প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৭৫

সূচীপত্র

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫

সূচীপত্র

আষাঢ়

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৭৫

সূচীপত্র

শ্রাবণ
১৩৭৮

প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৭৫

সূচীপত্র

১৩৭৮

প্রবাসী—ভাদ্র ১৩৭৫

সূচীপত্র

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৭৫

সূচীপত্র

লিলির ক্রীম ক্র্যাকার
উৎসবের দিনে প্রচুর আনন্দ দেয়
LILY BISCUITS
LILY'S Cream Cracker BISCUITS
LB-33/68
SYMBOL OF QUALITY
লিলি বিস্কুটই কিনবেন
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

স্বর্ণকুম্ভ

নন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৭৫

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

বিশ্বের সকল মানবের সকল দুঃখ দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে নানান লোকের প্রাণে নিত্য নূতন আকারে জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখ দূর হয় নাই। ধর্মের পথে মোক্ষ লাভ প্রচেষ্টায় দুঃখ দূর হইবে বলিয়া কতই যে বিভিন্ন ধর্মের পথ ভাবিয়া বাহির করা হইয়াছে; ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় দুঃখ দূর হইবে আশায় নিত্যনূতন ন্যায়ের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া মানুষের নিকটে ধরা হইয়াছে, ভোগের পথে, ত্যাগের পথে, নানাভাবে নানা উপায়ে ঐ একই চেষ্টা বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া শেষ অবধি সেই একই বিফলতায় নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। দুঃখ কত ভাবে মানব জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া সকল আনন্দ নাশ করিয়া প্রাণ ধারণ দুঃসহ করিয়া তোলে তাহার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে ও দর্শনে অনেক সুদক্ষ ব্যক্তি বহুবার বলিয়াছেন। দুঃখ বা সুখের অভাব অনুশীলনে একথা পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে এক দিক দিয়া ক্লেশ নিবারণ করিলে সেই কষ্ট অন্য পথে আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করে। এই কারণে যদিও ধর্ম, ন্যায়, ভোগ, ত্যাগ অথবা অপরাপর আদর্শ প্রথমত দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়াই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পরে, সেই সকল উদ্ভাবনা দুঃখ নিবারণে সক্ষম না হইয়া শুধু নিজ নিজ বৈচিত্র্যের গৌরবেই চিন্তার ক্ষেত্রে স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। দুঃখকে সানন্দে গ্রহণ করিয়া লইয়া জীবনে স্থান দিবার প্রস্তাবও মহাপুরুষগণ করিয়া থাকেন। "সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে ফুল ফুটবে" কিম্বা "মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল" বলিয়া দুঃখকে সুখের আনন্দের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া নেওয়ার চেষ্টাও হয়।

দুঃখ পূর্বজন্মের কর্মফল এবং এ জীবনে দুঃখ দূর করিতে না পারিলেও সৎকর্মের দ্বারা পরজন্মে দুঃখ বর্জিতভাবে জীবন কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বলিয়া কোন কোন ধর্মে বলা হয়। বিজ্ঞান নানান

উপায় উদ্ভাবনা করিয়া অনেক প্রকারের কষ্ট দূর বা হ্রাস করিতে সক্ষম হইয়াছে, যথা শরীরের কষ্ট ঔষধে বা অস্ত্রোপচারের কষ্ট মানুষকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া লাঘব করা যায়। দীর্ঘপথ অতিক্রমের কষ্ট দ্রুত গমনের উপায় আবিষ্কারে কমান সম্ভব হয়। গরমের কষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে গৃহাদি ঠাণ্ডা করিয়া নিবারণ করা যায়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানা প্রকারের অভাব বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিয়া দূর করা সম্ভব হইতেছে। মানবজীবনযাত্রা আধুনিককালে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক হইয়াছে। কোন কোন দেশের সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্বের তুলনায় বহু উন্নতভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেছেন। কিন্তু এই সকল অভাব বা তাহার দূরীকরণ বাস্তব প্রকারের। যে দুঃখ অন্তরের ও যাহা কোন বস্তু আহরণ করিয়া অপসৃত করা যায় না তাহা কেহ দূর করিতে সক্ষম হয় না। যথা প্রিয়জন বিয়োগের কষ্ট, নিকটের লোকও শত্রু হইবার দুঃখ কিম্বা নিজ ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে না পারার দুঃখ ইত্যাদি। আধুনিক যুগে কোন কোন অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীন কার্য্যক্রমে নূতন নূতন বাধার সৃষ্টি হইতেছে। যদিও এই সকল ব্যবস্থা মানুষকে অধিকতরভাবে "মুক্তি" দান করিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হয়। কিন্তু বস্তুত এই সকল নূতন উদ্ভাবিত উপায়ে সমাজ গঠন করিয়া মানুষের মানসিক স্বাধীনতা, বাস্তব সুখ সুবিধা কোন কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। যে সকল দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সকল মানবের কার্য্য ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি বাড়াইয়া তাহাদিগের জীবন যাত্রা অধিকতর সুগম করা হইয়াছে, সেই সকল দেশ পুরাতন পথে চলিয়াই নূতন নূতন সুখ ও সুবিধার আস্বাদলাভ করিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের মধ্যে সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। যে সকল দেশ মানুষের জীবনকে নব নব নিয়ম ও নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া আরও কঠিনতরভাবে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়াছে সেই দেশগুলির প্রচার শ্রবণ করিলে মনে হয় ঐ আড়ষ্ট ভাবই মানব জীবনকে পূর্ণতর ভাবে গতিশীল করিয়া দেয়। অবশ্য পুরাতন কালেও কোন কোন ধর্ম্মমতে না পাওয়াই পাওয়া অথবা আত্ম-বলিদানই আত্ম প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রভৃতি উদ্ভট কথার অবতারণা করা হইয়াছে। রীতি, নীতি, পদ্ধতি ও নিয়মকে রাজাসনে বসান কোন নূতন কথা নহে। কোন ব্যক্তি, দল অথবা মতবাদকে মানুষের উপরে পূর্ণতম শক্তিতে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে এইভাবে সর্ব্বগ্রাসী নিয়ম ও পদ্ধতির সৃষ্টি করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি সহজ হয়। আমাদিগের দেশের বিগত কুড়ি বৎসরের ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মানুষের সকল স্বাধীনতার অধিকার উত্তরোত্তর ক্রমাগত অধিক করিয়া খর্ব্ব করা হইয়াছে ও দেশবাসীকে বুঝান হইয়াছে যে তাহারা ক্রমে ক্রমে অধিকতরভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সক্ষম হইতেছে। যাহারা দেশবাসীকে আরও অধিক নিজ নিজ অধিকার ত্যাগ করাইয়া দলপতিদিগের একাধি-পত্য পূর্ণাবয়ব করিতে চাহে তাহাদিগের প্রচারে মনে হয় মানুষের নিজ মতের কোন মূল্যই নাই! কোন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সকল মানবের সকল চিন্তা ও ইচ্ছার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করিয়া শুধু নিজের মগজ প্রসূত-বাণী দিয়া সহস্র লক্ষ লোকের জীবন ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম। এই জাতীয় কথার যে কোনই মূল্য নাই তাহা শুধু তাহাকেই বুঝাইতে হইতে পারে যাহার মনের অন্ধ বিশ্বাস প্রাচীন কালের ভূতের ভয় অথবা অদৃষ্টবাদের সহিত তুলনীয়।

আমরা বাঙ্গালীরা বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছি। ইহার কারণ বিগত দুইশত বৎসরে বহু বাঙ্গালী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা নিজ নিজ চিন্তা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাজা রাম-মোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র বসু অবধি কত শত ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, চিত্রকলা ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, বিপ্লববাদ, সামরিক অভিযান

প্রভৃতি নানা বিষয়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই আধুনিক কালের মতবাদগুলির বিষয়ে কোন আসক্তি দেখান নাই। ইহার কারণ এ সকল মতবাদ চিন্তার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। যাহারা এই সকল মতবাদ লইয়া প্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহাদিগের মধ্যেও উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব আছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুরাতনকে তুলনামূলকভাবে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এরূপ হাস্যকর প্রসঙ্গের উত্থাপনা করিয়া থাকে যে তাহা শুধু তাহারই করিতে পারে। যথা, স্বামী বিবেকানন্দ না কি অনার্য্যদিগের উপর আর্য্যজাতির প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপরন্তু এই কার্য্য রাজা রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথও করিয়া গিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই অপরাধে অভিযুক্ত নহেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও খালাস। অভিযোগের কারণ বেদ ও উপনিষদের প্রচার করিয়া রাজা রামমোহন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আর্য্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন উপরোক্ত অদ্ভুত নির্ব্বুদ্ধিতা আক্রান্ত ব্যক্তিগণ আরও নানান প্রকার বিচিত্র অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শুনা যায় একটি অতিবড় "বুর্জোয়া।" ইহার অর্থ কি আমরা ঠিক বুঝিনা। "বুর্জোয়া" কথাটির অভিধানের অর্থ হইল যাহারা বাজারের শেয়ার কেনা বেচা করে সেই প্রকার ব্যক্তি। অর্থটা আরও প্রসারিত করিয়া দেখিলে "ব্যবসাদার" কিম্বা "ধনবাদে বিশ্বাসী" ব্যক্তি হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজ সকল অর্থ বিশ্বভারতীকে দান করিয়া গিয়াছেন। কার্য্যত তিনি ব্যবসাদার কিম্বা ধনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে হেয় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করে তাহারা বুদ্ধির ক্ষেত্রের "প্রলিটেরিয়াট"—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই সঙ্গে আরও কিছু বলা আবশ্যক। বলিতে হইত না যদি আজকালকার বাঙ্গালীগণ তাঁহার সাহিত্য যথাযথভাবে চর্চ্চা করিতেন। কিন্তু অনেকে আজকাল রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ দেখাইতেছেন না। এই কারণে তাঁহার কাব্যসম্ভারের দুই চারিটি ছত্র এই স্থলে উদ্ধৃতি করিয়া দেখান হইতেছে তাঁহার মনের ধারা কোনদিকে প্রবাহিত ছিল।

> "...........। ইচ্ছা করে, সে নিভৃত
> গিরি ক্রোড়ে সুখাসীন উর্মি মুখরিত
> লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
> বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
> যেখানে যা-কিছু আছে; নদী স্রোতোনীরে
> আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
> নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
> পিপাসার জল.......................
> ....
>
> কঠিন পাষাণ ক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
> মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
> নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
> স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্ব লোক সনে
> দেশ দেশান্তরে, উষ্ট্র দুগ্ধ করি পান
> মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
> দুর্দম স্বাধীন;...............
> ....
>
> প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
> কর্ম্ম অনুরত—সকলের ঘরে ঘরে
> জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।"

আর্য্যজাতির প্রাধান্য প্রয়াসী ব্যক্তি আরব ও চীন দেশে জন্মলাভ ইচ্ছা করিতে পারেন না। ধনতন্ত্রে বিশ্বাসের লক্ষণও বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। যে সকল অপরাপর মহাপুরুষদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন চেষ্টা করা হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের মতামত আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে অভিযোগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অভিযোক্তাদিগের অজ্ঞানতা অথবা নীচ অভিসন্ধিজাত। বাঙ্গালী জাতিকে নিজ ঐতিহ্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যবিরুদ্ধ মতে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা যাহারা করে তাহাদিগকে বাঙ্গালীর শত্রু ও স্বজাতিদ্রোহী বলিয়া বিচার করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর নিজত্ব বিচার করিলে দেখিতে হইবে এই জাতীয় বিশেষত্ব কিসে এবং কোথায় নিবিষ্ট। বাংলার ইতিহাসে যে সকল মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদিগকে আবোলতাবোল অর্থহীন বাক্য ছিটাইয়া নবরূপ দান করিয়া হেয় প্রমাণ চেষ্টার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান চীন অথবা কঙ্গো দেশের কোন মহারথী মানবমূল্য স্থির করিবার কি নূতন মাপকাঠি তৈয়ার করিয়াছেন তাহা ব্যবহার করিয়া আমরা নিজের ঘরের কথার নূতন অর্থ নির্ণয় করিব কি না তাহা আমরাই বুঝিব। পূর্ব্বে ইংরেজের মাপকাঠিতে মাপিয়া আমাদিগের যাহা মূল্য স্থির হইয়াছিল তাহাতে আমরা অসভ্য বর্ব্বর অনুন্নত ও স্বাধীন অস্তিত্বের অযোগ্য প্রমাণ হইয়াছিলাম। রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি লোকেদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার ব্যবহারে আমরা পরে ইংরেজের কথা যে মিথ্যা তা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। বাংলার মহাপুরুষগণ যদি চীনের মানদণ্ডে ওজন হইয়া অপদার্থ প্রমাণ হইয়া যান তাহা হইলে আমরা নিজেদের প্রিয়জনকে পরিত্যাগ না করিয়া চীনকেই পরিত্যাগ করিব। যাহারা চীনের কথাই শেষ কথা মনে করে, তাহাদেরও উচিত হইবে চীনদেশে গিয়া বাস করা। আমাদের সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, ন্যায়, বিজ্ঞান, সামাজিক রীতি, নীতি ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়া যদি আমরা অজ্ঞাত-কুলশীল বিদেশীদিগের বিদ্যা ও জ্ঞানের স্পর্দ্ধার নিকট আত্মসমর্পণ করি তাহা হইলে আমাদিগের জগতের নিকট মুখ দেখাইবার আর কোন উপায় থাকিবে না। যে কোন জাতির জাতীয়তা তাহার সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত জড়িত। সভ্যতা ও কৃষ্টি জাতির ইতিহাসের সহিত আন্তরিকভাবে গ্রথিত। আর্য্য কাহারা ছিলেন ও কখন তাঁহারা বাংলায় আসিয়া অপরাপর জাতির সহিত নানান সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন এই জন্য নাই যে বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ তাহার বহু পরেকার কথা। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অমিশ্র আর্য্য রক্ত অধিকাংশের দেহেই নাই। কোন বাঙ্গালী আর্য্য ও কে অনার্য্য তাহা আমরা জানি না এবং চীন দেশের লোকেরা আরোই জানে না। সুতরাং কোন ব্যক্তিরই ঐ সকল কথার উপর নির্ভর রাখিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া ভ্রান্তির পথে চলিয়া বিভ্রান্তির অনুধাবন মাত্র।

বাংলার সভ্যতার মূলে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহা-দিগের মধ্যে অনেকেই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা বাংলার বড় বড় পণ্ডিতগণ ধনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলা অতিবড় মূর্খতার পরিচায়ক। ধন ঐশ্বর্য্যের সহিত কৃষ্টি ও সভ্যতার সম্বন্ধ যে গভীর নহে এবং গরীব হইলেও মানুষ যে দেশপূজ্য হইতে পারে এ কথা আমাদিগকে মার্কস্ বা এঙ্গেলস্ পড়িয়া শিখিতে হইবে না। সমাজের ধনপতিগণ যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে পারেন না সেকথাও আমরা মার্কসের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই জানি। বিদ্যা ও কৃষ্টি ঐশ্বর্য্যের সহিত যেরূপ জড়িত নহে, দারিদ্র্যেরও সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই। বস্তুতঃ বিদ্যা, কৃষ্টি, শ্রদ্ধাভক্তি, মানবতা, জনহিতাকাঙ্খা প্রভৃতির সহিত ধনবাদ বা সমষ্টিবাদের সম্বন্ধ অত্যন্তই অগভীর। বলা যাইতে পারে যে মানবজাতির উন্নতি ঐ সকল ব্যক্তি-গত গুণের উপর নির্ভর করে না; সে উন্নতি জাতির শিকড় হইতে গজায়, সুতরাং, অখ্যাত ও অজানা জনতার উপরেই তাহা নির্ভর করে। উত্তরে বলা যায় যে বিদ্যা, কৃষ্টি ও সভ্যতাও আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই। তাহারও সংযোগ জাতির ইতিহাস আবেগ ও মনের ধারার সহিত। সেই ইতিহাস ও মানসিক গঠন কখনও শুধু উপরের লোকগুলিকেই ধরিয়া হইয়া থাকিতে পারে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে যে জনতা মনের আবেগে এক হইয়া ঘুরিত তাহারা সকলেই "বুর্জোয়া" ছিল বলিয়া দিলে সে কথার কোন

মূল্য হইবে না। কথকদিগের কথকতা, বাউলের গান কিম্বা কীর্ত্তন ঐভাবে শুধু জাতিকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা মাত্র ছিল বলিলে সে কথাকেও কেহ কোন মূল্য দিবে না। সকল কিছুই জাতির জীবনের সহিত গভীর সংযোগ বর্জ্জিত ছিল; শুধু এতদিনে জানা গিয়াছে জীবনের মূল কথাটি কি এবং তাহা জানিয়াছে একটা রাষ্ট্রীয় দল বিশেষের লোকেরা। এই ধরণের নকল পাণ্ডিত্যের ও ভুল বিদ্যার উপর কাহারও শ্রদ্ধা জাগ্রত হইতে পারে না। মানবজীবন বিচিত্র ও তাঁহার গুণাগুণ বহু দূর দূরান্তরের রক্ত সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। ধনিক, শ্রমিক, রাজা, প্রজা সকলেই আজ একপ্রকার ও কাল অপর প্রকার হইয়া দেখা দেয়। প্রবৃত্তি ও মনোভাবও পরিবর্ত্তনশীল। কোন কিছুই সহজ ও সরলভাবে নিজ অর্থ ও মূল্য প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না। বিশ্লেষণ যত দূর যায় ততই তাহা জটিল ও শতমুখী-শতগ্রন্থি হইয়া দেখা দেয়। মানবজীবনের সমস্যাগুলির কোন সহজ নিষ্পত্তি সম্ভব নহে; কারণ সেই বিষয়ের অনন্ত বিস্তৃতি ও জটিলতা।

কালো সাদার সংঘাত

অতি প্রাচীনকালে, যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে বিজয়ী সেনাদলের লুঠ, নারীহরণ, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বিজিত জাতির লোকেদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজদেশ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইবার অধিকার সকলেই মানিয়া লইত, সেই সময়ে শ্বেতকায় মানুষ অপর শ্বেতকায়দিগকে যুদ্ধলব্ধ দাস হিসাবে পরিশ্রমের কার্য্যে নিয়োগ করিত। রোমানগণ বৃহৎ বৃহৎ দাঁড়টানা জাহাজ চালাইবার জন্ত যে সকল "গ্যালি স্লেভ" ব্যবহার করিত সেই সকল লোকের অধিকাংশই শ্বেতকায় দাস হইত। পোপ গ্রেগরির নিকটে কয়েকজন বৃটিশ বালক দাস লইয়া গিয়া যখন বলা হয় তাহারা "অ্যাঙ্গল্" জাতীয়, তিনি তাহাতে বলেন তাহারা "অ্যাঙ্গল্" নহে "এঞ্জেল" বা দেবশিশু। এতই তাহাদিগের দেহের সৌন্দর্য্য ছিল। তৎকালে যে সকল দাস-বাজার বসিত সেই সকল বাজারে শ্বেত কৃষ্ণ নির্ব্বিচারে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় করা হইত। এই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া ক্রমে ক্রমে বহুশত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে শ্বেতজাতীয় লোকেদের দাসত্বে ক্রয় বিক্রয় প্রথা উঠিয়া যায়; কিন্তু কোন কোন দেশে, যথা রুশিয়ায়, জমির সহিত চাষীকে বিক্রয় করার রীতি বর্ত্তমানকালেও প্রচলিত ছিল। দাসত্ব প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এই শতাব্দীর আরম্ভের পরে হইয়াছে; শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় জাতির মধ্যেই। শ্বেতকায় দাসদাসীর বাজার উঠিয়া যাইবার পরেও কৃষ্ণকায় দাসদাসী কেনাবেচা বহুকাল চলিত। আরবগণ আফ্রিকা হইতে হাজার হাজার লোক বলপূর্ব্বক ধরিয়া ইয়োরোপীয় জাহাজের ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিত এবং এই সকল কৃষ্ণকায়গণকে তখন আমেরিকা ও ইয়োরোপে লইয়া গিয়া দাস হিসাবে বিক্রয় করা হইত। এই কৃষ্ণকায় দাসদাসীর কথা ইয়োরোপে আমেরিকার সাহিত্যে বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। "আঙ্কল্ টমস্ ক্যাবিন" গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত। ইয়োরোপ হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া যাইবার পরেও আমেরিকায় তাহা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল এবং প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে এই প্রথা রাখা না রাখার কথা লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে একটা দারুণ যুদ্ধ লাগিয়া যায়। এই যুদ্ধের ফলে ঐ দেশ হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া যায়। কিন্তু প্রথা উঠিয়া যাইলেও এবং কৃষ্ণকায় দাসদাসীদিগের সন্তানসন্ততিগণ মুক্তিলাভ করিলেও শ্বেতকায়দিগের সহিত সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহাদিগের অদৃষ্টে ঘটে নাই। এক ট্রাম, ট্রেণ প্রভৃতিতে আরোহণ এক হোটেলে খাওয়া বা থাকা, এক পাড়ায় বাস করা, থিয়েটার সিনেমায় পাশাপাশি বসা, স্কুলে একত্র পাঠ প্রভৃতি বহু বিষয়েই কৃষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দিগের সহিত সমান অধিকার লাভ করেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়াতে যেরূপ সংখ্যাধিক্য থাকিলেও কৃষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দিগের অধীনে বাস করে, আমেরিকায় কৃষ্ণকায়দিগের ঠিক সেইরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকারের অভাব না থাকিলেও পূর্ব্বো-

লিখিতভাবে সামাজিক ও মানবীয় অধিকারের যথেষ্টই অভাব আছে। কৃষ্ণকায়দিগকে নানাভাবে হেয় প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদিগকে অপমান করিবার রীতিও বহুস্থলে রহিয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ ঘটিলে কৃষ্ণকায়দিগকে নির্য্যাতন করা, এমনকি আক্রমণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার উদাহরণেরও অভাব নাই। এই সকলের মূলে রহিয়াছে ইয়োরোপের শ্বেতকায়দিগের কৃষ্ণকায়বিদ্বেষ ও শ্বেত প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা। বিগত বহু শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপের জাতিগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ার জনসাধারণের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে শোষণ করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার সাফাই হিসাবে তাহারা ইয়োরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা ও আফ্রিকা-এশিয়ার মানুষের নিকৃষ্ট রীতিনীতি ধরণধারণ লইয়া নানাপ্রকার-মিথ্যা প্রচার করিয়া চলিত। উচ্চ সভ্যতা থাকিলে অপরকে লুঠ করিয়া খাইবার অধিকার জন্মায় একথার নীতিগত মূল্য না থাকিলেও ইয়োরোপ বহুকাল প্রবলতর সামরিক শক্তির সাহায্যে নিজ লুণ্ঠনকার্য্য চালাইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়াছে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলি ইয়োরোপের শোষণ নীরবে সহ্য করিয়া চলে নাই। প্রথমে জাপান ও পরে চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে স্বাধীন অধিকারের পূর্ণতম গঠনের চেষ্টা হইতে থাকে। জাপান রুশিয়াকে যুদ্ধে হারাইয়া এই প্রচেষ্টাকে প্রকৃষ্ট রূপদান করে। চীন নিজ দেশে নানা প্রকার সংস্কার করিয়া ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা জগতে পূর্ণ করিয়া লয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলে প্রায় ৪৫ বৎসর ও ইহার শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র বোস ভারতীয় সেনাদল গঠন করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা সফল না হইলেও ইহার ফলে বৃটিশ জাতি ভারত হইতে চলিয়া যাওয়ার পন্থা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। সুভাষচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে ভারতের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী আর সবল থাকে নাই এবং ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারতের নেতাগণ যেনতেন প্রকারে দেশবিভাগ করিয়া তথাকথিত স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে শ্বেতকায় প্রভুত্ব চলিয়া যাইল। কিন্তু শ্বেতকায়দিগের অর্থনৈতিক অধিকার প্রবলতর রূপ ধারণ করিল।

বর্ত্তমান জগতে কৃষ্ণকায়গণ আর দাসত্বে আবদ্ধ নাই; কিন্তু আমেরিকা ও আফ্রিকার দুইটি দেশে তাহাদিগের অবস্থা কোনমতেই উন্নত ও সমাধিকার চর্চ্চিত বলা বলা যায় না। আমেরিকায় বর্ত্তমানে শ্বেত ও কৃষ্ণের বিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে এবং আফ্রিকায় সংঘর্ষ সামরিক আকার লাভ করিবার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃটেনের অবস্থা শুধু বিশেষ করিয়া সমস্যা জটিল। কারণ বৃটেন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দাকে বৃটেনে প্রবেশ করিতে দিয়া এক নূতন শ্বেত-কৃষ্ণ সংঘাতের সূচনা করিয়াছে। এখন দেখা যায় বৃটেনে প্রায় দশ লক্ষ কৃষ্ণকায় মানুষ বাস করে। ইহা ঐ দেশের জনসংখ্যার শতকরা দুইজন বলিয়া ধার্য্য হয়। কোন কোন সহরে বৃটেনে শতকরা দশজন কৃষ্ণকায় ও কোন কোন সহরের রাজপথ বিশেষের বাসিন্দাদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ জন কৃষ্ণকায়। কিন্তু ইহাতে বৃটেনের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে না; কারণ কৃষ্ণকায়দিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক ও কর্ম্মক্ষম এবং সেই কারণে তাহারা বৃটিশ জাতিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাহা দেয় তাহার তুলনায় ভোগ করে অল্পই। অর্থাৎ কৃষ্ণকায় জনসংখ্যা আর্থিকভাবে বৃটেনের পক্ষে লাভজনক। এতগুলি কালো মানুষ থাকিলে দেশের লোকের গয়ের রং ক্রমশঃ কালো হইয়া যাইবে কি না ভাবিবার বিষয়। হইতে পারে যে কালোরা নিজের মতই থাকিবে এবং বৃটিশদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে না। এখন বৃটেনের জনমত দুই পথে চলিতেছে। এক পথের পথিকগণ ভাবেন যে কৃষ্ণকায়দিগকে আর বৃটেনে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। অপর দলের মতে আসিতে দিলে কোন ক্ষতি নাই। প্রথম মতাবলম্বীগণই সংখ্যায় অধিক এবং কিনিয়ার কৃষ্ণকায়দিগকে বৃটেনে প্রবেশ করিতে

দিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় অতঃপর বৃটেনে অবাধ গতিবিধি কৃষ্ণকায়-দিগের পক্ষে আর কোনরূপে সম্ভব হইবে না। যাহাই হউক কৃষ্ণকায় শ্বেতকায় সমস্যার হঠাৎ কোন সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণকায়দিগের (অশ্বেতকায়) এখন কর্ত্তব্য নিজেদের শক্তি সামর্থ্য যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া লইয়া সকল অবস্থার জন্ম প্রস্তুত থাকা।

অতি আধুনিক রাষ্ট্র

সবস কিছুই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির শৃঙ্খলে বাঁধা—সর্ব্বত্র সুব্যবস্থা ও সুবিচারের অনন্ত প্রসার। সকলের জন্ম একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা, একই প্রকার পরিধেয় বস্ত্র, একই ধরণের বাসস্থান, একই লেখক সংঘের লিখিত একই পুস্তকরাজি—ন্যায়ের চূড়ান্ত ও অহিংসার সম্পূর্ণ অভাব। বৈচিত্র নাই, কল্পনার সম্ভাবনা নাই, অজানা কিছু নাই। রাস্তার পর রাস্তা, মোড়ের পর মোড় ঘুরিয়া ভাবিতে হয় না, কি দেখা যাইবে। সবই পূর্ব্ব হইতে জানা আছে। মানুষের মন যেখানে অনুসন্ধানের খোরাক চায়, প্রাণ সেখানে নূতন নূতন আবেগ অনুভব না করিলে জড়তাপ্রাপ্ত হয়, আত্মা সেখানে নব নব উদ্দীপনা লাভে বঞ্চিত হইলে নিজত্ব হারাইয়া ফেলে; সেখানে মানব জীবনের প্রকৃত কোন অর্থ থাকে না। অতি সুরক্ষিত, অতি সজ্জিত, অতিমাত্রায় ব্যবস্থার মোড়কে মোড়া। প্রাণ খুলিয়া কিছু করা যায় না, বিহ্বল আনন্দে দিশাহারা হওয়া চলে না। সুস্থির-ভাবে গোনা গাঁথা সব কিছু। সকল রস কিছু কিছু মিশাইয়া যে ভাবের অনুভূতি তাহা একান্তই রসহীন। প্রাকারের পর প্রাকার, দরজার পর দরজা, জানলার গরাদ এত কাছাকাছি বসান যে আলো বাতাস চলে না। অসংখ্য দেওয়ালের মাঝে মাঝে যেটুকু স্থান আছে সেখানে বাস করা চলে না। বাহিরে অসংখ্য গোয়েন্দা ঘুরিতেছে পাছে কেউ আইন ভঙ্গ করিয়া স্বাভাবিকভাবে কোন কিছু করিয়া ফেলে। এত কড়াকড়ি যে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা কখন পাওয়া যায় নাই। অভিজাত এই রাজত্বে তাহারাই যাহারা পূর্ব্বযুগে কুলি ঠেঙ্গাইয়া কাজ আদায় করিত এবং এখন নিয়মের দাস-দিগকে নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য করে। কারখানায় আটঘন্টার মেয়াদ কিন্তু রাষ্ট্রের আদর্শ জীবনযাত্রা দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই চলে। মুক্তির হাওয়া কোথাও একটা আইনের কেতাবের পাতাও নাড়াইতে পারে না। কারখানার যন্ত্র পিছনে রাখিয়া শ্রমিক কারখানার বাহিরে যাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় যন্ত্র মানুষের মাথার ভিতর, বুকের ভিতর ও রক্তের প্রতি কণায় কণায় নিজের ওজন চাপাইয়া মানুষের জীবন অসাড় করিয়া তোলে। রাষ্ট্রকে প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া মানবজীবনকে যাহারা ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন জড়তায় রচিত যন্ত্রের রূপ দান করে তাহারা মানবতার সর্ব্বনাশে নিযুক্ত ও মনুষ্যজাতির মহাশত্রু। দলবদ্ধতার চরম অবস্থায় মানব প্রগতি মেষপালের গড্ডালিকা প্রবাহে পর্য্যবসিত হয়। মানুষের স্বরূপ আর থাকে না।

চীন প্রবাসী নাগা

কিছু কিছু নাগা জাতীয় ব্যক্তি চীনের প্ররোচনায় ভারত হইতে সতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করেন ও সেই কারণে তাঁহারা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে একটা গুপ্তযুদ্ধ চালাইয়া চলিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি-দিগের সহিত ভারত সরকার কখন কখন শান্তি স্থাপন চেষ্টাও করিয়া থাকেন, যদিও এই সকল লোক আইনত দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী। এখন শুনা যাইতেছে গুপ্তযুদ্ধলিপ্ত নাগা সৈন্যগণের কিছু লোক চীন দেশে গমন করিয়া যুদ্ধ শিক্ষালাভ করিয়াছে ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা এখন ভারতে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যগণ ইতিমধ্যে চীনের সীমান্তে লোকবল বৃদ্ধি করিয়া ঘাঁটিগুলি ভাল করিয়া আগুলান সুরু করায় নাগাদিগের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কঠিন হইয়াছে। তাহারা চীনের এলাকাতে আটকাইয়া গিয়া ঐ দেশেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। পাকিস্থান এই কারণেই বোধ হয় হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সৈন্যদিগের

দৃষ্টি অন্যদিকে লইয়া যাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। যদিও মনে হইতেছে না যে এই চেষ্টায় তাহারা সকলকাম হইতে পারিবে। কারণ ভারতীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা চীন সীমান্ত রক্ষা করে তাহারা চীন সীমান্ত ত্যাগ করিয়া পাকিস্থান সীমান্ত রক্ষার কার্য্যে কখন আসিতে পারে না। পাকিস্থানের ভারতের উপর হামলা করিবার অন্য কারণ হইল ভারতের যুদ্ধের আয়োজন কিরূপ আছে তাহা দেখিয়া লইবার জন্য। পাকিস্থান আক্রমণের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে ও সে আক্রমণ আরম্ভ হইল বলিয়া। আমরা মনে করি যে পাকিস্থান ভারত আক্রমণ আয়োজনে ব্যস্ত। ব্যবস্থা হইলেই ভারত আক্রমণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। অবশ্য সকল কথাই প্রধানতঃ আন্দাজের উপর নির্ভর করিতেছে। নাগা, মিজো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগুলি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার যে আয়োজন করিতেছে ও চীন বা পাকিস্থানের নিকট অস্ত্র সংগ্রহের জন্য যে গমনাগমন করিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে বিদেশী প্ররোচকগণ। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজ বা আমেরিকান ও অপর সকল ব্যক্তিই চীনা, পাকিস্থানী অথবা ভারতীয়। যাহারা ভারতীয় তাহারা অপর দেশের লোকেদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া নিজ মাতৃভূমির বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত। চীন বহু ভারতীয়কে গুপ্তচর রাখিয়াছে ও তাহারাও ঐ সকল বিদ্রোহী নাগা কুকি প্রভৃতিকে সাহায্য করিয়া থাকে। এই ভারতীয়দিগের মধ্যে আসামের লোক আছে অনেক। ইহাদিগের সহিত পাকিস্থান ও চীন উভয় জাতিরই গোপন সংযোগ আছে। চীন যে পাকিস্থানকে অস্ত্র দিয়া ভারতের সহিত যুদ্ধ করাইবার আকাঙ্খা পোষণ করে সে কথা সকলেই জানেন। এই যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইবে তখন ভারতকে ভিতর হইতে যাহারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিবে তাহাদের মধ্যে ঐ সকল পার্ব্বত্য জাতি এবং স্বদেশদ্রোহী ভারতীয়গণ থাকিবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে চীনের প্রতি নিজেদের অনুরাগ ব্যক্ত করিয়া বলতারি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাদিগকে কেন এইরূপ করিতে দেওয়া হয় তাহা আমরা জানিনা। জাতীয়ভাবে আমাদিগের কর্ত্তব্য এই সকল দেশদ্রোহীদিগকে দমন করা। কিন্তু আমরা তাহা করিনা। আমরা ভাবি দেশদ্রোহিতাও এক প্রকার নির্দোষ রাষ্ট্রমত ও তাহা পোষণ করার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু বস্তুত বিদ্রোহ চেষ্টা করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। সেরূপ চেষ্টা যে করে তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করাই নীতি সঙ্গত। বিদেশীর হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইলে প্রজাগণ স্বাধীনতার আকাঙ্খায় বিদ্রোহ করিতে পারে। সে বিদ্রোহের একটা নীতিগত ও ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু নিজেদের অধিকারে দেশ থাকিলে ও অধিকাংশ লোকের মতে রাজ্য শাসন কার্য্য চালিত হইলে, বিদ্রোহের অধিকার ন্যায়তঃ কাহারও থাকিতে পারে না। তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে যে মানুষ যদি সেচ্ছায় নিজের হাতে পায়ে শৃঙ্খল লাগাইয়া বাস করে তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের সভ্যতায় আমরা স্বেচ্ছায় নানা প্রকার অর্থনৈতিক নিয়মাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছি যেগুলি আমাদের পূর্ণমুক্তি উপভোগ করিতে বাধা দিতেছে। সুতরাং যদি অল্প সংখ্যক লোক এই সামাজিক রীতিনীতি জোর করিয়া ভাজিয়া দিয়া অপর উন্নততর রীতি প্রবর্ত্তন করে তাহা হইলে সেইভাবে বল প্রয়োগ করা নীতি বিরুদ্ধ হইবে না। প্রথম কথা, বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মাদি আমাদিগের হস্তপদের শৃঙ্খল একথা আমরা স্বীকার করি না। দ্বিতীয় কথা, অপর যে উন্নততর রীতি প্রবর্ত্তন চেষ্টা চলিতেছে তাহা মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিবে এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই। যতটা জানা যায় আধুনিক যে সকল পরিবর্ত্তিত ধরণের রাষ্ট্রগঠন পদ্ধতি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার

(এরপর ১১৯ পাতায়)

আঘাত, প্রত্যাঘাত ও দণ্ডনীতি

কালীচরণ ঘোষ

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্য বহুলাংশে সাধারণের মধ্যে উত্তেজনার রসদ জুগিয়েছে। আপদ এসে জুটলে করিতকর্মা মানুষ নিশ্চেষ্ট না থেকে উদ্ধার হবার পথ খুঁজে বার করে। জীবনের জয়যাত্রা এই এক মন্ত্রে চালিত হয়েছে। অভাববোধ এবং তাকে দূর করবার প্রচেষ্টা আজ মানুষকে "সভ্য" করেছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে; কয়েক দশক পূর্ব্বেও যা অভাবনীয় ছিল তাকে সহজলভ্য করেছে।

শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক বিশেষতঃ পুলিশ কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, আহত হবার সংবাদ সেযুগে প্রায়ই শোনা যেত, এবং সে অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করাই একটা রীতি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু "স্বদেশী" অর্থাৎ তার এ কার্যে আত্মসম্মানবোধ জাতির চিত্তে ক্রমেই ফুটে উঠেছে। এমন সময় সাধারণ লোকের বোধগম্য ভাষায় নানা মন্ত্র উচ্চারিত হতে আরম্ভ হয়, সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায়। সবেরই নির্গলিতার্থ ছিল মারের বদলে মার, ইংরেজি ঘুষি বনাম দিশি কিল, গালাগালির বদলে চড়, কিলের বদলে লাথি, ইত্যাদি। ইংরেজি প্রবচন "Eye for an eye; tooth for a tooth," শিক্ষিত মহলে প্রচারিত হয়েছিল।

শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক অপমানের প্রতিকার-চেষ্টা বহু ক্ষেত্রে হয়েছে; তার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ যুবকের মন আরও এক উচ্চ সুরে বাঁধা সুরু হলো; অর্থাৎ পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত। বলাবাহুল্য গভর্ণমেণ্টও এই মনোভাব দমন করবার জন্য কঠোরতম শাস্তির পথ গ্রহণ করেছিল। কিশোর ও যুবকদের কোমল অঙ্গে কঠোর বেত্রাঘাত যেন এক প্রকার গতানুগতিক দণ্ডের পর্য্যায়ে এসে পড়েছিল।

প্রথম "রাজনৈতিক" সঙ্ঘর্ষের বৃত্তান্তটি অতি মনোজ্ঞ; ১৯০৫ নভেম্বর মাসের ঘটনা। আর এই থেকে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির শক্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। (হায় ভারত! তোমার আত্মমগ্ন, অদূরদর্শী, বুদ্ধিহীন নেতৃবর্গের দোষে সেই রণতাণ্ডবে আহ্বানের নিনাদ হারিয়ে বসেছ !!) সাধারণ একটি মণ্ডপ, পুলিশের সাক্ষীতে হাবু নামে পরিচিত, পথে 'মাতলামি' করে চলেছিল। কর্ত্তব্যরত পুলিশ তাকে পাকড়াও করলে, সে উচ্চকণ্ঠে বার দুই 'বন্দেমাতরম্' বলে চীৎকার করে উঠলো। গঙ্গাজল স্পর্শ না কি সর্ব্ব পাপ হরণ করে। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সেরূপে হয়ত মাতালের সকল ত্রুটি ক্ষালন করে বসেছিল এখানে।

রাস্তার অপর পার দিয়ে চলেছিলেন জানকীনাথ দত্ত। তিনি এসেই 'বন্দেমাতরম্' নাম-গ্রহণে সকল পাপ-মুক্ত হাবুকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। বলাবাহুল্য তাতে কোনো ফল হলো না। তখন দুপক্ষেই কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ ঘটলো। জানকীনাথ পুলিশের সঙ্গে যখন রণোন্মত্ত তখন সব হালচাল দেখে অর্থব্যয়ে লব্ধ হাবুর মৌতাত ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাবু দ্রুত পদক্ষেপে ঘটনাস্থল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন আরও (অধুনালুপ্ত) 'লাল পাগড়ি' এসে জানকীনাথের ওপর হামলা করে হাজতে নিয়ে গেল। পুলিশকে প্রহার এবং তার কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে কাজি কিংসফোর্ড ২৮ নভেম্বর (১৯০৫) জানকীনাথকে পনেরো ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন। কাছারি প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য স্থানে সেই আদেশ পালিত হয়েছিল।

পরের হাঙ্গামার পরিচয় পাওয়া যায় ৭ আগষ্ট ১৯০৭। 'যুগান্তর' অফিস খানাতল্লাসী চলছে চাঁপাতলায়। পুলিশ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এ শুভ কার্য্যে কোনো রকম বাধা পাবে। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। ভিড় দেখে সেখানে জুটে গেল অনেক লোক। তার মধ্যে ছিল রিপন

(সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জ্যোতিষ চন্দ্র রায় আর যুগান্তরের তরুণ কর্ম্মী শৈলেন্দ্রনাথ বসু। এখানে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় সেটার গুরুত্ব নিতান্ত উপেক্ষা করার মত নয়। যা হয়েছিল তার ওপর ৮ আগষ্ট (১৯০৭) সন্ধ্যা লিখেছিল "যুগান্তরে রক্তারক্তি, ফিরিঙ্গিদের ফাটলো পিন্তি"। তাৎকালিক বিবরণে পাওয়া যায় যে দুপক্ষেই বেশ খানিকটা রক্তপাত হয়েছিল।

The Indian World পত্রিকা (আগষ্ট ১৯০৭, পৃ: ১৬৫) লেখে "a boy from the Jugantar office was handled severely by the police" and he also "dealt some telling blows on his assailant."

নিম্ন আদালতের বিচারে শৈলেনের তিন মাস ও জ্যোতিষের এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপীলে ২৮ এ আগষ্ট (১৯০৭) জ্যোতিষের সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকারে পাঁচশত টাকা জামীন মুচলেখায় পরিণত হয়। শৈলেন আর আপীল করে নি।

সুশীল সেনের বেত্রদণ্ডের খবরটাই বেশী করে প্রচারিত হয়েছিল (প্রবাসী, পৌষ ১৩৭৪, পৃ: ৩৪৯), জানকীনাথ দত্তর কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। রাজনৈতিক অপরাধে ঐ সময় আরও যে কয়জন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, তাঁদের নামও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন মনে করি। সঞ্জীবনী প্রথমে প্রকাশ করলে পরে অমৃতবাজার পত্রিকা (৯ নভেম্বর ১৯০৭) সে সংবাদ পুনর্মুদ্রিত করে।

জানকীনাথ দত্তের কথা সেখানে প্রথমে দেওয়া ছিল; দ্বিতীয় ছিল সুশীল সেন। তারপর পান্নালাল শেঠ ও পঞ্চানন দাস; এদের প্রত্যেককেই আদালত প্রাঙ্গণে সর্ব্ব সমক্ষে দশ দশ বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। এতেও কাজি সাহেবের মন ওঠেনি। কালীপ্রসন্ন সাহা ও পঞ্চদশ বয়স্ক বালক তিনকড়ি দে প্রত্যেককে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দেওয়া হয়। কালীপ্রসন্নর সাজা প্রকাশ্য স্থানে, আর তিনকড়ির সাজা প্রেসিডেন্সী জেলে সংসাধিত হয়।

আরও যে এ রকম হয় নি, সে কথা হলপ করে বলতে পারবো না। এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এর পটভূমিকা ছিল কাজী কিংসফোর্ডের চিন্তাধারায়। তিনি এ শ্রেণীর প্রায় প্রতি মামলায় আওড়াতেন যে, "যুবকদের বর্ত্তমান বিদ্রোহী-মনোভাব দমন করবার জন্য এর প্রয়োজন আছে; তারা কারণে অকারণে পুলিশকে প্রহার করে আর সেই কারণেই পুলিশের মর্য্যাদা রক্ষায় এ সাজা একান্ত প্রয়োজন।" (ইংরেজিতে: "The punishment was called forth by the prevailing spirit of rebellion among students which prompts them to assault police whenever possible and by the necessity of upholding the authority of the police")

এই শ্রেণীর গুরুতর শাস্তি অনবরত চলতে থাকলে প্রকাশ্যে ত বটেই হৃদয়হীন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টও এ রূক্ষতার ওপর নজর দেয়। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ওপর সরকার নির্দ্দেশ দেয় যে ষোলর অনধিক বয়স্ক কিশোরদিগকে সাজা হিসাবে বেত্রাঘাত দেওয়া প্রয়োজন বোধ হলে সেটা খানিকটা "মোলায়েম" করে নিতে হবে। যদিও আইনমতে ত্রিশ ঘা দেওয়াও সিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পনেরোই হবে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা। প্রকাশ্য স্থান পরিহার করে জেলের অভ্যন্তর বা কাছারির সন্নিকটে ঘেরা জায়গা নির্ব্বাচিত হবে। সাজার তীব্রতা আসামীর সহনশক্তির অতিরিক্ত হয় কি না, সেটা বিচারের জন্য একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে উপস্থিত রাখা বাঞ্ছনীয়। ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে না যায় সেজন্য বীজাণু নাশক লোশনে ভিজিয়ে এক টুকরা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে আঘাত দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট স্থান ঢেকে দিতে হবে। বেতটি হবে আধ ইঞ্চি ব্যাসের, কিন্তু কিশোরদের ক্ষেত্রে বেতটি হবে অপেক্ষাকৃত লঘু ওজনের। তালুতে যদি বেত মারা স্থির হয় তাহলে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন হাতের কোনো স্থায়ী ক্ষতি না হয়। (The Indian World, November, 1907.)

এ সতর্কবাণী পড়লে কি মনে হয় না যে এই শ্রেণীর

দুর্ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতো? সকলেই সুশীল সেনের মত অকাতরে সহ্য করবার মত মনের শক্তির অধিকারী ছিল না। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে যখন বেত্রদণ্ড আইন (Whipping Act) ১৮৯৯ সালে পাস হয়, তখন ভারতীয় বহু পত্রিকা এর অপপ্রয়োগের সম্ভাব্যতায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তবু তখন তারা জানতো না যে সভ্য ইংরেজ রাজত্বে নির্বিচারে এই কঠোরদণ্ড রাজনৈতিক কিশোর ও যুবক অপরাধীর উপর প্রযুক্ত হবে।

এই অবস্থার কথা বিবেচনা করে London Daily News লিখেছিল :

"To flog young men for political offences however foolish they have been, is the surest way of turning the whole educated sentiment of India against us."

সংক্ষেপে, যত বড়ই বোকামির কাজ এরা করে থাকুক, রাজনৈতিক অপরাধে যুবকদের প্রতি বেত্রদণ্ড সমস্ত শিক্ষিত ভারতীয়ের মন আমাদের বিরূপ করে তুলবে!'

অতি সত্য কথা। প্রকৃতপক্ষে যুব বাঙ্গালী মন ক্রমে এই ধরণের নির্য্যাতনের জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে এবং যে-সকল অত্যাচারের কথা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয় তাহাও অকাতরে সহ্য করেছে। অপরাপর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলকাতার কয়েকটি ঘটনার কথা বলা বলা হয়েছে। দূর পল্লীতেও যে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকায় কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি; যা পাওয়া গিয়েছে, তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা যাচ্ছে :

সবে মাত্র বঙ্গ বিভাগের ঘোষণা হয়েছে: লোকের মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। পুলিশ একদল ছোকরাকে, ধীরেন্দ্র নাথ রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, খগেন্দ্রজীবন রায় ও হরকিশোর ধর, মৈমনসিংহে ডিসেম্বর প্রথম সপ্তাহে পাকড়াও করে। তাদের অপরাধ থানার দারোগাকে লক্ষ্য করে তারা ঢিল ছুঁড়েছে। ঐমাসেই বরিশালে ধরা পড়েন সুরেশচন্দ্র কারণ তিনি দারোগা বাবুকে গালিগালাজ করেছেন। ভবানীপুর কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর (১৯০৫) মামলায় হাজির করা হয় সুরথকুমার বসুকে, অপরাধ, কনেষ্টবলকে প্রহার। জলপাইগুড়িতে দুর্গাদাস অভিযুক্ত হয়েছিলেন, (২রা ডিসেম্বর ১৯০৫) তিনি বিদেশী মালের দোকানে পিকেটিংয়ে রত এবং ধৃত দুজনকে পাহারাওয়ালার কবল থেকে মুক্ত করে দেন। তাঁর সঙ্গে আসামী ছিলেন আশুনাথ ও চণ্ডীদাস। দুর্গা আর আশুনাথের চৌদ্দ দিন করে জেল হয়, চণ্ডীর হয় পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। (২১শে ডিসেম্বর ১৯০৫)।

মাদারীপুরে মিঃ ক্যাটেলের প্রতি ঢিল ছোড়ার অপরাধে অনন্তমোহন দাসকে অভিযুক্ত করা হয় জানুয়ারী ১৯০৬; মাস দুই জেল খেটে ৬ এপ্রিল তিনি মুক্তি পান।

সার্জ্জেণ্টকে মারার অভিযোগে সেপ্টেম্বর (১৯০৭) মাসে কলিকাতায় সুরেশচন্দ্র রায়কে অভিযুক্ত করা হয়। ২রা অক্টোবর রংপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকার সম্পাদককে রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার করলে পত্রিকা অফিসের নিকট স্থানীয় (ন্যাশনাল) জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত যতীন্দ্রনাথ দাস, শৈলেশচন্দ্র গুপ্ত, ভুবনচন্দ্র দত্ত ও জেলা স্কুলের অপর দুই জন ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের মারপিট হয়। ফলে ১৮ বছরের শ্রীশের এক মাস বিনাশ্রম কারাবাস, যতীন ও শৈলেশ (১৭) প্রত্যেকের তিন সপ্তাহ সশ্রম ও ভুবনের একমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মার্চ্চ (১৯০৮) মাসে কলিকাতায় পুলিশকে প্রহার করার জন্য নলিনীমোহন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রমোহন রায় ও কৃষ্ণনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।

এ দুটি বেশ বড় রকমের মামলা হয়েছিল ব্লুমফিল্ড (Bloomfield) নামক নীলকর আর হিকেনবোথাম (Hickenbotham) পাদ্রীকে হত্যা ও হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে। আরও নানা হাঙ্গামা হওয়া অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে এ সকল ঘটনা "হাত পাকাবার" প্রথম পর্য্যায়। তখনও দেশের যুবকরা যেন সবেমাত্র স্বপ্নোত্থিত হয়ে উঠে শক্তি পরীক্ষার সূচনা জুড়ে দিয়েছে। এই সকল প্রাথমিক লক্ষণ আলিপুর বোমার মামলার ইঙ্গিত দিতেছিল।

অপরাধ

গল্প

কুমারলাল দাশগুপ্ত

সকাল বেলা হালের বলদ দুটোর জন্যে মাচা থেকে খড় নামাচ্ছিল শিউচরণ, এমন সময় ছেলে মতি ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে একটা হুলস্থুল বাধিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি মাচা থেকে নেমে পড়লো শিউচরণ, ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো "কি রে, কি হয়েছে, চেঁচাচ্ছিস কেন ?"

হাঁপাতে হাঁপাতে মতি বল্ল "সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, অড়র ক্ষেতের অর্দ্ধেক অড়র গরুতে খেয়ে গেছে।"

এমন দুঃসংবাদ শুনে কেবল শিউচরণ নয়, বাড়ীর ছোট বড় সবাই কাতর হয়ে পড়লো। গ্রাম থেকে একটু দূরে নদীর ওপারে শিউচরণের বিঘে দুই জমি ছিল। উঁচু জমি বলে সেটা প্রায়ই অনাবাদী পড়ে থাকতো। এবার চাষ করে অড়র লাগিয়েছে শিউচরণ, সময়ে বর্ষা হওয়ায় ভালই হয়েছে ফসল। অড়রের শুটিগুলি বড় হয়েছে, আর সপ্তাহ দুই পরেই কাটার মত হবে, এমন সময় ফসল নষ্ট হয়েছে শুনে চাষীর মনে আঘাত লাগবারই কথা। হাতের কাজ ফেলে রেখে শিউচরণ ছুটলো ক্ষেতের দিকে, পিছনে ছুটলো স্ত্রী আর সবকটা ছেলে মেয়ে।

গরু ছাগলের ভয়ে কুলকাঁটা দিয়ে জমিটা মোটামুটি ঘিরে দিয়েছিল শিউচরণ। দেখা গেল বেড়ার দুর্বল একটা অংশ ভেঙে গরু ভিতরে ঢুকে কিছু অড়র গাছের মাথা মুড়ে খেয়ে গেছে, সর্বনাশ হবার মত ক্ষতি হয়নি। শিউচরণ দেখেশুনে বল্ল "দিনের বেলা খায়নি, দিনের বেলা গরুর সঙ্গে রাখাল থাকে, এ কাণ্ড ঘটেছে রাত্রে, কোন ছুটো গরু ঢুকেছিল ভিতরে।" শিউচরণের স্ত্রী আকাশের দিকে দুহাত তুলে উচ্চকণ্ঠে বারবার দেবতার দরবারে প্রার্থনা জানালো। "যে গরু রাত্রে পরের ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেয়ে বেড়ায় তাকে যেন বাঘে খায়, তার মালিক যেন নির্বংশ হয়।"

শিউচরণ বোধহয় দেবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলো না, তাই কিছু ডালপালা আর কুলকাঁটা দিয়ে ভাঙা বেড়া মেরামত করে বাড়ী ফিরলো।

পরদিন সকালে নিশ্চিন্ত মনেই রোদে পিঠ দিয়ে খইনি টিপছিল শিউচরণ এমন সময় খবর পেল রাত্রে আবার বেড়া ভেঙে গরুতে অড়র খেয়ে গেছে। হঠাৎ তার মাথায় খুন চেপে গেল, লাঠি গাছ কাঁধে নিয়ে গরজাতে গরজাতে চল্ল ক্ষেতের দিকে। রোজ রোজ গরু ছেড়ে দিয়ে যে ক্ষেত খাওয়ায় আজ তাকে হাতের কাছে পেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। শিউচরণের বউ যাচ্ছিল বারোয়ারি কুয়োতে জল আনতে, দোর গোড়ায় কলসী নামিয়ে রেখে সেও চল্ল সঙ্গে। যেতে যেতে হাঁক পেড়ে সে গাঁয়ের লোককে হুঁশিয়ার করে দিল—যে গরীবের সর্বনাশ করে ভগবান তার সর্বনাশ করবেন।

ক্ষেতে গিয়ে শিউচরণ গরু বা গরুর মালিক কারুরই দেখা পেল না। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হলে বাড়ী থেকে কাঠখুঁটি এনে বেড়ার ভাঙা জায়গাগুলো ভাল করে মেরামত করে দিল। তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না, বেড়ার আর একটা দুর্বল স্থান ভেঙে গরু আবার ক্ষেতে ঢুকে পড়তে পারে। অড়হর পাকবার আর বেশী দেরী নাই, এই ক'টা দিন যেমন করেই হোক তা বাঁচাতে হবে।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে শিউচরণ বল্ল "ঘরে বসে থাকলে এক গোটা অড়রও বাঁচবে না, সব খেয়ে পয়মাল করে দেবে। ভাবছি রাত্রে এসে ক্ষেত পাহারা দেব।"

"যা বলছো, একবার যে গরু জিবেয় রস পেয়েছে সে রোজ রাতে আসবে" ভেবে চিন্তে জবাব দিল শিউচরণের বউ। "তা তুমি কেন ক্ষেত পাহারা দিতে আসবে?

"তবে কে আসবে?" প্রশ্ন করলো শিউচরণ।

"কেন, বুড়ো আসবে।"

"বাবা কি পারবে গো" বল্ল শিউচরণ।

"পারবে না তো কি" ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো শিউচরণের স্ত্রী।" বসে বসে খাচ্ছে, সংসারের এই উপকারটুকু করতে পারবে না!"

"মাঘের শীত, আর এই খোলা-ময়দান" একটু ইতস্তত করে বলল শিউচরণ।

ওমা, শীত আবার কোথায়! বুড়ো হাড়ে শীত লাগে না। তা যদি এতই শীতের ভয় তাহলে এক মালসা আগুন করে সঙ্গে দিও, ঘরের চেয়ে মাঠে আরামে থাকবে" বললো শিউচরণের স্ত্রী।

এর পরে আর আপত্তি করবার কিছু থাকলো না। নিশ্চন্ত মনে বাড়ী ফিরলো শিউচরণ।

বুড়ো বৈজু ছাগল চরিয়ে যখন বাড়ী ফিরলো দুপুর তখন পার হয়ে গেছে। আঙিনা শূন্য, ঘরের ভিতরে নাতি নাতনীর কলরব শুনতে পেয়ে বৈজু ডাকলো "মতি, ওরে মতি।" ক্ষীণ কণ্ঠের সে ডাক কারো কানে পৌঁছোলো কিনা বোঝা গেল না, ভিতর থেকে কোন সাড়া এলো না। ভোরবেলা তার ভাগ্যে জলপান জোটে নি, খালি পেটেই ছাগল তিনটে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল, দুপুরেও যে তার বরাতে কিছু নাই সেটা সে বুঝে নিল। হিসেবী পুত্রবধূ যেদিন ব্যয়সঙ্কোচ করতে চায় সেদিন দুপুরে তাকে এড়িয়ে চলে, বেলা পড়ে এলে ভাতের থালা সামনে এগিয়ে দিয়ে একবেলায় বথরায় দুবেলা চালিয়ে নেয়। আজও ইঙ্গিত এত স্পষ্ট যে বৈজু আর অপেক্ষা করলো না, ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো, গাঁয়ের পথ ধরে ঠাকুরবাড়ীর দিকে চললো। পুজারীর দয়া হলে দেবীর প্রসাদ দুচারটে ভিজে ছোলা অন্তত পেতে পারে।

অনেক দিনের পুরোণো ঠাকুরবাড়ী, জীর্ণ মন্দিরের গায় বটগাছ উঠেছে। নির্জন আঙিনায় এসে বসলো বৈজু। শৈশবে এইখানে সে খেলা করেছে, কৈশোরে রাত জেগে ভজন শুনেছে, যৌবনে পরবে পরবে বৌ ছেলের মঙ্গলের জন্যে পুজো দিতে এসেছে। ঠাকুরবাড়ী এসে বসলে অতীতের কত কথাই না বৈজুর মনে পড়ে। একবার ছেলেবেলায় শিউ-চরণের খুব অসুখ করেছিল, ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিয়ে বলেছিল বাঁচবে না। গাঁয়ের লোক বললো মা দুর্গার কাছে ঘটা করে পুজা দিবি আর জোড়া পাঁঠা দিবি মানত কর তাহলে ছেলে ভাল হয়ে উঠবে। তাই করলো বৈজু। রোজ সকালে এসে পড়ে থাকতো মন্দিরের দরজায়, দেবীর চরণে কাতর প্রার্থনা জানাতো। সত্যি সত্যি সে যাত্রা ভাল হয়ে উঠলো শিউচরণ। কৃতজ্ঞ বৈজু নিজের ঘর থেকে দণ্ডি কাটতে কাটতে মন্দির পরিক্রমা করে এসেছিল, ঘটা করে পুজো আর জোড়া পাঁঠা দিয়েছিল। ধার কর্জ করেই করতে হয়েছিল এসব, ভাল ধানক্ষেতখানা বন্ধক রাখতে হয়েছিল। অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম করে টাকা শোধ করে ক্ষেত ছাড়িয়ে নিয়েছিল বৈজু।

ভাবতে বসলে বৈজুর মনে হয় সে সব যেন কালকের কথা। তখন গায়ে জোর ছিল, মনে উৎসাহ ছিল, খাটতে কসুর করতো না। সংসারের বোঝা সে আনন্দেই বয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছোট থাকতেই শিউচরণের মা গেল মরে, মায়ের স্নেহ দিয়ে সে ছেলেকে বড় করে তুলেছে। আজকের বৈজুকে দেখলে অতীতের বৈজুকে চেনা যাবে না। বয়স তাকে ভেঙে চুরে, জীর্ণ করে সংসারের আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে, আজ সে জঞ্জাল।

মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজে স্বপ্ন ভেঙে গেল বৈজুর। চেয়ে দেখলো পুজারী বেরিয়ে আসছে মন্দির থেকে। পুজারী আজ বড় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি চলে গেল, চেয়েও দেখলো না বৈজুকে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

উঠে দাঁড়ালো বৈজু, মন্দিরের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে আবার পথ ধরে চললো।

পা দুটো যেন তার অবশ হয়ে আসছে, তবু ধীরে ধীরে সে চললো বারোয়ারি কুয়োতলার দিকে। পেটে কিছু না দিলে তো চলছে না, এক পেট জল খেয়েই বাড়ী যাবে ভাবলো সে। কুয়োতলায় একটা লোকও নাই। দড়ি বালতি থাকে না কুয়োতলায়, যে যার সঙ্গে করে নিয়ে আসে আবার সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বৈজু বসে থাকলো কুয়োর ধারে, আসবেই কেউ না কেউ জল নিতে। একবার বড় খরা হয়েছিল দেশে, গাঁয়ের সব কুয়ো শুকিয়ে গিয়েছিল। নদীতেও জল ছিল না। এক হাত বালু খুঁড়লে জল বেরোতো, তাই নিতো গাঁয়ের লোক। ঠিক হোলো বড় করে একটা কুয়ো কাটতে হবে, সবাই লেগে পড়লো কাজে। বৈজু তখন জোয়ান, গায় অসুরের শক্তি, ছেনি আর হাতুড়ি দিয়ে পাথর কাটবার ভার পড়লো তার উপর। একমাস ধরে রাতদিন পাথর কেটেছিল সে। বারোয়ারি কুয়োর জল কোনদিন শুকোয় না, গাঁয়ের লোকের কষ্ট গেছে।

বেশীক্ষণ বসতে হোলনা বৈজুর। বেলা পড়ে এসেছিল, বৌঝিরা কুয়োয় আসতে আরম্ভ করলো। জল খেয়ে সে বাড়ীর দিকে চললো। পথের পাশে হরি মহতোর তরকারির বাগান। ছোট্ট বাগানখানিতে সব রকম তরকারি সে ফলায়, আলু, মুলো, বেগুন, লঙ্ক, কড়াইশুটি। বৈজু সেখানে এসে দাঁড়ালো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বেড়ার ও পাশেই কড়াইশুটির লতা, সবুজ পুষ্ট শিমগুলো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কয়েকটা শিম ছিঁড়ে কোচড়ে রাখলো বৈজু। বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠলো তার, দেখে ফেলেনি তো কেউ? চারিদিকে একবার তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চললো।

বিকেল বেলা আঙিনার কোনে পড়ন্ত রোদে বসে ছিল বৈজু এমন সময় শিউচরণ এসে বললো "গরুতে অড়র খেয়ে যাচ্ছে, কয়েকদিন পাহারা না দিলে ফসল বাঁচবে না।" রাত্রে গিয়ে ক্ষেতের ধারে শুয়ে থাকতে হবে তোমাকে। কোন জবাব দিল না বৈজু, অসহায়ভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। শিউচরণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে নরমভাবে বললো "চারপাইখানা আর এক মালসা আগুন পৌঁছে দিয়ে আসবে মতি, তোমার কোন কষ্ট হবে না।"

নির্ব্বাক বৈজু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

সন্ধ্যার মুখে কাঁধে ছেঁড়া কাঁথা আর হাতে লাঠি নিয়ে বৈজু ধীরে ধীরে ক্ষেতের দিকে চললো। চারপাই আর একমালসা আগুন নিয়ে মতি চললো সাথে। নদী পার হয়ে যখন তারা ক্ষেতের ধারে পৌছোলো তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চারপাই আর আগুনের মালসা বেড়ার ধারে রেখে মতি বললো" আমি চললাম দাদা, তুমি খবরদার থেকো কিন্তু ঘুমিয়ে পোড়ো না। মা বলেছে গরুতে যদি অড়র খেয়ে যায় তাহলে…।" তাহলে যে কি তা না বলেই চলে গেল মতি। বলবার দরকার ছিল না কারণ বৈজু জানে তাহলে একবেলা নয়, কয়েকবেলা তার কপালে আহার জুটবে না।

আগুনের মালসাটা চারপাইএর নীচে রেখে কাঁথাখানা গায় দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বৈজু। হঠাৎ যখন তার ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, মালসার আগুন কখন নিভে ছাই হয়ে গেছে। শীতে সে কাঁপতে লাগলো। আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছিল, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় কাছের জিনিষ দেখা যাচ্ছিল। কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে লাঠি হাতে নিয়ে উঠে পড়লো বৈজু, ভাবলো ক্ষেতের চারদিকে ঘুরে একবার দেখে আসবে। একধারে একটা মহুয়া গাছ, ক্ষেতের অনেকখানি জুড়ে ছায়া পড়েছে সেখানে। তার কাছাকাছি আসতেই বৈজু দেখলো গাছের নীচে আবছায়া অন্ধকারে কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে। 'হেই' বলে চেঁচিয়ে উঠলো বৈজু। জানোয়ারটা নড়লো না। দুচারটে পাথর ছুঁড়ে মারলে ধীরে ধীরে সে সরে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো বৈজু, সময়মত উঠে না এলে আজও অড়র খেয়ে যেতো গরুটা। হারামজাদা বজ্জাত গরু, পিঠে এক ঘা লাঠি বসাতে পারলে খুশী হোতো সে। আজকের মত গালাগালি দিয়ে মনের ঝাল মেটালো বৈজু।

সমস্ত ক্ষেতটা বার দুই ঘুরে এসে সে বসলো। বয়সের কালে রক্ত যখন গরম ছিল, এমন শীতেও তখন খোলামাঠে সে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এখন রক্ত গেছে ঠাণ্ডা হয়ে, একটু শীতেই কাবু হয়ে পড়ে। সারারাত চোখের পাতা আর এক হোলো না তার, ওঠবস করে রাত কেটে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার সে চললো ক্ষেত পাহারা দিতে। মালসার আগুনটুকু থাকতে একটু ঘুমিয়ে নেবে ভেবে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো বৈজু। শুতে না শুতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন রাত প্রায় দুপুর। অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি উঠে বসল বৈজু। এতক্ষণ কি হয়েছে কে জানে, ক্ষেতের চারিদিকে একবার ঘুরে আসা দরকার। আজ জ্যোৎস্না আরও পরিষ্কার। লাঠিগাছ হাতে নিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে চললো। মহুয়া-তলার আবছায়া অন্ধকারে এসে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লো কুলকাঁটার বেড়া এক জায়গায় ফাঁক হয়ে আছে। বুক কেঁপে উঠলো বৈজুর, বজ্জাত গরুটা তাহলে ঢুকে পড়েছে ক্ষেতে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই সে দেখলো ক্ষেতের মাঝামাঝি একটা গরু অড়র গাছের কচি ডগাগুলো খাচ্ছে। লাঠি তুলে হৈ হৈ করে ক্ষেতে ঢুকে পড়লো বৈজু, তাড়া খেয়ে গরুটা ছুটলো সামনের দিকে। সে দিকটায় বাঁশের শক্ত বেড়া, গরুটা বেড়ার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ক্ষিপ্ত বৈজু এসে পড়েছে কাছে, ঘুরে পালাবার পথ ছিল না গরুটার, হুড়মুড় করে পড়লো গিয়ে বেড়ার উপর। বাঁশের বেড়া ভেঙে সে বেরিয়ে গেল কিন্তু দু পা গিয়েই হুমরি খেয়ে পড়লো মাটিতে। বৈজুর রক্ত মাথায় উঠেছিল, লাঠি তুলে সে ছুটে চললো গরুটার দিকে, অড়র খাবার মজা আজ সে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে। এত কাছে বৈজুকে দেখেও গরুটা উঠলো না, গলা লম্বা করে যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইলো। লাঠি তুলে মারতে যাবে বৈজু, এমন সময় তার নজরে পড়লো দুটো চোখ, দুটো বিস্ফারিত বড় বড় চোখ, আর তাদের অত্যন্ত অসহায়, অত্যন্ত কাতর দৃষ্টি।

থমকে দাঁড়ালো বৈজু। স্থির বড় বড় চোখদুটো যে তারদিকে চেয়েই আছে! বৈজুর লাঠির মুঠো ঢিলে হয়ে পড়লো। জ্যোৎস্নার আলোয় এখন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বলদটাকে। কি রোগা, পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, একটি একটি করে গোণা যায়। এখানে ওখানে গায়ের লোম উঠে গিয়েছে। লাঠি ফেলে দিয়ে বৈজু এগিয়ে গিয়ে গরুটার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার মনে আর একটুও রাগ নাই। স্থির চোখদুটির ভাষা বোধ হয় বুঝতে পারে সে, সহানুভূতিতে বুকটা ভরে ওঠে তার। ধীরে ধীরে বসে পড়লো বৈজু, গরুটার পাঁজরার উপর তার শীর্ণ হাতখানা রাখলো। নিঃশ্বাসে দুলছিল পাঁজরার হাড়। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে বৈজু বললো "ভয় নাই, ভয় নাই রে।"

খানিক পরে বলদটাকে ঠেলে দিয়ে বৈজু বললো "ওঠ।" ওঠবার চেষ্টাও করলো না বলদটা। কোথাও চোট লেগেছে বুঝতে পারলো বৈজু। উঠে গিয়ে ক্ষেত থেকে অড়রের কয়েকটা ডগা ভেঙে এনে মুখের কাছে রেখে দিয়ে বললো "খা"। বলদটা খেতে লাগলো। বৈজু পরম তৃপ্তির সঙ্গে তা দেখতে লাগলো। খাওয়া শেষ হলে বৈজু আবার তাকে ঠেলে বললো "ওঠ।" এবার কোনমতে উঠে টালসামলে দাঁড়ালো বলদটা। বৈজু তার পিঠে হাত রেখে বললো "চল।" গরুটা চলতে লাগলো। গাঁয়ের দিকে না গিয়ে বনের দিকে সে চললো। বৈজু আগেই বুঝেছিল এটা অন্যগাঁয়ের বলদ, তাদের গাঁয়ের সব গরুকে সে চেনে। বলদটার পিছনে পিছনে সেও এগিয়ে চললো।

আবছায়া অন্ধকারে বনের পথ ধরে তারা দুজনে চললো। মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে আগে চলেছে কঙ্কালসার বুড়ো বলদটা, পিছনে চলেছে তারই মত দুর্বল বুড়ো একটি মানুষ।

বনের শেষে এসে বৈজু দাঁড়ালো। মাঠের ওপারে অনেক দূরে আর একখানা গ্রাম, বলদটা সেইদিকে এগিয়ে চললো।

বৈজু বললো "যা, আর আসিস নে।"

ধূসর মাঠের সঙ্গে বলদটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(১)

কথায় বলে "বাপ্‌কো বেটা, সিপাহিকো ঘোড়া, কুছ্‌ না হো তো থোড়া থোড়া"। অর্থাৎ বাপে আর বেটায় সাদৃশ্য থাকবেই, যতই কম হোক না কেন? কিন্তু কথাটা কি সত্যি? রামপদর ছেলে অভয়পদকে দেখলে কেউ আর সে কথা বলত না।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশ। বেশ কয়েক পুরুষ ধরেই এঁরা শিষ্য পড়িয়ে শাস্ত্রচর্চ্চা করে এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়া কর্ম্ম করে দিন কাটিয়েছেন। জমিজমা কিছু ছিল, তারই উপর বেশী নির্ভর করতে হত সংসার চালানর জন্যে। ওগুলোর বিলি ব্যবস্থা, আদায় প্রভৃতি অধিকাংশ সময় বাড়ীর গিন্নিরাই করতেন, যখন দেখতেন যে এদিকে কর্ত্তাদের খেয়ালই নেই।

রামপদ বড় হয়ে হঠাৎ ধারাটা একটু বদলে দিলেন। এর আগে কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে পড়াশুনো করতে চায়নি, কিন্তু ছাত্রবৃত্তি পাশ করে রামপদ আর পৈত্রিক বাড়ীতে থাকতেও চাইলেন না, পৈত্রিক টোলে পড়তেও রাজী হলেন না। অনেক সাধ্যি সাধনা করে, কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনো করবার অনুমতি আদায় করলেন, গুরুজনদের কাছ থেকে, এবং মায়ের একখানা ছোটখাট গহনা বিক্রী করে, সেইটা দিয়েই পথখরচা এবং কিছুদিনের মত বাসার খরচ নির্ব্বাহ করবেন স্থির করে কলকাতা যাত্রা করলেন।

সেখানের সবই আলাদা। থাকা, খাওয়া, চলা, বলা। পদে পদে যেন হোঁচট খেয়ে চলতে হতে লাগল। বামুনের ছেলে ভাল খাওয়ার ওপর ঝোঁক আছে, বাড়ীতে খাওয়া দাওয়াটা মন্দ হতও না। আর এখানের সেই দুর্গন্ধ মোটা চালের ভাত, জলের মত ডাল, আর পুঁইশাক কুচোচিংড়ির চচ্চড়িশোভিত থালার সামনে বসলেই তার কান্না আসত। থাকার ঘরেরই বা কি শ্রী! এক তলা এঁদো বাড়ী। আলো নেই, বাতাস নেই, নোংরা নর্দ্দমার গন্ধে ভরপুর। মেসের অন্য বাসিন্দাগুলি সবাই নামে বাঙালী যদিও, তবু কতরকম ভাষায় যে কথা বলে। সবাইকার কথা বোঝাও যায় না। চাল চলনই বা কত ঢং এর।

যত কষ্টই হোক, পড়া ছাড়বেন না, ঠিক করেই এসেছিলেন। কপালক্রমে দুচারটি ভাল ছেলের সঙ্গে আলাপও হল। তারাও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক জগতের উপযুক্ত মানুষ হতে চায়। পড়াশুনো ভালই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু কালের কুটীল স্রোত হঠাৎ তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলল হেনরি ভিভিয়েন ডিরোজিওর চেলাদের মধ্যে।

রামপদ যেন বনবাস থেকে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। এই ত তিনি চেয়েছিলেন। এই আদর্শ, এই লক্ষ্য। এদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চললে, তাঁর বাঞ্ছিত স্বর্গ রাজ্যে পৌঁছে যাবেন ঠিক। এদের সঙ্গে চলতেই হবে, যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন।

বন্ধুদের সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে তিনি উৎসাহের আতিশয্যে তাদেরও ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম করলেন।

আগেকার বন্ধু বান্ধবের দল মাঝে মাঝে তাঁকে সাবধান করতে লাগল। "ওহে অতি বাড় বেড়োনো ঝড়ে ভেঙে যাবে। বাবা মা জানতে পারলে বিষম বিপদে পড়বে, হাজার হোক এখনও তাঁদের পয়সায় খাচ্ছ পরছ।"

রামপদ বললেন "কে তাঁদের খবর দিতে যাচ্ছে? আমাদের গ্রামের লোক একটাও নেই এ তল্লাটে। আমীর অত খোঁজ কে বা রাখে?"

"তুমি ভাবছ তাই। কলকাতায় এ নিয়ে কি হৈ হৈ হচ্ছে খবর রাখ তার? কাগজে কাগজে কত লেখালেখি হচ্ছে, তোমাদের গ্রামে কি বাংলা কাগজ একখানাও যায় না নাকি? সব বাপ মাই ভড়কেছে, লোক পাঠিয়ে নিজের নিজের ছেলের খবর নিচ্ছে। তোমাদের বাড়ীর সকলেই এমন সৃষ্টিছাড়া হতে পারে না যে সব শুনেও চোখ বুজে বসে থাকবে?

রামপদ বললেন "না হয় শুনলেন সব। আমি ত কচি খোকা নয় যে কান ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে পিটুনি দেবেন? আর যে বারোটা টাকা পাঠান, তা যদি বন্ধ করেও দেন তা আমি ঐ ক'টা টাকা রোজগার করে নেব।

"যদি ত্যাজ্যপুত্র করে?"

"তাতেও যে কিছু নিদারুণ এসে যাবে তা নয়। তবে মা যতদিন বেঁচে আছেন, সেরকম কিছু ঘট্‌বে বলে মনে হয়না। তিনি হিন্দুনারী বটে, কিন্তু পতির ছায়ার মত অনুগামিনী নন একেবারেই, বাবাও সেটা ভাল করে জানেন।"

বন্ধু বলিলেন "কি বাজে বকছ? গ্রামদেশের হিন্দু ভদ্র মহিলা, তিনি ছেলের জন্যে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন? কোন যুগে আছ তুমি?"

রামপদ বললেন "এই যুগেই আছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে আমার মামার বাড়ী? আমার এক বড় মাসিমা আছেন বাড়ীতে, তার হাতের একটি থাপ্পড় খেলেই তখুনি তোমার বুদ্ধি খুলে যাবে। পতির অনুগমন ত তিনি করেনই না, বরং প্রয়োজন মত চ্যালাকাঠ চালিয়ে তাঁকে সিধে রাখেন।"

বন্ধু বললেন "আচ্ছা তা না হয় হল, কিন্তু তুমি সকল দিক দিয়ে বিধর্ম্মী হয়ে গেলে তোমার মা কষ্ট পাবেন না?"

রামপদ বললেন "সম্ভবতঃ পাবেন, সেই জন্যই ত খবরটা তাঁকে এখন দিতে চাইছিনা।"

"তুমি দিতে না চাইলেও খবর তিনি পেয়েই যাবেন। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের মত এ ধরণের খবরও কখনও চাপা থাকে না। বাতাসের আগে ছোটে এ সব খবর।"

দ্বিতীয় বছরের শেষে বন্ধুর কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ একেবারে মায়ের চিঠি নিয়ে এক জ্ঞাতি কাকা এসে হাজির। এখনই তার সঙ্গে যেতে হবে রামপদকে, তার মা প্রায় শেষ শয্যায়, কবিরাজ জবাব দিয়ে গিয়েছেন।

এরকম খবর শুনেও যারা নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়ে গ্রামের পথ ধরেন না, রামপদ সে জাতের মানুষ নন। তা ছাড়া মা ছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতার স্থানে। তিনি শেষ শয্যায় ছেলেকে ডাকছেন অথচ ছেলে যাবেন না, এ হতে পারে না। পড়া যদি চির-কালের জন্যে ছাড়তে হয় সে ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁকে যেতে হবে। সামান্য জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে রামপদ কাকার সঙ্গে ফিরে চললেন।

গ্রামের বাড়ীতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। নিজেদের বাড়ীর চালটা চোখে পড়তেই তাঁর বুকটা দুরদুর করে কেঁপে উঠল। বাড়ী গিয়ে কি দেখবেন! কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে নাকি? কাকা ত দিব্য নিশ্চিন্ত-ভাবে চলেছেন, বেশী চিন্তাকাতর মনে হচ্ছে না ত? বাড়ীর দিক থেকে দুচারজন মানুষ যেন তার দিকে

এগিয়ে আসছে। ঐ ত খুড়তুতো ভাই শিবপদ বেশ প্রসন্ন মুখেই ত আসছে।

কাছে এসে পড়তেই রামপদ উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্লেন, "মা কেমন আছেন রে ?"

শিবু বলল "ভাল তেমন আর কই ? তবে কাল পরশু যেমন এখন তখন গিয়েছে সে ভাবটা নেই, আজ কথা বলছেন।"

বাড়ীতে ঢুকে সোজা চললেন মায়ের ঘরে। ঘরের মেঝেতে মায়ের বিছানা পাতা, নূতন শীতলপাটি দিয়ে ঢাকা। মা চোখ বুজে শুয়ে আছেন, কাকীমা মাথার কাছে বসে তালপাখা দিয়ে বাতাস করছেন।

রামপদ মাকে প্রণাম করতে যেতেই কাকীমা বাধা দিলেন, "শুয়ে রয়েছেন, এখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে নেই।"

রামপদর মা বিন্ধ্যবাসিনী চোখ খুলে তাকালেন।
বললেন "রাম, এলি বাবা এতক্ষণে ?"

রামপদর তখন চোখে জল আসছিল মায়ের শীর্ণ-মুখের দিকে চেয়ে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললেন "আগে কেন তুমি আমায় খবর দেওনি মা, আমি অনেক আগেই আসতে পারতাম।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "এত বাড়াবাড়ি হবে তা ভাবিনি। কর্ত্তাও খবর দিতে চাইছিলেন না প্রথমে। বলছিলেন শুধু শুধু কেন পড়া কামাই করে আসবে? তুমি কয়েক'দকের মধ্যেই সামলে উঠ্‌বে। কিন্তু অসুখ ত বেড়েই চলল, তখন আর না ডেকে উপায় রইলনা। শেষ কথা ত না বলে যাওয়া যায় না?"

রামপদ বললেন, "কিসের শেষ কথা? সে শুনব আমি পঞ্চাশ বছর পরে। এখনকার কথা কি বলবে বল? কি করব আমি তোমার জন্যে? কবিরাজ মশায় যখন সামাল দিতে পারছেন না, তখন শহর থেকে বড় ডাক্তার আনাই?"

কাকীমা বলে উঠলেন "আমাদের বাড়ী কেউ কখনও ডাক্তারি ওষুদ খেয়েছে? ও সব শহরে চাল শহরেই চলে।"

রামপদ ভ্রুকুটী করলেন। তাঁর মাও অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ছোট জায়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "আজ ত ভাল আছি একটু। এখনই ডাক্তার ডাকার দরকার নেই।

আরো দুচারদিন যাক্, তারপর কর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।"

আর এক কাকী এই সময় ঘরে ঢুকে বললেন, "সারাদিন তেতে পুড়ে এসেছে। রাম এখন উঠে একটু হাতে মুখে জল দিক, একটু কিছু মুখে দিক।"

রামপদকে উঠতে হল, মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেতেও হল। বাবা, কাকা, জ্যাঠাদের সঙ্গে দেখাও হল। রামপদর মনে হতে লাগল, সবাই যেন কি রকম আড়ষ্ট হয়ে আছে, খোলাখুলি কথা বলছেনা। আবার নিজেই ভাবলেন অসুখ বিসুখের বাড়ী, তাই হয়ত মনমরা হয়ে আছে সবাই।

আবার গিয়ে মায়ের পাশে বসলেন। মা বললেন "একটু শুয়ে নিলিনা বাবা? ক্লান্ত লাগছেনা?"

রামপদ বললেন "এত বড় ধাড়ী ছেলে তোমার এইটুকুতেই ক্লান্ত লাগবে? এখন শোবনা। তোমার ঘরেই বসে থাকব, তোমায় বাতাস করব। ইঃ কি গরমটাই পড়েছে।

মেজকাকী বললেন "আহা, তুমি ছাড়া বাড়ীতে ত আর মানুষ নেই, তাই তোমাকে রাতজেগে বাতাস করতে হবে। যা চেহারা হয়েছে যেন তালপাতার সেপাই। শহরে শুনি টাকাপয়সার ছড়াছড়ি তা এমন হাড় জিরজিরে মূর্ত্তি কেন?"

রামপদ বললেন "আমার মত যারা মেসে থাকে তারা ভাল খাবার মত পয়সা খরচ কি করে করবে? পড়াশুনোর জন্যে যা দরকার তা খরচ করে তবে না খাওয়ার কথা ভাবতে পায়? তা আমার কোনো কষ্ট হয় না আজকাল সহ্য হয়ে গেছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "সত্যি বড় শুকিয়ে গেছিস্ বাবা। দুধ টুধ কিছু পাসনা বুঝি?"

মেসের খাদ্যের তালিকা মনে করে রামপদ মনে মনে হাসলেন। দুধ খাবার প্রকৃষ্ট জায়গা বটে। বললেন "দুধ কে দিচ্ছে মা? ও তল্লাটে এক ফোঁটা দুধ কেউ কোনদিন চোখেও দেখেনি। কোনোমতে ডাল ভাত গিলি আর কি?"

ছোট কাকীমা বললেন "ওরই লোভে এতকাল ধরে ওখানে পড়ে আছ? কেন দেশে কি পড়া হয় না? আমাদের ঘরে সবাই কি মূর্খ্য?"

রামপদ বললেন "তা নয় অবশ্য। কিন্তু এক ধরণের পড়াশুনো ত সকলের ভাল লাগে না। এসব কথা ত অনেকবার হয়ে গেছে প্রথম কলকাতা যাবার সময়। আর ভগবান এতবড় একটা বিশাল পৃথিবী গড়েছেন, তার মাত্র একটা গ্রাম দেখেই চিরকাল সন্তুষ্ট হয়ে থাকব?

মেজকাকী বললেন "যত সব আজগুবি কথা। পৃথিবীটা বড় তাতে কি হয়েছে? যার যেখানে জন্ম, সে সেখানে থাকে। সারা পৃথিবী কে সারাক্ষণ ঘুরছে? দরকার পড়লে এধার ওধার যায় অবশ্য। নিজের বাড়ী ঘর নিজের জন্মমাটি, এর উপর মানুষের টান থাকবে না?"

রামপদ বললেম "টান রক্ষা করেও ত কার্য্যগতিকে অন্ত জায়গায় কিছুকাল থাকা যায়? আমি কি চিরকাল কলকাতায় থাকব এমন কথা বলেছি?

মেজকাকী বললেন "তা না হয় না বললে, কিন্তু কবে যে ফিরে আসবে তাও ত বলনা। তোমার বয়সী যারা তারা সব বিয়ে করে ঘর সংসার করার ভাবনা ভাবছে।"

রামপদ বললেন "আগে সংসার করার উপযুক্ত হই, তবে ত সংসার করব?

ছোটকাকী বললেন "কথার ধুকড়ি ছেলে। এই যে চারিদিকে এত সব মানুষ, তোমার মতে কেউই তাহলে উপযুক্ত নয়, সব ত বিয়ে করেছে, ছেলেপিলের বাপ হয়েছে তাতে কই ছিষ্টি ত উলটে যায়নি?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "যাক গে, ও নিয়ে কথা কাটাকাটি করে কি হবে? ইংরিজি পড়তে চায়, পড়ুক না? সব মানুষ কি আর একরকম হয়? আর ওর কিই বা বয়েস? আজকেই বিয়ে করে সংসারি না হলেই যে সে জন্মের মত সন্ন্যাসী হয়ে যাবে তা ত নয়?

রোগিণী উত্তেজিত হচ্ছেন দেখে তাঁর জা দুজন চুপ করে গেলেন, এবং খানিক পরে কাজের অছিলায় উঠে গেলেন। রামপদ এবার পাখাটি নিয়ে বাতাস করতে করতে বললেন, "আমি নিজের মতে পড়তে কলকাতা গিয়েছি দেখে সবাই খুব বিরক্ত দেখছি।"

তার মা বললেন "বেশীর ভাগ মানুষই নিজের ছাঁচটাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। যারা তাদের মত তারাই ভাল, আর যারা অন্যরকম তারাই খারাপ এই তাদের ধারণা!"

রামপদ বললেন "তুমি নিজে কি মনে কর মা? আমি কলকাতা গিয়ে খুব অন্যায় করেছি?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "না বাবা, সব মানুষ একরকম নয় তাদের মতও একরকম নয়। নিজের একটা মত থাকা ভাল। শুধু পরের তালে তাল দিয়ে চলা কি ভাল? ভগবান্ বুদ্ধি বিবেচনা তাহলে আর দিয়েছেন কি করতে? আমি মেয়েমানুষ হয়েও কোনোদিন তা করিনি তুই আমার ছেলে হয়ে কেন তা করবি? নিজে যেমন ভাল বুঝেছিস তাই করছিস, এতে আমি দোষ দেখিনা? অন্যায় কাজ ত কিছু করছিস্ না? তবে আমার কাছে থাকলে আমার ঢের বেশী সুখ শান্তি থাকত সেটা ঠিক। রাত্রিদিন আমারই দুর্ভাবনা, কবিরাজ মশায় বলেন এত বেশী ভেবে ভেবেই আমি অসুখ বাধিয়েছি।"

রামপদর মুখে একটা ছায়া নেমে এল। তনি

বললেন, "মা তুমি যদি বল ত আমি পড়া ছেড়ে চলে আসব। তোমার ইচ্ছার বড় আমার কাছে কিছু নেই।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "এত দিন কষ্ট করলি, সব বৃথা হবে? তাতে কাজ নেই বাবা। চিরদিন হয়ত এই নিয়ে আফশোষ করতে হবে যে কেন পড়ায় বাধা দিলাম। মানুষ হতে ত হবে? শুধু পাড়াগাঁয়ের পুরুৎ হয়ে থাকবে কেন? আরও দু একটা সাধ আছে পরে বলব তোকে। একটু বেশী চিঠি পত্র দিস্, আর ছুটি-ছাটা গুলোতে বাড়ী আসিস্।"

রামপদ বললেন, "তাই আসব। আসতে ইচ্ছে কি আর করেনা? কিন্তু বাবা, কাকাদের ত জানি, এলেই নানা কথা বলে আটকাবার চেষ্টা করবেন। এইটে এড়াবার জন্যেই আসিনা।"

মা বললেন "প্রথমবারেই যখন আটকাতে পারেন নি, তখন এখন আর পারবেন না। আর দেখ বাবা নিজেই নিজের একটু যত্ন করিস। বড় রোগা হয়ে গেছিস, সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে। টাকার জন্যে ভাবিস না, আমি গহনা বেচে তোকে আরো দশ টাকা করে বেশী পাঠাব।"

রামপদ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না মা তা মোটেই করবে না। গহনা তুমি আর বেচতে পাবে না। পুজোর সময় যখন বরণ কর তখন তোমার গায়ে গহনাগুলো এত সুন্দর মানায় যে বেচে দেবার কথা শুনলেই আমার রাগ হয়। আমি চাকরি নিয়ে প্রথম যেই টাকা হাতে পাব, তাই দিয়ে তোমার যে হারটা বেচেছিলাম সেটা গড়িয়ে দেব।"

মা একটু হেসে বললেন "তাই দিস। তোর বউয়ের জন্য গা সাজান গহনা রেখে যেতে হবে ত?"

রামপদ একটু অবাক হয়ে বললেন "বউ আবার এর মধ্যে কোথা থেকে জুটল? কোনোদিন নাও ত আসতে পারে?"

মা বললেন "সে হবে না বাছা, আমার এক ছেলে তুমি। মেয়েগুলো ত বিয়ে হয়ে গেলেই পরের ঘরে চলে যাবে, বৎসরান্তে দেখতেও পাব না। তারপর কি কর্ত্তা আর আমি বসে বসে আকাশের তারা গুনব নাকি? ও কথা রাখ দেখি, পড়া শেষ হলেই আমি তোর বিয়ে দিয়ে দেব, ঘর আলো করা বউ আনব।"

রামপদ বললেন "কি, কনে টনে ঠিক করে বসে আছ নাকি? বিয়ের উপযুক্ত হই তবে ত বিয়ে? দশ বছরের নোলক পরা ছিঁচকাঁদুনে খুকী কিন্তু এনো না মা, তাহলে আমি একেবারে দেশ ছেড়ে পালাব।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "না না, দশ বছরের হবে না, ডাগর দেখেই আনব। তুই শিখিয়ে পড়িয়ে তোর মনের মত করে নিস। তোর নামে কত যে কথা উঠেছে তার আর ঠিক নেই। কর্ত্তারা ত ভেবেই খুন, আমি একলা শুধু তোর দিকে কথা বলি, আমি কি আর আমার ছেলেকে চিনি না? না হয় দুদিন কলকাতায় গেছে, এতদিন ত আমার হাতে মানুষ হয়েছে?"

রামপদ মুখ কাল করে বললেন "আমার নামে কি কথা উঠেছে মা?"

"এই, তুই বিধর্ম্মী হয়ে যাচ্ছিস, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করিস, অখাদ্য কুখাদ্য খাস, হয়ত মেম বিয়ে করবি, দেশে আর আসবি না, বাবা, মা মারা গেলে তাদের শ্রাদ্ধ করবি না, পিণ্ডি দিবি না।"

রামপদ বললেন "মা, মিথ্যে কথা বলা আমার স্বভাব নয়, বিশেষ, তোমার কাছে ত বলবই না। এর মধ্যে সত্যি যেটুকু, তা আমি বলছি। ধর্ম্ম আমার যা ছিল, তাই আছে, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করি, পড়াশুনোর সূত্রে করতে হয়। সকলেই পণ্ডিত, অতি সৎ স্বভাবের মানুষ। তাঁদের সঙ্গে মেশার ফলে আমার উন্নতি বই অবনতি হবে না। অখাদ্য কুখাদ্য পাব কোথায় যে খাব? কোনোরকম খাদ্য জুটলেই বর্ত্তে যাই। মেম কলকাতার কি অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? আমি দু, একটার বেশী দেখিনি, বেশ আমার ঠাকুরমা হবার বয়সী। দেশে ফিরবার ইচ্ছা আমার পুরোমাত্রায় আছে। নিজের বাড়ীতে, নিজের পরিবারের মধ্যেই

আমি বাস করব। সংসারী মানুষ যা কিছু কর্ত্তব্য করে, সবই করব।"

বিন্ধ্যবাসিনী আর কিছু বলবার আগেই তাঁর মেজ জা আবার এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন "সত্যি বাবা রাম, কলকাতার জল হাওয়ায় তোর ক্ষিদে তেষ্টা সব গেছে। আগে ত কান খাড়া করে থাকতিস, কতক্ষণে রান্নাঘরে পিঁড়ে পাতার শব্দ হবে, আর এসে খেতে বসবি। আর এখন এত রাত হল, অন্য ছেলে বুড়ো সব এসে বসে অপেক্ষা করছে তোর জন্যে, তোর আর দেখাই নেই।"

রামপদর মা বললেন "সত্যি কত রাত হয়ে গেছে, যা বাবা ছুটো খেয়ে আয়।"

রামপদ উঠে যেতে যেতে বললেন "আমার বিছানা মায়ের ঘরেই করো কিন্তু।"

"তাই হবে, তুমি যখন অত করে বলছ। তা সারারাত বকবক করে মাকে জাগিয়ে রেখোনা যেন, রোগা মানুষ। ওঁর নিজেরও ত একটু ঘুম দরকার।"

খাওয়াটা এবারে ভাল লাগল রামপদর। সারাদিন পথশ্রমে শরীর খানিকটা বিকল হয়েই ছিল তাই বাড়ীতে ঢুকে প্রথমে যখন খেতে বসলেন, তখন তাঁর মুখে কিছুই ভাল লাগেনি। এখন শরীরটা সুস্থ হয়েছে, রান্নাবান্নাও কাকীমা যত্ন করে করেছেন, কাজেই ভাল করেই খেতে পারলেন।

আহারান্তে মায়ের ঘরে গিয়ে শুলেন। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে, ফুরফুরে হাওয়াও আসছে বেশ। গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, মুখে একটা শান্তির ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। পাখা নিয়ে রামপদ আস্তে আস্তে বাতাস করতে লাগলেন। যতই অস্বীকার করুন, ক্লান্ত তিনি হয়েই ছিলেন বিধিমতে। দেখতে দেখতে খানিকক্ষণের মধ্যে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লেন।

(২)

খুব ভোরবেলা ওঠাই রামপদর অভ্যাস। এতে পড়াশুনা করার অনেক বেশী সময় পাওয়া যায়। সঙ্গীরা তাঁর বেশীর ভাগই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে সাতটা বা আটটা অবধি। অত আগে উঠে হবে বা কি? একমুঠো শুকনো মুড়ি চিবিয়ে একঘটি জল খাওয়া ত? সে যখন হয় খেলেই হবে। কলেজ বা অফিস যাবার জন্যে যেটুকু সময় দরকার, সেইটুকু হাতে রেখেই তারা বিছানা ত্যাগ করে। রামপদর চিরকালই ভোরে ওঠা অভ্যাস এটি তার মায়ের কাছে পাওয়া, শহরে এসেও তার সঙ্গীদের ছোঁয়াচ লাগেনি।

আজও ভোরেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখলেন মাও জেগে উঠেছেন তবে চিকিৎসকের নিষেধ আছে বলেই হোক বা দুর্ব্বলতার জন্যই হোক্, বিছানা ছাড়েননি। রামপদ উঠে বসে বললেন, "মা এখনও তেমনই ভোর রাত্রে ওঠ?"

মা বললেন "ছেলেবেলার থেকে অভ্যাস, সে কি আর যায়? তবে এখন ত উঠে বেড়ান বারণ, তাই জেগে থাকলেও উঠতে ত পারিনা? বড় অসুবিধা হয়। মেজ বউ কি সেজ উঠে আসবে, ধরে তুলবে বাইরে নিয়ে যাবে, তবে ত আমার দিন আরম্ভ হবে? মুখ ধোওয়া, পূজো আহ্নিক করা, সব সারতে সারতে বেলা হয়ে যায়, তাও ঠিক মত হয় না। তোর কাকীরা দায় সারা গোছের করে। তাদেরও দোষ দিইনা, তাদের ঘাড়ে গোটা সংসারের কাজ। আমি পড়ে অবধি তারাই ঠেলছে, কখন আর আমার এত করণা করবে? এই জন্যেই ত একটি বউ চাই একেবারে নিজের করে। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নেব, আমার আর কোনো ভাবনা থাকবেনা।"

রামপদ বললেন "উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা নিতান্তই অন্যায় মনে করি, নইলে আজই তোমার

জন্যে বউ এনে দিতাম। তা বউ যখন নিতান্তই নেই, ছেলেটাকে দিয়েই এখন যতটা পার কাজ করিয়ে নাও।"

মা হেসে বললেন, "ছেলেকে দিয়ে আর কতটা কাজই বা হবে? তার চেয়ে উঠে দেখ্ তোর ছোট কাকীমা দরজা খুলেছে কিনা। সেই ওদের মধ্যে একটু আগে ওঠে। তাহলে তাকে ডেকে দে। নিজে উঠে হাত মুখ ধুয়ে একটু ঘুরে আয় নদীর ধারে। হ্যাঁরে ওখানে ত গঙ্গা রয়েছেন, কখনও বেড়াতে কি চান করতে যাস্ না।"

রামপদ বললেন, "না মা, সময় হয় না। সকালে নিরিবিলিতে পড়াশুনো করি, তা ছাড়া সঙ্গীও পাইনা, একলা একলা বেড়াতে ভাল লাগেনা। বিকেলে ও সব জায়গায় নানাজাতের লোকের ভীড়, সেও ভাল লাগেনা। ঐ যে কাকীমা এসেই গেছেন।"

রামপদ বেরিয়ে গেলেন, তাঁর ছোট কাকীমা ঘরে ঢুকে বিন্ধ্যবাসিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হলেন। বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখাচ্ছে যেন অনেক ভাল, বললেন "দিদি আর কবরেজ দেখিয়ে কি হবে? রামুকে কাছে রাখ, তাতেই সব রোগ সেরে যাবে। আজই মনে হচ্ছে তোমার অর্দ্ধেক রোগ সেরে গেছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "তা ঠিক বলেছ বোন, ওর মুখ দেখে অবধি মনে হচ্ছে আর যেন দেহে কোনো রোগ নেই। আমি যদি বলি ঘরে ফিরে আয়, তাহলে ছেলে আমার এক্ষুনি করে। কিন্তু ওর এতদিনের সাধ যে ইংরিজি পড়ে পাস করবে, তাতে আমি বাধা দেবনা। এত কষ্ট করল, এতদিন ধরে, সব পণ্ড হয়ে যাবে?"

ছোট জা বললেন, "শরীরটা যে মাটি হতে বসেছে দেখছনা? একেবারে খেতে পারে না, শিবুটা যে এত ছোট, সেও ওর দ্বিগুণ খায়। আমি বলি কি, সুন্দর দেখে একটি বউ নিয়ে এস, তাহলেই আর ঘরে ফিরতে পথ পাবেনা।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "আগে টাকা পয়সা রোজগার করুক তবে ত বিয়ে? তার আগে ও বিয়ে করতে চায়না, আমিও জোর করবনা।"

ছোট জা বললেন "দেখ বাপু, তার মধ্যে যেন মেমটেম নিয়ে এসে ঘরে না তোলে।"

রামপদর মা একটু হেসে বললেন "যা, যাঃ, তোদের যে সব কথা। মেম পাবে কোথায় যে বিয়ে করবে? ওকে বললাম ত বলল গোটা দুই তিন মাত্র মেম সে দেখেছে ওখানে, সব ঠাকুরমার বয়সী। আর মেম কোন্ দুঃখেই বা এই চালকলা খেকো বামুনের খোড়ো ঘরে আসতে চাইবে?"

ছোট জা আর কথা বাড়ালেন না। বিন্ধ্যবাসিনীর যা কিছু দরকার সব তাড়াতাড়ি সেরে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। রামপদও প্রায় সেই সময় বেড়িয়ে চেড়িয়ে ফিরে এলেন।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কারো বাড়ী গিয়েছিলি নাকি?"

রামপদ বললেন "না' রোদটা বড় চড়া হয়ে উঠল দেখে কারো বাড়ী আর ঢুকিনি। ও বেলা পারি ত দু চারজনের সঙ্গে দেখা করব।"

একটু থেমে বললেন "আর দেখা করে হবে বা কি? সব আমার নামে কি না কি শুনে বসে আছে, কথা বলে সব ব্যাঁকা ব্যাঁকা, শুনতে ভাল লাগেনা।"

রামপদর মা বললেন, "ঐ ত আমাদের বাঙালী ঘরের দোষ। গুজব ছড়াতে অদ্বিতীয়। বাড়ীর লোকেই ঐ কথা নিয়ে গুজুর গুজুর করছে তা অন্যদের কি বলব? দ্যাখ্ বাবা এক কাজ করলে হয় না? তোকে খুলেই বলি, একটি মেয়ে আমার খুব পছন্দ, যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি স্বভাব, তেমনি সৎ বংশের। যদি বাগ্দান করে রাখা যায়, তাহলে তারা অপেক্ষা করবে তোর পাশ করা পর্য্যন্ত। আর মেম বিয়ে করার গুজবও তাহলে থামবে। তবে আগেই বলে রাখছি, মেয়ে বড় লোকের ঘরের নয়, টাকাপয়সা একরাশ ঘরে আসবেনা তার সঙ্গে।"

রামপদ একটু হেসে বললেন "বাবা এতে রাজী হবেন না?"

মা বললেন "আগে হলে নিশ্চয়ই রাজী হতেন না কিন্তু এখন মেম বৌ আসার ভয় বড় বেশী হয়েছে, এখন রাজী না হয়ে পারবেন না। আর ও মেয়েকে দেখলে পাষাণও গলে যায়, মানুষের কথা ছেড়ে দে।"

রামপদ এবার কৌতূহলী হয়ে বললেন "কার মেয়ে মা, কতবড়? তুমি কবে থেকে এঁচে রেখেছ একে? কই আগে ত এসব কথা শুনিনি?"

"শুনবি কি করে? তখন তোর কতই বা বয়েস, মেয়েও ছোট, তখন তাকে ভাল করে দেখিনি। আমার বাপের বাড়ীর গ্রামের মেয়ে। মানে ঐ গ্রামে তার মামাবাড়ী। ওর মায়ের সঙ্গে ছোটবেলা আমার খুব ভাব ছিল। বিয়ে হবার পর দেখাশুনো আর বিশেষ হয়নি। হঠাৎ গেল বছর বিধবা হয়ে মেয়ে নিয়ে এসে বাপের বাড়ী হাজির। সেই প্রথম আমি অন্নপূর্ণাকে দেখলাম। এমন লক্ষ্মীশ্রী আমি আর কোনো মেয়ের মধ্যে দেখিনি। যেন পটে আঁকা ছবি। গলার স্বরও তেমনি মিষ্টি।"

রামপদর ইচ্ছা করতে লাগল, আরও বিশদভাবে মেয়েটির কথা শোনেন। কিন্তু মাকে কি করে প্রশ্ন করবেন? বাপ মায়ের সামনে বিয়ের কথা তোলাই ত বেহায়ার কাজ, এই ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের ধারণা। রামপদ শহরে গিয়ে অনেক মত বদলেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে ধারণা তাঁর আগের মতই আছে।

মা নিজেই বললেন "তবে মেয়ের মাকে বলি মেয়ে নিয়ে এই গ্রামে চলে আসতে দু তিন দিনের জন্যে। এখানেও তাদের আত্মীয়-স্বজন আছে। তুই নিজের চোখে দ্যাখ একবার মেয়েটিকে, তারপর তোর বাবাকে বলে আমি পাকা কথা দেওয়াব।"

রামপদ বললেন "আমার দেখার দরকার কি মা? তুমি ত দেখেছ, তাহলেই হবে। তুমি যে জিনিষ পছন্দ করবে, তা অপছন্দের কখনও হবে না।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "না বাছা, তোমায় নিজের চোখে দেখে নিতে হবে। চিরদিন তাকে নিয়ে ঘর করবে তুমি, তোমার পুরোপুরি পছন্দ থাকা চাই। আমার মামাতো বোন সন্ধ্যারাণীর যেমন বিয়ে হয়েছিল, ও রকম বিয়ে আমি ভাল মনে করিনা, যদিও আমাদের গ্রামদেশে ঐ রকম বিয়েই হয় শতকরা নিরানব্বুইটা। সন্ধ্যার রং কালো ছিল, মুখশ্রীও সুন্দর কিছু না। তবে মেয়ে কাজে কর্মে ভাল ছিল, স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শাশুড়ীর পছন্দ হয়ে গেল। মেয়ের বাপমায়ের পয়সা কড়ি বেশ ছিল কাজেই ছেলের বাপেরও পছন্দ হতে দেরি হলনা। শুধু ছেলের কথাটাই কেউ ভাবল না। বিয়ের পর কিন্তু ছেলের মুখের অন্ধকার আর কাটলনা। সে বউএর সঙ্গে কথাই বলে না, ঘরে এলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বন্ধু বান্ধব বউ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করলে তাদের তেড়ে মারতে যায়। সবাই ত অবাক্, ছেলের হল কি? শেষে তার সমবয়সীদের কাছ থেকে জানা গেল অমন কুৎসিত বউয়ে তার দরকার নেই, ওকে বাপের বাড়ী ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।

রামপদ বললেন "কি বিশ্রী! মানুষে মানুষকে কত রকম অপমানই যে করতে পারে? তার চেহারাটাই সব হল? যিনি বিয়ে করলেন সেই গুণবান্ নিজে কেমন দেখতে?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "সেও দেখতে ভাল নয়, তবে বেটাছেলে যে? তার খুঁত কে ধরবে?"

রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার সেই বোনের কি হল? সত্যিই কি ফেরৎ পাঠিয়ে দিল নাকি?"

তার মা বললেন, "তাই কি আর হয়? গেরস্ত ঘর ভদ্রলোক বলে একটা নাম ডাক আছে, অমন নিন্দার কাজ করতে পারলনা। নিজেরা দেখেশুনে এনেছে, টাকাকড়ি, গহনাগাটি, জিনিষপত্র মিলিয়ে প্রচুর নিয়েছে। বাপ মারা গেলে আরো পাবে, কারণ মামার ত ছেলে ছিল না, ঐ তিন মেয়েই সব পাবে। ফিরে মেয়ে গেল না, কালে তার উপর রাগও

বোধহয় পড়ে গেল, দেখলাম ত নিয়ে ঘর করছে, ছেলে-পিলেও হয়েছে। কিন্তু সুখ কোনোদিন পেলনা, আদরও কিছু পেলনা। স্বামীর ঘরে দাসীর মত থাকত; তাঁর মন জোগাত, দুটো খেতে পরতে পেত, এই পর্য্যন্ত। একে কি আর বিয়ে বলে?"

রামপদ বললেন "আমাদের মেয়েগুলিকে যেভাবে আকাট মূর্খ করে রাখা হয়, ওদের অদৃষ্ট আর কত ভাল হবে? দেখতে ভাল হলে সুখ, আর দেখতে খারাপ হলে ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা, এই তাদের পাওনা। মানুষ বলে তাদের কোনো দাম নেই। এইসব দেখলে এক একবার মনে হয় খুব কালো কুৎসিত একটি মেয়েকে ঘরে এনে দেখিয়ে দিই যে তেমন মেয়েকেও সমাদরে রাখা যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী হেসে বললেন, "এখন ত আর তা হবার জো নেই বাবা। মনে মনে আমি অন্নপূর্ণাকেই বউ বলে বরণ করে নিয়েছি। তোর একজন ছোট ভাই থাকত, তা হলেও বা হত।"

রামপদ বললেন "তবে আর কি হবে?"

এমন সময় বড় একবাটি দুধ, আর কাঁসার রেকাবীতে খইয়ের মোওয়া আর নারকেল নাড়ু নিয়ে ছোট কাকীমা ঢুকলেন। রামপদর সামনে সব নামিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও বাবা একটু জল খেয়ে নাও। শহরে তোমরা সকালে কি খাও তাও জানিনা, আমাদের ঘরে যা হয় তাই দিলাম।"

রামপদ বললেন "শহরে সকালে কি খাই তা আর জেনেও কাজ নেই, আর আমাকে তা জোগাড় করে দিয়েও কাজ নেই। যে ক'টা দিন আছি পেট ভরে খেয়েত নিই।"

কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিন আছিস্?"

রামপদ বললেন, "যেদিন মা হাসিমুখে যাবার অনুমতি দেবেন, সেইদিন যাব।"

কাকীমা বললেন "আমি মা হলে, হাসিমুখ আর করতামই না। তা হলেই ছেলেকে আটকান যেত। তা দিদি যে আমার জ্ঞানী মানুষ, আমাদের মুখ্যু ত নয়, তিনি অমন কাজ করবেন না।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "হ্যাঁ, জ্ঞানী ত কত। জ... একেবারে উপ্‌ছে পড়ছে মাথা ফুঁড়ে। তা সব বিষ... জোর করা কি ভাল? ও ত আর কচি খোকা নেই? একটা পথ বেছে নিয়ে চলছে, তাকে জো... করে আটকান ঠিক নয়।"

রামপদর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, ছোটকাকী রেকাব... আর বাটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন "খড়মের শব্দ শুন্‌ছি দিদি, কবিরাজমশা... আসছেন বোধ হয়।"

বৃদ্ধ কবিরাজমশাইই আসছিলেন। ভদ্রলোকে... গায়ের রং গৌর, শাদা ধুতি চাদর পরণে, কপা... শাদা চন্দন, হাতে একটি শাদা কাপড়ের ঝুলি... এইটিই তাঁর ওষুধপত্রের ব্যাগের কাজ করে... চেহারাটা দেখলেই লোকের মন প্রসন্ন হয়।

খড়ম খুলে ঘরে ঢুকেই বললেন, "এই যে রামপ... এসে গেছ, মাকে কেমন দেখছ?"

রামপদ কাছে এসে প্রণাম করে বললেন "আমি ত কিছু খারাপ দেখছি না, যতখানি ভয় আমাকে দেখান হয়েছিল ততটা পাওয়ানোর দরকার ছিলনা।"

কবিরাজমশাই বললেন, "খারাপই হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তাই তোমার কাছে খবর পাঠান হল। কিন্তু আজ আমিও অনেকটাই ভাল দেখছি। তুমি আসাতে মন প্রফুল্ল হয়েছে, তার ফলে শরীরেরও উন্নতি হয়েছে।"

বিন্ধ্যবাসিনীর বিছানার কাছে তাঁর জন্যে আসন দেওয়া হয়। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে তিনি রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন "হ্যাঁ আজ অনেকটাই উন্নতি দেখছি, এরপর উঠে বসতে পারেন। তাতেও যদি ভালই থাকেন ত পরে থেকে চলাফেরা করতে পারবেন।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "বাঁচি ত তাহলে। বিছানায় পড়ে পড়ে অন্যের সেবা নিতে নিতে নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেছে।"

কবিরাজমশাই আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, "রোগ পীড়ার সময় সবাইকেই তা করতে হয় মা, ওতে আর ঘেন্নার কি আছে? নিজের আত্মীয়-স্বজনরাই সেবা করছেন, এ ত ভাগ্যেরই কথা।"

রামপদ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন ত আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই?"

কবিরাজমশাই বললেন, "আর দুচারদিন দেখে তবে বলতে পারি। তুমি কি এখনই ফিরে যাবার কথা ভাবছ? এখনই যেয়োনা। আর কয়েকদিন থেকে মাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে তবে যাও। ওঁর হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়ে গেছে, হঠাৎ আঘাতে আবার একটু বিকল হতে পারে। থাকার কোনো অসুবিধা আছে?"

রামপদ বললেন, "তেমন কিছু না। পড়া কামাই হবে খানিকটা, তা সেটার জন্যে আমি প্রস্তুতই হয়ে এসেছি।"

কবিরাজমশাই চলে গেলে রামপদ একটু গ্রামে ঘুরতে গেলেন। বন্ধুবান্ধব অবশ্যই ছিল কতগুলো, তা এখন তাদের মনোভাব কি রকম দাঁড়িয়েছে তাঁর সম্বন্ধে তা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু বড় চড়া রোদ—হেঁটে বাড়ী ঘুরেই তাকে হাঁপিয়ে উঠতে হল। বাড়ীর দিকে ফিরলেন। মায়ের ঘরের কাছে এসে দেখলেন, বাবা সেখানে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে ছোট কাকীমার ঘরে গিয়ে বসলেন। ভাই বোন অনেকগুলি সেখানে বসে গল্প করছে, তাদের দলে ভিড়ে গেলেন। কলকাতার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন তখন বর্ষিত হতে লাগল তাঁর উপরে।

নিজের ছোটবোন কনকলতা বলল, "আচ্ছা দাদা, তুমি ইংরিজিতে কথা বলতে পার?"

রামপদ বললেন, "তা খানিকটা পারতে হয় বইকি? যখন ইংরেজ মাষ্টারদের কাছে পড়ি, তখন ত আর বাংলা বলা চলেনা।"

মেজকাকীমার ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমাদের মত করে খাও?"

রামপদ বললেন, "তা না ত কি গরু ছাগলের মত করে খাব? তোমাদেরই মত হাত দিয়ে ভাত মাখি আর মুখে তুলে খাই।"

প্রশ্নকর্ত্তা হাবু বলল, "আহা, তা যেন আর আমি জানিনা। আমি জানতে চাইছিলাম যে আমাদের মত মাটিতে পিঁড়ি পেতে বসে খাও না চেয়ার টেবিল পেতে বসে ছুরি কাঁটা দিয়ে খাও?"

রামপদ বললেন, "আমাদের খাদ্য যদি দেখতে তা হলে আর কি প্রণালীতে খাই তা জানবার ইচ্ছে হত না। পচা চিংড়ি মাছ আর পুঁইশাকের ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে তোমাকে যদি মোটা কাঁকরওয়ালা চালের ভাত খেতে দিত, তাহলে বোধ হয় তুমি পা দিয়েও খেতে চাইতেনা।"

কনকলতা বলল, "অমন ছাইভস্ম সব খাও কেন? কলকাতা অত বড় শহর, সেখানে ভাল খাবার কিছু পাওয়া যায়না?"

"যায় পাওয়া, যাদের পয়সা আছে তারা খায়ও কিনে। আমাকে অল্পক'টা টাকায় চালাতে হয়, আমি ত আর খাওয়ার জন্যে অত খরচ করতে পারিনা?"

হাবু বলল, "কেন যে অমন ছাই জায়গায় গেলে তাও জানিনা বাবু। আমাদের নিজেদের জমির কত ধান চাল, পুকুরের কত মাছ, বাগানের কত তরকারি ফল, নিজেরা খেয়ে শেষ করতে পারিনা, আর তুমি কিনা কোন্ এক শহরে বসে পচাচিংড়ি খাচ্ছ। কেন যে এমন কাজ করতে গেলে, তা জানিনা বাবু। জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা কেন যে তোমাকে যেতে দিলেন্ তার ঠিক নেই।"

রামপদ বললেন, "আরো খানিকটা বড় হয়ে নে,

তার পর বুঝবি যে শুধু ভাল ভাল খেলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়না।"

কনকলতা বলল, "পচা কুচো চিংড়ি খেলেই বুঝি সার্থক হয়।"

রামপদ বললেন, "খুব ত মুখফোঁড় হয়েছিস্ দেখি। যাই খাও, খাওয়াটাই কি সব? জানোয়ার ত নয় যে শুধু খেয়েই সন্তুষ্ট থাকব? মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন মানুষের মত কাজ করতে হবে, নিজের দেশের জন্যে দেশের মানুষের জন্যে খাটতে হবে।"

কনকলতা বলল, "তুমি কি যে সব বল, ভাল করে বুঝতেই পারিনা।"

রামপদ তাকে বোঝাতে যেতেন হয়ত, এমন সময় ছোট কাকীমা এসে বললেন, "এই, তোর মা ডাকছে ঘরে। ভাসুর ঠাকুরও বসে আছেন। দরকারি কথা কিছু হবে বোধ হয়।"

রামপদ উঠে পড়লেন। বাবাও কি আবার তাকে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে আসতে বলবেন? তা হলেই বিপদ্। তাঁকে কিছু বোঝানও যায় না, আবার বাড়ীর নিয়মমত তাঁর সঙ্গে তর্কও চলেনা। সেটা অত্যন্তই অভদ্রতার পরিচায়ক হবে। বাড়ীতে কথা বলার লোক একমাত্র তাঁর মা। তিনি মাও যেমন, বন্ধুও তেমন। তাঁর কাছে রামপদর কোনো কিছু গোপন নেই। বাড়ীর আর সব কর্তা গিন্নীরা অবশ্য এতে অত্যন্তই অবাক্। সেজ গিন্নী বলেন, "দিদি যেন কি। ছেলের সঙ্গে কথা বলছে এমন করে যে বাইরের লোকে শুনলে ভাববে যে সমবয়সীর সঙ্গে ইয়ার্কি করছে। আমরা কখনও এ সব কথা ছেলেমেয়ের সামনে উচ্চারণ করতে পেরেছি?"

ছোট গিন্নী বললেন, "সাধে কি আর রামু অমন সাহেব হয়ে উঠেছে? কি না বলছে, কি না করছে? গুরুজনদের উপর ছেদ্ধাভক্তি কিছু নেই।"

ক্রমশঃ

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ

সাতকড়িপতি রায়

সমাজতন্ত্র কথাটা ইংরাজী Socialism কথার অনুবাদ। Society শব্দ হইতে Socialism শব্দের উদ্ভব। Societyর বাংলা অনুবাদ 'সমাজ'। 'সমাজ' শব্দ ভারতীয়। তার অর্থও আমাদের নিকট পরিস্ফুট। মানুষ একক বাস করিতে পারে না বলিয়াই সমাজ বন্ধন করে। যখনই একত্র বাস করিবার ব্যবস্থা করে তখনই কতকগুলি নিয়ম কানুনের সৃষ্টি হয়। তার দ্বারাই সেই একত্রিত বাস পরিচালিত হয়। প্রাচীন কালে ভারতের অধিবাসীদের অর্থাৎ আর্য্যদের সমাজ পরিচালনের জন্য এইরূপ বিধিনিষেধযুক্ত যে সকল পুস্তক প্রণীত হইত তাহাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলিত। উহা সমাজের সব স্তরের মানুষই মানিয়া চলিত। রাজাও মানিত, ব্যবসায়ীরাও মানিত, ব্রাহ্মণগণ মানিত, সেবা-পরায়নগণও মানিত। অর্থাৎ তখন ভারতে সমাজের যে ৪টী স্তর ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, সকলেই ঐ স্মৃতির উপদেশ মান্য করিয়া চলিত।

ভারতের সভ্যতা যে ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীর বহুস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা আর এখন আকাশ-কুসুম নয়। যেখানে যেখানে এই সভ্যতা গেছে সেখানে সেখানে তার স্মৃতিগুলিও যে গিয়াছিল ইহা অনুমান করা খুব শক্ত নয়। তবে কালের গর্ভে ভারতে যেমন তার প্রচার লুপ্ত হয়েছে, সেইরূপ ভারতের বাহিরেও হইয়া থাকিবে। কিন্তু মনুষ্যসমাজ, সর্ব্বস্থানেই বর্ত্তমান ছিল এবং আছে। সুতরাং 'সমাজ' শব্দের অর্থ বুঝিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হয় না।

কিন্তু Socialism কথাটার উদ্ভব কিরূপে হইল তাহা আমার জানা নাই। ভারতে ইহার প্রথম আমদানি জহরলাল নেহেরুজীর দ্বারা। কেহ কেহ বলেন মহাত্মা গান্ধীজী ইহা চাহিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি প্রত্যেক মানুষের তার সর্ব্ব বিষয়ে অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করণে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন মানুষের যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্ফুরণ হয় তবে স্টেটের অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকিবে না। Socialism শব্দের অনুবাদ যাহাই হউক সমাজতন্ত্র কিম্বা আর কিছু নেহেরুজী ইহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা মহাত্মাজীর ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

নেহেরুজী বলিয়াছিলেন পৃথিবীর সব দেশেই Socialism প্রবর্ত্তিত হইবে। Socialism জিনিষটা কি তাহা তিনি প্রথম স্পষ্ট ভাষায় বলিতে ইতঃস্তত করিয়াছেন। বলিয়াছেন সমাজতন্ত্র ধাঁচের সমান। ওইভাবে জাতীয় কংগ্রেসকে ও ভারতবাসীকে ধোঁকায় ফেলিয়া রাখিয়া পরে শেষ ভুবনেশ্বরে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, দেশের সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য, ভূস্বত্ব সর্ব্বপ্রকার মালিকানা সমস্ত বিষয়ের মালিকত্ব ক্রমশঃ ক্রমশঃ আইন প্রনয়ন দ্বারা স্টেটে বর্ত্তাইবে। ব্যক্তিগত মালিকানা ক্রমশঃ লোপ পাইবে। স্টেট বলিতে ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসন বিভাগ। সে শাসন বিভাগ পরিচালিত হইবে দেশের কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে রাজনৈতিক দল নির্ব্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা করিতে পারিবে। দেশের কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের বলিয়া কোনও কিছু পরিচালনা করিতে পারিবে না বা নিজের বলিয়া কোনও কিছুর অধিকারী হইবে না। সমাজে সকল ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ সুবিধা সমান-ভাবে যাহাতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে ঐ সার্ব্বোচ্চ শাসন বিভাগ বা যে রাজনৈতিক [illegible]

করিবে। সমাজে কোন উচ্চ নীচ স্তর থাকিবে না। সম্পদে ধনী নির্ধন বলিয়া কোনও প্রভেদ থাকিবে না। ইহাই মোটামুটী নেহেরুজী বর্ণিত সমাজতন্ত্র সমাজের ভাবধারা। ইহার নাম নেহেরুজী দিয়াছিলেন ইংরাজীতে democratic Socialism যার বাংলা তর্জ্জমা হইয়াছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

পৃথিবীতে বৃহৎ ও ছোটখাট লইয়া প্রায় ১৫০টি দেশ হইয়াছে। 'হইয়াছে' বলিলাম এইজন্যে যে বহু দেশ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পরাধীন ছিল, তারা এখন স্বাধীন সত্তা পাইয়াছে, আবার একটি দেশ বলিয়া যাহা এতকাল চলিয়া আসিতেছিল সেরূপ কিছু দেশ খণ্ডিত হইয়া পৃথক পৃথক সত্তা পাইয়া পৃথক পৃথক নাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু নেহেরুজীর পরিকল্পিত democratic Socialism আজ পর্য্যন্ত কোনও দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কখনও হইবে কি?

পৃথিবীর চারি মহাদেশে ইউরোপ, আমেরিকা এসিয়া ও আফ্রিকা যেখানে বর্ত্তমানে প্রায় ১৫০টি দেশ হইয়াছে তাহার কোনও দেশে ইহা পাওয়া যাইবে না। খৃষ্টান অধ্যুসিত দেশগুলিতে বহুদিন রাজতন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল, ইউরোপে প্রথম পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা সুরু হয়, যাহাকে বর্ত্তমানে democratic শাসন বলা হয়। ফরাসী দেশে যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব হয় তখন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বলিয়া রব উঠিয়াছিল। স্বাধীনতা বলিতে রাজতন্ত্রের বিলোপ, সাম্য মানে নেহেরুজী যাকে সকলের সমগ্র সুযোগ সুবিধা বলেন এবং শ্রেণীবিহীন সমাজ বলেন এবং মৈত্রী মানে কেহ কাহাকেও হিংসা করিবে না। ইহার মধ্যে ফরাসী দেশেও ঐ রাজতন্ত্র ধ্বংস হইয়াছে, বাকী দুইটির কিছু হয় নাই। সব দেশেই ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি অধিকার বিদ্যমান আছে। মুসলমান অধ্যুসিত দেশে রাজতন্ত্র আজিও বিদ্যমান। কোথাও কোথাও পার্লিয়ামেণ্টারী ধাঁচে শাসন যন্ত্রের চেষ্টা হইতেছে, বিশেষ সফলতা হয় নাই। বৌদ্ধ অধ্যুসিত দেশগুলিরও প্রায় সেই অবস্থা। ভারত ছাড়া হিন্দু অধ্যুসিত দেশ নেপাল রাজ্য সেখানেও রাজতন্ত্র প্রচলিত।

বিংশ শতাব্দীতে কোনও কোনও দেশে Communism (কমিউনিজম) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে দেশ হইতে ধর্ম্ম বা Religion লুপ্ত হইয়াছে। কমিউনিজম ডিমক্রেটিক সোসালিজম নহে। তবে বহু সাদৃশ্য আছে। যে দেশে কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দলের হাতে দেশের শাসনযন্ত্র গিয়াছে সেখানে আর কোনও রাজনৈতিক দল হয় নাই। কমিউনিষ্ট দল তাহা হইতে দেয় নাই। সেখানে সমাজ সম্বন্ধে রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবধারার দলের মধ্যে কোনও সাধারণ নির্ব্বাচন হয় না কমিউনিষ্ট দলের মধ্যে কে বা কয়জন মিলিয়া দলপতি হইবে তাহারই একটা নির্ব্বাচনের প্রহসন হয়। প্রথম পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের পর রুশ দেশে জারের রাজত্বের অবসানে প্রথম কমিউনিষ্ট তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাহা সেখানে কায়েম হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রুশ দেশের প্রভাবে ইউরোপে আরও কয়েকটি দেশে কমিউনিষ্ট তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এশিয়ার বৃহৎ চীনদেশে তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং চীনও রুশের সাহায্যে কোরিয়ার অর্দ্ধেক এবং ভিয়েতনামের অর্দ্ধেকেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কমিউনিজমের যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি তাহার গোড়ার কথা ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কোনও বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম বা Religion অহিফেন মাত্র, উহার প্রভাব থাকা চলিবে না। সংসারে যাহা কিছু বস্তু বা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য তাহার মধ্যে গৃহপালিত পশুপক্ষীও পড়ে তাহার মালিক দেশ বা দেশের শাসনপ্রণালী। ব্যক্তিগত মালিকানা চলিবে না। প্রত্যেক দেশবাসীকে স্টেটের অধীনে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। যতদিন জীবিকা অর্জ্জনজন্য পরিশ্রমে সক্ষম না হইবে ততদিন স্টেট ভরণ পোষণ করিবে। যিনি এই তত্ত্বের প্রবক্তা জার্মানদেশোদ্ভূত কার্ল মার্কস তিনি একটা সুন্দর সূত্র বলিয়াছিলেন Each shall get from the State according to his needs and each shall work for the State according to his Capacity.

কিন্তু এর কোনওটাই কোন কমিউনিষ্ট দেশে নাই। তার কারণ প্রয়োজন ও ক্ষমতা কতটুকু তা নির্দ্ধারণ করেন যাঁরা কর্ত্তৃত্ব করেন তাঁরা। কারো নিজের প্রয়োজন বা নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও মতামত গ্রাহ্য নহে। অর্থাৎ অধিবাসীদের নিজেদের পৃথক পৃথক সত্তার স্ফুরণ সেসব দেশে নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পৃথক সত্বা বর্ত্তমান, তাহা ধ্বংশ করা যায় না। সে সত্বা পৃথক অধিকার খোঁজে, না পাইলে পরিশ্রম করিতে নারাজ হয়। সুতরাং জবরদস্তি তাহাকে খাটান হয়। যে যাহা চায় তাহা স্টেট দেয় না বা দিতে পারে না।

আমি কমিউনিজম সম্বন্ধে কিছু বলিলাম তাহার কারণ নেহেরুজী যে ডিমক্রেটিক সোসালিজমের কথা বলেছেন তার সঙ্গে কমিউনিজমের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রধান সাদৃশ্য হচ্ছে স্টেট বা কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র সমস্ত বস্তু বা সম্পত্তির অধিকারী। এতে সমস্ত অধিবাসীকে নিজের সত্বাকে ভুলতে হবে। কোনও মানব ইহা ভুলতে পারে না, নিজ সত্বা ভুললে উন্নতির পথে প্রকাণ্ড বাধা হবে। কিন্তু জোর করিয়া তাহার স্ফুরণ লোপ করিতে হয়। কমিউনিষ্ট দেশে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। দ্বিতীয় সাদৃশ্য সমস্ত দেশবাসীকে সমান সুযোগ সুবিধা দান, শ্রেণী বিহীন সমাজ গঠন। কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে ইহা হয় নাই। ক্রুসেফ সাহেব ও তাঁর মোটর ড্রাইভার সমান সুযোগ সুবিধা পায় নাই। রাত্রি ১২টার সময় ক্রুসেফ সাহেবকে বাড়া পৌছিয়া দিয়া তাহাকে দুই মাইল পথ ঠাণ্ডায় হাটিয়া বাড়ী যাইতে হয়। শ্রেণীহীন সমাজও হয় নাই। ক্রুসেফ সাহেব যে শ্রেণীর তার মোটর-ড্রাইভার সে শ্রেণীর নয়। একটি সমাজ চালাইতে হইলে সেখানে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মীর প্রয়োজন। ছাত্র পড়াইতে শিক্ষক চাই, শিক্ষক ও ছাত্র একশ্রেণীর নয়। চাষ করিতে হইলে কলের লাঙ্গল যে চালায় ও যে কাদায় দাঁড়াইয়া ধান রোয় তারা এক শ্রেণীর নয়, হইতে পারে না। শিক্ষার ক্রম অনুসারে যে যতটা উপরে উঠে সে ততটা অন্য অপেক্ষা পৃথক শ্রেণী হইয়া যায়। আমি মনে করি এইরূপ শ্রেণী বিভাগ সমাজে থাকিবেই, থাকিতে বাধ্য। আর সমান সুযোগ সুবিধা? কমিউনিষ্ট দেশে ইহা হয় নাই। আমাদের দেশে কখনও হইবে কি? নেহেরুজী যে ডিমক্রেটিক সোসালিজমের কথা বলিয়াছেন কমিউনিজমের সঙ্গে তাহার পার্থক্য হইতেছে কমিউনিষ্ট দেশে কমিউনিষ্ট ছাড়া কেহ শাসনযন্ত্র চালাইবে না, তাহাদের এ-বিষয়ে এক নায়কত্ব। নেহেরুজী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। নির্ব্বাচনে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে সেই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিবে।

এখন এই ডিমক্রেটিক সোসালিজম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি। আমরা ভারতবাসী হিন্দু। ইহার ঐতিহ্য, ইহার সংস্কৃতি সকলই হিন্দু ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। এই ধর্ম্মের সহিত ভারতের বাহিরে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি যেমন খৃষ্টান ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম তাহার প্রভেদ এত বেশী, যে মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে আমাদের ভাবধারা ঐ দুই ধর্ম্মাবলম্বীর ভাবধারার সঙ্গে মিলান শক্ত। হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ এর উপর স্থাপিত। খৃষ্টান ও মুসলিম ধর্ম্মে জন্মান্তরবাদ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ও ঐ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভুত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতির মতে পূর্ব্বজন্মে যে সকল কর্ম্ম করা যায় তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে এজন্মে ফলভোগ করায়। খৃষ্টান ও মুসলীমধর্ম্ম অনুসারে একই জন্ম, এই জন্মের কর্ম্মের ফল কতক এই জন্মেই ভোগ হয় এবং বাকী মৃত্যুর পর যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন অন্য জগতে থাকিয়া সেখানে ভোগ করিতে হইবে। আমি যদি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস না করি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলিবে না। শুধু তাই নয় বহু যুক্তির মধ্য দিয়া, বহু দৃষ্টান্ত দিয়া হিন্দুশাস্ত্র জন্মান্তরবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছে। সৃষ্টির প্রথম হইতে মৃত্তিকা, পরে উদ্ভিদ, পরে পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্মের ভিতর দিয়া মনুষ্য জন্মে আসিতে হইয়াছে। এই মনুষ্যজন্মেও বহু স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে হইতেছে। যতদিন বিবেক থাকে না অর্থাৎ মনুষ্যজন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের

প্রশ্ন নাই। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তিমাত্র বিবেক যুক্ত হওয়ায় কর্ম্মফলের ভোগ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমার ও আর এক ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম যদি এক না হয় (এক হওয়া অসম্ভব) তবে ভোগ এক রকম হইতে পারে না। যদি ভোগ এক রকম না হয় তবে সমাজের কাছে বা রাষ্ট্রের কাছে আমাদের উভয়ের একই প্রকার সুবিধা সুযোগ হইবে কি প্রকারে? আমরা যাহারা প্রারব্ধ কর্ম্মে এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী তাহাদিগকে যদি বলা হয় রাষ্ট্র সকল অধিবাসীকে সমান সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য যেরূপ সমাজের রূপ হওয়া উচিত তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা হইলে কি আমরা বলিব না যে ইহা উন্মাদের পরিকল্পনা। যখন আমরা নিশ্চিত জানি যে প্রত্যেককে তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে এবং বিভিন্ন কর্ম্মের ফল বিভিন্ন রকমের তখন যদি সমাজের বা রাষ্ট্রের রূপের পরিকল্পনা সেই অনুযায়ী না হয় তবে বুঝিব রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তার ধারা আমাদের দেশের মানবসমাজের পরিপন্থি। আমি যখন যুবক তখন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তএর শিশু কন্যা পীড়িত হইলে তিনি তাঁর পাদরী স্বামী মিষ্টার বেসেন্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমরা খৃষ্টান, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলে যে আমরা একবারই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। এই পৃথিবীতে যেসকল অন্যায় কাজ করি তার ফলভোগ করি। কিন্তু এই শিশু ত কোনও অন্যায় কাজ করে নাই। উহার স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে যদি কিছু অন্যায় করার জন্য উহার ব্যারাম হইল, সে অন্যায় ত আমরা যাহারা উহার স্বাস্থ্যের তত্বাবধান করি তাহারা করিয়াছি কিন্তু তাহার ফল এই শিশু ভোগ করিবে কেন? তাঁহার পাদরী স্বামী কোনও সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। কন্যার সেই ব্যারামে মৃত্যু হয়। শ্রীমতী বেসান্ত নাস্তিক হইয়া যান। তারপর যখন মাদাম ব্ল্যাভাত্স্কীর নিকট হিন্দুধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ ও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের বিষয় জানিয়া তাঁর শিশু কন্যার যন্ত্রণাভোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হন তখন থিয়জফিষ্ট হইয়া ভারতে আসেন। সুতরাং আমার বক্তব্য রাষ্ট্রনায়কগণ যদি প্রত্যেক অধিবাসীকে তার বাঞ্ছিত বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া এমন রাষ্ট্রীয় কাঠাম করিতে উদ্যত হন যাতে রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যক্তি একই প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে তবে আমরা জন্মান্তরবাদ, প্রারব্ধ কর্ম্মফল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তাহা বিশ্বাস করিব কেন এবং গ্রহণ করিব কেন? তাই বলিতেছিলাম সমাজতন্ত্র নামে রাষ্ট্রের যে রূপ দিবার জন্য কংগ্রেসকে শাসন করিয়া নেহেরুজী দেহরক্ষা করিয়াছেন বিধাতার সৃষ্ট জগতে তাহা দ্বারা মানবগোষ্ঠীর কোনও উপকার হইবে না কারণ তাহা কোনও দিন সম্ভব নহে। একটা কাল্পনিক অবস্থার পশ্চাতে ২০ বৎসর ছুটিয়া খণ্ডিত ভারতের 'হাড়ির হাল' হইয়াছে।

তবে কি বুঝিব বিদ্বান মুর্খে প্রভেদ দাতায় কৃপণে প্রভেদ বিলাসী ধনি ব্যক্তির সহিত দরিদ্র ব্যক্তির প্রভেদ এ সবই সমাজে বর্ত্তমান থাকিবে? যখন প্রত্যেক মানুষের প্রারব্ধ কর্ম্ম অন্যের প্রারব্ধ কর্ম্মের সহিত প্রভেদ সুতরাং ফলভোগও প্রভেদ, তখন বিভেদ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করতঃ সমাজের এরূপ রূপ দিবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কগণের কর্ত্তব্য যাহাতে প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক অধিবাসী স্বাধীনভাবে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতে পারে এই স্বাধীনতাই তাহাকে নিজভাবে নিজের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। পার্থিব সমস্ত বস্তু হইতে তাহার অধিকার লুপ্ত করিয়া লইয়া তাহাদের নিজ নিজ উন্নতি করিবার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র তাহাদের সকলকে সমান সুবিধা সুযোগ দিবে বলা এবং সেই সমস্ত বস্তু রাষ্ট্রের অধিকারে আনা এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা করে রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালনার ভার পাইবে সেই দলই ঐ সকল পার্থিব বস্তুর মালিক হইয়া বসিবে, এই যে ডেমক্র্যাটিক

সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা ইহা সমাজে আনিবার চেষ্টা বিধাতার সৃষ্টির প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। বীমা রাষ্ট্রীয়করণ হইয়াছে; ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ হইতেছে, বহুপ্রকার উৎপন্নের প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অধীনে গড়িবার চেষ্টা হইতেছে, রাজন্যবর্গের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের ভাতা কাড়িয়া লইয়া তাহাদের দরিদ্র করিবার চেষ্টা হইতেছে কারখানার কর্ম্মচারীদের ক্ষ্যাপাইয়া মালিকদের নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে; ভাগচাষীদের ক্ষ্যাপাইয়া এবং আইন করিয়া জমির মালিকদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা হইতেছে সমাজতন্ত্রের নামে এইরূপ যাহা করিবার চেষ্টা হইতেছে ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে সমাজের পক্ষে প্রকৃত পন্থা নহে। এই সমস্ত পন্থার মধ্যে বিদ্বেষ বর্ত্তমান। এই সকল কার্য্য করিবার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে বা হইবে যাহা নেহেরুজী দেশবাসীর মাথায় ঢুকাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহার মূলে বিদ্বেষ বর্ত্তমান আছে বা থাকিবে। তাহাতে সমাজের বা মানবের কল্যাণ হইবে না, হইতে পারে না। কারণ এইভাবের বা আদর্শের মূলে অসত্য বিদ্যমান। সে অসত্য হইল "সমাজে সকল মানুষকে সমান সুযোগ সুবিধা দান"।

সমাজতন্ত্রের এই যে ভাবধারা ইহা কমিউনিজমের যে ভাবধারা রুশ চীন প্রভৃতি দেশে প্রচলিত তাহা হইতে পৃথক নহে। তবে সেসব দেশে যখন কমিউনিজম আরম্ভ হয় তখন নিধন যজ্ঞ দ্বারা যাঁহারা ধনী বড়লোক ছিল, বড় বড় কারখানার মালিক ছিল, বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল, বড় বড় জমিদার ছিল সকলকে শেষ করা হইয়াছিল, কিন্তু নেহেরুজী দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান অবধি অহিংসার পূজারী। হিংসাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাঁর ধারণা ছিল বরাবর আইনসভার মধ্য দিয়া আইন করিয়া সমস্ত বিষয় রাষ্ট্রায়ত্ত করিবেন। সেই ধারাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর কমিউনিষ্ট দেশে অন্য ভাবধারা বিশিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দল নাই। সেখানে কমিউনিষ্টরাই একনায়কত্ব করে। নেহেরুর democratic socialism ও অন্য ভাবধারার অধিকারী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিও সম্বন্ধে কোন বাধা নাই।

কংগ্রেসের এই সমাজতন্ত্রের পূজারী আরও কয়েকটি দল আছে যথা ফরওয়ার্ডব্লক, প্রজাসমাজতন্ত্রী দল, সম্যুক্তসমাজতন্ত্রী দল। এই দলগুলি কংগ্রেসের থেকে বহিরাগত নেতৃবৃন্দের দ্বারাই পরিচালিত তাই তারা কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ। এই দলগুলিও চায় democratic socialism। ভারতে যে কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি আছে বা কমিউনিষ্ট নাম না লইয়া কমিউনিষ্ট ভাবে পূর্ণ অন্য নামে যে দলগুলি আছে তারা democracy তে বিশ্বাস করে না। অহিংসায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু তারা নির্ব্বাচনে যোগ দেয়, গদি দখল করে নিজ নিজ দলের পাওয়া ভারী করে তুলবার জন্য। ভারতে আরও ২।৩টী দল আছে যারা সমাজতন্ত্রে আদৌ বিশ্বাস করে না। তাহাদিগকে নেহেরুজী Communist আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণও সেই আখ্যা দিয়া থাকেন। তাহাদের অপরাধ তাহারা হিন্দুশাস্ত্রের জন্মান্তরবাদ প্রারব্ধ কর্ম্মবাদ বিশ্বাস করে; সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদএ আস্থা নাই। এ দলগুলিও কংগ্রেসত্যাগী নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত। নেহেরুজীর সমাজতন্ত্রবাদ কংগ্রেসের মধ্যে পরিস্ফুট হইলে ইহারা সরিয়া দাঁড়াণ।

অধুনা যে সকল রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠছে তাদের ভাবধারা কংগ্রেসের সঙ্গে পৃথক নয়। তাঁরা কংগ্রেস থেকে বোধহয় এসে দল করেছেন, আশা কংগ্রেস শীঘ্র ভেঙ্গে যাবে তাঁরা তার স্থল অধিকার করবেন। নেহেরুজী ১৭ বৎসর ভারতে একচ্ছত্রী রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁরই নেতৃত্বাধীনে ভারত খণ্ডিত হইয়াছে, ভারতের বর্ত্তমান কেন্দ্রীভূত শাসন প্রণালী প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি চেষ্টা করিয়া কেন্দ্রের অধীন বহু রাষ্ট্রীয় কারখানা প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় বিদেশ হইতে বহু টাকা ঋণ করিয়াছেন। ভারতের অর্থনীতি

ঋণের ভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ভারতের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে ঋণের বোঝা ভারতের মুদ্রার অনুপাতে বহু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারত ঋণজালে এরূপ জড়াইয়া গিয়াছে যে উদ্ধার পাওয়া খুবই শক্ত। তিনিই আইন করিয়া বীমা কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন, এবার তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সবই হইতেছে ও হইয়াছে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে অনুসরণ করিয়া।

সাধারণ কংগ্রেস কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাহারা সমাজতন্ত্রের কিছুই বোঝে না। তবে তাহারা সমাজে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ যে খুবই বেশী সেটা বোঝে। যাঁহারা কলকারখানা করিয়া ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিতেছে তাহাদের সহিত যাঁহারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহে অপারগ তাহাদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা বোঝে। তাহারা মনে করে এ পার্থক্য কি সঙ্গত? যদি সঙ্গত না হয় ইহা নিরাকরণের উপায় কি? এরূপ চিন্তা স্বতই মানুষের মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বলপূর্ব্বক ধনীকে হত্যা করিয়া বা আইন করিয়া ধনীর ধন কাড়িয়া লইয়া যে এই প্রভেদ দূর করা যায় না তাহা ধ্রুব সত্য। সমাজতন্ত্র নামক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা যে ইহা দূর করা যায় না তাহাই প্রতিপন্ন করাই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে সকল দেশ এই সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রভেদ দূর করিতে পারে নাই। সেখানে কলকারখানার মালিক, বড় ব্যবসায়ের মালিক ইত্যাদি নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিরাট প্রভেদ। আমি দেখাইয়াছি ক্রুসেফ সাহেব ও তাঁর মোটর ড্রাইভারের মধ্যে প্রভেদ। এ প্রভেদ থাকিবেই। যেখানে সমাজতন্ত্র নাই সেখানে যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারা ব্যক্তিগত উপায়ে সামর্থ্যানুসারে কেহ বড় কেহ ছোট হইতেছেন। যেখানে সে উপায় নাই, যেখানেই রাষ্ট্রের অধীন কাজ করে সেখানে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও শিক্ষার প্রভাবে কেহ উচ্চপদস্থ হইতেছে কেহ নিম্নে পড়িয়া থাকিতেছে; কেহ ক্রুসেফ, মলিটফ ব্রিজনেফ, মাও সে তুং, চু এন লাই প্রভৃতি হইতেছে কেহ সাধারণ মোটর ড্রাইভার হইতেছে। যে নেহেরুজী এই সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা তাঁর জীবনযাত্রার ক্রম ও তাঁর আরদালির জীবনযাত্রার ক্রম এক ছিল না।

মহাত্মা গান্ধী দেশের নগ্নাবস্থা দেখিয়া কৌপীন ধারণ করিয়াছিলেন। এ চিন্তার ধারা দ্বারা দেশের মহা উপকার হইতে পারে কিন্তু নেহেরুজী পরিকল্পিত সমাজতন্ত্রের দ্বারা জোর করিয়া দেশের কোনও উপকার হইবে না। উহা বিধাতার সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত বলিয়া উহা কখনও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিতে পারিবে না। সমাজে যে সকল বৈপরীত্য স্থায়ী হইয়াছে তাহা দূর করা যাইবে না। কিসে যাইবে তাহা আমার নিজের চিন্তার ফল পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বেদের দেবতা—সবিতা

মুক্তাকণা সেনচৌধুরী

বৈদিক দেব সমাজে সবিতা দেবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের এবং সাম বেদের প্রথম সূক্তের দেবতা অগ্নি। যজুর্বেদের প্রথম সূক্তের দেবতা সবিতা। অথর্ব্ব বেদের প্রথম সূক্তের দেবতা বাচস্পতি। শুক্ল যজুর্বেদের ৩০।১ মন্ত্রে সবিতাকেই বাচস্পতি বলা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে সবিতা সম্বন্ধে একাদশটি পূর্ণ সূক্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতক মন্ত্র আছে। অপর তিন বেদেও তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কতক সূক্ত ও বহু মন্ত্র আছে।

বেদ মন্ত্র সমূহে তাঁহার আকৃতির যে বর্ণনা আছে তাহা চমৎকার। ইনি 'হিরণ্যাক্ষঃ', 'হিরণ্য জিহ্বঃ' এবং 'হিরণ্য পাণিঃ'। অর্থাৎ তাঁহার নেত্র, জিহ্বা এবং হস্ত হিরণ্ময়। 'হিরণ্যপানি' বিশেষণটি বিভিন্ন বেদমন্ত্রে সবিতা দেবের সম্পর্কে অন্ততঃ ২০ বার প্রযুক্ত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে হিরণ্য শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে জ্যোতিঃ। "জ্যোতির্হি হিরণ্যং" (৪।৩ ১।২১)। সুতরাং 'হিরণ্যপাণি' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'জ্যোতিঃ পাণিবৎ যাঁহার'। অন্যত্র 'সুবর্ণাদির দাতা' অর্থও করা হইয়াছে।

ইনি 'হিরণ্যেন রথেন' (হিরণ্যময় রথে আরোহণ করিয়া) বিচরণ করেন। রথের অশ্বগুলিও কনকাবদাত (হিরণ্য প্রজগম্)। রথটি সর্ব্বপ্রকার মণি-মাণিক্য-বিভূষিত (বিশ্ব-রূপং রুশনৈঃ)। অশ্বগুলির পায়ের নিম্নাংশ শ্বেতবর্ণ (সিতি পাদঃ)।

এই সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া ইনি অন্তরীক্ষের নিম্নোন্নত (প্রবতা উদ্বতা) পথে অষ্টদিক উদ্ভাসিত করিয়া (অষ্টৌ বি অখ্যৎ) বহুদূর হইতে আগমন করেন। ইনি বিচিত্র প্রভামণ্ডল সম্বৃত (চিত্রভানুঃ)। গগনের অতি উচ্চ প্রশস্ত পথ অতিবাহন কালে তাঁহাকে উড্ডীয়মান 'সুপর্ণ'বৎ মনে হয়।

ইনি প্রাণিজাতকে উৎকৃষ্ট 'অপাংসুল' মার্গে চালনা করেন। তিমিরাবৃত ব্রহ্মাণ্ডগুহার সচল (জঙ্গম প্রাণি-বর্গকে জ্যোতির্ময় প্রেরণাদানকারী। এই সবিতা দেব ব্রাহ্মণ, কুকুর (শ্বান্) চণ্ডাল (শ্বপাক) তথা সামান্য তৃণ-কীটাদির প্রতিও মৃদু এবং দয়াবান্ (সুমৃলোকঃ)। দুর্ব্বল ও পীড়িতদের তিনি উত্তম রক্ষক (সু আবান্)।

সবিতা দেব আপনার স্বর্ণাভ কিরণ নিকরে দেব-মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীকে স্বকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট করেন (নিবেশয়ন্)। যজমানদিগকে (দাশুষে) অভিলষিত রত্নাদি প্রদান করেন (বার্য্যানি রত্নাদধৎ)। পিঙ্গল কেশ কলাপ যুক্ত সবিতাদেব প্রাচ্যাকাশে কিরণজালের সহিত উদিত হন। অন্তরীক্ষে তাঁহার গমন পথ প্রাচীন কিন্তু সুগম (সুগেভী), ধূলিরহিত (অরেণবঃ) এবং সুনির্ম্মিত (সুকৃতাঃ)।

তিনি দুঃস্বপ্ন নিবারণ করেন। মনুষ্যদিগকে নিষ্পাপ করেন। রাক্ষস এবং যাতুধান্ (নিশাচর) দিগকে দূরীভূত করেন। (অপসেধন্ রক্ষসঃ যাতুধানান্)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ (কবিক্রতুঃ) শোভনকর্ম্মা (সক্রতু) সত্য প্রেরক (সত্য সবং) রত্নদাতা (রত্নধাঃ)। তাঁহার জ্যোতিতে ভূলোক ও দ্যুলোক অতীব প্রদীপ্ত হয় (ভূঃ দ্যোঃ অদিদ্যুতৎ)। সামবেদের ২য় পর্ব্বে, ৪র্থ প্রপাঠকে অষ্টম মন্ত্র, যজুর্ব্বেদের ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫ মন্ত্র এবং অথর্ব্ব বেদের ৭ম কাণ্ডে ১৪ অনুবাকের ১।২ মন্ত্র অবিকল একই মন্ত্র। তাহা হইতেই এই বিশেষণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের প্রথম কাণ্ডের চতুর্থ অনুবাকের ১৮ সূক্তে দ্বিতীয় মন্ত্রে তাঁহাকে বরুণের তুল্য শান্তস্বভাব, বায়ুর তুল্য হিতকারী

এবং অর্য্যমার তুল্য স্থায়বান বলা হইয়াছে। (দয়ানন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত সবিতা দেবের সম্পর্কে একটি মন্ত্র যজুর্ব্বেদের ত্রিংশ অধ্যায়ে ও ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলে দেওয়া হইয়াছে। যথা—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আ সুব॥

হে সবিতা দেব! আমাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত কর। যাহা ভদ্র (কল্যাণকর) তাহা আমাদের প্রতি প্রেরণ কর।

সামবেদের ২য় পর্ব্বে, ২য় অধ্যায়ে, ২য় প্রপাঠকে এবং ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৮২ সূক্তে একই মন্ত্রে সবিতা দেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—

অদ্য নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগম্।
পরা দুঃষপ্ন্যং সুব॥

হে সবিতা দেব! তুমি অদ্য আমাদিগকে প্রজাযুক্ত সৌভাগ্য (সন্তান লাভের সৌভাগ্য) প্রেরণ কর এবং দুঃস্বপ্নকে দূরীভূত কর।

যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"ইষেত্বা উর্জ্জে দেবঃ বঃ সবিতা প্র অর্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে"। অন্নপ্রাপ্তি ও বললাভের জন্য সবিতা দেব তোমাদিগকে যজ্ঞাদি শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মে সংযুক্ত রাখুন। "মা বঃ স্তেনঃ ঈশত"—তোমাদের মধ্যে তস্কর উৎপন্ন না হউক।

ঋগ্বেদের ১।২২।৭ এবং যজুর্ব্বেদের ৩০।৪ মন্ত্রে "বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ" (যথাযোগ্যভাবে বিচিত্র ধনরত্নাদির বণ্টনকারী) বলিয়া সবিতা দেবকে আবাহন করা হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের ৩০।১ মন্ত্রে সবিতাকে 'কেতপূঃ' ও 'বাচস্পতি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 'কেতপূঃ' শব্দের অর্থ উবটাচার্য্য করিয়াছেন "অন্নস্য পবিতা" অর্থাৎ অন্নের শোধক। মহীধরাচার্য্য এবং সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন 'অপরের জ্ঞানকে বিশুদ্ধকারী'।

ঋগ্বেদের ৩।৬২।১০ এবং যজুর্ব্বেদের ৩।৩৪ একই মন্ত্র।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

এইটিই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র। ভাষ্যকারগণ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নয়।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

কিন্তু বেলা সাতটার কাছাকাছি দিবাকর যখন এল, তখন এ সমস্ত ভাবনাও মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছে সে। সে তখন একজন পরিপূর্ণ আত্মসমাহিত মানুষ, তার মুখভাবে গভীর প্রশান্তি।

একটা মোড়া এনে বারান্দায় রেখে বলল, "বস।"

দিবাকরকে দে'খে মনে হল সে খুবই ক্লান্ত। তার চোখ-মুখের ভাবে, অবিন্যস্ত চুলে অনিদ্রার লক্ষণ স্পষ্ট। বসে পড়ে বলল, "তুমি বসবে না?"

"এই যে বসছি", বলে আর একটা মোড়ায় বসল নির্ম্মলা।

দিবাকর বলল, "হয়ত তোমার ঠিকে ঝিটির আসবার সময় হ'ল। আমার যা বলবার আছে তা তাড়াতাড়ি ব'লে নিতে চাই। শোন নির্ম্মলা! একটা মানুষের পক্ষে আর একটা মানুষকে যতটা জানা সম্ভব আমি তোমাকে ততটাই প্রায় জানি। আর জানি বলেই বিশ্বাস করি না, একটা খুনের মত কিছু তুমি করেছ, বা করতে পার। তবু যখন বলছ তখন ঠিক কি যে ঘটেছিল, কি তুমি করেছিলে তার সবটা বল আমাকে। আমি শুনি।"

"না শুনলে চলবে না?"

"একেবারেই না।"

"আচ্ছা, বলছি!"

সেই ভয়ব্যাকুল সন্ধ্যায় তাদের আটপাড়া গ্রামের দীঘির নির্জ্জন ঘাটে যা যা ঘটেছিল, পূর্ব্বাপর সে-সমস্তই বলল সে দিবাকরকে। তার কণ্ঠস্বরে কোনো উত্তেজনা নেই, কোনো ভাবান্তর নেই মুখে চোখে।

দিবাকর বলল, "ডুব-সাঁতার দিয়ে এসে নির্জ্জন সন্ধ্যায় তোমার পা চেপে ধরেছিল লোকটা। চুলওয়ালা একটা মাছ আছে ঐ দীঘিতে, সে প্রতিবছর দু-একজন লোককে ঐরকম ক'রে পায়ে চুল জড়িয়ে জলে টেনে নিয়ে ডুবিয়ে মারে। জলের মধ্যে লোকটার চুল দেখে সেই চুলওয়ালা মাছটা ভেবে তুমি কোপ মেরেছিলে। কোনো আইনে একে খুন বলবে না।"

নিজের দুটি পায়ের উপর চোখ রেখে বসেছিল নির্ম্মলা। বলল, "নিজেকে ঐ ব'লে বোঝাবার চেষ্টা আমিও অনেক করেছি। কিন্তু ধর, সরকার পক্ষের উকিল আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, নিবারণের মাথায়, ঘাড়ে, ঘাড়ের আশেপাশে বেশ কয়েকটা কোপের দাগ ছিল; প্রথম কোপটা মাথায় পড়তেই সে কি মাথাটা তোলেনি? প্রাণপণে চেঁচায়নি? তখনো কি তাকে মাছ ভেবেছিলে তুমি? জলের নীচে একরাশ চুল দেখবার পর আমি যে ভয়ে আর চোখ খুলনি সেটা কি বিশ্বাস করবে কেউ?"

চোখে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে নির্ম্মলাকে দেখছে দিবাকর।

নির্ম্মলা একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "এটা সত্যিই কথা যে ওটা যে মাছ নয় মানুষ, আর মানুষটা যে নিবারণ তা জানবার পরেও হয়ত দু-একটা কোপ বসিয়েছিলাম আমি। কেন তা করেছিলাম তা নিজেও ভেবেছি। করেছিলাম, তার কারণ, আমি অত্যন্ত ভীতু মানুষ. কিছু-ক্ষণের জন্যে বোধশক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম ভয় পেয়ে।"

দিবাকর বলল, "খুব বেশী ভয় পেলে অনেকেরই শুনেছি ও রকম হয়।"

নির্ম্মলা বলল, "তুমি বেশী কঠোর হয়ে না আমার বিচার কর, সে জন্যে এও বলছি, মাথাটা তুলে চেঁচিয়ে উঠবার আগেই বেশ কয়েকটা কোপ খেয়েছিল নিবারণ। তখন অবধি চুইলা গজারই তাকে ভাবছিলাম আমি!"

দিবাকর বলল, "তোমার বিচারের ভারটা যদি আমার উপর থাকত ত আমার রায়টা কি হবে সেটা জানা কথা ব'লে এতক্ষণ গিয়ে উনুন ধরাতে। আমি কখন যাব তার অপেক্ষায় ব'সে থাকতে না। যাও, উনুন ধরিয়ে এসে বস। তারপর চায়ের জল চড়াবে। আমি চা খেয়ে বেরুইনি সকালে।"

কি করবে একটু ভাবল নির্ম্মলা, তারপর বলল, "যদি বাইরে গিয়ে কোথাও চা খেয়ে নাও, খুব কি অসুবিধে হবে? আমার শরীর মন দুয়েরই আজ এমন অবস্থা যে ন'ড়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। নয়ত বস কিছুক্ষণ, দুখনী আসুক।"

দিবাকর উঠে দাঁড়াল। বলল, "না, বসব না। চ'লেই যাই। আমার একটি বন্ধু উকীলের বাড়ী যাব প্রথমে, তারপরে তাকে নিয়ে বেশ অভিজ্ঞ কোনো এ্যাডভোকেট বা এটর্নীর কাছে গিয়ে অবস্থাটা বলে তাঁর পরামর্শ চাইব। চির জীবন পালিয়ে বেড়াতেই হবে তোমাকে, যদি শুনি ত একসঙ্গেই পালিয়ে বেড়াব দুজনে, অবিশ্যি তোমার পাশে দাঁড়াতে, তোমার সঙ্গে থাকতে যদি আমাকে দাও। কিন্তু আমার মন বলছে, তোমার যতটা পাওনা তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ অকারণেই নিজেকে দিয়ে চলেছ তুমি।"

নির্ম্মলার চোখে জল আসা উচিত ছিল, কিন্তু এল না। সে এখন আর নির্ম্মলা নয়, সে নিরুপমা। দিবাকর বলে যে মানুষটাকে নির্ম্মলা জানত, তাকে সে চেনে না। সে-মানুষটার কথাগুলি বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝতে চেষ্টা করতে পারে, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না। বলল, "একটা ছেলেকে দীঘির ঘাটে কুপিয়ে কেটে খুন ক'রে একটা মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে, এ খবরটা তখনকার দিনের খবরের কাগজে যারা পড়েছে তাদের অনেকেরই হয়ত মনে আছে। কার কথা হচ্ছে সেটা হয়ত শুনেই বুঝতে পারবেন তোমার উকীলরা। তা বুঝুন গিয়ে, এখন আর আমার ওতে এসে-যাবে না কিছু। আমি ঠিক করেছি ধরা দেব।"

দিবাকর আবার বসল মোড়াটাতে, বলল, "সে আবার কি? ধরা দেবে মানে? না, না, নিজের বুদ্ধিতে কিছু করতে যেও না তুমি। ভীষণ অন্ধ হবে তাহলে। একজন বিচক্ষণ উকীলের পরামর্শ নিতেই হবে।"

নির্ম্মলা বলল, "সেটা নাহয় পরে নিও।"

মনে মনে হিসেব করল। আজ রবিবার। মলিনার ডাক্তারদা কাল কলকাতায় ফিরবেন। চাটগাঁর দিক্‌কার গাড়ী আসে ভোরের দিকে। হয়ত কালকেই কোনো-একসময় মলিনা আসবে তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে। ধরা দেওয়ার কাজটা তার আগেই চুকিয়ে ফেলতে হবে। তার মানে, আজকের দিনটা এবং কাল সকাল বেলাটা তার হাতে আছে। এরই মধ্যে এ কাজটা তাকে সমাধা করতে হবে।

নিজে ত ঐ ক'রে নিস্কৃতি পাবে সে। মৃত্যুদণ্ড বরণ ক'রে মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় দুর্গতির হাত এড়াবে। কিন্তু ঐ তেরো বছর বয়সের বাচ্চা মেয়েটা? সে হয়ত ভেবেছে, এ বেশ একটা মজার খেলা হচ্ছে। তার কি গতি হবে?

কিন্তু সে কে, কাদের মেয়ে কিছুই ত জানে না নির্ম্মলা। যদি জানত, পুলিশে ধরা দেবার পর তাদের সে ব'লে দিত ঐ মেয়েটাকে কোথাও আটকে রেখে দিতে। মলিনাদের ভয় তখন ত আর থাকত না? একবার পুলিশের হাতে গিয়ে পড়লে আর কাকে তার ভয়?

দিবাকর অত্যন্ত কাতর মুখ ক'রে চুপচাপ ব'সে আছে দে'খে বলল, "একটা কথা মনে রেখো। সেটা হচ্ছে এই যে, আমাকে পালিয়ে বেড়াতে বললে পালিয়ে আমি আর বেড়াব না। ও কাজটা আমাকে দিয়ে আর হবে না। তাই উকীলের পরামর্শ আগে নেওয়া হ'ল কি পরে নেওয়া হ'ল তাতে এসে যাবে না কিছু।"

দিবাকর কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে থেকে রুমালে চোখ মুছছে দে'খে হয়ত একটু মায়া হ'ল তার। বলল, "তুমি

এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ রেখো না মনে। আর এই একটা অত্যন্ত বিতিকিচ্ছি ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না, নিজের নামটাকে জড়িয়ে যেতে দিও না। কারণ, তার দরকার কিছু নেই। আমার বাড়ীর লোকদের সঙ্গে এই পাঁচ বছর কোন যোগাযোগ ছিল না আমার। পাছে আমাকে নিয়ে তাদের খুব বেশী উত্যক্ত হতে হয় এই ভয়ে আমি যে বেচে আছি তাও এতদিন তাদের জানাইনি আমি। পুলিশে ধরা দেব ঠিক ক'রে আজ এই একটুক্ষণ আগে আমার ভাইকে চিঠি লিখে খবর দিয়েছি। সে নিজে পুলিশ কোর্টের উকীল, আইনের দিক্ থেকে ব্যবস্থা যত রকমের যা করা দরকার তা সে করবে। তবে অবশ্য সেও যদি আমাকে পালিয়ে বেড়াবারই পরামর্শ দেয় ত তার সে পরামর্শ আমি শুনব না।"

দিবাকর বলল, "তোমার নিজের ভাই, তার উপর তিনি পুলিশ কোর্টের উকীল, তিনি যদি ধরা দিতে বারণ করেন ত তাঁর সে পরামর্শ তুমি কেন শুনবে না?"

নির্ম্মলা বলল, "শুনব না, সে সাধ্য নিতান্তই নেই ব'লে।"

দিবাকর বলল, "যাক, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল একটু। তোমার ভাই নিজেই যখন উকীল, তখন আর আমার উকীলের বাড়ী দৌড়োবার দরকার কিছু থাকল না। কিন্তু কথাগুলি আগেই আমায় বলনি কেন নির্ম্মলা?"

আগেই কেন বলেনি সেটা ব'লে দিবাকরকে অযথা ব্যথা দিতে চাইল না নির্ম্মলা। বলেনি তার কারণ, সে চাইছিল না, নিরুপমার কোনো কথাতে দিবাকর থাকুক। নিরুপমার অতীত জীবনটার থেকে নিজেকে বহু বেদনার মূল্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে নির্ম্মলা ব'লে যে একটি মানুষ স্বতন্ত্র একটি ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছিল এতদিন, সে মানুষটার সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে গিয়েছে ব'লে সে বিদায় নিয়ে চ'লে গিয়েছে, আর ফিরবে না। এখন যে রয়েছে, সে নিরুপমা। মাছ কোটা বঁটি দিয়ে যে নিবারণকে কুপিয়ে কেটেছিল। তবে কিনা, নিরুপমাও থাকবে না বেশীদিন। তারও দিন শেষ হয়ে এসেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দুখনী ত আজ এল না এখনো। জানি না তার আবার কি হ'ল। ছুতো পেলেই কামাই করা তার স্বভাব ত? আজ হয়ত আসবেই না। তুমি ত বাইরে চা খাবে বলে চলেই যাচ্ছিলে, তাই বরং যাও।"

দিবাকর বলল, "যাব, যদি কথা দাও, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এইখানেই থাকবে। অন্ততঃ পুলিশে খবর দেবার কথাটা সে-অবধি ভাববে না।"

নিরুপমা, কারণ সে আর এখন নিজেকে নির্ম্মলা বলে ভাবছে না, বলল, "কথা দিতে পারছি না।"

"নির্ম্মলা!" ব'লে তার দিকে এগিয়ে গেল দিবাকর। এক পা পিছনে সরে গেল নিরুপমা।

ঠিক এই সময় বিকাশ এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। নিরুপমার চিঠিতে জগন্নাথ মিস্ত্রির বাড়ীর ঠিকানা দেওয়া ছিল। তিনুকে অনেকখানি পিছনে ফেলে সে চলে এসেছে। বড় রাস্তার মোড়ের কাছ থেকে নিরুপমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়েছিল একজন গোয়ালা।

মনে হচ্ছে, দাড়ি কামাবার জন্যে সাবান মেখেছিল মুখে, তাড়াতাড়িতে মুখ মুছে চ'লে এসেছে, সাবানের দাগ রয়েছে এখানে সেখানে।

উঠোনটায় ঢুকে একবার একটু থমকে দাঁড়িয়ে বারান্দায় উঠে এল বিকাশ। বলল, "নিরু, নিরু, বোন!"

নিরুপমা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাকে। দুই হাত ধরে নিরুপমাকে তুলে কয়েকবার ঢোঁক গিলল বিকাশ, তারপর আঙুলে তার চিবুক তুলে ধ'রে বলল, "নিরু, বোন! তোমাকে পেয়ে গেছি আমরা! তোমাকে ফিরে পেলাম! সত্যিই ফিরে পেলাম! কি আশ্চর্য্য!"

"দাদা, এস, বসবে," ব'লে বিকাশকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বেড-কভার দিয়ে ঢাকা বিছানাটার এক-পাশে বসিয়ে দিল নিরুপমা। বিকাশের চোখে জল, তার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো নিরুপমাকে মনে হচ্ছে, স্থৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি।

দিবাকর যে রয়েছে একটু দূরেই, ভাই-বোনের কারও মনের ত্রিসীমানায় যে সে বোধ রয়েছে তখন, তা মনে হ'ল না। একটু অপ্রস্তুতিবোধ নিয়ে দুতিন

মিনিট অপেক্ষা করল দিবাকর, তারপর সিঁড়িটা নিরুপমার ঘরের দরজার সামনে ব'লে সেদিকে না গিয়ে বারান্দা থেকে সরাসরি উঠোনে নেমে চ'লে গেল গলির মোড়ে রাখা নিজের গাড়ীটার দিকে।

রুমালে চোখ মুছে বিকাশ বলল, "তোমাকে পেয়ে গেছি বলছি নিরু, কিন্তু তোমার চিঠিতে এমন কতগুলি কথা রয়েছে যার মানে কিছুই বুঝতে পারছি না, আর সেইজন্যে বড্ড ভয় পাচ্ছি।"

নিরুপমা বলল, "কি বুঝতে পারছ না দাদা? কেন বুঝতে পারছ না?"

গলাটাকে নামিয়ে বিকাশ বলল, "বুঝতে পারছি না বোন, কি এমন তুমি করেছ যেজন্যে তোমাকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, যেটা করতে হাঁপ ধ'রে গেছে ব'লে পুলিশে ধরা দিতে চাইছ। আর হাঁপ ধরেছে, এই পাঁচ বৎসর ধরেই এটা করতে হচ্ছে ব'লে। মনে হয়, তোমাকে যে-সময় আমরা হারালাম, তার অল্প-কিছুদিন পরেকারই ঘটনা এটা। কি হয়েছিল আমায় বলবে?"

নিরুপমা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে ছিল বিকাশের মুখের দিকে। এ কি বলছে বিকাশ? মনে হচ্ছে যেন আবোল তাবোল বকছে....হঠাৎ কিরকম একটু সন্দেহ হ'ল তার, সে-ও গলাটাকে নামিয়েই বলল, "তুমি আমাকে অবাক্ করলে দাদা। নিবারণকে কে খুন করেছে ব'লে তোমাদের ধারণা?"

এবারে বিকাশ কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল নিরুপমার মুখের দিকে। তারপর বলল, "খুন? নিবারণকে খুন? তোমাকে যেদিন হারালাম আমরা?"

নিরুপমা বলল, "হ্যাঁ দাদা।"

বিকাশ বলল, "সেদিন মমীনপুরের গুণ্ডারা ওকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়, নিতান্ত কপালগুণে বেঁচে গিয়েছিল সে।"

ছুটে এগিয়ে গিয়ে বিকাশের একটা হাত চেপে ধ'রে নিরুপমা বলল, "কি বলছ তুমি দাদা? দাদা, তুমি বলছ, নিবারণ মরেনি সেদিন? সে খুন হয়নি? মানে কেউ খুন করেনি তাকে? সে বেঁচে আছে তুমি জানো দাদা? সে যদি বেঁচে আছে তাহলে ত আর তার খুনের দায়ে কারও ফাঁসী হতে পারে না?"

দু-চোখ বিস্ফারিত ক'রে নিরুপমাকে দেখছে বিকাশ। বোনের এই অসংলগ্ন কথাগুলির ভিতরকার কি একটা অর্থ যেন পরিষ্কার হতে হতে হচ্ছে না। বলল, "এর মধ্যে আটপাড়ায় আমি গিয়েছি দুবার। নিবারণ বেঁচে আছে শুধু নয়, আগেরই মত গাঁয়ের লোকেদের হাড় জ্বালাচ্ছে। পুলিশকে বলেছিল মমীনপুরের গুণ্ডারা তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সে বাধা দিতে গেলে তারা দুতিনজনে মিলে তাকে দা দিয়ে কোপায়, তারপর সে মরেই গিয়েছে মনে ক'রে তাকে বারুণী দীঘির ঘাটে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু পরে পুলিশের সঙ্গে মমীনপুরে গিয়ে গুণ্ডাদের একজনকেও সনাক্ত করতে পারেনি সে।"

নিরুপমা বলল, "কি ক'রে পারবে? গুণ্ডা যে কেউ সেখানে ছিলও না, আমাকে নিয়ে পালাচ্ছিলও না, আর তাকে দা দিয়ে কোপায়ওনি।"

বড় নদীর ধারে নিরুপমার মাছের চুপড়িটা মনে পড়ছে বিকাশের। একটু অদ্ভুত ঠেকেছিল তার তখন। গুণ্ডারা একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা বোঝা যায়। সেই সঙ্গে তার মাছের চুপড়িটাও তারা নিয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়। আর যেটা একেবারেই বোঝা যায় না, তা হ'ল, দু-মাইল পথ বয়ে নিয়ে এলই যদি তারা ত সেটা ফেলে চলে যাবে কেন?

নিবারণ যদি সেদিন ম'রে যেত, বেঁচে উঠে যদি মমীনপুরের গুণ্ডাদের গল্পটা না বলত পুলিশকে, ত আর একটা-যে সম্ভাবনার কথা মনে হ'ত বিকাশের, মনে হ'ত আরো অনেকের, সেটা আজ থেকে থেকে বিকাশের মনে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। বলল, "কি তাহলে হয়েছিল নিরু? নিরু, বোন, তুমি কি... তাহলে কি,...কিন্তু না.."

নিরুপমা বলল, "হ্যাঁ দাদা! জলে নেমে বঁটি খুচ্ছিলাম, ডুব সাঁতার দিয়ে এসে পা জড়িয়ে ধরেছিল নিবারণ। জলের নীচে অল্প আলোয় ওর একমাথা চুল দেখে

মনে হয়েছিল চুইনা গঙ্গার। ভীষণ ভড়কে ওর মাথায় আর ঘাড়ে বঁটির কয়েকটা কোপ বসিয়েছিলাম।"

নিরুপমার দুই হাত ধ'রে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে বিকাশ বলল, "নিরু বোন, ও ম'রে গিয়েছে আর তুমিই ওকে মেরে ফেলেছ মনে ক'রেই কি তুমি সেদিন,—তুমি এতদিন,—" কথাটা শেষ করতে পারল না, একটু পরে কপালে হাত দিয়ে বলল, "হা কপাল!"

"মা গো মা, কি কাণ্ড!" বলে নিরুপমা হাসছে, কিন্তু একটু একটু ক'রে কান্নার মত একটা কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তার সেই হাসি।

ধরা গলায় বিকাশ বলল, "খুন করেছ ভেবে ভয় পেয়ে পালিয়েছিলে, না বোন?"

নিরুপমা মাথা নেড়ে জানাল, হুঁ।

গভীর স্নেহে তার মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বিকাশ বলতে লাগল, "আহা বেচারী! বেচারী নিরু! বেচারী নিরু আমাদের! কত দুর্গতির মধ্যে না জানি তোমাকে পড়তে হয়েছে; কত দুঃখ পেতে হয়েছে!"

নিরুপমার স্থৈর্য্য ফিরে এসেছে তখন। বলল, "না দাদা, না! তেমন কোনো দুর্গতির মধ্যে আমাকে কখনো পড়তে হয়নি, আর এই পাঁচ বৎসর কেবল যে দুঃখ পেয়েছি তাও নয়।"

বলবার কথা, শোনবার কথা ত কত আছে, অনেক-দিন ধ'রে ধীরে সুস্থে সে-সব বলা যাবে, শোনা যাবে। আজ অল্প কথায় তার বিগত পাঁচ বৎসরের জীবনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়ের একটির থেকে আর একটিতে উত্তরণের একটা ইতিহাস বিকাশকে শুনিয়ে দিল নিরুপমা।

বিকাশ বলল, "যাক, সবদিক্ দিয়েই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তোমার চিঠি প'ড়ে এত ভয় পেয়েছিলাম যে বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলেই চ'লে এসেছি। এবারে ওঠ নিরু, বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই। তোমার জিনিষপত্র নেওয়াবার ব্যবস্থা পরে করা যাবে।"

নিরুপমা বলল, "দাদা, তুমি যে আজই বাড়ীতে কাউকে কিছু বলনি, সেটা ভালই করেছ। আজকের দিনটা আমি এইখানেই থেকে যাই। কতগুলি জট ছাড়াবার আছে। কাল সকালে এসে আমায় নিয়ে যেয়ো, নয়ত যদি বল, আমি নিজেই গিয়ে হাজির হব কাল কোনো এক সময়।"

দিবাকরের হাসিমুখটা দেখে যেতে না পারলে এত দুঃখভোগের পর বাড়ী ফেরার আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না তার। বারুণী দীদির বৃত্তান্ত শোনবার পর থেকে এমন শুকনো মুখ ক'রে রয়েছে বেচারা। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। রিভলবারটা রয়েছে তার সুটকেসে, কতগুলি সেমিজ পেটিকোটের তলায়। সেটার একটা গতি না ক'রে যায় কি ক'রে সে? ওটা সঙ্গে নিয়েও ত আর ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা যায় না? যদি পুলিশ এসে বিকাশের বাড়ী ঘেরাও করে আর নিরুপমার পাট করা সেমিজ পেটিকোটগুলির নীচে থেকে বেরিয়ে পড়ে রিভলবারটা, তবে ত চিত্তির। তখন বিকাশকে নিয়েও যদি পুলিশ টানাহেঁচড়া করে ত তার বাড়ী ফেরাটা খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে বটে। মলিনা ব'লে গিয়েছে, বিকেলে আসবে। নিরুপমা যে তার দাদার বাড়ী যাচ্ছে, আর সেখানে যে রিভলবারটা রাখবার সুবিধা একেবারেই নেই, এই কথাটা খুব স্পষ্ট ভাষায় মলিনাকে জানিয়ে দেবে সে। মলিনা রিভলবারটা নিয়ে গেলে কিছুদিনের মত ত নিশ্চিন্ত হতে পারবে নিরুপমা? তার পরে কি হবে, সে তখন দেখা যাবে।

বিকাশ বলল, "না, না, আমিই এসে নিয়ে যাব তোমাকে। কিন্তু এত দেরি করবে নিরু? আজ সারাটা দিন, আর সারাটা রাত বাড়ীতে কাউকে কিছু না ব'লে কি ক'রে যে থাকব তা জানি না। পেট ফুলেই হয়ত ম'রে যাব। তার চেয়ে চল না, একবার একটু দেখা দিয়েই চ'লে আসবে?"

নিরুপমার মনে রিভলবারটার কথাটাই ঘুরে ঘুরে আসছে। ওটাকে আগলে থেকে যে কি লাভ হবে তা

জানে না, কিন্তু ওটাকে ফেলে খানিকক্ষণের জন্তেও বাইরে যেতে ভরসা হচ্ছে না তার।

বলল, "কাল খুব সকাল সকাল এসো দাদা। আজ থাক।"

উনত্রিশ

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই আধ ময়লা ধুতি আর টুইলের টেনিস শার্ট পরা বছর ত্রিশ বয়সের রোগা মতন একটি লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হ'ল বিকাশের। লোকটি বলল, "আচ্ছা দেখুন, আপনি ত ঐ বাড়ীটায় থেকেই বেরুলেন? সেইজন্তেই জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। ঐ বাড়ীতে নির্ম্মলা বলে যে একটি নার্স এসে রয়েছেন ক'দিন হ'ল, তাঁকে কি আপনি চেনেন?"

বিকাশের মন তখন তার বোনকে নিয়ে, তার বোনের বিস্ময়কর জীবনেতিহাস নিয়ে, বোনটিকে ফিরে পাবার গভীরতর বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে কানায় কানায় ভরে আছে। বাড়ীর লোকদের বলা বারণ, কারণ, বললেই তারা হৈ হৈ ক'রে এসে নিরুপমাকে নিয়ে টানাটানি করবে, যা সে এখন চাইছে না। কিন্তু বাইরের লোকদের বলতে ত বাধা কিছু নেই? বলল, "নির্ম্মলা ওর নাম নয়। ওর নাম নিরুপমা।"

লোকটি বলল, "বলেন কি? ফেরারী আসামী নাকি যে নাম ভাঁড়িয়ে বেড়াচ্ছেন?"

কতকটা দায়ে ঠেকে, আর বেশীর ভাগটা পরিপূর্ণ মনের আনন্দ থেকে নিরুপমার নাম যে কেন হয়েছিল নির্ম্মলা, সেটা লোকটিকে শোনাল বিকাশ। নিরুপমাকে হারানোর থেকে তাকে সদ্য ফিরে পাওয়ার বৃত্তান্ত। বিকাশের চোখে জল, লোকটিরও চোখদুটো যেন শুকনো নয়। মাথাটা চুলকোল একটু, তারপর বলল, "আপনি বলছেন, উনি যে বেঁচে আছেন, ওঁর বাবা আর ছোট ভাই-দুটিকে সেটা বলা হয়নি এখনো?"

বিকাশ বলল, "না।"

"ও!" ব'লে লোকটি আবার একটুক্ষণ মা চুলকোল, তারপর দুবার মাথা নাড়ল, তারপর বিকাে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু করুণ হাসি হেসে পথচারীে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

কি যে হ'ল ব্যাপারটা, কিছুই বুঝতে পারল না বিকাশ

এদিকে বিকাশ চলে যাবার পর নিরুপমা কিছুক্ষ হতবুদ্ধির মত হয়ে ব'সে রইল। কি যে হ'ল ব্যাপারট সেও যেন বুঝতে পারছে না। এরকম হবার যে কথ ছিল না সেটাই যেন বড় কথা, যা হ'ল সেটা বড় কথা নয়।

কিন্তু কি হ'ল? কোথায় এসে দাঁড়াল সে?

মলিনা কালও ব'লে গেছে, "কুকীর্ত্তি কইলাম একট করুম-অই।" নিরুপমা তার সঙ্গে যাবে, তাকে কথ দিয়েছে। এর পর যদি সে না যায় ত তার একমাত্র অর্থ হবে, নিজে রেহাই পাবার জন্যে তেরে বছরের একটা কচি বাচ্চা মেয়েকে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে চরমতম দুর্গতির পথে ঠেলে দিচ্ছে সে। তার স্বভাবে স্বার্থপরতা আছে সেটা ঠিকই, কিন্তু এতটাই নেই তাই ব'লে।

কি করে এখন সে?

ভাল করে যে ভাববে একটু তারও উপায় নেই। কোনো উপলব্ধিই তার মনের মধ্যে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। এদিকে শুদ্ধমাত্র রাত্রি-জাগরণের ফলেই চিন্তাস্রোতও মন্থর। উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করবে ভাবছে, এমন সময় জগন্নাথকে সঙ্গে করে দিবাকর এল।

জগন্নাথ যে সব শুনেছে সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। শুনেছে ভালই হয়েছে, দুর্ভাবনায় খানিকটা ভুগলে, সেটা যে অমূলক তা জেনে আনন্দের মাত্রাটা বেশী হবে। মলিনার ব্যাপারে পরে কি হবে, না-হবে, সেকথা পরে।

নিরুপমা বলল, "একে কোথায় পেলে?"

দিবাকর বলল, "জুটিয়ে নিয়ে এলাম দল ভারী

করবার জন্যে। তোমাকে বলে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে হবে ত?"

"কিসের থেকে নিরস্ত?"

"এই যে ভাবছ, পুলিশে ধরা দেবে, এটার কোনো মানে হয় না। তোমার দাদাও নিশ্চয় তাই ব'লে গিয়েছেন—"

নিরুপমা বলল, "ধরা দিলেও পুলিশ ধরবে না আমাকে, কারণ, যে ছেলেটাকে মেরে ফেলেছি ভেবেছিলাম, সে মরেনি। আমার নামও কারুর কাছে সে করেনি। দাদা বলে গেলেন।"

দিবাকর বলল, "কি কাণ্ড!"

নিরুপমা বলল, "কাণ্ড না কাণ্ড!"

দিবাকর সকালে যাবার সময় যা করেছিল, এবারেও তাই করল, যদিও সম্পূর্ণ অন্য কারণে। বারান্দা থেকে এক লাফে নেমে পড়ল উঠোনে, বলল, "আমি চললাম, বাবাকে বলিগে।"

তারপর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জগন্নাথের মুখটা জ্বলজ্বল করছে হাসিতে। বলল, "মাসী! কি ভাল খবর মাসী! আশা করে আসিনি যে শুনব।"

নিরুপমার মন থেকে কিছুক্ষণের মত স'রে গেল তার দুর্ভাবনার অন্ধকার। তারও মুখটি হাসিতে উজ্জ্বল হ'ল।

একটু পরে জগন্নাথ বলল, "জান মাসী, আমি জানতাম।"

"কি জানতে?"

"জানতাম যে তুমি সামান্যি মানুষ নয়। আমাদের মত একজন সেজে বেড়াচ্ছ।"

"আমি তোমাদেরই মতই ত একজন।"

"না, না মাসী। ও যে যেমন হয়ে জন্মেছে। ও কি আর ইচ্ছে করলেই অন্যরকম হওয়া যায়?"

হাসিটা আর আগের মত অতটা জ্বলজ্বল করছে না মুখে। বলল, "আচ্ছা মাসী, নার্সিং হোমের কাজে তুমি আর ফিরে যাবে না, না? কেনই বা যাবে?"

"যেতে কি আমাকে দেবে এরা?"

"আমি হলেও দিতুম না। ও কি মানুষের কাজ করবার মত একটা জায়গা, না থাকবার মত জায়গা? একটা ব্যামোর আড়ত। আমি ত দিন গুনছিলুম, কবে তুমি কাজটা ছাড়বে।"

"তার মানে, আমি ছাড়লে তুমিও ছেড়ে দেবে কাজটা?"

"বা, ছাড়ব না?···আচ্ছা মাসী, কি ব্যাপার বল ত? তুমি যে আজ উনুন ধরাওনি বড়? আজ রান্নাবাড়া নেই? খাবে-দাবে না? বেলা কত হয়েছে খেয়াল আছে?"

"ইচ্ছে করছে না কিছু করতে। ভাবছি ত বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নিয়ে খাব।"

"সেই ভাল। আমারও এত খিদে পেয়েছে যে উনুন ধরিয়ে রান্না করার তর সইবে না।"

চলে গেল বাজারে। ফিরে এল, সেই ফ্রুরডাইস লেনের হোটেলের প্রথম রাতটির মত একরাশ গরম গরম আটার পুরি, ছোলার ডাল, ঝাল তরকারি আর একটা খুরিতে ক'রে খানিকটা আম-তেল নিয়ে। উপরন্তু এনেছে আর একটা খুরিতে ক'রে কয়েকটা রসগোল্লা।

নিরুপমা বলল, "এত খাবার কি হবে?"

"কি আবার হবে? খাব। তুমি কিছু ভেবো না মাসী। যা ভীষণ খিদে পেয়েছে, এর কিছু প'ড়ে থাকবে না, তুমি দেখো।"

বেশী কিছু প'ড়ে রইলও না!

দিবাকর এল খুব বেলা ক'রে। নিরুপমা একটু গড়িয়ে নিচ্ছে চায় শুনে জগন্নাথ তখন চলে গিয়েছে। মাসী তাকে ব'লে দিয়েছে সন্ধ্যার পর একবার আসতে। দিবাকর খায়নি তখন পর্যন্ত। বলল, তৈরি হয়ে নাও, বাইরে কোথাও গিয়ে খাব দুজনে। তুমি যে আজ উনুন ধরাওনি তা ত দেখতেই পাচ্ছি।"

জগন্নাথ খাবার এনেছিল বাজার থেকে, তাই দুজনে পেট পুরে খেয়েছে বলতে কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকছিল

নিরুপমার। শুনে দিবাকরের মুখটা একটু কালো হ'ল। বলল, "আমার জন্তে অপেক্ষা করলে না একটু ?''

নিরুপমা পায়ের আঙ্গুলে মেজেতে দাগ কাটছে। তারও মুখটা কালো হয়ে গিয়েছে।

দিবাকর হেসে বলল, "কি ভাবছ ? আমি খুব রাগ করছি ? না, না, আর রাগ না। এই জীবনেই আমি আর রাগব না তোমার উপরে। খাবার যা এনেছিল তার সবই কি খেয়ে নিয়েছ, না বাকী আছে কিছু ?"

যা ছিল এনে দিল নিরুপমা। চেটেপুটে খেল দিবাকর।

তারপর মুখ-হাত ধুতে ধুতে বলল, "বাবা কি বলেছেন জানো নির্মলা ?''

"কি ?''

"বলেছেন, তুমি নিজের বাড়ীতে গিয়ে স্থির হয়ে বসলে তিনি নিজেই গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। মানে হ'ল আমাদের বাড়ীতে তোমার এরপর ঢোকা বারণ, কিন্তু তোমাকে না হলে তাঁর ত চলবেও না, কাজেই যা হলে ঢুকতে পার তার ব্যবস্থা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি তিনি করতে চান।''

নিরুপমা আবারও পায়ের আঙ্গুলে মেজেতে দাগ কাটছে, তবে এবারে মুখের রঙটা অন্তরকম।

দিবাকরকে বিদায় করে দিয়ে নিরুপমা গড়িয়ে নিল একটু। বেলা পড়ে আসতেই উঠোনে রাজ্যের লোকের ভিড়। নিরুপমার অজ্ঞাতবাসের গল্পটা শুনেছে অনেকেই। জগন্নাথ যাবার সময় কলতলার পাশে দাঁড়িয়ে ব'লে গিয়েছে চাঁপাবৌকে, সে বলেছে দুখনীকে, আর দুখনী পাড়া-প্রতিবেশীদের যাকে যেখানে পেয়েছে তাকেই বলেছে। খড়ের আগুনের মত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে গেছে খবরটা।

এসেছে দিলীপ, রঘু, পিন্টু, বাবলু, নারাণদের একটি দল। নতুন কয়েকটা ছোকরা এদের সঙ্গে জুটেছে যাদের নিরুপমা আগে কখনো দেখেনি। দিলীপ এখন নিজেই মিস্ত্রি হয়েছে। অন্ত ছেলেগুলো তার সঙ্গে থেকেই কাজ করছে। তাদেরও মধ্যে কয়েকজন এখন নানা রকমের কাজ শিখেছে। পিন্টু আগের মত অতটা আর রোগা নেই, খানিকটা লম্বা হয়ে নারাণের থলথলে ভাবটা একটু কেটেছে। এদেরই একজনকে বাজারে পাঠিয়ে একরাশ নিমকি, শিঙাড়া, দরবেশ আর রসগোল্লা আনিয়ে এদের খাইয়েছে নিরুপমা। দিলীপ ভাঙা গলায় বলেছে, "খেয়ে জুত হ'ল না মাসী। তোমার হাতের রান্না আবার কবে খেতে পাব বল।" বিকাশের বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে তবে তারা গেছে।

এল গয়লারা, ধোপারা। কেউ বা একলা এল, দল বেঁধেও এল কেউ কেউ। নিরুপমার সঙ্গে কোনোদিনই নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কথা বলে না তারা, আজও বলল না। তাকে দেখে হাসিতে মুখ ভ'রে তুলে নীরবেই জানিয়ে দিয়ে গেল, তারা খবরটা শুনেছে, শুনে খুব খুশী হয়েছে।

চাঁপাবৌ এল সন্ধ্যা হতেই, দুখনীকে সঙ্গে ক'রে। বলল, "এরপর আর তোমাকে আমরা দেখতে পাব না, না ?"

নিরুপমা বলল, "দুখনী ইচ্ছে হলেই যেতে পারবে, ঠিকানা রেখে যাব। তুমি ত আর সেটা পারবে না ? আমিই মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব তোমাকে।''

চাঁপাবৌ বলল, "দুপুরে বাজারের খাবার খেয়েছ, এবেলাও যেন তাই করতে যেয়ো না। তোমার রাতের খাবার আমি রেঁধে পাঠাব।"

নিরুপমা বলল, "বেশ, পাঠিও। আমি আর উনুনে আঁচ দিই না তাহলে।''

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল, মলিনা এল না। অথচ বলে গিয়েছিল বিকেলেই আসবে।

বেশ খানিকটা সময় ঘর আর বার ক'রে কাটল নিরুপমার। স্নিগ্ধলবাবুটা ত আগে ঘাড় থেকে নামুক, তার পরের কথা পরে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ জগন্নাথ এল। বলল, "কি করতে হবে বল মাসী।"

"বস, বলছি," ব'লে মলিনাকে দু লাইনের একটা চিঠি লিখল নিরুপমা, তারপর দেখল খাম নেই। সে কথা জগন্নাথকে বলাতে সে বলল, "খামের জন্তে ভাবনা। দাও

ত তোমার চিঠির কাগজের একখানা আর তোমার নখ কাটবার কাঁচিটা।” তারপর সেই কাগজ কেটে চাঁপা-বৌএর কাছ থেকে কয়েকটি ভাতের দানা চেয়ে এনে তার আঠাতে ছোট্ট একটি খাম খুব পরিপাটি ক’রে তৈরি করে দিল সে। খামে করে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে নিরুপমা বলল, “এটা নিয়ে তুমি বকুল-বাগানে চ’লে যাও। মলিনাকে ত জানো? তার হাতে দেবে। যদি শোন তার আসতে দেরী আছে, ব’সে থাকবে যতক্ষণ না আসে। এ চিঠির জবাব আজ রাত্তিরের মধ্যে আমার চাইই চাই, নইলে কাল সকালে দাদা এলে তাঁকে ফিরে যেতে বলতে হবে।”

জগন্নাথ চ’লে গেল চিঠি নিয়ে।

খানিকক্ষণ কাটবার পর আবার আগেরই মত ঘর আর বার করছে নিরুপমা।

জগন্নাথ ফিরে এল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। চিঠিটি নির্মলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “ও চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দাও মাসী।”

“কেন, কি হল?”

“ওকে আর পাবে না। ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।”

“সে কি? কি করেছে সে, যে তাকে ধ’রে নিয়ে গেছে?”

“কিছু করেনি, কিন্তু হয়ত করবে, তাই ভেবেই তাকে ধরেছে। পাঠিয়ে দিয়েছে পুরুলিয়ার কোনো একটা জায়গায়, সেখানে এখন কতদিন তাকে তারা রাখবে তা তারাই জানে।”

কি ক’রে ঘটেছে ব্যাপারটা তাও পাড়ার একজন চেনা মিস্ত্রির কাছে শুনে এসেছে জগন্নাথ। সেই পাড়ারই একটি তেরো চোদ্দ বছরের মেয়েকে নিয়ে কোথায় খুন-খারাপি কিছু একটা করতে যাবে ঠিক করছিল মলিনা। মেয়েটির নাম আত্রেয়ী। মা-বাপ নেই। দিদিমার কাছে থেকে মানুষ হচ্ছে। চন্দনা, মালতী আর শশীপ্রভা তার তিনটি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বান্ধবী। তাদের সে নাকি একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তারা রিভলবার দেখেছে কি না। সমস্বরে “না” ব’লে তারা জিজ্ঞেস করছিল, “তুই দেখেছিস্?” আত্রেয়ী বলেছিল, “দেখেছি মানে? চালাতে শিখেছি।” তারপর খুব বিজ্ঞের মত মুখ ক’রে তাদের বুঝিয়েছিল, হাতটাকে সোজা ক’রে সামনের দিকে বাড়িয়ে গুলী ছুঁড়তে নেই, তাতে হাত নড়ে গিয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা। হাতের পেনসিলটাকে কোমরের পাশে চেপে ধ’রে তাদের দেখিয়েছিল, গুলী ছোঁড়ার কায়দা। বান্ধবীদের একজন গল্প করেছিল বাড়ীতে, বলেছিল কাউকে না বলতে। বাড়ীর লোকরা বলেনি কাউকে, কেবল কথাটা তুলে দিয়েছিল ওদের চেনাজানা পুলিশের একটি লোকের কানে। পুলিশ জানত, আত্রেয়ীর এক মাসীর ছেলে হওয়া উপলক্ষে মলিনা তাদের বাড়ীতে কাজ করেছিল মাস-দুই। পোলিটিক্যাল সাস্‌পেক্টদের একজন বলে মলিনার নামও রয়েছে তাদের খাতায়। কাজেই কালবিলম্ব না ক’রে বকুলবাগানের বাড়ীটা আজ ভোর রাত্রিতেই ঘিরে ফেলেছিল তারা। আশা করেছিল, আত্রেয়ী তার সখীদের যে রিভলবারটার কথা বলেছিল, সেটা পাওয়া যাবে মলিনার কাছে। পেলে সোজাসুজি জেল হেপাজতে নিয়ে রাখত মলিনাকে, তারপর দিত বেশ কিছুদিনের জন্যে ঠেলে। কিন্তু পেল না কিছুই, তাই বিনাবিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

নিরুপমা বলল, “ভাগ্যিস!” তারপর চিঠিটাকে কুটিকুটি ক’রে ছিঁড়ে ফে’লে দিল আবর্জনার ঝুড়িতে।

জগন্নাথ বলল, “ভাগ্যিস্ কেন বললে মাসী?”

নিরুপমা বলল, “কতদিক্ দিয়ে কত ভাল হ’ল একটু ভেবে দেখ। মলিনা ‘কুকীর্ত্তি একটা করব-অই’ বলত, দিনক্ষণও ঠিক ক’রে রেখেছিল। ও যা মেয়ে, বড় রকমের কুকীর্ত্তি একটা না ক’রে ছাড়ত না। কি হ’ত? ফাঁসী যেত। আগেই তাকে ধ’রে নিয়ে গেল ব’লে বেঁচে গেল সে। ঐ যে আত্রেয়ী বলে ছোট্ট মেয়েটাকে সে সঙ্গে নেবে ঠিক করেছিল, সে ত ধরা পড়তই, কি ভীষণ বিপদ্ তার হত বল ত? সেও রক্ষা পেয়ে গেল। আর রিভলবারটাকে পুলিশ যে পায়নি শুধু ওখানে, সেটাকেও ভাগ্যেরই কথা বলতে হবে, মলিনাকে জেলে যেতে হ’ল না। ডেটিনিউদের ক্যাম্পে খেয়ে দেয়ে, গান গেয়ে, কবিতা আউড়ে সে ভালই থাকবে। একজন মার্

থাকবে হাতের গোড়ায় ব'লে অন্যদেরও ভাল থাকবার সুবিধে হবে। সবই ভাল হ'ল, কেবল—"

জগন্নাথ বলল, "কেবল কি মাসী? বলতে বলতে থামলে কেন তুমি? আচ্ছা মাসী, সত্যি ক'রে বল ত তোমার কি হয়েছে? তোমাকে আজ কত যে খুশী দেখব ভেবেছিলুম। কিন্তু কই, তোমাকে ত তা দেখাচ্ছে না?"

নিরুপমার মনে পড়ল, জগন্নাথ নিজে থেকেই একদিন স্বদেশী করার কথা বলেছিল। সে জেলও খেটে এসেছে। নিশ্চয় সহজে ভড়কাবে না। বলল, "যদি কথা দাও বলবে না কাউকে ত তোমাকে একটা জিনিষ দেখাব।"

জগন্নাথ দেখল রিভলবারটা। শুনল, মলিনা রেখে গিয়েছিল, আজ বিকেলে তার আসবার কথা ছিল, সে এলে রিভলবারটা তাকে ফিরিয়ে দেবে ভেবে রেখেছিল নিরুপমা। এখন কি করবে এটাকে নিয়ে ভেবে পাচ্ছে না।

জগন্নাথ হাসিতে ভ'রে তুলল মুখটা। বলল, "তুমিও যেমন, এ নিয়েও ভাবছ! দাও দেখি ওটা আমাকে। অনেকদিন গঙ্গাস্নান করিনি, কেওড়াতলার ঘাটটা ত খুব কাছেই, ওটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ডুব দেব। শ্মশানে রাত-বিরেতে আকছারই লোকে জলে নামছে, ডুব দিচ্ছে, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।"

রিভলবারটা নিয়ে চ'লে গেল জগন্নাথ। যেতে যেতে বলল, "আমি এই এলুম ব'লে।" তার যাবার পথের দিকে চেয়ে দু-চোখ জলে ভরে উঠল নিরুপমার।

এই ছেলেটা কি চোখে যে দেখেছে তাকে! নিরুপমা জানে, তার কাছ থেকে কোনো কাজের ভার পেলে প্রাণ গেলেও সেটা ভণ্ডুল করবে না জগন্নাথ। এমনিতেও কোনো কাজই ভণ্ডুল সে করে না সচরাচর। অবশ্য নিরুপমারও মনের কোনো একটা গভীরতার জায়গায় জগন্নাথের উপর যে একান্ত নির্ভর, তারও তুলনা নেই কোথাও। যেজন্যে এই রিভলবারটার কথা আর কাউকে বলতে তার সাহসে কুলোয়নি, কিন্তু জগন্নাথকে নির্ব্বিকার চিত্তে বলতে পেরেছে।

ক্রমশঃ

দুই বন্ধু—বিদ্যাসাগর ও তারানাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড-পণ্ডিত। মাইনে পান মাসে পঞ্চাশ টাকা। কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। তাই ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ খালি হলে মার্শাল ওই পদের জন্য বিদ্যাসাগরের নাম প্রস্তাব করলেন। ব্যাকরণের অধ্যাপকের যে পদ, তার বেতন ছিল নব্বই টাকা। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যা পান, তার প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর ওই পদ গ্রহণে রাজি হলেন না।

আসলে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কথা দিয়েছেন যে, তাঁকে চাকরি করে দেবেন। তারানাথ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। এবং যোগ্য ব্যক্তি। বিদ্যাসাগর অনুরোধ করলেন, চাকরিটা তারানাথ বাচস্পতিকে দেওয়া হোক। তাঁর একান্ত অনুরোধে মার্শাল শেষ পর্য্যন্ত রাজি হলেন।

কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হয় না। সেদিন ছিল শনিবার। সোমবার সকালেই এডুকেশন কাউন্সিলের মিঃ মোয়াটের কাছে নাম ও প্রার্থীর আবেদনপত্র পেশ করতে হবে। তারানাথ তখন কলকাতা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে—কালনায়। এখনকার মত সে সময় টেলিফোন ছিল না; টেলিগ্রামও পাঠানো যেত না। তাছাড়া তারানাথকে সবকিছু বুঝিয়ে বলা দরকার। তারানাথও জেদী লোক। কালনায় টোল খুলেছেন; মহাজনি কারবারও করেন। বিদ্যাসাগর ভাবলেন, যেমন করেই হোক তারানাথকে দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে আনতেই হবে।

শনিবার রাত্রেই হাঁটাপথে অগ্রসর হলেন বিদ্যাসাগর। ট্রেন নেই ত। সারারাত হেঁটে রবিবার দুপুরে এসে পৌঁছলেন কালনায়। সব কথা শুনে তারানাথ ত স্তম্ভিত। বিদ্যাসাগর কি দেবতা!

তারানাথের সই করা দরখাস্ত নিয়ে সেইদিনই কলকাতা রওনা হলেন বিদ্যাসাগর। আবার পঞ্চাশ মাইল হেঁটে এলেন কলকাতায়। মার্শাল সাহেবের হাতে তুলে দিলেন সেই দরখাস্ত।

এমনই ছিল তাঁদের বন্ধুত্ব। তারানাথও বন্ধুকে যথেষ্ট ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। সংস্কৃত কলেজে তারানাথ ও বিদ্যাসাগর একই সময়ে ছাত্র ছিলেন। যদিও তারানাথ বয়সে সামান্য বড় ছিলেন, এবং উচ্চতর শ্রেণীতে পড়তেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহমূলক আন্দোলনে তারানাথেরও যথেষ্ট সহায়তা ছিল। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত এ কথা প্রমাণ করবার জন্য বিদ্যাসাগর যখন ব্যস্ত তখন তারানাথও তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রসাগর মন্থন করেন। গভর্ণর জেনারেলের কাছে বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র পাঠান, তাতে তারানাথেরও স্বাক্ষর ছিল। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণের বিবাহ বিধবাবালিকা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। আত্মীয় স্বজন কেউ বধূবরণ করতে এলো না। এলেন তারানাথ পত্নী নিজে। তিনিই বধূবরণ কার্য সম্পন্ন করেন।

বেথুন সাহেব যখন একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন, তখন ঐ বিদ্যালয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্যাসাগরও পরিশ্রম করেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই বিদ্যালয়টি দাঁড়াতে পারে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাঁদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করতেন এবং

তাঁরা সমবেতভাবে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করেছেন বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে। কিন্তু নির্দ্বিধায় নিজের মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন তারানাথ।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ মেধা ও উপস্থিত বুদ্ধিকে তিনি সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবু এই দুই মহাপণ্ডিত মানুষের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ছিল বেগবান নদীর মত; আপন গতিপথে যা কিছু অবরোধ সবই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বিদ্রোহী সৈনিক তার তরবারি উঁচু করে এগিয়ে গেছে। সে মানেনি কোন প্রতিপক্ষকে। বিচার করেনি কে স্বজন, কে বান্ধব।

কোন বিপ্লবীর পক্ষেই নায়কের আসনে থাকা সম্ভব হয় না, যদি সে প্রতিপক্ষের অবরোধে দ্বিধান্বিত হয়। হিন্দু-সমাজবিপ্লবের নেতৃত্ব করা বিদ্যাসাগরের পক্ষেও সম্ভব হত না, যদি তিনি পৌরুষের প্রকাশকে স্বজনপ্রীতির কাছে খর্ব হতে দিতেন। তাই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত বন্ধুকেও তিনি দূরে সরে যেতে দিয়েছেন। ইংরাজ শাসক-বৃন্দের সহৃদয় সহায়তাকেও বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তুচ্ছ করেছেন দারিদ্র্যভীতিকে। হ্যালিডে, বিডন, কোলভিল, বেল প্রমুখ উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিরাও পলকের জন্য তাঁকে নমিত করতে পারেন নি। ব্যক্তিজীবনেও বহু বিপর্যয় এসেছে এই অনমনীয় মনোভাবের জন্য। তারানাথের মত পরমবান্ধবের সঙ্গেও বিরোধ ঘটেছে।

'বহুবিবাহ' সে যুগের হিন্দুসমাজে এক কুৎসিৎ প্রথা। বহুবিবাহ বন্ধ করবার চেষ্টায় তখন মেতে উঠেছেন বিদ্যাসাগর। প্রথমে গভর্ণরের কাছে আবেদন পাঠালেন বহু বিবাহকে আইন-বিরুদ্ধ ঘোষণা করবার চেষ্টায়। এই আবেদনপত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারানাথও তাঁর স্বাক্ষর দিলেন। বিদ্যাসাগরের কথার প্রতিধ্বনি করেই তারানাথ বললেন যে এ কুৎসিত জঘন্য হীন প্রথা। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হ'ল না। হিন্দুসমাজ 'বহুবিবাহ' প্রথার উচ্ছেদ মেনে নিতে রাজী নয়। ইংরেজ-শাসকেরা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে সাহসী হ'লেন না। তখন বিদ্যাসাগর জনমত গঠনের জন্য কলমধারণ করলেন এবং আবার শাস্ত্রের মধ্যেই শাস্ত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

বলাবাহুল্য সে যুগে মানুষের মনে যে ভাবে সংস্কার ও ধর্মান্ধতা বাসা বেঁধেছিল, তাতে কোন কু-প্রথাকেই দূর করা সম্ভব ছিল না, যদি না শাস্ত্রের সমর্থন তুলে দেখানো যেত। বিদ্যাসাগরও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মনুর যে শ্লোক উদ্ধার করলেন—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীণাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তিনাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রানাং সা চ স্বাচঃ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ॥

তাঁর প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দিলেন—ধর্মকর্মের জন্য স্বজাতীয়া পত্নীর একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার জন্য স্বজাতীয়া পত্নী হ'তেই পারেনা, ভিন্নজাতীয়া পত্নী চাই। কলিযুগে জাত্যান্তর বিবাহ অশুদ্ধ, কাজেই বহুবিবাহও অশুদ্ধ।

এই ব্যাখ্যাতে কিন্তু তারানাথ খুশী হ'লেন না। তাঁর মতে—প্রত্যেক জাতির পক্ষেই প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ করা একান্ত আবশ্যক ও অবশ্য কর্তব্য। পরে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার জন্য ইচ্ছে হ'লে স্বজাতীয়া বা ভিন্ন জাতীয়া কন্যা গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারানাথ বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখে বললেন—বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কখনও নয়।

এই প্রবন্ধই দুই বন্ধুর সম্পর্কে ফাটল ধরালো। বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুস্তক ছাপালেন এবং তর্কবাচস্পতির প্রবন্ধের উল্লেখ করে যা' লিখলেন বলাবাহুল্য তার দ্বারাই দুজনের মধ্যে স্থায়ী মতান্তরের সৃষ্টি হ'ল। বিদ্যাসাগর লিখলেন—

"তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন, এবং কখনও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "তৎসমুদায়ই অপসিদ্ধান্ত।"

"অনেকেই বলিয়া থাকেন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়েকটি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"

একই সময়ে কিছু বেনামি রচনায়ও তারানাথকে অশালীন ভাষাতে ব্যক্ত করা হয়। এই বেনামি রচনাগুলির ভাষা এত লঘু এবং প্রয়োগভঙ্গি এতই শ্লেষাত্মক যে এগুলি যে বিদ্যাসাগরের নয় এ বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। বিদ্যাসাগরের মত প্রখর আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কোন অশালীন উক্তি করা সম্ভব নয় ব'লে আমরাও মনে করি। বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী তৎকালীন কোন সাহিত্যিকেরই রচনা ছিল ও'গুলি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও তারানাথের মধ্যে সকল সংস্রব ছিন্ন হ'ল। এমন কি সাধারণ বাক্যালাপও রইলো না।

১৮৮৫ সালে তারানাথ তর্কবাচস্পতির মৃত্যু হয়। সে সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেলেন। বলেন—"ভারত পণ্ডিতশূন্য হইল।"
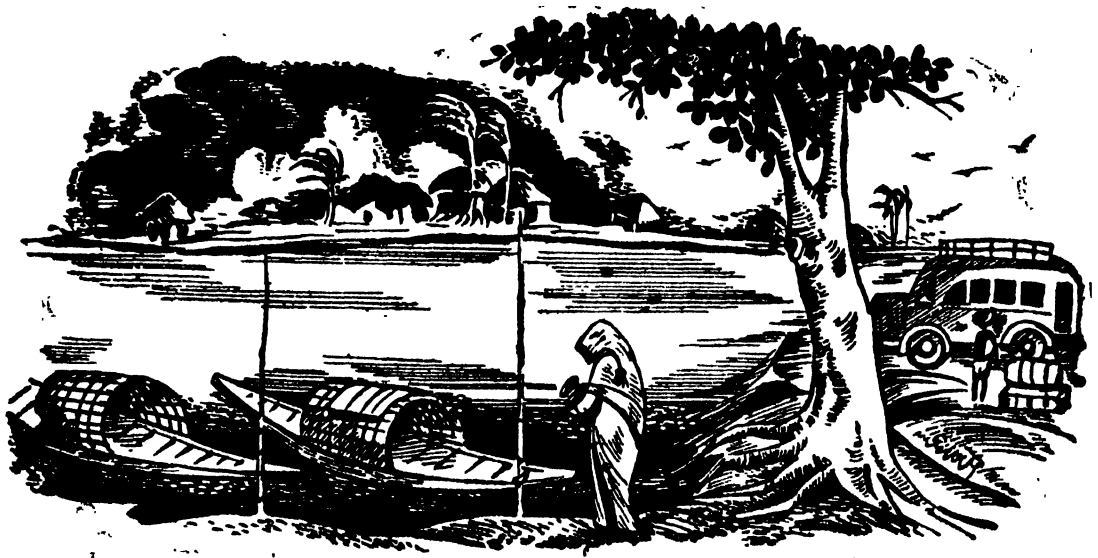
ভারতী ব্রেল

পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কথায় বলে চোখে দেখে শেখা। এ প্রবচনের একটা মানে যা আমরা বুঝি তা হলো যে এই চোখের দৃষ্টির সাহায্যে আমরা লিখতে, পড়তে, কাজ করতে, এক কথায় এই পৃথিবী এবং জীবনকে পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে পারি। কিন্তু যাদের চোখে আলো প্রবেশ করে না, তাদের বেলায় কিন্তু এ মানে খাটে না। এদের সংখ্যাও ত কম নয়। অনেকে মনে করেন এক পশ্চিম বাংলাতেই নাকি প্রায় দুলাখ, আর সারা ভারতে পঁয়তাল্লিশ লাখ লোক দৃষ্টিহীন।

দৃষ্টিহীনতাকে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই ভগবানের অভিশাপ বলে গ্রহণ করেছে। তা'হলেও মানুষ কিন্তু এর কাছে নতি স্বীকার করেনি। উপনিষদের গল্পেও দেখি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে দৃষ্টি দেহ থেকে বিদায় নিয়ে বৎসরান্তে ফিরে এসে দেখলো মানুষটা বিকল হয়নি। নতুন পরিস্থিতিকে সে নিজের বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত করে জীবন অব্যাহত রেখেছে। দৃষ্টি পরাজয় স্বীকার করল।

গল্পের মানুষ শুধু নয়, পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষও হার মেনে নেয়নি। তাদের অনেকে আবার সমাজের শীর্ষস্থানও দখল করেছে—নানা বিদ্যায়, নানা কর্মপটুতায়। হেলেন কেল্লারের নাম কে না জানে। ডাঃ এস, রায় আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার, শ্রীবেদ মেতা, আমেরিকা প্রবাসী প্রখ্যাত সাংবাদিক, ডাঃ আর, টি ভিয়াস বোম্বের ভারতীয় জাতীয় দৃষ্টিহীন সমিতির ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সাধন গুপ্তের কথা কার না মনে হবে, প্রখ্যাত 'শুকতারার' সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, কলকাতার অদূরে নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমীর অধ্যক্ষ গোপীনাথ দাঁ, এম, এ। এমনি আরও কত নাম যোগ করা যায়।

তবে একটা কথা অবশ্যই মানতে হবে এবং তা হচ্ছে এই যে লিখতে পড়তে না শিখলে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ খুবই দুরূহ। আরও একটা দিক আছে। দৃষ্টিমান লোকেরা যেমন দশটা কাজ করে, ঘুরে বেড়িয়ে, আর প্রকৃতির বৈচিত্র্য দিয়ে নিজের জীবনকে ভরে তুলতে পারে, অপর দিকে দৃষ্টিহীনরা একেবারে নিঃসঙ্গ বলতে গেলে। লেখাপড়া না জেনে, হাতে কলমে কাজ শিখে হয়ত নিজের পেট পালবার শক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তা দিয়েই মনকে ভরে রাখা যায় না। এদিক থেকে দেখলে, এদের কাছে পঠন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া দৃষ্টিমান মানুষের চাইতেও কিছু বেশী। অবশ্য এ কথার মানে এই নয় যে দৃষ্টিমান লোকের বেলায় লেখাপড়ার গুরুত্ব কিছু কম আরোপ করছি।

শিক্ষা-জগতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপই হ'ল অক্ষর-পরিচয়। দৃষ্টিহীনদের বেলায় এ অক্ষরপরিচয়ের পদ্ধতি নিয়ে হয়ত মানুষ অনেকদিন থেকেই ভেবে আসছে কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে প্রথম অবদান আসে ১৭৮৬ খৃঃ ভেলেনটিন হঁয় (Velenline Hany) নামক এক ফরাসী সমাজসেবী এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন দৃষ্টিহীনদের জন্য প্যারী নগরীতে—ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর সহায়তায়। সে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা। তারপর তিন বছর পার হতে না হতেই, ১৭৮৬ খৃঃ, একদিন একখানা সদ্য মুদ্রিত কাগজ হাতে পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ফ্রাঙকুই লেছেউর (Francois Lesuuer) অনুভব করল যে অক্ষরগুলি পড়তে পারছে। সদ্য মুদ্রিত কাগজের উল্টো পিঠে অক্ষর-

গুলি জেগে ওঠায় তার ওপর হাত বুলিয়ে অক্ষরগুলি চিনতে পেরেছিল। ভেলেনটিন সাহেবের মন নেচে উঠল। গড়ে তুললেন দৃষ্টিহীনদের মত করে বাঁকা হরফের উঁচু উঁচু ধরণের বর্ণমালা। তখন বাঁকা হরফেরই প্রচলন ছিল।

কেউ কোন কিছু প্রবর্তন করলেন আর সবাই মিলে তা মেনে নিয়ে কাজ শুরু করলেন, এ বড় একটা হয় না। এক্ষেত্রেও তা হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই লণ্ডনের ডাঃ এডমণ্ড ফ্রাই (Edmund Fry) প্রবর্তন করলেন সহজ বড়হাতের রোমান হরফ। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন ব্রাইটনের ডাঃ উইলিয়ম মুন (Dr. William Moon)

এ সব বিবর্তন চলাকালীন আর একজন মানুষও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তিনি হলেন লুই ব্রেল। তিনি দৃষ্টিহীনের জন্য ছটি বিন্দুর সাহায্যে যে-লিপি প্রবর্তন করেন তা আজ সারা দুনিয়ায় গ্রাহ্য। ⠿ ওপর নীচে তিন এবং পাশাপাশি দুটি এই যে ছয়টি বিন্দু একে ৬৩ বিভিন্নভাবে সাজানো যায়। এবং এরই উপর প্রতিষ্ঠিত আজ যা ব্রেললিপি নামে খ্যাত।

লুই ব্রেল জন্মগ্রহণ করেন প্যারী থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে কুল্রে গ্রামে, ১৮০৯ খৃঃ, ৪ঠা জানুয়ারী। জন্ম মুহূর্তে কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। মাত্র তিন বছরের মাথায় নেমে এলো দৈবের নির্মম আঘাত। এক দুর্ঘটনায় তার দুটি চোখই বিনষ্ট হল। পিতামাতা প্রমাদ গুনলেন। কিন্তু দৃষ্টিহীনের শিক্ষা-জগতে যে বিপ্লব আনলেন তার লিপির সাহায্যে তা করল তাকে অবিস্মরণীয়।

দশ বছর বয়সে তিনি ভর্তি হলেন পূর্বোক্ত ভেলেনটিন সাহেবের স্কুলে। সাত বছর পরে তিনি ঐ স্কুলেই শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। তিনি নিজে অবশ্য বাঁকা হরফেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। তার মন কিন্তু খোঁজ করছিল আরও সরল কিছু যার উপর আঙুলের স্পর্শদ্বারা পাঠ আরও সহজ হবে।

ঠিক এই সময় তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল বারটি বিন্দুর সাহায্যে সাঙ্কেতিক বার্তা প্রেরণের এক পদ্ধতির প্রতি। ফরাসী সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী বিভাগের সিগন্যাল কোরের ইঞ্জিনিয়ার অফিসার চার্লস বার্বিয়ের (Charles Barbier) এই সাঙ্কেতিক বার্তার আবিষ্কর্তা। ব্রেল দেখলেন যে তিনি মাত্র ছটি বিন্দু নিয়েই নিজের স্বপ্ন সফল করতে পারবেন। করলেনও তাই। সৃষ্টি হল দৃষ্টিহীনের পড়া ও লেখার উপযোগী বর্ণমালা।

এ হলো উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। তারপর একে নিয়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা, এবং ইউরোপের মধ্যে প্রায় একশত বৎসরব্যাপী বিবাদ-বিরোধের পর ইংরেজী ব্রেল স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৩২ সনে।

এ ত গেল পশ্চিম গোলার্ধের কথা। ভারতবর্ষেও ব্রেললিপি প্রবর্তনের ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আলাদা আলাদা ভাষাভিত্তিক প্রায় সাত রকমের ব্রেল-লিপি এক সময় চালু হয়েছিল। ক্রমে অনেকেই বুঝতে পারলেন এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। চলতে লাগল সলা-পরামর্শ, সভা সমিতি। এ ঐক্য ব্যবস্থার রূপায়নে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে স্বনামধন্য স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বেরুটে ব্রেল কাউন্সিলের যে সভা হয় তাতে ভারতবর্ষের জন্য একটীমাত্র ব্রেললিপি স্বীকৃতি লাভ করে। তারই নাম আজ ভারতী ব্রেল।

ব্রেল লিপি কণ্ঠধ্বনির (Phonetic) উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যেসব ভারতীয় এই ভারতী ব্রেলে শিক্ষালাভ করছেন তাদের পক্ষে অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক ভাষায় শিক্ষালাভ করা তেমন শক্ত হবে না। কেননা, তারা আবার নতুন করে কোন বর্ণমালা শিখতে বাধ্য হবেন না।

ভারতী ব্রেল স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ '৫১ সনেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হল দেরাদুনের 'সেনট্রাল ব্রেল প্রেস'। সরকারী তদারক ও তহবিল ছাড়া

ব্রেল প্রেস অসাধ্য না হলেও দুরূহ। কারণ ব্রেল লিপি অনুযায়ী পুস্তকমুদ্রণ আর সাধারণ পুস্তক মুদ্রণের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। দৃষ্টিমানদের পাঠোপযোগী বই ছাপান হয় কাগজের ওপর কালির দাগে। দৃষ্টিহীনের পড়ার বই ছাপতে কাগজ প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাতে থাকেনা কালির আঁচড়। তার বদলে কয়েকটি বিন্দু-সংখ্যায় ছটির বেশী কখনও নয়—কাগজের ওপর মাথা উচু করে থাকে। তারই ওপর আঙুল চালিয়ে দৃষ্টিহীনরা পড়াশুনা করে থাকে। দ্বিতীয়, মুদ্রণের জন্য যে কাগজ ব্যবহৃত হয় তা এক ধরণের বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী পুরু কাগজ। এ কাগজ এখন পর্যন্ত বিদেশ থেকেই আসে। তবে আশার কথা এই যে দেরাদুনের বন-গবেষণামন্দিরে (F.R.I.) নানা পরীক্ষার পর আমাদের দেশেই এমনি কাগজ তৈরীর কাঁচামাল ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অচিরে আমাদের দেশ আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে বলে আশা করা যায়। তৃতীয়, ব্রেল-লিপি মুদ্রণ খুবই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং সেই ব্যয় মিটিয়ে বইএর দাম যা দাঁড়ায় তাতে এ সমস্ত বই দৃষ্টিহীনের নাগালের বাইরে চলে যাবে। সে কারণে, সেন্ট্রাল ব্রেল প্রেসে মুদ্রিত পুস্তক আসল দামের মাত্র এক তৃতীয়াংশে বিক্রয় করা হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে এমনি লোকসানের পসরা বহন ক্ষমতা যে নেই তা বলা যায় না, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা দুর্লভ।

কাগজ ছাড়া আর যা প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে দস্তার পাত। এই পাতের ওপর টাইপরাইটিং পদ্ধতিতে ছাপার বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হয়। এটাকেই প্রুফ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রুফ পরীক্ষায় একজন দৃষ্টিহীন আঙুল চালিয়ে পড়ে যান আর তা মিলিয়ে দেখার জন্য থাকেন একজন দৃষ্টিমান ব্যক্তি। ভুলচুক মিটিয়ে নিয়ে ঐ দস্তার প্রুফ পাতখানা পুরু কাগজে চাপ দিয়ে বিষয়বস্তু মুদ্রিত করা হয়। দস্তার পাতে প্রুফ তৈরী এবং পরে তা মুদ্রণের জন্য বিশেষ ধরণের যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়।

ছাপার পর হয় বই বাঁধাই। সাধারণত দৃষ্টিমানেরাই এ কাজে নিযুক্ত, যদিও একজন দৃষ্টিহীনও এদের সহায়ক আছেন।

দেরাদুনের কেন্দ্রীয় ব্রেল প্রেস পরিচালন ব্যাপারে একজন অধিকর্তা ছাড়াও আছেন একজন সম্পাদক। সাধারণ ছাপাখানার তুলনায় এখানে সম্পাদকের একটা বিশেষ দায়িত্ব ও ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। কারণ, ব্রেললিপি কণ্ঠধ্বনির ওপর নির্ভরশীল বলে বিষয়বস্তুকে ব্রেল অনুগ করে সাজাতে হয়। যে সমস্ত পুস্তকে কোন ছবি বা চিত্রের কথা উল্লেখ থাকে তা বাদ দিতে হয় এবং এমনভাবে বিষয়বস্তুকে পুনর্বিন্যাস করতে হয় যাতে পাঠ্যবস্তু সমভাবে বোধগম্য থাকে। এ সব করার পরই কোনকিছু যেতে পারে যন্ত্রের কাছে দস্তার পাতে প্রুফ তৈরীর জন্য।

কোনকিছু ছাপার ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার মধ্যে প্রথম কথাই হল প্রয়োজন। যে বিপুলসংখ্যক দৃষ্টিহীন ভারতবর্ষে আছেন তাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে বই তুলে দিতে হলে জানার প্রয়োজন তাদের শিক্ষার স্তর, এবং ব্যক্তিগত সামর্থ। এ বিষয়ে প্রথমেই ভাবতে হয় ছাত্রছাত্রীর কথা। সারা ভারতে পাঁচশতেরও বেশী ছাত্রছাত্রী কেবল স্কুল ফাইনাল বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা প্রতি বছর দিয়ে থাকে। উচ্চ পর্য্যায়ের পরীক্ষাও অনেকে দেয় এম. এ. পর্য্যন্ত। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের ওপর প্রথম প্রাধান্য দে'য়া হয়। পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে বিজ্ঞান ও ভূগোলও আছে। সাধারণভাবে মানচিত্রের জ্ঞানও যাতে হয়, ছাপার মাধ্যমে তারও ব্যবস্থা আছে।

এর পরই ভাবতে হয় সাধারণ পড়ার বইএর কথা যা মেটাবে মনের ক্ষুধা, হবে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে আলোর সাথী। মুদ্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলে এ বিষয়ে বই বাছাই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া যে সমস্ত বই ব্রেলে মুদ্রিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, স্বামী বিবেকানন্দের উত্তিষ্ঠত জাগ্রত,

এবং বিপ্লবী সাভারকরের লেখা পুস্তক। এ ছাড়াও বর্তমানে হাতে নিয়েছেন এরা তুলসীদাসের রামায়ণ ও গান্ধী-গীতা। দৃষ্টিহীনের জীবনে এমনি ধরণের বইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বোধহয় কাউকেই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

বিষয়বস্তু এবং পুস্তক বাছাইএর ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। এবং তা' হচ্ছে বইএর মাপ। লম্বা-চওড়ায় বইগুলি ১০ ইঞ্চি.× ১৩ ইঞ্চি। কাগজ বেশ পুরু। প্রতি অক্ষরের সঙ্কেত চিহ্নও বেশ বড়। সুতরাং সাধারণ মাপের বইও ব্রেল-পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে ২।৩ খণ্ডে ভাগ করার প্রয়োজন হয়।

দেরাদুনের কেন্দ্রীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকের চাহিদা যে কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা' নয়। আমেরিকা, ব্রেজিল, পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, নেপাল, লঙ্কা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে যেখানেই আমাদের লোক আছে দৃষ্টিহীন তাদের জন্য বই পাঠাতে হয়। এছাড়া আছে পাকিস্তানের চাহিদা। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয়না এ ছাপাখানার উপর চাপ কতখানি। অথচ বছরে তিরিশটীর বেশী বই ছাপানো সম্ভব নয়। এবং প্রত্যেক বইএর প্রায় এক হাজার করে কপি ছাপানো হয়। এ পরিসংখ্যান কিন্তু বিদেশীর তুলনায় অনেক বেশী প্রশংসার দাবী রাখে। কেন না, তারা নাকি আড়াই-শতের বেশী ছাপাতে পারে না। নতুন নতুন বই ছাড়া আবার অনেক বইয়ের পুনর্মুদ্রণও করতে হয়। সেই একান্ন সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ২৫০ শত বইয়ের ৬৫,০০০ কপি ছাপানো হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি বছর একটি ব্রেল ক্যালেণ্ডার ছাপান হয় এবং একটী ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্রিকা নাম—'নয়ন রশ্মি'।

এখন পর্য্যন্ত ভারতের দশটী ভাষায় ব্রেল পদ্ধতিতে বই ছাপা হয়। এগুলি হল—বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী ও মারাঠী।

দৃষ্টিহীনের সংখ্যার তুলনায় বই খুবই কম। তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বইএর চাহিদা এবং দেরাদুন কেন্দ্রের উপর ক্রমেই চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ১৯৬৭ সনে একমাত্র উত্তর প্রদেশ সরকারই কুড়ি হাজার টাকা দামের বইএর অর্ডার দিয়েছে। ভারতের সব রাজ্য থেকেই এমনি ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা আসছে এই দেরাদুন কেন্দ্রের কাছে।

এ সমস্ত বিবেচনা করে ভারত সরকার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা সংস্থার সহায়তায় আরও তিনটী মুদ্রণ কেন্দ্র' খোলার আয়োজন করেছেন পশ্চিমবাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। দেরাদুনের মুদ্রণসংস্থা অবশ্য সকলের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে থাকবে। এই নতুন কেন্দ্রগুলি সাধারণত আঞ্চলিক ভাষায় বই ছাপাবার কাজ করবে। পশ্চিম বাংলার কেন্দ্রটী করবে বাংলা, উড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষায়।

পশ্চিম বাংলার জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্রটী স্থাপিত হচ্ছে কলকাতার অদূরে নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমির পরিপূরক হিসেবে। এ ছাপা-খানার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশ্রমের স্বামী অক্ষরানন্দজী বিশেষ উৎসাহী এবং সহায়ক।

মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করা যায়, কিন্তু লেখবার সমস্যা তাতে মেটে না। তার জ ভারত সরকার এ কেন্দ্রের ছাপাখানার পাশেই ১৯৫৪ সনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক কারখানা যেখানে তৈরী হয় লেখবার জন্য ব্রেল স্লেট, পকেট ফ্রেম, ব্রেল টাইপরাইটার, ব্রেল সর্টহাণ্ড টাইপ রাইটার ইত্যাদি। তবে টাইপরাইটারের মত যন্ত্র কজন লোকের সাধ্য আছে কিনতে পারে। এই ব্যক্তিগত সাধ্যের কথায় এসে একটা কথার উল্লেখ না করে পারছি না। ব্রেল-পদ্ধতি দৃষ্টিহীনকে জ্ঞানের রাজ্যের চাবিকাঠি এনে দিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে যে সংকেতের উপর আঙুল চালিয়ে পড়বার কুশলতা নাকি বেশ কিছু শতাংশ লোক অর্জন করতে পারে

না। সুতরাং অনেকেই মনে করেন এমন কোন উপায় বার করতে হবে যা সকলে আয়ত্ত করতে পারে। অথচ পদ্ধতিটি এমন হওয়া চাই যা সকলের কেনার সাধ্যের মধ্যে থাকে। কেননা, এমনিতেই ত আমরা গরীব দেশের মানুষ। তার ওপর যে সমস্ত কারণে মানুষ দৃষ্টিহীন হয় তার মধ্যে পুষ্টিহীনতা নাকি একটা প্রধান কারণ। এ ব্যাপারে পশ্চিমে সবাক পুস্তকের প্রচলন আছে। এগুলি অবশ্য আসলে ১২ ইঞ্চি গ্রামোফোন রেকর্ড। ছাপার হরফে সাধারণ মাপের বইও বেশ কিছু সংখ্যক রেকর্ডের সমষ্টি। সুতরাং ভারতবর্ষে এমনি ধরণের সবাক পুস্তক কতখানি কার্যকর হবে ব্যক্তিগত জীবনে না ভেবে দেখবার মত। তবে সর্বাত্মক প্রগতি ও অনুসন্ধানের প্রতি আজ মানুষ যেভাবে ঝুঁকে পড়েছে তাতে লিখন, পঠনের ব্যাপারে দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীনের মধ্যে পার্থক্য অদূর ভবিষ্যতে লোপ পাবে এমনি আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

রাজ্যসত্য-অর্দ্ধসত্য

জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাজ্য রাখতে হ'লে "সত্য" রাখা যায় না। আর "সত্য" পালন করতে গেলে "রাজ্য" লাভ হয় না, রাজত্ব করা যায় না। এ "সত্য" ত্রেতা যুগের রাম রাজ্যেও হয়েছিল। রাম সত্য রাখার জন্য বনবাসী হলেন। রাজ্য ত্যাগ করতে হল। আবার শেষজীবনে রাজ্য রাখা বা লাভের জন্য "সত্য" (সতী) উপেক্ষিত হলেন। রাজ্য বজায় রইল। এর রফা হয়না কখনো।

এ কালের রাম রাজ্যেও এই পন্থা অনুসৃত হচ্ছে।

আমি খাদ্যনীতিতে সত্যাসত্যের তথ্যের কথাই সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করছি।

সকলেই জানেন সংখ্যা-শাস্ত্রের (ষ্টাটিস্‌টিক্‌স) গড় হিসাবের কথা। "গড়ে" কত মানুষের আয়ু, গড়ে কত আয়।

গড়ে কত তাদের ধন সম্পদ, কতটা তারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান গড়ে, কতটা ইত্যাদি ইত্যাদি। "গড়ের" গজ কাঠি সব মেপে রেখেছে পণ্ডিতরা জানেন।

আমাদের রাম রাজ্যে লোকের আয়ু গড় হিসাবে ৩৪।৩৭ বছরের কোঠায় বেড়েছে। আগে ছিল ২৩।২৪এ। ধন দৌলতও বেড়েছে তেমনি গড় হিসেবে। কোটিপতি থেকে আমরা কুটীরবাসী আয় সকলের দৈনিক ৩০ বা ৪৭ নয়া পয়সা। দৈনিক পাঁচ আনা থেকে সাত আনা। এই নিয়ে ১৯৬৪ সালে বহু বিজ্ঞ 'মহান' কংগ্রেসী ও বিরোধী দলে বিতর্ক হয়। তাঁদেরও ত গড় আয় সাত আনা মাত্র গড় হিসেবেই ধরতে হবে।

মনে পড়ছে ঔরংজেবের টুপী সেলায়ের পয়সায় জীবিকা অর্জ্জনের ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ভোগের কাহিনী। রাণা প্রতাপের বংশধরদের সোনার থালার নীচে শুকনো কুটো খড় রেখে পূর্ব্বপুরুষের বনবাসের প্রতীক উপাসনা। এসব গড় পুণ্য অর্জনের কথা এখন থাক!

গড়ের ভুল ধরার সাধ্য কোনও মানুষের নেই। ওসব পণ্ডিত বাক্য।

খাদ্য বিষয়ে আমার নিতান্তই স্বল্প অভিজ্ঞতা। তাও অন্তঃপুরের অন্তরালে থেকে জানা ও শোনা। তীর্থপথে দেখা। দেশভ্রমণে পিতা পতি পুত্রের ভাইদের স্বজনের কর্ম্মক্ষেত্রে বাসের সময়ে দেখা। কথা কীর্ত্তনের আসরে সর্ব্বশ্রেণীর নারীদের সঙ্গে আলাপে পরিচয়ে দেখতে শুনতে ও জানতে পাওয়া।

তবে আমার বক্তব্য হ'ল সব দেশের সাধারণ মানুষের নিত্যখাদ্য তথ্যের কথা। অবশ্য আমি যে কটা দেশের কথা জানি। অন্যগুলি আপনারা বিদ্বান পণ্ডিতরা "গড়" কষে দেখে নিতে পারবেন আশা করি।

প্রথমে বলি আমার জন্মভূমি রাজস্থানবাসীদের সাধারণ আহার্য্য খাদ্যের কথা। আদম সুমারীর রিপোর্ট মেয়েরা দেখেন না। কিন্তু দেশের কোটি কোটি লোক সমাজ যে দীনদরিদ্র তা তাঁরা দেখেছেন। দেখতে পান।

সবকালের শিশুদের মতই আমাদেরও বাল্য-সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা ছিল বেশীর ভাগই দরিদ্র দীন দরিদ্রস্তরের মানুষ। রাঁধুনী ব্রাহ্মণ দাসদাসী ভৃত্যদের সন্তান ঘোড়া গরুর রক্ষক, গোয়ালা, মহিষ, ভিস্তি মেথরদের মজুর মুচি কর্ম্মকারের সন্তানরা সবাই আমাদের বন্ধু ছিল।

তখন তাদের পিতামাতার বেতনের হার পুরুষদের ৬।৮ টাকা অবধি। নারীদের ২ টাকা ৩ টাকা ৪ টাকা।

তাদের ঘর ভাড়া দু আনা চার আনা। বিছানা ছেঁড়া কাঁথা। শীতে তুলোর জামা গরমে অর্দ্ধনগ্নকায়, মাথায় পাগড়ী। এই তাদের পরিচ্ছদ ও আয় ?

এই শ্রেণীর প্রধান খাদ্য বারমাস ছিল যব। তখন যব টাকায় একমণ। তারও বেশী সু-কালে। অ-কালে ১০।১৫ সেরে নেমে যেত। মোটা মোটা ⁄৴। ⁄৷৷ পোয়া ওজনের একখানি দেড়খানি রুটি একটু ডাল বা আচার কিম্বা সবচেয়ে সস্তা কোনো সজীর তরকারী তারা খেত। ওদের মধ্যে একটু ভাল অবস্থায় কর্মচারী দলেরাও ঐ রুটিই খেতেন একটু ঘি মাখিয়ে। কথনো কথনো গমের তৈরী রুটিও খেতেন। এছাড়া আরও তিন চারটি সস্তা অতি সুলভ শস্য কয়েকটা খাওয়ার প্রথা আছে। যার নাম হলো মক্কা (ভুট্টা), জোয়ার, জনার বাজরা। এগুলো সাধারণতঃ যেমন পশু খাদ্য, তেমনি যারা সাধারণ লোক তাদেরও খাদ্য। সখ করে ও সস্তায় রোগে অসুখে প্রয়োজনে ওই সব শস্যের খাদ্য খিচুড়ী (দলিয়া) এবং হালকা রুটি। সে খিচুড়ি প্রায়ই ডালহীন। এবং ডালও যেটা ওদেশেসাধারণ লোকের আহার সেটি মুগও নয়। অন্য ডাল নয়, তার নাম হলো চঁওলা মোঠ। সেটা সেন মন্ত্রী আমলে "রাজস্থানী মুগ" নামে বাজারে চালানো হয়েছে। এই মোঠ আর চঁওলা দুরকম ডালই জনতার খাদ্য। যার মণ ছিল বার আনা বা এক টাকা। অতি সস্তা। যব গম ও ছোলা সমান ভাগে কোনো আটার রুটিও খায়। তাকে বলে বেজড় আটা।

রাজস্থানী রাজপুত, ব্রাহ্মণ, বেনিয়া, ক্ষত্রিয় সম্পন্ন ঘরের মানুষরাই শুধু গমের রুটি খেতো। কদাচ কখনো যব, গম, ছোলা ও ভুট্টার আটার রুটিও খেতেন। বাকী সর্ব্বসাধারণের খাদ্য অবস্থা হিসাবে একবার, দুবার, তিনবার বা চারবার ঐ যবের জোয়ারের জনায়ের বাজরা ভুট্টার রুটি। রাজপুত ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শ্রেণীরা, জৈনরা কঠোর নিরামিষাশী সম্প্রদায়। মনে রাখতে হবে গম নয়, চাল নয়, মুগ মসুর ডালও নয়। গম বা চাল ওদের নিত্য খাদ্য নয়। আমরা তাদের কারুর কারুর ঘরে ছোটবেলায় খুসীমনে সেই সব রুটির ও যবের রুটি খেয়ে এসেছি। আদর করে খাইয়েছে তারা মনিব সন্তানদের।

এখানেও গমের ও চালের চুয়াল্লিশ কোটির মানুষের খাদ্যের গড় হিসাব রাম রাজ্যে রাজ্যরক্ষা ও সত্যরক্ষার মতই বিপরীত "গড়" সত্য।

এই রাজস্থানের আশে পাশের গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের অনেকটা জায়গায় (পাঞ্জাবের কিছুটার) খাদ্য ও এই ধরণের নানা শস্য। কচ্ছ গোয়ালিয়র, ইন্দোর আদি দেশের দীনহীন মানুষ রাজস্থানী ধরণের খাদ্যেই অভ্যস্ত।

মধ্যপ্রদেশবাসীদের মাঝখানে আছেন বহু আদি-বাসী। যে দেশের একদিকে উড়িষ্যা সীমান্ত, অন্যদিকে অন্ধ্র, আর একদিকে মহারাষ্ট্র। এই রকম সব জায়গায় প্রায়ই দেখা যায় যারা যে প্রদেশ সীমান্তের কাছাকাছি বাস করে প্রায়ই সেই এ দেশের আহার, ব্যবহার আচার বিচারে অভ্যস্ত হয়। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা ও অন্ধ্রদেশের লোকদের মত চালভোজী আছে। মহারাষ্ট্র দেশে মিশ্র শস্যভোজী। চাল গমসহ গুজরাটি শস্য। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীরা প্রায় বনবাসী অরণ্যবাসী। তারা বন অরণ্য পুড়িয়ে গ্রাম বা বাসস্থান বানায়। বন্যশস্য নিকৃষ্ট ধরণের "কাহণ চাল," বাঁশের ধান রোপণ বপণ করে। প্রায় সব রকম জীব জন্তুর মাংস নির্ব্বিচারে খায়। ছাগল, ভেড়া, মুরগী, শূকর পালন করে। তাছাড়া তারা জীবিত এবং সহজভাবে মৃত পশুদের মাংস ও সাধারণ সহজ আহার্য্য ভাবেই খায়। এদের কথা ভেরিয়ার এলুইন সাহেবের লেখায় পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপত্যকায় আর অতি গভীর অরণ্যে বাস এদের। সভ্য মানুষকে খুব ভয় করে। পছন্দ করে না। অনেকটা যাযাবর-ধর্মী জীবন যাত্রা। বন পুড়িয়ে অরণ্য কেটে কিছুদিন বাস করে। খাদ্য জীব বা শস্য না পেলে অথবা অপছন্দ হলে সবান্ধবে সে জায়গা ছাড়ে। কেনা শস্য প্রায়ই খায় না।

মোট কথা সভ্যজগতের খাওয়া বা পরিচ্ছদের ধার ধারে না। গম, চাল, খায় না। গড় হিসাবে বললেও

চাল, গম প্রধান খাদ্য এদেরও নয়। ঠিক সংখ্যায় এরা কত বলতে পারব না। কিন্তু কম নয়। এরাই দণ্ডকারণ্যের চিরবাসী বা আদি মানুষ। বসন ভূষণ অতি যৎসামান্য। খুব ঘোরতর অরণ্যবাসীরা সভ্য মানুষ দেখলেই পালায়। এ তথ্যও পাওয়া যায় পর্য্যটক মানুষের কাহিনীতে।

এবারেই ইউপির খাদ্য। এই উত্তর প্রদেশটি ইংরাজ আমলে সংযুক্ত প্রদেশ নামে ছিল এবং সে নামই এর ঠিক ঠিক নাম। রামরাজ্যে উত্তর প্রদেশ নামটা অর্দ্ধসত্য। ঠিক নয়। আগ্রা, অযোধ্যা, মীরাট, নাইনিতাল, কেদার বদরিধাম, হরিদ্বার, আলমোড়া আবার কাশী, প্রয়াগ লক্ষ্ণৌ নানা সভ্যতা নিয়ে একটা বিরাট প্রদেশের কাণ্ড বিশেষ। কতরকম আচার আকার প্রকার আহার, যে দেখে চমৎকৃত হতে হয়। একদিকে হিমালয় পাহাড় ও তার উপত্যকা প্রদেশ, অন্যদিকে সুজলা সুফলা গঙ্গা যমুনার তীরবর্ত্তী গাজিয়াবাদ, রুড়কী মীরাট প্রয়াগ কানপুর কাশী আদি বিশাল নগর জনপদগুলি কাটা খাল ক্যানাল নদীতে ভরা।

এই মিশ্রিত প্রদেশীয় এদের খাদ্য কি? কোনো খাদ্যমন্ত্রী অথবা কোনো কৃষিমন্ত্রী অথবা কোন প্রধানমন্ত্রীও—একমাত্র খাদ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় রফি আমেদ কিদওয়াই সাহেব ছাড়া— কোনো খবর রাখেন নি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঐ সব প্রদেশের তাঁরা অধিবাসী হলেও। গরীবের কুঁড়ে ঘরের হাঁড়ির খবর হারুণ অল রসিদের পর কোনো রাজা বা মন্ত্রী রাখেন নি। এরা যারা আগ্রা কানপুর, মীরাট সমতল অঞ্চলের অধিবাসী—সাধারণ গৃহস্থরা নানা শস্যের রুটিই খান বেশীর ভাগ। সম্পন্ন ঘরে ভাত খাওয়া হয় মাঝে মাঝে। শীতকালে নয় কিন্তু। রাজস্থানের সীমান্তভাগের বাসিন্দারা যবের রুটিই খায় বারো-মাসের আট মাস। মাঝের চার মাস শীতকালে বাজরা জোয়ার ভুট্টার আটার রুটি এবং দলিয়ার খিচুরী (ডালহীন) খাওয়ার প্রথা আছে। এই সব শস্যের খইকে মিলা, এবং 'ফুল্যা' বলে। তাও দীনহীন লোকে জলযোগ করে। আকালের অভাবের দিনে একবেলা খেয়েও থাকে। 'গড়' ভারতের ।/ আনা রোজগারী দীন মানুষ দুবেলা রান্না করে খেতে পারনা। সস্তা খাদ্যও।

এই উত্তর প্রদেশের বিহার সীমান্তবাসীরা অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ প্রদেশের লোকেরা বিহারের মতই ডাল ভাত এবং মডুয়া রাগীর তৈরী (এক রকম কালশস্য চট চটে আটা হয়) রুটি খায়। কাঁচা ছোলা মটর, কাঁচা মুলো, রাঙ্গালু, সুথনি নামে একরকম কচু সিদ্ধ ও শস্য অন্নের বদলে একবেলা গ্রামাঞ্চলে খায়। আর উত্তর প্রদেশের যে দিকটি পাঞ্জাবের সীমানায় পড়ে কুরুক্ষেত্র কর্ণাল ইত্যাদির পাশে তাদের আহার্য্য সাধারণতঃ গম। কাঁচাছোলা অন্য শস্য এবং ভুট্টা জাতীয় শস্য দরকার ও অভাবের দিনে। ভুট্টা জোয়ার, গাছ ছোলা পোড়া, কাঁচা মুলো, রাঙ্গালু, কচু সিদ্ধ ইত্যাদিও খায়।

উত্তর প্রদেশে (যুক্ত প্রদেশ) সব জায়গার খাওয়া একরকমের নয়। এর পাহাড় অঞ্চলের খাদ্য—যতদূর দেখা যায় নিজেক জমির অপকৃষ্ট চাল আর অন্য শস্য। শীতের দিনে যব গম জাতীয় শস্যই চলে। ডেরাদুন বা উৎকৃষ্ট চাল বিক্রির জন্য রাখে। গম বা চাল এদেরও প্রধান খাদ্য শস্য নয়।

এবারে বিহারের সাধারণ মানুষের খাদ্য বলি।

অনেকদিন বিহারে ছিলাম। এরা সাধারণ সম্পন্ন ঘরে মানুষ দুবেলাই ডাল ভাত অল্প মাছ মাংস খেয়ে থাকেন।

দীন দরিদ্র গ্রামবাসীদের কিন্তু দুবেলা কেন এক বেলাও অন্ন পরিপূর্ণ জোটে না। আমি বলছি ১৯০৭ থেকে '১৮ সাল অবধির কথা। যখন চাল ৩।৪ টাকা মণ। তখনও গ্রাম অঞ্চলের লোকের এক বেলা মড়ুয়ার রুটি 'রাগী'শস্য একবেলা অযত্নসম্ভূত সুথনী নামের কচু আর চ্যাপের খই সাধারণ দৈনিক খাদ্য। ভাত একবেলাও দুর্লভ বস্তু ছিল। ঝি চাকরের মাহিনা ৩।৪ টাকা থেকে ৭।৮ টাকা ছিল উৎকৃষ্ট রেট। অথচ বিহার ঠিক নদীমাতৃক অঞ্চল না হলেও অনুর্ব্বর

প্রদেশ নয়। তখনও চাল ও ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। দানাপুর পাটনা মোকামা তো গঙ্গার কূলেই। শোন নদের কূলে কূলেও অসংখ্য গ্রাম প্রদেশ। ফল শস্য গোরু মহিষ ছাগলের দুধে সমৃদ্ধ দেশ তখন। তবু সাধারণ বিহার গ্রামাঞ্চলবাসীর খাদ্য হলো তিন রকমের—চাল ডাল, সাধারণত মড়ুয়া, আর ছোলা ও যবের ছাতু। এই ছোলা ও যবের ছাতু (তাতে খেঁসারী মটর ও অন্য ডালের সংমিশ্রণ থাকে) এই খাদ্যটি লোকে বলে খুব সুষম খাদ্য। এটা বাংলা প্রবাসী বিহারী শ্রমিক মজুর শ্রেণীরও প্রধান খাদ্য। দিনের বেলায়। প্রতি রাজপথে দুপুর বেলায় যিনি বেরিয়েছেন দেখেছেন দুধারের রকে ফুটপাথে যবের ও ছোলার ছাতু কিছু নুন কিছু কাঁচা লঙ্কা এবং কয়েকখানা পিতলের থালা ও ঘটি ভরা জল নিয়ে পথের ধারে ও রকের একটি খাদ্যশালা সাজিয়ে একটি লোক বসে আছে। আর বহুসংখ্যক বিহারবাসী সামনের টিউব কলে হাত মুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সঙ্গতি অনুযায়ী একথালা বা আধথালা ছাতু লঙ্কা নুন নিয়ে খেতে বসেছে। যদি তার সঙ্গে গুড় পায় তো ভাগ্যমানে।

এক কথায় বিহারবাসী কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রধান দৈনিক খাদ্য বা আহার্য্য শুধু চাল বা গম নয়। প্রধান জলযোগ মুড়ী খই 'ফুটাহা' ফুট কড়াই সুথনী বা কচুসিদ্ধ। গ্রামের মানুষের নিত্য খাদ্য 'রাগী' 'মড়ুয়া' আর ছাতু যব ও ছোলার। যদি পায় ভাত বা চাল খায়। ছোলার ছাতুই সস্তা দাম।

এবারে পাঞ্জাবের খাদ্য কথা বলি। এখানে বেশ কিছুকাল বাস করেছি প্রয়োজনমত। এঁদের সাধারণ শিখ হিন্দু ও মুসলমানের (তখন দেশ ভাগ হয়নি). খাদ্য সকলেরই গমের রুটি। তিনবার বা দুবার এঁরা রুটিই খান। ভাত হল সখের ও রোগীর খাদ্য। পোলাও সম্পন্ন-মুসলমান সমাজের দৈনিক সৌখীন খাদ্য। সাধারণ সব মানুষের জলখাবার মুড়ি চিড়া খই মটর ছোলা ভুট্টার খই আলু ছোলা এবং প্রচুর ফল। ফল ওদেশে প্রচুর। নাসপাতি আপেল আঙুর পিচ জাম আম কলা কাঁচা মোনক্কা খেজুর আখরোট বাদাম চেরী তুঁত আলুচা শসা কাঁকড়ি...এক মাস দেড় মাস অন্তর এক এক ফলের মরসুম আসে। শীতে কাঁচা মুলো ছোলা মটর মেওয়া এবং আনাজ। মুলোর পুরের রুটি সেও খাদ্য। এঁদের মধ্যে খুব দুধ দই খাওয়ার প্রথা আছে। এবং সম্পন্নঘরের সঙ্গে সাধারণ লোকের আচার আহার্য্য বস্তুর প্রভেদ সামান্যই। খুব সহজ সরল জীবনযাত্রা শরীর দরিদ্র দীনেরও সুস্থ বলিষ্ঠ। ভারতের সকল প্রদেশের চেয়ে এরা সাধারণতঃ সুস্থ দেহ। এখন দেশে মুসলমান নেই। কাশ্মিরী মুসলমান কিছু আছেন। তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র। কাশ্মীরি দরিদ্রের খাদ্য ভাত দুবেলাই। করম শাক্ আর ভাত। চাল কাশ্মীরে জন্মায়। উৎকৃষ্ট চাল। সেটা ময়রার সন্দেশের মতই তারাও খায় না। আমরা ভারতীয়েরাই পোলাও ভাত রান্না করে খাই। ওরা বিক্রি করে। লেইদামে সপরিবারে আগুনের মালসা বুকে নিয়ে শীত পোয়াতে পোয়াতে এক বেলা ভাতের স্বপ্ন দেখে। কাশ্মীরে আর কি শস্য জন্মায় আমার ঠিক জানা নেই। যদিও অতি সুশ্রী ও রূপবান তবুও তাদের চেহারা দেখে মনে হয়েছে দুবেলা অনেকেরই অন্ন জোটে না। এবং রুটি খেতে অভ্যস্ত নয়। ফল দুধ অপর্য্যাপ্ত হলেও খেতে পায় না। তবে ভুট্টার ছোলা গমের মিশ্র রুটিও লোকে খায়। যব গম ও ছোলা সমান ভাগে মেশানো আটা রাজস্থান ও গুজরাটের খাদ্য খায়।

এবারে আসি আমাদের চাল ভাত ভোজী মাতৃভূমি বাংলা দেশের খাদ্য কথায়। অথণ্ড বাংলার মানুষ চিরকালই ভাত বা অন্নভোজী জাতি। মাছ ভাত দুধ ছিল সাধারণ খাদ্য বাঙালীর। দীন দুঃখীদের দুধ যদি বা না জুটত মাছ ভাত তারা খেত। ডাল খুব নয়। শাক মাছ ভাত। উচ্চ বর্ণের বিধবা ছাড়া তারা দুবেলাই অন্ন খেত। পেলে এখনো খায়। আর জলযোগে বা অন্ন না জুটলে খই চিঁড়া মুড়ি তাদের অন্য বিশেষ খাদ্য। সব যায়গার মতই হয়ত হাঁড়িতে ভাত না থাকলে মেয়েরা গৃহিণীরা মুড়ি চিঁড়ে খেতেন। আটার রুটি একবেলা খাওয়ার চলনটা সহরে হয়েছে

মাত্র ৩০।৭০ বছর। পল্লীগ্রামে ৩০।৪০ বছর আগেও ছিল না। রুটি মুড়ীর ও লুচি ময়দার খাদ্যে আবার সকৃড়ি শুচিতা ভেদ আছে। বিধবারা রুটি খেতেন না। অনেকে ময়দার কোন খাদ্যই খেতেন না। দুবেলাই ভাত তরকারী ডাল মুড়ি চিঁড়ে দুধ এবং মাছ এই হল সব স্তরের সাধারণ বাঙালীর সাধারণ খাদ্য। এটি জলখাবারও আহার্য্যও। এখন জলযোগে আটা ময়দার রুটি বা লুচি প্রচলিত। এখনও কিন্তু পূর্ব্ববাংলার হিন্দু মুসলমান মানুষ সকলেই প্রায় ভাতভোজী। ময়দা আটা খাওয়ার অভ্যস্ত নন। এটা তাঁদের বিশেষত্ব।

উড়িষ্যাবাসীরাও অন্নভোজী মানুষ। তিন চার বার ভাত খান। পাকাল ভাত (প্রচলিত পান্তা ভাত) খাওয়ার প্রথা খুব। গরম ভাতের সঙ্গেই সেটা খাওয়া চলে। অন্য সময়ে জলযোগের মত সকাল সন্ধ্যায়। মুড়ি খই চিঁড়েও খুব খায়। আটা প্রায় খায়ই না। জল খাবারেও না। ডাল ভাত মাছ আনাজ খুব বেশী খাওয়া হয়। দুধ মনে হয় খাওয়ার চলন কম। সম্পন্ন ঘরে একটু আছে। সাধারণ ঘরে খুব কম। দীন-হীনের শুধু মাছ ভাত, ডাল ভাত, শাক ভাত।

আসামের সর্বত্রের মানুষ ঠিক ঠিক কি খান সবটা জানি না। তবে কামাখ্যা প্রদেশে সাধারণ মানুষ যাদের দেখেছি সকলেই অন্ন বা ভাত ভোজী মানুষ। মাছ মাংস খাওয়ার চলন আছে উচ্চ বর্ণেও। কিন্তু যতদূর জানি এঁরা ভাত ভোজী জাতি। যদিও ভাতের জিনিষ সব সময় খায় না। কড়াই ডালের বড়া পিটক খুব খাওয়ার চলন আছে।

মাদ্রাজের না বলে দক্ষিণের মানুষ বললেই এখন ঠিক হয়। কেন না অন্ধ্র, কেরল, মাদ্রাজ তিনটিই আলাদা এখন। কিন্তু খাওয়ার এঁরা তামিল তেলেগু আয়ার নায়ার পঞ্চম সব বর্ণই ভাত বা অন্নভোজী মানুষ। চালের পিঠা, ডাল চালের পিঠে, বড়া, সরুচাকলী। সরু-চাকলী চাল ডালের মিশ্র রুটি) কড়াই ডালের বড়া, ভাতের তৈরী বড় বড় মণ্ড এঁদের দেবালয়ে মন্দিরে ভোগেও চলে কন্যাকুমারী থেকে নীলাঞ্চল ওয়ালটেয়ার নৃসিংহ মন্দিরেও দেখেছি। প্রসাদও গ্রহণ করেছি দু-এক জায়গায়।

কোনোখানে আটা ময়দা জলখাবার বা খাবার চোখে পড়েনি। অন্ততঃ ২ বছর আগেও দেখিনি। ১৯৫৮-৫০ শেও দেখিনি।

কলাপাতায় মোড়া ডাল ভাত তরকারী সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ষ্টেশনেও। হোটেলেও। ডাল ভাত রান্না বাংলা দেশের মতই। কলাপাতায় করে মাটিতে বসে খাওয়া। ডালের মধ্যে শাকসব্জী দেওয়ার চলন আছে। এক একটা তরকারী পৃথক ভাবে রান্নার প্রথা নেই উত্তর পশ্চিম ভারতের মত। এঁরাও বাংলা উড়িষ্যা আসামের মত তিন চার রকম আনাজ তরকারী মিলিয়ে রান্না করেন। মাছ মাংস সব শ্রেণী খায় না-ই মনে হয়েছে। তবে অবর্ণের মধ্যে শুকনো শুঁটকী মাছ এবং মাছ মাংস খাওয়া খুবই আছে। উচ্চ বর্ণের বিধবারা মনে হয়েছে মারাঠি ও বাংলার বিধবার মত একাহারী ধরণ। নিষ্ঠাবতী। তেমনি কিঞ্চিৎ শুচিতা, ধর্ম্মীও যেন। সেটা রাজস্থানে এবং উত্তর ভারতের বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রী সমাজেও আছে। তবে অন্নাহারে উচ্চবর্ণের বিধি-নিষেধ দাক্ষিণাত্যে কি রকম জানা যায়নি।

এছাড়া আমি রাজোয়াড়া ও কলিকাতায় গুজরাটি ভাটিয়া সমাজে যেটুকু দেখেছি তাতে এটা দেখেছি সাধারণ তাঁরা অন্ন ভোজী নন। সম্পন্ন ঘরে মাঝে মাঝে অন্ন ভাত খিচুড়ীর গমের রুটির সঙ্গে চলন আছে। নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন গুজরাটি মারাঠি ঘরের লোকের আহারীয় খাদ্য রাজস্থানের বিত্তহীন সমাজের মত জোয়ার বাজরা ভুট্টা জনার যব গম। যা যখন সস্তা পান তাই খান। এবং দুধহীন আনাজ ডালহীন। তবে ডালে ঘিয়ের ছিটে রুটির ওপর দিয়ে খান। দরিদ্র এদের খাদ্য খেয়েছি ও দেখেছি। উত্তর পশ্চিম ভারতে সাধারণতঃ ভাত রোগীর ও দুর্ব্বলের পথ্য। এদেশ বহু সম্প্রদায় প্রায় জৈনধর্ম্মাবলম্বী। এবং অহিংস। নিরামিষাশী। ঐ সব যে কোন শস্য ভোজী। গুজরাটিতে একটি মজার প্রবচন গুজরাটি বিখ্যাত লেখক উমাশঙ্কর যোশী মহাশয়ের মুখে শুনি। তাতে মোটামুটি বিত্তবান

ও মধ্যবিত্তের খাদ্যের ধরণ জানা যায়।

সেটা হল

"ভাত কহে মর গাঁও তক খানা।
খিচুড়ী কহে ঘর পৌছানা।
রোটি বলে আনা খানা।"

অর্থাৎ ভাত বলে তোমার গ্রাম অবধি পৌছে দিতে পারি।

(তারপরেই খিদে পাবে) খিচুড়ী বললে, বাড়ী অবধি পৌছবে।

(তারপর কিন্তু খিদে পাবে।)

রুটী কিন্তু বললে আমি কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে পৌছে ফিরিয়েও আনতে পারব। "(পেট ভরাই থাকবে)"

অর্থাৎ খাদ্যের ভার হিসেবে ভাত খিচুড়ীর চেয়ে রুটীটা ভারী খাবার।

কিন্তু এটি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত স্তরের ঘরের প্রবচন।

বিশকোটী বিত্তহীনের বাজরা জোয়ার যবের রুটীও 'চুনিয়া'র (ভাঙা শস্ত) খাদ্যের সঙ্গে চাল গমের কোনো সম্পর্কই নেই।

এটা সত্য। এবং বিশেষভাবে সত্য। যাঁরা ওই শ্রেণীদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তাঁরা জানেন। অবশ্য আজকাল সরকারী উঁচুস্তরের কিছুই জানেন না। রাজধানী বাসীরাও তাঁরা তো দেশের সাধারণের খাদ্যের খবর রাখেন না। দীনহীন গ্রামের লোক কি খায় না খায় তাঁরা জানেন নাই বলতে পারি।

স্বয়ং গান্ধীজীও চারিদিকের ভক্ত যাবক বেষ্টনী ভেদ করেও জানতেন না।

জানতে পারার চেষ্টা করেছেন কি না তাও বলা শক্ত।

মহামানব-মহিমার-মোহ-আবরণ অচ্ছেদ্য ছিল! হোক না সে বাল্মীকি আশ্রম!

মন্ত্রী মশাইদের সপ্ত তোরণ রাজপ্রাসাদ ভেদ করে দীনহীনশীর্ণ দেহ কোনো দুটি ভিক্ষার্থী সেপাই সান্ত্রীরক্ষিত রাজদ্বারে পৌছয় কি না তাও বলা শক্ত।

তাঁদের ঘরের মেয়েদের বা পুরুষদের মুষ্টিভিক্ষা দেবার 'অবকাশ বাতায়ন'ই প্রাসাদে নেই। তাঁরা সুসভ্য। ভিক্ষা-টিক্ষা দেন না।

৭৪ বছরের আমার জীবনে আমি বাল্যে বা শৈশবে ১৯০০ সালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখেছিলাম সেটা কিষণগড় রাজ্যে (রাজস্থানে)।

প্রতিদিনই দেখেছি বাড়ীর সমুখের পথ দিয়ে চলেছে ভিক্ষুক নরনারী শিশু বালক বালিকার দল। শীর্ণ ক্লিষ্ট প্রায়-নগ্নদেহ তাদের। মুখে একটি গান।

তার একটিমাত্র লাইন এখনো আমার মনে আছে "ছপ্পনিয়া সালরে"।

মনে হয় এক কোন্ '৫৬ সালের দুর্ভিক্ষের দিনে গানটি রচিত হয়।

সহসা একদিন শেষ রাত্রে বাড়ীর আঙিনায় কুকুর মুরগীর ডাক আর ভৃত্যদের গোলমাল শুনে বড়রা জেগে উঠলেন।

পিতা বাইরে এলেন।

দেখা গেল একটী শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ ছোট্ট ছেলে বছর দুইয়ের বয়সের—রকের সিঁড়িতে বসে ফোঁপাচ্ছে। কাঁদছে। তার গায়ে রক্ত। মুরগী ঠুকরে দিয়েছে। পালিত কুকুরটা কাছাকাছি চেঁচাচ্ছে।

চাকররা পিতাকে বললে 'এই শিশুটিকে কারা রাত্রে এখানে ফেলে রেখে গেছে। তারা কুকুর আর মুরগীর চেঁচামেচিতে উঠে এসে দেখতে পেয়েছে ছেলেটিকে। তার মা বাবা বা কারুকে সেখানে দেখতে পায়নি।'

পরে শুনেছিলাম, শিশুটিকে একটি ক্রিশ্চান অনাথ আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল (তখন পরাধীন ভারত ব্রিটিশ রাজ্য)।

স্মরণীয়, এই দুর্ভিক্ষটা শুধু রাজস্থানেই হয়েছিল। সারা ভারতে একসঙ্গে রচনা করা হয় নি! এবং পরাধীন দেশের সামন্ত রাজারা তাঁদের রাজকোষ ও শস্যভাণ্ডার থেকে সস্তাদরে প্রজাদের যব গম বাজরা ভুট্টা সরবরাহ করেছিলেন। শোনা যায় খাজনাও মাপ করা হয়েছিল। এবং দুর্ভিক্ষতে তখনো যবের মণ টাকায় আট সের! অন্য শস্য জোয়ার জনার আরো সস্তা, ১২।১৩ সের করে।

তারপরের দুর্ভিক্ষ—সরকার সৃজিত দুর্ভিক্ষ দেখি ১৯৪২

সালে। তখন বাংলা দেশে রয়েছি। সহসাই এক সময়ে ভাদ্র মাসের মধ্যে কৃষ্ণকায় শীর্ণ দেহ জীর্ণ বাস নরনারী শিশুর দলে কলকাতার উপকণ্ঠের প্রান্তর প্রাঙ্গন—সহরের পথ গলি ভরে গেল। হাতে তাদের মাটির সরা খুলি মালসা ভাঙা টিন, মগ। মুখের কথা শুধু "একটু ফেন দেবে মা?"

ভাত নয়, রুটী নয়, মাছ নয়, শাক নয়, শুধু ভাতের ফেন। যা আমরা নর্দমায় ফেলে দিই। গ্রামে গরুকে দিই। শুধু সেই ফেনটুকুই তারা ভিক্ষা চাইছে।

সে সময়ে খেতে বসে অনেকেই ভাত ঠেলে রেখে দিয়েছেন। ওদের ডাকে মনে হয়েছে একটু ফেনে মিশিয়ে ওদের দেবেন। তারা বন্ধ দরজার সামনে ভাঁড় মগ মালসা সাজিয়ে বসে আছে। জন প্রতি এক হাতা পেলেই ফিরে যাবে।

একদিন মেয়ে বললে, 'মা আজ দুটি চাল নিও বেশী। এক জনরা চেয়ে গেছে।'

ভাত? কজনের?

মনে খুব খুশী হলাম না। কিন্তু রান্না করলাম।

বেলা হল। বিকাল হল। একজন মাত্র এলো। এক মুঠো মাত্র খেল। খেতে পারলই না। উদ্‌ভ্রান্ত মুখে ভাত নেড়ে চেড়ে আবার খাবার চেষ্টা করল। খেতে পারল না। উঠে গেল।

পরে শুনেছিলাম সে মৃত্যু আগের দিন তার ঘরে না পথে হয়েছে স্ত্রী পুত্রের। অনাহারে সে মৃত্যু। ভাত চেয়ে খাওয়ার পর।

আমার তাদের ভাত দিতে দ্বিধার কুশাঙ্কুর আজো মনে ফুটে আছে।

শুনেছিলাম সরকারী হিসেবে সেই দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীর মৃত্যু হয়েছিল। বেসরকারী মতে তার দ্বিগুণ। বাংলা এক তখন। চোখের সামনে রাস্তায় বেরুলে যেখানে সেখানে গরু ঘোড়ার পানের জলাধারের পাড়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

ঘুম? না। অসহায় মৃত্যু!

এখন তাতে আর বলবার কিছু নেই। স্বাধীন ভারতেও সরকারী অনাচারে অনাহারে খরায় মৃত্যু হচ্ছে।

মরবে না? কি তপস্যা করেছিল তারা মন্ত্রীপুত্র সদাগর পুত্র কোটাল পুত্র হবার জন্ত!

তবু সেই '৪৩।৪২ এর দুর্ভিক্ষ ভারতব্যাপী করা হয়নি। এবং যিনি তখনকার লাট ছিলেন দুর্ভিক্ষের সহায়তা করেন। ব্রিটিশ লাট তিনি আত্মহত্যা করেন "জবাব দিহির ভয়ে"! অর্থাৎ 'ভয়' করতে হয়েছে, অন্যায় করায়!

কিন্তু চাল পাওয়া গেছে তখনো ১১।১২ টাকা মণ। ডাল ।০॥৵০ সের। মন্ত্রীনেত্রপাতে আনাজ শুকিয়ে যায় নি। মাছ টুলায় শুদ্ধ লক্ষ লক্ষ টাকা সহ সরকারী বেহিসাবের খাতায় ডুবে যায় নি।

তারপর রেশন ব্যবস্থা হ'ল। প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতা কালোবাজারীকে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী ভোটের মত করে সযত্নে লালন করা হয়নি। ফাঁসীতে (আস্ফালনে) লটকানোর কথাও বলা হয়নি। রেশনটা পুরো ৩॥০ সেরই ব্যবস্থা হয়েছিল। দর ।৶০ চাল।

এখন মন্ত্রী কথামৃত শোনানো চলেছে।

আমরা যা দেখেছি আমাদের যা বিশ্বাস, তাহচ্ছে এই, ৪৫।৫০ কোটী ভারতবাসী ৩০ কোটীই চাল-গম ভোজী নয়। অন্য সব সস্তা শস্য খায়। যারা নিতান্তই অন্ন বা ভাত ভোজী তারাও একবেলাই খেতে পায়। মুড়ী চিঁড়ে ছাতু মড়ু "কাহন" চাল (পোস্তদানার মত গোল চাল) বন্য শস্য খায়। ধানের গাছে গোড়ায় জন্মায়। এরা হ'ল বিহারী আসামী বাঙালী ও আদিবাসী বনবাসী মধ্য প্রদেশী এবং হিমালয়ের। এবং মাদ্রাসী। এঁরাও চালের সঙ্গে ডালের সরুচাকলী পিঠে 'দোসা'-'ইডলী' খেয়ে থাকেন। দুবেলাও ভাত পান না।

দেশে দেশে রাত্রে অধিকাংশের বস্তিবাসীদের বনবাসীদের রাত্রে উনুন জ্বালানোর পাট নেই। মটর ছোলা কাঁচা মুলো আর ভাজা 'কড়াই মুড়ী খেয়ে তারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। কচু সেদ্ধ খায়। আমার একটি বিহারী ঝিকে একবার জিজ্ঞাসা করি 'তুমি এতক্ষণ ধরে ওই কটা কড়াই ভাজা খাচ্ছ? আর ওই কচু সিদ্ধ?

ভাত খাবেনা? সে একটু হেসে বললে, 'অনেকক্ষণ ধরে একটা দুটো করে খেলে বেশী দেরী হয়। মনে হয় পেট ভরেছে। 'ভাত কম লাগবে।' এই বিশ পঁচিশ কোটী আমাদের ভারতবাসীর ঘরে উনুন একবারই জ্বলে। তরকারী রাঁধে না। ডাল পায় না। মাছ জোটে না। দুধ ঘি? সে কথা বলার দরকার নেই। ঘরের ভাড়া, জ্বালানী, ।৵০ আনাতে কুলোয় না। লেখাপড়া জামা জুতো ওষুধ অসুখের কথা সেতো বিলাস! সেটা আমাদের ওপর তলার মানুষদের জন্ম রাখা হয়েছে।

* * *

এই তিক্ত স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে ভারতবর্ষে তার অহিংস নেতাদের দিল্লীর ময়ুর সিংহাসনে বসিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপাল পালে পালে প্রাসাদে প্রাসাদে বসছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগস্বীকারের পুরস্কার স্বরূপ।

আমরা রাজাদের মাচিয়েছি বটে, কিন্তু প্রাচ্য রাজ মহিমার জাঁকজমক ভুলতে পারিনি। মন্ত্রীদের মন্ত্রীত্ব ব্যবস্থা ও প্রায় পুরুষানুক্রমিক ভিত্তিতে মজবুত করার চেষ্টা হচ্ছে। 'অচল' 'অটল' (অধম!)।

এখন আমাদের কথামৃত চতুর্থ সংস্করণ শোনানো হচ্ছে পরিকল্পনায়। পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের সুখের কথামৃত। দাদা ভাই নৌরজীর রমেশ দত্ত মহাশয়দের আমলে আমাদের দৈনিক আয় ছিল ৴১০ দু'পয়সা। এখন বেড়েছে। ।৵০ আনায় উঠেছি। সবই গড় হিসেবের কাহিনী। পুরোণো প্রবাসীর ৬০ বছর আগের পাতায় পাতায় এই গড় সত্য ও মন্তব্য কথা দেখতে পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিদেশী লেখকের লেখার উল্লেখ না করে পারলাম না। মনে নেই লেখকের নাম। হাতের কাছে বই নেই। লেখার নাম হল "মাস্ট ইণ্ডিয়া ষ্টার্ভ" (উপবাসী ভারত) বেরিয়েছে "রীডার্স ডাইজেস্ট"-এ। সেপ্টেম্বর বা আগষ্ট মাসে। ১৯৬৭। তার প্রথম আরম্ভ প্যারা হ'ল "রাষ্ট্রপতির আটঘোড়ার গাড়ীতে মোগল বাদশার মতো বসে ২৬শে জানুয়ারীর "পবিত্র সেলাম গ্রহণ" জাঁক জমক, কুচকাওয়াজ, (রামরাজ্য) পতাকা নিশান সেলাম। নতুন দিল্লী ও লালকেল্লার পথে।" দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ হ'ল ভুখা মিছিল জনতার। পুরোণো দিল্লীর পথে পথে। "গান্ধীজীর অমর রাম রাজ্যের" পাশাপাশি চিত্র। পরের পাতায় মন্তব্য হ'ল নেহরুজীর 'মডার্ণ টেম্পল' পরিকল্পনা। লোহার কারখানা মন্দির" কুলটী, ভিলাই, রাউরকেলা দুর্গাপুর ইত্যাদি। কিন্তু এতবড় দেশে শস্য ভাণ্ডার নেই? দেশের "শস্য ভাণ্ডার খাদ্য ভাণ্ডার" কোথায়? প্রশ্ন হ'ল দুর্দিন এলে? প্রশ্নের জবাবে পণ্ডিতজীর সহাস্য উত্তর আসে তাঁর দেশের খাদ্য সঞ্চয় হয়।

সাধারণ লোকের প্রশ্ন বছরে কত কোটী টাকার শস্য কেনা হয়? একজন ছাত্র বললেন আন্দাজ সাড়ে পাঁচশো কোটী টাকার।

* * *

এই রাম রাজ্যে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে চারটি "জুজুর" বিভীষিকা বাণী।

জুজু (১ম) জন্মহার বৃদ্ধি।

" (২য়) অজন্মা। খাদ্যাভাব। অতএব চিরদুর্ভিক্ষ।

" (৩য়) পাকিস্থান সীমান্ত।

" (৪র্থ) চীন সীমান্ত।

সত্য সত্যই আমরা অশিক্ষিত অসহায় মূঢ় জনসাধারণ এই "জুজুকে" ভয় ও বিশ্বাস করেছি।

এই হল রাম রাজ্যের সত্য পালনের অর্দ্ধ সত্য অসত্যের মিশ্র কাহিনী। নির্গলিত সত্য হচ্ছে রাজ্য রাখতে হলে সত্য থাকেন না। সত্য রাখতে গেলে রাজ্য রাখা যায় না।

তাঁদের 'সত্য' কথা হ'ল আমাদের 'ভাতে পড়ল মাছি।'

সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে আজ যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহার সূচনাকালের পথিকৃৎদের শ্রমনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে পরিমাপ করা একপ্রকার কল্পনাতীত ব্যাপার। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের পাঠকগণ একথা আদৌ অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন না যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতারূপে যেসব গবেষক অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যয়ন, তথ্যসংগ্রহ, প্রমাণনিরূপণ প্রভৃতির মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেইসব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদেরও পূর্ব্বে যিনি একক প্রচেষ্টা ও দুরূহ কর্ম্মপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে অগ্রণী হইয়াছিলেন তিনি কি অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন! এই ব্যক্তিপুরুষের নাম রামগতি ন্যায়রত্ন এবং যে সাহিত্যকৃতির জন্য সমগ্র বাঙালী বিদ্বৎসমাজ ইঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ সেই অতুলনীয় কীর্তির নাম—'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'।

সংস্কৃত কলেজের অন্যতম মেধাবীছাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন দীর্ঘ ছয় বৎসরে সিনিয়র বৃত্তিলাভ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি সকল বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জ্জনের সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষাও আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহারই স্নেহ ও সাহচর্য্য রামগতি ন্যায়রত্নকে ছাত্রজীবনের সকল অবস্থায় উৎসাহিত করে, যাহার ফলে তিনি উত্তরকালে 'বাংলা ইতিহাসের প্রথম ভাগ' (১৮৫৯) ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া সার্থকতার পরিচয় দেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি লাভের পর তিনি অধ্যাপনা-কর্ম্মে ব্রতী হন। প্রথমে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহকারীরূপে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে, পরে যথাক্রমে বর্দ্ধমান গুরুট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক-রূপে এবং অবশেষে হুগলী বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালরূপে কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে 'হিষ্টরী অফ দি ব্ল্যাক হোল' নামক গ্রন্থের অনুবাদ 'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস' (১৮৫৮), বস্তুবিচার (১৮৫৮), রোমাবতী (১৮৬২), ঋজুব্যাখ্যা (১৮৬৬), দময়ন্তী (১৮৬৯), 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ' (১৮৭২), শিশুপাঠ (১৮৭৩), ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৭৪), গোষ্ঠীকথা (১৮৭৪), আর্য্যক্ষেমীশ্বর কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের অনুবাদ 'কুপিত কৌশিক' (১৮৭৭), ভবভূতির মহাবীর চরিতের অনুবাদ রামচরিত (১৮৮১), নীতিপথ (১৮৮১) এবং সর্বশেষে 'ইলছোবা' নামক উপন্যাস (১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, শাস্ত্রবিচার প্রভৃতি গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ বিষয় রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মজলিশি গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদকর্ম্মেও যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ লক্ষণীয়।

বহরমপুরে অবস্থানকালে (১৮৬৫-৭৮) তিনি রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লোহারাম শিরোরত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত হন। তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা রামগতি ন্যায়-রত্নকে উপরোক্ত গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থটি বহরমপুর

অবস্থান কালেই রচিত ও প্রকাশিত হয় (১৮৭৩)। এই গ্রন্থটি একাধারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস, আলোচনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ। ইতিপূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি খণ্ড আলোচনা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় কেহই অগ্রণী হন নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর কৃত, 'সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক চিন্তাপূর্ণ রচনাটির দ্বারা কিছু প্রভাবিত হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যায় মাত্র, কিন্তু তাঁহার উপাদান সংগ্রহ, রচনাবিন্যাসে, বিষয় নির্ব্বাচন সবকিছুই মৌলিক শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার গ্রন্থের প্রভাব উত্তরকালে কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে পরবর্ত্তী আলোচকগণের অর্থাৎ গঙ্গাচরণ সরকার, পদ্মনাভ ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, [সুকুমার সেন প্রভৃতির রচনাবলী পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলেই সহজে অনুভব করা যাইবে।

'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের তথ্য আলোচনাক্রম, বিষয়বিন্যাস যেমন ইতিহাস-ভিত্তিক তেমনি যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত ও লেখকের গভীর গবেষণা প্রসূত। ভূমিকায় বাংলা ভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি বিষয়ে লেখকের সুস্পষ্ট মতগুলি দৃষ্টান্ত সহযোগে ও তুলনামূলক আলোচনায় পাঠকের সহজগ্রাহ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। মূল অংশে সাহিত্যের আদিকাল অর্থাৎ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে কৃত্তিবাস, মধ্যকাল অর্থাৎ চৈতন্যদেব হইতে মঙ্গলকাব্যের যুগ এবং ইদানীন্তন কাল অর্থাৎ ভারতচন্দ্র হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ইত্যাদির রচনার ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে বিধৃত।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে রীতিসম্মত আলোচনা বা সাহিত্য সমালোচনায় কেহই অগ্রসর হন নাই। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের কালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিছু কিছু সাহিত্য-বিচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন তথাপি সেই-গুলি যথার্থ সমালোচনার পর্য্যায়ে পৌঁছায় নাই। রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থটি প্রধানতঃ সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহাতে লেখকের যথেষ্ট বিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই হিসাবে ইহাকে সাহিত্যের আলোচনাগ্রন্থ বা সমালোচনার আদি-রূপে বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাহা সহজেই প্রমাণিত হইবে। বাংলা সাহিত্যের আদিকবি বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন: "বিদ্যাপতির প্রায় সমুদয় গীতেই বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাবগম্ভীর, রসাঢ্য ও মধুর। সম্পূর্ণরূপে অর্থ পরিগ্রহ না হইলেও শ্রবণ বিষয়ে যেন মধুধারা বর্ষণ করে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন: "বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য্য ও রচনা-পরিপাট্য অধিক আছে, চণ্ডীদাসের গীতে সেরূপ পাওয়া যায় না। ইঁহার রচনা সাদাসিধা, সামান্য ভাব লইয়াই অধিকাংশ গীত রচিত। সকল গীতই মধুর ও হৃদয়স্পর্শী।" তিনি একথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: "চণ্ডিদাস যে সময়ের লোক সেই সময়ে ঐরূপ সুললিত ছন্দোবন্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কাম্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিবার অবসর পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নৈসর্গিক শক্তিসম্ভূত।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানুন আর নাই জানুন, মূল রামায়ণের সহিত তাঁহার রচনার ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—তাঁহার রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ যে বহুল নীতিগর্ভ প্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

চৈতন্যযুগের উত্তরকালে বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' দুইটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। দুইকাব্যেই শ্রীচৈতন্যের জীবনের আদ্যোপান্ত বর্ণনা থাকিলেও প্রথমোক্ত গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকায় তাহা রসিকচিত্তকে পরিপূর্ণভাবে

আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। "বৃন্দাবনদাস কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। হাস্য ও করুণ রসসৃষ্টিতে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল।" পক্ষান্তরে 'চৈতন্য চরিতামৃত' বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ। অতএব ইহার বৃত্তান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, সত্যবোধে যাহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে গ্রন্থকার তজ্জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবিত্বশক্তি প্রকাশের জন্য সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। গ্রন্থের পারিপাট্য সম্পাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না—প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবানরূপে প্রতিপন্ন করা ও নিজগ্রন্থের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।"

চৈতন্যযুগের অপর কবি লোচনদাস রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা যেরূপ সুনিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন অন্য কাহারও কাব্যে তাহার তুলনা মেলে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে চৈতন্যের সময় হইতেই বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র পুঁথির আকার হইতে গ্রন্থের আকার প্রাপ্তি, সংস্কৃত লিপি হইতে বাংলা লিপির প্রচলন এই সময়েই ব্যাপকতা ও প্রচারবহুলতা লাভ করে।

বৈষ্ণবযুগের অবসানে মঙ্গলকাব্য রচনার অভ্যুদয় হয়। এই সময় মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম দাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ যথাক্রমে চণ্ডী, মনসার ভাষণ মহাভারত, শিবায়ন, কবিরঞ্জন ইত্যাদি কাব্য প্রণয়ন করেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচয়িতা মুকুন্দরামকে রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন: "কবিকঙ্কণ বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। অন্যের কথা দূরে থাকুক কবিত্ব বিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে এত শ্রদ্ধা আছে, চণ্ডীকাব্যের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘ কবি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপাল বধের রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ [কবিকঙ্কনের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের রচনা করিয়াছেন।... কবিকঙ্কন চণ্ডী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির ভূরি ভূরি উপাখ্যান, সুরলোক ও সুরগণের বিবরণ, ভারতবর্ষস্থ নানাদেশের নদ-নদী গ্রাম নগর অরণ্য প্রভৃতির কাব্যই বর্ণনা করিয়াছেন এবং পশু-পক্ষী ও নানা প্রাকৃতিক নানাধর্ম্মী নানা জাতীয় লোকের বিভিন্ন প্রকার স্বভাবগুলি কি সুন্দর রূপেই পৃথকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।" কবিকঙ্কণের কাব্য বহুগুণ সমন্বিত হইয়াও সর্ব্বৈব ত্রুটি বিমুক্ত নয়। ইহার চরিত্রগুলির আচার-ব্যবহার মাঝে মাঝে অত্যুক্তিদূষিত ও অনৈসর্গিক। এতদ্ব্যতীত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে—"কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ়, রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখভোগ্য নহে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃতশব্দের প্রয়োগ আছে।

মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস নিজেকে কখনও কবি বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তিনি একজন বিনীত কবিত্ব গর্ব্বশূন্য ও পরমভাগবত ব্যক্তি ছিলেন। অনেকের ধারণা কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত অনুবাদ করিয়া ইচ্ছামত উপন্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্ন প্রচুর প্রমাণ ও উদ্ধৃতির দ্বারা সেই ভুল ধারণার অপনোদন করিয়াছেন। সাধক রামপ্রসাদ সেনের কবিরঞ্জন বা বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতির ছন্দমাধুর্য্য ও পরিপাট্য রসিক মাত্রেরই আকর্ষণের বিষয়।

মধ্যযুগের অন্তে কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগ সূচিত হয় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলকে' কেন্দ্র করিয়া এই যুগের জয়যাত্রা। ইহার পর নীতি-কবিতার যুগের আরম্ভ। নিধুবাবু, রামবসু, হরু ঠাকুরের টপ্পা গান এই যুগের উল্লেখযোগ্য বস্তু। ইহার পর ইংরাজ আমলে নবযুগের অধ্যায় সূচিত হয়। ক্রমে রামমোহন রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পরে ঈশ্বরগুপ্তের সময় হইতে বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ভিন্ন খাদে প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্রমে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণের দানে পুষ্ট হইয়া বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় ও নবরূপ পরিগ্রহ করে। অতঃপর মধুবঙ্কিমের যুগে

বাংলা সাহিত্য যে রেনেসাঁসের সম্মুখীন হয় তাহা হইতে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কল্পনার সুদূরপ্রসারী প্রকাশ লক্ষিত হয়। মধুসূদনের কাব্য নাটক প্রহসন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি প্লাবন বহাইয়া দেয়। মধুসূদনের মেঘনাদ কাব্য সম্বন্ধে রামগতি বলিয়াছেন : মেঘনাদ মাইকেলের সাগরের সর্কোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন.........বাঙ্গালীর বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সদ্ভাব বিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইনি সেরূপ হন নাই ; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।"

অতঃপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস, পারিবারিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদিবিষয়ের বিশদ আলোচনায় পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত হয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য অনুধাবন যোগ্য : 'পদ্মিনী উপাখ্যান বীর ও করুণ রসপ্রধান গ্রন্থ ; ইহাতে নায়ক নায়িকার অনন্যা নুরাগ সূচক অনেক কথোপথন আছে কিন্তু কোথাও নিরব-গুণ্ঠন আদিরস অবতারিত হয় নাই।"

রামনারায়ণের নাটকাবলী অর্থাৎ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নবনাটক, রুক্মিণীহরণ সম্বন্ধে তাঁহার বিচার বিশ্লেষণ নিরপেক্ষ রসসৃষ্টির পরিচায়ক। রামনারায়ণের উত্তরসূরীদের মধ্যে দীনবন্ধুর খ্যাতি সর্বজন বিদিত। তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী রচনা। তথাপি ইহার চরিত্রও ঘটনাসংস্থানের বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন : "গ্রন্থ বর্ণিত সকল অত্যাচারই নীলকরদিগের কর্তৃক সত্য সত্যই সম্পাদিত হইয়াছে কিনা সে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু বর্ণনা পাঠ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, এবং নীলকরদিগকে পিশাচ রাক্ষস হইতেও সহস্রগুণে অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া বোধ জন্মে।" দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক—নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী এবং প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', সধবার একাদশী, 'জামাই বারিক' সম্বন্ধে আলোচনা-গুলি একালের পাঠকের নিকট বিরূপধর্মী সমালোচনা বলিয়া গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক। 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে তাঁহার এই আক্ষেপ "বড়ই দুঃখের বিষয় যে দীনবন্ধুর ন্যায় সামাজিক লেখকের হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে" লক্ষণীয়।

দীনবন্ধু মিত্রের টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র রামগতি ন্যায়রত্নের আলোচ্য লেখক। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের জনপ্রিয় রচনা হইলেও উহার বিষয়বস্তু এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত গোষ্ঠীর উদ্দেশে ব্যাজোক্তি রামগতি ন্যায়রত্নের বিরূপতার উদ্রেক করিয়াছিল। ইহার ভাষারীতিও তৎকালীন পণ্ডিতসমাজকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। তথাপি তাঁহার একটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য : "হাস্যপরিহাসাদি লঘুবিষয়ের বর্ণনায় আলালীভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপদা হয়।"

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমের আবির্ভাব নবযুগের সূচনা করিয়া নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়া দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের জগতে একটি অভাবনীয় সৃষ্টি। অনেকের ধারণা এই উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'আইভান হো' উপন্যাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার ছায়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ কিন্তু এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন না। "এই গ্রন্থের ভাষা চলিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আলালীও সম্পূর্ণ নহে—তদপেক্ষা উন্নত ও মধুর। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সকল আলোচনার পর 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : ইহার রচনা যুক্তিমতী, ওজস্বিনী ও বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকা রচনার ন্যায়ই মধুবর্ষিণী ও চিত্তা-কর্ষিণী।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন অনুকূল মত পোষণ করিতেন। তাই মেঘনাদ বধের ছন্দ অপেক্ষা

'বৃত্রসংহার'-এর ছন্দ অনেক বিচিত্র ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। মহাভারতের অনুবাদকর্ত্তা কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামক যে ব্যঙ্গ-কাব্য রচনা করেন তাহার সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন: ইহা বঙ্গ ভাষার অপূর্ব্ব সামগ্রী, ইহা পাঠে কলিকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। নক্সার ভাষা অতি সুন্দর। মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন কালীপ্রসন্ন সিংহই তাহা প্রথমে 'হুতোম প্যাঁচায়' ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

'সারদামঙ্গল', 'বঙ্গসুন্দরী'-র কবি বিহারীলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 'ভোরের পাখী' আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির বহুপূর্ব্বে রামগতি ন্যায়রত্ন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: ইংরাজ কবি Blake যেমন ইংলণ্ডে একটা নূতন সুরে নূতন ঝঙ্কারে তাঁহার বীণা বাজাইয়াছিলেন আমাদের মধ্যে বিহারীলালও তদ্রূপ একটা অপরিচিত পূর্ব্ব; মনোমোহন নবীনতায় তাঁহার সমসাময়িক কাব্যসাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন স্বচ্ছ তরল সরিতের মত তাঁহার ভাষার সহজ হিল্লোল আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।"

এই যুগের অপর কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত 'মহিলা' কাব্যটিও জননী ও জায়ার স্নেহ মহিমার বর্ণনায় পাঠককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই এই দুই কবির উদ্দেশে রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন: "তাঁহারা উভয়েই এক ভাবের ভাবুক, এক পথের পথিক, এক উপাস্যের উপাসক একই লক্ষ্যযুক্ত ও একই প্রাণে অনুপ্রাণিত ছিলেন।"

কবি নবীনচন্দ্র সেন 'অবকাশ রঞ্জিনীর' মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'ন। অতঃপর পলাশীর যুদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া রসিক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন এবং 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতক' ও 'প্রভাস' নামক কাব্যপরম্পরায় যশের শিখরে আরোহণ করেন। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে 'পলাশীর যুদ্ধ' বীরত্ব, ও ওজস্বিতা ও করুণ রসে পূর্ণ এবং সবিশেষ কবিত্বের পরিচায়ক।" অপর কাব্যত্রয়ী সুভদ্রার পরিণয়, সুলোচনা, উত্তরা, রুক্মিণী ও সত্যভামা—ভক্তি, স্নেহ, সরলতা, বিনয় ও অভিমান পূর্ব্বক ভালবাসার জীবন্তমূর্ত্তি। তাহার অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, ব্যাসদেব, শৌর্য্য, মহত্ত্ব ও জ্ঞানের অবতার।"

বহরমপুর নিবাসী রামদাস সেনের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার সাহচর্য্যে গবেষণামূলক কর্মে ব্রতী হন। রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য', 'ভারতরহস্য' ও রত্নরহস্য' নামক তিনটি গ্রন্থে ভারতবর্ষের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আর্য্যজাতির সমাজ ও ধর্ম্মনীতি ও সমর প্রণালী এবং গজমুক্ত, ফণিমুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্নের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে বিশদ আলোচনা আছে তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'মডেল ভগিনী, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', 'নেড়া হরিদাস', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'বাঙ্গালী চরিত' 'মহীরাবণের আত্মকথা', 'কালাচাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে কিরূপ সম্পদশালী করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি রামগতি ন্যায়রত্ন রুচিবান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পরিশেষে রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় যে সকল ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন—বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কণ, জীবন প্রভাত ও জীবন সন্ধ্যায় মানব চরিত্রের যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন এবং ঘটনা বৈচিত্র্য, চরিত্র ও নৈতিক বলে সকল পাঠকের চিত্ত বিজয় করিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের শেষ বয়সে রচিত 'সমাজ' ও 'সংসার' নামক উপন্যাস দুটি তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি-শক্তির পরিচায়ক। রামগতি ন্যায়রত্নের মতে 'গ্রন্থকার উহাতে স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরার এরূপ সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন যে তৎপাঠে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদেরও ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই।"

'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের পরিচিতি প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়রত্নের সমালোচনা শক্তির কিছু পরিচয় দেওয়া হইল। আধুনিককালে সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে তাহা অস্বীকার

করা যায় না। কিন্তু তথাপি সাহিত্যের সূচনাকালে যখন মূল্যমান নিরূপণের কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি স্থিরীকৃত হয় নাই সেই সময় রামগতি ন্যায়রত্ন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা সুদীর্ঘ এক শতাব্দী অন্তে অসার প্রমাণিত হয় নাই। এই অসমান্ত কৃতিত্বের জন্য লেখকের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম মূল্যায়নের সার্থক নমুনা হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিলে একই সঙ্গে লেখকের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে তেমনি তাঁহার রচনার প্রতিও অকৃত্রিম সমাদর করা হইবে।

এই গ্রন্থের আর একটি আকর্ষণ 'বাংলা সাময়িক পুস্তিকা ও বাংলা সংবাদ পত্র' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ তালিকা সংযোজন এবং ব্যাকরণ ছন্দ ভাষা ও অলঙ্কার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা যাহা প্রত্যেক সাহিত্য-বিচারকের অধিগত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্মৃতির টুকরো

সাতকড়িপতি রায়

গয়া কংগ্রেসে যখন স্বরাজ্য দল গঠিত হল মতিলালজী তার সেক্রেটারী হলেন। দেশবন্ধুর প্রাণ-পণ চেষ্টায় এবং মতিলালজীর কর্ম্মকুশলতায় স্বরাজ্য দলের দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসে কাউন্সিল যাবার প্রস্তাব গৃহীত হল। তারপর তিনি Central Government এর council এ নির্ব্বাচিত হলেন এবং সেখানে পার্টি লিডার নির্ব্বাচিত হলেন। সেখানে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তা যাঁরা সত্যকার গুণগ্রাহী তাঁরা সকলেই চিরকাল সেকথা মনে রেখেছেন। ১৯২৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় দিল্লীতে গিয়ে মতিলালজীর সঙ্গে দেখা হয়। বহুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন,—ঠিক বড়-ভাই ছোট ভাইএর সঙ্গে যেভাবে আলাপ করে সেই-ভাবে। তখনকার দিনে তাঁকে রাজনীতিক্ষেত্রে সূর্য্য-প্রতিম বলা যেতে পারে। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি যে শোক পেয়েছিলেন সেটা যেন ভ্রাতৃ-বিয়োগের শোক। এরপর কানপুর কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কিন্তু তখন আমি সে শোকের গভীরতা বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম যখন ১৯২৭ সালে গৌহাটী কংগ্রেসে যাবার জন্তে কলকাতায় এসে কয়েকদিন ছিলেন। সে সময় আমি তাঁর সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চাই করেছি। প্রথম দিনেই তিনি বললেন—আপনি চিত্তরঞ্জনের একজন প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন, আপনার সঙ্গে আমাকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হবে।" যে আলোচনা তিনি করেছিলেন তা ঠিক্ যেন সমানে সমানে আলোচনা করার মত। আমি অসুস্থ ছিলাম বলে গৌহাটীতে যেতে পারিনি। তাই আগেই তাঁকে আমার বক্তব্য বলেছিলাম এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর সুন্দরবন ডেস্প্যাচ ষ্টীমার সার্ভিসের জাহাজে গৌহাটী গেলেন।

ভারতের তদানীন্তন যে ক'টী রাজনৈতিক দল ছিল,—কংগ্রেস, মডারেট, মুস্লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা সকলকে নিয়ে মতিলালজীকে চেয়ারম্যান করে যে constitution তৈরী করবার কমিটী হয়েছিল এবং যাতে Dominion Status এর দাবী করে আইন প্রণীত হয়েছিল তাতে মতিলালজীর নেতৃত্ব করবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা গেছল'। constitutionই ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়। এই কংগ্রেসে মতিলালজী সভাপতি হন এবং সুভাষ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর কর্ত্তা ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে ডাণ্ডী-মার্চ্চ সুরু করেন তখন আবার মতিলালজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। মহাত্মা সবরমতী আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন আর সেই আশ্রমে জহরলালের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভা হচ্ছে। রাত্রে সভা শেষ হয়েছে,—সকালের ট্রেনে অনেকেই মহাত্মার সঙ্গে সুরাটে মিলিত হবার জন্তে রওনা হবেন। আমি প্রত্যুষেই জহরলালের তাঁবুতে গেলাম। তাঁর সঙ্গে লবণ-আইন-ভঙ্গ করা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে। তিনি কড়া মেজাজে বললেন—তাঁর আলোচনা করবার ফুরসুৎ হবে না। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছি,—মতিলালজী গান্ধীজীর

কাছে যাবেন বলে প্রস্তুত হয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়েছেন। আমায় দেখেই বললেন,—কি সাতকড়িবাবু কোথায় চলেছেন! আমি বললাম,--কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের কাছে এসেছিলাম লবণ-আইন ভঙ্গ করার টেকনিক্ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে কিন্তু তিনি একেবারেই হাঁকিয়ে দিলেন ফুরসুৎ নেই বলে। তাই মহাত্মার কাছে যাব'। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—জহর কি আপনাকে চেনেন না! আমি বললাম—দেখ্ছি তো তাই। তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে তাঁর মোটরে তুললেন। ষ্টেশনে গিয়ে আমার তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বলা সত্ত্বেও তাঁর প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালেন জোর করে। সুরাট পর্য্যন্ত যেতে যেতে কত গল্পই করলেন। সুরাটে নেবে তাঁর গাড়ীতে মহাত্মার কাছে নিয়ে গিয়ে পৌঁছুলেন। আর সমস্তক্ষণ তাঁর পুত্রের সেই আচরণের জন্তে কেবল appology চাইতে লাগলেন। এরূপ অমায়িক ব্যবহার যে অতবড় উচ্চস্তরের নেতার কাছে পাওয়া যায় তা আগে ধারণা ছিল না আমার। মহাত্মা একগাল হেসে বললেন,—you have also come Satkaribabu? আমি জহরলালজীর ব্যবহারের কথা এবং তারপর মতিলালজীর সমস্ত পথ যেভাবে আমায় যত্ন করে আনলেন সে সব কথা অকপটে বললাম। তিনি নির্ব্বিকার মানুষ। সদা-হাস্যমুখে বললেন, খেয়ে নিয়ে চারটের সময় আমার পাশে পাশে মার্চ্চ করুন, সব টেক্‌নিক আমি বুঝিয়ে দোব আপনাকে।"

মতিলালজী যখন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্তে এলেন, সেই আমার শেষ সাক্ষাৎকার তাঁর সঙ্গে। বরানগরে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ীতে রেখে শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁর চিকিৎসা করছেন। তখন তাঁর কিছু সেবা করবার অধিকারও পেয়েছিলাম। দেখলাম অত রোগের যন্ত্রণাও তিনি অম্লান বদনে সহ্য করে চলেছেন। আর দেখলাম শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্ব তাঁকে নিরাময় করায়। যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন তখন কবিরাজ মহাশয়ের বহু অনুরোধেও এখানে থাকলেন না। দেশের কাজ যে তাঁকে ডাকছে। কবিরাজ মহাশয় বলেছিলেন আর তিন-চার মাস থেকে যান যাতে এ ব্যাধি আর পুনরায় না ফিরে আসে তাই করে দোব। কিন্তু থাকলেন না। বললেন,—যখন কর্ম্মক্ষম হয়েছি তখন কাজে যাই।" হায়, বোধহয় এক বছরের মধ্যেই সেই ব্যাধি আবার দেখা দিল। তখন জহরলাল কবিরাজী চিকিৎসা করতে দিলেন না। ডাক্তার রায় গেলেন চিকিৎসা করতে। কিন্তু কিছুই হোল না। একটী অমূল্য জীবন শেষ হয়ে গেল।

আরও যাঁদের সঙ্গে মিশেছি এবং যাঁদের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে মিল ছিল তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে—আমাদের টি, ফুকন, মধ্যপ্রদেশের রাঘবেন্দ্র রাও, বম্বের জয়াকর ও মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি! এঁদের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ না হলেও যতটুকু দেখেছি তাতে এঁদের বলিষ্ঠ মত এবং প্রভুত কর্ম্মশক্তির পরিচয় পেয়েছি। এঁরা সকলেই স্বরাজ্য দলে উচ্চস্তরের নেতা ছিলেন। এঁদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ই বলবান ছিল। রাঘবেন্দ্র রাও পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর হয়েছিলেন। আর বম্বের জয়াকর প্রিভিকাউন্সিলের জজ হয়েছিলেন।

যাঁদের সঙ্গে মতের মিল না থাকলেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি তাঁদের দুজনের নাম করি। একজন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু যিনি স্বাধীন ভারতে উত্তর প্রদেশের প্রথম মহিলা গভর্ণর হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুকে খানিকটা বাংলারই লোক বলা যায়। তাঁর পড়াশুনা কলকাতায় এবং প্রথম ওকালতির কর্ম্মজীবনও কলকাতাতেই। তাঁর সঙ্গে হাইকোর্টে একসঙ্গে ওকালতি করেছি এবং লাইব্রেরীতে একই ঘরে বসতাম। স্যার রাসবিহারীর জুনিয়ারি করতে গিয়ে ডক্টর রাজেন্দ্রবাবুর যে আমাদের মতই

'হাড়ির হাল' হত তাও দেখেছি। তারপর পাটনায় হাইকোর্টের পত্তন হতে রাজেন্দ্রবাবু সেখানে চলে গেলেন। আবার আমরা মিলিত হোলাম মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসে এসে। তিনি বরাবর মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। আমরা যখন স্বরাজ্য দল গঠনে যোগ দিলাম, রাজেন্দ্রবাবু আসেননি। বিহারের যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়নি। রাজেন্দ্রবাবু অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধীর কর্মী ছিলেন। ত্যাগেরও একটী মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। শেষের দিকে আর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না আমার সঙ্গে। যখন তিনি constituent committee র চেয়ারম্যান তখন আমি সমাজ ও রাষ্ট্রের কি রূপ হওয়া উচিত অর্থাৎ ভারতের constitution কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখে দিল্লীতে নিয়ে যাই। রাজেন্দ্রবাবু সেইসময় আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিন্তু নেহেরুজী প্রভৃতিকে তিনি বুঝাতে পারেননি। সেই আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার। তারপর দশবছর রাষ্ট্রপতি থেকেছেন আর নেহেরুজীকে ভিটো দিয়ে এসেছেন নিজের মত জাহির করতে পারেননি। চাকুরী ছেড়ে এসে কোনও কোনও বিষয়ে তাঁর স্বকীয় মত যেটা জহরলালজীর মতের বিপরীত তা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর তখন না ছিল জোর, না ছিল উপযোগিতা।

সরোজিনী নাইডুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবেই মিশেছিলাম। মানুষ হিসাবে অতি চমৎকার। কিন্তু স্ত্রীলোকের যে দুর্ব্বলতা সেটাও তাঁর চরিত্রে দেখতে পেয়েছি। সেজন্যে নেতৃত্বে মাঝে মাঝে গোলযোগ হয়ে যেত'। তিনিও মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর আর ইংরাজী ও উর্দ্দুতে অসীম দখল ছিল অবর্ণনীয়। ১৯২২ সালের কংগ্রেসে আমাদের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় কিছুদিন আর তাঁর সঙ্গে মিশবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু, ১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসে সভাপতি হওয়ায় পর ১৯২৬ সালে যখন তিনি বাংলাদেশে প্রচার করতে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরতে হয়েছিল আমাকে। তিনি যখন মহিলাদের সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতেন তখন আমাকে তার তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। পাঞ্জাবের একটি মহিলা কর্ম্মী ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে তাঁকে "কংগ্রেসের বুলবুল" বলে ঠাট্টা করেছিলেন সে কথা আমার এখনও মনে আছে। তিনি খুব humerous ছিলেন। কংগ্রেসের সমস্ত নেত্রীস্থানীয়াদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠা ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতিরূপে মেদিনীপুরে ভ্রমণ করতে গেলে আমার বৌদি তাঁর সীমন্তে সিন্দুর পরিয়ে দিয়েছিলেন,- তিনি হাস্যমুখে তা গ্রহণ করেছিলেন। আজকাল স্বাধীন ভারতে বহু মহিলা নেতা হয়েছেন কিন্তু সরোজিনী দেবীর সমকক্ষা কেউ আছেন বলে মনে হয় না। সে জাতটাই যেন আলাদা ছিল। তাঁরা অনেকটা মায়ের আসন গ্রহণ করেছিলেন,—এঁরা যেন সব "দিদিমণির" আসনে অধিষ্ঠিতা। সরোজিনী দেবী বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান, সুতরাং তাঁকে বাঙ্গালীই বলতে হয়। তবে তিনি বাংলার অধিবাসী ছিলেন না, বাংলায় জন্মগ্রহণও করেননি। বাংলা বুঝতে পারতেন কিন্তু বলতে পারতেন না। মাদ্রাজে জন্ম এবং মাদ্রাজী স্বামী তাঁর। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরও জীবনাবসান হয়ে গেছে।

আর এক ব্যক্তি যিনি আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন,—তিনি চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়া। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে বেশী মিশবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জেলা-কোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি মহাত্মার ডাকে ওকালতি ছেড়ে কংগ্রেসে এসেছিলেন। তাঁর এক কন্যার সঙ্গে গান্ধীজীর এক পুত্রের বিবাহ দেন। মহাত্মা গান্ধীর 'কুটুম্ব' বৈবাহিক হয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবের প্রধান আপত্তিকারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তিনি তখন

"ছোট-গান্ধী বলিয়া অভিহিত হইতেন। গয়া কংগ্রেসে তাঁর জিত্ হল কিন্তু দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসে তাঁকে হার মানতে হয়েছে। যখন জিন্না সাহেব ভারতবর্ষ ভাগের কথা তোলেন তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে কিছুদিনের জন্যে তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়। পরে যখন জহরলাল ও প্যাটেল মিলে ভারতকে ভাগ করা ঠিক করলেন তখন আবার কংগ্রেসে চক্রবর্ত্তী মশায়ের খাতির এত' বেড়ে গেল যে মাউন্ট-ব্যাটেনের পরে তিনিই ভারতের গভর্ণর জেনারেল হলেন। আবার ভারতে গণতন্ত্র স্থাপিত হলে তিনি পশ্চিম-বাংলার গভর্ণর হয়ে এসেছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে তাঁর কখনও মিল ছিল না। তিনি বাংলার বিপ্লবী দলের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। আজও তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্ত্তমান এবং জহরলালের সমাজতন্ত্রবাদের ঘোর বিরোধী। তাই তাঁর 'স্বতন্ত্র দল' গঠন।

বাংলার আমার সহকর্মীদের প্রায় সবাই গত হয়েছেন, কেবল দু-চারজন জীবিত আছেন। তাঁদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত না বলাই সমীচীন। কারণ তাঁরা সকলেই আমার আপনার থেকেও আপন। যখন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চলত তখন আমি কোমর বেঁধে এগিয়ে যেতাম। কিন্তু যখন আপনা-আপনি বিবাদ করেছেন তখন আমি মুষড়ে পড়তাম। কোনও দলেই যেতে পারতাম না। তখন বাংলায় দুটো দলই কংগ্রেসের মধ্যে ছিল। কংগ্রেসের বাইরে অবশ্য আরও দুটো দল ছিল,—মুস্লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা। এদের প্রভাব তেমন ছিল না প্রথম দিকে। দেশবন্ধুর তিরোধানের পরে ওরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। যদি কংগ্রেসের মধ্যে দুটো দল না হত, তাহলে হয়ত ভারতের ভাগ্য অন্যরূপ হত।

রাজনৈতিক দলাদলি, ইংরাজের সহিত রাজনৈতিক বিবাদ, এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে শতধা বিভক্ত করে ইংরাজের ভারতশাসন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে যা দেখেছি তার বিষয়ে আরও কিছু লিপিবদ্ধ করবার ইচ্ছা আছে। তবে উপস্থিত আমাদের সমাজের পরিবর্ত্তনের বিষয় যা এই দীর্ঘ জীবনে দেখলাম সে সম্বন্ধে আমার অভিমত কিছু লিখি।

(২৩)

এই "স্মৃতির টুকরো"তে প্রথম দিকে আমি রাঢ় দেশের সমাজের একটু চিত্র দেবার চেষ্টা করেছি। ঐ চিত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের। সে সময়ে কেবল ব্রাহ্ম সংসারে এবং বিলাতফেরৎ ব্যক্তিদের সংসারে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান অসবর্ণ বিবাহ। দ্বিতীয় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরৎ সংসারে শ্রেণী বিভাগ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বিভাগটা চলত না। মুসলমান বাবুর্চ্চির হাতে খাওয়াটা চলিত হচ্ছিল। কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি তরি-তরকারি বা মাছ-মাংস যদি মেথরে ছুঁয়ে দিত তবে মুসলমান বাবুর্চ্চিও তা খেত না। এম্, কে, দেব বলে মেদিনীপুরে একজন সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁর বাজার এলে তিনি সেই বাজারের জিনিষগুলি মেথরকে ডেকে এনে ছুঁইয়ে দিতেন। একদিন ঠিক ঐ সময়ে আমি তাঁর সামনে ছিলাম। আমি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন মেথরকে দিয়ে ছুঁইয়ে দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—মুসলমান বাবুর্চ্চিরা আর ওর ওপর ভাগ বসাবে না। বাবুর্চ্চিরা এগুলো রাঁধবে কিন্তু খাবে না। শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। ক্রমশঃ বিংশ শতাব্দীতে এই উভয় বিষয়ে অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহ ও ছুঁতমার্গ পরিহার বিষয়ে বঙ্গভূমির বাঙ্গালীরা অগ্রসর হচ্ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু ইহার বিশেষ লক্ষণ ছিল না। ১৯২১ সালে যে কংগ্রেস গঠিত হল তার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ছাড়া আর্থিক ও সামাজিক অসাম্য দূর করবার জন্যেও বিশেষ কার্যক্রম গৃহীত হল। আর্থিক অসাম্য দূরী-করণের ও উন্নতির জন্যে প্রধানতঃ চরকার প্রচলন

এবং খদ্দর পরিধানের ব্যবস্থাই হয়েছিল। সামাজিক অসাম্য দূরীকরণের জন্যে অসবর্ণে বিবাহ ও ছুঁৎমার্গ পরিত্যাগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। হিন্দুসমাজ এই উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে আরম্ভ করে কিন্তু বাংলায় এটা যতশীঘ্র প্রসারলাভ করে অন্যান্য প্রদেশে তত হয়নি। ইংরাজ চলে যাবার পরে বাংলাতে এক পংক্তিতে হিন্দুর সকল শ্রেণী খাদ্য গ্রহণ চালু হয়ে গেছে। অপর প্রদেশের কথা বলতে পারব না। অসবর্ণ বিবাহও বাংলা দেশে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। এর ফলাফল সমাজের কল্যাণকর হবে কিনা তা এত শীঘ্র বলা সম্ভব নয়। তবে হিন্দু-মুসলমানে, হিন্দু ও খৃষ্টানে, বা খৃষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। এর প্রধান কারণ আমার মনে হয়—হয়ত বিবাহের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত বেশী পার্থক্য। কিন্তু রেজিষ্ট্রী করেও ত বিবাহ হতে পারত ঐ সব ক্ষেত্রে। অথচ তাও বিশেষ দেখা যায় না। আর দ্বিতীয় কারণ হয়ত সামাজিক ও পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের অনুষ্ঠানাদির পার্থক্য। আবার ধর্ম্মের আচরণেও অত্যন্ত বেশী পার্থক্য রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে দু-চারটি হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ হয়েছে অথচ উভয়েই নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করেনি। যাকে প্রেম করে বিবাহ বলে, ভালবাসার জন্য বিবাহ বলে, তাই। বিবাহ রেজেষ্ট্রী করে হয়েছে কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান স্বামী ও স্ত্রী পৃথকভাবে করে। তবে হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান হয়ে মুসলমান বা খৃষ্টানকে বিবাহ করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আর পূর্ব্ববঙ্গে ত বহু হিন্দু-নারীকে জোর করে মুসলমান করে বিবাহ করবার দৃষ্টান্ত প্রচুর এখন।

পূর্ব্বে বিবাহবাড়ীতে বা সামাজিক কাজে নিমন্ত্রিত-দের মধ্যে ব্রাহ্মণদের পৃথক বসান হত এবং অন্য সমস্ত শ্রেণীকে একত্রে বসান হত। এটা আমি কলকাতাতেও বহু দেখেছি। "এই দিকে ব্রাহ্মণদের আর ঐ দিকে ভদ্রলোকদের"—এই ভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হত তখনকার দিনে। কেবল যে পুরুষদের মধ্যেই নয় মহিলাদের মধ্যেও আজকাল সহরে একসঙ্গে খাওয়াতে আর আপত্তি নাই। কিন্তু, পল্লীগ্রামে এখনও পুরাতন সামাজিক নিয়মকানুন অনেকাংশে বর্ত্তমান আছে। নিমন্ত্রিতগণ পৃথক পৃথক বসিয়া আহার করেন। তা পুরুষ কি, আর মেয়েই কি!

অসবর্ণ বিবাহও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে চলিত হ'য়েছে। পল্লীগ্রামে এর চল এখনও হয়নি।

পূর্ব্বেই বলেছি এর ফলাফলের কথা ভবিষ্যৎ লিপিবদ্ধ করবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি অসবর্ণ বিবাহে ব্রাহ্মণ যুবক ও ব্রাহ্মণে-তর যুবতীর বিবাহে বিশেষ কুফল হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুবতীর সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর যুবকের বিবাহে কুফল দিয়েছে এটা আমি দেখেছি। এক ক্ষেত্রে নয়, একাধিক ক্ষেত্রে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের কথা আছে। তাতে ব্রাহ্মণকে উচ্চ শ্রেণী এবং অন্যান্যকে তাহা অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণী বলা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে ব্রাহ্মণেতর যুবতীর বিবাহ অনুমোদন করা হয়েছে; কিন্তু, এর বিপরীত বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা যদি আমাদের পৃথিবীতে জন্ম অবস্থিতি ও তিরোধান প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করি তাহলে শাস্ত্রের এই অনুশাসন হিন্দু হয়ে না মেনে চলা উচিত নয়। আমার মনে হয় সমাজ যদি অনুলোম বিবাহ গ্রহণ করে এবং প্রতিলোম বিবাহ ত্যাগ করে চলে তবে সমাজের উপকারই হবে। আইন প্রণয়ন করে জোরজবরদস্তি একটা প্রথা চালু করা সমাজের পক্ষে কখনও কল্যাণকর হয় না ব'লেই আমার ধারণা।

সামাজিক বন্ধন ব'লে যে অবস্থা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেটা ইংরাজ-শাসনের সময় প্রায় সমস্ত সহর থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। পল্লীগ্রামে এখনও তার কিছুটা চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সমাজ-বন্ধনের ফল সময়ে সময়ে খুবই খারাপ হয়েছে,—যদিও বহুক্ষেত্রে এর সুফলও দেখা যেত। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাও

আজকাদের সংসারে পৃথকান্ন এখন নিত্য-নৈমিত্তিক হ'য়েছে। এমনকি পিতামাতার বর্ত্তমানেই পুত্ররা তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে পৃথক হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। এই যে *সমাজের চিত্র এটা* আত্ম-স্বতন্ত্রতার ফল,—ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এতে সমাজের সুখ সমৃদ্ধি কি বৃদ্ধিলাভ করেছে?—আমার মনে হয় তা হয়নি। তবে যেখানে ত্যাগের মহিমা অদৃশ্য হয়েছে, সেবার চিহ্ন বর্ত্তমান নেই, পরমত-সহিষ্ণুতার একান্ত অভাব,—সেখানে শান্তির জন্য এই পৃথক গৃহস্থের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস চলে গেছে, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির একান্ত অভাব, সেখানে এই পৃথক সংসার অপরিহার্য্য।

এই যে সদ্‌গুণাবলি আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে বর্ত্তমান নেই তার কারণ কি? অনেক চিন্তার পর আমার স্থির ধারণা,—ইংরাজপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীই এর মুখ্য কারণ। শিক্ষার মধ্যে সৎ চরিত্র গঠনের কোনই ব্যবস্থা ইংরাজ-সরকার রাখেন নি। কিন্তু, এই ভারতবর্ষে যেসব খৃষ্টান পাদ্‌রীরা কলেজ স্থাপন করেছেন এবং যেখানে খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বীগণই বেশীর ভাগ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন সেখানে চরিত্র-গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। আজ সতের-আঠারো বছর দেশের শাসন ক্ষমতা আমাদের নেতৃবৃন্দের হাতে আসা সত্ত্বেও তাঁরা শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করে চরিত্র গঠনের ব্যবস্থার প্রচলন করেন নি। এর ভয়াবহ পরিণতি সমাজকে চরমভাবে আঘাত করেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা যুবক অপেক্ষা এই শিক্ষায় শিক্ষিতা যুবতীদের মধ্যে বেশী সংক্রামিত হয়েছে। ধর্ম্ম-বিহীন এই শিক্ষার ফলে সমাজ-জীবন থেকে ধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্তপ্রায়। এটা যে একটি জাতির পক্ষে মর্ম্মান্তিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সৎগুণাবলি অর্জ্জন করতে হলে বাল্যে ও কৈশোরে প্রত্যেকটি গুণের অভ্যাস করতে হয়। ভারতবর্ষ ছিল তাতে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে প্রথমেই সৎ গুণগুলি অভ্যাস করতে হত;—তার সঙ্গে কিছু পরাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে হত। তারপর অপরা-বিদ্যা বা secular education দেওয়া হত। এতে অধিকাংশের চরিত্র দৃঢ় ও সৎ হ'ত। এখন যদি দেশের সমাজকে নির্ম্মল করতে হয় তবে সেইভাবে শিক্ষা-প্রণালীকে পরিবর্ত্তিত করতে হবে বলেই মনে করি। তা নাহলে সমাজ ক্রমশঃ আরও মলিন হয়ে যাবে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের যে রূপ পরিস্ফুট তারই কিছুটা বর্ণনা করলাম।

(২৪)

১৯২২ সাল থেকে ১৯২৫ সালের রাজনৈতিক ইতিহাস—"দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বৎসর—" প্রবন্ধে আমি বর্ণনা ক'রেছি। ঐ সময়ে আমাদের গৃহস্থালীর কিছু বিবরণ দিই। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসুধীরপতি রায়ের একমাত্র কন্যা রাজলক্ষ্মী ও আমার দ্বিতীয়া কন্যা অমলা একবয়সী এবং উভয়েই একই বিদ্যালয়ে পড়িত। ১৯২১ সালে উভয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হ'ল আর সকলের সঙ্গে। কিন্তু ওদের বিবাহ দিতে হবে। রাজলক্ষ্মী তিন চার মাসের বড় অমলার থেকে। কাজেই তার বিবাহের সম্বন্ধ আগে করতে হবে। একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পেলাম কিন্তু 'ভঙ্গ'-ঘরের। আমার দাদা কিশোরীপতি তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। তাঁর কাছে গেলাম তাঁর মত নিতে। তিনি "ভঙ্গে" বিবাহ দিতে রাজী হলেন না,—স্বভাব-কুলীনের ঘরে পাত্র খুঁজতে বললেন। আমাদের বংশের ইতিহাস একটু বিচিত্র। আমরা ব্রাহ্মণ বংশ, শুদ্ধ-শ্রোত্রীয়। পূর্ব্বপুরুষের সকলেই স্বভাব কুলীনের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করে এসেছেন। মেথরের হাতে খেতে দাদার আপত্তি হয়নি কিন্তু রক্তের সম্পর্ক

বিষয়ে তাঁর দৃঢ় রক্ষণশীল মত। যা হোক্, স্বভাব কুলীনের ঘরেই একটি পাত্র পেলাম। হাওড়ায় শিবপুরের অধিবাসী রায় বাহাদুর, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Retired District Judge-এর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, পাশ করে এম্, এ, এবং ল' পড়ছে। গোপালবাবু গোঁড়া হিন্দু। তাঁর ছয়টি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ডাক্তার, দ্বিতীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, চতুর্থ পুলিশের ইন্‌সপেক্টর, পঞ্চম পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট আর আমরা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্ত্তৃস্থানীয়। কন্যা দেখে গোপালবাবুর পছন্দ খুব। আমাদের বংশগৌরবও তিনি জানেন। কাজেই তাঁর কোনও আপত্তি হ'ল না। আশীর্ব্বাদের দিন স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ সংবাদ এল, আবার মেয়ে দেখা হবে। কারণ জানতে গিয়ে শুনি দ্বিতীয় পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আপত্তি,—এখানে বিবাহ দিলে তাঁর চাকুরী থাকবে না। তারপর পঞ্চম পুত্র রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি সুপার শ্রীরামপুর থেকে এসে কন্যা দেখে গেলেন। তিনি তাঁর বাবাকে বললেন,—আমরা দুই ভাই পুলিশে চাকরী করি আমাদের চাকরী যাবে না, আর মেজদার চাকরী যাবে? বিবাহ দিয়ে দিন, মেজদা না আসে না আসবেন। হ'লও তাই। দ্বিতীয় ভ্রাতা জ্ঞানচন্দ্র সে বিবাহে এলেন না ভয়ে। দাদা তখনও জেলে বন্দী। বৈশাখ মাস (১৯২৩ এর মে মাস) ছোট ভাই, কন্যার পিতা আসতে পারবে না লিখলে। আসতে পারবে না কারণ পত্তনি সম্পত্তি রক্ষার ব্যস্ত। অবশেষে জোড়া গিয়ে তাকে নিয়ে আসি।

বিবাহের রাত্রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (রাজলক্ষীর মামা) উপস্থিত ছিলেন। আমি খরচ কমাবার জন্যে ছাতে ম্যারাপ বাঁধিনি। সব খাওয়ান চুকে গেলে স্যার আশুতোষের সামনে গোপালবাবু আমাকে বললেন,—সাতকড়িবাবু, আপনার ত' খুব বুকের পাটা। বৈশাখ মাস, অথচ ম্যারাপ বাঁধেন নি। যদি জল-ঝড় হত? আমি কিছু বলবার আগেই স্যার আশুতোষ বললেন,—গোপালবাবু, এতে আর এমনকি বুকের পাটা দেখলেন সাতকড়ির? হাঁসের মত একপাল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, হাইকোর্টের অমন জমজমাট প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে এই যে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে স্বদেশী আন্দোলনে,—এতে কতটা বুকের পাটার দরকার ভাবুন ত'?" কথাটা আজও আমার মনে আছে। তাঁর একটি কথা মনে আছে। লক্ষ্মীর বৌভাতের দিন গোপালবাবুর বাড়ীতে তিনিও নিমন্ত্রিত হ'য়ে গেছলেন। লক্ষ্মীকে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এগার-বারো বছরের মেয়ে ত'। চুপটি করে বসে আছে। স্যার আশুতোষ বলছেন,—কি লক্ষ্মী, আমাদের চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না? ছোট মেয়ে সে কি বলবে? তাই আবার বললেন, বেশ, বেশ যত না চিনতে পারবি ততই ভাল, ততই বুঝব শ্বশুর বাড়ীতে সুখে আছিস। এটা যে হিন্দু-সমাজের পক্ষে একটি খুব মূল্যবান কথা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিবাহের পর শচীন এম্, এ-তে ফাষ্ট ক্লাশ হ'ল এবং ল' পাশ করে হাইকোর্টের উকিল হল। হাইকোর্টে যা কখনও হয়নি,—উকিল হ'য়ে original side এর Assistant Registrar হল। ক্রমশঃ Registrar এর পদে উন্নীত হয়েছিল। লক্ষ্মীর শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, জা, ননদ, সবাই লক্ষ্মীকে আদর করেছেন আর বলেছেন,-শচীনের স্ত্রী-ভাগ্যে সব। হায়, আজ সে শচীন কোথায়? মাত্র ৫৬৷৫৭ বছর বয়সে হঠাৎ তার মৃত্যু হল। পূর্ব্বদিন তার কনিষ্ঠা কন্যার আশীর্ব্বাদে রাত বারটা পর্য্যন্ত আনন্দ করেছে, পরদিন বেলা সাড়ে দশটায় হাইকোর্টে টেলিফোন করে বলেছিল,—শরীরটা ভাল নেই, আজ যেতে পারব না। বলতে বলতে phone পড়ে গেল, শচীনও পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। হাইকোর্টের ছুটি হয়ে গেল। সব জজরা ছুটে এলেন। না, আর লিখতে পারি না।

আমার দ্বিতীয়া কন্যা অমলার বিবাহে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। নীরোদ চট্টোপাধ্যায়ের (আলিপুরের বড় উকিল) একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর এম্, এ পাশ করেছে।

নীরদবাবু মেয়ে দেখে পছন্দ করলেন কিন্তু দেনা-পাওনার বহরে হল না বিবাহ। আর একটি ভদ্রলোক,—ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের ম্যানেজার মেয়ে পছন্দ করলেন। তাঁরও একমাত্র পুত্র। তারপর তাঁর কাছে যেতে বললেন,—সাতকড়িবাবু, আমি ভাবছি কি জানেন এই বিয়ে দিলে আমার চাকরি যদি চলে যায়। আবার এও ভাবছি আপনারা হয়ত শীঘ্রই দেশের কর্ত্তা হয়ে বসবেন তখন ত' আমি, আমার ছেলে, সকলের ভাল চাকরিও হতে পারে।"—মানুষের যে মনের কত রকম অবস্থা! যাই হ'ক, কয়েকমাস পরে হঠাৎ নীরোদবাবুই তাঁর পুত্র বীরেশ্বরের সঙ্গে ঐ কন্যার বিবাহ দিলেন। সেই বীরেশ্বর হাইকোর্টে একজন যশস্বী উকিল হ'ল। সেও আজ কালের করালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে,—মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে!

এর পরেও আমাকে আরো ছয়টি মেয়ের এবং দাদার ছয়টি মেয়ের বিবাহ দিতে হয়েছে। কেবলমাত্র আমার পঞ্চম কন্যার বেলা পাত্র খুঁজতে একটু কষ্ট করতে হয়েছিল, তাছাড়া সকলের বিবাহ অল্প চেষ্টাতেই হইয়াছিল। তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হল মেডিকেল কলেজের একটি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে। কিন্তু পাত্র আমাকে খুঁজতে যেতে হয়নি,—টাকাও লাগেনি। আমার মেয়ের তখন ১১ বৎসর বয়স। অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলনে যেদিন চিত্তরঞ্জন, বীরেন শাসমল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি জেলে গেলেন তার-পরদিন, বোধহয় ১১ই কি ১২ই ডিসেম্বর একটি ছেলে-মানুষ যুবক কংগ্রেস অফিসে এসে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে জেলে যেতে চাইল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি কর? বল্লে,—আমি ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের চাকরী ছেড়ে এলাম। আমার তখন একজন ডাক্তারের বড় প্রয়োজন। সিভিক গার্ড আর সার্জ্জেণ্টরা স্বেচ্ছা-সেবকদের মারধর করে রক্তারক্তি করে ছেড়ে দিচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ করার লোকও একটা পাইনি। ডাক্তার যুবককে বললাম,—যদি এই আহতদের medical help দাও তাহলে জেলে যাওয়ার থেকে অনেক বড় কাজ করা হবে তোমার। তাইতেই রাজী হয়ে গেল। তারপর আন্দোলন বন্ধ হলে ন্যাশন্যাল মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাক্তার কুমুদশঙ্করের সহযোগী হয়ে গেল। তারপর প্রায় তিন বছর পরে আমার জামাতা হল। এখন তিনি কলকাতার একজন শ্রেষ্ঠ সার্জ্জেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য কন্যাদের বিবাহের কথা পরে লিখব' প্রয়োজন হলে। এখন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর সহকারী হিসাবে যে পাঁচবছর কাজ করেছিলাম (যে প্রবন্ধ "প্রণব" পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে), সেই সময়ের কিছু দরকারি কথা আজ লিখি।

(২৫)

১৯২১ সালে নূতন কংগ্রেস সুরু হল। জেলায় জেলায় কংগ্রেস গড়া হ'তে না হতে জে, এম্, সেনগুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গে রেল ও ষ্টীমারে ধর্ম্মঘট লাগিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা জেলার বসন্ত মজুমদার। মাইনে বাড়াবার জন্যে সেই ধর্ম্মঘট হয়নি,—অসহযোগের ধর্ম্মঘট। রেল নাই, ষ্টীমার নাই। দেশবন্ধু, বাসন্তী দেবীকে নিয়ে গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পাড়ি দিলেন এক নৌকায়। এদিকে যতীন সেনগুপ্ত ও বসন্তদা বন্দী হয়েছেন। আর তাঁদের জায়গায় কাজে অবতীর্ণ হলেন যতীনের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা এবং বসন্তদার পর্দ্দানসীন পত্নী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার।

ঠিক্ এই সময়ে মেদিনীপুর জেলা কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুরে চৌকিদারী ট্যাক্স্ বন্ধ আন্দোলন সুরু করেছিলেন। সেই ১৯২১ সালে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Local Self Govt.-এর মন্ত্রী হিসাবে Village Self Govt. Act-এর দ্বারা যে ইউনিয়ন বোর্ড চালু হবার কথা তাহাই সমস্ত বাংলাতে চালু করলেন। মেদিনীপুরের কংগ্রেস স্থির করলে ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স্ বন্ধ কর। অসহযোগের এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথাও হয়নি। ট্যাক্স্ দোবনা, কিন্তু ট্যাক্সের পরিমাণ অনুসারে একটি করে তৈজসপত্র দোবো। কাঁথি মহকুমার একটি গ্রামের

কথা বলি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বললেন ট্যাক্স আদায় করা তাঁর সাধ্যাতীত। সারকেল অফিসার চৌকিদার নিয়ে ট্যাক্স আদায় করতে গেলেন। যার যেমন ট্যাক্সের পরিমাণ সে সেইরূপ তৈজসপত্র (পিতল কাঁসার) দিয়ে দিল। চৌকিদার কর্তৃক সেগুলি একটি গাছের তলায় সংগৃহীত হ'ল। তারপর সারকেল অফিসার ঐগুলি নিলাম করালেন। কোনও খরিদ্দার নাই। তখন ঐগুলি মহকুমা সহরে নিয়ে যাবেন। গরুর গাড়ী পাওয়া গেল না। চৌকিদারগণ ব'য়ে নিয়ে যেতে অস্বীকার ক'রলে। ব'ললে গ্রামে বাস ক'রে সকলের সঙ্গে বিবাদ ক'রতে পারবনা। S.D.O. মহকুমা থেকে চাপ্রাসী পাঠালেন। তারা ঐগুলি ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে বলে উর্দি ফেলে দিয়ে চাকরী ছাড়বার উপক্রম। S.D.O. কালেকটারকে লিখলেন একটি গ্রামের এই অবস্থা। এক পয়সাও আদায় হ'লো না। সমস্ত জেলায় কি ক'রে কি হবে? কালেক্টার ঐ কথা রিপোর্ট ক'রতে মেদিনীপুর জেলা থেকে নভেম্বর মাসে ইউনিয়ন বোর্ড উঠে গেল। বীরেন্দ্র শাস্মলের এ কীর্ত্তির তুলনা নাই। বারদোলীতে খাজনা বন্ধের আন্দোলন সর্দার প্যাটেলের অধীনে আরম্ভ হ'য়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মাজী সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। সেটার শেষ ফল হয়নি। যতীন সেনগুপ্তর strikeও শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছিল। কিন্তু বীরেনের কীর্ত্তির ফল ইউনিয়ন বোর্ড অপসারণ।

সারা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন Prince of Walesকে বয়কট করা। ইহা আইন অমান্য আন্দোলন। এ আন্দোলনে এখনকার Viceroy Lord Reading নিজেকে এতদূর অপমানিত জ্ঞান করেছিলেন যে, শেষ পর্য্যায়ে যখন রাজপুত্রকে কলিকাতায় ২৪শে ডিসেম্বর আনবার দিন স্থির হল; তখন ১৮ই ডিসেম্বর তিনি নিজে মদনমোহন মালব্যজীকে সঙ্গে করে এসে দেশবন্ধুর সঙ্গে জেলে আপস্ করবার জন্য মালব্যজীকে নিযুক্ত করেন। তাঁর আপোসের সর্ত্ত ছিল, তিনি Civil disobediance বন্দীদের মুক্তি দেবেন (তখন সারা ভারতে একলক্ষ বন্দী)। ভারতে Round Table conference করবেন, তার বিষয় হবে স্বরাজ, পাঞ্জাব অত্যাচার ও খিলাফৎ এবং পক্ষ হবে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার। তার বদলে তিনি চেয়েছিলেন রাজপুত্রকে কলিকাতায় সকলে অভ্যর্থনা কর। দেশবন্ধু এই অসহযোগ দ্বারা এইরূপ আপোষ্ নিষ্পত্তি আশা করেননি। সুতরাং তিনি এবং বাংলার জেলে আবদ্ধ ও জেলের বাহিরে সকল নেতৃবৃন্দ রাজী ছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীকে সবরমতিতে সমস্ত জানান সত্ত্বেও তিনি রাজী না হওয়ায় আপোষ হয় নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার উল্লিখিত "দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বৎসর" প্রবন্ধে লিখেছি। পরে চৌরীচৌরায় পুলিশ পোড়ানোর জন্য মহাত্মাজী এ আন্দোলন বন্ধ করেন।

তার পরের ঘটনা কাউন্সিলের মধ্যে গিয়ে অসহযোগ করবার জন্য দেশবন্ধুর Council entry programme। ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধুর এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। মহাত্মাজী তখন জেলে। প্রধান আপত্তি দিলেন চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারিয়া, সরোজিনী নাইডু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন মতিলালজী, ভি জে প্যাটেল প্রভৃতি। দেশবন্ধু গয়াতেই সভাপতিত্ব ত্যাগ করে স্বরাজ্যদল গঠন করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে অবশেষে দিল্লীতে Special কংগ্রেসে council entry পাশ করান এবং নির্ব্বাচন পর্ব্বে ১৯২৩ সালে যোগ দিয়ে অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হয়ে কাউন্সিলে গিয়ে সমস্ত বজেট না-মঞ্জুর করে দিলেন। তখন ডায়র্কি সিষ্টেম। যেগুলি গভর্ণরের হাতে Reserved সেগুলি গভর্ণর সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। যেগুলি transfered বিষয় সেগুলির জন্য ছয়মাস বাদে আবার বজেট আনবেন স্থির ছিল। ঐ বজেট্ সেসনে দেশবন্ধু একটি Constructive Speech দিয়েছিলেন। তিনি মন্ত্রী হলে কি ভাবে দেশ গঠন করতেন, তাই বলেছিলেন। সেই বক্তৃতা বিলাতে গিয়াছিল।

লর্ড বার্কেন্‌হেড তখন সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া। ঐ ছয়মাস গত হওয়ার পূর্ব্বেই লর্ড বার্কেন্‌হেড্ দেশবন্ধুকে লিখলেন যে, আপনার বক্তৃতায় আপনি যে ভাবে দেশ গঠন করবার কথা বলেছেন, আপনি সহযোগিতা করে তাই করুন। ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, ষ্টাটুটারী সময় চলিয়া গেলে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের আইনে যে দশবৎসর চল্‌বে বলে বলা হয়েছে সেই দশবৎসর গেলে ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষকে Dominion Status দেওয়া হইবে। মহাত্মাজী তখন দেশ গঠন কাজেই ব্যস্ত। দেশবন্ধু বললেন কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব নিলে গঠনের সুবিধা হবেই। আর ১৯২৯ সালে যদি Dominion Status পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি? কিন্তু মহাত্মাজী বললেন ব্রিটিশ সরকারের কোন প্রতিশ্রুতিতে তাঁহার আস্থা নাই। সুতরাং ইহা গৃহীত হয় নাই। ইহার পর দেশবন্ধু আর বাজেট-এ আপত্তি করেন নাই এবং উহা পাশ হইয়া যায়। স্বরাজ্য-পার্টি স্থাপন করা থেকেই দেশবন্ধু পল্লীগঠনে বিশেষ জোর দেন। মেদিনীপুরে ইহার আশ্চর্য্য ফল হয়েছিল। মেদনীপুরে বহু ধর্ম্মগোলা হয়েছিল। বহু আপোষ সমিতি হয়েছিল যেখানে বিরোধ মীমাংসা হ'ত, কংগ্রেসের পৃথক ডাক-বিভাগ হয়েছিল। জমি হস্তান্তর রেজেষ্ট্রি অফিসে হইত না। সাদা কাগজে দলিল লিখিয়া কংগ্রেসের মোহরাঙ্কিত করে সম্পাদকের সহি দ্বারা দলিল শুদ্ধ হইত। বিবাদের সংকেত শাঁখ বাজিয়ে জানান হইত। গভর্ণমেণ্ট এ সংবাদ পাইয়া একদিনে ধর্ম্মগোলা ভেঙ্গে দিলে এবং সমস্ত কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষকে বন্দী করলে। সব উঠে গেল।

আমার মত যদি কেহ জীবিত থাকেন, তিনি আমার এই কথা সমর্থন করিবেন। দেশবন্ধুর পরের কীর্ত্তি তারকেশ্বর মন্দির দখল। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ হবার পর মহন্ত দেশবন্ধুর শরণাপন্ন হইল। উনি তারকেশ্বরে গিয়া বক্তৃতা দিলে মহন্ত তাঁর সমস্ত গৃহের দরজা খুলে দেন এবং উহা কংগ্রেসের দখলে আসে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সভা কোর্টে মোকদ্দমা করেছিলেন মহন্তর বিরুদ্ধে। তাতেও দেশবন্ধু গিয়ে মহন্তর হ'য়ে সওয়াল করেন। কিন্তু ইংরাজ রাজের আদালত তাহা গ্রহণ করেন নাই। দেশবন্ধুর আর এক কীর্ত্তি কলিকাতা করপোরেশন দখল করা। তিনিই তার সুরেন্দ্রনাথ কৃত আইনের কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র এবং সুভাষ প্রথম Chief Executive Officer। কিন্তু এই করপোরেশন দখল উপলক্ষে একটি বন্ধুবিচ্ছেদ হয়। বীরেন শাসমলের খুবই ইচ্ছা ছিল তিনি Chief Executive Officer হবেন। কিন্তু দেশবন্ধু সুভাষকে করায়, বীরেনের ধারণা হল সুভাষ কলিকাতার অভিজাত বংশের যুবক বলে দেশবন্ধু বীরেনকে না করে সুভাষকে করলেন। বীরেন দেশবন্ধুকে স্পষ্ট ভাষায় ঐ কথা বলে তাঁর পাশ থেকে চলে গেল, বলে গেল, যেদিন সে কলকাতায় বাড়ী করবে এবং বড় মোটর গাড়ী করবে এবং কলকাতায় একজন আভিজাত ব্যক্তি বলে গণ্য হবে, সেইদিন আবার আসবে। আমি উপস্থিত ছিলাম। সে দৃশ্যের বর্ণনা আমি আমার "দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বৎসর" প্রবন্ধে করেছি। পুনরুল্লেখ করতে চাইনা। বড় করুণ দৃশ্য।

এরপর ১৯২৪ সালের বেলগাঁও কংগ্রেস। মহাত্মা গান্ধী প্রেসিডেণ্ট। দেশবন্ধু ঐ কংগ্রেসে গিয়েই অসুস্থ হন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাস। তিনি আর সুস্থ হন নাই। প্রথম পাটনায় ভাইয়ের কাছে পরে রাজগীরের থেকে কিছু সুস্থ হয়ে বাজেট সেশনে যোগ দিবার জন্য মার্চ্চ মাসে কলকাতায় আসেন এবং একদিন ষ্ট্রেচারে করে গিয়ে ভোটও দিতে হয়। বাজেট সেসন হ'য়ে গেলে তার পর প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স। সে কনফারেন্সে তাঁকে নাস্তানাবুদ্ করবার জন্যে একদল বিশেষ চেষ্টা করেন। রাত্রি জাগরণের পর একটা মীমাংসা হয়। এতে তাঁর শরীর আবার ভেঙ্গে পড়ে। সুতরাং ১৯২৫ সালের মে মাসে তিনি স্বাস্থ্য উদ্ধার জন্য দার্জিলিং-এ যান। সেখানেই ১৬ই জুন দেহরক্ষা করেন।

ক্রমশঃ

আকাশে মেঘ দেখে

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ

স্পার্লিং চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা হল প্লেনটা স্পার্লিংকে নিয়ে রানওয়ে ছেড়ে অদৃশ্য হয়েছে। আমেরিকা যাবে স্পার্লিং। একদিন ও মায়ের ওপর, দেশের ওপর অভিমান করে পালিয়ে এসেছিল সোজা বাংলা দেশে। সুজলা সুফলা বাংলাদেশের স্নেহ-ভালবাসাও নাকি শীতল আর গভীর, এই কথাই শুনেছিল ও। আর সেইজন্মেই ও সোজা বাংলাদেশে চলে এসেছিল। এই বাংলার শীতল স্নেহচ্ছায়ায় স্পার্লিং ওর তৃষ্ণার্ত্ত, অশান্ত হৃদয়টাকে রেখে খুব শান্তি পেয়েছিল। একদিন ও নিজেই বলেছিল, "জানিস মিট, এই বাংলা দেশের মত ভালবাসা, এখানকার মত শান্তি আর কোথাও নেই রে, আর কোথাও নেই।"

খুব অদ্ভুত ছিল এই বিদেশী ছেলেটা। ওর অদ্ভুত প্রকৃতি দেখে দিব্যেন্দু প্রায়ই ভাবতো। স্পার্লিং-এর যেন এই বাংলারই কোন স্নেহময়ী জননীর কোলে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল। ও আমেরিকার ছেলে এটাই নাকি ওর জীবনের চরম অভিশাপ। ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা যখন ক্রমশঃ গভীর হচ্ছিল তখনি ওকে জানতে পেরে ওকে বুঝতে পেরে ভীষণ অবাক হচ্ছিল দিব্যেন্দু।

"জানিস মিট—" স্পার্লিং বলেছিল, সারাটা জীবন একটুও স্নেহ-ভালবাসা পাইনি। অথচ একটু ভালবাসা পাবার জন্ত কতবার এর ওর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু যা পেয়েছি তাতে আমার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়নি। আমাদের দেশে কোথাও একটুও ভালবাসা নেইরে। মা বাবারা চাকরী করেন, সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে গিয়ে ডান্স করেন। ছেলেমেয়েদের দেখার, তাদিকে স্নেহ-ভালবাসা দেবার তাঁদের সময় কোথায় বল? আয়ার হাতেই বড় হলাম। তাদের কাছ থেকে যেটুকু স্নেহ-ভালবাসা পেলাম তাই দিয়েই হৃদয়ের শুকনো জায়গাগুলো ভেজাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এক অঁাজলা জল দিয়ে কি একবস্তা বালি ভেজানো যায় রে? সে কি কষ্ট, তুই বুঝবিনা মিট। যখন জ্ঞান হল, যখন বুঝতে শিখলাম, যখন মনের মধ্যে একটা তীব্র স্নেহ-কাঙাল তৃষ্ণা জেগে উঠলো তখন কি আকুলিবিকুলিই না করেছি। পাশ্চাত্যের উলঙ্গ রূপ দেখে আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমি মরে যাব। দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। সে তুই বুঝবিনা মিট, সে তুই কল্পনা করতে পারবিনা।

অফিস লীগের একটা খেলার দিনে খেলার মাঠেই হঠাৎ স্পার্লিংএর সঙ্গে দিব্যেন্দুর পরিচয় হয়েছিল। আর সেই পরিচয়ের সুতোটাকে টানতে টানতে ওরা একটা রেষ্টুরেণ্টে এসে বসেছিল। সেখানেই সেই সুতোটায় কখন ও কি ভাবে একটা শক্ত গিঁট পড়ে গিয়েছিল তা ওরা কেউই তখন বুঝতে পারেনি। একটি বাংলা দেশের আর একটি বিদেশের ছেলের বন্ধুত্বের ভিতটা সেদিন হৃদয়ের শক্ত কংক্রিটে গাঁথা হতে আরম্ভ করেছিল।

"জানো, তোমাদের বাংলা ভাষা, তোমাদের আচার ব্যবহার, তোমাদের সবকিছু আমার ভীষণ ভাললাগে। বাংলায় কথা বলারও আমার ভীষণ ইচ্ছা।"

"তাহলে শেখনা কেন?"

"কার কাছে শিখবো?"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমি কিন্তু শেখাতে পারি।"

"তুমি শেখাবে?"—খুশীর উজ্জল আলো স্পার্লিংএর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

"সত্যি তুমি শেখাবে?"

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু তার বদলে তোমায় কি গুরু-দক্ষিণা দেব?" স্পার্লিং হেসে বলেছিল।

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের রেশ ছড়িয়েছিল দিব্যেন্দু।

হ্যাঁ, গুরুদক্ষিণা নিশ্চয় দিতে হবে। এবং সেটা খুব মূল্যবান জিনিয়। কি দিতে পারবে?"

"খুব-ই মূল্যবান জিনিষ?"—একটু চিন্তা করেছিল স্পার্লিং।

"অসাধ্য কিছু না হলে নিশ্চয়ই দেব, কি চাই।"

দিব্যেন্দু বলেছিল "বন্ধুত্ব।"

"বন্ধুত্ব!" বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল স্পার্লিং। দিব্যেন্দুর হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়েছিল।

সত্যি, তোমরা বাঙালীরা কি সুন্দর। তোমরা কি সুন্দর ভালবাসতে পার প্রত্যেক মানুষকে। জানো, আমি আজ নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করছি।"

স্পার্লিং সেদিন আবেগে বিভোর হয়ে, খুশীর ভারে বেশী কথা গুছিয়ে বলতে পারেনি। অথচ তার মধ্যেই দিব্যেন্দু স্পার্লিংএর মনের খুশীর উচ্ছলতার স্পর্শ পেয়েছিল। তারপর থেকেই স্পার্লিং বাংলা শিখতে আরম্ভ করলো।

"আচ্ছা, বাংলায় 'বন্ধুর' আর একটা শব্দ মিটা না?"—স্পার্লিং একদিন বলেছিল।

"মিটা না, মিতা।"

"আচ্ছা। মিতা।"—স্পার্লিং জিবটাকে পেতে শুধরে উচ্চারণ করেছিল।

"কিন্তু আমি তোমায় মিট বলে ডাকবো।"

স্পার্লিংএর সম্বোধনটা দিব্যেন্দুর খুব ভাল লেগেছিল। সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিল দিব্যেন্দু। সেদিন থেকেই স্পার্লিং ওকে মিট বলে ডাকতো।

ঘড়ির দিকে তাকাল দিব্যেন্দু। নিশ্চয় স্পার্লিং এখন কয়েক হাজার মাইল দূরে। বাংলাকে অনেক পিছনে রেখে স্পার্লিংএর প্লেনটা নিশ্চয় এখন হু-হু ক'রে ক্ষ্যাপা বাজপাখীর মত এগিয়ে যাচ্ছে।

মায়ের কথাও মনে পড়ছিল দিব্যেন্দুর। বিদেশী স্পার্লিং দিব্যেন্দুর মায়ের কাছ থেকে দিব্যেন্দুর আদরের ভাগ বেশ কিছুটা কেড়ে নিয়েছিল।

"মিট, তুই নাকি দেশে যাচ্ছিস। কিন্তু কই আমাকে তো যেতে বোললি না?

"তুই যাবি?" দিব্যেন্দু অবাক হ'য়েছিল। "সে কি রে! সে যে একেবারে পাড়াগাঁ। লাইট নেই, ভাল রাস্তা নেই, বাস নেই, তুই সেখানে থাকতে পারবি?"

"কিছু না থাক। কিন্তু মা আছে যে।"

দিব্যেন্দু সত্যিই এ কথাটা ভেবে দেখেনি। কতকগুলো অসুবিধার কথা ভেবেই ও স্পার্লিংকে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করেনি। অথচ স্পার্লিংএর আসল আকর্ষণই হ'চ্ছে মা। মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালবাসা ওর জীবনে এক বিরাট বিস্ময়। আর বাঙালী মায়ের স্নেহ-ভালবাসা ওর কাছে যেন স্বর্গের অমৃতের মতই দুর্লভ।

"জানিস মিট, যখন রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে দেখি ফুটপাতের রাজ্যের ছড়ানো ছিটানো লোকগুলোকে, যাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, যাদের মাথার ওপরে আচ্ছাদনও নেই। এক নির্মম দরিদ্রতার মধ্যে যাদের জীবন, সেই দরিদ্র পরিবারের দরিদ্র মায়েদের যখন দেখি, নিজের মুখের একমুঠো খাবার ছেলের মুখে গুঁজে দিচ্ছে, কিংবা তার হাড়-বের করা শুকনো বুকে ছেলের মাথাটাকে রেখে আদর ক'রছে তখন আমি থমকে দাঁড়িয়ে যাই। নিজের বুকের মধ্যে সেই তীব্র স্নেহ কাঙাল তৃষ্ণাটা জেগে ওঠে। ডুকরে ডুকরে হৃদয়টা আমার কাঁদে। জানিস মিট, তখন ভাবি যদি এই নিষ্ঠুর দরিদ্রতার মধ্যেও ওদের কোলেই জন্ম

নিতাম তাহলেও আমি বেঁচে যেতাম। ভীষণ ভাবে বেঁচে যেতাম রে।"

সেদিনেই দিব্যেন্দু মাকে চিঠি লিখেছিল,—"আমার এক আমেরিকান বন্ধু স্পার্লিংকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কোনও আশঙ্কার কারণ নেই। আচারে, ব্যবহারে, কথায়, বার্তায় ও একেবারে বাঙালী। কিন্তু জানো মা, ছেলেটা খুব অসহায়। ওর মা থেকেও মা নেই, ওর দেশ থেকেও দেশ নেই। তাই ও মায়ের আদর পেতে তোমার কাছে যেতে চাইছে। আমার ভাগ কমিয়েওকেও একটু আদর দিতে হবে মা।"

কয়েকদিন পরেই দিব্যেন্দুর সঙ্গে স্পার্লিংও রওনা হয়েছিল বর্দ্ধমান জেলার এক পল্লীগ্রামের পথে। সে যেন ওর জীবনে এক অদ্ভুত অনুভূতির কাহিনী। সেদিনের সেই ছবিটা দিব্যেন্দু আজও পরিষ্কার দেখতে পায়।

স্পার্লিং মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতেই মা ঠিক দিব্যেন্দুর মত স্পার্লিংএরও থুঁত্‌নিতে হাত দিয়ে চুমু খেয়েছিলেন। স্পার্লিং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ওর মুখে চোখে খুশীর উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়েছিল দিব্যেন্দু। তারই বিহ্বলতায় চোখের কোলে জলের একটা সুক্ষ্ম রেখা চিক্‌ চিক করে উঠেছিল।

"আমি তোমায় 'পালি বলেই ডাকবো বাবা। তোমাদের ঐ ইরিং বিরিং উচ্চারণ তো তোমাদের এই মুখ্যু মা ক'রতে পারবে না।"

আর তখনি স্পার্লিং দিব্যেন্দুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের সুরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিল, "দেখছিস মিট, মা আমাকে তোর চেয়ে কত বেশী ভালবাসেন।"

দিব্যেন্দু তাই ভাবছিল। যখন মা শুনবেন তাঁর 'পালি' আমেরিকা চলে গেছে। হয়তো আর ফিরবে না। তখন মায়ের মনটাও তাঁর বিদেশী অসহায় ছেলেটার জন্য ভীষণ ভাবে কেঁদে উঠবে।

ঘড়ির দিকে তাকাল' দিব্যেন্দু। স্পার্লিং এতক্ষণ অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর মা মৃত্যু-শয্যায়। তিনি শুধু একবার তাঁর ছেলেকে দেখতে চেয়েছেন। অভিমানী ছেলেটাকে একবার তিনি চোখের দেখা দেখবেন। তাই দিব্যেন্দু ভাবছিল, যদি ওর মা ওকে কাছে পেয়ে বুকে টেনে নেন, ও যেমন চায় ঠিক তেমনিভাবে ওর মা যদি আদরে ওকে ভরিয়ে দেন তাহলে নিশ্চয় অনেক শান্তি পাবে স্পার্লিং। ওর অভিমানী মনটা নিশ্চয় ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আর যদি ওর মা অভিমানী ছেলের ওপর অভিমান ক'রে চিরকালের জন্য পালিয়ে গিয়ে থাকেন? যাবার আগে যদি কাউকে বলে গিয়ে থাকেন যে "স্পার্লিং এলে ওকে বলে দিও, একদিন ও আমার ওপর অভিমান ক'রে পালিয়ে গিয়েছিল আর আজ আমি অভিমান করে পালিয়ে যাচ্ছি। ও কেমন জব্দ হয় দেখ।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দিব্যেন্দুর চিন্তাটা প্রচণ্ড রকম ধাক্কা খেল। না-না এরকম যেন না হয়। এলো-মেলো চিন্তাগুলোকে চাপা দিতে চেষ্টা ক'রলো দিব্যেন্দু।

ঘরে ফেরা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অনেক চড়েছ নৌকা পদ্মায় মেঘনায়,
অনেক দুলেছ ঢেউয়ে।
ছৈয়ের উপরে শুয়ে দেখেছ আকাশ—
তিমিরে তারার লেখা
কখনো বা জ্যোৎস্নার জোয়ার।
কোনদিন ভোর ভোর বেলা
সদ্য হাসি অরুণ আলোর
ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে গেছে।

পাল তুলে হয়তো বিকেলে,—
কেশবতী কন্যা যবে চুল বাঁধে,
বনপ্রান্তে আঁচল লুটায়,—
মুগ্ধ চোখে তাকায়ে রয়েছ।
নদী-যাত্রা জীবন-প্রতীক।
ঘরে ফেরা সময় এখন।
অন্ধকার নামে ধরণীতে।
স্মৃতির প্রদীপ জলে,
শোনো শঙ্খধ্বনি।

যদি

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আমি যদি পুষ্প হয়ে ফুটিতাম স্বর্গ-রমণীর,
তাহলে হতাম সখি তব কাছে সবচেয়ে প্রিয়
আকীর্ণ অলকপ্রান্তে শোভা পেয়ে আমি অনুপম
বিরহ জ্বালায় তব আনিতাম মধুগন্ধে মম
চিত্তকোষে কি প্রশান্তি ; কভু প্রেম-ফুলমালা হয়ে
নন্দন-মন্দিরহর্ষ, সুরভিত মধুনিশা ব'য়ে
তব প্রাণ-বীণা মাঝে তুলিতাম অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,
সার্থক জীবনখানি স্বপ্নসাধে পূর্ণিত আমার।
কখনো ছিঁড়ি সে মালা বিরচিতে নব অনুরাগে,
আমার সে গ্রন্থি টুটে চল চল ওষ্ঠ-অগ্রভাগে
চুম্বন করিতে শুধু, কভু পুনঃ পরশ-পীড়নে
ঝরায়ে দিতে গো মোরে শ্যামস্নিগ্ধ নিকুঞ্জ-কাননে ;
অলীক স্বপন হায় নাহি ফোটে পরিপূর্ণতায়,
যদি তা ঘটিত কভু রহিতাম ক্লান্ত প্রতীক্ষায়।

বৈশাখী সন্ধ্যায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আবার বোশেখী সাঁঝে ফোটে মধুমালতীরা,
আবার বাতাসে সেই গন্ধ !
নারিকেল-পল্লবে সেই মৃদু মর্ম্মর !
তুমি নাই ! সবই নিরানন্দ !
আঙিনায় শুয়ে আছি ! কেদারায় তুমি বসে'—
লাল-পেড়ে খদ্দর অঙ্গে !
চুপ্‌চাপ্‌ চলে গেলে ! একবারও বলিলে না :
"একা যাবো ? চলো তুমি সঙ্গে !"

লিখেছিলে, "ফিরে গিয়ে গ্রীষ্মের ছুটি দেবো,
তত্তদিন ইস্কুল চল্‌বে।"
একবারও ভাবিনি তো, কুসুম-কোমলা তুমি
আমারে এমন করে ছল্‌বে
মনে পড়ে বনানীর কানে কানে সমীরণ
ফিস্‌ফিস্‌ কথা কয় আস্তে!
মধুমালতীর মিঠে গন্ধ আসিছে,-দূরে
বাঁকা চাঁদ রৌপ্যের কাস্তে।

তুমি আছো ঘরে মোর! আর কিসে প্রয়োজন?
নৃমুণ্ড মালিনীর খড়্গ
সে দিন তো দেখি নাই! বিষ্ণুর বাঁশরির
সুরে ভরা ছিল মোর স্বর্গ!
সহসা মৃত্যু এলো কালীর কৃপাণ মুখে!
নিভে গেল এ গৃহের দীপ্তি!
ভেঙে গেল আশ্রয়, চিড় খেয়ে গেল বাঁশী।
হারালাম জীবনের তৃপ্তি!

রুদ্রাণী নমো নমঃ, নিলে মোর ঘরণীরে!
মন্দির ক'রে দিলে শূন্য!
এবার প্রসন্ন মুখে আমারে লবে না বুকে?
পদাঘাতে করো নাই চূর্ণ!
বৈশাখী সন্ধ্যায় ফোটে মধুমালতীরা!
পৃথিবীতে নেমে আসে সুপ্তি
নেমে এসো বরাভয়, তোমার শীতল কোলে
হোক্‌ সব বেদনার মুক্তি!

বিরহী কবির বারমাস্যা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তোমারে বৈশাখে খুঁজি, তবু তুমি আসনি বৈশাখে
তৃষ্ণায় বিবশা পৃথ্বী, রৌদ্রতপ্ত তাম্রাভ আকাশ
শীর্ণ বনানীর বুকে শ্বাস ফেলে শোকার্ত বাতাস
শুষ্ক রুক্ষ সারামাঠ দিগন্তর ছুঁয়ে পড়ে থাকে।

তোমারে খুঁজেছি জ্যৈষ্ঠে, গ্রীষ্ম যবে অগ্নিবৃষ্টি করে
পাতার আড়ালে বসে' বিহগেরা নীরবে ঝিমায়
কে যেন জেলেছে ধুনী পথে ঘাটে অদৃশ্য শিখায়,
পঙ্কিল সরসীবুকে কাদাখোঁচা মাছ খুঁজে মরে।

আষাঢ়ে তোমারে খুঁজি মেঘ যবে পথ ভুলে আসে
আকুল আগ্রহে ধরা চেয়ে থাকে আকাশের পানে
বনানী মেলিয়া শাখা মত্ত হয় নব ধারা স্নানে
শুষ্ক তৃণ মাথা তোলে ম্লান হেসে সজল বাতাসে।

তোমারে শ্রাবণে খুঁজি চম্পা কেয়া সুরভি পবনে
কি এক অসহ তৃষ্ণা জেগে ওঠে রাতের প্রহরে,
মেঘের ঝালর চুঁয়ে অবিরল ধারা শুধু ঝরে,
চকিত বিদ্যুৎ-শিখা কাঁপে দূর সীমান্ত গগনে।

তোমারে দেখেছি ভাদ্রে, বকুলে আকুল করা রাতে,
কদমফুলের বনে ভিজে হাওয়া দোল দিয়ে যায়,
তোমারি তনুর গন্ধ পাই যেন রজনীগন্ধায়,
জানালায় বাঁকা চাঁদ ভালবেসে ভীরু করপাতে।

তোমারে আশ্বিনে খুঁজি, খোঁজা মোর আজো ফুরাল না,
একটু আলতো ছোঁয়া, ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস
শঙ্খচিলের ডাকে থরো থরো শিহরে বাতাস,
পায়ের নরমঘাসে ঝিকিমিকি হীরকের কণা।

তোমারে কার্তিকে খুঁজি, কুয়াশায় ঢেকেছে প্রান্তর,
বনশিরে রবি যেন হয়ে গেছে পূর্ণিমার চাঁদ,
লাল শালুকের ঝাড়ে মাছরাঙা পেতে বসে ফাঁদ
পুকুরের ঢেউ নিয়ে খেলা করে বাতাস মন্থর।

তোমারে অঘ্রাণে খুঁজি রৌদ্রভরা স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
অদৃশ্যে আসেন লক্ষ্মী অঙ্গবাস সুরভি মধুর,
মাঠে মাঠে পাকা ধানে বাজে তাঁর পায়ের নূপুর,
কলকে ফুলের বুকে প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে মরে।

তোমারে খুঁজেছি পৌষে, আনে যবে ধরার অঙ্গনে
শীতের শাসন-লিপি হরকরা উত্তুরে বাতাস
ভিজে-ভিজে নীল রঙে ভরে গেছে প্রভাত-আকাশ
ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি উড়ে আসে খেজুরের বনে।

মাঘেও এলেনা তুমি, ফুল হোল সজিনার কুঁড়ি,
হলদে পাতার ফাঁকে দেখা দিল আমের মুকুল,
বৈঁচি পেকেছে গাছে, গাছভরা দোলে টোপাকুল,
ঝরাপাতা নিয়ে বন চুপিসাড়ে দেয় লেপমুড়ি

তোমারে ফাল্গুনে খুঁজি, বাতাসে কিসের নেশা আসে,
কামনার স্বপ্ন মেলি' প্রাণ চায় প্রাণের সাথীরে,
কি যেন অসহ তৃষ্ণা সাড়া দেয় মনের গভীরে,
"বউ কথা কও" ডাক ডাকে পাখী কত অভিমানে!

তুমি ত এলে না চৈত্রে, কেঁদে ওঠে বিরহীর মন
আড়ালে বিদায় নিলে সাঙ্গ করি ঋতু পরিক্রমা,
নিদ্রায় জীবনপথে হে মানসী চির মনোরমা
পাণ্ডুর বিশীর্ণ ওষ্ঠে ঝঞ্ঝা দিল বৈশাখী চুম্বন।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের সরকারী ভাষা—?

দেশের প্রতিটি রাজ্যই আশা করে যে কেন্দ্র সরকার সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিবেন, ভাষার ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য। প্রাদেশিক ভাষাগুলির সৃষ্টি এবং উন্নতির জন্যও প্রত্যেকটি রাজ্য কেন্দ্রের নিকট হইতে সমান সহায়তা এবং সুযোগ সুবিধা আশা করে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাইতেছে? দেখা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় অহিন্দী ভাষাগুলিকে মৌখিক দরদ দেখাইয়া— একটি মাত্র ভাষার উপরই তাহাদের সমস্ত দয়া, মায়া এবং আর্থিক সহায়তা দান করিতেছেন, হিন্দীর কল্যাণেই সব কিছু উজাড় করিয়া দিতেছেন! হিন্দীর প্রতি এই কেন্দ্রীয়-পক্ষপাতিত্ব ক্রমশ বৃদ্ধিমুখেই চলিয়াছে। কেন্দ্রীয় মহারাজগণ—হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য দরাজ হস্তে করদাতাদের কোটি কোটি টাকা কোন সঙ্কোচ না করিয়া, ব্যয় করিতেছেন। অন্য ভাষা যেখানে বহু কষ্টে এবং কাতর নিবেদন করিয়া এক টাকা মুষ্টি ভিক্ষা পায়, সেখানে 'সুদূর-ভবিষ্যতেও-হইবে-কি না-সন্দেহ' হিন্দীকে রাজ ভাষা করিবার বাসনায় কেন্দ্র সরকার হিন্দীকে নজরানা দিতেছেন হাজার গুণ বেশী! ভগবান-না-করুন হিন্দী যদি কখনও ভারতের রাজতক্তে বসিবার অসম্ভব সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে, সুদূর ভবিষ্যতে তবে, সেই ভয়ঙ্কর দিনে হিন্দীভাষীরা হইবে একটি বিশেষ প্রিভিলেজ্‌ড্‌ ক্লাশ, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এবং আমরা অর্থাৎ অহিন্দী ভাষীরা হইব—দ্বিতীয় শ্রেণীর! হিন্দী ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইলে হিন্দীভাষীরা তাঁহাদের মাতৃভাষার জোরে এবং সাহায্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসন মেসিনারীর পূর্ণ দখলদার হইবেন এবং অন্য ভাষীরা বা ভাষাগোষ্ঠির মানুষ বিষম তথা অসম প্রতিযোগিতার মুখে হাবুডুবু খাইবেন এবং এমন অবস্থায় অহিন্দীভাষীদের ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিও সবিশেষ ব্যাহত ত হইবেই, এমন কি একেবারে স্তব্ধও হইতেও পারে।

কেন্দ্রে সরকারী ভাষা হিসাবে যদি ইংরেজী থাকে, তাহা হইলে সমস্ত রাজ্যের সকল মানুষই অসম প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইবেন, আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রগতিও বাধা পাইবে না। গত কিছুদিন হইতে অন্যান্য অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলি হিন্দীর 'আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক সচেতন হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয় এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন প্রকার কার্যকরী তৎপরতা দেখা যায় নাই। এ রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি পার্টি স্বার্থ রক্ষা এবং কংগ্রেসকে বধ করিতে যে বিষম তৎপরতা দেখাইতেছে, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বাধিকে কল্যাণ প্রচেষ্টা প্রয়াসে .তাহাদের কোন মাথা ব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না!

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথাও বলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে—যতদিন ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসাবে প্রচলিত এবং সর্ব্বজন স্বীকৃত ছিল (স্বাধীনতা প্রাপ্তির

কিছুকাল পরেও)—ততদিন আমাদের বিভিন্ন রাজ্য-গুলির মধ্যে অন্তকার মত ভাষা লইয়া বিষম কোন্দল-কোলাহল দেখা যায় নাই। রাজ্যগুলির এবং কেন্দ্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা হইত ইংরেজীর মাধ্যমেই এবং ইহাতে গরীব প্রজাসাধারণের কোন অসুবিধা হইত বলিয়া শুনি নাই। একথা সকলেই জানে যে প্রশাসনিক কার্য্য পরিচালনার সহিত জনসাধারণের প্রাত্যহিক যোগাযোগ থাকে না, তাহার প্রয়োজনও হয় না। জনসাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিংবা সরকারী কাগজপত্রে কি ভাষা বা কোন্ হরফ ব্যবহার করা হয় বা হইতেছে, তাহার খবরও রাখে না, হয়ত রাখার প্রয়োজন বোধও করে না। দেশের শতকরা ৯৫ জনই যখন প্রায় নিরক্ষর, যে-দেশে, কোন রকমে নাম সই করিতে পারিলেই যাহাকে শিক্ষিত বলিয়া সেন্সাস্ রিপোর্টে রেকর্ড করা হয়, সে-দেশের শত করা অন্তত ৯০ জন লোকের কাছে—"রাজভাষা" লইয়া এত হাঙ্গামা, হৈ হল্লা এবং দেশের সংহতি রক্ষার নামে সংহতি-সংহারের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলা-বাহুল্য আজ ভারতবর্ষে "হিন্দী" নামক অর্দ্ধপক্ব প্রায়-কাঁচা একটা ভাষাকে জোর করিয়া ভারতে ৫২ কোটি লোকের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা যে কেবল ব্যর্থ হইবে তাহাই নহে, ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে হয়ত আবার প্রাক্-ইংরেজ যুগে ঠেলিয়া দিবে। 'গোবিন্দজীর' বাসনাও চিরতরে লুপ্ত হইবে।

যে-সময় ভারতের চারিদিক হইতে বিপদের সম্ভাবনা এবং সঙ্কেত দেখা যাইতেছে এবং যে-কোন সময় ভারত দুই-তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইতে পারে, ঠিক সেই সময় হিন্দী লইয়া দেশের মানুষকে অযথা "আক্রমণ" প্রচেষ্টা কেন, কাহার হিতে?

শিক্ষা-নীতি V. S. ভাষা নীতি-পরিণাম?

শিক্ষা-নীতির পরিবর্ত্তন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর মর্জ্জি এবং খেয়ালমত না হইয়া গভীর চিন্তা এবং সবদিক বিবেচনা করিয়া করা প্রয়োজন এবং এ-বিষয় প্রকৃত শিক্ষাবিদ এবং যথার্থ পণ্ডিতের নির্দ্দেশমত হওয়াই কর্ত্তব্য, সাধারণ ভাবে ইহা অবশ্যই বলা যায়। হঠাৎ এবং ঘন ঘন শিক্ষা-নীতি এবং শিক্ষাদানের ভাষার পরিবর্ত্তন করার অর্থই হইবে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিষম বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতীব দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের দেশে তথাকথিত স্বাধীনতার পর হইতেই এই নীতিই ঘন ঘন পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি দেশের ছাত্র-সমাজকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ করিয়া তুলিবার বিবেচনাহীন প্রয়াস—প্রচেষ্টায়—বর্ত্তমান কালের শিক্ষার্থীদের শ্রাদ্ধ করিবারই পূর্ণ আয়োজন করা হইয়াছে! এই ভাবে শিক্ষা-নীতির ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষার নিদারুণ উৎপাত এবং এই ভাষার উৎপাতটাই যে আসলে শিক্ষার উপর রাজনীতির দৌরাত্ম্য, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকার নূতন আর একটি শিক্ষানীতি রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং প্রস্তাবিত এই নীতি নাকি শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে নূতন প্রস্তাবটির ফাঁকফোকর ঢাকিয়া পালিশের কার্য্য চলিতেছে। অভিনব শিক্ষা প্রস্তাবটির সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যই আপাতত যথেষ্ট হইবে:

> যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রস্তাবের মোদ্দা কথাটা এইরূপ:
>
> বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এই দুই স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম ভাগকে বলা হইয়াছে বিদ্যালয়-স্তর, আর দ্বিতীয় ভাগের নামকরণ হইয়াছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তর। প্রথম স্তরে আবির্ভাব হইবে ত্রিমূর্তিতে ত্রিভাষা-সূত্রের—আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও ইংরেজীর। মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার রঙ্গমঞ্চ হইতে এক মূর্ত্তির নিস্ক্রমণ করিতে হইবে। হিন্দী ও ইংরেজীর যখন গায়ের জোর

বেশী তখন 'লাঠি যার মাথা তার' এই নীতির (?) সূত্র অনুসারে হিন্দী ও ইংরেজীকে রঙ্গমঞ্চে দাপাদাপি করিবার পূর্ণ সুযোগ দিয়া আঞ্চলিক ভাষাকেই মাথা হেঁট করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তারপর চলিবে হিন্দী আর ইংরেজীকে জোর কদমে চালাইবার পালা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কেবল এই দুইটি ভাষাই চালু থাকিবে। আর যেহেতু হিন্দীই নাকি হইবে দেশের একমাত্র যোগাযোগের ভাষা সেই হেতু হিন্দী-শিক্ষার এমন পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে উহা ভারতীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক-বাহক হইয়া উঠিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ৩১৫ ধারাটির উল্লেখ করিতেও ভুল হয় নাই এবং সর্বভারতীয় চাকরিতে বা সংস্থায় ঢুকিতে হইলে যে হিন্দী শিখিতেই হইবে সে কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রক্ষায় ও দ্রুত প্রসরমান বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে তাল রাখার জন্ত ভাল করিয়া ইংরেজী শেখা যে প্রয়োজন, প্রস্তাবে সে কথাও বলা হইয়াছে। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে প্রস্তাবে যে দুই-একটা দরদী কথা নাই তাহা নহে। তবে সে দরদ ভাত রান্না করিয়া পরিবেশন করার দরদ নয়, গরম ভাত ফুঁ দিয়া খাইতে বলায় যে শ্রেণীর দরদ প্রকাশ পায়, এ দরদ সেই শ্রেণীর।

প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ান এখনও পাই নাই। যাহা পাইয়াছি তাহারই এই রূপ। এইটুকু হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই প্রস্তাব বস্তুত দুই হঠাও-ওয়ালাদের গলাগলি করাইবার হাস্যকর প্রয়াস আর সমগ্র দেশে হিন্দীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার নির্লজ্জ আয়োজন। এতদিন যাহা বেসরকারী হিন্দীওয়ালাদের উগ্রতায় সীমাবদ্ধ ছিল, আর কেন্দ্রীয় সরকার বলি বলি করিয়াও দেশের হাওয়ার গতি ঠিক ঠাহর হইতেছিল না [illegible] যাহা বলেন নাই, এবার তাহা প্রস্তাবের [illegible] স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলিতেছেন।

শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার বাঁধা বাঁধা স্তোকবাক্যগুলিকে কবর দিবার সুব্যবস্থা ত প্রস্তাবটিতে রহিয়াছেই, তাহার সঙ্গে রহিয়াছে ইংরাজীকে বগলদাবা করিয়া হিন্দী যাহাতে সকল ভাষাকে দলিয়া মলিয়া বীরদর্পে ভারতের বুকে বিচরণ করিতে পারে তাহার আটঘাট বাঁধা বন্দোবস্ত। হিন্দীকে ভারতের ভাষার জগতে সম্রাজ্ঞীর আসন দানের প্রসঙ্গে সংবিধানের ৩৫১ ধারার দোহাই দেওয়া হইয়াছে। কথায় কথায় যাঁহাদের সংবিধান সংশোধনে বাধে না এ ধারাটি সম্বন্ধে তাঁহাদের এত মমতা কেন? ধারাটি সংশোধন করিয়া লইলেই ত সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

সরকারের কর্তাব্যক্তিরা স্বীকার করুন আর না করুন ইংরেজী সর্বভারতের যোগসূত্রসাধক হইয়াই আছে। অতএব শিক্ষাক্ষেত্রে অযথা বিপর্যয় না ঘটাইয়া ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ও উন্নয়নের সুব্যবস্থা করিয়া দিন। শিক্ষার্থীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচুক। আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তি পূজকের দেশে ত্রিভাষা সূত্রের উপর মোহ যদি এমনই প্রবল হয় তবে ইহার সঙ্গে সংস্কৃতকে সংযুক্ত করা হউক। তাহা হইলে ভাষা হইতে রস আহরণ করিয়া আঞ্চলিক ভাষাগুলিও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে। আঞ্চলিক হিন্দী ভাষাকে সকলের কাঁধে চাপাইয়া আতঙ্কিত করার প্রয়োজন হইবে না।

প্রস্তাবটি নাকি শীঘ্রই লোকসভায় অনুমোদনের জন্ত পেশ করা হইবে। দেশের সুধীসমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতিসংস্থাসমূহ এখনই সচেতন ও সক্রিয় হউন। শিক্ষার্থীদের ভাষার অযথা নিপীড়ন হইতে ত্রাণ এবং রক্ষা করুন। রাজনীতির চাপে শিক্ষা-সরস্বতী যেন নিষ্পেষ্টা না হন।

[illegible] কিন্তু ভাষা সম্পর্কে কোন সুযুক্তি কট্টর হিন্দীপ্রেমী- [illegible] (যথা শেঠ গো-বিন্দ দাস এবং তস্য ভ্রাতা

[illegible] কুর

অপ্রাব্য। দেশ জাহান্নাম নামক স্থানে যাইতেছে—যাউক, কিন্তু হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্র এবং ‘লিঙ্ক’ ভাষা করিয়া রাজ্যগুলির মধ্যে যে সামান্য সংহতি এবং ‘লিঙ্ক’ আছে, তাহাও সমূলে উৎপাটিত না করিয়া উৎকট হিন্দীফেরিওয়ালারা নিরস্ত হইবে না।

স্বাধীন ভারতে উন্মাদাগারের সংখ্যা অতি কম। ক্রমশ দেশের অবস্থা এবং এক শ্রেণীর তথা কথিত নেতা, উপনেতা এবং অপনেতার প্রচণ্ড দাপাদাপি পাব্‌লিক সেক্‌টির পক্ষে অতি বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় অন্তত জরুরী-কালীন ব্যবস্থা হিসাবে আরো বেশ কতকগুলি উন্মাদাগার তথা ফ্যানাটিক্ অ্যাসাইলামের একান্ত প্রয়োজন বহুজন অনুভব করিতেছেন। এবং যতদিন উপরি উক্ত ব্যবস্থা না হয় আমরা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে সাবধান সচেতন থাকিতে বলিব। হিন্দীফোবিয়া রোগে অহিন্দী ভাষী সব কয়টি রাজ্যই কম বেশী আক্রান্ত হইয়াছে, প্রতিকার-পন্থা কেবল চিন্তা নয়, কার্যকরী করিবার সময় যেন অতীত না হইয়া যায়। ২৬-৩-৬৮

‘সংযোগরক্ষাকারী’ ভাষা হিসাবে হিন্দীর প্রকৃত মূল্য কি—এবং আদৌ আছে কিনা—

আসামের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দ্বিভাষা সূত্রের প্রস্তাব করেন। আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে এবং কাহার বা কাহাদের চাপে তিনি কিছুকাল পরে ত্রিভাষা সূত্রের প্রবর্ত্তন করেন তাহা বুঝা শক্ত নহে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীতে হিন্দীভাষী সদস্যরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ এবং সেই কারণে অধিক ‘বলশালী’—একথা আবার নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ‘ত্রি’ভাষার মধ্যমনি হইল ‘হিন্দী’ এবং ইংরেজীর স্থান হইল দ্বিতীয় এবং ততদিন পর্য্যন্ত যতদিন না ভারতের সমস্ত রাজ্যের বিভিন্ন ভাষী অ অহিন্দী ভাষী জনগণ হিন্দীতে পক না হইয়া তাহার পরেই হইবে ইংরেজীর দ্বীপান্তর!

সাময়িক কালের জন্য হিন্দীকে দেশের সংযোগ রক্ষা-ভাষা হিসাবে, চালাইতে না পারিলেও, চালাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কি ফললাভ হইবে? বর্ত্তমান জগতে যাহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেই আন্তর্জাতিক সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে হিন্দী আগামী দুইহাজার বৎসরেও এই মর্য্যাদালাভ করিতে সক্ষম হইবে কি?

একথা অবশ্যই বলা যায় যে সাধারণ মানুষ, কৃষক, দিনমজুর এবং অন্যান্য শ্রমিক ও সাধারণ পেশায় যাহারা নিযুক্ত থাকে, তাহাদের পক্ষে মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাষার কোন প্রয়োজনই বিশেষ হয় না, এবং এই শ্রেণীর মানুষ যাহারা নিজের রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে কাজের জন্য কিংবা কাজের চেষ্টায় যায়, তাহারা সেই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা কাজ চালাইবার মত অতি অল্পকাল মধ্যেই শিখিয়া লইতে পারে, লইতেছেও। যেমন কলিকাতায় বিহারী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী প্রভৃতি লোকেরা করিতেছে। এ-কথা সেই সকল বাঙালী তাহারা অন্য প্রদেশে বসবাস করিয়া রুজি রোজগার করিতেছে, তাহাদের সম্পর্কেও খাটে। ইহার জন্য কোন আইন কিম্বা শিক্ষা-মন্ত্রকের উর্ব্বর মস্তিষ্কউদ্ভূত কোন নিয়ম-নির্দ্দেশের প্রয়োজন হয় না। মানুষ আপন প্রয়োজন এবং গরজেই মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা এবং গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির (অর্জ্জন নহে) পর হইতে যাহারা ‘হিন্দী হিন্দী’ চিৎকার করিয়া বিষম কোলাহলের সঙ্গে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র শান্তিভঙ্গ করিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, যদিও স্বীকার করিবেন না যে, আজও ভারতে যে ঐক্যবোধ দেখা যাইতেছে তাহা ইংরেজ বং ইংরাজীর কল্যাণেই সংঘটিত হয়। ইহার জন্য হই বিন্দ দাস এবং মোরারজীর মত পরম দেশভক্ত হিন্দী র হিন্দী-প্রেমী ও প্রচারকদের প্রয়োজন

ছাত্রদের উপর অপ্রয়োজনে ত্রিভাষার বিষম ভার চাপাইবার ফলে তাহারা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে সকল বিষয় শিক্ষা করা বর্ত্তমানজগতে একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হইতেছে, ঠিক বঞ্চনা না হইলেও ছাত্রদের মানসিক এবং স্বাভাবিক শিক্ষাপ্রবণতার পথে বিষম বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়—ভারতের মাত্র শতকরা পনেরো বিশ ভাগ লোকের ভাষা বাকী ৮০।৮৫ ভাগ লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইবার অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে নেহাত গর্দ্দভের পক্ষেও কষ্ট হইবে না। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে দেশের মাত্র তিনটি বিশেষ রাজ্যের হিন্দী ভাষী-দের সর্ব্বভারতীয় প্রাধান্য দান করিয়া তাহাদের সর্ব্ব-বিষয়ে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা। আজ যাঁহারা ইংরেজী হটাইবার জন্য আদা জল খাইয়া, কোমরে গামছা বাঁধিয়া মাঠে নামিয়াছেন, তাঁহারা একথা মনে মনে জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে—ইংরেজী ঐ বিশেষ তিনটি অঞ্চলের লোকের কাছে প্রিয় নহে এবং ইংরেজী নামক আঙ্গুর ফলের প্রকৃত স্বাদ তাহারা (অন্তত শতকরা ৯৫ জন) কখনও পায় নাই, কাজেই তাহাদের কাছে আঙ্গুরকে টক বলিয়া প্রচার করিয়া টকো হিন্দী-আমড়াকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া প্রচারের জন্য এত উৎসাহ এত কসরৎ।

কপালগুণে-বর্ত্তমান-ভারতের-প্রধান-মন্ত্রী যদিও উগ্র হিন্দী-পন্থি নহেন, তাহা হইলেও তিনি হিন্দীকেই রাজ ভাষা করিবার বিপক্ষে কিছু বলিতে সাহস করেন না। তিনি তাহার পুত্রদের উত্তর প্রদেশের হিন্দী টোলে ভর্ত্তি না করিয়া বিদেশের বিদ্যালয়ে কেন প্রেরণ করেন? আমরা যতদূর জানি—ইংলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা বোধ হয় নাই। এ-বিষয় বেশী বলার প্রয়োজন নাই, শ্রীজয়প্রকাশের একটি সাম্প্রতিক উক্তি দিয়া এবারের নিবন্ধ শেষ করিব। নিউইয়র্কে এক ভাষণপ্রসঙ্গে জয়প্রকাশজী বলিয়াছেন: কেন্দ্রীয় (ভারত) সরকারের চাকুরী যোগদানকারী প্রার্থীকে হয় হিন্দী আর না হয় ইংরেজী অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে—এই প্রকার প্রস্তাব লোক-সভায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা অহিন্দী ভাষী রাজ্য-গুলির পক্ষে বৈষম্যমূলক আচরণ।" তিনি আরো মন্তব্য করেন "হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলির চাপে প্রধানমন্ত্রী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।" বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রীর সবলা রূপ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।

মন্ত্রী হওয়া অর্থই হইল সর্ব্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ!

আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, অর্থাৎ বলিতে বাধ্য হইয়াছি, মন্ত্রী মহাশয়দের ভাবগতিক এবং বাণী-বর্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে এক একটি বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হওয়ামাত্র সেই দপ্তর অর্থাৎ সেই বিশেষ দপ্তরের টেক্‌নিক্যাল এবং পরম অনভিজ্ঞ মন্ত্রীও রাতা-রাতি 'বিশারদে' পরিণত হয়েন। যেমন দেখুন আমাদের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং মহাশয়। দেশের পাট-শিল্প বিষয়ে তাঁহার অর্জ্জিত পূর্ব্বজ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধি কি ছিল তাহা আমাদের জানা নাই, খুব সম্ভবত বিশেষ কিছুই ছিল না (এবং এখনও নাই), কিন্তু যেহেতু তিনি আজও কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী অতএব ধরিয়া লইতে হইবে তিনি এ-বিষয়ে যাহা কিছু বলিবেন, তাহাই এক্সপার্টের কথা বলিয়া কেবল গ্রহণ নহে, সেই মত কার্য্যও করিতে হইবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প এবং পাট শিল্পে নিযুক্ত ব্যবসায়ী-দের নানা হিতোপদেশ দান করিয়া পরম কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং কলিকাতার পাটকল পরিচালকদের বার্ষিক সমাবেশে পরম উদারভাবে তাঁহা[র] উপদেশামৃত ব[র্ষণ] করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের [আ]থিক-অবলম্বন রাজ্যের পাটশিল্প—তাহা ছাড়া

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের ভূমিকা অতি বৃহৎ। মোট ডলার যাহা অর্জ্জিত হয়, অর্দ্ধেকই আসে পাট রপ্তানি হইতে।

পাট শিল্পের বর্ত্তমান সমস্যা বহুবিধ, তবুও কিন্ত ওই শিল্পের সমস্যার দিকে নজর দিবার অবকাশ কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নাই। দুই-চারটা মামুলী বুলির সঙ্গে কিঞ্চিৎ উপদেশের ত্রিকলা মিশাইয়া শ্রীদীনেশ সিং পাটকলগুলির পরিচালকদের জন্য চমৎকার শরবত তৈয়ারি করিয়া পরিবেষণ করিয়াছেন—তাঁহাদের ধারণা যে পাঁচন পান করিলে তাঁহাদের তাবৎ ব্যাধির উপশম হইবে—তাঁহাদের রপ্তানি ও মুনাকা বাড়িবে আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ঘরে জমিয়া পড়িবে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা।

পাটের কলের পরিচালকদের অবস্থা এখন মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল। বিদেশের বাজারে ভারতীয় পাটশিল্পের যে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল সেটা দেশ-বিভাগের পরই গিয়াছে। উৎকৃষ্ট পাট যে-সকল এলাকায় উৎপন্ন হয় সেগুলি পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছে। কাজেই কাঁচামালের ঘাটতি সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা দিয়াছে এবং সে ঘাটতি দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন হয় চড়া দাম দিয়া বিদেশ হইতে কাঁচাপাট কিনিতে হইতেছে, নয় দেশের মধ্যেই সরবরাহ বাড়াইতে হইতেছে। ফলশ্রুতি একই—উৎপাদন-ব্যয়বৃদ্ধি। বিদেশী খরিদ্দারেরা চটের থলি কিনিত শস্তা বলিয়া। এখন যদি তাহার দর বাড়িয়াই চলে তবে তাহারা বিকল্পের দিকে ঝুঁকিবে। হইয়াছেও তাই। পাটের থলির বদলে কাপড়ের এবং কৃত্রিম তন্তুজাত বস্তুর থলির ব্যবহার ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিকার একটিমাত্র—চটের থলির দাম বিদেশের বাজারে কমান।

ভারতীয় চটের বিপদ কেবল বিকল্প হইতেই নয়, পাকিস্তানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেও। দেশ বিভাগ হইবার আগে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হইলেও সেখানে পাটের কল একটিও ছিল না। পাটের কল সবই ছিল কলিকাতার আশে-পাশে পশ্চিমবঙ্গে। এখন আর সেদিন নাই—পূর্ব-পাকিস্তানেও বৈদেশিক সহযোগিতায় পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সে শিল্পজাত পণ্য সারা দুনিয়ায় রপ্তানি হইতেছে। ভারতবর্ষের ভোজে তাহারা ভাগ বসাইয়াছে তো বটেই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ দেশের মুখের গ্রাস তাহারা কাড়িয়া লইতে উদ্যত। পাকিস্তানী পাটশিল্পের অনেক সুবিধা। প্রথমত, তাহাদের কাঁচামাল দামেও শস্তা, আবার সরেসও। দ্বিতীয়ত, তাহাদের যন্ত্রপাতি অতি-আধুনিক, মান্ধাতার আমলের অকেজো যন্ত্র লইয়া তাহারা কাজ চালাইতেছে না। ফলে তাহাদের উৎপাদনও হইতেছে বেশী, পড়তাও পড়িতেছে কম। তাহার উপর আছে দরদী সরকারের আর্থিক ও করঘটিত আনুকূল্য।

কাজেই পাকিস্তানী পাটশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যদি ভারতীয় পাটশিল্প প্রমাদ গণে তবে সেটা তাহার অযোগ্যতার প্রমাণ নয়। সমান তালে পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে যে সমস্ত বাধা ভারতীয় শিল্পকে অতিক্রম করিতে হইবে সেগুলি সম্বন্ধে সরকারের সচেতন হওয়া উচিত এবং সেগুলি দূর করার প্রয়াস যাহাতে সার্থক হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। কেবল অযাচিত উপদেশ দিয়াই যদি সরকার তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ করিতে চান তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পাটশিল্পের ঘোর দুর্দিন এবং সরকারেরও। ওই শিল্প যদি ধ্বংস হয় তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎসটি শুকাইয়া যাইবে এবং তখন শত চেষ্টা করিলেও মরা গাঙে আর জোয়ার আসিবে না। পাটশিল্পের সঙ্কট এড়াইবার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত বিধান, মামুলি হিতোপদেশ নয়। মুনাকা খরচ না করিয়া ফেলিয়া আবার পাটশিল্পেই নিয়োগ করা উচিত। উৎপাদনব্যবস্থা যতদূর সম্ভব আধুনিক করিতে হইবে। সরকারী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের পায়ে

ভর দিয়া দাঁড়ানোই বিধেয়—এ সবই নিঃসন্দেহে উত্তম উপদেশ। কিন্তু শুষ্ক তরু তাহাতে কি মঞ্জুরিবে।

শুধু চট কেন, যে-কোন পণ্য বিদেশের হাটে কেরি করিতে গেলে তাহার দাম কমানো দরকার। রপ্তানি শুল্ক জিনিসের দাম বাড়ায়, কমায় না—এ জ্ঞান সরকারের কবে হইবে? এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার রপ্তানিকারকদের বোনাস দিতেছেন, আর আমাদের সরকার তাহাদের উপর নূতন নূতন বোঝা চাপাইতেই ব্যস্ত। কেমন করিয়া ভারতীয় পাটশিল্প প্রবল প্রতিযোগিতায় টিকিবে? আধুনিকীকরণ না হইলে পাটের কলগুলি বাঁচিবে না—এ আশঙ্কা অমূলক নয়। কিন্তু সেটা হইতেছে কি কলগুলির আপত্তি বা অনিচ্ছার দরুণ? পুরাতন যন্ত্রপাতি বাতিল করিয়া নূতন যন্ত্রপাতি বসানোর ঝামেলা অনেক, খরচও বিস্তর। কিন্তু সে ব্যাপারে কর্মীদের নিকট হইতে যদি বিরোধিতার ঝড় ওঠে তাহা হইলে সরকার কী করিবেন, সে কথা স্পষ্ট করিয়া সরকারের তরফ হইতে কেহ বলেন নাই। সরকারের সুস্পষ্ট আশ্বাস যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন্ সাহসে শিল্পপরিচালকবৃন্দ আধুনিকীকরণের ঝুঁকি লইবেন?

বলিতে গেলে ভারতীয় প্রায় সকল প্রকার উৎপাদিত দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসরই তাঁহাদের নূতন বাজেটে সোজা কিংবা বাঁকা পথে কোন না কোন প্রকার কর বৃদ্ধি করিতেছেন এবং ইহার ফলে আভ্যন্তরিক ক্রেতামহলও সবিশেষ আহত হইতেছে। অর্থমন্ত্রীর হিতোপদেশের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান তালে করের মাত্রাও ক্রমাগত বৃদ্ধিমুখেই চলিয়াছে।

সাধারণ মানুষের অবস্থা এবং সঙ্গতির সহিত পরিচয় থাকিলে অর্থ এবং অন্যান্য মন্ত্রী এবং মহোদয়গণ হয়ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচন না হইলেও লাঘবের কিছু প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু সরকারী খরচায় সরকারী প্রাসাদে বসবাস এবং যে-কোন অজুহাতে বিমান-ভ্রমণ যাঁহাদের প্রায় পেশাতে এবং চরিত্রগত নেশাতে পরিণত হইয়াছে—সেই অবাস্তব নগরীর অধিবাসীদের নিকট হইতে দুঃখনগরীর অভাগাজনরা কি আশা করিতে পারে একমাত্র মহাজন বাণীবাণ বিদ্ধ হওয়া ছাড়া?

—·—·—

বৃথা আশা দান কেন?

এ-রাজ্যের কৃষি-দপ্তর ঘোষণা করিয়াছেন যে—আগামী দুই বৎসরের মধ্যেই (১৯৭০) তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যে স্বয়ংভরতা দান করিবেন। কথাটা শুনিলেই এ-পোড়া রাজ্যের অধিবাসীদের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিবে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এ-আশাবাণীর বাস্তব সার্থকতা অসম্ভব। প্রসঙ্গত বলা যায় যে বাঙলা দেশ কখনও খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই, কখনও ছিল না—আমরা অখণ্ড বাংলার কথাই বলিতেছি। দেশ কর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাঙলার লোকসংখ্যা যাহা ছিল, আজ খণ্ডিত পশ্চিম বাঙলার জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অখণ্ড বাঙলার লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি আর আজ পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যাই ৪ কোটি অতিক্রম করিয়াছে! অন্যদিকে বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের আয়তন প্রাক্ স্বাধীনতা আমলের বাঙলার বোধহয় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ! এমনিতেই এ-রাজ্যের লোকের সংখ্যা ক্রমাগত স্ফীত হইয়াছে, তাহার উপর ভারতের অন্য সকল রাজ্য হইতেও বহু লক্ষ লোক এ-রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে বিগত দশ-পনেরো বৎসর হইতে।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। কেবলমাত্র চাউল, গম এবং অন্যান্য দু-চারিটা খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধি করিলেই, খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য মাংস ডিম, দুগ্ধ……বিবিধ প্রকার ফল, তরিতরকারী, আখ, গুড়, তৈলবীজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর খাদ্য না হইলে একদিকে যেমন দেহের পুষ্টি হইতে পারে না, অন্যদিকে তেমনি দেহের রোগ-

প্রতিরোধ-শক্তিও যথাযথ কিংবা যথোপযুক্ত হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ আজ প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জর্জ্জরিত। এ-বিষয়ে এ-রাজ্যের পশু এবং মানুষের অবস্থা একই অবস্থায়। ফলে যতদিন যাইতেছে বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশ ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে। গবাদি পশুর অবস্থাও হীন হইতে হীনতর হইতেছে। দুগ্ধ ত বলিতে গেলে রোগী এবং শিশুদের পক্ষেও দুর্লভ!

পশ্চিমবঙ্গের এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচারিত কৃষি-দপ্তরের বিস্তারিত পরিকল্পনা (খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা বিষয়) দেখিয়া আশান্বিত না হইয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। দপ্তরের পরিকল্পনায় কেবলমাত্র ধান, গম এবং ভুট্টার চাষের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করা ছাড়া, পুষ্টিকর ও রোগ প্রতিরোধক কোন প্রকার খাদ্যের যেমন দুধ, মৎস্য, ফল, ডিম প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার বাড়াইবার কোন উল্লেখই নাই। অথচ এটা জানা কথা যে পুষ্টিকর খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রয়োজনমত পরিমাণে এবং সাধারণ জনের ক্রয়-সাধ্য দরে সরবরাহ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যার প্রকৃত এবং সুষ্ঠু সমাধান কখনও হইতে পারে না, হইবে না।

অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এ-কথা বলা যায় যে পুষ্টিকর তথা রোগ-প্রতিরোধক খাদ্য-দ্রব্যাদি যদি সুষমভাবে এবং সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে দানা শস্যের চাহিদা কমানো সম্ভব এবং ইহার ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি আয়ত্তাধীন করাও সহজ হইবে। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে দানা জাতীয় সকল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জনের পরিকল্পনার মধ্যেও গলদ আছে। যেমন:

একথা সকলেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বাড়াইবার আর কোন অবকাশ নাই। উপরন্তু:—

"আবাদী এলাকার কিছু অংশ বন-জঙ্গল তৈরীর জন্য ছেড়ে দিতে পারলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা প্রশস্ত হতে পারে। বৃষ্টিপাত বাড়ানোর এবং আবহাওয়ার রুক্ষতা কমানোর জন্য তা অবশ্যই প্রয়োজন। আপাততঃ তা না হয় চাপা থাকুক। কিন্তু, যত জমিতে চাষ হয়, তারও একটা অংশ পাট ও মেস্তা চাষের জন্য ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় খাদ্যশস্য চাষের এলাকা কমে গেছে। অন্যদিকে আখ, তৈলবীজ, ডাইল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের চাষ বাড়ানো দরকার—কিন্তু তার জন্য আলাদা জমির সংস্থান সম্ভব নয়। তাই ধান ও পাট চাষের এলাকা কমিয়ে অন্যান্য খাদ্যের চাষ বাড়ানো দরকার।

"বিঘা প্রতি ফলনের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়া এই বহুমুখী সমস্যার কোনরূপ সুরাহা সম্ভব নয়। তার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল চাষের ক্ষেত্রে চাহিদামত জল সরবরাহের ব্যবস্থা। কিন্তু, পশ্চিম-বাঙলায় চাষের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এইখানে। রাজ্যে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর ধানী-জমির মধ্যে এক কোটি একরেরও বেশী জমিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রকৃতির করুণায় যেটুকু বৃষ্টি পড়ে তাই সেখানকার ভরসা। কিন্তু, ১৯৪৫ সালে প্রথম বিস্ফোরণের পর থেকে আণবিক বোমা নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। ঋতু অনুসারে বৃষ্টির স্বাভাবিক রীতিতে ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটছে। পৃথিবীর এই অংশেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সুতরাং প্রকৃতির উপর ভরসা করে ফলন বাড়ানোর পরিকল্পনা স্থির করা ভুল। তাই মাটির নীচে থেকে জল তুলে সেচের সুব্যবস্থা ছাড়া ফলন বাড়ানোর সুনিশ্চিত ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলার কৃষিদপ্তর প্রতি বছরে ২০ হাজার হিসাবে এই বছরে ৪০ হাজার অগভীর নলকূপ খননের জন্য চাষীকে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। প্রত্যেক নলকূপে খরচ পড়বে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে দুই বছরে কুড়ি কোটি টাকা। প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে শ্রুতিমধুর। কিন্তু, বৃষ্টির জলই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অগভীর নলকূপে জল আসবে

কোথা থেকে—কৃষিদপ্তর শুধু এই গোড়ার কথাটাই চিন্তা করেননি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে—বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার অনেক জায়গায় খরার সময় ৭০, ৮০ ফুট খুঁড়েও জল পাওয়া যায় না! অগভীর নলকূপ খননের জন্য সেখানে কুবেরের সম্পদ কবর দিলেই বা কার উপকার হবে? বেসরকারী ব্যক্তিদের মারফতে ২০।২২ কোটি টাকার ঋণ বিলির প্রস্তাবটি কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। তবে তার কতটা সদ্ব্যয় হবে এবং কতটা অংশ শেষ পর্য্যন্ত রাজকোষে ফেরত আসবে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গভীর নলকূপ খননের নানা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বারবার যেসব কেলেঙ্কারী করেছেন, তারপর এ ধরণের একটা অবাস্তব ও আধা-খ্যাঁচড়া পরিকল্পনায় এই দরিদ্র রাজ্যের কুড়ি কোটি টাকা কবর দেওয়ার প্রস্তাব কোনক্রমেই সমর্থন...” করা যাইতে পারা যায় কি। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সব কয়টি সরকারী পরিকল্পনা হয় ব্যর্থ হইয়াছে আর না হয় যে-পরিমাণ অর্থ এক একটি পরিকল্পনায় নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশ সার্থকতাও অর্জ্জিত হয় নাই। অবশ্য পরিকল্পনার দৌলতে এবং পরিকল্পকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব এবং অনুগৃহীত ব্যক্তিদের প্রতি করুণায় প্রাবল্যের অতি-প্রবাহের ফলে কিছু সামান্ত সংখ্যক ব্যক্তির প্রচুর বিত্তলাভ হইয়াছে!

দেশ দলীয় রাজনীতি হইতে মুক্তি পাইবে কি?

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা দেখিয়া যুগান্তর যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পরিলাম না। পত্রিকার মতে:

“দলের পরিমাপে যদি রাজনীতির স্বাস্থ্যের পরিমাপ হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিশ্চয়ই অতিশয় বলকারক হত। কেননা, এখানে আর যা কিছুরই অভাব হোক, দলের অভাব নেই। আত্যাক্ষর দিয়ে দলের নাম লিখতে বসলে সেই নামাবলিতে ইংরেজী বর্ণমালা ফতুর হওয়ার উপক্রম হয়। যেহেতু ভারতবর্ষের সংবিধানে দল গড়ার স্বাধীনতা অবাধ এবং “আমার মত অনুযায়ী দেশের ভাল না হলে ভাল হয়ে কাজ নেই” এমন কথা ভাবার মত লোকের অভাব নেই। সেই কারণে এই একটি ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা সম্ভব হচ্ছে না। এক দলের জঠর থেকে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একাধিক দলের জন্ম হচ্ছে। প্রাক্তন কংগ্রেসীদের নিয়ে বাঙলা কংগ্রেস হয়েছিল। সেই বাঙলা কংগ্রেস এখন নাম বদলে সর্ব্ব-ভারতীয় ক্রান্তি দলের সামিল হয়েছে, কিন্তু প্রাক্তন বাঙলা কংগ্রেসীরা ইতিমধ্যে তিনটি নূতন দল খাড়া করেছেন। সুভাষচন্দ্রের আদর্শের তকমা এঁটে যে দল তৈরি হয়েছিল সেই দলের একাংশ আজ পি এস পি অথবা এস এস পি’তে, এক অংশ কংগ্রেসে বাকীরা দুই হাঁড়িতে পৃথগন্ন। “অধিকন্তু ন দোষায়” বলে হালে সুভাষচন্দ্রের নামে শপথ পড়ে আরও একটি নূতন দল ভূমিষ্ঠ হল।

“কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বহু দলশোভিনী রাজনীতি নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি করব? কোন্ দলের সঙ্গে কোন্ দলের জুটি মেলালে একটা মানানসই নক্সা তৈরী হয় অনন্তকাল ধরে তারই পরীক্ষা চালিয়ে যাব? এই ত’ পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচন আসছে। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে যেসব দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সেগুলি ত’ আছেই, তার উপর আরও গণ্ডাখানেক নূতন দলের এবার আসরে নামার কথা আছে। ফল কি হবে? যদি গত এক বছরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে আমরা এত খরচ করে আর একটা নির্ব্বাচনের মধ্যে যাচ্ছি কেন? অথচ, এখন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চেহারার দিকে তাকিয়ে এমন কথা ভরসা করে বলা যাচ্ছে না যে, আগামী নভেম্বরের নির্ব্বাচনের পর এই রাজ্যের পরিষদীয় রাজনীতিতে স্থায়িত্ব আসবে। সেই

খোর-বড়ি-খাড়াই আমাদের কপালে আছে বলে মনে হচ্ছে। এক বছরের ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে যে, বামপন্থী পার্টিগুলি যে ধরনের যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছে সেটা পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের কোন প্রকৃত বিকল্প নয়। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ফ্রন্টের মধ্যে থেকেও নিজ নিজ দলের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এক ফ্রন্টের মধ্যে থেকেও দলগুলির মধ্যে রেষারেষি, এমনকি প্রকাশ্য কলহ ও মারামারির বিরাম নেই। হালের দৃষ্টান্ত হচ্ছে দুর্গাপুরের ঘটনা। কোন্ দিকে থাকলে মন্ত্রীত্বের প্রসাদে ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটাই কোন কোন দলের কাছে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থাকার প্রশ্নে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। স্বভাবতই এই ধরণের ফ্রন্টে জোটের বন্ধন খুব দৃঢ় হবে বলে আশা করা যায় না।

"একথা আমরা ঠেকে শিখছি যে, শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম দুটি প্রধান দল না থাকলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে স্থায়ী সরকার পাওয়ার আশা নেই। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। যদি তারা তা গ্রহণ করত তাহলে তারা একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্তির দ্বারা দলের সংখ্যা কমাবার চেষ্টা করত। বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি না করে তারা এক হাঁড়ি থেকেই ভাগ করে খেতে শিখত। কিন্তু আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা, রাজনৈতিক দলগুলির একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে ক্রমেই পৃথগন্ন হয়ে যাচ্ছে।

"দলগুলি নিজেরা যদি সুবুদ্ধির পথ দেখতে না পায় তাহলে ভোটদাতারা তাদের সেই পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। যে সব খুচরা দল কোনদিনই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না অথচ অন্য বড় দলের পথের কাঁটা হয়ে থাকবে সেই সব দলকে আলাদা হয়ে থাকার পুরস্কার দিতে ভোটদাতারা যদি অস্বীকার করেন তাহলে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের শুধরে নিতে পারে বলে আশা করা যায়।

"আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। "স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য দলের সংখ্যা কমান দরকার"—এই দাবীর উপর পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অভিমত এখন থেকেই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।"

উপরি উক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর আরো গোটা তিন চারি নূতন দলের উদ্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য সব কয়টি দলই দেশ এবং দেশবাসীর উদ্ধারে 'কৃত সংকল্প,' কতকগুলি দল আবার সদা "সংগ্রামী" মনোভাব লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রকে কুরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ভারতে কলিযুগে নূতন ধর্ম্মযুদ্ধের সূচনা করিতে চাহেন।

বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির যাত্রার আসরে 'সংগ্রাম সিংহের' অতি প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই 'সংগ্রাম সিংহ' বাহিনী কাহার সহিত, কি কারণে, কি মহৎ আদর্শ-প্রেরণায় এবং কোথায় সংগ্রাম কি ভাবে করিবেন, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। আমরা বুঝিতে পারি নাই পারিতেছি না।

দলীয় স্বার্থ এবং দলপতি বা পতিদের ব্যক্তিগত প্রেষ্টিজ (আর্থিক স্বার্থ আছে কি না জানা নাই) রক্ষা ছাড়া দেশ এবং দেশবাসীর কি কল্যাণ এই সব বিচিত্র 'আদর্শী' এবং বিচিত্র-গঠন দলগুলি আজ পর্য্যন্ত কি ভাবে, কতটুকু, কোথায় কি করিয়াছেন, তাহার একটা 'সমীক্ষা'—দলগুলি নিজনিজ স্বার্থ রক্ষার কারণে এবং সেই সঙ্গে প্রচারের সুবিধার জন্য কেন প্রকাশ করিবেন না, বা করিতেছেন না?

যুক্তফ্রন্টের নয়মাস রাজ্য শাসনকালে তাহাদের প্রচণ্ড কেরামতি এবং প্রশাসন দক্ষতার জলন্ত প্রমাণ জনগণ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে এবং ফ্রন্টের বিতাড়নের পর লোকে রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যপালের সামান্য কয়দিনের শাসনে পরম অশান্তির পর একটু যেন স্বস্তি বোধ করিতেছে, রাজ্যের আইন এবং শৃঙ্খলাও আজ বহুপরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সংযত হইয়াছে।

লোকে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে—পাটি-সরকার অপেক্ষা বর্ত্তমান অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসন হাজার গুণে শ্রেয়! যুক্ত-ফ্রন্টের জনযারি-গণতন্ত্র যে কি অপূর্ব্ব বস্তু তাহার পূর্ণ এবং নগ্নরূপ নয় মাস ধরিয়া অবলোকনের পর, পশ্চিমবঙ্গের বলীর-পাঁঠা জনগণ আর তাহা দেখিতে চাহে না। সাধারণ লোক প্রার্থনা করিতেছে, নভেম্বর মাসে আবার নির্ব্বাচন না হইয়া রাষ্ট্রপতির শাসনই এ-রাজ্যে চলিতে থাকুক। কিন্তু তাহা হইবে কি? (৮-৪-৬৮)

ক্রান্তি দলের ভ্রান্তি দূর হইবে কি?

বিগত নভেম্বর মাসে ইন্দোরে সর্ব্বভারতীয় ক্রান্তি-দলের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান এবং কংগ্রেসকে পরাজিত করাই ছিল, এই পার্টির উদ্দেশ্য। এবং একথাও বোধহয় সত্য যে কংগ্রেস বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণের জন্যই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় সকল কংগ্রেস বিরোধী এবং কংগ্রেস-ত্যাগী দলগুলি ক্রান্তিদলের সহিত পলিটিক্যাল মিতালীতে আবদ্ধ হয়। সবই হয়ত ভাল ছিল, কিন্তু কমিউনিষ্ট—বিশেষ করিয়া বাম কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত মিতালী যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অশুভই হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের চারটি রাজ্যে সেদিন এই দলের নেতারা যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নবাগত হইয়াও এই দল যে বৃহৎ প্রভাবের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়, তাহার কারণ কংগ্রেসের বাহিরে যে সব দল সেদিন একটা বিকল্প সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা নিজেদের রাজনীতির প্রয়োজনেই ভারতীয় ক্রান্তি দলকে সামনে রাখিয়াছিল। দিল্লীর হালের সিদ্ধান্তের পর এই অবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন হইল মনে হয়। কেননা, ঐ সিদ্ধান্ত দলের কংগ্রেস-বিরোধী অপেক্ষা কমিউনিষ্ট-বিরোধী ভূমিকাটিকেই বড় করিয়া তোলার চেষ্টা। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষের রাজনীতির পক্ষে হয়ত ঐতিহাসিক হইবে।

দলের অন্তর্ভুক্ত তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং, শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিং ও শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে রিপোর্ট পাওয়ার পর দলের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ এই প্রস্তাব লইয়াছে। বুঝা যায় কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করিয়া এই তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শাসন কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহারই ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বিগত কয়েক মাসের ঘটনাতেই প্রকাশ যে, এই অভিজ্ঞতা (কমু-মিতালী) ভারতীয় ক্রান্তি দলের পক্ষে (ও অন্যান্য কয়েকটি অ-কমিউনিষ্ট দলের পক্ষে) সুখকর হয় নাই। যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কমিউনিষ্টরা নিজেদের দলীয় স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করেন, কমিউনিষ্ট মন্ত্রীরা ক্রান্তি দলের অন্তর্ভুক্ত মুখ্যমন্ত্রীদের আগোচরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই ধরণের অভিযোগ অনেক সময়ে উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের মতবিরোধ এতদূর অগ্রসর হয় যে, তিনি পদত্যাগ করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হয়েন। "কমিউনিষ্টদের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করা যায় না" এই রকম একটা অভিমত ভারতীয় ক্রান্তি দলের মধ্যে অনেক দিন ধরেই দানা বাঁধিতেছিল। তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যুক্তফ্রন্টগুলির মধ্যে ভারতীয় ক্রান্তি দল ও কমিউনিষ্টদের অস্বস্তিকর সহাবস্থানও ছিল। নূতন এমন কি ঘটিল, যাহার জন্য দলের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ সেই সহাবস্থানের পাটও চুকিয়ে দেওয়ার পথে পা বাড়াইল প্রস্তাবে তাহার উল্লেখ নাই। হয়ত এমন হইতে পারে যে, ব্যাপারটা ভারতীয় ক্রান্তি দলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় অথবা দল এখন তার নিজের শক্তি সম্পর্কে অধিকতর আস্থাবান হইয়া উঠিয়াছে [illegible]

দের সহিত বিরোধের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিতেছে না। কিংবা এমনও হইতে পারে যে সম্প্রতি ভারতে পূর্ব্বাঞ্চলে কমিউনিষ্ট কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে সকল সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে দলের নেতারা আর নিজেদের কমিউনিষ্টদের সহিত গাঁটছড়া রাখা ভরসা করেন না। কারণ যাহাই হউক না কেন, দলের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের এই সিদ্ধান্ত আর একবার প্রমাণ করিল একমাত্র একটি দলের বিরোধিতাকে সম্বল করিয়া গঠিত এখন এই ধরণের জোটের ভিত্তি কত দুর্ব্বল।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সাগ্রহে লক্ষ করিবেন দলের এই নূতন নীতি এই রাজ্যে কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে। জাতীয়তা-বিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে, যাঁহারা চীনকে 'আক্রমণকারী' বলিতে অস্বীকার করেন তাঁহাদের সঙ্গে 'মৈত্রী' নিষিদ্ধ করিয়া দলের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ যে ফতোয়া দিয়াছেন, তাহার পর যুক্তফ্রণ্ট টিকিবে কিনা, টিকিলে ফ্রণ্টের অন্যান্য দলের সহিত ভারতীয় ক্রান্তি দলকে আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে একটা সীমাবদ্ধ নির্ব্বাচনী বোঝাপড়া করিতে দেওয়া হইবে কিনা অথবা যুক্তফ্রণ্টের সহিত আবার একত্রে সরকার গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভারতীয় ক্রান্তি দল আগামী অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনে নামিতে পারিবে কিনা এইসব প্রশ্নের উত্তর আশা করা যায় আগামী কিছু কালের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। (১২-৪-৬৮)

ক্রান্তি দলের ফ্রণ্ট ত্যাগের সংবাদে শ্রীজ্যোতি বসু

বিগত ১২ই এপ্রিল 'গণপতি' জ্যোতিবসু ঘোষণা করেন যে যুক্তফ্রণ্ট যদি সত্যই ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার পার্টি (সি পি এম) একাই নির্ব্বাচন সংগ্রাম চালাইবে! আমরা শ্রীবসুর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাইতেছি এবং এই আশাও প্রকাশ করিতেছি যে বাম কম্যুপার্টি পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি আসনে (বিধান সভার) প্রার্থী দাঁড় করাইবে এবং শতকরা শতজন ভোটারই বাম কম্যু প্রার্থীদের ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিবেন এবং যাহার ফলে 'গণপতি' শ্রীজ্যোতিবসু নব-নির্ব্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হইয়া পরমানন্দে রাজত্ব করিবেন এবং বাম কম্যু আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে এক নবযুগের সূচনা করিবেন। আশা করি 'গণপতি' জ্যোতি বসু স্বর্গত বিধান রায়ের আরব্ধ কর্ম্মের এখনও যতটুকু বাকি আছে, তাহাও ঝাঁটাইয়া সাফ করিয়া—কম্যু আদর্শমত নূতন ভাবে সব কিছু আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিবেন। জ্যোতিবাবু তাঁহার সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের মহাপ্রাণ শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সহযোগী মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে ভাল করিবেন। তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে পুরানো কলকারখানা এবং অন্যবিধ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অচিরে 'ভ্যানিস্' করিবে! অর্থের জন্য চিন্তা নাই, যত টাকা লাগে যোগাইবে 'গৌড়জন'। (১৪-৪-৬৮)

আগামী নির্ব্বাচন ও আমরা—

পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি (প্রায় ৩০টি) রাজনৈতিক দল আগামী নভেম্বর মাসের নির্ব্বাচনের জন্য তোড়জোড় করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেসও অন্যতম (এবং বৃহত্তম)। এ-পর্য্যন্ত পার্টি-ওয়ারী নির্ব্বাচনী ম্যানিফেষ্টো—কিছুই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু এ-বিষয় যতটুকু জানা যাইতেছে, তাহাতে কংগ্রেস ছাড়া অন্য প্রায় সব কয়টি দলই দলীয় স্বার্থ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেছে সর্ব্বাগ্রে। দলীয় স্বার্থ সর্ব্বভাবে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিয়া, তাহার পর ভোটদাতা তথা দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থ এবং কল্যাণের কথা আসিবে। পার্টিগুলির কথাবার্ত্তায় ইহাই মনে হইবে যে দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ চিন্তা এবং স্বার্থরক্ষার একচেটিয়া অধিকার এই পার্টিগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। এ-অধিকার কে বা কাহারা রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্পণ করিল, তাহা জানিবার

অধিকার আমাদের অর্থাৎ জনগণের প্রয়োজন নাই। আমাদের অর্থাৎ পরম অনুগৃহীত ভোটদাতাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—পার্টি-বসদের আজ্ঞামত তাহাদের নির্দ্দেশিত প্রার্থীকে ভোট দান করিয়া কৃতার্থ বোধ করা। কোন্ প্রার্থীর যোগ্যতা কতটুকু, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত দূর, তাহার চরিত্রবলের এবং দেশ-প্রীতির পূর্ব্ব নিদর্শন কিছু আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে ভোটদাতার কিছুই জানবার, দেখিবার দরকার নাই। প্রার্থীর পৃষ্ঠে পার্টির ছাপই সব এবং এই পার্টি-ছাপের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে পরম অযোগ্য এবং চরিত্রহীন প্রার্থীও সর্ব্বগুণের আকর বলিয়া অবশ্যই গৃহীত হইতে বাধ্য এবং আমরা ভোট-দাতারাও এই পার্টি-ছাপের দ্বারা অবশ্যই পরিচালিত হইব, হইতে বাধ্য। এইভাবে নির্ব্বাচন ব্যাপারে যদি আমরা চলিতে পারি, তাহা হইলেই দেশের এবং জাতির গণতন্ত্র সুরক্ষিত হইবে।

যে দেশে শতকরা ৮০ জন ভোটদাতাই প্রায় নিরক্ষর এবং যাহাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি বিবেচনা (নির্ব্বাচন ব্যাপারে) বলিতে কিছুই নাই, সে দেশে গণতন্ত্রের নামে এক শ্রেণীর প্রতারকের ধাপ্পাতে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়, সে-দেশে আপাতত ১০।২০ বছর গণতন্ত্রের পরিহাস অর্থহীন এবং গণতন্ত্রের নামে যে-নির্ব্বাচন পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে একটিমাত্র কার্য্য পরম সার্থকভাবে হয়, তাহা গরীব জনগণের এবং নির্ধন দেশের অর্থশ্রাদ্ধ !!

———

বর্দ্ধমান সি পি আই (এম) সমাবেশে প্রস্তাব—

বিগত ১২ই এপ্রিল বর্দ্ধমানে বাম কম্যুদের যে বিশেষ অধিবেশন শেষ হইয়াছে—তাহাতে কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে—

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক সবিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এমনভাবে যাহাতে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের অটোনমিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

অন্যান্য প্রস্তাবও আছে কিন্তু এই প্রস্তাবটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—কারণ কার্য্যে ইহা পরিণত হইলে কোন্ রাজ্যে যদি কোনক্রমে একবার সি পি আই (এম) গদি দখল করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে দেশ এবং মানুষকে, বিশেষ করিয়া অ-কম্যুদের, একবার দেখাইয়া দিতে তীব্র লালুদের লালের প্রমত্ত লালীমা কী এবং কত সর্ব্বনাশী !

সি পি আই (এম) পার্টি এবং দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম' করিতেও প্ররোচিত করিয়াছে। যুক্তফ্রণ্টকে রক্ষা করিয়া নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার কথা বলিতেও সি পি আই (এম) চাঁইরা ভুলেন নাই। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টই যখন একটি মাত্র সামান্য ঠোকরের ধাক্কায় খানখান হইয়া যাইতেছে, ফ্রণ্টের অন্যান্য ভদ্র অংশীদাররাই যখন সি পি আই (এম) এবং সি পি আই এই দুইটি তীব্রলাল এবং লালচে দলের সহিত কোন প্রকার সমঝোতায় আসিতে আর রাজী নহে, এমন অবস্থায় দেশের লোক কম্যুদের কি সাহায্য দিয়া ভরাডুবি হইতে রক্ষা করিবে বলা শক্ত। অসম্ভবকে সম্ভব করা এক অসম্ভব কার্য্য !

পশ্চিমবঙ্গের কম্যু গণপতি যখন ঘোষণা করিয়াছেন, কম্যুরা একাই নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়ী হইবে, তখন এত কাঁদুনী কেন ?

———

পশ্চিমবঙ্গের এ-ব্যাধি কি দুরারোগ্য ?

কয়েকদিন পূর্ব্বে হাওড়ার একটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন :

হাওড়ার বার্ন কোম্পানির লক্ আউটের ফলে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পরিবারে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু পরিবার ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। হাওড়ার স্কুল কলেজগুলিতে অনেক ছাত্রছাত্রী বেতন দিতে পারছে না বই কিনতে পারছে না। বিভিন্ন পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের পাঠাবার সময় ৭৮ মাসের মাহিনা মকুব করতে হচ্ছে। অধিকাংশই মধ্যবিত্ত মানুষ ;

লজ্জায় হাত পাততে পারছে না—তাহাদের দুঃখ দুর্দশা সহ্য করবার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

কেবল হাওড়ার বার্ণ কোংতেই নহে, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বহু কলকারখানাই আজ ষ্ট্রাইক কিংবা লক্-আউটের ফলে বিগত কয়েক মাস যাবত বন্ধ হইয়া আছে এবং যাহার ফলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট-দুর্দশা ভোগ করিতেছে বাঙ্গালী কর্ম্মী, কর্ম্মচারী এবং শ্রমিক। আমরা বহুবার এই বিষয় লইয়া আবেদন নিবেদন করিয়াছি—কিন্তু আমাদের মত অধমজনদের বাক্য শ্রমিক ইউনিয়নের সর্ব্বাধিনায়ক—ইউনিয়নের নিকট পৌঁছাইলেও তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

আজ হাজার হাজার শ্রমিক, কর্ম্মী, কর্ম্মচারী যে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশায় পড়িয়াছেন, তাহার প্রতিকার কে করিবে? ইউনিয়ন লিডারদের বিষম সংগ্রাম স্পৃহার বলী কি কেবল অসহায় শ্রমিক, কর্ম্মী, কর্ম্মচারীরাই হইবে? খোঁজ লইলে দেখা যাইবে—লিডারদের দিন ভালই কাটিতেছে, তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভিক্ষা-পাত্র লইয়া পথে বাহির হইতে হয় নাই, কখনও হইবে না।

সংগ্রামে উৎসাহ দিয়া শ্রমিকদের ষ্ট্রাইক করানো সহজ কিন্তু তাহার দায় সামলাইতে কে বা কাহারা? অসহায় শ্রমিকদের কেন পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে ভিক্ষাপাত্র লইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইবে? যাঁহারা শ্রমিকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন সেই ইউনিয়ন লিডারগণও কেন ভিক্ষাপাত্র লইয়া পথে বাহির হইতেছে না?

আজ শ্রমিক কল্যাণে এবং মালিক ধ্বংসে নিবেদিত জীবন-মন সেই ফ্রন্টী শ্রমমন্ত্রী ব্যানার্জ্জী মহাশয় একবেলা খাইতে দিবার সম্বলও যাহারা যোগাইতে পারে না, সেই তাহারা মানুষকে পথে ঠেলিয়া দিয়া নিজেরা নিরাপদ আশ্রয়ে নিরাপদ-জীবন যাপন করে কোন্ মুখে?

গত কিছুকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে আবার শ্রমিক গোলযোগ নানাভাবে খোঁচাইয়া করা হইতেছে। ইহা কেন, কিসের কারণে এবং কাহাদের প্ররোচনায় হইতেছে তাহা বুঝা কষ্টকর নহে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ যেখানে দুইপক্ষের আলোচনায় হয়ত সহজেই মিটিয়া যায়, সেই সেই ক্ষেত্রেও ইউনিয়ন লিডার হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া সঙ্কট জিয়াইয়া রাখেন এবং বিরোধের মীমাংসা দীর্ঘায়িত করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না, পারিলেও তাহা করেন না, কারণ তাহাতে তাঁহার স্বার্থ এবং প্রেষ্টিজ রক্ষা হয় না।

ক্রমশঃ ইহা প্রকট হইতেছে—শ্রমিক মহল কেবল মাত্র নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। যদি দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে যেখানে হাজার হাজার লোকের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত, সেই হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেও আজ ধর্ম্মঘটের হুমকী দেখা যাইত না। হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমিকদের কোন অন্যায় আচরণও ক্রমশ প্রতিকার করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন শ্রমিক রোগী কিংবা ডাক্তার প্রভৃতির সহিত যদি অন্যায় আচরণ করে এবং উপরিওয়ালার নির্দ্দেশ পালন না করে, তাহা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা সহ্য করিতে হয়! ইউনিয়ন লিডারগণ সর্ব্বব্যাপারে এবং কাজে সমর্থন করেন শ্রমিকদের। হাসপাতালের শুভাশুভ এবং রোগীর কল্যাণ-অকল্যাণ কিসে হইবে, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধি-বিবেচনার আওতার বাহিরে! এ-অবস্থার প্রতিকার না হইলে এবং সর্ব্বসাধারণ সতর্ক না হইলে অচিরে এমন দিন আসিবে, যখন হাসপাতালের পক্ষেও হয়ত 'লক-আউট' ঘোষণা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন এবং তাহা এই যে হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫ জনই বহিরাগত এবং তাহাদের সর্দ্দারদের দয়ায় রাজ্যবাসী বাঙ্গালী সন্তানদের পক্ষে হাসপাতালে কাজ পাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। (১৫-৪-৬৮)

বিজয় সেনা—

পশ্চিমবঙ্গেও অবশেষে একটি 'সেনাদল' জন্মলাভ করিয়াছে কিছুদিন পূর্ব্বে। নাম হইয়াছে বিজয় সেনা। (আশা করি ইহার সহিত প্রাক্তন স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন সম্পর্ক নাই কিংবা ভবিষ্যতেও থাকিবে না।) বিজয় সেনার দাবী—

১। শিক্ষার বাহন ত্রিভাষা না হইয়া দ্বিভাষা (ইংরেজী এবং বাঙলা) করিতে হইবে।

২। বাঙলা দেশের চিত্রগৃহে শতকরা ৭৫টি বাঙলা চিত্র দেখাইতে হইবে। ইহা বর্ত্তমানে কার্য্যকর করা এক প্রকার অসম্ভব, তাহার একমাত্র কারণ বাঙলা ছবির নিদারুণ সংখ্যাল্পতা।)

বিজয় সেনা দিল্লী আকাশবাণী প্রচারিত এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের পক্ষে "আবশ্যক"—বিবিধ ভারতীয় বিপক্ষে অভিযান এবং এই কেন্দ্রীয় আকাশবাণীর প্রিয় সন্তানের নাম বদলাইয়া—'বিবৃধ্ হিন্দী' করা। পূর্ণ সমর্থন করি।

বিজয় সেনার আর একটি মহৎ দাবী, পশ্চিমবঙ্গে স্থিত কল-কারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে —শতকরা ৮০ জন বাঙালীকে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের বেকারী সমস্যা সমাধান জোরদার করিতে হইবে। এইটি যদি কার্য্যে পরিণত করা 'বিজয়ী সেনার' পক্ষে সম্ভব হয়, সেনা নাম সার্থক হইবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে—পাশের রাজ্যদুটিতে (বিহার এবং ওড়িষ্যা)—রাজ্যসরকারের চেষ্টা এবং রাজ্যবাসীদের দাবীতে ইহা কার্য্যকর হইয়াছে কয়েকবৎসর পূর্ব্ব হইতেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী সরকার এবং তাহার উল্টো সরকার রাজ্যবাসীদের কল্যাণে এ-বিষয় কিছুই করেন নাই। দুইটি বিগত রাজ্যসরকারই দলীয় স্বার্থরক্ষা ব্যতিরেকে, "সন্স অব্ দি সয়েল"সম্পর্কে ছিলেন নির্ব্বিকার এবং তাহারই ফলে আজ রাজ্যময় এই পরম দুর্ব্বিষহ বেকারী রাক্ষসের করাল ছায়াপাত!

(১৫-৪-৬৮)

কবি-নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

রণজিৎকুমার সেন

আমাদের আধুনিক জাতীয়তাবোধ মূলতঃ যেসব মনীষীর রচনা ও বাণীদ্বারা বিশেষভাবে উন্মেষিত, তাঁদের মধ্যে প্রধানতম একজন দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, দীনবন্ধু তাঁর সাহিত্যে কেবল স্বদেশ-ব্রতের ইঙ্গিতমাত্রই লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত দীনবন্ধু কাব্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন, এবং সে কাব্যও ব্যঙ্গ-কাব্য। তার মধ্যে স্যাটায়ারের চাইতে হিউমারেরই প্রাধান্যই ছিল অধিক। দীনবন্ধু যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার। দীনবন্ধুর প্রাথমিক ব্যঙ্গকাব্যগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরেই' পত্রস্থ হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবশিষ্য ছিলেন তিনি। কিন্তু তাই ব'লে গুরুর শ্লেষাত্মক স্যাটায়ার তিনি যথেষ্ট শক্তির সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারেন নি; তাঁর সমস্ত অনুকরণ ও অনুসরণই নিছক ব্যঙ্গ বা হিউমারে পর্যবসিত হয়েছিল। তাতে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'জামাই ষষ্ঠী' প্রভৃতি দীর্ঘ কবিতার উল্লেখ করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন: 'আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা লাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বরগুপ্তের নিকট ঋণী।...তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্যপথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।'

তিনি যেসমস্ত নাটক রচনা করেন, তন্মধ্যে একমাত্র 'নীল দর্পণং নাটকং' ব্যতীত অধিকাংশই সমাজবিষয়ক হ'য়েও প্রহসন বা ব্যঙ্গাত্মক। নবীন তপস্বিনী নাটক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী নাটক, সুরধুনী কাব্য, জামাই বারিক, দ্বাদশ কবিতা বা কমলে কামিনী নাটক—সমস্ত গ্রন্থই এই প্রহসন বা ব্যঙ্গশ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রেরণা তাঁর যে নাটক থেকে উচ্ছৃত, তা 'নীল দর্পণ'। দেশীয় চাষীপ্রজার উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের জমি নীলচাষের উপযোগী ছিল ব'লে কোম্পানীর আমল থেকেই ইংরেজ বণিকেরা এ দেশের চাষিদের দিয়ে নীলের চাষ শুরু করে। ক্রমে ব্যবসাক্ষেত্রে মুনাফা যত বর্ধিত হয়, এই বণিকেরাও ততই উদ্ধত হয় এবং চাষিরা নিজেদের অবস্থাবিপর্যয়ে যখন মালিকশ্রেণীর কাছে তাদের ন্যায্য দাবী উপস্থাপিত করেও প্রতিকারের কোনোপথ খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই সময় তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে কুঠিয়াল সাহেবেরা। তৎকালীন সাময়িকপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি এই অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করেন এবং এমন কি ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে এঘটনার বিবরণ

উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: 'নীলকরের জুলুম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন, তাহার দফা একেবারে রফা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবদ্ধ করিয়া দাদনের টাকা পরিশোধ করে বটে, কিন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের গোমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অন্নে পুরে না।...নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল। প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। হাকিমরা স্বজাতির অনুরোধে তাহাদিগের বশ্য হইয়া পড়ে আর আইনের যেরূপ গতিক, তাহাতে নীলকরদিগের পলাইবার পথও বিলক্ষণ আছে।'

এইভাবে সাময়িকপত্রে ও সাহিত্যে যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী ক্রমে উচ্চকিত হ'য়ে উঠতে থাকে, বহু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে তখন 'নীলদর্পণ' নাটক (১৮৬০) রচনায় এগিয়ে আসেন দীনবন্ধু মিত্র।

এই নাটকের মূল কহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ:

—স্বরপুর গ্রাম। গোলোকচন্দ্র বসু এই গ্রামেই বাস করেন। তিনি বয়সে যেমন প্রবীণ, তেমনি অত্যন্ত নিরীহ গৃহস্থ। তাঁর পৈত্রিক জমি থেকে বার্ষিক যা আয় হয়, তা থেকে সাংসারিক খরচা এবং অতিথিসৎকার ও দেবসেবা কুলিয়ে যায়। বড়ছেলে নবীনমাধবও বিশেষ পরোপকারী, সে ঘরে থেকে বিষয়কর্ম দেখে। নীলকর সাহেবদের বিরাগভাজন হয়েও নিরীহ প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য সে সর্বদা ব্যস্ত। তাঁর অনুজ বিন্দুমাধব কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। দু'ভাইই বিবাহিত। বড় বউ সৈরিন্ধ্রী, ছোট বউ সরলতা; তবু গোলোকচন্দ্রের স্ত্রী সাবিত্রীই এখনও সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার তখন এত বৃহৎ আকার ধারণ করেছে যে, ইংরেজ বিচারকের কাছে ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে নালিশ বা মোকদ্দমা ক'রেও কিছু সুরাহা করা যেতো না। গোলোকচন্দ্র কুঠিয়ালের নির্দেশে পঞ্চাশ বিঘা জমিতে নীলচাষ করেও একবছরের মধ্যে তার প্রাপ্য টাকা পান না। অথচ তাঁর প্রতি পুনরায় ষাট বিঘা জমিতে নীলচাষের নির্দেশ দিয়েছে কুঠিয়াল। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁর ধান চাষের জায়গা আর থাকে না, ফলে তাঁর সাংসারিক অচলাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিসৎকার ও দেবসেবাও বন্ধ হয়ে যাবে; তিনি সাহেবের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু কোনো অনুনয়ই টিকলো না। তাঁর প্রতিবেশী ছিল সাধুচরণ ও রাইচরণ দুই কৃষক ভাই। সাধুচরণের মেয়ে ক্ষেত্রমণি বিবাহিতা, প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে সে বাপের বাড়ী এসেছে। তাকে চোখে পড়ায় নীলকুঠির ছোট সাহেবের আমিন মনে মনে ভাবলো—ক্ষেত্রমণিকে ছোট সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে পারলে সাহেবের কাছ থেকে সে পুরস্কার পেতে পারে। এই মনে করে সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো এবং অবশেষে ভ্রষ্টা নারী পদীময়রাণীকে সে একাজে দৌত্য নিয়োগ করলো। পদী গিয়ে সাধুচরণের স্ত্রী রেবতীকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলো, এবং রেবতী তার কথায় যখন সম্মত না হয়, তখন পদী এই ব'লে তাকে ভয় দেখাল যে, লাঠিয়াল নিয়ে সে ক্ষেত্রমণিকে সাহেবের কুঠিতে ধরে নিয়ে যাবে। এদিকে নবীনমাধবের উপর নীলকর সাহেবের আক্রোশ ক্রমেই ধূমায়িত হচ্ছিল, সেই আক্রোশ মেটাতে নীলকর নিরীহ গোলোকচন্দ্রের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করলো। নবীনমাধব তার যথাসর্বস্ব বিক্রী ক'রে পিতাকে এই দারুণ অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে এলো। এ সময়ে দীঘি থেকে জল নিয়ে ফেরার পথে ক্ষেত্রমণি নীলকরের চারজন লাঠিয়ালের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রোগ সাহেবের কামরায় নীত হয়। সাহেব তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে ক্ষেত্রমণি কামড়ে আঁচড়ে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়াস পায়। অনন্যোপায় হ'য়ে সাহেব তার পেটে সজোরে ঘুষি মারে। এ সময় অকস্মাৎ নবীনমাধব তার এক মুসলমান প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ ক'রে সাহেবের কবল থেকে

ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়; কিন্তু গৃহে ফিরে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষেত্রমণি মারা যায়। এদিকে মোকদ্দমায় হাজতে আবদ্ধ হয়ে ধর্মচেতা গোলোকচন্দ্র অনাহারে আত্মহত্যা করলেন। সাহেবের হাতেপায়ে ধরে নবীনমাধব প্রার্থনা করলো—পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত তার পুকুরপাড়ে নীলচাষ বন্ধ রাখতে। উত্তরে সাহেব তাকে যথেচ্ছ অপমান করলো—যে অপমান সহ্য করতে না পেরে সে সাহেবকে আক্রমণ করলে। কিন্তু সাহেবের আঘাতের কাছে তার আক্রমণ টিকলো না। আহত অবস্থায় সে গৃহে নীত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করলো। ছেলের মৃতদেহ দেখে সাবিত্রী পাগল হ'য়ে গেলেন এবং উন্মাদ অবস্থায় তিনি সরলতাকে গলায় পা চেপে হত্যা করলেন; তারপর যখন তাঁর চৈতন্যোদয় হ'লো, তখন পুত্রবধূকে তিনি নিজে হত্যা করেছেন জেনে পুনরায় মানসিক আঘাতে আত্মঘাতিনী হ'লেন।

একটি ট্রাজিক ঘটনার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো। এ নাটক উদ্দেশ্যমূলক সন্দেহ নেই। একটি সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে দীনবন্ধু যেভাবে এই নাটকীয় কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটিয়েছেন, তা স্থানে স্থানে মেলোড্রামা বা অতি-নাটকীয়তায় সম্পৃক্ত হ'য়েও একটি বিশেষ কালকে এবং সেই কালটিকে কেন্দ্র ক'রে এদেশীয় প্রজার উপর ইংরেজের অত্যাচারের ঘটনাবলীকে মরমী-ভাবে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন—যা শুধু সেই কালের মধ্যেই বিলীন হ'য়ে যায় নি, সেই কালকে কেন্দ্র ক'রে অদ্যাবধি আমাদের মনকে এসে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়। আমাদের জাতীয়তার বীজ এরই গর্ভে নিহিত। এদেশে স্বাধীনতার ভিত্তিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে যতরকম আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছে, তার মধ্যে নীলকর বিদ্রোহ প্রধানতম একটি। এই কারণে আমাদের মুক্তিকামী চিত্তকে এসে এই কাহিনী কেবল নাড়াই দেয় না, জাতীয়তাবোধেও উদ্বুদ্ধ করে। দীনবন্ধুর লেখনী থেকে এজাতীয় নাটক দ্বিতীয়টি গ'ড়ে ওঠেনি; সেই কারণে ইতিহাসের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে এ নাটকের বৈশিষ্ট্য অনেকখানি। মাত্র দুটি পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে এ নাটকের যে কাহিনী গ'ড়ে উঠেছে, তা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হ'য়েও বাংলার গোটা চাষী-জীবনের এক অবিচ্ছিন্ন নিপীড়নের চিত্রই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

এর মূলে খুঁজে পাই লেখকের জীবন সম্পর্কে আগ্রহ ও অফুরন্ত সমাজচেতনাবোধ। তিনি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও মাইকেল মধুসূদনের মাঝামাঝি সন্ধিকালের কবি। পুরো বাঙালীয়ানার মতো ইংরেজীয়ানাও তাঁর মধ্যে কম ছিল না। তিনি ঘুরেছেন অনেক, দেখেছেন নানা বিচিত্র মানুষ—যাঁরা সুখে-দুঃখে রাগে-অনুরাগে ভিন্নতর হ'য়েও মূলতঃ এক; প্রায় একই তাদের দুঃখ, একই তাদের আকাঙ্খা। মূলতঃ এই মানুষগুলোও দীনবন্ধুর রচনার উপজীব্য ছিল। ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর এই বহু দূরদর্শী অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ বঙ্কিম-চন্দ্র বলেছেন: 'এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্য ছিল না?... ক্ষেত্রমণির মতো গ্রাম্য প্রদেশের ইতরলোকের কন্যা, আদুরীর মতো গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মতো গ্রাম্য প্রজা, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্গীরের মতো লোকের নাড়ী-নক্ষত্র তিনি জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোনও বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মতো অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী।...'

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ১৮৭৭ সালে 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' লেখেন। এই রচনাই এযাবৎকাল দীনবন্ধু সম্পর্কে বাংলাসাহিত্যে প্রধানতঃ আলোচিত হ'য়ে আসছে; ক্রমে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর সাহিত্যের কোনো কোনো দিক এবং বিশেষভাবে 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এই কবি-নাট্যকারের জীবনকাহিনী সম্পর্কে এখানে কিছু ইঙ্গিত রাখা প্রয়োজন মনে করি।

নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৮ সালে দীনবন্ধু

মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালাচাঁদ মিত্র বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। অল্প বয়সেই দীনবন্ধু কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হ'য়ে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করেন। তারপর হিন্দু কলেজ। কলেজে তাঁর মতো মেধাবী ছাত্র খুব কমই ছিল। হিন্দু কলেজ থেকেই সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন এবং বাংলায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সেটা ইংরেজী ১৮৮৫ সাল। এই সালেই কলেজ থেকে বেরিয়ে দীনবন্ধু কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম চাকরী পাটনায় পোষ্টমাষ্টার হিসেবে। কাজে তিনি এত একাগ্র ও কর্মদক্ষ ছিলেন যে, অল্প দিনেই চারদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে তাঁর পদবৃদ্ধি ঘটে, পাটনা থেকে তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হ'য়ে যান, এবং সেখান থেকে নিজের জেলা নদীয়ায় বদলী হ'য়ে অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা বিভাগের কার্য্যভার নিয়ে যান। এই সময়েই নীলকরের গোলযোগ দেখা দেয়। এ ঘটনায় তিনি মাত্র দর্শক হ'য়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন না, নানা স্থানে পর্যটন ক'রে এ সম্পর্কে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন, তারই উপাদানে রচনা করেন 'নীলদর্পণ'। ঢাকা থেকে ফিরে এসে তিনি 'নবীন তপস্বিনী' রচনা করেন। পরে দীর্ঘকাল কৃষ্ণনগরে কাটিয়ে সুপারনিউমেরারি ইন্‌সপেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হ'য়ে কলকাতায় আসেন এবং ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের ডাকের সুচারু ব্যবস্থার জন্য তাঁকে কাছাড় যেতে হয়। কলকাতায় থাকাকালেই তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে দীনবন্ধু 'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। কলকাতার কর্মজীবনে তাঁকে প্রধানতঃ পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে সাহায্য করতে হতো। এই নিয়ে পোষ্ট্‌-মাষ্টার জেনারেল ও ডাইরেক্টার জেনারেলের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'লো—যার ফল হ'লো দীনবন্ধুর কার্য্যান্তরে গমন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেকদিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইতেন এবং ডাইরেক্টার জেনারেল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।—পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এবং ডাইরেক্টার জেনারেল বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছুদিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিভিসনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।'

তখন যথাক্রমে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও ডাইরেক্টার জেনারেল ছিলেন মিঃ টুইডি ও মিঃ হগ। তাঁদের কার্যকলাপের নিন্দা ক'রে এ সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন—

'....A few days before his death, Babu Deno Bandhu while in a very bad state of health told us that he was sure to die and its real cause was the Party Spirit which was rampant between Mr. Twedie and Mr. Hogg will Government enquire into this matter ?'

এই প্রতিভাদীপ্ত কবি-নাট্যকারের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর। তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতো বাগ্মিতাও সেকালে বড় একটা কারুর ছিল না। তৎকালীন 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্র তাঁর এই বাগ্মিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

দীনবন্ধুর এমন নাটক নেই—যা তৎকালে বিভিন্ন সৌখীন নাট্যমঞ্চে দিনের পর দিন অভিনীত না হ'য়েছে। ক্রমে যখন সৌখীন নাট্যমঞ্চকে অতিক্রম ক'রে কলকাতায় জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন একান্ত-ভাবে দেখা দিল, তারও মূলে ছিলেন দীনবন্ধু। জাতীয়

নাট্যমঞ্চের জন্ম তাঁর যে অবদান, তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকটি দীনবন্ধুর নামে উৎসর্গ করেন; উৎসর্গপত্রে তিনি যে কয়েকটি কথা লেখেন, এই সূত্রে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গিরিশচন্দ্র লেখেন: "বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্ম মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।...যে সময়ে সধবার একাদশী' অভিনয় হয়, সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্ম সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

'সধবার একাদশী' যদি দীনবন্ধুকে বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেয়, 'নীলদর্পণের' মধ্য দিয়ে তবে তিনি জনচিত্তে জাতীয়তাবোধের প্রবক্তার অধিকার লাভ করেন। সেই অধিকার আমরা তাঁকে ভক্তিবিনম্র চিত্তেই দিয়েছি।

নাগরিক অধিকার

চিত্তরঞ্জন দাশ

স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর উজির নাজির সভাসদ পারিষদ নির্ব্বাচনে কেবল একটিমাত্র ভোট প্রদান। এতদ্ভিন্ন দেশ কিম্বা জাতির কল্যাণে তাদের কোন দায়-দায়িত্ব অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতার বালাই নাই। অগণিত দেশবাসীর যাবতীয় সুখদুঃখ জীবন মরণের সম্পূর্ণ ভার মুষ্টিমেয় রাজনীতি-বিদ্‌দের উপর নির্ভর ক'রে, জনগণ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাঘোরে অলীক স্বপ্ন দেখছেন—কতদিনে তথাকথিত জনদরদী নেতৃবৃন্দ তাদের স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দেবেন। অবশ্য সে দিক থেকে গণভোটে নির্বাচিত সদস্যগণও যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। গণতন্ত্রের সুযোগে ক্ষমতালোভীর দল ক্রমশঃ এত অধিক স্বার্থান্ধ হয়ে পড়েছে যে জনস্বার্থ-বিরোধী যে কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে তারা আর বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। যার ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার মাত্রা ক্রমশঃ চরম পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অনশন অর্দ্ধাশনে কোটি কোটি নাগরিক জীবনের স্বর্গপ্রাপ্তির পথ অত্যন্ত সুগম হয়ে পড়েছে।

দেশে গণতান্ত্রিক রামরাজ্য স্থাপিত হ'য়েছে বিশ বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু রাজা অর্থাৎ রাম শূন্য রাজ্যে তাঁর অনুচরবৃন্দের দ্বারাই শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে। ত্রেতাযুগের রামরাজ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের রামরাজ্যের শাসনপদ্ধতির যে নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইহাই যদি হয় রামরাজ্যের আদর্শ, তা হ'লে রহিমরাজ্যের আর অপরাধ কি?

গৃহস্থ যখন নিদ্রামগ্ন থাকে, সেই সুযোগে চোর গৃহে প্রবেশ করে তার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তেমনই দেশের নাগরিকবৃন্দের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং পরনির্ভরতার সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতাসীন দল অবাধে দুর্নীতির বহুবিধ কৌশলদ্বারা দেশের ধনসম্পত্তির অপচয় ও আত্মসাৎ ক'রে দেশকে সর্ব্বতোভাবে নিঃস্ব করেছে। বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও অন্নঋণ ভিন্ন এ দেশের মুস্কিল আসানের আর কোনও উপায় নেই। বিশ্ববাসীর চোখে সোনার ভারত আজ একটি ভিখারীর দেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং এর পরেও কি আর ভারতীয় নাগরিকদের তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলির উপর দেশের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত ক'রে নিষ্ক্রিয়ভাবে কালাতিপাত করা সমীচিন? জনস্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত, নিষ্পেষিত; সেখানে উচিত নয় কি জনগণের সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের সর্ব্ববিধ কৌশল এবং চক্রান্ত ধূলিসাৎ করা?

তাই আজ দেশের সর্ব্বস্তরের জনগণের কল্যাণার্থ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সর্ব্বভারতীয় নাগরিকবৃন্দের সম্মিলিত একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠন করা। উক্ত সংস্থার নাম হবে "নিখিল ভারত নাগরিক পরিষদ" (All India Citizens Council). দেশের ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার থাকবে উক্ত পরিষদে যোগদান করবার।

নাগরিক পরিষদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে যে যন্ত্রের মাধ্যমে (নির্ব্বাচন) বৈতরণী পার হ'য়ে মুষ্টিমেয় লোক কোটি কোটি মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে স্বৈরশাসন পরিচালনা করে, সেই যন্ত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে বিকল ক'রে দেওয়া অর্থাৎ নির্ব্বাচন প্রহসন বর্জ্জন করা। অবশ্য শাসনযন্ত্র যতদিন রাজনৈতিক দলদ্বারা পরিচালিত হবে, ততদিন নির্ব্বাচন যথানিয়মে চলবে এবং কিছুসংখ্যক লোক ভোটও দেবে। অতঃপর স্থায়ী কিম্বা

tituency-wise অর্থাৎ প্রত্যেক নির্ব্বাচন এলাকায় নাগরিক পরিষদ গঠন করা এবং স্থানীয় নির্দলীয় যোগ্য ব্যক্তিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচন করা। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজ্যসভায় মিলিত হ'য়ে তাঁদের মধ্য থেকে সুযোগ্য ব্যক্তিকে নেতা স্থির করবেন এবং যদি তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'ন, তাহ'লে সেই নেতাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ইহাই রাষ্ট্রের প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন-পদ্ধতি। তদ্ভিন্ন এযাবৎকাল নির্ব্বাচনের যে প্রহসন চলে আসছে অর্থাৎ যারা শুধু ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থেই নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়, তাদের দ্বারা দেশের কোটি কোটি অর্থের অপচয় ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত বহুল প্রচারিত জন-কল্যাণ কিংবা দেশসেবার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে যে প্রচলিত নির্ব্বাচন রাজনৈতিক দলগুলির কোটি কোটি মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার এবং দেশের শাসন-ক্ষমতা দখল করবার একটা বিচিত্র কৌশল।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অপূর্ব্ব প্রহসন দেখেও কি আর জন-সাধারণের উক্ত দলগুলির উপর কোনরূপ আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত? "ছলে বলে কৌশলে, কার্য্য-সিদ্ধি গরীয়সী" ইহাই হচ্ছে প্রায় সকল দলের মূলমন্ত্র। নইলে যাদের ব্যক্তিগত জীবনে আত্মস্বার্থ ভিন্ন দেশ কিম্বা জাতির কল্যাণে বিশেষ কোন অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়না, নির্ব্বাচনের সময়ে তারাই এসে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটপ্রার্থীরূপে জনসমক্ষে দণ্ডায়মান হন। এদের অনেকেই বক্তৃতাবাগীশ এবং মুখরোচক বক্তৃতাদ্বারা সাধারণ মানুষের সরল মন অনায়াসে জয় ক'রে, জয়মাল্য গ্রহণ করেন। যেখানে বিশেষ অসুবিধা হয়, সেখানে "ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধিয়তে" অর্থাৎ যেখানে যেরূপ অপকৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন, তা করতে তারা কোনও দ্বিধা বোধ করেন না। তদ্ভিন্ন ভোট সংগ্রহের জন্য প্রার্থীদের যে পরিমাণ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়, সাধারণ মানুষের নিকট উহা বিধানসভার ক্ষেত্রে সাত হাজার এবং লোকসভার ক্ষেত্রে পঁচিশ হাজার। কিন্তু কার্য্যত ব্যয়িত হয় উহার বহুগুণ। সুতরাং এই স্বোপার্জ্জিত অথবা ঋণার্জ্জিত বিপুল অর্থ কি তারা শুধু পরার্থেই ব্যয় করেন কিম্বা উহা ব্যবসায়ের মূলধন হিসাবেই ব্যয়িত হয়? ইহাই হচ্ছে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়।

ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে ভানুমতীর খেল্ দেখেছিলেন, অনেকের কাছেই হয়ত উহা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। নির্ব্বাচনের সময়ে যারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সরকার গঠনের সময়ে আবার তারাই হিংসা দ্বেষ, মত ও পথ ভুলে এক গোষ্ঠীভুক্ত হ'লেন। কিন্তু শাসন-যন্ত্র পরিচালনার কার্য্যে ক্রমশঃ তাদের স্বরূপ প্রকাশ পেল। একমাত্র সংরক্ষণ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে তারা কখনও একমত হ'তে পারলেন না। যদিও তাদের অপ্রত্যাশিত সংযুক্তির জন্য জনসাধারণের খুবই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে হয়ত বা তারা রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সে ভুল ভেঙ্গে গেল। সংযুক্ত দল জনগণের নিকট যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে কেবলমাত্র দলাদলি ও কোন্দলের জন্যই সব কিছু তারা ভুলে গেলেন। ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার মাত্রাও সীমা ছাড়িয়ে গেল। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। শাসনযন্ত্র প্রায় অচল। ঠিক সেই সময়েই হ'ল তাদের আকস্মিক পতন। এবং মাত্র তিন মাসের জন্য অপর দল শাসনকার্য্য পরিচালনা করে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনেও সক্ষম হ'য়েছিল। কিন্তু প্রতি-ক্রিয়াশীল বিভিন্ন দলের চক্রান্তে শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনই প্রবর্ত্তিত হ'ল। দলাদলির ফলে রাজ্যে যে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছিল, রাষ্ট্রপতির অল্প-দিনের শাসনেই উহা সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক নিরসন হ'য়েছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দলের ক্রমবর্দ্ধমান দলাদলি এবং হিংসাত্মক

কার্য্যকলাপের পরিবর্ত্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসনই যে রাজ্য এবং জনগণের পক্ষে মন্দের ভাল, ইহাই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সুচিন্তিত অভিমত।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকলে এবং আশু অন্তর্বর্ত্তী নির্বাচন প্রহসন সম্পন্ন না হলে যে রাজ্যের ছাটাই মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সভাষদ, পারিষদ-দের বর্ত্তমান বেকারত্ব ঘুচবে না, তাই আগামী নভেম্বর মাসে নির্বাচন-অনুষ্ঠানের দিনও ধার্য্য হয়েছে। বলা বাহুল্য এই নির্বাচন-অনুষ্ঠানের ব্যয় কমপক্ষে চার কোটি টাকা এবং যারা নির্ব্বাচিত হবেন, পোষ্যবর্গসহ তাদের বেতন এবং বহুবিধ ভাতার কোটি কোটি টাকার নিয়মিত প্রবল চাপ পশ্চিম বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের উপরই পড়বে। অথচ উল্লিখিত শ্বেত হস্তীদের অভাবে রাজ্যের শাসনযন্ত্র যে অচল হয় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতির শাসনেই জাজ্বল্যমান। ইতিমধ্যে রাজ্যের কুখ্যাত কালোবাজার যে কিছুটা সাদা হয়েছে, সাধারণ মানুষ হয়ত উহা খানিকটা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তবে কালোবাজারের মূল কারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ যতদিন প্রচলিত থাকবে, ততদিন কালোকে সাদা করা খুবই কঠিন। কিন্তু যদি সরকারের কিছুমাত্রও সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং কথঞ্চিৎ জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের আগ্রহ থাকে, তাহ'লে রেশনে চালের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে কালোবাজারের প্রবল চাহিদাকে খর্ব্ব করতে পারলে কালো রং কিছুটা, সাদা হতে পারে এবং জনসাধারণও তখন তাদের প্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিস্মৃত হয়ে রাষ্ট্রপতির শাসনকেই সুস্বাগতম জানাবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আশু নির্ব্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং উহাদ্বারা জনসাধারণের বিশেষ অনিষ্ট ছাড়া ইষ্টের কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ নির্ব্বাচন-যুদ্ধের অধিকাংশ যোদ্ধাই জনগণের সুপরিচিত। এদের জনসেবার পরাকাষ্ঠাও সাধারণ মানুষ এ যাবৎকাল মর্ম্মে-

মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে। একমাত্র গদীর লোভ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ভিন্ন ইহাদের আর যে কোন উদ্দেশ্য নাই, উহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে। সুতরাং এর পরেও যদি জনসাধারণ তাদের ফাঁকা বুলিতে আকৃষ্ট হয়ে তাদেরই আবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তাহ'লে তারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠার হানবেন। দেশের তথাকথিত স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ যারা গত সাধারণ নির্ব্বাচনে অতি নগণ্য ব্যক্তিদের কাছেও পরাজিত হয়েছেন, অর্থাৎ যারা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেই সমস্ত পুরাতন পাপীরাও, আবার লজ্জা ঘৃণার বাঁধ ভেঙ্গে আসন্ন মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য বিশেষ-ভাবে তোড়জোড় করছেন। কারণ ইহারা যে ইতিপূর্ব্বে রক্তের প্রকৃত আস্বাদ পেয়েছেন। সুতরাং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাদের সে রক্তের লোভ সম্বরণ হবে না। তাই তারা অগত্যা গৌরাঙ্গদেবের উদার নীতিই অবলম্বন করেছেন—অর্থাৎ "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না?" এরা যে সব প্রেমাবতার। প্রেমের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দেবার জন্য কৃতসঙ্কল্প।

এমতাবস্থায় রাজ্যের কোটি কোটি সাধারণ অধিবাসীর আগামী নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে কি করণীয়, সেইটাই হচ্ছে বিশেষ বিবেচনার বিষয়। প্রথমেই উল্লেখ করা হ'য়েছে সে নির্ব্বাচন রাজনৈতিক দলেরই প্রয়োজন কারণ ক্ষমতা লাভের জন্য বর্ত্তমান সংবিধান অনুযায়ী উহাই একমাত্র সোপান। দেশের নাগরিকবৃন্দ উহার নিস্ক্রিয় দর্শক, প্রহসনে তাদের ভূমিকা শুধু নির্ব্বিচারে একটি মাত্র ভোট প্রদান। অথচ ভোট দিয়ে যে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদেরই প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন, সে কথা কেউ একবার চিন্তা করেও দেখেন না। যার ফলে সাধারণ মানুষের যে শোচনীয় দুর্দশা ও পরিণাম পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা ভাষা'য় ব্যক্ত করা কঠিন। সুতরাং এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি দূরীকরণার্থ রাজ্যের জনগণের উচিত নির্ব্বাচন প্রহসন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা এবং উক্ত প্রহসনের বরাদ্দকৃত বিপুল অর্থ অর্থাৎ চার কোটি টাকা দিয়া রাজ্যের খাদ্যশস্য ঘাটতি পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট অবিলম্বে ন্যায্য দাবী পেশ করা। সরকার যদি সে দাবী মেনে নেয় এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উক্ত জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হন, তাহলে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে অগণিত নরনারী নিস্কৃতি পাবে।

পরিশেষে দেশের নাগরিকদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তারা যেন আর নিস্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে না থেকে সর্ব্বত্র সক্রিয়ভাবে সংঘবদ্ধ হন, কারণ গণতন্ত্রের দেশে সংঘশক্তি ছাড়া কোন বৃহৎ কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনের এখন থেকেই যে তোড়জোড় চলছে, উহাদ্বারা জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি ভিন্ন উপকারের যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন পূর্ব্বোল্লিখিত নাগরিক পরিষদের মাধ্যমে হয়, উহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করতে হবে, নচেৎ প্রত্যেক নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে নির্দ্দলীয় প্রার্থীকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, বিশবছরের বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করতে হবে। ইহাই প্রকৃত নাগরিক অধিকার।

খাদ্য হিসাবে মাটির ব্যবহার

ভাগবতদাস বরাট
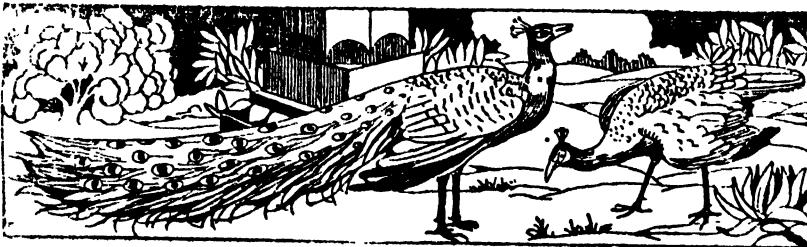
দেশ অজন্মা। খাদ্য নেই। খাদ্যাভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই আশঙ্কা ভবিষ্যতে হয়ত টাকা দিয়েও খাদ্য জুটবে না। মানুষ তখন কি খাবে?

এ নিয়ে অনেক চিন্তা। নানা গবেষণা। কিন্তু কেউ তো বলে না যে মানুষ তখন মাটি খাবে! আমিও তা বলছি না।

মাটির সঙ্গে আমাদের চিরকালের পরিচয়। মানুষ শুধু একা নয়, জগতের প্রতিটি জীবেরই মাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

মাটির উপর আমরা মাটি দিয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করি। মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাই। আর মাটিরই উপর দিয়ে আমরা চলাফেরা করি। চিন্তাশীল দার্শনিক ও মহাপুরুষ-দের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতিভাত এই যে আমাদের নশ্বর দেহ মাটি থেকেই উদ্ভুত এবং মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাবে; বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কিন্তু তা হলেও খাদ্য হিসাবে মাটির ব্যবহার অনেকেরই জানা নেই। এইক্ষুদ্র আলোচনায় আমি সেই অশ্রুতপূর্ব সংবাদ-কথাই জানাচ্ছি।

কলকাতায় পাতখোলা নামে যে মাটি বিক্রী হয় তা অনেকের কাছেই খাদ্য বিশেষ। বৃন্দাবনের মাখন মাটি আকর্ষণীয় খাদ্য বস্তু। মোড়ং পাহাড়ে ঘুটিং জাতীয় এক প্রকার মাটি পাওয়া যায় যা স্থানীয় অধিবাসীরা তর-কারীর পরিবর্ত্তে তেল-নুন দিয়ে রান্না করে। স্পেনের অভিজাত বংশের মেয়েরা লঙ্কা সহযোগে আলমাগ্রো বা এস্ট্রেমেজ থেকে আমদানী একপ্রকার কাদা-মাটি উপাদেয় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সুইডেনের উত্তরে ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশে এবং তৎসন্নিকটস্থ স্থানের অধি-বাসীরা একপ্রকার সাদা মসৃণ মাটি ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি তৈরী করে। উক্ত অঞ্চলে খাদ্যবস্তু হিসাবে এই মাটি দোকানে বিক্রীও হয়।

অষ্ট্রিয়ার ষ্টিভিয়া প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরা রুটিতে মাখনের পরিবর্ত্তে একপ্রকার নরম ও মসৃণ মাটি মেখে নিয়ে আহার করে। এই মাটির তারা নাম দিয়েছে মাখন মাটি।

পারস্যের নিশাপুর প্রদেশে এবং দক্ষিণ পারস্যে,-এই দু' স্থানে দু' প্রকার সুস্বাদু মাটি পাওয়া যায়। প্রথম স্থানের মাটি মশলার সঙ্গে মিশিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় স্থানের প্রাপ্ত মাটি পাঁউরুটির মাখন রূপে ব্যবহৃত হয়। এস্কিমোদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাটি ভক্ষণের রীতি আছে। শ্যামদেশের মেয়েরা ফুলখড়ির মত একপ্রকার মাটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যবদ্বীপের সমুদ্রোপকূলের অধিবাসীরা "এম্পো" নামে একপ্রকার মাটি খায়। এবং পুলির আকারে গড়ে নিয়ে দোকানে সাজিয়ে রেখে বিক্রী করে। তাদের ধারণা যে এই মাটি ভক্ষণে দেহের গঠন সুন্দর হয় এবং ক্লান্তি বাড়ে।

আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি খাওয়ার রীতি আছে গিনি অঞ্চলের অধিবাসীরা খুব বেশী পরিমাণে মাটি খায় সেনেগাম্বিয়ার অধিবাসীরা একপ্রকার মসৃণ মাটি দি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। নিউক্যালিডোনিয়া প্রদেশের মা জব লৌহ মিশ্রিত একপ্রকার মাটি ভক্ষণ করে। দক্ষি আমেরিকার কোনো কোন স্থানে পোড়ামাটি খাদ্য হিস বেশ প্রচলিত। গোয়াটিনালা নামক স্থানের অধিবাসী চিনির পরিবর্ত্তে আগ্নেয়গিরি হতে উদ্গত ভস্ম ব্যব করে। তা ছাড়া কলম্বিয়া হতে বলিভিয়া পর্য

আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে খাদ্য হিসাবে মাটির ব্যবহার দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় একপ্রকার সাদা মাটি পাওয়া যায়। ইহা খনিজাত। এবং খড়িমাটি নামে পরিচিত। মাটির ঘরকে সাদা রঙে রঞ্জিত করতে এর প্রলেপ দেওয়া হয়। বাঁকুড়ায় পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা উক্ত মাটি আগুনে পুড়িয়ে ভক্ষণ করে। তা' ছাড়া কুমারেরা একপ্রকার পিষ্টক আকারের পোড়া মাটি বিক্রী করে। ইহা বনক মাটি নামে পরিচিত। কেউ কেউ এই মাটিও তৃপ্তি সহকারে আহার করে।

খাদ্য হিসাবে মাটির ব্যবহার বহুকাল হতেই প্রচলিত। মানুষ কি ভাবে এবং কখন থেকে যে মাটিকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করল তার নজির ইতিহাসে পাই না। হয়ত মুখের কাছে কোন আহার্য্য বস্তু না পেয়ে একদা আদিম যুগের কোন মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মাটি খুঁড়ে মুখে পুরে। সেই থেকে তার দেখাদেখি অপর মানুষও মাটি খায়। ফলে আজও মাটি মুখরোচক খাদ্যরূপে বিভিন্ন দেশে পরিচিত।

এ কথা সম্পূর্ণ অনুমানসাপেক্ষ। ভেবে চিন্তে মনে করি। তবে একটু চিন্তা করে দেখা যায় মাটি যেন আমাদের মা টি। শিশু যেমন মাতৃস্তন পান করে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হয় আমরাও ঠিক সেইরূপ। মাটির রস পান করেই তো বেঁচে আছি আমরা।

রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা

অশোক সেন

কবির সাত আট বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ একদিন দুপুরবেলা তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন যে তাঁহাকে পদ্য লিখিতে হইবে এবং পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগা-যোগের রীতিপদ্ধতি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। কবি লিখিয়াছেন,

"গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না·····ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে সুরু করিয়া দিলাম।······সেই নীল ফুল্‌স্‌কাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, তাহার ভবভয় আর নাই। মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।

আমি কবিতা লিখি এ-খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না।

এরপর কবি লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত মহাশয়, বালক রবীন্দ্রনাথ লেখেন জানিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া তা' পূরণ করিয়া আনিয়া দিতেন। এ-ছাড়া স্কুলের ভীষণ গম্ভীর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ গোবিন্দবাবু তাঁহার কবিতা লিখিবার কথা জানিতে পারিয়া কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করেন। পরদিন কবিতা লইয়া গেলে তিনি কবিকে সঙ্গে করিয়া ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সামনে দাঁড় করাইয়া কবিতাটি আবৃত্তি করান। এরপর কবি নিজের স্বভাবসুলভ পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করিয়াছেন···

"এই নীতি কবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে—এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে।"

রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয়ে যাওয়া স্থির হয়। যাইবার পথে দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থাকিয়া যান। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলিয়াছেন—

"ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা লেট্‌স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এখন খাতাপত্র এবং বাহ্য উপকরণের দ্বারা কবিত্বের ইজ্জত রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে। এইজন্য বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটিকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো লেট্‌স্ ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।"

'পৃথ্বীরাজ পরাজয় (১২৭৯) কাব্যটিরই পরিমার্জিত রূপ 'রুদ্রচণ্ড'—ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

বনফুল—আট সর্গে বিভক্ত কাহিনীমূলক কাব্য। কবির ১৩।১৪ বৎসর বয়সের রচনা—প্রথম প্রকাশিত

হয় জ্ঞানাংকুর মাসিকপত্রে ১২৮২ সালে এবং গ্রন্থকারে ছাপা হয় ১২৮৬ সালে। বর্তমানে রবীন্দ্ররচনাবলীভুক্ত করা হইয়াছে।

এত বছর পূর্বে এবং ওই অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ এমন দুঃসাহসিক কাহিনীর সৃষ্টি করিলেন কিরূপে, এ-কথা ভাবিয়া সত্যই আশ্চর্য লাগে। নায়িকা কমলার চরিত্রের উপর মিরাণ্ডা, শকুন্তলা ও কপালকুণ্ডলার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

মাতৃহীনা কমলা শৈশব হইতে নির্জন কুটিরে পালিতা। পুরুষ বলিতে একমাত্র সে নিজের পিতাকেই জানিত—কারণ লোকালয়ের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধই ছিল না। বনের পশুপক্ষী গাছপালার সঙ্গে তাহার এমন একটা মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা সহজেই শকুন্তলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কমলার ষোড়শ বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পথিক বিজয় নানা স্থান ঘুরিয়া এই বনভূমিতে উপস্থিত হয় এবং আত্মীয়স্বজনহীনা কমলাকে সঙ্গে করিয়া লোকালয়ে লইয়া আসে। ইহার পর বিজয় ও কমলার বিবাহ হয়।

কমলা চিরকাল জনমানবহীন বনভূমিতে মানুষ। লোকাচার, বিবাহ, এ-সব সে কিছুই বুঝে না। বিজয়ের বন্ধু নীরদকে সে ভালবাসিল—ইহা যে অন্যায়, সমাজ যে এ-প্রেমকে স্বীকার করিবে না, এ-বোধও কমলার হয় নাই। ইহার পরেই ইহাদের জীবনে আসে জটিলতা এবং শেষ পর্যন্ত ঈর্ষ্যায় উন্মত্ত হইয়া বিজয় নীরদকে হত্যা করে। শোকবিহ্বলা কমলা পলাইয়া আসে আবার সেই শৈশবের বাসস্থান বনভূমিতে। কিন্তু এবার এখানে আসিয়াও সেই আগের মত প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিল না। প্রকৃতির বুকে যখন সে মানুষ হইয়াছিল তখন তাহার ভিতর যে আদিম সরলতা ছিল, লোকালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা চিরতরে নষ্ট হইয়া যাওয়াতেই এমনটা ঘটিল।

'বনফুলে'র রোদনভরা কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার ছাপ জায়গায় জায়গায় সুস্পষ্ট। ভবিষ্যতে এই বালক-কবি যে একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের রচয়িতা হইবেন তাহারও আভাস পাওয়া যায় 'বনফুলে'।

"কবিকাহিনী" বনফুলের পরে লেখা। ইহা রচিত হয় ১২৮৪ সালে কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বনফুলের একবৎসর পূর্বে ১২৮৫ সালে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ষোল বৎসর। এই কাব্যটি সম্বন্ধে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়া-মূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা।......

......ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পথে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে।......

......এই 'কবিকাহিনী' কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ আকারে বাহির হয়।"

এ-কথা সত্য যে এ-কাহিনীতে যে-সব কথা কবি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা ঠিক হৃদয় দ্বারা অনুভূত স্বতঃস্ফূর্ত জিনিষ নহে। তাহা হইলেও এ-কথা মানিতে হইবে যে রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি বিশেষ দিক এই অপরিণত রচনাগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন—কবির প্রকৃতিপ্রীতি, বিশ্বপ্রেম, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, লিরিকের প্রাবল্য এবং কল্পনার ব্যাপকতা।

মানুষ কাছের জিনিষকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার আদর্শকে খুঁজিতে যায় দূরে—সেখানে ব্যর্থ হইয়া যখন ফিরিয়া আসে তখন দেখে চিনিতে না পারার দরুণ যাহাকে একদিন পিছনে ফেলিয়া গিয়াছিল তাহাই তাহার আসল আদর্শ; কিন্তু তখন আর তাহা ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। ভবিষ্যতেও বহুবার বহু কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটিই আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত জার্মান্ নাট্যকার জুডারম্যানের "The Three Horon Feathers" নাটকটির কথা মনে পড়ে। সমালোচক ফ্র্যাক্ ওয়াড্‌লে চ্যাণ্ডলার তাঁহার Aspects of Modern Drama-তে লিখিয়াছেন—

'Die Drei Reiherfedern exhibits a man's quest of the ideal, identified with a beautiful woman. He who would attain the ideal disdains the actual, and discovers only too late that she who seemed earthly was herself the ideal he was seeking. Suderman's Prince Witte has left home to find the woman who will match his dream. It has been revealed to him that in order to possess her he must secure three feathers from a heron of the northern seas. By burning the first, he will gaze upon her ; by burning the second, he will be united with her in love ; by burning the third, he will destroy her. Having fulfilled the first two conditions without realizing that his wife is indeed his ideal, Prince Witte resigns his crown and wanders over the earth. One day he returns and, meeting his faithful queen, comprehends his folly. It is she whom he loves, and no other. He will dispel the vision, that has so misled him. Accordingly he burns the last magic feather. As it disappears in smoke, the queen sinks at his feet. The prophecy has been fulfilled. She is his true ideal, and he has destroyed her.

'কবিকাহিনী'র নায়ক কবি যখন বহুদেশ লোকালয় প্রভৃতি ঘুরিয়াও মনে শান্তি পাইল না তখন সে আবার ফিরিয়া আসিল বনবালা নলিনীর কাছে। কিন্তু সে কি দেখিল ?—

"দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে, শীতল তুষার 'পরে
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।"

শৈশবসংগীত ১২৮৪ হইতে ১২৮৭ সাল—অর্থাৎ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে রচিত। ইহা প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। এই কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতাই গাথাজাতীয়। হৃদয়াবেগের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস এবং করুণরসের প্রাবল্য কবির এই সময়কার সব রচনারই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ সন্ধ্যাসংগীতের ও শৈশবসংগীতের মধ্যে এমন একটা মিল আছে যাহা চোখে না পড়িয়া পারে না। দুটি কাব্যের বক্তব্য বিষয়ও প্রায় এক। তবে সন্ধ্যাসংগীতে লিখিবার ষ্টাইলটা অনেকটা পরিণত।

ভগ্নহৃদয় ১২৮৭ সালে রচিত এবং ১২৮৮ সালে প্রকাশিত। কবি 'জীবনস্মৃতি'তে :

'বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। ফিরিবার পথে কতকটা, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। 'ভগ্নহৃদয়' নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল। ... আমার আঠারো বছর বয়সের কবিতাসম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি—'ভগ্নহৃদয়' যখন লিখিতে আরম্ভ করেছিলেম, তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময় সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে ওঠে।...

অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত উক্তিগুলা বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই, তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।'

ভগ্নহৃদয় নাট্যাকারে লেখা কাব্য। ভগ্নহৃদয় পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে বিহারীলালের প্রভাব খুবই বেশী চোখে পড়ে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—১২৯১ সালে প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতিতে আছে—

পূর্বেই লিখিয়াছি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য

সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলী মিশ্রিত ভাষা আমার পথে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেই-জন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অংকুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম প্রাচীন পদকর্তাদের রচনাসম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। ··এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।··· কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জার্মানীতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্যসম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি পাইয়াছিলেন।

ভানুসিংহ যিনিই হউন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।···

ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।

ভানুসিংহ অবধি রবীন্দ্রনাথের লেখায় একটা অনুকরণের প্রয়াস দেখা যায়। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) হইতেই তাঁহার আসল কাব্যরচনা সুরু হইল—কবি যেন নিজেকে প্রথম খুঁজিয়া পাইলেন। তার আগে বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি কবির ভাব ভাষা ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথের রচনার উপর এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যাহার ফলে রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখক সত্তাকে তখনও পর্যন্ত খুঁজিয়া পান নাই। বিহারীলালের প্রতি কবির নিজেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে আছে—

"নিজের মধ্যে যে অবরুদ্ধ অবস্থার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবু কর্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাবলী 'হৃদয়-অরণ্য' নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে।···

এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে—কেবল 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

একসময়ে জ্যোতিদাদারা, দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।

এইরূপে যখন আপনমনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে-সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে-সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

··· ··· ··· ···

তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোনো ভয়ডর যেন ছিল না। লিখিয়া গিয়াছি, কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনো-প্রকার পূর্বসংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া যাওয়াতে যে জোর পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে

কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিসকে পাই নাই। হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই। সেইজন্যই হাতটাকে যেমন খুশি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জন্যই হাতটাকে যথেষ্ট ছুঁড়িয়াছি।

আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্য হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানীদের কাছে সন্ধ্যাসংগীতের একটা বিশেষ স্থান আছে। একটা ব্যথা এবং বেদনার ভাব বেশীর ভাগ কবিতাতেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাগুলির গতি অত্যন্ত শ্লথ। তবে শেষের দিকের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন এই দুঃখ-বেদনাকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ-কথা মানিতেই হইবে যে সন্ধ্যাসংগীতের ভাষা ও ভাব বেশ ধোঁয়াটে ধরণের এবং কবিতাগুলির ছন্দ এলোমেলো।

Thompson-এর মতে—"This was a period when Shelley's *Hymn To Intellectual Beauty* was the perfect expression of his mind—when he could feel that poem as if written for him, or by him. When he wrote *Evening Songs*, his mind resembled Shelley's in many things ; in his emotional misery, his mythopoeia, his personified abstractions."

এলোমেলো হইলেও সন্ধ্যাসংগীতের ছন্দের অভিনবত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Thompson লিখিয়াছেন—

'But the essential thing to remember is that this boy was a pioneer. Bengali lyrical verse was in the making. A boy of eighteen was striking out new paths, cutting charrels for thought to flow in······ ...... ···

··· ··· ······ ···

The reader to day must admire the extraordinary freedom of the verse-formless freedom too often, but all this looseness is going to be taken together presently, the metres are to become knit and strong Further, this was the first genuine romantic movement in Bengali."

সন্ধ্যাসংগীতের কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ হইতে আন্তরিক অভিনন্দন পাইয়াছিলেন।

প্রভাত সংগীত (১২৮৯-৯০)-সন্ধ্যাসংগীতের হৃদয়-অরণ্য হইতে কবি-মানসের নিষ্ক্রমণ প্রভাতসংগীতে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'তেই এ কাব্যের মূল সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি মানস সন্ধ্যাসংগীতের সময়কার ধোঁয়াটে অস্পষ্টতার ভাব কাটাইয়া উঠিয়া অনেক বেশী স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে প্রভাতসংগীতে। স্থানে স্থানে ভাবের অতি প্রাবল্য দোষ অবশ্য আছে, নবাবিষ্কৃত মুক্তির আলোর বর্ণনায় আধিক্যদোষ প্রকটভাবে দেখা যায় সত্য, মানসিক বলিষ্ঠতা এবং সার্বজনীন প্রেম, ভালবাসা এবং সহানুভূতির দিকটা সময় সময় উগ্রভাবে পরিস্ফুট সন্দেহ নাই, তবু এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কাব্যের গতি অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ এবং দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যাসংগীতের বিষাদমগ্ন অবসাদের গহন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কবি প্রকৃতির বুকে আলোবাতাসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ মুক্তির আনন্দ যে একটা বিরাট প্লাবনের গতিবেগ দেখা দিবে, সব কিছু ওলোট-পালোট করা আবেগ মূর্ত হইয়া উঠিবে, ইহার মধ্যে তো অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। এই অবস্থাটা কবিমানসের স্বাভাবিক বিবর্তনের একটি অধ্যায়। কবির মন তখনও অপরিণত, অপরিস্ফুট এবং বিকাশোন্মুখ—সুতরাং এ-অবস্থায় তাঁহার রচনায় asceticism of imagination প্রত্যাশা করিতে পারি না। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ প্রভাত-সংগীত সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে

আমরা জানিতে পারি যে ১০ নং সদর স্ট্রীটের বাসায় যখন তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকিতেন তখন একদিন সকালে তাঁহার এক বিস্ময়কর অনুভূতি হয়। ইহার ফলে তাঁহার মধ্যে সব কিছু যেন উলট পালট হইয়া গেল। কবি লিখিয়াছেন: "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তর হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।"

এবং

"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।·········তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্ন হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকার হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধদ্বার জানিনা কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম।" 'পুনর্মিলন' কবিতায় কবির মনের এই ভাবধারাটাই প্রকাশিত হইয়াছে।

"প্রভাতসংগীতে"র মূল বক্তব্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে।' হৃদয়-অরণ্য হইতে অকস্মাৎ মুক্তি এবং বাহিরের জগতের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত এবং প্রসারিত করিবার বিরাট উল্লাস এবং চাঞ্চল্য কবিতাটির ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত। এই কবিতাটির আলোচনাপ্রসঙ্গে Edward Thompson লিখিয়াছেন:

"The poem is remarkable for its natural beauty; an example of this is its picture of the frozen cave, into which a ray of light has pierced, melting its coldness, causing the waters to gather drop by drop—a Himalayan picture, mossy and chill."

অনন্ত-জীবন, অনন্ত-মরণ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রমানসে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান্।

'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি দার্জিলিংয়ে লেখা। অনেকেরই কাছে কবিতাটি অতিশয় দুর্বোধ্য। কবি বলিয়াছেন,··· "······এ-কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য যে কবিতাটা লেখা হয় নাই এবং কোন তত্ত্বকথা ফাঁকি দিয়া কবিতায় বলিয়া লইবার প্রয়াসও তাহা নহে।" এ-কবিতাটি সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয়
রেলপথের
১১৫ বছর পূর্ণ হ'ল।

(৮ পৃষ্ঠার পর)

আদর্শ খর্ব্বই করা হইয়াছে। কারণ মানবজীবন শুধু বাস্তব সম্পদ দিয়াই গঠিত নহে এবং বাস্তব সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই মানব জীবন পূর্ণতর বিকাশ লাভ করে না। মানব জীবনের শত শাখা ও সেইগুলির অধিকাংশের সহিত অর্থ সম্পদের সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম, রস-অনুভূতি, প্রেরণার প্রকাশ, যথাইচ্ছা কার্য্য করা বা না করা, যথেচ্ছ যাওয়া আসার সুবিধা। স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করা, কোন আদর্শ মানা অথবা না মানা প্রভৃতি বহু বিষয়ের অবতারণা সম্ভব যেগুলির জন্য মানুষ সকল সম্পদ ত্যাগ করিতে পারে।

অল্প সংখ্যক লোকের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিদ্রোহের অধিকার কোন ভাবেই মানা চলে না। কোন অসুবিধা থাকিলে তাহা দূর করিবার নানান উপায় আছে। যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সামান্য সামান্য দাবি পেশ করিবার কোন অর্থ হয় না। নাগা, কুকি, মিজো অথবা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল ইঁহাদিগের কাহারও বিদ্রোহের অধিকার আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। বিদ্রোহ করিলে তাহা আইনত মহা অপরাধ ও তাহার শাস্তিও কঠিনতম। বিদ্রোহবাদ আজকাল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার নিবৃত্তি আবশ্যক।

নির্ব্বাচনের ন্যায় ও নীতি

বাংলাদেশে আবার একটা অকালে বা অসময়ে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার কারণ বাংলার জনসাধারণ যে সকল ব্যক্তিকে ইতিপূর্ব্বে ১৯৬৭ খৃঃ অব্দে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন তাঁহারা দল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন মিলিত ও সংযুক্ত দলসংঘ গঠন করিয়া এমনই একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে কোন মন্ত্রীসভাই স্থায়ীভাবে রাজ্যশাসন কার্য্য চালাইতে সক্ষম হয়েন নাই এবং ফলে ক্রমাগত মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অবশেষে সকল প্রতিনিধিদিগকে বরখাস্ত করিয়া বাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করা হইল। যাহারা এই ব্যবস্থার ফলে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মর্য্যাদা হারাইয়া মন্ত্রীত্বে বা মন্ত্রীত্ব গঠনে বেকার হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রকট সমালোচক হইয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণতন্ত্র না কি এই অবস্থায় মৃতপ্রায় ও জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লুপ্তপ্রায় ইত্যাদি ইত্যাদি। যে অবস্থায় সকাল সন্ধ্যা মন্ত্রীত্ব পরিবর্ত্তন হইত এবং বাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধিগণও যথেচ্ছা দল পরিবর্ত্তন করিয়া কখনও চীনের কখনও রুশিয়ার ও কখনও অপর কোন দেশ বা মতবাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বাংলার নির্ব্বাচকদিগের রাষ্ট্রীয় অধিকারের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেন; সে অবস্থাটা না কি সাধারণতন্ত্রকে প্রবলভাবে আকাশে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত এই সকল রাষ্ট্রক্ষেত্রের তথাকথিত নেতাগণ বাংলার সাধারণের কান মলিয়া তাঁহাদিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার নিজ করায়ত্ত করিয়া স্বৈরাচারের চূড়ান্ত করিতেছিলেন। ইঁহাদিগের হাত হইতে শাসন কার্য্য কাড়িয়া লওয়া অত্যন্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই পুরান খেলা খেলিবার সুবিধা না করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য অর্থাৎ অকালে নির্ব্বাচন করিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। রাষ্ট্রপতির শাসন আইনসঙ্গত এবং যতদিন তাহা চলিতে পারে ততদিন তাহা চলিলে দেশবাসী শান্তিতে দিন কাটাইতে সক্ষম হইবেন। বিগত কুড়ি বৎসরে যে সকল ব্যক্তি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তির, এমন কি দেশসেবার ইচ্ছারও উপর আর কাহারও বিশ্বাস নাই। এই সকল ব্যক্তি ও ইঁহাদিগের দলগুলি রাষ্ট্রক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া না যাইলে ভারতের সাধারণতন্ত্র নিজ হারান স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে আমাদিগের কর্ত্তব্য হইল প্রথমত ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের নিয়মাদি এমন করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া

যাহাতে অল্প সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোকে আর রাষ্ট্রশক্তি বেদখল করিয়া লইতে না পারে। বিদেশী অথবা বিদেশীর চরদিগের প্ররোচনায় ও ইচ্ছায় কার্য্যকলাপ পরিচালনা যাহাতে আর কাহারও পক্ষে সম্ভব না হয় সেরূপ ব্যবস্থাও অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আরও দেখা যাইতেছে যে কোন কোন নির্ব্বাচনে অর্দ্ধেকেরও কম ভোটদাতা ভোট দিতেছেন এবং তাহার ফলে কোন ক্ষেত্রেই দেশবাসীর অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জনের মতেও কেহ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেছেন না। অর্থাৎ যদি ভোটার সংখ্যা কোথাও ৭০,০০০ হাজার হয় এবং যদি ভোট দিবার জন্ম ৩৫,০০০ হাজার হইতে অল্প সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়েন তাহা হইলে যিনি জয়লাভ করিবেন তিনি মোট ভোটদাতাদিগের অর্দ্ধেকেরও ভোট পাইবেন না।

সুতরাং নিয়ম করা প্রয়োজন যে মোট ভোট দাতা-দিগের সংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধেকের অধিক লোক ভোট না দিলে কোন নির্ব্বাচন গ্রাহ্য হইবে না। আর একটি নিয়ম করা প্রয়োজন যে কেহ দল পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে পুনর্নির্ব্বাচনের জন্ম দাঁড়াইতে হইবে। দল গঠনের জন্ম যে সকল মতবাদ, রীতি, নীতি বা আদর্শ ব্যক্ত করা হইবে তাহার মধ্যে যদি কোন স্বদেশ-বিরুদ্ধতা লক্ষিত হয় তাহা হইলে সেই সকল দলের লোকেদের নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে দেওয়া হইবে না। বর্ত্তমানে দেশদ্রোহী মতবাদ কোন কোন দল প্রচার করিতেছেন। ইহা কঠোরভাবে নিবারণ করা প্রয়োজন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
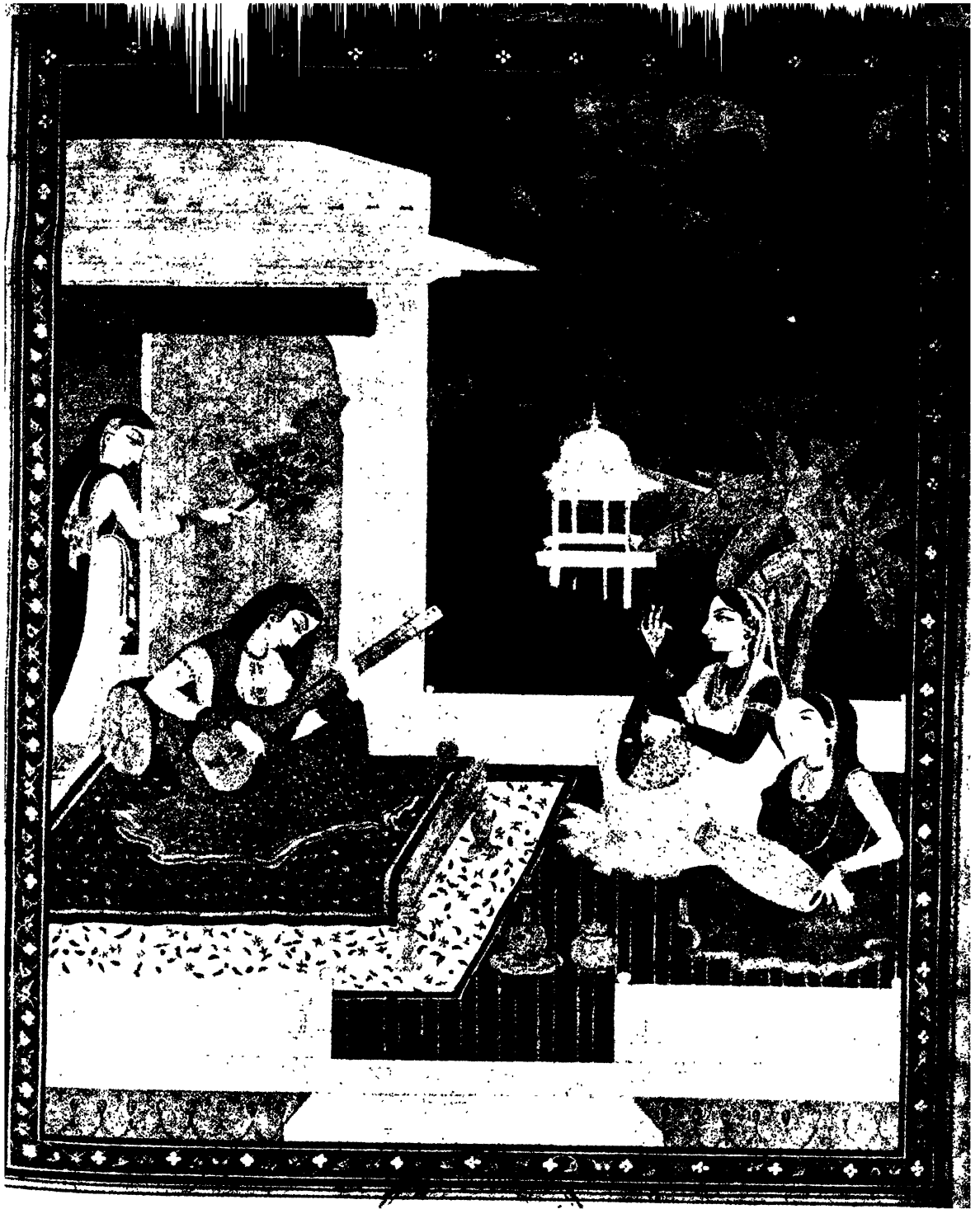
মেঘমল্লার

কমলকুমার সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ প্রথম খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫	২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ফরাসী বিপ্লব

ফরাসী দেশের নাম করিলেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিন্তু ফরাসী বিপ্লব, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী দেশে যে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ যায়, আরও বহু সহস্র ব্যক্তি সর্ব্বহারা হইয়া যায় ও সমাজের সকল অঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, সেই বিপ্লব মানব ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ বিপ্লব বলিয়া ধরা হয়। রাজরক্তপাত করিয়া, অভিজাতদিগকে সবংশে হত্যা করিয়া, ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর দুর্দ্দান্ত আক্রমণ করিয়াও অর্থনৈতিক সাম্যের চূড়ান্ত করিয়া ফরাসী জাতি সেই সময় পৃথিবীতে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কারণে মানবসমাজে ফরাসীদিগের বিপ্লব চেষ্টা সম্বন্ধে একটা ভয়ের ভাব সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ফরাসীগণ ঐরূপ ভয়ানক একটা কাণ্ড আরম্ভ করিয়া তাহার পরিণামে নেপোলিয়নকে সম্রাট বলিয়া মানিয়া লইয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে মানবমনের বিচিত্র গতিবিধির কথা কেহই সর্ব্বকালের জন্য স্থির নিশ্চয়ভাবে বলিয়া দিতে পারে না। আজ যাহারা কোন একটা মতবাদের নেশায় উন্মত্তভাবে সকল ঐতিহ্যকে চুরমার করিয়া ভাঙিয়া দিতে নিযুক্ত হয়; তাহারাই আবার দুইদিন যাইলে উল্টাপথে চলিয়া পুরাতন পাপগুলিকে পরমানন্দে ঘরে ফিরাইয়া আনিয়া পূজার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বসাইয়া দেয়। ফরাসী বিপ্লব মানবসমাজের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ভয়াবহতা যেমন প্রকট ভাবে দেখাইয়াছে, তেমনি আবার মানবচরিত্রের ভাবপ্রাবল্যের অস্থায়ীত্বও পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে কার্পণ্য করে নাই। যদিও আধুনিক মানুষ নূতন নূতন "সত্যপথ" ক্রমাগতই দেখিয়া থাকে তাহা হইলেও কেহই একথা বলিতে পারে না যে কোন "সত্য"ই চিরকালের জন্য স্বীকৃত হইতে থাকিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে যে ছাত্র বিপ্লব হইয়াছে ফরাসী দেশে, সেই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতিকেও অনেকে ফরাসী বিপ্লবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিপ্লবের কারণও কিছুকিছু বর্ত্তমান ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্রমাগত একের পর এক শাসকমণ্ডলী আসিয়া কোন কার্য্যেই সফলতা না দেখাইতে পারা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল পরিবর্ত্তনের ফলেই মানুষের সুখ সুবিধার লাঘব হওয়া। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শুধু কথার বন্যা ও অক্ষমতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। শিক্ষার কেন্দ্রে অযোগ্য লোকের উচ্চ-আসনে অধিষ্ঠান—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অবস্থা বুঝিতে আমাদিগের, ভারতবাসীদিগের, কোন অসুবিধা হইতে পারে না; কারণ আমরা এই সকল অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। কিছুকিছু বিপ্লব আমাদিগের ছাত্রগণও ইতিপূর্ব্বে করিয়াছিল ও এখনও করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশেও এই ধরণের বিপ্লব ঘটিতেছে ও আরও ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পূর্ব্বযুগের বিপ্লব ও এই বিপ্লবের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্ব্বকালের অন্যায় উৎপীড়ন, অত্যাচার ও মানবতার অপমানের সহিত আজকালকার শক্তিমানদিগের দুষ্কার্য্যের ঠিক তুলনা করা চলে না। আজকাল পেষণ, শোষণ ইত্যাদি ঘটে কিন্তু তাহার মধ্যে পূর্ব্বকালের সেই নির্ম্মম বর্ব্বরতা ও নির্লজ্জ মনুষ্যত্বহীনতা সেইরূপ প্রকটভাবে দেখা যায় না। এই কারণে আজকালকার বিপ্লবও কিছুটা মার্জ্জিতভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। অল্পবিস্তর মাথা কাটাকাটি জিনিষপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া, কার্য্য ও পাঠ বন্ধ করাও সাধারণের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সঞ্চার করিয়া বিপ্লব আবার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া স্থিতিবান শান্তিভাব ধারণ করে। ছাত্রগণ নূতন উত্তেজনার সন্ধানে ধাবিত হইলেই পুরাতন বিক্ষোভ কতকটা ভুলিয়া যায়। এবং রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, ক্রীড়া ময়দান প্রভৃতিতে নূতন আবেগের আবির্ভাব অহরহই হইয়া থাকে। কর্ম্মীদিগের মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা যায় তাহাও অধিক বেতন আদায়ের সহিতই অধিকাংশ স্থলেই সংযুক্ত; সুতরাং শ্রমিক আন্দোলন পুরাতন যুগের বিদ্রোহ অথবা বিপ্লবের সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। পাওনা দাবীর পরিমাণ ও প্রবলতা যতই অধিক হউক না কেন, তাহার জন্য হাজার হাজার লোক প্রাণ দিতে কখনও অগ্রসর হয় না। হাওয়ায় গুলি চলিলে অথবা কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ আরম্ভ হইলেই সাময়িকভাবে যুদ্ধ থামিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে বর্ত্তমানকালে কোন অধিকার অথবা লাভই মানুষের জীবনমরণের কথা হইয়া দাঁড়ায় না। অধিকার পাইলে তাহা আবার অপহৃত হয়। লাভের গুড় পিপিড়ায় খাইয়া যায়। সুতরাং জীবন বিপন্ন করিয়া কিম্বা সর্ব্বস্ব হারাইয়া কেহ কোন প্রচেষ্টায় সহজে অবতীর্ণ হয় না। রাষ্ট্রীয় অথবা অপরাপর দলগুলি ক্রমে ক্রমে মত বা পথ পরিবর্ত্তনের জন্য এমন একটা দুর্নাম আহরণ করিতেছেন যে কোন লোকই নেতা বা দলের অনুসরণে বেশী দূর যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন না। অর্থাৎ সকল বস্তুর সহিত আবেগ ও বিক্ষোভেও ভেজাল দেওয়া হইতেছে বলিয়া আজকাল রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক প্রলয়ের সম্ভাবনা কিছুকিছু পরিমিত হইয়া পড়িতেছে।

নাগরিক পরিষদ

শ্রীসাতকড়িপতি রায় রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে উচ্চস্তরের কর্ম্মী বলিয়া সুপরিচিত। তাঁহার অভিজ্ঞতাও দীর্ঘকালের। দেশের বহুনেতার সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিয়া তিনি যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন তাহা মূল্যবান। তিনি বাংলার জনসাধারণকে একটি পত্র লিখিয়াছেন নির্ব্বাচন কার্য্যে পথ প্রদর্শনের জন্য। আমরা সেইটি এইখানে পুনঃমুদ্রিত করিতেছি:

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ British Parliament এ Dominion Status পাশ করাইয়া ভারতকে দুই রাজ্যে ভাগ করিয়া তদানীন্তন দুইটি প্রবল রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কংগ্রেসের হাতে ভারত ইউনিয়নের শাসনযন্ত্র এবং মুসলিম লীগের হাতে পাকিস্তান নামে নবগঠিত দেশের শাসনযন্ত্র সমর্পণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কংগ্রেস ইংরাজের সঙ্গে

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করায় বহু কংগ্রেস নেতাকে ও কর্ম্মীকে জীবনে বহু ত্যাগ স্বীকার ও বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল বলিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে একটা মহান ঐতিহ্য ছিল। পরে Constitution Assembly একটি Constitution প্রস্তুত করিল যেটি প্রকৃতপক্ষে Centralised, যদিও নামে Fedaration of United India. কংগ্রেস সব প্রদেশেই গোড়ায় জনহিতকর কিছু কিছু কাজ করিয়াছিল, যথা :—ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি। Centralised শাসন-প্রণালীর জন্যই হউক, Planning এর ভুলের জন্যই হউক অথবা রাজনৈতিক দলের নৈতিক অবনতির জন্যই হউক, গত ১৮ বৎসর কি কেন্দ্রে, কি প্রদেশে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিয়া সারা ভারতবর্ষব্যাপী চরম দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে।

কংগ্রেসের দেখাদেখি অথবা কংগ্রেস হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া অন্য যে সকল রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাদের পশ্চাতে কোনও ঐতিহ্য নাই, কেবল ক্ষমতা হস্তগত করাই যাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহারা বিগত ৪র্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে কয়েকটি প্রদেশে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে শাসনযন্ত্র হস্তগত করিয়া একবৎসরে দেশে যে চরমতম দুর্দ্দশার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ইহার প্রধান কারণ রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল করিয়া নিজ নিজ দলের পুষ্টি সাধন। কংগ্রেস সহ এই সকল রাজনৈতিক দলের সদস্য সংখ্যা দেশের নির্দ্দলীয় সাধারণ অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় অতি মুষ্টিমেয়। কিন্তু ইহারা Constitution অনুসারে নির্ধাচনে প্রার্থী দাঁড় করাইয়া শাসনযন্ত্র দখল করিতেছে। এই সব রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ইহাদের প্রভাব খর্ব্ব করিতে না পারিলে দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই বিষয়ে বাংলার কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি কয়েকটি অধিবেশনে সমবেত হইয়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে যাহারা কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত নয় অথচ এই সমস্ত দল কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত, তাহাদের অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হওরা একান্ত প্রয়োজন। তাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে "নিখিল ভারত নাগরিক পরিষদ" গঠনের প্রয়াস।

উদ্দেশ্য :—ইংরাজ শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দুইটি অনিষ্টকর কার্য্য করিয়াছে :—

১। দেশ বিভাগ।

২। রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ।

উপরোক্ত কার্য্য দ্বারা ইংরাজ দেশের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, নাগরিক পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য—তাহা সংশোধন করা।

১। যে constitution গঠিত হইয়াছে তাহাতে এক একটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে সেই কেন্দ্রের অধিবাসীগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, ইহাই বিহিত হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকেই নির্বাচন করিতে হইবে, constitution এ সেরূপ কোনও নির্দ্দেশ নাই। নাগরিক পরিষদ দেখিবে যাহাতে কোন নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কোনও রাজনৈতিক দলের কেহ নির্বাচিত না হয়, সেই কেন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্দ্দলীয় অধিবাসীদের একজন প্রতিনিধি যাহাতে নির্বাচিত হয়।

২। প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কী প্রয়োজন তাহা স্থির করিবার ভার সেই কেন্দ্রের নাগরিক পরিষদের উপর। পরিষদই উহা স্থির করিবে এবং কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

৩। এক্ষণে সমস্ত দেশ জুড়িয়া যাহা প্রধান প্রয়োজন তাহা "খাদ্য"। প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের 'নাগরিক পরিষদ" সেখানে কিরূপে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে পারা যায় এবং সে জন্য যাহা কিছু করণীয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে।

৪। প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের "নাগরিক পরিষদ" নিজ নিজ এলাকায় গ্রাম্য শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হইবে। বিশেষ করিয়া বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য দিতে হইবে, যাহাতে উৎপাদন দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদা মিটিতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কুটির শিল্প,

মৎস্যের চাষ, পলট্রি প্রভৃতির প্রবর্ত্তন ও উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইবে।

৫। প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের "নাগরিক পরিষদের" তথাকথিত কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকিবে না এবং স্থানীয় অধিবাসীদের কেহ যাহাতে রাজনৈতিক দলভুক্ত না হয়, সেজন্যও পরিষদের সদস্যগণ বিশেষভাবে চেষ্টা করিবে। পরন্তু যদি কেহ রাজনৈতিক দলে যোগদান করে, পরিষদ তাহাকে বর্জন করিবে।

৬। প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রের "নাগরিক পরিষদ" সম্মিলিতভাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি জেলা পরিষদ গঠন করিবে। জেলা পরিষদ সেই জেলার নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি কিভাবে কাজ করিতেছে, তাহারই আলোচনা কেন্দ্র হইবে এবং তাহাতে যে সকল বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্যগণ একমত হইবেন, তাহা সকল নির্ব্বাচন কেন্দ্র পরিষদ গ্রহণ করিবে। ঐ জেলা পরিষদগুলি প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করিবে এবং প্রাদেশিক পরিষদ নিখিল ভারত নাগরিক পরিষদ গঠন করিবে। কিন্তু এই পরিষদের যে Conslitulion ভবিষ্যতে গঠিত হইবে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে কেন্দ্র থেকে কোনও কর্ম্মপন্থা স্থির করা কিম্বা নির্দ্দেশ দেওয়া নহে। প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্র পরিষদ আপন আপন কর্ম্মপন্থা স্থির করিবে। কেবল মাত্র আদর্শ এক হইবে। প্রধান আদর্শ হইবে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনও সংস্রব না রাখা।

৭। রাজনৈতিক অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিক পরিষদের আদর্শ হইবে প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যাঁহারা পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইবেন তাঁহারা রাজ্যসভায় মিলিত হইয়া তাঁহাদের নেতা স্থির করিবেন। সেই নেতাই কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইবেন এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনমত সদস্যদের মধ্য হইতে অন্য মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন। তারপর মন্ত্রীগণ একসঙ্গে রাজ্য শাসনপ্রণালী স্থির করিবেন।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে দেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে ইংরাজ দুইটি অনিষ্টকর কার্য্য দ্বারা ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিয়াছে তন্মধ্যে এক রাজনৈতিক দলের হাতে (অর্থাৎ যাহারা সুবিশাল ভারতের জন সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য) দেশে শাসনক্ষমতা অর্পণ করা। তাহারই নিরাকরণ করিবার জন্য উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালী বর্ণিত হইল। অপরটি দেশ বিভাগ।

দেশ বিভাগের ফলে উভয় দেশের নাগরিকবৃন্দের যে শোচনীয় দুর্দ্দশা ও পরিণাম পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। ইহা এখন দেশের অধিবাসীগণের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের এই বিভেদ যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন ভারত কিম্বা পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়ন অথবা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সুকঠিন। পাকিস্তানে সামরিক শক্তি নোংরা রাজনৈতিক দলের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কাড়িয়া নিয়া স্বৈর শাসন চালাইতেছে। তাহাতে পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দেরও হাড়ির হাল হইয়াছে। সুতরাং দেশের এই চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং দেশ ও জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে সমগ্র দেশের নাগরিকবৃন্দের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উক্ত সংঘের নামই হইবে "নিখিল ভারত নাগরিক পরিষদ" এবং পরিষদের প্রধান কাজ হইবে কি উপায়ে এই কৃত্রিম দেশ বিভাগ রদ করা যায়, তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করা।

বেতনের দাস

যাহারা চাকুরী করিয়া খায় তাহাদিগকে বেতনের দাস অথবা wage slane বলা হয়। যাহারা ব্যবসা করিয়া অথবা কোন বিশেষ জ্ঞান বা কলাকৌশলের ক্ষেত্রে কাজ করিয়া দক্ষিণা আহরণ করে, তাহারা বেতনের দাস নহে। তথাকথিত ধনবাদের উপর গঠিত সমাজ, যাহাকে Capitalist Society বলা হয়, তাহায় অল্পে অল্পে ব্যক্তিগত ধনসম্পদ জমা হইয়া আছে

একথা ভাবিলে ভুল করা হইবে। কারণ ধনবাদের একটা লক্ষণই হইল বহু সংখ্যক লোক শোষণ করিয়া অল্প সংখ্যক লোক ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। অতএব আমরা যে দেখি যে ধনবাদী সমাজতন্ত্রে শতকরা ৯৯জন ব্যক্তি গরীব ও বেতনের দাস; তাহা ধনবাদের স্বাভাবিক অবস্থা মাত্র। যদি আমরা দেখিতে যাই যে "মুক্ত" মানুষ ধনবাদকে বিনষ্ট করিয়া কি প্রকার সমাজ গঠন করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা দেখি যে ঐ নূতন সমাজগঠন রীতির মধ্যে বেতন ভোগ করিয়া দিন গুজরান করে সেই শতকরা ৯৯ জন। বাকি যে একজন তাহার মধ্যে ব্যবসাদার কেহ নাই, কিন্তু দক্ষিণা আহরণ করে অনেকে। উচ্চ বেতনে কার্য্য করেও অনেকে। সম্ভবত ধনবাদী সমাজের তুলনায় সমষ্টিবাদী সমাজে উচ্চ বেতনভোগীর সংখ্যা অধিক; কেননা ব্যবসাদায়ের স্থান না থাকায় ঐ নূতন ধরণের সমাজের সমষ্টিগত ব্যবসায় কার্য্য চালাইয়া থাকে উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণ। গরীব অল্প বেতনের দাস কিন্তু কিন্তু উভয় প্রকার সমাজেই ঐ শতকরা ৯৯ জন। তফাৎ শুধু ব্যবসা থাকা ও না থাকায়। ব্যবসা ব্যক্তিগতভাবে চালাইলে লাভ ও লোকসান উভয়ই ঘটিতে পারে। ব্যবসা যদি ব্যক্তিগতভাবে না চলে তাহা হইলে উচ্চ বেতন পাওয়াটাই শুধু হইবে, লোকসানের কথা উঠিলে তাহা সমাজের স্কন্ধে চাপিবে। সুতরাং সমষ্টিবাদ গরীবের পক্ষে লাভজনক নহে। ব্যক্তিগত ব্যবসা তাহাতে থাকিবে না কিন্তু থাকিবে নিরাপদে উচ্চ বেতন ভোগ করিয়া প্রতিষ্ঠা। ইহার যে ব্যক্তিগত লাভের দিক তাহা ব্যবসায় লাভের তুলনায় কিছু কম হইবে না।

আনবিক অস্ত্রের প্রয়োজন

আনবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনার পর হইতে বহু জাতি আনবিক অস্ত্র তৈয়ার করিয়া নিজ নিজ দেশের সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। যদিও প্রথমে কোন অজানা নীতি অনুসরণে সম্মিলিত জাতিসভা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে আমেরিকা, রুশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দেশ আনবিক অস্ত্র রাখিবার অধিকারী এবং অপরাপর জাতি উহা বর্জ্জন করিয়া চলিবেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিসংঘকে না মানিয়া চীন নিজ ইচ্ছামত আনবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে অন্যান্য জাতি, যথা, দক্ষিণআফ্রিকা, রোডেশিয়া, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও জার্ম্মানী ইচ্ছা হইলেই আনবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে ও করিয়া লইবে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। ভারতের পরম শত্রু চীনের আনবিক অস্ত্র আছে। চীন যে পাকিস্থানকে ঐ অস্ত্র দিবে এই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। চীন বা পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করিলে আমেরিকা অথবা ইংলণ্ড নিশ্চয়ই ভারতের সহায়তা করিবে না; কারণ ঐ দুইদেশ সকল সময়েই পাকিস্তানের সপক্ষে চলিয়া থাকে রুশিয়া চীনের বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তা করিবে ইহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। অতএব ভারতের পক্ষে শুধু আত্মরক্ষার জন্যই আনবিক অস্ত্র আহরণ একান্তভাবে আবশ্যক। ভারতের এই ক্ষমতাও আছে এবং নাই শুধু পণ্ডিত নেহেরুর মৃত আদর্শের বিরুদ্ধবাদ করিবার ক্ষমতা। পণ্ডিত নেহেরুর যে সকল আদর্শ ছিল সেগুলি অনুসরণ করিয়া ভারত আজ রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ঘোর বিপদে পড়িয়া রহিয়াছে। যথা পাকিস্তান ও কাশ্মীরের ব্যাপারে; চীনের ভারতীয় দেশখণ্ড দখলের বিষয়ে, বিদেশীর নিকট অর্থ ঋণ করিয়া কারখানা গঠন করিয়া ও অনেকগুলি প্রদেশ গঠন করিয়া অকারণে বহু রাজত্বের সৃষ্টি করিয়া। এখন এই সকল সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। আনবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করাও একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহা করিতেই হইবে।

ভিয়েৎনামে শান্তি প্রচেষ্টা

ভিয়েৎনামে বিভিন্ন জাতীয় আদর্শবাদি মনুষ্যজাতীয় ব্যক্তিগণ বহু কালাবধি যুদ্ধ চালাইয়া চলিয়াছেন। ইহারফলে বহুলক্ষ সৈন্য ও সাধারণ নিরীহ মানুষের

প্রাণ গিয়াছে ও এখনও যাইতেছে। যুদ্ধকালে লিপ্ত নহেন এইরূপ লোকের প্রাণহানী ও সর্ব্বস্বনাশই অধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ যুদ্ধে আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ ও রকেট নিক্ষেপ করিয়া যত্রতত্র ধ্বংশ-কার্য্য সাধন করাই সাধারণ যুদ্ধের তুলনায় অধিক করা হইতেছে। এই জাতীয় আক্রমণে কাহার উপর বোমা বা রকেট পড়িবে তাহা কেহ নিশ্চয়ভাবে বলিতে পারে না ও সচরাচর যাহার তাহার উপরেই পড়িয়া থাকে। যে সকল আদর্শবাদী জাতিগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া এইভাবে নির্দ্দোষ জনসাধারণের উপর প্রাণান্তকর আক্রমণ চালাইতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে পৃথিবীর অনেক মহা মহা জাতি রহিয়াছেন। ইঁহাদিগের আদর্শ কি তাহা আমরা বহুবার বহুভাবে শুনিয়া ও পাঠ করিয়া এতই উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে না। এই সকল জাতির একদল পৃথিবীর লোকে-দের দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। দাসত্ব আছেই এবং এই জাতিদের সাহায্যে ছাড়া সে দাসত্ব যাইতে পারে না ইহাই এই জাতিগুলির আদর্শের মূল মন্ত্র। পৃথিবীর মানব ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতেই মানুষ নানাপ্রকার দাসত্ব, অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে ও শতশত বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া তাহারা বহুস্থলে নিজেদের স্বাধীনতা ও মুক্তি আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল সংগ্রামের সহিত বহু মহাপুরুষের নাম জড়িত আছে। যথা অলিভার ক্রমওয়েল, জর্জ্জওয়াসিংটন, গারিবাল্ডি, মাৎসিনি, সনইয়াৎ সেন, কামাল আতাতুর্ক, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল রাষ্ট্রক্ষেত্রের মহামহারথী-দিগকে যাঁহারা বহুপূর্ব্বকাল হইতে প্রেরণা দিয়া আসিয়াছেন সেই সকল ধর্মপ্রবর্ত্তকদিগের কথা ভুলিয়া যাওয়াও চলে না। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রচার অথবা মিথ্যা, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বর্জন ও অপরের সর্ব্বনাশ না করা নীতি ও ধর্মের কথা এবং সকল ধর্মেই এই সকল সুনীতির কথা ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া মানব সমাজে প্রচার করা হইয়াছে। এই কারণে ধর্ম ও নীতিই সকল রাষ্ট্রীয় সংস্কারের মূল কথা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কোন জাতি পূর্ব্বযুগের মহাপুরুষদিগের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছা দেখাইয়া থাকেন ও তাঁহাদিগের মতে মানবজাতির সকল উন্নতি ও অন্যায় হইতে মুক্তি লাভের আরম্ভ হইয়াছে তাঁহাদিগের রাষ্ট্রমত পরিবর্ত্তন ঘটিবার পর হইতে। মানব ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে কোন নূতন আদর্শই হঠাৎ ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে মানবমনে উদিত হয় নাই। পূর্ব্বযুগের অপরাপর মহামানবদিগের সত্যানুসন্ধান পরযুগের আদর্শ গঠনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। এবং নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার ও নীতিজ্ঞানের আলোচনা যাঁহারা যখনই করিয়া থাকুন, তাহার সহিত সকল নূতন আদর্শের প্রসারের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সংযোগ আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ধর্ম বা নীতি পূর্ব্বে যাহাই আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল ও তাহার ফলে মানব স্বাধীনতার লাঘব হইয়াছে, এরূপ ধারণার কোন উপযুক্ত কারণ নাই।

একথাও ভাবিবার কোন কারণ নাই যে মানুষ কোন ধর্ম বা রাষ্ট্রমত অবলম্বন করিয়াছে বলিলেই সে কথার সত্যতা মানিয়া লইতে হইবে। কারণ ধর্মের ক্ষেত্রে যেরূপ ভণ্ডামি ও ধর্মের অভিনয় দেখা যায় ও ধর্ম শুধু মুখের কথাতেই প্রকাশিত হয়, কার্য্যে কখনও হয় না; রাষ্ট্রমত ব্যক্ত করিলেই সেই-রূপ বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে রাষ্ট্রমতের অন্তরালে স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি ও অপরের অনিষ্টকর মতলব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। অপরকে মুক্তি দিতেছি ও তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিতেছি বলিয়া অপরের দেশ দখল করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করাও অনেক ক্ষেত্রে আজকাল হইয়া থাকে দেখা যায়। অপরক্ষেত্রে সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিতে গিয়া নিজেদের প্রভাব ও ব্যবসা বৃদ্ধি করাও হইয়া থাকে।

অপরের উপকার ততটা করা হয় না, যতটা বলা হয়।

ভিয়েৎনামে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে একদিকে ঐ দেশের লোকেরা অতি ভয়ঙ্করভাবে দাসত্বশৃঙ্খল মুক্ত হইতেছে ও অপরদিকে তাহারা আধুনিক সাধারণ-তন্ত্র উপভোগ করিতে করিতে পূর্ণতম স্বাধীনতার রকেট আঘাতে প্রাণ হারাইতেছে। অপরদিকেও অনেকে স্বায়ত্তশাসন অধিকারের বোমা বর্ষণে বিপন্ন। অর্থাৎ ভিয়েৎনামের সকল ব্যক্তিই কোননা কোন ভাবে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ধাক্কায় বিপদগ্রস্ত হইয়া দিন কাটাইতেছে। কেহ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছে গৃহ সমেত পরিবারের সকল ব্যক্তিই বোমা বিদ্ধস্ত, কেহ দফতরে বসিয়াই রকেট বা গোলা লাগিয়া মৃত বা আহত। যুদ্ধ করিতেছে ভিয়েৎনামের লোকেরাই, কিন্তু পিছনে রহিয়াছে বৃহৎ বৃহৎ সামরিক শক্তিপুঞ্জ। প্যারিসে যে শান্তি স্থাপন চেষ্টা চলিতেছে তাহা আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ঝগড়া চলিতেছিল, কথা বলা হইবে কোথায় লইয়া। নানাস্থানের নাম করিয়া শেষ অবধি ফরাসী রাজধানী প্যারিস নগরে কথা হইবে ঠিক হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হরতাল প্রভৃতি আরম্ভ হইয়া কথাবার্ত্তা শান্তিপূর্ণভাবে হওয়া অসম্ভব হইল। ইহা ব্যতীত কথা কি প্রসঙ্গ অবলম্বনে আরম্ভ হইবে তাহা ঠিক করিতেই দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। একদল বলিল উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ কেন করা হইতেছে না সেই আলোচনাই আসল কথা; অপর দলের মতে বোমা বর্ষণের কারণ কি অথবা কি সর্ত্তে বোমা বর্ষণ বন্ধ করা যাইবে সেই কথাই প্রথমে স্থির করা প্রয়োজন। শান্তি স্থাপন করার জন্ম সভা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতরভাবে বোমা ও রকেট চলিয়াছে; ইহা এক নূতন ধরণের শান্তিসভা।

আসল কথা, কোনদলই নিজের জিদ ছাড়িয়া দিয়া অপরের নিকট দুর্ব্বল প্রমাণ হইতে চাহেন না। বাংলায় যাহাকে বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খড়ের প্রাণ যায়, এ তাহাই। ভিয়েৎনামে গরীব জনসাধারণ ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছে, কিন্তু যুদ্ধ চালাইয়া রাখিয়া নিজ নিজ দম্ভ অটুট রাখিতেছে শক্তিমান অপর জাতিগণ। এক দিকে আমেরিকা আত্ম-প্রকাশ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সাড়ে পাঁচ লক্ষ সৈন্ম পাঠাইয়া সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে নামিয়াছে; অপরদিকে রহিয়াছে অন্ম মহাশক্তি যাহার সৈন্ম যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকিলেও গোলা, বারুদ, রকেট বিমান ও দূর হইতে পরিচালনা ব্যবস্থা সবই রহিয়াছে। কলকাঠি নাড়িতে উভয় দিকেই আরো অনেকে রহিয়াছেন। উভয় দলের আদর্শই বলিদান চাহিতেছে এবং উভয়দিকেই যূপকাষ্ঠে মাথা দিয়া রহিয়াছে গরীব ভিয়েৎনামবাসী জন-সাধারণ।

বাংলায় নূতন করিয়া নির্ব্বাচন

১৯৬৭ খৃঃ অব্দের গোড়ায় যে রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচকার্য্য সাধিত হইল তাহাতে যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রমত জাহির করিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা অধিককাল সেই সকল রাষ্ট্রমতের ইজ্জত রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। মন্ত্রীত্ব লাভ আকাঙ্খা একটা মহা প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল ও অনেক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নূতন নূতন দল গঠন করিয়া অন্মান্ম দলের সহিত কাঁধ মিলাইয়া মন্ত্রীত্বের দাবি পেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মিলিতভাবে দল বাঁধা বা কোলিশন গঠন একটা রাষ্ট্রীয় সংক্রামক ব্যাধির মতই দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যাহার ফলে মন্ত্রীত্ব আহরণ করিয়া তাহা ভোগ করিবার কেহ সময় পাইত না। একের পর এক করিয়া বহু মন্ত্রীত্ব আসিল ও শেষ হইল এবং বাংলা দেশে এই ভাঙ্গাগড়া এরূপ বিকৃত আকার ধারণ করিল যাহাতে শেষ অবধি কোন মন্ত্রীত্বই আর রহিল না। রাষ্ট্রপতির শাসনভার গ্রহণ করিবার পর বাংলা দেশে পুনঃ নির্ব্বাচন কবে হইবে সেই আলোচনাই প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের যূথপতিদিগের চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। তাঁহারা পূর্ব্বেও

যেরূপ স্বার্থান্বেষী ও রাষ্ট্রশক্তি লোলুপভাবে দেশবাসীর মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া দলাদলি করিয়া দিন কাটাইতেন, এখনও তাঁহারা সেই পথেরই পথিক রহিয়াছেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস। সুতরাং নূতন নির্ব্বাচন হইলে যে দেশের নৈতিক কোন নবজাগরণ হইবে, অথবা রাষ্ট্রাকাশে কোন নবতারকার উদয় হইবে এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সরকারী নিয়ন্ত্রণে খাদ্য বণ্টন

ভারতের যে যে স্থলে সরকারী নিয়মে চাউল, গম প্রভৃতি কিছু কিছু লোককে দেওয়া হয় ও যে বণ্টন ব্যবস্থা আছে বলিয়া ঐ সকল এলাকার কাহাকেও চাউল প্রভৃতি খোলাখুলিভাবে ক্রয় বিক্রয় বা আমদানি রপ্তানি করিতে দেওয়া হয় না; সেই নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থার অনেকগুলি দোষ আছে যাহার জন্য উক্ত নিয়ন্ত্রণ লোকে মানিয়া চলিতে পারে না। প্রথম দোষ হইল যে সকল ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের বণ্টনে অংশ দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষের লোকজন স্বাধীনভাবে এ অঞ্চল হইতে অপর কোন অঞ্চলে যাতায়াত করিলে তাহাদিগকে খাইতে হয় কিন্তু নূতন জায়গায় গিয়া খাদ্য ক্রয় করিতে না পারিলে তাহাদিগকে বেআইনিভাবে খাদ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। শুধু কলিকাতাতেই বহু লক্ষ লোক আছেন যাঁহাদিগের "রেশন কার্ড" নাই ও চাহিলেও যাঁহাদিগকে কার্ড দেওয়া হয় না। ইঁহারা আইন মানিয়া চলিলে না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয় আপত্তি খাদ্যের পরিমাণ লইয়া। যাঁহারা ভাত খাইয়া অভ্যস্ত তাঁহারা দিনে অন্তত এক পোয়া চাউলের ভাত না খাইলে বাঁচিয়া থাকিতে কষ্ট অনুভব করেন। সপ্তাহে সাতপোয়া চাউল রেশনে দেওয়া হয় না। তাহার অর্দ্ধেকও দেওয়া হয় না; অন্তত কলিকাতায়। এই অবস্থায় মানুষ যদি আধপেটা ব্যবস্থা মানিয়া না চলিতে পারে তাহাতে তাহাদিগকে অপরাধ সাব্যস্ত করিলে তাহা আইনসঙ্গত হইলেও ন্যায়সঙ্গত নহে বলিতে বাধ্য হইতে হয়। তৃতীয় গোলযোগ চাউল বা গমের নিকৃষ্টতা লইয়া। অনেক সময়ই এমন চাউল বা গম সরবরাহ করা হইয়া থাকে যাহা বহুলোকে খাইতে পারেন না। খাইলে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এই সকল অভিযোগ থাকাতে দেশবাসী খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যতটা বোঝা যায় সরকারী ব্যবস্থা হইলেই তাহার ফলে দেশবাসীর মঙ্গল হওয়া কঠিন হয়। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রে সরকারী প্রভাব যত কম থাকে দেশবাসীর মঙ্গলের ততই অধিক সম্ভাবনা হয়। যে সকল বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা না হইলে চলেনা সেই সকলক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থা রাখিতেই হয়; কিন্তু দেশবাসীর স্বাধীনতায় সরকার যতটা কম হস্তক্ষেপ করেন ততই দেশের মঙ্গল। কারণ, দেখা যায় যে ডাক বা তার বিভাগ, রেলওয়ে, সামরিক, স্বাস্থ্য বা শিক্ষা বিভাগ, সর্ব্বত্রই ভারত সরকারের ব্যবস্থায় কার্য্যকলাপ বিশেষ উন্নতভাবে হয় না। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যই যাঁহারা যথাযথভাবে চালাইতে পারেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে আরো অনেক অপরাপর কার্য্যের ভার গ্রহণ করা কখনও উচিত হয় না।

বেকার সমস্যা

সোসিয়ালিজম বলিতে আমরা বুঝি সমাজের সকল ব্যক্তির সমান অধিকার; অন্তত সমান অধিকার আহরণের পথে কাহারও কোন বাধাপ্রাপ্তি যাহাতে না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু যদি সমাজের বহুসংখ্যক লোক বেকার অবস্থায় দিন গুজরান করিতে বাধ্য হ'ন তাহা হইলে তাঁহারা কিভাবে সমান অধিকার উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা বোঝা যায় না। কারণ বেকার ব্যক্তির কোন রোজগার থাকে না এবং রোজগার না থাকিলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ঔষধ প্রভৃতির অভাব ঘটে। বেকার ব্যক্তিরা তাহা হইলে বিশেষভাবে অভাবের তাড়নায় বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে বাধ্য হ'ন। বাংলায় যদি চল্লিশ লক্ষ লোক বেকার থাকেন, তাহা হইলে, প্রথমত দৈনিক কয়েক কোটি টাকা মূল্যের শ্রমশক্তি অবথা নষ্ট হইয়া যায় ও জাতিকে দারিদ্র্যের আরও গভীরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, সমান অধিকার কথাটার কোন অর্থ থাকে না এবং সোসিয়ালিজমের নাম উচ্চারণ করাও আমাদিগের পক্ষে শোভন হয় না।

চতুষ্পাদ ব্রহ্ম

ঋষভচাঁদ

মাণ্ডূক্য উপনিষদে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে : সর্বংহ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। এই সমস্তই ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ অর্থাৎ চারপাদবিশিষ্ট বা চারপাদে পূর্ণ।

প্রথম পাদ হচ্ছে জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, স্থূলভুক; দ্বিতীয় পাদ হচ্ছে স্বপ্নস্থান, অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভুক বা সূক্ষ্মের ভোক্তা; তৃতীয় পাদ হচ্ছে সুষুপ্তস্থান, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দভুক, চেতোমুখ···,চতুর্থপাদ হচ্ছে (চতুর্থং মন্যন্তে), অন্তঃপ্রজ্ঞ নয়, বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, প্রজ্ঞানঘনও নয়, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য··· প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। এই আত্মা, এই বিজ্ঞেয়।

চতুষ্পাদ ব্রহ্ম আত্মাই, এবং আত্মার চতুষ্পাদত্ব যুগপৎ জানলে আত্মার বা ব্রহ্মের পূর্ণত্ব জানা হয়। গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যকারগণ কিন্তু এ সরল অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁদের মতে ব্রহ্মের প্রথম তিন পাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—মায়ার অধীন, অপরব্রহ্মের এলাকা। এই মতানুসারে মাণ্ডূক্য উপনিষদে যে প্রণবের উল্লেখ আছে তা সূচিত করে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে—অ উ ম। এই ত্র্যক্ষর প্রণবের অতীত যা তাই ব্রহ্ম, তাকেই বলা হয়েছে প্রপঞ্চোপশম শান্ত, শিব, অদ্বৈত। এই চতুর্থপাদকেই জানতে হবে, পেতে হবে। এই চতুর্থপাদই নিঃশ্রেয়স।

চারপাদের তিনপাদ বাদ দিয়ে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন যদি উপনিষদের অভিপ্রেত হ'ত, তবে ব্রহ্মকে চতুষ্পাদ বলার কোন প্রয়োজন হ'ত না। সেই ব্রহ্মকেই বলা হয়েছে আত্মা যাতে অপরব্রহ্মের অবতারণা এখানে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। চতুষ্পাদ আত্মা বা ব্রহ্মই পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা। আর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে কেবল মাথাকেই যেমন গোটা মানুষ বলা যেতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মের তিনপাদ বাদ দিয়ে কেবল তুরীয়পাদকেই পূর্ণব্রহ্ম বলা যেতে পারে না। মানবদেহে মাথা যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তা ব'লে মানুষ শুধু মাথাই নয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহটাই মানবদেহ। চারপাদযুক্ত ব্রহ্মই অখণ্ড ব্রহ্ম।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ১০,৯০।৩ সূক্ত উদ্ধৃত করতে পারা যায়। এতেও পাদের উল্লেখ আছে।

> এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
> পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

অর্থাৎ এই সমস্ত সৃষ্টির মহিমা পুরুষেরই, কিন্তু এই মহিমায় অনুপ্রবিষ্টও অনুস্যূত হয়েও তিনি এর বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। এ সমস্ত বিশ্বভুবন তাঁর এক পাদ মাত্র, আর বাকি তিনপাদ দিব্যলোকে অমৃতস্বরূপ। বিশ্বভুবন তাঁর একপাদ এবং এই পাদ মায়িক বা কাল্পনিক বা শুধু ব্যবহারিক ও অপারমার্থিক, এ কথা শ্রুতি বলে না। তার মতে সৃষ্টি পুরুষের বা পরমাত্মার মহিমা-প্রকাশ। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "একাংশেন স্থিতং জগৎ" (আমার এক অংশে জগৎ অবস্থিত আছে। এই একাংশকেও মায়িক বা মিথ্যা বলা যায় না। বেদে ও উপনিষদে জগৎকে ব্রহ্মজাত, ব্রহ্মস্থিত বলা হয়েছে। এই বিশ্বচরাচর সমূল, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠ, ব্রহ্মই এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন এ কথা বার বার উদাত্তস্বরে উপনিষদে ঘোষণা করা হয়েছে।

চতুষ্পাদ ব্রহ্মের প্রথম দু'পাদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু ব'লব না। চতুর্থপাদ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ উপনিষদে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সরল ও সুস্পষ্ট। এখানে কেবল তৃতীয়পাদ অর্থাৎ

প্রজ্ঞানঘন, আনন্দভুক্, বিশ্বযোনি সর্বেশ্বর সুষুপ্তপাদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বলার চেষ্টা ক'রব।

গৌড়পাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শঙ্করাচার্য সুষুপ্ত-স্থান সম্বন্ধে বলছেন, স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথা রূপপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশ-তমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূতমিত্যুচ্যতে। অতএব স্বপ্নজাগ্রমনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব, সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞানঘন উচ্যতে। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্বং ঘনমিব, তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব।…মনসো বিষয়বিষয়্যাকারস্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দময় আনন্দপ্রায়ঃ; নানন্দ এব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ।"

অর্থাৎ—প্রথমে দু'পাদ—জাগ্রত বা বিরাট বা বৈশ্বানর আর স্বপ্নপাদ বা তৈজস—মনঃস্পন্দিত দ্বৈতজাত প্রবিভক্ত রূপবোধ পরিহার না ক'রেও যেন অবিবেকাপন্ন ও নৈশ আঁধারগ্রস্ত হ'য়ে সপ্রপঞ্চক একত্ব প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলা হয়। অতএব স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মানসিক সঙ্কল্প বিকল্প অর্থাৎ প্রাজ্ঞানরাজি যেন ঘনীভূত হয়ে থাকে। এইজন্য এই পাদকে একীভূত বলা হয়। ইহা একত্ব নয়; মানসিকব্যাপারগুলো আঁধারে জমাট বেঁধে যেন এক অবিভক্ত পিণ্ড বলে প্রতীত হয়। অবিবেকাপন্ন ব'লে এই অবস্থাকে প্রজ্ঞানঘনও বলা হয়। যেমন নৈশ অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সব কিছু তাদের পার্থক্য হারিয়ে অবিভক্ত বলে মনে হয়, তেমনি ঘনীভূত মানসবৃত্তি-গুলিকে প্রজ্ঞানঘন ব'লে বোধ হয়।…বিষয় বিষয়ী আকারে মানসিক ক্রিয়ারূপ আয়াসজনিত দুঃখ তখন থাকে না বলে এই সুষুপ্ত অবস্থাকে আনন্দময় বা আনন্দ-প্রায় বলা হয়। অবশ্য, ইহা আনন্দ নয়, আত্যন্তিক আনন্দ নয় ব'লে একে আনন্দ আখ্যা দেওয়া চলে না।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন ব'লে আমাদের মনে হয় না। প্রথমতঃ উপনিষদোক্ত সুষুপ্ত স্থান যে মানবমনের বা বিশ্বমনের সুষুপ্ত অবস্থা নয় তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ এই সুষুপ্তস্থানকে সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, বিশ্ব-যোনি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। অনন্ত ব্রহ্মশক্তি এই অবস্থায় অক্লান্তভাবে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করছে। অপরিমেয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই সর্বেশ্বর থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, আবার তাঁতেই বিলয় প্রাপ্ত হচ্ছে—প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। এই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলা হয় এইজন্য যে মানবচেতনা যখন এই উত্তুঙ্গ দিব্যধামের দিকে তাকায় তখন সেখানকার নিস্তরঙ্গ শান্তি তার কাছে ঘোর সুষুপ্তির মত মনে হয়। জাগরণ ও স্বপ্নের সমস্ত চাঞ্চল্য, সমস্ত স্পন্দন যেন সেখানে চিরতরে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। পরম শান্তির মধ্যে থেকে পরমপুরুষ তাঁর অমোঘ আত্মশক্তি দিয়ে বহুবর্ণে রঞ্জিত, বহুছন্দে স্পন্দিত এই মহিমময় বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন—এই সৃষ্টি তাঁর বহুরূপ আত্মরূপায়ন। এই সুষুপ্তিকে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বলেছে। ইহা মানবমনের ঘুম-ঘোর নয়। দ্বিতীয়তঃ এই সুষুপ্তপাদকে উপনিষদ বলেছে "একীভূত"। অতি সহজেই এটা বোঝা যায়, কারণ এখানে জগতের সমস্ত বহুত্ব, সমস্ত ভেদ-পার্থক্য, সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধ এক সর্বালিঙ্গনকারী একত্বের সামঞ্জস্যে পর্যবসিত হয়েছে। এক থেকে, অদ্বয় থেকেই যে বহুর সৃষ্টি হয়! বিশ্বেশ্বরের এই কালাতীত একত্বকে অবিবেক-ক্লিষ্ট, সপ্রপঞ্চক, আঁধারগ্রস্ত একত্ব বললে মায়াবাদের সাময়িক সমর্থন হয়ত বা হ'তে পারে, কিন্তু ঋষিদের জীবন্ত উপলব্ধি শুধু অস্বীকার করা হয় তা নয়, তাকে ভুল ব'লে হেয় করা হয়। তৃতীয়তঃ এই অদ্বয় সৃষ্টি-চৈতন্যের প্রজ্ঞানঘন অবস্থাকে বলা হয়েছে "অবিবেক-রূপত্বাৎ প্রজ্ঞানঘন উচ্যতে"। প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ উপনিষদে এক বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐতরেয় উপনিষদে আছে, "প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। আবার অন্যত্র অয়মাত্মা প্রজ্ঞানময়ঃ"। এই প্রজ্ঞানঘন অবস্থাকে মানসক্রিয়ার তমোগ্রস্ত সংহিত বা মূর্ছিত অবস্থা বলা কতদূর শ্রুতি-সঙ্গত তা সুধিগণের বিবেচ্য। চতুর্থতঃ এই সুষুপ্তস্থানকে উপনিষদে আনন্দভুক ও আনন্দময় বলা হয়েছে। কিন্তু প্রজ্ঞান যদি একীভূত মনঃস্পন্দন মাত্র হয় তবে তাকে আনন্দময় বলা চলে কি ক'রে? শঙ্করাচার্য তাই বলছেন যে এই অবস্থা আত্যন্তিক আনন্দের অবস্থা নয়; মানসিকব্যাপারজনিত আয়াসের

দুঃখ সেখানে থাকে না ব'লে একে আনন্দপ্রায় বলা যেতে পারে। পরিষদের আনন্দভুক ও আনন্দময়ের অর্থ করা হয়েছে "আনন্দপ্রায়ঃ", "আনন্দ এব"! এইভাবে চেতোমুখ শব্দটারও অসঙ্গত অর্থ করা হয়েছে!

এ প্রসঙ্গে আর অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। শুধু মুণ্ডক উপনিষদ থেকে দুটো শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে দেখাব যে মায়াবাদিদের "ঈশ্বর" নয়, ব্রহ্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তিনি স্বয়ং এই বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাঁরই অবস্থা' বা বিভাব ত্রয়, তাঁরই তিন পাদ, এবং তুরীয় তাঁরই চতুর্থ পাদ।

"দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" —মুণ্ডক

সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত (নিরাকার), অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র, অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ হ'তে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়নিচয়, আকাশ, বায়ু, আলো, জল এবং সকলের ধাত্রী বা আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে।

কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকও প্রমাণ করছে যে সর্বেশ্বরের প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় সুষুপ্তি মানবমনের বা বিশ্বমনের সুষুপ্তি নয়, এ সুষুপ্তি চিরজাগ্রত, সর্বকৃৎ, সর্বনিয়ন্তা।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ।

যখন সমুদায় প্রাণী সুপ্ত থাকে, তখন যে পুরুষ জাগ্রত থেকে (জীবের) কামনা পরম্পরায় নির্মাণ করেন, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত ব'লে অভিহিত হ'ন। সমস্ত লোকলোকান্তর তাঁতেই আশ্রিত রয়েছে, কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। ইনিই তোমার লক্ষ্য ও আরাধ্য।

এই সর্বেশ, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামীই ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত, সমস্ত লোক তাঁতেই আশ্রিত, এবং কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না—এই বর্ণনা এত স্পষ্ট যে সুষুপ্তস্থানের প্রজ্ঞানঘন পুরুষই যে তুরীয় ব্রহ্মের এক পাদ এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্ন পাদ যে তাঁরই পাদ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকতে পারে না।

বস্তুতঃ বেদ ও উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা থেকে ভূরি-ভূরি উদ্ধরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে ব্রহ্মই হয়েছেন জীব-জগৎ। তিনিই যুগপৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। তাঁকেই প্রসঙ্গানুসারে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, অক্ষর ব্রহ্ম বা শুধু ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই চতুষ্পাদ, ব্রহ্মই পূর্ণব্রহ্ম, ইনিই মানবাত্মার পরম লক্ষ্য।

সমস্যা-সমাধান

(গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

(১)

পরেশ ডাক্তারের পসারটা দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছে। যে ওষুধটাই যে রোগীকেই দেন একেবারে অব্যর্থ—হাতযশ আছে খুব বলতে হবে। আর একটা গুণ হলো প্রসন্ন মূর্তি তাঁর ও মিষ্টি কথা রোগীর সঙ্গে। তাঁর প্রথম দর্শনেই এবং মধুর ভাষণে রোগী তার রোগের কথা যেন ভুলেই যায়—তখন থেকেই রোগমুক্তির সূত্রপাত। অথচ পক্ষান্তরে এমন ডাক্তারও সহরে আছে যাকে দেখলেই রোগী আঁৎকে ওঠে এমন কি দু একটি মারাও যায়।

যাকগে সেকথা। পরেশ ডাক্তারের আর একটি সৌভাগ্য তাঁর বিদুষী কন্যারত্ন। তর্ তর্ ক'রে সব ক'টা পরীক্ষা পাশ করলো যেন মই বেয়ে উঠে গিয়ে এম, এ, টাও হাত ক'রে নিলে। কিন্তু মুস্কিল ঠেকছে তাঁর এখন তাঁর গিন্নিকে নিয়ে। প্রায়ই তিনি শোনান আজকাল, এবং আজ রাতেও শোনাতে বসলেন "তোমায় কবে থেকে বলছি—আর পড়িও না মেয়েটাকে, সোমত্ত মেয়ের এখন বে থার চেষ্টা দেখ। তা না, এখন এম, এ, পাশ করা মেয়ের বর জোটানোই সমস্যা।"

"বল কি? এখনি ত সোজা হবে। গুণী মেয়েকে আগ্রহ করে নেবে।"

"তোমার যদি একটুও বুদ্ধি থাকে। দেখছ না—ম্যাট্রিক পাশ করবার পর সম্বন্ধ এসেছিল প্রায় ১০।১২টা জায়গা থেকে, আই, এ, পাশ করলো যখন তখন ৫।৭টা, বি, এ, পাশের পর এলো মোটে দু' জায়গা থেকে। এখন এম, এ, পাশ করেছে, কৈ একটাও ত আসে কি সম্বন্ধ। হ্যাঁ, প্রফেসরির জন্যে দরখাস্ত যদি করে তবে হয়ত একটা চাকরী পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটা বর জোটানোই হয়েছে এখন সমস্যা।"

"তাই হোক না, প্রফেসর হলে ত ভালই হয়।"

"ওই শোন কথা! তা হ'লে আর যে হবে না কোনদিন তোমার মেয়ের। রইল আইবুড়ো চিরদিন। আর আজকাল কি যে নেশায় ধরেছে ওকে—ব'সে ব'সে ক্রস্ ওয়ার্ডের সমস্যা সমাধান করতে একেবারে ডুবে যায়। নাওয়াখাওয়া সব ভুলে যায়। ভাল কথা, ভুল বলছিলাম যে সম্বন্ধ আসে না এখন! একটা সম্বন্ধ ত এসেছে। ঐ যে ছেলেটি লিখেছে যে সে নিজেই এসে দেখতে চায় মেয়ে, তুমি সেইজন্যেই নাকচ ক'রে দিয়ে ব'সে আছ। বলছো—নিজেই এসে দেখতে চায়, তার মানে তুকুলে কেউ নেই। তা না গো, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম—ছেলের মামার বাড়ীতে উপযুক্ত লোকই আছে। তবে নিজে দেখা, তার একটা খেয়াল আর কি। তা হোক না। তুমি কাল সকালেই একবার তার কাছে গিয়ে কথা ক'য়ে এসো—কবে আসতে পারে।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন ঘুমোও ত।"

"না না 'দেখা যাবে' না—যেতেই হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, এখন থাম ত। অনেক রাত হয়েছে, এখন ঘুমোতে দেও।"

"ক্রী-রীং, ক্রী-রীং, ক্রী-রীং।"

টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনি! এত রাতে কে টেলিফোন করছে? পরেশ ডাক্তার যদিও একটু বিরত বোধ করছিলেন, খুশীও হলেন এই ভেবে যে গভীর রাতের কলে' চার্জ ত দ্বিগুণ হবে। গভীর জল থেকে যে মুক্তাকে তোলা যায় তার মূল্য অধিক।

হাতল তুলে হাঁকলেন, "ইয়েস, ডক্টর পরেশ গুহ স্পীকিং। কি অসুখ আপনার বাড়ী? কি বলছেন? রোগী নয়, রোগ? বুঝলাম না ঠিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা রোগ আছে বটে ঐ নামে, তা কার হয়েছে? কোথায় যেতে হবে ঠিকানা বলুন। কি বলছেন? কারুর হয় নি? তবে! কি আশ্চর্য্য! তার জন্যে আমাকে এই রাতে টেলিফোন করছেন! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মাথার চিকিৎসা করান—হোপ্‌লেস!" এই ব'লে রাগে গজ গজ করতে করতে টেলিফোনের হাতলটা প্রায় আছড়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। হাতলের আছাড়টা বিজলীযানে চ'ড়ে শ্রোতার কর্ণমূলে গিয়ে আঘাত দিতে পারলো কি?

পাশে দাঁড়িয়ে গিন্নি শুধোলেন "কে টেলিফোন করলে?"

"কোথাকার একটা বখাটে রাত দুপুরে কোন্ নাইট ক্লাবে আড্ডা দিচ্ছে। ক্রস্-ওয়ার্ডের ফাঁকে কি অক্ষর বসালে কোন্ রোগের নাম হয় তারই সন্ধান চায় আমার কাছে। কত বড় আস্পর্দ্ধা বল ত! এর আগে আরও দুজন ডাক্তারকেও নাকি হয়রান করেছে এই নিয়ে—তাও টেলিফোনে।"

গিন্নি তাঁর নিটোল গালে এক গোছা চুড়ির ঝংকৃত হাত দিয়ে বল্‌লেন, "ও মা! কোথা যাব গো"! কিন্তু একটু পরেই আবার বল্‌লেন, "তা তোমার মেয়েও কম যান না তা ত বলেইছি। সেও কাল থেকে প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ঐ ক্রস্-ওয়ার্ডের কাগজখানা নিয়ে। তারই সঙ্গে খান দুই ডিক্‌শনারি। আর সেই জন্যেই বুঝি তোমার সেই মোটা ডাক্তারি বইটাও নিয়ে গেছে আজ সকালে। তা তুমি জানও না। আমি জিগেস করলাম—ও বই নিয়ে এলি যে? জবাব দিলে—আমি ডাক্তারি পড়বো। আজ সকালে নাইতে যাবার জন্যে কি ওঠাতে পারি মেয়েকে! বলে—পরশু হচ্ছে ক্রস্-ওয়ার্ডের কাগজ পাঠাবার শেষ দিন। কী পাগল বল ত!"

"যাক্ গে এখন ঘুমোও।"

"তা হলে ঐ কথা রইল, কাল সকালেই যাবে ঐ ছেলেটির কাছে। সে কোন্ কলেজের যেন প্রফেসর।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যাব। এখন বকবকানি থামাও। সকালে যদি যেতে হয় তবে এখন ঘুমোতে দেও।"

(২)

সকালে উঠে চা খাবার পর পরেশ ডাক্তার নোট-বুকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সকালেই যেতে হবে দুটো 'কলে' আর তোমার ফরমাস্ হচ্ছে সেই ছেলেটির কাছে যেতে হবে, কি নাম বলেছিলে—প্রফেসর পার্থ পুরকায়স্থ? তা আগে কোন্ দিকে যাই তাই ভাবছি!"

"আর ভাবতে হবে না, ঐ ছেলেটির কাছে আগে যাও, তার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তার পর 'কলে' গেলেই ত হবে।"

"তথাস্তু।"

(৩)

মোটরের হর্ণ শুনে জানলায় গিয়ে দাঁড়াতেই ত চক্ষুস্থির।

একেবারে সঙ্গে ক'রে আনা! ডাক্তার-গিন্নি একবারও ভাবেন নি যে আজই এই সাত-সকালে কর্তা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন ছেলেটিকে। ব্যস্ত হয়ে মেয়ের সন্ধান করতে করতে সারাবাড়ী ছুটোছুটি করবার পর বাইরের বসবার ঘর থেকে ধরে এনে বললেন, "আর জায়গা পেলি না বসবার? আর একটু হলেই ত ওঁরা এসে ঢুকে পড়তেন এই ঘরেই।"

মেয়ে অবাক হয়ে বলে' উঁরা—কারা মা? বাবার দপ্তার ঘরে ত আমি রোজই বসি। আজ তোমার এত ব্যস্ততার কারণ কি? হয়েছে কি?"

"আরে চুপচুপ, তোকে যে দেখতে এসেছে—একখানা ভাল শাড়ী পরবি আয় আয়—"

শিপ্রা সর্বাঙ্গে একটা বিরক্তির ঝাপটা মেরে বললে,—"ওসব হবে না। যত্তসব! আমি যাব না।"

"ওমা! সে কি কথা রে! তোর কি লজ্জা করে?"

"হ্যাঁ, করেই ত।"

"কেন, তুই ত কত ছেলের সামনে কতদিন বের হয়েছিস, কত কথাবার্তা বলেছিস্।"

"সে কোনো না কোনো কাজের জন্যে।"

"আর এইটে কি কাজের জন্যে না? এইটেই ত সব চেয়ে বড় কাজ রে।"

শিপ্রা বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, "আমার কোন কাজ নেই ওকে দিয়ে। তোমাদের বড় কাজ থাকে ত তোমরা কথা কও গিয়ে।"

"ওমা! বলিস্ কি রে? তুই যে—"

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই শিপ্রা একটা ঘরে গিয়ে দড়াম্ করে ভেতর থেকে হুড়কো এঁটে দিল। মাতা হতাশ হয়ে বাইরে থেকে জিগেস করলেন, "একবার দেখাটাও দিবিনে?"

মেয়ের উদ্ধত জবাব এলো, "না।"

একটু পরেই ডাক্তার এসে গিন্নিকে জিগেস করলেন, "মেয়ে প্রস্তুত ত?"

গিন্নির রাগ পড়লো গিয়ে এইবার স্বামীর উপর। "মেয়ে ত বিগড়েছে। তোমারও যেমন কীর্তি! একেবারে ছেলে সঙ্গে করে নিয়ে এলে! কথা কয়ে আসবে কবে আনবে, তা না। একেবারে বেখবরি!"

"কি করবো বল, কথাটা ছেলের কাছে পাড়তেই ও নিজেই আজকেই আসতে চাইল রবিবার বলে।"

কর্তাগিন্নি যখন পাশের ঘরে এই রকম বিপদসাগরে পড়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত, শিপ্রা তখন রুদ্ধ দুয়ার ঘরের মধ্যে ব'সে হঠাৎ মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লো আর একটা কারণে। বাহিরের ঘরে বসে যখন ক্রস্ওয়ার্ডের মীমাংসায় ব্যস্ত ছিল, তখন মায়ের আচম্কা আহ্বানে সেই ক্রস-ওয়ার্ডের কাগজখানা ফেলেই চলে এসেছে তাড়াতাড়িতে। সেইটের জন্যেই ব্যস্ততা। তাই আস্তে দরজা খুলে পা টিপে টিপে গেল বাইরের ঘর থেকে কাগজখানা নিয়ে আসতে। মা বাবা জানতে পারলেন না। বাইরের ঘরের দরজার সামনে গিয়েই দেখে সর্বনাশ! ঐ ঘরেই ব'সে আছে সেই ছেলেটা! এই ভয়ই করছিল সে। আর দিব্যি সেই কাগজখানার উপরই ঝুঁকে পড়েছে! শিপ্রা কুতূহলী হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে র'ইল তার দিকে কিছুক্ষণ। ছেলেটি তন্ময় হয়ে কাগজটার পাশে পাশে শিপ্রার লেখা সমাধানগুলি নিরীক্ষণ করছিল। আর এতটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে একটু অস্ফুট-স্বরে ব'লে উঠলো, "এইটে আমার সঙ্গে ঠিক মিলেছে, কিন্তু এই খানটায় ভুল হয়েছে—এ শব্দটা কোনো ডিক্সনারিতেই নেই আমি দেখেছি।"

শিপ্রা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। হঠাৎ সে একেবারে ছেলেটির সামনে এসে বল্লে—"না না ভুল হয় নি, মাপ করবেন। ঐ শব্দটা এই ডাক্তারী বই দেখে লেখা যদিও কোনো ডিকশনারিতে নেই—আপনিই দেখুন না।"

দুজনের মস্তিষ্ক তখন ঝুঁকে পড়লো অন্যান্য মীমাংসার পরীক্ষাতেও। যেমন চুম্বক-শলাকার সমান আকর্ষণে দুটি ভাসমান লৌহচঞ্চু খেলার হাঁস এসে একস্থানে মিলিত হয়। পরিচয় ছিল কি ছিল না সেদিকে হুঁসই নেই কারো।

'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, কি সুন্দর আপনি—আপনি এই মীমাংসাটা করেছেন।" ছেলেটি মুগ্ধ হয়ে বললো। 'আপনি, আপনি' কথাটা জিবে যেন আটকে গিয়েছিল, কারণ তার আগেই ছিল 'সুন্দর' কথাটা। কিন্তু তন্ময়তার জন্য ভেদ ক'রে লাজ-পুষ্প ফুটে উঠতে পারলো না।

শিপ্রা জিগেস করলে, "আর এইটে আপনি কি করেছেন ? আমি ত পারছি না।" যুবক লিখে দেখাতেই শিপ্রা বলে উঠলো, "চমৎকার ?" ঠিক সেই মুহূর্তে শিপ্রার মা বাবা সেখানে এসে তাদের কাণ্ড দেখে ত অবাক ! মা হাঁক দিলেন "শিপ্রা !"

এবার শিপ্রার লজ্জিত হবার কথা। কিন্তু সে জবাব দিলে "মা, কি চমৎকার ইনি—মানে যে ক্রসওয়ার্ডের কথাগুলো বসিয়েছেন তা চমৎকার হয়েছে—ঠিক খেটেছে প্রত্যেকটাই।"

* * * * *

গোধূলির আধা আলোয় প্রথম দেখা মুখখানিকে যেমন মনে ধ'রে যায়, কথায় হেঁয়ালীর আবছায়ায় আবছা দুটি তরুণ চিত্তের প্রথম পরিচয়ও ব্যর্থ হলো না।

* * * *

অচিরেই একদিন গোধূলিলগ্নেই সাহানা রাগিণীতে সানাই বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলনে আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাব

কালীচরণ ঘোষ

(১) দেশের মধ্যে জাতীয়তাভাবের জাগরণকে অধিক ত্বরান্বিত ও শক্তিমত্তা করে পৃথিবীর নানা অংশের আন্তর্জাতিক ঘটনা। সকলেই যে অত্যাচারী শক্তিমানের পরাজয় বা সম্মানহানির সংবাদ রাখতো তা নয়, কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তি, দেশের চিন্তাধারার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতেন, এ সকল ঘটনা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতো না।

জাতির চেতনায় দেশপ্রেম নিবদ্ধ করবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দান করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তখন শিক্ষিত লোকেরাও দৃষ্টি এড়িয়ে যেত যে সকল ঘটনা, রাজার নিকট সে সকলের সামান্য-প্রকাশও ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা বহন করে আনতো। ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনার পারম্পর্য্য তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন এবং ভারতের চিন্তার জগতে তার কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ করতেন।

(২) রামমোহনের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যে সকল বিরাট ঘটনা ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করতেন তাদের মধ্যে দু একটি বিষয় আলোচনা করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ভারতে উচ্চশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনাসংক্রান্ত প্রবন্ধ পুস্তক প্রভৃতি যোগ্য লোকের কাছে সম্মানলাভ করেছে এবং জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকলের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ও তার পরই হলো ফরাসী বিপ্লব কাহিনী। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ প্রচেষ্টায় মানবের অধিকার ও মানবতার বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হওয়ায় জগতে একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যায়। এখানে কেবল তার উল্লেখ করা হ'লো।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধের সূত্রপাত হয় ১০ ফেব্রুয়ারী ১৭৬৩তে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের সাত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। তখন কানাডা (মূলতঃ ফরাসী শক্তি) হতে আক্রমণের ভয় দূর হয়েছে এবং আমেরিকা নিশ্চিন্তে ঘরের দিকে মুখ ফেরাবার সুযোগ পেয়েছে।

ইংলণ্ডও ১৭৬৫ থেকে আমেরিকার ওপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের সুযোগ খুঁজতে থাকে। আমদানী শুল্ক, ঝোলা গুড়ের ওপর শুল্ক, স্থানীয় (ইণ্ডিয়ান) অধিবাসীদের জমি হস্তান্তর, ইংরেজ সেনা কটক স্থাপন ব্যাপারে পদে পদে মনোমালিন্য সুরু হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে দলিল দস্তাবেজের ওপর ষ্ট্যাম্প বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশ ইংরেজ দাবী করলে (Stamp Act) বিরোধ বেশ প্রকট হ'য়ে ওঠে। বেগতিক দেখে ১৭৬৬তে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট

কর্তৃক সেই শুল্ক রহিত হলেও উপনিবেশের ওপর পার্লামেন্টের ট্যাক্স বসাবার শক্তির কথা সদর্পে পুনরুচ্চারিত হয়েছিল।

যথানিয়মে মতান্তর আরও প্রকাশ্যভাব ধারণ করে। ১৭৬৭ সালে কাগজ, কাচদ্রব্য ও চা-এর ওপর শুল্ক বসানো হয়। পর বৎসরই অন্যগুলি বাদ দিয়ে চা সম্বন্ধে হুকুম বহাল রাখা হয়।

যখন প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব কেবল সুরু হয়েছে, তখন ৫ মার্চ ১৭৭০ ইংরেজ সৈনিকের গুলিতে বোষ্টন সহরে চারজন আমেরিকান মারা পড়ে। এই ঘটনাই ইতিহাসের বোষ্টন হত্যাকাণ্ড (Boston massacre). জুন মাসে ইংরেজের জাহাজ (Gaspec) চড়ায় আটক পড়লে তাতে আমেরিকানরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্রমে বলবদ্ধ বাধা দেওয়া আরম্ভ হলে ১৬ ডিসেম্বর ১৭৭৩ বোষ্টন বন্দরে একরাত্রে ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত থেকে ৩৪০ পেটি চা বোষ্টন চা (শুল্ক প্রতিরোধ) দল (Boston Tea Party) কর্তৃক সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়।

তার পর থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমেরিকার ১২টি রাজ্য (State) ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ৫ সেপ্টেম্বর ১৭৭৪ মিলিত হয়। ফলস্বরূপ নভেম্বর মাসে আমেরিকার ন্যায্য অধিকার ও অভিযোগ (Declaration of Rights Grievances) ঘোষিত হয়।

এর পর থেকে প্রকাশ্য সংগ্রামের তালিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৭৫ এপ্রিল ১৮তে কনকর্ড (concord) এ অবস্থিত ইংরেজের রণসম্ভার আমেরিকান কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ১৯ এপ্রিল লেক্সিংটন (Lexington) যুদ্ধে ইংরেজ পরাজয় স্বীকার করে। মে মাসে কানাডার প্রবেশ পথে অবস্থিত টিনকন্ডেরোগা (Tinconderoga) ক্ষুদ্র দুর্গটি আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরে ১৭ জুন ১৭৭: বাঙ্কার হিল (Bunker Hill) এর অপেক্ষাকৃত বড় সংগ্রাম অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও আমেরিকা এই যুদ্ধে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ১৫ জুন ওয়াশিংটন (George Washington) প্রধান সেনাপতি-পদে বৃত হন এবং ৩ জুলাই থেকে সৈন্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। ৩০-৩১ ডিসেম্বর আমেরিকান সৈন্য কানাডা প্রবেশের চেষ্টায় ব্যাহত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

কালবিলম্ব না করে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ৪ জুলাই ১৭৭৬। এর বয়ান সম্বন্ধে একটু উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সূচনায় বলা হয় যে প্রকৃতির নিয়মে যদি এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বতন্ত্র সত্ত্বা লাভ করতে চায়, তা হ'লে পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের অবগতির জন্য তার মূল কারণ প্রকাশ করা কর্তব্য।

সৃষ্টির নিয়মে মানুষ সকলেই এক স্তরে জন্মলাভ করেছে এবং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তারা কতগুলি অবিচ্ছেদ্য সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকারী হয়েছে। জীবন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সুখশান্তি লাভের প্রয়াস ও সুযোগ সকলের আদিম অধিকার। একে লাভ করতে হলে নিজেদের ভিতর থেকে শাসনযন্ত্র গঠন করতে হবে, আর সেই রাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোকমতের ওপর নির্ভরশীল হবে। যখন কোন গভর্ণমেণ্ট জাতীয় সিদ্ধির পথে পরিপন্থী হয় তখন শাসিত জনগণ এই গভর্ণমেণ্টের রদবদল বা উচ্ছেদ সাধনের সম্পূর্ণ অধিকারী......।" যাতে সমগ্র জাতির প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের সমস্ত পথ উন্মুক্ত থাকে, সেই রকম গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত করে নিজেরাই পরিচালনা করবে।

ইংরেজী ভাষায় যা বলা ছিল:

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the

people to alter or abolish it, and to institute a new government, laying its foundation on such principles and organising its power on such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness."

৩

অবশিষ্ট অংশ সংক্ষেপতঃ দাঁড়ায় যে বহুদিন ইংরেজের নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করবার পর এখন বোঝা যাচ্ছে পূর্ব্ব সম্পর্ক রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। ইংলণ্ডেশ্বরের খামখেয়ালী আমেরিকাবাসীর সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি ও নানাভাবে অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে এবং সে সকল থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে ইংরেজ অমানুষিক বর্ব্বরতার সাহায্যে তার উপনিবেশ শাসন করতে চায়।

সে ব্যবস্থা মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে অতএব "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে" এবং "সময় এবার হয়েছে নিকট বাঁধন ছিঁড়িতে হবে"। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা এক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে জগতে পরিগণিত হ'তে চেয়েছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা এবং স্বাধানতালাভ এক পর্য্যায়-ভুক্ত নয়। ইংলণ্ড তখন ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

২৬ আগষ্ট (১৭৭৬) লঙ আইল্যাণ্ড (Long Island) যুদ্ধ শুরু হয় আর ২৯-৩০ তারিখে আমেরিকানরা পশ্চাদ-পসরণ করতে বাধ্য হয়। আবার ১৬ নভেম্বর ইংরেজ ওয়াশিংটন দুর্গ (Fort Washington) শত্রু কবলে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলেছে। ২৬ ডিসেম্বর (১৭৭৬) ট্রেনটন (Trenton) এবং ৩ জানুয়ারী ১৭৭৬ প্রিন্সটন (Princeton) যুদ্ধে আমেরিকা জয়ী হয়। এই সময় কিছু ফরাসী সৈন্য এসে আমেরিকার বহু সুবিধা করে দেয়।

আমেরিকার মাঝে মাঝে পরাজয় ঘটেছে ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে আছে। ১১ সেপ্টেম্বর (১৭৭') ব্র্যাণ্ডিওয়াইন (Brandywine) ও ৪ অক্টোবর জার্মানটাউন (Germantown) যুদ্ধে আমেরিকার পর পর দুইটি পরাজয় ঘটে। ২৬ জুলাই টিকনডেরোগা (Ticonderoga) দুর্গ শত্রুহস্তে সমর্পণ করতে হওয়ায় আমেরিকার প্রচুর মর্য্যাদাহানি ঘটে। পরে আবার সারাটোগা (Saratoga) যুদ্ধে ১৭ অক্টোবর ইংরেজ সেনাপতি বরগয়েন (John Burgone)-কে আত্মসমর্পণ করতে হওয়ায় আমেরিকা হৃতমর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

১৭৭৮ সালে জার্ম্মানী থেকে বিরাট সমরকুশলী ফনষ্টয়বেন (Von Steuben) এসে সদ্য নিয়োজিত আমেরিকান সৈন্যের সামরিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যেই তাহাতে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়েছিল। তার পরে ১৭৭৮ ফেব্রুয়ারী ফ্রান্স, ১৭৭৯তে স্পেন আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যোগদান করে। ফ্রান্সের নৌবহরের সাহায্য পাওয়ায় ইংরেজের সহিত জলযুদ্ধে আমেরিকাকে আর পূর্ব্বের মত বিব্রত হ'তে হয় নি।

আমেরিকার উত্তরাংশে যুদ্ধে ইংরেজের বিশেষ অসুবিধা হলেও ১৭৭৮-৮০ সময়টা দক্ষিণ বা নিম্ন আমেরিকায় ইংরেজ কয়েকটা যুদ্ধে জয়ী হয়। তন্মধ্যে ক্যামডেন (Camden) যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে সারাটোগা-বিজয়ী গেটস্ (Haratio Gates) ১৬ আগষ্ট ১৮৮০ বীরবর কর্ণওয়ালিশের (Charles Cornwallis) নিকট পরাজিত হন।

খণ্ডযুদ্ধ সমানে চলেছে; ১৭৮১ থেকেই ইয়র্কটাউন (Yorktown) যুদ্ধের তোড়জোড় চলতে থাকে। ১৯ অক্টোবর পরাজিত হ'য়ে কর্ণওয়ালিশ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সমরবিরতি জ্ঞাপন করেন। এক বৎসর পরে ৩০ নভেম্বর ১৭৮২ সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করা হয় এবং ১১ এপ্রিল ১৭৮৩ দুপক্ষই সেটা মেনে নেয়। পরে ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৩ সালে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ইংরেজ কবল হ'তে মুক্তিলাভ করায় আমেরিকা জগতে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করে। নতুন ধারায়

শাসনতন্ত্র প্রচলিত হয়েছে আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধারম্ভ থেকেই। ইংরেজ নিযুক্ত শাসকবর্গ বিতাড়িত হয়ে যুদ্ধ-পোতে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা সুবিধা পেলেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে। পুরাতন শাসকগোষ্ঠী শাসনযন্ত্র অপসারিত হয়ে কংগ্রেস, কন্‌ভেনশন (বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত সভা), সমিতি গড়ে উঠেছে। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণের মতামত দ্বারা এদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হতে সুরু হয়েছে। সাধারণ নাগরিকের শক্তিতে শক্তিমান সরকারী কর্মচারী একাধারে প্রজা ও রাজারূপে শাসন পরিচালন আরম্ভ করেছেন।

ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাজ্যের বা রাষ্ট্রীয় খণ্ডের স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছে অগ্রদূত আমেরিকা। হয়ত উত্তরকালে সারা পৃথিবী এই পথ গ্রহণ করে এক বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত হবে। লীগ-অফ্‌-নেশন্স (League of nations) রাষ্ট্রসঙ্ঘ এ বিষয়ে প্রথম ক্ষীণ প্রচেষ্টা এবং ইউনাইটেড নেশন্স অরগ্যা-নিজেশন্‌ (United nations organisation) সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ তার বর্ত্তমান পরীক্ষা। আরও মারাত্মক অস্ত্রাদির আবিষ্কার ও আন্তর্জাতিক সংগ্রাম যখন বিধ্বংসী হয়ে উঠবে তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত মহাদেশ সমন্বয় ঘটবে বলে মনে করা যেতে পারে।

ফরাসী বিপ্লব ।

স্বাধীন আমেরিকা সাধারণ মানুষের অধিকার যতটা মেনে নিয়েছিল, পরে ফরাসী বিপ্লব তাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। আমেরিকা-ইংলণ্ডের সংগ্রামে অনেক ফরাসী সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল, তারা স্বদেশে এক নতুন ভাবধারা বহন করে আনে। এদিকে ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় শাসনব্যাপারে তিন শতাব্দী ধরে যত কলুষ জমে উঠেছিল তাকে একটা শুষ্ক বারুদের স্তুপ বলা চলে।

সামন্ততন্ত্র (feudal system) বহুকাল একই ধারায় চলাতে তার মধ্যে অসংখ্য গলদ জমে যায় এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা, উত্তরইটালি প্রভৃতি দেশ থেকে ধীরে ধীরে সে প্রথা অপসারিত হতে থাকে। ফ্রান্সে শিক্ষিত বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত ও উচ্চ কৃষিজীবীর হাতে অর্থাগম ও রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্রে অংশ গ্রহণের স্পৃহা মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌তে থাকে। এই অবস্থার সঙ্গে ভল্টেয়ার (Voltaire), রুশো (Roussean) প্রভৃতি চিন্তাশীল লোকের প্রবন্ধাদি ধূমায়মান বহ্নিতে ইন্ধন যোগ দিতে থাকে।

১৯৭০ সাল নাগাদ ইউরোপে সকল দেশের রাজশক্তি আপনাদের প্রভাবক্ষেত্র বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে এবং প্রজাশক্তি সেটা খর্ব্ব করবার জন্য প্রস্তুত হয়। এই রকম সময় ৫মে ১৭৮৯ ফ্রান্সের ত্রি-সংসদ (Estates General) অর্থাৎ (১) ধর্ম্মযাজক পাদ্রী, (২) বিত্তবান অভিজাত সম্প্রদায় ও (৩) নিম্নমধ্যবিত্ত বা জনসাধারণ এক সভায় মিলিত হয়। এই সভা সম্রাট ষোড়শ লুই (Louis XvI)র মনঃপূত হয় নি এবং তিনি এটিকে তিন স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করে ফেলার আদেশ দেন। কিন্তু সংসদের প্রতিনিধিরা সরাসরি অগ্রাহ্য করে এবং ১৭জুন তৃতীয় সংসদ (third state) জাতীয় (সাংবিধানিক) সভা [national (Constituent) Assembly] নাম গ্রহণ করে প্রকাশ্যে রাজনীতির ও শাসনযন্ত্রের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ১৭ জুনই ফ্রান্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর ঘটনাস্রোত খুব দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। ২০ জুন (১৭৮৯) সভার অধিবেশনের জন্য গেলে দেখা যায় সভাকক্ষর সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ। নিরুৎসাহ না হয়ে সভ্যরা নিকটস্থ এক টেনিস্‌কোর্টে সভা করে এবং শপথ গ্রহণ করে যে যতদিন না তারা ফ্রান্সের গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা ক ত পারে, ততদিন অধিবেশন সমান ভাবেই অনুষ্ঠিত

সম্রাট (Louis Xvl)ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই

বেড়ে যেতে থাকে এবং রাজাজ্ঞায় যখন প্যারীনগরীতে বিরাট সৈন্য সমাবেশ হয় তখন বোঝা গেল একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছে। জুলাই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ রাজধানীতে প্রতিনিয়ত গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা চলতে থাকে এবং ১২ জুলাই (১৭৮৯) সহরেই জাতীয় রক্ষীবাহিনী (national Guard) গঠিত হয়; আর ১৪ই জুলাই কুখ্যাত কারাদুর্গ ব্যাষ্টিল (Bastil!e) বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়।

৪ আগষ্ট ১৭৮৯ সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমস্ত সুযোগ সুবিধার বিলোপসাধনের আদেশ প্রচার করা হয়।

অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তখন জনপ্রতিনিধিরা ফ্রান্সকে ৮৩টি রাষ্ট্রীয় বিভাগে (Departments sub-divided into districts, cantons and communs) অঞ্চলে বিভক্ত করে শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরা মাত্র জাতীয় সভার আনুগত্য স্বীকার করে আর সরকারী আদেশ অনুজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এই ভাবে জনপ্রতিনিধি শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং বিকল্প শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে।

ক্রমে ৪ আগষ্ট (১৭৯১) ধর্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় (First and second States) জাতীয় কর্তৃত্ব মেনে নেয়। ২৬ আগষ্ট জগতে এক অতি স্মরণীয় দিন। আমেরিকার অনুকরণে ফ্রান্সের জাতীয় সভা সাধারণ মানুষ ও নাগরিকদের ন্যায্যদাবীর কথা ঘোষণা করে (Declaration of the Rights of man and of the Citizen). এতে বলা হয় (ব্যক্তিগত) স্বাধীনতা, সম্পত্তি বা সম্পদ, নিরাপত্তা ও অত্যাচার প্রতিরোধশক্তি ("liberty, property, Security and the rights to resist oppression") প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। সংক্ষেপতঃ এটাই হলো সারা জগতের কাছে পরিচিত মন্ত্র: 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা।"

ভার্সাই (Varsalles) সহরে যখন এই সভার কাজ চলছে তখন রাজসৈন্য তথায় প্রেরিত হয়। প্যারিশহরে প্রতিনিধি গোষ্ঠী (Commune) সম্রাটের কার্য্যে সহায়তা না করে প্রকাশ্যে জনমত সমর্থন করে। বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হলে সম্রাট ৫ অক্টোবর প্রজাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন এবং গোপনে ভার্সাই শহর থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য্য হয়ে তিনি প্যারি শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

পরে তিনি পলায়নের উদ্দেশ্যে টুলারিজ (Tuileries) প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন ২০ জুন (১৭৯১); কিন্তু ভ্যারেন্‌স্‌ (Varennes) নিকট তাঁর পথ অবরুদ্ধ হয় এবং তাঁকে রাজধানীতে ধরে আনা হয়। তখন পর্য্যন্ত সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রশ্ন ওঠে নি। ১৭ জুলাই (১৭৯১) জাতীয় রক্ষীবাহিনী (National Guard) প্যারী নগরীর এক অঞ্চলে (Champ de Mars) এক জনতার ওপর গুলি চালায় এবং তাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। এই সময় জাতীয় সভায় (National Assembly)র মধ্যে রাজতন্ত্র সমর্থন বা বিলোপ নিয়ে বিশেষ মতান্তর দেখা দেয়।

সংবিধান প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে এবং ৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় সভায় সেটা মনোনীত হয় পরে ১৪ সেপ্টেম্বর সম্রাটের অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়। ৩০ সেপ্টম্বর পুরাতন এ্যাসেম্‌ব্লী লোপ পায়। নবগঠিত আইন পরিষদ (Lagislative Assembly)-এর প্রথম অধিবেশন হয় ১ অক্টোবর ১৭৯১।

জনতা শক্তির স্বাদ পেয়ে এবং রাজতন্ত্রের ওপর আক্রোশবশতঃ ২০ জুন ১৭৯২ টুলেরিজ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। ক্রমেই বামপন্থীরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে ১০ আগষ্ট সম্রাট ও পরিবারবর্গকে টেম্পল্‌ (Tepmle) নামক ধর্মযাজকদের আশ্রমে (monostery)তে বন্দী অবস্থায় রেখে দেয়। আত্মকলহ, বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা, ভীষণ আর্থিক অনটন, সরকারী অব্যবস্থা সব মিলে তখন ফ্রান্স বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ২রা থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ কদিনের মধ্যে পক্ষ বিপক্ষ নির্ব্বিশেষে নিহত বন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২০০ বা ততোধিক।

১০ আগষ্ট ১৭৯২ ফ্রান্সে গণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত

হয়। ডানটন্ (Danton) রবস্পিয়র (Robespierre) প্রভৃতি বহু মহাবিপ্লবী নেতার জীবনাবসান ঘটে বিপক্ষ "অতি" বিপ্লবীর আবেশে। ২১ জানুয়ারী ১৭৯৩ সম্রাট ষোড়শ লুইয় শিরশ্ছেদ করা হয়।

স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, দায়িত্বহীন, বিলাসপ্রিয়, চরিত্রহীন, ধনগর্ব্বিত সামন্তবর্গ এবং তাদের পার্ষদের হাত হ'তে মুক্তিলাভ করতে গিয়ে ফ্রান্স ৩০,০০০ লোক ফাঁসিতে হত্যা ছাড়া অপরাপর ভয়াবহ পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও বলতে হয়, মানবতার দাবী সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বাণী যে পরাধীন জাতিকেই স্পর্শ করেছে সেই দেশ উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করে ধন্য হয়েছে। কণ্টকাকীর্ণ স্বাধীনতার পথে এই ভাবে পদক্ষেপ ছাড়া ফ্রান্সের সামনে হয় ত অন্য পথ উন্মুক্ত ছিল না।

ইটালী স্পেন, আর্জেন্টাইনা

যে বিপ্লবগুলির প্রতি রামমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি কার্য্যতঃ তার সিদ্ধি বা বিফলতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন, তার উল্লেখ করা চলতে পারে।

নিয়োপোলিটান (নেপল্স্ ইটালীর অধিবাসী)রা তদানীন্তন সম্রাটের (Joachim Umrat, 1808—15) রাজত্বকালে কার্ব্বনারি দল (ইটালীয় Carbonari বা 'charcoal burners' হ'তে গৃহীত নাম) গঠিত হয়। ফ্রান্স ও বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়ার প্রভাব থেকে ইটালীকে মুক্ত করাই ছিল এদের লক্ষ্য। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত কবি লর্ড বায়রণ (Byron) ছিলেন এই দলের বড় পৃষ্ঠপোষক)। বিপর্য্যস্ত হ'লেও কার্ব্বনারি দল সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। ১৮১৫ সালে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড (Ferdinand iv) তাকে দমন করেন। ১ জুলাই ১৮২০ প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটে মণ্টফোর্টে (Montforte)তে; দলের শ্লোগান (রণধ্বনি) হ'লো, ঈশ্বর, সম্রাট ও সংবিধান (God, the King and Constitution)-তাদের দমন করবার চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে ১৩ জুলাই একটি রাজ্য-পরিচালনবিধি গৃহীত হয়। ১৮২১ সালেই সম্রাট অষ্ট্রিয়ানদের সাহায্যে কার্ব্বনারি দলের শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে সমর্থ হন। পরে ম্যাটসিনি (Giussepe maazzini) এই সঙ্ঘের অবশিষ্ট সভ্য নিয়ে "নব্য ইতালী" (Young Italy) দল গঠন করেন।

নিওপোলিটানদের উত্থান পতন দুইটাই রামমোহন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। প্রথমে তিনি বেশ উল্লসিত এবং পরের ঘটনায় অবসাদগ্রস্ত হন। তিনি বন্ধু ব্যাকিংহাম (Silk Buckinghum)কে ১১ আগষ্ট ১৮২৫ তারিখে লেখেন যে স্বাধীনতার বৈরী এবং যথেচ্ছাচরণের সমর্থক-গণ শেষ পর্য্যন্ত সফলতা লাভে সমর্থ হয় না ("Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful)".

দক্ষিণ আমেরিকার ঘটনা নিয়ে রামমোহনের মতামত পাওয়া যায়। ষোড়শশতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ল্যাটিন আমেরিকার আর্জেণ্টাইনা ও বলিভিয়া স্পেনের অধিকারে আসে; পরে যথারীতি ইংরেজ গিয়ে কিছুকাল কর্তৃত্ব করবার পর স্পেন অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ সময় আর্জেণ্টাইনাবাসীরাও স্বাধীনতার লাভের চেষ্টা করে চলেছে। ১৮১৬ সালে কতকটা সফল হলেও ১৮২৬ পর্য্যন্ত সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। ঐ সালে ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাদের সীমিত স্বাধীনতা মেনে নেয়, মোটামুটি স্পেনের ওপর আক্রোশই তার প্রধান কারণ। রামমোহন এই উপলক্ষ্যে কলকাতা টাউন হলে বিজয়-উৎসবের এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করেন। প্রকৃতপক্ষে স্পেন তার কর্তৃত্বের দাবী সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে ১৮৪২ সালে। বলিভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে তার কিছু আগে ১৮২৫ সালে।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(৩)

রামপদর মায়ের শোবার ঘরটিই এ বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। অন্য জাদেরও যে খুব ছোট ঘর তা নয়। বাড়ীখানি দালান নয়, মাটিরই ঘর, খড়ের চাল, তবে অনেকখানি জমি জুড়ে আছে, ঘরগুলি মাঝারি মাপের, দরজা জানলাগুলি ভাল কাঠের। মোটামুটি সম্পন্ন অবস্থার মানুষ হওয়াতে এঁদের ঘরদোরের প্রত্যেক বছরেই দরকার মত সংস্কার হয়, চালের খড় বদলান হয়, কাজেই বাড়ীটি গ্রামের মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে আছে। কপালক্রমে রামপদর মা মেজবউ হয়েও বড়বউয়ের স্থান অধিকার করে আছেন, কারণ তাঁর একমাত্র ভাসুর হরিপদর স্ত্রী বেঁচে নেই। শাশুড়ীও নেই। তিনি বহুকাল হল গত হয়েছেন। বিন্ধ্যবাসিনীই এখন বাড়ীর গিন্নী। নিজে অত্যন্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ তিনি, তাঁর ঘর সবসময় ছিমছাম পরিপাটি। ছোটজাদেরও সেই শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবে শিক্ষা নেবার ক্ষমতা ত সব মানুষের সমান থাকে না? এখনকার মেজবউ মোটামুটি গোছাল মানুষই, বিন্ধ্যবাসিনীর তুলনায় তাঁকে কেউ এলোথেলো ভাববে। এটা তিনি সহ্য করতে রাজী নয়, কাজেই ঘরদোর গুছিয়ে রাখতেই চেষ্টা করেন, তবে অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মা হওয়াতে তাদের উৎপাতে সব সময় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। ছাড়া কাপড় জামা, ছড়ান বই খাতা অনেক সময়ই তাঁর ঘরের শোভাবর্দ্ধন করে। ছেলেদের বকুনি এবং মেয়েদের চড়চাপড় দিয়েও তিনি তাদের স্বভাব সংশোধন করতে পারেননি।

ছোটবউয়ের ওসব আপদ্ বালাই নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কোনো যে প্রয়োজন আছে তাইই তিনি স্বীকার করেন না। নিজের সাজ-সজ্জাও তেমনি। কেউ কিছু বললে বলেন, "অত পরিপাটি হবার আমার অবসর কোথায় বাপু? রাতদিন ত হাঁড়ি ঠেলছি আর উঠোনে গোবর লেপ্‌ছি, এর মধ্যে আবার অত পটের বিবি হয়ে বসে থাকব কখন?"

স্ত্রীর চালচলন তাঁর স্বামীর মোটেই পছন্দ হয় না। তিনি পরিচ্ছন্নতারই পক্ষপাতী। প্রায়ই স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলেন, "শ্রী দেখ ঘরের? কে বলবে বামুনের বাড়ীর ঘর? ঠিক ধাঙড়, নয় ক্যায়োটের ঘরের মত। ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রাখতে হয় কি তোমার? ছেলেমেয়েগুলোকেই বা কি শিক্ষা দিয়েছ? ঠিক যেন জানোয়ারের খাঁচা করে রেখেছে। দেখ ত বড়বউয়ের ঘর, দেখলে দু চোখ জুড়িয়ে যায়।"

ছোটবউ রেগে উঠতেন, "তবে তাই দেখগে যাও দুই চোখ ভরে। বলি, পঞ্চাশবার ঘর গুছোব কখন? সকাল থেকে কাঁধের জোয়াল নামে একবারও? ছেলে-মেয়েকে ভাল শিক্ষা তুমি দিলেই পার, সারাদিন ত ঘরেই আছ। আর তাও বলি বাপু, বড়গিন্নীর মত ঘরখানাকে চণ্ডীমণ্ডপের মত করে সাজিয়ে রাখতে আমার ভালও লাগে না। বসতে শুতেই যেন ভয় করে,

মোটে স্বস্তি হয় না। ছেলেপিলের মায়ের ঘর একটু আগোছাল হবে না?"

ছোট কর্ত্তা রেগে হন্ হন্ করে চলে যেতেন। বলে যেতেন মাঝে মাঝে, "তা হ'লে বাড়ীর পিছনের পাঁশ-কুড়ে গিয়ে গড়াগড়ি দেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে, খুব স্বস্তি পাবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী রোগশয্যায় পড়ে সারাক্ষণই বিরক্ত হয়ে থাকতেন। ঘরদোর ঠিকমত গোছানো হয় না, নিকোন হয় না। জায়েরা কোনোমতে তাঁর কাজগুলো করে দেয়, সেই ঢের, তার উপর আর কিছু তাদের করতে বলা যায়না। বড় ছেলে রামপদ, তারপর আট ন, বছর পরে মেয়ে কনকলতা। তাকে দিয়ে কিছু কিছু করাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেও মায়ের রুচিমত কিছু করতে পারেনা, কাজেই বকুনি খেয়ে তাকে চলে যেতে হয়। এ পরিবারের গিন্নীদের কারোই বড় মেয়ে নেই, সকলের ছেলেরাই বড়। ছেলেদের গৃহকর্ম্ম করা বড় লজ্জার কথা, বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে বড় ধিক্কারের কথা, কাজেই ছেলেদের ডাক কখনও পড়েনা, আর কর্ত্তাদের কিছু কাজ করতে বলার কথা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেনা।

কলকাতা থেকে এসে প্রথম মায়ের ঘরে ঢুকেই রামপদর মনে হয়েছিল মায়ের ঘরের সেই অম্লান অমল-রূপটি আর যেন নেই। উপায় নেই ভেবেই চুপ করে ছিলেন। মায়ের ত অপটু হাতের কাজ পছন্দ হবেনা, না হলে নিজে চেষ্টা করতেন।

কিন্তু এখন কাকীর ঘর থেকে ফিরে এসে দেখলেন, ঘরের চেহারা পালটে গেছে। ঘর তকতক্ করছে, কাপড় চোপড় জিনিষপত্র সব যেখানকার যা সেখানে সাজান। খোলা জানলার পথে ঈষৎ গরম হাওয়া হু-হু করে ঢুকছে ঘরে। স্নান সেরে ধবধবে পরিষ্কার শাড়ী পরে বিন্ধ্যবাসিনী তিন চারটে বালিশে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসেছেন। একটু দূরে ছোট একটা কাঠের চৌকি নিয়ে রামপদর বাবা দুর্গাপদ বসে আছেন।

চিরকাল আসনে বসতেই অভ্যস্ত তিনি, কিন্তু হঠাৎ বাঁ পায়ে ভয়ানক বাতের ব্যথা হওয়াতে তাঁর জন্যে এই ছোট্ট কাঠের চৌকির ব্যবস্থা হয়েছে।

রামপদ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ও কি মা? তুমি কি কবিরাজ মশায়ের কথা শুনতে পাওনি না কি? একটু ভাল হতে না হতেই অমনি উঠে স্নান করা, ঘর নিকোন সুরু করে দিয়েছ?"

বিন্ধ্যবাসিনী হেসে বললেন, "আরে না রে বাবা না, ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে তোর ও পাড়ার নিত্যপিসী, তাকে সকালেই ডাকতে লোক পাঠিয়েছিলাম যে। আর স্নান করেছি তোলা জলে, ছোট ভাঁড়ার ঘরটায় বসে। তুই বোস্ দেখি।"

দুর্গাপদ ভারি গলায় বললেন, "কারো কথা শোনা ত জন্মে অভ্যাস করেননি তোমার মা। তা কবিরাজই হোন বা অন্য কেউ হোন। আজ না করে কাল স্নান করলেও কিছু এসে যেতনা, কিন্তু ঐ যে কব্‌রেজমশায় বলেছেন কিছু ভাল আছেন, আর রক্ষা আছে?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "বা গরম! ঘামে যেন সেদ্ধ হয়ে থাকি। আমার এর জন্যে কোনো ক্ষতি হবেনা দেখো।"

দুর্গাপদ এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি ত দেখি শরীরটাকে একেবারে মাটি করে এনেছ। দেহপাত করে এমন ইংরিজি না শিখলেই নয়? আমরা যে শিখিনি ইংরিজি, তা কি মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে গেছি?"

রামপদ কিছু বলার আগেই তাঁর মা বললেন, "থাকা খাওয়ার কষ্টেই ওরকম হয়েছে। মোটে বারো টাকা পাঠাও তাতে কি আর ভাল থাকা, ভাল খাওয়া হয়? আরো গোটা দশ দিতে হবে এর পর থেকে।"

দুর্গাপদ অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "তা সে কথা ত সময়মত জানানও যায়? টাকা অবশ্য অঢেল নেই, তা শরীরের জন্য দরকার হ'লে দিতেই হবে।"

এই সময় বাইরের বৈঠকখানা ঘরে দুর্গাপদর ডাক পড়ল। তিনি একটা পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

রামপদ বললেন, "সবাই আমার চেহারার বর্ণনায় পঞ্চমুখ। এমন কি খারাপ দেখতে হয়ে গেছি? নিজে ত কই কিছু বুঝতে পারিনা?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তুই কি সারাক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস যে বুঝবি? সত্যিই চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, রংও ময়লা হয়ে গেছে। আমার ত ভয়ই হচ্ছে যে সই আমার ছেলেকে তার পরমাসুন্দরী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র ভাববে না।"

রামপদ একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "ছেলেদের ত চেহারার পরীক্ষায় পাস করতে হয়না, নইলে ক'টা ছেলেই বা উৎরোত? যা না সব স্বাস্থ্য আর যা না সব চেহারা। কিন্তু তুমি কি পাকাপাকি সব ঠিক করে ফেলেছ? বাবাকে বলেছ?"

"বলেছিই বলা যায়। তিনি এখনও পাকা কথা কিছু দেননি। শুধু বলছেন, 'আগে মেয়ে দেখি।' তা আমার ভরসা আছে, ও মেয়ে কেউ অপছন্দ করবেনা, টাকাও চাইবেনা, বরং টাকা দিয়ে ঘরে আনতে চাইবে।"

রামপদর মনের কৌতুহলটা আরো খানিক উগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বিন্ধ্যবাসিনী বলে চললেন, "সইকে কিন্তু আমি মেয়ে নিয়ে চলে আসতে খবর দিয়ে দিয়েছি। এখানে তার এক দূর সম্পর্কের দেওর থাকে, তারা মানুষ ভাল, যত্ন করে রাখবে। এখনি ত আর আমাদের বাড়ী এসে উঠতে বলা যায় না? কি বলিস?"

রামপদ বললেন, "ওর আর আমি কি বুঝব বল? তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। তাই ত চিরকাল আমাদের বাড়ী হয়ে আসছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "আহা, আমার কথায় সব হতে যাবে কেন? তোমার বাপ-খুড়োরা নেই?"

রামপদ বললেন, "খুড়োরা ত কোন সমস্যা উঠলেই বলেন, 'মেজদা যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমরা কি জানি।' কাকীমারা বলেন, 'ভাসুরঠাকুর ত কখনো দিদির একটা কথাও ঠেলেন না'।"

রামপদর মা বললেন, "যেমন সবজান্তা তোমার দুই কাকী, তেমনি তুমি। একশটা কথা যখন ঠেলা হয় তখন ত আর কেউ দেখতে আসে না, আর একটা কথা যখন মেনে নেয়, তখনই দশদিকে ঢাক ঢোল বেজে ওঠে।"

এই সময় মেজকাকীমা বিন্ধ্যবাসিনীর খাবার নিয়ে এলেন। রামপদকেও বললেন, "রান্না ত হয়ে গেছে, দুটো ডুব দিয়ে আর না? পিবুরা সব যাচ্ছে।"

দারুণ গরম, বাইরে যাবার ইচ্ছা রামপদর বিশেষ ছিল না। কিন্তু ঘরে তোলা জলে স্নান করতে চাইলে এখনি হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তার চেয়ে মাথায় গামছা জড়িয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে যাওয়াই ভাল। তিনি উঠে পড়লেন।

বিন্ধ্যবাসিনী এখনও বেশী কিছু খেতে পারেন না, অরুচি তাঁর পুরো মাত্রায় বর্ত্তমান। খানিক নাড়াচাড়া করে কয়েক গ্রাস খেয়ে তিনি থালা ঠেলে রাখলেন। একটু পরে ছোটবউ বাসন নিতে এসে বললেন, "ও কি খাওয়া হল দিদি? সব ত ফেলে দিয়েছ? অতবড় মাছটা দিলাম, তাও খেলে না?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "আমাকে ভাল জিনিষ দেওয়া এখন বৃথা ভাই। যা মুখে দিই, সবই খড়ের মত লাগে। ছেলেপিলেদেরই এখন বড় মাছটাছগুলো দিও।"

রামপদ তাড়াতাড়ি স্নান করে ভিজে গামছা মাথায় চাপা দিয়ে ফিরে এলেন। ছোটকাকীমা বললেন, "এখন গামছা রেখে খেতে চল ত। দিদি যেমন সব ভাত তরকারি, মাছ ফেলে দিচ্ছে, তেমনি তোমাকে দুগুণ খেয়ে দুদিক্ সমান করতে হবে। এত যত্ন করে রান্না করছি, তা না দাঁতে কাটছেন মা, না দাঁতে কাটছেন ছেলে।" রামপদ ঘরের বাইরের দড়িতে গামছাটা টাঙিয়ে দিয়ে খেতে চলে গেলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী বসে বসে নানা ভাবনা ভাবতে লাগলেন। অন্নপূর্ণাকে চোখে দেখে কেউ অপছন্দ করতে পারবে না এটা তিনি ধরেই নিয়েছেন। দুর্গাপদ অবশ্য গাঁই গুঁই করছেন এখনও, একমাত্র ছেলের বিয়েতে কিছু পাবেন না, এটা তাঁর ভাল লাগবার কথা নয়। তবে নারীর রূপ সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, তাও বিন্ধ্যবাসিনীর

অজানা নয়। তিনি নিজে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রঘরের মেয়ে, কিন্তু দেখতে সুন্দরী ছিলেন বলে দুর্গাপদর এতই পছন্দ হল যে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা স্বীকার করেও তিনি বিয়ে করে বসলেন। নূতন বউ সমাদরও পেয়েছিলেন খুব। দেওরদের বিয়েতে এত ঘটা হয়নি। ছোট দুই বউ দেখতে নিতান্তই সাধারণ, এ জন্যে দুর্গাপদ প্রথমে মতই দেননি, তারপর মত দিলেন অবশ্য, তবে ঘটাপটা খুব বেশী কিছু করা হল না। বউ দুজন এ জন্য ভাসুরের উপর কিছু সন্তুষ্ট ছিলেন না, অবশ্য কথায় বা ভাবভঙ্গীতে সে কথা কখনও প্রকাশ করবার সাহস তাঁদের ছিল না। তবে ঠারে ঠোরে বড় জাকে দুচারটে কথা শোনান তাঁদের চলত বৈকি? কনকলতা মায়ের মত অত ফরশা না হলেও, দেখতে বেশ ভালই ছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সে বাংলা লিখতে আর পড়তে শিখেছিল, প্রায়ই রামায়ণ আর মহাভারত বেশ মিষ্টি সুরে পড়ে শোনাত, মা কাকীমাদের। কাকীরা এমনিতে তার উপর কিছু অখুশী ছিলেন না, তবে যখন কোনো কারণে দুর্গাপদ বা বিন্ধ্যবাসিনীর উপর রাগ হত, তখন কনকলতার উল্লেখ করতেন তাঁরা, "সুন্দরীর বেটি সুন্দরী" বা "লিখিপড়ির বেটি লিখিপড়ি" বলে। বিন্ধ্যবাসিনী এ সব খোঁচা উপেক্ষাই করে যেতেন।

কাজেই দুর্গাপদর মত দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, আর রামপদ ত মত দিয়েই বসে আছেন। বলেইছেন, মায়ের চোখে যে সুন্দর, তার চোখেও সে সুন্দরই হবে। তাঁর নিজের তরুণ চোখে অন্নপূর্ণাকে অপরূপাই দেখাবে তাতে আর সন্দেহ কি?

রামপদ ইতিমধ্যে খেয়ে ফিরে এলেন। বিন্ধ্যবাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে, এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল? কাকীদের খুশী করতে পারলি না?"

রামপদ বললেন, "যা গরম মা, এর মধ্যে কি বেশী খাওয়া যায়? আমের অম্বলটাই যা খেতে ভাল লাগল।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "যখন যাবি তখন তোর সঙ্গে এক হাঁড়ি আম-তেল, আর এক হাঁড়ি আমসত্ত্ব দিয়ে দেব, তবু একটু মুখ বদলাতে পারবি।"

রামপদ বললেন, "খুব বড় বড় হাঁড়ি দিও না, আর একটা জোয়ান দেখে মুনিষ দিও, যে ঘাড়ে করে বইতে পারবে। মেসে আমি ত একলা নয়, আরো গোটা পনেরো কুড়ি ছেলে আছে। কেউ বাড়ী থেকে কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে ফিরলে সব চিলের মত গিয়ে পড়ে। হাঁড়ি শেষ হতে বেশী সময় লাগে না।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "আহা বাছারা, কতদিন মায়ের কোল ছাড়া হয়ে আছে, করবেই ত ঐরকম। এখন যা দেবার তা দেব, এরপর যখনই কলকাতায় কেউ যাচ্ছে শুনব, অমনি তার সঙ্গে আরো খাবার জিনিষ পাঠাব। এখানে ত বারো ভুতে লুটে খায়, আর ও দিকে ঘরের ছেলে শুকিয়ে থাকে। তাও যদি চিঠিপত্রে একটু জানাতিস্। আমি ত ভাবি, ছেলে বেশ আরামেই আছে, ভাল আছে। কলকাতা অত বড় শহর, সেখানে কি কিছুর অভাব আছে?"

রামপদ বললেন, "ইচ্ছে করেই জানাইনি মা, পাছে তুমি উতলা হয়ে ওঠ, আর আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হও। টাকায় যে কুলোয় না, তাও এইজন্যে জানাই নি। তবে পৈতের সময় পাওয়া যে দুটো সোনার আংটি ছিল, তা বিক্রী হয়ে গেছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তা গেছে ত গেছে, বিয়ের সময় আবার নূতন আংটি হবে এখন।"

রামপদ হেসে বললেন, "মা বুঝি বিয়ের ভাবনা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারছ না?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তা না ভাবলে চলবে কেন? অতবড় কাজ একটা, সে কি নিজে নিজেই হয়ে থাকবে? সই ত বড়লোক নয়, ঝট্ করে সব জোগাড় করতে পারবে না। কাজেই ছেলের বিয়ে হলেও আমারই খাটুনি বেশী পড়বে, খরচও বেশী পড়বে। আমি মনে মনে সব গুছিয়ে রাখছি। আচ্ছা, ঐ বড় সিন্দুকটা খোল দেখি।"

ঘরের কোণে এক বিশাল সিন্দুক, ডালার উপর সুন্দর খোদাই কাজ। এটার উপর বিন্ধ্যবাসিনী কাউকে কোনো জিনিষ চাপাতে দেন না, রোজ নিজে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার রাখেন। কাজেই ধুলোর রাশের তলায় কাঠের

কারুকার্য্য নষ্ট হয়ে যায় নি, নূতনের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। এর ভিতর বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী ভাল কাপড়চোপড়, গহনা, রূপোর বাসন, পাথরের বাসন সব তোলা থাকে। বাবুদের ও ছেলেদের শাল দোশালাও আছে। জায়েদেরও গহনাগাঁটি তাঁরা দিদির হাতে সঁপে নিশ্চিন্ত। এর বড় চাবিটা বিন্ধ্যবাসিনী কখনও নিজের আঁচল ছাড়া করেন না।

রামপদ মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুললেন। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "ঐ যে উপরেই যে চন্দন কাঠের গহনার বাক্সটা আছে, ঐটা নিয়ে আয়।"

রামপদ সযত্নে বাক্সটি বার করে এনে মায়ের বিছানায় নামিয়ে রাখলেন। বিন্ধ্যবাসিনী ডালাটা তুলে বললেন, "ভট্‌চাজ বামুনের বউ হলে কি হবে, এই পঁচিশ বছরে গহনা কম জমা হয় নি। শাশুড়ীঠাকরুণ অনেক দিয়েছিলেন। বড় বউ ত এল আর একটি ছেলের মা হতে না হতে চিরদিনের মত বিদায় হল। সে বউ নিয়ে ঘর করা আর তাঁর ঘটে ওঠেনি। তাই আমি খুব আদর পেয়েছিলাম তাঁর কাছে। তারপর বছর বছর পূজোর সময়ও নূতন গহনা পেয়েছি বেশ আটাশ উনত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত। পরতাম না বেশী, ঐ পূজোর সময়ই এক, আর দৈবাৎ কখনও কোনো বিয়ে বাড়ী কি বৌভাতের নেমন্তন্নে গেলে।" একজোড়া মোটা মকরমুখো বালা তুলে বললেন, "কালই যদি আশীর্ব্বাদ করে ফেলা যায় ত এইটে দেব অন্নপূর্ণাকে। এই বালা দিয়ে আমার শাশুড়ী আমার মুখ দেখেছিলেন।"

রামপদ বললেন, "সবই দেখি ঠিকঠাক মা। কিন্তু তোমার সইয়ের যদি আমাকে পছন্দ না হয়, কি বাবার যদি মেয়েটিকে পছন্দ না হয়?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "কোনোটারই সম্ভাবনা নেই। সই তোমায় না দেখেই ত প্রায় কথা দিয়ে বসেছে। আমি বলেও ছিলাম সে কথা, যে, আগে ছেলে দেখ, পছন্দ যদি হয় তবেই না বিয়ের কথা? তা বললে, 'তোমার ছেলে, এই ত ঢের, আবার দেখতে হবে কিসের জন্যে?' তবুও আমি দেখিয়েই দিচ্ছি। এসব বিয়েটিয়ের ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া ভাল নয়।"

রামপদ বললেন, "আচ্ছা মা, তোমার সব কথাই মেনে নিচ্ছি, কেবল একটি কথা আমার রাখতে হবে। আমি পাস করে চাকরিতে না ঢোকা পর্য্যন্ত বিয়েটা দিও না। এই আশীর্ব্বাদ করাই থাক এখন।"

তাঁর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর পরীক্ষা কবে?"

রামপদ বললেন, "তা এখনও বছর খানেক ত দেরি আছে। কলেজে ঢুকলাম যে বুড়ো বয়সে। এখানের টোলে বসে বসে সময় নষ্ট না করে যদি সময় মত যেতাম, তাহলে ত এতদিনে পাস করে বেরিয়ে আসতাম, চাকরিও হয়ত জুটে যেত।"

তাঁর মা বললেন, "সময় নষ্ট করা কেন বলছিস্ বাবা? এখানের পড়াও পড়া, সেখানের পড়াও পড়া। কোনটাই কম নয়।"

রামপদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "মা, তোমার গহনা বাছা হল ত বাক্সটা দাও তুলে রাখি, ঘরে আবার কে কখন এসে ঢুকবে। সব যেন ঝোঁকের মাথায় দান করে বসে থেকোনা, তোমার গহনা তোমার থাকবে, তুমি পরবে, যেমন আগে পরতে। নূতন কেউ এলে তার জন্যে নূতন গহনা হবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তা ত হবেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরানোও খানিক পাবে। আমি ত সব গহনা মনে মনে তিনভাগে ভাগ করে রেখেছি; কনকলতার একভাগ, হেমলতার একভাগ আর তোর বউয়ের একভাগ। নে, এবার তুলে রাখ্।"

রামপদ গহনার বাক্স সিন্দুকে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "কাল কিছু ঘটা করতে যেও না যেন মা, বেশী পরিশ্রমে আবার শরীর খারাপ করবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তেমন কিছুই করতে যাব না তবে নিয়মরক্ষার মত সবই করতে হবে ত? আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে, খুঁৎ কিছু রাখব না। তবে নিজে ত আর হাতে করে কিছু করব না, তা আমার পরিশ্রম হবে কেন? অন্তদের দিয়ে করিয়ে নেব।"

(৪)

রামপদর চিরকালই ভোরে ওঠা অভ্যাস। তার উপর কাল রাত্রে মোটেও তাঁর ঘুম হয়নি। মস্তিষ্ক বেশ উত্তেজিত ছিল, হাজার রকম ভাবনা মাথার ভিতর খালি বিজ্‌বিজ্‌ করেছে। না দেখা অন্নপূর্ণা বারবারই তাঁর কল্পরাজ্যের পথে ঘুরে গিয়েছে, তাকে অবশ্য একবারও ভাল করে দেখতে পাননি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে আর সহজে আসতে চায় না। শুয়ে এপাশ ওপাশ করলে হয়ত মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে, এই ভয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন, তারপর সন্তর্পণে ঘরের খিল খুলে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি, বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারদিক্। গৃহিণীদের শোবার ঘরের পিছন দিকে মাঝারি একফালি জমিতে একটি ফুলের বাগান। বেল, জুঁই, মল্লিকা, গন্ধরাজ এইসব শুভ্র সুগন্ধি ফুলেরই ছড়াছড়ি, পূজার ফুল পরের বাগান থেকে চুরি না করে নিজেদের যত্নপালিত ফুলগাছ থেকে শুদ্ধাচারে যাতে তুলে আনা যায় সেই জন্যই বিন্ধ্যবাসিনী বাগানটি করেছিলেন। নিজেই জল দেওয়া, ফুল তোলা এসব কাজ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে কনকলতা, হেমলতাও করত। দেওরদের মেয়েরাও করত কাজ মধ্যে মধ্যে, তবে ওখানে, কি করা যায়, কি না করা যায়, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল তাদের প্রতি। শুধু শুধু ফুল তুলে নষ্ট করতে বিন্ধ্যবাসিনী কাউকেই দিতেন না, বিশেষ করে পূজার ফুলের জন্য ব্যবহৃত গন্ধপুষ্পগুলিকে। তবে মধ্যে মধ্যে মেয়েদের আবদারে দু'চারটে রঙীন ফুলের গাছও লাগান হয়েছিল যেমন স্থলপদ্ম, সূর্য্যমুখী, রক্তকরবী প্রভৃতি। এগুলি ছেলেমেয়েরা ইচ্ছামত তুলতে পারত। তবে বাগান কোনোরকমে নোংরা করা চলত না।

রামপদ খিড়কির দরজাটা খুলে আস্তে আস্তে বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। ফুলের গন্ধে বাতাস একেবারে ভারি হয়ে উঠেছে। দিনের সেই গরম হাওয়াটা কেমন মৃদু আর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, গা যেন জুড়িয়ে যায়। রামপদর হঠাৎ কলকাতার বাসার নিকট নর্দ্দমার দুর্গন্ধ আর গুমোট আবহাওয়ার কথা মনে পড়ল। ভাবলেন, "আলেয়ার পিছনে ছুটছি কি না কে জানে? কষ্ট ত ঢের করলাম, অভীষ্ট ফল পাব কি না কে জানে? মায়ের ইচ্ছায় সংসারের বোঝা ঘাড়ে নিতে চলেছি, তার যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জ্জন করতে পারব কি?"

কিছুদূরেই একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল। রামপদ একটু অবাক্ হয়ে গেলেন। ভোররাত্রে এখানে আবার কে?

মা ছাড়া এত ভোরে কে উঠতে পারে? কাকীমারা কোনো কারণেই এত ভোরে ওঠেন না, এইটাই বরং তাঁদের গভীরতম ঘুমের সময়। এতবড় সংসারের সব কাজকর্ম্ম সেরে শুতে রাত হয় ত? রামপদর বোনদের মধ্যেও এত সকালে কেউ ওঠে না। তবে কি কোনো প্রতিবেশিনী বাড়ীর লোকদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে কিছু ফুল অপহরণ করতে এসেছেন? তাহলে ত সামনে পড়লে শুধু তাঁকে নয় রামপদকেও লজ্জায় পড়তে হবে।

তিনি ফিরে যাবার উপক্রম করতেই নারীমূর্ত্তিটি হন্-হন্ করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। আরে, এ ত চোর নয়, এ ত পাশের বাড়ীর নিত্যপিসী। হাতে মস্ত বড় সাজি স্তূপাকার ফুলে ভরে উঠেছে। রামপদ একটু অবাক্ হয়ে বললেন, "এত ভোরে কি করছ পিসী? আর এত ফুলই বা কেন তুলেছ? একটা গোটা মন্দির ত এতে সাজিয়ে ফেলা যায়?" সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রণামও করে ফেললেন নিত্যপিসীকে।

রামপদকে আশীর্ব্বাদ করে পিসী বললেন, "আর বাবা বল কেন? তোমার মা একবার বায়না ধরলে আর ত ছাড়ে না? মন্দির সাজাবারই ব্যাপার প্রায়। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তার ঠাকুর ঘর ভাঁড়ার ঘর ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করতে হবে। আলপনা দিতে হবে, ঘর, বিগ্রহ সব ফুলের মালায় সাজাতে হবে, ধান দুর্ব্বো চন্দন সব ঠিক করে রাখতে হবে। একা হাতে এত করতে হলে সময় লাগে বৈকি? মেজবউ বলে অবিশ্যি মেয়েগুলোকে

সঙ্গে নিতে ত, তাদের সব আরামের দেহ, ওরা কি আমার মত শেষ রাতে উঠে ডুব দিয়ে কাজ আরম্ভ করবে? তাই নিজেই করছি, পরে যদি কেউ আসে তখন দেখা যাবে।"

রামপদ বললেন, "বড় কষ্ট হল ত তোমার পিসী? মায়ের সব তাতে এতও ঘটা। না হয় শাদামাটা ভাবেই হত।"

বিধবা বললেন, "সে হবার জো নেই বাবা তোমার মায়ের কাছে। তায় তুমি তার প্রথম সন্তান, একমাত্র ছেলে, নিজে খুঁজে পেতে তোমার জন্যে সাগর সেঁচা মানিক আনছে। এ কাজে কি কখনও খুঁৎ থাকতে দেয় সে? আর সে বললে আমি না করেও পারিনা, তারই দয়ায় বেঁচে আছি, না হলে দাঁড়াতাম কোথায়?"

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে রামপদ বললেন, 'মা বুঝি এরই মধ্যে সবাইকে সব বলে বসে আছেন? নেমন্তন্ন আমন্ত্রন করাও হয়ে গেছে নাকি?"

নিত্যপিসী বললেন, "না বাবা, বাড়ীর দেওর জাদের শুধু বলেছে কাল রাত্তিরে, ছেলেপিলেরাও জানে না। তোমার বাবা ত না করেনা কখনও মেজবউয়ের কথায়, সেও ত মত দিয়ে বসে আছে।"

রামপদ বললেন, "বাবা ত মেয়ে দেখেনই নি এখনো।"

"নাই দেখলেন, মেজবউ যাকে সুন্দর বলেছে সে সুন্দর না হয়েই যায় না।"

আর কি কথাই বা বলা যায়, মাতৃস্থানীয়া মহিলার সঙ্গে? রামপদ বললেন, "আমিও যাই, স্নানটা করে আসি। এখন ঘাটটা নিরিবিলি পাওয়া যাবে। বেশী রোদ উঠে গেলে আর পুকুরের ঘাটে বেশীক্ষণ থাকতে ভাল লাগেনা," বলে তিনি ঘরে গিয়ে নিজের ধুতি গামছা নিয়ে পুকুরের দিকে চললেন। বন্ধুবান্ধবদের কানে এ কথা যাবার আগে স্নানটান করে ঘরে ফিরে আসা ভাল। নইলে ঠাট্টা তামাসা এত শুনতে হবে যে মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হবে না। আশ্চর্য্য যা সব রসিকতা, তা সব সময় সহ্য করা সম্ভব হয় না।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আর সাঁতার কেটে শরীরটা স্নিগ্ধ করে রামপদ বাড়ী ফিরে এলেন। তখন সকলেই প্রায় উঠে পড়েছে, মেজকাকীমার ছোট ছেলে বিষ্ণুপদ দূর থেকে রামপদকে দেখেই ছড়া কাটতে আরম্ভ করল, "খোকন মোহন চৌধুরী, বউটি হবে সুন্দরী।"

রামপদ কিছু বলার আগেই কনকলতা ছুটে এসে বিষ্ণুর কানটা টেনে ধ'রে বলল, "কের বাঁদরামি? মা বলেছেন, না যে এখন চেঁচামেচি ক'রে লোক জানাজানি করতে হবে না?"

বিষ্ণুপদ রেগে এক ঝটকায় কানটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ভারি দশমাসের বড় মহাগিন্নী দিদি হয়েছেন রে! তুই কথায় কথায় আমার কানে হাত দিবি কেন রে?"

এরপর দুজনের মারামারি লাগা অনিবার্য্য। রামপদ দ্রুতপদে কাছে এসে তাদের থামিয়ে দিলেন। "আচ্ছা, বড় হওয়ার গৌরব ত খুব আছে দেখি। কিন্তু কথায় কথায় রুপী বাঁদরের মত খামচা-খামচি লেগে যায় কেন?"

দাদার কথার অবাধ্য হওয়া চলেনা। বিশেষ কলকাতাবাসী ইংরিজি পড়া দাদা। কাজেই কান এবং চুল ছেড়ে দিয়ে দুজন সরে দাঁড়াল, তবে রামপদ পিছন ফিরতেই পরস্পরকে মুখ ভেঙিয়ে এবং কলা দেখিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেল।

মায়ের ঘরের কাছে এসে রামপদ দেখলেন ঘরগুলি প্রায় আর চেনাই যায় না। এক সারির তিনখানি ঘর বিন্ধ্যবাসিনীর দখলে। সবচেয়ে বড়টি তাঁর শোবার ঘর, তারপরেরটি তাঁর পূজার ঘর এবং আংশিকভাবে তাঁর ভাঁড়ার ঘরও বটে। সব ছোট ঘরটি এখন দুর্গাপদ তাঁর কাজকর্ম্মের জন্য ব্যবহার করেন, বাইরের বড় বৈঠক-খানায় গিয়ে কাজ করা অসুস্থতার জন্যে তাঁর সব সময় সম্ভব হয় না। এখানের একটি নীচু ছোট তক্তপোশে, শতরঞ্জি বা মাদুর পেতে অনেকসময় বিশ্রামও করেন, পা মালিশ করান, স্নানের আগে সর্ব্বাগ্রে তেল মাখেন চাকরের সাহায্যে।

রামপদ দেখলেন, আজ কিন্তু ঘরগুলির আটপৌরে চেহারা বদলে গেছে। সব জায়গায় উৎসব-সজ্জা। বড় ঘরটি ঝক্‌ঝক্ করছে, জিনিষপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে,

বড় খাটও বার করে ফেলা হয়েছে। ঘরজোড়া নতুন মাদুর আর পাটি পাতা, মাঝখানে বাড়ীর কর্তাদের আমলের একটি গালিচা পাতা। দরজার গোড়ায় অনেকখানি জায়গা আলপনাচিত্রিত, এখনও ভাল করে শুকোয় নি। চারদিকের দেওয়ালে লম্বা করে ফুলের মালা ঝোলান। দরজায় পূর্ণঘট আর আমের পাতা। ঠাকুরঘরটিকে একেবারেই মন্দিরের মত করে সাজান হয়েছে। ফুলের গন্ধ, চন্দন ধূপের গন্ধে ঘরের ভিতরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। দুর্গাপদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছেন। শরীর তেমন ভাল নেই, দরকারের সময়ের আগে উঠে নিজেকে ক্লান্ত করতে চান না।

রামপদর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিন্ধ্যবাসিনীও ঘরে এসে ঢুকলেন। আজকে হেঁটে চলে বেড়াবার অনুমতি তিনি আদায় করেছেন কবিরাজমশায়ের কাছ থেকে। স্নান সারা হয়েছে, খুব চওড়া লাল পাড়ের শাড়ী পরেছেন। অসুখে পড়ে গহনা-গাঁটি সব খুলে রেখেছিলেন, আজ দুর্গাপদর কথায় সবগুলি আবার পরেছেন। ছেলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে একটু লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, "তোর বাবার কথায় আবার সং সাজতে হল রে, কিছুতেই উনি ছাড়লেন না। আমার নইলে ইচ্ছা ছিল না, সই বিধবা মানুষ তার সামনে এত গয়নাগাঁটি পরা একটু বেমানান দেখায়।"

পাশের ঘর থেকে নিত্যপিসী বললেন, "ও আবার কি কথা? তার অদৃষ্টে ছিল তাই বিধবা হয়েছে, তা বলে তুমি এয়োরাণী ভগ্যিমানি, তুমি পরবেনা কেন? না পরলেই বরং নিন্দে করে লোকে।"

বিন্ধ্যবাসিনী এবার রামপদর দিকে ফিরে বললেন, "তুই ছোট ঘরে গিয়ে কাপড়চোপড় বদলে আয়, এই আধময়লা ধুতিতে চলবে না। সব আমি ওঘরে সিন্দুকের উপর গুছিয়ে রেখে এসেছি।"

রামপদ পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন সিন্দুকের উপর তাঁর কাপড়, জামা, উড়ুনি সব পরিপাটি করে সাজান। বেশ পরিবর্তন করে, চুলটা ভাল করে আঁচড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর মা বললেন, "যা, জলটল যা খাবার খেয়ে নে। এরপর অনেক পর্ব্ব, ভাত খেতে আজ বেলা গড়িয়ে যাবে। সইরা এসে পড়বে অল্পক্ষণের মধ্যেই। আমি সকাল সকাল স্নান সেরে চলে আসতে বলেছি। বেশী রোদ উঠে গেলে মেয়ের মুখ চোখ শুকিয়ে যাবে। ওমা, ঐ যে ওরা এসে পড়েছে।"

রামপদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। মেজ কাকীমা আগে আগে আসছেন, তাঁর পিছন পিছন আরও দুটি স্ত্রী মূর্ত্তি। মা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "এস ভাই এস, এস মালক্ষ্মী এস। ভালই করেছ আগে এসে পড়ে, যা চড়া রোদ। হেঁটেই এলে নাকি?"

অগ্রবর্ত্তিনী বিধবা মহিলা বললেন, "না ভাই, হেঁটে আসিনি। ঠাকুরপোর গরুর গাড়ীটা হাটে যাচ্ছিল তরকারি নিয়ে, তাতেই উঠে পড়লাম, রোদে কোনো কষ্ট হয়নি।"

রামপদ চেয়ে দেখলেন, না দেখে পারলেন না, কে যেন তাঁর মাথাটা জোর করে দরজার দিকে ঘুরিয়ে ধরে রাখল। সামনে সাদা থান পরা বিধবামূর্ত্তি। গায়ের রং বেশ ফরশা, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, স্নানসিক্ত চুলের গোছায় ইতিমধ্যেই রূপোর তারের মত সাদা চুল ঝকঝক্ করছে। আর তাঁর পিছনে কে এ?

রামপদর মনে হল যেন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের ছবি দেখছেন তিনি। কিশোরী লক্ষ্মী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। একটি রক্তপদ্মের পাপড়ির রংএর বালুচরী শাড়ী তার তনুদেহটি বেষ্টন করে রয়েছে। হাতে একগোছা গন্ধরাজ ফুল। বিপুল অবিন্যস্ত চুলের রাশ তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে গোড়ালীর কাছ অবধি লুটিয়ে পড়েছে। চোখে চকিত ভয় মিশ্রিত কৌতূহলের চাহনি। রামপদর দৃষ্টির সঙ্গে সেই চাহনি একবার মিশে গেল, তারপরই মাটির দিকে নেমে পড়ল। বিন্ধ্যবাসিনীকে অবনত হয়ে প্রণাম করতেই তিনি অন্নপূর্ণাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে রামপদকে বললেন, 'সইমাকে প্রণাম কর বাবা, আর মালক্ষ্মী তুমি

ফুলগুলি ঐ ঠাকুর ঘরে রেখে এস, না হলে হাতের তাপে শুকিয়ে উঠবে।"

অন্নপূর্ণার মা রামপদর মাথায় দুইহাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, "তোমার ছেলে তা আর কাউকে বলে দিতে হবেনা ভাই, একেবারে তোমার মুখ বসান। আন্নু, এই যে এদিকে, এঁকে প্রণাম কর।" হতবুদ্ধি রামপদ অতি অপ্রস্তুত ভাবে অন্নপূর্ণার প্রণাম নিয়ে তাড়াতাড়ি পাশের ছোট ঘরে ঢুকে গেলেন। বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে মনে হচ্ছে। মেয়েটিকে অন্ততঃ একটা প্রতি-নমস্কার ত করা উচিত ছিল?

বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে ডেকে বললেন, "কর্তাকে এঘরে উঠে আসতে বল। আর ওঁর বসবার চৌকিটাও এঘরে নিয়ে এস, উনি ত মেঝেয় বসতে পারবেন না।"

দুর্গাপদ কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর রামপদর কাঁধে হাল্কা করে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। বিন্ধ্যবাসিনী তাড়াতাড়ি চৌকিটা রামপদর হাত থেকে নিয়ে পেতে দিলেন। দুর্গাপদ তাতে বসে পড়ে বললেন, "এই বাতের জ্বালায় আমার আর ভদ্রসমাজে চলাফেরার জো নেই। একেবারে খোঁড়া হতে বসেছি।"

নিজের আধিব্যাধির কথা আরম্ভ করলে দুর্গাপদ সহজে থামেন না। বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "এই যে, সই তোমায় নমস্কার করছে।"

অন্নপূর্ণার মা অবনত হয়ে তাঁকে নমস্কার করলেন। দুর্গাপদ প্রতিনমস্কার করে বললেন, "বহুদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল। তা আসতে রোদে কোনো কষ্ট হয়নি ত?"

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে জানালেন, না, তাঁদের কোনো কষ্টই হয়নি।

রামপদর মা ডেকে বললেন, "কনক, অন্নপূর্ণাকে পুজোর ঘর থেকে আন ত, কর্তাকে প্রণাম করে যাক।"

কনকলতার সঙ্গে অন্নপূর্ণা পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবার চোখের দৃষ্টি একেবারে মাটির দিকে অবনত, কারো দিকে তাকাচ্ছেনা সে। নির্দেশমত গিয়ে দুর্গাপদকে প্রণাম করল। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে, দুর্গাপদ তার মুখখানা এক হাতে তুলে ধরে ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, "এ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা। আচ্ছা মেজবউ, এবার পুরোহিত মশায়কে ডাকতে পাঠিয়ে দাও, আর সব জোগাড়যন্ত্র কর। বেয়ান ঠাকরুণ, আজ এখানেই থেকে যেতে হচ্ছে। ফিরবার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। বেশী রাতও হবে না কোনো কষ্টও হবে না। মেজবউ, নিত্যকে বল, এর জন্য রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করতে।"

অন্নপূর্ণা কনকলতার সঙ্গে আবার ঠাকুরঘরে ঢুকে গেল। রামপদ মায়ের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা রান্নাঘরে আশ্রয় নিলেন।

সেখানে তখন মহা হট্টগোল বেধে গিয়েছে। প্রাতরাশ খাওয়ার বদলে সব ক'টি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গলা ছেড়ে গোলমাল করছে। মেজগিন্নী তাদের খাওয়াবেন না চুপ করাবেন, ভেবে পাচ্ছেন না, ছোটগিন্নী যে কোথায় উধাও হয়েছেন, তার ঠিকানাই নেই।

এরমধ্যে ছোট হেমলতা হাত নেড়ে বলে উঠল, "সবাই খালি হাঁ করে চেঁচাবে না খাওয়া সারবে? পুরুত ঠাকুর ত আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন, আশীর্বাদ ত তখনি আরম্ভ হবে। এইরকম ভূত সেজে সব যাবে নাকি? চান করতে হবে না, চুল বাঁধতে হবে না, শাড়ী পালটাতে হবে না?"

একেবারে মন্ত্রের মত কাজ হল। মেয়ের দল হুড়-মুড় করে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা ধীরে সুস্থে তাদের পিছন পিছন বেরিয়ে নিজের নিজের ঘরের দিকে চলল এবং ধুতি গামছা সংগ্রহ করে পুকুরের ঘাটের দিকে অগ্রসর হল।

মেয়েদের ঘাটে তখন পুরোপুরি ভীড় জমে উঠেছে। গ্রামে এমন হঠাৎ উৎসব বড় একটা লাগে না। কোনো ক্রিয়াকলাপ হবার আগে মাস দুই ধরে তার আলোচনা সমালোচনা হতে হতে সেটা সকলের কাছে ভাত জলের সামিল হয়ে যায়। এ ব্যাপারটা যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত সবাইকে চকিত করে তুলল। কোথায় সবাই আহা-

উহ্ করছিল রামপদর দুঃখে, মায়ের এমন শক্ত অসুখ বলে, না দিন শেষ হতে না হতে তার বিয়ের ধুম লেগে গেল? তাও আবার এমন মেয়ের সঙ্গে যাকে আগে তারা কেউ দেখেনি, আর যার তুল্য সুন্দরী নাকি এ তল্লাটে কখনও পদার্পণ করেনি। গিয়ে চোখের দেখা ত সবাই দেখবে, তারপর বড়মানুষ চৌধুরীরা তাদের খেতে বলুক বা নাই বলুক।

এক বাড়ীতে বসে বরকনে দুজনেরই একসঙ্গে আশীর্ব্বাদ! এও বিচিত্র ব্যাপার। কিন্তু অবস্থাগতিকে তাই করতে হচ্ছে। রামপদ দু-একদিনের মধ্যে চলে যাবেন, খুব শীগ্‌গির আর গ্রামে আসছেন না, আর তাছাড়া তাঁর মা বাবা দুজনেই অসুস্থ রয়েছেন, গ্রামের বাইরে কোথাও অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্নপূর্ণার মাও এত দরিদ্র আর পরনির্ভর, যে তাঁর পক্ষে যথোপযুক্ত ঘটা সহকারে আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা করা খুবই দুরূহ আর সময়-সাপেক্ষ। সুতরাং এই ব্যবস্থাই হল। পুরোহিত মশায়ের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর কথাবার্ত্তাও হয়ে গিয়েছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর বড় ঘরেই আসর বসল। বাড়ীর সব বড়রা সেখানে এসে জমা হলেন। ছেলেপিলের দল আর পাড়া প্রতিবেশীর দল, দুধারের দুটো ঘরে আর সামনের চওড়া বারান্দায় গুঁতোগুঁতি করে স্থান করে নিলেন। শিশু কোলে কয়েকজন ভদ্রমহিলা ছেলে সামলাতে অস্থির হয়ে উঠলেন, তারা গরমে খালি চিৎকার করতে লাগল। তাদের সুরে সুর মেলাল মাঙ্গলিক শঙ্খ।

দুর্গাপদ প্রথম অন্নপূর্ণাকে আশীর্ব্বাদ করলেন কপালে চন্দন কুঙ্কুমের টিপ দিয়ে, মাথায় ধান দুর্ব্বা দিয়ে। তার পর বিন্ধ্যবাসিনী এগিয়ে এসে মোটা বালা দুগাছি পরিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। অন্নপূর্ণার কোমল হাতে পাকা সোনার বালা যেন রং এ রং মিশে গেল। তারপর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা শিশু সকলের মিশ্রিত কোলাহলে কারো আর বুঝতে বাকি রইলনা যে এটা উৎসবের বাড়ী

এরপর অন্নপূর্ণাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল অন্য ঘরে। রামপদকে এনে বসান হল। আশীর্ব্বাদ করলেন অন্নপূর্ণার মা, আর তার কাকা কাকীমা, যাঁদের বাড়ী তাঁরা এসে উঠেছিলেন। অন্নপূর্ণার মা ফিশ্‌ফিশ্‌ করে বিন্ধ্যবাসিনীকে বললেন, "খালি হাতে সোনার চাঁদকে আশীর্ব্বাদ করব না ভাই। এই এক কুচি সোনা মাত্র ঘরে ছিল, তাই দিলাম।" বেশ বড় আর ভারি একটি সিল আংটি তিনি ভাবী জামাইয়ের হাতে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

শুভ শঙ্খধ্বনির সঙ্গে আশীর্ব্বাদ পর্ব্ব শেষ হল। এর-পর কোলাহল আরো দ্বিগুণ হয়ে উঠল। সবাই চায় কনেকে দেখতে। হেমলতা আর কনকলতা রক্ষাকর্ত্রীর মত তাকে দুদিক্ দিয়ে আগলে রাখল।

ক্রমশঃ

তন্ত্রাচার্য স্যার জন জর্জ উঠ্‌রফ

হারাধন দত্ত

ভারত সভ্যতা বহু পুরাতন। সভ্যতার প্রাণপ্রবাহ সকলদেশের মত এদেশেও একটানা চলেনি। তার গতিচ্ছন্দ মাঝে মাঝে অজ্ঞানতার মরুপ্রান্তরে দিকভ্রান্ত হয়েছে। তমসাচ্ছন্ন জীবনের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ভারত তার অতীত গৌরবকে বারে বারে ভুলেছে। অষ্টাদশ শতক ভারত ইতিহাসে সেই বিস্মরণের কাল। কিন্তু এই শতকেই আবার ভারত-আত্মার পুনর্জন্ম। পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার তড়িতস্পর্শে দেশ ও জাতি নব সূর্যোদয়ের পথে পদসঞ্চার করে। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা অনেক নূতন পথের সন্ধান দেয়—ভারতবিদ্যাচর্চা বোধ করি তাদেরই একটি। ভারতচর্চার উষালগ্ন অষ্টাদশ শতক থেকে। ভারতচর্চার ফলে নিদ্রিত দেশবাসীর কেবল-মাত্র আত্মসমীক্ষা বা জ্ঞানবৃদ্ধিই ঘটেনি—ভারতসংস্কৃতির নূতন মূল্যায়নের ফলে—নবচেতনার তরঙ্গ বিশ্বচিত্তকেও প্রতিহত করে। বিদেশী ভারতসাধকেরাই এরূপ চর্চার পথিকৃৎ—পরে ভারতীয় পণ্ডিতেরাও তাদের সহযাত্রী হয়েছেন। গতযুগের বাংলাদেশে যে জাগরণের ঢেউ এসেছিল—তাঁর সূচনাতে ছিল এঁদের সাধনা। স্যার জন জর্জ উডরফ এমনই একজন ভারতসাধক।

ইংরেজ শাসন সূত্রেই উড্‌রফের ভারতে আগমন। পিতা জে. টি. উড্‌রফ অনেক আগে থেকেই কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি ও এ্যাডভোকেট জেনারেল-রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। স্যার জন উড্‌রফও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইনজ্ঞ ও বিচারক হিসেবে স্মরণীয় নজির স্থাপন করেন—অর্থ-যশ ও পদ-গৌরব সবই লাভ করেন এই পথে। কিন্তু এই পরিচয়েই উড্‌রফের কর্মজীবন নিঃশেষিত হয়নি। অর্থ ও রাজকীয় পদগৌরব নিয়ে তিনি অন্য ইংরেজ সন্তানদের মত দেশে ফিরে যাননি। এ্যাডভোকেট-ব্যারিষ্টার ও বিচারপতিরা হয়ত আজও তাকে জানেন অসাধারণ আইনজ্ঞ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিচারক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আইন-গ্রন্থ প্রণেতারূপে। কিন্তু এদেশে তাঁর মহত্তম পরিচয় ভারত-হিতৈষীরূপে। ভারতের অতীত সভ্যতা—হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের নিষ্ঠসাধক ও অনুরাগীরূপে তিনি এদেশে পূজার্হ। ভারতবর্ষের প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে যে কজন ইংরেজ এদেশে এসে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে জানবার চেষ্টা করেছেন—স্যার জন উড্‌রফ নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। তন্ত্রকে বলা হয় পঞ্চমবেদ। তন্ত্রধর্ম ভারতীয় সাধনার অন্যতম প্রাচীন শাখা। ভারতীয় সাধনায় ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি। এদেশে ধর্ম জীবনেরই অঙ্গ। ধর্ম জীবনকে কিভাবে সুন্দর স্বচ্ছন্দ ও মধুর করে তুলতে পারে ওসবেরই বিস্তৃত নির্দেশ আছে শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে। এ ব্যাপারে বোধ করি তন্ত্রশাস্ত্র আর সব শাস্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে। তথাপি তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে নানা অপবাদ প্রচারিত ছিল। গত শতকে ইংরেজী শিক্ষিত কৃতবিদ্য অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রকে অবজ্ঞা করেছেন। ফলে কেবল দেশেই নয় পাশ্চাত্য রাজ্যেও তন্ত্রের প্রতি একটা ঘোর বিতৃষ্ণা ও সংশয়ের ভাব বিদ্যমান ছিল। তন্ত্র সম্পর্কে নানা আজগুবি ও বীভৎস কাহিনী প্রচলিত ছিল। গতযুগে এদেশের কৃতবিদ্য সাহিত্যসেবী ও চিন্তাবিদদের অনেকেই তন্ত্রের মহত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হননি। সেই অবজ্ঞাত তন্ত্রশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে উড্‌রফ তার মহিমা প্রচার করেন। উড্‌রফের প্রচেষ্টার ফলেই জগতের সর্বত্র শিক্ষিত ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতাকে

বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। উডরফ বেদান্ত-বিহিত হিন্দুধর্ম, হিন্দুসভ্যতা ও ভারতমাতার একনিষ্ঠ ভক্ত। বেদান্ত উপনিষদ ও আগমশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি তন্ত্রসম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ প্রচার করে ভারতের ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে ও পাশ্চাত্য রাজ্যে তন্ত্রের প্রতি যে ঘোর বিতৃষ্ণা ও সংশয় সৃজন করেছিল—তা বহুল পরিমাণে অপনোদন করতে সক্ষম হন। শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি ভারতের তন্ত্রশাস্ত্রকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন—তা কম গৌরবের নয়। তন্ত্রশাস্ত্রের জন্য ত বটেই—ভারত-হিতৈষণার বহুশাখায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারত-বিদ্যাপথিক মহানুভব উডরফকে প্রদক্ষিণ করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

উডরফ তন্ত্রশাস্ত্রের যে গম্ভীরতর তত্ত্ব ও দার্শনিকতার দিকটি উদ্‌ঘাটন করেছেন সে বিষয়ের মূল্যায়ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনের দ্বারাই সম্ভব। বক্ষ্যমান আলোচনায় ভারতসাধক উডরফের কথঞ্চিৎ পরিচয় উপস্থিত করা আমাদের লক্ষ্য। সেই সূত্রেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাসের প্রয়োজন। জন জর্জ উডরফ ইংলণ্ডের সেণ্ট-গ্রেগরীর অধিবাসী, পিতা জেমস্ টিসডল উডরফ, মাতা-ফ্লোরেন্স। মাতামহ জেমস্ হির্ডস। উডরফের পিতা জি. টি. উডরফ বাংলাদেশের এ্যাড-ভোকেট জেনারেল, ভারত সরকারের legal member এবং অগ্রগণ্য ব্যবহারজীবি হিসেবে এদেশে অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। তিনি পরে জে. পি ও নাইট উপাধি লাভ করেন। জন উডরফের জন্মলগ্ন ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৬৫। 'উডবার্ণ পার্ক' স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে উডরফ 'অক্সফোর্ডে প্রবেশ করেন। এখান থেকেই তিনি 'জুরিসপুডেন্সে' এম. এ. ও বি. সি. এল অর্জন করেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উডরফ ইনার টেম্পল' থেকে ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন। এর পরেই জন উডরফ পিতার কর্মস্থল কলকাতায় চলে আসেন জীবিকার সন্ধানে। ১৮৯০ সালে উডরফ কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টাররূপে তালিকাভুক্ত হন। খ্যাতিমান পিতার মতই তিনিও অচিরে কলকাতা হাইকোর্টের একজন অগ্রগণ্য ব্যবহারজীবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, ব্যবহারজীবি সমাজে উডরফের এই খ্যাতির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একজন "ফেলো" হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উডরফ "টেগোর ল প্রফেসরের" পদ লাভ করেন। ঠাকুর আইন অধ্যাপক হিসেবে তাঁর বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু ছিল, "বৃটিশ ভারতে রিসিভার নিয়োগ প্রথা", এই বক্তৃতামালা পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ দেশের আইন-জগতের দিকপাল ও সুপণ্ডিত স্বর্গীয় আমীর আলীর সহযোগীরূপে Civil Procedure in British নামক বহুল প্রচারিত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি একাধিক প্রামাণ্য আইনগ্রন্থ প্রণয়ন করে প্রভূত অর্থ-যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে উডরফ তদানীন্তন ভারত সরকারের "ষ্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল" নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন এবং এই পদে তিনি ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত বহাল থাকেন। ১৯১৫ সালের দিকে তিনি কিছুকালের জন্য অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এবৎসরেই উডরফ 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। আরও পরে স্যার ও ডি. এল উপাধি অর্জন করেন। উডরফ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯২২ সালে। এ বৎসরেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩ সালে তিনি 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় রীডাররূপে যোগদান করেন। এখানে তিনি অধ্যাপনা করেন ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত। ১৯৩৬ সালের ১০ই জানুয়ারী ফরাসীদেশের মণ্টেকার্লো নামক স্থানে পক্ষাঘাত রোগে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এর তিন-দিন আগেই উডরফ বন্ধু ও সতীর্থ অটলবিহারী ঘোষও ইহলোক ত্যাগ করেন। এটুকুই স্যার জন জর্জ উডরফের ঘটনাদীপ্ত জীবন।

উডরফ জীবনের এই ঘটনাগুলির মধ্যে একজন

পারদর্শী প্রতিভাদীপ্ত বৃটিশ-শাসক প্রতিনিধির পরিচয় মিলবে। বহিরঙ্গ সকল জীবনের দিক থেকে উডরফ জীবনের এই পরিচয় বৃটিশ জাতির পক্ষে কম গৌরবের নয়। তথাপি প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি, খ্যাতকীর্তি বিচারক, এবং ভারতীয় আইন-বিশেষজ্ঞ গ্রন্থপ্রণেতা উডরফ এদেশে পূজিত হবেন অন্য কারণে। ভারতবর্ষ ও তার জনসাধারণকে তিনি গভীরভাবে ভালবেসে-ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে তিনি এ-দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতলগভীরে ডুব দিয়ে-ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রকে গভীর নিষ্ঠায় আয়ত্ত করে তিনি এদেশের অতীত সভ্যতা সংস্কৃতি ও হিন্দুদর্শনের প্রায় বিস্মৃত এবং অনাদৃত অধ্যায়কে আলোকদীপ্ত করেন। এবিষয়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি তন্ত্রব্যাখ্যা। উডরফের পূর্বে অধিকাংশ বিদেশীই তাঁদের অজ্ঞতাহেতু তন্ত্রকে হীনবৃত্তির পরিপোষক, একপ্রকার কুসংস্কার বলে চিত্রিত করেছেন। ১৯০৭ সালে জনৈক ইংরেজলেখক তন্ত্রকে আসাম ও পূর্ববঙ্গের ম্যালেরিয়া-পীড়িত জনসাধারণের বিকৃত মনোভাবের ফল—এইরূপ অভিমত প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি। এদেশে ও বিদেশে অনাদৃত তন্ত্রধর্মের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গ দার্শনিকতত্ত্ব ও প্রতিভার স্ফূর্তি বিদ্যমান—উডরফ এই আবিষ্কারে প্রথম নাবিক। এখানেই উডরফের অমরত্ব।

হাইকোর্টের কর্মজীবনে তন্ময় উডরফ জীবনের এই পার্থিব সাফল্যে তৃপ্ত হননি। তাঁর আত্মায় ছিল ভূমার তৃষ্ণা। দূর সমুদ্রের আহ্বানে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন আরণ্যক ঋষির দেশ ভারতবর্ষে। ভারতের সাহিত্য ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি তাঁর অধীর জিজ্ঞাসা ছিল। হাইকোর্টের কর্মজীবনের এক বিশেষ লগ্নে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিধান সমূহে কৌতূহলী হন—বিশেষ করে তৎকালে নিন্দিত তন্ত্রসাধনার প্রতি ঔৎসুক্য বাড়ে। সে সময়ে হাইকোর্টের দোভাষী হরিদেব শাস্ত্রীর কাছে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পাঠগ্রহণে ব্যস্ত। এই মাহেন্দ্রক্ষণে সাক্ষাৎ পেলেন স্মলকজ্ কোর্টের প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী অটলবিহারী ঘোষের। অটল-বিহারী তন্ত্রপ্রেমিক। তিনি ইতিমধ্যেই "আগম অনু-সন্ধান সমিতির" প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত হয়েছেন। পরে উডরফ এই "আগম অনুসন্ধান সমিতির" বিশিষ্ট সভ্যে পরিণত হলেন। আগম-নিগম সাধন-পদ্ধতির বিভিন্ন ধারায় জ্ঞানলাভ করলেন—অনেক তন্ত্রবিদ মাতৃসাধকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। হরিদেব শাস্ত্রী আর অটলবিহারীর কাছেই উডরফ জানলেন তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক। উডরফ চাইলেন শিবচন্দ্রের কাছে দীক্ষা নিতে। তিনি শিবচন্দ্রের সান্নিধ্যলাভে তৎপর হলেন। শিবচন্দ্র তখন কাশীধামের অধিবাসী। বাঙালীটোলার অধীন পাতালেশ্বরের এক বাটীতে শিবচন্দ্রের সাধনা-ক্ষেত্র, সর্বমঙ্গলা আশ্রমের সম্পাদক। আর উডরফ কলকাতায় ক্যামাক ষ্ট্রীটের বাসিন্দা। হরিদেব শাস্ত্রীর নির্দেশকে অঙ্গীকার করে, উডরফ সুদূর বারাণসীধামে উপস্থিত হয়ে শিবচন্দ্রের কাছে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু শিবচন্দ্র প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে দীক্ষা দিলেন না। ভারতের বিভিন্ন তন্ত্রপীঠ ও সিদ্ধ তান্ত্রিক সন্দর্শনের পরামর্শ দিলেন উডরফকে। উডরফের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা বোধহয় উদ্দেশ্য। যাহোক সাধুসঙ্গ ও সৎ প্রসঙ্গ শেষ করে উডরফ শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণে অভিলাষী হলেন। উডরফের এই তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন হরিদেব শাস্ত্রী। শিবচন্দ্রের নির্দেশে উডরফ হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের অসংখ্য পুঁথি সংগ্রহ করে পঠন-পাঠনে মনোনিবেশ করলেন। উডরফের ইচ্ছা পূর্ণ হল এবার। উডরফ ও তদীয় পত্নী এলেন উডরফকে শুভদিনে ও শুভলগ্নে শিবচন্দ্র তন্ত্রোক্ত বিধান ও কর্ণ দীক্ষিত করে শাক্তাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উডরফের এই শিষ্যত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিবচন্দ্রের সহপাঠী, বন্ধু ও স্বগ্রামবাসী সাহিত্যসেবী জলধর সেন উডরফ বিয়োগে লিখেছেন "প্রথমে তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই তিনি অসাধারণ উৎসাহ আগ্রহ ও নিষ্ঠা

সহকারে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করে। সেকার্য্যে তাহার গুরু হইয়াছিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।" পণ্ডিত রাধাবিনোদ বিদ্যাবিনোদ একটি প্রবন্ধে উডরফের শিষ্যত্বগ্রহণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তন্ত্রচর্চার যে ক্ষেত্র তিনি এতদিন কর্ষণ করে চলেছিলেন—শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর উড্রফের তন্ত্রাভিলাষী মানসভূমি আরও উর্ব্বর হয়। শিবচন্দ্রের দীর্ঘশিক্ষায় তাঁর প্রসুপ্তচিত্ত জ্যোতিষ্মান হয়। অতঃপর তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্ববিশ্লেষণে লেখনীধারণ করেন। শিবচন্দ্রের 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থখানির দুভাগই Principles of Tantra নামে ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করে গুরুদক্ষিণা দেন। উড্রফ শিবচন্দ্রের গ্রন্থগুলি প্রকাশের ব্যাপারে অর্থ-সাহায্য করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শিবচন্দ্র ও তার পরিবারবর্গকে নানাভাবে অর্থসাহায্য করেছেন, চিঠিপত্রদ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। শিবচন্দ্রের পরলোকগমনের পরও এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। অবসর গ্রহণের পর উড্রফ যখন ইংলণ্ডবাসী তখনও গুরুপত্নী ও পুত্রগণের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র ইহজীবন ত্যাগ করিলে কলকাতায় রসরাজ অমৃতলাল বসুর পৌরোহিত্যে যে শোকসভা হয়—উড্রফ সে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন। এরপর বিষাদক্লিষ্ট উড্রফ গুরুদেবের শিষ্য ও ভক্তগণদের নিয়ে এক ঘরোয়া সভার আয়োজন করেন। সভায় উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে ছিলেন "আগম অনুসন্ধান সমিতির" অটলবিহারী ঘোষ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চৌধুরী, ফরিদপুরের ভুলুয়াবাবা (কালীদাস ঘোষ) ভোলানাথ মজুমদার কাব্যবিনোদ, ঢাকায় আনন্দঋষি মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। এ-সভায় শিবচন্দ্রের সাধনজীবন ও তন্ত্রধর্ম নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। পরে অশৌচান্ত শ্রাদ্ধদিবসে উড্রফ হরিদেব শাস্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় সাধক ও সদব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে বিবিধদান ও ভোজনাদির ব্যবস্থা করেন। আবার উড্রফের লোকান্তর প্রাপ্তি সংবাদ এদেশে পৌঁছিলে শিবচন্দ্র প্রবর্তিত কুমার-খালির সর্ব্বমঙ্গলা সভা এক শোকসভার আয়োজন করেন। কুমারখালির সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর নিত্যপূজার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন উডরফ। বিলেতে প্রত্যাবর্তন করার পরও সে ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। কুমারখালির কৃতজ্ঞ জনসাধারণ উড্রফের শোকসভায় শোকোচ্ছ্বাস-মূলক যে দীর্ঘসঙ্গীতটি পরিবেশন করেন—তার প্রথম দুটি লাইন এইরূপ—

ধন্যজীবন পুণ্যশ্লোক স্যার জন উড্রফ অভিমান!
বোধনে করি বিজয়াসাঙ্গ করিলে কেন মহাপ্রস্থান?

ইত্যাদি

উড্রফ শিবচন্দ্র প্রসঙ্গ দীর্ঘ। এখানে তার সর্ব্বাঙ্গীন বিবরণ সম্ভব নয়। উড্রফ জীবনের ভারত-চর্চা ও হিন্দুসাধনার অধ্যায়ে শিবচন্দ্র একটি অবিচ্ছেদ্য নাম। সেজন্যই উড্রফ চরিত্র ব্যাখ্যানে এই শিবচন্দ্র প্রসঙ্গ।

তান্ত্রিকসাধনা ও তন্ত্রচর্চা ভারতধর্মের একটা সুপ্রাচীন পথ। পরাধীনতা জর্জর এবং সংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর অজ্ঞানতাহেতু তন্ত্র কালক্রমে বিপথগামী হয়। পাশ্চাত্যবিদ্যার সংস্পর্শ কাল থেকে এ বিদ্যার চর্চা সুরু হলেও ঊনিশশতকের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের অনেকেই তন্ত্রের মহত্ত্বকে আস্বাদ করতে পারেন নি! গত শতকের অষ্টম দশকে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রমুখ কতিপয় দেশীয় সিদ্ধ-পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় তন্ত্রের চিন্ময়ীশক্তির অবগুণ্ঠন মোচন হয়। এ পর্য্যায়ে "বঙ্গবাসী" প্রতিষ্ঠানের শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগ বিশেষ কার্য্যকরী ভূমিকা নেয়। বঙ্গবাসী, পত্রিকার বিভিন্ন লেখকসম্প্রদায়ের দ্বারা ও তন্ত্র, পুরাণ, বেদ উপনিষদ প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। পরিশেষে উড্রফের দিব্য আলোকসম্পাতে তন্ত্র কেবল এদেশের শিক্ষকসমাজেই নয়—বিশ্বলোকের সংশয়-সন্দিগ্ধচিত্তকে আলোকে উদ্ভাসিত করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

উড্রফের এই সাফল্যের জন্য ভারতবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। এ ব্যাপারে বিদেশী কোন ভারত-বিদ্যাপথিকই উড্রফের সমকক্ষ নন। লণ্ডনের The Timesপত্রিকা একসময়ে লিখেছিল—

"A man of studious and retiring habits, he devoted his leisure from judicial in the main to Sanskrit and Hindu Philosophy and specialised in the Sakti system to an extent not equalled probably by any other British Orientalist"

সাধারণভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তন্ত্রকে "নিক্রো-ম্যানন্টিক বুকস্" ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। ওয়াডেল, তাঁর "বুদ্ধিজিম্ ইন্ টিবেট" গ্রন্থে তন্ত্র সম্বন্ধে এই মনোভাব পোষণ করেছেন। উড্রফের পূর্ববর্তী অনেক পাশ্চাত্য লেখকই তন্ত্রকে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক', 'এরোটিক মিষ্টিসিজ্ম্', "মিনিংলেস মামারী" প্রভৃতি কদর্থে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের কাছে মন্ত্র 'মিষ্টিক্যাল ওয়ার্ডস্' মুদ্রা—"মিষ্টিক্যাল জেষ্টার" যন্ত্র—"মিষ্টিক্যাল ডায়াগ্রামস্"—এ ছাড়া আর কিছুই নয়। উড্রফ তন্ত্র সম্বন্ধে এই মূল ভ্রমগুলিকে উৎপাটিত করেন। উড্রফের তন্ত্রচর্চার অন্যতম সহযোগী ও বন্ধু অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় তন্ত্রকে বলেছেন "প্র্যাকটিক্যাল ফিলজফি"। প্রমথনাথ পরে প্রত্যাগাত্মা-নন্দ নামে পরিচিত হয়েছেন এবং খণ্ডে খণ্ডে জপসূত্রের ভাষ্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তান্ত্রিক-দর্শন বর্তমান জগতের একান্ত উপযোগী। তন্ত্র কেবল-মাত্র যুক্তিশুদ্ধ নয়—তন্ত্র বিজ্ঞানময়ও বটে। তন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা। অসীম আধারের প্রতিসঞ্চারে আছে সসীমশক্তির ছন্দ। তাকে ধরেই সেই সম্ভাবনাকে আগিয়ে তোলার ইঙ্গিত তন্ত্রে যেমন সুস্পষ্ট তেমন আর কোথাও নেই। জীবনের বৃত্তি ভোগের চরিতার্থতা চায়। এই ভোগস্পৃহা সহসা দূরীভূত করা যায় না। জীবনে ভোগ স্বাভাবিক বৃত্তি, এর মধ্যেই জীবনের স্ফূর্তি ও অখণ্ড অনুবৃত্তি। তন্ত্র জীবনের এই উল্লাসকে নষ্ট করতে চায় না। জীবনের সবখানিই তন্ত্র গ্রহণ করেছে—ভোগ ও মোক্ষ। জীবন-বাদ ও মোক্ষবাদ দুইই তন্ত্রে স্থান পেয়েছে। তন্ত্র দেখিয়েছে জীবন ও মুক্তির সমন্বয়—এককথায় জীবন্মুক্তি মানুষের চিরন্তন আস্পৃহা আছে ভূমা ও বৃহতের দিকে। এই ভূমার অন্বেষণে আত্মার আবরণগুলি উন্মোচিত হয়। মানুষ বৃহৎ ও অখণ্ড আনন্দের দিকে ধাবিত হয়। অখণ্ড মানবত্বে তৃপ্তি না পেয়ে সে আরও উচ্চতর অনুভবের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এ অনু-সন্ধ্যানেও মানুষের তৃপ্তি নেই। সে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অনুসন্ধান করে—এ লোক উর্দ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ—এই পথেই সে সত্তার অম্লান অখণ্ডদীপ্তির সঙ্গে পরিচিত হয়। চেতনার এই প্রশান্তগতিতে নিম্নের ভূমি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ রাজ্যের অধিশ্বর তখন জ্যোতি ও শান্তির রাজ্যে, মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি। তন্ত্রের লক্ষ্য এখানেই। এই সমাহিত প্রশান্তিতে। তন্ত্রের এই রহস্য বিদীর্ণ করতে না পেরে—অনেকেই এর বিরূপতা করেছেন। উড্রফ জীবন-বিকাশের পরিপূর্ণ পথের সন্ধান পেয়েছেন তন্ত্রে। আধুনিক জগতে তন্ত্রের গভীরতর জীবনরহস্যের মর্মোৎঘাটন করেছেন তিনি—তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র আজ বিশ্বলোকের সাধনার বিষয়।

উডরফের তন্ত্রশাস্ত্রচর্চার পরিধি বিরাট এবং ব্যাপক। একজন বিদেশীর পক্ষে তন্ত্রের মত এইরূপ গূঢ় ও তত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের সর্বাঙ্গীনচর্চা বিস্ময়কর। ভারতধর্মের সব শাখাতেই তিনি অধিগত ছিলেন এবং এ কারণেই তিনি তন্ত্ররহস্যের মর্মোৎঘাটন করতে পেরেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যাও বিপুল। তাঁর সম্পাদনায় প্রায় কুড়ি-খানি তন্ত্রগ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হয়। এই সমস্ত গ্রন্থ Tantrik Text Series শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এইরূপ গ্রন্থের প্রথম কয়েক খণ্ডের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উড্রফের প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থই 'আর্থার এভেলন' এই ছদ্মনামে প্রচারিত হয়। তান্ত্রিক টেক্সট' গ্রন্থগুলির মধ্যে vol. I Tantrabhidana vol. II

Sachakra Nirupama. vol III Prapanchasara vol.IV Kulacundamani vol. V Kularnava. vol. VI Kalivilasa vol. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পর্য্যায়ের আরও কয়েকখানি খণ্ড আর্থার এভেলনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

তিনি অনেকের গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। শিল্প সমালোচক ও. সি. গাঙ্গুলির একখানি গ্রন্থের ভূমিকা তিনি লিখেছেন, Tibetan Book of the Dead (W. Y. E. W.) নামক আর একখানি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন, হয়ত এমন গ্রন্থ আরও অনেক আছে। তন্ত্রসম্বন্ধীয় এই গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্র বা মৌলিক চিন্তার ভাস্বর। এগুলিতে তাঁর প্রজ্ঞা, মনীষা ও দিব্যদৃষ্টি বিদ্যমান,, ভারতীয় সিদ্ধ-ঋষির পক্ষে যা সম্ভব ছিল, তন্ত্রচর্চায় উডরফের সেই সাফল্য। উডরফের সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক, তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভগবানকে জগদম্বা বা মা নামে ডাকা ভারতের নিজস্ব। তন্ত্রের প্রভাব ভারত হতে অন্যত্র বহু বিস্তৃতিলাভ করে। সে সকল দেশের আদিম ভাবের সঙ্গে মিশে ঐ সব স্থানেই ভারতীয় তন্ত্র বিকৃত হয়, বৌদ্ধ অভিধানে, সেগুলির নাম হয় 'বৌদ্ধতন্ত্র'। বৌদ্ধপ্লাবনে সেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলির আগমন হয় ভারতে, মধ্য এশিয়া বা তিব্বত হতে তন্ত্র এদেশে আসেনি—লয়যোগ বা কুলকুণ্ডলিনীযোগও সেসব স্থান হতে আসেনি।

তন্ত্রসাধনা বিশেষ করে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর এই প্রকার শ্রদ্ধাপূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব তাঁর সুবিশাল রচনা-রাজির মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমান। উডরফের হিন্দুহিতৈষণার আর এক অবিনশ্বর কীর্তি Is India Civilized (1918) ভারতবাসীমাত্রেই এই গ্রন্থের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। সেদিন উইলিয়ম আর্চার নামক একজন ইংরেজ লেখক India and the future নামক গ্রন্থে হিন্দু-সভ্যতার কুৎসা প্রচার করলে—উডরফ্ প্রতিবাদ করেন। Is India Civilized তার প্রত্যক্ষফল গ্রন্থখানি বহুপূর্বেই চট্টগ্রামের কালীশঙ্কর চক্রবর্তী 'ভারত কি সভ্য' এই নামে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেন। স্বর্গত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও এই গ্রন্থের অনুবাদ অসম্পূর্ণ রেখে পরলোক গমন করেছেন। উডরফ্ ভারতের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রাদিতে তাঁর যে অসাধারণ অধিকার এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তা বিদ্যমান। হিন্দুধর্মের বিশ্লেষণে উডরফ্ অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন পণ্ডিত গবেষক ও শ্রমনিষ্ঠ ভারতপথিক হিসাবে চিরকাল পূজিত থাকবেন। কর্মে ধ্যানে মননে তাঁর হিন্দুহিতৈষণার অভিনবত্ব লক্ষ্য করে 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক ও সাহিত্যসেবী স্বর্গত বিহারীলাল সরকার একদা বলিয়াছিলেন—'উডরফ্ শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ'।

বিদেশী ও বিধর্মী হয়ে উডরফ্ পুরাপুরি হিন্দুসাধকের জীবন যাপন করেছেন, শিবচন্দ্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর হিন্দু ভাবনাই তাঁর জীবনের সর্বস্ব হয়। বসনে-ভূষণে আচার-আচরণে তিনি হিন্দুসাধকের জীবন-যাপন করতেন। শেষ জীবনে তিনি হিন্দুর মত পূজার্চনা ও যাগযজ্ঞ করতেন—এ সময়ে তিনি গৈরিক বস্ত্রাবৃত হয়ে নগ্নপদে বিরাজ করতেন, যে নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরে সাধনা করে চৈতন্যদেব নীলাম্বু মধ্যে আরাধ্য দেবতাকে পেয়েছিলেন এবং নীলজল মধ্যেই বিলীন হয়েছিলেন—সেই পুরীর নীলাম্বুবেলাভূমিতে উডরফ্‌কে নগ্নপদে চিন্তারত অবস্থায় অনেকেই ভ্রমণ করতে দেখেছেন। কেবল পুরী বা কোনারক নয়—দূর-গ্রাম-গ্রামান্তরে—তীর্থে তীর্থে ছোট বড় খ্যাত-অখ্যাত মন্দিরে উডরফ্ গভীর তৃষ্ণায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। বীরভূম জেলার বেহুলা নদীতীরস্থ আমোদপুরের শ্মশানে অবস্থিত বড়কালী মন্দিরেও উডরফ্‌কে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখা গিয়েছে।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও উডরফের সাধক-জীবন অব্যাহত ছিল। ইংলণ্ডবাসী হয়েও তিনি পরিপূর্ণ হিন্দুর জীবনযাপন করতেন। এ বিষয়ে প্রাক্তন হোম সেক্রেটারী রবি মিত্র আই, সি, এস মহোদয় একদা বসুমতী কার্য্যালয়ে যা বিবৃত করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। "বিলাতে আই, সি, এস, পরীক্ষা উদ্দেশ্যে আইন অধ্যয়ন কালে ভারতীয়

আইনের অধ্যাপক কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার জন উড্রফ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া একদিন আমি তাঁহার ভবনে গমন করি, তথায় গিয়া দেখিলাম বিচারপতির বৈঠকখানায় ঘরের চারি দেওয়ালে দশমহাবিদ্যা, সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা, তন্ত্রোক্ত দেবদেবী, গায়ত্রী, ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবদেবীগণের এবং তাহার গুরুদেব শিবচন্দ্র ও তদীয় সহধর্মিণীর প্রতিকৃতি সমূহ সুদৃশ্য সুশোভন ফ্রেমে বাঁধা আলোকচিত্র সুসজ্জিত। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীগণের ছবিও তন্মধ্যে শোভা পাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখে আমি ত স্তম্ভিত ও বাকশূন্য হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তখন মনে হইতেছিল আমি যেন পুণ্যভূমি ভারতের কোন দেবালয়ে অথবা ভারতীয় কোন সাধনআশ্রমে।" শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর উড্রফের জীবনধারা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়—হিন্দুর ধ্যান ধারণা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে পড়ে। গুরুর কাছেই তিনি শ্রবণ করেছিলেন তন্ত্র গুরুমুখীবিদ্যা—এ গুহ্যসাধনা। গভীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য সহকারে এ বিদ্যালাভ করা যায়। বাস্তবিকই বিদ্যার্ণবের উপদেশ শিক্ষা-শাসন ও নির্দেশে তিনি তাঁর সাধনজীবনকে চরিতার্থ করেছিলেন। বিদ্যার্ণব এই বিদেশী শিষ্যের কাছে পার্থিব ভোগসুখকর কোন গুরুদক্ষিণা চাননি। উডরফের এই প্রকার প্রচেষ্টাকে তিনি তিরস্কার করেছিলেন। ভারতীয় তন্ত্র ও মাতৃসাধনার প্রসার ও প্রচার এই ছিল শিবচন্দ্রের প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা। বহিরঙ্গ জীবনচর্য্যা ও সাধনার সর্বস্তরে উডরফ ভারতীয় সাধকের মহত্ব অর্জন করেছিলেন। যুক্তিবাদী ইংরেজ হয়েও তিনি ছিলেন বিশ্বাসে অটল।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের শিল্প-সুষমার রসগ্রহণে তিনি মর্মজ্ঞ অধ্যবসায়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় তৎকালে এদেশে যে আধুনিক শিল্পীসমাজের আবির্ভাব হয়, উড্রফ তাঁদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষণা করতেন নানাভাবে। ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের চিত্রগুলি বিদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের জ[ন্য] তাঁর সীমাহীন প্রচেষ্টা ছিল। সুদূর অতীতে নির্মি[ত] এদেশের মন্দিরগাত্রে যে লীলায়িত শিল্পসুষমা ছি[ল] তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে মন্দির শিল্পে এদেশে[র] ভাস্করদের মৌলিকত্ব উপলব্ধি করতেন, শুধু শিল্পসৌন্দর্য্য নয় হিন্দুসাধনার গভীরতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির জন্য[ই] বারে বারে তিনি মন্দির-দ্বারদেশে উপস্থিত হতেন। উড্রফ ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলা শিল্পের মর্মজ্ঞ রসিক Indian Society of Oriental Art. যে মুখ্যত তাঁরই প্রচেষ্টার ফল তার নজীর পাওয়া যায়।

এই সূত্রেই আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব উড্রফের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ভারতীয় চারুকলার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য জানবার জন্য উদগ্রীব হন। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য উডরফ শিবচন্দ্রের সহযোগিতা কামনা করেন। বিদ্যার্ণব কান্তি-বিদ্যা ও চারুকলা বিদ্যাসম্পর্কীয় গভীর তত্ত্ব ও দার্শনিকতার দিকটি ভারতীয় পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দিতেন। কেবল হ্যাভেলই নয় শিল্পশাস্ত্রী আনন্দকুমার স্বামীও উড্রফ ভবনে শিবচন্দ্রের আবেগানুভবসঞ্চারী বক্তৃতার শ্রোতা থাকতেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শনের প্রতি কুমারস্বামীর যে সুগভীর আসক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর শিল্প-সমালোচনাকে প্রভাবান্বিত করেছিল—তার প্রেরণামূলে উড্রফ ও শিবচন্দ্রের প্রভাব স্বীকার্য। এদেশের আনুষ্ঠানিক লোকশিল্প বিষয়েও উড্রফ আগ্রহী ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

এদেশের কুটীরশিল্পের জন্য উড্রফের আন্তরিক অনুরাগ ছিল, ইংরেজশাসনে ধ্বংসোন্মুখ কুটীরশিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। বাংলার কুটীরশিল্পের প্রাগ্রসর ভূমিকা ছিল একদিন—এর দ্বারা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। এ শিল্পে বাঙালীর মৌল দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ পড়েছিল—বাঙালী জনজীবনে কুটীরশিল্পের এই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী তিনি অবগত হয়েছিলেন। এদেশের কুটীরশিল্পের উন্নয়নকল্পে স্বদেশীচিত্তে আলোড়ন এসেছিল।

যে সময়ে Bengal Home Industries Association নামে যে সংস্থার ভূমিকাপত্তন হয় উড্রফ ছিলেন সেই সংগঠনের একজন উদ্যোক্তা ও অক্লান্ত কর্মী। তিনি বাংলা দেশের কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেন।

বাংলাদেশে তখন শিক্ষা-আন্দোলনের সংঘাতে মুখর হয়ে উঠেছিল। ভারতবন্ধু উড্রফ শিক্ষাজগতের সেই দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। সেদিনের শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ভারতপ্রেমিক উড্রফ নির্দেশ করেছিলেন শিক্ষাই জাতীয় সিদ্ধি-সাফল্যের প্রধানতম পথ। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতার দেশ। ইংরেজী শিক্ষার আগমনে এদেশে একটা ভাব-সংঘাত দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার চাক্যচিক্যে দেশবাসী মোহগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু ভারত সভ্যতার স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হলে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা সুফল মিলবে না। ১৯১৭-১৮ সালে এদেশে স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে যে শিক্ষা-কমিশন বসেছিল—সেখানে সাক্ষ্যদানকালে উড্রফ্ স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় ছাত্ররা ভারতসভ্যতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেশের কল্যাণ ও সংস্কৃতি-সাধনার দিক থেকে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সংশোধন প্রয়োজন। তাঁর Is India Civilized গ্রন্থে এতৎ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা আছে— সে সকল অভিমত আজও এদেশের পক্ষে কল্যাণকর।

বৈদিক দেবী ঊষা

মুক্তাকণা সেনচৌধুরী

বৈদিক দেবীগণের মধ্যে মন্ত্রসংখ্যার আধিক্য বিবেচনায় ঊষাদেবীর স্থানই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ঋগ্বেদে প্রায় ৩০টি সূক্তে ঊষাদেবীর স্তুতি করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বহু মন্ত্রে ঊষাদেবীর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে প্রায় ৩০০ বার ঊষাদেবীর নাম পাওয়া যায়। অপর তিন বেদে, বিশেষত: সামবেদে ঊষাদেবী বহুবার স্তুত হয়েছেন।

তাঁহার বর্ণনায় বিশেষণ-নির্ব্বাচনে এবং উপমা প্রয়োগে বৈদিক ঋষিগণ যে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অন্য দেবদেবী সম্বন্ধে তাহা কদাচিৎ দেখা যায়। ঊষা সূক্তগুলিকে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৈদিকযুগের গীতিকাব্য বলিয়াছেন।

ইনি দ্যুলোকের কন্যা অথবা আদিত্যের কন্যাস্থানীয়া। (নুনং দিবো দুহিতর:) ঋক্ ৫।৫১।১ ; দুহিতা দিবঃ ঋক্ ১।৩০।২২, ১০।১৭২।৪, সাম ২।৩।৪।১ দিবঃ দুহিতরঃ—ঋ ৪.৫১।১০ ৪।৫১।১১ ইত্যাদি। ইনিধ নবতী ('মঘোনী'-ঋক্ ১।৬১।১ এবং ৩.৬১.১) ; রেবতী-ঋক্, ৩।৬১।১) ; অন্নবতী (বাজিনী-ঋক্ ১।৪৮.১৬) ; প্রকৃষ্টজ্ঞানবতী (প্রচেতা ৩.৬১.১) এবং বিশ্ববরেণ্যা (বিশ্ববারা, ৩।৬১।১-২)।

ঊষা পুরাতনী অথচ চিরতরুণী (পুরানী দেবি যুবতী-৩.৬১.১) ; নবীনা (নব্যা-৩।৬১।৩); পুনঃ পুনঃ জন্মপ্রাপ্তা (পুন: পুনর্জ্জায়মানা পুরানী-১ ৯২।১০)। ইনি পুরংধি অর্থাৎ বহুস্তোত্রবতী বা বহুশোভমানা (সায়ন) অথবা বিপুল ধীশক্তিসমন্বিতা (যাস্ক)। ইনি সত্যবতী (ঋতাবরী ৩.৬১।৬) ; প্রিয়ংবদা অথচ সত্যভাষিণী (সুনৃতা ঈরয়ন্তী-৩.৬১.২) এবং স্তুতিপ্রিয়া (কথপ্রিয়ে ১।৩০।২০)।

ঊষাদেবী সর্ব্বদা একরূপা (সমানী ৪.৫১।৯ ; সদৃশী ৪।৫১।৬) অশীর্ণা (অদূর্য্যা :) দীপ্তা (শুভ্রা:) ; এবং কল্যাণী (ভদ্রা:)। ইনি "অভীষ্টহ্যুম্না :," "দ্রবিণং সদ্য: আপ" অর্থাৎ যজমান তাঁহার স্তুতি করিলে এই অভীষ্ট-পূর্ণকারিণীর নিকট বাঞ্ছিত দ্রব্যাদি সদ্যসদ্যই প্রাপ্ত হয়-৪।৫১।৭)। ইনি অমৃতের পতাকা (অমৃতস্য কেতু:), 'যজ্ঞ কেতু:' এবং অনন্ত বর্ণাঢ্যা (অমীত বর্ণা: ৪।৫১।৯)।

শতপথ ব্রাহ্মণে ঊষার অপহরণ কাহিনী বলা হইয়াছে। এক কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য ঊষাকে গুহার অন্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। দেবতারা তাঁহার অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। অবশেষে সূর্য্য ঊষাকে দৈত্যের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। মনে হয় ইহা একটি রূপক মাত্র। সূর্য্যকিরণ রাত্রির তমসায় বিলীন হয়। সূর্য্যের কিরণকেই ঊষা কল্পনা করা হইয়াছে। সূর্য্য পুনরায় রাত্রির অন্ধকারের গর্ভ হইতে রশ্মিরূপী ঊষাকে মুক্ত করেন।

নিরুক্তে যাস্ক (২।১৮।৪) ঊষা নামের কারণ বলিয়াছেন—ঊষা: কস্মাৎ? উচ্ছতীতিসত্যা রাত্রে: পরঃকাল:।" রাত্রির অবসানে (উচ্ছতি, উৎসারয়তি) উদ্ভাসিত হ'ন, তাই ঊষা। ঊষার এক নাম সূর্যা. তাহার এক আভিধানিক অর্থ নবোঢ়া বধূ।

সূর্যের সহিত ঊষার সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ বিচিত্র মনে হইবে। পূর্ব্বে উদ্ধৃত "নুনং দিবো দুহিতরঃ"—এই বাক্যাংশের অর্থ সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন দ্যুলোকের অথবা আদিত্যের কন্যাস্থানীয়া। কিন্তু ঋগ্বেদের ৩.৬১।৪ মন্ত্রে ঊষাকে "স্বরসস্য পত্নী" বলা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য স্বরস শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সূর্যো বা

বাসবো বা"। অর্থাৎ তিনি সূর্য্য অথবা বাসবের (ইন্দ্রের) পত্নী। "সূর্য্য অস্তুতি ক্ষিপতি তমঃ ইতি স্বসরঃ" এই অর্থ স্বীকার করিলে উষাকে সূর্য্যের পত্নী বলাই স্বাভাবিক মনে হইবে। কিন্তু তিনি সূর্য্যের পত্নী হইতেই পারেন না, তাহা নিম্নে প্রদত্ত উষার বিবাহের বিবরণ হইতেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বাসব বা ইন্দ্রের সহিত কোন সম্বন্ধ কোন মন্ত্রে দেখা যায় না। বরং অশ্বিসূক্তে (ঋক্‌ ৭।১১) উষা অশ্বিদ্বয়ের সহিত একই মন্ত্রে স্তুত হয়েছেন। এই মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে "উষা আপনার ভগ্নিসদৃশা কৃষ্ণাকে (অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রিকে) আপনার গমন পথ হইতে দূরে অপসারিত করে। দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে "হে গো-ধন ও অশ্বধনে সমৃদ্ধ অশ্বিদ্বয়! আমরা তোমাদের স্তুতি করিতেছি। তোমরা অহোরাত্র আমাদের হিংসকদিগকে দূরে রাখ।"

এইবার উষার বিবাহের কথা বলিব। পৌরাণিক-গল্প নয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটিকে উষার বিবাহ সূক্ত বলা যায়। এতবড় দীর্ঘ সূক্ত আর দেখা যায় না। এই সূক্তেই উষাকে পুনঃপুনঃ সূর্য্যা বলা হইয়াছে। উষা যথার্থই সূর্য্যের কন্যাস্থানীয়া—কারণ এই সূক্তেই দেখা যায় সূর্য্যই বিবাহকালে সম্প্রদানকর্ত্তা হইয়াছিলেন। "সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন। সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহপ্রার্থী ছিলেন কিন্তু অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনীকুমার যুগল) তাঁহার বরস্বরূপ গৃহীত হইলেন। (নবম মন্ত্র—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ)। "হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা যখন ত্রিচক্র-যুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সকল দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্যার বিবাহ স্বীকার করিলে, তখন সকল দেবতাই সেই গ্রহণকার্য্য অনুমোদন করিলেন" (১৪ মন্ত্র) "পতিগৃহে গমন কালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল।" (১৩ মন্ত্র) "হে সূর্য্যা! তোমার পতিগৃহে যাইবার রথে সুন্দর পলাশতরু ও সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে (এই প্রকার কাষ্ঠে রথ প্রস্তুত হইয়াছে)।" (২০ মন্ত্র)। ইত্যাদি। বরযাত্রীগণের গমনপথের, বধূবস্ত্র, বধূর প্রতি আশীর্ব্বাদ ইত্যাদিরও কৌতূহল উদ্দীপনা বর্ণনা আছে। সুতরাং উষা সন্দেহাতীতভাবে অশ্বিদ্বয়ের পত্নী। বর হিসাবে তাঁহাদের যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের মহিমা বিভিন্ন সূক্তে ও বিক্ষিপ্ত মন্ত্রে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচনা সম্ভব নয়।

সামবেদের ২৩৪।১ মন্ত্রে উষার স্তুতি করা হইয়াছে—

প্রতি উ অদর্শি আয়তী উচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপ উ মহী বৃণুতে চক্ষসা তমঃ জ্যোতিঃ
কৃনোতি সুনরী॥

আগমনশীলা তমসানাশিনী দ্যুলোককন্যা দৃষ্টি-গোচর হইতেছেন। ইনি মহা অন্ধকারের আবরণ উন্মোচন করেন এবং শোভনা নেত্রীরূপে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন।

ইদম্‌ উ ত্যৎ পুরুতমম্‌ পুরস্তাৎ
জ্যোতিঃ তমসঃ বয়ুনাবৎ অস্থাৎ।
নূনম্‌ দিবঃ দুহিতরঃ বিভাতী—
গাতুম্‌ কৃণবন্‌ উষসঃ জনায়॥ ঋকঃ ৪।৫১।১

সম্মুখে এই যে প্রভূত তেজসম্পন্না উত্তমকান্তীমতী—উষা পূর্ব্বদিক হইতে তমসাভেদ করিয়া উদিত হইতেছেন, ইনি নিশ্চয় দ্যুলোকের কন্যা (অথবা আদিত্যের কন্যাস্থানীয়া) ইনি প্রভা বিকীর্ণ করিয়া যজমানদের গমনাগমন সামর্থ্য দান করেন।

উষা অপ স্বসুঃ তমঃ সংবর্ত্তয়তি।
বর্ত্তনিং সুজাততা॥ সাম ২।২৪৫

উষা নিজের শোভন আবির্ভাব দ্বারা নিজভগ্নি রাত্রির—তমসাকে বিপরীত পথে চালনা করেন।

বি উ ব্রজস্য তমসঃ দ্বারা
উচ্ছন্তী অব্রন্‌ শুচয় পাবকাঃ। ঋক্‌ ৪।৫১।২

ইনি আবরক তমসার রুদ্ধদারগুলি উৎসারিত করিয়া প্রদীপ্ত পাবক (শোধক) রূপে আবির্ভূতা হ'ন।

একৈ বোষাঃ সর্বমিদং বিভাতি। ঋক্ ৪ ৫৮,২

ঊষাদেবী একাই (অন্ধকার বিদূরিত করিয়া) এই দৃশ্যমান জগৎকে বিশেষরূপে উদ্ভাসিত করেন।

আয়াহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত
বর্ত্তনিং যৎ উধভিঃ। সাম ২।৪।৫,

ঋক্ ১০।১৭২।১

হে ঊষা-দেবী, তোমার অর্চনীয় তেজের সহিত শুভাগমন কর। তোমার শক্তিবহনকারী রশ্মিসকল আমাদের সত্তাকে বিকশিত করে।

বয়ঃ চিৎ তে পতত্রিণঃ দ্বিপাৎ চতুষ্পাৎ অর্জুনি।
উষঃ প্রায়ন্ ঋতূন্ অনু দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি॥

ঋক্ ১।৪৯।৩

হে অর্জুনি (কান্তিময়ী) উষে! তোমার আবির্ভাবে প্রেরণা পাইয়া দ্বিপদ (মনুষ্যগণ), চতুষ্পদ (গবাদিপশুগণ) এবং আকাশের প্রান্ত হইতে উড়ন্ত পক্ষীদল স্ব স্ব কর্মে সর্ব্বদিকে ধাবিত হয়।

অচিত্রে অন্তঃ পনয়ঃ সসন্তু।
অবুধ্যমানাঃ তমসঃ বি মধ্যে॥ ঋক্ ৪ ৫১।৩

যাহারা কৃপণ বণিকের ন্যায় হব্যাদি, নিবেদন-বিমুখ ঊষাদেবী তাহাদিগকে গভীর অন্ধকার মধ্যে প্রসুপ্ত করিয়া রাখুন্।

মহে নঃ অদ্য বোধয়
উষঃ রায়ে দিবিত্মতী।
যথা চিৎ নঃ অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বার্যে
সুজাতে অশ্বসূনৃতে॥

হে সুজাতা বরণীয়া সত্যজ্ঞানদায়িনী ঊষাদেবী! পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ, সেইভাবে হে জ্যোতি-স্বরূপা, তুমি অদ্যও আমাদিগকে পরমধন প্রাপ্তিবিষয়ে প্রবুদ্ধ কর।

ধনী দরিদ্র পার্থক্য দূরীকরণের প্রকৃত উপায়

সাতকড়িপতি রায়

"ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ" প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ভারতে যে সমাজতন্ত্রবাদ আনাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা বিধাতার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কিন্তু এদেশে ধনী দরিদ্রের মধ্যে যে বিরাট প্রভেদ সৃষ্টি হইতেছে তাহা সমাজ হইতে দূরীকরণের চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব।

মানুষ যতদিন না তার মানসিক বৃত্তির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে ততদিন এ প্রভেদ দূর করা সম্ভব নহে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যাঁহারা নিজ প্রয়োজনের অধিক অর্থ সংগ্রহ করেন তাঁহাদের কর্তব্য সাধারণের জন্য সেই অতিরিক্ত অর্থের 'অছি' বা trustee-স্বরূপ উহা সংরক্ষণ করা। তাঁহার এ কথা বল'র উদ্দেশ্য যাদের অর্থ নাই, ঐ অতিরিক্ত অর্থে তাহাদের অর্থাভাব যতটুকু দূর করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা সমাজে করিতে হইবে। কিন্তু যদি মনের উৎকর্ষতা সাধিত না হয় তাহা হইলে কেহ তাহা করিবে না। এই উৎকর্ষ কিরূপ? সমাজের সভ্যরূপে যে সকল মানুষ বাস করেন তাঁহাদের প্রত্যেককে অনুশীলন দ্বারা মনের মধ্যে ত্যাগ গুণের উৎকর্ষতা সাধন করিতে হইবে। যদি তিনি সত্যকার ত্যাগী হন তবে তাঁকে বলিতে হইবে না যে গ্রামের বা পাড়ার রাম তার ছেলেদের জন্য খাদ্য যোগাড় করিতে পারে নাই, কি করা যায়? তিনি শুনিবামাত্র বলিবেন, আমার ঘরে বেশী খাদ্য আছে রামকে বল লইয়া যাউক। মনের এই অবস্থাতেই হিন্দু ক্ষুধার্থ অতিথিকে নিজের ভাত ধরিয়া দিয়া নিজে উপবাস করে।

ইংরাজের অধিকারের পূর্ব্বে আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে সমাজের এইরূপ একটা রূপ ছিল। তাহাকে পঞ্চায়েত রাজ বলিত। এই পঞ্চায়েতগণ ত্যাগ সংযম ও সত্যনিষ্ঠার মাপকাঠিতে নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁরাই সমাজের কর্তা হইতেন তাঁহারাই নির্দ্দেশ দিতেন, শ্যামের জমির উৎপন্ন খাদ্য তাহার প্রয়োজনের অনেক বেশী, রামের জমিতে উৎপন্ন খাদ্য তাহার সংসারের ৬।৭ মাসের বেশী চলে না। শ্যাম তার উৎপাদিত খাদ্য হইতে রামকে সাহায্য করিবে এবং রাম দৈনিক পরিশ্রম করিয়া বা অন্যভাবে শ্যামের ঋণ পরিশোধ করিবে। পঞ্চায়েতের অধীন ধর্ম্মগোলা থাকিত, গ্রামের উৎপন্ন অতিরিক্ত খাদ্য তাহাতে জমা হইত। যার নেই সে ধার পাইত এবং পরিশ্রম বা অন্য উপায়ে সে দেনা শোধ করিত। এরূপ সমাজ গড়িতে হইলে যে কয়েকটি গুণের কথা পূর্ব্বে বলিলাম তাহা অনুশীলন দ্বারা গ্রামের অধিবাসীগণকে অর্জন করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক অবস্থাতেই মহাত্মা কথিত trustee হওয়া সম্ভব। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতি বিশিষ্টতা। হিন্দুধর্ম্মও এই শিক্ষা দেয় "যাহার আছে সে যাহার নাই, তাহাকে দাও এবং তাহার নিকট অন্যভাবে তার ঋণ শোধ করিয়া লও। যদি এই ভাবধারা আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়া আসে তবে জোর করিয়া বা আইন করিয়া কাহারও কিছু কাড়িয়া লইতে হয় না। চিত্তের বা মনের এইরূপ অবস্থাই প্রকৃত নির্ম্মল অবস্থা। ইহার ব্যতিক্রমই মনের বিকৃত অবস্থা বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এই সকল সংগুণ অনুশীলন দ্বারা অর্জন করা না

হইলে সমাজের সহজ সাম্যরূপ প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। কি প্রকারে এইরূপ সৎগুণ অর্জিত হইবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষাপ্রাণালীর মধ্য দিয়া ছাড়া এইসব গুণের অনুশীলন করা সম্ভব নহে। ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালী আবহমান কাল তারই সাক্ষ্য দিতেছে। যদ্যপি আমাদের শাসকগণ একটু সচেতন হইয়া বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী বদলাইয়া শিক্ষার মধ্য দিয়া অতি বাল্যকাল হইতে বালক-বালিকাগণকে কয়েকটি সৎগুণের অনুশীলন করাইবার ব্যবস্থা করেন তবে এক generation পরে সমাজের যে রূপ হইবে তাহাতে এই অর্থ-নৈতিক প্রভেদ আর চোখে খুব পড়িবে না। সমাজের সমস্ত ব্যক্তিই গুণবান হইয়া উঠিবে ইহা আশা করা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যর বহির্ভূত। তবে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ সমগুণে ভূষিত হইলে সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা থাকিবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলা যায়।

মানুষ যতদিন না অপর মানুষকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিবে ততদিন মানুষে মানুষে পার্থক্য দূর করা যায় না। অপর মানুষকে ভালবাসিতে শিক্ষা করাই সকল ধর্ম্মের মর্মকথা। হিন্দু যে মুসলমান বা খৃষ্টানকে ঘৃণা করে বা বিদ্বেষ করে বা মুসলমান ও খৃষ্টান যে হিন্দুকে ঘৃণা করে বা বিদ্বেষ করে ইহা ধর্ম্ম অনুসরণ না করার ফল।

যে গুণগুলি অনুশীলন দ্বারা জীবনের অংশ করিতে হইবে তাহা হইতেছে। (১) ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস (২) গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি শ্রদ্ধা (৩) পরসেবা (৪) দেশভক্তি (৫) ব্রহ্মচর্য্য (৬) সত্যনিষ্ঠা (৭) ত্যাগ (৮) সংযম (৯) একাগ্রতা (১০) নির্ভীকতা। ইহার কোনওটাই অনুশীলন ব্যতীত জীবনের অংশ হইবে না। আর এই অনুশীলন বাল্যকাল হইতেই করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্যক্রমের অংশীভূত করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "ইংরাজ প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী (যাহা আজও প্রচলিত আছে) মনুষ্যত্বহীন কেরানী গড়িবার শিক্ষা, ইহা আমূল বদলাইয়া যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের স্ফূরণ হয় তাহাই প্রবর্তন করিতে হইবে।"

যদ্যপি সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল সৎগুণে ভূষিত হয় তবে সমাজ হইতে যে কোনও পার্থক্য দূর হইতে বাধ্য। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই সব গুণের অনুশীলন করিলে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকে না, আর সকল ধর্ম্মের বিশেষ করে যে ধর্ম্মের মর্ম্ম আমি জানি সেই হিন্দু ধর্ম্মের ইহা মূল শিক্ষার অন্তর্গত।

বাল্যকালে পড়িয়াছি গ্রেট বৃটেনের যুবরাজকে (Prince of Wales) গরীব কুলির কাজ অনুশীলন করিতে হইত। মাথায় করিয়া কয়লার বোঝা জাহাজে তুলিতে হইত। ইহাই প্রকৃত খৃষ্টানধর্ম্মের শিক্ষা। এখন ইহা হয় কিনা জানিনা। কারণ প্রকৃত ধর্ম্মে বিশ্বাস সকল দেশেই চলিয়া যাইতেছে।

অতএব আমার বিনীত নিবেদন, নেহেরুজীর প্রবর্ত্তিত democratic socialism এর জীগির পরিত্যাগ করতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহাতে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে এবং যে সকল গুণাবলির কথা বলিয়াছি তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ গঠন করিলে সে সমাজে কোনও পার্থক্য প্রকটভাবে ফুটিয়া উঠিবে না। মানুষে মানুষে অবস্থার প্রভেদ, মস্তিষ্কের প্রভেদ, দেহের প্রভেদ, মানসিক বৃত্তির প্রভেদ প্রভৃতি বহুবিধ প্রভেদ থাকিবেই। কারণ প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী এবং বিচিত্রতাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু এই প্রভেদ কেহ এরূপভাবে দেখিবে না যেমন এখন দেখিতেছে। সে জন্য উহা আর অনুভূতির মধ্যে থাকিবে না। অর্থের প্রভেদ থাকিলেও দরিদ্র দেখিবে ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে না, বরং খুবই সহানুভূতির সহিত সে দারিদ্র্য যাহাতে সে অনুভব না করে তার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ ডোম বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করে না; বরং তার ডোমত্ব ঘুচাইয়া ব্রাহ্মণত্বে তুলিতে চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ে অনুশীলন দ্বারা সৎগুণাবলি অর্জনের প্রকৃত ফল এইভাবে সমাজে প্রতিফলিত হইবে।

১৯৪৯ সালে যখন দেশের constitution গঠিত হইতেছিল তখন আমি একটা সামান্য পুস্তিকায় এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলাম, উহার নাম দিয়াছিলাম "সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন"। উদ্দেশ্য গ্রামকে unit করিয়া নিম্ন হইতে constitution গড়িয়া তোলা। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ যিনি constituent assembly chairman ছিলেন তিনি উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু নেহেরুজী, শুধু নেহেরুজী কেন প্রায় আর সকল সভ্যই যাঁদের দৃষ্টি বিলাতি পার্লিয়ামেণ্টারী সিস্টেমের দিকে তাঁরা রাজী হন নাই। সেটা গৃহীত হইলে যে পার্থক্য আজ সমাজে প্রকট তাহা হইত না। পরে সেই পুস্তক শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরীতে পাঠাইয়া দিই। তিনি উহা পাঠ করিয়া আমায় ডাকাইয়া পাঠান। আমি ১৯৪৯ এর আগষ্ট মাসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন ভারতের সমাজের চিরন্তন রূপ ঐ প্রকার ছিল। তিনি তাঁহার রচিত form & spirit of Indian Politics পড়িতে বলেন। পড়িয়া দেখিয়াছি। ঐ রূপ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠাম করিলে আজ দিকে দিকে যে বিভেদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহা উঠিত না, সমাজ সদগুণাবলীর উপর স্থাপিত হইলে সমাজ হইতে হিংসা দ্বেষ দূরীভূত হইয়া যাইত। কেন্দ্রীয় সরকারও খুব শক্ত মাটীর উপর স্থাপিত হইত। ভারতের অদৃষ্টে তাহা হয় নাই। পশ্চিমের অনুকরণে যে consituilon গঠিত হইল তাহাকে ১৭ বৎসরে ১৭ বার amend করিতে হইয়াছে। আরও বহুবার amend করিতে হইবে। কিন্তু আকাশকুসুম democratic socialism স্থাপিত হইবে না।

তারপর ও রাস্তায় না গিয়া শিক্ষার পরিবর্ত্তন করিয়া সদগুণাবলির অনুশীলন যাহাতে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়া করান যায় তার চেষ্টা করিয়াছি। নেহেরুজী শেষে ১৯৫৯ সালে একটা কমিটি করেন যাহার chairman শ্রীপ্রকাশজী (তদানীন্তন গভর্ণর বোম্বে) এবং G. C. Chatterjee (vice chanceller Rajsthan) ও Fayjee (vice chairman Kashmir) ও কিরপালজী (তখন Dy secretary education Dept.) সেক্রেটারীরূপে কাজ করেন। তাঁরা কিন্তু সকলে একমত হইয়া রিপোর্ট করেন শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়া প্রাথমিক অবস্থা হইতে চরিত্রগঠন ও আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা এখনি কর্ত্তব্য। সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ ভারতের সমস্ত স্টেটের মুখ্যমন্ত্রীগণকে ও সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষগণকে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা ১৯৬৫ সালের গোড়ার কথা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোথাও কিছু হয় নাই।

হইবে কি প্রকারে? কোনও স্টেটে রাজনৈতিক স্থিরতা নাই যাহারা শাসনযন্ত্র চালাইবার জন্য কর্ম্মচারী রহিয়াছেন তাঁহারা জানেন না আজ যাঁহারা মুনিব কাল তাঁহারা থাকিবে কিনা। তারপর দেশে এমন একটিও রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে নাই যে দলের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ, আবিলতাপূর্ণ নয়। কারণ প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কোনও না কোনও বিদেশীর অনুকরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে তাহার প্রধান কারণ constitution টাই বিদেশের ধার করা।

আমাদের কর্ত্তব্য কি? সাধারণ দেশবাসীর কর্ত্তব্য যাহাতে এই সব রাজনৈতিক দলের মন হইতে আলেয়ার পশ্চাৎ ছুটিবার প্রবৃত্তি না থাকে তার চেষ্টা করা। যাতে শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়া দেশের বালক বালিকাগণের কিশোর-কিশোরীগণের; যুবক যুবতীগণের চরিত্র সদগুণগুলি অনুশীলন দ্বারা গঠিত হয় তার জন্য চেষ্টা করা। তাহা হইলে সমাজের রূপ বদলাইবে। মানুষে মানুষে ভালবাসার সম্প্রীতির সমাজ গড়িয়া উঠিবে। পশুত্বের বিকাশ কমিয়া যাইবে। সমাজ আনন্দে পূর্ণ হইবে।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ওদিকে নীতুর কাছে নিরুপমার ইতিহাস শুনে শীতেশ বলেছেন, "কথাটা শুনতে ভাল শোনাবে না, তবু বলছি, ঐ মেয়েটি তার গাঁয়ের সেই ছেলেটাকে আধমরা ক'রে ফেলে রেখে না এসে যদি একেবারে খতম ক'রে রেখে আসতে পারত ত তার ও তার বাড়ীর লোকদের দুর্ভোগ অনেক কম হ'ত। সেরে উঠে নিজে সাধু সাজবার জন্তে কতগুলি মিথ্যে কথা ব'লে এতসব গোলযোগের সৃষ্টি একলা ঐ বাঁদরটাই করেছে।"

নীতু বলল, "ওর কোনো শাস্তি হবে না বাবা?"

শীতেশ বললেন, "হওয়া ত খুবই উচিত, কিন্তু পাছে উল্টো উৎপত্তি হয় এই ভয়ে এই মেয়েটির বাড়ীর লোকরা হয়ত ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইবেন না। হয়ত ভাববেন, এমনিতে যদি বা লোকে তাঁদের কথা বিশ্বাস করে, আদালতের ত ব্যাপার, সাক্ষীপ্রমাণে হয়ত সাব্যস্ত হয়ে যাবে গুণ্ডারাই মেয়েটিকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর তাঁদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।"

নীতীশের খুব ইচ্ছে হচ্ছে, নিরুপমাকে গিয়ে বলে, সে খুশী হয়েছে, কিন্তু লজ্জায় পারছে না। নিরুপমা কি আর জানে না যে নীতু দুরবীণ লাগিয়ে তাকে দেখত? ওটা যদি না করত সে, ত হয়ত এই আশ্চর্য্য মেয়েটির সঙ্গে তার আলাপ হ'ত, খুব কাছে থেকে রোজ তাকে সে দেখতে পেত, হয়ত আজীবনের বন্ধুত্ব হতে পারত তার ঐ মেয়েটির সঙ্গে। কত মাধুর্য্যের সম্ভাবনা ভরা বন্ধুত্ব।

জগন্নাথ ফিরে এল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। বলল, "আরো আগেই ফিরতুম, কিন্তু এই শীতের রাত্তিরে ভিজে কাপড়ে এতটা পথ আসতে ভরসা হ'ল না মাসী। তাই এই কাছেই দিলীপদের আড্ডায় গিয়ে কাপড় পাল্টে এলুম।"

নিরুপমা বলল, "বেশ করেছ। আশা করি তারই মধ্যে ঠাণ্ডা লেগে যায় নি।"

বলতে বলতেই দুখনী এল চাঁপাবৌএর ঘর থেকে নিরুপমার রাতের খাবার নিয়ে। জগন্নাথকে দে'খে বলল, "মিস্তিরির জন্তেও কি খাবার নেব?"

জগন্নাথ থাকবে না রাত্তিরে, নার্সিং হোমে ফিরে গিয়ে শোবে, কাজেই খাবেও সেখানে ফিরে গিয়ে। কিন্তু খাবারের ঢাকা খুলে দেখা গেল, চাঁপাবৌ দুজনেরই মত খাবার পাঠিয়েছে। দুখনী জানত না সেটা। হয়ত বেশী পাঠাতে হয় বলেই পাঠিয়েছে, কিন্তু এতটাই বেশী পাঠিয়েছে দেখে মনে হয়, জগন্নাথ যে আসবে সেটা জানত চাঁপাবৌ।

রাত তখন প্রায় দশটা। একতলায় তার অফিস ঘরে ব'সে বিকাশ একটা আবকারী মামলার ফাইলে মনোনিবেশ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, এমন সময় সদর দরজায় ঘণ্টা বাজল। বিকাশ দরজা খুলে দেখল, আঁটসাঁট ছিপছিপে গড়নের লম্বাটে অল্পবয়সী একটি মানুষ, একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হতে পারে মক্কেল, নাও হতে পারে। বলল, "কি চাই?"

জগন্নাথ বলল, "আপনি ত বিকাশবাবু?"

"হ্যাঁ, আসুন ভিতরে।"

"আগে আপনি চলুন, আপনার বোনের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি ব'সে আছেন ঐ গাড়ীতে।"

নিরুপমা আজ আসবে না বলেছিল, হঠাৎ কি হ'ল তার ভেবে একটু ভয়ই পেল বিকাশ। ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে বলল, "গাড়ীতে কেন ব'সে আছ, কি হয়েছে ?"

নিরুপমা বলল, "কিছুই হয়নি বাবা। যে জটগুলো ছাড়াবার জন্তে একটা দিন দেরি করতে চাইছিলাম, সেগুলো ছাড়ানো হয়ে গেছে, তাই ভাবলাম, একটা রাতই আর শুধুশুধু বাইরে থাকি কেন, চ'লে আসি বাড়ীতে। বাবা হয়ত ঘুমিয়ে গেছেন, তাঁকে জাগিও না। অন্তু শন্তু যদি জেগে থাকে ত এবারে তাদের জানিয়ে দাও আমার কথাটা। নয়ত, হঠাৎ আমাকে দেখলে ভড়কে যেতে পারে।"

বিকাশ বলল, "কেউ ঘুমোয়নি। তার কারণ, যদিও তোমাকে ব'লে এসেছিলাম, তোমার কথা এদের বলব না আজ, কিন্তু পারিনি, ব'লে ফেলেছি। সেই থেকে বাবা তোমার জন্তে একটা ঘর গোছাচ্ছেন, আর অন্তু-শন্তু যখন শুনল, আজ তুমি কিছুতেই আসবে না, আর তোমাকে দেখতে যাওয়াও চলবে না তখন কি আর করে, ঘর গোছানোর কাজে বাবাকেই নানারকম পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করছে। তবে দুভাই কোনো-দিন কোনো বিষয়েই একমত হতে পারে না ব'লে এত বেশী ঝগড়া করছে, যে তাদের নিজেদের ঘুম পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে, আর আমি পালিয়ে এসে ব'সে আছি একতলার ঐ ঘরটায়। এস, নামো, চল যাবে তোমার নিজের বাড়ীতে, পাঁচ বৎসর পরে।"

"আচ্ছা, যাই মাসী," ব'লে জগন্নাথ চ'লে যাবার পর নিরুপমার মনে হ'ল, দাদার সঙ্গে ওর পরিচয় ক'রে দেওয়া বোধহয় উচিত ছিল। যাক সে যাক, সেটা কালকেও হতে পারবে। বলল, "এই যে ছেলেটি চ'লে গেল, এরই নাম জগন্নাথ, যার কথা আজ সকালে তোমাকে বলেছি।"

বাড়ীটাতে ঢুকতে পা কাঁপছে নিরুপমার। দুড়দুড় করছে তার বুক। এটা যে তার নিজের বাড়ী তা মনে হচ্ছে না যেন। নীচে করিডরের ডান দিকে বিকাশের অফিস ঘর। "একটু এখানে ব'সে যাই ?" ব'লে সেইটেতে ঢুকে পড়ল নিরুপমা।

বিকাশ বলল, "সেই ভাল। কিছুক্ষণ এইখানেই বস তুমি। হয়ত তোমার ঘর গোছানো শেষ হয়নি এখনো। অন্তু-শন্তুকে এইখানেই ডাকি, তাতে সেটাও তাড়াতাড়ি হবে। পরে উপরে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা ক'রো।"

খবর পেয়ে তড়বড় ক'রে সিঁড়ি নেমে ছোট দুভাই ঢুকল এসে ঘরে। নিরুপমা উঠে এগিয়ে গেল তাদের দিকে। কিন্তু বোন আর ভাইদের মধ্যে আজ পাঁচ বৎসরের ব্যবধান। যেজন্তে তাদের তক্ষুণি বুকে চেপে দিতে পারল না নিরুপমা। কত বড় হ'য়ে গিয়েছে অন্তু, কি সেল্লায় লম্বা হয়েছে এই বয়সেই। এমনি কোথাও দেখলে চিনতেই পারত না নিরুপমা। সহজে চিনতে পারত না শন্তুকেও। সে বেড়েছে বহরের দিকে বেশী।

এরা দিদিকে আনতে যাবে ব'লে বিকেলে খুব নাচানাচি শুরু করেছিল, কিন্তু এখন নিরুপমার সামনে এসে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

নিরুপমাও ত অনেক বদ্‌লেছে ? ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী যে ছিল, তার দেহে এখন যৌবনের পরিপূর্ণতা। চোখের দৃষ্টি, মুখাকৃতি, কিছুই আর আগের মত নেই।

অন্তু শন্তু দিদিভাইয়ের কৈশোরের চেহারাটাই দেখবে আশা ক'রে এসেছিল, এখন তার এই অন্ত মূর্তি দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। এবারে নীরবে তাদের বাহু-বন্ধনের মধ্যে টেনে নিয়ে অশ্রুপাত করতে লাগল নিরুপমা। তারা মাথা নীচু ক'রে রইল। কাউকে কাঁদতে দেখলে তাদের কান্না পায়, কিন্তু দিদিভাইকে এখনো তাদের দিদিভাই ব'লে চিনে নিতে হচ্ছে, তার সামনে ত কান্নাকাটি করা চলে না ? অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে লাগল নিজেদের।

নিরুপমা তাদের মুক্ত ক'রে দিলে তারা টেবিলের অন্তদিকে গিয়ে দুটো চেয়ারে বসল পাশাপাশি।

বিকাশ নিরুপমার চোখ দিয়ে দেখছে অন্তুকে। বলল, "তেরো পেরোয়নি, এর মধ্যে কিরকম লম্বা হয়েছে দেখ।"

চোখ মুছে অঙ্কুর দিকে চেয়ে একটু হেসে নিরুপমা বলল, "বছর আড়াই আগে এই বাড়ীর দুতলার বারান্দায় ওকে বোধহয় একদিন আমি দেখেছিলাম, গাড়ীতে যেতে যেতে। তখনই বেশ লম্বা মনে হয়েছিল ওকে।"

"বিকাশ বলল, বছর আড়াই আগেই হবে, বোধ হয় তোমাকেও একদিন আমি দেখেছিলাম মিরু। মনে হয়েছিল তুমিও আমাকে সেদিন দেখেছিলে। তারপর পথে পথে কত যে ঘুরেছি, আর তোমার দেখা পাইনি। প্রথমটা বুঝতে পারিনি যে তুমি, তা'ই গাড়ীর নম্বরটা দেখে রাখিনি।"

নিরুপমা বলল, "তার আগে আরো কয়েকবার আমি লুকিয়ে ঘুরে গিয়েছি এই বাড়ীটার সামনে দিয়ে। কিন্তু সেদিনের পর আর আসিনি এদিকে, তুমি আমাকে দেখে ফেলেছ মনে ক'রে এতই বেশী ভড়কেছিলাম।"

বিকাশ বলল, "দোনামনা না ক'রে যদি দৌড়ে গিয়ে তখন থামাতাম গাড়ীটাকে ত তোমার অজ্ঞাতবাস থেকে আড়াইটে বৎসর বাদ যেত।"

নিরুপমা বলল না কিছু। সে জানে, এই আড়াই বৎসরের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে আরো অনেক কিছুই বাদ যেত তাহলে তার জীবন থেকে। বাদ যেত দিবাকর, বাদ যেতেন স্নেহশীল বৃদ্ধ দিনকর, পিতৃপ্রতিম সহৃদয় সুহৃদ্ সুজন সান্যাল। সুরূপা, সুনন্দা, অনীমা, মলিনা এরাও তাহলে আসত না তার জীবনে। এদের সকলকে নিয়ে জীবনের একটা পরিপূর্ণতা বোধের মধ্যে সে চলে এসেছিল, এবং তাকে ঘিরে যা জমে উঠেছিল সেটা জীবনেরই সমারোহ। এরা না থাকলে জীবনটার কি নিঃস্ব, রিক্ত চেহারা হ'ত, তা ভাবতে পারে না সে।

শুধু এই আড়াইটে বৎসরই বা কেন? বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসবার পর প্রথম আড়াইটে বৎসর যে জীবনের মধ্যে দিয়ে সে চলে এসেছে, তারও সবটা জুড়েই ছিল একটা পরিপূর্ণতার আস্বাদ। তার সেই বিভীষিকাময় দিনগুলিতেও।

তার সেই দিবারাত্রির ভয়ার্ততা, তারপর সেই ভয় থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে মুক্তি, মুহূর্তে মুহূর্তে সেই ভয়েরই কাছে আবার আত্মসমর্পণ; তার সেই নিরবচ্ছিন্ন জীবন-সংগ্রাম, যে-সংগ্রামে জগন্নাথ তার পাশে ছিল নিত্য সাথী হয়ে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে তাদের সেই সংগ্রামে কত উত্থান-পতন, কত জয়পরাজয়। তার সেই দিন থেকে দিনে এগিয়ে চলার পথে অভিনবর সঙ্গে, অপ্রত্যাশিতের সঙ্গে কত বিচিত্র পরিচয়; এ সমস্তেরই মধ্যে ছিল, সে যে একটা মানুষ, সে যে খুব বেশী করে বেঁচে আছে এই উপলব্ধির নিবিড়তা।

আর যাই হোক, সে যে নেশাগ্রস্তের মত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল না, আধমরা হয়ে ছিল না এইটেই একটা বড় কথা।

আজ সেই জীবনটাকে ছেড়ে আসতে তার কষ্ট হচ্ছে। যদিও জানে সেই জীবনের পথে যে বন্ধুগুলিকে সে পেয়েছে তাদের সে হারাবে না, তবু যে নির্ম্মলা সরেই গিয়েছে বলতে হবে, তার জন্যে শোক করছে নিরুপমা। বারবার অশ্রুসজল হয়ে উঠছে তার চোখ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কাটবার পর একটু উসখুস ক'রে অঙ্কুর দিকে ফিরে শঙ্কু বলল, "দিদিভাই শোবে না?"

দিদিভাইয়ের ঘরে তার বিছানা পাতার তদারক এইমাত্র ক'রে এসেছে সে। শিয়রের কাছে বুককেসের উপরে আরো নানা ফুলদানিতে সাজিয়ে এসেছে গ্ল্যাডিওলি ও রজনীগন্ধা, সেই সঙ্গে রংবেরং এর ফুল। একটা পিরীচে রেখে এসেছে সদ্য ফোটা বেলফুলের মালা।

অঙ্কু বলল, "দেখেছ, দেখেছ? বাড়ীতে একটা লোক এল এতদিন পর, তাকে কোথায় ভাল ক'রে আগে খাওয়াবে, না আগেই বলছে, শোবে না?"

নিরুপমা বলল, "আমি খেয়েই এসেছি অঙ্কু, আর এখুনি শুতে যেতেও ইচ্ছে কর্ছ না। তবে রাত ত অনেক হয়েছে? তোমরা দুভাই গিয়ে শুয়ে পড়।"

অঙ্কু বলল, "শঙ্কুর নিশ্চয় নিজের ঘুম পেয়েছে, তাই বলল, দিদিভাই শোবে না?"

শঙ্কু বলল, "আমার ঘুম পেয়েছে! তোমাকে বলেছে! তুমি গুনতে জানো, না? কেন তুমি মিথ্যে ক'রে বলছ আমার নামে?"

অঙ্কু বলল, "আমি ঠিকই বলছি।"

"ঠিকই বলছ! ঠিকই বলছ!"

প্রায় হাতাহাতি বাধে আর কি দুজনে।

বিকাশ বলল, "তোমরা দুজন উপরে যাও দেখি এখন। গিয়ে বাবাকে বল, দিদিভাই এসেছে। আমি তাকে নিয়ে একটু পরেই যাচ্ছি।"

ওরা চ'লে যাবার পর নিরুপমা বলল, "বাবা কি আমার বিষয়ে কিছু বলেছেন?"

বিকাশ বলল, "তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন তিনি। তবে কেবলই বলছেন, একটা উভয়সঙ্কটে পড়েছি আমরা। যে-কারণেই হোক, ভুল ক'রে হোক, যে ক'রে হোক, একটা লোককে কুপিয়ে কেটে তুমি প্রায় খুনই ক'রে ফেলেছিলে এটা জানলে হয়ত তোমাকে সহজে কেউ বিয়ে করতে না চাইতে পারে। অন্যদিকে, নিবারণের গল্পটাকেই যদি চালু থাকতে দেওয়া যায় ত তোমার বিয়ে হয়ত দেওয়াই যাবে না। তাই বলছেন, দুদিক্ রক্ষা হয় এমন কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখতে।"

নিরুপমা বলল, "দুদিক্ রক্ষা হয়ে যাবে দাদা। তুমি ভেবো না। সে-কথা পরে হবে।"

বিকাশ বলল, "হ্যাঁ, পরেই ত।"

নিরুপমা বলল, "আচ্ছা দাদা। তুমি বিয়ে করেছ?"

"না বোন।"

"একটি মেয়েকে তুমি পছন্দ করেছিলে না? মাধবী না কি যেন নাম?"

"মাধুরী! ওতে আমাতে সাক্ষাৎভাবে কোনো আলোচনা ত কখনো হয়নি? ওর সঙ্গে আলাপও ছিল নামে মাত্র। তবে ওর এবং ওর বাড়ীর অন্যদের খুব পছন্দ ছিল আমাকে তা জানতাম। আমি বলেছিলাম, 'বোনটিকে আগে ফিরে পাই, তারপর বিয়ে করব। নিজেদের বাড়ীর মেয়ে যাদের এইরকম ক'রে খোয়া যায়, পরের মেয়েকে তারা কোন্ মুখে বাড়ীতে এনে তুলবে?' খুব ভাল বলতে হবে, তিন বৎসর অপেক্ষা করেছিল মেয়েটি, আর তার বাড়ীর লোকেরা। তারও ত বয়স হয়ে যাচ্ছিল. অনিশ্চিতের আশায় কতদিন বসে থাকবে?"

গলাটা ধ'রে এসেছিল বিকাশের, তার মুখের দিকে চেয়ে নিরুপমা আর্তকণ্ঠে বলল, "দাদা!" তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তার কান্নার প্রথম আবেগটা কেটে গেলে বিকাশ বলল, "এবার চল বোন, বাবার কাছে যাবে।"

আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নিরুপমার কান্না। বলল, "বাবাকে কি ক'রে মুখ দেখাব আমি? তোমাদেরই বা কি ক'রে মুখ দেখাচ্ছি জানি না। কি দুঃখই না তোমাদের সকলকে আমি দিয়েছি, কেবলমাত্র পাগলের মত ভয় পেয়ে আর বোকামি ক'রে।"

গোড়াতে এই বাড়ীর একতলার ফ্ল্যাটটা নিয়ে থাকত বিকাশ। মহেন্দ্র ও ছোট ভাইদুটিকে আসবে ঠিক ক'রেই সমস্ত বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে।

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে যেতে যেতে নিরুপমা দেখল, পিছনে বাঁদিকে খাবার-ঘর, যার ওদিকে সিঁড়ি, ডানদিকে রান্নাঘর ও একটা বাথরুম।

তাদের ভবানীপুরের বাড়ীটারও প্ল্যান ছিল ঠিক একই রকম। দক্ষিণ-দুয়ারী বাড়ী, সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠে প্রথমেই করিডরের পশ্চিমদিকে বসবার ঘর ও একটি শোবার ঘর। পূবদিকে একটি বাথরুম ও তারপর গায়ে গায়ে দুটি শোবার ঘর।

তিনতলায় একটিমাত্র শোবার ঘর, তাতে মহেন্দ্র থাকেন। পাশে একটি বাথরুম।

দুতলায় উঠে বসবার ঘরের পরের যে ঘরটিতে নিরুপমা থাকবে সেটা তাকে একবার দেখিয়ে দিল বিকাশ। অন্যদিকে দুটি শোবার ঘর; একটি বিকাশের, আর একটিতে অমু শম্ভু একসঙ্গে শোয় আর ঝগড়া করে।

অশ্রুসজল চোখে নিরুপমা লক্ষ্য করল, ভবানীপুরের বাড়ীটা তাদের মা যেরকম ক'রে সাজিয়েছিলেন, এই বাড়ীটাও অনেকটা সেইরকম ক'রে সাজানো। সে বাড়ীতে বসবার ঘরের আসবাবগুলি যেরকম ছিল এবাড়ীতেও অনেকটা তাই। সেই ছবিগুলিই দেয়ালে

ভাগ ঝুলছে দেয়ালে। তক্তাতের মধ্যে সিঁড়ির ধারে ধারে দেয়ালের গায়ে তাদের মায়ের নানা বয়সের একলা বা অন্তরের সঙ্গে তোলা ছবি। বেশীর ভাগ এন্লার্জ করে রঙ করা। তার নিজেরও খুব ছেলেবেলাকার গোটা-তিনেক ছবি রয়েছে সে দেখল। এগুলি ভবানী-পুরের বাড়ীতে ছিল না।

নিরুপমা এসে মহেন্দ্রকে যখন প্রণাম করল, তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ ত মা?"

নিরুপমা বলল, "আমি ভাল আছি। কিন্তু তোমাকে ত একটুও ভাল দেখছি না বাবা!"

একথার উত্তরে মহেন্দ্র কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে। শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

নিরুপমাও এরপর এত কাঁদল যে, সমস্ত বাড়ীটা কেমন যেন থমথমে হয়ে রইল তারপর।

অঙ্কু শঙ্কু ভেবেছিল, খুব একটা হৈ হৈ হুল্লোড় হবে দিদিভাইকে নিয়ে। কিছুই হ'ল না।

[ত্রিশ]

হুল্লোড় শুরু হ'ল, পরদিন বিকেল থেকে, নিরুপমার সব জিনিষপত্র একটা লরীতে চাপিয়ে জগন্নাথ এসে পড়বার পর। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ীর আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল একেবারে। সন্দেহ করবার কোনো অবকাশ রইল না, যে, যে মানুষটি এসেছে সে এ-বাড়ীরই মেয়ে এবং দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তারই প্রতীক্ষাতে ছিল এই বাড়ীটি। নিরুপমার সব জিনিষ তোলা গোছানো ইত্যাদি নিয়ে এমন ব্যবহার সে করতে লাগল যে কারুর বুঝতে বাকী রইল না, নিরুপমার কোথায় কতখানি অধিকার তা নিয়ে কারুর সঙ্গে রফা করতে সে রাজী নয়। তাছাড়া এও মনে হতে লাগল যে এই বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষ, এমন কি ঝি-চাকরদের সঙ্গেও যেন তার বহুকালের পরিচয়।

পরদিন ভোর হতেই সে এল। গোছগাছের যা বাকী ছিল তা ক'রে দিয়ে গেল। আবার এল সন্ধ্যা হতেই। এরপর রোজ দুবেলাই সে আসছে।

একতলায় বিকাশের অফিসঘরের ঠিক পিছনে খাবার ঘর, তার পিছনে সিঁড়ি। সিঁড়ির ঠিক উল্টো দিকে, করিডরের ওপাশে প্রথমে একটি বাথরুম, তারপর রান্নাঘর যেটা খাবার ঘরের ঠিক মুখোমুখি, তারপর রাস্তার উপরকার একটি ঘর যেটা বিকাশের অফিস ঘরের মুখোমুখি। বিকাশ ব্যস্ত থাকলে বাইরের লোকরা এই ঘরটিতে অপেক্ষা করে। ঘরটিতে আসবাব সামান্যই, এবং কেউ থাকেও না বেশীর ভাগ সময়। তাই দেখে-শুনে এই ঘরটিতেই আস্তানা গাড়ল জগন্নাথ।

অঙ্কুশঙ্কু দুজনের সঙ্গেই তার ভাব, যদিও শঙ্কুর সঙ্গেই তার জমে বেশী। ঘরটাকে খালি পেলেই দুভাইকে ডেকে নিয়ে এসে সে আসর জমায়। দুভায়ের পড়াশোনা এখন কিছুদিনের মত তাকে উঠেছে। এ নিয়ে তাদের কেউ কিছু বলছেও না।

ক'দিন যেতেই মনে হতে লাগল, অঙ্কুশঙ্কু দিদিকে ফিরে পেয়ে যতটা খুশী হ'য়েছে, জগন্নাথকে পেয়ে খুশী হয়েছে যেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

হবেই বা না কেন? জগন্নাথ না পারে কি? ঝাল-মুড়ি খেয়ে ঠোঙাটায় ফুঁ দিয়ে এক চাপড়ে সেটাকে ফটাস ক'রে ফাটায়, অঙ্কুশঙ্কুও ঐরকম ক'রে ঠোঙা ফাটাতে শিখছে দু'দিন ধ'রে। রুমাল দিয়ে লম্বা দুটো কানওয়ালা খরগোস বানাতে পারে সে, সেটার মাথায় হাত বুলোলে সেটা প্রচণ্ড একটা লাফ মেরে দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। তখন বোঝা যায় তার কান-দুটোই আছে, আর কিছু নেই। কাগজ ভাঁজ করে পাখী বানায়। সে-পাখীদের ল্যাজ ধ'রে টানলে তারা ডানা ঝাপ্টায়।

এক-একদিন খুব ভোরেই সে চ'লে আসে। তারপর দুভাইকে ডেকে জাগিয়ে ঢাকুরিয়ার লেকে নিয়ে চ'লে যায়। সেখানে একদিন পদ্মাসন ক'রে ব'সে দুইহাতে

অনেকটা দূর হেঁটে চ'লে গেল সে। একদিন পা শূন্যে তুলে হাতে হাঁটল। একদিন একটি ছেলের কাছে তার সাইকেলটা চেয়ে নিয়ে হাতল না ধ'রে সেটাকে শুধু সোজা পথে নয়, একটা মোড় ঘুরেও সে চালাল। এইসব ক'রে দুভায়ের একেবারেই মনোহরণ ক'রে নিয়েছে সে।

এর উপর আবার অম্বুকে সে গাড়ী চালাতে শেখাবে বলেছে। আর বলেছে, "তুমি বলবে, তোমার কুড়ি বৎসর বয়স। কেউ অবিশ্বাস করুক দেখি? মারব না চাঁটি? আমি বলব, আরে ও ত বয়স কমিয়ে বলছে। সরকারী চাকরিতে ঢুকতে যাচ্ছে কিনা?"

বিকাশকে সে বলেছে, যদি এক-দেড় হাজার টাকায় পুরনো একটা অষ্টিন, বা মরিস, বা উল্‌স্লি, বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ী সে কেনে, ত সেটাকে এমন করে সারিয়ে দেবে, যে পাঁচ হাজার দিয়ে যে কিনবে, সেও ভাববে, খুব একটা দাঁও মারা গেল।

অম্বু-শম্বু এই নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে দাদাকে রাজী করাবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে।

আবার অন্য দিকে, দিদি ভাই কি করছে দেখে এস, দিদি ভাই ঝালমুড়ি খেতে চায় কি না জেনে এস, দিদি ভাইয়ের কাছ থেকে তার নখ কাটবার কাঁচিটা চেয়ে নিয়ে এস, এইসব কাজের ভার দিয়ে আর করিয়ে দিদি-ভাই সম্বন্ধে দু-ভায়ের সঙ্কোচটাও আস্তে আস্তে কাটিয়ে দিচ্ছে সে।

ইতিমধ্যে বিকাশ আর মহেন্দ্রর সঙ্গে দিবাকরের আলাপ করিয়ে দিয়েছে নিরুপমা। তারপর থেকে তাকে আর বাড়ীতে এনে বেশী তোলে না। রোজই তাদের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু একান্তে দিবাকরের হিলম্যান মিংক্‌স্ গাড়ীটাতে। বেশীর ভাগ প্রিন্সেপঘাটের কাছে সেই নিরিবিলি রাস্তাটায়, কখনো বা দক্ষিণদিকে কতগুলি গাছের ভিড়ের মধ্যে, কখনো বা লেকের বালিগঞ্জ ময়দানের পাশে দুটো বাড়ীর উঁচু পাচিল ঘেরা বাগানের মাঝখানকার একটা প্রায়ান্ধকার গলিতে। গাড়ী ছোট হওয়ার যে কত সুবিধা তা দুজনেই উপলব্ধি করছে তারা এই ক'দিন ধ'রে।

দিবাকরের বক্ষলগ্ন হয়ে ব'সে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল নিরুপমা, "আচ্ছা, আমার দুটো নামের-মধ্যে কোনটা তোমার বেশী পছন্দ? দেখছি, তোমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে।"

দিবাকর বলেছিল, "তুমি নির্ম্মলা, তুমি নিরুপমা, দুটিই সুন্দর নাম আর দুটিই তোমার যোগ্য নাম। কিন্তু তোমার যে নামটি এতদিন জপ করেছি মনে মনে, সেটিকে ভুলি কেমন ক'রে?"

নিরুপমা বলেছিল, "কি দরকার ভুলবার? দুটো নাম ত অনেকেরই থাকে, আমারও থাকুক। তুমি আমাকে নির্ম্মলা বলেই ডেকো। অন্য যারা আমাকে নির্ম্মলা ব'লে জানত তাদেরও কাছে ঐ নামটাই বাহাল থাকুক আমার। বাবা আর দাদা আমাকে নিরু ব'লে ডাকেন, তা আমার নাম নির্ম্মলা হলেও হয়ত ঐ বলেই ডাকতেন।"

দিবাকরকে নিয়ে খুব শীগ্‌গিরই একদিন নার্সিংহোমে গেল নিরুপমা। সবাই হাসিতে মুখ ভরে এমন ক'রে ভিড় করে এল তাকে ঘিরে, যে ভীষণ লজ্জা করতে লাগল নিরুপমার। পালিয়ে গিয়ে সুরূপার বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্রয় নিল সে। সুরূপা অশ্রুসজল চোখে নিঃশব্দে তার মাথায় পিঠে হাত বুলোল অনেকক্ষণ ধ'রে।

দিবাকরকে সঙ্গে করে সুজনের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেল, তিনি অন্য কথার মধ্যে একবার হেসে বললেন, "নার্সের কাজ বাড়ীতে ত থাকবেই তোমার, কাজেই নার্সিং হোমটাকে miss করবে না বেশী।"

নিরুপমা বলল, "না, না, খুব বেশীই miss করব। তবে কিনা, খুব বেশী দূরে ত যাচ্ছি না, যখনই পারব এসে আপনাকে প্রণাম করে যাব।"

সুজন বললেন, "তাই এসো। আমি খুব খুশী হয়েছি দিবাকর, তবে না বুঝে তোমাদের ছাড়াছাড়ি করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম কিছুদিন, তা ভেবে এখন লজ্জা পাই।"

দিবাকর বলল, "ছি, ছি, কি যে বলেন! আমরা ত জানি, আমরা পরস্পরকে যে পেতে যাচ্ছি সে

আপনারই জন্তে। আপনি দয়া ক'রে নিরুপমাকে আশ্রয় না দিলে সে কোথায় দাঁড়াত আজ? আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনোকালে শোধ হবে না।"

সুজন বললেন, "না, না, কি আর এমন আমি করেছি? আমাকে ত তাহলে বলতে হয়, এর মত এমন একটি নাস´ যে আমি পেয়েছিলাম, সেও ত বহু ভাগ্যের কথা।"

ওরা যখন যাবার জন্তে উঠছে, তখন বললেন, "আচ্ছা শোন! জগন্নাথকে নিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছি আমি। সকাল-বিকেল কোনো সময়েই নার্সিং হোমের ধারে-কাছে সে থাকে না। যে-সময়টা থাকে, তারই মধ্যে কাজ যা তার তা সে শেষ ক'রে দেয় সেটা ঠিক, কিন্তু অনিয়মটা ডিসিপ্লিনের দিক্ থেকে ভাল হচ্ছে না। তাই ভাবছি ওকে আপাততঃ মাসখানেকের জন্তে ছুটি দিয়ে দেব। তোমরা কি বল?"

ওরা আর কি বলবে?

জগন্নাথ মহা খুশী। একতলায় যে ঘরটায় তার আস্তানা, সেইটেতেই সে থাকবে, শোবে ঠিক হয়ে গেল। ঘরে যে চেয়ারগুলি ও একটা বেঞ্চি ছিল সে-গুলিকে বের ক'রে করিডরে সাজিয়ে রাখা হ'ল। বিকাশের সঙ্গে দেখা করতে এসে যারা অপেক্ষা করবে তারা ঐখানে বসবে। সন্ধ্যার পর বস্তির বাড়ী থেকে নিজের নেয়ারের খাটটা অনেক কসরৎ ক'রে একটা রিক্শায় চাপিয়ে নিয়ে এল সে।

অম্বুশম্ভুও খুব খুশী। শম্ভু প্রস্তাব করল, সেও এক-তলায় ঐ ঘরটাতে শোবে, এবং তারও একটা নেয়ারের খাট চাই। অবশ্য সে প্রস্তাব কেউ কানে তুলল না, মাঝের মধ্যে সে মাথায় অম্বুর চাঁটি খেল গোটা-দুইতিন।

এর অল্প কিছুদিন পরে একদিন বাবাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল দিবাকর। দিনকর সিঁড়ি উঠবেন না ব'লে একতলায় বিকাশের অফিসঘরে দুই বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হ'ল। দিনকর বললেন, "আপনি মেয়ে ফিরে পেয়েছেন, আমিও যাতে পাই এবারে তার ব্যবস্থা করুন?" তাঁর চোখে জল।

মহেন্দ্র বললেন, "আপনি আদেশ করলেই সেটা করব। কবে হলে আপনার সুবিধে বলুন।" তাঁরও চোখে জল।

দিনকর বললেন, "আমার আর সুবিধে অসুবিধে কি? তবে মাকে এতকাল পরে ফিরে পেয়েছেন, এখন কিছুদিন তিনি আপনাদেরই কাছে থাকুন, তার পর দিনক্ষণ দেখে' কোনো একসময় দুই হাত এক করে দেওয়া যাবে।"

উপর থেকে পাঁজিটা আনতে পাঠালেন মহেন্দ্র।

দিবাকরের সঙ্গে নিরুপমার বিয়ের আয়োজন এরপর দুবাড়ীতেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। বর-কনেকে হিসেবে না ধরলে, এই বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ মনে হচ্ছিল জগন্নাথেরই সবচেয়ে বেশী। দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এই উৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছে তার। প্রকাশ পাচ্ছে তার সদা-হাস্যময় প্রফুল্লতায়।

দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাবার পর নিমন্ত্রণ যাদের করা হবে তাদের নামের লিস্ট করা, সলাবিদা ক'রে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপানো—কিছু বাংলায়, কিছু ইংরেজীতে,—তারপর সেগুলিকে খামে পুরে নাম-ঠিকানা লিখে কিছু ডাকে দিয়ে বাকীগুলিকে বাড়ীর মেয়েদের দু-একজনকে সঙ্গে ক'রে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে "নিশ্চয় যাবেন কিন্তু" ব'লে আসা, এ ধরণের অল্প কয়েকটি কাজ ছাড়া বাকী আর সমস্ত কাজে দেখা গেল জগন্নাথ একাই একশ।

নিমন্ত্রণের ব্যাপারেও দেখা গেল, কিছু বক্তব্য আছে তার। বলেছিল, "আচ্ছা মাসী, কাশীপুরে সুধীরদের বাড়ী একটা চিঠি পাঠালে হয় না?"

নিরুপমা বলেছিল, "তোমার ঐ মামাবাবুটি তাহলে সর্বাগ্রে এসে হাজির হবেন ত?"

জগন্নাথ বলেছিল, "ওটিকে বাদ দিয়ে? অবিশ্যি ও এলেই বা কি? এসে দে'খে যেত। থোঁতা মুখ ভোঁতা হত।"

নিরুপমা বলেছিল, "না, না, কি দরকার? যাঁদের ডাকতে চাইছ তাঁরা হয়ত আসবেনই না। হয়ত আমাদের সম্বন্ধে খুবই নীচু ধারণা নিয়ে তাঁরা ব'সে আছেন। গাল বাড়িয়ে চড় কেন খাবে? নয়ত সুধীর প্রবীর এলে খুব ভালই লাগত।"

জগন্নাথ বলেছিল, "আমি অবিশ্যি একদিন ঘুরে এসেছি মাসী। এখন ত আর লুকোবার বা ভয় পাবার কিছু নেই? কি শুনে এসেছি বল ত মাসী?"

নিরুপমা বলেছিল, "কি শুনেছ?"

জগন্নাথ বলেছিল, "গিন্নীমার আবার ছেলে হচ্ছে। আর কি শুনেছি মাসী বল ত?"

"কি, শুনি?"

"লতুদিদিরও ছেলে হচ্ছে।"

"যাও, পালাও এখান থেকে।"

আর একদিন বলল, "শৈল বোঠান, চাঁপাবৌ, এদের ডাকবে না?"

নিরুপমা বলেছিল, "বেশ ত, ডাকো। কিন্তু ওদের স্বামীদের যেন ডাকতে ভুলে যেয়ো না, কারণ সে হলে তারা আসবেই না। আর দিলীপ, রঘু, পিণ্টু, নারাণ, বাবলু, এদেরও ডাকছ ত?"

জগন্নাথ বলল, "ডাকছি মানে? ওরা কি ডাকার অপেক্ষায় বসে থাকবে ভাবছ নাকি তুমি? না কি ভাবছ, ওরা নেমন্তন্ন খেতে আসবে? ওরাই ত এসে সব ক'রে কম্মে দেবে।"

'গয়লাদের, ধোপাদের, দুখনীকে, তিনুকেও আনতে ব'লো জগন্নাথ।"

"সে ত বলতেই হবে। তিনু নিজেই এর মধ্যে বার তিনচার এসে ঘুরে গিয়েছে। আমাদের চাল ডাল তেল নুন এইসব তাদের দোকান থেকেই নেব।"

পাশের পোড়ো জমিটায় মিস্ত্রিরা বাঁশ নিয়ে এসে ফলছে। তারা বাঁধবে বাড়ী রঙ করবার জন্যে। তাদের কাজের তদারক করতে চ'লে গেল জগন্নাথ।

কতগুলি কাজের সম্পূর্ণ ভার জগন্নাথের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিকাশ নিজে অন্য কতগুলি কাজ নিয়ে রয়েছে। তারও বিশ্রাম নেই। অক্ষুশঙ্করও বিশ্রাম নেই, তবে তারা যে ঠিক কি করছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

শ্যামপুকুর থেকে নিরুপমাদের দূর সম্পর্কের পিসীমা রঞ্জনবাসিনী সকন্যা বেড়াতে এলেন একদিন। পাঁচ-বৎসর আগে সুধীরের জন্মদিনে সুরবালাদের কাশীপুরের বাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। নিরুপমা সেদিন সেখানেই ছিল আর তিনি যে গিয়েছিলেন তাও জানত। শুনে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে থেকে বললেন, "মা গো মা, পাঁচ-পাঁচটা বৎসর তুমি এই ক'রে কাটিয়েছ? ধন্যি মেয়ে তুমি যা হোক।"

তাঁর বছর-বারো বয়সের মেয়ে কাজল, এসে অবধি সারাক্ষণ নিরুপমার একটা হাত ধরে চুপ করে বসে রইল আর প্রায় একদৃষ্টে দেখল তাকে। যখন জলখাবার এল, তখনো একটা হাতে নিরুপমার হাতটা ধ'রে রেখে সে খেল।

একদিন নৃপতি এল সুনন্দা ও সুরূপাকে সঙ্গে ক'রে। সুনন্দা এসেই কলকণ্ঠে গল্প জুড়ল তখন উৎসব-বাড়ীর মত মনে হতে লাগল বাড়ীটাকে। নিরুপমাকে এক ফাঁকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে সুনন্দা বলল, 'আমি ওকে কথা দিয়েই ফেলেছি বিয়ে করব ব'লে।"

নিরুপমা বলল, "বেশ করেছ। সুরূপাদি জানেন?"

সুনন্দা বলল, "না জানলে আসতেন আমাদের সঙ্গে ভেবেছ? তেমন মেয়ে সুরূপাদি নয়।"

"আর ডাক্তার সান্ন্যাল?"

"আমি বলতে গিয়ে ফিরে এলাম। পারলাম না। সাহস হ'ল না। নৃপতিকে দিয়ে বলিয়েছি।"

সুরূপাও এসে তখন জুটেছে সেখানে। নৃপতি আর বিকাশের সঙ্গে বসবার ঘরে গল্প করছিল এতক্ষণ, জগন্নাথ এসে এইমাত্র বাবু দুজনকে ডেকে নিয়ে গেছে ছাতে। সেখানে রান্নার জায়গা করা হবে। তাতে মেয়েদের তদারক করবার সুবিধেও হবে আর ঠাকুর-চাকর-ঝি ইত্যাদির কলহ কোলাহল নিমন্ত্রিতদের কানে আসবে না। মাঠের দিকে প্যারাপেটের ধারে কাৎ করা বাঁশের গায়ে চারটে কপিকল বসিয়েছে সে। এদের সাহায্যে দড়িতে ঝুলনো বড় বড় ঝুড়ির লিফ্‌টে ক'রে খাবার ভরতি বাসন নীচে নামবে, আর শূন্য বাসন উপরে উঠবে। উপরে নীচে কথার আদান-প্রদানের জন্যে সরু নলও একটা বসাবার প্ল্যান আছে তার।

নিরুপমা বলল, "ডাক্তার সান্যাল শুনে কি বললেন?"

সুনন্দা বলল, "জানতে চাইলেন, নার্সের কাজটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি কি না। আমি নৃপতিকে বলেই নিয়েছি যে, কাজটা আমি ছাড়ব না। উনি একপাল নার্স নিয়ে ওখানে বিহার করবেন, আর আমি বাড়ী ব'সে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলব, তাঁর জামা ইস্তিরি করব, জুতো পালিশ ক'রে দেব, সেরকম মেয়ে যে আমি নই তা ত জানই তোমরা। তাছাড়া নিজে অন্তরের নিয়ে যা করেছি, অন্য নার্সরাও যে তাকে নিয়ে সেইরকম কিছু করবে না তা জানব কি ক'রে? মাথা ঘুরে যাবে অনেকেরই। অমন আর একটি কালো মাণিক পাবে কোথায়?"

কালো মাণিকটি এইসময় নীচে এলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এল ফেরার তাগিদ। ডিউটি রয়েছে তিন জনেরই।

বড়দিনের আর অল্পই বাকী। ক্রিস্টমাস ইভ-এ সুরূপা পার্টি দিচ্ছে তাদের কোয়ার্টার্সে, নিমন্ত্রণ করল নিরুপমা আর দিবাকরকে। বলল, "তোমাদের ত এখন এক প্রাণ এক টিকিট, ওকে আর আলাদা ক'রে বলছি না।"

নিরুপমার মনে পড়ল, মলিনা বলেছিল, বড়দিনের সময় বড় করবে কুকীর্ত্তি একটা।......"লাট-বেলাটগো একটারে ফেলাট কইরা ফালামু।" মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তার।

সুরূপা সেটা লক্ষ্য ক'রে বলল, "কি হ'ল?"

নিরুপমা বলল, "মলিনাকে মনে পড়ল হঠাৎ।"

সুরূপারও মুখ গম্ভীর হ'ল, বলল, "বেচারী মলিনা। অবশ্য একসময় তোমার পেছনে বড্ড বেশী লেগেছিল।"

নিরুপমা বলল, "তুমি সেটা জানতে সুরূপাদি?"

সুরূপা বলল, "তা আর জানতাম না?"

এরপর কিছুদিন অবিশ্রান্তভাবে চলল বাড়ীর বাইরে ভেতরে চুনকাম করানো, দরজা-জানালা, সিঁড়ির রেলিংএর কাঠে রঙ ধরানো, রান্নার ঠাকুর ও জোগানদার ঝি-চাকর খুঁজে বের ক'রে তাদের দাদন দিয়ে আটকে রাখা, শানাইয়ের দল বায়না করা, ডেকোরেটারদের সঙ্গে বিয়ের আসর, খাওয়া-দাওয়ার আসরের সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনা ক'রে সেগুলি কিরকমের হবে তা মোটামুটি ঠিক ক'রে রাখা, এই ধরণের সব প্রস্তুতির পর্ব। এ-সমস্তেরই ভিতরে জগন্নাথকে থাকতে হচ্ছে, সে থাকছে।

বিয়ের দিন-দুই আগে থেকে চালডাল ঘি ময়দা, তেল-নুন-চিনি, নানারকমের মশলাপাতি কেনাকাটার কাজ, ছাতের উপর ইঁট সাজিয়ে তার উপর উনুন পাতা, ছানা-খোয়াক্ষীর-সুজি-চিনি কিনে এনে ভিয়েন বসানো, রান্নার বাসনকোসন ভাড়া করা, জলের ড্রাম জোগাড় ক'রে টিউবওয়েলের জল দিয়ে সেগুলিকে ভর্ত্তি করা, মাটির খুরি গেলাস চৌবাচ্চার জলে ডুবিয়ে রাখা, এই ধরণের অসংখ্য কাজের তদারক করছে জগন্নাথ। দশটা কাজের সঙ্গে দুটো অকাজও ত হয়? সেই দিকেও দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে তাকে।

বিয়ের দিন ভোর থেকে শানাই বাজছে।

বাড়ীতে ক'দিন ধরেই মেয়েদের ভিড়। দুঃখের দিনে কেউ নাই বা এল, সুখের দিনে যে আসে সেটাই কি কিছু কম? বিজনবাসিনী ছাড়াও নিরুপমাদের নিকট ও দূর সম্পর্কিত কয়েকজন মহিলা এসে রয়েছেন বাড়ীতে। ছোটরাও এসেছে তাঁদের কারও কারও সঙ্গে। রাত্তিরে ঢালা বিছানা পাতা হচ্ছে সব ক'টা ঘরে।

সারাদিন একে ওকে তাড়া দিয়ে, অসংখ্যবার উপর নীচ ক'রে কাটল জগন্নাথের। বিকেলের দিকে কনে সাজানো শুরু হয়েছে। সিঁড়ি উঠতে নামতে জগন্নাথ কয়েকবারই দেখে গিয়েছে নিরুপমার ঘরের সব ক'টা দরজাজানালা বন্ধ। যে মেয়েদের ভিতরে জায়গা হয়নি, বা যারা ভিতরে যেতে চায়নি, তারা বাইরে বসবার ঘরটায় ভিড় ক'রে আসর জমাচ্ছে।

আজ তার আর তার মাসীর মধ্যে এরা এসে সব দাঁড়িয়েছে। এরা কারা? কোথায় ছিল এতদিন? কোথায় ছিল যতদিন দুর্ব্বহ দুঃখের বোঝা তাদের দুজনকে ভাগাভাগি ক'রে বইতে হচ্ছিল, হাত ধরাধরি ক'রে দুর্গম পথ চলতে হচ্ছিল হোঁচট খেতে খেতে?

......আমিও ত সেইদিকেই যাচ্ছি মাসী, যেদিকে দু'চোখ যায়......

উপরের কপিকলে ঝুড়ির লিফ্‌টগুলি চালু ক'রে দিয়ে সেগুলির ওঠা-নামা দাঁড়িয়ে কয়েকবার দে'খে সিঁড়ি নামছে, দেখল, নির্মলার ঘরের যে-দুটো জানলা বসবার ঘরের দিকে, তার একটা খোলা। মেয়েরা সেখানে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। বসবার ঘরের ভিতরে ঢুকে দুপা এগিয়ে গেল, তারপর কি মনে হ'ল, নীচের থেকে শঙ্কুকে জুটিয়ে নিয়ে এল। বর আনতে বিকাশের সঙ্গে বেলেঘাটায় যাবে ব'লে অঙ্কু তখন নিজেই সাজতে ব্যস্ত। বাড়ীর এতসব সমারোহ ফেলে বেরুতে শঙ্কুর মন চাইছে না, তাই দাদাদের সঙ্গে সে যাচ্ছে না।

কনে সাজানোর প্রথম পর্ব্বে চুল বাঁধা, শাড়ী জামা পরানো এবং মুখচোখ হাত-পা ইত্যাদির কিছু কিছু অন্তরঙ্গ প্রসাধন শেষ হয়ে গেলে বন্ধ ঘরের ভিতরে বহুলোকের নিঃশ্বাসে গুমোট হচ্ছে বলে যারা সাজাচ্ছিল তারা বসবার ঘরের দিকের ও করিডরের দিকের একটা ক'রে জানালা খুলে দিয়েছিল। রাস্তার দিকের জানালা-গুলো অবশ্য বন্ধই রইল।

শঙ্কুকে সঙ্গে ক'রে এসে, তাকে সামনে রেখে জগন্নাথ দাঁড়াল করিডরের দিকে খোলা জানালাটার একপাশে। ক্রমে অবশ্য সেখানেও মেয়েদের আর একটা ভিড় জমল। নিরুপমার তখন পায়ে আলতা পরানো হচ্ছে, কপালে পরানো হচ্ছে সিঁদুরের টিপ, মুখে আঁকা হচ্ছে চন্দনের পত্রলেখা। গয়নার কিছু অদলবদল হচ্ছে, কিছু নতুন পরানো হচ্ছে। কখনো একটু এদিকে, কখনো বা একটু ওদিকে স'রে গিয়ে, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, যেটুকু যখন পারছে দেখে নিচ্ছে জগন্নাথ। মেয়েদের ভিড় যত বাড়ছে ততই পিছিয়ে পড়ছে সে, কিন্তু জানালাটার কাছ থেকে নড়ছেও না। দুই চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে তার মাসীর নীর মত রূপ ও রূপসজ্জা দেখছে সে। এমন তন্ময় হয়ে দেখছে; যেন তার চোখের দৃষ্টিই শুধু আছে, চেতনা নেই।

জানালার এদিকে ওদিকে, এঘরে ওঘরে যারা রয়েছে, তারাও সেজেছে খুব, আর তাদের মধ্যে সুন্দরীরও অভাব নেই। কিন্তু জগন্নাথ যখনই একটু সচেতন হয়ে এদের দিকে দেখছে, তার মনে হচ্ছে, নিরুপমার পাশে মিটমিট করছে এরা, যেন হেড লাইটের পাশে সাইড লাইট।

জগন্নাথ তার মাসীকে নার্সের পোশাকে দেখেছে, খুব ভাল লাগেনি তার। বাকী সময় তার মাসী অত্যন্ত সাধারণ রকমের শাড়ীজামা প'রে থাকত। যখন বাইরে বেরুত তখন একটু চওড়া পাড়ের তাঁতের সাদা শাড়ী আর তার সঙ্গে সাদা নয়ত খুব হালকা রঙের জামা, এই পরত সে। অবশ্য সব-কিছু এমন মানিয়ে পরত যে ঐ অল্প সাজেই তাকে মনে হ'ত যেন রাজকন্যা। কিন্তু আজ তাকে এমনই দেখাচ্ছে যে তার দিক্ থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না জগন্নাথ। দুই চোখ ভ'রে তার মাসীর এই আশ্চর্য্য রূপ দেখছে আর অশ্রুসজল হয়ে উঠছে তার দৃষ্টি।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই করিডরে ভিড় এত বাড়ল যে, জগন্নাথকে আরোই দূরে স'রে যেতে হ'ল। এখন তার মাসীকে আর দেখতে পাচ্ছে না সে। তার এই পিছিয়ে পড়া, মাসীর কাছ থেকে দূরে স'রে যাওয়া, এগুলি ক্রমশঃ একটা রূপকের রূপ নিচ্ছে তার মনে। মনটা খুশী হওয়ার বদলে ভার হয়ে উঠছে।

"এস, দিদিকে দেখবে," ব'লে একজন বর্ষীয়সী মহিলা শঙ্কুকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর মানে হয় না কিছু ব'লে নেমে যাবে ভাবছে, এমন সময় আরও কয়েকটি মেয়ে তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। আঘাত করা বা অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, তাদের একজন হাল্‌কা রসিকতার ছলে চাপা গলায় বলল, "এ কে ভাই? এই প্রমীলার রাজত্বে একলা এসে ঢুকেছে? সাহস ত খুব!"

জগন্নাথের মনে হ'ল, কে যেন তার গালে খুব ক'ষে চড় মারল একটা। নীচে নেমে এল আর দেরি না ক'রে।

কিন্তু বর সভায় হবার পর কনেকে যখন বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হ'ল, তখন সব কাজকর্ম ফেলে সেও চ'লে এল সেখানে। তার মাসীকে একটু কাছে থেকে দেখতে পাবার লোভে মেয়েদের ভিড় ঠেলে সে এগোতে চেষ্টা করল কয়েকবার, দুতিনটি মেয়ের গায়ে এক-আধটু ধাক্কাও লাগল সে-সময়, কিন্তু বহুলোকের আনন্দোৎসবের ব্যাপারে এ নিয়ে কেউ বলে না কাউকে কিছু, ধাক্কা দেওয়াটা ইচ্ছাকৃত মনে না হলে।

বিয়ের আসরের খুব কাছেই রঙী কাপড়-জড়ানো একটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়াবার জায়গা পেল সে। তারপর সেখানে সেই যে দাঁড়াল, বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়ে গাঁটছড়া বাঁধা বর-কনে আসর ছেড়ে চ'লে না যাওয়া পর্য্যন্ত নড়ল না সেখান থেকে। তার সেই ছোট্ট এতটুকুন মাসী, ছোট ইষ্টিশনটার দেয়াল ঘেঁষে যে ব'সে ছিল ছোট একটি পুঁটলি কোলে ক'রে। তার যে এমন রাজরাণীর মত রূপ সেটা কে জানত?

আর ঐ শুভদৃষ্টির সময় চকিতের মত তার মাসীর মুখে যে আশ্চর্য্য হাসির ঝলকটি সে দেখেছে, কে জানত অমন হাসি তার মাসী হাসতে পারে। কেন তার মনে হচ্ছে, ঐ হাসিটি যার মুখে সে দেখল, সে যেন তার মাসী নয়। সে যেন আর একটা কোনো মানুষ।

বিকাশ এসে এই সময় তাকে ধ'রে নিয়ে গেল, পরিবেশনের তদারক করবার জন্যে।

তদারক সে করল, কোথাও কোনো খুঁৎ রেখে করল না, কিন্তু করল কলের পুতুলের মত। তার মাসীর মুখের সেই আশ্চর্য্য হাসির ঝলকটি তার মনে পড়ছে। মনে প'ড়ে তার গলাটা শুকিয়ে উঠছে যে কেন? গলার ঠিক নীচে বুকটা এবং গলারও নীচের দিকটা ব্যথা করছে, আর শরীরটা এত দুর্ব্বল লাগছে যে মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাবে।

এক-একবারে শ-দেড়েক লোক ব'সে খাবে হিসেব ক'রে খাবার জায়গা করা হয়েছিল। প্রথম কিস্তিতে বরযাত্রীদের বসানো হ'ল, আর তাঁদের সঙ্গে বসলেন অন্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যারা খুব দূর থেকে এসেছেন তাঁরা। তারপর আরো তিন কিস্তিতে নিমন্ত্রিতদের প্রায় সকলের খাওয়া হয়ে যাবার পর রয়ে সয়ে পাত পড়ল বাড়ীর লোকদের, পরিবেশনকারীদের ও চাকর-বাকরদের জন্যে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা গাড়ী নিয়ে এসেছেন এবং নিজেরা ড্রাইভ ক'রে আসেননি, তাঁদের ড্রাইভারদেরও এবার ডেকে আনা হ'ল।

বাবুদের থেকে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে এরা বসল, ঝি-চাকররা যেদিকে বসেছিল সেদিকে। দুজন ড্রাইভার নাকি খেতে আসতে রাজী হ'ল না কিছুতেই। কেন রাজী হ'ল না, বুঝতে পারল না কেউ।

কিন্তু জগন্নাথ কোথায়?

অবশ্য ছোট আর-একটা দল বসবে খেতে এরপর যেটা হবে শেষ দল। হয়ত জগন্নাথ বসবে সেই দলের সঙ্গে। হয়ত বর তার কোনো কাজে তাকে পাঠিয়েছে বেলেঘাটায়, দূরের পথ বলে ফিরতে দেরি হচ্ছে।

এই ধরণেরই কিছু-একটা ঘটেছে সাব্যস্ত ক'রে 'আচ্ছা, তাহলে' ব'লে লুচি ভাজতে শুরু করল সবাই।

কিন্তু সত্যিই জগন্নাথ তখন কোথায়?

নিমন্ত্রিতদের শেষ দলটির পাতে চিনিপাতা দই ও তিনরকম মিষ্টি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঢুকেছিল তার একতলার অন্ধকার ঘরটায়। নেয়ারের খাটটায় বেশ কিছুক্ষণ হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে থাকবার পরেও কিছুমাত্র আরাম হ'ল না তার। মনে হতে লাগল, গলার কাছে কি একটা যেন আটকে আছে, যেজন্যে বারবার ঢোঁক গিলতে হচ্ছে তাকে। ভাবল, হয়ত বাইরে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালে ভাল বোধ করবে।

রাস্তায় বেরিয়ে এল এবং একবার বেরিয়ে আসার পর আর ঢুকতে ইচ্ছে করল না বাড়ীটাতে।

চোখে তার কি হয়েছে, আলোর দিকে তাকাতে পারছে না। উৎসবের সব আলোগুলি যেন একজোট হয়ে তাকে তাড়া ক'রে নিয়ে গেল পাশেরই একটা অন্ধকার রাস্তায়। তারপর সেই যে রাস্তা, আর তার যে অন্ধকার, তা থেকে সে মিলিয়ে গেল এক অনির্দ্দেশ্য ভবিষ্যতের গভীরতর অন্ধকারে। কোথা দিয়ে যে গেল,

কেমন ক'রে যে গেল, তার কোন চিহ্ন কোথাও রেখে গেল না।

যেদিকে দুচোখ যায়। আমিও ত সেইদিকেই যাচ্ছি মাসী !……

বেশ খানিকটা পথ চ'লে এসে একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, ফিরে গিয়ে একটুকরো কাগজে লিখে রেখে আসে, মাসী, চললুম, কিছু মনে ক'রো না। কিন্তু জানত, ফিরে গেলে আর চ'লে আসা হবে না, তাই ফিরে গেল না।

ছ'দিনের দিন, যখন সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় তার খোঁজ ক'রে সকলে হাল ছেড়ে দিয়েছে, নিরুপমা চ'লে এসেছে বেলেঘাটায়, তখন জগন্নাথের চিঠি এল।

সে লিখেছে :

মাসী !

কিছু মনে ক'রো না আমি এভাবে চ'লে এলুম ব'লে। চ'লে আসতে যে চাইছিলুম তা কিন্তু নয়; কে যেন ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দিলে রাস্তায়, তারপর আর ফিরে যেতে দিলে না, তাই ত চ'লে আসতে হ'ল।

পথ চলতে শুরু ক'রে মনে হচ্ছিল আমার ব্রেকটা যেন ফেল ক'রে গেছে, থামতে চাইছি কিন্তু পারছি না।

তোমার কাছ থেকেও পালাতে হবে স্বপ্নেও তা ভাবিনি মাসী। কিন্তু কি করব? আমাকে যে দিলে না তোমার কাছে থাকতে। তুমি আমার দোষ ধ'রো না।

আমার গলার কাছটা যেন কেমন করতে লাগল, অনেকখানি পথ ছুটে এলে যেমন হয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল আমার।

কিন্তু মাসী, জানো, যদিও তখন খুব কষ্ট পাচ্ছিলুম, তোমার কাছে থাকতে পেলেই আমি সুখে থাকতুম ?

কিন্তু সুখ কি সকলের কপালে থাকে মাসী? তুমিই বল। কপালদোষে কত কষ্ট তুমিও ত সয়েছ।

তুমি আমার জন্যে ভেবো না মাসী, ভেবে দুঃখু পেও না। আমার দিন কেটেই যাবে কোনোরকম ক'রে। আপন জন বলতে কেউ নেই, এমন কত মানুষ ত আছে এ সংসারে, আমিও তাদের একজন হয়ে থাকব।

যখন আর পারব না তখন ব'সে ব'সে চেতলার বাড়ীর সেই দিনগুলোর কথা ভাবব, যখন চোখ তাকালেই তোমায় দেখতে পেতুম। ভাবব আমাদের ছোট-ঘরদুটোকে। কত যত্ন ক'রে দুজনে মিলে সে-দুটোকে আমরা সাজিয়েছিলুম। বাঁশের বেত তুলে রঙ ক'রে আমি ডালা বুনতুম, কোনোটাতে শালিক পাখী, কোনোটাতে প্রজাপতি, কোনোটাতে ময়ূরপঙ্খী নৌকো, কোনোটাতে জোড়া মাছ। তারপর সেগুলিকে ঘরের দেয়ালে আটকে দিতুম, দেখে তুমি হাততালি দিয়ে হাসতে। শাদা এনামেল পেন্ট দিয়ে দুটো ঘরেরই মেঝেতে কি সুন্দর ক'রে আলপনা এঁকেছিলে তুমি, মনে হ'ত যেন ঠাকুরঘর। কোন্ ভূত বাঁদররা এসে এখন ভাড়া নেবে বাড়ীটা, নোংরা পায়ে মাড়াবে সেই আলপনাগুলিকে।

তখন ত জানতুম না কি কষ্ট মুখ বুজে সয়ে তুমি চলেছিলে। না জেনে আরো কত কষ্ট তোমায় তখন দিয়েছি। তারপর যখন অবস্থা একটু ফিরল, ভাবতুম তোমাকে আরামে রেখেছি, তুমি সুখে আছ! নিজে সুখে ছিলুম কিনা মাসী।

ভিখিরিকে যদি কেউ নিয়ে গিয়ে মুকুট পরিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দেয়, তার যে অবস্থা হয়, চেতলার বাড়ীতে দিনেরেতে তোমাকে দেখতে পাবার মত কাছে পেয়ে আমার অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম হয়েছিল। যেন হাওয়ায় ভর ক'রে চলতুম, মাটিতে পা পড়ত না আমার।

জানতুম না ত, যে, এত শীগগির ঐ বাড়ীর বাস উঠে যাবে?

আমি কূলকে প'ড়ে বয়ে যাচ্ছিলুম। তুমি আমায় ঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছিলে। কি ভয় যে সেদিন পেয়েছিলুম, তুমি ঐ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ মনে ক'রে। যদি সত্যিই তুমি সেদিন চ'লে যেতে, হয়ত তোমার খালি ঘরটার মেঝেতে মাথা খুঁড়ে মরতুম আমি। আর আজ? আজ আমিই তোমাকে ছেড়ে চ'লে এলেছি মাসী।

অন্ধকার গলিটায় যখন এসে দাঁড়ালুম, কে যেন কানেকানে বললে, কি রে, এখানে এসে ভাল লাগছে ত তোর? আরাম বোধ হচ্ছে ত? তা যদি হয় ত আর তাকাসনে ঐ আলোগুলোর দিকে। এই আঁধারের পথ ধ'রেই চ'লে যা। এইটেই তোর পথ।

ঐ একটা কথাই বারবার বলতে লাগল। যেন ঠেলতে লাগল পেছন থেকে।

বলতে লাগল, আলো আর আঁধার কি কখনো এক হয়ে মেলে রে? তুই চ'লে যা তোর নিজের পথে।

আরো বললে, তুই থেকেই বা কি করতিস্? কোন্ কাজে তার লাগতিস্?

এতবার ক'রে বলতে লাগল কথাগুলো যে, না শুনে পারলুম না। তাই চ'লেই এলুম।

মাসী, যাই। মাসী!

জগন্নাথ।

চিঠিটি প'ড়ে চারদিকের উৎসব সমারোহের মধ্যে বন্ধ ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ কাঁদল নিরুপমা।

হয়ত জগন্নাথের সঙ্গে দেখা তার আর হবে না এ-জীবনে। কিন্তু যদি দেখা হয়, তাহলে তাকে সে বলবে, আলো আর আঁধার এক হয়ে মেলে না কে বলেছে তোমাকে? তাই যদি হবে ত আমার আলোর গা থেকে তোমার অন্ধকারকে কিছুতে ছাড়াতে পারছি না কেন আমি?

সন্ধ্যায় স্বরূপা বেড়াতে এলে কাঁদতে কাঁদতেই তাকে জিজ্ঞেস করল, "বল না স্বরূপাদি, তোমার কথা ত ভুল হয় না? ও কি আর ফিরে আসবে মনে হয়?"

স্বরূপা বলল, "কি জানি ভাই। প্রাণের টানটা সত্যি হলে মানুষ ফিরে আসে, আবার সেই একই কারণে ফিরে আসেও না। আমি ত ওকে চিনতাম না ভাল ক'রে? এতকাল একসঙ্গে ছিলে, তোমারই এটা বলতে পারা উচিত।"

গালে হাত দিয়ে ব'সে অনেকক্ষণ ভাবল নিরুপমা। তারপর বলল, "এক-একবার এমনও মনে হয়, ওর ফিরে আসাটাই যেন বড় কথা নয়। ও যে কেন চ'লে গেল, তা যদি না বুঝতে পারি, ত ও ফিরে এলেও হয়ত ওকে ধ'রে রাখতে পারব না।"

স্বরূপা বলল, "বুঝতে চেষ্টা কর।"

আরো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কাটবার পর নিরুপমা বলল, "ও আর আমি মিলে মোটরগাড়ী সারাবার কারখানা করেছিলাম একটা, তা ত তুমি জানো। সেটা যদি না উঠে যেত, বা আবার ঐরকম একটা কারখানা যদি করতে পারতাম, ত সেটা হ'ত তার আর তার মাসীর এলাকা। সেখানে তার মাসীকে একলা ফেলে চ'লে যাবার কথা সে ভাবতেই পারত না।"

"তাই যদি তোমার মনে হয়, ত ডাকো তোমার দিলীপ বাবলু রঘু পিণ্টুদের, চালু কর আবার কারখানা-টাকে, তোমাদের দুজনের এলাকা হয়ে থাকুক সেটা। যেখানেই সে থাকুক, যদি শুনতে পায় ত হয়ত এসে হাজির হবে ওটারই টানে টানে।"

"কিন্তু তা যদি করি আমি, অন্য লোকটির ভাগে কিছু কি কম পড়বে না?"

"যে দেবে, তার দেবার সামর্থ্য কতটা তার উপর সেটা নির্ভর করবে। তোমার স্বামীর কাজেও তার সঙ্গী হবে তুমি। দুরকম কাজের মধ্যে দিয়ে দুজন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কি যায় না? আমার ত মনে হয় খুব যায়।"

কথাটা শুনে দিবাকর বলল, "বেনেপুকুরের দিকে বেশ খানিকটা জমি রাখা আছে আমার। সস্তায় কিনেছিলাম। খুব ডেভেলপ করছে পাড়াটা। সেইখানে ভাল একটা শেড আমি তৈরি ক'রে দেব তোমাদের, ভাড়া দিও তোমরা আমাকে। এদিকে তোমার দাদার

বাড়ীতে জগন্নাথকে যে ঘরটা দেওয়া হয়েছিল, অক্ষুশঙ্কু কিন্তু সেটা তোমার দাদাকে ফিরিয়ে দেয়নি, তালাবন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের জগন্নাথ-দা ফিরে আসবেই।"

নিরুপমা বলল, "আমি ত ভাবছি, চেতলার বাড়ীটাও রেখেই দেব। আমার পুরনো জীবনের মিউজিয়মের মত হয়ে ওটা থাক, তাছাড়া ওখানে যে ভীষণ পাগলামি তুমি করেছিলে সেটাও মনে ক'রে রাখবার মত। কি ক'রে যে পেরেছিলে জানি না।"

তাকে গভীর সমাদরে বুকে টেনে নিয়ে দিবাকর বলল, "কাজটা সহজ হয়নি তা ঠিক, কিন্তু পাঁচ মিনিট ঐ পাগলামিটা যদি আমি না করতাম, তোমার পাগলামি সারাজীবন ধ'রে চলত। বলত ত? ভাল করিনি পাগলামিটা ক'রে?"

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিরুপমা বলল, "খুব ভাল করেছ। আর যতরকম পাগলামি আছে পৃথিবীতে, এর পর নির্ভাবনায় তা করা যাবে দু-জনে মিলে সারা জীবন ধ'রে।"

সমাপ্ত
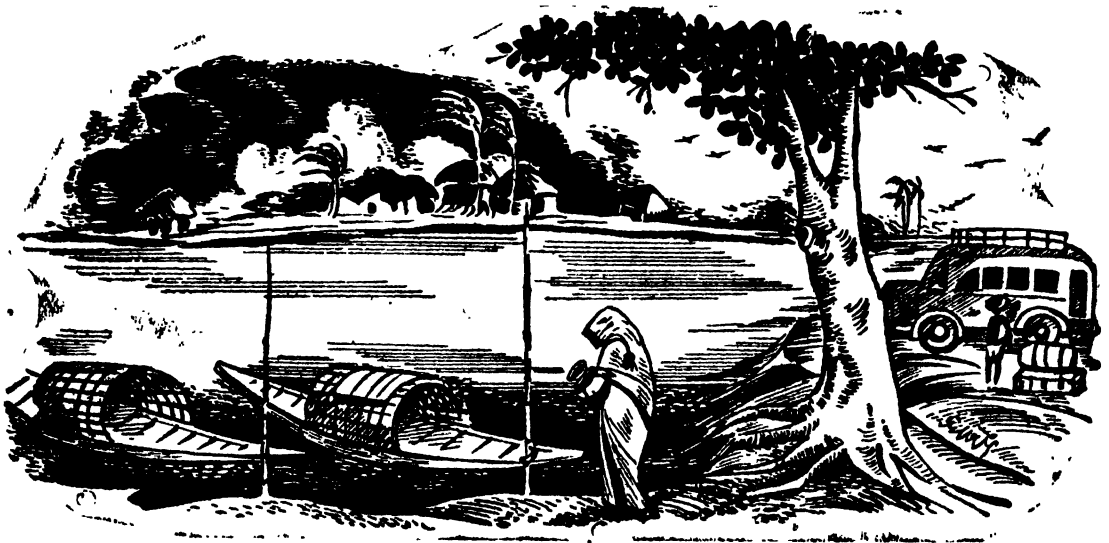
কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত কয়েক বৎসর হইতে কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদের সন্তানগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্ম পাঠাইতেছেন; অনেক ক্ষেত্রেই ইহার জন্ম তাঁহাদিগকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস করিতে হইতেছে; অর্থাৎ সন্তানদের বিদ্যালয়ের মাহিনা, পুস্তক, খাতা, কাগজ, কলম, কালী প্রভৃতি ক্রয়, এবং বিদ্যালয়ে যাইবার উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ সরবরাহের জন্ম তাঁহাদের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন নিম্নমান আরও নিম্নস্তরে চলিয়া গিয়াছে, অনেকের ঋণের পরিমাণও বাড়িতেছে। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল কথা বলিতেছি, একটি কথাও অবাস্তব বা অতিরঞ্জিত নহে। যে দেশে শিক্ষিতদের সংখ্যার হার অতি নিম্নে সেই দেশে শিক্ষার এই ক্রম-বর্দ্ধমান প্রসার যে একটি শুভ লক্ষণ কেহই অস্বীকার করিবেন না। সকলেই শিক্ষার প্রসারকে স্বাগত জানাইবেন।

কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় এত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তাঁহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা অর্জ্জনের প্রতি এত উৎসাহশীল করিতেছেন কেন? অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? কৃষক সম্প্রদায়ের অনেকের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সকলেই স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা বংশপরম্পরায় 'চাষা' আখ্যা পাইয়া আসিতেছেন, ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কোন স্থান নাই, তাঁহারা চান তাঁহাদের সন্তানগণ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া 'চাষা' আখ্যা হইতে মুক্তিলাভ করুক এবং ভদ্রসমাজে স্থান লাভ করুক। তাঁহারা চান না যে তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানগণ তাঁহাদের সঙ্গে অনাবৃত দেহে অপরিচ্ছন্ন-বস্ত্রাবৃত হইয়া ক্ষেতে-খামারে জলে কাদায়, রৌদ্রে বৃষ্টিতে চাষ-বাস করুক। তাঁহাদের মধ্যে কেহই চান্ না তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানগণ কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকিয়া স্থানীয় কৃষির উন্নতি করুক।

নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের সন্তানগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কি ভাবে কৃষির অন্তরায় হইয়াছে, কি ভাবে কৃষক-সমাজের কাঠামো শিথিল করিয়াছে এবং কি ভাবে শিক্ষিত কৃষকসন্তানগণ তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি অবিনয়ী হইয়াছেন বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমার এক পুত্র আমার গ্রামের বাড়ীর পুরাতন পরিচারক শ্রীএককড়ি মালিকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনিমাই চরণ মালিককে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দেন; নিমাই পরিষ্কার ধুতি, জামা পরিধান করিয়া, নূতন জুতা পায়ে দিয়া, বই খাতা লইয়া বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল, বলা বাহুল্য আমার পুত্রই নিমাইয়ের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতেন। নিমাই নিয়মিতভাবেই বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল; মাঠের কাজে তাহার দাদাদের যেটুকু সাহায্য করিত তাহাও আর করিল না। কিছু দিন পর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল: কোনএক ছুটির দিনে নিমাইয়ের বড়দাদা শ্রীসতীশচরণ মালিক বীজতলা হইতে আমন ধানের চারার পোছা আমন-জমিতে রোপণ করিবার জন্ম নিমাইকে বহন করিয়া আনিতে বলিল; বর্ষাকালে জলে কাদায় আমন ধানের চারা রুইতে হয়; নিমাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এমন সময়ে সতীশের মা বাহিরে আসিয়া সতীশকে বলিল,

"সতীশ, তুমি কি জান না যে নিমাই এখন স্কুলে পড়িতেছে, সে যদি এখন ধানের চারা বহিয়া লইয়া যায় তাহার সহপাঠীরা তাহাকে 'চাষার ছেলে' বলিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিবে; নিমাই এখন আর মাঠের কোন কাজ করিবে না;" এই বলিয়া তিনি নিমাইকে চারা বহন করিতে নিষেধ করিলেন। সতীশ উত্তরে বলিল "তোমার নিমাই জজ. ম্যাজিষ্টর হবে আর আমরা চাষাই থাকবো।" যাহা হউক নিমাই ষষ্ঠ কি সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিল; কিন্ত বিদ্যালয়ে এত অল্প বা সামান্ত শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া সে আর মাঠের কাজে ফিরিয়া গেল না। স্থানীয় ছোট এক কারখানায় মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে এক চাকরী যোগাড় করিল এবং বিদ্যালয়ে যেরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাইত সেইরূপ পোষাক পরিচ্ছদেই কারখানায় যাইতে লাগিল, যদিও সে পরিবারবর্গের সহিত মাটির ঘরে বাস করিতে লাগিল এবং তাহার দাদারা আগের মতই "চাষার" কাজ করিতে লাগিল। নিমাইয়ের মাহিনা বর্দ্ধিত হইয়া এখন মাসিক ৪০৲ টাকায় উঠিয়াছে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদের উন্নতি হইয়াছে এবং হাতে রিষ্ট-ওয়াচও আছে। সম্প্রতি শুনিলাম নিমাই একটি হারমোনিয়াম কিনিয়াছে এবং একটি যাত্রার দল গঠন করিতেছে। নিমাইয়ের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই, বরং আমি তাহার উন্নতি কামনা করি। তবে নিমাই একমাত্র উদাহরণ নহে। এইরূপ বহু নিমাই সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়া কৃষি-কাজ ত্যাগ করিয়াছে।

এইরূপ অনেক উদাহরণের মধ্যে আর একটি উদাহরণ দিতেছি। আমার গ্রামের একটি নিরক্ষর কৃষকের পুত্র স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে (সর্ব্বার্থ সাধক) পড়িত; ছেলেটি মেধাবী ছিল। বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে আমি তাহার অর্দ্ধবেতন মঞ্জুর করিয়াছিলাম, ছেলেটি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহার পিতার ১৫।১৬ বিঘায় চাষ ছিল, পিতা এবং অন্যান্ত পুত্রেরা চাষের কাজেই নিযুক্ত ছিল। যে পুত্রটি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল সেই পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া পিতা আমার কাছে আসিল এবং আমাকে অনুরোধ করিল আমি যেন তাহাকে কলিকাতার কোন ভাল কলেজে অল্প বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিই এবং ঐরূপ অল্প খরচে তাহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিই। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি ত মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে ২।৩ মাস বসিয়া ছিলে, এই সময়টা কি ভাবে কাটাইলে?" ছেলেটি বলল "বই টই পড়তুম।" তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই সময় তোমার বাবার ও ভায়েদের সঙ্গে মাঠের কোন কাজ কর নি?" ছেলেটি কোন উত্তর দিল না; তাহার বাবা উত্তর দিল, "আমি ওকে মাঠে কাজ করতে দিই নি, পাছে রদ্দুরে ওর 'ব্রেন' নষ্ট হয়ে যায়।" অভিভাবকের এই উত্তরের একমাত্র অর্থ হইতেছে যে তাহার পুত্র অধ্যয়নকালে রদ্দুরে বা বৃষ্টিতে মাঠে কাজ করিলে তাহার 'ব্রেন" অর্থাৎ মস্তিষ্ক নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে সে উপযুক্তভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া সমাজের একজন গণ্য-মান্ত ব্যক্তি হইতে পারিবে না।

বিদ্যাশিক্ষার ফলে কৃষক সন্তানগণ তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি কিরূপ অবিনয়ী হইয়াছেন তাহার বহু উদাহরণের মধ্যে কেবলমাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি। আমার গ্রামের বাড়ীর পুরাতন পরিচারক এককড়ির ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় রেলষ্টেশনে 'টেলিগ্র্যাফি' শিক্ষা করিতেছিলেন; একদিন সন্ধ্যার সময় উক্ত রেলষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার তাঁহাকে লইয়া আমার কাছে আসিলেন, এবং আমাকে অনুরোধ করিলেন আমি যেন উক্ত ছেলেটির অর্থাৎ এককড়ির ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি চাকরী সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করি। বলা নিষ্প্রয়োজন ছেলেটির বেশভুষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, আমি আমার তক্তা-পোশের উপর বসিয়াছিলাম, সেই ঘরে তিনখানি চেয়ার

ছিল, পূর্ব্বেই আমার এক বন্ধু আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন; অপর দুইখানি চেয়ারের মধ্যে একটিতে ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় বসিলেন, অন্য একটিতে ছেলেটি বসিলেন। আমরা কথাবার্তা বলিতেছিলাম এমন সময়ে এককড়ি সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রীতি অনুসারে ঘরের মেঝেতে বসিল; ছেলেটি অর্থাৎ এককড়ির ভ্রাতুষ্পুত্র ইহাতে কোন প্রকার সংকোচ বা আসোয়াস্তি প্রকাশ করিলেন না, মনে হইল তিনি যেন এককড়িকে চিনিতেই পারিলেন না; ছেলেটির পিতা যদিও পৃথকভাবে বাস করেন কিন্তু তিনিও নিজের হাতে মাঠের যাবতীয় কাজ করেন, অর্থৎ একজন নিরক্ষর চাষী। এককড়ির প্রতি ছেলেটির এইরূপ অশিষ্ট আচরণ দেখিয়া আমি খুবই বিস্মিত হইলাম এবং ছেলেটিকে সোজা জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি এককড়িকে চেনেন কিনা, এবং সম্পর্কে এককড়ি আপনার কে হন?" ছেলেটি উত্তর করিলেন "উনি আমার জ্যাঠামশাই হন।" তখন আমি ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়কে বলিলাম, "যে ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া তাহার গুরুজনের প্রতি এইরূপ অশিষ্ট আচরণ করে তাঁহার জন্য আমি কিছুই করিতে পারি না।" বলা বাহুল্য আমার এই উক্তি ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়কে আঘাত ত দিয়াছিল, ছেলেটিকে ততোধিক আঘাত দিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় আমার প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি অনেককে বলিয়াছিলেন যে বিনা কারণে আমি এইরূপ বিরক্ত হইয়াছিলাম এবং উপরোক্ত উক্তি করিয়াছিলাম, তিনি আরও বলিয়াছিলেন ছেলেটি লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রসমাজে ভদ্রলোকদের ন্যায় চেয়ারে বসিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন, এককড়ি সে অধিকার অর্জ্জন করে নাই, এককড়ি ভৃত্য, তাকে ভৃত্যের মতই মেঝেতে বসিতে হইবে।

আর একটি উদাহরণ দিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। উড়িষ্যাবাসী একজন হালুইকর ব্রাহ্মণ আমার খুবই পরিচিত ছিল; সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত, তার পরণে থাকিত ছোট ধুতি, গায়ে থাকিত ফতুয়া, পায়ে জুতা থাকিত না; তাহার নাম প্রহ্লাদ; কলিকাতায় এক বস্তির একটা মাটির ঘরে তাহারা ৪।৫ জন (দেশবাসী) এক সঙ্গে থাকিত; প্রত্যেকে মাসিক ১২৫-১৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিত এবং নিজের খরচ বহন করিয়া উদ্বৃত্ত টাকা দেশে পাঠাইয়া দিত; প্রহ্লাদ যখন আমার বাড়ীতে আসিত, তখন সে আমার ঘরের মেঝেতেই বসিত। একদিন সে তাহার এক পুত্রকে সঙ্গে আনিল, পুত্র ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কটক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন প্রহ্লাদের পুত্র বেশভূষায় সুশোভিত ছিল, তাহার পায়ে জুতাও ছিল, হাতে রিষ্টওয়াচও ছিল; সে আমার ঘরে ঢুকিয়াই একটি চেয়ারে বসিল, আমার অনুমতির কোন প্রয়োজন হইল না, প্রহ্লাদ তাহার অভ্যাস-অনুযায়ী ঘরের মেঝেতেই বসিল। প্রহ্লাদ তাহার পুত্রের একটি চাকরী যোগাড় করিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল। প্রহ্লাদ ও তাহার পুত্রের সঙ্গে ২।১টা কথা বলিবার পর আমি আমার তক্তাপোষ হইতে হঠাৎ উঠিয়া প্রহ্লাদের হাত ধরিয়া তাহাকে আর একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিলাম, তার একটু ভ্যাবাচাকা লাগিল, আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার পুত্রই তোমাকে চেয়ারে বসিবার অধিকার দিয়াছে, তুমি এবার হইতে যখন আমার বাড়ীতে আসিবে, চেয়ারেই বসিবে।" প্রহ্লাদের পুত্র লজ্জিত বোধ করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বর্ত্তমানে শিক্ষার প্রসার হেতু এইরূপ কতকগুলি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদের সমাধান কি ভাবে হইবে জানি না। স্বর্গীয় অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "রোগ যে সর্ব্বত্রই, শিক্ষার প্রসার বন্ধ করিলে কি এই রোগ সারিবে।"

যাহা হউক উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে কৃষকসন্তানগণ বিদ্যালয়ে অল্প দিন শিক্ষা

অর্জন করিয়াও তাঁহাদের অগ্রজদের সঙ্গে ক্ষেতে-খামারে কাজ করিতে অনিচ্ছুক এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণও তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানগণকে কৃষিকাজে নিযুক্ত করিতে অনিচ্ছুক; তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য সন্তানগণের সমাজিক সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা। গ্রামাঞ্চলে এমন একটিও উদাহরণ নাই যেখানে শিক্ষিত কৃষক-সন্তানগণ প্রধান জীবিকা স্বরূপ কৃষিকে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা কৃষি ব্যতীত অন্য পেশায় নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে পূর্ব্বের মতই নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায় কৃষিতে নিযুক্ত আছেন এবং পূর্ব্বেও তাঁহাদের সন্তানগণের নিকট হইতে কৃষিকাজে যে সাহায্য পাইতেন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছেন এবং এই সাহায্যের জন্য পারিশ্রমিক দিয়া শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে; ফলে কৃষি অধিকতর ব্যয়বহুল হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসর হইতে পল্লী-অঞ্চলের বহু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে একটি করিয়া কৃষি-শিক্ষা শাখা সংযুক্ত হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই ছিল যে কৃষি অধ্যয়ন করিয়া যাহারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে কিছু অংশ গ্রামে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের অগ্রজদের সঙ্গে ক্ষেত-খামারে কৃষি-কাজ করিবেন এবং বিদ্যালয়ে অর্জ্জিত উন্নত কৃষি-শিক্ষা প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু অদ্যাবধি এইরূপ কৃষি-শিক্ষা প্রাপ্ত একটি ছাত্রও গ্রামে অবস্থান করিয়া নিজেকে কৃষি কাজে নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ছাত্রগণ কৃষি-শাখাতে যোগদান করিতে অধিকতর ইচ্ছুক, কারণ ইহাতে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজতর হয় এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হয় তথাকথিত কোন না কোন মর্য্যাদাসম্পন্ন চাকরী জোগাড় করা যায়, না হয় উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে উদ্দেশ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহে কৃষি-শাখা সংযুক্ত করা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে সকল কৃষক সন্তানগণ উচ্চ শিক্ষা লাভের পর সম্মানজনক পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ সহরে চাকরী স্থানেই বসবাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রার মানও উচ্চ, তাঁহাদের সহিত গ্রামের ও বাড়ীর তেমন কোন সম্পর্ক নাই। অথচ তাঁহাদের অভিভাবক ও অগ্রজগণ এবং অন্যান্য পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ গ্রামের জীর্ণ কুটিরেই বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের জীবন-যাত্রার মানও পূর্ব্বের মতই নিম্ন। সুতরাং শিক্ষাপ্রসারের ফলে গ্রাম ও স্থানীয় কৃষির কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নাই, বরং অবনতি ঘটিয়াছে।

ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত হইবার প্রাক্কালে লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং প্রণিধানযোগ্য:

"One danger is to look on the necessary change as simply a Switch from the traditional bureaucratic education to the new needs of technology. When this does need examining carefully there are also social factors. How much effort goes to the primary as against Secondary education? The answer can depend on the evidence that the aspiring peasants. Once he gets to the Secondary level of education, is lost to the Village for ever. The result may be the constant creaming off talent that never goes back to rural life, so that the Stagnant Village is untouched. At the upper levels of society there is a Strong tradition of regarding the official bureaucracy as the only worthy career. This need deflecting too."

দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে টাইমস্ পত্রিকার উপরোক্ত মন্তব্য একেবারে সত্য। পল্লী অঞ্চলের শিক্ষিত ও মেধাবী ছাত্রগণ স্ব স্ব অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, পল্লী অঞ্চল পূর্ব্বে যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই আছে, কৃষির অবস্থা পূর্ব্বের মতই অনুন্নত। এখানে সেখানে অতি অল্প সংখ্যক কৃষক

উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধি করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার ফলে দেশের অগণিত কৃষকগণের অবস্থা আদৌ সমৃদ্ধ হয় নাই এবং দেশের খাদ্যাভাবও ঘোচে নাই।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কৃষক সন্তানগণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে; ইহার দ্বারা তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে যাহার ফলে তাঁহারা 'ঘর-বাড়ী' ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন।

সুতরাং কৃষক সন্তানগণের শিক্ষার জন্তে এমন এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দরকার যাহা তাঁহাদের পক্ষে সমগ্রভাবে উপযোগী হইবে এবং যাহার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে তাঁহারা আগ্রহশীল হইবেন এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে উন্নত কৃষি-শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া গ্রামেই অবস্থান করিয়া তাঁহাদের অর্জ্জিত উন্নত কৃষিবিদ্যা তাঁহাদের দৈনন্দিন কৃষিকাজে প্রয়োগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষক সম্প্রদায় সাধারণতঃ যেরূপ আবহাওয়ায় ও পরিস্থিতিতে ঘোরেন ফেরেন, বসবাস করেন ঠিক সেইরূপ আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে উন্নত প্রণালীর কৃষিশিক্ষা দিতে হইবে, ইহার জন্য অট্টালিকার ও সাজসরঞ্জামের কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন কালের পাঠশালার কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনেকবার বলিয়াছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের সন্তানগণকে তাহাদের দেহ ও মনের গঠন করাতে তাঁহাদের শিক্ষার জন্য তাহাদের স্বাভাবিক আবহাওয়া ও পরিস্থিতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সহরে শিক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই ভুল হইবে। কারণ ইহার ফলে তাহাদের মনোভাব গ্রামের প্রতি অনুকূল হইবে না; তাঁহারা সহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করিবে এবং গ্রামের প্রতি উদাসীন হইয়া 'সহরে' হইয়া যাইবে।

শিক্ষিত যুবকগণ আইন, চিকিৎসা, ব্যবসা, কারিগরী প্রভৃতি পেশা গ্রহণ করেন, কারণ তাঁহারা দেখেন ও বোঝেন যে এই সকল পেশাতে সফলতার গড়পড়তা হার বেশী। সুতরাং রাষ্ট্র যদি হাতে কলমে দেখাইতে পারেন যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সন্তানগণ তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে এক লপ্তে ৩০.৪০ বিঘা জমি লইয়া তাঁহাদের আর্থিক সীমার মধ্যে উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া লাভবান হইতে পারেন তাহাহইলে তাঁহারাও অন্যান্য পেশার ন্যায় কৃষিকেও পেশা হিসাবে অবলম্বন করিতে পারেন। দেশের মধ্যে যত বেশী সংখ্যায় এই রূপ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকগণকে কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল হইবে। ইহার ফলে তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিমালয়তুল্য ব্যবধান আছে তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইবে। এই ব্যবধান দূর হইলেই কৃষকসম্প্রদায়ের শিক্ষিত সন্তানগণ আর কৃষিকাজকে 'চাষার' কাজ বলিয়া গণ্য করিবেন না, তখন তাঁহারা গ্রামে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের অগ্রজদের বা কনিষ্ঠদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কৃষি কাজ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। এই ব্যবধান দূর হইলেই আরও বহুরকমের সুফল ফলিবে, ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে তথাকথিত মধ্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক কৃষকসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান শোষণ (exploitation) কতকটা হ্রাস পাইবে। আরও অনেক দুর্নীতির অবসান ঘটিবে।

কত রকমের কত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে, কত অজস্র ব্যয় হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি কৃষকসন্তানদের উপযোগী কৃষি-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় নাই; এবং মধ্যবিত্তসম্প্রদায়কে পেশা হিসাবে কৃষিকে গ্রহণ করিবার জন্তে কোন কার্য্যকর পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু দেশের কৃষির উন্নতি করিতে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে এই দুইটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া অতীব আবশ্যক।

বড় মা শ্রীহেমলতা ঠাকুর মহাশয়ার জীবন ও স্মৃতিকথা

শ্রী—

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসের শেষের দিকে এক রাত্রে বধূবেশে উপস্থিত হলাম শান্তিনিকেতনের একটি কুটীরে। রাত এগারোটার ট্রেন যখন বোলপুর ষ্টেশনে পৌঁছাল,—দেখা গেল দীপুবাবুর ব্রুহামগাড়ী হাজির—বরবধূকে নিয়ে যাবার জন্য শান্তিনিকেতনে। কুটীরে পৌঁছে দেখি, সেই রাতে সমবেত হয়েছেন সেইখানে—প্রতিমাদেবী, কমলাদেবী, শৈলদেবী, ননীবালাদেবী আর আশ্রম-বালিকা ক'টি—যারা গরমের ছুটির মধ্যেও রয়েছে তাদের বাড়ীতে বাবা, মা, আত্মীয়দের সঙ্গে। বড়মা হেমলতাদেবী আগিয়ে এলেন বধূবরণের জন্য। আমার শাশুড়ীমার বৈধব্য সৃষ্টি করেছে বাধা বধূবরণে। যত্নের সঙ্গে বড়মা নিলেন বধূবরণ করে। তবে চশমা-পরা সদ্য কলেজেপড়া কালোবৌ—সুপুরুষ বরের পাশে তেমন মানানসই লাগেনি তাঁর—সেটা শুনেছি অন্যের মুখে।

বড়মা যেতেন আমাদেরই কুটীরের পাশ দিয়ে, প্রতিদিন সকালে, নীচুবাংলা থেকে শান্তিনিকেতনের পুরানো বাড়ীতে—তাঁর স্বামী দীপুবাবুর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা জেনে আসতে। আমাদের কুটীরে একবার ঢুকতেন যাওয়া আসার পথে—সব খবরাখবর নিয়ে যেতে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে দেরী হলোনা তাঁরই স্নেহমাখা ব্যবহারে। তাঁরও প্রথমকার ধারণা বদলাতে দেরী হয়নি—বুঝে নিলেন কালোবৌ এ সংসারে বেমানান হয়নি; সংসারটি সে মাথায় করে তুলে নিয়েছে।

বড়মার নিজের কথায় তাঁর জীবনের কিছু বিবরণ তুলে দিচ্ছি। এটি তিনি বলেছিলেন, তাঁর ৯১তম জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতা আর্ট সোসাইটি পুরীর বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে যেদিন তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। বড়মা বলেন:—"ষোলবৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের ৬৭ বৎসর পরে আমার দাদাশ্বশুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ডেকে বললেন যে, "এই বৌমার ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে। আপনি এঁকে দশটা উপনিষদ পড়ান। আমি তিনবৎসর ধরে তাঁর কাছে উপনিষদ পড়েছি।

মানুষকে কি ভাবে ভালোবাসতে হয়…সে দাদাশ্বশুর মহাশয়ের কাছে দেখেছি। আমার যখন বিবাহ হয়, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে ১১৬ জন লোক। বহুজনকে নিয়ে সংসার করার শিক্ষা পেয়েছি।

…আমি দশ বৎসর বয়সে রাজারামমোহন রায়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ব্রহ্মময়ীর কাছে ছিলাম। আমি দেখেছি তিনি রাত্রি তিনটায় উঠে ব্রহ্ম গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতেন। আমি সেই সঙ্গে গায়ত্রী জপ করতে শিখেছি।"

আমরা এইখানে বড়মার জন্মবছর ও তারিখ উল্লেখ করছি:—জন্ম—২৯এ পৌষ, ১২৮০ সাল (১৮৭২ খৃঃ অঃ)। তাঁর জীবনের অবসান হয় পঁচানব্বই বছরে—১৩৭৪ সালের ১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৭)—পুরী বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে। তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের বংশলতা উদ্ধৃত করছি নীচে:—

পিতৃকুল :—

শ্বশুরকুল :—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ | | | | | | | | রবীন্দ্রনাথ

দীপেন্দ্রনাথ — হেমলতা

সুধীন্দ্রনাথ

সৌমেন্দ্র

তাঁর বিবৃতি থেকেই আমরা জানি যে ষোলবছরে তিনি বধূরূপে আসেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর কৈশোর ও যৌবন কাটে বহু আত্মীয় পরিজনের প্রতি পারিবারিক কর্তব্যসাধনে। নানা সম্বন্ধের বন্ধনে তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয় জড়িত হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনে যখন তিনি চলে আসেন—নীচু-বাংলায় সংসার পাতেন—বৃদ্ধ শ্বশুরমশায় ও স্বামীকে নিয়ে, তখন ক্রমে তিনি হয়ে যান মায়ের মতন শান্তি-নিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও। তখন থেকে তিনি আশ্রমের সকলের হন বড়মা।

বিদ্যালয়ের ছেলেদের তিনি খাওয়াদাওয়ার তদারক করতেন, মাঝে মাঝে তাদের নিজের বাড়িতে এনে

খাওয়াতেন। এইখানে বড়মাকে লেখা তাঁর কাকামশাই রবীন্দ্রনাথের চিঠির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি বিশ্বভারতী পত্রিকা—কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৪ থেকে:—"urbana, U. S. A, ২০শে পৌষ ১৩১৯ (Dec 1912)

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার ওখানে আবার ছেলেদের খাওয়া আরম্ভ হয়েছে এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। বিদ্যালয়ের ভোজনশালার চেয়ে তোমার ওখানে খাওয়া ভাল হবে বলেই যে খুশী হচ্ছি, তা নয়। একজন কেউ মনের সঙ্গে যত্ন করে ওদের খাইয়ে দিচ্ছে—এইটেই ওদের পক্ষে সবচেয়ে উপাদেয়। মানুষ ত শুধু কেবল রসনা দিয়ে খায়না, সে হৃদয় দিয়ে খায়। সেই সর্ব্বাঙ্গীন খাওয়াটি সব চেয়ে দরকার শিশুদের—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনো তখনকার দিনের ছেলেদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে পৌঁছেছেন—তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বড়মাকে স্মরণ করেন। আগে উল্লেখ করেছি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৩৭০ সালে ১৯এ পৌষ কলিকাতা আর্ট সোসাইটি পুরীতে গিয়ে বড়মাকে সম্বর্দ্ধনা জানান। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আর্ট সোসাইটির সম্পাদক প্রণবেশচন্দ্র সিংহ। তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যে বলেছেন:—"বড়মাকে আমার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁর সে আমার সম্বন্ধ অতি শৈশবাবস্থা হতেই, যখন আমি শান্তিনিকেতনে শিশু-আলয়ে ছাত্র ছিলাম।"

বিশ্বভারতী পত্রিকা-১৩৫৪ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা থেকে বড়মাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর একটি অংশ তুলে দিচ্ছি এখানে:—

কল্যাণীয়াসু

আমি দূরে থাকলে বোধহয় আরো বিশুদ্ধভাবে গভীরভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে পারব।...তোমাদের পরেই বিদ্যালয়ের মঙ্গলভার ...তোমরা ইচ্ছার সঙ্গে কাজের ভার নিয়েছ এরই একটা মস্ত সার্থকতা আছে। ইতি ৪ঠা চৈত্র ১৩১৮ (১৭ মার্চ ১৯১২)

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৬৩-জানুয়ারী বিশ্বভারতী নিউজে-(১৩৮ পৃষ্ঠায়) নবীন খাণ্ডওয়াল নামে একটি গুজরাটি ছেলের চিঠি-বড়মাকে লেখা দেখা যায়। তার থেকে অল্প কিছু তুলে দিচ্ছি:—

"I do not think you can remember me, as we have not met for the last 42 years. But during this long interval, I have often remembered you and your kindness to a Gujrati boy....

You treated him as your own son··· I have a son of 22 years. I often tell him about my childhood at Santiniketan."

১৯৬৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ দাস, মমতা দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেকে পুরীতে গান ও সঙ্গীত, ভাষণ ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের দ্বারা তাঁর ৯৪তম বৎসরে অভিনন্দিত করেন। এ সংবাদ আমরা পাই ১৯৬৬ সনের মার্চ সংখ্যা বিশ্বভারতী নিউজ থেকে।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি—বড়মা তাঁর ৯১তম জন্মদিনের উৎসবে তাঁর ভাষণে বলেন যে; তাঁর দাদাশ্বশুর মহর্ষি তাঁর প্রতিভা ও ধীশক্তি লক্ষ্য করে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মশায়ের কাছে তাঁর উপনিষদ পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। এইভাবে চলে তাঁর বিদ্যাচর্চা। শান্তিনিকেতনে আসার পর তিনি বিদ্যাচর্চার সুযোগ পান আরও। তিনি ইংরাজী পড়তে আরম্ভ করেন এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে। লেখায় হাত তাঁর ছিল; তারও চর্চার সুযোগ পান তিনি 'কাকামশায়' রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ছোট দুই একখানা কবিতার বই তাঁর ছাপা হয় এই সময়। তার মধ্যে একটির নাম ছিল 'অকল্পিতা'। সংসারের আশ্রমের কাজকর্মের মধ্যে এইভাবে চলে তাঁর বিদ্যাচর্চা।

যাঁদের নিয়ে প্রধানতঃ তাঁর সংসার—তাঁর স্বামী, তাঁর শ্বশুরমশায়—তাঁরা একে একে চলে গেলেন যখন পরপারে, সংসারের বন্ধন যখন তাঁর শিথিল হয়ে যায়, তখন তিনি শুনতে পান বৃহত্তর জগতের আহ্বান। তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত দেখলেন নারী জাতির কল্যাণ-যজ্ঞে।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সদ্য। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ডেকে নিলেন বড়মাকে তাঁর স্বর্গতা পত্নী সরোজনলিনীর নামে প্রতিষ্ঠিত এই নারীমঙ্গল সমিতিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য। বড়মার জীবনের গতি এখন থেকে মোড় ফিরলো এক নূতন কর্মময় পথে। সমিতির কাজে তাঁকে যেতে হত প্রায় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে। গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল প্রত্যক্ষ। গ্রামের মেয়েদের অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত মেয়েদের জীবনে এনে দিলেন নূতন আশা, আশ্বাস। সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি থেকে প্রকাশিত হয় একটি পত্রিকা 'বঙ্গলক্ষ্মী' ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসে (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে)। হেমলতা ঠাকুর হলেন এর সম্পাদক। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা চলে কুড়ি বছর। নারীকল্যাণে উৎসর্গীকৃত এই পত্রিকাটি তখনকার স্বল্পসংখ্যক পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি এখনও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করে হেমলতা দেবী নানা বিষয়ে প্রবন্ধ আর ছোট গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। ১৩৪৬ সালে "দেহলি" নামে তাঁর ছোট গল্পের একটি বই প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ থেকে। তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—কল্যাণীয়াসু তোমার ছোট গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কী মানব চরিত্রের কী তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলা দেশের ছোট বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষ্যে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্র প্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে, তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি—

৮ই চৈত্র ১৩৪৫
আশীর্ব্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা বেশ সুনামের সঙ্গে চলছে, তখন হেমলতা দেবীর কতকটা অবসর মিললো। তাঁর বহুদিনের সাধ ইউরোপের নানাস্থান দেখে আসার; বিশেষ করে ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁর পূর্ব্বপুরুষ রাজর্ষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার। এবারে সে সুযোগ তাঁর মিললো। কয়েকমাসের জন্য তিনি চললেন ইউরোপভ্রমণে। প্রথমে গেলেন ইংলণ্ডে। ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর একটি ফটো আমরা তখনকার কাগজে দেখেছিলাম। জানিনা সে ছবি রক্ষিত আছে কিনা কোথাও। এখন আর দেখতে পাইনা তা'। বড়মার মুখে তাঁর নরওয়ে সুইডেন ভ্রমণের কাহিনী আমরা শুনেছি।

বিদেশ ভ্রমণ সেরে তিনি দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর আহ্বান এলো পুরী থেকে; সেখানে বসন্ত কুমারী বিধবাশ্রমের ভার নিতে হবে তাঁকে। বসন্ত কুমারী ছিলেন সুযোগ্য ধনী কর্ণেল এ. সি চ্যাটার্জির পত্নী। দুঃস্থা নারীর অসহায় বেদনায় বসন্তকুমারী হতেন ব্যথিত। তাঁর মৃত্যুর পর কর্ণেল চ্যাটার্জি তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে দান করেন প্রচুর অর্থ—তাঁরই নামে বিধবাশ্রম গঠন করার জন্য। এই গঠনের ভার পড়লো বড়মার উপর। তিনি চলে গেলেন পুরীতে এই কাজে আত্ম-নিয়োগ করে। বিধবাশ্রম ত হলই, সঙ্গে হল একটি স্কুল। কেবল বিধবারা নয়—সব শ্রেণীর মেয়েদের জন্য রীতিমত গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত এই স্কুলটিতে শিক্ষিকা এলেন প্রয়োজনমত ডিগ্রী, ডিপ্লোমাধারী মহিলারা। এদিকে বিধবাশ্রমে তাঁত অন্যান্য কুটির-শিল্প, তরি-তরকারীর বাগান করার ব্যবস্থা হল আবাসিক গরীব ছাত্রীদের জন্য।

হেমলতা দেবী পুরীর ও বাংলা দেশের বড় বড় অফিসার-দের আমন্ত্রণ করে এনে সব কাজ দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর পরিচালনায় সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানটির জন্য অর্থের অভাব হয়নি কখনও।

মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা যেখানেই দেখতেন সেখানেই বড়মা যেতেন উৎসাহ দিতে। বোলপুর সহরের মধ্যে প্রাইমারী মেয়ে স্কুল ছিল একটি—বহুদিন আগে (১৯০৬ সনে) প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টান মিশন পরিচালিত আর একটি প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় চলেছিল অবশ্য কয়েক বৎসর। ঐ মিশন উঠে যাওয়ায় বিদ্যালয়টিও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত বোলপুর হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়টি প্রাইমারী অবস্থায়ই চলতে থাকে ১৯৩৫ সন পর্য্যন্ত। বড়মা ও তাঁর স্বামীর আলাপ পরিচয় ছিল বোলপুরের কয়েকটি বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে। ছেলেদের স্কুলটিতে এঁদের যথেষ্ট দান ছিল। মেয়ে স্কুলটির দিকে তাকাবার অবসর বড়মার হল তখন যখন তিনি বাইরের জগতে কাজ করার জন্য চলে গেছেন বোলপুর ছেড়ে। যখনই আসতেন তিনি শান্তিনিকেতনে অল্প ক'দিনের জন্য, তিনি সংবাদ নিতেন বোলপুরের। ১৯৩৩ বা '৩৪ সনে বড়মা এলেন একবার শান্তি-নিকেতনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তিনি বললেন বোলপুরের ডাক্তার পাঁচুবাবুকে বলেছেন তিনি মেয়ে স্কুলটি দেখতে যেতে চান। আরও বললেন যে আমি তার সঙ্গে গেলে খুসী হবেন। গেলাম বড়মার সঙ্গে বোলপুর থানার কাছে ছোট দুটি কুঠরীওয়ালা ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে। বালিকারা আমাদের শোনাল দেবতার স্তব। বড়মার ইচ্ছা বিদ্যালয়টি বড় হোক। সে সুযোগ আসতে দেরী হলনা। ১৯৩৫ সনের ডিসেম্বরে বোলপুর মেয়ে স্কুল কমিটির সদস্য হংসেশ্বর রায় মহাশয় আগ্রহের সঙ্গে ডেকে নিলেন আমাকে ঐ ছোট্ট প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টিকে বড় করে তোলার কাজে। বড়মা এ খবর পেয়ে মহাখুসী। এরপর সেই ছোট্ট বিদ্যালয়টিতে তিনি যেতেন একবার করে যখনই তিনি আসতেন শান্তি-নিকেতনে। বোলপুরের মহিলাদের ডাকা হ'ত বড়মা যেদিন আসতেন বিদ্যালয়ে। মহিলা সভায় গান, আলাপ আলোচনা হ'ত নানা বিষয়ে। ছাত্রীরা অভিনয় করে দেখাতো। বোলপুরের রক্ষণশীল আব-হাওয়া ধীরে ধীরে গেল মিলিয়ে। মেয়ে স্কুলটি ক্রমে ক্রমে প্রাইমারী থেকে এম-ই, এম-ই থেকে হাইস্কুলে পরিণত হ'ল। এই বিদ্যালয় এখন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল; বিরাট কম্পাউণ্ডের ভিতর বিভিন্ন বিভাগের বাড়ি। বড়মার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত।

দূরে থাকলেও বড়মা সব সংবাদ নিতেন শান্তি-নিকেতন আর বোলপুরের শেষদিন পর্য্যন্ত। ১৯৬১ সনের জানুয়ারী সংখ্যা বিশ্বভারতী নিউজে দেখি সেবারের পৌষ উৎসবের আগে ছাতিমতলার আগের বেদিটির যে বেদীতে মহর্ষি বসতেন সেটা উদ্ধার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করায় আনন্দিত হয়ে বড়মা উপাচার্য্য সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়কে চিঠি লেখেন আর সেই সঙ্গে মহর্ষির উদ্দেশে একটি ছোট কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটি তুলে দিচ্ছি:—

"প্রাণের আরাম হেথা মনের আনন্দ
আত্মার শান্তির সাথে মিলাইল ছন্দ
ধ্যানদীপ্ত আত্মতৃপ্ত সেই শান্তিধাম
দূর হতে করি তারে সহস্র প্রণাম।"

১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যা বিশ্বভারতী, নিউজে আমরা দেখি, তদানীন্তন উপাচার্য্য সুধীররঞ্জন দাস মশায়কে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীতে লেখা বড়মার কবিতা:—

"এলরে এলরে ফিরে বাইশে শ্রাবণ
বরষার ধারা সাথে অশ্রুর প্লাবন
মিশে হলো এক, চক্ষু হারাইল দিশা
কবির আনন্দ ছবি ঢাকিল কি নিশা।

— — — —

জনতার স্রোত দাঁড়াল ঘেরিয়া, করি
যাত্রাপথ রোধ, দিবে না লইতে হরি

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গলার সংস্কৃতি বহুমুখী এবং বিবিধ সংস্কৃতির সমষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তৎপরে দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য, এই তিন মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভারত ও প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে অষ্ট্রিক জাতি আসিয়াও ইহাদের সহিত মিশিয়াছে। বাঙ্গালী তাই মিশ্রিত বা সঙ্কর জাতি। ইহা অগৌরবের বিষয় নহে। ইংরাজও সঙ্কর জাতি। কিন্তু সঙ্করত্বের জন্য উহাদের জাতীয় গৌরব কিছু ক্ষুন্ন হয় নাই।

বাঙ্গলার সংস্কৃতির মিশ্রণও এইভাবে ঘটিয়াছে। অনার্য্য ও আর্য্য সংস্কৃতি তো মিশিয়াছেই; মুসলমান রাজত্বকালে মুসলিম সংস্কৃতি এবং ইংরাজের আমলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিও আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বহুদিন হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক আসিয়া বাঙ্গলা দেশে বসবাস করিতেছে। তাহারাও ক্রমশঃ বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। উহাদিগের প্রদেশগত ও বংশগত সংস্কার বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে মিলিয়া একটি অভিনব সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার ফলে প্রাচীনের হৃদয়বত্তা ও নবীনের উদ্যমশীলতার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে এই বঙ্গভূমি। নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত "বাঙ্গালীর ইতিহাস" ও ভগিনী নিবেদিতার Web of Indian Life পুস্তকদ্বয়ে ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। গণেশ দেউস্কর, মদনমোহন পাঁড়ে, এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এইরূপ মিশ্রণেরই সুফল। বর্দ্ধমানের রাজবংশ ও পাঞ্জাব হইতে আগত আবু রায় এবং বাবু রায়ের বংশোদ্ভূত। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতিগত উন্নতিকল্পে বর্দ্ধমান রাজবংশের অবদান অবহেলার সামগ্রী নহে।

আমাদের নিবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লইয়া; সুতরাং তাঁহাদের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইস্থানে দেওয়া অসমীচীন হইবে না।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের সহিত পুণ্ডরীক বংশের সবিতা রায় সপরিবারে বাঙ্গালাদেশে আসেন। মানসিংহের অনুগ্রহে তিনি ফতে সিংহের জমিদারী প্রাপ্ত হন। উক্ত পুণ্ডরীক বংশের আশ্রয়েই জিঝোতিয়া, কনোজিয়া, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণগণ ফতে সিংহে আসিয়া বাস করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে কান্দী মহকুমা। উক্ত কান্দী মহকুমার মধ্যে কান্দী ও ভরতপুর থানার সকল অংশ, এবং বড়োয়া, গোকর্ণ, ও খরগ্রাম থানার কতক অংশ লইয়া ফতেপুর পরগণা গঠিত।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুলগোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ মনোহররাম ত্রিবেদীর পুত্র হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়াগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। হৃদয়রামের পুত্র দয়ারাম। দয়ারামের চারি পুত্র গদাধর, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। গদাধর নিঃসন্তান। তিনি বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র বলভদ্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বলভদ্রের সহিত জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ী দেবীর বিবাহ হয়।

বলভদ্রের তিন পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর, ব্রজসুন্দর, ও ভবনসুন্দর। তাঁহার তিনকড়ি নাম্নী একটি কন্যাও জন্মিয়াছিল। ব্রজসুন্দর কবি ও কাব্যামোদী ছিলেন। পদ্য-

পদ্যময় নাটক "মাধব সুলোচনা" এবং "স্বর্ণসিন্দুর" বা "গৌরলাল সিংহ" নামে একখানি প্রহসন তিনি রচনা করেন। পুস্তক দুইখানিই বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা তখন মনেপ্রাণে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণসুন্দরের দুই পুত্র—গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। উঁহাদের জন্মসময় বাংলা ১২৫৫ (ইং ১৮৪৭-৪৮), ও ১২৫৮ (ইং ১৮৫০-৫১) সাল। রাধিকাসুন্দর ত্রিবেদীর কন্যা চন্দ্রকামিনী দেবীর সহিত গোবিন্দসুন্দরের বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র—রামেন্দ্রসুন্দর ও দুর্গাদাস। তাঁহাদের চারিটি কন্যাও জন্মিয়াছিল।

১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গাদাস রামেন্দ্রসুন্দর অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট।

রামেন্দ্রসুন্দরের পিতাও সাহিত্যরসিক ছিলেন। "বঙ্গবালা" নামে একখানি উপন্যাসও তিনি প্রণয়ন করেন। মানুষ হিসাবেও তিনি কোন দিকে ছোট ছিলেন না। সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা, কপটতা, ও সঙ্কীর্ণতাকে তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রতিবৎসর পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সসম্মানে উপরের শ্রেণীতে উঠিলেন। পিতার আন্তরিক যত্ন ও সহজ শিক্ষাদান-প্রণালীই রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাপড়ায় কৃতিত্বের প্রধান কারণ।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কান্দীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেই বিদ্যালয় হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পঁচিশ টাকা মাসিক বৃত্তি পান। প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দরের পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর মাত্র।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার চারি বৎসর পূর্ব্বেই রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ এবং তাঁহার পত্নীর বয়স সাত বৎসর মাত্র ছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার পিতৃব্য উপেন্দ্রকুমার তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে এফ্.এ. পরীক্ষা দিয়া তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, এবং পঁচিশ টাকা মাসিক বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার খুল্লতাত উপেন্দ্রসুন্দরও পরলোক গমন করেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই বিজ্ঞানে "অনার্স" (Honours) লইয়া রামেন্দ্রসুন্দর বি.এ. পরীক্ষা দেন, এবং প্রথমস্থান লাভ করিয়া মাসিক চল্লিশটাকা বৃত্তি পান। তাঁহার সাহিত্য-জীবনেরও সুরু হয় এই সময়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবন পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র বসু, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, প্যারীলাল সরকার, সুরেশচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালিদাস মল্লিক ও টইনার সাহেবের সহিত রামেন্দ্রসুন্দরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, এবং সেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ইঁহারাও ছাত্র হিসাবে কৃতী তো ছিলেনই, পরবর্ত্তী জীবনেও অসামান্য সাফল্যের অধিকারী হন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানশাস্ত্রে (Natural and Physical Science) এম. এ. পরীক্ষা দিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং স্বর্ণপদক ও একশত টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার পান। তাঁহার বন্ধু চতুষ্টয়—প্যারীলাল সরকার, সুরেশচন্দ্র সিংহ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও কালিদাস মল্লিক প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই বিজ্ঞানের এম.এ. পরীক্ষায় যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

ঐ বৎসরই সংস্কৃত কলেজ হইতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়া জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য "সংস্কৃতে" প্রথম স্থান অধিকার করেন।

অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেবের উৎসাহে ও উপদেশে রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হন এবং নির্দ্দিষ্ট অর্থ পারিতোষিক লাভ করেন। অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ও উক্ত বৎসরে "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত পুরস্কার পান।

ইহার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানীদের গবেষণা করিবার অনুমতি পাইয়া রামেন্দ্রসুন্দর দুই বৎসর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে (আধুনিক সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রামেন্দ্রসুন্দরই অধ্যক্ষপদে বৃত হন। আমরণ প্রায় সতের বৎসরকাল তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সে যুগের অনেকেরই "তীরের সঙ্গে সংযুক্ত পুরাতন কাছিটা নির্মম আঘাতে ছিন্ন হয়ে নৌকার পাল নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়ার কাছে." কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে সেরূপ দুর্ঘটনা কোনও দিন ঘটে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রণালী ও সংস্কৃতির উপর আস্থা হারান নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতেই মানুষের আত্মোন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর রহিয়াছে, আর বর্ত্তমান শিক্ষাধারায় মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। তিনি বলিতেন—"প্রতি জাতির নিজস্ব বৃত্তি, শক্তি ও স্বভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া উহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। বিদেশ হইতে আমদানী কোন শিক্ষাবীজ দেশের মাটিতে পুঁতিলে যে শিক্ষার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে যে মানুষ ফলিবে, তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না।" স্বামী বিবেকানন্দও বহুপূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা না শোনার বিষময় ফল এখন উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিলেই তাঁহাদের কথার সত্যতা বুঝা যাইবে।

মাতৃভাষাই যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত তাহা রামেন্দ্রসুন্দর সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি কলেজে বাঙ্গলা ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাও বাঙ্গলা ভাষাতেই। উহা কিন্তু সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে নাই। তাঁহাকে অনেক বাধাবিঘ্নই অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কবে তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হইবে কে জানে!

মাতৃভাষার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরের টান ছিল। সেই কারণে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" প্রতিষ্ঠার কাল হইতেই উহার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল, Bengal Academy of Literature নামক সভাকে পুনর্গঠিত করিয়া উহাকে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নামে অভিহিত করা হয়। তদবধি তিনি নানাভাবে উহার সেবা করিয়াছিলেন। অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী। টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ও একাজে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রদত্ত জমিতে, এবং লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের অর্থানুকূল্যে ১৩১৫ সালের ৩১শে অগ্রহায়ণ, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, উক্ত "সাহিত্য পরিষৎ মন্দির" নির্ম্মিত ও স্থাপিত হয়। রামেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টাতেই পরিষদের গ্রন্থাগারটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল্যবান গ্রন্থাগারটি নিলামে উঠিবার প্রাক্কালে রামেন্দ্রসুন্দরেরই প্রচেষ্টায় উহা "সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে" স্থান লাভ করে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা ও উদ্যমে বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন কাশীমবাজারে ১৩১৪ সালে, ইংরাজী ১৯০৬-৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরই ছিলেন তাঁহার প্রধান উদ্যোক্তা। প্রাচীন পুঁথিসংগ্রহ, উহাদের সংরক্ষণ, মুদ্রণ ও প্রকাশের

ব্যবস্থাও রামেন্দ্রসুন্দরেরই অবিনশ্বর কীর্ত্তি। তাঁহার প্রযত্নেই সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে প্রদর্শনশালা (Musuem) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষা পঠন, পাঠন ও পরীক্ষা প্রচলনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যে চেষ্টা করেন, তাহার মূলে ছিল রামেন্দ্রবাবুরই আন্তরিক যত্ন। সাহিত্য পরিষদের সেবা ছিল তাঁহার জীবন-ব্রত। বাঙ্গালীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে সে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে এ কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তজ্জন্য তিনি জীবনপাতও করিয়া গিয়াছেন।

দেশাত্মবোধ ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের সহজাত। শুধু দেশকে নয়, দেশের সকল জিনিষকেই তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। মাতৃভাষাকে তিনি হৃদয় দিয়া ভালবাসিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে আহূত হইলে বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা দেওয়া যাইবে এই প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি সে কার্য্যে বিরত ছিলেন। বাঙ্গলার প্রতি ধূলিকণা তাঁহার নিকট পবিত্র ছিল। রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকিয়াও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ না দিয়া পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সেসময় যেরূপ রাখীবন্ধনের প্রচলন করেন, রামেন্দ্রসুন্দরও প্রবর্ত্তন করেন অরন্ধনের। মেয়েদেরও এই স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে তিনি দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন শুধু একক পুরুষের দ্বারা এ কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না, তৎসঙ্গে চাই রমণীদিগেরও ঐকান্তিক সাহায্য। তৎ-প্রণীত "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেমে কোনরূপ খাদ ছিল না। তাহা ছিল খাঁটি সোনা। "সারস্বত ভবন" প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রামেন্দ্রসুন্দরের দেশাত্মবোধেরই পরিচয়। তিনি চাহিয়াছিলেন—"বাঙ্গলাদেশের কোথায় কি আছে, কোথায় কি ছিল তাহা সকলে জ্ঞাত হউক। বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সম্পদ কোথায় কি আছে, আর কোথায় কি ছিল তাহাও সকলে জানুক।" তাঁহারই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কর্ম্মযোগী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় উদ্যোগে, এবং স্বদেশপ্রাণ শরৎকুমার রায়ের যত্ন ও পরিশ্রমে "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" গঠিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে "চিত্রশালা" স্থাপন, এবং "রমেশভবন" নির্ম্মাণ তাঁহারই দেশপ্রেমের নিদর্শন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির আদর্শে গোহাটি অনুসন্ধান সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উদ্যোগী কর্ম্মীর অভাবে উহা উঠিয়া যায়। বীরভুম অনুসন্ধান সমিতিরও অনুরূপ দশা ঘটে। এই সময় রঙ্গপুর বঙ্গীয় সাহিত্য শাখা পরিষদের একটি চিত্রশালা একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রজীবন হইতেই রামেন্দ্রসুন্দর লিখিতে ভালবাসিতেন। যাহা পড়িতেন বা দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাসই অবশেষে তাঁহার সাহিত্যসাধনায় পরিণতি লাভ করে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "নবজীবন" পত্রিকায় তাঁহার রচনা সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আসে। তাহার পর সাধনা, জন্মভূমি, দাসী, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়), আর্য্যাবর্ত্ত, মুকুল, উপাসনা, মানসী, ভারতী, এবং ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁহার নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে ঐ সকল প্রবন্ধের কিছু কিছু সংকলন—প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, চরিতকথা, কর্ম্মকথা, শব্দকথা, যজ্ঞকথা, ও বিচিত্র জগৎ প্রভৃতি তাঁহার গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার লেখার মধ্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর অধ্যাত্মসাধনার পরিচয় মেলে। সাহিত্য পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তাই লিখিতে পারিয়াছিলেন—"দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী, ও সাহিত্যের যমুনা, মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্রসংগমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছে।" সেই পুণ্য সঙ্গমস্থানে অবগাহন করিলে সাহিত্যসেবী মাত্রই পরা ও অপরা

বিদ্যা লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারেন, এবং বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনার বিশুদ্ধ নিষ্ঠার পরিচয় পান।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাংসারিক জীবনও সুখের ছিল। দুইকন্যা, একপুত্র, ও আত্মীয়স্বজন লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ আনন্দেই দিন কাটাইতে ছিলেন। এমন সময় অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে কাতর হইয়া বিশ্রাম লাভের আশায় ১৩১৮-১৯ সালে, ইংরাজী ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর পুরীধামে গমন করেন। কয়েকদিন পরেই তিনি মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হন। পনের দিনের মধ্যেই চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। এখানে আসিয়াও আবার শূলবেদনায় (colic pain) আক্রান্ত হইলেন। সাধারণ স্বাস্থ্যও তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বাস্থ্যলাভার্থে কিছুদিন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে নৌকায় বাস করেন। কিন্তু পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না।

১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে, ইংরাজী ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর, তাঁহাকে মূত্রকৃচ্ছ্রারোগে (Bright's disease) আক্রমণ করে। মাস দুই পরে ২২শে পৌষ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার অকালমৃত্যু ঘটে। এই বৎসরেই মহাবিষুবসংক্রান্তির দিনে তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীও জেমোর বাড়ীতে ইহলোক সংবরণ করেন। রামেন্দ্রবাবুর শরীর এ সময় খুবই খারাপ ছিল। আত্মীয়স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি অসুস্থদেহেই কলিকাতা হইতে জেমোয় গমন করিলেন। মাতৃদেবীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থে নানা প্রকার অনিয়ম, উপবাস ও পথক্লেশে তাঁহার পীড়া প্রবলাকার ধারণ করিলে ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মে-মাসে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়।

জালিওয়ানালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ "নাইট" উপাধি বর্জন করিয়া তদানীন্তন বড়লাটকে যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন, রামেন্দ্রবাবু সংবাদ পত্রে তাহা পাঠ করিয়া ১৮ই জ্যৈষ্ঠ,-১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন, রবিবার, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাসবাবুকে রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। পরদিন সোমবার রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলে তিনি রবিবাবুকে তাঁহার উপাধিত্যাগের মূলপত্রখানি পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথও সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রবণশক্তি লোপ পায়। রবীন্দ্রনাথের প্রস্থানের পর তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। সে তন্দ্রা হইতে আর তিনি জাগরিত হন নাই।

সেই দিনই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। দেশের দুর্ভাগ্য ঠিক পরের দিনই ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ হয়। ইহার পর আর পাঁচদিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন শুক্রবার রাত্রি দশঘটিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন কর্ম্মময় এবং কার্য্যাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। মধুর আনন্দ ও সুচতুর শৃঙ্খলা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্ররূপে দেখা গিয়াছিল। মূলতঃ ছিলেন তিনি জ্ঞানতপস্বী। চরিত্রের শুচিতা, হৃদয়ের বিশালতা, ঐকান্তিক সহৃদয়তা ছিল তাঁহার স্বভাবের সৌন্দর্য্য। পরনিন্দা বা পরচর্চা করিতে তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই। তিনি কাহারও প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। হিংসা তাঁহার নিকট পৌঁছাইতেই সাহস করে নাই। পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন মতাবলম্বীকে স্বমতে আনিবার সামর্থ ছিল তাঁহার অসামান্য। তিনি তাই ছিলেন অজাতশত্রু।

সংহতিশক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অগাধ। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি অধ্যাপকদিগকে লইয়া একটি অধ্যাপক সঙ্ঘ গঠন করেন। যখনই কলেজের কার্য্যধারার কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জনের প্রয়োজন হইত, তিনি তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া সকলের সুপরামর্শমত উহা নিষ্পন্ন করিতেন। বাঙ্গলায়,

শুধু বাঙ্গলায় কেন, সমগ্র ভারতে ইহাই বোধ হয় প্রথম শিক্ষক সভ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মধ্যেও তিনি তাঁহার কর্ম্মশক্তির প্রভূত পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রিয়তা অথচ সকল কাজে সম্পূর্ণ অনাসক্তি তাঁহার জীবনে অদ্ভুতভাবে সম্মিলিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন খাঁটী ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রাম ও অধ্যাপনাবৃত্তি আয়ত্ত করিতে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় নাই। প্রাচীন ভারতের ঋষিদিগের ন্যায় নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁহার সকল কর্ম্মে সত্যসুন্দরের আভাস ফুটিয়া উঠিত। কবিগুরু যথার্থই বলিয়াছিলেন "তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর তোমাকে সাদরে অভিবাদন করি।" আমরাও কবির সহিত আমাদের প্রণতি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

একাধারে এইরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরের সমাবেশ বাঙ্গলায় আর কখনও দেখা যাইবে কি?

স্মৃতির টুক্‌রো

উপন্যাস

সাতকড়িপতি রায়

আমি বলিয়াছি আমাকে তাঁহার সহকারীরূপে এই কয় বৎসর বহু কাজ করতে হয়। প্রথম কংগ্রেস গঠনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বীরেন্দ্রনাথের ইউনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স্ বন্ধের কাজে আমাকে ঘাটালে বিশেষভাবে খাট্‌তে হয়। কংগ্রেস গঠনের জন্য আমাকে মেদিনীপুর ছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়ায় কাজ করিতে হয়। তারপর যখন রাজপুত্রকে বয়কট করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বাংলায় civil disobedience ডিসেম্বরের গোড়ায় সুরু হয় তখন শাস্‌মল্ অসুস্থ। দেশবন্ধুর আদেশে সে ভার আমাকে গ্রহণ করতে হয়। সুভাষ ও অনঙ্গ দাম আমার সাহায্যকারী স্থির হয়। দেশবন্ধুর আদেশে প্রথম তাঁর পুত্র চিররঞ্জন আইন অমান্য করে জেলে যায় এবং তারপর বাসন্তীদেবী, ঊর্ম্মিলাদেবী জেলে যান। তারপর দেশবাসী আইন অমান্যের অনুমতি পায়। ১০ কি ১১ই ডিসেম্বর যখন দেশবন্ধু বীরেন শাসমল ও সুভাষ এক-দিনে জেলে যান, তখন অন্যান্যদের সাহায্যে আমিই কর্ত্তা হিসাবে ঐ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম। বাংলার জেলে আর স্থান ছিলনা। খিদিরপুরের ডকে গোডাউনগুলি তার দিয়ে ঘিরে জেল করা হয়েছিল। লর্ড রিডিং যখন ১৮ই ডিসেম্বর আপোষ করতে আসেন, তখন আমাকেই মালব্যজীর সঙ্গে লর্ড রিডিংএর সঙ্গে কথা বল্‌তে হয়েছিল। আমাকেই মহাত্মাজীকে টেলিগ্রাম করে তাঁর উত্তর আনতে হয়েছিল। অবশেষে ২৪শে ডিসেম্বর ১০ টার সময় যখন রাজপুত্র হাওড়ায় উপস্থিত হন, তখন বন্দী হইয়া আমাকে জেলে যেতে হয়। যখন জেল থেকে বেরিয়ে আসি তখন চৌরি-চৌরার জন্য মহাত্মাজী ভারতের ডিক্টেটরস্বরূপ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর সেই হুকুমটা কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত করাবার জন্য যখন দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়, তখন আমাকেই বাংলার সদস্য লইয়া দিল্লীতে গিয়া মহাত্মাজীকে বাধা দিতে হয়। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব ছাড়া আর সব প্রদেশ মহাত্মাকে অনুসরণ করে। দুই দিন তর্কের পর যখন মহাত্মার হুকুম গৃহীত হয়, তখন মহাত্মার আদেশে আমাকে সে রাত্রে দিল্লীতে থেকে যেতে হয়। পরদিন প্রাতে তিনি আমায় বলে-ছিলেন, "I had not a minute's sleep last night. I find I got mechanical majority. The heart is not with me.' তিনি আমায় বলেছিলেন তিনি এক-মাসের মধ্যে বাংলায় আসবেন এবং যদি দেখেন এখানে কংগ্রেস অহিংস আছে, তবে আমাদের আইন অমান্য করতে দেবেন। কিন্তু ৮।১০ দিন মধ্যে তিনি বন্দী হ'য়ে যান।

তা পর যখন লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা বসে, তখন আবার আমাকেই সদস্য নিয়ে বাংলার নেতৃত্ব করতে হয়। সেখানেও একটা Enquiry committee হয়ে সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর দেশবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে সারাবাংলার পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। আমিই চেষ্টা করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে অভিনন্দন লেখাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হবার জন্য প্রথম নির্ম্মলচন্দ্র চন্দর ও আমি চেষ্টা করি, কিন্তু বিফল মনোরথ হ'য়ে, আবার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে যাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী না হওয়ায়, আচার্য্য দেবই সভাপতিত্ব করেন সেটা ১৯২২ সালের ১০ই কি ১১ই

আগষ্ট। বাংলা শ্রাবণ মাস। সেদিন বাংলায় বড় আনন্দের দিন। বাংলার মহান নেতাকে সারা বাংলা অভিনন্দন দিয়েছিল। দেশবন্ধুর জেল থেকে বেরুবার ৪।৫ দিন মধ্যে তাঁর ছোট মেয়ে 'বেবির' বিবাহ হয়। তাতে চার হাজার লোক নিমন্ত্রিত হয়। তার রান্না ও খাওয়াবার ভার পড়ে আমার উপর। ৫০ জন কংগ্রেস-সেচ্ছাসেবক নিয়ে সে কাজ সুশৃঙ্খলায় আমি উদ্ধার করি।

দেশবন্ধু সেপ্টেম্বরে কি অক্টোবরে স্বাস্থ্য উদ্ধার কল্পে সস্ত্রীক কাশ্মীর চলে যান। বাংলায় হঠাৎ ভীষণ বন্যা হয়। তাতে উত্তর বঙ্গ বিশেষ রাজশাহী জেলায় অভূতপূর্ব্ব অবস্থা উদ্ভূত হয়। দেশবন্ধু নাই, নির্ম্মল-চন্দ্রের সঙ্গে যুক্তি করে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সভাপতি করে একটা বন্যাত্রাণ সমিতি গঠিত করা হয়। আর তিনজন সম্পাদক হন। সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয়, সুভাষ ও আমি। সুভাষকে উত্তরবঙ্গে পাঠান হয়। আমি ঘাটালে যাই। সতীশবাবু আফিসে থাকেন। ঘাটালে কিছুকাল কাজ করে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে খুব অসুস্থ হয়ে সেখানকার কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর ভার দিয়ে কলিকাতা ফিরে আসি। নওগাঁতে সুভাষ একটিও নৌকা পায় নি। নদীই নাই। রেল লাইনে জল আটকে লোকের সর্ব্বনাশ হয়েছিল। কলাগাছ কেটে ভেলা করে কিছু সাহায্য হয়েছিল। কলকাতা থেকে যত পুকুরে ছোট ছোট 'জলিবোট' ছিল সেগুলি রেলের ভ্যানে করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুভাষ তাঁর কর্ম্ম-শক্তি দিয়ে সেখানে যে ব্যবস্থা করেছিল সে কথা ঐ অঞ্চলের অধিবাসী আজও ভোলে নাই। আচার্য্য দেবের আবেদনে বহু পুরাতন ও নূতন কাপড় জড় হ'ল সায়েন্স কলেজে। আমি সেগুলির মধ্যে বিলাতি কাপড়গুলি পৃথক করালাম। সুভাষ আসতে আমরা উভয়ে আচার্য্যদেবকে বললাম বিলাতি কাপড়গুলি বিতরণ করা যাবে না, কারণ গতবছর ঘাটাল অঞ্চলে বিলাতি কাপড়ের বহ্নুৎসব হয়েছে। তিনি কিছুতেই সেগুলি নষ্ট করতে রাজী হলেন না। আমি আর সুভাষ ইস্তফা দিলাম। সতীশবাবু একাই সম্পাদক রহিলেন। দেশবন্ধু কলকাতায় এসে যাওয়ায় আমাদের কংগ্রেসের কাজ এসে গেল, ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেস।

গয়া কংগ্রেসে আমিই বাংলার প্রাদেশিকের সম্পাদক। কংগ্রেস ডেলিগেট নির্ব্বাচন ইত্যাদি সব কাজই আমায় করতে হয়েছিল এবং গয়াতে হোগলায় ঘরে গয়ার শীতে বাস করতে হয়েছিল। দেশবন্ধুর কাউন্সিল গমন প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব সেখানেই পরিত্যাগ করে স্বরাজ্যদল গঠন করলেন। বাংলার মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী কর্ম্মী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অধীন স্বরাজ্য দলে যোগ দেন নি। অন্য সকলেই যোগ দিয়েছিলেন।

দেশবন্ধু ও মতিলালজী সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে যখন নাগপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন করালেন, সে অধিবেশনেও আমাকেই সব ব্যবস্থা বাংলার সদস্যদের জন্য করতে হয়েছিল। প্রথম দিন নাগপুর কংগ্রেসের নিরামিষ খেয়ে সকলেই চটে উঠলেন। পরের দিন রাঁধলেন হেমপ্রভা দেবী ও মোহিনী দেবী। আমি মাছ কিনতে গিয়ে পচা মাছ এনেছিলাম। কিন্তু হেম-প্রভা দেবী তাকে পেঁয়াজ ও লঙ্কা দিয়ে রাঁধলেন এবং যতীন সেনগুপ্ত, সত্যেন মিত্র, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হেমপ্রভা দেবী প্রভৃতি সেই মাছ আনন্দ করে খেলেন। স্থির হল দিল্লীতে সেপ্টেম্বরে স্পেসেল কংগ্রেস হবে এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হবেন সভাপতি।

দেশবন্ধুর আর টাকা নাই। বেনারসের ঋষিপ্রতিম ভগবানদাসজী দশ হাজার টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সেই টাকা দিয়ে বহু ডেলিগেট নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। সেখানে কাউন্সিল গমন গৃহীত হল। কিন্তু ফিরে আসবার টাকা? দেশবন্ধু আমাকে বললেন হাকিম আজমল খাঁ সাত হাজার টাকা ধার দিবেন। দেশবন্ধু হ্যাণ্ডনোট লিখে আমাকে দিলেন। পরদিন সকালে আমি টাকা আনতে গেলাম। হাকিম সাহেব দশ টাকার নোট, পাঁচ টাকার নোট, এক টাকার নোট, আধুলি, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদিতে সাত হাজার টাকা দিলেন। ঐ একটি সদাশয় ব্যক্তি আমি দেখেছিলাম।

নভেম্বরে নির্ব্বাচন। সেটা ১৯২৩ সাল। ফিরে এসেই প্রার্থী স্থির করা হল। আমাকে প্রথম মেদিনীপুর জেলার দেবেন্দ্রলাল খাঁএর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আদেশ হ'ল। কুমারসাহেব ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দলের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রফা হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াবে না স্থির হল। ঐ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্যার সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কলকাতা বড়বাজার কেন্দ্রে দেশবন্ধুর ভ্রাতা সতীশরঞ্জন দাস মহাশয় দাঁড়িয়েছেন সরকারের পক্ষে। তিনি তখন বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাঁর বিরুদ্ধে কবিগুরুর পুত্র রথীন্দ্র ঠাকুরকে দাঁড় করালেন। কিন্তু বড়বাজারের কংগ্রেসীদল তাঁকে পছন্দ না করায় শেষে দেশবন্ধু আমাকে সেখানে দাঁড়াতে আদেশ করলেন।

এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য হয়েছিল আর ঐ independent দলের ১০ জনের সাহায্যে বাজেট নামঞ্জুর করা হয়েছিল। আমার নির্ব্বাচনে দেশবন্ধুর ভ্রাতা অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেলকে হারাতে বেগ পেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় নির্ব্বাচনের দিন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হয়েছিল লালবাজার পুলিশের অফিস ও জোড়াবাগান পুলিশ অফিস। এই পুলিশের খাস মোকামে লোকের যে অপূর্ব্ব ভিড় হয়েছিল সেটা তখনকার কলকাতাবাসীর মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা আজও ভুলেন নাই। মেদিনীপুর থেকে দাদা ও আমাদের বংশের বহু কর্ম্মী এসেছিলেন। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দুই নামজাদা সংবাদপত্র এস আর দাস মহাশয়কে সাহায্য করেছিলেন। দেশবন্ধু দুই দিন বড়বাজারে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সতীশ আমার ভাই, সে লোক খারাপ নয় কিন্তু সে মনে করে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতাতে দেশের মঙ্গল হবে। আর আমরা কংগ্রেসের স্বরাজ্যদল মনে করি, দেশবাসী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করলে দেশের মঙ্গল হবে। তাই আমরা আমার ভাইএর বিরুদ্ধাচরণ করছি। এতেই কাজ হয়েছিল। ইলেকশনে জিত হলে দেশবন্ধু আমার বাড়ীতে এসে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করে গেলেন কারণ আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপরেই আমি মধুপুরে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যাই।

এই নির্ব্বাচন হয়েছিল হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন ভোটে ১৯১৯ সালের এই ডায়ারকি আইনেই ইংরাজ পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করে হিন্দু মুসলমানে রাজনৈতিক বিরোধ লাগিয়ে দেয়, যাহার সমাপ্তি হয় ভারত ভাগ করে।

নির্ব্বাচনের পরই যে সকল মুসলমান পৃথক ভোটে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছিলে অথচ তাঁরা স্বরাজ্যদলভুক্ত তাঁদের অনুরোধে দেশবন্ধু একটা চুক্তিপত্র প্রস্তুত করেন। এই চুক্তিপত্র ভবিষ্যতে বিপরীত ফল প্রসব করে। চুক্তিপত্রে লিখা ছিল বাংলার হিন্দু মুসলমান একযোগে বৃটিশ হাত হইতে ভারতকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টার ফলে দেশ স্বাধীন হইলে তখন যে শাসনযন্ত্র প্রস্তুত হইবে তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের প্রত্যেকের অর্দ্ধেক প্রতিনিধি হইবে। সরকারী চাকরিতেও অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক চাকরি পাইবে। মসজিদের সামনে উপাসনার সময় বাদ্যভাণ্ড হবে না, গরু করবানি মুসলমানগণ করিতে পারিবে তবে হিন্দুর সমক্ষে নয় ইত্যাদি। ইহাতে কেবল দেশবন্ধু সহি করেন নাই হিন্দুর পক্ষে আরও বিশিষ্ট কাউন্সিলের সভ্যগণ সহি করিয়াছিলেন এবং আমাকে কিছু না জানিয়ে আমার নামও সহি করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মধুপুরে। হঠাৎ বড়বাজার থেকে একদল মধুপুরে উপস্থিত। এ কেয়া কিয়া সাতকৌড়ী বাবু?

মুসলমান হিন্দুকা সমান শাসন পায়েগা, সমান চাকরি ভি পায়েগা, গো কোরবানি ভি করেগা, এইসা চুক্তি আপ কেয়সে কিয়া? হামলোগোকে কি একদফে পুছাভি নেহি। আমিত অবাক হয়ে গেলাম। বললাম আমি চুক্তি করি নি। তাঁরা বললেন আপনার সহি আছে। আশ্চর্য্য হয়ে আমি কলকাতা এলাম। দেশবন্ধু বললেন তোমার নাম সহি করে দিয়েছি। এ সব ত দেশ স্বাধীন হলে হবে, এখন যেমন আছে তাইতেই মুসলমানগণ আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ

করবে। ও না করলে ওদের ভোটই পাওয়া যাবে না। আমি বললাম মুসলমানরাও বলছেন এই চুক্তি আজ থেকেই বলবৎ, আর হিন্দুরাও বলছেন আজ থেকেই বলবৎ হয়ে গেল। অবশ্য বড়বাজারের আমার কর্মীদের আমি বলতে পেরেছিলাম, চুক্তি দেখ দেশ স্বাধীন হলে এ চুক্তি বলবৎ হবে। কে সেকথা শুনছে? কিন্তু এই চুক্তিতেই কি কিছু ফল হল? মুসলমান কাউন্সিল মেম্বারগণ টাকা পকেটে নিয়ে তবে বাজেট নামঞ্জুরে ভোট দিয়েছে। আজ ভাবি দেশবন্ধুর ও কাজটা তাড়াতাড়ি না করলে ভালই হত। এই চুক্তির জন্যই তাঁর দেহাবসানের পর ১৯২৬ সালে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হল। বিদ্বেষ চরমে উঠল।

কাউন্সিলে আমি খুব কম সময় থাকতাম, ভোট দিবার প্রয়োজন হলে phone করত এবং এসে ভোট দিতাম। বাজেট সেশন শেষ হতে আমাকে দার্জ্জিলিং যেতে হয়েছিল। শরীর সারছিল না। দেশবন্ধু বললেন দিন কুড়ি থাকলেই সেরে যাবে। বড়বাজারের কে একজন দার্জ্জিলিংএ একটা ধর্ম্মশালা করেছেন, সেটা open করতে হবে এবং তার নিয়মকানুন লিখে দিতে হবে আমাকে। তাই এপ্রিলমাসে দার্জ্জিলিং গেলাম। তখন আমার ছোট ভ্রাতার জামাতা শচীনের দাদা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জ্জিলিংএ পুলিশের ডেপুটী সুপারিনটেনডেণ্ট। তাকে নিয়েছিলাম। সে শিলিগুড়িতে একজন জমাদার ও দার্জ্জিলিং স্টেশনে একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর পাঠিয়ে তাদের হেফাজতে তার বাসায় নিয়ে গেছল। সেখানে একদিন থেকে মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা খুলে সেখানে উঠে এসেছিলাম এবং ২০ দিন ছিলাম। সেখানে খেতাম আমার এক খুড়তুত ভগ্নী-পতি অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাসাবাড়ীতে। পুলিশ-সুপার রাঘবকে দিয়ে কলকাতা থেকে ১৯০৪ সাল থেকে পুলিশ আমার যে ঠিকুজী প্রস্তুত করে রেখেছিল সেটা দার্জ্জিলিংএ নিয়ে যায় এবং রাঘব সেটা আমাকে দেখিয়েছিল। তাতে সত্যি মিথ্যে অনেক কিছু ছিল। সেখানে আমি পোষ্ট অফিসের কর্ম্মীসংঘের বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম মাত্র। আর কিছু করি নি। শরীর সারল না বরং কাশি খুব বেড়ে গেল। পালিয়ে এলাম। কলকাতায় শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ খেয়ে তবে কাশি যায়। কিন্তু পেটে যে Deodonal Ulcer হয়েছিল সেটা যায় নি।

বরিশালে সেই ১৯২৪ সালে যে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি নির্দ্ধারণ হয় তাতে দেশবন্ধুকে হারাবার জন্য শ্যামসুন্দরবাবুকে নিয়ে একদল চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়। বরিশালে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলাম। সেখানের একটা ঘটনা মনে আছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার বাবুর স্ত্রী খুব যত্ন করে রেঁধে আমাদের খাইয়ে ছিলেন। কিন্তু পেটে আলসার জন্য আমি বেশী খেতে পারি নি। সেই কথা নিয়ে সুকুমারের ভাই সরল বসন্তদার সঙ্গে আলোচনা করেন। বসন্তদা তাকে বলেন, সাতকড়ি-বাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাকে সুকুমারের স্ত্রী রেঁধে খাইয়েছে তাই তিনি ঐ রকম খেয়েছেন। সরল অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সন্ধ্যায় রান্নার জন্য উড়ে ব্রাহ্মণ এনেছে। আমরা মিটিং থেকে আসতে দেশবন্ধুর সামনেই বলল যে "আমাদের বড় অপরাধ হয়েছে। আপনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বৌদিদির রান্না বলে আপনি কিছুই খান নি। এ বেলা ব্রাহ্মণ এনেছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" আমি কিছু বলার আগেই দেশবন্ধু বললেন কে তোমাদের এ কথা বলেছে? সরল বলে বসন্তবাবু। দেশবন্ধু হাসতে হাসতে বললেন বসন্তর মাথায় গোবর। তাই যদি হবে তবে একটা ভাত খাওয়াও যা আর অনেক খাওয়াও তাই। ওর অসুখ তাই বেশী খায় না। আমি বললাম, সরলবাবু, ঐ বৌমা যদি এ বেলা না রাঁধেন তবে আমি খাবই না। সরলও অপ্রস্তুত। তার পরের দিন সকালে আমরা চলে আসব। সুকুমারের বৌ এসে আমার পায়ের ধুল নিলো আর তার সঙ্গে হেমপ্রভা বৌদি। হেমপ্রভা বললেন, উনি কাল বৌমাকে ভড়কে দিয়ে-ছিলেন। তাই আজ উনি আপনার পায়ের ধুল

নিলেন। আমি বললাম, "আশীর্ব্বাদ করি মা, যখন আসব তখনই যেন তুমি বেঁধে খাইও।" সকলেই হাসতে লাগলেন।

দেশবন্ধুর হুকুমে পল্লী গঠন করতে যশোহর জেলায় যাই। সেখানে ছোট বিজয় রায় (যাকে মুসলমানগণ হত্যা করবে বলে কাগজে ছাপা হয়) তখন ২০৷২২ বৎসরের যুবক তাকে সঙ্গে করে কত পল্লীতে পল্লীতে ঘুরেছি। গ্রাম পরিষ্কার রাখার উপদেশ দিয়েছি। রাস্তার ধারে মলমূত্র ত্যাগ করেছে, মুখে বলায় পরিশোধিত না হওয়ায় নিজে হাতে করে 'মল' মাঠে ফেলে দিয়েছি। গ্রামের লোক অপ্রস্তুত হয়ে উপদেশ অনুসরণ করেছে।

১৯২৪ সালের বেলগাঁও কংগ্রেসে গিয়ে দেশবন্ধু অসুস্থ হলে অফিসের কাজের খুব চাপ পড়ল। বহুকর্ম্মীকে মাসোহারা দিতে হত। তার টাকার সংগ্রহ করতে হ'ত। দেশবন্ধু তখন সস্ত্রীক রাজগীরে। আমায় যেতে হয়েছিল। তারপর ফিরে এসে শুয়ে থাকতেন। একদিন ডেকে বললেন, হেমপ্রভাকে মাসোহারা দাও না। বললাম, বসন্তদাকে দিই। বললেন হেমপ্রভা স্কুল করেছে তার জন্যে আলাদা একটা মাসোহারা দাও। এইভাবে টাকার যোগাড় আর খরচ। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্য্যন্ত আমাকে অতিশয় পরিশ্রম করতে হয়। ঐ সময় তারকেশ্বর মহান্তর গদি দখল করা হল। দেশবন্ধুর হুকুমে আমাকে শিবরাত্রির দিন তারকেশ্বরে মহান্ত হয়েই বসতে হয়েছিল। সকাল থেকে সমস্ত প্রস্তুতি। সেচ্ছাসেবকের দল শিবের মন্দিরে তৃতীয় দরজা ফুটিয়েছে। এক দরজা দিয়ে পুরুষগণ ঢুকবে, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। অপর এক দরজা দিয়ে মেয়েরা ঢুকবে, তারাও সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ভিতরে একসঙ্গে ২০৷২২ জনের বেশী স্থান হবে না। পুরুষগণ ও স্ত্রীলোকগণ পৃথক পৃথক লাইন দিয়েছে। কংগ্রেস দখল করেছে বলে অভূতপূর্ব্ব ভিড়। বৈকালে সশিষ্য ভোলাগিরি উপস্থিত হলেন। উভয় দিকের দরজা বন্ধ করে তাঁকে সামনে দিয়ে পূজা করবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করালাম। ১৫৷২০ মিনিট উপাসনা করে তাঁরা বেরিয়ে এসে খুব সুখ্যাতি করে; আশীর্ব্বাদ করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে ব্রাহ্মণসভার কয়েকজন শ্রীজীব তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে উপস্থিত হলেন। ওঁরা মহান্তর বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা করেছেন। দুদিক বন্ধ করে ওদেরও সামনে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করালাম। ওরা আধঘণ্টাবাদে বাইরে এলেন। বললেন বেশ বন্দোবস্ত হয়েছে।

ক্রমশঃ
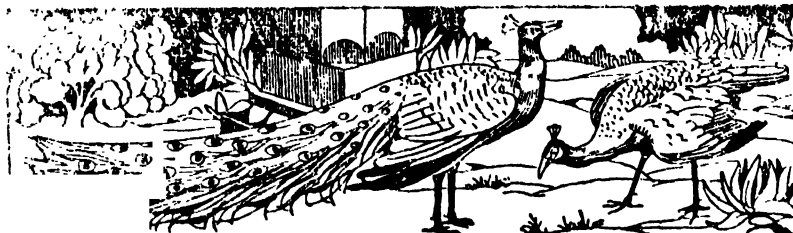
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গলায় এমন দিন ছিল যখন কলকারখানার কাজ বাঙ্গালী এড়াইয়া চলিত, সেই অতীত দিনে বাঙ্গালীর ভরসা ছিল কলম এবং কেরানীগিরি। আজ এই ক্ষেত্রেও তাহার একচেটিয়া অধিকার আর নাই, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা আসিয়া বাঙ্গালীর চাকুরীর ভাতেও হাত দিয়াছে এবং ক্রমশঃ বেশী করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থার প্রধানতম কারণ পশ্চিমবাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্যের চাবিকাঠি বাঙ্গালীর নাই, যাহাদের হাতে এই চাবিকাঠি তাহারা বাঙ্গালী ত নহেই, অনেকে আবার ভারতীয়ও নহে। কাজেই বাঙ্গালীর প্রতি বিশেষ কোন দরদ তাহাদের নাই এবং থাকিবার কথাও নহে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালী গায়ে-গতরে খাটিতে আজ কুন্ঠিত এবং গররাজী নহে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে বাঙ্গালী আজ কলকারখানার শ্রমিকের কাজও পাইতেছে না তাহার কারণ এই একই। কলকারখানায় চাকুরী দেনেওয়ালা অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্তা বাঙ্গালী নহে, কাজেই বাঙ্গালী শ্রমিক অপেক্ষা অবাঙ্গালী নিয়োগকর্ত্তা নিজ-রাজ্যের শ্রমিক আমদানী করিতে অধিক উৎসাহী এবং তৎপর। অবাঙ্গালী মালিকানার কল-কারখানা এবং বাণিজ্যসংস্থায় কর্ম্মখালী কিংবা নূতন লোকের প্রয়োজন হইলে মালিকের নিজ প্রদেশের স্ববর্ণ-স্বগোত্রীয়দের ভাগ্যেই তাহা পড়ে, বাঙ্গালীর আবেদন-নিবেদন হয় প্রত্যাখ্যাত আর না হয়, নাকচ নানা অজুহাতে। এই সকল নিয়োগের ব্যাপারে অবাঙ্গালী মালিকের নিকট হইতে বাঙ্গালী চাকুরী-প্রার্থীর দল প্রায়-কোন সময়েই মৌখিক ভদ্রতারও পরিচয় পায় না। এই বিষয়ে পত্রিকান্তরে মন্তব্য সময়োচিত :—

> এ রাজ্যের শিল্পবাণিজ্য-পরিচালনার ভার অচিরে বাঙ্গালীর উপর বর্ত্তাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নিয়োগের ধারাটা পালটাইয়া দেওয়া এমন কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রতিবেশী একাধিক রাজ্যে নিয়োগের চিত্র সাম্প্রতিককালে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। যেখানে বহিরাগতদের একাধিপত্য ছিল, সেখানে আজ স্থানীয় অধিবাসীদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিলেই হয়। দুই দিক দিয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক তো নূতন নূতন প্রকল্পে কাজ পাইয়াছে প্রধানত সেই রাজ্যেরই অধিবাসী, তাহার উপর পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নূতন চাকুরীর অগ্রভাগ মিলিয়াছে তাহাদেরই। এই যে আমূল পরিবর্ত্তন, সেটা ঘটিয়াছে মুখ্যত সরকারের চেষ্টাতেই। পশ্চিমবঙ্গেও বাঙ্গালীর বেকারী ঘুচাইতে গেলে সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। তাঁহারা যদি উদ্যোগী হন তাহা হইলে এ রাজ্যে শিল্পবাণিজ্য-প্রসারের প্রসাদ বাঙ্গালীর ভোগে আসিবে, তাহার বেকারী ঘুচিবে, দৈন্যের আতিশয্যও। এখনকার মত তাহাকে তখন আর নিজবাসভূমে পরবাসী হইয়া দারিদ্র্য-রোগে ভুগিয়া দিন কাটাইতে হইবে না।—

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে বাঙ্গালীর তেমন উৎসাহ

নাই—স্পষ্টই ইহা দেখা যায়। একথাও সরকারী ভাবে স্বীকৃত যে পশ্চিমবঙ্গে 'আর্থিক রক্তাল্পতা' রোগ প্রকট। নূতন শিল্পের লাইসেন্স পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়াছে। বিদ্যুতের চাহিদাও ক্রমশ নিম্নগতি হইতেছে। অর্থনৈতিক পণ্ডিতের মতে, বিশেষ করিয়া ধনবিজ্ঞানীদের; ইহার প্রধান কারণ আর্থিক অবস্থার অবনতি। এবং এই অবনতির ফলেই কর্ম্মসংস্থানক্ষেত্রে প্রয়োজন মত সুযোগের সঙ্কোচও ঘটিতেছে। এ-সব আর্থিক তথ্য এবং তত্ত্বকথা উদ্বেগের কারণ সত্যই। কিন্তু এ-ব্যাপারে বাঙ্গালীর যে-প্রকার উদাসীনতা দেখা যাইতেছে তাহার কারণ বাঙ্গালীর 'দার্শনিক' মনোভাব কিংবা ভাবুকতা নহে, ইহার প্রকৃত কারণ :

> এ রাজ্যের বিরাট কর্ম্মকাণ্ডে বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ যোগ সামান্যই—সে যজ্ঞশালায় প্রবেশের অধিকার তো তাহার নাই-ই, এমন কি উঁকি মারিয়া দেখিবার সুযোগও আছে কি না সন্দেহ। যে ভুরিভোজের বিরাট আয়োজন এখানে নিত্য চলিতেছে, তাহার সুগন্ধ পর্যন্ত বাঙ্গালীর নাকে আসিয়া পৌঁছায় না, সেখানে পাত পাতিয়া বসার সৌভাগ্য দূরের কথা। কখনও কখনও ছিটেফোঁটা কিছু তাহার বরাতে হয়তো বা জুটিয়া যায়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সেটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়—।

তাই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোদ্যোগে ভাটার টান দেখিয়া বাঙ্গালীর চমকাইবার বা প্রমাদ ঘটিবার কারণ ঘটে নাই।

বেল পাকিলে বা পচিলে কাকের লাভ লোকসান কিছুই নাই, বাঙ্গালীর হইয়াছে তাহাই। এ-রাজ্যে নূতন নূতন কলকারখানা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, শিল্প লাইসেন্সের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহাতে বাঙ্গালীর কি লাভ হইবে। নূতন লাইসেন্সের শতকরা একটাও কি বাঙ্গালীর ভাগ্যে জুটিবে? ছোট বড় চাকুরীই বা বাঙ্গালীর ভাগ্যে কয়টা জুটিবে? এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে ভাটা বা জোয়ারে বাঙ্গালীর কোন প্রকার চিন্তা বা উৎসাহ যদি না থাকে, তবে বাঙ্গালীকে দোষ দেওয়া যাইবে কতখানি—ভাবিবার কথা।

অবস্থা হইত বিপরীত যদি নিজ বাসভূমে শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর থাকিত প্রাধান্য, প্রাধান্য না হউক যদি বাঙ্গালীর কর্ম্মসংস্থানের পূর্ণ ব্যবস্থা এবং সুযোগ কলকারখানা এবং সদাগরী দপ্তরে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা সামান্য কয়েকটি বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্যসরকারের দপ্তর-গুলিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ-রাজ্যস্থিত দপ্তরগুলিতেও বাঙ্গালীর সংখ্যা সীমিত।

> এ ব্যবস্থা অসঙ্গত ও অসহনীয়। বাঙ্গালীর নিজের ঘরে উৎসবের আয়োজন হইবে আর বাঙ্গালীর সঙ্গে তাহার কোনও সংস্রব থাকিবে না, এ কেমনতর কথা? বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে হইলে, তাহাকে অন্তত খাটিয়া খাইবার সুযোগ দিতে হইবে, এ-রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যে তাহার যাহাতে কর্ম্মসংস্থান হয় সে আয়োজন করিতে হইবে। সে দায়িত্ব মুখ্যত রাজ্য সরকারের। দেখা যাইতেছে এ রাজ্যের যে কয়টি প্রধান শিল্প সে সব কয়টিই আজ সংকটে পড়িয়াছে। মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনশৈলী লইয়া কি পাট, কি চা, কি ইঞ্জিনীয়ারিং কোনও শিল্পই আজ আর বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না, তাহাদের আধুনিকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। কাজেই সে সব শিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশই কমিবে, নহিলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই শিল্পগুলি যদি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের কেন্দ্র করিয়া যেসব পরিপূরক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়িয়া উঠিবে লোকের কাজ জুটিবে সেগুলিতেই। রাজ্য সরকারকে সে সব শিল্প যাহাতে গড়িয়া ওঠে তাহার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে, আর দেখিতে হইবে যাহাতে সেগুলি বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তবেই বাঙ্গালীর দুঃখ ঘুচিবে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে, বিশেষ করিয়া ইউনিয়ন কর্ম্মকর্ত্তাদের কিছু কালের জন্য অযথা এবং

সামান্য কারণে ধর্মঘট আহ্বান করিয়া, বাঙলার শ্রমিক-দের দুখের বোঝা বৃদ্ধি না করিতে কাতর নিবেদন জানাইতেছি। বাঙালী শ্রমিকদের বাঙলার বাহিরে কোন স্থান নাই, এ-কথাটা যদি ইউনিয়ন কর্তারা মনে রাখেন, তাঁহারা দেশ ও জাতির প্রতি হয়ত কিছু কর্তব্য পালন করিবেন।

'উফী' সরকারের আমলে যে সকল ধর্মঘট হয়, সুবোধ ব্যানার্জীর আশীর্বাদে, তাহার ঘা শুকাইতে বাঙলা শ্রমিকদের খেসারত দিতে হইতেছে আজও এবং আরো কয় বৎসর দিতে হইবে কে জানে। (৩-৬ ৬৮)

পশ্চিমবঙ্গের 'উফী'র দাবী (মানতে হবে ?)

এ-রাজ্যের ইউ-এফ দলের শ্রীসুধীনকুমার দিল্লী গিয়াছেন কিছুদিন পূর্বে ইলেক্‌সন্ কমিশনার শ্রীসেন বর্মার সকাশে তাঁহাদের এই দাবী পেশ করিতে যে, কোন অবস্থা বা কারণেই মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন আগামী নভেম্বর মাস হইতে পিছাইয়া দেওয়া চলিবে না! ইহা দাবী, না হুকুম তাহা বুঝা শক্ত! 'উফী' দলের হঠাৎ এমনভাবে চম-কাইবার কারণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহলে আগামী নভেম্বর মাসে নির্বাচন রদ করিবার জন্য নানাভাবে প্রয়াস চলিতেছে। যাঁহারা এই প্রয়াস চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশের শিক্ষিত, ভদ্র এবং দেশভক্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন। একটি সিগ্‌নেচার (signature) ক্যাম্পেন্‌ও আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বহু লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী স্বাক্ষর করিয়াছেন। স্বাক্ষরকারীরা চাহেন এখন অন্তত আরো দুই বৎসর এ-রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চলুক, যাহাতে মানুষ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস লইতে পারে। মাত্র নয়-মাসের 'উফী' শাসনের বিষময় ফল পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বাধ্য হইয়া ভক্ষণ করিতে হইয়াছে এবং ইহার বিষক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গকে কতদিনে রেহাই দিবে কেহ বলিতে পারে না

দেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষ যদি একজোট হইয়া নির্বাচন বন্ধ রাখিবার দাবী পেশ করে, তাহা হইলে সে-দাবী কি 'উফী'র দাবী অপেক্ষা কমজোরী বলিয়া গৃহীত হইবে কর্তামহলে? মনে হয় কয়েকটা হৈ-হল্লাকারী চ্যাঙড়া পার্টির দাবীকে কেহ দেশের দাবী বলিয়া ভুল করিবেন না। পার্টি কিংবা পার্টিগোষ্ঠি অপেক্ষা দেশ বড় এবং দেশ অপেক্ষাও বড় সেই দেশের মানুষ। বর্তমানে এই মানুষকে বোকা বানাইয়া 'উফীর' দল দেশে আবার অরাজক রাজত্ব কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া মনে হইতেছে। উফী-দের মধ্যে আবার অতিচতুর তীব্রলালের দল—এবং এই তীব্রলালারাই উফীর অন্যান্য দলগুলিকে কাজে লাগাইয়া তাহাদের হাতিয়ার করিয়া নিজের দল এবং দলপতিদের গদিতে বসাইতে কোন প্রকার অপপ্রয়াস করিতে দ্বিধা করিবে না। যাহারা নিজেদের দেশকে পরের হস্তে তুলিয়া দিবার চিন্তা করিতে পারে, দেশের শত্রুদের একান্ত আপন-জন বলিয়া আলিঙ্গন করে, তাহাদের সহিত মিতালী কিংবা দলীয় স্বার্থে প্যাক্‌ট্ করিতে যাহারা দ্বিধা করে না, সেই সকল লোক তথা পার্টিকে জনগণ ক্রমে চিনিতেছে এবং তাহাদের নির্বংশ করিবার চিন্তাও অনেকের মাথায় আসিয়াছে। (আহা। 'এমন দিন কবে হবে তারা!)'—

আসলকথা

দেশের জনগণের নিকট পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের সংযুক্ত দলীয়দের প্রকৃত এবং জঘন্য নগ্নরূপ, ক্রমশ প্রকট হইতেছে এবং আজ পর্যন্ত যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট—সংক্ষেপে উফীদের, আগামী নির্বাচনে বেপাত্তা করিয়া দেশছাড়া করিবার জন্য জনগণ বদ্ধপরিকর। এমন কথাও অনেক প্রাক্তন উফী সমর্থক বলিতে কোন দ্বিধা করিতেছেন না যে "নো-গভর্ণমেন্ট্ ইজ্ বেটার্ দ্যান্ দোজ্ পলিটিক্যাল গুণ্ডা উফী গভর্ণ-মেন্ট। (No Government is better than those political goonda U. F. Government.)

উফী দলীয় চাঁইদের আর যাহাই বলি না কেন, তাঁহাদের বোকা বলা চলে না। তাঁহারা সত্যই চালাক, কিন্তু একটু অতিরিক্ত চালাক। সেই কারণেই উফী

সর্দ্দারেরা গণতন্ত্রের ভাঁওতা মারিয়া নির্ব্বাচনটা সারিতে চাহিতেছেন, অবশ্য আয়ত্তের বাহি:র যাইবার পূর্ব্বেই! এইখানেই উফী নায়কদের ঠিকে ভুল হইয়াছে। জ্বর যখন বিকারে ঠেকিয়াছে, তখনই উফী গণপতিদের টনক নড়িল। এখন আর উফীদের টক্ বুলীর দাওয়াই দিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

'উফীরা' যেমন জোর গলায় চাহিতেছেন আগামী নভেম্বর মাসে অন্তর্বর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন, ঠিক তেমনি, এমন কি আরো জোরের সঙ্গে, বাঙ্গালীর জনগণের অন্তত শতকরা ৮৫।৯০ জনই এ-রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বর্ত্তমানে চালু রাখিবার দাবী করিতেছেন। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে উফীদলের জনকয়েক নেতা এবং তাঁহাদের হাজার কয়েক (বড়্জোর) অন্ধ তল্পীবাহী সমর্থক দেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য। এই সামান্য কিছু সংখ্যক স্বার্থপর নেতা এবং তাহাদের ক্যাম্পফলোয়ার, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের হইয়া কোন কথা বলিতে পারে না, কথা বলার কোন অধিকার জনগণ তাঁহাদের দেন নাই। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করিব যে ইউ-এফ্ নেতারা প্রায়ই এবং যে-কোন সমাবেশে সমগ্র দেশের হইয়া কেবল কথা বলাই নহে, বহুপ্রকার দাবী দাওয়া করিতে থাকেন। ইহা দেখিলে মনে হয় দেশে আর কোন নেতা বা জনকল্যাণ-প্রার্থী নাই, কাজেই দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য এই হঠাৎ গজানো কয়েকজন নেতা, বিশেষ করিয়া সি পি এম দলের কর্ত্তাস্থানীরা, জীবনপণ করিয়া জনদুঃখত্রাণে জনযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা নাকি 'রাম-বিদ্রোহী'—দেশের প্রতি হারামী করিতে যাহাদের মনে কোন লজ্জা নাই—তাহাদের বিদ্রোহীর ছদ্মবেশে দেখিতে প্রচুর আনন্দ অবশ্যই পাইয়া থাকে দেশের সাধারণ মানুষ! নয়মাস প্রশাসনিক গদিতে বসিয়া যাহারা গদিকে সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বদিক হইতে কেবলমাত্র কলঙ্কিত, কুলষিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে আবার মসীলিপ্ত বদনে দেশের মানুষের সামনে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভের জন্য ভোট ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করা উচিত ছিল—কিন্তু কাহাদের নিকট কি আশা করিতেছি? আত্মসম্মানবোধহীন মানুষ যেমন নিজে শত অপমানেও অপমানিত বোধ করে না, তেমনি দেশ এবং দেশের মানুষকেও সে প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে পারে না।

দুঃখ হয় সেই অজপ্রতিম বৃদ্ধ গদিলোভীর জন্য!

শ্রীঅজ(য়) মুখোপাধ্যায়ের কথা বলিতেছি। ইউ-এফ্ দলীয় সহকর্ম্মীদের হস্তে শতভাবে শতপ্রকারে নিগৃহীত হইয়া যাঁহার অধোবদনে অরণ্যবাসে যাওয়াই ছিল কর্ত্তব্য এবং একমাত্র সমীচীন কার্য্য—সেই শত অপমান-নিগ্রহ যুদ্ধের 'ভি-সি' প্রাপ্ত বীর শ্রীঅজয় আবার জয়লাভের আশায় তাঁহার পরম-আত্মীয়সমান সি-পি-আই-এম্ তথা অন্যান্য ইউ-এফ্ দলীয়দের আশ্রয় ভিক্ষার জন্য রাজপথে ঘুরিতেছেন! শ্রীঅজয়ের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তিনি নিজেকে প্রায় ডঃ বিধান রায় মনে করিতেছেন, মাত্র ৯ মাস ডঃ রায়ের পরিত্যক্ত গদিতে বসিয়া—। কিন্তু তিনি ত কিছুকাল বিধানরায় মন্ত্রী সভারও সভ্য ছিলেন—ডঃ রায় সম্পর্কে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা উচিত ছিল, মগজে সামান্য পরিমাণ কিছু গব্য থাকিলেও হয়ত তাহা ঘটিত! শ্রীঅজয়কে কোন উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই, কিন্তু তিনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে আগামী নির্ব্বাচনে ইউ এফ্ যদি ভাগ্যক্রমে সংখ্যা-গরিষ্ঠতাও লাভ করে, তাহা হইলে ঐ দল শ্রীঅজয়কে কোনমতেই মুখ্য-মন্ত্রীত্ব দান করিবে না। মুখে না বলিলেও, সি পি এম যে এবার দলের গণপতি পরম দিব্যজ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাইবে—সেবিষয়ে, একমাত্র শ্রীঅজয় ছাড়া আর কেহ কোনপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করে না! শ্রীঅজয় ফুল্স প্যারাডাইসে বাস করিতেছেন। তাঁহার মোহভঙ্গ হইতে আর বেশী সময় লাগিবে না, যখন দেখিবেন মুখ্যমন্ত্রীত্ব দূরের কথা, বিধানসভার কোন অন্ধকার কোনে ভাঙ্গা আসনেও তাঁহার স্থানলাভ হইল না! আগামী নির্ব্বাচনে সি পি আই+সি পি এম শ্রীঅজয়কে নির্ব্বাসন দিবার পাকা ব্যবস্থা করিতেছে!

শ্রীঅজয় ক্রান্তিদলের হাইকমাণ্ডের নিকট বহু দরবার এবং বিনীত আবেদন নিবেদন করিয়া ইউ-এফের তথা সি পি দলের সহিত সংযোগ ছিন্ন না করিবার অনুমতি পাইয়াছেন এই আশা লইয়া যে এই এফ দল যদি নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে তাহা হইলে শ্রীঅজ আর একবার মুখ্য-মন্ত্রীর গদিতে বসিবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়া মানব-জনম সার্থক করিবেন! একান্ত অজবুদ্ধি না হইলে শ্রীঅজয় এ-চিন্তাকে তাঁহার শূন্য মস্তিষ্কে স্থান দিতেন না। সি পি আই এমএর সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির পর শ্রীঅজয়ের ভ্রান্তি দূর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাঁহার ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া গত্যন্তর নাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীত্বের আশাটুকু লইয়াই বর্ত্তমানে মূখের স্বর্গে বিহার করারই পক্ষপাতি! বেচারী!

সি পি আই এম এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত সোজা কথায় বলিয়াছেন :

—"ক্রান্তিদলের রাজ্যশাখা এবং শ্রীঅজয় মুখার্জ্জি সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ভারতীয় ক্রান্তিদল বাম কমিনিষ্টরা অচ্ছুৎ বলিয়া ফ্রণ্ট ত্যাগের যে মূল সিদ্ধান্ত লইয়াছেন, রাজ্য ক্রান্তিদল কোথাও তাহার বিরোধিতা করেন নাই, শুধু বলিয়াছেন কখন এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করা হইবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শ্রীমুখার্জ্জিকে দেওয়া হউক। সাময়িকভাবে ফ্রণ্টে থাকিয়া সকল সুবিধা লওয়ার সুযোগ আমরা কাহাকেও দিতে পারি না।"

প্রমোদবাবুর কথা অতি স্পষ্ট এবং এই স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রমোদবাবুকে অবশ্যই প্রশংসা করিত। সি পি এম-এর নীতি ভাল বা মন্দ যাহাই হউক, কিন্তু এই নীতি পরিষ্কার, সোজা, কথার কোন মারপ্যাচ নাই। এই নীতিকে পুরুষোচিত বলিতে দ্বিধা নাই, শ্রীঅজয়ের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তাঁহার নীতি বলিয়া কিছুই নাই, যতটুকু আছে তাহা নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। অজয়বাবুর খ্যাতি বা নামডাক যাহা ছিল তাহা কংগ্রেসের কৃপাতেই। পলিটিক্স বুঝা কিংবা পলিটিক্স লইয়া খেলার মত বুদ্ধি তাঁহার নাই। এখন 'রিটার্ণ অব্ দি প্রডিগ্যাল' হইলেই ভাল।

৬-৫-৬৮

আবার সুবোধ ব্যানার্জ্জির আবির্ভাব!

এবারে মে-ডে র‍্যালিতে প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জ্জি তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন যে—এ-দেশে ট্রেড্ ইউনিয়ন মুভমেণ্ট এখন পুরাপুরি 'বিদ্রোহী-চরিত্র' লাভ করে নাই। ঘেরাও এবং অনুবিধ জবরদস্তিমূলক শ্রমিক আন্দোলন যথা ক্রিয়াকলাপকে, আইন-সঙ্গতির দিক হইতে বিচার না করিয়া, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি-সঙ্গতভাবে করণীয় কি না তাহাই দেখিতে হইবে (from the ethical and not the legal point of view.)। শ্রীব্যানার্জ্জি আরো বলেন যে—আইন অবশ্যই মানিতে হইবে, কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত যতদূর পর্য্যন্ত আইন ট্রেড্-ইউনিয়নের সমর্থক অর্থাৎ ট্রেড্ ইউনিয়নের ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতিবন্ধক আইনাদি সম্পর্কে কোন মোহ বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করা ঠিক নহে, কারণ আইন রচয়িতারা মালিক অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর মানুষ! শ্রীব্যানার্জ্জি বলেন যে ইউ-এফ সরকারের আমলে প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে সকলের প্রতি সমভাবে আইন প্রযুক্ত হয় নাই। (অতীত সত্য স্বীকৃতি!) শ্রীব্যানার্জ্জি মনে করাইয়া দেন—কোন একটা কাজ বেআইনী হইলেই তাহা নীতিহীন (unethical) হইতে পারে না! প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কাজেই তাঁহার দৃষ্টিতে দেশের শ্রমিক-সমাজ ছাড়া আর কোন সমাজ বা শ্রেণীর স্বার্থ ধরা পড়ে না। এমন কি যাঁহাদের উদ্যম এবং শিল্প-প্রচেষ্টার উপর শ্রমিক-সমাজের জীবনমরণ নির্ভর করে, সেই শিল্প সংস্থাপক-পরিচালকগণও সুবোধবাবুর মতে একান্ত কালতু এবং ইহাদের একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারিলেই শ্রমিকদের মোক্ষম স্বর্গলাভ হইবে (স্বর্গপ্রাপ্তি যে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!)।

ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনে ঘেরাও নামক অস্ত্রটি সুবোধবাবুর আমলেই অতি-ব্যবহৃত হয় এবং সুবোধ-বাবুর মতে নিশ্চয়ই ইহা 'এথিক্যাল'। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রের নীচে বার্ণপুরের মত ঠাণ্ডা জায়গায় দুইজন নিরীহ অফিসারকে ৭।৮ ঘণ্টা ঘেরাও করিয়া দাঁড় করাইয়া

রাখা এবং পানের জল চাহিলেও তাহা না দেওয়াটা অতি অবশ্যই অতি ethical কার্য্য—কাজটা বেআইননি হওয়া এখানে বড় কথা নহে! এবার এই পরম ethical ঘেরাও এর কবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, অধ্যাপকরাও বাদ যাইতেছেন না। ইহার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতারা—বিশেষ করিয়া কম্যু ট্রেড্ইউনিয়ন লিডার মহাশয়গণ একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, ছাত্রসমাজের একটি অংশ—এইপ্রকার ঘেরাওকে তাহাদের ট্রেড্ইউনিয়ন আন্দোলনের ethical কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং ছাত্রদের এইপ্রকার মনোভাব বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের বিশেষ অশীর্ব্বাদপুষ্ট! কারণ অতি নিকট ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর ছাত্রগণই বামনেতৃত্বের পতাকা বহন করিয়া তাঁহাদের জয়গান করিবে। ছাত্র হিসাবে আজ তাহারা আন্পেড্ অ্যাপ্রেন্টিস্ মাত্র!!

এবারে মে-ডে র‍্যালিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে শ্রমিকসমাজ তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দাবী আদায় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং প্রয়োজন বোধে দেশব্যাপি সর্ব্বাত্মক ধর্ম্মঘট করিতেও শ্রমিকমহল—অর্থাৎ ট্রেড্-ইউনিয়ন নেতারা পিছপা হইবেন না।

মে-ডে র‍্যালিতে মালিকদের অনমনীয় মনোভাবের বিষম নিন্দা করা হইয়াছে, কারণ তাঁহারা শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার দাবী, (সম্ভব অসম্ভব যাহাই হউক) স্বীকার করিয়া দাবী মিটাইতে গররাজী। অধিকন্তু ছাঁটাই, কর্ম্মচ্যুতিও হইতেছে। এই প্রকার নানা নিন্দা এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে একটি বিষয় সম্পর্কে রাজ্যসরকারের একটি নিষেধ আজ্ঞার জোরাল প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তাহা এই যে, কলিকাতার পথেঘাটে আন্দোলনকারী এবং স্লোগান্ প্রচারকদের, অবস্থান ধর্ম্মঘট যাহার ফলে সাধারণ মানুষের এবং যানবাহনের চলাফেরা সর্ব্বতোভাবে কেবল বিঘ্নিতই নহে, একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।—ইহা আর করা চলিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম্মঘটী, আন্দোলনকারী এবং ঝাণ্ডাবাহী স্লোগান উচ্চারণকারীদেরই 'পূর্ণ রাজত্ব' স্থাপিত করাই, শ্রমিকসাধারণের না হইলেও শ্রমিকনেতাদের একমাত্র কার্য্য। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের কোন মূল্যই ট্রেড্ইউনিয়ন নেতাদের কাছে নাই, কারণ তাহারা টেক্নিক্যাল্ অর্থে ধর্ম্মঘটী শ্রমিক নহে এবং শ্রমিক নেতাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ইউনিয়ন্ ভাণ্ডারে কোন চাঁদা দেয় না। (৪-৫-৬৮)

—————

শ্রমিকদের আবার পথে (বসাইবার?) নামাইবার শুভপ্রয়াস?

রাজ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়াও যাঁহারা অযথা মানুষ, বিশেষ করিয়া শ্রমিক ক্ষেপাইবার পুণ্যব্রত ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবার (গদিচ্যুত বলাই সত্যকথা হইবে)—পরে যে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবেন এমন কেহ আশা করিতে পারেন না, কার্য্যক্ষেত্রেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে কিছুপরিমাণ নিয়ম শৃঙ্খলার পুনরাবির্ভাব হয় এবং হৈ-হল্লা বেশ কিছুটা কমতির দিকে দেখা যাইতেছিল। কিন্তু দেশের শান্তি এবং লোকের মনে নিরাপত্তা নিশ্চিন্ততার ভাব—এক শ্রেণীর রাজনৈতিক ফেরিওয়ালা এবং পার্টির পক্ষে কিছুতেই প্রীতিকর হইতে পারে না। সাধারণ মানুষকে সদা উত্যক্ত এবং উত্তপ্ত রাখাতেই যাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি হয় বলিয়া বিশ্বাস, ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয়—ঘোলাজলে যাহাদের মাছ ধরাই স্বভাব, সেই তাহারা আবার পরম সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং রাজ্যের সাধারণ-জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্বতোভাবে পরম অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আগামী নির্ব্বাচনে যেনতেন প্রকারে জয়লাভ করিতে প্রয়াস সুরু করিয়াছে। এই পুণ্যপ্রয়াসে শ্রমিকমহলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা রাজনৈতিক—বিশেষ কয়েকটি দলের, সদা প্রযোজ্য টেক্নিক্। ইউ-এফ-রাজত্বকালে কয়েক লক্ষ শ্রমিককে পথে বসাইয়া, অনেকের স্ত্রীপুত্র পরিবারকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাস্তায় বাহির করিয়া শ্রমিক-নেতাদের প্রাণের আশা এবং চরম পিয়াসা মিটে নাই। এইবার

এই বিকৃতদৃষ্টি স্বার্থপর রাজনৈতিক তথা শ্রমিক-নেতারা যে প্রকার শ্রমিক (সঙ্গে ছাত্রও থাকিতে পারে) আন্দোলন চালাইতে স্থির করিতেছেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মহামারি লাগিতে পারে। রাজ্যের কল-কারখানা এবং বাণিজ্যসংস্থাগুলি মালিকপক্ষকে যদি বাধ্য হইয়া বন্ধ অথবা অন্য রাজ্যে সরাইতে হয়, শ্রমিক-মহল বিশেষ করিয়া বাঙালী শ্রমিক কোথায় দাঁড়াইয়া শ্রমিক-নেতাদের আদেশ-নির্দ্দেশে কি আন্দোলন চালাইবে বলিতে পারি না।

শ্রমিক-নেতাদের হয়ত চিন্তার কিছু নাই, কিন্তু যাহাদের, যে শ্রমিকদের, কর্ম্মচ্যুত করাইয়া পথে বাহির করিতে তাঁহারা প্রয়াস-পরিকল্প করিতেছেন, তাহাদের বাঁচিবার, পেটের দাবী মিটাইবার কোন সামান্য দায়িত্বও কি শ্রমিকনেতারা গ্রহণ করিবেন। এ-দায়িত্ব গ্রহণ করিবার কতটুকু শক্তিই বা তাঁহারা রাখেন? পরের চাঁদার অর্থে যাঁহাদের সংসার চলে, নেতাগিরিও বজায় থাকে, সেই শ্রমিকদের চাঁদা দিবার ক্ষমতাই যদি লোপ পায়, তাহা হইলে শ্রমিক-নেতামহাশয়গণ পেশা পরিবর্ত্তন করিয়া কি ক্ষেত্রান্তরে প্রয়াণ করিবেন সুবিধা সুযোগ মত?

শ্রমিকদের ন্যায্যদাবী অবশ্যই থাকে এবং তাহা পূরণ করিতেও হইবে। কিন্তু এখানেও একটা 'কিন্তু' আছে। শিল্পসংস্থা যত বড়ই হউক না কেন, তাহারও দিবার একটা চরম সীমা আছে। দাবী তাহার উপরে উঠিলে সংস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া পথ কোথায়? একেবারে চিরতরে বন্ধ না করিলেও, বছর দুই তিনের মতও যদি কোন শিল্পসংস্থা বন্ধ হয়, ঐ সংস্থার শ্রমিক, কর্ম্মচারীরা কোথায় যাইবে, কি করিবে, কি দিয়া সংসার প্রতিপালন করিবে, এ-সব চিন্তা শ্রমিকনেতাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে উদয় হয় কি না জানা নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গত কিছুকাল ধরিয়া যাহা দেখা গেল তাহাতে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার দায়িত্ব শ্রমিকনেতাদের নাই বলিয়া মনে হইয়াছে। হাওড়ায় একটি বড় লৌহ-কারখানা প্রায় আট মাস বন্ধ ছিল, তাহার ফলে কয়েকহাজার শ্রমিক এমন কি তাহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারকে রাস্তায় বাধ্য হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হয়!—কিন্তু অন্যদিকে ঐ-কারখানার শ্রমিকনেতারা কয়জন ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন? নেতাদের দিন ঐ সময় ভালই কাটিয়াছে, যে-সময় হাজার হাজার শ্রমিক অনাহারে জর্জ্জরিত হইয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে! নেতাদের দরদ এই সময় কোথায় ছিল?

কথায় তুবড়ী ফুটাইয়া, শ্রমিকচিত্তে তাক্ লাগাইয়া তাহাদের নাচানো সহজ, কিন্তু এই নাচনের ফলে শ্রমিক-সাধারণের যে সর্ব্বনাশ হয় প্রায় ক্ষেত্রেই সেই সর্ব্ব-নাশের দায় কখনো শ্রমিক-নেতারা বহন করেন না, দায়ের মূল্য শোধ করিতে হয় শ্রমিকদেরই। শ্রমিকদের সরল বিশ্বাসের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া শ্রমিকনেতারা হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বেশীর ভাগ শ্রমিকনেতাই শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—যে ভাবেই হউক।

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিতে প্ররোচনা দান করেন শ্রমিক-নেতারা, কিন্তু ধর্ম্মঘট যদি মাসের পর মাস চলে, এবং কারখানার মালিকসংস্থা যদি বিপাকে পড়িয়া লক্-আউট ঘোষণা করেন, সেই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দিনখরচা মিটাইবার, কোন দায়িত্ব কোন শ্রমিক-নেতা গ্রহণ করেন বলিয়া শুনি নাই। চরম অবস্থায় ইউনিয়ন সদস্যদের সামান্য খোরাকীর ব্যবস্থাও যাঁহাদের করিবার ক্ষমতায় কিংবা সাধ্যে কুলায় না, তাঁহাদের পক্ষে, সামান্য একটা কারণে, যাহা হয়ত শ্রমিক-মালিক সহজেই মিটাইয়া ফেলিতে পারেন, শ্রমিক-নেতারা তেমন ক্ষেত্রেও মাঝখানে পড়িয়া তুচ্ছ কারণকে পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া শ্রমিকদের দুর্দ্দশার সাগরে নিক্ষেপ করিতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করেন না! বাহাদুরী দেখাইবার অন্য বহু ক্ষেত্র থাকিতে সরল-বিশ্বাসী শ্রমিকদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার প্রয়াস অতি নিন্দনীয়। গত কয়েক মাসে কয়েকটি ধর্ম্মঘট এবং লক-আউটের ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের দুর্দ্দশা এবং অসহ-নীয় কষ্ট দেখিয়া এত কথার অবতারণা করিতে হইল। যদিও জানি সত্য ভাষণ সকলের সহ্য হয় না। (৯.৫.৬৮

শ্রমিক-নেতাদের কর্ত্তব্য কি একদিকে?

ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অধিকার সকল সভ্যদেশে স্বীকৃত, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ছাড়া। সোভিয়েট্ রাশিয়া, কমিউনিষ্ট চীন, এবং পূর্ব্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট্ দেশগুলিতে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার বোধ হয় নাই। ঐ সব দেশে শ্রমিকদের ঘড়ির কাঁটার সহিত তাল রাখিয়া কাজ করিতে হয়। রাষ্ট্র-প্রশাসকগণ শ্রমিকদের কোনপ্রকার হৈ-হল্লা, কাজে ফাঁকি, 'গো-স্লো' প্রভৃতি প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, কঠোর হস্তে তাহা দমন করিয়া থাকেন। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী কি এবং কতখানি তাহাও ঐ-সকল রাষ্ট্রের কর্ম্মকর্ত্তারাই স্থির করিয়া দেন বলা বাহুল্য। কিন্তু আমাদের দেশে কি দেখিতে পাই? কয়জন শ্রমিক তাহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কায কতটুকু পালন করে, সে-কথা না বলাই ভাল। কেবল শ্রমিকদেরই দোষ দিব না। শ্রমিক-ইউনিয়নের নেতারা, যাঁহারা শ্রমিকদের কল্যাণার্থে জান-কবুল করিয়াছেন, শ্রমিকদের কর্ত্তব্য পালন করিতে কখনও বলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। শ্রমিকদের দাবী আদায় করিতে হয়, তাহা হইলে মালিকের দাবীও শ্রমিকদের মানিতে হইবে। কারখানার কাজে ফাঁকি দিব। ইচ্ছামত 'গো-স্লো' চালাইব, অথচ মজুরী বেলায় আদায় করিব প্রাপ্যের বেশী, ইহা অচল। কিন্তু কোন শ্রমিক-নেতা কি শ্রমিকদের এই সব ব্যাপারে কখনও সতর্ক করিয়া দেন? যদি না দেন, তাহা হইলে শ্রমিকদের দাবী আদায় করিতে নেতাদের এক তরফা উৎসাহ দেখানো কেন? শ্রমিক যদি তাহার কর্ত্তব্য পুরাপুরি না করে, তাহা হইলে মজুরী কোন হিসাবে বা কোন দাবীর জোরে, কেবল পুরা নহে, তাহারও বেশী সে আশা করিতে পারে? শ্রমিক-নেতারা চতুর, তাঁহারা জানেন সব, বুঝেনও সব, হিসাবের জ্ঞানও তাঁহাদের চাটার্ড্ অ্যাকাউন্টেন্ট্এর কম নাই, কিন্তু শ্রমিকদের কর্ত্তব্যের কথা বলিয়া তাঁহারা অপ্রিয় হইতে চাহেন না। কাজেই—সকল প্রকার অকাজে কুকাজে তাঁহার শ্রমিকদের পিঠ চাপড়াইয়া যান। কিন্তু আখেরে হিসাবের ঘরে এ-গোঁজামিলের জের তাহাদের টানিতে হইবে। ঋণও পরিশোধ করিতে হইবেই। (২২-৫-৬৮)

অপূর্ব্ব রাষ্ট্রনীতি!

ভারতের লাটি-টিলা-ডুমাবাড়ী এলাকায় প্রায় ৭৪৮ বিঘা জমি পাকিস্তান ১৯৬২ সাল হইতে জবরদখল করিয়া আছে। এ-বিষয়ে আমাদের দিল্লীর কেন্দ্রকর্ত্তাদের ধৈর্য্যও অসীম! বহির্বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগত বলিয়াছেন, 'এই বেদখলী ৭৪৮ বিঘা জমি ভারতের।' বাস্ এই পর্য্যন্তই। জমি ভারতের হওয়া সত্ত্বেও বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে ভারতসরকার ঐ জমি পাকিস্তানের থাবা-মুক্ত করিতে পারেন নাই। ১৯৬২ সালে জমি বিনিময়ের পর ঐ জমি পাকিস্তান জবরদখল করিয়া বসে। পাকিস্তান বেশ ভালভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে যে ভারতের যে কোন এলাকা একবার দখল করিতে সক্ষম হইলে, সে-জমি উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা দিল্লীর বিচক্ষণ-চক্রবর্ত্তীর দল চিঠিপত্র লেখা এবং ঘন ঘন কড়া হইতে কড়াতর প্রতিবাদ-পত্র দেওয়া ছাড়া অন্য কার্য্যকর কোন পন্থাই অবলম্বন করিবেন না, কিংবা করিবার মত ভরসাও তাঁহারা রাখেন না।

এই ৭৪৮ বিঘা জমির উদ্ধার কল্পে বিগত ছয় বৎসর ধরিয়া চিঠিপত্র লিখালিখির পালাই চলিতেছে নন্‌ষ্টপ্! রাজ্যসভার কোন কোন সদস্য বলেন, যে পাকিস্তান-কবলিত এই এলাকা উদ্ধার করার ব্যাপারে ভারতসরকার একেবারে নির্ব্বিকার—নিষ্ক্রিয়। শ্রীভগত এই অভিযোগে মনে 'বড়ই ব্যথা বোধ করিয়া বলেন যে ভারত সরকার এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় নহেন, কারণ পাকিস্তানকে তাহাদের অন্যায় বুঝাইবার জন্য 'ক্রনিক' চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন!—অতি সত্য কথা, কিন্তু দুষ্টমতি পাকিস্তান যদি বুঝিতে না পারে, বা বুঝিয়াও না বুঝে ভারতসরকার কি করিবেন, কাজেই আবার নূতন ভাবে পাকিস্তানকে বুঝাইবার প্রয়াস করিতে হইবে!

ভারত রাষ্ট্রের জমি এইভাবে জোর করিয়া দখল করা সম্পর্কে—পত্রিকান্তর মন্তব্য করিয়াছে:

জমি কয় বিঘা তাহা মূল কথা নয়, ভারত সরকারের আচরণই এ ব্যাপারে বিস্ময়কর। স্বাধীন রাষ্ট্রের সামান্যতম অংশও অন্যের দখলে গেলে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য সর্ব্ববিধ দ্রুত ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রকর্ত্তাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। ভারত সরকারের নিয়ম এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত। চীন ও পাকিস্তান এখানে-ওখানে থাবল দিয়া ভারত-ভূমির অনেকগুলি জায়গা দখল করিয়া রাখিয়াছে। ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ প্রায়ই আশ্বাস দিয়া থাকেন, দেশের এক ইঞ্চি জমিও তাঁহারা ছাড়িয়া দিবেন না, ভারতের আঞ্চলিক সংহতি ও সার্ব্বভৌম অধিকার রক্ষা করার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত। প্রস্তুত যে কেমন তাহা বাস্তব অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। হিমালয়-সীমান্তবর্ত্তী ভারতভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল চীনা কমিউনিষ্টরা বহুদিন দখল করিয়া রাখিয়াছে। উহা কবে কিভাবে পুনরুদ্ধার করা হইবে, ভারত সরকার সে বিষয়ে কোনই উচ্চবাচ্য করেন না। পাকিস্তান কর্তৃক জবরদখল এলাকাগুলি সম্পর্কে ভারতসরকার কেবল কথা-চালাচালিতে বছরের পর বছর কাটাইতেছেন।.........

পাকিস্তানকে বুঝাইবার এই অথর্ব কূটনীতি ভারত-সরকার সব ব্যাপারেই চালাইতেছেন একেবারে কর্ম্ম-ফল-নিস্পৃহভাবে। দেশ-বিভাগের সময় হইতে পাকিস্তানের নিকট প্রাপ্য বহু টাকা এখনও আদায় হয় না, ভারতসরকার কিন্তু পাকিস্তানকে দফায় দফায় টাকা দিয়াছেন। তাসখন্দ-চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া পাকিস্তান ভারতীয় জাহাজ ও মালপত্র আটক করিয়া রাখিয়াছে: রাওয়ালপিণ্ডিতে ভারতীয় মালিকানায় পরিচালিত হোটেলগুলি পাকিস্তান-সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, ডাক-তার চলাচল বাবদ বহু লক্ষ টাকা পাকিস্তানের কাছে ভারতের পাওনা তাহাও পাকিস্তান শোধ করিতেছে না। অথচ ভারতসরকারের তরফ হইতে পাকিস্তানকে দানতর্পণে কৃপণতা নাই।

জবরদখল এলাকা হউক আর আটক জাহাজ বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি হউক, পাকিস্তান বুঝিয়া লইয়াছে ভারত সরকারের ভাবগতিক বুঝিয়া পাকিস্তান গোটা দুই বেয়াড়া বায়না ধরিয়া রহিয়াছে। এক নম্বর, কাশ্মীর-সমস্যার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান অন্য কোন ব্যাপারে কথাই বলিবে না। দুই নম্বর জুটিয়াছে বেরুবাড়ি। পাকিস্তান নাকি বলিয়াছে, বেরুবাড়ির নিষ্পত্তি না হইলে লাটিটিলা ডুমাবাড়ির ওই ৭৪৮ বিঘা জবরদখল জায়গা সম্পর্কে একটা কথাও চলিবে না। ইহার পরও শ্রীভগত কোন্ মুখে বলিয়াছেন, পাকিস্তানকে বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারিদের বৈঠকে প্রস্তাব উঠিবে এবং তারপর কোন এক কালে সীমানা-চিহ্নিত করণের কাজে দুইপক্ষ হাত দিলে লাটিটিলা-ডুমাবাড়ির ওই ৭৪৮ বিঘা জায়গার সমস্যা মিটিবে।

এভাবে কিছুই মিটিবে না, মিটিতে পারে না; পাকিস্তানের জিদ-জবরদস্তি আর ভারতসরকারের কেবল ক্রমাগত কথা-চালাচালিতে অবস্থাই উহার প্রমাণ। পাকিস্তানের যাহা কোনকালে কোন মতে প্রাপ্য নয় তাহা পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দেওয়ায় ভারত-সরকারের কোন ভাবনাই দেখা যায় না। দেশ-বিভাগের সময় বৌদ্ধ-হিন্দুগরিষ্ঠ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল পাকিস্তানকে বিনা আপত্তিতে সমর্পণ ইহার চরম কলঙ্ক-জনক সাক্ষ্য। এখনও উহারই জের টানিয়া পাকিস্তানী জবরদখল সম্পর্কে ভরতসরকারের নীতি পরিচালিত হইতেছে।—

ভারত খণ্ডিত হইবার পর হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ভারতসরকারের ক্লীব-নীতি, বিশেষ করিয়া পাকিস্তান এবং চীন সম্পর্কে। গত ২১ বৎসরে পাকিস্তান ভারতকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত এবং বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য কোন প্রয়াসই বাদ দেয় নাই, এবং এখনও দিতেছে

না, ভবিষ্যতেও দিবে না। কিন্তু শতভাবে পাকিস্তানের কর্দ্দমাক্ত জুতার লাথি খাইয়াও—আমাদের কোন বিকার ঘটে নাই, সবই অতি স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

সোভিয়েট রাশিয়া সর্ব্ববিপদে আমাদের রক্ষা করিবে—বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের আক্রমণ হইতে, আমাদের কর্ত্তামহলে এই 'বিষম বিশ্বাসে চিড় দেখা যাইতেছে পাক-সোভিয়েট নব-প্রেমের জোয়ার দেখিয়া।

আমাদের সর্ব্ববিষয়ে অতি বিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্ত্তারা বোধ হয় জানেন না যে রাজনীতিক্ষেত্রে কোন দেশ, অন্য কোন দেশের চিরমিত্র কিংবা চিরশত্রু থাকিতে পারে না। অবস্থার গতিকে এবং পরিবর্ত্তনে বন্ধু-দেশ হয় শত্রু, কিংবা শত্রু-দেশ হয় বন্ধু! আরো একটি কথা বলা কর্ত্তব্য—দুর্ব্বল দেশ বা মানুষ যাহাই হউক, অন্যের দয়া ভিক্ষা করিয়া হয়ত পায়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধা কিংবা সম্মানের পাত্র হয় না। আজ ভারতের অবস্থা কি সকলেই জানেন। আমরা দয়া পাইতেছি কিন্তু মর্য্যাদার বিনিময়ে। (৯.৫ ৬৮)

বিদেশে ভারতের 'ইমেজ'!

দয়ায় দানলব্ধ স্বাধীনতার পর পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশে ভারতের সম্পর্কে যে সম্মানের ভাব দেখা গিয়াছিল, গত কয়েক বৎসরে বিদেশে ভারতের প্রতি অন্য রাষ্ট্রে সম্ভ্রমের ভাব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই ভারত সম্পর্কে নানাপ্রকার সত্য-মিথ্যা ধারণার প্রসার হইতেছে। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারত সম্পর্কে বিদেশে যে-সকল কলঙ্ক রটিয়াছে এবং রটিতেছে, তাহার শতকরা বোধহয় ৯৫ ভাগই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই কলঙ্ক রচনা-রটনার ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে জড়িত রহিয়াছে ভারতেরই লোক, সরকারী এবং বেসরকারী। ভাবিতে কষ্ট এবং ভয় হয়, ভারত সম্পর্কে বিদেশের ধারণা যদি ক্রমশ এইভাবে কৃশ হইতে কৃশতর এবং ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে থাকে, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজগতে ভারতের বন্ধু বলিয়া কেহ থাকিবে না, এমন কি বর্ত্তমানে যে-নগণ্য সংখ্যক গুটিকয়েক দেশ এখনো ভারতের বন্ধু বলিয়া পরিচিত তাহাও হয়ত আর থাকিবে না।

কিছুকাল পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে যোগদানের পর, ভারতীয় দলের একজন প্রতিনিধি শ্রী ডি এন তেওয়ারী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, সাধারণ পরিষদের বক্তৃতাদিতে ভারতীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত অন্যান্য দেশের সদস্যদের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারেন না!

শ্রীতেওয়ারী আরো বলিয়াছেন যে বিদেশে ভারতীয় দূতাবাস, বাণিজ্যদূতাবাস, হাইকমিশনার প্রভৃতি দপ্তরের কর্ম্মব্যবস্থা, কর্ম্মীনিয়োগ তথা কর্ম্মী সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীতেওয়ারীর মতে:

> অধিকাংশ জায়গাতেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক আছেন এবং তাঁহারা যে কাজের জন্য আছেন, তাহাছাড়া আর সব কাজই করেন প্রভূত উৎসাহ ও আড়ম্বর সহকারে। দেশের সংস্কৃতি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বাইরে প্রচার করা বা দেশবাসীর বাস্তব দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে অন্য দেশের মানুষদের অবহিত করা তাঁহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না। তাঁহারা কোন মতে চাকরিটুকু বাঁচিয়ে বাকী সময় আমোদপ্রমোদ ও পানভোজনে কাটান। বিদেশে প্রত্যাগত ভারতীয় ছাত্র এবং পর্যটকরাও আমাদের কূটনীতিবিদদের এই সব গুণপনার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের কাছে বিদেশে কোন রকম সহযোগিতা না পাওয়ার কথাও বলিয়াছেন অনেকে।

শ্রীতেওয়ারী দুঃখ করিয়াছেন এই বলিয়া যে আমাদের বিদেশস্থ দূতাবাসের অনেকগুলিতেই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব দিন, যেমন স্বাধীনতা দিবস বা গান্ধী জন্মতিথি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় না। বেসরকারী উদ্যোগে কোন অনুষ্ঠান আহূত হইলে তাহাতেও সরকারী-মহলের কর্ত্তাব্যক্তিদের পদার্পণ কমই ঘটে।

শ্রীতেওয়ারীর দুঃখের সঙ্গত কারণ থাকিলেও ইহাতে অবাক হইবার বোধ হয় কিছু তাই। পরাধীন ভারতের খয়েরখাঁ-পরিবারগুলি থেকে, কিংবা উপর-তলার ভাগ্যবান মহল থেকে বাছাই করা লালুভুলু-দের বড় বড় পদে বহাল করা হইলেই নিছক পদ ও অর্থের জোরে তাঁহাদের পদার্থ বাড়িবে না।

আসলে দেশে প্রশাসনের অধোগতি আর বিদেশে ইজ্জতের অপমৃত্যু হইতেছে আমাদের একই কারণে। সে কারণটা আর কিছুই নয়, দেশ ও মানুষ সম্বন্ধে দরদহীন একদল অকেজো লোককে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার অধিক দায়িত্বে বসান, যাহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আজ ঘরে-বাইরে সমভাবে প্রকট হইয়াছে। কায়েমি স্বার্থের কোলে ঝোল টেনে চলার অনিবার্য এই পরিণাম ঠেকান জোড়াতালিতে আর সম্ভব নয়। এখন চাই খোল-নলচার আমূল পরিবর্ত্তন। কিন্তু তাহা করিতে মরদ এবং মুরদ দুইয়েরই প্রয়োজন এবং দেশে আজ সবচেয়ে বড় অভাব এই দুই জিনিষেরই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দূতস্থান ও প্রচার-দপ্তর ইত্যাদির কর্ম্মীদের আমরা দেখিতেছি এদেশের সমাজ-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যাইতে এবং রকমারি শিল্প সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপন আপন দেশের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে। আমাদের ভাগ্য-বন্তেরা শুধু বিদেশী খানাপিনা ও আদব-কায়দারই নকল করা শিখিয়াছেন, অন্য কিছুর পাঠও তাঁহাদের রপ্ত হয় নাই। কাজেই লোক হাসান ছাড়া আর কি বা করিতে পারেন, তাঁহারা বিদেশে ?

শ্রীতেওয়ারীর রিপোর্ট অবহেলা করা কিংবা দিল্লী-দপ্তরের ঠাণ্ডা-ঘরে ফেলিয়া রাখা ভুল হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে একথা বলাও দরকার শ্রীতেওয়ারীর রিপোর্ট অপেক্ষা অধিকতর চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারী কাহিনীও দিল্লী কর্ত্তা-মহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছেন !

একটা 'কমিশন' নিয়োগ করিলে ত ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে! ৭।৮ বৎসর পরে রিপোর্ট যখন বাহির হইবে—দেশের লোক তখন হয়ত অধিকতর কোন চাঞ্চল্যকর ব্যাপার লইয়া মত্ত থাকিবে !! (১০-৫-৬৮)

মৃত্যুঞ্জয় ডাঃ মার্টিন লুথার কিং-এর উদ্দেশে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রিয়তম ভ্রাতঃ, ঈশ্বরের চরণমূলে নিঃশেষে সমর্পিত তোমার আত্মার
কাছে নিবেদন করি আমার আনত আত্মার প্রণতি।
খ্রীষ্টের পতাকাবাহী তুমি ক্রসকে সানন্দে স্বীকার করেছিলে নিত্য
নূতন সঙ্কটের মধ্যে, উদ্ধতপ্রবলের নিক্ষিপ্ত শরজালের মুখে!

মানুষকে ভালোবাসোনি তুমি বাক্যের বুদ্বুদে। সেই ভালোবাসার অকুণ্ঠ
পরিচয় দিয়েছিলে নবনব দুঃখবরণের মহাবীর্য্যে!
তুমি যাঁর ক্রস্‌কে বহন ক'রে চলেছিলে দুঃখ থেকে দুঃখের
শিখরে, কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হয়েছিল স্বর্গরাজ্যের বার্তা!
সেই স্বর্গ তো বাহিরে নেই কোথাও! সে যে প্রেমের রাজ্যে
আত্মকেন্দ্রিক সত্তার নবজন্মের আনন্দলোক!

মাটির ধূলায় প্রেমের এই স্বর্গরাজ্যরচনায় ব্রতী হয়েছে যারা
আরামের আতপ্ত কোটর-জীবন তো তাদের জন্য নয়!
ভালোবাসা মানেই তো সংগ্রাম।
পৃথিবীতে যদি কোন কিছুর মূল্য থাকে সে হচ্ছে মানুষের
আত্মা, নর-নারীর জীবন।
মানুষের জীবনকে অকুণ্ঠ সম্মান দেয় যারা, মানুষকে
অপমানিত দেখলে কেমন করে নীরব থাকবে তাদের কণ্ঠ?
পরম আদরে যাকে তৈরী করেন নি ঈশ্বর, এমন পতিত মানব
কে আছে পৃথিবীতে?
জগতের রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি মানুষকে এমন একটী বিশেষ
ভূমিকা দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি যেখানে আর সকলেই অবান্তর!

হাঁ, একটা নবতর পৃথিবীর, নবতর স্বর্গের বিরাট স্বপ্ন
অনুক্ষণ ঘিরে ছিলো তোমার মনকে।
সেই পৃথিবী, সেই স্বর্গ দীপ্ত, মুক্ত, মহাজীবনের
কল্লোলধ্বনিতে মন্দ্রিত,
মৈত্রী আর করুণায় স্পন্দিত নয় যার হৃদয়, তার চলমান শব
ভিতরে বহন করে চলেছে নিষ্প্রাণ সত্তার আড়ষ্ট-কঠিন শীতলতা!
মৃত্যুঞ্জয় মার্টিন লুথার, মৃত্যু থেকে অনন্ত প্রাণের অমৃত-
লোকে নিঃসংশয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলে তুমি!
সমস্ত মানুষের মধ্যে আত্মার আনন্দিত সম্প্রসারণের পরিপূর্ণতাই
তো জীবন!

জীবনের উপাসক হে মহাপ্রেমিক, খ্রীষ্টের ক্রস্‌কে নিয়ে তুমি
উন্নতশিরে দাঁড়িয়েছিলে বর্ণবৈষম্যের দানবের সম্মুখে !
হিংসার উন্মত্ত আস্ফালনের সম্মুখে দাবী করেছিলে মানুষের
অকুণ্ঠ স্বাধীনতা, জীবের ঈশ্বরদত্ত মর্য্যাদা !
ন্যাজারথের এক মৃদুভাষী সূত্রধর সকলকে শুনিয়েছিলেন,
ভালোবাসো তোমরা পরস্পরকে !
উন্মত্ত জনতা সেদিন দাবী করেছিল তারস্বরে,
"ওকে ক্রুশবিদ্ধ করো," "ওকে ক্রুশবিদ্ধ করো !"
খ্রীষ্টান বলে আত্মপরিচয় দেয় যারা তারা তাদের ধর্ম্ম-
প্রবর্ত্তককে নয়, সে দিনের জনতাকে অনুসরণ করছে !
তাই অহিংসা-মন্ত্রের উদ্গাতা, খ্রীষ্টের ক্রস্‌বাহী তোমাকে
তাদেরই একজন অর্ব্বাচীন নির্ব্বিচারে করলো হত্যা।

ডাক্তার মার্টিনলুথার কিং, তোমার কবরে মর্ম্মরে তৈরী
একটা স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করবো না আমরা !
মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ তোমাকে হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করবো
প্রতিটী বাক্যে, জীবনের প্রতিটী আচরণে !
তোমারই মতো ঈশ্বরকে আমরা স্বীকার করবো শুধু দেবালয়ের
প্রশান্ত পরিবেশে নয়, জীবনের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের নানা
প্রতিকূল ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যেও,
শাস্ত্রের কতকগুলি নেতিবাচক নীতি-বাক্য অনুসরণের মধ্যে
ধর্ম্মজীবনের পরিচয় আছে কতটুকু ?
মানুষের আত্মার অপরাজেয় মহিমার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর
আর সকলের জন্য আনন্দিত আত্মবলিতে,
ধন্য তুমি, জীবনকে এত ভালোবেসেও ঐশ্বর্য্যের এবং আরামের
মধ্যে জীবনকে রাখ্‌লেনা সীমিত !
আকাশের অবারিত নীলিমায় ডানামেলার মুক্তিতে
অনুভব করেছিলে ভালোবাসার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ !
সেই আনন্দের প্রাচুর্য্যে. প্রশান্তচিত্তে মৃত্যুর ভ্রূকুটীর
সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবহেলায় জীবনকে দিলে বিসর্জ্জন।

মুক্তিস্নান

গল্প

সন্তোষকুমার ঘোষ

এইমাত্র রাহুমুক্ত হলেন সূর্যদেব। সেই কখন গ্রহণ লেগেছিল। পূর্ণগ্রাস। দিনের বেলাতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়ে আকাশে তারা ফুটে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হল ভেবে বাঁশবনের ওদিকটায় শিয়ালগুলোও ডেকে উঠেছিল। এতখানি বয়েস হল, জীবনে এমনটি আর কখনো দেখেছে বলে তো কই মনে পড়ে না প্রতিমার। আশ্চর্য ব্যাপার বই কি! আকাশে সূর্যদেবের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ছিল না। পুরোপুরি গ্রাস করেছিল চিরশত্রু ওই রাহু। মুক্তি পেয়ে উনি এখন তাড়াতাড়ি পাটে নামবার উদ্যোগ করছেন। বামুন পাড়া থেকেই প্রথমে শাঁখের আওয়াজ উঠলো। ঘোষপাড়া তাঁতিপাড়া, দুলেপাড়া সবদিকেই এখন ঘরে ঘরে শাখ বাজতে শুরু হয়েছে। অবেলা। তার গায়ে যেন একটু জ্বর জ্বর ভাব রয়েছে। ক'দিন হল শরীরটা ভাল যাচ্ছে না প্রতিমার। তা হ'ক। মুক্তির স্নানটা করা দরকার। এমনিতে তো রাহুর দশা চলেছেই। রাহুর দশা নয়ত কি! না হ'লে—সংসারের এমন হতচ্ছাড়া অবস্থা হবে কেম? সুখের মুখ দেখে সংসার যে কবে একটু হেসেছিল তা আর এখন মনে পড়ে না প্রতিমার। মানুষের জীবনে দশ দশা হয় বলে। তাই না হয় হ'ল। কিন্তু এবছর ওবছর করতে করতে কত বছরইতো কেটে গেল। অবস্থা আর ফিরল কই! ফিরবে যে তেমন আর ভরসাও নেই। আশা-ভরসা কোন কিছুকেই আর চোখের সামনে হাতড়ে পায় না প্রতিমা। পূর্ণগ্রাস—হ্যাঁ, পূর্ণগ্রাসের মতই অবস্থা হয়ে আসছে ক্রমশ। অন্ধকার—কি এক ধরণের ভয়াবহ অন্ধকার যেন সংসারটাকে গ্রাস করতে বসেছে! এ অন্ধকারের কবল থেকে কোনদিন আর মুক্তি পাবে কিনা কে জানে। না, কিসে কি হয় বলা যায় না। বিশ্বনিয়মের কতটুকু বোঝে ও। বাপ-ঠাকুর্দা—পূর্বপুরুষরা আবহমান কাল যা করে এসেছে—তা করতে না পারলে সারা মন জুড়ে অস্বস্তির আলোড়ন শুরু হবে। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে মুখুয্যেপুকুরে টুপ করে একটা ডুব দিয়ে আসাই ভাল। কার্তিকের শেষ চলছে। এরই মধ্যে হাওয়ায় বেশ খানিকটা শীতের আমেজ লেগেছে। জলেরও যেন দাঁত গজিয়েছে। তা হ'ক। যেমন করে হ'ক একটা ডুব না দিতে পারলে ও স্বস্তি পাবে না। সারারাত ছটফট করে মরবে। কিন্তু ডুব দিতে গিয়েই কাল হল।

কোন রকমে একটা ডুব দিয়ে নিয়েই জল থেকে উঠতে যাচ্ছিল প্রতিমা। শান-বাঁধান ঘাট। জলের মধ্যে পায়ে কি একটা ঠেকল। হারের মতই যেন। আবার ডুব দিল প্রতিমা। জিনিষটাকে তুলে দেখেই চমকে উঠল। হারই বটে। সোনার চিক-হার। তিন ভরি কি সাড়ে তিন ভরির কম নয়। মুখুয্যে বাড়ীর কোন বউয়ের এ ধরণের হার নেই। প্রতিমা জানে তা। তবে অন্নপ্রাশন হয়ে গেল আজ ওদের বাড়ীতে। আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে অনেক। তাদেরই কারুর গলা থেকে খসে পড়েছে নিশ্চয়ই। পোড়া মনেও যেন গ্রহণ লাগল সঙ্গে সঙ্গে। না হ'লে এমন অলুক্ষণে চিন্তা মনে জাগবে কেন?

ওর পক্ষে এ চিন্তা নিতান্ত অভাবনীয় বই কি! ভাবলে—হারটার কথা কাকেও কিছু না বললে কি হয়। রাতের বেলায় চুপি চুপি শুধু বাড়ীর মানুষটাকে জানালেই হবে। শহরের কোন সেকরার কাছে বিক্রি করতে পারলে অনেকগুলো টাকা মিলবে। অনেক অভাব মিটবে তাতে। কিছু না হ'ক—শোয়ার ঘরখানাকে অন্তত মেরামত করান চলবে। মাথার ছাউনি গেছে। পচা বিচুলি খসে খসে পড়ছে চারদিক থেকে। বৃষ্টি হলে ঘরের মেঝের কোথাও আর 'থল' থাকে না। গত বছরে বর্ষা ভাল হয়নি তাই রক্ষে, না হলে—কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে—কে জানে! তা ছাড়া—ভরাপোয়াতী ও। ন' মাস চলছে! 'শত্তুরটা' আর দিনকয়েকের মধ্যেই পেট থেকে পড়বে। সে সময়টায় অনেকগুলো টাকা খরচা আছে। বড় বড় কাঁসারের ঘড়াদুটো তেলীপিসীর কাছে পড়ে রয়েছে। দু বছরের উপর হল। ঘড়াদুটো রেখে সাতগণ্ডা টাকা ধার নিয়েছিল। এখনো উদ্ধার করা হয় নি। ভিটেটাও বাঁধা পড়ে আছে। তারও সুদ জমেছে এক কাঁড়ি টাকা। সোনার হারছড়া পড়ন্ত বেলার আলোয় শুধু ঝকমক করছে না—প্রলোভনের ইঙ্গিত দিচ্ছে সেই সঙ্গে। দুরন্ত লোভ—দুর্বার বাসনা এখন মনের উপর সওয়ার হয়ে কোষে লাগাম ধরেছে। রেহাই নেই আর। মুক্তি নেই। আজন্মের সংস্কার—পাপপুণ্যের চিন্তা—মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেল মন থেকে। তাড়াতাড়ি হারটাকে পেটকাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে ফেললে প্রতিমা। না—কেউ কোথাও নেই এখন। কাক-পক্ষীও টের পায় নি। অভাবনীয় এক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রতিমা কোন রকমে এসে বাড়ীতে ঢুকে পড়ল।

ঘাটের সিঁড়িতে—চাতালে—বাড়ীর দিকের পথ-টুকুতে ভিজে পায়ের দাগগুলো তখনো বেশ ভালভাবে মিলিয়েছে কিনা সন্দেহ।' প্রতিমা তাড়াতাড়ি চুল-নিঙড়ে গা-মাথা মুছে সবে ঘরে এসে কাপড় ছেড়েছে। হন্তদন্ত হয়ে মুখুয্যেবাড়ী থেকে বউটা বেরিয়ে এল। মেজবউএর ভাজ ওটা। পরশু এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীর-মেজবউ বড়বউ আর তারা ঠাকুরঝিও বেরিয়ে এল। ঘাটের পথটুকু তেমন পরিষ্কার নয়। জায়গায়-জায়গায় শুকনো আমপাতা উড়ে এসে পড়েছে। তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে শুরু করে দিলে বউগুলো। তারা ঠাকুরঝি তাড়াতাড়ি ঘাটে এসে জলে নামল। খোঁজা-খুঁজির পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজবউএর ভাজটা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে বলতে লাগল—মরতে আমি পরের জিনিষ গলায় দিয়ে এলাম গা। খালি গলায় এলেই ভাল ছিল। পাশের বাড়ীর কায়েতদের বউটা শাশুড়ীকে লুকিয়ে হারছড়া দিয়েছে। কি করে গিয়ে মুখ দেখাব তার কাছে—কিই-ই বা বলবো তাকে!' কান্নার সঙ্গে আকুলভাবে কত কি বলছে বউটা। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। অবস্থা মোটেই ভাল নয় বউটার। স্বামীটা নাকি উড়নচণ্ডি। গয়নাপত্তর যা ছিল সব বেচে খেয়েছে। সব শুনেছে প্রতিমা। ঘাটের ঠিক কোনখানটায় নেমে কাপড় কেচেছিল—কাঁদতে কাঁদতে তাও দেখিয়ে দিলে বউটা। পুকুরধারের জানলাটা দিয়ে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে প্রতিমা। সকলকার সব কথাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ও। বুকটা অস্বাভাবিক-ভাবে দুরদুর করছে। উত্তেজনাভরে পা দুটোও বেশ কাঁপছে। পুকুরের ধারঘেঁসেই ঘর। পাছে ওর দিকে কারও নজর পড়ে তাই তাড়াতাড়ি জানালার ধার থেকে একটু সরে এল প্রতিমা। তারা ঠাকুঝি এমুড়ো ওমুড়ো সারা ঘাটটাকেই পা দিয়ে ঘুঁটে ফেললে। ঘাটের উপরেই ঠিক একটা বড় আমডাল ঝুঁকে আছে। গুচ্ছের আমপাতাও হাতে করে তুললে জল থেকে। সূর্যদেব খানিক আগে পাটে নেমে গেছেন। পুকুরের জল এখন বেশ কালো হয়ে এসেছে। ওপাড়ায় শাঁখ বেজে উঠল। কারা সন্ধ্যা দেখালে। সন্ধ্যা হয়ে এল। তার ঠাণ্ডা জল। তারা ঠাকুঝি জল থেকে উঠে পড়ল। খোঁজার পর্ব আজকের মত স্থগিত রইল। তারা ঠাকুঝি চাপা গলায় বউটাকে বললে—কাঁদিস নে ভাই। কাল সকালে খুঁজলেই ঠিক পাওয়া যাবে। যাবে

কোথায়! পাড়ার কেউ পেলেও ঠিক দিয়ে যাবে। ভয় শুধু ওই বাড়ীটাকে। প্রতিমাদের বাড়ীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে আবার বললে—ওরা কেউ যেন না টের পায়। চোরের ঝাড় ওরা।

কথাটা স্পষ্ট কানে এল প্রতিমার। গায়ে বিষ ঢেলে দেবার মত কথা। অন্ত কাদেরও সম্পর্কে নয়—তারা ঠাকুঝি তাদেরই উদ্দেশ করে বললে অমন সব কথা। অন্য দিন হলে প্রতিমা হয়ত বারুদের মত জ্বলে উঠতো। আজ কিন্তু কে জানে—কথাগুলো শুনে ওর মনটা বড় দমে গেল। প্রতিমা জানে—চক্রবর্তী বাড়ীকে পাড়ার সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। মানসম্ভ্রম বলতে আর কিছু নেই। বাড়ীর মানুষটাকে কেউ আর এখন বিশ্বাস করে না। মুখের সামনে—চোর-জোচ্চোর কত কি বলে লোকে। প্রতিমাকেও সন্দেহ করে সবাই। আগে—আড়ালে-আবডালে বলতো। এখন কারুর কিছু হারালে কি খোয়া গেলে—পাঁচজনের সামনে গলাফেড়ে তাকেই বদনাম দেয়। বদনামের কাজ যে করে নি কখনো—তা নয়। নিজে না করুক, স্বামীকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ছেলেমেয়েদেরও। এক আধবার নয়—বহুবার। না দিয়ে উপায়ও ছিল না। ছেলেমেয়েগুলোর পেটের জ্বালা আছে। নিজেদেরও পোড়াপেটে খুদ কুঁড়ো যা হ'ক কিছু না দিলে—শরীর বাঁচে কি করে! উপায় তো একটা চাই। বাড়ীর মানুষটার অন্ত কোন বিদ্যে-সাধ্যি নেই। পাশের গাঁয়ের পাঁচ-সাত ঘর যজমানই যা ভরসা। কিন্তু পুজোআচ্ছা—বিয়ে অন্নপ্রাশন—এ আর বছরের মধ্যে ক'টা হয়? তাতে কি আর সংসার চলে। ছোট বড়োয় মিলে সাত সাতটা পেট। বরাবরই তাই ঘটকালির কাজ করে মানুষটা। ঘটকালি করা নয়—মিথ্যের বেসাতি করা। টাকা খেয়ে কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে। কত মেয়ের চোখের জল ফেলিয়েছে। এই সেদিন বিকেলে এক ভদ্রলোক এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে যা-নয়-তাই বলে গেল। গত বোশেখে নাকি আগাম দশগণ্ডা টাকা নিয়ে এসেছিল। ভাল 'পাত্তর' হাতে আছে। যোগাযোগ করে মাসখানেকের মধ্যেই মেয়েকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করে দেবে বলে কথা দিয়ে এসে-ছিল। তারপর আর খবরাখবর নেই—পাত্তাও নেই। জোচ্চোর—চোর—বলবে নাই বা কেন? শুধু কি তাই! হেন লোক নেই যার কাছে ধার করে নি। হরিমুদীর দোকানে তো এককাঁড়ি টাকা ধার হয়েছে। ধারে জিনিব দেয় না আর। গঞ্জের কোন্ দোকানদারও নাকি অনেক টাকা পায়। মাসের পর মাস ধারে জিনিষ যুগিয়ে—তারা নিজেরাই যেন দায়ে পড়েছে। তাগাদা দিয়ে দিয়ে পায়ের জুতো ছিঁড়ে ফেলেছে অনেকে। বলে—নালিশ না করলে জোচ্চোরের কাছ থেকে আদায় হবে না।

ছেলেমেয়েগুলোও তেমনি হয়েছে। যেমন হ্যাংলা—তেমনি চোর আর মিথ্যেকথার ঝুড়ি সব। খাবার জিনিষ হ'ক—আর যাই হ'ক। বেমালুম চুরি ক'রে—দিব্যি সাধু সাজবে। জিজ্ঞেস করো, আকাশ থেকে পড়বে একেবারে।—যেন কিছুই জানে না। তবে ওদের আর দোষ কি! যেমনটি দেখবে তেমনটি শিখবে তো। বাপের দেখেই শিখছে সবাই। চোদ্দবছরের মেয়ে, এগার বছরের মেয়ে, ন'বছরের ছেলে, বড় তিনটের একটাকেও কি ভাল হতে নেই। সবই অদৃষ্ট। বেশীদিনের কথা নয়। বড় মেয়েটা ছাতিমতলায় খেলতে খেলতে ছিদেম ঘোষের নাতনীর কানের ঝুমকো কুড়িয়ে পেয়েছিল। কম নয়—ছ'আনা ওজনের সোনার ঝুমকো। সর্বনাশী মেয়ে লুকিয়ে নিয়ে এসে সোহাগ করে বাপকে দেখিয়েছে। মানুষটা যেন ওঁৎ পেতেই ছিল। শশী সেকরার হাতের কাজ। টাটকা জিনিষটা। মাসখানেকও হবে না গড়িয়েছে। কিন্তু জিনিষটাকে ফেরত দিতে বলবে কি! অবস্থার গতিকে বিচার-বিবেচনা, বিবেকবুদ্ধি সবকিছুই বিগড়ে যায়। উপরি উপরি দু'দিন পেটে ভাত পড়ে নি কারও। চাল-ডাল-তেল-নুন সব 'বাড়ন্ত'। দিনতিনেক আগে যজমানবাড়ী থেকে দুটো নারকোল পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই নারকোল আর মুড়ি চিবিয়ে—দুদিন দুবেলা ছেলেমেয়েরা থাকতে পারে? একমুঠো ভাতের জন্তে আনচান করছিল ক'টায় মিলে। ছোট দুটোতো

সেদিন সন্ধ্যার পর ভাত খাবে বলে বায়না ধরে কেঁদে কেঁদে শেষটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মানুষটার আর মাথায় ঠিক ছিল না সেদিন। না হ'লে—নিজের মেয়েকে কেউ অমন ক'রে বলে—না ওসব শিক্ষা দেয়! ঝুমকো কুড়িয়ে পেয়েছিল—খবরদার বলবি না কাকেও—জেলে নিয়ে যাবে তা হ'লে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি—জানি না তো। কথাগুলো বাপ হয়ে মেয়েকে কি করে বললো—তা ভেবে পায় নি প্রতিমা। নিজের কানে সব স্পষ্ট শুনেও রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে নি প্রতিমা। মেয়েটাকেও ধমকাতে পারে নি। উপোসী সন্তানদের মুখচেয়ে সেদিন চরম অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল। পরদিন সকালে গঞ্জের কোন্ সেকরাকে ঝুমকো বেচে—মানুষটা সেই পয়সায় চাল, ডাল, তেল, নুন কিনে নিয়ে এল। ভগবান জানেন—কি দুঃখে প্রতিমা সেদিন সেই চালডাল হাঁড়িতে তুলেছিল। ছেলেমেয়েগুলো তো এই-ভাবেই প্রশ্রয় পাচ্ছে। পরের বাগান থেকে, ক্ষেত থেকে ফলপাকড়, আনাজপাতি লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রায়ই আনে ওরা। কাণ্ড দেখে—আগে আগে রাগে জলে উঠতো প্রতিমা। মেয়ে দুটোকে ঠাস্ ঠাস্ করে চড়িয়েও দিয়েছে কতদিন। এখন আর রাগে না যোটেই। গা-সহা হয়ে গেছে সবকিছুই। আর ওদের বলবে কি। নিজেরই এখন কি রকম যেন লোভ হয়। পোয়াতী মানুষ। এটা সেটা খাওয়ার লোভ যেন দিনদিন বাড়ছে। বাড়ীর মানুষটা কুঁচোচিংড়ি এনেছিল সেদিন কোথা থেকে। পুঁই শাক দিয়ে মজে ভাল। মুখুয্যেদের বাগানে মেটুলিভর্তি পুঁইশাকের কাঁড়ি রয়েছে। হলে কি হবে। হাত দিয়ে জল গলে না ওদের। চাইলেও 'ছেদ্দা' করে দুডাল ভাল শাক দিতে চায় না। বড় মেয়েটাকে সন্ধ্যের সময় তাই নিজেই বলেছিল। ওদের ওদিককার বেড়া গ'লে ঢুকে দুটো পুঁইডাল কেটে আনতে পারিস। মা হ'য়ে—কি করে যে মেয়েকে অমন কথা বলতে পারলে—তা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল পরক্ষণেই। কিন্তু বারণ করবে কি। বলার আগেই যেন যাবার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। একছুটে গিয়ে শাক নিয়ে এসেছিল মেয়েটা। মেটুলিভরা শাক দেখে নোলায় জল এসে গিয়েছিল প্রতিমার। মেয়েকে চুরি করতে বলে ফেলে মনের কোনে যে সংকোচ-টুকু জেগেছিল—তা আর মাথাচাড়া দিতে পারে নি তখন। এই ভাবেই মুখ পুড়ছে দিনদিন। পোড়া পেটের জন্যে নিজের ছেলেমেয়েদের কাছেও মাথা হেঁট হচ্ছে। পাড়ার পাঁচজনের সামনেও এখন আর মুখতুলে দাঁড়াতে পারে না প্রতিমা। ছেলেমেয়েগুলোরও একই রকমের অবস্থা হয়েছে। ওরা কেউ পাড়ার কোন বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ালেই—সবাই যেন কেমন সন্দেহের চোখে দেখে। ঘরে-দোরে উঠলে, বসলে তো কথাই নেই। পাছে ঘটিটা বাটিটা চুরি যায়—তাই কড়া নজর রাখে সবাই। বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে সকলের—চোখের আড়াল হলেই জিনিস খোয়া যাবে। কিন্তু লোকে এখন প্রতিমা যাই ভাবুক না কেন—কী ঘরের মেয়ে যে ও তা তো অনেকেই জানে। হলে কি হবে। জেনেশুনেও এখন আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না ওকে। না হলে—মিথ্যে নয় কিছুই। প্রতিমার বাবা—ইস্কুলমাষ্টার ছিলেন। কাব্য-তীর্থ—সংস্কৃত পড়াতেন। তা ছাড়া কথকতা করতেনও ভাল। এপাড়াতেও ভাগবত পাঠ করে গেছেন ক'বার। কত নাম ডাক ছিল বাবার। নাম শুনলেই লোকে হাতজোড় করে কপালে ঠেকাত। এমনি সম্ভ্রম ছিল তাঁর। পাড়া বেপাড়ার কত বিধবা আর ছোটজাতের মেয়ে-পুরুষ বাবার কাছে টাকাকড়ি, সোনাদানা—কত কি গচ্ছিত রেখে যেত। ভুলেও কারও কোন-কিছুর তঞ্চকতা করেন নি কখনো। জীবনে মিথ্যে কথাও বলেন নি কখনো। মানুষটার উপর সকলের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সেই বাপেরই মেয়ে প্রতিমা। জন্ম থেকে এই বাপেরই ছায়ায় ছায়ায় মানুষ হয়েছে সে। তার মনের বনেদ যে বাপেরই হাতে গড়া—তা আর এখন বিশ্বাস করবে কে? ভগবান জানেন শুধু। আর কে জানবে! পেটের জ্বালা—হ্যাঁ, পোড়া পেটই শুধু অমানুষ করে তুলেছে তাকে। শুধু তাকে নয়—স্বামী, ছেলে, মেয়ে—সংসারের সবাইকে।

একটু রাত করেই সেদিন বাড়ী ফিরল কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদই প্রতিমার স্বামী। খেতে বসে খুশিখুশি গলায় প্রতিমাকে বললে—ওদের মঙ্গলবার বিয়ের সব ঠিকঠাক করে এলুম—বুঝলে ?

ওদের—মানে, ওপাড়ার হালদারদের মেয়ে মঙ্গলা। বিধবা মা ছাড়া মাথার উপর কেউ নেই। মাও আবার তেমনি হাবাগোবাগোছের মানুষ। মেয়ে আঠার পেরিয়ে উনিশে পড়বে আসছে মাসে। মুখের ছিরিছাঁদ ভাল হলে কি হবে—রঙ ময়লা। তায় পয়সার জোর নেই মোটেই। কেউ তাই ঘাড় পাততে চায় না। ক'দিন ধরে মঙ্গলার মা এবাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করছে। এই অঘ্রাণেই যাতে একটা ব্যবস্থা হয়। প্রতিমা জানে সব। নির্জীব গলায় বললে শুধু—কোথায় ঠিক হ'ল ?

কালীপ্রসাদ গলার আওয়াজ একটু খাটো ক'রে বললে—দুডুলের সেই লোকটা গো। বউ মরেছে—ক'বছর হ'ল। কেউ তো মেয়ে দিতে চায় না। দেবে কি ! হাঁপানি আছে যে লোকটার। মাঝে মাঝে যখন হাঁপ বাড়ে—যাই যাই অবস্থা হয়। অন্য সময় বোঝবার জো নেই। মোটা রকমের ঘটকালি দেবে। পাকা কথা দিয়ে এলুম বুঝলে ? আজই আগাম একশো টাকা হাতে গুঁজে দিলে। বাকী দু'শো বিয়ের রাতে দেবে। তা ছাড়া ধুতি শাড়ি আর ঘড়া দিয়ে বিদেয় দেবে বলেছে। হাঁপানির কথা মঙ্গলার মাকে জানাই নি বাপু। তুমি যেন আবার কথায় কথায় ব'লে ফেলো না—বুঝলে ?

কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে গেল প্রতিমা। হৃদয় মন বলতে কি কিছু আর নেই মানুষটার! দিনদিন একী, অমানুষ হ'য়ে উঠছে লোকটা! জেনে শুনেও অমন মেয়েটার সর্বনাশ করতে চলেছে। হাতে 'নোয়া' আর সিঁথেয় সিঁদুর—ক'দিন আর পরতে পাবে বেচারি। হাঁপানিরুগী, আজ আছে কাল নেই। না—মুক্তি নেই আর। রাহুর কবল থেকে সংসার আর মুক্তি পাবে না কোনদিন। এত পাপের বোঝা। জন্ম জন্ম ধরে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করলেও মুক্তি মিলবে না। ছেলে-মেয়েরাও কেউ রেহাই পাবে না। বংশ বংশ ধরে হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এর জন্যে। প্রতিমার মুখ-চোখ মুহূর্তের মধ্যে পাষাণ-প্রতিমার মত কঠিন হয়ে উঠল। সমস্ত চৈতন্য জুড়ে দুর্বার এক চিন্তার আলোড়ন শুরু হল। ভাল-মন্দ কি হাঁ-না—কোন রকমই আর উত্তর দিলে না প্রতিমা স্বামীর কথায়! কেন কে জানে—কিছু খেতেও পারলে না প্রতিমা। তাড়াতাড়ি এঁটো বাসন দুটো সরিয়ে রেখে, হাত ধুয়ে কোন রকমে গিয়ে ছেলেমেয়েদের পাশে শুয়ে পড়ল। মাথার কাছেই কাঁথার তলায় সোনার হারছড়া রয়েছে। হার নয়—জ্যান্ত একটা বিছে যেন। বিছের কামড়ের মতই হঠাৎ অসহ্য জ্বালা শুরু হল সারা মনজুড়ে। ছট্‌ফট্‌ করছে প্রতিমা। চোখে আজ আর ঘুম আসছে না কিছুতেই। জ্বালা যেন বেড়েই চলেছে ক্রমশ। চিন্তার জ্বালা।—এমনিভাবে অমানুষ হয়ে জীবনকে জীইয়ে রেখে কি লাভ আছে! এর চেয়ে মরা ভাল। একা নয়—সংসারের সবাই। হ্যাঁ, একেবারে সব মরেহেজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ভাল। মর্যাদার চেয়ে বড় জিনিষ আর নেই। একার—একজনের মর্যাদা নয়। বংশের মর্যাদা—বংশ-ধারার মর্যাদা বলে কথা। এমনি করে মর্যাদা হারিয়ে ওর ছেলেমেয়েগুলোরই বা কি দশা হবে এরপর। সংসারে, সমাজে ওরা কোন্ মুখ নিয়ে চলাফেরা করবে। কেমন করেই বা মাথা তুলে হাঁটবে ফিরবে। বড়সড় হয়ে সবকিছু বুঝতে শিখলে—নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে শুধু নিজেদের অদৃষ্টকেই দায়ী করবে কি ? মোটেই না। বাপ-মাকেই দায়ী করবে তখন পদে পদে। বাপ-মা ব'লে রেহাই দেবে না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে শাপশাপান্ত করতে থাকবে হয়ত। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অভাবনীয় একটা সংকল্প মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সে সংকল্প সারা মনজুড়ে শিকড় চারিয়ে মহীরুহের আকার নিলে। দংশনের জ্বালা কমে এল আস্তে আস্তে। চিন্তার

ালোড়নও থেমে এল। ধীরে ধীরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে ড়ল প্রতিমা।

পরদিন সকালে বেশ বেলাতেই ঘুম ভাঙল প্রতিমার। সন্ন হাসির মত চারদিকে নেকদিন পরে গা-মাথা আ াল্কা মনে হচ্ছে ওর। ঠে গেল বিছানা থেকে। টল হয়ে আছে মনের মধে াথার তলা থেকে বের ক খলে প্রতিমা। পাট-ঝাঁটের কাজও সারলে াড়াতাড়ি। মুখুয্যেবাড়ীর ওদের খোঁজাখুঁজির আর ক পর্ব অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কোলেরটা ড়া—সব ছেলেমেয়েকটাই পুকুরঘাটে গেছে তখন। ত মাজবে—মুখ ধোবে। বড় মেয়েদুটো স্নান করবে। লতি নিয়ে ঘাটে যাবারই উদ্যোগ করেছিল প্রতিমা। লীপ্রসাদ দাওয়ায় বসে পাঁজি দেখছে। মঙ্গলার এসে দাঁড়াল। মঙ্গলার মাকে সকালেই আসতে বছিল। বিয়ের দিনক্ষণ সব বলে দেবে। তাড়াতাড়ি ই এসেছে বেচারি। মাসের গোড়ার দিকেই একটা । দেখো ঠাকুরপো—যত শীগগির হয় ততই ভাল— াড়া পড়তে কতক্ষণ—বলতে বলতে মঙ্গলার মা াওয়ার একধারে উঠে বসল।

প্রতিমা যেন তৈরী হয়েই ছিল। মঙ্গলার মায়ের নে এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট গলায় বললে—ওখানে মেয়ের । দিও না দিদি। লোকটা দোজবরে জানই তো। াড়া—হাঁপানি আছে। মাঝে মাঝে 'বাই-বাই'- া হয়। জেনেশুনে মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিও দিদি।

অবাক হয়ে গেল মঙ্গলার মা। সবিস্ময় দৃষ্টি তুলে াপ্রসাদের দিকে চাইলে। আরও বেশী অবাক হল াপ্রসাদ নিজে। শুধু অবাক হল না—হতবাক হয়ে । ভাবলে,—প্রতিমা কি ভুল বকছে! প্রতিমার াথা খারাপ হ'ল! ক'দিন হ'ল সংসারে সব কিছু 'বাড়ন্ত' হয়েছে। হাতথালি চলছে এখন। ধারও আর মিলবে না কোথাও। তাছাড়া—আর দিনকতক পরেই ওর প্রসবের সময়টায় অনেকগুলো টাকার দরকার হবে। জুটবে কোথা থেকে শুনি। তিন তিনশো টাকা— আর ঘটক বিদায়ের কথাটা ভাবলেও না একটুও। হ'ল কি প্রতিমার!

কি একটা বলতে যাচ্ছিল কালীপ্রসাদ। ঝড়ের বেগে বাড়ী থেকে পুকুরে চলে গেল প্রতিমা। দেহটা ওর উত্তেজনাভরে থরথর করে কাঁপছে তখন। কাঁপুক। রাতের মহাসংকল্পটুকু কিন্তু অনড় হয়ে আছে মনের মধ্যে।

প্রতিমা ঘাটে গিয়ে তাড়াতাড়ি একবুক জলে নামল। 'পায়ে কি যেন একটা ঠেকল রে!' ব'লে ইচ্ছে করেই ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশ একটু সচকিত করে তুলল তাদের। সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে গলা ডুবিয়ে পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে হারটাকে বার করলে প্রতিমা। জলের উপরে হাত তুলতেই— জিনিষটাকে দেখে চমকে উঠল ছেলেমেয়েরা। 'ওমা— মুখুয্যেবাড়ীর কারও গলা থেকে খসে পড়েছে হয়ত রে!' ব'লে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ল প্রতিমা। আর দেরি করা নয়। মহাসংকল্পটি মনকে যেন ঠেলে-ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মুখুয্যেদের বাড়ীর দিকেই চললো প্রতিমা। কৌতূহলাবিষ্ট ছেলেমেয়েকটাও মায়ের সঙ্গ নিলে। অন্নপ্রাশন গেছে কাল মুখুয্যেবাড়ীতে। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভর্তা। ভিজে কাপড়ে প্রতিমা ওদের উঠনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে বললে— বড়দি—ও মেজদি—কার হার গলা থেকে জলে পড়ে গেছে। দেখতো—তোমাদের কারও কি না? কাপড় কাচতে এসে জলে নেমেছি—পায়ে ঠেকল। তুলে দেখি—ওমা হার! তা কার গো?

বড় বউ, মেজবউ আর তারা ঠাকুরঝি শুধু নয়— বাড়ীশুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ সবাই ঘর, দালান আর বৈঠক-

খানা থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিমা আর তার ছেলেমেয়েদের ঘিরে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি চোখের কিনারা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দিলে প্রতিমা। ভাশুর সম্পর্কের রয়েছে দু'তিনজন। মেজবউ তাড়াতাড়ি হারছড়া নিলে ওর হাত থেকে। বললে—আমার ভাজের ওটা। তাও নিজের নয়। পরের জিনিষ পরে এসেছিল। তুই ওকেও বাঁচালি—আমাদেরও মুখরক্ষে করলি ভাই। ভগবান তোদের ভাল করবে।

এমন কথা, এমন সম্বোধন—অনেকদিন শোনেনি প্রতিমা। সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে। মনে হ'ল, সকলের চোখেই যেন বেশ সম্ভ্রমভরা দৃষ্টি। এতকা[ল] পরে আজ প্রতিমা এই প্রথম উপলব্ধি করল—এদে[র] সকলের মাঝখানে সে একটা মর্যাদার আসন পেয়েছে ছোট হলেও—ছেলেমেয়েগুলোও যেন মায়ের মর্যাদা[র] অংশ পেয়ে বেশ খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হার দিয়ে ঘাটে ফিরে এল প্রতিমা। মন যে[ন] সত্যিই রাহুমুক্ত হয়েছে। শুধু কাপড় কাচলে ন[া] প্রতিমা। রুখু চুলেই—পর পর ক'টা ডুব দিয়েও নিলে প্রতিমা। মুক্তিস্নানের আনন্দে মন ভরে গেল।

শিক্ষাব্রতী সূর্যকুমার

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের সম্পাদক নিযুক্ত হ'লেন একজন তরুণ শিক্ষক—নাম সূর্যকুমার অধিকারী।

ইতিপূর্বে মেট্রোপলিটানের সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ১৮৬৪ সাল থেকে যুক্ত। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভাবে মেট্রোপলিটান (পূর্বের নাম ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল) সরকারী কোন সহায়তা ছাড়াই সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৭২ সাতে এফ, এ, ক্লাস পর্যন্ত পড়াবার ভার অনুমতিও পাওয়া গিয়েছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সহকারী, কাজ ছেড়ে এসে মেট্রোপলিটানে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন নামটি তখন একাধিক কারণে স্মরণযোগ্য। সে যুগে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য ছাড়া কোন কলেজ গ'ড়ে তোলা সম্ভব এবং ইংরাজি শিক্ষক বা অধ্যক্ষ ছাড়া সে কলেজকে সাফল্য-মণ্ডিত করা যায়—এ' চিন্তা যেন সাধারণ লোকের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অধ্যবসায় প্রতিক্ষেত্রেই অনন্যসাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য বেলে সাহেবকে তিনি যে চিঠি লেখেন, সেই চিঠিতেও তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন যে বাঙালী পরিচালনা এবং বাঙালী শিক্ষকের শিক্ষণে একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজ গড়ে তোলা সম্ভব।

বিদ্যাসাগর বললেন বটে কিন্তু তবুও বিশ্ববিদ্যালয় অতখানি এগিয়ে যেতে রাজি নয়। পরীক্ষামূলক ভাবে এফ. এ পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে। অথচ শুধুমাত্র কলেজ নিয়ে পড়ে থাকার মত সময়ও বিদ্যাসাগরের নেই। তিনি বাংলাদেশের ও হিন্দুসমাজের অগণিত সমস্যা নিয়ে জড়িত। তাই তিনি এমন একটি লোকের সন্ধান করছিলেন যিনি এই শিক্ষায়তনটির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করে তাকে সাফল্যের তটভূমিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে।

বিদ্যাসাগরের সেই মনোনীত ব্যক্তি হ'লেন সূর্যকুমার।

সূর্যকুমার অধিকারীর জন্ম ফরিদপুর জেলায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সার্টক্লিফ্ সায়েবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সার্টক্লিফএর ইচ্ছাতেই তিনি হেয়ারস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রেসিডেন্সি কলেজের গন্থাগারিক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে।

ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ মিত্রদের মধ্যে একজন। তিনি সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের কাছে সূর্য-কুমার সম্বন্ধে গল্প করে থাকবেন। যার ফলে বিদ্যাসাগর বলেন—সূর্যকুমারকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসতে। বিদ্যাসাগর তখন সুকিয়াষ্ট্রীটের মোড়ে ৬১, ৬২, ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পরপর তিনটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ত্রৈলোক্যবাবু ৬৩নং বাড়ীতে সূর্যকুমারকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

প্রথম পরিচয়েই বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হন। ফলে তিনি দুটি প্রস্তাব দেন ত্রৈলোক্যবাবুর কাছে। একটি তাঁর তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে বিবাহ; দ্বিতীয়টি মেট্রোপলিটান ইনষ্টি-টিউসনের ভারগ্রহণ। সূর্যকুমার অসম্মত হন এবং বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু সূর্যকুমারের সুহৃদ ও আশ্রয়দাতা—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চাপে সূর্যকুমার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য

হন; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরদুহিতা বিনোদিনীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তারপরেও মেট্রোপলিটানে যোগদান করতে তাঁর আপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুরোধে শেষপর্যন্ত (১৮৭৬ খৃঃ) মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের সম্পাদকরূপে যোগদান করলেন।

মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন তখন তিনটি বিভাগে বিভক্ত—[১ বিদ্যালয় (preparatory school) ২ কলেজ— ৩ বাংলা বিভাগ]। কলেজে শিক্ষকতা করতেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিবৃন্দ। কলেজে তখন শুধু এফ. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। চেয়ার বেঞ্চি কেনা থেকে অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার বিদ্যাসাগরকেই বহন করতে হয়। সূর্যকুমার এসেই আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চেষ্টা করলেন। এবং কলেজ যাতে প্রথম-শ্রেণীর কলেজে পরিণত হতে পারে তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর কার্যদক্ষতায় খুসী হ'য়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ সূর্যকুমার একসঙ্গে ইনষ্টিটিউশনের সম্পাদক ও কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতে লাগলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সূর্যকুমার কলেজে যোগদান করার তিনবছর পরে বি. এ. পর্য্যন্ত পড়ানোর অনুমতি পাওয়া গেল। প্রথম বছরেই বি, এ, পরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য। এডুকেশন গেজেটে শিক্ষা-অধিকর্তার রিপোর্টে লেখা হ'ল—

"The success of the Institution reflects great credit on its maneger and the teaching staff."

ম্যানেজার কথাটা অধ্যক্ষকে-লক্ষ্য করেই বলা হ'য়েছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'ল' ও ৮৫তে অনার্স ও এম, এ, পর্য্যন্ত পড়ানোর অনুমতি পাওয়া গেল। ১৮৮৫তে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রতালিকাতে প্রথম দশজনের মধ্যে—প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম স্থানাধিকারী মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র। অন্যান্য বিষয়েও গৌরবজনক ফলাফল। এডুকেশন গেজেটের রিপোর্ট—

The un-aided Metropoliton Institution is by far the largest of the Colleges···as in the previous year the Metropoliton Institution sent up and passed the greatest number of candidates."

এইসময় কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা-৫০০, মাথাপিছু প্রতিছাত্রের জন্য খরচের যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, প্রতি ছাত্রের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ বছরে ৩৬৪ টাকা ব্যয় করে, আর মেট্রোপলিটান কলেজ করে ৪৯ টাকা ১৩ আনা।

মেট্রোপলিটান কলেজের কোন নিজস্ব ভবন ছিল না। সূর্যকুমারই অনেক চেষ্টায় শঙ্কর ঘোষ লেনের বর্তমান জায়গাটি ত্রিশহাজার টাকায় কেনেন। কলেজ ভবনটি তাঁর হাতেই তৈরী। ১৮৮৬তে এই ভবন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং ১৮৮৭র জানুয়ারীতে কলেজ নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

একদিকে কলেজের উন্নয়নের জন্য যেমন তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্কুলের জন্যও তাঁর চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁর চেষ্টাতেই বড়বাজার ও বউবাজারে মেট্রোপলিটানের ব্রাঞ্চ্ খোলা হয়। স্কুলের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেও তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বি ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোং থেকে প্রকাশিত ঐতিহাসিক পাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তখন যথেষ্ট সমাদৃত হ'য়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রকৃতি বিজ্ঞান'। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় এ ধরণের বই রচিত হয়নি। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি Balfour, Stewart, Tyndall, Gauot, Deschannel, Stalls প্রভৃতি—ইদানীন্তন প্রকৃতিতত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক লিখিত হইল।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল ইন্ কাউন্সিল এক বিশেষ আদেশবলে সূর্যকুমার অধিকারীকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) হিসাবে মনোনীত করেন। ২৮শে মার্চ তারিখের সভায় তাঁকে ফ্যাকাল্টি

অব্ আর্টস করা হয়। মিনিট বইয়ে সই করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য H Reynolds এবং রেজিস্ট্রার Charles H. Tawney.

তখনকার দিনে কোন বাঙালী (বা ভারতীয়) শিক্ষাব্রতীর কাছে এই সম্মান আশাতীত ছিল।

তাঁর প্রতিষ্ঠা শুধু শিক্ষাব্রতী হিসাবেই নয়। সৃজনশীল সাহিত্যে এবং মৌলিক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর খ্যাতি ছিল। "কাননকুসুম" নামে তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক উপাদানে রচিত এই উপন্যাসটির ভাষা লক্ষ্য করার মত। সেই যুগটা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত'র যুগ। 'কাননকুসুমের' ভাষা সংস্কৃতবর্জিত স্বাভাবিক বাংলাভাষা।

> "তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পলায়ন আমার একমাত্র উপায়। পলায়ন না করিলে বন্দী হইব। অথবা প্রাণ যাইবে। বন্দী হওয়া ও প্রাণ যাওয়া একই কথা। সে যাহা হউক, আর একবার চেষ্টা করা যাউক। এই শেষ উদ্যম। এইরূপ চিন্তা করিয়া যুবক সবেগে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন।"

সূর্যকুমার 'লা মিজারেবল্' গ্রন্থের অনুবাদের কাজেও হাত দিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ "প্রবন্ধ মুক্তাবলী" নামে বার হয়। ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় তাঁর স্বনামে ও কন্যা সরযূবালা দেবীর নামে অনেক প্রবন্ধ ছাপা হ'য়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সূর্যকুমারের হৃদ্যতার ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সুরটি যেন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। বিদ্যাসাগর-চরিত্র অনুধাবন করলে দেখা যায় যে কোনরকম বিরোধিতা তিনি কোনদিন মেনে নেন নি। এ'র জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ও বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাঁকে অনেক জনপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হ'য়েছে। ছেড়ে দিতে হয়েছে বেথুন কলেজের সম্পাদকের দায়িত্বভার, ছিঁড়তে হ'য়েছে হিন্দু এ্যানুয়িটি ফাণ্ড ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক। তাঁর প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁকে একান্তভাবেই একক করে তুলেছিল।

অপরদিকে সূর্যকুমারও ছিলেন জেদী ও আত্মাভিমানী। বিদ্যাসাগর যখন চাইতেন, কলেজের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারেই সূর্যকুমার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন, তখন সূর্যকুমার চেষ্টা করতেন অধ্যক্ষের মর্য্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে।

চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁদের মধ্যে বিরাট একটা বৈষম্যের সুর থেকে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর ধর্মবিষয়ে কিছুটা নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল ব্রাহ্ম তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে ঈশ্বর নয়, মানুষই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে সূর্যকুমারের যোগাযোগ ছিল থিয়োজফিষ্ট্ সম্প্রদায়ের সঙ্গে। ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্তর ধর্ম-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর ও প্রত্যক্ষ। ধর্মসম্পর্কে 'ব্রহ্মবিদ্যায়' তাঁর অনেক প্রবন্ধ বেরিয়েছে। সূর্যকুমার 'ভারতসভা'র (Indian Association) প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের অন্যতম এবং এই বিদ্যাসাগরের মত সূর্যকুমারও ছিলেন স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ পুরুষ। তাই তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাধ্‌বে এ'তে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই।

কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই মনান্তরের সুযোগ গ্রহণ করেছিল অন্য কতকগুলি লোক। যারা সূর্যকুমারের এই অসাধারণ প্রভাবকে ঈর্ষ্যার চোখে দেখ্‌ছিলো। এই লোকগুলি নানাভাবে বিদ্যাসাগরের মনকে সূর্যকুমারের প্রতি বিরূপ করে তুলতে চেষ্টা করছিল। অবশেষে এক দিন প্রত্যক্ষ সংঘাত বাধে। কলেজভবন সম্পর্কিত কাগজপত্র নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে কিছু রূঢ় কথা বলেন। সূর্যকুমারও প্রত্যুত্তর দেন। ফলে ১৮৮৮ খৃঃ র সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলেজ ছেড়ে যান।

তাঁর তের বছরের কার্যকালেই যে কলেজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা—এ বিষয় প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। বিভিন্ন লেখক এ' সম্পর্কে তাঁর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের মত প্রবল ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ যথাযথভাবে

প্রকাশিত হ'তে পারেনি। তবু পরবর্তী কালের অনেক লেখকই তাঁকে সেযুগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষা-ব্রতীরূপে বর্ণনা করেছেন। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে জলধর সেন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর সহৃদয়তা ও শিক্ষানুরাগের কথা আলোচনা করেছেন। অনেক দুঃস্থ ছাত্রকে তিনি গৃহে আশ্রয় দিয়ে তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালে বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখতে গিয়ে জনৈক ইন্দ্রমিত্র সূর্যকুমারের সঙ্গে কলেজের সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাটির পেছনে আরও কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রমিত্র এমন একটি কাহিনী রচনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ইন্দ্রমিত্র ৺যতীন্দ্রমোহন ঘোষের নামের উল্লেখ করেন। এবং বলেন যে ৺যতীন্দ্রমোহন ৺মুক্তিদারঞ্জন রায়ের মুখে ঘটনাটি শুনেছিলেন। অথচ বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের কাছে ৺মুক্তিদারঞ্জন রায়ের পুত্র ভূতপূর্ব আধ্যাপক শ্রীশৈলজারঞ্জন রায় বলেন—পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার অধিকারী বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল থাকাকালীন কোনও গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কখনও কোনও কালে কাহারও কোনও ইঙ্গিত বা অভিমতের সম্পর্কে কিছুই শুনি নাই।"

শ্রীইন্দ্রমিত্র তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ—শ্রীগৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের উল্লেখও করেছেন। শ্রদ্ধেয় গৌরীকান্তবাবু বলেন—"দুঃখের বিষয় শ্রীইন্দ্রমিত্র মহাশয় অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়ের সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে আমার মত উদ্ধৃত করিলেন কিন্তু আমি জানি সূর্যকুমার অধিকারী মহাশয়ের কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে বিদায় লওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়ের কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।"

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্তী এ' ব্যাপারে অধ্যাপক ৺যতীন্দ্রমোহন ঘোষের বক্তব্যের সত্যতাকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন কলেজ পত্রিকার পৃষ্ঠায় ৺যতীন্দ্র-মোহনের একটি রচনা ছাপা হ'য়েছিল কারণ সম্পাদক হিসাবে দুর্গাশরণবাবু একজন সতীর্থের লেখা পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জি শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর দৌহিত্র। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ গভর্নিং বডিরও সদস্য। তিনি বলেন, সূর্যকুমার বিদ্যাসাগর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলেজ থেকে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হ'য়েছিল, কারণ শেষদিকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটেছিল। ইন্দ্রমিত্রর উক্তিকে তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে বর্ণনা করেছেন।

ডক্টর ব্যানার্জি শাস্ত্রী বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য সূর্যকুমারের আসন ছিলো ভাইস-চ্যান্সেলারএর আসনের পাশেই। সেযুগের বৃহত্তম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য। শিক্ষাব্রতী সূর্যকুমারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

রবীন্দ্র কাব্য-তরঙ্গ

অশোক সেন

রবীন্দ্রকাব্যের আর একটা নূতন দিক দেখা দিল 'ছবি ও গানে'। ইহা শব্দ এবং সঙ্গীতের সাহায্যে রচিত চিত্রকাব্য। বাহিরের জিনিষকে দেখিবার দৃষ্টি এবং অনুভব করিবার শক্তি যেন প্রখর হইয়া উঠিল এই সময়কার রচনায়। সামান্যকে অসামান্য এবং অবিশেষকে বিশেষ করিয়া তুলিবার এক তীব্র অনুভূতি-ক্ষমতা দেখা দিল কবির অন্তরে বাহিরে। সঙ্গীতের মিশ্রণে কবিতাগুলির ভিতরে একটা গভীরতার ভাব মূর্ত হইয়া উঠিল। ছবি ও গানের কবিতাগুলি ১২৯০ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বাইশ বৎসর বয়সের সময়ের লেখা। এই বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে কবির বিবাহ হয়। এই বৎসরেরই ফাল্গুন মাসে ছবি ও গান প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের সূত্রপাত কারোয়ারে। তারপর কবি ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়। জীবনস্মৃতিতে আছে:—

"চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলার রোডের একটি বাগান-বাড়ীতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষরঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা-পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, একএকটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে; আমিও সেইদিন নবযৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপনমনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই-ছবিগুলোকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

প্রভাতসংগীতে একটা পর্ব শেষ হইয়াছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর এক রকম শুরু হইল। একটা জিনিসের আরম্ভের আয়োজনে বিস্তর বাহুল্য থাকে। কাজ যত অগ্রসর হইতে থাকে তত সে সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নূতন পালার প্রথমের দিকে বোধকরি বিস্তর বাজে জিনিষ আছে। সেগুলি যদি গাছের পাতা হইত তবে নিশ্চয়ই ঝরিয়া যাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা তো অত সহজে ঝরে না, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টিকিয়া থাকে। নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে।"

(কবির জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত)

জীবনের শেষদিকে কবি লিখিয়াছেন :

"ছবি ও গান নিয়ে আমার বলবার কথাটা বলে নিই। এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর।............"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে কবি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের দিক দিয়া বিচার করিলে সমালোচকের কাছে হয়তো 'ছবি ও গানের' একটা মূল্য আছে—কিন্তু প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলির যে কাব্য-সৌন্দর্য, তাহার অত্যন্ত অভাব 'ছবি ও গানের' কবিতায়। তবে ভাবের ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, প্রভাতসংগীতের হৃদয়ারণ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কবি বিশ্বজগতের এবং বিশ্বজীবনের স্পর্শ অনুভব করিতে শুরু করিয়াছেন 'ছবি ও গানে'।

কড়ি ও কোমল (১২৯৩)

Poetry has primarily to do with the expression of feeling and emotion --T. S Eliot.

'ছবি ও গানের' পর 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়াই এ উক্তির যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায়। 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময়ে কবির মনোভাব এবং চিন্তাধারার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকিলে কবিতাগুলি বুঝিতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন : "ইতিমধ্যে বাড়ীতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার যখন মৃত্যু হয়' তখন আমার বয়স অল্প।............

প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।.........

কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সংগে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ১২৯১, ৮ই বৈশাখ]

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম।.........

— — — —

যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তিবোধ করিলাম।

— — — —

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।...............

আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পট-ভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম—এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।............ ..

....

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।...........

ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি লিখিতে-ছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি ফরাসি কোনোকোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমলএর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা, এই কবিতাগুলির মূলকথা। আশু বলিলেন; "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

অসম্ভব নহে। বাল্যকালে যখন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি। যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবনলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ঢেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে, তীরে দাড়াইয়া আমার মন বুঝি তাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ডাক পাড়িত। জীবন যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়।

....

মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ যেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগরযাত্রায় চলিয়াছে, তাহারই জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কি আমার ওই গলির ওপারটায় প্রতিবেশী-সমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তাহা নহে। যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানেই প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা-ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

....

তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনো-মতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!'

আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

এ তো আমার নিজেরই কথা। যেসব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই। মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্খা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানেই সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি। যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়-লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎ-কালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

এবারের একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেশির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে।

কড়ি ও কোমলের সূচনায় কবির মন্তব্য হইতে আমরা জানিতে পারি:

(১) সেই সময় কবির নবযৌবন—আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন তিনি প্রথম উপলব্ধি করিতেছিলেন।

(২) হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেনের কবিতার কোনো প্রভাব রবীন্দ্রনাথের রচনায় পড়ে নাই।

(৩) এই সময়ের কিছু আগে হইতেই, কবি বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন।

(৪) বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের একজন বড় ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মিল ছিল না এবং সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বপ্নপ্রয়াণের কোন প্রভাব পড়িতে পারে নাই।

নারীদেহের স্বর্গীয় নগ্ন-সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা কড়ি ও কোমলের কয়েকটি কবিতায় সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত মনপ্রাণ মাতাইয়া তোলে। এই রীতির কবিতা তখন প্রচলিত ছিল না—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ সাহিত্য-বিচারকেরা এইসব কবিতার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই—তাই অযথা এগুলিকে কামনা লালসার অভিব্যক্তি মনে করিয়া কবির বিরুদ্ধে গাল পাড়িয়াছেন। সাধারণতঃ কথাশিল্প বা কলাশিল্পের মাধ্যমেই শিল্পী নারী-দেহের নগ্নরূপের আলেখ্য তুলিয়া ধরেন—স্রষ্টার মনে কল্পনাশক্তির দারিদ্র্য বা তীব্র গভীর অনুভূতির অভাব থাকিলেই এইসব আলেখ্য পর্ণগ্রাফিক হইয়া ওঠে—আর কল্পনাশক্তি এবং গভীর ভাবানুভূতিমণ্ডিত এইসব সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার মর্যাদায় মণ্ডিত হয়। আর তাছাড়া নারী-দেহের বর্ণনায় যদি দেহাতীতের প্রতি ইঙ্গিত না থাকে, অথবা সৃষ্টির মধ্যে যৌন-আবেদনটাই প্রকট হইয়া উঠে, তবে সেক্ষেত্রে শিল্প অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক টমাস ক্রেভেন বিখ্যাত শিল্পী টিসিয়ানের নিউড্‌স সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছেন তা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। টিসিয়ান সেই সময়টায় হ্যাপস্‌বার্গদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পচর্চার সাধনায় রত ছিলেন—বিখ্যাত সম্রাট চার্লস দি ফিফ্‌থ্‌ এবং তাঁর পরিবারের সকলেরই ছবি তিনি পেইণ্ট করিলেন। ক্রেভেনের মতে—

The nudes painted during these years are voluptuous jobs. They were designed for the cabinets of dukes and cardinals and designed deliberately as aphrodiseaes for conoisseurs·········their appeal its wholly sextual.

At one of them, the venus of urbiuo, Mark Twain was profoundly incensed. The bare flesh he professed to tolerate, but the position of the left hand was the most bra piece of impudicity he had ever looked upon —that is, in public! If literature were allowed such license the human race would soon go to the dogs! Today we smile at Mark Twain's moral indignation, but his criticism has the uncommon merit of honesty: he saw what every one sees in the venus—the left hand—it is the centre of attraction:

শিল্পী রুবেনস সম্বন্ধে ক্রেভেন লিখিয়াছেন:

He loved the nude, make no mistake about that, but he was not obsessed by its sexual enticements; nor did he, under the hallowed disguise of art, stoop to the cheap practice of creating fat to burn the radiant animal fat to burn the imaginations of those who would find in painting a stimulus to their physical desires······The powerful draughts of organised sensuality that blow through his world are clean and pure; the atmosphere is not polluted by the odours of the studio, his love for substantial, sun warmed nakedness —whatever it was that aroused his imagination—was submitted to the sternest intellectual consideration and reduced to law and order, thus his sensuality was dissolved in the currents of a new synthesis in which no single form protrudes suspiciously. There is no false concentration on faces, breasts, or thighs, no sly beckonings to come and behold salacious poses; all forms beat to one colossal tune when an artist is engaged in the mental toil of a great composition, his physical yearnings are lost in the struggle and he has no time for sexual blandishments. Most painters of the nude, devoid of legiti-

mate purpose and unable to frame a conception of any *importance*, busy themselves, *like procurers, supplying marketable flesh like Leonardo da Vinci, he loved all natural* forms."

'স্তন' 'চুম্বন' 'বিবসনা' প্রভৃতি কবিতায় sexual enticementsএর কোন ইঙ্গিত নাই—বরং সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথের love of formsএর দিক্‌টাই অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। রুবেনসের ছবির মতই রবীন্দ্রনাথের এইসব কবিতার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে his passion for life এবং his love for sun-wormed nahedress.

বাঙ্গালী জাতি এবং বাংলাদেশের প্রতি গভীর প্রীতি এবং অনুরাগ মনে মনে পোষণ করিতেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীদের আত্মসচেতন এবং জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টায় রচনা করিয়াছেন 'বঙ্গভূমির প্রতি,' 'বঙ্গবাসীর প্রতি,' 'আবাহনগীত' প্রভৃতি কবিতা। 'চিরদিন' একটি সুসমন্বয়পূর্ণ আধিবিদ্যক শ্রেণীর কবিতা—গভীর দার্শনিক তত্ত্বকে এমন মর্মস্পর্শীভাবে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা এক রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

জয়দেবের মেলা

ভাগবতদাস বরাট

বীরভূম জেলায় জয়দেব কেন্দুবিল্ব অতি মনোরম স্থান। এখানের মেলাও অতি প্রাচীনতম। প্রায় আটশ' বৎসর ধরে পদাবলী রচয়িতা সাধক কবি জয়দেবের পুণ্য নামের সঙ্গে বিজড়িত 'এই' উৎসব। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই সব অনুষ্ঠানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা জাতীয় জীবনের গৌরব বলে মনে করি। তাই এই আলোচনার অবতারণা।

প্রবাদে কথিত যে কবি জয়দেব গোস্বামী গ্রামের পশ্চিমপার্শ্বে কদমখণ্ডীর ঘাটে রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তারপর তিনি কেন্দুবিল্বে সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সে আজ অনেক কাল আগের কথা। সুতরাং এখন ঐ প্রবাদবাণীর সত্যাসত্য বিচার সম্ভব নয়। যে যা বলে তাই মানতে হয়।

অনেকের ধারণা অন্যরূপ। তাঁরা বলেন, তিনি কোন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন নি। এবং বৃন্দাবন যাত্রাকালে কোন বিগ্রহও সঙ্গে নিয়ে যান নি। তিনি রাধাদামোদরের সেবা-অর্চনাদি করতেন। ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবাই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। এখন সেখানে যে বিগ্রহযুগলের পূজা হয়, তা রাধাদামোদর নামে পরিচিত। বিনোদ সেন নামে সেনবংশীয় কোন রাজা এই মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এবং পূর্ব্বে তা সেন পাহাড়ীর শ্যামারূপার গড়ে অধিষ্ঠিত ছিল। ঠাকুর-মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ আজও সেখানে দৃষ্ট হয়।

দিনে দিনে মাস কেটেছে। মাসে মাসে বৎসরের অতিক্রম। আর এই বৎসরের অতিক্রমতায় নানা পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে। কালক্রমে শ্যামরূপার গড় জঙ্গলে পরিণত হয়ে বর্ত্তমান রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছে। এই জনবসতিহীন জঙ্গলে অজয় নদ পার হয়ে সেবাইতগণের নিত্যপূজার নিমিত্ত যাতায়াত সম্ভব হলেও মনে ভয়ের উদ্রেক হত। বর্দ্ধমান রাজ তা জানতে পেরে এই যুগলমূর্ত্তি কেন্দুবিল্বের শূন্য মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রহদ্বয়ের বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমানের তৎকালীন মহারাজা কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের মাতা নৈরানী দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ-সেবা ও মহোৎসবাদি সুনির্ব্বাহের জন্য তিনি কিছু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। উক্ত মন্দির ভক্তকবি জয়দেব গোস্বামীর অবস্থানভূমির কিয়দংশমধ্যে স্থাপিত। কবি যে স্থাবর ভূ-সম্পত্তি রেখে যান, তা গ্রামস্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধিকারী বংশনিকটস্থ ব্রাহ্মণবিধায় প্রাপ্ত হন এবং তদবধি উভয় বংশই ঐ সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছেন।

রাধাবিনোদের অন্নভোগের কোনরূপ ব্যবস্থা নেই। অধুনা এই মন্দির সরকারকর্ত্তৃক সংরক্ষিত। এই মন্দিরের পশ্চিমপ্রান্তে নিতাইগৌর বিগ্রহ-মন্দির। মন্দির-সংলগ্ন আশ্রমশালা ও বহিঃপার্শ্বে কাছারীবাড়ী।

নিতাইগৌরএর জমিদারীর আয় নিতান্ত অল্প নয়। এই জমিদারী একজন মহন্তের অধীনে আছে। রাধারমণ ব্রজবাসী কর্ত্তৃক এই গদি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আজ প্রায় তিন শ' বৎসর আগের কথা। মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত রাধারমণ ব্রজবাসী শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে তীর্থদর্শন মানসে এখানে এসে একটি আখড়া স্থাপন করে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুজীর সেবা প্রকাশ করেছিলেন।

পরে বীরভূমের তদানীন্তন রাজধানী রাজনগরে শ্রীশ্রী-রামচন্দ্র জীউর আর একটি আখড়া স্থাপিত করে সেটিকে কেন্দুবিল্বে স্থানান্তরিত করেন।

কবি জয়দেব যে অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডে বসে অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা ও মন্ত্রজপ করে সিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই প্রস্তরখণ্ড এখন অজয়তীরবর্ত্তী কুশেশ্বর শিব-মন্দিরে রক্ষিত। অনেকে একে ভুবনেশ্বর যন্ত্র বলে থাকেন। কবি জয়দেব প্রত্যহ প্রাতঃকালে কেন্দুবিল্ব হতে ছত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে স্নান করতে যেতেন। ভক্তের অসুবিধা লক্ষ্য করে গঙ্গাদেবী দৈনিক বেলা দশদণ্ড পর্য্যন্ত চিরকাল কদম-খণ্ডীর ঘাটে অধিষ্ঠান করতে সম্মতি জানান। কথিত আছে যে কদমখণ্ডীর ঘাটের আট দশ রসি পূর্ব্বে পদ্মাসনে বসে তিনি গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন। এজন্যে বহু দূর দেশ হতে হিন্দুগণ কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নান করতে সমাগত হন। এবং গঙ্গাতীরে শব-দাহাদির ব্যবস্থা করেন।

প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব কেন্দুবিল্বে মেলা বসে এবং তিনচার দিন এই মেলা চালু থাকে। এই সময় নানা দেশবিদেশ হতে কাতারে কাতারে বহু জনের সমাগমে সারা অঞ্চল মুখরিত হয়ে ওঠে। যাত্রী-দের মধ্যে বৈষ্ণব বাবাজী ও বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। বহু গৃহস্থ-পরিবার আপনআপন বাড়ী থেকে চাল, ডাল, নুন, মসলা এবং তরিতরকারী এনে কদম-খণ্ডীর ঘাটের চারপাশে আখড়া স্থাপন করে বৈষ্ণব বাবাজীদের ভোজন করান। শ্রীক্ষেত্রের মত এখানে জাতি ধর্ম্মের বিচার নেই।

মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে কবি জয়দেবের নামের সঙ্গে বহু আলৌকিক কথা শোনা যায়। দীর্ঘদিন ধরে যা হাজার হাজার ভক্তহৃদয়কে দোলা দিয়ে আসছে তা কল্পনাপ্রসূত হলেও পরম উপভোগ্য।

সেকালে সাধকপ্রবর জয়দেবের নাম শুধু গৌড় নয়, সারা আর্য্যাবর্ত্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা দেশ থেকে গীতগোবিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা জয়দেব কবিকে দেখার মানসে বহুজন ছুটে এসেছে। একদা এক পুণ্যার্থীর দল জয়দেবের গৃহে এসে হাজির হন। কবি তাঁদের কদমখণ্ডীর ঘাটে শ্মশানে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। কিন্তু অতিথিগণ মূর্খতাবশতঃ ভোজ্যদ্রব্য শ্মশানে আহার করতে অস্বীকৃত হলেন। সুতরাং জয়দেব অপর লোকজন আমন্ত্রণ করে ঐ সব ভোজ্য-দ্রব্য বিলিয়ে অবশিষ্টাংশ মাটির নীচে পুঁতে দিলেন। পর বৎসর উক্ত অতিথিগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে জয়দেবের কাছে এসে ক্ষমাপ্রার্থী হন। গোস্বামী প্রভু তাঁদের জানালেন যে কদমখণ্ডীর ঘাটে গত বৎসরের উদ্বৃত্ত যে ভোজ্যদ্রব্য পুঁতা আছে তা যদি তাঁরা তুলে এনে গ্রহণ করেন, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। অতিথি-গণ গোস্বামী প্রভুর এই অভাবনীয় কথা শুনে অবিলম্বে কদমখণ্ডীর ঘাটে গিয়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে গত বৎসরের রান্না-খাদ্য সদ্যকৃত অবস্থায় দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁরা জয়দেবের চরণপ্রান্তে পতিত হলেন। সেই দিনটি ছিল পৌষ সংক্রান্তি। এই অলৌকিক কাণ্ড লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়তেই মহাধুমধামে উৎসব শুরু হয়ে গেল। তদবধি এই উৎসব পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আজও সেই উৎসব চালু। হাজার বছর অতীতের জয়দেবের ললিত প্রাণস্পন্দন নিয়ে যে কয়দিন কদমখণ্ডীর ঘাট উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তা তৎকালীন অমলীন স্মৃতি বহন করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতের মানুষের কাছে এ কাহিনী নিছক কল্পনাপ্রসূত তবু তাঁরা তুচ্ছজ্ঞানে হেয় করতে পারেন কি?

কুশদহের ইতিহাস ঃ হাসিরাশি দেবী প্রণীত—শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্ত্তৃক ১৬ বি, নন্দলাল বসু লেন, কলিকাতা-৩, হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৮, মূল্য চারি টাকা।

মধ্যযুগের শেষে কুশদ্বীপ বা কুশদহ—বর্ত্তমান নদীয়া, চব্বিশপরগণার কিয়ৎঅংশ, প্রাক্ দেশবিভাগের যশোহর জেলার অনেক অংশ—এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ড বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট অঞ্চল ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও ইহার সমৃদ্ধি বজায় ছিল। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প এবং সংস্কৃতিতে ইহার অধিবাসীরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইহার পতন আরম্ভ হয় নানা কারণে যাহার মধ্যে ম্যালেরিয়া সর্ব্বপ্রধান। খরস্রোতা এবং নাব্য নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায়, রোগের তাড়নায় লোকে দেশ ছাড়িয়াছিল। কারখানা-শিল্পের সহিত পরাজিত হইয়া কুটীর-শিল্প মৃত্যুবরণ করিল, ফলে কর্ম্মসংস্থানে গ্রামবাসীকে দেশান্তর হইতে হইল। ইহার উপর ছিল শক্তিমান ভাগ্যান্বেষীদের কলিকাতার প্রতি আকর্ষণ। সোনার দেশ শ্রীহীন হইল, তাহার অতীত গৌরব আজ ইতিহাসের বস্তু। লেখিকা কুশদহের সন্তান, খাঁটুরা গ্রাম তাঁহার মাতৃভূমি।

এই গ্রন্থ শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী লিখিত এবং শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সংকলিত 'খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী' অবলম্বনে লিখিত। মূল গ্রন্থের গল্পাংশ প্রভৃতি বর্জন করিয়া ঐতিহাসিক রূপ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমখণ্ডে আছে দেশের অবস্থান, নদী, খাল, বিল ও বামোড়, বন্যা, খাজনা, ভূ-সম্পত্তি দান, জমিবিলি, দুর্ভিক্ষ, জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, শ্রেণী ও বৃত্তি, সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম, পুণ্য ক্ষেত্র, মেলা, পূজা বা হাজৎ, তেজারতী ও মহাজনী, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও তিতুমিঞার কাহিনী।

দ্বিতীয়খণ্ডে সংস্কৃতির তথ্য স্থান পাইয়াছে—ইহাতে রহিয়াছে পণ্ডিতমণ্ডলীর, গোবরডাঙ্গা জমিদার বংশের এবং বাংলা তথা আধুনিক ভারতের কৃতিসন্তান যাঁহারা এই অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয়।

তৃতীয়খণ্ডে এই অঞ্চলের বিখ্যাত তাম্বুলীসমাজ ও খাঁটুরার দত্ত বংশ ও অন্যান্য (আশ, কোঁচ, রক্ষিত, পাল, দাঁ, কুণ্ডু, বেল, সেন এবং দে) বংশের ইতিহাস আছে।

চতুর্থখণ্ডে লেখিকা মন্দির, লৌকিকধর্ম্ম প্রবর্ত্তক (সত্যপীর, ঠাকুরবর সাহেব, মাণিকপীর, মুস্কিলআসান, ওলাবিবি, পীরহৈদর, দক্ষিণা রায় এবং বিবি চম্পা) খ্যাতনামা মহিলা, জনপ্রিয় কবিয়াল (মধুপাল, মহেশ-কালা, মাতুরায় প্রভৃতি) বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

ইতিহাসের লেখক না হইয়াও কবি এবং সাহিত্যিক-রূপে লেখিকা পাঠকসমাজে সুপরিচিত। তাঁহার প্রথম ইতিহাসগ্রন্থকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাই। ইহা পাঠে কেবল কুশদহ অঞ্চলের তথা খাঁটুরা ও গোবর-

'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'

'প্রবাসী' চিরকালই দেশের কথা ও পল্লীর কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সকল সমস্যা-সমাধানের নির্দেশক এই প্রবাসী। নিরপেক্ষ সমালোচনা সেদিন একমাত্র 'প্রবাসী'ই করিয়াছে। সত্যরক্ষার্থে কঠিন মন্তব্য করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীকেও কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবাসী চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে।

রাজনৈতিক ফাঁদে বাঙালীর দুর্গতি আজ নূতন নয়। সেই কতবছর আগে 'প্রবাসী'ই বলিয়াছে:

"বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মানীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাঙলা-দেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলা-দেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে' যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহারপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, 'ওহে, দেশের জন্য কিছু কর,' তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?" সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর," তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ।" প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭।"

এই দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই 'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'। বিদগ্ধ-সমাজে আজও প্রবাসী আদরণীয়। যদিও কালের প্রভাবে আজ মানুষের রুচি নিম্নগামী। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-অধোগতি লজ্জার কথা!

তাহার অতীত ও বর্ত্তমান অধিবাসীরাই উপকৃত এবং গৌরবান্বিত বোধ করিবেন না। পাঠকেরা অখণ্ডিত বাংলার একখানি পুরাতন আলেখ্য দেখিয়া বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করিতে সক্ষম হইবেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া লেখিকাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

চোখের আলোয়: শংকর মিত্র, ৩৮ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-তিন। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বইখানি উপন্যাসের বাঁধা সড়ক ধরিয়া চলে নাই। কাহিনী একটা গড়িয়া উঠিয়াছে বটে; পরস্পরের ডায়লগের মধ্য দিয়া। বইখানিকে উপন্যাস না বলিয়া বরং একটি কবিতা বলা চলে। তবে কবিতাই হোক বা উপন্যাসই হোক বইখানি সুখপাঠ্য। আমরা সেইদিক দিয়াই বিচার করিব। তিনটি প্রধান চরিত্র—শংখ, সর্বাণী ও অনুতোষ।

সর্বাণী অনুতোষের স্ত্রী। কিন্তু এ বিবাহ সর্বাণীর এক দুর্বল মুহূর্তে সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পর সর্বাণীর চমক্ ভাঙ্গিল। শংখকে সে ভালবাসে—বিবাহের পূর্ব হইতেই ভালবাসে। টি, বি, রুগী জানিয়াই সে ভালবাসে। শংখ নিজেই একস্থানে বলিতেছে: "আমি টি, বি রুগী মায়ের কাছ থেকে এই অসুখটা পেয়েছি। আর একটি অসুখের কথা বলে রাখি, সেটি আমার পৈত্রিক বংশের। বাবার ছিল। আমার তো সেই অসুখের প্রকাশ প্রকট। মাথার অসুখ। পাগল হয়ে যাই। শেষ, একটি অসুখের কথা বলি, এই যুগের কোন বুদ্ধিমান ছেলে কিংবা মেয়ের এই অসুখের হাত থেকে রেহাই নাই। ক্যান্সার। ঐ অসুখটার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আনন্দ-কে পাবো, জীবন-কে পাবো।"

এককথায় শংখ কবি। কল্পনার রাজ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। বাস্তবের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সর্বাণী অনুতোষকে বিবাহ করিয়াছিল, শংখ তখন মেণ্টাল হস্পিটালে। এই নিঃসঙ্গ জীবনকে অতিক্রম করিতেই এক নিরাপদ আশ্রয় সে খুঁজিয়াছিল। সে বোঝে নাই ইহাই একদিন তাহার গলায় কাঁটা হইয়া বিঁধিয়া রহিবে। তাইতো সে অনুতোষকে বলিতে পারিয়াছিল, "পীড়ন করে একটি মানুষের দেহকে বন্দী করা যায়। কিন্তু তার মন?···যে মন একবার যার রংয়ে সেজেছে, তারই রং সে বাঁচিয়ে রাখে।"

তবু সর্বাণী একদিন বলিয়াছে, "শংখ যদি শক্ত হাতে তাকে চেপে ধরে বলত, সর্বাণী, তুমি আমার কাছে থাক। সর্বাণী তাহলে কিছুতেই সরে যেত না।"

সর্বাণী সম্বন্ধে শংখও একটি চমৎকার উত্তর দিয়েছে: "সর্বাণীকে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করেছি। তবু সে আমার কাচে ঘর-সংসার চেয়েছিল। তাতো দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কি পরিচয়ে সে আমার কাছে থাকবে? মানুষের মৃত্যুতে মা বলবে তার সন্তান হারিয়ে গেছে, স্ত্রী বলবে তার বৈধব্য ঘটেছে, সন্তান বলবে সে নিরাপদ আশ্রয় হারিয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের মানুষের মৃত্যুতে সে কি বলবে পৃথিবীর কাছে? তার কি পরিচয় থাকবে—সে কি নিয়ে বাঁচবে? গোপনে তাকে কাঁদতে হবে, গোপনে তাকে বৈধব্যের সাজ নিতে হবে। তাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।"

শংখর মাও একদিন বলিয়াছিলেন, "কোলাহলের এলোমেলো থাকায় যে নিজেকে শান্ত রাখতে পারে না; ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে যে স্বপ্ন দেখতে সাহস পায় না, গুটিগুটি পায়ে মাথা নিচু করে আইনের খাঁচায় ঢুকে নিশ্চিন্ততার আশ্বাস পায়—সে কোনদিন খাঁচা খুলে উড়তে পারবে না।"

চরিত্রগুলি খেয়ালী,-কিন্তু তাদের অস্বীকার করা যায় না। অতি গোঁড়া সংসারের স্ত্রীরাও সর্বাণীকে অসতী বলিবে না, কারণ সর্বাণী কোথাও অস্পষ্ট নয়।

"সর্বাণী অনেকবার নিজের মনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে অনুতোষের কাছে ফিরে যাওয়া যায় কিনা। মনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে সে ক্লান্ত হয়েছে, বিষণ্ণ হয়েছে,—তবু সে বুঝেছে, অনুতোষের কাছে ফিরে যাওয়া যায় না। সে কথাটা ভেবে কষ্ট পেয়েছে, তবু সে মনের কাছে নিজেকে হারাতে পারেনি। অনুতোষের জীবনে সে কোনদিন মিশে যেতে পারবে না, সর্বাণী জানে।"

জানে অনুতোষও। তাইতো শংখ ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিল, অনুতোষ তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও। তখন সে বলিতে পারিয়াছিল, "তুমি না ছাড়লে শংখ, ওকে আমি পাবো না।"

বইখানির একটি টানা ছন্দ আছে, সে নিঃশ্বাস লইতে দেয় না, মনকে রসাপ্লুত করিয়া রাখে। গ্রন্থ-রচনার পক্ষে এই দাবীই তো তার যথেষ্ট। তবে সাধারণ পাঠকে ইহা কিভাবে গ্রহণ করিবে বলা শক্ত।

কত কথা মনে পড়ে: শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৬। চারটাকা।

অতীতের ভারতবর্ষ হইতে বর্তমান ভারতবর্ষের একটা মনেপড়ার ইতিহাস লেখক আলতোভাবে ছুঁইয়া গিয়াছেন। ইহা প্রবন্ধাকারে রমন্যাস—উপন্যাস নহে। সুতরাং গল্পের বালাই নাই, লেখকের দেখা কতকগুলি মানুষকে আমরা দেখিতে পাই বটে—যেমন, মণিদা, নীরা বৌদি, পরাণ ঘোষ, যতীশ পাল প্রভৃতি। ইহারা আসিয়া প্রবন্ধের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রবন্ধ কথা-সাহিত্যের রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। বইখানি সুখপাঠ্য। আশা করি সকলেরই ভাল লাগিবে।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (শিকার : ২৬২ পৃষ্ঠা)

রাজ গোক্ষুর।

শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(শিকার : ২৫৫ পৃষ্ঠা)

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭৫

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় সংহতি সমস্যা

সম্প্রতি যে জাতীয় সংহতি স্বজন হেতু একটা প্রায়-সরকারী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহার আলোচনার ধারা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইল যে জাতীয় সংহতি যেমন করিয়া হউক কংগ্রেসী আদর্শেই স্থাপিত করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে কংগ্রেসী মণ্ডলগুলিকেই রক্ষা করিতে হইবে—জাতীয় সংহতির দশায় যাহা থাকে থাকিবে। আরো প্রকৃষ্ট-ভাবে দেখিলে দেখা যাইত যে জাতীয় সংহতি কংগ্রেস-দলের স্বার্থান্বেষণ আগ্রহেই নানাভাবে নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং সেই সকল রাষ্ট্র কৌশল ও কূটবুদ্ধিজাত কপটতার পথ না ছাড়িয়া দিলে জাতীয় সংহতি কখনও সাধিত হইবে না। ভারতীয় মহাজাতি নানা বৈচিত্র্য বিভেদ থাকিলেও একটা মূল ঐক্যের বৈশিষ্ট বহযুগ হইতে রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহার কারণ যে সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতিগুলির একটা গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যাহার ফলে এই সকল জাতি পরস্পরের সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, কাব্য, নৃত্য, বাদ্য, খাদ্য, বস্ত্র, ভাস্কর্য্য স্থাপত্য প্রভৃতি অনায়াসে ও সানন্দে উপভোগ করিতে সক্ষম হয়। ইহার ভিতরে যে সকল ইতিহাস, ধর্ম্মমত, উপাখ্যান, ললিতকলার আদর্শ ও অবয়ব, রসবোধের স্বভাব ও অপরাপর জন্মগত অকৃত্রিম একসূত্রে গ্রথিত ধরণের যোগ রহিয়াছে সেগুলির পূর্ণ আলোচনা করিলে ভারতীয় জাতি সংঘের সংহতির সহজসাধ্য ভাব আরও সুপরিষ্কার রূপ ধারণ করে। কিন্তু ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে যখন কংগ্রেস ভারত বিভাগ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেন তখন জাতীয়তার অখণ্ডতা নষ্ট হইয়া বিভাগের স্বরূপই প্রকট হইয়া দেখা দিল। ভারতের কংগ্রেসী রাষ্ট্রনায়কগণ তখন দেশকে কতভাবে ও কতভাগে কর্ত্তন করিলে কোন কোন গোষ্ঠীর কতটা লাভ হইতে পারে সেই কথার বিচারে আত্মনিয়োগ

করিলেন। ফলে ভারত নেতাগণ, ইতিহাস, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম ইত্যাদির বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া দেশকে বহুভাগে বিভক্ত করিলেন ও অসংখ্য কংগ্রেসী লোকের এই ব্যবস্থায় দেশবাসীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে ও সগৌরবে দিন গুজরান করিবার একটা সুযোগ হইয়া যাইল। এই বিনা পরিশ্রমে সুখে কাল কাটাইবার ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও সুপরিসর হইতে লাগিল ও লক্ষ লক্ষ লোক বাসস্থান, ভাষা, জাতি (বর্ণ), ধর্ম্ম প্রভৃতি দেখাইয়া নিজ নিজ সুবিধা করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। প্রদেশের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল এবং সরকারী ফিরিস্তিতে সত্যমিথ্যা নির্বিশেষে নানা প্রকার সংখ্যা ছাপাইয়া নানা প্রকার কংগ্রেসী মতলবের প্রমাণ, সরবরাহ হইতে লাগিল। এই সকল মিথ্যার মধ্যে অতি প্রবল ছিল সেইগুলি যেগুলি হিন্দি ভাষার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি চেষ্টার জন্য প্রচারিত হয়। সত্য কথা বলিলে দেখা যাইত যে তথাকথিত হিন্দিভাষা বলিয়া যাহা চালান হয় তাহার মধ্যে অনেকগুলি এমন এমন ভাষা আছে যাহা ঠিক হিন্দি নয়। যথা ভোজপুরী মৈথিলী, মাগধী, ইত্যাদি ইত্যাদি। যথার্থ হিন্দি ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষের জন সংখ্যার শতকরা ১০।১৫ ভাগের অধিক হইবে না। কিন্তু অনেক সরকারী পুস্তকে প্রকাশ করা হয় যে ভারতের হিন্দি ভাষাভাষী জনসংখ্যা মোট জন সংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ। একবার প্রকাশ করা হইল যে পাঞ্জাবী ভাষাও হিন্দি ভাষা। এই হিন্দি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ফলে বহু স্থলে সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্যক্তিদের উপর বহু অন্যায় করা হইল। যথা মানভূম ও সিংভূম জেলায় সেই জেলাগুলি যে চিরকাল বিহার প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের উপর নানাপ্রকার অপমানকর নিয়ম প্রয়োগ করা হইল। কোন কোন বাঙ্গালী লিখিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহাদের পরিবার তিনশত বৎসর বিহার প্রবাসী আছেন। যদিও এ জেলাগুলি প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশের অন্তর্গত। অনেকের জমিজমা নানাভাবে বেহাত হইয়া যাইল। অপ্রিয় আলোচনা না বাড়াইয়া বলা যায় যে হিন্দি ভাষাভাষী প্রদেশগুলির আকারবৃদ্ধি ও সেই সকল প্রদেশে হিন্দি ভাষার প্রচার লইয়া বহু মিথ্যার ও অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল ও হইতেছে। হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হইবে মানিলেও হিন্দি-ভাষাভাষী জাতিগুলির কোন একটি বিশেষ আভিজাত্য স্বীকার করিতে হইবে একথা কেহ কখন বলে নাই, ও বলিলেও কথাটা চলিবে না। সম্প্রতি যে "ইংরেজী হাটাও" আন্দোলন করিয়া হিন্দিভাষীরা বহু অসভ্যতা করিয়াছিলেন তাহাও কেহ সানন্দে মানিয়া লয়েন নাই। অনেক অহিন্দিভাষী ঐ প্রকার অসভ্যতায় হিন্দি ভাষী-দিগের উপর রুষ্টই হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে হিন্দী প্রচার সূত্রে ভারতের জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি না হইয়া খর্ব্বই হইয়াছে। রাষ্ট্র ভাষার অর্থ হইল State Language; জাতী ভাষার অর্থ National Language। কংগ্রেসী হিন্দিভাষীগণ অনেক সময়ই সরলভাবে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন। এই বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। হিন্দি কিছু ভারতবাসীর মাতৃভাষা ও আরো কিছু ভারতবাসীর মাতৃভাষার নিকট-আত্মীয়। হিন্দিকে যদি রাষ্ট্রভাষা অর্থাৎ State Language বা রাজদরবারের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহাদ্বারা একথা ধার্য্য হয় না যে হিন্দি সকল ভারতবাসীর জাতীয় বা National ভাষা হইয়াছে বা হইবে। যেমন ইংরেজী ভারতের জাতীয় ভাষা হয় নাই। হিন্দি শুধু আইন আদালত দফতরের কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে যদি কখন সে যোগ্যতা হিন্দিভাষার মধ্যে জাগ্রত হয়। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের সকল মানবের খরচে হিন্দিভাষায় উন্নতি করিবার সেই চেষ্টাই করিতে পারেন যাহা রাষ্ট্রীয় কার্য্যে হিন্দি ব্যবহারে সাহায্য করিতে পারে। হিন্দি সাহিত্য গঠন অথবা বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দি পুস্তক লিখাইবার ব্যবস্থা সাধারণের খরচে না করানই ন্যায়সঙ্গত। কারণ হিন্দি গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা দার্শনিক নিবন্ধ উন্নত ও সুগঠিত ভাষায় লিখিত হইলে তাহাতে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে কোন সহায়তা সাক্ষাৎ ভাবে হইতে পারে না। এক কথায় হিন্দি ভাষার

উন্নতি শুধু রাষ্ট্রীয় কার্য্যের জন্য যতটা প্রয়োজন সেইটুকুর জন্যই সরকারী অর্থ ব্যয় করিলে তাহা অন্যায় হইবে না।

হিন্দি ভাষার প্রসার করিবার অন্যায় চেষ্টা ও হিন্দি ভাষীদিগকে অন্যায়ভাবে উচ্চস্থানে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে, এই উভয় সন্দেহ ভারতের জাতীয় সংহতি নষ্ট করিতেছে। আইন করিয়া যদি হিন্দি প্রচার বিরুদ্ধতা দমন চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে জাতীয় সংহতি আরই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইবে। প্রদেশে প্রদেশে যে সকল সংখ্যা লঘিষ্ঠ অহিন্দিভাষীগণ আছেন তাঁহাদিগকে জোর করিয়া হিন্দিভাষী করিয়া তুলিবার চেষ্টাও জাতীয় সংহতি সংহারক। অতএব প্রথমত হিন্দি লইয়া কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না করাই বিধেয় ও দ্বিতীয়ত হিন্দি-ভাষী প্রদেশের সহিত অহিন্দিভাষী কোন অঞ্চল না জুড়িয়া রাখা কর্ত্তব্য। যথা বিহারের সহিত সিংভূম মানভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া। এই সকল কথার ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা না করিয়া কথাগুলি ধামাচাপা দিয়া রাখিলে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি হইবে না। এবং এই সংহতির বিরুদ্ধে যাহা কিছু আছে তাহার মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা ইহা প্রচার করাও ঠিক নহে। কারণ হিন্দু-মুসলমানের গোলযোগ যাহা কিছু ঘটে তাহার অনেকাংশই ভারতের জাতীয়তা বোধের সহিত সংযুক্ত নহে। কংগ্রেস যখন ভারত বিভাগ করিয়াছিলেন তখনই ঐ সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সূত্রপাত হয় ও এখনও ঐ জাতীয় গোল-যোগের কেন্দ্র হইল পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্ররো-চনাই সাম্প্রদায়িক কলহের প্রধান কারণ এবং পাকিস্থানকে যতদিন আমেরিকা ও রুশিয়ার খাতিরে ভারত সরকার আসকারা দিতে থাকিবেন ততদিন সাম্প্রদায়িক কলহ থামিবে না। ভারত সরকার কবে নিজ জাতীয়তা সংরক্ষণের ও জাতির সম্মান রক্ষার জন্য উপযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা আমরা জানিনা। আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের গলদ কখন দেশের ভিতরে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিয়া দূর করা যায় না। অতএব ভারত পাকিস্থান সম্বন্ধ যথাযথভাবে সংস্কৃত না হইলে ভারতের সাম্প্রদায়িক সংহতির বিষয়ও সুগঠিত হইতে পারিবে না।

জাতীয় সংহতির বিষয়ে আরও বহু বিষয় আলোচিত হইতে পারে, কিন্তু সে সকল কথার আলোচনা এই স্থলে সম্ভব নহে। সেই জন্য এই আলোচনা এই স্থলেই শেষ করা হইল।

অর্থনীতি ও প্রদেশ গঠন

ভারতের যে সকল প্রদেশ গঠিত হইয়াছে সেইগুলির কোন কোনটির জনসাধারণের মধ্যে ভাষার দিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীর সমাবেশ দেখা যায়। যথা বিহারে বহু বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাস। ইহার কারণ ভাষার দিক দিয়া বাংলার কোন কোন জেলা বিহারের সহিত সংযুক্ত করা আছে বৃটিশ আমল হইতেই এবং স্বাধীন ভারতের নেতাগণ সেই ব্যবস্থার সংশোধন করেন নাই। কারণ অর্থনৈতিক। বিহারের অপরাপর জেলার অর্থ-নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত নহে এবং মানভূমের কয়লাখনি বা সিংভূমের ইস্পাত ও কলকজার কারখানা না থাকিলে বিহারের আর্থিক অবস্থা বিশেষ অবনত হইয়া পড়ে, ও সেইজন্য ভাষা যাহার যাহাই হউক বিহারের বাঙ্গালীরা নিজবাসভূমে পরবাসী হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবেনই। সোসিয়ালিজমে শুনা যায় ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার পয়দা হয়; কিন্তু আমা-দিগের সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণের রাষ্ট্রে কখন কখন স্থানে স্থানে ভাষা, জাতি বা ধর্ম্ম প্রবল হইয়া দেখা দেয়। ইহার কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের প্রতিষ্ঠা। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, ভাষা ইত্যাদির মাহাত্ম্য ভারতীয় রাষ্ট্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে। কে কাহার সন্তান, কে কোন গোষ্ঠী বা জাতির লোক অথবা কাহার ভাষা রাজভাষার সহিত কতদূরের সম্বন্ধে আবদ্ধ, এই সকল কথাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে মূল্যবান। এইখানেই প্যাটার্ণ বা নক্সার শক্তি। ইহাতে সুবিধামত কার্য্যপন্থা অদল-

বদল করা চলে।, কোন আদর্শের পথ ধরিয়া পড়িয়া থাকার আবশ্যক হয় না। অন্য পথেও চলা যায়। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা চলে। সাধারণতন্ত্রের নামে ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখা চলিতে পারে। সমষ্টিবাদী সমাজের ঠিকেদার হইয়া ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের অবাধ আহরণ করা যাইতে পারে। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে পরের নিকট মস্তক বিক্রয় করা সঙ্গত বিবেচিত হয়, মিথ্যা সত্যের রূপ ধারণ করে ও যাহা নাই তাহাও আকার ধারণ করিতে পারে।

মধ্যকালীন নির্ব্বাচন

বাংলার জনসাধারণকে বোঝান যাইতেছে যে মধ্যকালীন নির্ব্বাচনের কার্য্য যতশীঘ্র সম্পন্ন হইয়া মন্ত্রীশাসন পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইবে, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা ও তজ্জাত প্রগতি ততই শীঘ্র বাঙ্গালীরা উপভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। বাংলা দেশ ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা বাঙ্গালীকে শিখাইবার প্রয়োজন হয় না। মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করিবার অধিকার কি তাহা কারারুদ্ধ মানুষকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। যে দেশের মানুষ বহুকালাবধি কার্য্যক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বেকার অবস্থায় দিন কাটায়, অর্থের অভাবে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারে না, আধপেটা খাইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ও চিকিৎসার ঔষধ পায় না তাহাদিগের স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝিতে দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সেই স্বাধীনতা লব্ধ যে প্রগতি তাহাও ক্রমশঃ সমাজের সকল ব্যক্তিকে শুধু সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে শিখাইতেছে। কিছু পাওয়া যাউক অথবা না যাউক সংযত-ভাবে "কিউ" বাঁধিয়া দাঁড়ানটা একটা মহাপ্রগতির পরিচায়ক। "কিউ"-এর বাহিরে থাকিয়া চাউল সংগ্রহ করিলে সাজা হইবে। গম সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অলঙ্ঘ্য নিয়মের তাড়নায় মিষ্টান্ন ভক্ষণ অসম্ভব, সপ্তাহের কোন কোন দিন সাধারণ ভোজনালয়ে মাংসাহার অথবা অন্নগ্রহণ বন্ধ। নানান অবস্থার নানান সুবিধা উপভোগ স্বাধীনতার নিয়ম অনুসারে নিবারণ করা আছে। দেশবাসীর যদি আর্থিক অবস্থা কিছু উন্নত হয়, কাহারও কাহারও; তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তির দুর্ভোগের সীমা থাকে না। চোর, পুলিশ, ট্যাক্সের পেয়াদা, ভোটের দালাল, চাঁদা আদায়ের সবল অভিযান, শ্রমিকদের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিলে ঘেরাও ও অপরাপর উন্নত উপায়ে সেই সম্বন্ধ সংস্কার ব্যবস্থা ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্বাধীনতা ও প্রগতির সংঘাত ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের পরে ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছে এবং মন্ত্রীমণ্ডলী যতই পূর্ব্বযুগের ত্যাগের আদর্শ হইতে সরিয়া গিয়া পেশাদার রাষ্ট্রনেতা জাতীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন দেশবাসীর অবস্থা ততই শাসন-নিয়মভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় কিছু কালের জন্য মন্ত্রীরাজত্বের অবসান হইয়া শুধু ভেজাল-বিহীন আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষের স্বাধীনতা পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যাইলেও প্রগতির তোড়ে কিছুটা মন্দা পড়াতে সুখ বৃদ্ধি না হইলেও স্বস্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলা যায়। সুতরাং বাংলাবাসী জনসাধারণ মন্ত্রী রাজত্বের শীঘ্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উৎসুক বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র ভোটাভুটি চাহিতেছেন তাঁহারা রাজত্ব ফিরিয়া পাইলে নিজেরা লাভবান হইবার আশাতেই দেশবাসীকে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। দেশবাসীর লাভের কথা তাঁহারা পূর্ব্বেও ভাবেন নাই, এখনও ভাবিতেছেন না।

যে কয়টি রাষ্ট্রীয় দল আছে সে সবগুলির নেতৃত্বই পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে এবং প্রার্থীদিগের সংখ্যা ও পরিচয় যতটা জানা যাইতেছে, ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে। অর্থাৎ আবার নির্ব্বাচন হইলে যে নূতন কোন প্রতিভা রাষ্ট্রক্ষেত্রে দেখা যাইবে এরূপ লক্ষণ বিশেষ কোথাও নাই। যতটা জানা যায় পূর্ব্বের যোদ্ধারাই পুনর্ব্বার নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিজ রণ-কৌশল ও চাতুর্য্য দেখাইয়া

জয়লাভ চেষ্টা করিবেন। অর্থাৎ জাল নির্বাচকের মেকী ভোটের উপর প্রতিনিধিদিগের জয় পরাজয় আবার নির্ভর করিবে। মিথ্যার বন্যায় সত্য কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা মিলিবে না। ঝুটো আশা দিয়া নির্বাচকদিগকে বোঝান হইবে যে "রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সর্ব্বস্ব" বা অপর কোন জনহিতপ্রাণ দলকে জয়যুক্ত করিলে তাঁহাদিগের কি কি লাভ হইবে। পূর্ব্বে তাঁহারা কত পরোপকার করিয়াছেন তাহারও একটা মিথ্যা ফিরিস্তি সকলের নিকট পেশ করা হইবে। কিন্তু আসল রাষ্ট্রনীতি হইবে নিজেদের মতলব সিদ্ধি। এই বিষয়ে সকল রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে পরস্পরের সহিত একটা গভীরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সকলেরই আগ্রহ একমুখো। স্বার্থরক্ষা কেমন করিয়া হয়। এবং এই স্বার্থরক্ষা আবার বহুমুখী। কত উপায়ে কত ভাবে সাধারণের খরচে কত আপনজনের লাভ হইতে পারে এই চিন্তাই রাষ্ট্রনেতাদিগের মনে সদা জাগ্রত। ফলে নানাভাবে সাধারণের অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের কোন সুবিধার আয়োজন না করিয়া শত সহস্র নিষ্কর্মা লোকের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বিগত ২০।২১ বৎসরে যে দেশের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই ও সহস্র সহস্র কোটি মুদ্রা ঋণ করিয়া অল্পসংখ্যক বিশেষ বিশেষ লোকের সুবিধা করা হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদিগের সাধারণতন্ত্রের বিচিত্ররূপ। যতদিন না আমাদিগের দেশনেতাদিগের মধ্যে দেশের উন্নতির জন্য সত্য অনুরাগ জাগ্রত হয় ততদিন জনসাধারণ নির্বাচন করিয়া লাভবান হইবেন বলিয়া আশা করা ভুল। অবশ্য যদি আমলাতন্ত্রই বহুকাল সচল থাকিয়া যায় তাহাতেও সাধারণের লাভের সম্ভাবনা অল্পই। ইহার কারণ যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের পরিচালনা মূলত কংগ্রেসদলের হস্তে রহিয়াছে এবং কংগ্রেসদলের সকল দোষই প্রদেশ শাসন কার্য্যে প্রক্ষিপ্তরূপে দেখা যাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং অধিককাল বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র চালু রাখাও বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। সাধারণের মঙ্গল হইত যদি নূতন নির্ব্বাচন হইবার পূর্ব্বে বাংলার জনসাধারণ নিজেদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ মানবদিগের মধ্যে কিছু লোককে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাইতে পারিতেন ও যদি দলবদ্ধভাবে সেই সকল ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ভোট দিবার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে বাংলা বা অন্য প্রদেশেই উন্নত ও সুচিন্তিত কোন নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে সকল দুর্নীতির প্রচলন কায়েমিভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলির প্রাবল্য বজায় থাকিলে কোন গুণী ব্যক্তিই নির্ব্বাচিত হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা চলে না। রাষ্ট্রক্ষেত্রের দুর্নীতি ও সাধারণের সংহতিহীন "যা হইবার হইতে দাও" ভাব দেশের সকল দুর্দ্দশার মূলে রহিয়াছে। এই কারণে ইংরেজীতে যে বলে যে a nation gets the kind of government that it deserves, অর্থাৎ সকল জাতিই নিজ নিজ দোষগুণ অনুপাতে শাসন ভোগ করিয়া থাকে। বাঙ্গালীও নিজ দোষেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মফল উপভোগ করিতেছে। এই অবস্থা উন্নততর করিতে হইলে নিজেদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক হত্যা

সুনীতি বা ধর্ম্মের দিক দিয়া কোনও প্রকারের হত্যারই সমর্থন করা যায় না। যেখানে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যাক্রমণ করিলে আক্রমণকারী হত হয়, সেখানে সেই কার্য্য হত্যা বলিয়া গণ্য হয় না। যুদ্ধ যদি আইনত ভাবে পরস্পরকে জ্ঞাত করিয়া আরম্ভ করা হয় তাহা যুদ্ধের ফলে যাহাদিগের মৃত্যু হয় তাহাদিগকেও হত্যা করা হইয়াছে বলা যায় না। রাজনৈতিক কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আইনভঙ্গ শোভাযাত্রা বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতির জন্য অস্ত্র চালনার ফলেও কাহারও মৃত্যু হইলে তাহাও হত্যা বলিয়া বর্ণিত হইবে না। কারণ হত্যা কথাটির আইন ও ভাষাগত অর্থের সহিত ইচ্ছাকৃতভাবে ও পূর্ব্ব হইতে মতলব করিয়া কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তি

বিশেষদিগের হননের চেষ্টার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কোন ব্যাপক প্রাণনাশক আক্রমণ যদি কোন বিশেষ মানুষ বা মানুষদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চালিত না হয় তাহা হইলে সেই জাতীয় আক্রমণ হত্যার চেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু যদি একদল সশস্ত্র লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে থাকিলেও কোথাও আর একদল সশস্ত্র লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয় ও কোন কোন লোকের সেই আক্রমণের ফলে মৃত্যু হয় তাহা হইলে সেই আক্রমণকে হত্যা চেষ্টা বলা যাইতে পারে। যথা জালিওয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ড।

রাজনৈতিক হত্যার অর্থ তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অপর কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টিকে পূর্ব্ব হইতে মতলব করিয়া হত্যা করিবার ইচ্ছায় আক্রমণ করিয়া প্রাণে মারিলে ও সেই কার্য্যের মূলে কোন রাজনৈতিক কারণ থাকিলে সেই হত্যা রাজনৈতিক হত্যা। ইতিহাসে রাজনৈতিক হত্যার কথা অনেক আছে। পূর্ব্বে প্রধানত উৎপীড়িত প্রজাগণ উৎপীড়ক রাজা অথবা রাজকর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিতেছে এইরূপ ঘটনাই রাজনৈতিক হত্যার নিদর্শন বলিয়া লিখিত হইত। পরে ক্রমশঃ মতলব লইয়া মানুষে মানুষে মতদ্বৈধের সূচনা হইতে আরম্ভ হয় ও বহু জনহিতকারী রাজনৈতিক নেতাকেও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ হত্যা করিতে আরম্ভ করে। এই সকল হত্যার ইতিবৃত্ত চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ হত্যার ষড়যন্ত্র খুব ন্যায়সাপেক্ষ ছিলনা ও হত্যার ফলে হত্যাকারীদিগের বা দেশের সাধারণের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। খৃঃ পূর্ব্ব যুগে যাঁহারা রাজনৈতিক আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ ও রোমের সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নাম উল্লেখযোগ্য। উভয় হত্যারই মূলে ছিল যাহারা তাহাদিগকে ঠিক উৎপীড়িত প্রজা বলা যায় না। হত্যার ফলে হত্যাকারীদিগের কোন সুবিধাও হয় নাই। রাজত্বের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব আহরণার্থে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করা সেকালে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। হত্যাকার্য্যও এখন যেরূপ পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রীয়দলের লোকেরা করে তখনও সেইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যাধিকারলোলুপ অভিজাতগণ করিত। মধ্যযুগে ও আধুনিককালে যে সকল হত্যাকার্য্য করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে রাজার নির্দ্দেশে ধর্ম্মযাজক টমাস এ বেকেটের হত্যার কথা বিশেষ করিয়া বলা যায়। রাজাদিগের মধ্যে প্রাণ যায় স্কটল্যাণ্ডের প্রথম জেমস-এর ও ঐ দেশেরই তৃতীয় জেমসের। ফ্রান্সের তৃতীয় হেনরি ও চতুর্থ হেনরির কথাও বলা যায়। পরে রুশিয়ার প্রথম পল ও দ্বিতীয় এলেকজাণ্ডারের হত্যা ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের নেতা-দিগের মধ্যে মারাকে একজন স্ত্রীলোক হত্যা করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদিগের মধ্যে এব্রাহাম লিঙ্কন, জে, এ, গারফিল্ড, ডবলিউ ম্যাকিনলি ও জে, এস, কেনেডি রাজনৈতিক ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। যাঁহারা স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সকল কিছুই ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ হত্যাকারীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। যথা কম্যুনিষ্ট নেতা লিওঁ ট্রটস্কি ও মহাত্মা গান্ধী। দুই একটি হত্যার ফলে পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সেইগুলির মধ্যে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের কারণ আর্চ ডিউক ফ্রানসিস ফার্ডিনান্ডের হত্যার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

রাজনৈতিক মতামত রীতিনীতি ও পদ্ধতির সহিত জড়িত কারণে রাজামহারাজা রাষ্ট্রনেতা রাষ্ট্রীয় দলপতি প্রভৃতিকেই যে শুধু গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছে তাহা নহে। সমাজ সংস্কার সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ শোধন ও অপরাপর বিষয় ঘটিত কারণেও মহৎ উচ্চমনা লোকেদের প্রাণহানি হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকা দেশের দুইটি হত্যার মূলে দেখা যায় ঐ দেশে শ্বেত ও কৃষ্ণকায় বিচ্ছেদ দূর করার চেষ্টা লইয়া প্রবল মতান্তর। ডাঃ মার্টিন লুথার কিং কৃষ্ণকায় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি নানাভাবে শ্বেত ও কৃষ্ণকায়দিগের ভিতরে মিলন ও সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতেন ও তাঁহার আশা ছিল একদিন উভয় জাতি একত্র ভ্রাতৃভাবে আমেরিকায়

বসবাস করিতে সক্ষম হইবে। তিনি কৃষ্ণকায়দিগের উপর নানান অত্যাচার হইলেও তাহাদিগকে অহিংস-ভাবে নিজেদের ন্যায্য অধিকার লাভ চেষ্টা করিতে শিখাইতেছিলেন। এই কারণে তিনি শ্বেত ও কৃষ্ণের রণভূমি আমেরিকাকে শান্তির কেন্দ্র করিয়া তুলিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রবার্ট কেনেডি অগাধ সম্পদের অধিকারী ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে সফলকাম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমেরিকার কৃষ্ণকায়-দিগকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে শ্বেতকায়দিগের সহিত সমান অধিকার দিবার পক্ষপাতি ছিলেন ও ঐ কারণে তাঁহাকেও হত্যা করা হয়। তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কেনেডির ভ্রাতা ছিলেন। রাষ্ট্রপতি কেনেডিও উদার মতামতের জন্য হত্যাকারীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। প্রচলিত নীতির বিপরীত বিশ্বাস অথবা সমাজ সংস্কার আগ্রহ থাকিলে মানুষকে অনেক সময়ই বিপদের মুখে পড়িতে হয়। ধর্ম্মমতের জন্য যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের সংখ্যা লক্ষের হিসাবে গণনা করা হয়। রাষ্ট্রমত আজ-কাল অনেক সময় ধর্ম্মমতের সমতুল্য শক্তিতেই মানব-মনকে আলোড়িত করে। রাষ্ট্রমতের জন্যও যে মানুষ মানুষকে প্রাণে মারিতে অগ্রসর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। রাষ্ট্রমত অনেক সময়ই ধর্ম ও নীতির সহিত সংযুক্ত থাকে ইহাও দেখা যায়। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুতঃ তাহা ধর্ম্ম বা নীতির কথাই ছিল। মার্টিন লুথার কিং ও রবার্ট কেনেডির মতবাদ রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সাম্য লইয়াই ছিল; কিন্তু মূলতঃ সেই মতবাদ ধর্ম্ম ও ন্যায়ের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সত্য ও মিথ্যার যে সংগ্রাম পৃথিবীর মানব-সভ্যতার আরম্ভকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; আজকালকার রাষ্ট্রমতের দ্বন্দ্ব সেই একই সংগ্রামের অঙ্গ।

রেলে দুর্ঘটনা

প্রায়ই শোনা যায় রেলের গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইল অথবা লৌহবর্ত্মন ছাড়িয়া গাড়ী বাহিরে পড়িয়া উল্টাইয়াছে; কিম্বা বৈদ্যুতিক তারের গোলমাল থাকায় আগুন লাগিয়া সবকিছু পুড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা ঘটনার পরে অনুসন্ধানকার্য্য সমাধান করিয়া কি কারণে ঐরূপ হইয়াছে স্থির করেন, তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে মানুষের দোষেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। মানুষ, অর্থাৎ রেলকর্মীগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া, ভুল করিয়া অথবা কাজ না শিখিয়া কাজের ভার লইয়া দুর্ঘটনার কারণ হইয়া থাকে। মানুষের দোষেই অধিক দুর্ঘটনা ঘটে; অন্যান্য কারণ, অর্থাৎ যে সকল কারণের উপর মানুষের হাত নাই, যাহা থাকে, তাহার জন্যও কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়া থাকে। এই যে মানুষের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা, অবহেলা ও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়-কার্য্য করা, যাহার ফলে প্রতিবৎসর বহু রেল দুর্ঘটনা ঘটে ও বহুলোকের প্রাণ যায়, আঘাত লাগে, সম্পদ নষ্ট হয়; ইহার মূলে যাহারা আছে, তাহাদিগের কোন শাস্তি হইতেছে বলিয়া কখনও কেন শোনা যায় না? কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির প্রাণহানি বা অপর কোন ক্ষতি হইলে যাহাদের দোষে তাহা হয় তাহার সাজা হইবার ব্যবস্থা সর্ব্বদেশের আইনেই আছে। ভারতবর্ষের আইনেও সেইরূপ সাজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কাহারও সাজা হইতেছে বলিয়া বিশেষ কোন খবর কখন প্রকাশিত হয় না। হইতে পারে যে দোষীর সাজা হয় কিন্তু সংবাদ প্রকাশিত হয় না। আর হইতে পারে যে রেলের কর্ম্মীসংঘের অপ্রিয়কার্য্য করিতে উচ্চ রেল কর্মচারীগণ নারাজ বলিয়া অপরাধী-গণ বিনা শাস্তিতে অবাধে অপরাধ করিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ যদি হয় তাহা হইলে তাহার কোন প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। রেলের যাত্রীগণের তরফ হইতে রেলওয়ের নামে নালিশ যে কোন লোক করিতে পারেন। কারণ, রেলে যাতায়াত বিপদজনক হইলে সকলেরই প্রাণের আশঙ্কা বৃদ্ধি হয় এবং যদি রেলের কর্ম্মচারীদিগের দোষেই তাহা হয় তবে জন-সাধারণ দাবী করিতে পারেন যে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি-দিগকে সাজা দেওয়া এবং কার্য্য হইতে অপসৃত করা

অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর রেলমন্ত্রীর নিকট চাওয়ার অধিকার আমাদিগের সকলেরই আছে।

হিন্দী প্রচারে কূটবুদ্ধি

হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে ভারতে ব্যবহৃত হইবে বলিলে ইহা বুঝায় না যে হিন্দী ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা। ভারতের মানবের মূলতঃ এক সভ্যতা ও কৃষ্টি এই কারণে যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত উহা পূর্ব্বকাল হইতে সংযুক্ত আছে। সেই পূর্ব্বকালীন সভ্যতা ও কৃষ্টিও ভারতের সকলজাতির মূল সভ্যতা ও কৃষ্টি। জ্ঞানের ও শিল্পকলার ক্ষেত্রের সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। পরে, যখন মুসলমানদিগের আগমনের সময় পারস্য দেশের কৃষ্টি ভারতের কৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া এক নূতন কৃষ্টির সৃষ্টি হয়, তখনও ভারতের সকল জাতির মধ্যেই সে কৃষ্টি প্রবেশ করে। কিন্তু সংস্কৃত অথবা ফারসী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা কখনও হয় নাই। ভারতীয় মানব সর্ব্বদাই জ্ঞান কিম্বা শাসনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত, ফারসী অথবা ইংরেজী ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে কিন্তু গৃহে ও বাজারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাই চালিত হইয়াছে। এই প্রাকৃতগুলিই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূল উৎস। এইজন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কথিত ও লিখিত ভাষা আছে যদিও রাষ্ট্র শাসনক্ষেত্রে ভারতে বহুকালাবধি কোন একটা বিশেষ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাষা যখন সংস্কৃত, ফারসী অথবা ইংরেজী ছিল তখন ঐ ভাষাগুলি ভারতের সকল মানবের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের ভাষা ছিল না।

এখন যদি আমরা শাসনক্ষেত্রে হিন্দী ব্যবহার করি তাহা হইলে আমরা শুধু রাষ্ট্রকার্য্যে ঐ ভাষা ব্যবহার করিব। ঐ ভাষাকে অন্য সকল কার্য্যে ব্যবহার করাইবার চেষ্টা যদি হিন্দী ভাষাভাষীগণ করেন তাহা হইলে সে চেষ্টা সকল অহিন্দীভাষীরাই প্রতিরোধ করিবেন। হিন্দীর বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাহাতে এখন কি শুধু শাসনকার্য্যও ঐ ভাষায় চালান যায় না। পরে যাইবে কি না তাহাও বলা যায় না। সভ্যতা ও কৃষ্টির বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় হিন্দী চালান আরই অসম্ভব। কারণ সংস্কৃত, ফরাসী অথবা ইংরেজীর সহিত হিন্দীর কোন তুলনা হইতে পারে না। সংস্কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ পরিণত সকল জ্ঞান ও বিদ্যার আধাররূপে কার্য্যকরী ভাষা। ইংরেজীও প্রায় সেইরূপ ভাষা। ফারসী নিজকালে নিজকার্য্য যথাযথভাবে চালাইয়া লইতে সক্ষম ছিল। হিন্দী বর্ত্তমানে অর্দ্ধগঠিত, অর্দ্ধশুদ্ধ ও অর্থ প্রকাশে অসম্পূর্ণতা ও অনিশ্চয়তা দোষদুষ্ট। এই কারণে হিন্দি এখনও রাষ্ট্রভাষা হইয়াও হয় নাই। কারণ হিন্দীকে তর্জ্জমার সাহায্যে গড়া হইতেছে ও হিন্দীর শব্দার্থ ক্রমাগতই বদলাইতেছে অথবা বহু অর্থের প্রকাশহেতু নূতন নূতন হিন্দী শব্দের সৃষ্টি চেষ্টা চলিতেছে।

এই সকল দোষ দূর না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন শাখায় ও হিন্দী ভাষাভাষী কোন কোন প্রদেশে হিন্দী চালাইবার নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে, যে সকল চেষ্টার সমর্থন করা যায় না। যথা টেলিফোনে কলিকাতার টেলিফোনকর্ম্মীদিগকে হিন্দী বলাইবার চেষ্টা। হিন্দীতে টেলিগ্রাম পাঠাইতে অনুরোধ করা। রেলওয়ের কর্ম্মচারীগণের অযথা হিন্দী বলিয়া নিজেদের ও অপরকে বিপর্য্যস্ত করা। "ন্যাশনাল" রাজপথগুলিতে দূরত্বজ্ঞাপক সংখ্যাগুলি হিন্দীতে লেখা; যদিও যাহাদিগের সাহায্যের জন্য ঐগুলি লেখা হয় তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ৫ জনও হিন্দী পড়িতে পারে না। কূটবুদ্ধির সাহায্যে হিন্দী প্রচার হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এ বৃথা চেষ্টা কেন?

সাহিত্যে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ধ্বনি কাব্যের মুখ্য ব্যঞ্জনা। ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত সকলেই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। প্রতিধ্বনি কাব্যের মুখ্য ব্যঞ্জনাকে অতিক্রম করে অভিব্যক্ত সূক্ষ্মতম অর্থ সাহিত্যে। প্রতিধ্বনির অর্থ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয়ের আবির্ভাব।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে ধ্বনির চরম উৎকর্ষ দেখা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অর্থের সাঙ্কেতিকতা সুদূর-প্রসারী। কিট্‌স্‌ ও কালিদাসের রচনার তুলনা করলে সে-কথা বোঝা যায়। পাশ্চাত্য-সাহিত্যরসে বাঙালি-জাতির দীক্ষাগুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োগ-কৌশলে কালিদাসের রচনার একটি অতি সাধারণ শ্লোক, যার মধ্যে ধ্বনি আছে কিনা সন্দেহ, কি ভাবে রোমান্টিক প্রতিধ্বনিতে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে তার করুণ-রঙিন উদাহরণ রাজসিংহ উপন্যাসে সঙ্কলিত। কালিদাস লিখেছিলেন কুমারসম্ভব কাব্যের চতুর্থ সর্গে :—

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা সমদুঃখামিব কুর্বতীস্থলীম্ ॥

"তখন পুনর্বার বিহ্বলা বসুধাকে আলিঙ্গনবশত ধূসরস্তনী, আলুলায়িতকুন্তলা তিনি বনভূমিকে সমদুঃখী ক'রে বিলাপ করেছিলেন।"

এই শ্লোকের ছিন্নাংশ "মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল" বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে অস্তরবির রাঙা আলোর রঙিন সুষমা আহরণ করেছে :—

"যুদ্ধের পর জেবউন্নিসা শুনিল, মোবারক যুদ্ধে মরিয়াছে। তখন সে বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিল, উদয়সাগরের প্রস্তরকঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিল—

বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণ মূর্ধজা ॥

জেবউন্নিসার সেই কান্না পাঠককে মুহূর্তে করুণার্দ্রচিত্ত ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভব রতিবিলাপসঙ্গীতে পূর্ণ ক'রে তোলে, পাঠকের মন এক নিমেষে হরপার্বতীর প্রেমের পৌরাণিক কাহিনীর যুগ, কালিদাসের কাল ও মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই চিরন্তনী বিরহিনী প্রিয়বিয়োগকাতরা রমণীর প্রাণের কান্না শোনায় আবিষ্ট হয়ে যায়। এরই নাম সাহিত্যে প্রতিধ্বনি। বাংলা সাহিত্যে এমন রসসিদ্ধি খুব কম শিল্পী লাভ করেছেন; মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ তাঁর রচনায় অর্থের এমন সুদূরপ্রসারী প্রতিধ্বনি তুলতে পেরেছেন কি না, সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন এক নিমেষে কালিদাসের রচনার রেনেসাঁস সাধন করেছেন, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। এর মতো সঙ্গীত প্লাবন না থাকলেও ভিক্তর য়্যুগোর একটি রচনায় প্রায় অনুরূপ করুণ দীর্ঘশ্বাসের ঝাউমর্মর গানের রেশ শোনা যায়। লে মিজেরাবল উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি লিখেছেন :—

Il dort. Quoique le sort fut pour lui bien etrange,
Il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange,
La chose simplement d'elle-meme arriva
Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.

"সে নিদ্রাগত। যদিও তার ভাগ্য বিচিত্র ছিল, তবু সে প্রাণধারণ করেছিল। যখন তার প্রিয়তম আর

রইল না তখন সে মারা গেল। দিনের শেষে রাতের মতো নিজে থেকেই ব্যাপারটি সহজে সমাধা হয়েছিল।"

আধুনিক কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়কালে ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির কথাও বলতে হবে। হুগো বা য়ুগোর কবিতায় জাঁ ভালজাঁর যে জীবনাভাস প্রতিফলিত তা সাহিত্যে প্রতিধ্বনির উদাহরণ। এ ধ্বনি বনাম রসের তর্ক নয়। সাহিত্যে প্রতিধ্বনিকে ইচ্ছা করলে রস ব'লে চালানো যায়। কিন্তু শুধু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত উপায়ে রস বলে ব্যাখ্যা করলে এই প্রতিধ্বনির স্বরূপ ঠিক বোঝানো যাবে না।

সংস্কৃত কবি জ্ঞানত রূপবন্ধকে গৌণ মনে করেন না। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিক রূপবন্ধকে অগ্রাহ্য ক'রে কাব্যের নিগূঢ় মর্মকথাটি ফুটিয়ে তুলতে চান। এখানে মামুলি রসবিশ্লেষণের সঙ্গে প্রতিধ্বনির সূক্ষ্ম ভাবগত পার্থক্যের সূত্রপাত।

সংস্কৃত কবির ছন্দের অতিরিক্ত সূত্রবদ্ধতা তাঁর রূপবন্ধপ্রীতির প্রমাণ। এই বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও নিগূঢ় ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলায় তাঁর কৃতিত্ব। তিনি কাব্য-প্রেরণা অনুসারে ছন্দঃ পরিবর্তন করতে পারেন না। তাঁকে আদ্যোপান্ত এক ছন্দেই কাব্যের এক সর্গ রচনা করতে হয়। অনুরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্য-কবির ভঙ্গি-পরিবর্তনের স্বাধীনতা অবাধ। ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, সাঙ্কেতিকতা সৃষ্টি যেমন পাশ্চাত্যকবির মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রাচ্য-কবির তেমন নয়। পাশ্চাত্যকবি তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে ব্যাকরণ লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত, যেমন হপকিন্স্। তার ফলে পাশ্চাত্য-সাহিত্যে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পথ চির উন্মুক্ত। সেখানে সৃষ্টির রস-উৎস কখনও শুকিয়ে যায় না। আধুনিক কবিতায় ছন্দ ও অলঙ্কারাদির ব্যাপারে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দাবির উদ্দেশ্য, অন্তরের ছবির সুষ্ঠু প্রকাশ-সাধন, স্বৈরাচার নয়। অবশ্য, ব্যঞ্জনার উৎকর্ষের দিক থেকে এই স্বাধীনতার সার্থকতা বিচার করতে হবে। যদি ভাব ও রূপ-ব্যঞ্জনা সার্থকতর না হয়, তা হলে এই স্বাধীনতা ব্যর্থ।

তির্যক্ প্রকাশভঙ্গির প্রয়োগ-সার্থকতা বিচারকালে *দেখতে হবে যে, কবি একটি রসপূর্ণ প্রতিবেশ রচনা* করতে পেরেছেন কি না। কেবল বুদ্ধির শাণিত তরবারি-চালনার মূল্য সাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ধ্বনি অনেকটা এই তরবারিক্রীড়ার সগোত্র। সুধীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত বর্ণিত দীপ্তিকাব্য এই পর্যায়ভুক্ত। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন তুলবার শক্তি তথাকথিত দীপ্তিকাব্য বা ধ্বনিপ্রধান কাব্যের থাকে না।

আধুনিক সাহিত্যিক তাঁর রচনাবৈশিষ্ট্যের যথাযথ প্রকাশের পথে মামুলি অলঙ্কারশাস্ত্রকে বিঘ্ন মনে করেন। তাঁর মতে, সব ভাব অলঙ্কারশাস্ত্রের কাঠামোয় ঢালা যায় না। আধুনিক কাব্যে ছন্দোবিস্তারকে সম্পূর্ণ করতে হলে ভাবের পারম্পর্য চাই। যেখানে কবিতা আকস্মিক ইঙ্গিতের সমষ্টি, সেখানে গানে তালফেরের মতো কাব্যে ছন্দ বদ্‌লে যেতে বাধ্য। আলঙ্কারিক-প্রয়োগ সম্বন্ধেও সে-কথা প্রযোজ্য। অলঙ্কারচন্দ্রিকা বা কাব্যনির্ণয়ের সূত্র দিয়ে সাহিত্যের সব গভীর ভাব প্রকাশকে মাপা সম্ভবপর নয়। ধ্বন্যালোকের আলোয় প্রতিধ্বনির সুকুমার সূক্ষ্ম প্রায়-অতীন্দ্রিয় জগৎ ধরা পড়ে না।

এ কথা ঠিক যে, এলিঅট ও তাঁর অনুগামী কবি-গোষ্ঠী তীক্ষ্ণাগ্র ইঙ্গিত প্রদানে মনোযোগী, সংযোগ-সূত্রবিহীনতা তাঁদের স্বধর্ম। পাঠক ও লেখকের মধ্যে এখানে সাধারণ প্রতিষ্ঠাভূমির অভাব, উভয়ের বাসনা-লোক একেবারে আলাদা। পাঠক কাব্যপাঠকালে একটিমাত্র অসপত্ন ভাবের প্রভাব অনুধাবনে অভ্যস্ত। কিন্তু বাস্তবজগতে এককথা ভাবার সময়ে অবচেতনে আরো অনেক ভাবধারা থাকতে পারে। তা ছাড়া উর্দ্ধচেতনার কথাও মনে রাখা উচিত। আজকাল-কার সাহিত্যে অবচেতন খানিকটা স্থান ক'রে নিলেও উর্দ্ধচেতন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ, বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের ভাবটাই প্রবল। "সাহিত্যে সমগ্রদৃষ্টি" বললে তবু আধুনিক পাঠক খানিকটা বুঝতে পারে।

অতিবাস্তবতার খাতিরে সাহিত্যে অবচেতনাগত বিশৃঙ্খলাগুলিকে রূপ দিতে হয়। তার জন্যে আধুনিক কাব্যে অনিবার্যভাবে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

এমন ক্ষেত্রে পাঠককে এই নতুন রূপবন্ধে অভ্যস্ত হতে হবে। কারণ, প্রকৃত বাস্তব একটিমাত্র সুশৃঙ্খল ভাবের প্রকাশ নয়; বহুমুখী বিশৃঙ্খল ভাব আধুনিক মনের অন্তত আধুনিক পাশ্চাত্যবাসীর মনের বিশেষত্ব। আধুনিক সাহিত্যেও তাই বহুমুখী জটিল চিন্তাধারার সমাবেশ সাধিত। সচেতন মনের সুশৃঙ্খল চিন্তাটির সঙ্গে অবচেতনের অস্ফুট, অস্পষ্ট ভাবধারার ছড়িয়ে-যাওয়া জড়িয়ে-ধরা বাস্তবতার খাতিরে বাঞ্ছনীয়। হেমিংওয়ের উপন্যাস এই প্রয়াসের উদাহরণ। জয়েস হয় তো তাঁর উপন্যাসে সর্বত্র মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন নি। কিন্তু হেমিংওয়ে সম্বন্ধে সে-অভিযোগ আনা চলে না। জয়েস বা হেমিংওয়ে ঠিক সাহিত্যে ধ্বনিবাদ দিয়ে বিচার্য নন। কিন্তু সাহিত্যে প্রতিধ্বনির পূর্ণ বিকশিত রূপ পেতে হলে অবচেতন ও সচেতনের সঙ্গে উর্দ্ধচেতনের সংবাদও রাখা দরকার।

পূর্ব যুগের সাহিত্যে বস্তুর ভদ্ররূপ দেওয়া হত, যথার্থ বা পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। আধুনিক সাহিত্যিক চান, বস্তুর আসল ছবিটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে, মানবমনের সৌষম্যবোধের দ্বারা তাকে একটুও মার্জিত না ক'রে। অথচ এর ফলে লেখকের নিজের মনের রসসিক্ত মাধুর্য্যবোধের সান্নিধ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে সাহিত্য রসহীন বস্তুপিণ্ড অনেকসময় ক্লেদাক্ত আবর্জ্জনাস্তূপ হয়ে পড়ে। তাতে বস্তু থাকে, বাস্তব থাকে, যথাযথ ভাব থাকে, কিন্তু না থাকে রস, না থাকে মানব-চেতনার উর্দ্ধলোকের সেই সংবাদ যার প্রসাদে আনন্দপরিপ্লুত হয়ে পাঠক বলতে পারে; তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী!

আধুনিক শিল্পী Harmony বা Concord ও Discord-এর সমাবেশ চান। একই অর্থকে চেতনার দশটি স্তর থেকে তিনি একই সঙ্গে প্রতিধ্বনিত ক'রে তার ধ্বনিগাম্ভীর্য তথা বৈচিত্র্য বাড়াবার চেষ্টা করেন। প্রাচীন কাব্যে এ-কাজ ছন্দ ও অলঙ্কারের জাদুশক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হত। আধুনিক শিল্পী কাব্যসাহিত্যে প্রতিধ্বনি রচনার জন্যে বহুবিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির একত্র সমাবেশের দ্বারা তাঁর সৃষ্টি সম্পন্ন করেন। ছন্দ ও অলঙ্কারের কাজ প্রধানত হৃদয়াবেগকে উৎসারিত করা। কিন্তু আধুনিকের লক্ষ্য, বুদ্ধির উজ্জ্বল আলোর পর্যবেক্ষণের পর বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুভূতির বিভিন্ন স্তর থেকে একটি ভাবের সমগ্র রূপ রচনা। তার জন্যে সচেতন ভাবের সঙ্গে অবচেতন প্রণোদনা ও প্ররোচনা মিশিয়ে দিয়ে তিনি সাফল্যলাভের আশা করেন। তাঁর ও পাঠকের দুর্ভাগ্যবশত উর্দ্ধচেতনের খবর তিনি কদাচিত পান।

প্রসঙ্গত Surrealism বা পরাবাস্তবতার ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা যাক। বাস্তবতা সমতল নয়, তার বহু স্তর; এই বহুতল বাস্তব তার শাখাপ্রশাখা অবচেতন পর্য্যন্ত প্রসারিত ক'রে আছে। সাধারণ বাস্তবতায় অর্থাৎ বাস্তববাদী সাহিত্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবিক্ত একটিমাত্র স্তর দেখানো হয়। আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা ছাড়াও স্তরনির্বিশেষে সমগ্রতাকে একত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয় Surrealism বা পরাবাস্তবতায়। বাস্তবতার সারনির্যাস হচ্ছে এই পরাবাস্তবতা।

ছন্দ ও অলঙ্কারের শক্তি যে ঐন্দ্রজালিক সম্মোহন বিস্তার করতে পারে, সে-কথা অস্বীকার করা মূর্খতা। কিন্তু সেই ঐন্দ্রজালিকতা সত্ত্বেও প্রাচীন বাস্তবতার অপূর্ণতা দূর হয় না। Surrealist-রা রূপবন্ধের বিশুদ্ধিতে আস্থা না রেখে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব চান মগ্নচৈতন্য ও স্বপ্নচৈতন্যের সাহায্যে। অর্থাৎ উপরি-ভাগের চেতনার নিম্নতর স্তরগুলির রহস্য তাঁরা উদ্‌ঘাটন করতে চান।

সন্ধ্যার পটভূমিকায় দিবালোকের যে-রূপ, সন্ধ্যা আদৌ না থাকলে সে-রূপ থাকত না; অবচেতনার পটভূমিতে চেতনার কাজ যা হয় তা থেকে অন্যরকম

হত ঐ পটভূমি না থাকলে। এই হল পরাবাস্তব-বাদীদের অবচেতনার প্রতি আকর্ষণের কারণ।

কিন্তু পরাবাস্তববাদীরা একসঙ্গে বহু স্তরের বার্তা পরিবেশন করলেও সেই বার্তাসমূহের কলরবের মধ্যে ধ্বনিসাম্য আনতে পারেন নি। তাঁরা সম্ভবত দাবি করবেন যে, বাস্তবেও ঐ ধ্বনিসাম্য নেই। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তিভেদে অবস্থা ভিন্ন। প্রতি ব্যক্তির চৈতন্য স্বতন্ত্র পথে সক্রিয়। চেতনার ক্রমবিকাশে সকলের স্থান সমান স্তরে নয়। বিপর্যস্তমস্তিষ্কদের বেলায় যাই হোক, স্থিতধীর সমগ্র চেতনার বহুতল প্রকাশক রূপটি ধ্বনিপ্রাচুর্যের সমাবেশজাত কলরবমাত্র না হয়ে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে ধ্বনিসৌষম্যের রচনা করে।

আগের যুগ পর্য্যন্ত কবিরা তাঁদের কাব্যে চেতনার একটি স্তরের বার্তা বহন করেছেন। কিন্তু অখণ্ড সত্য প্রকাশ করতে হলে সকল স্তরের বাণী একত্র পরিবেষণ করা চাই। এই পরিবেষণ রসান্বিত করা যায় কি না, সেই হচ্ছে কথা। মানসিক জটিলতার প্রকাশক ভাষা বক্তব্যের বিপর্যাস অতিক্রম ক'রেও রসস্ফুরণ করতে পারে কি না, এই হল আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা।

শেক্স্‌পিআর মানব-মনের যে-অতলে নেমে চেতনার সমগ্র রূপটি প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন, আধুনিক লেখকের সে-অন্তর্দৃষ্টি, মর্ম-সরোবরে সে-অবগাহনসামর্থ্য নেই! শেক্স্‌পিআর যে-অতলের সংবাদ দিয়েছেন তার প্রলাপবাণীর মধ্যে রসশক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন দ্যোতনা বিরাজিত, যা আধুনিক রচনায় নেই।

ম্যাকবেথ নাটকে মানব-মনের অতল জগতের এই দুরবগাহ রহস্যের সংবাদ পাচ্ছি ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ এমন-কি সামান্য দ্বারী চরিত্রের সংলাপে ও স্বগতোক্তিতে। একই সঙ্গে সুস্থ সচেতন মনের সঙ্গে অবচেতন মনের আবির্ভাবের কি বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায় ঐ নাটকের ছত্রে ছত্রে! ঠিক সেই রোমাঞ্চ-কর সাফল্য অন্য কবির কাছে প্রত্যাশা করা চলে না বটে, কিন্তু তবু যে কোন পরাবাস্তববাদী রচনাও অন্তত মোটের ওপর রসোত্তীর্ণ হওয়া চাই। দেখা দরকার, বিচিত্র জটিল বহু ভাব একত্র প্রকাশ করার সময়ে সেগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধের ভিত্তিতে সেগুলিকে সুষম সমাবেশ দেওয়া যাচ্ছে কি না। যদি কবি এ-দাবি করেন যে, বাস্তবে যখন ভাবের সুষম সমাবেশ নেই, তখন কাব্যে তার প্রতিফলনের প্রয়োজন নেই, তাহলে তাঁর কবিপদবী বৃথা। অক্ষম কবি বা অকবি বহুবিচিত্র ভাবের উপস্থাপনাকালে ঐক্যবোধের অভাবে ভাবরাশির মধ্যে সৌষম্যবিধান করতে পারেন না। পথের কোলাহলের যথাযথ রূপ রসাশ্রিতভাবে দিতে হলে ঐ গোলমালের অন্তরে সঙ্গীত আবিষ্কার করতে হবে। এ-কাজ দুঃসাধ্য; সাধারণের কল্পনার অতীত নিঃসন্দেহ। কিন্তু অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা যাঁর আছে সেই প্রতিভাবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ঐ সঙ্গীত যে দিব্য অন্তঃশ্রুতির অপেক্ষা রাখে তা খুব কম সাহিত্যিকের আছে। তার অভাবে সাধারণ শিল্পী কেবল হট্টগোল সৃষ্টি করেন। হট্ট-গোলের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতমাধুর্য্য পরিবেষণ করা কেবল দিব্যপ্রতিভার পক্ষে সম্ভবপর। বুলি কপ্‌চে বা অশ্লীল কটুক্তি দিয়ে ও-কাজ হবার নয়। উপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতির ব্যবস্থা না ক'রেই অনেক-ক্ষেত্রে আধুনিক কবি জোর ক'রে একটি ব্যঞ্জনা পাঠকের মনে প্রবেশ করাতে চান। দলের লোক এবং হাতে পত্রিকা থাকলে এর ফলে প্রচুর কবিতা প্রচুর পত্রিকায় ছাপা যায়, 'বিশেষত অঞ্চলবিশেষের প্রাদেশিক মনো-ভাবকে রাজনৈতিক দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে আধুনিক কাব্য-জগতের কবিসম্রাট হওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণ ক্রমশ কবিতার নামে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। দৈনিক কবিতা-পত্রিকা বার ক'রে এ-সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ধ্বনির ব্যঞ্জনা খুঁজে-না-পাওয়া এই সব রচয়িতাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি সকরুণ মন্তব্য স্মরণীয়: তোরা কেউ পারবি নে গো পারবি নে ফুল ফোটাতে।

সঙ্গীতসাধক মাত্রই জানেন, Harmony এবং আর্ট-

দশটি রাগের সামান্য অংশ একত্র পরপর গাওয়ার মধ্যে যে-পার্থক্য, প্রকৃত বৈচিত্র্যসঞ্জাত রসসৃষ্টি আর কেবল বৈচিত্র্যের অসংলগ্ন সমাবেশে সেই পার্থক্য। সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গের কোন অর্থ বা ধ্বনি নেই। কিন্তু সমস্ত তরঙ্গগুলির সমাবেশে মহাসাগরের গান শোনা যায়। আধুনিক কবিও চান, সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে একটি ভাবব্যঞ্জনা; তাঁরা সব কিছু জড়িয়ে নিতে পেরেছেন বটে, কেবল সেই বিজড়িত অবস্থা থেকে একটি ঐশ্যানুভূতি, একটি সৌষমাবোধ সৃষ্টি করতে পারেন নি। কেবল গতির দ্বারা ছন্দের অভাব পূরণ করার প্রয়াস তাঁদের লেখায় দেখা যায়!

সাঙ্কেতিকতা কাব্যের একটি গুণ; কিন্তু অর্থ উহ্য রাখলেই সাঙ্কেতিকতা হয় না। অর্থক্ষুণ্ণ ক'রে পংক্তি-বর্জন করা অনুচিত। অনেকের ধারণা, সাঙ্কেতিকতা অভাবাত্মক। এটি ভুল ধারণা। বৈদেশিক ভাষায় যা মানানসই, বাংলা ভাষায় তা না হতেও পারে। ঐতিহ্য পরিত্যাগ ক'রে সাঙ্কেতিকতা সৃষ্টি করা যায় না।

আধুনিক কবির সবচেয়ে বড় ত্রুটি তাঁর ইন্দ্রিয়-বদ্ধতা। গভীর ধ্যানের অনুভব না থাকায় তিনি কেবল যুক্তি ও ঐন্দ্রিয়িক উপলব্ধির সাহায্যে রসসৃষ্টি করতে পারেন না। সাহিত্যে কথা ও ভাবের সুসমন্বয়ে রসময়ী প্রতিধ্বনির সন্ধান তিনি পান না। গভীর চেতনা কবি ছাড়া যোগী, দার্শনিক প্রভৃতিরও থাকতে পারে। কিন্তু তাঁদের সে-চেতনার প্রকাশদ্যুতি নেই।

কবির স্বভাবসুন্দর কাব্যকান্তির রয়েছে এই দ্যুতি—এটিই কাব্যের আত্মা। একে "রস" বললে এর কাছে পাওয়া আনন্দের একটা নাম দেওয়া হল, এই মাত্র। এর স্বরূপ ধ্বনিকে ছাড়িয়ে এক অনির্বচনীয়ের দিশা দেওয়া, যার মর্ম যে জানে, কেবল সেই জানে। এই অনির্বচনীয়ের দিশা দেওয়া সাহিত্যে প্রতিধ্বনির কাজ। রবীন্দ্রনাথ "যেতে নাহি দিব"—মাত্র এই কথা কটিকে সম্প্রসারিত ও ঊর্ধ্বায়িত করেছেন ঐ প্রতিধ্বনির দ্বারা। এই সম্প্রসারণ ও ঊর্ধ্বায়নেই কবিচেতনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। যার অবচেতনার পঙ্কিল সরোবরে রসপ্রতিধ্বনির ঐ কমলকলি ফুটল না, তার কাব্যের অঙ্কুর "জাত আত ভেল, না ভেল যুগল পলাশা।"

শিকার

গল্প

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পাহাড়ী দেশ, রামগড়ের কাছেই। বেলা পড়ে এসেছে, আকাশ ঘোরঘটা করে কালো মেঘে ভরে গিয়েছে, তার সঙ্গে ঝির ঝির করে ইলসে গুঁড়ির মতো বৃষ্টি। জামা কাপড় ভিজে চপ চপে হয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে কখন জঙ্গলের এদিকে এসে পড়েছি বুঝতে পারিনি। শিকার মাথায় উঠে গিয়েছে এখন একটা আশ্রয় পেলে বাঁচি।

মানুষের মাথা পর্য্যন্ত উঁচু খাড়াই ঘাস আর আগাছার ঝোপ ঠেলে আমরা এগুচ্ছিলাম। অন্ধকার যে ভাবে জমাট বাঁধতে আরম্ভ করেছে তাতে একপা আগে কি আছে জানার উপায় নেই। ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ বাঘ বা লেপার্ড সেখানে এসে পড়লে ভারী রাইফেলকে (rifle) shot gun এর মত ব্যবহার করা চলবে না। কাছে shot gun এর সুবিধা অনেক। বাঘ বা বরাহের মত জানোয়ারের উপর চোখ কান বুজে বড় ছররার (L.G.) মার একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। ছোটগুলী যেন vital spot খুঁজে বার করে। মাথায় লক্ষ্য করা গুলী লেজে লাগলেও বুককে ছেড়ে কথা কয় না। আমার হাতে যে রাইফেল ছিল তা 425 high velocity Westly Richard, 425 বোর নিয়ে যার কারবার তার নিশানা অব্যর্থ হলে কি হয় লক্ষ্যভেদের প্রথায় অনেক নিয়মকানুন মানতে হয় অর্থাৎ শিকারীর দৃষ্টি রাইফেলের rear ও foresight এবং target এর যোগ ঘটলে তবেই গুলী বধ্যকে বধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সঙ্গে মালবাহীদের মধ্যে একজনের কাছে L. G. ছররা ভরা দোনলা shot gun রাখা ছিল। লোকটাকে ঠিক আমার পিছনে, হাতের নাগালে থাকতে বলেছিলাম। ওদের সঙ্গে নিয়েছিলাম পথ দেখান এবং সুবিধা পেলে মাচান বাঁধার জন্য। পিছন ফিরে দেখি সব কয়জন উধাও হয়েছে। বিস্ময়কর ঘটনা, কোন রকম শব্দ না করে কি ভাবে পালাল এবং কেনই বা এমনটি ঘটল বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয় কিছু দেখেছিল, হয়ত এত কাছ থেকে দেখেছিল যে আমাকে সাবধান করে দেবার সময় পায় নি।

যখন বন্দুক বদলের জন্য পিছন ফিরেছিলাম, ঠিক সেই সময় আমার কাছ থেকে কোন ভারী জানোয়ার ঝোপের মধ্যে চলে গেল। দেহ দেখতে না পেলেও ঝোপের ডগা নড়া থেকে বুঝলাম কে আমার পিছু নিয়েছিল। একাধিক লোক সঙ্গে থাকায় কাছে ঘেঁসতে সাহস পায়নি এবং কতক্ষণ আমার পিছু নিয়েছে তাও বলা কঠিন। আমি হঠাৎ পিছন না ফিরলে এখুনি একটা কিছু ঘটে যেত। Ready trigger এ আঙুল রেখে রাইফেলসংলগ্ন টর্চ টিপলাম এবং বড় বাঘের খাড়াই আন্দাজ করে সন্দেহজনক ছোট আগাছার উপর আলো ফেলতে লাগলাম। এটা নিশ্চত জানতাম, বাঘ ঝোপের আড়ালে দেহ লুকালেও চোখ আমার দিকেই আছে। আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। বাঘের চোখে আলো পড়লে ফিকে সবুজ রং যেন জ্বলে ওঠে। বিভিন্ন দিকে আলো পড়ার এক জায়গায় জ্বলন্ত চোখ নজরে পড়ল বটে কিন্তু রং তার ডগডগে লাল এবং একটার সঙ্গে আর একটার সঙ্গে ব্যবধান এত কম যে ভুল করেও বাঘের

চোখ ভাবা চলে না, তাছাড়া চাহনী যেন নিশাচর পাখীর মত, যেমন প্যাঁচা। খরগোশের মত ছোট জানোয়ারের চোখেও আলো পড়লে এইভাবে জ্বলে। ভারী রাইফেল দিয়ে প্যাঁচা বা খরগোস মারার জন্য এখানে আসিনি। বন্দুক অন্য দিকে ঘোরাতে যাচ্ছিলাম এমনি সময় দেখি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি এপাশে ওপাশে দুলছে এবং আসতে আসতে মাটি থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে। রোমাঞ্চকর দৃশ্য, দেহ নেই তবু দৃষ্টি শূন্যে দুলছে। চোখের তলায় মাঝে মাঝে আলোর নড়াচড়ায় মোটা কালো দড়ির মতো কিছু চক চক করে উঠছে, ভয়কে সামলাতে হলে অনুমানে সাপের মত বলা যেতে পারে কিন্তু সন্দিগ্ধ আত্মস্তোকই জিজ্ঞাসা করে বসে মানুষের কোমর পর্য্যন্ত উঁচুতে মাথা তুলতে পারে সে কোন জাতের সাপ? যেখানে দৃষ্টির দোলা দেখেছিলাম ঠিক তার কয়েক হাত দূরে ঝোপের পাতা নড়তেই জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন উড়ে কিছুর উপর পড়ল সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বিকট গর্জ্জন (কাশির মত বেজায় মোটা গলাখাকরানির শব্দ) শুনলাম তারপরই জঙ্গল তোলপাড় হয়ে গেল। বাঘ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন দিকে পালাল বুঝতে পারলাম না। পরক্ষণেই পালানর কারণ দেখলাম রাজ গোক্ষুর। এতক্ষণ তারই দৃষ্টি দেখছিলম।

অদ্ভুত ঘটনায় আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে ফিরে পেলাম। জ্বলন্ত দৃষ্টির দোলা আর দেখতে পেলাম না। আলো ভিন্ন দিকে ঘোরাতে একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দির চোখে পড়ল, চার পাশে গাছের ডালপালা আর শিকড়ে এমন ভাবেই স্থাপত্যকে আড়াল করেছিল যে টরচের তীব্র আলোতেও প্রথমটা বুঝতে পারিনি যে সন্ধানের জায়গায় এসে পড়েছি। এদিকে আসার সময় অনেক ইট-পাটকেলের সঙ্গে ঠোকর খেয়েছিসাম। ওগুলো ভগ্ন দেউলের বিক্ষিপ্ত অংশ। খবর অনুসারে বাঘের আস্তানা এবং রহস্যময় পরিবেশের নাগালে এসে পড়েছি। এই মন্দিরকে জড়িয়ে অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। শিকারে বার হবার আগে অনেকেই সাবধান করে দিয়েছিল, সন্ধ্যার আগে ফিরে এস।

অন্ধকারে বিপদ যখন চারধার থেকে ঘিরে ধরে তখন কোনপ্রকারে একটার কোপ থেকে রক্ষা পেলে মেনে নিতে হয় বাঁচা গেল। বাঘের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ায় ভেবেছিলাম বড়রকমের ফাঁড়া কাটল। বৃষ্টির সঙ্গে যেভাবে কাঁপুনি-দেয়া হাওয়া বইছে তাতে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। মন্দিরের দরজা সামনেই ছিল। দ্বার কবাটহীন তথাপি প্রবেশপথ রুদ্ধ। বট এবং অন্যান্য গাছের মোটা মোটা শিকড় মন্দিরের ছাদ ও দেয়াল ফাটিয়ে দরজাকে আঁকড়ে ধরেছে। বটের শিকড় বেশীর ভাগই মাটি কামড়ে আছে। এতক্ষণ রাইফেলে লাগান টর্চ জ্বালিয়ে রেখেছিলাম, কাজটা ভাল করিনি। এরই ভিতর ব্যাটারীর তেজ ঝিমিয়ে এসেছে। এই রকম আবেষ্টনীতে অন্ধকার আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে, যা দেখতে চাই না তাই চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তার সঙ্গে তেড়ে আসে কল্পনা। অসম্ভব রূপকেও বাস্তবে জড়িয়ে ফেলি—সংক্ষেপে অন্ধকারকে আমি ভয় পাই, আলোর ক্ষীণ রশ্মিও এই রকম সময়ে আমার কাছে মস্ত বড় সহায়। রাইফেলসংযুক্ত আলোকে স্বতেজ রাখার জন্য, পকেট থেকে ছোট টর্চ বার করে বড় আলো নিভিয়ে দিলাম। এখন মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে হলে শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম পিঠ থেকে নাবাতে হয়। ব্যাটারীর কেস, পানীয় জলের ফেলট দিয়ে মোড়া ফ্লাসক্ কার্ত্তুজ ভরা বেলট্ ইত্যাদি। বস্তুগুলি শিকড়ের ফাঁকে হাত বাড়িয়ে মন্দিরের ভিতরে রাখলাম। এইবার গোটা শরীর নিয়ে ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করতে হয়। ছোট টরচের আলোয় শিকড়ের যে ঘণীভূত জড়াজড়ি দেখলাম তাতে অশরীরী অথবা আধুনিক স্লিমমার্কা শরীর না হলে শিকড়ের বেড়াকে পাশ কাটানর উপায় নেই। কম বয়সে শক্তির পরীক্ষার অনেক ঘটনা মনে আসতে লাগল। আধ ইঞ্চি মোটা লোহার শিকল পিঠের চাড়ে টেনে ছিঁড়েছি, দুই ইঞ্চি

বারও বেঁকিয়ে দর্শকের তারিফ যোগাড় করেছি, আর মাটি কামড়ান শিকড়কে সামান্ত হেলিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারব না? অতীতের দম্ভ বর্ত্তমানের শক্তি-পরীক্ষায় এগিয়ে দিল। সবচেয়ে দুর্ব্বল শিকড়ের উপর বলপ্রয়োগ বুদ্ধির কাজ হবে, দুর্ব্বলকে দাবিয়ে দেয়াই তো শক্তির কাজ। বুদ্ধির ব্যবহার ঠিকই হলো কিন্ত এগুতে সময় লাগল। দুর্ব্বল স্থান মুচকে যেতে দেহকে দুই শিকড়ের মাঝখান দিয়ে ভিতরে দেবার চেষ্টা করলাম। মনের বল ও দৈহিক শক্তির মিলনে কোন প্রকারে শরীরকে ভিতরের দিকে এনে ফেলেছি এমনি সময় চাড়ের জায়গাতে হাত পিছলে যেতেই মোটা স্প্রীংএর মত শিকড় আমার বুকের উপর এসে পড়ল। এমন একটি জায়গায় আমাকে চেপে ধরেছিল যে দম বন্ধ হবার যোগাড়। এই সময় কোন মাংসভুকের আমাকে প্রয়োজন থাকলে আমিই নিজেকে বেঁধে ধরে তার মুখের গ্রাস তুলে দিতাম। এইরূপ সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই পকেট থেকে ছোট টরচ বার করে বাইরেটা দেখে নিলাম। কেউ ওৎ পেতে আছে বলে মনে হোলো না। কোনরকম বাধা না পাওয়ায় বুকের উপর চাপ বেড়েই চলেছিল। বাঁচার দরকার থাকায় পুনরায় শিকড়ের উপর হাত লাগালাম এবং মরিয়া হয়ে কিভাবে শক্তিপ্রয়োগ করেছিলাম বলতে পারি না হঠাৎ যেন পিছলে মন্দিরের ভিতরে এসে পড়লাম। ঘষ্টানিতে বুক ও পিঠের চামড়া বেশ খানিকটা জখম হয়েছিল। ও বিষয় চিন্তা করার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি রাই-ফেলের সঙ্গে অন্ত জিনিষগুলো তুলে নিয়ে দেখতে হোলো মন্দিরের ভিতর বাঘের পরিবার আছে কিনা?

রাইফেলে লাগান বড় টরচই জালিয়ে রাখতে হোলো। পায়ের তলায় জমির অনুভূতি থেকে অনুমান করলাম মেঝে পাথর দিয়ে বাঁধান। মেঝের উপর নরম ধূলো জায়গায় জায়গায় জমাট বেঁধে গিয়েছে। ঠিক পায়ের কাছে দৃষ্টি পড়তে চমলে উঠলাম, বিরাট সাপের খোলস। যেমন মোটা তেমনি লম্বা। এ খোলস রাজগোক্ষুরের না হয়ে যায় না। পরিত্যক্ত খোলসের পাশেই বিরাট থাবার দাগ। পদচিহ্নে কুল-গৌরবের ছাপ আছে। স্বয়ং অরণ্যের অধিপতি যে মন্দিরের স্থায়ী বাসিন্দা, সে বিষয় আর সন্দেহ রইল না। কারণ এখানে শোয়া বসা সব কিছুর প্রমাণই ধুলোয় রেখে দিয়েছে। বাঘ যে এইখানেই দিবানিদ্রার বিলাস সেরেছে সে খবরও জমাট ধুলোর কাছ থেকে পাওয়া গেল, চিৎ হয়ে শোয়ার জন্ত। যে সময়ে বাঘের আরাম কামরা পরীক্ষা করছিলাম সেই সময় আমার বিপরীত দিকে বিকট হাসি শুনতে পেলাম। আতঙ্ক আমাকে চেপে ধরার চেষ্টায় ছিল কিন্ত ভয়কে তফাৎ রাখার জন্ত ভাবলাম শব্দটির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যেদিক থেকে শব্দ এসেছিল সেই দিক দিয়ে মন্দিরে ঢোকার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা জানার জন্ত বিপরীত দিকে আলো ফেলতেই আর একটি কবাট-হীন ছোট দরজা বার হলো, পরক্ষণেই দেখি একটি হায়না দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। টরচের তীব্র আলোয় চোখ ঝলসিয়ে গিয়েছিল, আমাকে দেখতে পায়নি। ইচ্ছে করলেই গুলি চালাতে পারতাম কিন্ত বিরত হতে হোলো, অপ্রত্যাশিত আলো দেখেও যদি ফিরে না যায় তাহলে রাইফেলের বাঁটদিয়ে পেটান ছাড়া আক্রমণ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। এইটুকু জায়গার মধ্যে গুলী চালালে হায়নার শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে কোন দেয়ালে ঠোকর খেয়ে গুলী আমার দিকে ফিরে যে আসবে না তার স্থিরতা নেই। আলো জালিয়ে রেখেই পরের ঘটনার জন্ত অপেক্ষা করতে হোলো। কপাল ভাল, তীব্র রশ্মি সহ্য করতে না পেরে হায়না অন্ধকারে মিশে গেল। হায়না চলে যেতে দেখলাম, যেখানে জানোয়ার দাঁড়িয়েছিল সেটা সুড়ঙ্গের পথ মাটির তলায় চলে গিয়েছে—দরজার সামনেই সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। এদিকেও শিকড় নেমেছে, তবে যাতা-য়াতের কোন অসুবিধা নেই। হায়না জানিয়ে গেল, কোন পথ দিয়ে বাঘ মন্দিরে যাওয়া আসা করে। যে পথে হায়না ফিরে গেল নিশ্চয় সেই পথের শেষ জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। আজ যেখানে গভীর জঙ্গল হয়ে গিয়েছে, অতীতে হয়ত সেইখানেই প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান

বট এবং অন্যান্য গাছের মোটা মোটা শিকড় মন্দিরের
ছাদ ও দেয়াল ফাটিয়ে দরজাকে আঁকড়ে ধরেছে।

শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(শিকার : ২৫৫ পৃষ্ঠা)

দোফলা ডাল পাওয়ায় সেখানে গুছিয়ে বসলাম।

শিল্পী : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(শিকার : ২৫৯ পৃষ্ঠা)

ছিল। হয়ত অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকারা উদ্যানে পুষ্প-চয়নের পর সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে মন্দিরে পূজার অর্ঘ দিতে আসতেন। পূজার প্রসঙ্গে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাকালীর মূর্ত্তির কথা মনে পড়ে গেল। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। মনিমাণিক্যভূষিতা দেবী দর্শনের আশায় দূরগ্রাম থেকে মানুষ এদিকে আসতো কিন্তু দেবীর অস্তিত্ব তো মন্দিরে নেই। আলো ব্যবহার করে যা দেখতে পেলাম তাতে কালের ধ্বংসলীলা অপেক্ষা অধিকতর ধ্বংসকারী মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল। পাথরের দেহ থেকে অলঙ্কার অপহরণের জন্য বিভিন্ন দেহাংশ খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কারণ অলঙ্কার এমন ভাবেই পাথরের সঙ্গে আটকান হয়েছিল যে দেহ ও ভূষণের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে হলে অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

প্রাচীনের প্রতি আমার আকর্ষণ যথেষ্ট থাকলেও যে পরিবেশের মধ্যে পড়ে গিয়েছি তাতে ইতিহাসের সম্পদ সংগ্রহেরও উৎসাহ ছিল না। অজানা বিপদ আমাকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছিল।

নরখাদক বাঘের শিকারে আসা মানেই মৃত্যুর সঙ্গে খেলা, বিশেষ করে যখন মাটিতে দাঁড়িয়ে মহাপরাক্রম-শালী জীবটির সহিত বোঝাপড়া করার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কিন্তু যেখানে কোন রকম সাবধানতার অবলম্বন নেই সেইরূপ জায়গার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে হয়নি। যে সব আশঙ্কার কারণ মন্দিরের ভিতর পাওয়া গেল তাতে স্থানটি আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে ঘোরতর বিপদ-শঙ্কুল বলে মনে হোলো। কোন প্রকারে বাইরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। একমাত্র উপায় সুড়ঙ্গপথ দিয়ে জঙ্গলের সন্ধানে ঘোরা। অনুমান ঠিক হলে নিশ্চয় একটি গাছ খুঁজে নিতে পারব, যার উপরে যেতে পারলে রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাবে। তারপর যা ঘটতে পারে তা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেয়াই ভাল। যে সময় সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে ফাঁকায় আসার কথা ভাব-ছিলাম ঠিক সেই সময় সুড়ঙ্গের ভিতরেই যে ডাক শুনলাম তাতে বোঝা গেল বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হলেও আয়ুকে প্রয়োজন অনুসারে বাড়িয়ে নেওয়া যায় না। ডাক এসেছিল বাঘের কাছ থেকে, জরুরী ডাক প্রেয়সীর সন্ধানে আদিরসসংক্রান্ত ব্যাপার। বনের রাজা মিলনাকাঙ্খী, রাণীর সন্ধানে বেরিয়েছে। মন্দিরের দিকেই আসছে নিরালা প্রমদাগারে রাণীর পরিবর্ত্তে আমাকে দেখলে অবস্থা কিরকম দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

ভেবে দেখলাম, মন্দিরের ভিতরে যখন গুলী চলাবার উপায় নেই তখন সুড়ঙ্গের ভিতরই কপাল পরীক্ষা করা ভাল। এই পথে কয়েক পা এগুতেই দেখি রাস্তা সোজা নয়, আঁকা-বাঁকা পথ—দুইধারে পাথরের দেয়াল, ছাদও পাথরে গাঁথা। রাইফেলসংলগ্ন টরচ জ্বালাই ছিল কিন্তু আলো জ্বেলে রাখাও বৃথা। কয়েক পা অগ্রসর হলে বাঁকের ও পাশে কি আছে জানার উপায় নেই। কূট চিন্তার ফলেই বোধ হয় ভূগর্ভে এইরূপ স্থাপত্যে ঘেরা পথ তৈয়ারী হয়েছিল। এই-রূপ দৃষ্টান্ত পুরাণ দুর্গে দেখেছি। বিপদের চিন্তায় বিচার করে দেখলাম, এখন যে অবস্থায় এসে পড়েছি তাতে মরি বা মারির মন্ত্র মানা ছাড়া আর কোন গতি নেই। একমাত্র আশা, যদি সুড়ঙ্গের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আলো দেখে বাঘ ভয় পায় এবং হায়নার মত উল্টোপথে ফিরে যায়। চোখের উপর আলো ফেলতে পারলে ঝলসান দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না, ঐটুকু সময়ের মধ্যে যদি বাঁচার কোন উপায় বার করা যায় তবেই রক্ষা।

হেড লং কলিসনের (head long collison) জন্য প্রস্তুত থেকেই একপা দুপা করে এগুতে যাচ্ছিলাম। কিছুটা পথ আসতে মন্দিরের দিক থেকে প্রতীক্ষমানা রাণী, রাজার ডাকে সাড়া দিল। হতে পারে আমি মন্দিরে ঢোকার আগে রাণীই আমাকে অনুসরণ করছিল। প্রেমের বার্ত্তা এখানে ওখানে সেখানে শোনা যেতে লাগল! অসহিষ্ণুতার লক্ষণ, খোঁজার তাগিদে রাণী অস্থির হয়ে পড়েছে এদিক ওদিক ঘুরছে।

পথ সংকীর্ণ, দুজন পাশাপাশি চলা যায় না। কতদূর অগ্রসর হলে বদ্ধবায়ু এবং চামচিকের দম বন্ধ করা উগ্র গন্ধ থেকে রেহাই পাব জানি না, ভূগর্ভের বিষাক্ত বায়ু আমাকে জ্ঞানহীনের মত করে আনছিল। আমি চলেছি কতকটা স্বপ্নের ঘোরে হাঁটার মত। পা টলছে তথাপি চলেছি। প্রতিটি পদক্ষেপে বুক দুরুদুরু করে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু যেন আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে ঘটনাগুলির উপলব্ধি আছে কিন্তু কি ভাবে ঘটছে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। বাঁদিকে দেয়ালের দিকে শরীর ঢ'লে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শিকলে শিকলে ঠোকাঠুকিতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ উঠল। শুধু অ'বেষ্টনীর বদ্ধবায়ু যেন কম্পিত হয়ে উঠল। নিস্তব্ধতা বিধ্বস্ত হওয়ায় আর একটি শব্দ শুনলাম—একেবারে কাছে বাঁকের ওপাশ থেকে বিরক্তির অভিযোগ, তারপরই পলাতক ভারী জন্তুর পাদক্ষেপ থেকে অনুমান করলাম, বাঘ ভয় পেয়েছে, তা না হলে যে জানোয়ার শব্দকে সবদিক দিয়ে এড়িয়ে চলে তার পক্ষে এত সহজে আত্মপরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। বোধহয় নতুন বিপদের সঙ্গে সামনাসামনি ঘনিষ্ঠতার আগে সুড়ঙ্গের বাইরে এসে পড়তে পারব। তখনও শিকলের উপর আমার দেহের চাপ ছিল—দেখলাম ছোট কুলোর মত মরচে পড়া প্রকাণ্ড তালা মোটা লোহার শিকলের সঙ্গে আটকান। মজবুৎ রুদ্ধ কবাটকে আগলে আছে। কে বলতে পারে রামগড়ের গুপ্ত ধনের সন্ধান পেতে হলে রুদ্ধ কবাট খোলার প্রয়োজন হয় কিনা। অতীতের কাহিনী কতক্ষণ কল্পনাকে ঘেরাও করেছিল বলতে পারি না—তবে খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বর্ত্তমানে ফিরে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম—অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিল বাঘ কাছাকাছি কোথাও নেই।

শিকল নড়ার আওয়াজে যে সুবিধা পাওয়া গেল তা কাজে লাগাতে হলে এখুনি বাইয়ের দিকে চলতে হয়। সুড়ঙ্গের পথ কত লম্বা কিছুই জানি না, এদিকে আলোর তেজ একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসছে। অন্ধকারে পা বাড়াবারও সাহস পাচ্ছি না। সাপ মাড়িয়ে ফেললে ছোবলের আপ্যায়ন থেকে পরিত্রাণ নেই। আত্মরক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে মৃত্যুর ডাক এমন ভাবেই চারধার থেকে শুনতে লাগলাম যে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচার চিন্তাই আমাকে মরিয়া করে তুলল। এটা নিশ্চয় জানতাম, যে সরীসৃপের খোলস মন্দিরের ভিতর দেখেছি সেই বিষধর পায়ের সামনে পড়ে গেলে, মাড়া'বার দরকার হবে না, আলো থাক বা না থাক, তেড়ে এসে বিষদাঁতের ব্যবহার করতে সময় নষ্ট করবে না। সাপের কথা ভাবতে আলোকে জ্বালিয়ে রাখার প্রয়োজনবোধ করলাম না। কপালের গুণে বাঘ অত কাছে এসেও যদি ফিরে গিয়ে থাকে তা হলে আয়ু সম্বন্ধে হতাশ হবার কিছু নেই। ভিতরে ঘোর অন্ধকার তাই বাঁকের দেয়ালে মাথা ঠোকা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাঝে মাঝে আলোর সুইচ টিপে দেখে নিচ্ছিলাম। দেয়ালের গায়ে হাত রেখে চলতে পারলে টরচের ব্যবহার কমিয়ে ফেলার দরকার হোত না কিন্তু কোন দেয়ালে কি আছে জানার উপায় না থাকায় টরচের ব্যবহারই সঙ্গত মনে হয়েছিল। তাছাড়া, পাথরের গাঁথুনীর মাঝে গর্ত্তের ভিতর একটু আগেই যে কাঁকড়া বিছে দেখেছিলাম, তার দৈহিক মাপের বর্ণনা দিলে অনেক বিশ্বাস করবেন না যে বিষাক্ত কীটটির আকার প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা, তার উপর সমস্ত দেহ কাল লোমে ভরা। দুইটি দাঁড়া সত্যই বড় গলদা চিংড়ির সমান। এ দর দৌড় দেবার শক্তিও অদ্ভুত। যাই হোক ওরাও জঙ্গলের ভয়াল জীব, সুতরাং বিপদের বর্ণনায় ওদের উপস্থিতিকে স্বীকার করলে অবাস্তব কথা ভাবা উচিত হবে না।

নিঃশব্দে চলছিলাম, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, এইবার ঠাণ্ডা এবং মুক্ত হাওয়ার অনুভূতি পেলাম। বাইরের হাওয়ার সঙ্গে বাঘের গর্জ্জনও শুনতে

পেলাম। একাধিক বাঘ একই জায়গায় জড় হয়েছে— গর্জ্জনের পিছনে প্রেমালাপের অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কলহ ছিল কিনা বলতে পারি না। একটা বিষয় নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, বাঘের দল দূরে আছে। কোথায় এসেছি জানার জন্য রাইফেলের সংলগ্ন টরচের সুইচ টিপলাম. আলো একটু জ্বলেই নিভে গেল। টরচে হাত পড়তে ছ্যাঁক করে উঠল। টরচের উপরটা বেশ গরম হয়ে গিয়েছে। তার মানে পিঠে বাঁধা ব্যাটারীগুলো নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি করে দম ফুরিয়ে ফেলেছে। এখন আলোর জন্য একমাত্র সম্বল পকেটে রাখা ছোট টরচ। গত্যন্তরে তাই বার করে সুইচ টিপতে দেখি বাইরে এসে পড়েছি। সামনেই একটি আম গাছ। হাতের নাগালে একটি ডালও পেয়ে গেলাম। রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে উপরে উঠে যেতে কিছু অসুবিধা হোলোনা। এটা পুরান অভ্যাসের ফল। যারা হাতী, beaters বা বেজায় উঁচু মাচান ব্যবহার করার সুবিধা পান না তাঁহারা শিকারের সঙ্গে আদিম প্রবৃত্তির যোগ ঘটানোর ইচ্ছা থাকলে তড়িৎ বেগে গাছে ওঠার কৌশল আয়ত্ত করলে শিকারে বহুপ্রকারের সুবিধা পেতে পারেন। অবশ্য রাজা মহারাজা, বা অতি মার্জ্জিতরা বুনো অভ্যাসে দক্ষতা লাভ করবেন এমনটি আশা করি না। গাছে ওঠার আগে ছোট টরচের আলোয় যতদূর দেখা যায় পরীক্ষা করে নিলাম। কোনো জানোয়ার ওৎ পেতে ছিল না। উপরে উঠে একটি দোফলা ডাল পাওয়ায় সেখানে গুছিয়ে বসলাম। আন্দাজের হিসাবে নিরাপদ স্থানেই বসেছিলাম।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মাঝে মাঝে দূরে বিদ্যুৎ চমকানর সঙ্গে আকাশে মেঘ-গর্জ্জন শুনছি, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে পাতা-ঝরা জল পড়ার শব্দ। মেঘের ডাক ছাড়া জঙ্গল একরকম নিস্তব্ধই বলতে হয়, একটু নিশ্চিন্তভাব আসছিল কিন্তু শিকারীর কান খাড়াই ছিল, গাছের তলায় চেনা চলার শব্দ আরামকে সরিয়ে দিল। রাইফেল ধীরে বগলে তুলে চলার স্থান এবং নীচের জানোয়ারের গতির ভঙ্গিতে উদ্দেশ্য খুঁজতে লাগলাম। সন্দিগ্ধ পা ফেলার বৈশিষ্ট্য থেকেই বুঝলাম তলার জীবটি বাঘ। তাহলে কি আমাকে গাছে উঠতে দেখেছিল? যদি দেখে থাকে তাহলে গাছে ওঠার সময়েই পিছন থেকে আমাকে ধরার সুবিধা ছিল বেশী। অমন সুবিধা পেয়েও আমাকে ছেড়ে দিল কেন? বহু কেনর সদুত্তর না পেলেও এইটুকু বুঝেছিলাম যে আমাকে মাটিতে না দেখলেও উপরে গাছের ডাল খোঁজার সময় ছোট টরচের আলো দেখেছে—তাছাড়া রাইফেলের বাঁট ডালে লেগে আওয়াজ হওয়ায় যে দিকেই বাঘের মুখ থাক শব্দের দিকে মুখ ফেরাতে হয়েছে। তার পর শব্দের কারণ জেনে এদিকে এসে পড়েছে। আচরণ দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে এইবার নরখাদকের সঙ্গে বোঝাপড়ার সুবিধা এসেছে। মানুষ-খেকো বাঘ না হলে এতখানি সাহস দেখানোর প্রবৃত্তি সাধারণ বাঘ বা লেপার্ডের দ্বারা সম্ভব হোতো না। বাঘ গাছের কাছে আসার আগে গুঁড়িকে কেন্দ্র করে চারধারে প্রদক্ষিণ শুরু করে দিল।

প্রদক্ষিণের পথে পিছন দিক থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় যে সম্ভাবনা আমাকে সতর্ক করে দিল তাতে নির্লিপ্ত ভাবে বসে থাকা চলল না। কোন প্রকারে আশে-পাশের ডাল ধরে দাঁড়ালাম, যতটা সম্ভব পিছনদিকে ঘোরবার চেষ্টা করলাম কিন্তু চেষ্টা কাজে এলো না। আমি উঠে দাঁড়াতে অদৃশ্য জন্তুর চলা দ্রুত হয়ে উঠল গাছের চারধারে কাদা জলে ঘোরার জন্য যে শব্দ হচ্ছিল তাতে অনুমান করা চলে, ধৈর্য্যচুতি বাঘকে বেপরোয়া করে ছেড়েছে। বাঘের চেয়ে আমার উত্তেজনাও কম নয়, শিকারীর আদিম প্রবৃত্তি যেন আমার কানে দৃষ্টির শক্তি দিয়ে দিল। বাঘকে একটু বাঁদিকে এবং সামনে পেলেই আলো জ্বালতে পারি অন্যথায় এদিকে ওদিকে আলো ফেললে ঐটুকু

ক্রটির সুবিধা পেলেই বাঘ নরখাদক হলেও আত্মরক্ষার জন্য চোখের আড়ালে চলে যাবে। একটু পরেই বেশ উঁচু থেকে বেজায় ভারী জন্তু গাছের গোড়ায় আছাড় খেল। বেসামাল পতন সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভুল করিনি। যে রকম জায়গায় বাঘকে চেয়েছিলাম ঠিক সেইখানে না পেলেও বন্দুকের ব্যবহার কোন প্রকারে নেয়া যায়। আমিও ধৈর্য্য হারিয়েছিলাম আর বেশী সুবিধার জন্য বিলম্ব করা পোষাল না, শব্দের স্থান অনুমান করে আলো ফেলতে দেখি সত্যই বিরাট-কারের বাঘ, কর্দমাক্ত দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং আমাকেই ধরার চেষ্টায় লাফ-মারার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হয়েছে। লক্ষ্যের জায়গা বুক না পেলেও মাথা একেবারে সামনাসামনি পেয়ে-ছিলাম। ক্ষণিকের মধ্যে যথাস্থানে গুলী চালিয়ে দিলাম। Westly Richard কোম্পানীকে শত নমস্কার, গুলী মাথায় লাগলে কি হয়, রক্ত বার হতে লাগল পেটের কাছ থেকে যেখানে একরাস কাদা উড়িয়ে গুলী কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে। বাঘের মুখ এরই ভেতর অসাড় হয়ে কাদার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। রাইফেলের চক্রখাওয়া গুলী, ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেড়িয়েছে। একটু পরে আলস্য ভাঙ্গার মত যখন পিছনের পা দুটো সোজা করে দিল তখন নিশ্চিন্ত হলাম, এতক্ষণে ভয়াল শার্দুল মরার মতন মরল। বাঘ মরল বটে কিন্তু আমাকে মড়ার পাহারায় রেখে গেল। ওর চামড়াটা আমার দম্ভের পুঁজী সুতরাং পাহারা না দিলেই নয়। পাহারায় না থেকে উপায় আছে? হায়না, ভালুক, বুনোকুকুরের দল যে কোনটা মাংস ছিঁড়ে খাবে। বাঘ বনের রাজা হলে কি হয় মরেছে জানলে খেয়ে ফেলায় কোন আপত্তি ওঠে না।

উত্তেজনা স্তিমিত হবার পর শরীরটাও ঝিমিয়ে আসছিল। বিবেচনা করে দেখলাম, কড়া পাহারার প্রয়োজন নেই। একটু আগেই বন্দুকের আওয়াজে যেভাবে জঙ্গল তোলপাড় হয়ে গিয়েছে তাতে কোন জানোয়াররা এদিকে আসবে না। এটা ঠিক যে জঙ্গলী হলেও জানোয়াররা বজ্রপাত ও বন্দুকের বারুদ ফাটার আওয়াজের পার্থক্য জানে। একান্ত কোন মাংসভুক লোভ সামলাতে না পেরে এদিকে এসে পড়লে জল ছিটকানর শব্দে তার গতিবিধির সন্ধান ঠিক বুঝতে পারব।

নিশ্চিন্ত ভাব আমাকে এমনই বেকার অবস্থায় ফেলে দিল যে কোন একটা কাজ যোগাড় না করতে পারলে হয়ত মরা বাঘকে নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছাই প্রবল হয়ে উঠবে। এটা মোটেই শুভলক্ষণ নয় কারণ সাংঘাতিকভাবে আহত বাঘ অনেক সময় মড়ার মত পড়ে থাকে কিন্তু পরীক্ষারত জীবন্ত শিকারীর ছোঁয়া পেলে বাঘ স্বধর্মপালনে পিছিয়ে যায় না, শিকারীকে আদর অভ্যর্থনা করে হাসপাতালে পাঠায়—অনেক সময় রাস্তাতেই শিকারীর মৃত্যু ঘটে। বিবেচনা করে দেখলাম অযথা মরাটা ভাল কাজ নয় অথচ একটা কিছু কাজ চাই, তা না হলে সজাগ অবস্থায় রাত কাটাই কেমন করে? বসে থাকতে থাকতে ঘুম যদি আসে এবং নীচু দিকে ঝুঁকে পড়ি তাহলে পতন ও মৃত্যু সুনিশ্চিত। মনে পড়ে গেল, বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের কথা ভাবতে লাগলাম—যে ভাবে ভিজেছি তাতে সর্দি নিমনিয়া সবকিছুই হতে পারে সুতরাং গরম দাওয়াইকে এখুনি কাজে লাগান দরকার। গরম দাওয়াই পকেটেই ছিল। বিলিতী flask এ রাখা বিদেশী খাঁটি দাওয়াই বেশ খানিকটা পান করে ফেললাম। পরিমাণকে অনুমানে ঠিক করতে হলে এই-রূপ ক্ষেত্রে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটু আধটু মাত্রাধিক্য হয়েই থাকে।

ভেজালহীন ওষুধ তরলাগ্নির মত অন্তরে প্রবেশাধিকার পেয়ে আমাকে বাস্তব থেকে ঊর্দ্ধে তুলে নিল। তাতে বুঝলাম আমার আত্মাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ঘোর অন্ধকারে আলোকরশ্মি আমাকে জ্ঞানমার্গে তুলে নিয়েছে। অদৃশ্য শক্তি জ্যোতির্ম্ময় রূপ নিয়ে সামনে

উপস্থিত, অনুভূতির দ্বারা সবই দেখছি—আনন্দ তেড়ে আসছে আমাকে মসগুল করে দেবার জন্য, সাত্ত্বিক ও তামসিক আকর্ষণের মাঝে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হতে বসেছি। এই সময় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ আমার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। আত্মাও উত্তপ্ত উন্নত হয়ে কোন্ স্তরে উঠেছিল আজকে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে আছে বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর শব্দ আমার ধ্যানস্থ মনকে বিব্রত করায় প্রকৃতিকে অশোভন আচরণের জন্য ধমক দিয়েছিলাম এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম—এই ধরণের অসভ্যতা চলবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় আদেশ অগ্রাহ্য হোলো এবং এতবড় গুরুতর অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম। বাধ্যতামূলক ঔদার্য্যের জন্য আমার ক্ষোভের কিছু নেই। ভবিষ্যতে যতই অশোভনীয় আচরণ হোক, অভিশাপ তোলা রইল, ঠিক সময় কাজে লাগাব।

সময় কাটছিল, নিজেকে তাতিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। তাতের প্রতিক্রিয়ায় বোধ হয় মসগুলি কেন্দ্রের বাইরে গিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বাঘের নধর দেহ স্পর্শ করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। মনে ছিল, আমি মাটি থেকে ঊর্দ্ধে কোন বিশিষ্ট আসনে বসে ছিলাম। নীচে নামতে হলে, শ্বেত পাথরে বাঁধান গ্রাণ্ড ষ্টেয়ার কেস (Grand Staircase) দরকার, অভিনন্দন জানাবার জন্য সারবন্দী বন্দুকধারীরা সামরিক প্রথায় সেলিউট (Salute) না দিলে আত্মাভিমানে ব্যথা পেতে পারে। সর্ব্বোপরি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে! এতটা বাড়াবাড়ি। চোখ খুলে স্বপ্ন দেখার মৌজ যখন আমাকে বেশ মাতিয়ে ছেড়েছে সেই সময় কাছেই শ্যামবার হরিণের (Sambar) ডাক শুনলাম, ত্রাসের ডাক। তার পরেই কাছ দিয়ে ছুটে পালাল। এতক্ষণ ব্যোমে বিরাজ করছিলাম, মৌজ মেজাজকে যেখানে নিয়ে তুলুক, হরিণের ডাকে ত্রাসের সাড়া পেয়ে অন্তর মোচড় খেয়ে গেল, বাস্তবে ফিরে এলাম।

শ্যামবার ছুটে পালানর পর কিছুক্ষণ সময় কেটে গিয়েছে, পরের ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছি। এইবার অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে লাগল। গাছের কাছে ভারী জানোয়ারের সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ শুনতে পেলাম, কাদামাটিতে পা আটকিয়ে গেলে টেনে তোলার চেষ্টায় মনে হোলো মরা বাঘ বেঁচে উঠেছে। বাঘ সামনে চলছে। শিকারীর চরম সম্পদে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে জীবহত্যার দম্ভ, তাই কেড়ে নিতে চায় মরা বাঘ। বিবেককে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলাম মরা বাঘকে আর একবার মারলে জীবহত্যার পাপ ডবল করে হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাইফেল বগলে তোলার আগে বাঘ সামনের দিকে একটু দূরে চলে গেল। শব্দ অনুসরণ করে চলার দিকনির্ণয়ে কিছুমাত্র ভুল করিনি। বাঘ যে দিকে গিয়েছিল সেই দিকে বিকট আর্তনাদ সুরু হোলো। চিৎকার শুনলে মানুষের গলা বলে ভ্রম হয়। নরখাদক নিশ্চয় কোন মানুষকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু এই দুর্য্যোগে, গভীর জঙ্গলে মানুষ এল কেমন করে? দুপুর রাতে, একলা বাঘে-ভরা জঙ্গলে যে মানুষ ঘোরাফেরা করে, নিশ্চয় সে গুপ্তধনের সন্ধান রাখে এবং বাঘ ভালুককেও এড়িয়ে চলা অভ্যাস আছে, যেমন গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ডাকহরকরা বল্লমের ডগায় ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটে। কিন্তু ঘণ্টার আওয়াজ তো শুনিনি। তাও তো বটে, যে মানুষ গুপ্তধন আত্মসাৎ করতে চায় সে কি শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে ধরা পড়ার জন্য আত্মবিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে? গভীর জঙ্গলে, দুপুর রাতে, একলা অরণ্য-ভ্রমণের বিলাস যেমন আশ্চর্য্যের ব্যাপার, তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা বাঘের সঙ্গে মানুষের মল্লযুদ্ধ। যেদিক থেকে চিৎকার শুনেছিলাম ঠিক সেই জায়গা থেকে ধস্তা-ধস্তির শব্দ আসতে লাগল। বাঘের শক্তি কি হতে পারে আমি তা জানি এবং আক্রমণের পর কি ভাবে শিকারকে মারে সে খবরও রাখি। স্বচক্ষে দেখেছি, পিঠের উপর চড়াও হয়ে একটি মাত্র কামড় ও ঝাঁকুনিতে পূর্ণাবয়ব মোষকে নিঃশব্দে ধরাশায়ী করেছে। প্রকাণ্ড মুলতানী ষাঁড়কে মেরে অবলীলাক্রমে নালার কাছ থেকে প্রায় নয় ফিট উপরে পাড়ে টেনে তুলেছে, যা ডজনখানেক

জোয়ান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই মহাশক্তিশালীর সঙ্গে মানুষের মল্লযুদ্ধের কথা ভাবতে সবল আত্মার কথা মনে পড়ে গেল। নিশ্চয় বাঘের আত্মা স্বগোষ্ঠির কোন বিশেষ বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়েছে। গা ছম ছম করে উঠল। আত্মার রূপ দর্শনে দ্বিধা থাকলেও কৌতূহল আমাকে চেপে ধরেছিল। ছোট টরচই কোন প্রকারে বাঁ হাতে বন্দুকের নলের সঙ্গে ধরে সুইচ টিপলাম। রাইফেলসংলগ্ন টরচের মত, ছোট টরচ তেজস্বী না হলেও, অস্পষ্টতার বাধা সত্ত্বেও ১০-১৫ গজের মধ্যে দৃষ্টিকে বিশ্বাস করা চলে। যে দৃশ্য দেখলাম তা অভাবনীয়। সত্যই বাঘের পিছনে একটি বিশালকায় মিশকালো লোমশ মানুষ দুই পায়ে ভর করে সোজা দাঁড়িয়ে এক হাতে বাঘের কাঁধ ধরেছে অপর হাত পেটের কাছে। কালো হাতের নীচে বাঘের সাদা ও হলদে চামড়ার উপর যেন রক্তধারার স্রোত চলেছে। হঠাৎ বাঘ লোমশ মানুষকে কামড়ে এমন ঝাঁকুনি দিল যাতে উভয়কে একসঙ্গে মাটিতে আছাড় খেতে হোলো। এই সময় দেখতে পেলাম তলার মানুষ একটি বিরাট ভালুক। অদৃশ্য আত্মার গোলমাল না থাকায় "এক ঢিলে দুই পাখী" মারার সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। নিশ্চিত জানতাম বাঘের মাথা ও কাঁধের মাঝে মারতে পারলে, বাঘের তলার জীবটির বুক বা গলাকেও গুলী এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে। Shot gun দিয়ে Snap shot এ একসঙ্গে একাধিক হাঁস বা snipes মেরেছি বটে কিন্তু বাঘ ও ভালুকের মতো জানোয়ারকে একসঙ্গে যোড়ে মারার সুবিধা কখন পাইনি। তড়াহুড়া না করে রাইফেলের নল ডালের উপর রেখে বেশ তোয়াজ করেই টিপ করলাম তারপর ট্রিগার টিপে দিলাম। গুলী চলার পর বাঘের দেহ এতটুকু নড়ল না কেবল মাথাটা ভালুকের মুখের উপর গিয়ে পড়ল। ভালুকও তখন অসাড়।

লক্ষ্যভেদের সাফল্য আমার আত্মশ্লাঘাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এইরূপ অবস্থায় নিজেকে পুরস্কৃত না করলেই নয়, গরম দাওয়াই এর অনেকটা পড়ে ছিল। এক চুমুকে flask নিঃশেষিত করে ফেললাম ফলে দাওয়াই গলাধঃকরণের পর আমার অস্তিত্ব এমন একটি স্তরে উঠে গেল যার নাগাল পাওয়া সাত্ত্বিক আদর্শবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। সোজা কথা অসম্ভবকে সম্ভব করা আমার ইচ্ছাধীন হয়ে গেল। ভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটে। মড়ার পাহারায় বসে থাকার অপেক্ষা, ভালুক আর বাঘ দুটোকেই গাছের উপর তুলে রাত্রিটা মৌজে কাটাব ঠিক করলাম। একবার মনে হোলো কে যেন কানের কাছে বলে গেল, সাবাস পুরান পালোয়ান, এ তুহারি কাম,.বাঘের ওজন প্রায় সাত মণ এবং ভালুকও কম যায় না; তুমি না হলে একসঙ্গে তের চোদ্দ মণ ওজন কেউ গাছের উপর তুলতে পারে? বাহবা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। গাছ থেকে নামতে যাচ্ছি, অবাক হয়ে গেলাম পায়ের তলায় সব কিছুই শূন্য হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পাহারার বালাইও কাটল, মল্লভূমিতে আবার বাদা ছিটকানর আওয়াজ শুনলাম। টরচের আলো ফেলে দেখি ভালুক কেমন করে বাঘের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ে বড় ঝোপের দিকে টলতে টলতে চলেছে। কেবল পিছন ছাড়া আর কিছু দেখছি না। আন্দাজ শিড়দাঁড়ার উপর গুলি চালাবার ইচ্ছা এলেও লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকায় ভালুককে যেতে দিলাম। আসল কথা গরম দাওয়াই আমার দেহ মন প্রাণ সব কিছুই টলিয়ে দিয়েছিল। রাইফেল ছোঁড়ার রীতিনীতি মেনে চলার অবস্থা ছিল না। রাইফেলের নলকে বগল দাবা করে trigger টিপলে সত্যই আমার আত্মা আমার তাগমারিকে বাহাদুরী দিত। কিছুক্ষণ বাদে অনুভব করলাম আমার অমর আত্মাও খাবি খেতে আরম্ভ করেছে। বেশীক্ষণ সময় লাগল না আমি ব্যোমে বিলীন হয়ে গেলাম। গাছের উপরেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। দোফলা ডালের মাঝে এমন ভাবেই আটকে গিয়েছিলাম যে নীচ থেকে টেনে নামানও লোকের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হোতো। নিরাপদ হবার জন্য আরামের স্থানটি নিজেই বেছে নিয়েছিলাম তারপর কখন কিভাবে আটক পড়েছিলাম মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন

সকাল হয়ে গিয়েছে, মুরগী, তিতির ইত্যাদি বুনো পাখীর ডাক শুনছি। উঠে ভাল করে বসতে গিয়ে দেখি আরামের বাঁধন আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, তার উপর সারা গায়ে সাংঘাতিক বেদনা, জ্বরও তেড়ে এসেছে, এক্ষণ তিনের কাছাকাছি হবে। বহু কষ্টে দুই ডালের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম বটে কিন্তু প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গিয়েছে—হাত পা নাড়াতে হলে চেষ্টা দরকার।

রাত্রের ঘটনা, সব কিছুই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। গাছের নীচে দৃষ্টি পড়তে দেখি বাঘ কাদার উপর শুয়ে আছে, মোষের মত কাদায় বাঘকে শুতে কখনও দেখিনি। একটু ভাল করে দেখার দরকার হোলো। বাঘের পায়ের তলায় মাছি ভন ভন করছে, কানের গর্ত্তেও দু'চারটে মাছি আনাগোনা শুরু করছে কিন্তু কান নড়ছে না, নিঃশ্বাস নেয়ারও কোন লক্ষণ দেখছি না। স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে বাস্তবে এসে উপস্থিত হোলো।

জ্বর আমাকে কাবু করলেও শিকারীর মন এই ব্যবস্থায় কি হতে পারে তা অভিজ্ঞকে বোঝানোর চেষ্টা করব না। শিকারে বার হলে সব সময় পকেটে ছোট ঢিল নিয়ে বার হই। জ্বর নিয়েই গাছ থেকে নেবে বাঘকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা অদমনীয় হওয়ায়, দুই একটা ঢিল বাঘের মাথায় ফেললাম। ছোঁড়ার দরকার ছিল না। বাঘের দিক থেকে যে সঙ্কেত পেলাম তা মড়ার। গাছ থেকে নেমে এলাম। বাঘের পিছনের বাঁ পা ফুলে গোদের মতো হয়ে গিয়েছে, কাছে আসতে বার হোল ঘা এত পুরান যে ঘায়ের গর্ত্ত মাংস ভেদ করে হাড়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে। যে বাঘ চলৎশক্তিহীন তার পক্ষে লাফ মেরে আমার কাছে পৌঁছতে না পারায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নয়। রাত্রে গাছে ওঠার সময় বুঝতে পারিনি। আমি যে ডালে বসেছিলাম তা মাটী থেকে বেশী উঁচুতে নয়। এবার একরকম নিঃসন্দেহ হলাম যে বাঘটি প্রাচীন নরখাদক কারণ দ্রুতগামী জন্তুকে ধরার শক্তি বাঘ ক্ষতস্থান পেকে ওঠার পর থেকেই হারিয়েছে। গাছের নীচে মরা বাঘ যখন স্বপ্নের ঘটনা নয় তখন বাঘ-ভাল্লুকে মল্লযুদ্ধের স্থানটি দেখা দরকার। আন্দাজমত যথাস্থানে দৃষ্টি চলাতে প্রথমটা কিছু নজরে পড়ল না। এদিকে একসঙ্গে বাঘ ও ভাল্লুককে মেরেছিলাম বলেই তো মনে পড়েছে, তবে কি আত্মা ভোজবাজীর খেলা দেখিয়ে দিল। নিজের বিশ্বাস একটু বাড়িয়ে নিয়ে মল্লভূমির দিকে যাওয়াই স্থির করলাম। মন স্থির হোলো বটে কিন্তু পা চলতে চায় না, হাড়গুলোর যেন যোড় খুলে গিয়েছে। অপর দিকে শিকারীর অন্তর অস্থির হয়ে উঠেছে, উত্তেজনা যেভাবে খোঁজ নেবার তাগিদ দিতে লাগল তাতে এখুনি সত্যি মিথ্যে যাই হোক আসল ঘটনা না জানতে পারলে জ্বর হয়তো আরো বেড়ে যাবে।

এক পা দু'পা করে বে-সামাল অবস্থায় খানিকটা অগ্রসর হতে, ঘাসের তলায় দেখতে পেলাম বাঘের লেজ, কেবল ডগাটা, লেজের অসাড় অবস্থা দেখে বলা চলে, মরেছে কিন্তু বাকি দেহটা কতটা মরেছে জানতে না পারলে কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। কয়েকটা ঝোপ পার হয়ে যেখানে এসে পৌঁছালাম সেখান থেকে বাঘের মাথা আড়াল পড়লেও পিঠ অনেকটা দেখা যায়। পিছন দিকে এসে পড়েছিলাম। কাদায় মধ্যে যে ভাবে মুখ গুজড়ে বাঘ পড়ে ছিল তা কোন জীবন্ত জন্তুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আবার কাছে যাবার আগে ঢিল ছুঁড়লাম। বাঘ নড়ল না কিন্তু কাছ থেকেই গোঙানীর মত একটা আওয়াজ শুনলাম। পরক্ষণে কাছ থেকেই একটি ভাল্লুক বেগে আমার দিকে ছুটে এল। ঘটনাটি এমন আকস্মিক-ভাবে ঘটল যে রাইফেল বগলে তোলার আগেই ভাল্লুক প্রায় আমার উপর এসে পড়েছে, তখন বন্দুক যেখানে ছিল সেইখান থেকেই নল ভল্লুকের দিকে এনে ঘোড়া টিপে দিয়েছিলাম। 425 bore এর high velocity রাইফেলের Recoil বন্দুকের বাঁট ঠিক আমার বুকের তলায় ভীষণ বেগে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে আমিও মাটিতে পড়ে গেলাম।

পরের ঘটনা, যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দেখি আটচালার ভিতর তক্তাপাষের উপর শুয়ে আছি। মোড়লদের বড় ছেলে আমার কাছেই মাটিতে বসে। উঠানের দিকে টাটির দরজা খোলা, বাইরে লোক গিজ-গিজ করছে। ভিড়ের মধ্যে, ছেলে মেয়ে বুড়ো কেউ বাদ পড়েনি। আমি চোখ খুলেছি দেখে, মোড়লদের ছেলে বললে—কর্তাবাবু আমরা তো ভেবেছিলাম, আপনি কি বলে মানে আপনাকে বাঘে নিয়েছে, তা নিবে নয়, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বলি আপনার গতরটি তো কম নয়, একটা কেন সাতটা বাঘের পেট ভরিয়েও কিছু মাংস বেঁচে যাবে। সকাল বেলা বন্দুক ছোটার শব্দ শুনে বুঝলাম আপনি বেঁচে আছেন, তখন কর্তাবাবু, আপনার সাথে যারা গেছল তাদের এইসান গাল দিলাম যে ব্যাটাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়লাম, তার পর কর্তাবাবু এই শর্মা গাঁয়ে গিয়ে লোক যোগাড় করলাম—যে যা হাতিয়ার সামনে পেল তাই নিয়ে লড়াইয়ের পল্টনের মত জঙ্গলের দিকে চললাম। আপনার লেগে বাবু গাঁয়ে একটা বঁটি দা রইল না। ঘরে ঘরে কুটনো কোটা বন্ধ। বৌ-এর দল একবারে রেগে কাঁই হয়েছিল। কিন্তু আমরা যখন বার জন লোক হিমশিম খেয়ে দু-দুটো ডবল সাইজের বাঘ আর তার সঙ্গে তেমনি পেল্লাই ভাল্লুক আনলাম তখন মেয়েরাই ভিড় করে যেন ঠাকুর দেখতে এল। ঠাকুর বলতে আপনাকেই বলতেছি কর্তাবাবু। তার পর দুই-একটা বাড়ীতে ঘরোয়া বিবাদ বেধে গেছে। বাধবে না, মাইয়া মানুষ ঘর ছেড়ে পুরুষ দেখতে এলে বাধবে না। তবে কর্তা ভয় পাবেন না—আপনার তরে যে বদ্যি আসিতেছে সে একেবারে কি বলে শতমারি চিকিৎসক, ওষুধ ধরলে আর দেখতি হবে না একেবারে কাজ হাঁসিল করে ছাড়বে। তা কর্তাবাবু বাড়াবাড়ি হবার আগে লোকগুলোকে কিছু বকশিস দিয়া দেন, ওদের আশীর্ব্বাদেই আপনি সাইরা উঠবেন।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের প্রস্তাব শুনে সত্যই ভয় পেয়ে গেলাম। শতমারি চিকিৎসকের ওষুধ সেবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বকশিষের ঋণ শোধ করে এখানকার পাঠ তোলার আয়োজন সুরু করে দিলাম।

বাঙ্গলার বিপ্লব আন্দোলনে আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রভাব

কালীচরণ ঘোষ

আবিসিনীয় যুদ্ধ

শ্বেতজাতির ঔদ্ধত্য ও কৃষ্ণকায়জাতির স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টা একটা অতি সাধারণ ঐতিহাসিক তথ্য। সুতরাং এ দুয়ের দ্বন্দ্বে শ্বেতাঙ্গের পরাজয়সংবাদ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ব্যাপার। উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইতালীর আবিসিনীয়া আক্রমণ ১লা মার্চ আদোয়া (Adowa) রণক্ষেত্রে কালাসৈনিকের নিকট শ্বেতাঙ্গের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। নানাভাবে আন্দোলন চলতে থাকলেও ২৬ অক্টোবর (১৮৯৬) আদ্দিস্ আবাবা (Addis Ababa) সন্ধি স্থাপিত হয়। আবিসিনীয়ার উপর ইটালীর কর্তৃত্বস্পৃহা এইভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্বেতাঙ্গ ইটালীয়ানদের পরাজয় ভারতবর্ষে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করেছিল।

বুয়র যুদ্ধ

দক্ষিণআফ্রিকার বুয়রদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবার চেষ্টায় ইংরেজ কোনো ত্রুটি রাখেনি। "বুয়র" (Boer) কথাটি আসে ওলন্দাজ বোয়ারেন (Boeren) বা চাষী-সম্প্রদায় হতে। এরা হলাণ্ড এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চলের কাল হ'তে দক্ষিণআফ্রিকার অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট (Orange Free State) ও কেপ কলোনি (Cape Colony)তে এসে বসবাস আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে ইংরেজ এদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করবার চেষ্টা করেছে এবং ১৮৮১ (২৭ ফেব্রুয়ারী) মাজুবা হিলে (Majuba Hill) ইংরেজের পরাজয়ে বিরোধের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে। কিন্তু বাঙ্গলা সচকিত হয়ে ওঠে ১৮৯৯-১৯০২ সালের যুদ্ধকালে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখতে আরম্ভ করে।

কিম্বারলীতে সোনার খনি আবিষ্কারের পর বুয়র রাজ্যের ওপর ইংরেজের লোলুপদৃষ্টি আর একবার তার উপর পড়ে। রাষ্ট্রপতি ক্রুগার (S. J. P. Kruger)এর দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে সমরপ্রস্তুতি আরম্ভ করেন। ১০ অক্টোবর (১৮৯৯) যুদ্ধারম্ভ হয় এবং বুয়রদের হাতে ইংরেজের চরম দুর্দ্দশা ঘটে। অবস্থা এত গুরুতর হয় যে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এটাকে "কালা সপ্তাহ" ("black week of December, 1899) বলা হয়েছে। জোবার্ট (P. J. I. Joubert), বোথা (L. Botha), ডি ওয়েট (C. De Wet), ক্রজি (P. Crouje), ডি লা রে (J. H. De La Ray) প্রমুখ সেনাপতিরা সমরবিদ্যার যে অদ্ভুত পরিচয় দেন তার তুলনা অন্যত্র বিরল। গোপনে হঠাৎ আক্রমণ ও অন্তর্দ্ধান বা গরিলা-যুদ্ধনীতি অবলম্বন করায় ইংরেজ বিপর্যাস্ত হয়ে পড়ে। কোথায় কি ভাবে এই আক্রমণ এসে পড়বে তার জন্যে ইংরেজসমরকুশলীরা নিতান্ত নিরুপায় বোধ করতে থাকেন। উত্তরকালে প্রসিদ্ধ চার্চ্চিল (Winston Churchill) বোথার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। অবশ্য বন্দী অবস্থা থেকে পলায়ন চার্চ্চিলের এক বড় কৃতিত্ব।

ডিসেম্বর ১৮৯৯ ব্রিটেনের টনক নড়ে। "চাষা" বুয়রদের যত হীন দুর্ব্বল মনে করে ইংরেজসৈন্যবল রণে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে ধারণা ছুটে যেতে বেশী

সময় লাগেনি। তখন বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে "সাজ," "সাজ" রব পড়ে গেল। 'গেল রাজ্য, গেল মান' বলে ইংলণ্ডের লোক ডাক ছাড়তে লাগল; মজুত সেনাবাহিনী, স্বেচ্ছাসৈনিক, শস্ত্রধারী আধাসৈনিক, সব প্রস্তুত হতে লেগে গেল। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলণ্ডে সৈন্য সংগৃহীত হয়ে দক্ষিণআফ্রিকায় প্রেরিত হ'লো। বুলার বাটলার প্রভৃতি সেনাপতিরা পথ ছেড়ে দিলেন লর্ড রবার্টস্ (T. C. Roberts) ও লর্ড কিচ্‌নার (H. Kitchner)কে।

এই সকল ঘটনা থেকে বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের গুরুত্ব ও বুয়রদের শৌর্য্যবীর্য্য ও রণনীতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে মাত্র। ইংরেজ তখন দুলক্ষ সৈনিক সমবেত করেছে। সাজসরঞ্জামের ত কথাই নেই, আর তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অনধিক পঁচিশ হাজার বুয়র। চারিদিকে বুয়র সৈন্যের উপস্থিতির বিভীষিকা ইংরেজকে অভিভূত করে ফেলে। বুয়ররা ১৮৯৯ কিম্বারলী ও লেডিস্মিথ নগরী অবরোধ করে। ইংরেজ সে অবরোধ ভাঙতে সমর্থ হয়ে কতকটা ইজ্জত ফিরে পায়। ইতিমধ্যে ক্রঞ্জির আত্মসমর্পণ বুয়রদের পক্ষে একটা বড় দুর্ঘটনা।

১৩ই মার্চ্চ ১৯০০ ব্লোমফন্‌টাইন (Blomfontein) এর পতন হ'লে, বুয়ররা কতকটা দমে পড়ে। তাদের বিপর্য্যয় সুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। হ'লো বটে সাময়িক পরাজয়। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে ব্রিটিশ-শক্তিকে প্রতিরোধ করার অপরাপর নানা সুযোগ সুবিধা ত ছিলই তার ওপর ছিল—

"The brilliance of their guerilla leaders and the skill, valour and revolution of the few."

—তাদের গরিলা যুদ্ধনায়কদের বিস্ময়কর কর্ম্ম ও ধীঃশক্তি এবং অল্পসংখ্যক যোদ্ধৃবর্গের দক্ষতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা বর্ত্তমান; সুতরাং সে জাতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরাজিত হ'তে পারে কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ দমিত হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপরই দেখা যায়

"Never the less, right up to the last few weeks of the war, events showed a fairly even balance between the British and the Boers, and most famous of the Boer guerilla leaders were still at large at the end."(Chambers Encyclopoedia).

যুদ্ধ সমাপ্তির মাত্র শেষ কয়েক সপ্তাহ আগে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ও বুয়র-সমরশক্তি তুলাদণ্ডে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে এবং বুয়রদের সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী গরিলানেতারা শেষ অবধি মুক্ত অবস্থাতেই ছিলেন।

এর পর দুপক্ষই সন্ধির পথ খুঁজতে লেগে গেল। বহু ধবস্তাধবস্তির পর ৩১মে ১৯০২ ভেরেনিগিং (Vereeniging) সন্ধি স্থাপিত হলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ নবজাগ্রত বাঙ্গলায় বুয়রযুদ্ধ এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। পত্রিকা পড়া যাঁদের অভ্যাস তাঁরা বুয়র জয়ের সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন, পরাজয়ের সংবাদে বিমর্ষ হয়ে পড়া তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। বুয়র যুদ্ধের শিক্ষা ছিল স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর একজন দেশপ্রেমিক বিদেশী পররাজ্যলোলুপ চারজনের মহড়া ধরতে পারে। আর শিক্ষা দিয়েছিল প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে লড়তে হলে গরিলাযুদ্ধের সফলতা।

বুয়র যুদ্ধটা বাঙ্গলা পত্র-পত্রিকায় খুব আলোচিত হয়েছিল। এ সবের সার মর্ম্ম যে ইংরেজ উচিত শিক্ষালাভ করেছে একটি ক্ষুদ্র শক্তির কাছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মরুভূমিতে ইংলণ্ডের শ্বেতচর্ম্মধারীর প্রচুর রক্তপাত হয়েছে বলে মাতা ব্রিটানিকার করুণ ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে এ বড় ক্ষোভের কথা লেখে "সমীরণ" ৮ই নভেম্বর ১৮৯৯। পত্রিকা আরও বলে, "বুয়ররা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, তা কোনো দেশ এর পূর্ব্বে কল্পনাই করতে পারে নি। যখন মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করে, তখন তার দেহে অভাবনীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়। বুয়ররা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। তা না হলে এত ইংরেজ-মায়ের চক্ষু অশ্রুসজল কেন? ইংলণ্ডের এত লোক শোকভারাক্রান্তই বা কেন? এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে

ইংরেজ কখনও এত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে নি, এত বিরাট যুদ্ধায়োজনও করেনি, এত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনও হয়নি। আমরা মনে করেছিলাম চক্ষের নিমেষে বুয়রদের সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেওয়া যাবে। হায়! সে একটা বিরাট ভ্রান্ত-ধারণা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ছোটখাটো সংঘর্ষের কথা ছেড়ে দিলেও বড় দরের ছয়টা যুদ্ধে বুয়ররা অদম্য সাহস, অপরিমেয় বীর্য এবং অতুলনীয় শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে। যে লোকক্ষয় হয়েছে, ইংরেজের তাতে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

হাবলুল মতিন (৬ই নভেম্বর ১৮৯৯) এবং অপরাপর নানা পত্রিকা একই সুরে গান ধরেছে। 'হিতবাদী' (৮ই নভেম্বর) প্রকাশ্যভাবেই লিখেছে যে "ইংরেজের বারম্বার পরাজয়ে আমাদের দুঃখ ত হয়ইনি, বরং আমরা বিশেষ আনন্দিত। আমরা সহস্র কণ্ঠে বুয়রদের জয়গান করি। ধন্য বুয়রদের সাহস! ধন্য তাদের বীরত্ব!! ধন্য তাদের দেশপ্রেম!!!" এর ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর মর্মকথা প্রকাশ পেয়েছে, শত্রুর পরাজয়ে নিজেদের আনন্দ।

"সঞ্জীবনী" আবার বলছে (১৫ নভেম্বর) যে "অর্দ্ধসভ্য এক জাতির মারের কাছে বৃটিশ সিংহের মুখে চুণ-কালি পড়েছে। "বঙ্গবাসী" (২৫শে নভেম্বর ১৮৯৯) সেনাপতি জুবাট-এর জয়গান করছে—"তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন।"

ইংলিশম্যান প্রভৃতি বিদেশী পরিচালিত পত্রিকারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠেছে যে ইংরাজের পরাজয়ে ভারতবাসী উৎফুল্ল হয়েছে, এই মনোভাবের প্রতি সরকারের কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু তখন আর বাঙ্গালীর মনের আনন্দ গোপন করে রাখার উপায় ছিল না।

এ ছাড়া অন্য একদিক লক্ষ্য করবার ছিল। বুয়র সেনাপতিদের নানারকম গুণের কথা বড় করে লেখা হয়েছিল। তখনকার রীতি। সেনাপতি ক্রুগার দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বাড়ীর দরজায়, লিখলে সঞ্জীবনী (১৪ই ডিসেম্বর (১৮৯৯) আর লেডিস্মিথ থেকে ইংরাজ-বন্দী নিয়ে যাচ্ছে বুয়র সৈন্যরা। ট্রান্সভাল রিপাব্লিকের শিরোমণি ক্রুগার আনন্দ প্রকাশ ত করলেনই না, উপরন্তু মাথার টুপি উঁচু শত্রুসৈন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দী-সৈন্যরা সোল্লাসে প্রত্যভিবাদন জানালে। প্রশ্ন করছে "সঞ্জীবনী" "ক'জন মহাপুরুষ আছেন যাঁরা ক্রুগারের সদাশয়তা, বীরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের মহানুভবতার সমকক্ষতা লাভ করতে পারে? সঞ্জীবনী (১১ই জানুয়ারী ১৯০০) সংবাদ দিচ্ছে ক্রুগার বাৎসরিক ১০৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০ টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করবার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

ডে লা রে ৭ মার্চ ১৯০২ ক্লার্কসডোর্প (Klerksdorp) যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেথুয়েন (Methuen) কে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে মেথুয়েনের মত সম্মানিত বন্দীর যথোপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ তাঁর নেই, তিনি বন্দীকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করে ইংরেজ-শিবিরে ফিরে যাবার সকল ব্যবস্থা করেছেন।

এ রকম মহানুভবতার সংবাদ প্রচারিত ত হতই আরও হয়েছে বুয়রদের পরাজয়কে গৌরব আখ্যায় অভিহিত করা। তখন বাঙ্গালী মন বোথা, ডি ওয়েট, ডি লা রে, জুবার্ট প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে। এমন পরিবার অনেক ছিল যেখানে বুয়র সেনাপতিদের নামে বাঙ্গালী শিশুদের নামকরণ হয়েছে।

আয়র্লণ্ডের সংগ্রাম।

আয়র্লণ্ডের উপর ইংরেজের শাসন ভারতবর্ষ থেকে অনেক পুরাতন। কাজেই তার সংগ্রামের ধরণ-ধারণ, রীতি-প্রকৃতি বাঙলার নিকট একটা বড় শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন থেকে নিবিড়ভাবে ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে আইরিশ যুদ্ধের খুঁটিনাটি ভারতের সংগ্রামীরা সন্ধান করতে আরম্ভ করেছে। আয়র্লণ্ডের অনুকরণে ভারত খুব দ্রুত

অগ্রসর হয় এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে একই সংগ্রাম-পদ্ধতি এই দুই দেশে গৃহীত হয়েছে। আয়র্লণ্ডের সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিস্ফুট হবে।

শাসনযন্ত্রের সমস্ত প্রধান পদে ইংরেজ পাকাপাকি দখলীকার ছিল ১৬০৩ সাল পর্য্যন্ত। তারপর নিদারুণ জনমতের চাপে অতি ধীরে ধীরে বাঁধন শিথিল করতে থাকে। আয়র্লণ্ডে কাথলিকরা ছিল প্রভাবে ও সংখ্যায় প্রধান, আর ইংরেজ বরাবরই প্রটেষ্টাণ্ট সাহায্যে তাদের নানারকম বিব্রত করেছে। ১৭২৭ নাগাদ এর তীব্রতা খুব বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেন থেকে আয়র্লণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য-নীতি নিয়ন্ত্রিত হ'লো, আর১৬৮৯ থেকে প্রায় সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা হ'লো তাদের প্রকাশ্য কর্ম্মসূচী।

আয়র্লণ্ডের প্রচলিত আইন রদ করে ইংরেজ নিজের আইন সেখানে চালু করেছে; তাতে মাঝে মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে দুপক্ষে। ইংরেজ শান্তি পায়নি নানা-রূপ প্রকাশ্য দমননীতি গ্রহণ সুরু হয়ে ১৮৪২ থেকে, পরে প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮৪৬, ও ১৮৮১-তে। ঐ সময় দলে দলে লোক উত্তর আমেরিকা চলে গেছে, ১৮৪১ পর্য্যন্ত নয় লক্ষ লোক। এক ১৮৪২ সালে সংখ্যা উঠেছিল লক্ষাধিক।

আয়র্লণ্ডবাসীর হাঙ্গামার চাপে ইংলণ্ড ক্যাথলিকদের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করতে বাধ্য হয়। প্রটেষ্টাণ্ট জমিদারের শক্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯ পর্য্যন্ত আলু উৎপাদনে বিঘ্ন হওয়ায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ আয়র্লণ্ডকে গ্রাস করে বসে। ১৮৫১-তে অন্ততঃ দশলক্ষ লোকের অনাহারে জীবনান্ত ঘটে, সাড়ে বারোলক্ষ লোক দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়র্লণ্ডের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসো-ন্মুখ হয়ে পড়ে। এ কমাত্র পশু রপ্তানি ছাড়া আয়র্লণ্ডের পক্ষে অপর দেশ থেকে অর্থ-উপার্জ্জন করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। খাদ্যপত্রের দাম অসম্ভব পড়ে যেতে থাকে এবং কাজকর্ম্মের অভাবে লোকের চূড়ান্ত দুর্দ্দশা দেখা দেয়। ১৮৯৩-তে গেলিক ভাষাকে নির্ব্বাসন দেবার চেষ্টা করেছে ইংরেজ। আয়র্লণ্ডের পত্র-পত্রিকা নির্ব্বিচারে লোপ করা হয়েছে। পুলিশের রিপোর্টে সভাসমিতি ভেঙ্গে দেওয়া বা একেবারে রদ করা ছিল সাধারণ নিয়ম।

১৮৭৫ সালে দারুণ অর্থকষ্ট আয়র্লণ্ডবাসীকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছিল; তার ওপর ১৮৭৭-৭৯ অজন্মার পর দুর্ভিক্ষ এসে দেশকে গ্রাস করে বসেছে এবং ১৮৭৯ থেকে ১৮৮২ পর্য্যন্ত যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেটা সংগ্রামপর্য্যায়ে এসে পৌঁছালো। এই হলো মোটামুটি চিত্র, ভারতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য প্রচুর। দুদেশই একই দলন-যন্ত্রে নিষ্পেষিত। যাবার আগে দেশ বিভাগ করে দেওয়া ইংরেজি কূটনীতিতে উভয়দেশে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে উত্তর আয়র্লণ্ডকে প্রায় আত্মসাৎ করে ফেলেছে। পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে আঁতাত রাখতে একটু স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আছে।

এইবার সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক্। পাঠক এদিকে লক্ষ্য রাখবেন যে উভয়দেশের সংগ্রামের পদ্ধতিতে সামান্য তারতম্য থাকলেও একই ভাবে উভয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১১৭০ সালে আয়র্লণ্ডের ওপর ইংলণ্ডের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, ধীরে ধীরে বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠে ১৬৪১ সালে শত্রুকে বিতাড়িত করবার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং এ সময় বহু ইংরেজ নিহত হয়েছে। বিদ্রোহ দমিত হলেও দেশে পর্য্যন্ত আসেনি। লিমারিক (Limerick) এর সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল ১৬৯১। দীর্ঘ আন্দোলনের পর আয়র্লণ্ড কিছুকাল (১৭৮২ থেকে ১৭৯৯) স্বতন্ত্র পার্লামেণ্টের সম্মান সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু ১৮০১ সালে দুই দেশে পার্লামেণ্ট যুক্ত করা হয়।

ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট নিজ নিজ স্বার্থে মিলিত হয় ১৭৯১। উল্‌ফ টোন (Wolfe Tone) হ'লেন প্রবর্ত্তক (১৭৯২); ফিট্‌স্ জেরাল্ড (Fitzgerald) ফ্রান্সের গণবিপ্লব থেকে ফিরে এসে যোগ দেন। দলের নাম

হ'লো ইউনাইটেড আইরিশম্যান (United Irishman) ১৭৯৭-৯৮ উত্তর আয়র্লণ্ডে বিপ্লব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। উল্‌ফ টোন বন্দী অবস্থায় আত্মহত্যা করেন (১৭ই নভেম্বর ১৭৯৮)। দলের অন্যতম নেতা ফিট্‌স্ জেরাল্ড পলাতক অবস্থায় ধরা পড়ার কালে বাধা দেন এবং সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে মারা পড়েন। দলের অন্যতম নেতা টমাস্ এমেট (Thomas Emet) ডাবলিন দুর্গ (Castle) অধিকার ও রাজপ্রতিনিধি (Viceroy)-কে বন্দী করার চেষ্টায় বিফল হবার পর ইংরেজ কর্তৃক ধৃত হন এবং ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮০৩ ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করবার জন্যে ইংরেজ আয়র্লণ্ড থেকে বহু সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তখন একদল আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয় যাতে আয়র্লণ্ডের দাবী মানতে ইংরেজকে বাধ্য করা যেতে পারে। এঁদের চেষ্টায় আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্ত শাসনের দাবী প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এর ফলে অবাধ বাণিজ্যনীতি লাভ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আদায় করা গেল না।

১৮০৬ থেকে ও-কোনেল (O' Connell) এর প্রভাব আয়র্লণ্ডের রাজনীতিতে বেশ গভীরভাবে অনুভূত হ'তে থাকে। ১৮৪০ সালে তিনি পার্লামেণ্টীয় সংযোগ ছিন্ন করার দাবীতে রিপীল এ্যাসোসিয়েশন (Repeal Association) গঠন করেন। এখন থেকে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে আয়র্লণ্ডের দাবী উত্থাপিত হতে থাকে এবং দেশবাসীর সমর্থন বৃদ্ধি পায়।

৮ই অক্টোবর ১৮৪৩ এক আদেশে আয়র্লণ্ডের সমস্ত প্রকাশ্য সমিতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন আইরিশ নেতারা সখেদে বলেছেন যে একজন গুপ্তচরের রিপোর্ট এবং এক রাজপুরুষের মর্জ্জির ওপর একটা সমস্ত জাতি অসহায়।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার জন্য ও-কোনেল কারারুদ্ধ হন। উচ্চতম আদালতের রায়ের বলে মুক্তি-লাভ করার পূর্ব্বে চৌদ্দ সপ্তাহ তাঁকে কারাগৃহে অবস্থান করতে হয়। তাঁর দলের ভিতর থেকেই একটি অংশ বলপ্রয়োগে উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করে। তারা আয়র্লণ্ডের যুব সঙ্ঘ (Young Ireland Group) নামে পরিচিত। ১৮৪৬-তে ও' কোনেল এর দল থেকে সরিয়ে দেন।

এই সময় আর এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। আয়র্লণ্ডের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ভূমির ওপর সমস্ত সত্ত্ব কেবল মাত্র দেশবাসীর। তারা নিজের মত করে বিলি-ব্যবস্থা করবে এবং সে দাবী মানিয়ে নিতে যথাযোগ্য শক্তিপ্রয়োগে পরাঙ্মুখ হবে না। ল্যালর (Lalor) এ মতের উদ্গাতা। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য রাজস্ব বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হলো। মোট কথা স্বতন্ত্র আয়র্লণ্ডের চিন্তাই এর মূল প্রেরণা। ১৮৪৮ সালে ল্যালরের কারাদণ্ড ঘটে।

ল্যালর হলেন আইরিশ কন্‌ফেডারেশনের (Irish Confederation) অন্যতম সভ্য। এর প্রধান উদ্যোক্তা ও'ব্রায়েন (o'Brien) ও সহকর্মী ছিলেন মিচেল (mitchell), ডাফি (Duffy) ও ডেভিস্ (Davis)। এঁদের পত্রিকা ছিল নেশন (The Nation) আর আইরিশ ফেলন (Irish felon). শেষোক্ত পত্রিকায় ল্যালরের মতবাদ খুব বেশী প্রচারিত হতো। পত্রিকা দুখানাই সরকারী হুকুমে বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্রোহ করবার চেষ্টা বিফল হলে ১৮৪৮ সালে সঙ্ঘটিকে দমন করে দেওয়া হয়। ডেভিস, মিচেল ও সঙ্গীদের দীর্ঘ কারাবাস ঘটেছিল।

এর পর যাঁরা এলেন তাঁরা আয়র্লণ্ডের সংগ্রামে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। আইরিশ ফিয়ানা (fianna) অর্থাৎ সৈনিক থেকে নামকরণ হয়েছিল ফেনিয়ান সঙ্ঘ (fenian Association). আয়র্লণ্ডের এক কিম্বদন্তী থেকে নামটি গ্রহণ করেন ও' ম্যাহনি (O'mahony. তিনি ১৮৫৮ যে আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড (Irish Republican Brotherhood) সৃষ্টি করেন তারই একাংশের জন্য ফেনিয়ান নাম গ্রহণ করা হয়েছিল।

ষ্টিফেন (Stephen) আমেরিকায় ছিলেন এই দলের কর্ণধার। আমেরিকা হতে অর্থ সাহায্য আসায় আয়র্লণ্ডের দল অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বলপ্রয়োগে আয়র্লণ্ডকে ইংলণ্ড থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য বিড়াট ষড়যন্ত্র হলো উদ্যমের মূলমন্ত্র।

ফেনিয়ানরা ইংলণ্ডের নানাস্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ১৮৬৭ সালে; কানাডায় এ ঘটনা হয় ১৮৬৬তে। ইংলণ্ড সর্বশক্তি প্রয়োগে প্রতিষ্ঠানকে দমন করেছে। তৎসত্ত্বেও চেষ্টার (Chestor) জেলের ওপর আক্রমণ, ম্যাঞ্চেষ্টার জেলের মধ্যে আবদ্ধ বন্দীদের মুক্তিসাধন ও ক্লার্কেন-ওয়েল (Clerkenwell) জেল ধ্বংস প্রচেষ্টার গুপ্ত-প্রস্তুতির সংবাদ যখন প্রচারিত হলো, তখন ইংরেজ জোড়াতালি দিয়ে আয়র্লণ্ডবাসীদের শান্ত করবার চেষ্টা করেছে।

১৮৬৭ সালের পর ফেনিয়ানরা দু অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকায় ক্লান-না-গেল (Clan na Gael) আর ব্রিটেনে আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড (Irish Republican Brotherhood). এরা প্রথম দিকটায় পার্লামেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার পক্ষপাতী ছিল।

ইতিমধ্যে পার্নেলের) অভ্যুত্থান আয়র্লণ্ডে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

১৮৭০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য আন্দোলনের তীব্রতা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ফেনিয়ানদের সঙ্গে পার্নেলের অনুচরদের সাহচর্য্য স্থাপন চেষ্টা বিফল হলে ফেনিয়ানদের কর্ণধারা উগ্ররূপ ধারণ করে।

১৮৭৯ তে ডেভিট (Davitt) ল্যাণ্ড লীগ (Land League) স্থাপন করেন এবং এই সময় বাঙ্গলার পল্লীর সামাজিক শাসন অস্ত্র "এক ঘরে" বা "ধোপা নাপিত বন্ধ-নীতি চালু হয়। ইংলণ্ডের বড় বড় জমিদারদের এজেন্ট বা নায়েব' তাঁদের আয়র্লণ্ডের প্রজার খাজনা হ্রাস করতে অস্বীকার করায় ১৮৮০ সেপ্টেম্বর ২৪ থেকে বয়কট (Charles C. Boycott)-কে 'বয়কট' করা হয়। ভাড়া করা সশস্ত্র শ্রমিক সাহায্যে শস্য সংগ্রহ সম্ভব হলেও বয়কট সাহেবকে জমিদারী থেকে চিরতরে প্রস্থান করতে হয়েছিল।

১৮৮১ তে ডেভিটের ল্যাণ্ড লীগকে দমন করে দেওয়া হয়।

ফেনিয়ানদের দৌরাত্ম্য চরমে ওঠে। তাদের এক অংশ আইরিশ ইনভিন্সিব্‌লস্ (Irish Idvincibles) ফিনিক্স পার্ক (phoenix park)-এ ক্যাভেণ্ডিস (Fredrick Cavendish) ও বার্ক (Thomas Henry Burke)কে ৬ মে ১৮৮২ (সন্ধ্যা ৭-৮টা) ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল (আট মাস পরে বিশজন আসামী খাড়া করে পাঁচ জনের ফাঁসি, তিন জনের যাবজ্জীবন কারাবাস এবং নয়জনকে বিবিধ গুরুতর সাজা দেওয়া হয়। এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিল কেরী (James Carry)। কয়েক মাস যেতে না যেতেই কেপটাউন থেকে নাটাল যাবার জাহাজে এক রাজমিস্ত্রি ও'ডোনেল (Patrick O'Donnell), কেরীকে গুলি করে হত্যা করেন। লণ্ডনে ও'ডোনেলের ফাঁসি হয়।

পার্নেলের যশ, যখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর প্রভাবও অসীম তখন তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে সেই জেলের নামানুসারে ১৮৮২ এপ্রিলে ইংলণ্ডে ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে কিলমেনহ্যাম Kilmenham সন্ধি স্থাপিত হয়।

কিছু কিছু শাসন সংস্কার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল। ১৮৮৬ মার্চ্চে গ্লাডষ্টোন (E. Gladstone)-এর প্রথম আয়র্লণ্ড শাসন সংস্কার আইন উত্থাপিত হয় এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় বিল কমন্স কর্তৃক গৃহীত হবার পর হাউস অফ লর্ডস্ তাকে আর পাশ করে না।

১৮৯৬ কোনোলি (James Connolly) তাঁর সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি (Socialist Republican Party) ও আইরিশ সিটিজেন আর্মি গঠন করেন। কিছু কাল এরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার

করতে পারে নি। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সঙ্ঘ ভবিষ্যৎ সংগ্রাম-বিধির ইঙ্গিত দিয়েছিল।

ফেনিয়ানদের কর্মকাণ্ডের তৃতীয় ধারা ১৯০৭ থেকে ১৯২২ পর্য্যন্ত বলে ধরা যেতে পারে। ক্লার্ক (Thomas J. Clarke) ও ও' কেলি (Sean T. O'Kelly) ধীরে ধীরে আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড (Irish Republican Brotherhood) এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে চলেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালে ও'কেলির উদ্যোগে সিন্ ফিন্ (Sinn fein) 'আমরা নিজেরা'—all ourselves দল গড়ে ওঠেছিল। এখানে মনে রাখতে হবে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগরক্ষাকামী আলষ্টার দল (Ulster unionists) আলষ্টার ভলান্টিয়ার্স (Ulster volunteers) চমূ সৃষ্টি করলে ১৯১৩ সালে নভেম্বরে রেডমণ্ড (J. E. Redmond)-এর উৎসাহে আইরিশ ভলান্টিয়ার্স (Irish Volunteers) দল গঠিত হয়। ১৯১৩ থেকে ক্লার্ক আর ও'কেলি অধিক মাত্রায় সিন্ ফিন্দের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড ১৯১৪ সেপ্টেম্বর থেকে আইরিশ ভলান্টিয়ার্সের মারমুখী দলকে অধিক মাত্রায় সমর্থন জানাতে থাকে এবং পিয়ার্স (P. Pearse ও প্লনকেট (J. M. Plunkett) প্রমুখ কয়েকজন প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

এই সময় ইংরেজ জার্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এই সময় রেডমণ্ড ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দ্দেশ দেন। তখন আইরিশ ভলান্টিয়ার্স বা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স সম্মত হলেও উগ্রপন্থীরা ইংরেজের বিপদের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে চলে এবং ফেনিয়ান আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড (fenian Irish Republican Brotherhood) গঠন করে আপন পথে চলতে থাকে।

বিদ্রোহী নেতারা আমেরিকাবাসী আইরিশদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বহুলাংশে সফল হয়। অপরদিকে জার্মাণীর সঙ্গে যোগসাজসে অস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থাও চলতে থাকে। ১৯১৪ এপ্রিল লার্নে (Larne) তে ও ২৬ জুলাই হাউথ (Howth)-এ জার্মাণ অস্ত্র নামাবার চেষ্টা আংশিক সফল হয়েছিল।

যুদ্ধ যখন পেকে উঠেছে, তখন নানা বাধা সত্বেও ২৬ মে ১৯১৪ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হোম রুল বিল পাশ করে এই সর্ত্তে যে ঐ বিলের নির্দ্দিষ্ট বিধান যুদ্ধান্তে আয়র্লণ্ডে কার্য্যকরী হবে। কিন্তু ফেনিয়ান আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড ও সিটিজেন আর্মি কালবিলম্ব না করে প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

কেস্‌মেন্ট (R. Casement) যুদ্ধের পূর্ব্ব থেকেই জার্মাণীতে অস্ত্র সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। নরওয়ের পতাকা উড়িয়ে জার্মাণ জাহাজ (Aud) আয়র্লণ্ডের কেরি (Kerry) উপকূলে এসেছিল ২০ এপ্রিল ১৯১৬, আর তার সঙ্গে জার্মাণ সাবমেরিণে ছিলেন স্বয়ং কেসমেন্ট। পূর্ব্ব হতে সংবাদ পেয়ে জাহাজ আটক করা হয়। কেসমেন্ট ধরা পড়েন ২০ এপ্রিল। তাঁর ফাঁসি হয় ৩ আগষ্ট ১৯১৬।

এ সকল ঘটনার পরও বিদ্রোহীদের আর পিছোবার উপায় ছিল না। তখন ক্লার্ক (Thomas J. Clarke], ম্যাক্ ডিয়ারমাডা (Sean mac Diarmada), পিয়ার্স (P. H. Pearse) কোনোলি (J. Connolly.), ম্যাক্‌ডোনাঘ (Thomas Magdonagh) সিঁয়াং (Eammon Ceant). ও প্লকেট (J. M. Plunkett) এই সাত জনের নামে ডাবলিন জেনারেল পোষ্ট অফিস থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। দেড় হাজার সৈনিক সব ঘাঁটি দখল করে বসে ২৪ এপ্রিল (Easter Monday) ১৯১৬; আর ২৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত তারা সামনে লড়াই করে দিনান্তে আত্মসমর্পণের বিষয় ঘোষণা করে।

প্রায় তিন শত যোদ্ধার জীবনান্ত ঘটে। উপরে বর্ণিত সাত জন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে আরও নয়জনকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় ৩ হতে ১২ মে তারিখের মধ্যে। পঁচাত্তর জনের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করা হয় এবং দু সহস্রাধিক বিপ্লবী বিনা বিচারে বন্দী হন।

এই সময় কয়েকটি পত্রিকা বিদ্রোহ প্রচারকার্য্যে দেশের মধ্যে আগুন ছড়াতে থাকে। আগে ছিল

ডেভিটের "নেশন" (Nation), তাকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল, পরে আসে ম্যালর পরিচালিত আইরিশ ফেলন (Irish Felon)। ইংরেজ খুব বিব্রত হয়ে পড়ে এবং বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে ছিল সিন্‌ফিন্ (SinnFein)—এটি হ'ল দলের মুখপত্র। আরও যারা এ পথের যাত্রী ছিল তার মধ্যে আইরিশ ওয়ার্কার (Irish worker). এ দুখানিও যথারীতি বন্ধ হ'লো। বিরাম নেই ; দেখা দিল আইরিশ ভলান্টিয়ার (Irish Volunteer) স্পার্ক (Spark) হিবার্নিয়ান (Hibernian), ন্যাশনালিটি (Nationality) প্রভৃতি। সকলের মধ্যে প্রধান ছিল আইরিশ ভলান্টিয়ার। এতে প্রকাশ্যভাবে গরিলা যুদ্ধের ধরণধারণ, রীতি-পদ্ধতি প্রচার করা হ'তো। আত্মগোপন ও শত্রুকে অতর্কিতে ধরে গুম্ করে রাখার কায়দাকানুন শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার এদেরও আগে ছিল কোনোলির ওয়ার্কারস্ রিপাবলিক (Workers Republic)—এটিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বল্লে অত্যুক্তি হয় না। আর এই সহায়তায় কোনোলি শ্রমিকদের কেবল সঙ্ঘবদ্ধ করা নয়, রীতিমত ঘোর ইংরেজবিদ্বেষী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

ইষ্টার বিদ্রোহের পর ১৯২০তে গভর্ণমেণ্ট অফ্ আয়র্লণ্ড এ্যাক্ট (The Government of Ireland Act) পাশ হয়। এখানেই আলষ্টার দলের সৃষ্টি, এরা ইংরেজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। সিন্‌ফিন্‌দল এ আইন অমান্য করে এবং সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ফলে, ৬ ডিসেম্বর ১৯২১ আইরিশ ফ্রি ষ্টেট (Irish Free state) জন্মলাভ করে এবং গ্রিফিথ (Arthur Griffith) ডেল এরন (Dail Eireann) এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২১—২৩ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এবং প্রথমের দিকেই উগ্রদলের অন্যতম প্রধান সংগ্রামী কলিন্স (M.Collins) নিহত হন। কসগ্রেভ (William T, Cosgrave) তখন শাসনভার গ্রহণ করেন।

এর পরের ঘটনা বিবৃত করার আর প্রয়োজন নেই। তখন ভারতবর্ষ প্রথম পর্ব্বের সংগ্রাম শেষ হয়ে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মডারেটদের রাজনীতির সমাধি হয়ে গেছে বলা চলে।

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান বাঙ্গালীর নজর প্রায়ই এড়িয়ে যেতে পেত না।

সার্বিয়া থেকে সংবাদ পৌঁছাল সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার (Alexander Obrenovic)-এর রাজ্যের প্রজা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তিনি রাজ্ঞী ড্রাগা (Draga)র প্রভাবে পড়ে দেশকে দেশশান্তির সমাধিস্তূপে পরিণত করেছেন এবং প্রজাগণ সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। প্রজারা দুর্দ্দান্ত শাসকের অপসারণের জন্য উপায় খুঁজতে লাগলো, গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'তে বিশেষ বিলম্ব হ'লো না। ১১ জুন ১৯০৩ সম্রাট আলেকজাণ্ডার, পত্নী ড্রাগা, প্রধানমন্ত্রী, সমরসচিব এবং সম্রাটের দুইভাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনভার বিপ্লবীসেনার হাতে চলে যায়। বিচার বিবেচনার পর—চরম মতাবলম্বী দলপতিকে আহ্বান করে তাঁর ওপর সকল ভার ন্যস্ত করা হয়।

রুশ বিপ্লব

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর যাত্রা এইভাবে সুরু হয়েছিল। পর বৎসর, ২৪ জুলাই ১৯০৪ ঘটনার ক্ষেত্র রাশিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। তখন রুশসম্রাট ও পার্ষদদের অত্যাচারে রুশ একেবারে বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সাধারণ নাগরিকের ধন, মান, স্বাধীনতা, জীবন কিছুই নিরাপদ ছিল না। সন্ত্রাসের রাজত্ব দেশকে অভিভূত করে ফেলেছিল। তখন সমস্ত বিপদ নির্য্যাতনের আতঙ্ক উপেক্ষা করে দেশে বিদ্রোহীসঙ্ঘ প্রধানতঃ নিহিলিষ্ট (Nihilist) দল গড়ে উঠেছিল। সকলপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংশ করা হয়েছিল এদের ব্রত। যেমন অত্যাচার তদনুপাতে গুপ্ত সমিতির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। রুশ-জাপান বিরোধের কালে এদের প্রভাব ও উৎপাত চরমে উঠেছিল।

গুপ্তহত্যার লীলা আরম্ভ হয় ১৯০১। প্রধান রাজকর্মচারীরা লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বোগোলেপফ (Bogolepoff) ১৯০১, সিপিয়াজিন (Sipyagin) ১৯০২ সালে দুই প্রভাবশালী সচিবকে হত্যা করা হয়। পরেই স্বরাষ্ট্র (Minister of the Interior) বিভাগের দুর্দান্ত পরিষদ ডি' প্লেভে (D' Plehve)কে হত্যা করা হয় ২৪ জুলাই ১৯০৪। আরম্ভে কয়েকটা খুনখারাপি হয়েছে, দেশ প্রায় অরাজক অবস্থায় পৌঁচেছে প্লেভের ঘটনা নিয়ে ভারতের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা কার্য্যের সমর্থন জানিয়ে আলোচনা করে। সে সকল লেখা বিশ্লেষণ করলে ভারতের উগ্রপন্থীদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে হত্যাকারী প্রাণভিক্ষা করেন নি। জোরের সঙ্গে তাঁর দু'দফা দাবী পেশ করেন। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত লোকসভা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, নির্য্যাতন নিবর্ত্তনমূলক আইনের প্রত্যাহার, জাপানের সহিত যুদ্ধবিরতি, দুর্ভিক্ষরোধের সুব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কারণে বন্দীসকলের মুক্তি এই কয়টি অশান্তির কারণ দূর করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলে প্রকাশ করা হয়।

একেবারে ভারতবর্ষের দাবীর প্রতিচ্ছবি। ২৬ আগষ্ট ১৯০৪ তিলকবন্ধু পারাঞ্জপের পত্রিকা "কাল" লিখে বসলো, "নিহিলিষ্টদের দাবী পড়লে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। প্রতিনিয়ত ভারতে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, আর ভারত সরকার তিব্বতের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে গত কয়েক বৎসর ধরে। পরিতাপের বিষয় দুর্ভিক্ষ-রোধ ও যুদ্ধ পরিসমাপ্তির জন্য ভারতে নিহিলিষ্ট নেই।"

গুপ্তহত্যার শিক্ষা (The Education Value of Murder) শিরোনামায় ২ সেপ্টেম্বর "কাল" লিখেছিল, "রাজনৈতিক ও সাধারণ হত্যা কখনই এক নয়। যখন কোনো রাজা বা প্রধান অমাত্যরা নিহত হয়, তখন সারা পৃথিবীতে তার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। এরূপ হত্যার সংবাদে কোনো উল্কার আবির্ভাব বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতই মনকে অভিভূত করে ফেলে।......এ জাতীয় হত্যায় কারো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা নীচ জিঘাংসা বৃত্তির চরিতার্থতার গন্ধ নেই। সমাজ বা রাষ্ট্রের বিপন্ন অংশকে বিদায় দিয়ে অবশিষ্ট অংশের স্বার্থরক্ষাই এরূপ হত্যার মহদুদ্দেশ্য বলে মনে করা যেতে পারে। ভণিতা ছেড়ে দিলে বলতে হয় এ হত্যা-প্রচেষ্টা প্রমোদমত্ত, বিলাসমগ্ন, পরন্তু অনাচারের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনকারী ধনীর বিরুদ্ধে। প্রত্যুত, নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, সহায়সম্বলহীন হতভাগ্যের কর্ণবিদারক কাতর রোদনধ্বনি। এরূপ হত্যায় কোনো গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই। জগতের কল্যাণেই এ সকল ঘটনা সংসাধিত হয়। প্রথমে কিছু অজানা থাকলেও স্বল্পকালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী এর সুফলের অংশভাগী হয়।"

"কাল" বলেছিল, অনাচারের প্রসূতফল হিসাবে প্লেভের হত্যাকে গ্রহণ করতে হবে। নানাপ্রকারে পত্রিকাখানি এই হত্যাকে সমর্থন জানিয়েছে। যে গুপ্ত সমিতির মনোভাব দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে ইন্ধন যোগ হয়েছে মাত্র। একেবারে ঘরের কথায় এনে তিলক বলেছেন, "কার্জ্জনের সঙ্গে তুলনা করলে প্লেভের অত্যাচার-তালিকা অতি ক্ষুদ্র বলেই মনে হবে। অপরাপর অনেক পত্রিকা এই তালে তাল দিয়েছে: বিস্তৃত আলোচনার আর প্রয়োজন নেই।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রধান কর্মচারি নিহত হওয়া এবং রাজ্য-পরিচালনায় ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির আশঙ্কায় সম্রাট নিকোলাস (Nicholus) ১৭ অক্টোবর ১৯০৫ জনপ্রতিনিধি এক সভা (Duma) গঠন করতে বাধ্য হন এবং নানাক্ষেত্রে যাতে স্বাধীনভাবে কর্ম্মপরিচালনার বাধা বিদূরিত হয়, তার আদেশ জারি করেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ না থাকলে দেশের সর্ব্বক্ষেত্রে অমঙ্গল বৃদ্ধি পাবে। অতএব রুশসম্রাট নাগরিকদের ব্যক্তিগত পূর্ণ নিরাপত্তা, বিবেকপূত কাজ, ভাষণ, মিলন, সঙ্ঘগঠন করবার স্বাধীনতা মেনে নেন। ডুমার অনুমোদন ব্যতীত কোনো আইন বলবৎ হবে না, সে কথা

ঐ সঙ্গে প্রচারিত হয়। সর্ব্বশেষ, সকলের সহযোগিতা, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম মিলিত হয়ে রুশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিয়োজিত হবে বলে তিনি আশা পোষণ করে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

এ সকল সংবাদ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালে বিপ্লবীদের প্রাণে বল সঞ্চার হয়। অত্যাচারী রাজশক্তি যে "শক্তের ভক্ত" এই নীতি প্রচারে উৎসাহী কর্ম্মীরা লেগে যান এবং দেশের মধ্যে নবপ্রেরণার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রুশ জাপান সমর

এ সকলের চেয়ে রুশ-জাপান যুদ্ধ ভারতীয় মনকে খুব বেশী মাত্রায় আলোড়িত করেছিল। রুশ তখন বিরাটকায় মহাবলশালী দৈত্য বলে পরিগণিত হ'তো; আর জাপান পীতকায় ক্ষুদ্রাকৃতি দুর্ব্বল এশিয়াবাসী নগণ্য শক্তি। "কালায়ধলায়" মর্য্যাদার লড়াই সারা পৃথিবীর কাছে এক অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা এবং সমস্ত শ্বেতচর্ম্মধারী ও অশ্বেতকায় জাতি দুভাগে বিভক্ত হয়ে বিপরীত স্বার্থে অধীর আগ্রহে ফলাফল লক্ষ্য করছিল।

শস্ত্রের ঝন্‌ঝনা মাত্র সবে সুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের বিলম্ব আর কতটা তখনও কল্পনার পর্য্যায়ে ঝুলছে। সে সময় 'ট্রিবিউন' (১২ নভেম্বর ১৯০৩) লিখেছিল "ক্ষুদ্রাকৃতি জাপান কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে অসম এক দৈত্যের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে। শেষ পর্য্যন্ত জাপান জয়ী হ'লে সমগ্র এশিয়া রক্ষা পাবে; তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না; মর্য্যাদা শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র জাপান দূর প্রাচ্যে প্রভাতী তারার জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে; এর দ্বারা সমগ্র এশিয়ার জনজাগরণ সূচিত হচ্ছে।"

প্রায় তিন মাস পরে রুশ-জাপান কূটনীতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪, পর দিনই জাপান পোর্ট আর্থারে অবস্থিত রুশ-নৌবহর আক্রমণ করে; আর যুদ্ধ বিঘোষিত হ'লো ১০ ফেব্রুয়ারী। ১৮ ফেব্রুয়ারী জাপানীসৈন্য কোরিয়ার ভূমিতে অবতরণ করে। কুরোকি (Kuroki)-তে গুরুতর সংগ্রাম আরম্ভ হলো। ২৬শে এপ্রিল আর ১ মে রুশ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। ২৬ মে দ্বিতীয় প্রচণ্ড স্থলযুদ্ধ হয় এবং দুপক্ষের ষোলো ঘণ্টাব্যাপী নিদারুণ রক্তক্ষয় ও জীবননাশের পর বিজয়লক্ষ্মী জাপানের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেন। ১০ আগষ্ট দুপক্ষের প্রচণ্ড নৌসংগ্রামে জাপানের অচিন্ত্যপূর্ব্ব জয় বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়।

বছর শেষ হ'লো; ভাগ্যলক্ষ্মী দোদুল্যমানা, যদিও জাপানের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত প্রদর্শন করছেন। কিন্তু ২ জানুয়ারী (১৯০৫) রুশ নৌবহর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১০ই মার্চ্চ জাপানীরা মুকডেন (Mukden) দখল করে। এখানে ৫০,০০০ জাপসৈন্যের প্রাণবিনিময়ে জাপানীরা প্রতিপক্ষের ৩০,০০০ সৈন্যের প্রাণনাশ ও ৪০,০০০ সৈন্যকে বন্দী করে। সে সংবাদে এশিয়া উল্লসিত হয়ে উঠে।

আরও যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেটা সংঘটিত হয় ২৭শে মে (১৯০৫) নৌ-সেনাপতি টোগো (Togo) জাপানীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "এই দিনের যুদ্ধে জাপান সাম্রাজ্যের সকল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, যে পদে যে আছ, তোমার জীবন দিয়ে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হবে বলে আমি ভাবতেও পারি না।"

যুদ্ধারম্ভের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফলাফল সম্বন্ধে সকল অনিশ্চয়তা কাটিয়ে জাপানের জয়জয়কারে সমগ্র এশিয়া প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। রুশের পরাজয়ের অবশিষ্ট যা ছিল সেটা জাপানীরা ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন করে।

এইবার সন্ধি প্রস্তাব; ঘটক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (Rosevelt) সাহেব। ৫ আগষ্ট (১৯০৫) মে-ফ্লাওয়ার জাহাজের ওপর রুশপক্ষে উইটে (Sergius Witte) ও রোজেন (Baron Rosen) আর জাপপক্ষে কোমুরা (Baron Komura) ও তাকাহিরো (Togoro Takahiro) সন্ধিসর্ত্ত আলোচনা করতে থাকেন। খসড়া মনোনীত হলে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পসায়ার (New Hampshire)

এর পোর্টসমাউথ (Portsmouth)-এ মিলিত হয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ২৯ আগষ্ট ১৯০৫।

ভারতবাসী এ যুদ্ধকে অত্যন্ত নিজের বলে মনে করেছে। যুদ্ধে আহত ও নিহত জাপানীসৈন্যের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে পথে পথে অর্থ সংগ্রহ করেছে। অপর পক্ষে ইংরেজ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গজাতি রুশের প্রতিটি বিপর্য্যয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে এই জয় সমস্ত দুর্ব্বল জাতির চিত্তে যে সাহস দান করবে, তাতে ভারতবাসীরা একদিন ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে বদ্ধ পরিকর হবে।

কার্জ্জন সাহেব বলে উঠেছিলেন (১ জুলাই ১৯০৮), "মৃদুগুঞ্জনে (সভয়ে প্রাচীর বৈঠকে) লোকালয়ে আলোচিত এই বিজয় সংবাদ বজ্রনির্ঘোষের মত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। "(The reverberations of that victory have gone like a thunder clap through the whispering galleries of the East.)"

বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন তখন বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক যে সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভারতের হৃদয়ে বা বাহুতে বল সঞ্চার করেছে, তারমধ্যে রুশ জাপানের যুদ্ধ সর্ব্বপ্রধান বলে গৃহীত হয়ে থাকে।

বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্লব যখন রূপ গ্রহণ করেছে এবং তরবারি শাণিত করা আরম্ভ হয়ে গেছে, বাহিরের ঘটনা দ্বারা নূতন প্রেরণালাভের হয়ত বিশেষ প্রয়োজন নেই, তবুও কোনো সূত্র ধরে ইংরেজের বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেরকম ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা নিরুৎসাহ প্রকাশ করে নি।

পোর্তুগালে হত্যা

পোর্তুগালের রাজপথে যুবরাজকে নিয়ে সম্রাট কার্লোস (Carlos) চলেছেন। এমন সময় গুপ্তঘাতক অতর্কিতে আবির্ভূত হয়ে দুজনকেই হত্যা করে জানুয়ারী ১৯০৮-তে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পত্রিকা, যেমন 'অরুণোদয়' (৯ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮) বলে উঠলো, "সকল দেশের যথেচ্ছাচারী রাজার এই ঘটনা হতে শিক্ষালাভ করা উচিত যে যাঁর যত শক্তিই থাকুক তাঁর পক্ষে তরবারি সাহায্যে উৎপীড়িত প্রজাদের চিরকাল শাসনে রাখতে পারবেন।" 'বিহারী' পত্রিকা (১০ ফেব্রুয়ারী ১৯ ৮) লেখে, "অতি পরিতাপের বিষয় দুর্ব্বল ভারতবাসী এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করছে না—"সজীব থাকিলে এখনই উঠিত" এবং পোর্তুগাল-নাগরিকদের মত অত্যাচারীকে অপ-সারণ করে দেশে শান্তি স্থাপিত করতে পারতো।" অপরাপর অনেক পত্রিকাও এই সুরে গান গেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদশক ও বিংশের প্রারম্ভে পৃথিবীতে অত্যাচারীর দমন, স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা বা এতৎসংক্রান্ত যেসকল ঘটনা ঘটে সেসব সতর্ক লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কোনো না কোনো পত্রিকায়, কোনো নেতার ভাষণে লেখায় তার আভাস পাওয়া গেছে। যেগুলি প্রধান মাত্র তার উল্লেখ করা গেছে।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

এরপর রামপদকে দেখছি আমরা পঁচিশ বছর পরে। চুলে পাক ধরেছে, সদা হাস্যময় মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি এখন কলকাতায় বাস করেন ভাড়াটে বাড়ীতে। মা বাবা কেউ জীবিত নেই। দুই কাকা এখনও আছেন তাঁরা গ্রামের বাড়ীতেই থাকেন, বিষয়আসয় দেখেন। দুর্গাপদ বিন্ধ্যবাসিনী যে ঘরগুলিতে বাস করতেন, সেখানে এখন কনকলতা থাকে, ছেলেমেয়ে নিয়ে। তার স্বামী বেঁচেই আছে, কিন্তু চিররুগ্ন বলে কাজকর্ম করতে পারে না। গ্রামের সম্পত্তি থেকে যা আয় হয় তা রামপদ বোনকেই দিয়ে দিয়েছেন, তাতেই তাদের সংসার চলে। রামপদ খুব ভাল করে পাশ করে তখনি তখনি চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁর বিয়েও হয়ে যায় সেই সময়। বউ অন্নপূর্ণা কখনও গ্রামে থাকতেন শাশুড়ীর কাছে কখনওবা কলকাতায় এসে স্বামীর কাছে থাকতেন। এই কারণে বেশ অল্পবয়সেই তিনি সুগৃহিণী হয়ে উঠেছিলেন। সত্তেয়ো আঠারো বছর বয়সে তাঁর ছেলে অভয়পদ জন্মগ্রহণ করে। বিন্ধ্যবাসিনী তখনও বেঁচেছিলেন, তিনি একমাত্র পৌত্রকে ছাড়তে চাইতেন না বলে অন্নপূর্ণাকে তখন বৎসরের ভিতর বেশীর ভাগ সময় গ্রামেই কাটাতে হত। অন্নপূর্ণার আর ছেলেমেয়ে হয়নি।

বাবা মা বেঁচে থাকতে রামপদ ছুটিছাটা পেলেই গ্রামে গিয়ে থাকতেন। কলকাতায় কার্য্যগতিকে তাঁকে থাকতে হত কিন্তু জন্মভূমির প্রতি টান তাঁর বেশী ছিল। আর্থিক দিক্ দিয়ে তাঁর উন্নতি মন্দ হয়নি, পরিবারও খুব ছোট। ঘরে বাইরে অনেকেই তাঁকে কলকাতায় একখানা বাড়ী করতে পরামর্শ দিত। কিন্তু রামপদ তা করেননি, অন্নপূর্ণাও শহর বাস বেশী পছন্দ করতেন না। বাপের বাড়ী বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, মামার বাড়ীতেই তিনি মানুষ, তবু সেই মামার বাড়ীর গ্রামে গিয়েও মাঝে মাঝে মায়ের কাছে থেকে আসতেন। মা মেয়ের বিয়ে হবার পর খুব বেশীদিন বাঁচেন নি। তবে জামাইয়ের বদান্যতায় শেষ জীবনে তাঁকে টাকাকড়ির জন্য কোনো কষ্ট পেতে হয়নি। এর জন্য অন্নপূর্ণা স্বামীর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন মনে মনে।

অভয়পদ যে কার মত দেখতে সে বিষয়ে দুটো মানুষ কখনও একমত হত না। রংটা তার দুর্গাপদর মত উজ্জ্বল শ্যাম ছিল, তবে দুর্গাপদ বেশ বলিষ্ঠ গঠনের মানুষ ছিলেন, অভয়পদ চিরকাল রোগা ছিপ্‌ছিপে। তার অনিন্দ্যসুন্দরী মায়ের সঙ্গে তার কোথাও কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যেত না। বাপের সঙ্গেও কমই। তবে দুজনেরই খুব উন্নত নাসা ছিল। রামপদর চোখ ছিল বেশ বড় আর টানা, অভয়পদর চোখ ছিল ছোট তবে তীক্ষ্ণ।

স্বভাবেও বাবা মায়ের সঙ্গে মিল ছিল না তার। স্বভাবটা তার সরল ছিল না, খানিকটা গোপনচারীই ছিল। পরের দুঃখে সে বিশেষ কিছু বিচলিত হত না, নিজের সুবিধা যাতে হয় সেই পথেই চলত। তার নিজের মত যা তাই সে করবে, কারো পরামর্শ, উপদেশ বা

অনুরোধকে বিশেষ মূল্য দিত না। বাল্যকালে ধমক-ধামকে মাঝে মাঝে চুপ করে যেতে বাধ্য হত বটে, নিজের খোট কিন্তু কখনও ছাড়ত না, সুবিধা পেলেই সেটাকে আবার নূতনরূপে কাজে খাটাত। মেধাবী ছিল বেশ, তবে ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার কাছে বড় বেশী আদর পেয়ে খানিকটা অমনোযোগী হয়ে গিয়েছিল। তবু ক্লাশে কখনও ঠেকে থাকত না, প্রথম তিন চার-জনের মধ্যেই তার জায়গা হত। রামপদ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, অভয়পদর ঝোঁক ছিল তার পিতৃপুরুষদের সংস্কৃত চর্চার দিকে। বিন্ধ্যবাসিনীকে ভজিয়ে সে গ্রামেই থাকবে এবং টোলে পড়বে এই ছিল তার ইচ্ছা, কিন্তু ঠাকুরমা তেমনভাবে তার এ প্রস্তাবে সায় দেন নি, কারণ তিনি জানতেন রামপদ কিছুতেই এতে সায় দেবেন না। অভয়পদ ঠাকুরদাদাকে দলে টানবার চেষ্টাও করেছিলেন, তবে তিনি ত হেসেই সে প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন, বললেন, "তোমার বাবাকেই বড় গ্রামে রেখে সংস্কৃত পড়াতে পারলাম তা তোমাকে! যাও যাও, সাহেবের ছেলে সাহেব হওগে যাও।"

অভয়পদ যখন বারো বছরের তখন বিন্ধ্যবাসিনী মারা গেলেন। এরপর পরিবারে অনেক ভাঙাগড়া অদল বদল হয়ে গেল। অন্নপূর্ণা পাকাপাকি কলকাতায় চলে এলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্গাপদকে দেখবার জন্যে কনকলতা এসে তাঁর ভার নিল। বিন্ধ্যবাসিনীর ঠাকুরের সেবাও সে সযত্নে করতে লাগল। রামপদ কালেভদ্রে এসে বাবাকে দেখে যেতেন। মা চলে যাবার পর গ্রামের বাড়ী তাঁর চোখে বড় অন্ধকার ঠেকত, তবু কর্ত্তব্যবোধে যেতেন। হেমলতার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এক চাকুরে ছেলের সঙ্গে, কাজেই তার সঙ্গে দেখাশোনা রামপদর সব সময়ই হত। এইভাবে কিছুকাল কাটার পর দুর্গাপদ পরলোকগমন করলেন।

আর কয়েক বছরের মধ্যে রামপদর প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণাও তাঁকে ছেড়ে গেলেন। রামপদ এবার গৃহী হয়েও যেন সন্ন্যাসীই হয়ে গেলেন। কাজের মধ্যেই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল, তাই কাজেই আরো বেশী করে ডুবে গেলেন। অভয়পদ তখন ষোলো পার হয়ে গেছে, কাজেই ঝি চাকরের সাহায্যে সংসার একরকম মোটামুটি চলতে লাগল। অভয়পদ মায়ের অভাবটা খুব যে কিছু অনুভব করল তা মনে হল না। মা বড় বেশী সব বিষয়ে বাবার মতাবলম্বিনী ছিলেন, ছেলের মতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিলত না। এখন মা চলে যাওয়ায় বাবা এত দূরে সরে গেলেন যে অভয়পদ কার্য্যত প্রায় নিজেই নিজের কর্ত্তা হয়ে উঠল। তার বাবা বেশীর ভাগ নিজের লেখাপড়ার চর্চা নিয়েই থাকতেন। কলেজের কাজ ছাড়াও তাঁর সুলেখক বলে খুব খ্যাতি ছিল। আগে আগে বাইরে বেরোনটা তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না, ঘরে থাকতেই ভালবাসতেন। এখন আর বাড়ীর কোনো আকর্ষণ ছিল না তাঁর কাছে, এখন যতক্ষণ বাইরে থাকবার সুবিধা পেতেন, ততক্ষণ বাইরেই থাকতেন এমন কি বিদেশ যাবার আমন্ত্রণ এলেও পারতপক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। সুলেখক ছিলেন এবং সুবক্তাও ছিলেন। সুতরাং এরকম ডাক প্রায়ই আসত। সংসার চলত পুরনো চাকর ভগীরথের ব্যবস্থা-মত, তাকে অন্নপূর্ণা নিজের হাতে শিখিয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই বাবুর এবং দাদাবাবুর খাওয়া নাওয়া শোওয়া প্রভৃতি কাজগুলোর কোনো ব্যাঘাত হত না। তবে খরচপত্র বেশী হত, জামা কাপড় বেশী ছিঁড়ত বা হারিয়ে যেত, বাড়ীর বেশীর ভাগ ঘর বারান্দা দিনান্তে রোজ পরিষ্কার দেখাত না। কারো এদিকে বিশেষ নজর ছিল না। অভয়পদর যা বয়স তাতে এসব দিকে চোখ পড়বার তার কথা নয় আর রামপদ স্বয়ং দেখেও দেখতেন না। বিন্ধ্যবাসিনীর সংসারের অম্লান পারিপাট্য সর্ব্বদাই তাঁর স্মৃতিপটে জেগে থাকত। তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন নিজের সংসারও তাঁর চোখে বড়ই সুন্দর লাগত। কিন্তু এখন আর কোনো-দিকে তিনি তাকাতেন না, সব কিছু যে মলিন বিপর্য্যস্ত এও যেন তাঁর মনে দাগ কাটত না। শুধু নিজের বড় শোবার ঘরটিকে তিনি স্মৃতিমন্দিরের মত করে সাজিয়ে রেখেছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীর অনেক জিনিষপত্র, তাঁর

সিন্দুক, তাঁর বিশেষ রকম গড়নের কাঁসা, পিতল, তামার বাসন, তাঁর কারুকার্য্যকরা প্রদীপ পিলসুজ সব এনে নিজের ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলেন। চেনা একজন চিত্রকরকে ধরে তিনি মায়ের একখানা তৈলচিত্র করিয়ে ছিলেন মা বেঁচে থাকতে থাকতেই। ছবিখানি এখনও তাঁর শোবার ঘরে দরজার সামনাসামনি জায়গায় ঝোলান আছে। প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন একমাত্র ছেলের দিকে চেয়ে আছেন। আর এক দিকের দেওয়ালে নববধূরূপিণী অন্নপূর্ণার ছবি। রামপদ ঘরে এমন সুন্দরী পেয়ে প্রথম প্রথম ক্যামেরা কিনে খুব ছবি তুলে বেড়াতেন। মোটা মোটা অনেকগুলি অ্যাল্‌বাম এখনও সে ছবি তোলার হিড়িকের প্রমাণ দেয়। এরইমধ্যে একটি ছবি খুব সুন্দর ওঠাতে, সেটি বড় করিয়ে ও রঙীন করে বাঁধিয়ে রাখা হয়। রামপদর জীবনের দিনের সূর্য্য ও রাতের চন্দ্রমা এখন তাঁর ঘরের দুই দেওয়াল আলো করে হাসছে। অন্নপূর্ণার বধূজীবনের ও গৃহিণী জীবনেরও অনেক শখের জিনিষ এই ঘরেই সাজান আছে। এ ঘরখানির উপর ভগীরথের ইচ্ছা খাটান চলত না। সে শুধু ঘরখানিকে ভাল করে ঝাঁট দিয়ে মুছে দিয়ে যেত। আর সব ঝাড়া মোছা গোছানোর কাজ রামপদ নিজেই করতেন। অভয়পদ নিতান্ত দরকার না হলে কখনও বাবার শোবার ঘরে আসত না। তার অস্বস্তি লাগত। ঠিক যেন মিউজিয়ম। রামপদ যখন বাইরে যেতেন বা বিদেশে যেতেন তখন এঘর তালা দেওয়া থাকত। চাবি তিনি কাছ ছাড়া করতেন না। অভয়পদর এ ব্যবস্থা ভাল লাগত না। এত রকম এত সব জিনিষ, এ ছোঁওয়া যাবে না কেন, ব্যবহার করা যাবে না কেন? বাবাকে ভয় পাওয়াবার জন্য একবার বলল, "মা, ঠাকুরমার গহনাগুলির দাম ত অনেক। এভাবে একটা সাধারণ তালা বন্ধ ঘরে রেখে দেওয়া কি ঠিক? তুমি যখন অন্য কোথাও যাও, তখন এ ঘরে আর কারো শোওয়া উচিত। চাকর বাকরগুলো জানেও যে এ ঘরে অনেক দামী জিনিষ আছে।"

অভয়পদ বা ভগীরথ কেউই পরের ব্যবস্থাতে খুশী হতে পারল না। রামপদ তাঁর ব্যাঙ্কের vault-এ গহনা রাখবার একটা পাকা ব্যবস্থা করে নিলেন।

এইভাবেই চার পাঁচটা বছর কেটে গেল। অভয়পদর পড়াশুনো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নিজের যেমন ইচ্ছা, সেভাবেই সে চলেছে। সংস্কৃতে সে' এম এ পাশ করেছে এবং নানা গবেষণাও করছে। এই লাইনেই সে কাজকর্ম্ম করতে চায়। তাড়াতাড়ি করে সংসারী হবার একটা ইচ্ছাও তাকে পেয়ে বসেছে। গম্ভীর প্রকৃতি বাবার কাছে এসব কথা তোলাও শক্ত। ঘরে ছাই একটা বোনও নেই। বন্ধুদের দিয়েও বলান যায় না, তারা রামপদকে একটু ভয়ের চোখে দেখে এবং এড়িয়ে চলে।

তা অভয়পদর বোন না থাক, তার বাবার বোন ত ছিলেন? ছোট পিসীমা হেমলতা প্রায়ই দাদার বাড়ী বেড়াতে আসতেন। এবারে এসে তিনি প্রথমেই পড়লেন ভাইপো অভয়পদের সামনে। তাকে দেখে বললেন, "দাদা কি বাড়ী নেই নাকি?"

অভয়পদ বলল, "বাড়ী থাকবেন না কেন? নিজের শোবার ঘরে বসে কি সব পিতল কাঁসার জিনিষ পালিশ করছেন।"

হেমলতা বললেন "দেখ কাণ্ড! ও সব নিজে করবার দরকারটা কি শুনি? সন্ধ্যেবেলা একটু বেড়াবে চ্যাড়াবে না ঘরে ঢুকে বাসন মাজতে বসল। কেন, এসব করবার আর কোনো লোক নেই নাকি? ঝি চাকর ত আছে অন্ততঃ।"

অভয়পদ বলল, "ঝি চাকর? তাদের ঘরের ত্রিসীমায় যেতে দেবেন বাবা? আমাকেই বলে ছুঁতে দেন না কিছু।"

তার পিসীমা বললেন, "তবে বাপু ডাগর দেখে একটি বউ নিয়ে এস, বয়স ত হয়েইছে বিয়ের। দাদা যখন তোমার মত কি বড় জোর বছর খানিকের বড় তখনই ত তার বিয়ে হয়ে গেল। দেখ, বল ত কনে দেখি।"

অভয়পদ মনে মনে পুলকিত হয়ে বলল—"আমি

বললেই ত আর হবে না, বাবার মত চাইব আগে? বলবেন হয়ত চাকরি নেই বাকরি নেই, এর মধ্যে আবার বিয়ে কি?''

হেমলতা বললেন, "এই না কি সব বই লিখবি বলে দুই বৃত্তি পাচ্ছিস শুনলাম দাদার কাছে?"

অভয়পদ বলল, "তা ত পাচ্ছি। কিন্তু তাতে কি আর সংসার চলে?"

তার পিসীমা বললেন, "আহা সংসার চালাবার ভার এরইমধ্যে তোমার উপর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি? দাদা ত এখনও দশ বছর কাজ করবে কম হলেও। তার টাকার কিছু কমতি আছে নাকি? একটা ছেড়ে দশটা বউ পুষতে পারে সে। হ্যাঁ, ছেলেমেয়ে অনেক-গুলো হয়ে গেলে অবিশ্যি তখন নিজের রোজগারের দরকার হয় বই কি? তখন শুধু বাবার উপর নির্ভর করলে চলে না। আমার যখন বিয়ে হল তখন পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে ত আলাদা বাসা করতেই পারিনি, শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছি। তারপর তোমার পিসেমশায়ের মাইনে বাড়ল, আমিও কলকাতা চলে এলাম।''

অভয়পদ বলল, "ঐ ত বাবা বেরিয়েছেন ঘর ছেড়ে দেখ তাঁর সঙ্গে কথা বলে," বলে সে তাড়াতাড়ি নীচে প্রস্থান করল।

রামপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার পাতা একটা ছোট খাটিয়ায় বসলেন। হেমলতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হেম কতক্ষণ এসেছিস্ রে?"

হেমলতা বললেন, "এই ত এলাম। তোমার ঘরেই যাচ্ছিলাম তা অভয় এল, তার সঙ্গে দুটো কথা বল-ছিলাম। দাদা কতদিন আর এমনি করে থাকবে? বউদি গিয়ে অবধি বাড়ী যেন হানাবাড়ী হয়ে আছে। ঝি চাকরে কি আর সংসার চালাতে পারে? একেবারে ভূতের বাগান হয়ে আছে যেন। মায়ের সংসার দেখেছি, বউদির সংসার দেখেছি, সব যেন নূতন সোনার গহনার মত ঝলমল করত, আর এখন দেখ দেখি? দিনান্তে ঝাঁট পড়ে কিনা সন্দেহ। দুটো যে রাক্ষস পুষছ, তারা ত মহিষের মত পেট মোটা করছে নিজেদের, তোমাদের খেতে টেতে দেয়? ছেলেটাকে দেখলে ত মনে হয় যেন আধপেটা খেয়ে আছে।

রামপদ ম্লান হাসি হেসে বললেন, "উপায় কি বল? ভগবান যা নিয়ে গেছেন তা ত আর ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন না? এখানে এসে এই সংসারের ভার নেবে, এমন ত কোনো মানুষ দেখিনা। সকলেরই নিজের সংসার আছে।''

হেমলতা বললেন, "তা যেমন অবস্থা সেইমত ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে একজন মেয়েমানুষ না থাকলে কি ঘরের কোনো ছিরি থাকে? যারা গেছে তারা ত সত্যিই আর ফিরবে না। নূতন মানুষ আন। ছেলের বিয়ে দাও, বউ আন। ডাগর দেখে আন যেন এসেই নিজের ঘর সংসার বুঝে নিতে পারে। ঘাড়ে পড়লে সব মেয়েই তাড়াতাড়ি গিন্নি হয়ে বসে। মনে নেই পনেরো ষোল বছর বয়সেই বউদি কিরকম সুন্দর করে ঘরকরণা করত? মা তাকে হাতে ধরে এমনি শিখিয়ে-ছিলেন।

রামপদ বললেন, "ওরকম শিখাবার লোক আর শিখবার লোক কি হট্ করতেই পাওয়া যায়? দৈবাৎ জোটে কপালে। আর এত অল্প বয়সে বিয়ে করতে খোকা কি রাজী হবে? সবে ত একুশপুরে বাইশ চলছে।''

হেমলতা বললেন, হ্যাঁঃ, রাজী আবার হবে না। বলে "ও ক্যাংলা ভাত খাবি, না হাত ধোবো কোথায়? আজই বিয়ে ঠিক কর, ও এখনি নাচতে নাচতে বিয়ে করতে ছুটবে। মনে মনে পুরো সাধ আছে বিয়ের। আজ কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরোতে তর সয়না, বলে এখনি গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বল।"

রামপদর বিষণ্ন মুখ হাসিতে ভরে গেল। বললেন, "বেটার এমন সঙীন অবস্থা হয়েছে ত জানতাম না। জানবই বা কি করে? কথাবার্ত্তা ত বিশেষ হয়না আমার সঙ্গে?

আমারও দোষ আছে, তাকে প্রয়োজন না হলে

কাছে ত ডাকি না। তবে বড়ই অল্পবয়স, এখনই সংসারে না ঢুকলে পারত। আর এই শ্রীর ত সংসার। কে বা বউকে দেখবে, কে বা শেখাবে? আমি বাবা মায়ের ভরপুর সংসারের মধ্যে বিয়ে করেছিলাম, মা বউকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছিলেন। শেষে পরের মেয়ে এনে কি বিপদে পড়ব?"

হেমলতা বললেন "তা বললে আর চলে কই? ছেলের যখন এত ইচ্ছে বিয়ে করবার তখন দেওয়া ভাল, নইলে বিগ্‌ড়ে যেতে পারে। বড় দেখে মেয়ে আন, জানাশোনা ভদ্রবাড়ী থেকে, অল্পদিনে তৈরি হয়ে যাবে। তোমাকেও দেখা দরকার, অভয়কেও দেখা দরকার। সংসারটা একবার ভেঙে গেছে বলে আর কি গড়ে তুলতে হবে না? আমি ঘনঘন আসব এখন, দেখাশোনা করব। মেয়ে দেখ তুমি দাদা, এতে অবহেলা কোরোনা। আমিও দেখব জানাশোনাদের মধ্যে।"

রামপদ বললেন, "ছেলে কি রকম স্ত্রী চান সেটা ত জানা দরকার। আমি আনব নিজের পছন্দ মতন, কিন্তু ছেলের পছন্দ হয়ত সম্পূর্ণ অন্যরকম, সে হলে ত চলবে না। যে বিয়ে করবে তার পছন্দটাই সবার আগে দেখতে হবে।"

হেমলতা বললেন, "সে ত ঠিক কথা। তবে তার কিরকম পছন্দ সেই কথাটাই জানি আগে। ওটা প্রায় সব ছেলেরই একরকম। খুব ডানাকাটা পরীর মত সুন্দর হবে আর একরাশ টাকা সঙ্গে আনবে। আর মুখে তার রা থাকবে না।"

রামপদ বললেন, "বাঙ্গালীর সংসারে ডানাকাটা পরী ত অত সুলভ নয়। চাইলেই পাওয়া যায় না। আর মেয়ের সঙ্গে একরাশ টাকা দাবি করা আমি একেবারেই ভাল মনে করি না। সাত চড়ে যার মুখে রা বেরোবে না, সে হয় জড়বুদ্ধি নয় বোবা। এমন বউ কোন্ কাজে লাগবে?"

হেমলতা বললেন, "কাল এসে অভয়কে ডেকে সব কথা খোলাখুলি জিজ্ঞেস করব।"

রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো মেয়েকে এ মধ্যে পছন্দ করে বসে নেই ত?"

হেমলতা বললেন, "তা ত মনে হল না। মেয়ে সে দেখবে কোথায় যে পছন্দ করবে? কারো বাড়ী ত যায় না। বন্ধুরা ত বেশীর ভাগই মেসে থাকে।"

রামপদ বললেন, "আচ্ছা, কাল এসে কথাবার্ত্তা করে দেখ, তারপর কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে।"

এমন সময় ভগীরথ বাবুর চা জলখাবার হাজির করাতে হেমলতা উঠে পড়লেন। বললেন "উঠি আজকে, ছেলেরা খেলা সেরে বাড়ী ফিরেছে এতক্ষণ।

কাল আরো সকাল করে আসব। কাল ত রবিবার, সবাই বেলা করে নাইবে খাবে।

রবিবার বেশীর ভাগ বাড়ীতেই খাওয়া, নাওয়া, শোওয়া সব ব্যাপারেই ঢিলে পড়ে। খালি রামপদর দিনের ছক যেভাবে কাটা আছে, তার কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। কাজেই ভগীরথকে হাঁড়িমুখ করে সেই ভোর ভোর চা জলখাবার তৈরি করে বাবুকে দিয়ে আসতে হয়। অভয়পদর খাবার ঢাকা পড়ে থাকে, সে মনের সুখে ন'টা অবধি ঘুমিয়ে ঠাণ্ডা জলখাবার আর গরম করা চা খায়। তারপর ভগীরথ ধীরে সুস্থে বাজার করতে যায় এবং সাড়ে দশটার আগে ফেরেই না। দুটো উনুন ধরিয়ে চট্‌পট্ একটা নিরামিষ তরকারি আর একটা মাছের ঝাল বা ঝোল করে দেয়। ১১টার মধ্যে রামপদর খাওয়া হয়ে যায়। বেশীর ভাগ রবিবারেই নিরামিষ তরকারিটার আনাজগুলো সিদ্ধ হয় না, এবং মাছের ঝোলটায়ও উগ্র গন্ধ থাকে কাঁচা মশলার কিন্তু এ সব ত্রুটি হয় কারো চোখে পড়ে না, নয় পড়লেও সে বিষয়ে কেউ কিছু বলে না।

তাই আজ যখন হেমলতা ছোট টিফিন-ক্যারিয়ারের বাটিতে করে তিন চার রকম মাছ আর তরকারি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রান্নাঘরের সামনে, তখন, ভগীরথ সবে এসে দ্বিতীয় উনুনটায় আঁচ দিয়েছে, আর ভাঙা

তালপাখা দিয়ে প্রাণপনে বাতাস করছে। হেমলতা বললেন, "কিরে এত বেলায় উনুন ধরাচ্ছিল যে ?"

ভগীরথ বলল, "কি করব পিসীমা ? এক হাতে সব ত ? বাবু দাদাবাবু কেউ ঝিয়ের হাতে চা খাবে না। ও নাকি নোংরা। তা ঝি মানুষ, সে কি আর মেম-সাহেবের মত পরিষ্কার হবে ? কাজেই দাদাবাবুকেও চা খাইয়ে তবে ত রবিবারে আমি বাজার করতে বেরোই। এদিকে আবার ১১টায় বাবুকে ভাত দিতে হবে, নইলে তিনি আর খাবেনই না। ঝামেলা কি কম ? গিন্নিমা মারা গেলেন না আমাকে মেরে রেখে গেলেন। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে কথা দিয়েছিলাম যে এ বাড়ীর কাজ কখনও ছেড়ে যাব না, কাজেই যা থাকে কপালে চালিয়ে যাচ্ছি। দুটো উনুন না ধরালে তরকারি মাছের ঝোল ১১টার মধ্যে হয় কই ? তাই রবিবারে দুটো উনুনই ধরাতে হয়।"

হেমলতা বললেন, "আজ আর অত ঝামেলা করতে হবে না। ছুটির দিন আজ পাঁচখানা রান্না করেছিলাম ঘরে। তাই দাদা আর অভয়ের জন্যে নিয়ে এলাম খানিক খানিক। তোদের দুজনের জন্যে শুধু তরকারি মাছ কর, ওদের এতেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি উপরে যাচ্ছি এখন।"

অভয়পদ দেখতে শুকনো হাড় জিরজিরে হলে কি হয়, দেহে ও মনে বসন্তের আগমন তার ঠিক সময়ে বরং ঠিক সময়ের আগেই হয়েছিল। বন্ধুদের ভিতর আদিরসাত্মক শ্লোক আওড়াতে তার জুড়ি মিলত না। সবাই বলত খালি সংস্কৃতের চর্চ্চা করে করে সে বেজায় অসভ্য হয়ে গেছে। কুড়ি বছর পার হতে না হতেই তার এম্ এ পাশ করা হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সে নিজেকে যথেষ্ট সাবালক ও প্রাপ্তবয়স্ক ভাবত। সহপাঠী-দের মধ্যে বিয়ে দুচারজনের হয়েছে, তাদের কাছে বিবাহিত জীবনের নানা গল্প শুনে অভয়পদর রক্তটা একটু বেশী গরম হয়ে উঠছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল, এক বছরের মধ্যে বিয়ে সে করবেই যেমন করে হোক। বাবাকে দিয়েই বিয়েটা দেওয়াতে হবে। ও সব নিজে গিয়ে প্রেমে পড়াটড়া তার দ্বারা হবে না, ওরকম কর্ম্ম-টাকে সে বড়ই অনাচার মনে করে। সনাতন মতে যেভাবে গুরুজনরা পাত্রী নির্ব্বাচন করেন সেটাই ভাল। তাঁদের অভিজ্ঞতা কত বেশী তাঁরা স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছেন কতদিন। তাঁদের চেয়ে সে কি আর বেশী বুঝবে ? হয়ত চটকদার চেহারা দেখেই ভুলে যাবে। মেয়ে হয়ত সুশীলা ও পতিগতপ্রাণা নাও হতে পারে একথা মনেই রাখবে না। সে চায় শাস্ত্রমতে সুগৃহিণী ও পতিব্রতা ভার্য্যা, আধুনিক ভাবাপন্ন মেমসাহেব নয়। এই জন্যে গ্রামের মেয়ে হলেই তার সুবিধে বেশী। কিন্তু বাবাকে এ সব কথা বোঝাবে কে ? পাড়াগাঁয়ের ছেলে হয়েও তিনি ত নিজে প্রায় love এ পড়েই বিয়ে করেছিলেন সে গল্প শুনেছে। তার মা আশ্চর্য্য সুন্দরী ছিলেন কাজেই love-এ পড়তে আর বাধা কি, বিশেষ ঠাকুরমা ঠাকুরদাদাই যখন মেয়ে খুঁজে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার নিজের বেলায় এরকম সুবন্দোবস্ত হবার কোনো সম্ভাবনা নেইত ? একে ত তার মা নেই। বাবা ত ঘরে থেকেও সন্ন্যাসী, সমাজের সঙ্গে প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই তাঁর। তিনি কি আর ঠিক উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে আনতে পারবেন ? দুজন পিসীমা আছেন অবশ্য, এঁদেরই শরণ নিতে হয় এখন। একজন যে গ্রামে থাকেন এটা আরোই সুবিধার কথা। গ্রামের মেয়েরা অত স্বাধীন প্রকৃতি হয় না, স্বামীর কথা শুনে চলে। তার গ্রামের বাড়ীতে যে দুজন ঠাকুরমা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের দিকে চেয়ে দেখ না। এখনও ঠাকুরদাদাদের দেখলে মাথায় কাপড় দেন, কোনো কথায় অমান্য করেন না। তাঁরা খেলে পরে সেই পাতে বসে খান। আর এখনকার মেয়েরা ? তার বন্ধু পরেশের স্ত্রীকে তার পাতে খেতে বলাতে সে নাকি নাক সিঁটকে বলেছিল, "এ রাম, যা নোংরা তুমি, তোমার পাতে আবার মানুষে খেতে পারে নাকি ? আমি বরং উপোষ করে থাকব।" এই রকম বউ হলে সে তাকে নিয়ে সংসার করতে পারবে না। তার পছন্দমত বউ কলিকালে হয়ত পাওয়া শক্ত, বিশেষ এই কলকাতায়

শহরে, তবু চেষ্টা ত করতে হবে? ছোট পিসীমাকে বলবে সে, বড় পিসীমাকে একটা চিঠি লিখতে এ বিষয়ে। কিন্তু আগে বাবার সঙ্গে তাঁর কথাটা হয়ে যাক। সবার আগে বাবার অনুমতিটাই দরকার।

রবিবারে তাই সে আর বাইরে বেরোয় নি, ঘরেই বসেছিল ছোট পিসীমার অপেক্ষায়। সবে চায়ের পেয়ালা মুখের কাছ থেকে নামিয়েছে এমন সময় দেখে যে তিনি ছোট একটা টিফিন-ক্যারিয়ার নিয়ে উপরে উঠে আসছেন। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি ছোট পিসীমা, অত বাটি ঘটি ভর্ত্তি করে কি নিয়ে এসেছ?"

হেমলতা অভয়পদর ঘরে ঢুকে হাতের বাসন জানলার চৌকাঠের পাশে নামিয়ে রাখলেন। তারপর তক্তপোষের উপর বিছান এলোমেলো তোষক, চাদর সব একপাশে ঠেলে সরিয়ে শুধু কাঠের উপর বসে পড়লেন। বললেন "চান করে এসেছি বাপু, এই সবের মধ্যে বসব না। তোদের ঝিটা করে কি? এখন পর্য্যন্ত বিছানা তোলেনি? বাটিঘটিতে কি আর থাকবে? গঙ্গাজল আছে।"

অভয়পদ বলল, "কিন্তু গঙ্গাজল থেকে এমন আদা পেঁয়াজ গরমমশলার গন্ধ বেরচ্ছে কেন? আর বিছানা ওঠান কেন হয়নি জানতে চাও। আমি নিজেই যে এতক্ষণ উঠিনি, তা ঝি বিছানা তুলবে কি করে?"

হেমলতা বললেন, "কি বিচ্ছিরি অভ্যেস করেছিস বাবা সূয্যি মাঝ আকাশে উঠতে চায় আর এখনও রাতের বিছানায় গড়াচ্ছিস? ঘরে না পড়েছে ঝাঁট, না পড়েছে জাতা। এমন করলে সংসারে লক্ষ্মী থাকে? কে বলবে যে ব্রাহ্মণের বাড়ী।

অভয়পদ বলল, "নামেই ব্রাহ্মণের বাড়ী, কাজে কাগের বাসা। এতে আবার লক্ষ্মী কোথা থেকে আসবে? ব্যবস্থা করলে কিছু লক্ষ্মীটক্ষ্মি আনবার? বাবার সঙ্গে কিছু কথা হল?

হেমলতা বললেন, "বাবাঃ, ছেলের আর তর সয়না। কাল থেকে সারাক্ষণই ঐ কথাই ভাবছিস বুঝি? তা হয়েছে কথা। দাদার অবিশ্যি ইচ্ছে ছিলনা এত সাত তাড়াতাড়ি তোর বিয়ে দেবার, তা তুই বিয়ে করতে চাস শুনে রাজী হয়ে গেল। তবে বাপু মুখ ফুটে বলতে হবে কি ধরণের বউ তোমার পছন্দ, নইলে তোমার বাবা মেয়ে খুঁজতে যাবেননা।"

অভয়পদ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "এই সেরেছে। আমি কি করে বলব কিরকম মেয়ে ভাল হবে? সে ত তোমরা বুঝবে।"

হেমলতা বললেন, "আমরা পছন্দ করে যাকে আনব তাকে খুশী মনে মেনে নেবে ত? না তখন হাঁড়িমুখ করে দাপাদাপি করবে? এমন করে অনেক ছেলে। এই জন্যই ত দাদা তোমার পছন্দ কেমন তা জানতে চান। সবার আগে ত দরকার পরমাসুন্দরী?"

অভয়পদ বলল, "সবার আগে পরমাসুন্দরী কেন হতে যাবে? মেয়ের স্বভাব চরিত্র, শিক্ষা দীক্ষা, বংশ পারিবারিক অবস্থা এ সব দেখতে হবে না? তারপর ত রূপ?

তার পিসীমা বললেন "একেবারে যে বুড়ো ভট্‌চাযি্যর মত কথা বলছিস রে? তা ভাল, আজকালকার ছোঁড়াদের ত দেখি খালি রূপ আর গান আর নাচের খবর দরকার। এতে যে তাঁদের সংসারের কি সুরাহা হবে জানিনা, আর রূপ থাকেই বা ক'দিন? দুটো ছেলেমেয়ে হল ত বউও অমনি রক্ষেকালী মূর্ত্তি ধরল।"

অভয়পদ তাড়াতাড়ি বলল, "তাই বলে দেখে শুনে কুৎসিৎ পাত্রী আনবার দরকার নেই। সমাজে বার করতে হবে ত? আমি বলছিলাম কি অন্য সব দিকে যদি ভাল হয়, তাহলে রং একটু কম হলেও কিছু এসে যাবেনা।"

"এইত বুদ্ধিমানের কথা। আর দিগ্‌গজ পণ্ডিত-টণ্ডিত চাইনা ত? খুব বড় মেয়ে চাস না ছোটখাট হলেও চলবে?"

অভয়পদ নাক ফুলিয়ে বলল, "পণ্ডিত নিয়ে কি করব? সে কি কলেজে কাজ করবে? তবে বাংলাটা ভাল জানা চাই, আর সঙ্গে সংস্কৃতও একটু জানলে ভাল। খুব ছোট মেয়ে এনোনা পিসিমা, খালি বাপের বাড়ী

যাবার জন্যে নাকে কাঁদবে। এসেই ঘর সংসার বুঝে নিতে পারবে, এতটা বড় চাই। আর স্বভাব চরিত্র বংশ এসব ত দেখবেই। আমাদের সঙ্গে সমান ঘরের মেয়ে চাই, তাঁরাও যেন আমাদের কাছে মাথা হেঁট না করেন আমরাও যেন তাঁদের কাছে মাথা হেঁট না করি।”

হেমলতা বললেন “যাক, বোঝা গেল মোটামুটি। আর টাকা চাই সিন্দুক বোঝাই ত?”

অভয়পদ বলল, “সে সব বাবা বুঝবেন, তোমরা সবাই বুঝবে। ও সব কথায় আমি থাকতে চাই না।”

এমন সময় রামপদ স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাক দিলেন, “ভগীরথ।

“যাই বাবু” বলে ভগীরথ কিছু জিনিষপত্র নিয়ে দুড়মুড় করে উপরে এসে হাজির হল। বারান্দা ঝেঁটিয়ে আসন পাতল, গেলাশে জল গড়িয়ে রাখল, তারপর নীচে চলল ডাল ভাত আনবার জন্যে। হেমলতাও তাঁর মাছ তরকারীর বাটিগুলি নিয়ে বারান্দায় এসে রামপদর সামনে বসলেন। অভয়পদও এসে আসন গ্রহণ করল।

রামপদ বললেন, কি এত রান্না করে নিয়ে এলি? খুব যে সুগন্ধ বেরচ্ছে।”

হেমলতা বললেন, “দেখনা খেয়ে কেমন হয়েছে। বাড়ীতে ত কোনো সুখ্যাতি পাবার আশা নেই, খালি বলবে, বাবাঃ কি যে রাঁধ, এত ঝাল কেন? আবার ছেলে মেয়েরা ঝাল না হলে খেতেই চাইবে না, বেশ ঝাল না হলে নাকি কোনো স্বাদই হয় না।”

রামপদ বললেন, “দুই যুগের মানুষের দুরকম রুচি হল বিষয়েই।” ভগীরথ ডাল ভাত নিয়ে আসার পর খাওয়া আরম্ভ হল।

রামপদ খেতে খেতে বললেন, “ভালই ত রেঁধেছিস। তোর রান্না প্রবোধের পছন্দ হয়না কেন?”

হেমলতা বললেন, “ছোটবেলায় বোষ্টোম মামাবাড়ীতে থাকত? সব কিছু ‘মধুর’ না হলে ওদের খেতে ভাল লাগেনা। ছেলেমেয়েগুলো তেমনি হয়েছে কটর রেচো। ওর মধুর-টধুর ভাল লাগে না, ঝাল টকই পছন্দ করে। ঐ নাকি তোমার খাওয়া হয়ে গেল দাদা? এই খেয়ে বেঁচে আছ কি করে?”

অভয়পদ বলল, “তোমাকে যদি ভগীরথের রান্না রোজ দুবেলা খেতে হত, তাহলে তুমিও এর বেশী খেতেনা।”

হেমলতা বললেন, “তোমার বউ আনব বাপু পাকা রাঁধুনী দেখে, তাহলে তোমাদের খাওয়ার ছিরি ফিরবে।

বাবা ও ছেলে দুজনেরই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভগীরথও এসে দাঁড়িয়েছে এঁঠো বাসন তুলবার জন্যে। হেমলতা বললেন, “নে বাবা ভগীরথ, এ বাসন ক’টা নিয়ে যা। মাছ তরকারি যা আছে তোরা খেয়ে নিস্। বাটিগুলি ছাই দিয়ে ঘষে মেজে দিস, যেন তেল ম্যাড় ম্যাড় না করে।”

ভগীরথ খুশী মনে বাসনগুলো নিয়ে চলে গেল।

রামপদ বললেন, “শুভলগ্নে আজ ওর ভোর হয়েছিল। গলা অবধি ভর্তি করে খাবে আজ।”

অভয়পদ তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেল। রামপদ বললেন, “চল আমার ঘরে একটু বসবি চল, অভয় কি বলল তোকে শুনি একটু।”

হেমলতা খাটের উপর বসে বললেন, “বলল ত অনেক কিছু। তোমার ছেলে আজকালকার কলেজে পড়া ছেলে হবে কি, পছন্দ ত বুড়ো ভট্‌চাজ্জির মত। মেয়ে ইংরিজি পড়া আজ কালকার শহুরে মেয়ে হলে চলবেনা। অথচ বেশ বড়সড় হতে হবে, যেন এসেই সংসার বুঝে নেয়। নাকে কাঁদা খুকী হলে কিছুতেই চলবেনা। খুব রূপসী না হলেও চলবে কিন্তু মেয়ের স্বভাব চরিত্র, শিক্ষা দীক্ষা, বংশপরিচয় এ সব নিখুঁৎ হতে হবে। টাকাকড়ি থাকে ভাল, না থাকে তাতে তার আটকাবেনা, যদি তোমার না আটকায়। আমাদের সমান ঘরের মেয়ে হতে হবে।”

রামপদ বললেন, “এমন সোনার পাথরবাটি সহজে ত মিলবেনা। যে ধরণের মেয়ে চায়, তা গ্রামে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানে আকাট মূর্খ অতি নাবালিকা মেয়েই বেশী, সে ওর পছন্দ হবে না। বড়সড় মেয়ে ওখানে ঘরে আর রাখে কে? নিতান্ত কোনো খুঁৎ থাকে

তাহলেই মেয়ে বড় হয়ে ঘরে থাকে, আর বছরের পর বছর বয়স ভাঁড়িয়ে চলে।”

হেমলতা বললেন, “এই দেখ না, দিদির বড় মেয়েটা সবে তেরোয় পড়েছে বুঝি, এরই মধ্যে তার বিয়ের জন্যে দিদি একেবারে হৈ হৈ লাগিয়ে দিয়েছে।

রামপদ বললেন, “কনককে একটা চিঠি লেখনা। ওদিকে গরীবের ঘরে বড় মেয়ে থাকলেও থাকতে পারে। কলকাতায় ঠিক ঐ রকম মেয়ে পাবেনা সহজে। এখানের চাল চলন শিক্ষা দীক্ষা কিছু আলাদা। ঘোমটা টেনে কনে বউ হয়ে থাকবে, সকলের বাধ্য হয়ে থাকবে, আজকাল সে আদর্শ আর নেই। থিয়েটার বায়োস্কোপও দেখতে চাইবে।”

হেমলতা বললেন, “সেও আজকাল গ্রামের মেয়েরাও চায়। আচ্ছা দিদিকেও লিখে দেখি, আর তুমিও একটু চোখ কান খোলা রেখো। তোমার সঙ্গে যাঁরা চাকরি-বাকরি করেন, সকলেই ত গৃহী মানুষ, মেয়ে অনেকের ঘরেই আছে। তোমার ছেলেকে পেলে সবাই লুফে নেবে। আচ্ছা, আমি চলি তাহলে এখন। ওদের খাবার সময় হল। ও ভগীরথ, একটা রিকশ ডেকে দে ত। আর বাসন ক'টা ধোওয়া হল ?”

অতঃপর জিনিষপত্র নিয়ে হেমলতা প্রস্থান করলেন। রামপদ ছুটির দিন দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেন, তিনি পাশ ফিরে শুলেন। অভয়পদ নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবী বধূকে কল্পনার চোখে দেখতে লাগল। একটা জিনিষ সে একটু ভুল করে ফেলেছে। টাকাকড়ি খুব বেশী সে চায়না, এই ধারণা হয়েছে ছোট পিসীমার। কিন্তু নিতান্ত গরীব ঘরের মেয়ে আনবার তার ইচ্ছে নেই। তারা বড় হ্যাংলা হয়। অভয়পদ ছোটকাল থেকেই ভাল খেয়ে, ভাল পরে ভাল ঘরে থেকে অভ্যস্ত। এখন না হয় দেখাশোনার অভাবে তারা অযত্নে পড়েছে, কিন্তু টাকা যে খরচ হচ্ছেনা তা ত নয় ? বড় ভাল বাড়ীতে রয়েছে ঝি রয়েছে চাকর রয়েছে, কোথায়ও যেতে হলে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে যায়। কাপড় চোপড় জিনিষপত্রে বেশ পয়সা খরচ করে। কিন্তু এ সবই ত বাপের পয়সায় ? তিনি যখন থাকবেন না, তখন ? যদিই সে নিজে তেমন ভাল রোজগার না করতে পারে ? সংস্কৃতজ্ঞ মাষ্টারের কিই বা এমন বেশী রোজগার হবে ? তখন ত অভাবে পড়তে হতে পারে ? কলকাতায় বাবা কিছু বাড়ীঘর করেননি। করবার সঙ্গতি আছে কিনা অভয়পদ কিছুই জানেনা, রামপদ কোনোদিনই আর্থিক বিষয়ে ছেলের সঙ্গে কোনো কথাবার্ত্তা বলেননা। তবে গ্রামের বিষয়-সম্পত্তি যে কার্য্যতঃ বড় পিসীমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সে ছোট পিসীমার কাছে শুনেছে। এখন এক্ষেত্রে যদি সে একটি অতি গরীব ঘরের মেয়ে নিয়ে আসে তা হলে বিপদে পড়তে হতে পারে। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা ছুতো করে তার ভাই বোনও কয়েকটা এসে ভগ্নী-পতির কাঁধে চাপতে পারে। এ রকম হতে সে দুচার জায়গায় দেখেছে। নাঃ, এ বিষয়ে বাবা এবং পিসীমা দুজনের সঙ্গেই কথা বলতে হবে। মুস্কিল এই যে রবিবার ছাড়া এদের দুজনের একজনেরও অবসর হয়না। তার মানে আরো সাতটা দিন। অভয়পদ নিজে যেতে পারে হেমলতার বাড়ী, কিন্তু যা লোকের ভীড় সেখানে, নিরি-বিলিতে কথা বলবার কোনো সুযোগই সেখানে নেই।

যাক্, বিধাতা বোধহয় সদয় ছিলেন অভয়পদর প্রতি সেদিন। চা খাবার পর রামপদ ছেলেকে ডেকে বললেন, “খোকা, এখন কোথাও বেরোচ্ছ নাকি ?”

অভয়পদ বলল, “না, এখনি কোথাও বেরোবনা, যা রোদ ! পরে হয়ত বেরোতে পারি।”

রামপদ বললেন, “বারান্দায় এসে বোসো তাহলে। তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার আছে।”

অভয়পদ এসে বসল বারান্দার পাতা খাটিয়ায়। তার বাবাও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, “কতগুলো কথা তোমাকে বলা দরকার। এত দিনে বলি বলি করেও বলা হয়নি, ভাবতাম ছেলেমানুষ আছ, তাড়া কি ? একদিন বললেই হবে। কিন্তু এখন আর ফেলে রাখা যায় না, সংসারী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করছ যখন। কথাটা

আমাদের সাংসারিক অবস্থা ব্যবস্থার কথা। তুমি এ বিষয়ে কখনও ভাবনি বোধ হয়।"

অভয়পদ বলল, "ভেবেছি মধ্যে মধ্যে। তবে কোথায় কি আছে জানি না ত।"

রামপদ বললেন, "পৈত্রিক যা কিছু বিষয়আশয় সবই গ্রামে। এককালে তা মন্দ ছিলনা, মস্তবড় যৌথ পরিবার চলত তার আয় থেকে। গ্রামে আমরা মলতিপন্ন গৃহস্থ বলেই চলতাম। বাবাই দেখাশুনো করতেন সব। জমিজমা কিছু বাড়িয়ে ছিলেনও তিনি। কাকারা তাঁর উপরেই সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বাবা মারা যাবার পর সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে। এখন যা আছে তাতে একটা মাঝারি পরিবারের সাদামাটা ভাবে চলে। যদি অবশ্য গ্রামের বাড়ীতেই তারা থাকে। এখন সেখানে তোমার বড় পিসীমা রয়েছেন, তার সংসার চলছে ঐ সম্পত্তির আয়ে। ঐটাই আমি বাহাল রাখব ভাবছি, কারণ কনকের স্বামী একেবারেই invalid, শুধু আমাদের ঘরের পিছনে খানিকটা জমি আছে, সেখানে আমার মা ফুলবাগান করতেন। বাগান এখন আর নেই, সেই জমিটা আমি তোমার ছোট পিসীমাকে দিয়ে যাব ভাবছি। সে যদি গ্রামে গিয়ে থাকতে চায় ত ওখানে ঘর তুলে থাকতে পারবে।

তোমার ব্যবস্থা আমি যা করব বলে স্থির করেছি তা শোন। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিবাকরি ভালই করবে আশা করছি। আমি চিরজীবন কাজ করে ও বইটই লিখে যা উপার্জ্জন করেছি, তার অনেকটাই সঞ্চয় করতে পেরেছি কারণ আমি চিরকালই সাদাসিধাভাবে থেকেছি। তোমার জন্যে কলকাতায় আমি একটা তিনতলা বাড়ী করে যাব, তাতে তোমার নিজের বাস করাও চলবে এবং বাকি দুতলা ভাড়া দিয়ে টাকাও পাবে খানিক। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ও বাড়ীতে থাকব। আমার মৃত্যুর পর, আমার শোবার ঘর এখন যেমন ভাবে সাজান আছে তাই থাকবে, ও ঘরটি আর কোনো কাজে ব্যবহার কোরোনা। যদি কখনও বাড়ী বিক্রী করে দাও, তাহলে জিনিষপত্র-গুলি তোমার দুই পিসীমার কাছে রেখে দিও। গহনা-গাঁটি যা কিছু আছে আমার মায়ের তা কনকলতা হেমলতাকে দিয়ে যাব। তোমার মায়ের যা গহনা আছে তা তোমার স্ত্রী পাবেন। কেমন এ ব্যবস্থা তোমার ভাল মনে হয়?"

অভয়পদ এতক্ষণ নীরবে সব কিছু শুনে যাচ্ছিল। বাপের প্রশ্নে এবার চকিত হয়ে বলল, "গ্রামের কোনো কিছু আমি পাব না তাহলে? আমারও ত মাঝে মাঝে সেখানে যেতে ইচ্ছা হতে পারে?"

রামপদ বললেন, "সে ইচ্ছা থাকলে তার ব্যবস্থাও করা যায়। আমার এক জ্যাঠামশায় অল্পবয়সে বিপত্নীক হয়ে সংসার ছেড়ে যান। সম্পত্তিতে তাঁর যা ভাগ ছিল তা তিনি ভাইদের দিয়ে যান এই সর্ত্তে যে সেখানে সংস্কৃত পড়ানোর টোল হবে। তা যারবার যদি ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে জমি অন্য কোন ভাই ন্যায্যমূল্যে কিনে নিয়ে টাকাটা কোন সৎকার্য্যে দান করে দেবেন। ঐ জমিটা পড়েই আছে এখন, আমি ওটা তোমার জন্যে কিনে রাখব। ওখানে ছোটখাট বাড়ী করে তুমি বেশ থাকতে পারবে।"

অভয়পদ বলল, "সেই ভাল হবে। আর আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি যে ব্যবস্থা করবে তাই মেনে নেব।"

রামপদ বললেন, তাহলে ঐ কথাই রইল। উকিল লাগিয়ে এখন পাকাপাকি করে নিতে হবে। এখানেও জমি কেনার জন্যে দালাল লাগাতে হবে। কনককেও চিঠি লিখব একটা। তারও সব জানা দরকার। হেমকেও জানাব। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ এখন হচ্ছে তোমার পছন্দমত একটি পাত্রী জোগাড় করা। যদি কোথাও পছন্দ তোমার হয়ে থাকে, ত সেটা আমাকে জানিয়ে দিও।"

অভয়পদ মাথা নেড়ে জানাল যে সেরকম কিছু ঘটেনি। বলল, "আপনারা যাকে মনোনীত করবেন আমি তাকেই বিবাহ করতে প্রস্তুত।"

রামপদ এর পর বৈকালিক ভ্রমণে বেরোলেন। কাছেই হেদুয়া দীঘি। তার চার পাশের পার্কটায় সর্ব্বদাই ভীড়। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, বালক কিছুর অভাব নেই। ক্বচিৎ ক্বচিৎ মেয়ে কিছু কিছু আছে, বাদবাকি সকলেই পুরুষ জাতীয়।

বেথুন কলেজের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রামপদ ভাবলেন, "এখান থেকে ছেলের বউ জোগাড় করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বেটার যে আবার পছন্দ অন্য রকম। আমার ভাগ্যে না হয় গোবরে সোনার কমল ফুটেছিল, কিন্তু সকলের বেলায় ত তা ফুটবে না। কনকলতার শ্বশুরবাড়ীর মানুষগুলোর সব চেহারা মন্দ নয়, গুণ কিছু থাকুক বা নাই থাকুক। ওকে আজই একখানা চিঠি লিখে দেখব।"

ক্রমশঃ

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিদ্যাসাগরজীবন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কে যেন বলেছিলেন: সে যুগে বিদ্যাসাগরের কাছে কোনো না কোনো ভাবে ঋণী হয়নি এমন বাঙালী বিরল ছিল। কথাটি স্মরণ ক'রে বলতে পারি, কোনো না কোনোভাবে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে যায় নি এমন বাঙালীও সে যুগে বিরল ছিল। বিদ্যাসাগরের কাল থেকে অনেকদূরে স'রে এসেছি বলেই, তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতাকে অনুভব করা আমাদের পক্ষে যত সহজ হয়েছে তাঁর সমসাময়িক যুগের মানুষের পক্ষে তা হয়নি।

যাঁরা বিপ্লবী, সমাজকে যাঁরা নতুন ক'রে গড়তে আসেন, তাঁদেরকে এমন অনেক বাধা ও জটিলতা অতিক্রম করে যেতে হয়। সমাজসেবকের ভাগ্যে জনতার ভালোবাসা যত তাড়াতাড়ি জোটে, জনতার ক্রোধও তত দ্রুতই সঞ্চিত হয়? আজকের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে হিন্দুকলেজের প্রধান উদ্যোক্তা রামমোহনকে কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে গ্রহণ করা যায়নি, কারণ রামমোহন তখন সমাজের অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। কবিরদল সেদিন তাঁকে ব্যঙ্গ করে গান বেঁধেছিল:

> সুরাই মেলের কুল
> বেটার বাড়ী খানাকুল
> বেটা সর্বনাশের মূল
> ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
> বানিয়েছে ইস্কুল।
> ও সে জেতের দফা করলে রফা
> মজালে তিনকুল।

রামমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য এই যে, রামমোহন হিন্দুসমাজের বাইরে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজ গড়েছিলেন। আর বিদ্যাসাগর সমাজের মাঝখানে ব'সে সমস্ত সংস্কারের মূল ধ'রে নাড়া দিয়েছিলেন। হিন্দুসমাজের নিস্তরঙ্গ জলে সেদিন তিনি যেসব কাজের জন্য আলোড়ন তুলেছিলেন, সেগুলি হল:

১। শিক্ষাসংস্কার

(ক) ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন
(খ) শিক্ষায় আধুনিক মনোভাবের সৃষ্টি
(গ) শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্যের অবসান ঘটানো ও
(ঘ) শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি।

২। সমাজসংস্কার

(ক) বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করা এবং সমাজে প্রবর্তন করা
(খ) বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করা
(গ) বহু বিবাহকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে ধিক্কার দেওয়া
(ঘ) হিন্দু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন ঘটানো।

বিদ্যাসাগর তাঁর গর্বোদ্ধত হৃদয়ে একাই সংগ্রাম করেছেন এরজন্য তাঁর সহগামী ও অনুরক্তদের মধ্যে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে গেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য রাখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সংস্কৃত কলেজে আগে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। নিষেধের সে বেড়া বিদ্যাসাগরই ভেঙেছেন। তারজন্যে সেদিন তাঁর শিক্ষক

সহকর্মীরাও তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। বিরোধিতা করেছিলেন অনেক বিশিষ্ট বর্ণহিন্দুর দল। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্যও তিনি উদ্যোগী হ'লেন এবং বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় বালিকাবিদ্যালয় গড়ে তুলতে লাগলেন। তখন তাঁকে অনেকের সঙ্গে গুপ্তকবিও ব্যঙ্গ করেছেন :

"যত ছুঁড়িগুলো তুড়িমেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে,
আর কিছুদিন থাকুরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর। রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো উদারপন্থী ব্যক্তিও সেদিন বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিষয়ক প্রথম পুস্তিকা বার হওয়ার পরই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নায়ক মুর্শিদাবাদের বৈদ্যপ্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ। একা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অগণিত মহারথী। সেদিন বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের অনুকূলে যে পরাশরশ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে যে প্রতিবাদ-পুস্তিকাগুলি ছাপা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১। বিধবাবিবাহের নিষেধক বিচার। শ্রীউমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত।
২। বিধবাবিবাহ নিষেধক প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া॥
৩। পৌনর্ভবখণ্ডনম্
৪। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কল্পিত বিধবা ব্যবস্থার বিধবোদ্বাহ বারকঃ।
৫। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বিষয়ক ভ্রম-সূচক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিতসম্মত প্রত্যুত্তর॥
৬। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৮৫৫ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর ভারতসরকারের কাছে যে আবেদনপত্র পেশ করে বিধবাবিবাহের সমর্থনে আইন পাশ করাতে চাইলেন, তার বিরুদ্ধে অন্ততঃ চল্লিশখানি প্রতিবাদপত্র প্রেরিত হয়। এই প্রতিবাদগুলিতে যাটহাজার বর্ণহিন্দুর স্বাক্ষর ছিল। বিরুদ্ধদলের নায়কবৃন্দের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি প্রমুখ ব্যক্তিরা। পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি তাঁর প্রতিবাদপত্রে বলেন :

'Your petitioners most humbly but earnestly protest against a bill which is opposed to the whole of their shastras; which is contrary to the customs and usages of the most respectable portion of your Hindu subjects throughout the country.'

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে তীব্র শ্লেষ নিক্ষেপ করলেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তার জ্বালাও বড় কম ছিল না। তাঁর লেখা ব্যঙ্গ কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

'কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী
তাহারা সধবা হ'বে প'রে শাঁকা শাড়ী॥
এ' বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর···
'গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে
হইয়াছে আঁত খালি, হাতচাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যায় চড়াইয়া খাটে
শাড়ী পরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম কোনে সাজে বুড়ি।
কেমনে বলিবে মুখে, থুড়ি থুড়ি থুড়ি?'

'বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত।' [হিতবাদী]

বিদ্যাসাগর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার

লিখেছেন—[পৃঃ ৩২৪] 'প্রতিজ্ঞায় বিদ্যাসাগর ভীষ্মের ন্যায় অটল। অকার্যেও (?) চরম আত্মোৎসর্গ। ভ্রমেও লাঞ্ছনা তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ ছিল না।'

বিহারীলাল বিধবাবিবাহ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে অকার্য ব'লে ভেবেছিলেন এ'তে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বহুবিবাহ নিষেধক আইন পাশ করানোর জন্যও অনেক যুদ্ধে নামতে হ'য়েছে বিদ্যাসাগরকে। যদিও এবারে তাঁর সংগ্রাম সফল হয় নি, তবুও শত্রুসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি—যিনি বিদ্যাসাগরের আবাল্যসুহৃদ্ ছিলেন—তিনিই এবার বিরুদ্ধে গেলেন। তারানাথ বহুবিবাহ বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন পুস্তিকা রচনা করে বললেন বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী তখনই তাঁর বিপক্ষে প্রত্যক্ষসংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লেন তিনি। তিনিও লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, বিদ্যাসাগর মধুবচনের যে ব্যাখ্যা করেছেন সে ব্যাখ্যা তাঁর নিজস্ব; প্রচলিত বা গ্রাহ্য অর্থ তা নয়। তারানাথের বিরুদ্ধতায় বিদ্যাসাগর এতই ক্রুদ্ধ হ'ন যে, মতান্তর থেকে মনান্তর শেষপর্য্যন্ত স্থায়ী বিরোধে পরিণত হয়। তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যতে আর বাক্যালাপ ছিল না।

দেশের লোক আর একবার গর্জে উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে, যখন শেষবয়সে বৃদ্ধ ও রোগদুর্বল বিদ্যাসাগর ভ্রষ্টানারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর নির্ভীক মত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রও সেদিন তাঁর বিপক্ষে। কিন্তু বিদ্যাসাগর অকম্পিত। বলেছিলেন—মৃতস্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার যে নারী পেয়েছে, পরবর্তীকালে সে নারী ভ্রষ্টা হ'লেও প্রাপ্তসম্পত্তির ওপর অধিকার তার আর নষ্ট হয় না।

গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্প্‌বেলের সঙ্গে বিরোধ তাঁর জীবনে আর একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এ বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ ক্যাম্পবেলের চেষ্টা ছিল শিক্ষাসংকোচ ও শিক্ষার খাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করা! সমসাময়িক জনৈক লেখকের মতে—

'He was a great enemy of the high education of the natives of the soil.'

ক্যাম্পবেল বহরমপুর কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের মান নিচু করে দিলেন। এবং সংস্কৃত কলেজ থেকে 'স্মৃতি' ও 'ইংরাজী'র অধ্যাপকের পদ বিলুপ্ত করে দিলেন। বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে আগেই তাঁর আপত্তি জানিয়ে রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও ক্যালকাটা গেজেটে লেখা হ'লো যে বিদ্যাসাগরের অভিমত গ্রহণ করা হ'য়েছে।

বিদ্যাসাগর তখনই গভর্নরের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীকে এইচ এল জনসনকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন। জনসন সে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে জানালেন যে বিদ্যাসাগর নিজে সমর্থন না করলেও মোটামুটিভাবে যে সকলকে জানিয়ে প্রস্তাবটি কার্যকরী করা হয়েছে, তাই যথেষ্ট। বিদ্যাসাগর (১৮৭২ খৃঃ) ১০ই জুন তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে চিঠিগুলি ছাপতে দিলেন। মুখবন্ধে লিখলেন—

'As considerable misapprehension prevails among my countrymen as to the opinion I expressed to his honour the Lieutenant-Governor, when he did me the honour of consulting me regarding the Sanskrit College, particularly in reference to the constitution of the Chair of Hindu Law, I deem it due to lay before the public through the medium of your poper the accompanying correspondence which I hope will remove the erroneous impression entertained on the subject.'

এইভাবে সকলের সামনে ঘটনাটিকে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ায় স্যার ক্যাম্প্‌বেল অত্যন্ত চটে যান। অতঃপর তাঁর নির্দেশে বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকা থেকে বিদ্যাসাগরের বইগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। বই বিক্রীর আয়ই তখন বিদ্যাসাগরের প্রধানতম আয়। কাজেই তাঁকে অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্মুখীন হ'তে হয়।

পুত্রের বিবাহ বিধবা মেয়ের সঙ্গে দেওয়ায় অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু ভাই দীনবন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, কারণ সংস্কৃত প্রেস তিনি একটি বন্ধুকে দান করেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নাস্তিক বলে বিদ্রূপ করেছে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলে ব্যঙ্গ করেছেন; এমনকি 'Narrow minded' আখ্যাতেও ভূষিত করেছেন।

বিদ্যাসাগরকে আজ বাংলাভাষার জনক বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেদিন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরী ভাষাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'সীতার বনবাস' বঙ্কিমের মতে কান্নার জোলাপ। বিদ্যাসাগরের অনুরক্তরাও অবশ্য বঙ্কিমকে ছেড়ে দেন নি। বিদ্যাসাগরী ভাষার সমালোচনা করায় বঙ্কিমকে তীব্র ব্যঙ্গের সম্মুখীন হতে হ'য়েছিল। হালিশহর পত্রিকা লিখেছিল:

'কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে।
যারে পাই তারে ধরে দিগাদিগ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস,
'সাগরে' সাঁতার দিতে করেছে সাহস।'

হেলেন কেলার

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য মানুষ ছিলেন আমেরিকার কুমারী হেলেন কেলার যিনি অন্ধ ও বোবা হয়েও অদম্য চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে খুব পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন। গত ১লা জুন ওয়েস্টপোর্ট সহরে তিনি সাতাশি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এক বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান ঘটলো।

তিনি জন্মেছিলেন ১৮৮১ সালের ২৭শে জুন।

এই মহিলাটি জন্মাবধি অন্ধ, মূক ছিলেন না। জন্মের পর কিছুকাল তিনি খুব সুস্থ ও সুন্দর শিশুই ছিলেন। মাত্র ছয় মাসের সময় তাঁর মুখ দিয়ে প্রথম কথা ফোটে এবং ঠিক এক বছর বয়সে হাঁটতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পৌনে দুই বছর বয়সে মস্তিষ্ক পীড়া ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এমনি ভুগতে লাগলেন যে দৃষ্টিশক্তিও গেল কথা বলাও বন্ধ হলো, কর্ণও বধির হলো। সেই থেকে বরাবর তিনি অন্ধ ও মূক-বধির। পিতামাতা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যখন হেলেন ছয় বছরে পদার্পণ করলেন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ডক্টর বেলের কাছে। ডক্টর বেল টেলিফোন-যন্ত্রের আবিষ্কর্তা এবং বধিরদের শিক্ষক। তিনি মেয়েটির ভার নিজে না নিয়ে এক বিখ্যাত অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত শিক্ষিকাকে আনিয়ে তাঁর উপর হেলেনের সকল দায়িত্ব ও শিক্ষাভার চাপিয়ে দিলেন। এই মহিলার নাম অ্যানি সালিভান। সালিভান হলেন হেলেনের শিক্ষিকা, বন্ধু, খেলার সাথী, ভোজনে, শয়নে, ভ্রমণে চিরসঙ্গী। ইনি নিজেও আগে অন্ধ ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসার ফলে দৃষ্টিশক্তি পান। তাই অন্ধ হেলেনের প্রতি মমতায় ভরে থাকতো সারাক্ষণ তাঁর মন এবং সব সময় নানাভাবে সাহায্য করতেন। মহাপ্রাণা ছিলেন অ্যানি সালিভান। আর হেলেনও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় হেলেন জগতে এত খ্যাতিলাভ করেছিলেন সেকথা পরবর্তীকালে হেলেন সালিভানের যে জীবনচরিত লিখে গেছেন তাতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অন্ধ-বধিরকে শিক্ষা দেবার অপূর্ব প্রথা ছিল সালিভানের, সেই সঙ্গে ছিল তাঁর আশ্চর্য্য কৌশল।

সালিভানের চেষ্টায় হাতের সাহায্যে হেলেন অন্যের মুখের কথা বুঝতে শিখলেন সে এক অপূর্ব কৌশলে। অন্যরা যখন কথা বলতো তিনি তাদের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে দিতেন। সেই আঙুলের স্পর্শে বুঝতে পারতেন কি বলছে। আর ভাব-ভঙ্গীর মাধ্যমে নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। এই রকম এক অন্ধবধির মেয়ের গুরুদায়িত্ব নিয়ে শ্রীমতী সালিভানকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি প্রেমপূর্ণ। এই পরম দয়াশীলাকে নিয়ে পরবর্তীকালে একটি নাটক রচিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রে তার নাট্যরূপও প্রদর্শিত হয়েছে। "মিরাক্‌ল্ ওয়ার্কার" হলো তার নাম। তাতে সালিভানের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে ক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে সার্থকভাবে হেলেন কেলারের অন্ধবধির জীবনে।

হেলেনের অদম্য উৎসাহ ছিল অন্ধবধির হয়েও কি করে গুণীজ্ঞানী হওয়া যায়। তাই উপযুক্তা শিক্ষিকাকে পেলেন উপযুক্তা শিক্ষার্থিনী।

সেইজন্য নবনব শিক্ষার ব্রতী হতে লাগলেন দিনে দিনে। অবিশ্যি বহুদিন লাগলো অল্প অল্প শিক্ষার জন্য। দশ বৎসর বয়সে হেলেন স্থির করে ফেলেন যে যেমন করেই হোক—কোন না কোন প্রকারে—কথা বলতে হবে। তাই সালিভান তাঁকে নিউ ইয়র্ক সহরের

একটা বোবা স্কুলে নিয়ে গেলেন। সেখানে বিশেষ পদ্ধতিতে কথা বলা শিখতে লাগলেন। সঙ্গে সর্বদা থাকতেন সালিভান। এক একটি কথা আয়ত্ত করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কি দিনের পর দিন লেগে গেল। এইভাবে অনেকদিন পরে তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে লাগলেন যদিও সে সব কথার উচ্চারণে অনেক ত্রুটি থেকেই যেত। তবু শ্রোতারা বুঝতেন। এর পর তিনি শুধু ইংরেজী ভাষায় তৃপ্ত না থেকে শিখলেন ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জারমেন ভাষা।

১৮৯৬ সালে যখন তিনি ১৬ বছরের মেয়ে তখন কেম্‌ব্রিজের বালিকা-বিভাগে ভর্তি হলেন। পরে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মেয়ে-বিভাগে ভর্তি হয়ে গ্র্যাজুয়েট হন। এই সময় তিনি "আমার জীবন-কথা" নামে একটা বই লেখেন।

এর পর তিনি নানা দেশের মূক ও বধির বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে নানা কাজে লেগে গেলেন। নিজে বক্তৃতা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে দিতে লাগলেন। সরকারের কাছ থেকে অন্ধ বোবা কালাদের জন্যে অনেক নতুন স্কুলের ব্যবস্থা করলেন। হোলিউড্‌এ গিয়ে অভিনয় করে অর্থ পেলেন প্রচুর যে অর্থ ঐ সকল স্কুলের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর কার্য্যক্ষমতার জন্য "এচিভমেণ্ট প্রাইজ" তিনি পেলেন যার মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। এই অর্থের সমস্তই তিনি ঐ সব স্কুলে দান ক'রে দিলেন যদিও তাঁর নিজের তখন আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এমনি মহাপ্রাণা ছিলেন এই অন্ধবধির মহিলা। অদম্যকর্মী ছিলেন হেলেন সারাজীবন ভোর। আশি বছর বয়সেও দিনে ১০ ঘণ্টা করে কাজে লেগে থাকতেন। তাঁর বিশেষ "ব্রেইলি" টাইপরাইটার দিয়ে তিনি কত কি যে লিখতেন। জগতের বিশেষ ব্যক্তি-দের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, আইনষ্টাইন্, বার্ণার্ড শ, মার্ক টোয়েন ইত্যাদি। তিনি বহু বই লিখেছেন যেমন—

Teacher Anne Sullivan, The world I live in, The song of the stone wall, Out of the dark, My Religion, Let us have faith ইত্যাদি।

১৯২০ সালে প্রায় দেড় মাসকাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ছিলেন। সেই সময় কুমারী হেলেন কেলার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। তিনি কবির স্বকণ্ঠের গান ও আবৃত্তি শুনতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আবৃত্তি ও গান করলেন। হেলেন কবির কণ্ঠে ওষ্ঠে আঙ্গুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সঙ্গীত ও কবিতার পূর্ণ রস সম্ভোগ করতে লাগলেন। করস্পর্শের দ্বারা অন্ধ হেলেন কাব্যের আলোক-লোকে যেন গিয়ে পৌঁছলেন। দশ বছর পরে কবি যান সেই আমেরিকায়। সেখানে এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে দেখেন হেলেন কেলার বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সেখানে হাজির। বক্তৃতার পরই হেলেন এসে কবিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং শ্রোতাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন—জাতিতে জাতিতে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের যে শুভ সূচনা দেখতে পাচ্ছি তার শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ এই ট্যাগোর।

কবি আমেরিকা থেকে চলে আসবার দিন তাঁর কাছে হেলেন ফুলের ডালা পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গের চিঠিতে লিখলেন—"আমার এই পুষ্পোপহার গ্রহণ করুন। আপনার খুব ভাল লাগবে এই ফুলগুলি। আমার হৃদয়ের প্রীতি-কুসুমও আপনি ওরই মধ্যে পাবেন।"

হেলেন কেলার ভারতবর্ষ সফরে এসেছিলেন দুইবার। একবার ১৯৪৮ সালে এবং পরে ১৯৫৫ সালে। কিন্তু হায়? তখন রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নেই।

হেলেন অবিশ্যি এখানে এসে কবিকে সর্বদাই স্মরণ করতেন এবং যখন যেখানে বক্তৃতা দিতেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে তাঁর সৌহার্দ ছিল সে কথার উল্লেখ করতেন। "গোল্ডেন্ বুক অব্ ট্যাগোর" বইখানিতে হেলেনের একটি প্রবন্ধ আছে।

কলিকাতার অন্ধ, বধির, মূক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন ক'রে তিনি খুব খুসী হয়েছিলেন এবং নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তাঁর তিরোধানে তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

রাত্রি ২টার সময় একটা হৈ চৈ শুনতে পেয়ে গিয়ে দেখি শ্রীজীব মহাশয় খুব উত্তেজিত হয়ে সেচ্ছাসেবকদের গালাগালি দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসায় জানলাম তিনি আবার পুরুষের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এক ব্যাচের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে বসে চোখ বুজে উপাসনা করছিলেন। নিয়ম করা হয়েছিল ৫ মিনিটে পূজা সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাচ ২০।২২ জন পুরুষ ৫ মিনিট, আবার স্ত্রীলোক ২০।২২ জন ৫ মিনিট। এইভাবে করেও বৈকাল থেকে তার পরদিন বেলা দশটা হয়েছিল। সবাই বেরিয়ে গেলেন শ্রীজীব মহাশয় বসেছিলেন। সেচ্ছাসেবকদের আকুতিতে কান দেন নি। দশ মিনিট পরে তারা পাঁজাকোলা করে বাইরে বসিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় যখন ফল উল্টা হ'ল তখন চড়া কথা বলতে হ'ল। তাইতে তাড়াতাড়ি চুপ করলেন। আজ ভাবি কর্ত্তব্যের খাতিরে শ্রীজীব মহাশয়ের মত সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে কড়া কথা শোনাতে হয়েছিল। আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অধ্যাপক বিদায়ের দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিয়েছিলেন। আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম কারণ ওটা আমার মনে বড় খোঁচা দিত। তিনি প্রীত হয়ে আমায় ক্ষমা করেছেন। হায় তখন কর্ত্তব্যের খাতিরে কত কি করতে হয়েছে। আজ ভাবি সে সব করে কি করলাম। বাংলা ভাগ হয়ে সুজলা সুফলা বাংলায় আজ মস্লিম স্টেট, হিন্দুদের স্থান নাই। চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে আজ সব যাযাবর। আমরা ঠুটো হয়ে বসে আছি।

প্রাদেশিক কনফারেন্সে দেশবন্ধুকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। টেগার্ট ভ্রমে যে একটি নিরীহ সাহেবকে হত্যা করেছিল, তার সেই কার্য্যের প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে বলে একটা বিপ্লবী-দল জেদ ধরলেন। কংগ্রেস অহিংস-নীতি তার আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। আর নিরীহ সাহেবটিকে মারা গর্হিত কাজ নয়? সুতরাং ঐ কার্য্যের প্রশংসা করা যায় কি করে? ক্ষুদিরাম ভুল করে কিংসফোর্ড সাহেব বলে দুইটি নির্দ্দোষ মহিলাকে হত্যা করেছিল। ক্ষুদিরামের ঐ কার্য্যের প্রশংসা কেউ করে নি। ১৬ বৎসরে তার সাহস ও দেশের জন্য আত্মদানের প্রশংসা করেছে। সমস্ত রাত্রি একবার ওদের কাছে একবার দেশবন্ধুর কাছে ঘোরাঘুরি করে শেষে ঐ রকমই একটা প্রস্তাব গৃহীত হল। হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ করে এবং হত্যাকারীর সাহস ও দেশভক্তির প্রশংসা করে।

দেশবন্ধু ভগ্ন শরীর নিয়ে দার্জ্জিলিং গেলেন। যাবার সময়ও রেলওয়ে স্টেশনে বললেন, তোমার বড় পরিশ্রম ও কষ্ট যাচ্ছে। আর একমাস চালাও, আমি এরমধ্যে সেরে যাব। তখন তুমি পুরো বিশ্রাম করবে। হায়, তাকি হ'ল?

মহাত্মা এলেন বাংলা ভ্রমণে। সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় গেলাম। তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এলেন। বললেন তিনি অনেক ভাল। আর তার কিছুদিন পরেই তাঁর তিরোধানের সংবাদ এল ১৬ই জুন বৈকালে।

তুলসীচরণ গোস্বামী সে সময় বিলেতে ছিলেন।

তাঁর কাছে পরে শুনেছি। দেশবন্ধুর মৃত্যু হয় ৪টায় বৈকালে। সন্ধ্যার বিলাতে অর্থাৎ ১৮ ঘণ্টার পরে বিলাতে ডিনার-টেবিলে ইংরাজদের কি আনন্দ! তাদের প্রধান শত্রুর মৃত্যু হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজনীতিকের তিরোধান হ'ল। বাংলা আঁধারে ডুবল। সেই অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে ১৯৪৭ সালে ছারখার হয়ে গেল। আজ যেটা আছে সেটা বাংলা নয় তার কঙ্কাল।

(২৬)

দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধাদির পর মহাত্মা (কংগ্রেসের সভা-পতি) যতীন সেনগুপ্তকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং কাউন্সিলের লিডার করে চলে গেলেন। আমি স্বরাজ পার্টির বা কংগ্রেসের চার্জ্জ তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু দেশবন্ধুর নামে ব্যাঙ্কের overdraft এর দেনা তিনি নিলেন না। আমি বলেছিলাম ওটা কি তবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ওয়ারিশরা দেবে? তিনি বলেছিলেন, কে দেবে জানি না। আমি নিতে পারবো না। আমি আর কিছু বলি নি। আমার বড়বাজারের কারবারটা বাঁধা দিয়ে ঐ ব্যাঙ্কেই টাকা ধার করে দেশবন্ধুর overdraft শোধ করে দিই। আমার খুব জোর ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ল। মহাত্মা আমার শয্যাপার্শ্বে এসে একঘণ্টা বসে থেকে যতদিন ম্যালেরিয়া থেকে নিষ্কৃতি না পাই ততদিন কলিকাতায় না আসতে উপদেশ দিয়ে চলে যান। শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আফিসের ভার দিয়ে আমি মেদিনীপুর জেলার গিধনি স্টেশনে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীঅমৃতলাল বসু মহাশয়ের বাংলোয় প্রায় ২ মাস থাকি। ডাক্তার বিধানবাবুর উপদেশমত প্রথম কুইনাইন ইনজেকসন নিই। তারপর আর্সেনিক ইনজেকসন নিই, তাইতে ম্যালেরিয়া সারে। ডাঃ রায় আমাকে কোনও জোলাপ খেতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন কোষ্ঠবদ্ধ হলে ত্রিফলা খাবার জন্য। তাই খেতাম। দুই মাস বাদে ফিরে এসে অফিসের ভার নিই এবং কানপুর কংগ্রেসে ১৯২৫ সালে সভাপতি সরোজিনী নাইডু হয়েছিলেন। আমি বাংলার ডেলিগেট নিয়ে গেছলাম। ওখানে কংগ্রেস হয়ে গেলে আমি বৃন্দাবন চলে যাই।

গিধনি থেকে ফিরে এসে অফিসের ভার নিয়ে আমাকে বাসন্তী দেবীর সহিত দেখা করবার জন্য পাটনা যেতে হয়। বাসন্তী দেবী তখন পাটনায় দেশবন্ধুর সহোদর ভ্রাতা পাটনা হাইকোর্টের জজ প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আলিমঞ্জিল বলিয়া বৃহৎ বাসাবাড়ীতে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তার স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ীতে ছিল। আমি ও প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় পাঞ্জাব মেলে গিয়ে ডাকবাংলায় উঠে সকালে মুখ হাত ধুয়ে দেখা করতে গেলাম। তখন ৮।৮॥ হবে শীতকাল। বাসন্তী দেবীর খোঁজ করতে শুনলাম তিনি out house-এ রান্না করছেন। শুনে সত্যসত্যই আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জনের গৃহিণী বাংলার কর্মীদের মাতা জজ সাহেবের বাড়ীর out house-এ রান্না করছেন? জজ সাহেবের বাড়ীতে রান্না করবার স্থান হয় নি। গেলাম out house-এ। তাঁকে সেখানে রাঁধতে দেখে বলেছিলাম "মা আজই আমাদের সঙ্গে কলকাতা চলুন। বাংলা তোমায় মাথায় করে রাখবে"। তিনি একটু আশ্চর্য্য হলেন। বললেন কি হয়েছে? তখন out house-এ তাঁর রাঁধবার কথা বললাম। তিনি বললেন "প্রফুল্ল দোতলায় তাঁর রাঁধবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমারই কেমন ঘৃণাবোধ হতে লাগল। যে সিঁড়ি দিয়ে মেথর night soil নিয়ে নামবে সেই সিঁড়ি দিয়ে জল নিয়ে গিয়ে রান্না করতে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে লাগল। তাই বললাম বরং এখানে রেঁধে খেয়ে উপরে চলে যাব। আমাদের ক্ষোভ গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম। ব্রাহ্মণ কন্যা, ব্রাহ্ম মতে বৈদ্যকে বিবাহ করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বিলাতে ঘুরে

এসেছেন। কত হোটেলে কত রকম খাদ্য খেয়েছেন। কিন্তু আজ বিধবা হয়ে হিন্দুর চিরাচরিত সংস্কার ফিরে এসেছে। তাই বিশুদ্ধভাবে একবেলা হবিষ্যান্ন খাচ্ছেন। এই দুঃখের মধ্যেও প্রাণে খুব আনন্দ হল। প্রতাপকে P. R. Das-এর ওখানে ঠেলে দিয়ে মায়ের রান্না খেয়ে আনন্দ হল।

আর একবার বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। সে সময় উনি পুরুলিয়ায় বেবীর শ্বশুর, ভাস্করের পিতা কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ছিলেন। বেবীর খুব অসুখ, তাকে দেখতে বাসন্তী দেবী সেখানে গিয়েছিলেন। সে বাড়ীটা পুরুলিয়া স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে প্রায় একশ বিঘে জমির মাঝখানে বাংলো। আমি সকালে পৌঁছে ঘোড়ার গাড়ী করে সেখানে উপস্থিত হলাম। সেও শীতকাল ১৯২৬ সাল হবে। বাসন্তী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র আমায় বল্লেন, আপনি খাবেন কোথা? ওদের ওখানে আপনার খাওয়া হবে না, ওরা বড় ম্লেচ্ছ! আমি বল্লাম আপনি কি করেন? সে আর বোলো না, বাগানে গাছতলায় মাটীর ঢিবি বসিয়ে ভাতে ভাত খেয়ে আসি। আপনাকে সেখানে খাওয়াতে পারব না। বেশ বেবীকে দেখে আপনার সঙ্গে কথা বলে, কর্ণেল মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করে পুরুলিয়া চলে যাব, সেখানে আমার অনেক আত্মীয় আছে। বেশ তাই হবে বলে আমাকে বেবীর কাছে নিয়ে গেলেন। বেবী অনেকটা ভাল আছে। তাকে দেখে তারপর বাসন্তী দেবীর সঙ্গে কথা বলছি কর্ণেল মুখার্জ্জী বেড়িয়ে ফিরে এলেন। হাতে এক মোটা বেতের লাঠি, বাসন্তী দেবী বল্লেন ইনি সাতকড়ি বাবু, সাতকড়িপতি রায়। সেই বিশাল দেহ নিয়ে তিনি আমায় আলিঙ্গন করে ধরলেন, তারপর বল্লেন, চলুন আমার কুঞ্জে। বলে টানতে লাগলেন। বাসন্তী দেবী বললেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, উনি আমার সঙ্গে কথা বলে চলে যাবেন। ওর এখানে খাওয়া হবে না। উনি নিরামিষ ব্রাহ্মণ। তোমাদের যা ম্লেচ্ছ বাড়ী, ওকে ছেড়ে দাও। মুখার্জ্জি সাহেব বললেন, কেন তুমি ত খাও, সেখানেই ওকে খাওয়াবে। সেখানে বুঝি ওকে খাওয়ানো যায়? তোমার মান থাকবে কোথায়? বললেন বাসন্তী দেবী। আমার মান চাই নি, ঐখানেই উনি খাবেন, আমি ওকে ছাড়ব না। ওর এত কথা শুনেছি: ওঁকে আমি নিয়ে চললাম, বলে আমায় তাঁর পড়বার বেদীতে নিয়ে গেলেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কত কথাই বললেন। বাঙ্গালীর প্রতি কি দরদ। ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী বলে এক প্রকাণ্ড বই লিখেছেন। ওরকম ঋষিতুল্য মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বারটার পর ছেড়ে দিলেন। বাসন্তী দেবীর সহিত গাছ তলায় ভাত খেয়ে বেবীকে আদর করে চলে এলাম।

২৭

রাজনীতির কথাটাই শেষ করি। ১৯২৬ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস ও ১৯২৭ সালে গৌহাটী কংগ্রেস-এর কোনটাতেই আমি যাই নি। এ সময় কংগ্রেসে বিশেষ কোনও প্রোগ্রাম ছিল না। মতিলালজী অন্য রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে dominion status-এর একটা constitution প্রস্তুত করবার জন্য একটা কমিটি করেন। তিনিই তার চেয়ারম্যান। পূর্ব্বে বলেছি লর্ড বারকেনহেড দেশবন্ধুকে সহযোগিতা করতে লিখেছিলেন এবং তা করলে ১৯২৯ সালে dominion status। মহাত্মাজী সহযোগিতায় রাজী হলেন না। দেশবন্ধুর তিরোধান হলো। মতিলালজী সেই dominion statusটা সমস্ত রাজনৈতিকদলের কাম্য করে কংগ্রেসে সেটা পাশ করাবার চেষ্টায় ছিলেন। ১৯২৭ সালের গৌহাটী কংগ্রেসে যাবার সময় মতিলালজী কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে বহু আলোচনা করেছিলাম একথা পূর্ব্বে বলেছি। শ্রীনিবাস আইঙ্গার সে কংগ্রেসে সভাপতি।

তারপর ১৯২৮ সালের বিখ্যাত কলিকাতা কংগ্রেস। যতীন সেনগুপ্ত Reception Committee-র চেয়ারম্যান,

ডাক্তার বিধান রায় সেক্রেটারী এবং সুভাষবাবু স্বেচ্ছাসেবকদের G. O. C.। ২৮ ঘোড়ার গাড়ীতে মতিলালজীকে হাওড়া ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসা হল। তিনিই সভাপতি। মহাত্মা গান্ধীজী এসে সোদপুরে সতীশবাবুর খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করলেন। এই কংগ্রেসে dominion status কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কাম্য বলে প্রস্তাব পাশ হল। সুভাষ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তুলেছিল। জহরলাল support করবেন বলে শেষ পর্য্যন্ত করেন নি। তখন বাংলা কংগ্রেসে দুই প্রধান দল হয়ে গেছে। একটীতে যতীন সেনগুপ্ত, ডাঃ রায়, নলিনী সরকার প্রভৃতি, আর একটিতে সুভাষ এবং তার পশ্চাতে বিপ্লবীদল। সুভাসের দাদা শরৎবাবু তখনও কংগ্রেসে কোনও নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। কলিকাতা কংগ্রেসে আমাকে স্বেচ্ছাসেবক এবং ডেলিগেটদের খাওয়াবার ভার নিতে হয়েছিল। আমি দুই দলের আর কিছু করতে পারিনি। করতে ইচ্ছেও যেত না, ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে কোমর বাঁধতে পারি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিতে আমি মুষড়ে পড়ি। আমি আমাদের দেশভক্তির কথা ঠিক বুঝতে পারতাম না। দেশের সেবা করবার কি স্থানের কোনও অভাব ছিল বা আজও আছে? তবে বিবাদ কিসের?

১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কনফারেন্স হল। বীরেন শাসমল সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বীরেন আবার বাংলার রাজনীতিতে অগ্রগামী হন। কিন্তু সে সভাপতির ভাষণে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে এমন কথা লিখেছিল যে তারা ভীষণ চটে গেল এবং বীরেনকে সেইখানেই অপমান করলে। বীরেন আমাকে বললে, তুমিইত এদের এনে কংগ্রেসে ঢুকিয়েছ? তাতে কি অপরাধ হল বুঝলাম না। কংগ্রেসে ত সকল দেশবাসীর স্থান আছে। কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তাতে সব বিপ্লবীই বাহিরে গ্রহণ করেছে। তবে?

আমি ভাবতাম আসল কথা নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব। যারা দেশের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিল এবং নিজের ব্যক্তিত্বের কথা ভাবত না তাদের কোনও বিবাদ ছিল না। কিন্তু নিজ নিজ ব্যক্তিত্বে যারা বেশী বিশ্বাসী তারাই ঝগড়া বিবাদ করেছে। সমাজেও তাই দেখতে পাই।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে আমি যাই নাই। সেখানে জহরলালজীর সভাপতিত্বে সুভাষের পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হয় এবং ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় ও সঙ্কল্প গৃহীত হয়।

মহাত্মা লবণ-আইন ভঙ্গ করবার কার্য্যপ্রণালী গ্রহণ করলেন। সুরাট জেলার ডাণ্ডি উপকূলে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করবেন যার জন্য কোনও লাইসেন্স চাওয়া হবে না। কংগ্রেস থেকে সমস্ত প্রদেশে এই আইনভঙ্গের কার্য্যপ্রণালী গৃহীত হল। যেখানে সমুদ্র আছে বা লবণাক্ত জল আছে সেখানে সেই জল থেকে লবণ করা হবে। কিন্তু যেখানে লবণাক্ত জল নাই সেখানে কলাগাছ পুড়িয়ে সেই ছাই জলে গুলে তার থেকে লবণ করা হবে। মহাত্মা সবরমতি আশ্রম থেকে ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ বাহির হলেন। পদব্রজে প্রচার করতে করতে ডাণ্ডি আসবেন। তিনি আর সবরমতীতে ফিরে যাবেন না। তিনি বেরিয়ে পড়বার পর সবরমতিতেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা ডাকা হল। আমাকে যেতে হয়েছিল। সভা রাত্রি ৮টার সময় শেষ হল। সভার পর জহরলালজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারা গেল না। ভোরে উঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর তাঁবুতে গেলাম। দেখা করে বললাম, আমি বাংলার সদস্য। আপনার নিকট জানতে চাই কিভাবে লবণআইন ভঙ্গ করা যাবে। তার জন্য প্রাদেশিক সমিতিকে কি করতে হবে সে বিষয়ে কোনও ইস্তাহার কংগ্রেস থেকে যায় নি। এই ছিল আমার সাক্ষাতের কারণ। কিন্তু এত কথা ত দূরে থাক, কেবল বললাম 'আমি বাংলার সদস্য। তারপরেই তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নাই।

তবু কি জানতে চাই ছোট করে বললাম। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমার সময় নাই বললাম ত। আপনি যান। আমিও ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আদৌ আলাপ ছিল না। আমি অবাক হয়ে বেরিয়ে আসতেই মতিলালজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেকথা পূর্ব্বে বলেছি। মহাত্মার কাছে যেতে তিনি খুব হেসে বললেন you have also come। আমি তাঁকে জহরলালজীর বিষয় বললাম। তিনি সহাস্য মুখে বললেন, খেয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে মার্চ কর। আমি তোমায় সব বলে দিচ্ছি। তাই দিয়েছিলেন। আমি নিজে কোথাও আইনভঙ্গ করে জেলে যাই নি। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কাঁথির পিছাবাণীতে আর ঘাটালে দাসপুর থানায় যথেষ্ট আইনঅমান্য করে মেয়ে পুরুষ জেল ভর্ত্তি করেছিল। আর স্ত্রীলোকের উপর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ঘাটালে চেচুয়া গ্রামে দুইজন পুলিশের সাবইনসপেক্টরকে খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে তার মধ্যে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পুড়িয়ে মেরেছিল। যারা হুকুম দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল তারা পালিয়ে এসে কোথাও স্থান না পেয়ে আমার বাড়ীতে প্রায় দুইমাস লুকিয়ে ছিল। তাদের মুখে যে অত্যাচারের কথা শুনেছিলাম তাতে কোনও ব্যক্তিই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। স্ত্রলোকের মূত্রদ্বারে বেত দিয়ে খোঁচা মেরেছিলেন পুলিশের সাবইনসপেক্টর। দাসত্ব মানুষকে কত নীচ করতে পারে তার এত বড় দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে কি?

আমার কাছে দুমাস লুকিয়ে থেকেও ফল হয় নি। আমার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাদের কৌতূহল তাদের ঘাটালে নিয়ে গেছল এবং ধরা পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল। চোদ্দ বৎসর বাদে ছাড় পেয়ে যখন ফিরে এসেছিল তখনও এসে প্রথম আমার কাছেই এসেছিল।

(২৮)

আমি ম্যালেরিয়া থেকে রেহাই পেলেও Deodonal Ulcer থেকে রেহাই পাই নি। ম্যাকলিন পাউডার খেতাম যখন খুব যন্ত্রণা হ'ত। হঠাৎ একদিন সকালে অজ্ঞান হয়ে যাই। পেটের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। ডাঃ বিধান রায় ও কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির সমস্ত দিন বহু চেষ্টায় সন্ধ্যায় জ্ঞান ফিরে এল। তারপর বিধানবাবু যে চিকিৎসা করল সে অদ্ভুত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একমুঠো করে medicated চক পাউডার খাওয়াতে লাগলেন। Horse Serum injection করতে লাগলেন। শেষে যখন বললেন Raw meat juice খেতে হবে তখন আমি জোড় হাত করে বললাম আজন্ম নিরামিষাশী আমি ঐ juice খেলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে। তখন তিনি বললেন কেবলমাত্র দুধ খেয়ে অন্ততঃ একবৎসর থাকতে হবে। বাড়ী থেকে বের হতে পারবেন না। কংগ্রেসের সব activity ছাড়তে হবে। আমি সবেতেই রাজী হলাম। মহাত্মাজীকে পত্র দিলাম। তিনি লিখলেন it will be terrible thing if you are lost to public service. ডাক্তার রায়কে পত্র দিলাম তিনি পত্র দেখে নিজেই মহাত্মাজীকে লিখলেন। তখন মহাত্মাজী রোগের চেহারা জানতে পেরে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শেষে লিখেছিলেন,

A time will come, it may not come in my life time when men like you shall have to plunge yourself in national struggle.

যাই হ'ক কংগ্রেস কার্য্য বন্ধ হল। কেবল দুধ খেয়ে ৬ মাস কাটল। তারপর বিধানবাবুর উপদেশ অনুসারে দুধে ভাত চটকে গুলে খেয়ে আরও ৬ মাস ছিলাম। তিনি একটা alkali powder করে দিয়েছিলেন সেটা এক বোতল করে আনতাম আর প্রত্যহ খেতাম। পেটের সব যন্ত্রণা চলে গেছল। বিধানবাবু

বলেছিলেন যদি recur করে তবে বাঁচবেন না। আর পুনরাবির্ভাব হয় নি। ৮৬ বৎসর বাঁচিয়া আছি। ধন্য ডাক্তার রায়ের চিকিৎসা। ইহার জন্য চিরকাল তাঁর কাছে আমি ঋণী ছিলাম।

ইতিমধ্যে ৪র্থ কন্যার বিবাহ দিলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলাম। সংসারের জন্য রোজগার করা প্রয়োজন হওয়ায় আবার হাইকোর্টে বারে যোগ দিলাম। অবশ্য ডাক্তার রায়ের অনুমতি নিয়ে। যারা আমাকে জানে তারা ভাবে আমি কংগ্রেস থেকে কেন সরে এসেছিলাম। কংগ্রেসে থেকে কেবল মুরুব্বিআনা করব কোনও পরিশ্রম করব না, সে প্রকৃতি আমার ছিল না বা নাই। তাই সব সংস্রব ছেড়েছিলাম। তবুও থাকতে পারি নি। মহাত্মা যখন Scheduled Caste এর পৃথকীকরণ জন্য পুণা জেলে অনশন করেন তখন ছুটে গেছলাম। আবার তিনিই বাংলায় "হরিজন সেবক সংঘ" গড়ে তোলবার লোক না পাওয়ায় বিধানবাবুকে সভাপতি করে আমিই সেক্রেটারী হয়ে হরিজন সেবক সংঘ সুরু করি সেকথা পূর্ব্বে বলেছি। দুই বৎসর সে কাজে ছিলাম। তারপর সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয় উহার সভাপতি হলে আমি পরিত্যাগ করি।

১৯৩৪ সালে বার্জ্জ মার্ডার কন্‌সপিরেসী কেসে মেদিনীপুরে tribunal অন্যান্য আসামীর সহিত আমার দাদার কনিষ্ঠ পুত্র ১৬ বৎসরের সনাতনকেও জড়িয়ে দেয়। আসামীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্যক্তি defend করে। পূর্ণানন্দ সান্যালকে defend করবার ভার আমার উপর পড়েছিল। সেই বিচার যখন চলছিল সেই সময় বিহারের বিখ্যাত ভূমিকম্প হয়। মেদিনীপুরেও প্রচণ্ড কম্পনে আসামীরা কাঠগড়ায় তারের খাঁচার মধ্যে চাবি দেওয়া। বিচারক ছুটে ঘর থেকে পালালেন। উকীল মোক্তার পালালেন। সান্ত্রি যাহারা চাবি বন্ধ তাদের ফেলে পালাল। আমি সেই খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছেলেরা বলতে লাগল আপনি বাইরে যান। আমাদের ত ফাঁসিতে ঝোলাবে। সুতরাং বাড়ী চাপা পড়ে মরলে ক্ষতি নেই। আপনার অমূল্য জীবন বাঁচাতেই হবে। বাইরে যান, আমাদের অনুরোধ ছুটে পালান। আমি পারি নি। ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সকলে মরে নি। তিনটের ফাঁসী হল, আমার ভাইপোসহ পাঁচটার দ্বীপান্তর হল, আর গোটাতিনেক ছাড় পেল, তার মধ্যে আমার আসামী পূর্ণানন্দ সান্যাল ছাড় পেয়েছিল।

তারপর মেদিনীপুর থেকে বিতাড়িত হলাম আমি, দাদা, মন্মথদাস, বিনয়জীবন, নারাণ মুখোপাধ্যায়, দাদার পুত্রগণ ইত্যাদি।

যদিও হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করছিলাম তথাপি যখন ১৯৩৭ সালে আবার কংগ্রেস নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল এবং আমার দাদা কিশোরীপতিকে মেদিনীপুরের ঘাটাল ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনীত করে তখন সরকারের অনুমতি নিয়ে দাদার জন্য ভোট সংগ্রহে আমাকে ঝাড়গ্রাম যেতে হয়। দাদার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঝাড়গ্রামের জমিদার বা রাজা, গভর্ণমেণ্টের মনোনীত প্রার্থী। সে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে দাদার জিত হয়েছিল। ঝাড়গ্রামের জমিদারের নিজের এলাকায় তিনি অর্দ্ধেক ভোট পেয়েছিলেন। আর ঘাটালে তিনি নামমাত্র ভোট পেয়েছিলেন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ কারটার সাহেব আমাদের গ্রামে জাড়ার স্কুল কম্পাউণ্ডে সভা করে বলেছিলেন যে কিশোরী-পতিকে ভোট দেবে সেখানে আগুন জলে যাবে। তখনি জাড়ার চাষী দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের উপর বলেছিল আমরা তাকেই ভোট দোব তুমি সাহেব আগুন জালিও। আমরা ওতে ভয় পাই না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আর কিছু করতে সাহস করেন নি।

এই সময় আমার পঞ্চম ও ষষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিই এবং দাদার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। ক্রমশ: পারিবারিক খরচ বেড়েই চলছিল। ১৯৩১ সালে ভবানীপুরের বিখ্যাত জমিদার বরদাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর সুন্দরবনের লাটে আমায় ৬শত বিঘা জঙ্গল-জমি বন্দোবস্ত দিতে স্বীকৃত হন। তিনি আমার চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ

ছিলেন। কিন্তু বন্দোবস্ত হবার আগেই তাঁর ষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে চলে যায়। সুন্দরবনের পুলিশ ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করে যে যদি ওখানে আমাকে জমি দেওয়া হয় তবে সুন্দরবনে কংগ্রেসের প্রভাব বেড়ে যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই রিপোর্ট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসএর ম্যানেজারের হাত দিয়ে বরদাবাবুকে দেয়। বরদাবাবু তার উত্তরে লেখেন সাতকড়িবাবুকে জঙ্গল বন্দোবস্ত দিতে আমি চুক্তিবদ্ধ। যদি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস আমার সে চুক্তি অস্বীকার করে তবে আমার বিশেষ অসম্মান হবে। শুধু তাই নয় ঐ চুক্তি আইনতঃ শুদ্ধ। নালিশ করলে সাতকড়িবাবু ডিক্রি পাবেন। সুতরাং এ বন্দোবস্ত দিতেই হবে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসএর ম্যানেজার বরদাবাবুর চুক্তিমত বন্দোবস্ত দেন। ধারধোর করে তাতেই জঙ্গল পরিষ্কার করে বাঁধ দিয়ে নোনা জল আসা বন্ধ করে চাষবাস করতে আরম্ভ করি। ক্রমশঃ সে জমির যথেষ্ট আয় হয় এবং ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত চাষ করি। ঐ সময় জাতীয় সরকার পূর্ব্ববঙ্গাগত বাস্তুহারাদের দেবার জন্য ঐ জমি গ্রহণ করেন, ১৯৫৫ সালের মার্চ্চ মাসে। এই ২২।২৩ বৎসর ঐ জমির পশ্চাতে আমি ও আমার দ্বিতীয় পুত্র নেপাল বহু পরিশ্রম করি।

(২৯)

লিখছিলাম বাংলার রাজনৈতিক বিবরণ; চলে এলাম নিজের সাংসারিক বিষয়ে। ১৯৩৫ সালের যে আইন বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করলে তাতে লোকসংখ্যা হারে আসন স্থির হল। মুসলমানের সংখ্যা বাংলায় বেশী থাকায় মুসলমানের বেশী আসন বিধানসভায় হল। আবার সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য আসন সংরক্ষণ হল। সুতরাং মুস্লিম লীগের সংখ্যা বেশী হল। কংগ্রেস থেকে একজনও মুসলমান বাংলায় নির্ব্বাচিত হয় নাই। নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হয়ে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হল। ওদিকে সুভাষবাবু দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। প্রথমবার সকল ব্যক্তির সহযোগিতায়, বিশেষ মহাত্মা গান্ধীর সহানুভূতি ছিল, কিন্তু সুভাষবাবু মহাত্মার অহিংস নীতি সম্পূর্ণ গ্রহণ না করায় দ্বিতীয়বার মহাত্মাজীই পট্টভি সীতারামিয়াকে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। কিন্তু তিনি হেরে গেলেন। ওতে ভারতীয় কংগ্রেসেও দুই ভাগ হয়ে গেল। একে ত মুসলমানেরা বেরিয়ে গেল, দ্বিতীয়তঃ হরিজন অর্থাৎ সিডিউল্ড কাস্টরা পৃথক হবার চেষ্টা। তাদের নেতা বম্বের আম্বেদকর। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের মধ্যে একদল সুভাষের যারা অনুরাগী যেমন করে হউক ইংরাজ তাড়াইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা আনতে চায়, আর একদল অহিংসনীতির পূর্ণ সমর্থক। এই দলেও বাংলার ডাঃ রায়, নলিনী সরকার প্রভৃতি। এরা সুভাষবাবুর বিরুদ্ধপক্ষ।

পূর্ব্বে লিখেছিলাম ১৯৩০।৩১ সাল পর্য্যন্ত শরৎবাবু সুভাষের দাদা কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। চট্টগ্রাম আরমারি রেড কেসে তিনি ২১ দিনের জন্য গেছলেন। তারপর ধানবাদএ তাঁর মক্কেলের কেস করতে গেলেন আর সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে মাদ্রাজে জেলে ধরে রেখে দিলে। তারপর ছাড়া পেলে তিনি বাধ্য হয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তিনিও সুভাষের মত অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। কলিকাতা কর্পোরেশনেও তিনি ক্রমশঃ কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই যখন মেদিনীপুর থেকে ১৯৩৪ সালে সব নির্ব্বাসিত হলাম, তখন শরৎবাবুই বিনয়জীবনকে করপোরেশনে চাকরি দেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নারাণ মুখোপাধ্যায়কে ভবানীপুর মিত্র ইনস্‌টিটিউসন-এ চাকরী দেন। দ্বিতীয়বার সুভাষ যখন সীতারামিয়াকে হারিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি হলেন তখন ওঁরা দুইভাই-এ প্রাদেশিক কনফারেন্সে বলেছিলেন ইংরাজকে এখনি নোটীশ দেওয়া হ'ক যাতে তাঁরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যান। কিন্তু মহাত্মাজীর দলভুক্ত যাঁরা তাঁরা সেটা গ্রহণ করলেন না। কলিকাতার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সুভাষবাবু পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

অবশেষে তাঁরা সুভাষবাবুর দল নূতন দল করলেন তার নাম হল ফরোয়ার্ড ব্লক।

এ এক কংগ্রেসের করুণ ইতিহাস। দেশ স্বাধীন কর্‍বার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে এমন পরস্পর মতের অমিল যে কি করে হয় সেটা আমি কখনও বুঝতে পারি নি, আজও না। ব্যক্তিগত অহংকারের এক করুণ ইতিহাস। একদিন দেশবন্ধু স্বরাজ্যদল করেছিলেন, কিন্তু তিনি কংগ্রেস থেকে চলে যান নি। কংগ্রেসকে দিয়েই স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম অনুমোদন করে নিয়েছিলেন। সুভাষ কিন্তু সেটা পারে নি, তাই পর বৎসর রামগড়ে পাল্লা দিয়ে কংগ্রেসের মতই আর একটা অধিবেশন ফরোয়ার্ড ব্লকের করেছিল।

আমার মনে পড়ে দেশবন্ধুর তিরোধানের পর যখন মহাত্মাজী যতীন সেনগুপ্তকে সর্ব্ববিষয়ে বাংলার কর্ত্তা করলেন তখন যতীন মহাত্মাজীকে বলেছিলেন সাতকড়িবাবু দেশবন্ধুর কাউন্সিলে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু নেতার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছিলেন। মহাত্মাজী বলেছিলেন, তা নৈলে কোনও কাজই করা যায় না। প্রত্যেক সৈন্য যদি নিজের মত জাহির করতে যায় তাহলে কি যুদ্ধ করা চলে? আমি সেই অভিমতই বরাবর পোষণ করি।

এরপর ১৯৪১ সালে সুভাষের নিরুদ্দেশ কাহিনী। যতদূর চমকপ্রদ হতে হয় তা হয়েছিল। অতবড় দুঃসাহসিকের কাজ কয়জন করতে পারে? যারা পারে তারা পৃথিবীতে অমর। সুভাষও অমর। আর সুভাষ বাঙ্গালী বলে এবং একদিন আমাদেরও সহকর্ম্মী ছিল বলে আমরা তার গৌরবে গৌরব অনুভব করি। তার নিরুদ্দেশের কাহিনী, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের অলৌকিক কীর্ত্তি, দিল্লী চলো বলে ভারতীয় সেনা নিয়ে ভারত অভিযান প্রত্যেকটি প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করে মরমে গাঁথা হয়ে গেছে। জাপান আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করলে সুভাষের আবার নিরুদ্দেশ যাত্রাটাও অত্যাশ্চর্য্য বিষয় হয়ে আছে। সে মৃত কি জীবিত জানি না। কিন্তু তার সেই যাত্রাটাও যে অসাধারণ বা অলৌকিক কার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

গত শতাব্দীর বাংলা নাট্যরচনার প্রেরণা

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

কোনো সাহিত্যধারার প্রেরণা এক হতে পারে না। গত শতাব্দীর বাংলা নাটকের প্রেরণাকে বিশ্লেষণ করলেও একাধিক প্রেরণার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা নাটকের উৎস বিচার করতে গিয়ে আলোচকরা তিনটি ধারার সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন,—(ক) লৌকিক নাটগীতের ধারা (খ) সংস্কৃত নাটকের ধারা (গ) পাশ্চাত্য নাটকের ধারা। উক্ত তিনটি নাট্যধারার প্রেরণাগুলি পরোক্ষ এবং রীতি-বিশ্লেষণক্ষেত্রে মানসিকতার বিচারে পরোক্ষ প্রেরণার গুরুত্ব থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনাবশ্যক।

নাটকের প্রেরণাস্বরূপ কতকগুলি দিক এক্ষেত্রে ইঙ্গিত করা চলে। (ক সামাজিক বক্তব্য প্রকাশের প্রেরণা (খ) রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের প্রেরণা (গ) ধর্মীয় প্রেরণা (ঘ) ঐতিহাসিক প্রেরণা (ঙ) রঙ্গমঞ্চ অভিনয়ের প্রেরণা (চ) অর্থনৈতিক তথা ব্যবসায়িক প্রেরণা (ছ) সহজে খ্যাতি-লাভের আকাঙ্ক্ষাগত প্রেরণা এবং (জ) সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা।

কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, গত শতাব্দীতে অনেকেই প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু কিছু সামাজিক বক্তব্য না প্রকাশ করে পারে নি। তাছাড়া গত শতাব্দীর ভাববিপ্লব স্থবির সমাজকে আন্দোলিত করায় প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল—উভয় পক্ষ থেকেই বক্তব্য প্রচারের আয়োজন চলেছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', বিধবা বিবাহ-বিষয়ক বিভিন্ন নাটক এবং মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় একটি দশকের মধ্যেই বক্তব্য প্রকাশের এই সহজ রীতিটির পরিচয় জনসমক্ষে তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। "কর্মকর্তা" প্রহসনের আলোচনায় "আর্যদর্শন" পত্রিকায় (কার্তিক, ১২৮৮ সাল; পৃষ্ঠা ৩২৯) লেখা হয়েছে,—"শুষ্ক উপদেশ অনেক সময় দোষ সংশোধনে ব্যর্থ হয়। তাহার কারণ উপদেশের অযোগ্যতা নহে—লোকের প্রবৃত্তি। মানুষ সাধারণতঃ বিশুষ্ক উপদেশ চায় না। ভারতের সেদিন এক সময় ছিল, যখন ভারতীয় মানব কেবল নীরস উপদেশের বশবর্তী হইতেন। সংস্কৃত প্রহসন ও হিতোপদেশের সময়ে উপদেশ বিশুষ্ক বলিয়া প্রতীত হয়। বিষ্ণু শর্মা তজ্জন্য—

যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥

—বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন। যে ব্যক্তি নীরস উপদেশের অনুগত, তিনি কার্য ও প্রকৃতিতঃ ইংরেজ। যিনি গল্পচ্ছলে উপদেশ মিশাইয়া দিলে শুনিতে আপত্তি করেন না, তিনি ফ্রেঞ্চ। বলিতে কি এক্ষণে আমরা কার্যে ফ্রেঞ্চ। এই জন্যেই বক্তৃতা, নবন্যাস, নাটকাদির ন্যায় প্রহসনের সৃষ্টি। নাটকের বিষয়বস্তু, নামকরণ, কলাটাইপি ইত্যাদির মধ্যে সেই প্রেরণার প্রমাণ স্পষ্ট। পূর্বোক্ত 'কর্মকর্তা' প্রহসনের (সুরেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৮২ খৃঃ) ভূমিকায় লেখক দেশের দুর্দশাচিত্র প্রদানান্তে মন্তব্য করে ছেন, "জনসমাজকে এই ভ্রমান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াসই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয় জাগরণের ফলে আমাদের দেশে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে বক্তৃতাই শুধু নয়, নাটক প্রহসনের মধ্যে দিয়েও স্বদেশিকরা তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। "একেই কি বলে বাঙালী সাহেব" নাটকের ভূমিকায় লেখক বিজাতীয় শাসকদের বিরুদ্ধে স্বজাতীয় ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র ও সংহত করবার উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন—

"বাংলার উন্নতিশীল নব সভ্যগণে,
বাঁধিতে স্বজাতিপ্রেম ডোরের বন্ধনে।

উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ
গড়লেম বাঙ্গালী সাহেব নব্য প্রহসন ॥
যদি কারো মস্তকেতে টুপি হয় ফিট।
হিন্ট লয়ে শুধ্‌রে যাও হয়ে পড় ঢীট ॥

একদিকে পরাধীনতার যন্ত্রণা, অন্যদিকে স্বাদেশিকতার ভণ্ডামী, উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর "চক্ষুঃস্থির" নাটকে মন্তব্য করেছেন,—

"গোলাম অধম যত আর্য জাতিগণ
না পারি সহিতে আর পর পদাঘাত।
ভণ্ডামি দেখিয়া কত সহিব যন্ত্রণা।
দেখে শুনে তাই আজি হলো চক্ষুঃস্থির ॥"

এই সব রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণা কোথাও কোথাও পৃথকভাবে অবস্থান করেছে, আবার কোথাও বা জড়িতভাবে অবস্থান করেছে। এই সমস্ত নাটকের প্রেরণা যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা নয়, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ভুবনমোহন সরকারের "ডাক্তারবাবু" নাটকে। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'আমি পাঠকদিগকে চমৎকার করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল সাবধান করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পারে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইতে পারে।" (কলিকাতা, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ সাল)।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রকে জনসাধারণ প্রধান গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গত শতাব্দীতে সমাজ-বিপ্লবের ফলে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা অনেকের মনোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রগতিশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসংহত গোষ্ঠীকে ধর্মের দিক থেকে সংহত করবার জন্যে অনেক পুরাণের কাহিনী এবং অন্যান্য মহাপুরুষের কাহিনীকে প্রচার করেছেন। যখন নাটক বক্তব্য প্রচারের মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন রক্ষণশীল পক্ষ থেকে প্রচুর ধর্মীয় নাটক রচিত হয়েছে। সুতরাং গত শতাব্দীর নাট্য রচনায় ধর্মীয় প্রেরণাকেও অস্বীকার করতে পারিনে।

গত শতাব্দীতে যে দেশপ্রেমের চেতনা আমাদের মধ্যে জেগেছিলো, ইতিহাস-চেতনা তারই অন্তর্ভুক্ত। এই ইতিহাস চেতনা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বলা বাহুল্য নাটকের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। এই শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। এই নাটকগুলির মূলে যে ঐতিহাসিক প্রেরণা ছিলো, তা সহজেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক চেতনাকে একত্রে ঐতিহ্যচেতনা নামেও চিহ্নিত করা যেতে পারে।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের প্রেরণা থেকেও অনেকে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের (১৮৬৭ খৃঃ) ভূমিকায় বলেছেন, 'কয়লাঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের অধ্যক্ষবৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার সংশোধন বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়···কয়েকটা প্রস্তাবে এই "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম।" বিখ্যাত নাট্যকার মধুসূদনের ক্ষেত্রেও এই প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনের চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু নব অধ্যায়ে নাট্য-প্রেরণার প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উপস্থাপন করেছেন।—

"একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন; "দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন, "নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গলা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন বলিলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।"

গত শতাব্দীর অনেক নাট্যকারই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ বসু প্রমুখ অনেক নাট্যকারই অভিনয়ের প্রেরণায় নাট্যরচনা করেছেন। তাঁদের অনেকের প্রতিভা অবশ্য তাঁদের এই প্রেরণাকে গৌণ করে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাকে মুখ্য করে তুলে ধরেছে। এই সময়ে অনেক সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়-

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নাটক রচনা করেছেন! বহু নাটকের ভূমিকাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকে অর্থনৈতিক প্রেরণা থেকেও নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পূর্বোক্ত নাট্যমঞ্চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু নন, বাইরের অনেক ব্যক্তিও পারিতোষিকের লোভে নাট্যরচনায় অগ্রসর হয়েছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের একাধিক নাটকের মূলে পুরস্কারের প্রলোভন অস্বীকার করা যায় না। "কুলীনকুলসর্বস্ব" নাটক রংপুর কুণ্ডী গ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরীর পারিতোষিকের প্রলোভনে রচিত। তাঁর বিজ্ঞাপন ছিলো, "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত "কুলীনকুল সর্বস্ব" নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" রামনারায়ণের নব-নাটকেও জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রধান কর্মকর্তা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষিত পুরস্কারের প্রলোভনে রচিত। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গ-মহিলা" নাটকটিও একই জাতীয়। সন্ধান করলে এ জাতীয় আরো নাটকের সাক্ষাৎকার মিলবে। অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষপ্রমাণ অনুপস্থিত। কেউ কেউ আবার স্বনামে নাটক প্রকাশ করবার জন্যে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নাট্যকারকে দিয়ে নাটক লিখিয়েছেন। সুতরাং গত শতাব্দীর নাট্য-প্রেরণার বিচারে এই জাতীয় প্রেরণাকেও অস্বীকার করা যায় না। রঙ্গমঞ্চসংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তির প্রেরণা, রঙ্গমঞ্চ হলেও পরোক্ষতঃ তা ছিলো আর্থিক তথা ব্যবসায়িক। সুতরাং এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রেরণাকেও অন্তর্ভুক্ত করলে অসঙ্গত হবে না। অনেকে নগ্নভাবেই তাঁদের আর্থিক উদ্দেশ্য ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন। "হনুমানের বস্ত্রহরণ" প্রহসনের (১৮৮৫ খৃঃ) লেখক বেচুলাল বেনিয়া তাঁর "ভূমিকায় ধাক্কায় বলেছেন,—"বইখানি আমার যে হুড়মুড় করে বিক্রী হবে তাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। নিশ্চয় জানি আমার ব্যবসা ফস্‌কাবে না।

অন্তঃপ্রেরণা যা-ই থাকুক, গ্রন্থাকারমাত্রই খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করেন। প্রতিভাবানরা নতুন পথে চললেও তাঁদের দৃষ্টি থাকে অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। প্রচলিত পথে যাঁরা চলেন, তাঁরা বলা বাহুল্য বর্তমানের প্রতি অনেক আশাভরসা করে থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক অভিনয়ের ফলে অনেকে সহজে খ্যাতি-লাভের প্রেরণায় বহু নাটক লিখেছেন। প্রতিষ্ঠিত নাটকের নামকরণগত প্রশ্নোত্তরে, প্রতিষ্ঠিত নাটকের বিষয়বস্তুগত সম্পর্করক্ষায় ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে নাট্যকারের পূর্বোক্ত প্রবণতাই প্রকাশ পেয়েছে।

গত শতাব্দীর নাট্যরচনায় যে প্রেরণাই থাকুক না কেন, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাকে সম্পূর্ণ অবিচার করা হবে এবং অপমান করা হবে। লৌকিক নাটগীতের ধারা আমাদের জাতীয় প্রাণরসের ধারা এতদিন বহন করে এসেছিলো। পাশ্চাত্য নাটক ও সংস্কৃত নাটক জ্ঞানার্জনের বস্তু ছিলো মাত্র। পাশ্চাত্য নাটকের বস্তুধর্মিতা ও সংস্কৃত নাটকের ভাবধর্মিতাকে এই প্রাণরসের সঙ্গে যুক্ত করবার অনুপ্রেরণা অনেকে লাভ করেছেন। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছেন—যে পথ সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও নিজস্ব। গত শতাব্দীর খ্যাতিমান অনেক নাট্যকার অননুগতভাবে তাঁদের নিজস্ব ধারায় নাটক লিখেছেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রেরণাও ছিলো নিজস্ব।

গত শতাব্দীর নাট্যরচনার প্রেরণা বিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। বহু প্রেরণা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে পৃথক ভাবে তাদের মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রেরণাও সেই জটিলতাকে আরো জটিলতর করে তোলে। তবে মুখ্যভাবে কতকগুলি প্রেরণাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার দায়িত্ব শেষ করা চলে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'তোরা যে যা বলিস ভাই'—হিন্দীকে তক্তে বসানো চাই!

ভারত সরকারের অতি বিজ্ঞ এবং প্রবল-পণ্ডিত মহাশয়গণ জাতীয় সংহতির কথা বলেন, ঐক্যের দোহাই পাড়েন, কিন্তু হিন্দীর জন্য ভারতে আবার প্রাক্-ইংরেজ যুগের প্রবর্ত্তন করিতে বিন্দুমাত্র অনাগ্রহীও নহেন! এ-বিষয় পূর্ব্বে বহুবার বহুভাবে বহুকথা বহুজন বলিয়াছেন—কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে তাহাতে কোনপ্রকার জ্ঞান-বীজের অঙ্কুর দেখা যায় নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় দপ্তরের হঠাৎ একটি রাজকীয় ফরমান ঘোষিত হইল, যাহার ফলে হিন্দীর জবরদখল এলাকা বৃদ্ধি করিবার নূতন পাকা ব্যবস্থা হয়ত করা হইবে। এই অতি সময়োচিত নূতন ফরমানের মোদ্দা কথা হইল—

> (সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার-পরিচালিত যে স্কুলগুলি আছে সেখানে এতকাল পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হিন্দী এবং ইংরেজীর মাধ্যমে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। এখন কেন্দ্রীয় স্কুল-সংস্থা হঠাৎ হুকুম জারি করিয়াছেন) "ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। হুকুমে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই; কেন্দ্রীয় সরকার-পরিচালিত স্কুলগুলিতে হিন্দীই হইবে এক এবং অদ্বিতীয় মাধ্যম।"

হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন যখন ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে ঠিক সেই সময় নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় দপ্তর হইতে হিন্দী সম্পর্কে এই নবতম ফরমান বা আদেশনামা জারি করা হইল! কেন্দ্রীয় দপ্তরের কোন বিশেষ হিন্দী পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদের মস্তক হইতে হিন্দীর পক্ষে নূতন প্যাঁচ জন্মলাভ করিল, তাহার বিচার করিয়া লাভ নাই কিন্তু হঠাৎ এই উদ্ভট আদেশনামার জন্য—

> জবাবদিহি করিতে হইবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে, বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে, কেন্দ্রীয় স্কুলসংস্থাটি যাঁহার দপ্তর-ভুক্ত। এই অর্বাচীন আমলারা আগুন লইয়া যে-খেলা আবার শুরু করিয়াছেন তাহার ঠেলা কেন্দ্রীয় সরকার সামলাইতে পারিবেন তো? হিন্দী চাপাইবার মূঢ় জবরদস্তির ফলে একবার দক্ষিণ-ভারতে আগুন জ্বলিয়াছিল সে-আগুন কোনমতে চাপা দেওয়া হইয়াছে, একেবারে নিবে নাই। অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপাইবার মতলবে রকমারি চাপ এখনও দেওয়া হইতেছে নয়াদিল্লীর দপ্তরগুলি হইতে। কেন্দ্রীয় সরকারী স্কুলগুলিতে ইংরেজীর মাধ্যমে পঠনপাঠন বন্ধের হুকুম ওই রকম একটা চাল। ইহার পরিণাম কী, উৎকট হিন্দীপ্রেমীরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কি তাঁহাদের মাথা বন্ধক দিয়াছেন হিন্দীওয়ালাদের কাছে? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এ বিষয়ে কী বলেন?

কেন্দ্রীয় সরকার-পরিচালিত স্কুলগুলি নিশ্চয়ই কেবল হিন্দীওয়ালাদের জন্য নয় এবং কেবলমাত্র হিন্দীওয়ালাদের টাকায় চলে না। এই স্কুলগুলি

বিভিন্ন রাজ্যে খোলা হয় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য। দেশের অধিকাংশ লোক অহিন্দীভাষী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও অহিন্দীভাষীর সংখ্যা কম নয়। কেন্দ্রীয় সরকারী স্কুলগুলি সম্পর্কে ১৯৬২ সনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত লন, এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে হিন্দী এবং ইংরাজী। ইহাই সঙ্গত সিদ্ধান্ত। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নয় তাহাদের হিন্দীর মাধ্যমে পড়াশোনা করিতে বাধ্য করা হইবে না; সে-জন্য বিকল্প ইংরেজী-মাধ্যমের ব্যবস্থা। ইংরেজীকে একমাত্র বিকল্প মাধ্যম করিবার কারণও পরিষ্কার। নানারাজ্যে বদলী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের নানারকম মাতৃভাষা; একটি স্কুলে সবরকম আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারা অসম্ভব, তাই হিন্দীর মাধ্যমে যাহারা পড়িতে চায় না তাহাদের জন্য ইংরেজী-মাধ্যম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ১৯৬২ সনের সিদ্ধান্তে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না, বরঞ্চ ওই সিদ্ধান্তটি ছিল সরকারী ভাষানীতির পরিপূরক।

১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—তাহা বাতিল করিয়া ইংরেজী খতম এবং হিন্দী কায়েম করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় স্কুল-সংস্থাকে কে দান করিল? কোনো জাঁদরেল হিন্দী-প্রেমিক কেন্দ্রীয় মহামন্ত্রীর উস্কানী না থাকিলে স্কুল-সংস্থার এ-স্পর্দ্ধা বা বেআদবী দেখাইবার সাহস হইত না বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রীর নাম করিবার প্রয়োজন নাই।

হিন্দী এবং ইংরেজী সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত, ইহা পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের বিধান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও ইহা বাতিল করিতে পারেন না। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারী স্কুলগুলি হইতে ইংরেজী মাধ্যম তুলিয়া দিয়া একমাত্র হিন্দীতে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা কোন্ যুক্তিতে চালু হইতে পারে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দীপ্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যতই ক্ষমতাধর হউন না কেন, অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দীর ডাণ্ডা ঘুরাইতে পারেন না। কেন্দ্রীয় স্কুলসংস্থার আমলারা সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে ইংরেজী বরবাদ ও ও হিন্দী চালাইবার ফারমান দিয়াছেন, না, তাঁহাদের পিছনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার হিন্দীপ্রেমীদের অন্তরটিপুনি আছে, তাহার সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। দুর্বুদ্ধি যাহারই হউক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পূর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করা এবং সরকারী ভাষানীতি কার্যত বানচাল করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে সর্বাগ্রে জবাবদিহি করিতে হইবে।

কেবলমাত্র জবাবদিহিতে কুলাইবে না, কেন্দ্রীয় সরকারী স্কুলগুলিতে শুদ্ধ হিন্দী-মাধ্যম চালু করিবার ফরমানটি অবিলম্বে বাতিল করা না হইলে আবার অশান্তির আগুন জলিবে, কেন্দ্রীয় কর্তারা তাহা জানিয়া রাখুন। মাদ্রাজ এবং কেরলে কেন্দ্রীয় সরকারী স্কুলগুলির ছাত্র ও শিক্ষকেরা ইতিমধ্যেই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়াছেন। কেবলমাত্র হিন্দী-মাধ্যম চালু করিয়া কেন্দ্রীয় কর্তারা কার্যত অহিন্দীভাষীদের স্বচ্ছন্দ শিক্ষার অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। ইহার প্রবল প্রতিবাদ হইবেই, আরও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটা বিচিত্র নয়। হিন্দীকে চোরাপথে চালাইবার চেষ্টায় কেন্দ্রীয় কর্তারা নিজেরাই জাতীয় সংহতির গোড়ায় কোপ বসাইতেছেন; দুর্বুদ্ধি আর কাহাকে বলে?

বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর নিকট হইতে আমরা, অর্থাৎ অহিন্দীভাষীরা বহু কিছুই আশা করিয়া ছিলাম, তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেনও দিল্লীর তক্তে বসিয়া হিন্দী-প্রেমিক অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে 'সহাবস্থান'—তথা হিন্দী-প্রেমের নৃত্যে মত্ত হইয়াছেন। যাদবপুর এবং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীত্রিগুণা সেনের যে-রূপ দেখা গিয়াছিল, আজ সে-রূপ সত্যই অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে!

(২৭-৫-৬৮)

———

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসেনের প্রতিবাদ—

২৯-৫-৬৮ তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন স্কুল-গুলিতে ইংরেজীকে বিদায় দিয়া কেবলমাত্র হিন্দীর মাধ্যমেই শিক্ষাদান করিতে হইবে—এমন কোন নির্দেশ প্রচার করা হয় নাই! সুখের কথা। কিন্তু হঠাৎ এমন একটি বিচিত্র সংবাদ ভারতের প্রায় সকল রাজ্যের সকল খ্যাত-অখ্যাত সংবাদপত্রে বাহির হইল কেন এবং কেমন করিয়া তাহা বুঝা শক্ত। তাহা ছাড়া, একটি অতি গুরুতর 'মিথ্যা' সংবাদের সরকারী প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেই বা এত বিলম্বের কারণ কি? শ্রীসেন মহাশয় ব্যক্তি—তাই তাঁহার কথায় আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে বাধ্য—কিন্তু মনে একটা খটকা থাকিয়া গেল। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরে হিন্দী-প্রেমিক এমন বহু আছেন যাঁহারা 'ছলে বলে কৌশলে' হিন্দীকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে সংস্থাপিত করার জন্য বিবিধ প্রকারে বিবিধ প্রয়াস চালাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত এই অপচেষ্টাটি করিয়া থাকিতে পারেন। যে-সব সংবাদপত্রে আলোচ্য সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত হয়, সেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কিংবা ছাপাখানায় খোঁজ করিলে এই হিন্দী-বিষয়ক সরকারী নির্দেশ-পত্রটি (কপি) অবশ্যই পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রসরকার হইতে চাওয়া হইলে যে কোন সংবাদপত্র এই (মূল) কপি দিতে বাধ্য। আমরা যতদূর জানি—দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার কপি তথা ম্যানস্ক্রিপ্টগুলি অন্তত তিনমাস রক্ষা করিবার একটা সাধারণ নিয়ম আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী বাতিল করিবার সরকারী নির্দেশ একেবারে ভিত্তিহীন অর্থাৎ 'কিছুই নয়?—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। শ্রীসেনের প্রতিবাদপত্রটিও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ভুয়া হইতে পারে।

—————

ইংরেজীকে যদি বিদায় দিতেই হয়—

তাহা হইলে একমাত্র হিন্দীই কেন ভারতের সরকারী ভাষার মর্য্যাদা লাভ করিবে?—সংবিধানসম্মত ১৫টি ভাষা কেন সম-মর্য্যাদা লাভ করিবে না? এই ন্যায্য দাবী কি ইংরেজী-হটানেওয়ালা হিন্দী-প্রেমিকরা স্বীকার করিবেন? দাবী যদি সজোর হয় এবং তিনটি রাজ্য বাদ দিয়া অন্যসব রাজ্যবাসীরা এই দাবী পেশ করে, তেমন অবস্থায় হিন্দী-বসানেওয়ালারা কি যুক্তি বা কিসের বলে সেই দাবী ঠেকাইবেন, প্রতিরোধ করিবেন জানিতে ইচ্ছা হয়। আলকাতরা দিয়া ইংরেজী সাইনবোর্ড নষ্ট করিয়া এবং নিজ পাল্লায় পাইয়া মোটরের নাম্বার-প্লেট ভাঙিয়া দিয়া হিন্দী-এলাকার স্থান বিশেষে হয়ত সাময়িক আত্মপ্রসাদ এবং চ্যাংড়া হিন্দীসেনাদের নিকট হইতে বাহাবা লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার বাঁদরামো দ্বারা শেষ রক্ষা করা যাইবে না। হিন্দী-বানরসেনাদের পাল্টা জবাব যখন দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ডতর ভাবে সুরু হইল, ঠিক সেই সময় হইতেই হিন্দীবানর-সেনারা এবং তাহাদের ঝানু পিতৃবৃন্দ শুদ্ধ হইয়া নিজেদের সংযত করিতে বাধ্য হইল নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে।

জোর করিয়া হিন্দী চাপাইবার ফলে কি অনর্থ ঘটিতে পারে তাহা মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কিন্তু দিল্লীর হিন্দীভাষী কর্তামহাশয়গণ—কিছুদিন চুপ করিয়া থাকিবার পর আবার তাঁহাদের ভাষার-নষ্টামী সুরু করিয়াছেন এই ভাবিয়া সে-ঝড় যখন কমিয়া গিয়াছে বর্তমানে, এই সুবর্ণ-সুযোগ এবং অবসরে ফাঁকতালে হিন্দীর অভিষেক-উৎসবটা সারিয়া লইলে দোষ কি? দোষ হয়ত কিছুই নাই, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি অহিন্দীভাষীরা ভাষার ব্যাপারে পূর্ণ জাগ্রত, সতর্ক এবং সচেতন রহিয়াছে সব সময়, এই খবরটা বোধহয় হিন্দীওয়ালাদের কাছে পৌঁছায় নাই এখনও!

এমন সময় শীঘ্রই আসিতেছে যখন জনগণের (অহিন্দী-ভাষী) তীব্র প্রতিবাদের ফলে (পোষ্টাল) খাম, পোষ্টকার্ড, মনি-অর্ডারফর্ম্ম প্রভৃতিতে হিন্দী লোপ পাইবে। এমনও

হইতে পারে যে (বিভিন্ন ভাষী) রাজ্যের ভাষা অনুযায়ী ডাকবিভাগের সব কিছুই প্রচার করিতে হইবে। কারেন্সী নোট এবং খুচরা কয়েন্ সম্পর্কেও হয়ত অচিরে এই ব্যবস্থা চালু কবিতে হইবে—এবং সেদিনের অবস্থা হয়ত এমনই হইবে যে, সর্ব্বভারতের জন্য ভারতসরকার যাহা কিছু করিবেন সব কিছুই একমাত্র ইংরেজীতে করিতে হইবে—অর্থাৎ সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে হয় ইংরেজী আর না হয় সংবিধান-স্বীকৃত ১৫টি ভাষাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সমান স্বীকৃতি এবং মর্য্যাদা দিতে হইবে।

———

পশ্চিমবঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভবিষ্যৎ কি?

গত ২৮এ মে'র সংবাদে প্রকাশ যে—আগামী ১৭ জুন হইতে পশ্চিমবঙ্গের এঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের অনির্দিষ্ট-কালের জন্য ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত বুধবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

বি পি টি ইউ সির এক মুখপাত্র জানান, পরে বস্ত্রশিল্প ও পাটকল শ্রমিকরাও তাঁদের নিজস্ব দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করিবেন। দিন এখনও স্থির হয় নাই তবে জুনের শেষাশেষি হইতেই শুরু হইবে বলিয়াই ঠিক আছে। ঐ মুখপাত্র আরও জানান, এ সত্ত্বেও শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য মালিকপক্ষ কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না লইলে এই তিনটি শিল্পের শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে এক বা তারও বেশি দিনের জন্য সারা রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘটেরও ডাক দেওয়া হইবে।

ওই মুখপাত্র জানান, সারা রাজ্যে এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৪ লক্ষ, বস্ত্রশিল্পে ৫০ হাজার, পাটকলে আড়াই লক্ষ লোক কাজ করেন। এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিতে পৃথক পৃথকভাবে পূর্বে আন্দোলন হইয়াছে, তবে সারা রাজ্যের সমস্ত এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির একসঙ্গে এই রকম ব্যাপক আন্দোলন ইতিপূর্বে হয় নাই বলিয়াই ঐ মুখপাত্র জানান।

যে দাবিগুলির ভিত্তিতে এই আন্দোলন, তা হইল: (১) সর্বক্ষেত্রে ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট প্রভৃতি বন্ধ করা, (২) জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকের সঙ্গে সমস্ত রাখিয়া বেতননীতি সংশোধনের সময় শ্রমিকদের সুপারিশগুলি গ্রহণ করা, (৩) বেতন বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশ, (৪) পাট-কল শিল্পে বেতন-কাঠামো সংশোধন, (৫) বেকার ভাতা প্রবর্তন, (৬) বস্ত্রশিল্পে বেতন বোর্ডের সুপারিশের চূড়ান্ত-করণ অথবা অন্তর্বর্তী সাহায্যদান ইত্যাদি ইত্যাদি।

বি-পি-টি-ইউ-সি'র ঘোষণা ভাল কি মন্দ তাহা না বলিয়া এখানে এইমাত্র প্রশ্ন করিব যে ইহা সময়োচিত কি না। একথা সকলেই জানেন যে ১৯৬৭ সালের শ্রমিক বিক্ষোভ এবং তাহার উপর ব্যবসায়ে মন্দার ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই রাজ্যের ছোট বড় প্রায় সকল এবং সর্ব্বপ্রকার এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলি। এমন কি ছোট ছোট কারখানার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কলকারখানা সাময়িক, কোন কোন ক্ষেত্রে চিরকালের মত বন্ধ হইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে ইউ-এফ্ সরকারের পতন এবং রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে কলকারখানা এবং অন্যান্য 'ইউ-এফ্' শাসনের কল্যাণে আহত ব্যবসায় সংস্থা, ক্রমশ আঘাতজনিত ঘা নিরাময় করিয়া সুদিনের আশা করিতে-ছিল, কিন্তু বি-পি-টি-ইউ-সি'র প্রাণে তাহা সহ্য হইতেছে না, সি পি এম, সি পি আই এবং সমআদর্শধারী ট্রেড ইউনিয়নের লিডার তথা মালিকগুষ্টি, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে অরাজকতা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া সমগ্র রাজ্যকে কম্যু-কুরুক্ষেত্রে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রমিকদের দাবিদাওয়া অবশ্যই থাকিবে এবং যথাসাধ্য তাহা মিটাইতেও হইবে কিন্তু দাবীর যৌক্তিকতার মালিক-পক্ষের লাভ-লোকসান এবং আর্থিক সামর্থ-সঙ্গতির দিকটাও দেখিতে হইবে। শিল্পক্ষেত্রে ভাগীদার কেবলমাত্র শ্রমিকরাই নহে, মালিকপক্ষকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র বিসদৃশ শ্রমিকস্বার্থ দেখাটা কেবল বিসদৃশ নহে, পক্ষ-

পাতিত্ব দোষদুষ্টও বটে। পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—একদেশদর্শী এবং দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত।

ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের হাঁস মারিয়া ডিম খাওয়াইবার মহাপরিকল্পনা করিতেছেন। দু-চারদিন হয়ত পরমানন্দে শ্রমিক বন্ধুগণ ডিমের ভোজ চালাইতে পারিবেন, কিন্তু তাহার পর?

একটি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে অনেক কলকারখানার মালিক এবং মালিকসংস্থা উত্তর প্রদেশে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করিয়াছেন। কোন কোন মালিক বিহার উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে কারখানা চালান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ কেহ ইতিমধ্যেই করিয়াছেন। উল্লিখিত রাজ্য-সরকারগুলি পশ্চিমবঙ্গ হইতে যাঁহারা কলকারখানা ঐ সকল রাজ্যে সরাইতে চাহেন, তাঁহাদের পূর্ণ সহায়তা এবং সহযোগিতা দান করিতেছেন অকুণ্ঠিতভাবে। বলাবাহুল্য, এ-রাজ্যের অবাঙ্গালী শ্রমিক, অন্য যে-কোন রাজ্যে রুজি-রোজগারের সকল সুবিধাই পাইবে, কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালী শ্রমিকদের কি গতি হইবে? বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী শ্রমিককে কেহ কাজ দিবে না এমন কি বাঙ্গলার বাহিরে দিনমজুরী কিংবা কুলীর কাজও তাহারা পাইবে না। অবস্থা যদি শেষ পর্য্যন্ত এই রকম দাঁড়ায়, দাঁড়াইবে একথা জোর করিয়া বলা যায়, যদি না শ্রমিক-নাচানো অবিলম্বে বন্ধ করা হয়! তাহা হইলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কয়দিন কয়জন বাঙ্গালী শ্রমিক এবং তাহাদের নিরন্ন পরিবারকে এক মুঠা অন্ন দিতে পারিবেন? অবশ্য ধর্ম্মঘট যখন 'শ্রমিক-ধর্ম্মঘট' সেই ক্ষেত্রে যাঁহারা শ্রমিক নহেন, অর্থাৎ ট্রেড্ ইউনিয়ন লিডারমহাশয়গণ এ-ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতে পারেন না। করিলে তাহা বামপন্থি লিডার পরিচালিত ট্রেড্ ইউনিয়ন কোডে বে-আইনি হইবে। কাজেই শ্রমিক ধর্ম্মঘটে নেতারা যখন যোগদান করিবার অধিকারী নহেন, তখন ধর্ম্মঘটের কারণে যে-সকল শ্রমিক সপরিবারে অনশনব্রত পালন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের সহিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 'অনশন' নামক পুণ্যব্রতে যোগদান, একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও করিবেন কেমন করিয়া; কাজেই যখন অসহায় শ্রমিকগণ সপরিবারে অসহনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া অনাহারে থাকিতে বাধ্য হয়, তেমন ক্ষেত্রেও শ্রমিক হিতকল্পে-অর্পিত-প্রাণ শ্রমিক নেতারা অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিয়মিত পান আহার পরিত্যাগ করিতে পারেন না। শ্রমিক-নেতারা অনাহারব্রত গ্রহণ করিলে, তাঁহারা শরীর এবং মনে হীনবল হইবেন। এবং নেতারা হীনবল হইলে শ্রমিকরা মনোবল হারাইবার সঙ্গে আরম্ভিত ধর্ম্মঘটের মইটিও হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কাজেই শ্রমিক-নেতাদের কোনপ্রকার অনাবশ্যক দুঃখ কষ্টের (অনাহারাদি) মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। হাজার হাজার শ্রমিক মরিলে তাহাদের স্থান সহজেই পূর্ণ হইবে, কিন্তু একজন শ্রমিক-নেতার তিরোধানে সে স্থান পূর্ণ করা রাম শ্যাম যদুকে দিয়া হইবে না। একজন শ্রমিক নেতার অভাবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের যে ক্ষতি হইবে, তাহার পরিমাণ আকাশ সমান। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে শ্রমিকদের ঝড়ের মুখে ঠেলিয়া দিয়া শ্রমিক-নেতাদের আড়ালে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

একথা আমরা সকলেই জানি যে বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের অতিশিক্ষিত সরল চরিত্র, দেশপ্রাণ এবং অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিক-নেতারা শ্রমিকদের কল্যাণে সর্ব্বদা সব কিছু, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গোল বাধাইয়াছে সাধারণ শ্রমিকগণ, পালের গোদা হারাইয়া তাহারা কোন ক্রমেই হঠাৎ 'অনাথ' হইতে রাজী নহে। কাজে কাজেই শ্রমিকরাজদের কষ্ট করিয়া বাঁচিয়া থাকা ছাড়া (একান্ত দুঃখের সঙ্গে) অন্য উপায় কি আছে?

গত চারিমাসের কারখানা বন্ধের খতিয়ান

এ বছর গত চার মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১২৭টি প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট, লকআউট ও কাজ বন্ধ হইয়াছে। ফলে ৩৯ হাজার লোকের কাযত চাকরি নাই। যে-সব কারখানা উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে ত ভবিষ্যতেও চাকরির আশা নাই।

ইহার মধ্যে অবশ্য সিনেমা ধর্মঘটও ধরা হইয়াছে। সিনেমা শিল্পের ৮ হাজারের মত লোক ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত।

রাজ্য শ্রম-দফতরের এক মুখপাত্র ওই তথ্য জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, ওই ১২৭টির মধ্যে ২৬টি প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, ৩০টিতে লক আউট এবং ১৭টি কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইসব কারখানায় অধিকাংশেই ইন্‌জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রস্তুত হইত।

উপরি উক্ত হিসাবের সহিত ১৯৬৭ সালের হিসাব যোগ করিলে আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। রাজ্যপালের শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই এ-রাজ্যের কলকারখানা এবং অন্যবিধ শিল্প-সংস্থাগুলি একটু আলোর আভাস এবং নিঃশ্বাস লইবার অবকাশ পাইবার আশা করিতেছিল, কিন্তু দেশের এবং জনগণের ভাগ্যবিধাতা গণপতির দল ইহা সহ্য করিবেন কেমন করিয়া? দেশের সর্ব্বাত্মক কল্যাণ এবং মানুষের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার ভগবানপ্রদত্ত একচেটিয়া অধিকার একমাত্র তাঁহাদের হাতে এবং তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে, অতএব এই গণপতি তথা ট্রেড ইউনিয়ন কর্ত্তাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যপালের শাসনকে ব্যর্থ করিয়া আবার এ-রাজ্যে একটা অরাজকতা অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করিয়া মালিক বর্গের সহিত শ্রমিকদের আবার পথে বসানো, তখন অন্য কাহারো, ভগবান প্রদত্ত গণপতিদের এই শুভ ইচ্ছা এবং কল্যাণ প্রচেষ্টায় বাধা দিবার কোন অধিকার নাই, থাকিতেও পারে না।

ট্রেড্ ইউনিয়ন সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার বিদ্বেষ নাই, এবং ইহা আমরা বিশ্বাস করি যে ট্রেড ইউনিয়ন যদি ঠিকপথে চালিত হয় তাহা হইলে কেবল শ্রমিকই নহে দেশ এবং দেশের শিল্প এবং মালিক পক্ষও বহুভাবে উপকৃত হইবে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন যদি তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করে মালিক পক্ষকে জব্দ করিতে শ্রমিকদের সর্ব্ববিধ বে-আইনী কার্য করিতে উস্কানী দিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প ধ্বংস করিয়া একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করিতে, তবে তাহা বন্ধ করা চাই। অশিক্ষা এবং সদা অভাব-অনটন-জর্জ্জরিত শ্রমিকদের নেকৃড়ে-ধর্মী ট্রেড্ ইউনিয়নের থাবা হইতে মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করা এখন অত্যাবশ্যক।

হায় সুরেন্দ্রনাথ!

আজ তুমি বাঁচিয়া নাই—ইহা তোমায় পিতৃপুরুষদের বহু পুণ্যের ফল! যদি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার সাধের কলিকাতা কর্পোরেশনের লাল বাড়িতে আজ কালো-কীর্ত্তির ক্রীড়া চলিতেছে দেখিলে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন মুক্তির পথ তুমি পাইতে কি না সন্দেহ!

পৌর-পিতাদের বিচিত্রকাণ্ড এবং কেলেঙ্কারী এমন কিছু নূতন নহে, করদাতারা ইহাতে একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, যেমন হইয়াছে শহরের পথে-ঘাটে সর্ব্ববিধ জঞ্জাল এবং নোংরামীর পাহাড়প্রমাণ স্তূপ। এইটাই যেন কলিকাতার স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ বলিয়া লোকে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। "যাহা নিরাময় হইবে না, তাহা সহ্য করা ছাড়া পথ নাই।" এই প্রবচন আজ বারবার আমাদের মনে হইতেছে কলিকাতা শহরের অবস্থা দেখিয়া।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সভা মল্লযুদ্ধে এবং হাতাহাতির ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ইতিপূর্ব্বে বহুবার এবং পৌর (অপ) পিতাদের কর্ত্তব্যের ইহাও একটি অঙ্গ, কাজেই ইহা নূতন খবর কিংবা ইহাতে অবাক হইবার কিছু নাই! কিন্তু লম্ফ-ঝম্ফ ইত্যাদি ব্যাপারের শেষ চূড়ায় পৌঁছাইয়া একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলেন কর্ত্তব্যে সদা-সজাগ আমাদের এই বিষম নগরীর বিষম পৌরপিতারা। এমন অবস্থায় হঠাৎ তাঁহাদের মনে হইল—সময় হইয়াছে! এবার নিজেদের কলঙ্ক-রেকর্ড নিজেদেরই ভঙ্গ করা একান্ত কর্ত্তব্য!

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় যে কাণ্ড ঘটে তাহাতে যেমন—একদিক হইতে হয়ত ইতিহাসের প্রগতি সূচিত হইয়াছে:

অন্য দিক হইতে আবার হয়ও নাই। আমরা বরং পৌরপিতাদের অধঃপতনে শঙ্কিত। অধঃপতন আর কিছুতে নয়, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতায়। সেটা কি হঠাৎ এত ছোট হইয়া গিয়াছে যে, এই তুচ্ছ রাজ্যে কে রাজ্যপাল থাকিবেন কে থাকিবেন না সেই প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকিবে? ধর্ম্মবীর তো অত্যন্ত সামান্য ব্যক্তি। দ্য গল এলিজি প্রাসাদের মসনদে থাকিতে পারেন কি না, অথবা হো চি মিন হ্যানয়ে, পৌরপিতৃবৃন্দ সেই পিণ্ডিও তো চটকাইতে পারিতেন। অন্ততপক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর অপসারণ চাই—এমন একটা বায়না ধরিলে তবু মানাইত। মোটের উপর প্যারিসে, যখন 'বিপ্লব' আর শান্তি বৈঠক এবং ঈশ্বর জানেন ভূভারতের কোথায় আরও কত কী—তখন কিনা এই মহানগরের মহানায়কেরা সামান্য একটি সমস্যা লইয়া মাথা শুধু ঘামানো নয়, মাথা ফাটাফাটির পর্যন্ত উদ্যোগ করিলেন। কী (গভীর) লজ্জার কথা।

কলিকাতা যদি মহানগর, এই নগরের পৌরকাহিনী তবে এক মহাকাব্য। কে রাম, কে রাবণ বলা মুশকিল; কে ভীম, কে দুর্যোধন তাহারও ঠিক নাই, অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় লড়াই একটা লাগিয়াই আছে, লঙ্কাকাণ্ড গদা-পর্ব্ব মুশল-পর্ব্ব কোনটাই বাদ যায় না। 'ইস্যু' বা কোন একটা চুলচেরা দরকার নাই, প্রশ্ন একটা তুলিলেই হইল। পৌরপিতারা স্বদেশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবার যে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে জন্য আমরা অবশ্যই বিস্মিত হইয়াছি। একমাত্র নির্বোধ নাগরিকেরাই বোকার মত জানিতে চাহিবে, বেচারা রাজ্যপাল নূতন করিয়া কাহার পাকা ধানে আবার মই দিলেন? ভাল করুক, মন্দ করুক, যুক্তফ্রন্টের আমলও তো কবে ফুরাইয়া গিয়াছে, তবু তাহাকে লইয়াই বা অপর পক্ষের কানাকানি কেন? এই 'কেন'র উত্তর নাই। মার্চের পর অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে, কিংবা বলা চলে অনেক জল উবিয়া গিয়াছে বাষ্প হইয়া; গলা শুষ্ক, তাই যে-কোন একটি বিষয়ই গলা ভিজাইবার পক্ষে যথেষ্ট। রাজ্যপাল অথবা বিগত মন্ত্রিসভা রাজ্যের বিশেষ কিছু হিতে নাও যদি করিয়া থাকেন, তবু জিজ্ঞাস্য তাহার চেয়েও ছোট্ট যে দায়িত্বটা পৌরপিতাদের উপর ন্যস্ত ছিল—এই শহরে আলো জ্বালানো, জল যোগানো, রাস্তা সাফাই ও মেরামত ইত্যাদি তুচ্ছ কয়েকটা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সেই কাজটাই বা কতদূর করিতে পারিয়াছেন? রাস্তার বাতিগুলি দেখা যায় এখনও বেশীর ভাগই টিমটিমে, কোন কোন মহল্লায় বা একেবারেই কানা। (আবার অনেক রাস্তায় দিনের বেলাতেও দেখা যায় সারি সারি বাতি জ্বলিতেছে! বাতি নিভাইবার কাজ যাহার সে হয়ত ভুলিয়া গিয়াছে কর্ত্তব্যের কথা, কিংবা প্রত্যহ বাতি জ্বালা-নিভানো অযথা ঝামেলা না করিয়া ৩।৪ দিনের কাজ এক দিনেই সারিয়া রাখে।) পানীয় জলের সুতার মত যে-সরবরাহ সেটাও নোনতা হইয়া গিয়াছে। (রাস্তার কয়েক শত কলে দিবারাত্র জল পড়ে, অনেক কল খারাপ, অনেক কলের মাথার দিকটা হয়ত বা কালোয়ারের দোকানে খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।) এই শহরে বসিয়া আজ আমরা সমুদ্রের স্বাদ পাই। তা অতদূরই ইঁহারা যাইতে পারিলেন যদি, তাহা হইলে একেবারে সাত সমুদ্র টপকাইতে বা বাধা ছিল কোথায়? আমরা জনসন উইলসন প্রভৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞ পৌরনায়কগণের সুচিন্তিত মতামতও শুনিতে পাইতাম। এগুলি এই মহানগরীরই অত্যন্ত ঘরোয়া এবং নিজস্ব সমস্যা কিনা!

কথায় বলে—জনসাধারণের যেরূপ সরকার প্রাপ্য, তাহাদের সেইরূপ সরকারই জোটে। সূত্রটি একেবারে মিথ্যা হয়তো নয়। অন্যান্য মুলুকেও ভোটের চালুনিতে ছাঁকা হইয়া যে-সব রাজনীতিকেরা বাহির হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা ও কাহিনীই দিব্য প্রমাণ। ধরা যাক যুক্তপ্রদেশের 'হু'জ হু'। ওই রাজ্যের 'এম এল এ'দের কেহ নিজের বয়ানেই বলিয়াছেন, কেহ নন্-ম্যাট্রিক্ কাহারও বা বিবাহ-নেশা অথবা পেশা। পৌরসভারও অমন একটি 'কে ও কী' সংকলিত হইলে নেতাদের দিব্য-জীবনের এমনই রকমারী ছবি ফুটিয়া উঠিবে কি না জানি

না। তবে কিছুদিন পূর্ব্বের কুরুক্ষেত্রের দুইদিন আগেই ব্যাপারটার ছোটখাটো মহলা বা অধিবাস হইয়া গিয়াছিল। ক্লাবে বসিয়া দুই পৌরপিতা পরস্পরের গায়ে কালি ঢালিয়াছিলেন। বয়স্ক শিশুদের একজন নাকি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাঁহার ব্লাডপ্রেসারই কেলেঙ্কারীটার জন্য দায়ী। ইঁহাদের না-হয় খুব হাই-ব্লাডপ্রেসার, কিন্তু নগরীর প্রেসার যে অত্যন্ত 'লো' সে-দিকে ইঁহাদের খেয়াল আছে কি? পৌরপিতারা যে-কাণ্ড নির্বিকারভাবে করিয়া থাকেন তাহার পর পৌর-পুত্র বা ছাত্রদের কাণ্ডকারখানাকে ধিক্কার দিবে কে?

কর্পোরেশনে কুরুক্ষেত্র যাহা ঘটিবার তাহা তো ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুশকিল সঞ্জয় সাংবাদিকদের। তাঁহারা স্বভাবতই শঙ্কিত, অতঃপর বিবরণ লিখিতে পৌরসভায় ঢুকিবার আগে তাঁহারা জীবনবীমা করিয়া লইবেন হয়তো। তবে সব মন্দেরই একটা ভাল দিক আছে, এই খেলা চালাইয়া যাইতে পারিলে কর্পোরেশনের অর্থকষ্ট ঘুচিয়া যাইবে হয়তো। টিকিট কাটিয়া খেলাটা দেখানোর বন্দোবস্ত করিলে হয় না? দূর-দূরান্ত হইতে তাহা হইলে দলে দলে লোক ভিড় করিবে। ইতিপূর্ব্বে বিদেশের 'টেলিভিসনে' নাকি এই পৌরসভার ছবি দেখানো হইয়াছে। এবার স্বদেশীয় দর্শকেরও অভাব হইবে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই মনোহর বর্ণনার উপর কাহারো কিছু মন্তব্য করিবার থাকিতে পারে না। কিন্তু কর্পোরেশনের নবতম কুরুক্ষেত্রের শ্রীযুক্ত মেয়রের একটি তথ্য উদ্ঘাটন আরো চমকপ্রদ। সংবাদ পত্র হইতেই তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"কলকাতা কর্পোরেশনের ভিতরকার খবর যাঁরা কিছু-মাত্র জানেন তাঁরা সকলেই এটা অনুমান করেছিলেন। এবং মেয়র নিজের মুখে কথাটা প্রকাশ করলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের জঞ্জাল-ফেলা লরী নিয়ে রীতিমত একটা ব্যবসা ফেঁদে রাখা হয়েছে এবং সেই ব্যবসার সঙ্গে কর্পো-রেশনের কোন কর্তাব্যক্তিও জড়িত আছেন, এই সন্দেহ অতীতে অনেকবার অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে দৃঢ় হয়ে উঠেছে। যা ছিল সন্দেহ তাই হল এখন মেয়রের স্বীকারোক্তি।"

"আসলে, এই ব্যাপারে কলকাতা কর্পোরেশনের ভিতর যে চক্রান্ত চলছে, তার সবটা মেয়রের বিবৃতিতেও প্রকাশ পায়নি। ভাড়া লরীর ঠিকাদারদের পয়সা পাইয়ে দেওয়া যাঁদের স্বার্থে তাঁদের জাল অনেক দূর ছড়ান। মেয়র বলেছেন, টাকা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও নূতন লরী না কিনে সেই টাকা ঠিকাদারদের পকেটে দিয়ে ভাড়া করা লরীতে জঞ্জাল তোলা হচ্ছে। কিন্তু শুধু কি তাই? কর্পোরেশনের যে কয়টা লরী আছে সেগুলিকেও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অচল করে দিচ্ছে কারা? কার স্বার্থে? কর্পোরেশনের গ্যারেজ থেকে গাড়ীকে গাড়ী গায়েব হয়ে যাচ্ছে কি করে? এমন ঘটনা জানা গেছে যে, কর্পোরেশনের গ্যারেজ থেকে ১৪টি লরীর ইঞ্জিন মেরামত করার জন্য কারখানায় পাঠান হয়েছিল বছর চারেক আগে, কিন্তু কোন কারখানায় যে সেগুলি পাঠান হয়েছিল খাতায়-পত্রে তার হদিশ না পাওয়া যাওয়ায় সেগুলি উদ্ধার করা যায়নি! প্রায় ২৬টি ট্রেলারের সন্ধান নেই। কিছু-কাল আগে লাখ দুয়েক টাকার টায়ার কেনা হয়েছিল। অথচ, খোঁজ করে দেখা গেছে, যেসব লরীতে ঐ টায়ারগুলি লাগাবার কথা তাদের অনেকগুলিতেই ঐ টায়ার দেওয়া হয়নি। অনেক লরী থেকে হর্ণ, মাইল-মিটার, গিয়ারবক্স ইত্যাদি উধাও হয়ে গেছে। ছ-চাকার লরীগুলির শতকরা ৯০টি পাঁচটি চাকায় চলে। আমরা জানি যে, কর্পোরেশনের টাকায় কেনা লরীর স্পেয়ার পার্টগুলি চোরাপথে যেসব দোকানে চলে যায় তাদের মধ্যে গোয়াবাগান অঞ্চলের একটি দোকানের খবর মেয়রের কাছে আছে। গত অক্টোবর মাসের একটি অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছিল যে, এক নম্বর ডিষ্ট্রিক্টের গ্যারেজের ১৫৮টি আবর্জ্জনাবাহী লরীর মধ্যে ৬১টি সম্পূর্ণ অচল এবং ৪৮টি মেরামতের অপেক্ষায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গ্যারেজে পড়ে আছে। একমাত্র চিংড়িঘাটা ওয়ার্কশপেই ৩০টি লরী মেরামতের জন্য নিয়ে দু' বছর ফেলে রাখা হয়েছে।"

"এই ঘটনাও কর্পোরেশনের রেকর্ডে আছে যে, কোন

একদিন কর্পোরেশনের একটি ডিষ্ট্রিক্ট গ্যারেজ থেকে ৩৬টি গাড়ী বার করা হয় এবং তার মধ্যে ৩৭টি গাড়ীই রাস্তায় টায়ার ফেটে অচল হয়ে যায়। আর একদিনের ঘটনা: ওয়ার্কশপ থেকে ১১টি টায়ার মেরামত করা হল। গ্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল, কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই ঐ ১১টি টায়ারের ভিতর ৯টি আবার ফেটে গেছে। সকাল বেলায় গাড়ী বার করার সময় দেখা গেল নয়টি টায়ারই ফুটো হয়ে রয়েছে, অথচ সেগুলিই আগের দিন রাত্রেও ঠিক ছিল।

মেয়র-চক্রান্তের অংশমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন

"কলকাতা কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলা লরীর এই ঘুঘুর বাসাটিরই নাম মোটর ভেহিকেল্‌স্‌ বিভাগ। পর পর তিনজন কমিশনার—শ্রীসুনীলবরণ রায়, শ্রীহরিশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমূল্য ভট্টাচায্য—এই বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সাসপেণ্ড করেছিলেন। প্রথম দুজন কমিশনার নিজেরা কর্পোরেশন থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন; কিন্তু ঐ সুরারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কিছু হয়নি। কারণ, তাঁদের উপর থেকে সাসপেনসন আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় বারও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্যের দেওয়া সাসপেনসন আদেশের আওতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কারণ, কর্পোরেশনের ভিতরে যাঁদের দড়ি টানার ক্ষমতা আছে তাঁদের এমনই যোগাযোগ যে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে চার্জসীট দেওয়ার প্রস্তাবটি যেদিন কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় এল, দেখা গেল, সেদিনই হচ্ছে তাঁদের চার্জসীট দেওয়ার শেষ দিন। নিয়ম হচ্ছে, ঐ স্তরের অফিসারদের সাসপেনসনের চার মাসের মধ্যে চার্জসীট না দিলে সাসপেনসন আদেশ আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ঐখানেই চাপা পড়েছে এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবার স্বপদে যোগ দিয়েছেন। অথচ তিনি চাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পদত্যাগ করতে দেওয়া হয়নি। ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবশ্য এখনও সাসপেণ্ডেড আছেন।

"এত সব কাণ্ডের পরও কি বলে দিতে হবে, ঠিকা-দারের ভাড়া লরী খাটাবার ব্যবস্থাটা কত ফলাও এবং সেই ব্যবসায়ে কর্পোরেশনের কত ঘুঘু কতকিছু করে নিচ্ছেন? কমিশনারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে, আমাদের ধারণা, মেয়রমহাশয় ভুল জায়গায় হাত দিয়েছেন। যেখানে দিলে কাজ হত সেখানে তাঁর হাতও পৌঁছবে কিনা সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।"

মাস তিনচার পূর্ব্বে মেয়রমহাশয় কর্পোরেশনের আর একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেন। কর্পোরেশনের খাতাপত্রে নাম লিপিবদ্ধ আছে ৩৬ জন ঠিকাদারের, কিন্তু আসলে আছে, মাত্র ৬ জন ঠিকাদার, ৩০ জনই বেনামদার (লাইটিং বিভাগের)। মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে রাস্তাঘাটে নিয়মিত আলো জ্বলিতেছে না, এবং পথ-ঘাট অন্ধকার থাকে এই অভিযোগ পাইয়া, লাইটিং বিভাগের কাজকর্ম্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া উপরিউক্ত তথ্য আবিষ্কার করেন।

আরো আছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ-বৎসর ২০ হাজার বেশী বাল্‌ব্‌ লাগিয়াছে—ইহার কারণ কি, সে-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোন সদ্‌উত্তর দিতে পারেন নাই! সবাই জানেন যে-সব রাস্তায় এক একটি ল্যাম্পপোষ্টে তিনটি করিয়া বাল্‌ব্‌ লাগাইবার কথা, সেখানে প্রায় ক্ষেত্রেই হয় একটি বাল্‌ব্‌, কিংবা আদপে বাল্‌ব্‌ই নাই!! অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে কলকাতা কর্পোরেশনের ছাপমারা হাজার হাজার বাল্‌ব্‌ উত্তর প্রদেশের কানপুর এবং অন্যান্য শহরের বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কর্পোরেশন এ-বিষয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

করদাতারা অবশ্যই দাবী করিতে পারে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত এমন সর্ব্ববিধ দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে কেন, বাতিল করা হইতেছে না। করদাতাদের টাকা

কি জনকয়েক তথাকথিত নবাবপুত্রের বিলাসখানা? না, কুপোষ্যপালন আশ্রম? শুনিতে পাই কংগ্রেসীদল কর্পোরেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁহারাই কর্পোরেশন চালাইতেছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির সর্ব্বাধিনায়ক কিংবা জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং জেনারেল অতুল্য ঘোষ এই মহানগরীর কর্পোরেশনীয় কেলেঙ্কারী দমন বা দূর করেন না কেন? অতুল্যবাবুর মত বুদ্ধিমান এবং চতুর ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পৌর-প্রতিষ্ঠান তথা পৌরপিতাদের একদিনেই সায়েস্তা করিতে পারেন। যে কাজ তিনি সহজে বা অল্প কষ্টে করিতে পারেন, তাহা না করিবার হেতু কি বুঝা শক্ত।

আগামী নির্ব্বাচনের দেরী নাই, তাহার পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনকে অতুল্যবাবু যদি কঠোর হস্তে কলঙ্কমুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের কল্যাণ হইবে। কংগ্রেসের প্রতি বিরুদ্ধভাব বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। হাওয়া এখন কংগ্রেসের পক্ষে, অতুল্যবাবু কি এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিবেন না?

কর্পোরেশনে পৌরপিতাদের দুর্নীতি আরম্ভ হয় কংগ্রেসী আমল হইতেই, কাজেই বিশিষ্ট, চতুর এবং হয়ত বা দূরদর্শী কংগ্রেসী নেতা হিসাবে কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর করিবার কাজে অতুল্যবাবুর দায়িত্ব কম নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা অতুল্যবাবু জানেন দুর্নীতির উৎস কোথায় এবং কে বা কাহারা ইহার নায়ক। ইহাও সত্য কথা যে করদাতারা এইভাবে কর্পোরেশনী খেলা চিরকাল সহ্য করিবে না।

ভারত সংহতির পক্ষে 'স্পেশাল প্রিভিলেজ' ক্ষতিকর।

আহমেদাবাদের একজন হরিজন-নেতা, শ্রী কিকাভাই ভাঘেলা, হরিজনদের জন্য যে-সকল বিশেষ প্রিভিলেজ আছে, তাহা বর্জন করিবার দাবী উত্থাপন করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি ফ্রন্টও গঠন করিয়াছেন। শ্রী ভাঘেলা বলেন যে হরিজনদের জন্য নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র আসন রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ইহার ফলেই হরিজনরা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত যথাযথ ঐক্যবদ্ধ এবং মিলিত হইতে পারিতেছে না। অধিকন্তু হরিজনদের জন্য নানাবিধ বিশেষ ব্যবস্থা এবং প্রিভিলেজ থাকার ফলে অ-হরিজন সম্প্রদায় হরিজনদের সুনজরে দেখিতেছেন না। শ্রী ভাঘেলা ভারতীয় নেতাদের সহিত এ-বিষয় আলোচনা করিবেন এবং যাহাতে হরিজনদের জন্য কোন প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা এবং নির্ব্বাচনে সিট্ 'রক্ষিত' না থাকে সেই চেষ্টা করিবেন।

যে-কথা আমাদের হোমরা-চোমরা নেতারা ভাবিতে বা বলিতে ভরসা করেন নাই, সেই কথা একজন হরিজন-নেতার নিকট হইতে কেহ স্বপ্নেও প্রত্যাশা করিতে পারে নাই। ভারতীয়, বিশেষ করিয়া পরম শ্রদ্ধেয় এবং জনবরেণ্য কংগ্রেসী নেতারা—অহরহ জাতীয় ঐক্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের আদর্শবাণী প্রচার করিতেছেন, কিন্তু অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মীয়দের জন্য বিশেষ বিশেষ আইন এবং ব্যবস্থার সঙ্গে লোক এবং বিধানসভায় আসন-সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থাই বজায় রাখার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ-বাক্য কখনও উচ্চারণ করিতে ভরসা করেন না! কেন?

ভারতে বিবাহ বিষয়ে একটি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয় আইন পাশ হইয়াছে অর্থাৎ এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ বে-আইনী এবং এই আইন ভঙ্গকারীর যথাযোগ্য দণ্ডেরও বিধান বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিবাহ-আইন বিশেষ ধর্ম্মীয় একটি 'সংখ্যালঘু' সম্প্রদায়ের উপর প্রযোজ্য হইবে না। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের শাস্ত্র-অনুমোদিত চারিটি বিবাহ করিতে পারিবে ইচ্ছামত। বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কেও ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের যে ব্যবস্থা চলিত আছে, তাহাই চলিতে থাকিবে। এই বিশেষ ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের অতি শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বড় কম নহে। কিন্তু তাঁহারা ভারতে ভারতীয়

নাগরিকরূপে বসবাস এবং সকল প্রকার সুখ এবং সুবিধার সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াও নিজেদের জাতীয় জীবনের সহিত মিলিত করিতে পারেন নাই। কথাটা সাধারণভাবে বলিতেছি; বহু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে—যাঁহারা আমাদের নমস্য এবং আদর্শ-স্থানীয়।

এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিধান এবং লোকসভার বিশেষ আসনও নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, বিশেষ আইন দ্বারা। কি কারণ? কোন এক সময় বিশেষ আইন এবং বিশেষ ব্যবস্থার কিছু প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সেই মান্ধাতার যুগের নিয়মকানুন এবং বিশেষ রক্ষাকবচের প্রয়োজন নাই। ইহা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। অচিরে এইসব বাতিল করা একান্ত প্রয়োজন। মুখে ক্রমাগত জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং ইন্টিগ্রেশন প্রভৃতি বিষয়ে কথা না বলিয়া, দেশে যদি এক জাতি এবং প্রকৃত ঐক্য ও সংহতি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে সারা ভারতের সকল সম্প্রদায় এবং সকল মানুষকে একই আইনের এবং একই ব্যবস্থার সঙ্গে একই প্রকার সুযোগ-সুবিধার বিধান তন্ত্রের অধীন করিতে হইবে। তাহা না হইলে নেতা এবং শাসনসম্প্রদায়ের সকল সার কথা একান্ত অসার বলিয়া প্রমাণিত, পরিগণিত হইতে বাধ্য।
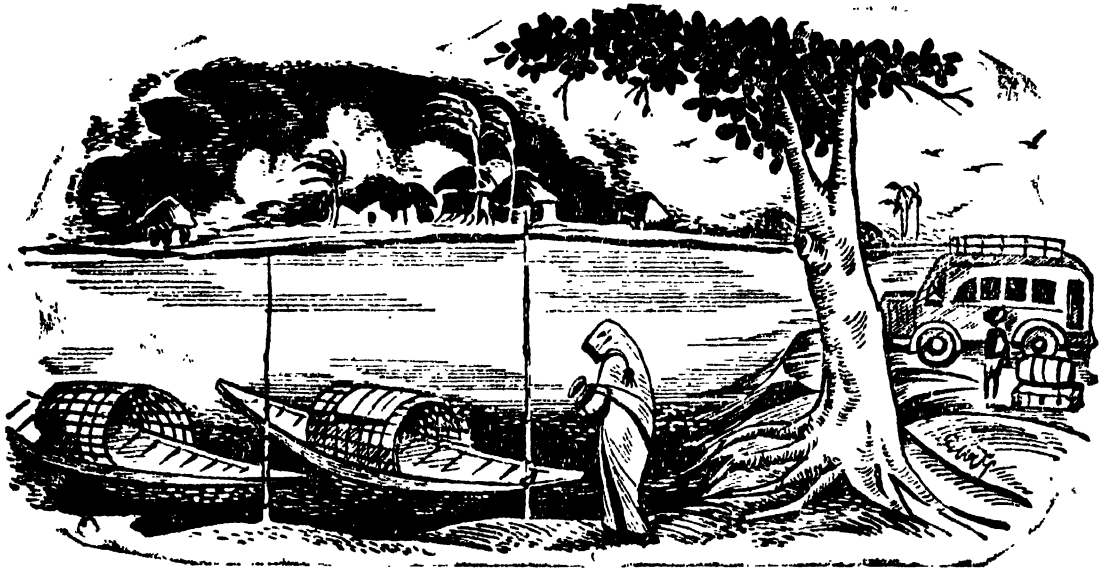
সুখ রজনী

(গল্প)

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ

কুন্তলের বিয়ে হয়ে গেল। আজ ফুলশয্যা। কুন্তল ভাবছিল,—এ যেন টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এখন যাত্রা আরম্ভ করলেই হ'ল। তারপরেই জীবনের চাকাটা নতুন ক'রে চ'লতে আরম্ভ ক'রবে। কখন, কোথায়, কি ভাবে থামবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

আজও বোধহয় বিয়ের একটা লগ্ন আছে। দূর থেকে সানাইয়ের হাঁপানো, ঝিমনো, ক্লান্ত সুর ভেসে আসছে। ঠিক কুন্তলের মত। কেমন যেন একরকম অবসাদ তার মন আর শরীরটাকে অবশ, অবসন্ন করে রেখেছে। অথচ ও বুঝতে পারছে না, এটা কি এক মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর লজ্জা না অন্যকিছু। ফুলশয্যার রাত্রি তো মানুষের জীবনে এক সাংঘাতিক রোমান্সের ব্যাপার! অথচ কুন্তলের কিছুই ভাল লাগছে না।

কুন্তলের স্ত্রীর নাম শুভ্রা। তার সামনে গিয়ে এখন দাঁড়াতে হবে। রোমান্টিক কিছু কথা-বার্ত্তা ব'লতে হবে। আর যে সমস্ত মেয়েরা এখন শুভ্রাকে ঘিরে বসে আছে তারা নিশ্চয়ই কুন্তলকে আসতে দেখলেই কেমন উচ্ছল হয়ে উঠবে। এই দিনটির অন্তর্বর্ত্তী একটা আবেগমুখর সময়কে ইঙ্গিত করে স্পষ্ট সস্তা রসিকতা ক'রবে। তার উত্তরে কুন্তলকেও কিছু কিছু চোখা-চোখা বাণ ছাড়তে হবে। একটু পরে ওরা ঘর থেকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে বিদায় নেবে। কিন্তু কাছাকাছিই থাকবে। দরজায় কিংবা জানালায় কান পাতবে। যাদের এ পালা চুকে গেছে তারা ঢোঁক গিলতে গিলতে সেই সমস্ত স্মৃতির জাবর কাটবে আর যাদের হয়নি তারা নিশ্চয়ই নাকের ডগার ঘাম মুছতে মুছতে নিজেদের দিনগুলোকে কল্পনা ক'রবে।

কিন্তু কুন্তলকে দরজায় খিল লাগাতে হবে। তারপর? উঃ! কি অস্বস্তির ব্যাপার। কিছুতেই কুন্তলের ভাল লাগছে না। এ যদি শুভ্রা না হ'য়ে জয়তী হ'ত তা হ'লে নিশ্চয়ই এত অস্বস্তির কারণ থাকতো না। কুন্তল ঘরে ঢুকলে জয়তী নিশ্চয়ই মাথার কাপড়টা বেশী ক'রে টেনে কৃত্রিম লজ্জার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতো। মুখটা অন্যপাশে ফিরিয়ে বা সামনের দিকে একটু বেশী করে। কুন্তল যদি খিলটা লাগিয়ে চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো তাহ'লে নিশ্চয় জয়তীর বেনারসীটা খসখস শব্দ তুলতো, হাতের চুড়িগুলো ঝিন্‌ঝিন্ ক'রে বাজতো। আর কুন্তল যদি জয়তীর মুখটা তুলে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলতো, "ইস, তোমাকে আজ কি সুন্দর লাগছে।" তখন হয়ত জয়তী বলতো—না জয়তী যা ব'লতো তা জয়তীই জানে। কুন্তল মনে মনে বিরক্ত হল। আজ আবার জয়তীর চিন্তাই বা কেন? সে তো বছর কয়েক আগের ঘটনা। এখন জয়তী বিবাহিতা। স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে সংসার ক'রছে। একদিন কুন্তলের সঙ্গে জয়তীর একটা সম্পর্ক ছিল ঠিকই। কিন্তু জয়তী একদিন তা অস্বীকার ক'রলো। পরে কুন্তল ভেবে নিয়েছে এটা এমন কিছুই নয়। এই সভ্য জগতের প্রায় প্রত্যেক যুবক-যুবতীর জীবনে গোড়ার দিকে এই রকম কিছু একটা ঘটে থাকে।

কিন্তু আজকের দিনে জয়তীর চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকাবেই বা কেন? জয়তী কি তার বিয়ের দিনে

ওর কথা চিন্তা করেছিল? পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো কুন্তল। বেশ বড় করে একটা টান দিল।

আচ্ছা শুভ্রা এখন কি ক'রছে? হঠাৎ কুন্তলের মনে হ'ল। হয়তো তার কথাই ভাবছে, কুন্তলতো দেখতে খারাপ না। শুভ্রার নিশ্চয় পছন্দ হবে। শুভদৃষ্টির সময় কেমন অসহায় চোখে কুন্তলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। শুভ্রার চোখটা বেশ টানা টানা। নাকটা টিকলো। ভ্রূ দুটো যেন প্রজাপতির মত ডানা মেলে চোখ দুটির ওপর ছড়িয়ে আছে। বেশ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শুভ্রা। সেই ফাঁকে কুন্তলও বেশ দেখে নিয়েছিল। সুদীপ্তটা কিন্তু খুব ফাজিল। হি হি করে হেসে বলেছিল, "আরে সাবাস, কুন্তল, এ যে একপলকেই কিস্তি মাৎ রে!"

শুভ্রা তখনি চোখটা নামিয়ে নিয়েছিল। আর কুন্তলও লজ্জা পেয়েছিল।

হঠাৎ কুন্তলের মনে হল শুভ্রার কথা ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তো! তাহ'লে এই অবসাদ কেন? তাহ'লে কি লজ্জা? তাই হবে বোধহয়।

দাদা! একি—ছন্দা! কুন্তলের বোন ছাদে এলো এই সময়ে।—তুমি এখানে বসে নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছো আর আমি গোটা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কেন, আমাকে খুঁজছিস কেন?

বারে, তোমার কি হয়েছে বলতো? রাত্রি হ'চ্ছে না?

কই রে, বেশী রাত্রি তো হয়নি? মাত্র দশটা।

দশ-টা!—ছন্দা চোখ পাকালো।

কুন্তল হেসে ওঠে।—তোরা একটা লোককে জাঁতা-কলে চাপাবার জন্যে বেশ তোড়জোড় আরম্ভ ক'রেছিল তো।

ছন্দাও হাসে।—না দাদা, আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি এসো।

তা হ্যাঁরে ছন্দা,—কুন্তল একটু থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করে, শুভ্রাকে তোদের পছন্দ হয়েছে?

কেন দাদা?—ছন্দা অবাক হল,—তোমার কি পছন্দ হয়নি?

না না তা ব'লছি না, কিন্তু কেন যেন আমার আজকের দিনটা কিছুতেই ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে বিয়েটা না ক'রলেই ভাল হত রে।

ছন্দা আরও কাছে এগিয়ে এলো।—না দাদা, আজ আর এসব কথা ভেবো না। নিজের সঙ্গে আর একজনের জীবন নষ্ট ক'রো না দাদা। মেয়েদের স্বামী ছাড়া আর কিছুই নেই। নাও ওঠ। একলা বসে আজেবাজে চিন্তা ক'রতে হবে না। চলো।

আচ্ছা তুই চল, আমি যাচ্ছি।

ছন্দা যা বললো তা কি ঠিক? কই শহরের মেয়েরা তো স্বামীকে তোয়াক্কাই করে না। পুরুষদেরও দোষ থাকে অনেক ক্ষেত্রে। কাজেই দুপক্ষকে সয়ে যেতে হয়, নয়ত সরে যেতে হয়। তবে হ্যাঁ, গ্রামের মেয়েরা এ ব্যাপারে কিছুটা অসহায়। কারণ শিক্ষায় দীক্ষায় তারা সহরের মেয়েদের থেকে অনেক পেছিয়ে। নিজের ওপর নির্ভর করার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া ধর্মের সংস্কারও কিছুটা আছে।

বাসন্তীর ঘটনাটা ঠিক এই রকম। হঠাৎ বাসন্তীর কথা মনে পড়ল কুন্তলের। বাসন্তী কুন্তলের এক বন্ধুর বোন। লেখাপড়া না-জানা মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল একটি গ্রামে। একবার কুন্তল বাসন্তীকে দেখতে গিয়েছিল। ফিরে আসার সময়েই বাসন্তী বলেছিল, তোমাকে একটা কথা বলবো কুন্তলদা? ভাবছিলাম বলবো না। কিন্তু না বলে থাকতে পারছি না।

হ্যাঁ নিশ্চয়। বল। আমিও ত তোর দাদা রে। আমার কাছে সঙ্কোচ করার কিছু নেই। বল কি বলবি।

জানো, আমাকে নিয়ে এ বাড়ীতে বেশ অশান্তি চলছে,—বাসন্তী এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলতে আরম্ভ ক'রলো,—আমি নাকি বেশী কাজ ক'রতে পারি না। আমার বাবা নাকি আমার বিয়েতে যা

জিনিষ-পত্র দিয়েছেন তা সব বাজে আর কমদামী জিনিষ। এই সব নানা কথা নিয়ে আমার শ্বশুর শাশুড়ী আমার সঙ্গে সব সময় ঝগড়া ক'রছেন। কিন্তু জানো কুন্তলদা, আমি এ সবে কিছু মনে করি না। কিন্তু উনি যদি কিছু বলেন তা আমি সইতে পারি না। আর উনিও আজকাল মা বাবার পক্ষ নিয়েছেন, তুমি ওঁকে একটু ব'লে দেবে? আমাদের জীবনে যে স্বামী ছাড়া কিছুই নেই কুন্তলদা। উনি আমাকে সহ্য ক'রতে না পারলে কি নিয়ে বাঁচবো বল তো?—বাসন্তীর গলার শব্দ চাপা কান্নার চাপে একটু কেঁপে উঠেছিল।

হঠাৎ কুন্তলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাসন্তী সত্যি অসহায়। একটুও শান্তি পেলোনা। স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যে শেষপর্য্যন্ত গলায় দড়ি দিতে হয়েছিল ওকে।

* * * *

শুভ্রা একরাশ মেয়েদের মাঝখানে মাথা নিচু করে বসে ছিল। এ এক ভয়ঙ্কর অস্বস্তির ব্যাপার। একটা অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে ছিটকে এসে আর একটা নতুন পরিবারের সঙ্গে, সেখানকার চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়া এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। সকলের মন রেখে চ'লতে হবে। একটু ভুল বা অন্যায় হ'লেই ব্যাস,—নতুন বৌ খারাপ, স্বার্থপর ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হবে। অথচ একটা মেয়ে যে দিনের পর দিন নিজের জীবন নিঃশেষ ক'রে দিতে বসে তার হিসাব কেউ রাখে না।

কিন্তু আজকের দিনটাই মস্ত বড় সমস্যা। কি করে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা বদ্ধ ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবে সেই কথা ভাবছিল শুভ্রা। ছন্দাকে ওর ভাল লেগেছে। বেশ ভাল মেয়ে। ছন্দাকে দিয়েই শুভ্রা ছন্দার দাদাকে কল্পনা ক'রতে পারছিল। তবুও সে আজকের দিনটাকে মেনে নিতে পারছে না। বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা অনুভব ক'রছিল ও। একটা চাপা কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু শুভ্রা কাঁদতে পারলো না। অথচ কষ্ট। কি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল শুভ্রা।

সেদিনের চাকরটার ঘটনাটা মনে পড়ল শুভ্রার। ওদের সামনের বাড়ীতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে শুভ্রা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। চাকরটাকে তার মালিকেরা ভীষণভাবে মারছিল। দরজার বার দিয়ে গুঁতো। সজোরে লাথি। কখনও বা দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিচ্ছিল। চাকরটা নাকি তার মনিবের টাকা ভর্ত্তি মানি-ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছে। এত অত্যাচারের কষ্টেও তার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল পড়েনি। শুধু শুকনো বুকফাটা বীভৎস আর্ত্তনাদ করে জানাচ্ছিল যে সে ব্যাগ নেয়নি। একটি ছেলে আবার দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ছেঁকা দিচ্ছিল আর ব'লছিল, "ব্যাটার চোখ দিয়ে জল ঝরেনারে। দে বাবা, লক্ষ্মী ছেলের মত ব্যাগটা বের করে দে।" লোকটি তখনও বীভৎস গোঁঙানির সুরে জানাচ্ছিল সে নেয় নি। অথচ আশ্চর্য্য চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। সেদিনে পাশের একটা বাড়ীতে বিয়ে ছিল। একদিক দিয়ে ভেসে আসছিল শুভ অনুষ্ঠানের শাঁখের শব্দ আর একদিক দিয়ে আহত চাকরটির বীভৎস গোঁঙানির শব্দ। শুভ্রা সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ঘরের মধ্যে পালিয়ে এসে কানে আঙুল চাপা দিয়ে বসে ছিল।

আজ ঠিক সেই রকম অবস্থা শুভ্রার। কেঁদে কেঁদে তার চোখে জল নেই। শুধু কষ্ট। বুকফাটা বীভৎস যন্ত্রণা। অথচ আজ যদি শুভ্রার সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে হত তাহ'লে কোন কষ্টেরই কারণ ছিল না। শুধু আনন্দ আর শান্তি। কিন্তু তা আর হল না। আজ কয়েকদিন ধ'রেই সুব্রতকে খুব বেশী ক'রে মনে প'ড়ছে শুভ্রার। ওর বিয়ের কয়েকদিন আগেই সুব্রত চাকরী পেয়ে চলে গেছে। যাবার সময় শুভ্রার হাত দুটো ধরে অনুরোধ জানিয়েছিল, "আমার কথা দাও তুমি

বেঁচে থাকবে। তুমি আত্মহত্যা ক'রবে না, তুমি শুধু বেঁচে থাকবে শুভ্রা।"—সুব্রতর চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। গলাটা কান্নায় চাপে বুজে গিয়েছিল। আর শুভ্রা তখন সুব্রতর বুকে মুখটা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

কার কথা ভাবছো বৌদি? দাদার কথা!

শুভ্রা হঠাৎ চমকে উঠলো। বোবা চোখ মেলে তাকালো ছন্দার দিকে।

ছন্দা কলকলিয়ে হেসে উঠলো,—তুমি একটু বস। আমি দাদাকে নিয়ে আসছি।

শুভ্রা অসহায় ভাবে ছন্দার কাপড়ের খুঁটটা খাঁমচে ধরলো,—" আবার দাদাকে কেন ভাই, বেশ ত আমরা গল্প ক'রছি।

রাত্রি হ'চ্ছে না?—শুভ্রার হাতটা ধরে আদর ক'রলো ছন্দা।—আর গল্প না বৌদি। আমি এখুনি আসছি।

ছন্দা চলে যেতে শুভ্রার নিজেকে আরও অসহায় মনে হল। সেই মারাত্মক সময়টা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। শরীরটা শিরশির করে উঠলো। উঃ কি অস্বস্তি। অথচ সুব্রতকে নিয়ে কত কল্পনাই ছিল। সুব্রত নিজের সাজানো ঘরে দাঁড়িয়ে বলতো, "জানো, এই ঘরে আমাদের ফুলশয্যা হবে। ঐ কোণে একটা আকাশী রংএর জিরো-পাওয়ারের বাল্ব জ্বলবে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রবে। আচ্ছা কি রংএর শাড়ীটা এই পরিবেশে—

আর দেরী নয়। দাদা আসছে, এবারে, ওঠ,—ছন্দা এসে তাড়া দিল।

কিন্তু কুন্তলের তখনও উঠতে ইচ্ছে ক'রছিল না। কেন যেন শুভ্রার চিন্তাটাকে সরিয়ে জয়ন্তীর কথাই মনের চারপাশে পাক খাচ্ছিল বেশী করে। নিজেকে খুব ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হচ্ছিল। অথচ আজ জয়ন্তীর কথা চিন্তা ক'রে কোন লাভ নেই। আজ জয়ন্তী আর কুন্তল কেউ কারও নয়। দুজনের মাঝখানে আজ একটা বিরাট পাচিল।

একি ঠাকুরপো, এখনও চুপ করে বসে আছো?—বৌদি এসে তাড়া দিলেন,—অদ্ভুত বাবা তোমরা!

ও বাবাঃ। তুমিও এসে হাজির? তা'হলে তো উঠতেই হল।

নাও ওঠ। আর দেরী নয়। রাত্রি হ'চ্ছে না? আমাদেরও তো শরীর আছে।

কুন্তল হেসে উঠলো,—বৌদি, শরীর আছে না দাদা আছে?

বৌদিও হাসলেন,—হ্যাঁ, এই বুড়ো বয়সে সোহাগে রস উথলে উঠছে।

কিন্তু বুড়ো বয়সেই তো রসটা বেশী হয় ম্যাডাম।

হ্যাঁ জানি, তুমি খুব বোঝেছো। এখন ওঠ তো। তোমার ছোকরা বয়সের রসের বাহারটা দেখা যাক। আমার সঙ্গেই যেতে হবে তোমায়। আচ্ছা মহাশয়, চলুন।—কুন্তল উঠলো।

আবার শাঁখগুলো একসঙ্গে ককিয়ে উঠলো। মেয়েরা ঠোঁটের সঙ্গে জিবটাকে ঠোক্কর মেরে মেরে উলু উলু শব্দ তুললো। শুভ্রাকে ঘিরে নিয়ে সকলেই ফুলশয্যার ঘরে ঢুকলো। ছন্দা শুভ্রাকে একবার ঘরের বাইরে আড়ালে নিয়ে গিয়ে মাথায় হাত রেখে আদর ক'রে ব'ললো, অতীতের কথা ভেবে কিছু কি ফিরে পাবে বৌদি?

ঠাকুরঝি!—চাপা শব্দ ক'রে ছন্দার বুকে মুখ রাখলো শুভ্রা।

আমিও তো মেয়ে ভাই। মেয়েদের মনের কথা মেয়েরাই সহজে বুঝতে পারে। তোমার চোখ মুখ ভাব-ভঙ্গি দেখে আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কি ক'রবে বল? আজকে যা পাচ্ছো তাই সহজ-মনে মেনে নাও ভাই। তা না হ'লে দুটো জীবন যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে ভাই। অশান্তির আগুনে দুটো জীবন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সব ভুলে যেতে চেষ্টা কর বৌদি।

শুভ্রা ছন্দার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কান্নার চাপে ফুলে ফুলে উঠলো।

কুন্তল ঘরে ঢুকলো মেয়েদের আক্রমণ প্রতিহত করে। দরজায় খিলটা লাগিয়ে ঘরের দিকে ফিরে তাকাল। শুভ্রা পালঙ্কের একধারে জড়োসড়ো হয়ে বসে কাঁপছে। কুন্তল অবাক হ'ল। মনের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা লাগলো। মেয়েরা বড় অসহায় তাই না? নিজের মনেই প্রশ্ন ক'রলো কুন্তল।—অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কয়েকটা মন্ত্র পড়ে আজ সে স্বামীর অধিকার দাবী করবে। কিন্তু শুভ্রা কি এইভাবে কোনও অপরিচিত ছেলেকে একলা ঘরে বরদাস্ত ক'রতো? অথচ এটা একই ব্যাপার? কি অদ্ভুত সমাজের নিয়ম! আজ সে যেমনভাবে শুভ্রাকে আদর ক'রবে তা সব সহ্য ক'রে নিতে হবে। কারণ সে তার স্বামী। মনে মনে হাসি পেল কুন্তলের। কিন্তু না, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। পায়ে পায়ে শুভ্রার কাছে এগিয়ে গেল। ওর মুখটা তুলে ধরলো। দেখলো শুভ্রার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝ'রছে। আরও অবাক হল কুন্তল। শুভ্রা কাঁদছে কেন? অথচ এই মুহূর্তে কি বলা উচিত, কি করা উচিত তা কুন্তল ভেবে ঠিক ক'রতে পারলো না। শুভ্রার কাছ থেকে সরে এসে একটা জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। শুভ্রা কি তার মা বাবার জন্যে কাঁদছে? না-কি অন্য কাউকে ভালবাসে? কথাটা ভাবতেই বুকটা ধ্বক করে উঠলো কুন্তলের। তাহ'লে? তা'হলে কি শুভ্রা তাকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারবে? কি করে ও কুন্তলকে ভালবাসবে? কি করে……হাসি পেল কুন্তলের। না এতটা ইমোশনাল হওয়া উচিত না। ভালবাসলেই বা, কুন্তলও তো জয়তীকে ভালবেসেছিল। আজ সেটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিলেও সেদিন তো সেটাকেই ভালবাসা বলে মেনে নিয়েছিল। দুজন দুজনকে নিয়ে অনেক কিছু কল্পনা ক'রেছিল। অথচ সে ভালবাসলে দোষ নেই আর শুভ্রা যেহেতু মেয়ে তাই ও অন্য কাউকে ভালবেসে থাকলে একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। কুন্তল মনে মনে হেসে উঠলো। সে আবার শুভ্রার কাছে এগিয়ে গেল। পাশে বসে পিঠে হাত রাখলো। বললো, একটা পরিচিত পরিবেশ থেকে হঠাৎ ছিটকে এই অপরিচিত পরিবেশে খুব কষ্ট হ'চ্ছে, না? কিন্তু কি ক'রবে বল, সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

শুভ্রা কিন্তু তখনও কাঁদছিল।

ছিঃ! আজকের দিনে কি কাঁদতে আছে? কেঁদো না!

শুভ্রা কাঁদতে কাঁদতেই বলতে চেষ্টা ক'রলো, কিন্তু আমি যে—আবার কান্নার চাপে ওর কথা থেমে গেল।

যদি কিছু বলতে চাও বল। আমি শুনতে রাজী। নিজেকে সহজ ও হাল্কা ক'রে নাও। আমি জানি প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু ব্যাথা, বেদনা, ভালবাসার করুন ঘটনা থাকে। তোমার কিছু বলার থাকলে বল শুভ্রা।

শুভ্রা তখনও দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে ছিল। কান্নাটা একটু কমেছে। জানো শুভ্রা—থেমে থেমে বললো কুন্তল। আমারও জীবনের একটা ঘটনা তোমায় বলবো বলেই ঠিক করেছি। কারণ তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে আমাদের দুজনেরই দু'জনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। অবশ্য তুমি যদি শুনতে চাও।

শুভ্রা ভিজে চোখ দুটো তুলে ধরলো কুন্তলের দিকে।

জানো, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। ঠিক সেই সময়ে আমরা দুজনেই জীবন আর বাস্তব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। কল্পনায় অনেক স্বপ্ন দেখতাম। যখন একটা ভীষণ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় এলো তখন দেখলাম এই দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমার নেই। যখন প্রথম আমি আর জয়তী একটা সম্পর্কের মীমাংসায় এলাম ঠিক তার কিছুদিন পর থেকেই বুঝতে পারছিলাম কোন লাভ হবে না। জয়তী আমাকে কোনদিন বিয়ে করতে পারবে না। এই সব বুঝে যখনই আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছি তখনি জয়তী আমাকে টেনে ধরেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে অভিযোগ করেছে আমি নাকি ওকে একেবারে ভালবাসি না। আমি যখন ওকে সব বুঝিয়ে বলেছি তখন ও আমায় মিষ্টি হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল ও আমার

জন্যে চিরদিন অপেক্ষা করে থাকবে। অথচ জয়তীর যখন বিয়ের ঠিক হল তখন একবারও প্রতিবাদ করলো না। আমি কিছু করতে পারি কিনা একবারও জানতে চাইলো না। বরং আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে আমাকে একেবারে অপদার্থ বলে বিবেচনা করলো। সেদিন মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি এসব অতি সাধারণ ব্যাপার। আজ আমি তোমায় এই কথাগুলো এইজন্যে বললাম যে তুমি যদি কোনদিন অন্যের মুখ থেকে শোন তাহলে তোমার আমার উপর ধারণা খারাপ হবে। সেদিন তুমি আমাকে কোনমতেই শ্রদ্ধা করতে পারবে না।

কিন্তু আমি যদি কাউকে ভালবেসে থাকি—কাঁপা কাঁপা মিহি গলায় প্রশ্ন ক'রলো শুভ্রা।

আমি তা অন্যায় বলে মনে ক'রবো না। মানুষের জীবনের অতীতের ঘটনাকে আমি মৃত মনে করি। তার কোনও দাম নেই, এক কানাকড়িও না।

কিন্তু আজও যদি আমি আজকের দিনটাকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারি।

তাহ'লেও তোমায় ভুল বুঝবো না। কারও কাছে জোর করে কি কিছু আদায় করা যায়? আর যদিও পায়, আমি মনে করি সে নেওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ নেই।

কিন্তু আপনার দুঃখ হবে না? ফুলশয্যার রাত্রি তো মানুষের জীবনে এক পরম আকাঙ্খিত রাত্রি।

না শুভ্রা। কোন দুঃখ না। কিন্তু একটা অনুরোধ আমাকে আপনি না বলে তুমি বোল। অন্ততঃ যতদিন না মেনে নিতে পারো ততদিন তো মেনে নেওয়ার অভিনয় ক'রতে হবে—একটু হাসলে কুন্তল। কেমন বিশ্রী ব্যাপার না? কিন্তু কি ক'রবে বল? হ্যাঁ যা বলছিলাম, আজকের জন্য আমার কোন দুঃখ হবে না। যেদিন তুমি আমাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারবে সেদিনই আবার আমাদের ফুলশয্যার রাত্রি হবে। আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারো শুভ্রা, যাকে সারাজীবন বিশ্বাস করার দায়িত্ব নিয়েছো তাকে আজ থেকেই বিশ্বাস করো। দেখবে তুমি ঠকবে না।

শুভ্রা মাথা নামাল, কুন্তল সত্যিই ভীষণ ভালো। ঠিক ছন্দার মত। ছন্দার কথাগুলো মনে পড়লো শুভ্রার, কেমন বুকটা কেঁপে উঠলো। দুটি জীবন যদি অশান্তির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়? না, না, তা হবে না। তা হতে দেবে না শুভ্রা। আজকের এই পরম লগ্ন যখন ওর জীবনে এসেছে তখন ওকে সব ভুলে যেতে হবে। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু। কুন্তলকে মেনে নিতে হবে। ওকে ভালবাসতে হবে। কুন্তলকে ভীষণ ভালো লাগল শুভ্রার। একটা মেয়ে যে আজ তার স্বামীর কোন দাবীকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অথচ তার জন্য দুঃখ নেই। ভুলও বুঝবে না। আজ থেকেই বিশ্বাস করতে আশ্বাস দিচ্ছে। এ কথা কি সকলে বলতে পারে! শুভ্রা ভাবলো। কিন্তু সুব্রত? আবার শুভ্রার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সুব্রত কোন অন্যায় করেনি। শুভ্রার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। অথচ দুজনকে সরে যেতে হল। এর জন্যে তাদের ভাগ্য দায়ী। সুব্রত বা শুভ্রা কেউ কোনদিন জানতে পারেনি যে সুব্রতর বাবার ব্যবসা ফেল করবে, তার বাবার স্ট্রোক হবে, তার ভাইয়ের—উঃ আর ভাবতে পারে না শুভ্রা। এক সঙ্গে যেন গোটা দুর্ভাগ্যের আকাশটা সুব্রতর মাথার ওপরে ভেঙ্গে পড়েছিল। গোটা সংসারের দায়িত্ব এসে পড়লো দত্তপরিবারের বড় ছেলে সুব্রতর কাঁধে। আর ঠিক সেই সময়ে—না। সে সব কথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপা যন্ত্রণা অনুভব করে শুভ্রা। কুন্তলের দিকে তাকাল শুভ্রা—আমিও একজনকে ভালবাসতাম। আমরা দুজনেই জানতাম যে আমাদের দুজনের একজনকেও কেউ কারও কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। কোন বাধা আমাদের আটকাতে পারবে না। অথচ—আবার কেঁদে মুখ গুঁজলো দু' হাটুর ফাঁকে।

আমি বুঝেছি শুভ্রা। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করবে বল। আজ তো আর কোন উপায় নেই।

নিজেকে আমার খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। আমি যদি তোমাদের মাঝখানে—

বাধা দিল শুভ্রা, কুন্তলের হাতে হাত রাখলো।—ও কথা কখনও বোল না। আমায় আজ আশীর্বাদ কর, যেন তোমায় ভালবাসতে পারি, যেন তোমায় সুখী ক'রতে পারি। কিন্তু আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা করতে হবে—শুভ্রার চোখের কয়েক ফোঁটা জল কুন্তলের হাতে পড়লো···পারবে না আজকের দিনটা ক্ষমা করতে?

নিশ্চয়ই পারবো শুভ্রা, শুধু আজকের দিন নয়, তুমি যতদিন ব'লবে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

ঘড়ির দিকে তাকাল কুন্তল,—কিন্তু আর দেরী নয়। শুয়ে পড়ো, অনেক রাত্রি হল।

শুভ্রা চোখ মেলে তাকালো কুন্তলের দিকে।

কোন ভয় নেই শুভ্রা। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

শুভ্রা বিছানার একপাশে সরে গেল। গলার মালাটা খুলে কুন্তলের বালিশের ওপর রেখে দিল। নিজে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। কুন্তল একটা সিগারেট ধরালো। নিজেকে ওর খুব পরিষ্কার ও হাল্কা মনে হল। মনে আর কোন গ্লানি বা অবসাদ নেই। সিগারেট শেষ করে টুকরোটা এ্যাশট্রেতে নিভিয়ে ফেললো। পাঞ্জাবীটা খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখলো। ঘড়িটা খুলে রেখে এক গ্লাস জল খেলো। জিরো-পাওয়ারের ঘোর নীল আকাশী রং-এর আলোটা জ্বালিয়ে শুয়ে পড়লো এ পাশ ফিরে। দুজনের মাঝখানে রইলো পাশ-বালিশটা। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়লো। শুভ্রাও। ও কুন্তলকে বিশ্বাস করেছে। আর সেই জন্যেই বোধ হয় মাঝখানের বালিশটা ওদের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি। ভোরের দিকে শুভ্রার সুন্দর হাতটা এসে পড়েছিল কুন্তলের গলায়। পরম নির্ভরতায় যেন কত সহজে এলিয়ে পড়েছিলো।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

সাতকড়িপতি রায়

রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিতে হইলে, খাদ্যের ও পানীয় জলের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। পশ্চিম বাংলায় প্রায় চার কোটী লোকের বাস। তার মধ্যে তিন কোটী পল্লীগ্রামে বাস করে, আর এক কোটী সহরে বাস করে। এই তিন কোটীর মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ চাষীর সংসার, অর্থাৎ ঐ ৫০ লক্ষ সংসার খাদ্য উৎপাদন করে আর ৮০ লক্ষ সংসার সেই খাদ্য গ্রহণ করে। (৫ জনে একটি সংসার ধরা হইল)

সচরাচর যে খাদ্য আমাদের নিত্য প্রয়োজন, তার মধ্যে কয়েকটী খাদ্য পশ্চিম বাংলায় খুব কম উৎপাদন হয়। যথা গম, সরিষা, ছোলা, অড়হর, মটর। যদি সকলে প্রয়োজন মত চাল পায়, তবে, সহরের কিছু সংসার ছাড়া বাকী বাঙ্গালী সংসারে গমের প্রয়োজন বিশেষ নাই। যদি বাংলায় চেষ্টা করিয়া মুগ, মুসুর ও বিরিকলাই ভাল করিয়া উৎপন্ন করিতে পারা যায় এবং তাহাতে যদি ডালের চাহিদা মেটে তবে অড়হর ছোলা ও মটরের বিশেষ প্রয়োজন নাই। সরিষা ও সরিষার তেলের কিন্তু খুবই প্রয়োজন। যদি আমরা হৈমন্তিক ধান্য কাটিবার পর মাঠে তিল করিতে পারি তবে ৩৫ সের তিলের সহিত ৫ সের সরিষা মিশাইয়া তেল প্রস্তুত করিলে অর্থাৎ ৭ সের তিলের সঙ্গে একসের সরিষা মিশাইয়া তেল করিলে তাহার স্বাদ ও গন্ধ সরিষার মত হয়।

সহরে খাদ্য উৎপাদন হয় না বলিয়া ব্যবসায়ীগণ আবহমান কাল হইতে উহা সহরবাসীকে যোগাইয়া আসিয়াছে। গত দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই প্রথার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। ঐ যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট কিছু চাল আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি হইয়াছে, আবার বর্ষাকালে যখন চালের অভাব হইয়াছে, তখন বর্মা হইতে মোটা আতপ চাল ও চালের খুদ আমদানী করা হইয়াছে। বর্মা তখন ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষেরই অংশ ছিল। এই আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা বিলেতী রালী ব্রাদ্রাস্ কোম্পানি করিত। ঐ মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য চাল সংগ্রহ করায় চালের অভাব দেখা দেয় এবং ১৯৪৩ সালে চাল কম অন্নাভাব জন্য দুর্ভিক্ষ হইয়া ৪০ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর সেই সময় হইতেই ব্যবসায়ীগণ চাল corner করিতে আরম্ভ করে। ঐ যুদ্ধের সময় হইতেই বাংলায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সুরু হয়।

উহার পর ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হওয়ায়, বরিশালের বালাম চাল যাহা কলিকাতায় প্রধান খাদ্য ছিল এবং খুলনায় চাল আর পশ্চিমবাংলায় আসা বন্ধ হইয়া গেল, তখন পশ্চিমবাংলা খাদ্যে ঘাটতি প্রদেশ হইল। যুদ্ধের সময় যে নিয়ন্ত্রণপ্রথা চালু হয়, দেশ বিভাগ করিয়া স্বাধীন হইবার পরেও উহা জাতীয় সরকার কর্তৃক কোনও না কোনও রূপে চালু করিয়া রাখা হইয়াছিল।

পরে কিদোয়াই সাহেব যখন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী হন, তখন তিনি নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। উহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং চলিয়া আসিতেছে। মানুষের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিলে তার অবস্থা ঠিক কিরূপ হয়, তাহা বলিতে হইলে, বলিতে হয় "একটা গরুকে খোঁটায় বাঁধিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে ঘাস জল দিলে, তার যা অবস্থা হয়, ইহাও ঠিক তাহাই। সে মাঝে মাঝে দড়ি ছিঁড়িবার চেষ্টা করে এই পর্য্যন্ত। যতটুকু খাদ্য দেওয়া হইবে, তাহাই পাইবে, তাহার বেশী পাইবার অধিকার নাই। তাহা যদি তাহার প্রয়োজন মত নাও হয়। উহাতেই জীবনধারণ করিতে হইবে।

এই খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ কাহাদের সুবিধার জন্য চালু হয়? সাধারণতঃ সহরবাসীর জন্য অর্থাৎ যাহারা উৎপাদন করে না, কিনিয়া খায়। ব্যবসায়ীগণ জোট পাকাইয়া association করিয়া খাদ্যদ্রব্য cornered করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত তাহার মূল্য বৃদ্ধি করে। আর সরকার খাদ্য উৎপাদনকারীদের সরকারের ইচ্ছামত মূল্যে খাদ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া সরকারের ইচ্ছামত মূল্যে সরকারের ইচ্ছামত পরিমাণ খাদ্য সহরবাসীকে খাইতে বাধ্য করে। ইহারই নাম নিয়ন্ত্রণ। সহরবাসীরা কিছু খাদ্য পরিমিত মূল্যে পায়। কিন্তু তাহাতে পেট ভরেনা বলিয়া প্রয়োজনমত খাদ্য বাজারে বেশী মূল্য দিয়া ক্রয় করে। ইহারই নাম কালবাজার। যদি এই নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রত্যেক সহরবাসীকে তাহার প্রয়োজনমত খাদ্য দিবার ব্যবস্থা হইত, তবে কালবাজারের কোন অস্তিত্ব থাকিত না। একথা স্বতঃসিদ্ধ। ইহার জন্য কোনও প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। আর একথাও সত্য যে, এই ঘাট্‌তি প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কখনও সকলকে তাহার প্রয়োজনমত খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং নিয়ন্ত্রাধীন মানুষ যতক্ষণ তাহার সাধ্যে কুলাইবে সে কালবাজারে প্রয়োজনমত খাদ্য কিনিবে। ইহাও দিবালোকের মত স্পষ্ট, যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালে খাদ্যমন্ত্রী ১২৫০ গ্রাম গম ও ৪০০ গ্রাম চাউল দিয়া সহরবাসীকে বলিয়াছিলেন যেন কালবাজারে চাউল না কিনেন। কেহ বলিতে পারেন যে, একটা ছোট ছেলেরও ঐ পরিমাণ খাদ্যে এক সপ্তাহ চলিতে পারে? সুতরাং যাহার শক্তি আছে সে কখনও খাদ্য না কিনিয়া পুত্রকন্যাগণকে উপবাস দেওয়াইতে পারে না। অবশ্য গম ও চাউল ছাড়া অন্য খাবার দিয়া পূরণ করিতে সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয়। কিন্তু অন্য খাদ্য মানে মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি। যখন কালবাজারে ৩৲ টাকা চালের দর, ২৷৷৹ টাকা গমের দর, তখন মাছ ৬।৭ টাকা, মাংস ৭।৮ টাকা এবং ডিমের জোড়া ৯০ পয়সা। দুধ খাঁটী ২৲ টাকা কিলো। সুতরাং চাল গম কালবাজারে কেনাই সুবিধা। প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণকারী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহারা উৎপাদন করে, বাজার দর অপেক্ষা কম দরে তাহাদিগকে চাল সরকারকে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া সেই চাল সহরবাসীকে কম দরে খাওয়াইবার অধিকার কি ন্যায়সঙ্গত? আবার সেই পল্লীগ্রামে যাহাদের জমি নাই, কিনিয়া খাইতে হয়, তাহাদেরও যদি ঐরূপভাবে খাওয়াইতে পারিতেন, তাহা হইলেও বুঝিতাম। কিন্তু তাহারা মাসে ১০০ গ্রাম গম পায়না, চালের কথা ত বাদ দিতেই হয়। ইহা কি আদৌ ন্যায়সঙ্গত? সকলেই ত দেশবাসী। তবে সহরবাসীরা যে সুযোগ পায়, পল্লীগ্রামবাসীরা পায় না কেন? সরকার কোন ন্যায়ের অধিকারে পল্লীগ্রাম হইতে বাড়্‌তি চাল নিজেদের ইচ্ছামত মূল্যে কিনিয়া সহরবাসীকে খাওয়াইবেন। আবার পল্লীগ্রামেরই জমিহীন অধিবাসীগণ সাহায্য পাইবে না? ইহা কোন্ নীতি?

সরকারের বাড়তি চালের হিসাবও চমৎকার। একজন পল্লীবাসীর ভাত মুড়ি খেতে মাসে ৩০ সের চাউলের কমে কিছুতেই হয় না; অর্থাৎ তার ৯ মণ চাউল (১৩৷৷৹ সাড়ে তের মণ ধান) বৎসরে দরকার। সরকার ৯ মণ ধান হিসাব ধরেন। তারপর যদি কারও বাড়ীতে তার আত্মীয়স্বজন আসে, মেয়ে জামাতা আসে, তাকে কি সে তাড়াইয়া দিবে? কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সহরেও ঐরূপ আত্মীয় আসে। সহরের লোকে কালবাজারে কেনে। পল্লীগ্রামে তারা কোথায় পাইবে? এই হিসাব উৎপাদনকারীদের মহা অনিষ্টসাধন করিতেছে।

যাঁহারা সারা প্রদেশে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, অর্থাৎ সকল উৎপাদনকারীর সমস্ত ধান চাল সরকার গ্রহণ করতঃ সকলকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার কথা বলেন, তাঁহাদিগকে কি বলিব তাহার ভাষা জানিনা। তাঁহারা সমস্ত মানুষকে জন্তু-জানোয়ার বলিয়াই ভাবেন বোধ হয়। মানুষের যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে, সেটা কি তাঁরা বিশ্বাস করেন না?

যাঁহারা এই নিয়ন্ত্রণ প্রথার অধীন আছেন, তাঁহারাও ইহার অধিন থাকেন না। কম মূল্যে যাহা পাইলেন

ভালই। তারপর কালবাজার। সুতরাং এই নিয়ন্ত্রণে কালবাজার সৃষ্টি হয় মাত্র এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে সহরবাসীরা পল্লীগ্রামের উৎপাদনকারীদের ক্ষতি করিয়া কিছু সুবিধা ভোগ করেন মাত্র। ইহাই নিয়ন্ত্রণের সাধারণ ফল।

এই ৮৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধের নিবেদন, দেশবাসীকে সাধারণ মানুষকে খাদ্যসংগ্রহে স্বাধীনতা দিন। যদি ব্যবসায়ীগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া association করিয়া খাদ্য cornered করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করে, ক্রেতাগণও association করিয়া জোট পাকাইয়া ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করিবে। নিজেরা সমবায় করিয়া ব্যবসায়ীরা যে ভাবে খাদ্য খরিদ করে, সেইভাবে খরিদ করিয়া আনিবে। কারণ, না খাইয়া কেহ থাকিবে না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া মানুষকে পশুর জীবনযাপন করিতে বাধ্য করিবেন না। তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন না। আর যাহারা রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া, এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া ধান্য উৎপাদন করে, তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া সরকারের দরে ধান্য বিক্রয় করাইবেন না।

কয়েক বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে কিছু পাটের চাষ বাড়িয়াছে, কিন্তু এই জবরদস্তি ধান্য খরিদের জন্য এ বৎসর পাট চাষ অনেক বাড়িবে। যাহাদের বেশী জমি আছে তাহারা নিজের সংসার-খরচের জন্য যে ধান্য প্রয়োজন তাহাই উৎপাদন করিবে। বাকী জমিতে পাট দিবে। মফঃস্বলে গেলে শুনিবেন, সরকারের ঝামেলার চেয়ে পাট করাই ভাল। এতে ঝামেলা নাই। যদি এ বৎসর আবার ধান্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়, তবে আগামী বৎসর পাট চাষ আরও বাড়িবে এবং ধান চাষ কমিবে। কারণ পাটের এখন খুবই চাহিদা আছে এবং পয়সাও আছে। চাষীকে আর এইভাবে পাটচাষে ঠেলিয়া দিবেন না।

ফাঁসী দিয়া মানুষ খুন বন্ধ হয় নাই, জেল দিয়া নারী-হরণ বন্ধ হয় নাই, P. D. Act এ জেলে পুরিয়া মানুষের লোভ ত্যাগ করান যাবে না। একমাত্র উপায় মানুষের বিবেকের স্ফুরণ করা, যাহা শিক্ষার মধ্য দিয়াই হইতে পারে। এই নীতি শিক্ষাহীন, শিক্ষার পরিবর্ত্তে যদি বাল্যকাল হইতে নীতিগুলি অভ্যাস করান যায়, যাতে তাহা চরিত্রের অংশ হইবে, তবেই বিবেক জাগরিত হইবে। আবার বলছি খাদ্যসংগ্রহে মানুষকে স্বাধীনতা দিন, পরবশ করিয়া রাখিবেন না। কুকুরের ও ব্যাঘ্রের গল্পটা একবার অনুধাবন করুন। পরবশ হইয়া থাকা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র। স্বাধীনতাই যদি অর্জ্জন হইয়া থাকে, তবে আবার পরবশ কেন? বিশেষ মানুষের সবচেয়ে দৈনিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থাৎ খাদ্যে। ব্যবসাদারদের ব্যবসা করিতে দিন। বরং যদি সাধারণ দেশবাসীকে সরকারের সাহায্য করার ইচ্ছা থাকে, তবে দল বাঁধাটাকে বে-আইনি করুন।

ভাল কাজে দল বাঁধে সে ভাল। কারণ সংঘশক্তিই জগতে কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া দেয়। কিন্তু যেখানে সংঘ শক্তি কেবল স্বার্থপরতার সাহায্য করে সে সংঘ শক্তি আসুরিক শক্তি। তা দিয়ে সমাজের কোনও উপকার হয় না। ইহাও একপ্রকার trade union.

এই যে খাদ্য লইয়া খেলা ইহা রোধ করিতে হইলে, সমাজই পারিবে! গভর্ণমেণ্ট পারিবেনা, যদি এই কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা সরকার চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন এই কুড়িবৎসরের মধ্যে কখনও সরকার খাদ্যের দর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিয়াছেন কি? পারেন নাই। আইন করিলেই কি তাহা কাজে লাগান যায়? দুই কারণে যায় না। প্রথম কারণ লোভ। লোভ যে শুধু যারা ব্যবসা করে তাহাদের নহে। যারা আইন বলবৎ করিবার জন্য নিযুক্ত হয় তাহাদের লোভও ইহার পরিপন্থি। কালবাজার বা মজুতদার কেন বন্ধ হয় নাই? ইহার জন্য ত প্রচুর আইন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল আইন যারা বলবৎ করিবে তাহাদের লোভই নিবারণ করা যাইবে না।

আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ট্যাক্সি করিয়া একটি ষ্টেশনে ট্রেন ধরিবার জন্য আসিলাম। একটি যুবক আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার পল্লী-

গ্রামে বাড়ীর কাছে তার বাড়ী। তার গায়ে খাকির পোষাক দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি চাকরী কর। সে বল্লে সে গণকমিটির চাকরী করে। তখন যুক্তফ্রন্টের দ্বারা মফঃস্বলে গণকমিটি হইয়াছে চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি কাজ? বল্লে, ষ্টেশন থেকে যেসব লোক চুরি করিয়া রেলে চাউল লইয়া যায়, তাহাদের ধরিতে হয়। আমি বলিলাম, তোমার কথা তাহারা মানিবে কেন? বলিল, আমি কনেষ্টবল দিয়া তাহাদের ধরাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত মাহিনা পাও? বলিল, মাসে ১০০৲ একশত টাকা। গণকমিটির টাকা কোথা থেকেই বা এল, আর তারা মাহিনা দিয়া লোক রাখিয়াছে। আমি waiting roomএ চলিয়া গেলাম। আমার সঙ্গে আমার গ্রামের একটি যুবক আসিয়াছিল, সে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল। পরে সে আসিয়া আমাকে জানাইল, গণকমিটির ঐ প্রতিনিধি চোরাকারবারীদের নিকট হইতে বহু টাকা রোজগার করে। এক কিলোগ্রাম চাউল ছেড়ে দিলে তার রেট্ ২৫ পয়সা। তার মধ্যে কনেষ্টবলের শতকরা দশভাগ। ঐ প্রতিনিধির দশভাগ আর বাকিটা—গণকমিটির। বল্লে প্রত্যহ এই যুবকের ১০।১২ টাকা আয় হয়। শতকরা দশভাগে যদি ১০৲ টাকা হয়, তবে ১০০৲ টাকা আদায় হয়। তার ১০৲ টাকা কনেষ্টবল, ১০৲ টাকা প্রতিনিধি, বাকী ৮০৲ টাকা গণকমিটির। যারা চাল নিয়ে যাচ্ছে তারা এক কিলোগ্রামে ১৲ টাকা মুনাফা করে। আইন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোনও লাভ নেই। শ্রীসুরজিত লাহিড়ী মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করায় দেশশুদ্ধ সমস্ত লোকই Criminal হইয়া গিয়াছে।

নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মানুষ যদি আত্মনির্ভরশীল না হইতে পারে, সরকার যদি তাকে জোর করিয়া পরনির্ভরশীল করিয়া রাখে, তবে স্বাধীন দেশ বলিবার অধিকার কি?

দেশবাসীর নিকট, সংবাদপত্রগুলির নিকট এবং সরকারের নিকট আমার এই ৮৮ বৎসরের বৃদ্ধের বিনীত নিবেদন, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। খাদ্য গ্রহণে সকল অধিবাসীকে স্বাধীনতা দিয়া, তাহাদিগকে প্রকৃত মানুষের জীবনযাপন করিতে অধিকার দিন।

উচ্চ চাপে রাসায়নিক পরিবর্তন

জুলফিকার

ভূত. বিজ্ঞান (physics) ও রসায়নে চাপ ও তাপের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাপ যেমন কঠিন পদার্থকে তরল ও তরলকে গ্যাসীয় বা বাষ্পীয় অবস্থায় নিয়ে যায়, চাপ তেমনি পদার্থের বায়বীয় অবস্থা থেকে তাকে তরল এবং তরল থেকে কঠিন অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। তাপ অণুদের সংসক্তিকে নষ্ট করে, তাদের বিচ্ছিন্ন করে; আর চাপ ওদের হারানো সংসক্তিকে ফিরিয়ে আনে। কাজেই তাপ ও চাপের কাজ বিপরীতমুখী।

তাপ প্রয়োগে কোন কোন যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ ভেঙে একাধিক বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে। চাপের ক্রিয়াতেও পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

* * * * *

সম্প্রতি জনৈক খ্যাতনামা মার্কিণ বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত উচ্চচাপে অনেক সাধারণ পদার্থকে নূতন ও মূল্যবান ধাতুতে পরিবর্তিত করা সহজসাধ্য হবে, তিনি বলেছেন,……

'…very high pressure may be used in the near future to transform ordinary chemical compounds into new and valuable metals.'

কথাটা এতই অদ্ভুত ও অসম্ভব ঠেকে, যে কার মুখ থেকে ওটা বেরিয়েছে জানা না থাকলে বিজ্ঞানের অনেক ছাত্রই ওটা শুনে বাতুলের প্রলাপ মনে করবে।

* * * * *

কথাটা বলেছেন ডক্টর উইলার্ড লিবি (W. F. Libby) -একজন দিকপাল বৈজ্ঞানিক। ১৯৬০ সালে ইনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বর্তমানে ইনি ডাইরেক্টার অব দি ক্যালিফর্নিয়ান ইনষ্টিটিউট অব জিওফিজিক্স এ্যাণ্ড প্ল্যানেটারী ফিজিক্স, এর আগে ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও কেমিষ্ট।

কোনো জিনিষকে পুড়িয়ে তারমধ্যকার Carbon-14এর পরিমাণ স্থির করে জিনিষটার প্রাচীনত্ব নিরূপণের অভিনব পদ্ধতি (Atomic Calender) আবিষ্কার করে ডক্টর লিবি বিশ্ব-ব্যাপী নাম করেছেন।

এ্যামেরিকান ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের নব নবতিতম (99th) বার্ষিক অধিবেশনে উচ্চ-চাপ রসায়নের (High pressure Chemistry) বিষয়ে বলতে গিয়ে ডঃ লিবি এই চমকপ্রদ উক্তিটা করেছেন।

ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবি সাহেব ও ছাত্র-সহকর্মী এ্যালফ্রেড ডায়নেল (Darnell) উচ্চ চাপে যে-সব সাফল্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন, এই সভায় তারই একটা বিবৃতি দেন। ওঁরা হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে অত্যন্ত উচ্চ চাপ সৃষ্টি করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই প্রেসের সাহায্যে প্রয়োজন হলে বায়ু চাপের লক্ষ-গুণ চাপও প্রয়োগ করা সম্ভব।

* * *

সাধারণতঃ বাতাসের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৪.৭ পাউণ্ড, অর্থাৎ সাত সেরের মত। এই চাপের লক্ষগুণ হচ্ছে প্রতি বর্গইঞ্চির উপর ১৩১২.৫ টন বা প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার মণের ভর। ভূগর্ভে একহাজার মাইল বা ১৬০০ কিলোমিটার নীচে যতখানি চাপ পড়ে, এই চাপ প্রায় তারই সমান।

উচ্চ চাপে তাপ প্রয়োগ না করেও অর্থাৎ সাধারণ তাপমাত্রা বা Room Temperature-এ সুন্দর রান্না করা চলে। সময়ও চুল্লীতে বা ষ্টোভে রান্না করার চেয়ে

কম লাগে। খাবারগুলো সুসিদ্ধ ত হয়ই, স্বাদেরও কোন তারতম্য ঘটে না।

উনুন থেকে নামানো, জিভ পোড়ানো গরম খাবার খেতে যে অসুবিধা—তাও ভোগ করতে হয় না। তা ছাড়া, এ খাবার বীজাণু-শূন্য—Completely Sterilised.

* * * *

বায়ু চাপের একলক্ষ গুণ চাপে প্রায় সব জিনিষেরই আয়তন তার প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে পড়ে। এই প্রচণ্ড চাপ-জনিত শক্তি পদার্থের মূল আণবিক গঠনকে ভেঙে ফেলে, অণুগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে, একটা সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ সৃষ্টি করে।

ডঃ লিব্বি বলেন,—

বায়ু চাপের লক্ষ গুণ চাপে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের অনেকগুলিই সম্ভবতঃ ধাতুতে পরিবর্তিত হবে (যে প্রচণ্ড চাপে এ হবার সম্ভাবনা;—ততখানি চাপ সৃষ্টি করা অবিশ্যি নিতান্ত সহজসাধ্য নয়, এবং সেটা আজও সম্ভব হয়ে ওঠে নি)। এইরূপ চাপ প্রয়োগ করতে পারলে যে কোন রাসায়নিক পদার্থ মুহূর্ত্তের মধ্যে (সেকেণ্ডের একশো ভাগ থেকে হাজার ভাগের মধ্যে) নতুন আর একটা পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পড়বে।

Low Temperature Physics এর মত High Pressure Chemistry ও বিজ্ঞানের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলে লিব্বি জানিয়েছেন।

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে? কলকাতায় বোমা পড়ছে তাই প্রভাদের নির্বাসন ঘটেছে কর্মাটারে, অথচ বিয়ের চেষ্টা না করলেও নয়। কথা চলছিল গাঙ্গুলী বাড়ীতে কিন্তু এখন কী যে হবে? স্বামী রইলেন কলকাতায়, দেওর রইল কলকাতায়, বাবা রইলেন কলকাতায়, ভাইরা ভগ্নিপতিরা রইলেন কলকাতায়, শুধু মেয়েদের মূল্যবান প্রাণগুলি আর তার সঙ্গে যত ডেও ঢাকনা গয়না বাসনকোসন দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হল এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে। প্রভার মনে দুরন্ত অভিমান। মরতে হয় সবাই একসঙ্গে মরবো। এ আবার কী ফ্যাসান? পুরুষরাই যদি চলে গেলো, শোক করবার জন্য এই একদল বিধবার সৃষ্টি কি না করলেই নয়?

শনিবারে শনিবারে কর্ত্তা আসেন সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলী মায় লোহার সিন্দুকও হাজির হয়েছে। প্রভা বলে হয়েছে ভালো। এর আগে ভয় ছিল বোমা পড়ে মরার। এবার ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে। ঐ বিশমুনি সিন্দুকটা তুমি কি বলে নিয়ে এলে বলো ত? এইটুকু সহর। ঐ কুলিদের মুখেই রটে যাবে খবরটা। তখন বাড়ীতে লুঠ হতে কতক্ষণ? কর্ত্তা সদাশিববাবু মাথা চুলকে বলেন অত ত ভেবে দেখিনি। তুমিই ত বললে গয়নাগাটি কলকাতায় রেখে কাজ নেই এখানেই বরং রেখে যাও। প্রভার মুখে হাসি চাপা থাকে না। বলে কিন্তু তা বলে সকলকে জানিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে?

সদাশিববাবুর টাকার ড্রয়ারের চাবী প্রায়ই হারিয়ে যায়। চাবী হারালে পাছে প্রভা রাগ করে তাই জানানো সমীচীন মনে করেন না ভদ্রলোক। অনেক ভেবেচিন্তে ড্রয়ারের পাশেই একটা চাবী ঝুলিয়ে রেখেছেন পেরেক পুঁতে। একটিমাত্র রিংএ একটি চাবী যাতে অসাধু লোকের বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয় চাবী পেতে। আর ড্রয়ার খুললে সামনেই থাকে পেটমোটা মণিব্যাগটা। কারণ কিছুর তলায় রাখলে আবার সদাশিবই ত খুঁজে পাবেন না ব্যাগটা। অতীতে এই চাবী নিয়ে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। সদাশিববাবু যে বয়সে বড় হলেও সাংসারিক বুদ্ধিতে বড় হননি একথা তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। তাই সব চাবীরই ডুপ্লিকেট তাঁর কাছে থাকা চাই। যথাসময়ে কিন্তু সে চাবী খুঁজে পাওয়া যেত না। বিব্রত ভাব দেখে মমতা ভরে প্রভাই নিজের চাবীর গোছাটা এগিয়ে দিতেন। আবার খুঁজে খুঁজে চাবিটি যথাস্থানে রাখতেন সবশেষে পুরো থোকাটাই গেলো হারিয়ে কিন্তু এতো আর যা তা চাবী নয়? ভালো ভালো গড্রেজের ও ইয়েলক এর চাবী। কাজেই নতুন আর করানো হয়ে উঠলো না। কারণ চাবী-ওলা জীবটির ওপর অদ্ভুত বিরক্তি তাঁর। যেকোন গর্ত্তে চাবী ঢুকিয়ে খানিক খটখট করেই তিনি চাবী খোলার কাজ সারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা চাবী দিয়েই সবগুলো খুললে তিনি আনন্দিত হন। আর

উদ্যোগ করে চাবীওলা ডাকা তাঁর পোষায় না। কাজেই চাবী সামলানো থেকে প্রভা মুক্তি পেলেন।

এই মানুষ নিয়ে সংসার করা যে কী দায় তা প্রভাই জানেন। একবার বড় মেয়ের বিয়ের পর নতুন কুটুম-বাড়ী যাতায়াতের জন্য অনেক সাধাসাধি করে ছুটি পাঞ্জাবী করাতে রাজী করিয়েছিলেন তাঁকে প্রভা। যখন কর্তা পাঞ্জাবী নিয়ে ফিরে এলেন প্রভার চক্ষুস্থির! ছুটো নয় ছটা পাঞ্জাবী। পিঠে ঘাড়ের কাছে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটা তালি কলের সেলায়ে রিপুর মত করে বজ্রআঁটুনিতে এঁটে বসেছে। আবার বুক পকেটের কাছেও ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল ঠিক অনুরূপ বন্দোবস্ত। জিগেস করায় প্রসন্নহাসি হেসে সদাশিববাবু বললেন, একে ত আদ্দির জামা। তায় ঐ জায়গাগুলো নিত্যি ছেঁড়ে। দেখেছি ত বাবু সাহেবদের? তাই বুদ্ধি করে ওখানে মোটা টুইলের তালি দিইয়ে নিয়েছি। ভালো হয়নি? বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে চান প্রভার মুখের দিকে—। নিমেষে মমতায় ভরে যায় প্রভার মন। এই শিশুর মত সরল মানুষটিকে আঘাত দিতে ইচ্ছে করেনা। অথচ এই টানাটানির সংসারে এতগুলো টাকা অনর্থক নষ্ট হল মনে করেও কষ্ট হয়।

মনে পড়ে অতীত দিনের কথা। একবার একটা ময়লা ধুতি পরে সদাশিববাবু যাচ্ছিলেন মামার বাড়ী—। প্রভা নিষেধ করায় সদাশিববাবু বলেছিলেন, যাচ্ছি ত দিদিমার বাড়ী—দিদিমা আমার কত ময়লা কাপড় পরা দেখেছে। কৌতুকময়ী প্রভা বললো—তিনি ত আঁতুড়ে তোমায় বস্ত্র শূন্য দেখেছেন তাহলে অকারণ কাপড়টা বয়েই বা কী ফল? কাপড়টা রেখেই যাও। বিরক্ত হয়ে সদাশিববাবু কাপড় বদল করেন।

বেচারী প্রভা, যে সব কাজ নিত্য-নৈমিত্তিক তাতে বেজায় আপত্তি সদাশিববাবুর। বাজার ঝিকে দিয়ে করানো যায়—কিন্তু সত্যি সত্যি সদাশিববাবুর বদলে ঝিকে সাজিয়ে দিলে সদাশিববাবুর বদলে অধ্যাপনা করতে পাঠানো যাবে না।

আপত্তি স্নানে, আপত্তি দাড়ি কামানোয়, আপত্তি চুল আঁচড়ানোয়, আপত্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরায়। এটা ঠিক আলস্যও নয় উদাসীনতাও নয় কৃপণতাও নয় এসবে তাঁর অসাধারণ বিরক্তি। অভ্যাসে তিনি অগোছালো তবে ভালোর মধ্যে অধ্যাপক বৃত্তিটুকু। অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে এগুলি একটি বিশেষ গুণ। সবাই বলবে ঋষিতুল্য ব্যক্তি—এ নিয়ে প্রভারও মনে আনন্দ কম ছিল না তবু সবেরই ত একটা সীমা আছে।

আগে কলেজে কাঁধে চাদর নিয়ে যেতেন। একদিন প্রভা তাঁকে খাইয়েদাইয়ে বাকী কাজ সারার জন্য রান্নাঘরে গেছেন। উনুন বয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট বালতীর উনুন—। কোনরকমে ছুখানা মাছ ভেজে সদাশিববাবুকে দিয়েছেন। তখনও রান্না বাকি। আজ দশটায় ক্লাস সদাশিববাবুর। নটায় বেরুতে হবে। খাটের রেলিং এ মুগার চাদরটা রেখে—প্রভা বলেন চাদর নিতে ভুলনা যেন। তখন সদাশিববাবু তার বিখ্যাত ড্রয়ার খুলে কী যেন নিচ্ছিলেন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন। ঐ ড্রয়ারটির প্রভা নাম দিয়েছিলেন হরি ঘোষের গোয়াল, সদাশিববাবু বলতেন ন্যাতা-কাতার ঝুলি—তাতে নেই হেন জিনিষ নেই। ভাঙ্গা টর্চের ব্যাটারী, অচল সুইচ। ডাঁটি ভাঙ্গা চশমা, অজস্র ভাঙ্গা গগলস্, মোমের টুকরো, ফলাভাঙ্গা ছুরী, আলপিনাবিহীন পীনকুশন্ রবার স্ট্যাম্প, ভাঙ্গা ড্রপার স্ট্যাম্প প্যাড—ড্রয়ারটি খুললে বন্ধ হওয়া শক্ত। কোন রকমে ঝাঁকি দিয়ে বন্ধ হয়। ঐ ড্রয়ারটি সম্বন্ধে যে প্রভার মতামত অনুকূল নয় তা জানতেন সদাশিববাবু। তাই খোলা অবস্থায় প্রভা আসায় মনে মনে শঙ্কান্বিত হয়ে আরো বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তারপর গরদের চাদরের বদলে প্রভার সবুজ ছিটের সেমিজটা কাঁধে ফেলে চটপট বেরিয়ে গেলেন। জানিনা এসে আরো কত ক্যাচাং জুড়বে। চুল আঁচড়াও কিংবা একটা কোসাড়িল সঙ্গে নিয়ে যাও যদি কালকের মত হঠাৎ

হাঁচি সর্দি আরম্ভ হয়। কিংবা হয়ত বলে বসবে কাল তোমায় একবার আমায় দোকানে নিয়ে যেতে হবে। তোমার জুতো একজোড়া কিনে আনবো—। এতো ঝামেলাও বাধাতে পারে। উঠলো বাই তো কটক যাই—মুখের কথা খসলে আর রক্ষে নেই—। জুতো সম্বন্ধে সদাশিববাবুর দুটি জোরালো মত আছে। ফিতে বাঁধা বা ষ্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো তিনি ফিতে খোলাবন্ধ বা ষ্ট্র্যাপ খোলা বন্ধ না করেই পরেন। মুখটা থ্যাবড়া হবে। জুতোর সরু ছুঁচলো মুখ তাঁর পছন্দ নয়। আসলে মানুষটা যতদূর উদাসীন হতে হয়—একেবারে সহজ সরল নিরাড়ম্বর মানুষটি। ভাগ্যে ভগবান চেহারাটা সুন্দর দিয়েছিলেন নইলে একেবারে কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা হত।

যাকগে কী কথা থেকে কি কথায় এসে পড়লুম। কাঁধে সেই সবুজ ছিটের সেমিজ নিয়ে সদাশিববাবু বাসে উঠলেন। আবারও বলি এটা একযুগ আগের কথা। নইলে বাসের মধ্যেই সদাশিববাবুকে সাতশো কৈফিয়ৎ দিতে হত। মনের সাধে গানের কলি গুণ-গুণ করতে করতে ক্লাসে ঢোকার আগেই দেখা অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে—। তাঁর কাছে সদাশিববাবু পড়েছেন, এখন সহকর্মী। তিনি কাঁধ থেকে সবুজ সেমিজটা টেনে নিয়ে বলেন এটা কি নিয়ে এসেছ? সদাশিববাবু ত হতভম্ব। স্নেহময় মিত্র মশাই নিজের চাদরটি ওর কাঁধে দিয়ে বলেন যাও ক্লাস সেরে এসো—। তারপর থেকে ব্যবস্থা হল যে কলেজের আলমারীতেই চাদরটা থাকবে। ক্লাসে যাবার আগে বের করে কাঁধে দেবেন আবার ফিরে তাতে তুলে রাখবেন। কিন্তু এত ব্যবস্থার মানুষটি ভালো—। সে চাদর ঠিকমত ব্যবহার হত কিনা জানিনা তবে প্রভার সেমিজ কাঁধে করে কলেজ যাওয়ার হাত থেকে সদাশিববাবু রক্ষা পেলেন এই-ই যা।

সামান্য আয় সদাশিববাবুর কিন্তু জীবনে বাজারে যাননি তিনি। বলেন ও দরাদরি আমার পোষায় না। বেশী দামে জিনিষ আনলে অনুযোগ করলে বলেন, হাত তুলে ত কারুকে কিছু দেবার মত অদৃষ্ট করিনি। ওরা যদি ঠকিয়েই কিছু নেয় তাও দেব না? একথার কি উত্তর দেবে প্রভা ভেবে পায়না।

তাঁকে দিয়েই মেয়ের বিয়ের চেষ্টা—। সাতটা নয় পাচটা নয় দুটি মেয়ে। বড় নিরুপমার বিয়ে হয়েছে বড় ঘরেই। ন বছরে গৌরী দান গঙ্গার ঘাটে চান করতে গিয়ে পছন্দ। না ছিল দাবী না ছিল দাওয়া। কিন্তু ছোট মেয়ের বিয়েতেই বাধলো এই বোমা পড়ার হাঙ্গাম। প্রভার মনে মনে এই মেয়ে নিয়ে গর্ব্বও ছিলো। অসাধারণ রূপসী মেয়ে তেমনি তার মেধা। তারো চেয়ে বেশী ছিল তার গুণ। যেমনি গোলাপ ফুলের মত রং তেমনি কালো কোঁকড়া একরাশ পশমের মত চুল। তেমনি সুন্দর গড়নপেটন। দেখলে কারুর চোখ ফেরাবার উপায় ছিল না। লোকে যাকে বলে সাজালে সাজে বাজালে বাজে।

বড় মেয়ে নিরুপমার বিয়ের পর তার শ্বাশুড়ী বলেছিলেন অনুপমাকে দেখে, বৌমা তোমার মা একে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন? একে দেখলে আমরা একেই পছন্দ করতুম। কোন কোথাও একটু খুঁত নেই। অলক্ষ্যে ভগবান হাসলেন। যাক প্রভা খবর পেলো মদনমোহন তলায় গাঙ্গুলিরা নাকি মেয়ে চাইছে। সেজছেলে নাকি দত্যি কুলে পেল্লাদ। লেখাপড়ায় খুব ভালো। কথাটা কিয়দংশে সত্যি। গুষ্টিশুদ্ধ এপাশ আর ওপাশ। মানে যাকে বলে ধপাসধপাস কাজেই বি এ পাশটাই তাদের পক্ষে মস্ত দিগগজ মনে হয়েছে। আর সরল সদাশিববাবু ভেবেছে ওরা নিজেরাই যখন বলছে আমাদের ছেলের জোড়া পাবেন না মশাই তখন না জানি কতই ভালো ছেলে।

কিন্তু প্রভা নিরুপায়। আমি অনেকদিন আগের কথা লিখছি তখন পাত্র দেখতে মেয়েদের যাওয়ার রীতি ছিল না। কাজেই সদাশিবই ভরসা। তার আগেই নিরুপমার অমন ভালো ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে। মন্দ ঘরও যে কতটা হতে পারে তা জানা ছিল না প্রভার। হঠাৎ একদিন না বলা না কওয়া

অনুপমাকে দেখতে এলেন গাঙ্গুলি বাড়ী থেকে। একটি কালো বৃদ্ধা আর একটি উন্নাসিক বিধবা—। বৃদ্ধাটি পাত্রের মা উন্নাসিকটি দিদি—। মেয়ে দেখার পর মা মেয়েকে বললেন কীরে বিপদ (বিপদতারিণী) কেমন বুঝছিস? মেয়ে নাকের ভুঁড়ি ফুলিয়ে বললো আমাদের গদায়ের পায়ের যুগ্যি নয়। তবে ওর যুগ্যি মেয়ে ভূভারতে নেই পাবে কোথায়?

প্রভা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বিপদতারিণী তখন অনর্গল নিজেদের বাড়ীর মহিমা কীর্ত্তন করছেন। তারো চেয়ে বেশী ভায়ের। কবে তাঁর ভাই ফার্ষ্ট হয়েছিল প্রাইজের বই আনতেই তাঁর বাবা কেমন করে সব বই ফেলে দিয়েছিলেন বারান্দা থেকে, ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ ঘটনা। বিব্রত হয়ে অনুপমার হাতের সেলাই এনে দেখাতে যান প্রভা। বিপদতারিণী বলেন, ওসব দেখে আর কি হবে বলুন? ওসব আমাদের খুব জানা আছে। মেয়ে দেখতে এলে পাড়া থেকে এসব জড়ো করতেই হয়। শুধুশুধু পরের জিনিস পাট ভাঙবেন না। প্রভা ভাবে সবই এদের জানা আছে, শুধু জানা নেই শিষ্টাচারটুকু।

গৃহিণী ভুবনমোহিনী ছানার পায়েসটুকু অর্দ্ধেক খেয়ে অনুপমার হাতে তুলে দেন বলেন নাও পেসাদ খাও। প্রভার মেয়েরা জীবন ভরে ভদ্রতার মাশুল দেয়নি তাই আজো সেই নালঝোল পড়া পায়েস নিয়ে সসম্মানে পাশ করলো অনু। হঠাৎ থমকে চেঁচিয়ে ওঠেন বিপদতারিণী। বলেন, মুখের পাশে গালে কিসের দাগ গো? প্রভা বলে ব্রণ হবে। ভুবনমোহিনী গালে হাত দিয়ে বলেন শেষে কি বেন্নওলা মেয়ে ঘরে নোব? ও বিপদ, বলনা কি করি আমি, বিপদতারিণী বলেন, তুমি যদি আকাশ থেকে পূর্ণিমার চাঁদও পেড়ে আনো মা, আমাদের গদায়ের পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারবেনা। সেই আকাশের চাঁদকে কিন্তু সদাশিববাবু দেখতে পান না। যখনই ছেলে দেখতে চান শোনা যায় ছেলের বিয়েতে ভীষণ লজ্জা তাই সামনে বেরুবে না।

কিন্তু বলা যায় না যে মেয়েরাই বা এত নির্লজ্জ হবে কেন যে বিয়ের আশায় শুধু সকলের কাছে বেরুবেই না, নালঝোল মাখা পাতের পায়েস চেটে খাবে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের কথা নিয়ম—

এই নিয়ম কথার তিনটি অক্ষরে সব ওলোটপালোট ক'রে দেবে সবাই। প্রভার মনে শত চিন্তার ঝড় বয়ে যায়—বাড়ীটা যেন বড্ড সেকেলে। আবার মনে হয় আর্থিক সঙ্গতি ত আছে। ছেলেটাও মোটের মাথায় লেখাপড়া জানা। এর চেয়ে কিইবা ভালো পাত্র পাবো? আবার যান সদাশিববাবু গাঙ্গুলিদের বাড়ী-। পাত্রের বড় ভাই নেমে আসেন লুঙ্গি করে ধুতি পরা। চেনস্মোকার ভদ্রলোক। হাতের সিগারেটে গাঁজার মত দম দিয়ে টেনে বলেন— ওরে অ সখীর মা, মাকে বল গদায়ের জন্যে সেই মেয়ের বাপ এসেছে।

অন্তরাল থেকে গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠ ভেসে আসে কোন্ বাপ রে? সেই বেন্নওলা মেয়ের বাপ? সদাশিববাবু তবুও আঘাত পান না। অমন প্রতিমার মত সুন্দর মুখে যদি দুটো ব্রণই উঠে থাকে তাহলে কি তাকে বেন্নওলা মেয়ের বাপ বলতে হবে? ভদ্রতা বলেও ত একটা বস্তু আছে—কিন্তু এদের বাড়ীতে সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব। এবার আসেন বিপদতারিণী। একটু উচ্চকণ্ঠেই বলেন, বলি বেন্ন বেন্ন করে মরছো কেন? কিন্তু মেয়ে বিয়োনীর মেয়ে মা বিষয়ের কথাটা ভুলছো কেন? সত্যিই এরা বেছে বেছে যে ঘরে ছেলে হয়নি সেই বাড়ীর মেয়ে আনেন। তাতে দুটো লাভ বিষয়ও ঘরে আসে আবার মেয়েবিউনীর মেয়ে বলে মেয়ের মাকে কথাও শোনান যায়। কোন অস্ত্রই হাতছাড়া করেন না এরা।

সদরে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহিনী কোমরের কসি খোলেন। সখীর মাকে বলেন, যা মোড়ের মেড়োর দোকান থেকে দুটো খাস্তার কচুরী দুখানা সিঙ্গাড়া আর পানতুয়া নিয়ে আয় চট্ করে। অমনি চায়ের দোকান থেকে চা আর দুখিলি পানও আনবি। কাঁচের গেলাসে

দোকানের চা খেতে খেতে সদাশিববাবু দশহাজার টাকার সোনার গয়না দিতে রাজী হয়ে যান। দশ-হাজার টাকার সোনা নিয়ে ততটা মাথা ঘামান না যতটা মাথা ঘামান সিঙ্গাড়া আর পানতুয়া নিয়ে। কারণ শুনলে প্রভা আর রক্ষে রাখবে না। ডাক্তারদের শাস্ত্রে এই দুটো জিনিষই ডায়বেটিস রুগীর পক্ষে বারণ। প্রভাকে নিয়ে পারা দায়। একি নিরুপমার শ্বশুরবাড়ী? যে যক্ষুনি যাও বাড়ীর তৈরী খাবার ধরে দেবে? বনেদী ঘর বটে? বারমাস মাইনে করা হালুইকর বামুন আছে। মার্বেল পাথরের ঘরে রূপোর বাসনে করে যে বাড়ীর তৈরী খাবার পরিবেশন হবে তার সঙ্গে আন্তরিকতার বসে সে যেন সুন্দরই শুধু নয় লোভনীয়ও হয়ে উঠবে। সদাশিববাবু আবার শোনেন বাড়ীর কর্ত্তা প্রসন্নবাবু কাকে বলছেন হরি বলো মন হরি বলো. বলি কালকে কে তরকারি কুটেছে, নবমী তিথিতে লাউ কি না খেলেই চলতো না? তক্ষুনি গিন্নিকে বলেছিলুম গিন্নি সায়েববাড়ীর মেয়ে এনো না। গিন্নি তো শুনলো না সেই সাহেববাড়ীর মেয়েই এনে তুললো। এই সাহেবটি হচ্ছে দারোগা সাহেব। কর্ত্তার মেজছেলের শ্বশুর। যতবা জানে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে ততবা জানে—

এর নামে এদের মনোরঞ্জন করতে। এর সঙ্গে পারবে কি করে অনুপমা? দুজনে শিব পূজো করতে বসেছে। বেচারা অনুপমা ক্লাশটেনে পড়া মেয়ে কিছু-কাল শান্তিনিকেতনেও কাটিয়ে এসেছে। তার পক্ষে এ মন্ত্র হজম করা কঠিন। মহাদেবকে নৈবেদ্য প্রদানের সময় মন্ত্র পড়ছে জা তারা "পক্ক রম্ভা মোচা ফলম" এর অর্থ কদলী প্রদান—বাবা ভোলানাথ জ্ঞানের আকর হয়েও আজো বাংলা শেখেননি কাজেই দেবভাষা নিয়ে টানাটানি।

যাক সেকথা। আমরা কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়েছি। মনে রাখতে হবে এখনও অনুর বিয়ে হয়নি—বিয়ের আগে সে কি কাণ্ড। প্রভারা কর্মাটারে আর গাঙ্গুলিবাড়ীর মেয়েরা জসিডিতে নির্ব্বাসিত হয়েছেন ইন্ডাকুয়েসনের কল্যাণে। অনেক সেধে সদাশিববাবুকে জসিডিতে পাঠান প্রভা, সঙ্গে দেন নেড়াকে। নেড়া প্রভার বন্ধুর ছেলে হলেও পেটের ছেলের সঙ্গে তার কোন প্রভেদ নেই। বিপদ শুধু নেড়াটি হচ্ছে সদাশিব-বাবুরই শিশু-সংস্করণ। কিন্তু নেড়া ছাড়া কেইবা এ ঝঞ্ঝাটে মাথা পাতবে বলো?

আর বন্ধুত্ব জিনিষটা ভারি মজার। ঠিক একভাবের মন না হলে ত বন্ধুত্ব হয় না। সদাশিববাবু আর নেড়া সারারাত ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে সকালে বাজার থেকে একঝুড়ি উৎকৃষ্ট ল্যাংড়া আম কিনে—বলাবাহুল্য মিষ্টির বাক্স সমেত গাঙ্গুলিবাড়ীতে হাজির হন।

গাঙ্গুলিবাড়ীতে তখন ভীষণ কাণ্ড—বড় নাতিটি নাকি হারিয়ে গেছে। মানে বিপদতারিণীর বড় ছেলে ক্যাবলা। বিপদতারিণী সত্যি সত্যি বিপদের সৃষ্টি করেছিল দশটি অপোগণ্ডের সৃষ্টি করে। বিপদের স্বামী বোধহয় আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরেই দেহত্যাগ করে সরে পড়েছেন। কাজেই ক্যাবলা হাবলা টাবলা গাবলা গামলা সামলারা যত্রতত্র বেড়ে উঠেছিল মামার বাড়ীতে আগাছার মত। শুধু ছোট্ট ট্যাপ্পোল নামে অভিহিত হয়েছিল। বোধহয় ট্যাপের খই কথাটি থেকে ট্যাপ্পোল কথাটির উৎপত্তি। যেমন সোহাগের ট্যাপারী কথাটি প্রচলিত আছে। যাক যা বলছিলুম বিপদতারিণীর সেই ক্যাবলা গেছে হারিয়ে। বিপদতারিণী কিন্তু কোন চেষ্টাই না করে আরো তর্জ্জন গর্জ্জন করছেন, বলছেন হবেই ত? এত অনাস্থা—এত অপগেরাজ্যি? যত বোঝা নামে ততই তোমাদের ভালো—তবে বিনে মাইনের চাকরটি ত তোমাদের গেলো?

ঠিক এই রকম একটা আবহাওয়ার জন্যে সদাশিববাবু প্রস্তুত ছিলেন না—বড়ই নিজেকে বিপন্ন মনে করেন। নেড়ার দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করেন আজ বরং আমরা যাই, এসব বিপদ কেটে গেলে আসলেই হবে। নেড়াকে উত্তর দিতে হয় না। প্রসন্নবাবু প্রসন্ন হেসে বেরিয়ে

বলেন "হরি বলো মন হরি বলো মন সবই অনিত্য" আরে ক্যাবলা আবার একটা মানুষ, ওর জন্যে আপনারা ফিরে যাবেন কেন? বাঃ চমৎকার আম তো? আপনাদের বাগানের বুঝি? সদাশিববাবু বিব্রত হয়ে বলেন "না এখানের বাজার থেকে-" কথাটা চাপা দিয়ে প্রসন্নবাবু বলেন, আমায় ঠকাবেন মশাই? আমি ব্যবসাদার মানুষ, ব্যবসা করে ঘুণ হয়ে গেছি, বাজারে এ জিনিস পাবেন কোথায়? সদাশিববাবুর সত্য কথা ওর প্রবল আপত্তিতে কুটোর মত ভেসে যায়। পরে প্রভা বুঝেছিল ওইটেই হল প্রসন্নবাবুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। যেমন ওঁর সত্যি নাম অপ্রসন্ন হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উনি যে সার্থকনামা প্রসন্নবাবু একথা দিনে রাতে পচিশ বার নিজেই বলেন।

এখন নিজের ঢাক নিজে পিটোবার দিন এসেছে। বিয়ের পর অনু মাকে বলেছিল ভাগ্যে আমরা বাবাকে বাবু বলি তাই রক্ষে, ওখানের বাবাকে মুখে বলি বাবা মনে মনে বলি ওঃ বাবা। ঠিক এমনি করেই সদ্য পুত্রহারা ক্যাবলার মা আরো হাজার দুই টাকার গহনার লিষ্ট সদাশিববাবুকে দিয়ে কবলিয়ে নিয়ে বললেন, বাবাকে যেন কখনো বলবেন না আমরা চেয়েছি, বলবেন আমিই দিচ্ছি ইচ্ছে করে। সদাশিববাবু ঢোক গেলেন। কারণ শেষ সামর্থ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করেছেন। এখন প্রভার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিইবা বলবেন? শেষে ভেবে চিন্তে বলেন যদি আর দিয়ে উঠতে না পারি? অম্লানবদনে বিপদতারিণী বলেন, তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। সদাশিববাবু মাথা চুলকে বলেন তবে যে আপনার মা বললেন আমি পাকাকথা দিচ্ছি, ভদ্দরলোকের মুখের কথাও যা আর আশীর্ব্বাদও তা। বিপদতারিণী বলেন, মেয়ে মানুষের কথা আবার কথা নাকি। দশহাত কাপড়ে যাদের কাছা নেই—ও একটা কথার কথা। বোধহয় নিজে যে মেয়ে মানুষ সেকথা বিপদতারিণীর মনে থাকে না। সদাশিববাবুকে বিস্মিতকরে এবার কথা কন ভুবনমোহিনী। বলেন, ছেলে আমার হীরের টুকরো, তেমন তেমন বাড়ী হলে ওজন করে ছেলের সমান টাকা নিতো।

ভাগ্যিস বিপদ বুদ্ধি দিল—নইলে ত এতগুলো টাকায় আমি ফাঁকিতে পড়তুম। নিরুপায় হয়ে সদাশিববাবু বলেন, সামান্য দুহাজার টাকার জন্যে যদি বিয়ে ভেঙে যায় তাহলে যেমন কোরে হোক সংগ্রহ করতেই হবে। মনে মনে ভাবেন, কো অপারেটিভ থেকে হয়ত হাজার টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে। আর ইনসিওরেন্স পলিসিটা বন্ধক দিয়েও হয়ত কিছু জোগাড় হবে। প্রভার গহনা বলতে কিছুই নেই হাতে সোনার নোয়া ছাড়া—। আবার ধার করতে প্রভার মহা আপত্তি। বলে, শাক ভাত খাই সেও ভালো ওসব ধারদেনার মধ্যে মাথা গলাবো না। আমাদের ত সব সময়ই টানাটানি ধার শোধ দোব কি করে? চমক ভাঙ্গে প্রসন্নবাবুর খড়মের আওয়াজে। চেয়ে দেখেন পট পরিবর্ত্তন হয়েছে। মা মেয়ে দুজনেই অন্তর্ধান। সামনে প্রসন্ন হাসি হেসে প্রসন্নবাবু বলছেন কি অত ভাবছেন? আমি সব চটপট ঠিক করি ভাবাভাবির ধার ধারিনা। ছেলেরা ভেবেই অস্থির এত ব্ল্যাকমানি ইনকামট্যাক্সে যদি ধরে? আমি বললুম, কাজ কি বাবা অত ঝঞ্ঝাটে। সোনার বার করিয়ে করিয়ে পাইপের ড্রেনের ভেতর রেখে দিয়েছি। এই যে সব ড্রেন-পাইপ দেখছেন এর ভেতর তালতাল সোনা পোরা আছে—জয়বাবা বিশ্বনাথ পার করো হরিহে নারায়ণ। ওঁর বিশ্বনাথকে স্মরণ করায় চমকে সদাশিববাবু বলেন এবার তাহলে আমরা উঠি? প্রসন্নবাবু বলেন, হ্যাঁ দেখুন কনের বাপের ওপর জোর-জুলুম করা আমি পছন্দ করি না—অমন রত্ন ছেলে আমার, এক পয়সাও দাবী করিনি। আমি শুধু ঘর-খরচ বলে দুহাজার টাকা আমায় আপনি দেবেন নগদে। এটা আমাদের কুলপ্রথা, ছেলের বিয়েতে তো আর ঘর খরচা দিয়ে বিয়ে দিতে পারি না।

সদাশিববাবুর যেন আর চিন্তারও ক্ষমতা নেই। অভিভূতের মত আজ্ঞে বলে উঠে পড়েন। যখন বাড়ী ফেরেন গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। প্রভার চিন্তার আর অন্ত থাকে না। নেড়ার মুখে সব কথাই শুনেছেন কিন্তু

এখন টাকার ভাবনা মাথায় তোলা থাক স্বামী সেরে উঠলে হয়। খুব ভুগলেন সদাশিববাবু, তবে সব মন্দের মধ্যে যেমন ভালো থাকে তেমনি অসুস্থ মানুষটির ক্লান্ত মুখ দেখে প্রভা আর তাঁকে কিছু বললেন না।

বিপদ থেকে রক্ষা করলেন প্রভার বাবা। তিনি বললেন ভেবে দেখো, এরকম যারা টাকা চেনে তাদের বাড়ী মেয়ে দেয়া ঠিক হবে কিনা? তবে তোমরা বলছো ছেলেটি ভালো কাজেই যদি বিয়ে দেওয়া স্থির করো টাকাটা আমিই দিতে পারব—। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেয়ে গেলুম ঐটে না হয় অনুদিদির বিয়েতে কাজে লাগুক। বাড়তি ওরা কি কি চেয়েছেন? পঁচিশভরির চন্দ্রহার আঠারোভরির চুড়ি দশভরির আর একজোড়া আর্মলেট আর হীরের ফুল বলেন প্রভা। রামবাবু আচ্ছা তোমরা ভেবে দেখো বলে প্রস্থান করেন।

প্রভার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে কারণ সে জানে বাবার কাছে প্রভার মেয়ের সঙ্গে তার ভাইয়ের মেয়ের কোন তফাৎ নেই। কিন্তু ভাজেরা এটা প্রসন্নমনে মেনে নেবে না। সেখানের আ-ন্ন ঝড়ের কথা ভেবে প্রভা ব্যাকুল হয়। মাতৃহারা প্রভা রামবাবুর দুচোখের মণি ছিল—ঠিক সেই কারণেই ভাজেরা তাকে দুচোখে দেখতে পারে না। মনে মনে ভাবে আমি কি চিরকালই বাবার কষ্টের কারণ হয়ে থাকবো? কত দুঃখে যে ঐ চন্দ্রহারের টাকা সংগ্রহ হল তা আর কেউ না জানুক অনুপমা জানতো। তাই জোড়ে ফিরে এসে প্রভাকে বলেছিল ও বাড়ীর কথা জানো তো? অত যে হীরের গয়না তোমরা দিলে তা আমার ননদ বলে ওকি হীরে, না জীরে? আর দিদির শ্বশুরবাড়ীর কথা ভাবোতো? শুধু চারটে হীরের গয়না বাপের বাড়ীর। হাতের চুড়ি ইয়ারিং ব্রোচ নেকলেশ অবিশ্যি দাদুর দেয়া আর্মলেট ধরলে পাঁচটা। বাকি দুটো হীরের কাটা মাথাপা বালা হীরের শাতনরী কলার সব তো শ্বশুরবাড়ীর—। অথচ বৌভাতের দিন ত দিদি গাঁথা সোনার গয়না পরিয়েছিল আর সব হীরের গয়না শো-কেশে সাজিয়ে সকলকে বলছে হীরের গয়না সব বাপের বাড়ীর দেয়া। আর আমার যে সবচেয়ে বড় গয়না, পঁচিশভরির চন্দ্রহার সে কেউ দেখলো না—। চেয়ারে বসে ত? কে আর দেখবে বলো? তোমার জামাই বললো সেদিন চন্দ্রহারটা দেখে মাগো এ আবার আজ-কাল কেউ পরে নাকি? আমি বললুম, ঐটেই তো তোমাদের বাড়ীর গেটপাশ—নইলে ত ঢুকতেই পারতুম না। ও চুপ করে রইল। জানো মা, ও সব জানে বোধহয় নইলে ত জিগেস করত। প্রভা কথাটা চাপা দেন শুধু শুধু মেয়েটার মনে কষ্ট রেখে লাভ কি?

হিরের আগের আশীর্ব্বাদের দিন সোনার হার পরে পরে যে বরপক্ষের লোক এলো তাদের দেখে প্রভা সন্তুষ্ট হতে পারলো না। কী জানি এরা যেন কেমন অন্য জাতের মানুষ। এ রকম সোনার হার পরে ত সোনার বেনেরা। কিন্তু তখনও অবাক হবার সবই বাকি ছিল।

বিয়ের সময় বর বরণ করতে গিয়ে বিভ্রাট। ঘরে শ্বশুরের এক বন্ধুর স্ত্রীকে প্রভা খাওয়াতে বসিয়েছে। শ্বশুরের বন্ধুই শুধু নন প্রভার স্বামীর জীবনদাতা। প্রভার শ্বশুর যখন সামান্য বেতনে অধ্যাপনা করতেন তখন বাড়ীশুদ্ধ লোকের কলেরা হয়। খরচের অবধি ছিল না। সদাশিববাবুকে নিজের কাছে রেখে বাকি ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর জন্য নার্স রাখতে হয়েছিল সদাশিববাবুর বাবাকে। সেই দুর্দ্দিনে ঐ বন্ধুটি ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করে দিয়ে দিছলেন যাতে টাকার অনটন না হয়।

এই গল্প অশ্রুসজল চোখে সদাশিববাবুর বাবা প্রভার কাছে বলেছিলেন, মাগো ওর টাকা ত আমি শোধ করেছি কিন্তু সেদিনের ঋণ কি শোধ হবার? অনুপমাকে বড় ভালোবাসতেন বৃদ্ধ—তার দেবশিশুর মত অপূর্ব রূপ আর বুদ্ধি উজ্জ্বল চরিত্রের জন্য সে তাঁর বড় প্রিয়পাত্রী ছিলো। প্রভার শ্বশুর যখন বিলেতে যান তখন একবার কর্মাটারে আসেন তিনি। সদাশিববাবু কলকাতায় শুনে সদর থেকেই তিনি

ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আর প্রভার পক্ষে পর্দানসীন থাকা সম্ভব হয়নি। মাথায় কাপড় দিয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিল উনি এখানে নেই বলে আপনি যদি না থাকতে পেয়ে ফিরে যান আমার অপরাধের সীমা থাকবে না। বৃদ্ধ স্নেহবিগলিত স্বরে বলেছিলেন, তুমি তাহলে সত্যিই আমার মা। তখন অনুপমা শিশু—বৃদ্ধ তাকে বলেছিলেন তোমার আসল দাদুতো বিলেতে আমি হলুম নকলদাদু –

সেই নকল দাদুর স্ত্রী। অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী মহিলা, মাছ মাংস খাননা, কোন নিমন্ত্রণে যাননা। তিনি এসেছেন তাঁর অনুদিদির বিয়েতে। প্রভা বিশেষ যত্ন করে তাঁকে খেতে বসিয়েছে নিজের ঘরে—। নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়াবে এই ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ ডাক পড়লো জামাই বরণের। গিয়ে দাঁড়াতেই সোনার হার পরা কে ভদ্রলোক বললেন, একী আপনি সেলাই করা জামা পরে বরণ করবেন নাকি? লালপাড় গরদের সঙ্গে একটি গরদের সেমিজ পরা ছিল প্রভার, থতমত খেয়ে প্রভা সেমিজ ছেড়ে আসে। রামবাবুর কড়া আইনে মাথায় কাপড় না থাকলেও সেমিজ না থাকলে মেয়েদের চলতো না। হোক বাড়ীর গিন্নী, হোক ঝি বা বামনী, গায়ে সেমিজ না থাকলে বেআবরু মনে করতেন তিনি। সেই বাড়ীর মেয়ে প্রভা। কোনমতে জড়োসড়ো হয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বরণ করতে আসেন—এসে দেখেন. সেখানে আদিরসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে—বিষয়বস্তু প্রভার অল্প বয়েস। বয়েসটা শাশুড়ীজনোচিত নয় এটা সত্যি কিন্তু প্রকাশ্য ছাদনাতলায় কন্যার মাকে নিয়ে এরকম ভাষা শুনতে প্রভা অভ্যস্ত নয়। সেমিজ পরার অপরাধেই শিলের ওপর জামায়ের অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে প্রভা আহত হয়। ভীষণ কষ্ট হয়েছে প্রভার। একী কঠিন কঠোর মানুষ! তার পুত্রহীন বুকের সব কিছু মমতা নিয়ে যাকে বরণ করতে গেল সে এমন কেন? কেন তার মুখে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম সৌজন্যের লেশ নেই? প্রভা বিস্মিত হল বিচলিত হল? মনে হল এ কার হাতে মেয়ে দিচ্ছি!

পরে প্রভা জেনেছিল গদাই যাকে বলতো "যাও যাও ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে এসো না—"মেয়েদের সম্বন্ধে বলতো মেয়েরা হচ্ছে গামছার জাত যত আছড়াবে তত শায়েস্তা থাকবে। পরে আরো জেনেছিল গদায়ের প্রভার ওপর আজীবন যে রাগ সে শুধু ঐ সেমিজ-পরা—সেলাই-করা জামা কাপড় পরে যে কোন ধর্ম কর্ম হয় না তাও কি এই বালিগঞ্জের বিবি জানেন না। প্রথম দর্শনেই বিপত্তি—। অথচ এই জামাইকে মনেমনে সন্তানের স্থান দিয়ে কী স্বপ্ন-সৌধই না গড়েছিল সে। তার সাধের স্বপ্ন যে এভাবে চূর হবে তা প্রভার কল্পনাতেও ছিল না। চোখে জল এসে যায় প্রভার। মনে মনে ভাবে ঠাকুর একী করলে? সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় চোখের জল চোখে চেপে প্রভা বরণ সেরে নেয়। ঘরে ফিরে দেখে বিভ্রাট যতদুর হবার হয়েছে। যে ভদ্রমহিলাকে সযত্নে খাওয়াবেন বলে ঘরে বসিয়েছিলেন তিনি পাতের ওপর বমি করেছেন। প্রভার ঘরে বসিয়ে খাওয়ানর অপরাধে তাঁকে বিশিষ্ট অতিথি বোধে যদুদা তাঁকে মাংস পরিবেশন করে গেছে আর তিনি তা এঁচড়ের কালিয়া ভেবে খেয়েছেন। ফলে এই বিপত্তি। এবার সত্যি সত্যি কান্না পেয়ে যায় প্রভার।

তাঁকে উঠিয়ে বাথরুমে নিয়ে যেতে গিয়ে পেছন থেকে আঁচলে টান পড়ে। পেছন ফিরে দেখেন গলায় হার পরা এক কাঠখোট্টা গোছের ভদ্রলোক এসে চোখ পাকিয়ে জিগেস করেন, আপনি কি কনের মা? প্রভা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। ভদ্রলোক বলে, এই কবিতা কি আপনি লিখেছেন? আবার প্রভা স্বীকার করে। ভদ্রলোক বলেন শ্বশুরের সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে শাশুড়ীর সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে ননদের সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে সব লিখেছেন আর ভাগ্নের সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে লেখেন নি কেন? নিন লিখুন। প্রভা জামায়ের

মুখ দেখা ইস্তক ভাবনায় ছিল। বুঝতে পারছিল না কোথায় ত্রুটী হয়ে গেছে। সম্প্রদানের সময়ও হাঙ্গাম কম হয়নি। যেখানে দানসামগ্রী সাজানো ছিল সেঘর থেকে সম্প্রদানের জায়গা সরিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। প্রসন্নবাবু বলেছিলেন তাই নাকি ওঁদের নিয়ম। পরে প্রভা জেনেছে তার দানসামগ্রী সকলকে দেখাতে নারাজ ছিলেন তিনি। নেবেন অথচ কিছু নিইনি এই হল তাঁর স্বভাব। যাক এখন প্রভা হাপ ছেড়ে বাঁচে—দুকলম কবিতা লেখা তার কাছে কিছুই নয় অথচ তাতে যদি বরপক্ষরা খুসী হয় তার চেয়ে আনন্দের আর কীই বা আছে—।

কিন্তু আনন্দ ছাড়া বস্তুও ত সংসারে আছে, সে হচ্ছে বিস্ময়! ভদ্রলোকের হাত থেকে কলম নিয়ে দু লাইন কবিতা লিখে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে চিৎকার করে বলে ওঠে পাঁচ ছয় জন—পেরেছে রে পেরেছে। নিজেই লিখেছিল। প্রভা চেয়ে চেয়ে দেখে তার মধ্যে গদায়ের দাদাও রয়েছে। মনে হয় হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে গঙ্গায় ফেলে দিলুম। এরা কেমন লোক গো? যারা মেয়েদের পক্ষে দুলাইন কবিতা লেখাও অসম্ভব মনে করে।

ক্রমশঃ

'জিজ্ঞাসা'

শ্রীরেবা দাশ
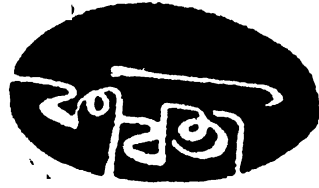
শক্তিধারার উৎস কোথায়,

  বুঝতে পারি যখন আসি কাছে—

দূরে গেলে রিক্ত বৃক্ষ,

  পত্র গেছে ঝরে ;

মাটির বুকে ধ্বস নেমেছে

  পায়ের তলায় জমি গেছে সরে।

সূর্য্য গেলে ডুবে

  বিশ্বজুড়ে আঁধার নামে

সবাই-ই তা জানে। তাই তো—

কোথায় প্রাণ, কেমন শক্তি

  শুধিয়েছিলেন সূর্য্য পানে চেয়ে

আলোর থেকে দূরে গেলে

সত্যিই কি আঘাত লাগে

  অস্তিত্বের নিবিড় মর্ম্মমূলে ?

অধ্যাপকেষু

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী

তুমি এমেরিটাস অধ্যাপক হ'লে,
স্তুতি-অভিনন্দনের রাজমুকুট বহুজনের
তোমার মাথায়।
বিশ্ববিদ্যার অন্তরলক্ষ্মী তোমাকে
প্রবেশপত্র দিলেন
তাঁর খাসমহলে ;
এই দুরূহ সম্মান পেলে ব'লে
কয়েক ছত্র কবিতা লিখে
তোমায় সম্বর্দ্ধিত করলেম !
আজ তুমি আশ্চর্য্য হ'লে ;
চণ্ডীতোরে গ্রামে
প্রধানের ধর্ডীসন ;
মাল্য চন্দন আর রাজচক্রবর্তীর অভিষেক ;
তোমার !
কতদিন কত রাত্রি ধ'রে
অনলস তপশ্চর্য্যা,
শান্ত চিত্ত,
মনের গহনে সমাহিত
কত জ্ঞান !
বুদ্ধির মুকুরে,
ব্যক্তিত্বের এলোমেলো তরঙ্গ ভঙ্গে
তারা বুঝি বিধুৎস্নু।
উনিশশো চল্লিশ সাল
বঙ্গদেশ তাপদিগ্ধ ;
তুমি তার বিক্ষোভ-প্রতীক ;
জ্ঞানে, কর্মে অগ্নি-অভিষেক,
কলিযুগে খাণ্ডবদাহন।

বিধুন্তুদ সূর্য গ্রাস করে ;
পুনরভ্যুদয়,
'জবাকুসুমসঙ্কাশং'
এ ত্যুষ প্রকাশ ;
কালচক্র সৌরচক্র একাকার
তাই·········এলো
রুপোলি ঐশ্বর্য,
নীহার রঞ্জিত হ'ল,
ক্ষান্ত দ্যুতি সূর্যের সায়াহ্ন,
সৌম্য ধৌম্য আলোক বিস্তার।
জীবন খণ্ডিত বেদ,
এ যুগের বেদব্যাস তুমি,
ক্ষীণমেধা আমরা সবাই।
বিদ্রোহ এষণা আর বিধিৎসা
বুঝি, তোমার ধর্ম্ম।
তাই অভূতপূর্ব তুমি,
অনন্ত ও একক।
সুখ্যাতি কৈতব
বিচ্ছুরিত মহিমা আদিগন্ত ;
তব তুমি উদাসীন।
বঙ্কিমের' তাই হাততালি,
সখ্যতা হ'ল না তার সঙ্গে
তোমার ·········।
তাই তুমি ভারত-পথিক ;
কুমটুকুর ক্লিন্নতার কাছে
খ্যাতি-অখ্যাতির
তুমি অস্পৃশ্য র'য়ে গেলে ;
সুখ্যাতির মিথ্যাচারটাকে
বর্জন করলে
অযত্ন প্রহাসে।

একটি সন্ধ্যা

করুণাময় বসু

আকাশের পটে বৈকালী মেঘম্লান,
মল্লিকা বনে চৈতালি অবসান ;
পাহাড়তলিয়ে ঘুমায় তৃতীয়া চাঁদ,
কি যে ভালো লাগে ছায়াপুঞ্জিত ছাদ !
তুমি আছো তাই ভালোলাগা এই নেশা
বায়ু চঞ্চল মালঞ্চে আছে মেশা ;
কখন রেখেছ ভীরু করতলখানি
পাখীর নরম পালকের মতো আনি।
গোধূলি প্রান্তে সোনালিয়া মায়া-রাত
হাতছানি দেয়, শৈলশিখরে চাঁদ :
সবুজ শাড়ির প্রান্ত-ভঙ্গিমায়
হারানোস্মৃতির সুর বুঝি ছুঁয়ে যায়।

যে ফুল রেখেছ শিথিল কবরীমূলে,
ভাঙা পল্লব যদি দাও মোরে ভুলে ;
মনের আড়ালে ছিন্ন কুসুম-রাখী
গেঁথে নিয়ে যাব, ভরিবে জীবন বাকী।
মাঠের প্রান্তে নদীর শীর্ণ ধারা
উপলখণ্ডে বাজাইছে একতারা ;
মাণিকের মতো জোনাকির পাখা জ্বলে,
সন্ধ্যা-পরীর নয়নে শিশির গলে।
পথতরু মূলে মালতী কুসুম ঝরে,
ছেলেবেলাকার কতো কথা মনে পড়ে ;
আকাশে মেঘেরা চালায় সোনার রথ,
তুমি আমি আর পাহাড়িয়া বাঁকা পথ।

'সদা সত্যের' সন্ধানে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তোমরা বলেছিলে সদা সত্য কথা বলিবে।
তা' সত্য কথা বলা আর কি শক্ত কাজ,
আমি সবাইকে অনেক সত্যকথা শুনিয়েছিলাম।
আশ্চর্য্য! তারাও আমাকে অনেক সত্যকথা শোনালো।
পৃথিবীর কোটী-কোটী লোকের কোটী কোটী সত্যে
ভরে ওঠে চারদিক।

অবাক হয়ে ভাবি কার সত্যটা ঠিক।
নানা সত্যের ঝাপটা লাগে গায়ে।
মন এসে দাঁড়ায়।
বয়স তার চার কুড়ির কোঠায়।
সে চারদিকে চেয়ে চুপিচুপি বলে
পৃথিবীতে একটাই সত্য আছে
(জানো তার নাম?)
তাকে খুঁজতে বললাম।

ক্ষতি মিথ্যা ক্ষত সত্য

কানাইলাল দত্ত

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ
কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ

উত্তরপ্রদেশ সরকার মাদকবর্জন নীতি ত্যাগ করিয়াছেন। কি কারণে তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা বিস্তারিতভাবে আমরা জানি না। তবে মাদক বর্জ্জনের বিরুদ্ধে অধুনা দুটি যুক্তি প্রবলভাবে উপস্থিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এক, ইহা হইতে কোটি কোটি টাকা রাজস্বআদায় হয়। কোন সরকারই রাজস্বের এই সহজ এবং সারবান উৎসটিকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে উৎসাহবোধ করেন না। দুই, আইন দ্বারা মাদক-বর্জ্জনের চেষ্টা করিলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়। নিষিদ্ধফলের প্রতি মানুষের লোভ তো চিরন্তন। চোরা-কারবারের প্রসার ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপও বাড়িয়া যায় উত্তরপ্রদেশের সরকার তার রাজস্বের এক দশমাংশ পান মদ্যাদি মাদকদ্রব্যের উপর ধার্য কর হইতে। ইহা খণ্ড সত্য। টাকার অপর পিঠটি লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

মাদকবর্জ্জন নীতির বিসর্জ্জন অপেক্ষা ক্ষতিকর কোন সিদ্ধান্ত আমি কল্পনা করিতে পারি না। মদ্যপানের ফলে কত যে সংসারের শান্তি ও সুখ চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কত যে পরিবার অনাহারে অর্ধাহারে কাটায়, কত মানুষ যে অকালে রোগজীর্ণ হইয়া কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়া অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে বসিয়া ধুঁকিতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নেই। সমাজের উপরের তলায় অর্থাৎ যাহাদের প্রভূত অর্থ আছে (আমি ইহাদের অভিজাত বলি না) সেখানে মদ্যপানের প্রাবল্য নানাপ্রকার সামাজিক অপরাধের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ইহার প্রভাব উচ্চমধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত যুবক-দের উপর পড়িয়া বহু প্রতিশ্রুতিময় জীবন নেশার স্রোতে অন্ধকারে হারাইয়া যাইতেছে। যানবাহনের দুর্ঘটনা বৃদ্ধির অবশ্যই একটি বড় কারণ পানাসক্তির প্রসার, খুন জখম রাহাজানি, দলবদ্ধ মারামারি লুটতরাজ এই যে কথায় কথায় ঘটিতেছে তাহার পশ্চাতে নেশার নিঃশব্দ পদসঞ্চার অবশ্যই আছে। এ সব কথা সকলের জানা।

এক কাপ চা। চা খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া উহা পান করা অনেকে সমীচীন মনে করেন নাই। কিন্তু পরে চা-বোর্ড নানা উপায়ে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে 'চা'য়ের বাজার বাড়াইবার জন্য প্রচার সুরু করেন। চা পানের প্রয়োজনীয়তার উপর নামী দামী লোকের কিছু কিছু লেখাও তাহারা বোধ হয় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ক্রমে চা-পানের ন্যায় একটি অপ্রয়োজনীয় (ক্ষতিকর কিনা জানি না, বোধ হয় ক্ষতিকরও) প্রয়োজন সারাদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। চা খাইনা বলিলে লোকে একসময় করুণা করিত, গেঁয় বলিত। সমাজের শীর্ষের দিকে উঠিবার একটি ধাপ ছিল চা পান। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চা যেমন করিয়া মিথ্যা আভিজাত্যের মোহ হইতে সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে আজ মদ্যপানেরও তেমনি অবস্থা। আঠার বিশ বছরের যুবকেরা (অনেক ক্ষেত্রে নারীও) প্রকাশ্যে মদ্যপান করাকে বাহবা পাইবার মত কাজ বলিয়া মনে করেন। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহারা যে মদ্যপানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং তাহারা মদ খাইয়াও মাতাল না হইবার যোগ্যতা রাখে (যদিও সকলেই মাতাল হয়), এই দ্বিবিধ যোগ্যতা উপস্থিত করিয়া নিজেদের বিশিষ্টতা প্রমাণ করিতে চায়। যে সমাজে তাহারা লালিত বর্ধিত সেখানে ইহা অপরাধ বা লজ্জার বলিয়া মনে করা হয় না বলিয়াই উহারা ইহা করিতে উৎসাহ বোধ করে।

ইয়ং বেঙ্গলের কলিকাতায়ও মদ্যপান এইরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইহার ফলে সমাজে যে গরল উত্থিত হইয়াছিল তাহার দ্বারা বহু প্রতিশ্রুতিময় জীবন অকালে নষ্ট হয়। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মদ্যপান নিরোধ আন্দোলন করিয়া এই কুফল হইতে সমাজকে বহুল পরিমাণে উদ্ধার করেন।

বিশ শতকে আর এক মহাত্মা, গান্ধীজি মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হন এবং কংগ্রেস মাদক-বর্জন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৭ সনে ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেই মন্ত্রীসভাকেই মাদকবর্জন নীতি কার্যকর করার জন্য কংগ্রেস নির্দেশ দেন। তখনও রাজস্বের কথা উঠিয়াছিল। ইংরেজ গবর্ণরেরা নানাভাবে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করা থেকে মন্ত্রীদের বিরত করতে চেষ্টা করেন। রাজস্বের ঘাটতি পূর্ণ করার অসুবিধাই অবশ্য তাঁহারা বড় করিয়া তুলিয়া ধরেন। এমনও বলেন যে, ইহার পরেও যদি মন্ত্রীরা মাদকবর্জন করাই সাব্যস্ত করেন তবে তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, ভারত সরকার ঘাটতি পূরণ করিবেন না। রাজাগোপাল আচারি তখন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ইংরেজ গভর্ণরদের এই সব প্রচ্ছন্ন হুমকি মোকাবিলার জন্য আগাইয়া আসিলেন এবং বিক্রয়-কর ধার্য করিয়া ঘাটতি রাজস্ব মিটাইবার ব্যবস্থা করেন। কোন না কোন আকারে সকল কংগ্রেসী প্রদেশে সেদিন মাদকবর্জন গৃহীত হয় এবং বিক্রয়কর ধার্য হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, কোটি কোটি টাকার রাজস্ব বিসর্জন দিবার সাহস যেন মন্ত্রীদের থাকে। কারণ? কোন রাজ্যেরই অধিবাসীদের নৈতিক অধঃ-পতনের সহায়তা করিবার অধিকার নাই। আমরা চোরকে চুরি করিবার সুবিধা দিতে পারি না।

সর্ব বিষয়েই মহাত্মা গান্ধী সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় মতামত প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও কোন দ্বিধা বা স্বার্থের অবকাশ নাই। মহাত্মা গান্ধীর এই প্রেরণা ও রাজাজীর বাস্তব বুদ্ধি মিলিয়াই সেদিন মাদকবর্জন নীতি গ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর কুড়ি বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, রাজাজী এখনও জীবিত (অবশ্য ক্ষমতাহীন) ইহার মধ্যেই উল্টা পুরাণ সুরু হইল।

মদ্যপান নিরোধ সার্থক করিতে পারিলে রাজস্বখাতে যে ঘাটতি হয় তাহা ধর্তব্যই নহে। ১৯৩৮ সনে বিধান-সভায় (তখন নাম ছিল ব্যবস্থাপক সভা) মাদকবর্জন আইন পেশ করিতে উঠিয়া মধ্যপ্রদেশের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রী পি, বি, গোল কথাটা চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেন। ত্রিশবৎসর পরেও তাঁহার বক্তব্য সমান মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের উপর ধার্য কর না পাইলে রাজ্য সরকারের তহবিলের যে সংকোচন ঘটে আসলে তাহা কোন সংকোচনই নহে। কারণ? "তাঁহার বক্তব্যের মর্মার্থ: আমরা কর আদায় করি জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য। মদ্যপান বন্ধ হইলে সমাজের দরিদ্রতর মানুষগুলির জীবনের মান দ্রুত বাড়িবে। মদ্যপায়ীদের অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর লোক। মদকে তিনি বিষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলেন, বিষপানের জন্য তাহারা তাহাদের রোজগারের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা তাহারা বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং প্রায়ই তাহারা পশুর ন্যায় হইয়া পড়েন। মদ্যপান বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্রয়শক্তি বাড়িবে অর্থাৎ যে টাকা দিয়া মদ কিনিত তাহার দ্বারা খাদ্যাদি কিনিতে পারিবে, মাতাল হইয়া রাস্তাঘাটে অস্থানে-কুস্থানে আর পড়িয়া না থাকিয়া বাড়ীতে তাহাদের আত্মীয় পরিজন স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দে অতিবাহিত করিবে।

মদ বিক্রয় হইতে লব্ধ সমগ্র রাজস্ব ব্যয় করিয়াও সরকার কি মানুষের এই কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবেন? গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কোন লাভ হয় না। তেমনি মদ্যপান বন্ধ না করিয়া জীবনের মান উন্নয়ন ও সামাজিক জীবনের উন্নতি-

বিধানের প্রচেষ্টা কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। অপরদিকে রাজস্বের ঘাটতির কোন যুক্তিসহ ভিত্তি নাই। মদ্যপান বন্ধ হইলে সারা ভারতের মদ্যপায়ীদের কত টাকার অপচয় বন্ধ হইবে অনুমান করিতে পারেন? ৮০০ হইতে ১০০০ কোটি টাকা হইবে। এই টাকাটায় ভোগ্য-পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রীত হইবে। সেই কেনাকাটার ফলে যে বাড়তি কর সরকার পাইবেন তাহা বোধহয় আবগারী শুল্ক অপেক্ষা কম হইবে না। পরন্তু গান্ধীজী বলিয়াছেন, "সুরাসেবী থাকার চেয়ে ভারতকে বরং ভিক্ষুকে পরিণত করাও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।"

অল ইণ্ডিয়া প্রহিবিশান কাউন্সিলের সভাপতি ডকটর শ্রীমতী সুশীলা নায়ার তাঁহার এপ্রী টু দি মেম্বারস্ অব দি এ, আই, সি, সি শীর্ষক আবেদনে মাদকবর্জ্জনের সপক্ষে একটি চমৎকার যুক্তি অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন—মদ্যব্যবসায়ীরা সর্ব্ব প্রযত্নে যখন সকলকে মদ্যপানের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন এবং তথাকথিত ফ্যাসানদোরস্ত সমাজে মদ্যপান ফ্যাসানের অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে তখন পান-বিরোধী শিক্ষা প্রসারের দ্বারা মদ্যপান বন্ধ করা কার্যকর হইতে পারে না।

ইহাতো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। চায়ের ক্ষেত্রে ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। স্বাস্থ্যের জন্য মদ্যপান প্রয়োজনীয় ইত্যাদি কথা আলোচিত হইতেছে। খবরের কাগজে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। অপরদিকে মদের সঙ্গে কিছু ঔষধপত্র মিশাইয়া একজাতীয় টনিক বা সুধা কি সুরা বাজারে বিক্রয় হইতেছে। শ্রীমতী নায়ার তাই যথার্থই বলিয়াছেন—জীবনের মৌলিক মূল্য সম্পর্কে আমাদের পুনঃ প্রত্যয়শীল হইতে হইবে। কায়েমী স্বার্থকে দরিদ্র মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ সর্ব্বোপরি তাহার বুদ্ধি, তাহার অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতাকে আমরা কখনই অপহরণ করিবার অধিকার স্বীকার করিতে পারি না।

সমকালীন সমাজের বিবিধ বাস্তব অসুবিধার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া আদর্শকে রূপদান করা ও ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান সর্ব্বদা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু সে জন্য একেবারে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জনের কথা ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। আমাদের কর্ম্মদক্ষতার অভাবজনিত অক্ষমতার জন্য নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত মারাত্মক এবং জনস্বার্থপরিপন্থী। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বহু বিষয়ে তাহার ধ্যানধারণা ও দীর্ঘ দিনের সযত্নলালিত বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। গঠন কর্ম্ম গিয়াছে। গ্রাম স্বরাজ খাদি সব কিছুই অনাদর অবহেলায় ধুকধুক করিতেছে। তথাপি আশা করা গিয়াছিল মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনটা সরব সচল থাকিবে। কারণ ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, সবটাই ইহার লাভ—। নৈতিক আর্থিক ও সামাজিক বিচারে ইহার দ্বারা কোন ক্ষতি হইতে পারে, একমাত্র বিদেশী সরকার ছাড়া অন্য কেহ তাহা প্রকাশ্যে বলিতে সাহস পান নাই। পরন্তু এই একটি মাত্র প্রচেষ্টার সার্থক হইলে অন্যবিধ কর্ম্মগুলি সম্পাদন সহজতর হইবে। তথাপি নানা অজুহাত তুলিয়া আর্থিক প্রচেষ্টা হইতে সরকার হাত গুটাইয়া লইয়াছেন। কোন রাজ্যে অঞ্চল বিশেষে, কোন রাজ্যে সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বাহাদুরি সিদ্ধান্ত বটে! ছয়দিন যথেচ্ছ মদ্যপানের পর সপ্তম দিনে মদ্যপেয়া সাধু বনিয়া যাইবেন এরূপ যাহারা আশা করেন তাহাদের বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। পরন্তু এইরকম ব্যবস্থার দ্বারা মদ্যপানের অন্ধকার কানাগলিও জানাজানি হইয়া যায়। কোনস্থানে পানের দোকানে ও বড় বড় রাজপথের পাশে জনবিরল প্রান্তরে যেসব সরাইখানা স্থাপিত হইয়াছে সেখানে অবাধে মদ্য বিক্রয় হয়। এগুলি চোরা-কারবার। অতএব মদ্যপান আইনসিদ্ধ হইলেও কিছু কিছু বাধ্য-বাধকতা সর্ব্বদা থাকে, নহিলে কর আদায় করা যায় না। সে বাধ্যবাধকতা ও আইন অহরহ ভঙ্গ হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গে মদ্যপান নিষিদ্ধ নয় অথচ ব্যাপক আকারে বেআইনী-ভাবে মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতেছে। অতএব মদ্যপান নিষিদ্ধ করিলেই যে চোরাকারবার এবং বেআইনী উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়ে এ কথা সত্য নহে।

আবার শ্রীমতী নায়ারের কথায় ফিরিয়া আসি।

"মদ্যপান দরিদ্রকেই কেবল শোষণ করে না ইহা উপর-তলার মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি সত্যসত্যই শততার সঙ্গে মাদকবর্জ্জন-নীতি গৃহীত হয় এবং তাহাকে রূপায়িত করা হয় তাহা হইলে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ দুর্নীতি হ্রাস পাইবে।"

গান্ধীজী বারবার বলিয়াছেন 'দুঃখবরণ ভিন্ন স্বরাজ আসিতে পারে না।' কথাটা কেবল কথার কথা নহে। দুঃখের মহামূল্যেই সত্যকার আস্পদ লাভ সম্ভব। রবীন্দ্র-নাথও আমাদের এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, স্বাধীন ভারতের বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে এই মহৎ সত্যের অনুভবযোগ্য স্বীকৃতি নাই, এই সত্যকে স্বীকার করিবার সাহসের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে। তাই মাদকবর্জ্জনের ক্ষেত্রে মিথ্যা ক্ষতির ভয়ে বিষাক্ত ক্ষতকে সযত্নে পোষণ করিবার ব্যবস্থা পাকা হইতে চলিয়াছে। জাতিকে তাহার ভিত্ হইতে গড়িয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী গঠন-কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করেন। ইহাকেই তিনি সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৯০২ সাল হইতে কংগ্রেস কর্ম্মতালিকায় মাদকবর্জ্জনের স্থান রহিয়াছে। গান্ধীজী আশা করিয়াছিলেন 'গঠন কর্ম্মীদের চেষ্টার ফলে আইন দ্বারা মাদক নিবারণের পথ তৈয়ার হইবে, অন্তত আইন দ্বারা মাদক নিবারণ সহজে সাফল্যলাভ করিবে।' তিনি জানিতেন ভারতবর্ষের সকল মানুষ তাহার কর্ম্মসূচী অনুসারে কাজ করিবে না। কিন্তু "যদি একজন উৎসাহী কর্ম্মী দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অন্য যে কোন কাজের ন্যায় এই কাজও অনায়াসে করা যাইতে পারে।" মাদকবর্জ্জনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য হোক এই প্রার্থনা করি।

পরাধীন ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মাদকপরিপ্লুত অভিশপ্ত জীবন হইতে উদ্ধারের জন্য সরকার নিরপেক্ষ হইয়া যে কাজটুকু হইত আজ সরকারের ভরসায় তাহাও বন্ধ হইয়াছে। মনে হয়, সরকার স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক গঠনকর্ম্মের জন্য তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। মাদকবর্জ্জন সফল করিতে হইলে গঠন-কর্ম্মীদের অগ্রণী হইতে হইবে। তাহারা সক্রিয় হইয়া কার্যে সাফল্যলাভ করিলে সরকার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। ভূদানের ক্ষেত্রে ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি বিনোবাজীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত নেতা এককভাবে দীর্ঘদিন একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবার পর সরকার তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতেছেন। মদ্যপান নিবারণের ব্যাপারে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই, সংবিধানের স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার দ্বিধাগ্রস্ত, অনেকক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। অথচ গান্ধীজী বারবার মনে করাইয়া দিয়া গিয়াছেন—পানদোষের কবলে যে জাতি পড়িয়াছে ধ্বংস ছাড়া তাদের আর অন্য কোন গতি নেই। সরকারী ক্ষমতা গান্ধীজীর অনু-গামীদের হাতে, অথচ তাহারা সাহস করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিতে পারিতেছেন না, ইহা ভাবিতেও আশ্চর্য ঠেকে। বন্ধ করিবার পর বেআইনী কালোবাজারীর প্রসারতা হয়তো কিছু বাড়িবে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক ক্ষতির কারণ হইতে পারে না।

এই দুঃখময় অবস্থার মধ্যেও রাজস্থানের সর্ব্বোদয় কর্ম্মীরা অগ্রসর হইয়া সরকারকে মাদকবর্জ্জনের নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছেন। সারা ভারতবর্ষে সর্ব্বোদয় কর্ম্মীগণের সঙ্গে সকল সৎ ও কল্যাণকামী মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক, ক্ষতি মিথ্যা ক্ষত সত্য। সাধনার প্রথম সোপান মাদকবর্জ্জন।

বাংলায় সংবাদপত্রের গোড়ার ইতিহাস

ভাগবতদাস বরাট

খবরের কাগজ নেশায় সামিল। আহার নিদ্রায় তাগিদেরই মত [illegible]র পড়ায় আগ্রহ বহুজনের। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ধূমায়মান চায়ের কাপে চুমুক আর সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের পাতায় মনঃসংযোগ। এর ব্যতিক্রমে মন যেন ফাঁকা হইয়া যায়। প্রতিদিনের খবর ছাপার অক্ষরে চোখের সামনে এসে না পৌছলে প্রতিটি মুহূর্ত্তই মনকে পীড়া দেয়। মনের সোয়াস্তি থাকে না। যেন প্রবাসে অবস্থান করছি, দেশের বাড়ীর চিঠিপত্র পাচ্ছি না। মনের ঠিক এইরূপ উদ্বেগ। সুতরাং এরূপ বস্তুর উদ্ভব ও উত্তির বিষয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। এবং তা জানার ইচ্ছা অনেকেরই। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

খুব সম্ভব মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেবের আমলে ভারতে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের উদ্ভব। মানুষের সঙ্গে সংবাদপত্রের সেই প্রথম পরিচয়। মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানার আবিষ্করণ না হওয়ায় হাতে লিখে খবরাখবর একহাত থেকে আর একহাতে পরিবেশিত হত সে যুগে। সে কাগজে অবশ্য সারা বিশ্বের সংবাদ প্রকাশিত হত না, রাজ্যেরই নানা বিষয়ের আলোচনা ও অবতারণায় পূর্ণ থাকতো পত্রিকায় আগাগোড়া।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই সময় প্রথম পাদরী কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা করেন। ফস্টার, মার্সমান, কোলব্রুক প্রভৃতি সাহেবদের সহায়তায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তারপরই দেখি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রকাশ। এই সময় রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় বাংলা ভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকা "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। এতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ চিত্রসহ মুদ্রিত হয়েছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পাদরী মার্সমান শ্রীরামপুর হতে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকার নাম "দিগ্‌দর্শন"। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ও বিভিন্ন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে পত্রিকাটি সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তা টিকলো কই! আত্মপ্রকাশের পরই পত্রিকার মৃত্যু ঘটে। পর বৎসরই চোখে পড়ে মাসিক "গস্পেল ম্যাগাজিন"। খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও প্রচারণের পত্রিকা। হয়ত তারই জবাবে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। সাহেবদের মধ্যে বেদান্তমত প্রচারমানসে উক্ত পত্রিকার প্রকাশন। বহু সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তিকা এরপর ধীরে ধীরে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠে। কিন্তু দীর্ঘায়ু হতে কোনটাই পারে নি। অঙ্কুরে বিনাশ না হলেও ডাল পাতা মেলে শুকিয়ে গেছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত "বিদ্যাদর্শন" নামে এক পুস্তিকা চালু করেন। আবার ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ মিত্রের সম্পাদনায় "কায়স্থকিরণ" পত্রিকার জন্মলাভ। কায়স্থ সমাজও যে উপবীত ধারণে সক্ষম এই যুক্তি প্রতিপাদনের নিমিত্ত উক্ত পত্রিকার অবতারণা। প্রত্যুত্তরে "মুক্তাবলীর" আত্মপ্রকাশ। কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য উক্ত মুক্তাবলীর প্রকাশক ছিলেন। সেই সময়ে নন্দকুমার কবিরত্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষে ও পৌত্তলিকতার

স্বপক্ষে এক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। পত্রিকার নাম "নিত্যধর্ম্মরঞ্জিকা"।

বলাবাহুল্য যে তৎকালীন এই সব পত্রিকাদিতে সংবাদাদি বিশেষ প্রকাশিত হত না। ধর্ম্মমূলক এই সব পত্র-পত্রিকায় স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে অগ্রণী ছিলেন প্রকাশকমণ্ডলী।

এরপর যে পত্রিকার জন্মলাভ হয় তার নাম "সর্ব্ব-শুভকরী"। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তদানীন্তন প্রখ্যাত সুধীবর্গের রচনাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পত্রিকাটিও বেশী দিন টিকে নি। পত্রিকাটি গতায়ু হলে মাধবানন্দ তর্কসিদ্ধান্ত বালি হতে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর প্রচারিত হয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ"। এর সম্পাদনায় ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এই বিবিধার্থ সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত আছে একটি অপূর্ব্ব আয়োজনের কথা।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৎকালীন বিদ্বজ্জনকে দিয়ে স্কুল পাঠ্যের উপযোগী ভাল ভাল বই লিখিয়ে নিয়ে সেগুলি প্রচার করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। এই এই প্রতিষ্ঠানটিও স্থায়ী হতে পারে নি। যদিও এই প্রতিষ্ঠান "স্কুল বুক সোসাইটির" সহিত মিলিত হয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সহযোগিতা পেয়েছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রচারের ভারও এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। এবং মিত্র মহাশয়ের প্রচেষ্টায় উক্ত গ্রন্থে বহু আকর্ষণীয় চিত্রাবলী ও উৎকৃষ্ট রচনাসম্ভার স্থান লাভ করেছিল। ফলে উক্ত পুস্তকটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থও হয়ে-ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ক্ষয়রোগীর মত ধীরে ধীরে উক্ত প্রতিষ্ঠান সকলের দৃষ্টির বাইরে সরে গেল। কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুরকে এই বিবিধার্থ সংগ্রহ ও প্রচারে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। এবং এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন প্রাণনাথ দত্ত। কিন্তু এই প্রচার-পত্রও বিলুপ্ত হল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জগমোহন তর্কালঙ্কার "বিজ্ঞান-কৌমুদী" নামক পত্রিকা সর্ব্বসমক্ষে তুলে ধরেন। কিন্তু এগুলি সবই একে একে লুপ্ত হল।

উল্লিখিত পত্রিকাগুলি অল্পবিস্তর আলোচনাত্মক ও সাহিত্যবিষয়ক। বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ের রচনা-সম্ভারে সুসমৃদ্ধ। কিন্তু শুধু সংবাদ পরিবেশিত হবে এই-রূপ পত্রিকার একান্ত অভাব ছিল সেকালে।

সংবাদপত্রের সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব শ্রীরামপুরে। বিদেশী মার্সমান সাহেবের চেষ্টায় পত্রিকার নাম ছিল "সমাচার দর্পণ"। ইংরাজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই উক্ত পত্রিকার সংবাদ পরিবেশিত হত। এই পত্রিকায় সময়েই তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্রের ডাকমাশুল এক চতুর্থাংশ ধার্য্য করেন। পত্রিকাখানির বহুল প্রচারকল্পে লর্ড আমহার্ষ্ট সরকারী দপ্তর থেকে প্রতি সংখ্যার একশ' কপি পত্রিকা ক্রয় করতেন। কিন্তু তবুও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশ কাল স্থায়ী ছিল।

রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে "কৌমুদী" নামক পত্রিকার আবির্ভাব। কিন্তু পরিচালকদ্বয়ের মধ্যে সতীদাহ নিবারণ বিষয় নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় ভবানীবাবু "সমাচার-চন্দ্রিকা" নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

হিন্দুধর্ম্ম-সংরক্ষণপ্রয়াসী এই পত্রিকাখানি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাত ব্যক্তি-গণের বিশেষ সাহায্যলাভে সক্ষম হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূল আলোচনায় সে যুগে সমাচার চন্দ্রিকা পঞ্চমুখ ধারণ করেছিল। কিন্তু উক্ত সমাচার পত্রও অস্তমিত হল। এরপর উদয় হল "তিমির নাশক" ও "বঙ্গদূত"। এই পত্রিকা দু'টিও হিন্দুশাস্ত্রসংরক্ষণে আগ্রহশীল ছিল। এই সময় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানা সামাজিক ব্যাপার নিয়ে দেশে আলোড়ন দেখা দেয়।

তৎকালে বহু পত্র-পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে। তন্মধ্যে কিছু দীর্ঘায়ু "সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়"। তারপর

১৮৩৯ সালে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত "সংবাদ ভাস্কর" এবং অর্দ্ধ সাপ্তাহিক 'রসরাজ' প্রকাশ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলা গভর্ণমেণ্ট "গেজেট" প্রকাশ করেন। আইন ও সরকারী বিষয়ের নানা তথ্য ও বিজ্ঞাপনাদিতে এই পত্রিকা পূর্ণ থাকতো।

এরপর দেখি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাম গোপাল ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বেঙ্গল' স্পেক্‌টেটার Bengal Specieator)। মাত্র দু-বছর ছিল ওর আয়ু। তারপর দেখি সাহিত্যধর্মী দু'খানি কাগজ। একটির নাম "সুধীরঞ্জন" ও অপরটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "পাষণ্ড পীড়ন"। এই সময় হতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন লর্ড মেটকাফ।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে "রসসাগর" প্রকাশ করেন, কালে তা দৈনিকপত্রে পরিণত হয়। তদনুসরণে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শকের উদ্ভব। খুব সম্ভব এই "পরিদর্শক" পত্রিকাখানিই বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। জগমোহন তর্কালঙ্কার হতে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সকলেই পত্রিকাখানির উন্নতির সহায়তা করেছেন।

পাদরী জে, লঙ্‌ এই সময়কার বহু পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। তৎসাহায্যে রামগতি ন্যায়রত্ন বহু পত্রিকার বিবরণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু সেই তালিকার কোনটিই আজ তেমন উল্লেখনীয় নয়। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নবজীবন প্রচার, আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী, কৃষি গেজেট, বিজ্ঞান দর্শন, ভারতী, বামাবোধিনী, ভারত শ্রমজীবী প্রভৃতি বহু মাসিক প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সর্ব্বশেষে ক্রমে ক্রমে সোমপ্রকাশ, এডুকেশন্] গেজেট, সুলভ সমাচার, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, রঙ্গপুর, দিকপ্রকাশ, শ্রীহট্ট, পরিদর্শক, বিজলী, সুরভী ও পতাকা, জগদ্বাসী, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়, সহচর, চারুবার্ত্তা ধূমকেতু, বারাণসী, সুনীতি প্রভৃতি সাপ্তাহিকের উদ্ভব হয়। তার মধ্যে সবগুলি গতায়ু। যারা আছে তারা বিভিন্ন আধুনিক ধরণের সংবাদপত্রের সমধর্ম্মী হয়ে বর্ত্তমান রয়েছে। বাংলা দেশই ভারতে সংবাদপত্র প্রচলনের প্রবর্ত্তক।

লেওনার্ডো ডা ভিন্‌সী

বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

সাধারণতঃ ক্লাস নাইন থেকেই ছেলেমেয়েদের ঠিক ক'রে ফেলতে হয়—সায়েন্স্ নেবে, না, আর্ট্‌স্ নেবে। তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকও বুঝে ঠিক করেন পড়ুয়াদের কোন্ দিকে ঝোঁক এবং দক্ষতা। এ রকম বিচার করার রীতির মধ্যে একটা ভাব প্রকাশ পায় এই যে, আর্ট্‌স্ ও সায়েন্স্, দুটো যেন এমনি পৃথক যে, একজনের পক্ষে দু'দিক সামলানো যায় না।

কিন্তু লেওনার্ডো ডা ভিন্‌সী এমনি মেধাবান ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে দুই দিকেরই বহু শাখায় অসামান্য খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন। তিনি নিজ-জীবনের সাধনায় দেখিয়েছেন যে, বিদ্যার এই যে দুইটি পক্ষ, ইহারা পরস্পর-বিরোধী ত নয়ই, বরং এক অপরের সহায়-স্বরূপ। তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় রত থাকার ফলে আর্টসের অনেক শাখায় আরম্ভ করতে পেরেছেন আবার আর্টসে থেকে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে গবেষণার সুবিধা ক'রে নিয়েছেন। তাই নিজের জীবনে দেখিয়েছেন—আর্ট্‌স্ ও সায়েন্স পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরস্পর-সহায়ক।

ইটালী দেশের ফ্লোরেন্স নামক শহরের কাছে একটা পাহাড়ের চূড়ায় একদিন এক যুবক নিয়ে গেল খাঁচায় করে কতগুলো পায়রা। তারপর একটার পর একটা পায়রা ছাড়তে লাগলো, আর সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল—পায়রা চলেছে উড়ে। তার কাণ্ড দেখে লোকেরা ভাবতে লাগলো, এমন সুন্দর সোনালী রংএর ঝাঁকরাচুল ছেলেটার মাথায়—কিন্তু মাথা কি খারাপ? ওকি পাগল? না, পাগল না। যুবক লেওনার্ডো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল পায়রার উড়ে যাবার কায়দা-কৌশল, আর ভাবছিল মানুষও যদি এইরকম পাখা তৈরী ক'রে নিতে পারে, তবে তারও ওদের মতো উড়ে যাওয়া সম্ভব। পরে আকাশে উড়ে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত সফলকাম হন নি। এটা হলো পঞ্চবিংশ শতাব্দীর কথা, উড়োজাহাজ আবিষ্কারের অনেক আগে।

আবার লেওনার্ডো ছিলেন চিত্রশিল্পী। যীশুখৃষ্টকে হত্যা করবার পূর্বরাত্রে তিনি যে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শেষ বিদায়ভোজ করছিলেন তা 'লাস্ট সাপার' নামে পরিচিত। এই দৃশ্যটার এমনি এক মর্মস্পর্শী চিত্র লেওনার্ডো অংকিত ক'রে গেছেন যা জগতে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। আর একটা জগত-বিখ্যাত ছবি তিনি এঁকেছেন, নাম তার 'মোনা লিসা'। তিনি আরও অনেক ছবি এঁকেছেন তাই তিনি বিখ্যাত আর্টিস্ট্। আর বিজ্ঞান-সাধনাকালে বিজ্ঞানের বিবিধ বহু ছবি এঁকে বুঝাবার সুবিধা ক'রে দিয়েছেন।

ফ্লোরেন্স শহরের নিকটবর্ত্তী ভিন্‌সী নামক গ্রামে ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে লেওনার্ডো জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়বার সময় দেখা গেল কঠিন কঠিন অংক সে খুব সহজেই কষে ফেলতে লাগলো। আর সেই সময় ছবিও আঁকতো খুবই সুন্দর সুন্দর। শুধু তাই নয়, কাঠের কাজ, পাথরের কাজ, ধাতুর কাজ নানা রকম শিখতে লাগলো। সবেতেই তার উৎসাহ ও আগ্রহ। তারপর ষোল বছর বয়সে অ্যানড্রি ডেল ভেরোশিও নামক চিত্রকরের কাছে শিক্ষানবীশ হয়ে চিত্রশিল্পে উন্নতি করতে লাগলেন। ভেরোশিও দেখলেন ছেলেটির মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিভা সুপ্ত! তাকে জাগাতে হলে চিত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একে ভাল করে লেখাপড়া শেখানো দরকার। তাই তিনি তাকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার সাহিত্য ও দর্শন এবং অংকশাস্ত্র শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করতে উৎসাহ ও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন যাতে ক'রে সে উন্নতস্তরের শিল্পী

‘প্রবাসী’ আজও ‘প্রবাসী’

‘প্রবাসী’ চিরকালই দেশের কথা ও পল্লীর কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সকল সমস্যা-সমাধানের নিদেশক এই প্রবাসী। নিরপেক্ষ সমালোচনা সেদিন একমাত্র ‘প্রবাসী’ই করিয়াছে। সত্যরক্ষার্থে কঠিন মন্তব্য করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীকেও কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে! সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবাসী চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে।

রাজনৈতিক ফাঁদে বাঙালীর দুর্গতি আজ নূতন নয়। সেই কতবছর আগে ‘প্রবাসী’ই বলিয়াছে :

“বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মানীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাংলাদেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে ; কিন্তু বাংলাদেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে, যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহারপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত ; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া ; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া : বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, ‘ওহে, দেশের জন্য কিছু কর,’ তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, “আমাদের দেশ কোথায় ?” সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, “দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর,” তাহারাও বলিতে পারে, “কোথায় আমাদের দেশ।” প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭।”

এই দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই ‘প্রবাসী’ আজও ‘প্রবাসী’। বিদগ্ধ-সমাজে আজও প্রবাসী আদরণীয়। যদিও কালের প্রভাবে আজ মানুষের রুচি নিম্নগামী। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-অধোগতি লজ্জার কথা!

হতে পারে। এইভাবে যুবক লেওনার্দো নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

ভেরোশিওর কাছে শিক্ষাকার্য শেষ হয় তাঁর ২৬ বছর বয়সে। তখন তিনি স্বাধীনভাবে নানা বিষয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি নিজের হাতে তৈরী ক'রেন বীণার মতো আশ্চর্য একটা বাদ্যযন্ত্র, যেটা দেখতে হলো ঠিক যেন একটা ঘোড়ার মাথা। আর তার দাঁত-গুলোতে পর পর টিপে টিপে নানা সুর ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে! মিলান শহরের শাসনকর্তা ডিউক লুডোভিকো এই যন্ত্র দেখে খুবই প্রীত হয়ে লেওনার্দোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর নানা কাজে লাগিয়ে দেন। এই ডিউক লুডোভিকোর ফরমাসেই তিনি 'লাস্ট সাপার' নামে বিখ্যাত ছবিখানা অংকিত করে দিয়েছিলেন। আর, শহর যখন দারুণ প্লেগ-মহামারির দ্বারা আক্রান্ত হলো, একটা নতুন শহর নির্মাণের পরিকল্পনা সেই লেওনার্দোই করেন। তিনি যে ছিলেন বহুবিধ করিৎকর্মা। এই মিলানে থাকাকালেই তিনি শবব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা শিখতে লেগে যান। নানা ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে, তাঁরা যে যখন মড়া কাটবেন তখনই তিনি উপস্থিত থেকে সব শিখে নেবেন এই ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে শিখবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হুবহু এবং সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে ফেলতে লাগলেন। এর ফলে ডাক্তাররাও পরম প্রীত ও উপকৃত হতে লাগলেন। এই সব ছবির দ্বারা ছাত্রদের শেখানো সহজ হতে লাগলো। তার আগে ছবিদ্বারা শরীরতথ্য শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না।

এ সকলই ডিউক লিডোভিকোর আনুকূল্যে সম্ভব হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা হঠাৎ এক সময়ে ডিউক লিডোভিকোকে বন্দী ক'রে নিয়ে যান। অগত্যা লেওনার্দো তখন চলে যান ভেনিস্ শহরে এবং সেখানকার কর্তৃপক্ষকে নিজের সামরিক যন্ত্রপাতির নমুনা দেখাতে থাকেন। তখন

দেশে দেশে যুদ্ধবিগ্রহের যুগ চলেছে তাই আগ্রহের সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ লেওনার্ডোকে নানাবিধ সামরিক কাজে ও আবিষ্কারে লাগিয়ে রাখলেন। তিনি ডুবোজাহাজ ও ডুবুরীর বিশেষ সাজ-পোষাকের আবিষ্কারে মেতে গেলেন।

সেই সময় বোর্গিয়া নামে এক দুর্দান্ত যোদ্ধার উচ্চাকাঙ্খা ছিল সারা ইটালির সর্বময় কর্তা হওয়ার। তিনি কিছুকাল লেওনার্ডোকে দিয়ে যুদ্ধের সাহায্যকারী মানচিত্র আঁকাবার কাজে লাগিয়ে রাখেন। লেওনার্ডো বহু পরিশ্রম করে নিজের হাতে মাপজোক করবার পর টাস্ক্যানি ও আম্ব্রিয়া প্রদেশের মানচিত্র এঁকে দেন।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে লেওনার্ডো তাঁর দেশ ফ্লোরেন্সে ফিরে গিয়ে ছয় বছর বাস করেন। এই সময় নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে আঁকলেন তাঁর বিখ্যাত চিত্রখানি—'মোনালিসা' যার জন্যে তাঁর নাম চিত্রশিল্পী হিসাবে অমর হয়ে রইল জগতে। পরমা সুন্দরী মোনালিসার মধুময় রহস্যপূর্ণ সস্মিত বদনখানি সকলকেই মুগ্ধ করে—দৃষ্টি আর ফিরতে চায় না! ছবিখানি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরের মিউজিয়ামে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। লেওনার্ডোর সমসাময়িক আরও দুইজন চিত্রকর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের নাম র‍্যাফেল ও মাইকেলেঞ্জেলো।

এই ত হলো লেওনার্ডোর চিত্রশিল্পের খ্যাতির কথা। আর দেশটা তখন যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল বলে তাঁকে সামরিক আবিষ্কার অনেক রকম করতে হয়। রকমারি কামান, বন্দুক, রকমারি যুদ্ধ-জাহাজ, ডুবোজাহাজ, তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছিল দেশের সামরিক সংস্থার অনুরোধে বা নির্দেশে। তাছাড়া বেসামরিক সাধারণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও সঙ্গে সঙ্গে করেন অনেক। যেমন বায়ুর গতিবেগনির্দেশক যন্ত্র, গাড়ীর মিটার, জলের পাম্প ইত্যাদি বহু যন্ত্রপাতি—যা তখনো পর্যন্ত জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপে দেখা যায় তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখীন—আর্ট্স ও সায়েন্স, উভয়েরই নানা বিভাগে। এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার! তিনি আবার কবিতাও লিখতেন। চিত্রকলা সম্বন্ধে একখানি চমৎকার গ্রন্থও প্রণয়ন করে গিয়েছেন তিনি।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা দ্বাদশ লুই লেওনার্ডোকে আমন্ত্রণ ক'রে সেখানে নিয়ে যান। আবার কিছুকাল তিনি মিশর দেশে গিয়ে নানাবিধ যন্ত্রশিল্পীর কাজে মেতে যান। কাজ ছিল তাঁর নেশা। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বিবিধ বিজ্ঞানী, দার্শনিক গণিৎকার, স্থাপত্যশিল্পী, সামরিক যন্ত্রপাতির নির্মাতা ও আবিষ্কর্তা, ভাসমান জাহাজ, ও ডুবোজাহাজ নির্মাতা, উড়োজাহাজের কল্পনামুগ্ধ, শারীর তত্ত্ববিৎ ইত্যাদি। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ২রা মে তিনি পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা

অশোক সেন

মানসী—(১২৯৭)

এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল ১২৯৪ সালের বৈশাখ হইতে ১২৯৭এর কার্তিক মাস পর্যন্ত (ইংরাজী ১৮৮৭—১৮৯০)। ১৮৯০-এর আগষ্টে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান—সেইসময় রচিত চারটি কবিতা মানসীতে আছে। বাকী কবিতার বেশীরভাগই গাজীপুরে লেখা।

কবির এইসময় পূর্ণযৌবন—তাঁর প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত—সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তিনি নিজের কাব্য প্রতিভার রূপায়ণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কবি নিজেই এ কাব্যের সূচনায় লিখিয়াছেন—"গাজীপুর আগ্রা দিল্লীর সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল-হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুনপর্ব আপনি প্রকাশ পেলো। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম, আমার লেখনি হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশুর' কবিতায়, অথচ সে জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষ্যেই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। মানসীও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল' এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণমূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'।" প্রেম, প্রকৃতি এবং দেশাত্মবোধ এই তিন বিষয়ক কবিতাই মানসীতে দেখিতে পাই।

মানসীর প্রথম কবিতা 'উপহার' ১২৯৭-এর বৈশাখে লিখিত রবীন্দ্রমানসের বিভিন্ন দিক্‌গুলির প্রথম প্রস্ফুটন মানসীতে।—জগতে নানাদিকে, নানাভাবে, নানারূপে যে বৈচিত্র্যের তরঙ্গের উত্থান পতন ঘটিতেছে তাহার স্পর্শ অনুভব করিতেছেন কবি নিজের নিভৃত চিত্তের মাঝে। এখন হইতে কবি সীমার মাঝে অসীমের রূপায়ন দেখিতে পাইয়া অন্তর দিয়া তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'প্রেমের কবিতা' 'ভুলভাঙা' 'বিরহানন্দ' 'বিচ্ছেদের শান্তি' 'ক্ষণিক মিলন' ইত্যাদি।

ভুলভাঙা কবিতায় প্রণয়ের অবসানে প্রেমিকার ব্যথিত অন্তরের ব্যাকুলতা এবং হতাশার ভাবটা অতি সহজ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বিরহানন্দে প্রেমিক বিরহের সময় প্রেমিকা সম্বন্ধে আপন স্বপনলোক সৃষ্টি করিতে পারেন। আলো-ছায়া, রঙেরসে সেই বিচ্ছেদের সময়টা মায়াময় হইয়া ওঠে। কিন্তু পুনরায় মিলনের সময় নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারেন—

বিরহ সুমধুর হল দূর কেনরে ?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে গেলরে।
কই সে দেবী কই ? হের ওই একাকার.

নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর—
সকলি করে ধূ ধূ, প্রাণ শুধু শিহরে।

The real always falls short of the ideal.

"ক্ষণিক মিলন"—কবি ক্ষণিকের জন্য তাঁহার মানসীর সঙ্গে মিলনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—কিন্তু এই ক্ষণিক মিলনের অবসানের পর মানসীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনের সবকিছু আনন্দ, সব সঙ্গীত অন্তর্হিত হইয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' এ কবিমানসে লাভ অলাভ ফর্মটাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মানসীতে প্রেমিক-প্রেমিকার মনোজগতে প্রবেশ করিয়া কবি প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত সে জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকটা বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি প্রভৃতি কবিতায়, প্রেমের অবসানে উভয়ের মনে যে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

মানসীতে প্রেমিক-প্রেমিকা দেহকে ছাড়াইয়া দেহাতীতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন। সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের প্রতি ধাবিত হইবার জন্য উন্মুখ। 'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলি বিরহ, বিচ্ছেদ উদাসীনতা প্রভৃতি মনের বিভিন্ন তারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণনের সৃষ্টি করিয়া কবির শিল্প-প্রতিভার ব্যাপ্তি এবং বিকাশের পরিচয় দিতেছে। 'নিষ্ফল কামনায়' কবি বলিতেছেন—

"ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব
....
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ
মধু তার করো তুমি পান,
ভালবাসো, প্রেমে হও বন্দী,
চেয়োনা তাহারে।
আকাঙ্খার ধন নহে আত্মা মানবের।"

আবার 'সংশয়ের আবেগ'-এ লিখিতেছেন :

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম
দিব তা সকলে।
নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব ফিরে লও আঁখি,
প্রেমে দাও দ'লে।
কেন এ সংশয় ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।"

যে প্রেম প্রেমিক-যুগলকে শুধু নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখে, শুধুমাত্র একের প্রতি অন্যের আকাঙ্খার সৃষ্টি করে—সে প্রেমে শেষপর্যন্ত অবসাদ এবং ক্লান্তির সৃষ্টি করে—সে প্রেম অন্তরে শক্তি আনে না। মানবত্বের বিকাশে বাধা দেয়। যে প্রেম নরনারীকে জাগতিক ক্ষেত্রে সংসারের পথে এবং জীবনের কর্মক্ষেত্রে আসিবার জন্যে অনুপ্রেরণা দেয়, সেই প্রেমের মহত্ত্বেরই প্রতি কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন এই সব কবিতায়।

"মানসীর" অন্যান্য প্রেমের কবিতাগুলিও মোটামুটি একই ধাঁচের—নরনারীর প্রেমের সম্পর্ক সহজভাবে সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। "নারীর উক্তি'তে নারীর অভিযোগ, পুরুষ আর তাকে আগের মত অন্তর হইতে ভালবাসেন না—

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।

পুরুষ উত্তর দেয়—

"কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে
রহিলে না ধ্যান-ধারণায়"

দিনের শেষে আপনি যখন কাজ করে
খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন
এক গ্লাস টাটকা লিলি বার্লি খেলে
অনেক আরাম ও আনন্দ পাবেন
লিলি ব্র্যান্ড বার্লি
বলে চাইবেন
আধুনিক
বিজ্ঞানসম্মত
প্রণালীতে প্রস্তুত
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪
LILY
BRAND
BARLEY

অর্থাৎ নৈকট্যে উভয়ের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মানসীর প্রেমের কবিতাগুলি যে খুব রসঘন হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে একথা মনে হয় না। 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটি এ বিষয়ে একটি ব্যতিরেক। কবি এখানে জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই ধরণের সমালোচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আমার কিন্তু মনে হয় ইহার অর্থ অন্যরূপ—প্রেমিক প্রেমাস্পদকে এমন গভীরভাবে ভালবাসেন যে তাঁহার মনে হয় এ প্রেমের আদি-অন্ত নাই—ইহাই চিরকালের, ইহা অনন্তপ্রেম। তাই তিনি বলেন—"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি ইত্যাদি। এই "যেন" কথাটিই এ কবিতার রহস্য উদ্ঘাটনের মূল চাবিকাঠি।" প্রেমের আবেগে অভিভূত পুরুষ প্রিয়ার কাছে তাঁদের আত্মিক সম্পর্কে একটা আধ্যাত্মিক স্তরে উঠাইয়া নিবেন, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। জন্মান্তরবাদের তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবাবেগের গভীরতার দিকটাই মনকে বেশী স্পর্শ করে।

"ধ্যান" কবিতাটিতে ঐশ্বরিক প্রেমের বর্ণনা—প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের মধ্যে এই ঐশ্বরিক বিরাটত্বের সন্ধান পাইতে পারেন। অন্তরের গভীর আত্মিক সংযোগের ফলেই মানুষ এই অনুভূতির অধিকারী হয়—ইহাও এক ধরণের সীমার ভিতর দিয়া অসীমের উপলব্ধি।

বাঙ্গালী সমাজ ও দেশবিষয়ক কবিতা

'দুরন্ত আশা,' 'দেশের উন্নতি,' 'বঙ্গবীর' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর। আমাদের জীবনযাত্রার দোষ-ত্রুটি, ধীর মন্থর গতি, মিথ্যা আড়ম্বর, ভীরুতা, ভীরুক-বৃত্তি, আলস্য ইত্যাদি লইয়া কবি তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন। এইসব কবিতায় ব্যঙ্গের প্রাধান্যটাই বেশী। স্বদেশ-প্রেমের গভীরতা তেমনভাবে মানসীর কবিতায় ফুটিয়া ওঠে নাই। "দুরন্ত আশা" কবিতাটি অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের। এ কবিতায় প্যাসন আছে, অনুভূতির তীব্র আবেগ আছে, দুঃখ, কষ্ট, বিপদকে 'অগ্রাহ্য' করিয়া বৃহত্তর জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবার বাসনা আছে। তথাকথিত শান্ত, ভদ্র নির্জীব, ক্লিষ্টগতি না হইয়া, বিকট উল্লাসে জীবন-উচ্ছ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িবার তীব্র আকাঙ্খায় কবিহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও মানসীর দেশপ্রেমের কবিতায় স্বাদেশিকতার সঙ্গে কবির আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই—বোধহয় মরমী মনোভাব এবং দরদী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই এমনটা ঘটিয়াছে।

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

আত্মপরিচয় বইটিতে রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখিয়াছেন—"একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌তো, শরতের আলো পড়তো, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো, আমি কত দূর-দূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকতো, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে-শিকড়ে, শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"

এই উদ্ধৃতিটি থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যাইবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি এবং মানুষের সম্পর্কে একটা নাড়ীর যোগ অনুভব করিতেন। এই ধরণের তীব্র অনুভূতির আবেগেই "অহল্যার প্রতি" শ্রেণীর কবিতা রচিত হইয়াছিল। ছন্দ-ধ্বনি—ছবি, শব্দসম্পদ, ভাবানুভূতি কোনকিছুরই অভাব নাই এই সব নৈসর্গিক কবিতাগুলির মধ্যে। মানুষও প্রকৃতির অন্তর্গত।

জনসাধারণের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে

যোগ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন

ভারত সরকার এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু করেছেন। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিতে ফাণ্ডের চাঁদা জমা নেওয়া হয়।

চাঁদা জমা দেওয়ার পদ্ধতি

বার্ষিক নিম্নতম ১০০ টাকা এবং উচ্চতম ১৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যায়। ৫ টাকার গুণিতকে যত টাকা খুসী, যে কোন সংখ্যক কিস্তিতে, যে কোন সময়ে জমা দেওয়া যেতে পারে। তবে মাসে একটার বেশী কিস্তি জমা দেওয়া যাবেনা। বর্ত্তমান বছরে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তার ওপর শতকরা ৪.৮ টাকা সুদ দেওয়া হবে।

করে রেহাই

আয়কর আইন অনুযায়ী, করযোগ্য আয়ের ওপর যে সব রেহাই পাওয়া যায়, এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তাতেও সেই রকম রেহাই পাওয়া যাবে। সুদের ওপর কোন আয়কর নেওয়া হবেনা। এই ফাণ্ডে যে টাকা জমা থাকবে তার ওপর সম্পদ কর নেওয়া হবেনা।

জমা টাকা ওঠানো এবং ঋণ নেওয়া

১৫ বছর পর, ফাণ্ডে জমা সম্পূর্ণ টাকা ওঠানো যাবে। ঐ সময়ের মধ্যে জমাকারীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ টাকা প্রত্যর্পণ করা হবে। এই ফাণ্ডে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ ওঠানো যাবে বা ঋণ হিসেবে নেওয়া যাবে।

ক্রোক করা যাবেনা

এই ফাণ্ডে যে টাকা জমা থাকবে, কোন আদালতের নির্দ্দেশে তা ক্রোক করা যাবেনা।

চিকিৎসক, আইনজীবী, অভিনেতা এবং ব্যবসায়ীর মতো স্বাধীন বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এমন কি পেন্সনভোগীগণও এখন স্বেচ্ছায় একটা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের মাধ্যমে সঞ্চয় করার সুযোগ পাবেন এবং এতে করেও যথেষ্ট রেহাই পাওয়া যাবে।
আরও বিবরণের জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জনসাধারণের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড

জনগণের কাছে একটি বর স্বরূপ

অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার

davp 68/185

"বধূ"-কবিতাটিতে কবি গ্রাম্য প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য হইতে বিচ্যুত একটি বালিকা বধূরূপে যখন মানুষের সৃষ্ট শহরে বাস করিতে আসিল, তখন তাহার নির্মল পবিত্র অন্তর যেভাবে বেদনার্ত হইয়া উঠিল, তাহার একটি বিষাদপূর্ণ করুণছবি আঁকিয়াছেন। এ যেন গোলাপবাগ হইতে ফুলটি তুলিয়া আনিয়া মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ফুলের ষ্টল-এ রাখা হইয়াছে—পরশ করে সবে, করে না স্নেহ।

মানসীর বেশীরভাগ প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা বর্ষা সম্বন্ধীয়। 'কুহুধ্বনি' বসন্তের কবিতা। অহল্যার প্রতি কবিতায় প্রকৃতি এবং মানুষের নিবিড় দৈহিক এবং আত্মিক সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। মেঘদূত কবিতায় কবি পূর্বসূরী কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন এবং মেঘদূতের কাব্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে নতুনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে। রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারাই জানেন কালিদাসের মেঘদূত তাঁহার কত প্রিয় ছিল।

সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন : শ্রীবাণী চক্রবর্ত্তী এম, এ, ১১, কালীকুমার ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-২। মূল্য ৭৺৫০।

রঘুনন্দন ছিলেন সমাজসংস্কারক। অবশ্য একথা বলিলে তাঁর সম্বন্ধে সব বলা হয় না। তিনি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব সমাজকে বিশেষ নাড়া দিয়াছিল। কারণ তাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিত না। তাহার উপর মুসলমান শাসনে ও অত্যাচারে হিন্দু-ধর্ম প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। এইসময় বল্লালসেনের কঠোরহস্ত অনেকখানি কাজ করিয়াছিল। আচারভ্রষ্ট হিন্দুদের রক্ষাকল্পে তিনি সমাজে কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্তন করেন।

এই গ্রন্থের একস্থানে দেখিতে পাই, "রঘুনন্দনের সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তান্ত্রিকধর্মের প্রচার ও প্রসার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার বৈষ্ণব-ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবোক্ত প্রেমধর্মের প্লাবনে জনগণ ও বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই তন্ত্র ও বৈষ্ণবধর্মের প্লাবনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিপর্যস্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত তন্ত্র ও বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচণ্ড সজ্ঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকার ধর্মের সজ্ঘাত হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রঘুনন্দন নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

বলাবাহুল্য তাঁর সেই অতুলনীয় প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে ও কালোপযোগী-সমাজ-ব্যবস্থার দেশ ও ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে অনেক নিন্দা শুনিতে হইয়াছে। একথা ভুলিলে চলিবে না, একটা পরিবর্তন আনিতে হইলে কঠোর হইতেই হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বহু বিষয় লইয়া আলোচিত হইয়াছে, সে সবের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া তিনি 'হিন্দু-ল' সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বিধান করিয়া যে বিধি-নিষেধ তিনি বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে সময় ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল, ইহার জন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা যায় না। গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই, "সমাজে রঘুনন্দনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাঁহার প্রচারিত সমাজ-ব্যবস্থা অদ্যাবধি জনগণ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে। বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তিনি সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে এবং দেশ ও সমাজকে বিভিন্ন উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছে। দেশের নিদারুণ সঙ্কটকালে তাঁহার শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থা ধর্মকে তথা দেশকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তিনি বঙ্গদেশে উজ্জ্বলতম রত্নরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন।"

রঘুনন্দন সম্বন্ধে ইহাই বড় কথা। এরূপ গ্রন্থের পরিচয় পূর্বে আমরা পাই নাই। গ্রন্থকর্ত্রী এই গ্রন্থ রচনায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। নানা বিষয়ে নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীও প্রশংসনীয়। এরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
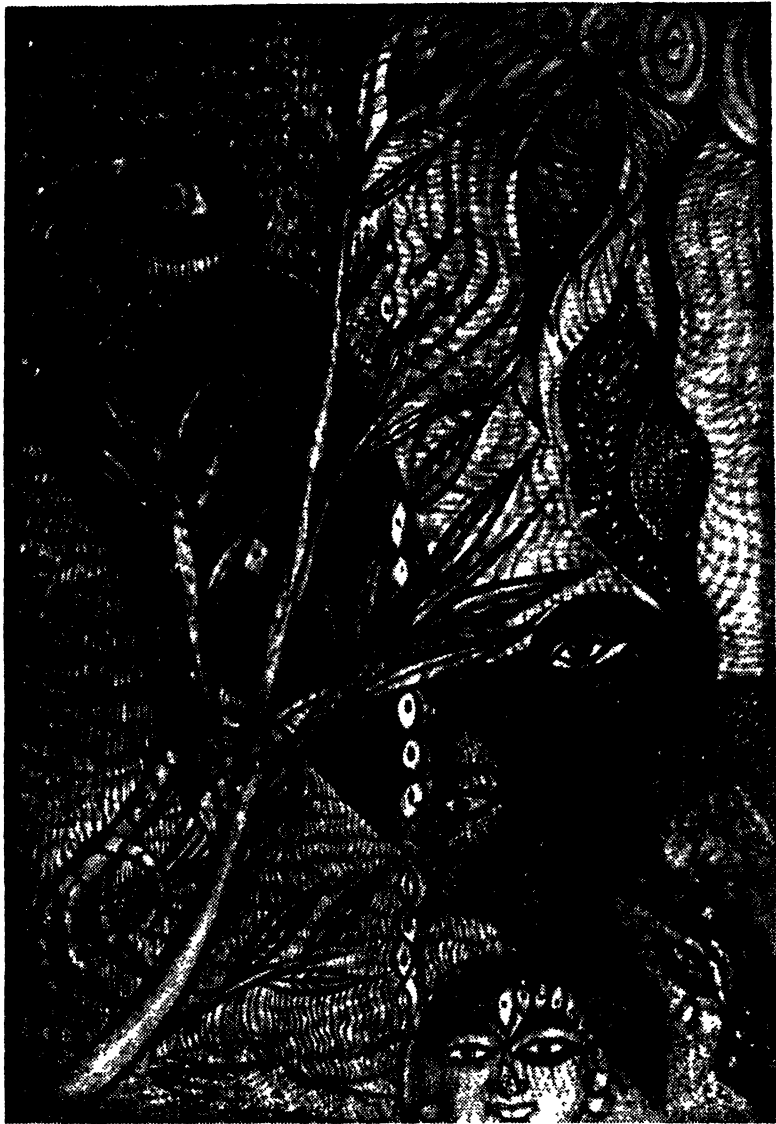
স্রোতাস্বনী

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৭৫

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত অধিকার

সাধারণতন্ত্রে মানুষকে যে সকল অধিকার দেওয়া হয় সে সকল অধিকারের মূলে কতকগুলি আদর্শ আছে, যেগুলিকে সংরক্ষণ করিয়া ও যেগুলির বিপরীত কিছু না করিয়া ঐ অধিকার উপভোগ করিতে হয়। সাধারণতন্ত্রের মূলত প্রধান আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইল সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্ব্বাধিক সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা। এই সুখ সুবিধা স্বভাবতই শুধু বাস্তব উপকরণ দিয়া উৎপন্ন হয় না। অবাস্তব মানসিক অবস্থাজাত সুখ সুবিধা যথা স্বাধীন এবং উৎকট নিয়মাধীনতা বর্জ্জিত জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে মুক্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাহাতে বাস করিবার যে প্রাণবান আনন্দ তাহা সকল সুখ সুবিধার সারবস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। খাদ্য, বাসস্থান,পরিধান বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিয়মানুযায়ীভাবে চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকিলেই মানবাত্মার অন্তর সুখময় হয় না। নিজের ইচ্ছামত খাওয়া, থাকা, কার্য্য করা, ভ্রমণ করা প্রভৃতি বহুভাবে মানুষ স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করে। এই স্বাধীনতা সকল সময়ে পূর্ণভাবে পাওয়া সম্ভব হয় না; কিন্তু যথাসম্ভব অধিকভাবে পাইবার পথে অযথা নিয়মের বাধা সৃষ্টি করিয়া অনেকে রাষ্ট্রকে অতি-নিয়ন্ত্রণ দোষদুষ্ট করিয়া ফেলেন। সেই দোষ যাহাতে না জন্মায় তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা সাধারণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। নিজ ইচ্ছামত চলিয়া যেখানে মানুষ অপরের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে সেখানে সেইরূপ ইচ্ছার কার্য্যে অভিব্যক্তি সাধারণতন্ত্রে গ্রাহ্য হয় না; কিন্তু রাষ্ট্রের নেতাদিগের ইচ্ছা সর্ব্বত্র প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিয়া যদি সকল মানবের জীবনযাত্রার অঙ্গে অঙ্গে রাষ্ট্রের নিয়ম প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তখন সকল মানবের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইতেছে স্বীকার করিতে হয়। উদ্দাম, অসংযত ও অন্যায়ভাবে মানুষ যদি নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে বহুক্ষেত্রে সেইরূপ কার্য্য আইনগ্রাহ্য হইবে না, নীতি বিরুদ্ধ ও মানবতার আদর্শের বিপরীতও হইবে। কিন্তু সেইরূপ

স্বৈরাচার নিবারণ করিবার জন্য মানুষকে পদে পদে নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। নিয়ন্ত্রণাধিক্য ও যথেচ্ছাচারের পথ অতি উন্মুক্ত রাখার কোনটিই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা নহে। উভয়ের মধ্যে এমন একটা পথ আছে যাহা ধরিয়া চলিলে মানুষের স্বাধীনতা ও সমাজের নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা দুইই সেইরূপ ওজন করিয়া রক্ষিত হয় যাহাতে সর্ব্বাধিক লোকের সুখ সুবিধা অধিকতরভাবে আরব্ধ ও আদৃত হয়। অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রের আদর্শ হইল মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা যথাসম্ভব পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা এবং সেই ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা যে যে স্থলে ও কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত না করিলে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, সেই সেই স্থলে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া সকল মানবের সুখ সুবিধার শ্রেষ্ঠতম আয়োজন করা। ব্যক্তিত্ব ও জনহিত সাধনা উভয়েরই যথাযথ ও পূর্ণতম ব্যবস্থা সাধারণতন্ত্রের আদর্শ। সুতরাং যদি কেহ অঙ্ক কষিয়া স্থির করেন যে সকল মানুষকে কি ভাবে ও কোন পথে চালাইলে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বৈজ্ঞানিক মাপ কাঠিতে সর্ব্বাধিক পরিমাণে জাগ্রত হইবে তাহা হইলে সে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য অঙ্কে প্রমাণ হইলেও বস্তুত কোন মানুষের প্রাণেই না থাকিতে পারে। যে যে-কাজ করিতে চাহে সে যদি অঙ্কের নির্দ্দেশে অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হয়; যে যে-স্থলে বাস করিতে চাহে তাহাকে যদি অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য করা হয় এবং যে যে-প্রকার জীবনযাত্রা চাহে তাহার জীবনযাত্রা যদি অপর প্রকার স্থির করা হয়; তাহা হইলে নিয়মের প্রবাহ প্রবল ধারায় বহমান হইলেও মানব জীবনের আনন্দ কোন মানবের প্রাণেই দেখা যাইবে না। নিয়ম শুধু ততটাই চলিতে পারে যাহাতে জীবনে কোন আড়ষ্টতা না দেখা দেয়। ভোগ্য-বস্তুর ভাগবাট নির্ণয় করিলেই অঙ্কের অনুপাতে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হইবে একথা যে বলে তাহার মানব মনের প্রকৃতরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। কারণ দুইজন মানুষকে সমান ভোগ্যবস্তু দিলে উভয়ের মনে সমানভাবে সুখ ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি ঘটিবে না একথা সকলেই জানে। দেহের অভাবও সকলের সমান হয় না। কাহারও ক্ষুধা অধিক, কাহারও বস্ত্র বৃহত্তর প্রয়োজন হয়। কেহ আসবাব অধিক চাহে, কেহ চাহে না। কেহ অল্প খাইয়া দর্শন বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে চাহে, কেহ অধিক খাইয়া ফুটবল খেলিতে ইচ্ছুক। কাহারও পাঠে মন আছে কাহারও চিত্রাঙ্কন অথবা সঙ্গীত পছন্দ, কেহ চাহে অল্প শ্রমের কার্য্য কেহ পরিশ্রমে অকাতর। পৃথিবীতে শত শত কোটি মানুষের বাস। তাহাদিগকে ছাঁচে ঢালিয়া এক প্রকার দেহমনের রূপ দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রভেদ মানুষের প্রকৃতিগত ও সেই ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষের জীবনযাত্রা নির্দ্ধারণ চলে না। মানুষের নিজের ইচ্ছা, কার্য্য ও সম্ভোগস্পৃহা বিচিত্র ও সদা-পরিবর্ত্তনশীল। মানব সভ্যতার গতি ও ধারা ঐ বৈচিত্র্যজাত। মানুষ যদি মনে প্রাণে দেহে শক্তিতে ছাঁচে ঢালাভাবে এক রকম হইত তাহা হইলে কোন উন্নতি কখন সম্ভব হইত না। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি কোন নির্দ্দেশ অনুসারে গঠিত হয় না। নিয়ন্ত্রণ ও সংযমন সীমাবদ্ধ ও সেই সীমার অতিরিক্ত কিছু নিয়ম করিয়া করা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি মানুষকে আদেশ বা হুকুমের চাপে নবরূপ দান করিবার আশা করেন। কিন্তু মানুষ কোন প্রকার চাপেই শেষ পর্য্যন্ত নিজ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করে না। এই দিক দিয়া দেখিলে সাধারণতন্ত্রের যে মুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহারের আদর্শ; তাহা অন্য জাতীয় রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের তুলনায় অধিক মানব প্রকৃতি সঙ্গত ও সামাজিক উন্নতির সহায়। কিন্তু মানবসমাজের অধিকাংশ লোক নিজ ইচ্ছার সম্যক ব্যবহারে অক্ষম ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলে যদি অভাব মোচন হয় তাহা হইলে নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোক নিজ ইচ্ছার উপযুক্ত ব্যবহারে সক্ষম ও সেই সকল মানুষ যদি সুনীতি অনুগত পথে চলিয়া নিজেদের ও অপরের মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহা হইলে মানবজাতির উন্নতির ও অধিকতম সুখ সুবিধা প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য রাষ্ট্রনীতি যেভাবে গঠিত ও চালিত তাহাতে যেসকল ব্যক্তি সাধারণতন্ত্র কিম্বা

অপর জাতীয় তত্ত্বে শক্তিমান হইয়া থাকেন তাহাতে সুপরিণত রাষ্ট্রগুলিতে মানুষের সুখ সুবিধা ও মানবতা সংরক্ষিত হয় এবং অপরিণত রাষ্ট্রগুলিতে তাহা হয় না। ইহার কারণ, যে অপরিণত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রয়াসী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিগণও যেরূপ দুর্নীতির আশ্রয়ে থাকিয়া শুধু নিজেদের লাভের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকেন; রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের নেতাগণও সেইরূপ শুধু নিজেদের শক্তি ও সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন ও জনসাধারণের মঙ্গলে অথবা তাহাদিগের শিক্ষাতে যত্নবান থাকেন না। অপরিণত রাষ্ট্রের মানুষ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সুনীতির অভাবে অকল্যাণের গভীরে নিক্ষিপ্ত; এবং যতদিন না ঐ সকল রাষ্ট্রের বিশিষ্ট মানুষদের প্রাণে নীতিবোধ জাগ্রত হয় ততদিন স্বাধীনভাবে সাধারণের হিতকর কার্য্য ঐ সকল রাষ্ট্রে করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশেও জনহিতকর কিছু বিশেষ অনুষ্ঠিত হইবে না; কারণ সেক্ষেত্রেও নেতাদিগের মধ্যে নীতিবোধ প্রদীপ্ত নহে।

অতএব এই যে নূতন নির্ব্বাচন চেষ্টা ভারতের নানা স্থানে চলিতেছে, সেই চেষ্টার ফল কি হইবে তাহার আলোচনা করিলে ইহাই প্রকটভাবে ব্যক্ত হইবে যে অদ্যাবধি নির্ব্বাচন করিয়া যেরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাওয়া গিয়াছে, এখনও সেইরূপ প্রতিনিধিই পাওয়া যাইবে। সুতরাং আদর্শ সাধারণতন্ত্রের যে জনহিতের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের সাধারণতন্ত্রে তাহা বলবৎ হইবে বলিয়া কোন আশা করা যায় না। ভারত যদি রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদিগের নির্দ্দেশে না চলিয়া ক্ষুদ্রদলের আদেশেই শাসিত হইত তাহা হইলেও কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা লাভ হইত না। কারণ, রাষ্ট্রীয় দলগুলিও নিজেদের শক্তি ও সুবিধার সন্ধানেই ঘুরিতে থাকিত; জনসাধারণের হিত কিসে হইবে, সে চিন্তা তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিত না। এক কথায় রাষ্ট্র কোন আদর্শে বা উদ্দেশ্যে চালিত হইবে তাহা অপেক্ষা বড় কথা হইল, রাষ্ট্র কাহার দ্বারা চালিত ও শাসিত হইবে। যে সকল ব্যক্তির কর্ম্মক্ষমতা ও বুদ্ধি অধিক তাহাদিগের নীতিবোধ কতটা অন্তরে সুনিবিষ্ট; সেই কথার উপরেই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধা ও কল্যাণ নির্ভর করে। অন্যায়, শোষণ ও অধর্ম্মের প্রতি যদি জননেতাদিগের ঘৃণা না থাকে এবং স্বার্থান্বেষণই যদি তাহাদিগের প্রাণের আগ্রহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সেইরূপ নেতাদিগের নেতৃত্ব জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে সক্ষম কখনও হইতে পারিবে না। আমরা সর্ব্বদাই এই বলিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিই যে আমরা অল্পশিক্ষিত এবং মানুষের কথায় সহজেই বিশ্বাস করিয়া যাহাকে তাহাকে ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ফেলি। কিন্তু কথাটা কি সত্য? আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত ও সরল অন্তঃকরণে সকল লোকের সকল কথায় বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও ভোট দিবার সময় জানিয়া শুনিয়া স্বার্থান্বেষী চতুর দলপতিদিগের কথায় যাহাকে বলা হয় তাহাকেই ভোট দিয়া থাকেন। ভাবেন একটা মহা কূটবুদ্ধির কাজ করিলেন; কিন্তু বস্তুত ঐরূপ চাতুর্য্য দেখাইয়া নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিলেন। কোন বুদ্ধিমান জনহিতকামী ব্যক্তির কখন উচিত নহে যাহাকে তাহাকে পরের কথায় ভোট দেওয়া। এই নির্ব্বাচনে যদি কিছু সংখ্যকও দেশহিতৈষী লোক প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্রকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহা হইলে হয়ত, দেশের ভবিষ্যত কিছুটা উন্নতির দিকে যাইতে পারে, ইহা সম্ভব হইবে যদি জ্ঞানপাপীরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে ভোটের ব্যবহার না করেন ও উপযুক্ত লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সাধারণতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই নহে যে ভোটের সাহায্যে দেশের পরিচালনা, গঠন ও উন্নতির ভার যাহার তাহার হস্তে তুলিয়া দেওয়া; এবং ইহা জানিয়া তুলিয়া দেওয়া যে সেই সকল লোক কখনও স্বার্থ ভুলিয়া দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন না।

পাকিস্থানের রুশিয়ায় অস্ত্র সংগ্রহ

বিদেশীর নিকট বিনামূল্যে, অল্পমূল্যে কিম্বা ধারে অস্ত্র আহরণ করা সর্ব্বদাই সন্দেহজনক উপায় বলিয়া প্রখ্যাত। বহুকাল পূর্ব্বে, সম্ভবত প্রায় কুড়ি বৎসর

হইল, আরব দেশগুলি, বিশেষ করিয়া মিশর, বৃটেনের নিকট সস্তায় হাওয়াই জাহাজ ক্রয় করিয়াছিল। হঠাৎ একটা যুদ্ধ লাগিয়া গেল ইহুদিদিগের সহিত। ইহুদিরা উপযুক্ত মূল্যে উপযুক্ত বিমান ক্রয় করিয়াছিল। আকাশ-যুদ্ধের প্রথম দিন প্রাতে মিশরের সমস্ত হাওয়াই নৌবহর ভূপতিত হইয়া শেষ হইয়া গেল। শুনা যায় বৃটেন সস্তায় তিন অবস্থা রীতি অনুযায়ী কারবার করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যত বস্তা পচা মাল মিশরকে অতি সুবিধাদরে ও ব্যবস্থায় বিক্রয় করিয়াছিল। ইহার পরে এক সময় নগদমূল্যে কেনা হাতিয়ার লইয়া মিশর বৃটেন ও ফ্রান্সকে হুমকি দিয়া মতলব হাসিল করিয়াছিল। কিন্তু আরো পরে, মিশর পুনরায় সুবিধায় কারবার করিয়া রুশিয়ার দেওয়া অস্ত্র লইয়া ইসরেলের সহিত যুদ্ধে নামিয়া তিন দিনের মধ্যে হারিয়া বেইজ্জত হইল। মিশরের এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই শিক্ষা করা যায় যে অস্ত্র আহরণ সহজ সাধ্য হইলে সে অস্ত্রে সচরাচর যুদ্ধ জয় করা যায় না। পাকিস্থান আমেরিকার নিকট অতি সুবিধার ব্যবস্থায় বহু ট্যাঙ্ক, বিমান প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া স্পর্দ্ধার উচ্চশিখরে বসিয়া চোখ রাঙাইয়া পরস্বলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইত। হঠাৎ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলায় ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভারতের অস্ত্র উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করা ও নিজ কারখানায় উৎপন্ন মাল ছিল। সেই কারণে কার্য্যক্ষেত্রে আমেরিকার অস্ত্র অতি উচ্চস্তরের হইলেও ভারতের সাধারণ অস্ত্রের সমকক্ষ হইল না এবং পাকিস্থান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আমেরিকা ও নিজের মুখে চুনকালি লাগাইয়া লোক হাসাইল। কিন্তু পাকিস্থানের ইহাতে শিক্ষা হইল না। পাকিস্থান অতঃপর চীনের নিকট অস্ত্র ভিক্ষা করিয়া এবং আমেরিকার পাঁচ হাতঘোরা পুরাতন অস্ত্র মিথ্যার আশ্রয়ে আহরণ করিয়া আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সম্প্রতি পাকিস্থান রুশিয়ায় নিজ প্রধান সেনাপতিকে পাঠাইয়া অস্ত্র সংগ্রহ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। যথাযথমূল্যে ক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে অত তোড়-জোড় করিবার আবশ্যক হইত না। সেইজন্য বোধ হয় উচিত মূল্য না দিয়া খাতির জমাইয়া অস্ত্র সংগ্রহ করা হইতেছে। রুশিয়া ভারতকেও অস্ত্র বিক্রয় করিয়াছে এবং পাকিস্থানকেও অস্ত্র বিক্রয় না করিবার কোন হেতু নাই। শুধু কথা এই যে রুশিয়ার সহিত কারবার যদি ধারের অথবা সস্তার হয় তাহা হইলে পাকিস্থানের অসুবিধা হইতে পারে। আর একটা কথা হইল পৃথিবীর সামরিক পরিস্থিতির কথা। যে সকল মুসলমান জাতি অধিকৃত দেশগুলি রুশিয়া ও চীনের সাম্রাজ্যের (?) অন্তর্গত সেইগুলির সামরিক অবস্থা পূর্ব্বাপর একভাবে রাখিতে হইলে চীন ও রুশিয়া উভয় দেশেরই পাকিস্থান লইয়া অল্প বিস্তর মাথা ঘামাইতে হয়; কারণ পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কাশ্মীরের কিয়দংশ দখল করিয়া ঐ সকল চৈনিক ও রুশিয়ান তুর্কস্থানের অতি নিকটে অবস্থিতি লাভ করিয়াছে। জলপথে ঐ সকল দেশে না চীন যাইতে পারে, না রুশিয়া। কিন্তু পাকিস্থানের সহায়তা লাভ করিলে করাচিতে আসিয়া সেখান হইতে পাকিস্থান অধিকৃত কাশ্মীরের ভিতর দিয়া চীনাগণ ঐ সকল স্থানে যাইতে পারে। রুশিয়া ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজনে ঐ সকল দিকে করাচি হইতে যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে পারে। পাকিস্থানের অবস্থিতি তাহা হইলে অন্যায়ভাবে কাশ্মীরের উত্তরাংশ দখল করিয়া সমরকৌশল সংক্রান্ত বৈশিষ্ট লাভ করিয়াছে এবং সেই কারণে প্রথমতঃ চীন ও পরে রুশিয়া পাক-সখ্যলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কুটনীতির সহিত সুনীতির দ্বন্দ্বে সর্ব্বদাই কুটনীতি জয়লাভ করে এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই হইতেছে। পাকিস্থানের সৃষ্টিও ঐ কুটনীতি হইতেই হইয়াছিল। কারণ ভারত মহাসাগরে যদি শুধু ভারতই এক মহাশক্তিশালী সামরিক রাষ্ট্র হইত তাহা হইলে আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি জাতির কিছু অসুবিধা হইতে পারিত। এইজন্য ভারত স্বাধীন হইবার সময় হইতেই ভারত বিভাগ করিবার সামরিক প্রয়োজনীয়তা সমরপিপাসু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনুভূত হয়। ভারত-বিভাগের ও পাকিস্থানকে কাশ্মীরে থাকিতে দেওয়ার ইচ্ছা বৃটেন ও আমেরিকার মনে এই কারণেই

জাগ্রত হয়। এখন যে পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিবার আয়োজন চলিতেছে ইহার মূলে রহিয়াছে পাকিস্থানের ভারত বিদ্বেষ ও অপরাপর জাতির সেই বিদ্বেষ চির-জাগ্রত রাখিয়া পাকিস্থানকে নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার পূর্ণরূপ কেহ এখনও দেখে নাই; কারণ এমন কোন আন্তর্জাতিক অবস্থার এখনও উদয় হয় নাই যাহার ফল চীন, রুশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেন প্রভৃতি জাতির এশিয়ার এই অঞ্চলের কুটনীতিগত চাল উন্মুক্তভাবে ব্যক্ত হইবে। তবে একটা কথা বেশ বুঝা যাইতেছে, তাহা হইল পাকিস্থানের ভারত বিদ্বেষের কেন্দ্র কাশ্মীর যতদিন ভারতের অধিকারে থাকিবে ততদিন কাশ্মীর এলাকার ক্রমাগতই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। ভারতকে তাহা হইলে হিমালয়ে যুদ্ধের জন্য চির প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং কোন সময়েই সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিতে ঢিলা দেওয়া চলিবে না। যে ক্ষেত্রে সামরিক মালমশলা বাহির হইতে আমদানি করিতে হইলে রুশ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নিকট যাইতে হয় এবং যেক্ষেত্রে ঐ সকল দেশের নেতাগণ কুটনীতিগত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চিরতৎপর, সে ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বাহির হইতে অস্ত্র আমদানির কথা ভুলিয়া নিজ দেশে অস্ত্র নির্ম্মাণ করা অতি প্রয়োজনীয়। এই সূত্রে একথাও মনে রাখা আবশ্যক যে অস্ত্র বলিতে আনবিক অস্ত্রও বুঝিতে হইবে এবং আনবিক আক্রমণ রোধ করিবার আয়োজন আক্রমণের অস্ত্র সংগ্রহ অপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। ভারতের শ্রমশক্তি তাহার একমাত্র নিজ হস্তগত ঐশ্বর্য্য। তাহা কি করিয়া পূর্ণতরভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে ও সেই ঐশ্বর্য্য ব্যবহারে কি করিয়া ভারতের নিজ রাষ্ট্র শত্রুর আক্রমণ মুক্ত রাখা যাইতে পারে সেই সকল কথাই এখন বিশেষ করিয়া বিচার্য্য।

বাংলায় বন্যা

আমাদের কি রকম একটা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে অনেকগুলি বাঁধ দিয়া দামোদর, বরাকর, কংসাবতী প্রভৃতি নদীগুলিকে বাঁধিয়া আমাদের দেশে আর যাহাতে বন্যা না হয়, ভারতের পরিকল্পনাবিদগণ সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি বর্ষার প্রবল জলধারা পড়িতে আরম্ভ করিলেই দেশের নানান অঞ্চল প্রতি বৎসরই বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। গরীব গ্রামবাসীদিগের গৃহ-সম্পদ, গোধন প্রভৃতি নষ্ট হইতেছে, চাষের ফসল জলে ডুবিয়া পচিয়া যাইতেছে এবং অনেক-ক্ষেত্রে যথাযথ সাহায্য না পাইলে মানুষেরও প্রাণহানি ঘটিতেছে। অর্থাৎ বহু সহস্র কোটিপ্রমাণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া আমেরিকান নকসায় বর্ষার জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়া বন্যা নিরোধ কার্য্য বিশেষ সফল হয় নাই। প্রাচীন কালে আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে বর্ষার জল ধরিয়া রাখার জন্য বৃহৎ বৃহৎ বাঁধ দিয়া গঠিত জলাশয় নির্ম্মাণ করা হইত। এই সকল জলাশয়গুলির কোন কোনটি আকারে কয়েক বর্গমাইল পর্য্যন্ত হইত, এবং কোথাও কোথাও বর্ষাস্ফীত নদীর জলও খাল দিয়া বহাইয়া আনিয়া বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়ে রক্ষিত হইত। প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজ্যে এইভাবে নদীর বন্যার জল বিরাটাকার বাঁধে রক্ষা করা হইত। নদী হইতে বাঁধে ও এক বাঁধ হইতে অপর বাঁধে, জল যাইবার, জল-রোধের দরজা দেওয়া খাল কাটা হইত, ও এই উপায়ে নদীর জল বর্ষার সময় বহু দূরের বাঁধে পৌঁছাইত ও বর্ষার পরে সেই জল চাষের জন্য ব্যবহৃত হইত। এই ব্যবস্থাতে কোন নদী ১৫০ মাইল পথ বাহিয়া চলিলে ও তাহার দুই পাশে ৩০ মাইল অবধি স্থান থাকিলে ৫০।৬০টি বাঁধ গঠন করিয়া ঐ নদীর অতিরিক্ত বর্ষার জল সেই সকল জলাশয়ে সহজেই রাখা যাইত। কোন বাঁধের জল উপচিয়া বাহিরে যাইলে তাহার পরিমাণ কখনও মারাত্মক হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় নদীর গতি পূর্ণ অবরোধ করিয়া ৫০।৬০টি বাঁধের মত জল একস্থানে জমা করিয়া যে সুবিশাল হ্রদ গঠন করা হয়; তাহার জল ছাড়িতে হইলে তাহাতেই বন্যার কারণ উৎপন্ন হয়। নদীর জল পুনরায় নদীতেই পড়িয়া বর্ষার স্ফীতি বহুগুণ বাড়াইয়া দিয়া বন্যার প্রাবল্য আরই বাড়াইয়া দেয়। পুরাতন ব্যবস্থায় নদীর অতিরিক্ত জল দূরে দূরে ছড়াইয়া

থাকায় তাহার পরিমাণ ও তোড় দুইই কমিয়া থাকিত। আমাদের দেশে যে ভাবে বর্ষা নামে তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক জল নদীর পথে বহিয়া যায়। এই কারণেই ঐ জলধারাকে নানান পথে বহু সংখ্যক বাঁধে লইয়া যাইলে তাহার ক্ষতি করিবার শক্তি কমিয়া যাইত। এখনকার আমেরিকান ব্যবস্থাতে নদীর গতি বন্ধ করিয়া সকল জল এক জায়গায় জমা করিয়া বিপদের সম্ভাবনা বাড়ান হয়।

বন্যার তোড় কমাইতে হইলে ও জল উপযুক্ত ক্ষেত্রে জমা রাখিতে হইলে, তাহা হইলে বর্ত্তমান পরিকল্পনা কার্য্যকর নহে। নদী যেমন অগ্রসর হয় তাহার জল তেমনি একের পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে এ বাঁধ হইতে আর এক বাঁধ করিয়া দূর হইতে আরও দূরে লইয়া যাওয়া হইত। ইহাই পুরাতন ব্যবস্থা ছিল ও ইহাতে একস্থলে কোন অতি বৃহৎ জলাশয় গঠিত হইত না। বহুস্থলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকার জলাশয় গঠিত হইলে জলের ব্যবহারও ভাল করিয়া হইতে পারে এবং তাহা হইতে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। আমাদিগের দেশে প্রায়ই যেরূপ বর্ষা হয় তাহাতে যতটা জল মেঘ হইতে নিঃসৃত হয় তাহার সমস্তটাই বাঁধ দিয়া এক স্থলে জমা করিলে অন্তত এক একটি নদীর জন্য ৫.৬টি বৃহৎ বাঁধ প্রয়োজন হয়। আমরা বর্ত্তমানে ৫।৬টির স্থানে ১টি কিম্বা ২টি বাঁধ দিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। ফলে ক্রমাগতই বাঁধ হইতে জল ছাড়িবার প্রয়োজন হয় ও উপরের ছাড়া জলের সহিত নিচের বর্ষার জল একত্র হইয়া বন্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। নদীকে পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বাঁধের নিচের নদী অথবা শুষ্ক হইয়া জনসাধারণের জলকষ্টেরও কারণ হয়। সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, এক একটি বড় বাঁধের উপর দিকে কিছু কিছু জল নদী হইতে খাল দিয়া দূরে দূরে লইয়া গিয়া অন্যান্য বাঁধে (জলাশয়ে) রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে বন্যার ভয় এবং জলকষ্ট দুইয়েরই নিবৃত্তি হইতে পারে। বড় বাঁধ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনও চলিতে পারে এবং আমেরিকান পদ্ধতির সকল সুবিধাই অর্জ্জিত হইতে পারে। এখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় না করিতে পারিলে জলসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব হইবে না। একদিকে বন্যার হাত হইতে দেশের লোককে রক্ষা করা ও অপর দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও যেসকল বৎসরে বর্ষা ঠিক মত হয় না, সেই সময়ে নদীর জল পূর্ণ রূপে জমা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা; এই দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করা প্রয়োজন। এই সকল কথা অবশ্য কেহ শুনিয়া কিছু করিবেন কি না, বলা যায় না। কারণ সমস্যা বাংলার ও তাহার সমাধান হইবে দিল্লীতে।

ভিয়েৎনাম

ভিয়েৎনামের যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘটিত যুদ্ধ বলিয়াই তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা সহজ নহে। উপরে উপরে মনে হয় যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটা আভ্যন্তরীণ বিপ্লব চলিতেছে যাহার জন্য আমেরিকান সৈন্যের সাহায্য লইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার দেশে শান্তি স্থাপন চেষ্টা করিতেছেন। সেই বামপন্থী বিপ্লববাদী ভিয়েৎকংদল অবশ্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লোক কি না তাহা লইয়াও কথা চলিতে পারে। কারণ তাহারা উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া থাকে এবং অনেক সময় উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যগণও তাহাদের সাহায্য করে। এই কারণে এবং উত্তর ভিয়েৎনামের রকেট আক্রমণের জন্য আমেরিকান হাওয়াই জাহাজগুলি উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া থাকে। উত্তর ভিয়েৎনাম সামরিক মালমশলা সংগ্রহ করে রুশিয়া এবং চীন হইতে। এই কারণে এই যুদ্ধের একদিকে রহিয়াছে রুশিয়া, চীন, উত্তর ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎকং (মুখোস হিসাবে), এবং অপরদিকে রহিয়াছে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার এবং তাহার সহায়ক আমেরিকান ও অন্যান্য সহায়ক জাতির সৈন্যদল। যুদ্ধে জয় পরাজয় হইতেছে না, তাহার কারণ যুদ্ধে যাহারা জড়িত তাহাদিগের উপর সাক্ষাৎ আক্রমণ

চালান সম্ভব নহে। আমেরিকা বহুদূরে এবং সেখানে বোমা বর্ষণ করিতে হইলে উত্তর ভিয়েৎনামকে রুশিয়া ও চীনের খোলাখুলি সাহায্য লইতে হয়। সেই সাহায্য করিতে ঐ দুই জাতি প্রস্তুত নহে কারণ তাহা করিলে আর একটি বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং তাহাতে আনবিক অস্ত্রও ব্যবহৃত হইবে বলিয়া সকলে মনে করে। আমেরিকাও ঐ একই কারণে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা ফেলিলেও সেই দেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে না। সুতরাং যুদ্ধটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ হইতেছে না এবং উহাতে জয় পরাজয় কিছুই কাহারও যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে যে শান্তির আলোচনা ফ্রান্সের বৈঠকে চলিতেছে তাহাও কতকটা লক্ষ্যহীনভাবে চালান হইতেছে। ইহার ভিতরের কথা হইল যে কোন পক্ষই যুদ্ধে বিশেষ সক্ষম হইতেছেন না এবং শান্তির প্রচেষ্টা হারজিতের সম্ভাবনা দিয়া কেহই বিচার করিতেছেন না। উত্তর ভিয়েৎনাম আমেরিকার বোমায় বিধ্বস্ত এবং সেই জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারিলে লাভবান হইবে। যুদ্ধে আমেরিকাকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে বহিষ্কৃত করিতে উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভিয়েৎকং সংযুক্ত চেষ্টায় সক্ষম হয় নাই। একথাও এক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে আমেরিকানগণ নিজ দেশ এইভাবে পরের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লওয়ার জন্য তীব্র সমালোচনার ধাক্কা সামলাইতে বাধ্য হইতেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যদি ভিয়েৎকং অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদিগের কবলে পড়িয়া যায় তাহাতে আমেরিকার কি এবং তাহার জন্য আমেরিকার যুবকগণ প্রাণ দিতে থাকিবে কেন? জগতে সাধারণতন্ত্র প্রধান হইবে, না কম্যুনিজম, এই কথার মীমাংসার জন্য কত আমেরিকান মরিবে? যত মরিয়াছে সেই তুলনায় কি কম্যুনিষ্টদল যথেষ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে? আরও কত লোক মরিলে বিষয়টার সুবিধাজনক মীমাংসা হইবে? এই সকল প্রশ্ন ও আলোচনা জাগ্রত থাকিয়া যাইতেছে, যুদ্ধও কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে যাইতেছে না। সুতরাং ফ্রান্সের বৈঠকও সময় কাটাইবার জন্যই যেন কোনমতে চলিতেছে।

ব্যবসায়ে মন্দা কতটা?

প্রায়ই শুনা যায় ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য অগ্রগামী না হইয়া পশ্চাদপদ হইয়া যাইতেছে। বড় বড় শহরে ও কারখানার কেন্দ্রে দেখা যাইতেছে লোকের চাকুরীর অভাব ও শ্রমিকদিগের ছাঁটাই হইতেছে; কারবারীদিগের মধ্যেও বহুস্থলে ক্রেতা নাই বা ভবিষ্যতের জন্যও মাল সরবরাহের বায়নার অভাব। একটা ব্যবসায়ে মন্দাভাব সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এই বিষয়ে সত্যানুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? যাহা পাওয়া যায় তাহা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

আমরা সকলেই জানি যে ভারতের মানুষ গরীব ও তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যাহা রোজগার করে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ খাদ্য বস্ত্রেই খরচ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে ভারতীয় মানবের যাহা ক্রয় বিক্রয় তাহার গড়পড়তা শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান, ঔষধ ইত্যাদিতে ব্যয় হইয়া যায়। অতএব সকল ব্যবসাবাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ঐ সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-নিচয়ের উপর নির্ভর করে এবং যেক্ষেত্রে ঐ সকল দ্রব্যের সরবরাহ সর্ব্বদাই প্রয়োজনের তুলনায় অল্প সে ক্ষেত্রে সকল কারবারের তৃচতুর্থাংশতে মন্দা নাই বলা চলে। বাকি এক চতুর্থাংশ যাহা থাকে তাহার মধ্যে অনেক কিছু বিলাসভূষণ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, আসবাব, গাড়ী, রেডিও, রেকর্ড, সাইকল্, ভোজ, ভ্রমণ, শিক্ষা সংক্রান্ত মালমশলা, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ঠাণ্ডা করিবার যন্ত্র ইত্যাদি, কলম, ঘড়ি, জুতা, মূল্যবান বাসন, গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ, অস্ত্র, শাল আলোয়ান, আয়না ইত্যাদি বহু দ্রব্য যাঁহারা ক্রয় করেন তাঁহাদিগের চাহিদায় মন্দা পড়ে নাই। সকল ক্রয়-বিক্রয়ের এই জাতীয় ব্যবসা নিশ্চয়ই শতকরা দশভাগের অধিক। তাহা হইলে মন্দা পড়িয়া যাহা মার খাইতেছে সেই ব্যবসা মোট ব্যবসার শত-

করা ১০ হইতে ১৫ ভাগের অধিক হইতে পারে না। ইহার মধ্যে ঔষধ একটা বড় ভাগ লইবে। সামরিক কার্য্যের জন্ম যাহা ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহাও বিশেষভাবে আবশ্যকীয় এবং তাহাতেও মন্দা নাই বলা চলে। তাহা হইলে দেখা যায় যে মোটমাট সকল ব্যবসায় শতকরা ৯০ ভাগের উপরই যাহা কিছু মন্দার আক্রমণ তাহা লাগিয়াছে। যে সকল অফিস, দফতরে কারখানায়, দোকানে কাজকারবার মন্থর গতিতে চলিতেছে সেগুলির ক্রেতা বিক্রেতাদিগের পূর্ব্বপশ্চাৎ যোগাযোগ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রায় সকলগুলিই সরকারী পরিকল্পনার সহিত কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত ছিল। অর্থাৎ সরকারী পরিকল্পনাগুলি জাতীয় প্রয়োজন না থাকিলেও জোর করিয়া যে ব্যবসায় চালাইয়া রাখিত, সম্প্রতি সে সকল ব্যবসায় আর না চালিত অথবা অর্দ্ধ চালিত থাকায় সেইগুলিতে মন্দা লাগিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা করিয়াই মন্দার হাওয়া বহান হইয়াছে এবং শুধু বড় বড় শহরে ও কারখানায় সেই মন্দা কিছু প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবসায়ের মন্দা তাহা হইলে সরকারী হিসাবের ভুল হইতে উৎপন্ন। এই হিসাবের ভুল শুধু দ্রব্য উৎপাদনে হয় নাই, ইহার জন্ম সহস্র সহস্র কোটি টাকা ঋণ করিয়া সেই ঋণের বোঝা ভারতে যাহারা এখন আছে ও ভবিষ্যতে যাহারা জন্মাইবে তাহাদিগের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে। ইহার সুদ ও আসল শোধ করিতে ভারতবাসীর বহুদিন লাগিবে।

আবার স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ

শ্রীমোরারজি আবার স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ লইয়া খেলার আসরে নামিয়াছেন। তিনি যে কার্য্যেই হাত ঠেকান তাহাতেই তিনি দেশের ক্ষতি করেন অনেক কিন্তু ভিতরের আদর্শ তাঁহার অসফলই থাকিয়া যায়। গূঢ় কোন মতলব সিদ্ধ হয় কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। শুধু একটা জিনিষ দেখা যায় যে মোরারজি আদর্শসিদ্ধিতে অসমর্থ হইলে, কালো বাজার সর্ব্বদাই জোরালভাবে চলিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বকালে মোরারজি যখন ভারতবাসীদিগকে মদ্যপান ত্যাগ করিতে শিখাইতেছিলেন; তখন বোম্বাই মদের চোরাই কারবারে পৃথিবীতে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখনও তাহার জের চলিতেছে এবং শ্রীমোরারজির আদর্শবাদের আশ্রয়ে বহু চোরাই কারবারী মদ্য বিক্রয় করিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। মোরারজির স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের ফলে হাজার হাজার স্বর্ণকার বেকার হইয়া, কেহ না খাইয়া মরিয়াছে, কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে। আবার কেহ কেহ কুলির কাজ করিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। বর্ত্তমানে কিছুকাল এই অতি পুরাতন পেশা আবার চালু হইয়াছিল। কিন্তু মোরারজির চেষ্টায় তাহা চলিতে থাকিবে কি না সন্দেহ। তিনি সহস্র ব্যক্তির পেশা নষ্ট করিয়া যদি দুই দশটি চোরাই কারবারীর লাভের পথ খুলিয়া দেন তাহাতে জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা মহা অন্যায়ের সৃষ্টি হইবে। যদিও শ্রীমোরারজী এই সকল নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটা অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইলেও বস্তুত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফলটা উল্টা হইতেছে। সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ কর্ম্মীর সর্ব্বনাশের উপর গড়িয়া উঠিতেছে একটা মহা অধর্ম্মের কারবার। শ্রীমোরারজি রাজকর সংক্রান্ত নিয়মকানুন অতি কঠোর করিয়াও দেশের মহা ক্ষতি করিতেছেন। তাঁহার নিজের নিয়ন্ত্রিত আইন অনুসারে রাজকর আদায় করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে ভারতে যাহারা আইন মান্য করিয়া চলে, তাহাদিগের স্কন্ধে শ্রীমোরারজি সিন্ধবাদের গল্পের বৃদ্ধের মতই সওয়ার হইয়া নির্ম্মম নিষ্পেষণে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিতেছেন; এবং যাহারা আইন ভঙ্গ করিতে সক্ষম ও চির প্রস্তুত, তাহারা রাজকর ফাঁকি দিয়া আনন্দে বসবাস করিতেছে। এই সকল কারণে আমাদিগের মনে হয় শ্রীমোরারজি অতঃপর বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে দেশের মঙ্গল হইবে, তিনি সহজ ও সরল পন্থায় বিশ্বাসী নহেন। উদ্ভট ও কঠোরই তাঁহাকে আকর্ষণ করে। এবং তিনি যাহাই করেন তাহাতেই সর্ব্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্ব্বাধিক ক্ষতি ও কষ্টের সৃষ্টি হয়। রাজকর আদায়ের মূলনীতি হইল সমাজের লোকের সুখ সুবিধা পূর্ণ সংরক্ষিত রাখিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করা। মোরারজি তাহা করিতে জানেন না।

বেদের দেবতা মরুৎগণ

মুক্তাকণা সেনচৌধুরী

পৌরাণিক দেবতাসমাজে মরুৎগণের স্থান অতি নগণ্য হইলেও বৈদিক দেবতারূপে তাঁহাদের ভূমিকা গৌরবময়। ঋগ্বেদে ৩৮টি পূর্ণ সূক্ত মরুৎগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।... তাহা ছাড়া ৭টি সূক্তে ইন্দ্রের সহিত, একটি সূক্তে অগ্নির সহিত এবং একটি সূক্তে পূষণের সহিত যুক্তভাবে স্তুত হয়েছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অন্ততঃ ৭০টি মন্ত্রে তাঁহাদের উল্লেখ আছে। অপর তিন বেদেও তাঁহাদের সম্পর্কে কয়েকটি সূক্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিস্তর মন্ত্র পাওয়া যায়।

মরুৎগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক ও বৈদিক মতের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। পৌরাণিক মতে তাঁহারা জন্মসূত্রে দৈত্য হইয়াও দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। বৈদিক মতে তাঁহারা জন্মসূত্রে এবং স্বকীয় মহিমায় দেবতারূপে গৃহীত হইয়াছেন। পুরাণে তাঁহাদের জন্মকথা সম্পর্কে আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে; কিন্তু বেদে বিভিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন্ত্র হইতে তাঁহাদের জন্মকথার উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়।

ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাঁহাদের যে কৌতূহল-উদ্দীপক জন্মকাহিনী আছে, আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন "মরুতশ্চ দিতেঃ পুত্রাশ্চত্বারিংশন্নবাধিকাঃ"—মরুৎগণ দিতির পুত্র এবং তাঁহাদের সংখ্যা উনপঞ্চাশ। এই কথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—"তাঁহারা যদি দিতির পুত্র, তবে তো তাঁহারা দৈত্য। তাঁহারা এমন কি সুকৃতি করিলেন যে দেবত্ব-প্রাপ্ত হইলেন?" শুকদেব তখন মরুৎগণের জন্মকথা বর্ণনা করিলেন। দিতির দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হইলে শোকার্তা মাতা এক অজেয় ও অমর পুত্র লাভের আশায় স্বামী কশ্যপকে দীর্ঘকাল ঐকান্তিক সেবায় পরিতুষ্ট করিলেন। কশ্যপ তাঁহাকে অভীষ্ট বরদান করিতে সম্মত হইলে দিতি বলিলেন "বরদো যদি মে ব্রহ্মণ্ পুত্রমিন্দ্রহনং বৃণে"—যদি বরদান কর, তবে আমি ইন্দ্রহননকারী পুত্র বর প্রার্থনা করি। কশ্যপ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। বরদানের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হইতে পারে না; অথচ ইন্দ্রও বধযোগ্য নয়। সুতরাং এক উপায় কল্পনা করিয়া বলিলেন "যদি তুমি একবৎসরকাল আমার নির্দেশমত অতি কঠিন ও ক্লেশসাধ্য একটি ব্রত সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপন করতে পার, তবে তোমার "ইন্দ্রহাদেববান্ধবঃ" পুত্র লাভ হইবে।" কশ্যপ ইচ্ছা করিয়া একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করিলেন। সন্ধি-বিচ্ছেদ করিয়া "ইন্দ্রহা+অদেববান্ধবঃ" পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে 'ইন্দ্রহননকারী ও দৈত্যবান্ধব'। দিতি সরলমনে প্রথম অর্থই গ্রহণ করিলেন। সন্ধিবিহীন পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে 'ইন্দ্রহননকারী ও দেববান্ধব'। কিন্তু ইন্দ্রহন্তা কখনো দেববান্ধব হইতে পারে না। সুতরাং 'ইন্দ্রহা' শব্দের অন্য অর্থ অনুসন্ধান করিতে হয়। হন্ ধাতু হিংসা ও গতি উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। গতি অর্থ ধরিলে 'ইন্দ্রহা' শব্দের অর্থ হইবে ইন্দ্রের সহিত গমনকারী অর্থাৎ ইন্দ্রের অনুগামী। এই অর্থই কশ্যপের অভিপ্রেত বলিয়া অনুমিত হয়।

এদিকে দিতি সরলমনে প্রথম অর্থ ধরিয়া গর্ভধারণ করিয়া কশ্যপ নির্দেশিত সুকঠিন ও অতি ক্লেশসাধ্য ব্রত ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত ইন্দ্র বিমাতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রকাশ্যে দিতির সন্তোষার্থে তাঁহার জন্য বন হইতে ফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশাদি আহরণ করিয়া দিতে লাগিলেন এবং গোপনে বিমাতার ব্রতের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গর্ভকাল প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে এইরূপ অবস্থায় একদিন দৈবমায়ায় বিমোহিত হইয়া অসতর্ক মুহূর্ত্তে উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়াও হস্তাদি ধৌত না করিয়াই ব্রতক্লিষ্টা দিতি নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। সেই ছিদ্র ধরিয়া ইন্দ্র নিদ্রিতা বিমাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া "চকর্ত্ত সপ্তধা গর্ভং বজ্রেণ কনকপ্রভং"—স্বর্ণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন বজ্রের দ্বারা ভ্রূণকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। রোরুদ্যমান সপ্তখণ্ডকে "মা রোদীতি" রোদন করিও না বলিতে বলিতে এক এক খণ্ডকে পুনরায় সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলেন। উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত সেই খণ্ড-গুলি বলিল 'হে ইন্দ্র! আমরা তোমার ভাই; কেন আমাদিগকে হিংসা করিতেছ?' ইন্দ্র বলিলেন 'মা ভৈষ্ট ভ্রাতরো মহ্যং'—ভ্রাতাগণ ভয় করিও না। আমি তোমাদিগকে নিজের পার্ষদ করিব।' ইন্দ্র তাঁহাদিগকে পার্ষদ করায় তাঁহারা দেবসমাজে উন্নীত হইলেন এবং 'মা রোদ' এই কথা হইতেই মরুদ্‌গণ আখ্যা পাইলেন।

বেদে এইরূপ আখ্যায়িকার কোন ইঙ্গিত নাই। বেদমন্ত্রে তাঁহাদের পিতৃপরিচয় ও মাতৃপরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদের ৭।৫৬।২ মন্ত্রে মরুৎগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'এই যে রুদ্রপুত্রগণ, ইহারা কে? কেহই তাঁহাদের জন্মকথা যথার্থ জানে না। ইহারা নিজেরাই আপনাদের জন্মকথা জানেন।' বেদে পুনঃ পুনঃ মরুৎ-গণকে রুদ্রপুত্র বলা হইয়াছে।* প্রথম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি মরুৎ সূক্ত। তাহার প্রথম মন্ত্রে মরুৎগণকে "রুদ্রস্য সূনবঃ" (রুদ্রের পুত্রগণ) এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে "রুদ্রাসঃ (রুদ্রপুত্রাঃ) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ৭।৫৮।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "দীপ্ত রুদ্র, হইতে তোমাদের জন্ম"।

দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তটি রুদ্রসূক্ত। তাহার প্রথম মন্ত্রেই রুদ্রকে "পিতঃ মরুতাম্"—মরুৎগণের পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। সুতরাং মরুৎগণ রুদ্রের পুত্র সন্দেহ নাই।

মরুৎসূক্তের (১।৮৫।২) মন্ত্রে তাঁহাদিগকে "পৃশ্নি মাতরঃ" বলা হইয়াছে। পৃশ্নি শব্দের অর্থ সায়ণভাষ্যে "নানারূপা ভূমি"। তৃতীয় মন্ত্রে তাঁহাদিগকে "গো মাতরঃ" (গো রূপা পৃথিবী যাঁহাদের মাতা) বলা হইয়াছে। ৭ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "মহতী পৃশ্নি তাঁহাদিগকে অন্তরীক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।" ৮ম মণ্ডলের ২০ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে মরুৎগণকে গোমাতৃক ও সুজন্মা বলা হইয়াছে। সুতরাং পৃশ্নি (বা গোরূপা পৃথিবী) যে মরুৎগণের মাতা তাহাতে সন্দেহ নাই।*

তাঁহারা একই সময়ে উৎপন্ন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কাহারো জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নয়, কেহই মধ্যম নয় (৫।৫৯।৬)। তাঁহারা একই সময়ে জন্মিয়াছেন; সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাব বিবর্জ্জিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে সমৃদ্ধিসহকারে বর্দ্ধিত হইয়াছেন (৫।৬০।৫)। তাঁহারা শুচি, তাঁহাদের জন্ম শুচি এবং তাঁহারা অন্যদের শুচি করেন (৭।৫৬।১২)। তাঁহারা সকল বস্তুর শোধক (১।৬৫।১২); পবিত্রতা বিধায়ক (৫।৬০।৮)।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি পুরাণ মতে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে পার্ষদ করায় তাঁহারা জন্মসূত্রে দৈত্য (দিতির পুত্র) হইয়াও দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বেদে তাঁহাদের যে পিতৃপরিচয় ও মাতৃপরিচয় দেখিলাম, তাহাতে তাঁহারা জন্মসূত্রেই দেবত্বের অধিকারী। পরন্তু তাঁহারা নিজেদের মহিমায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া (তে অবর্ধন্ত স্বতবসঃ) স্বকীয় মহত্ত্ব বলেই স্বর্গে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন (মহিত্বনা নাকং আতস্থুঃ) এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যবান হইলেন (শ্রিয়ঃ অধি-দধিরে)। তাঁহারা দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মহিমা যুক্ত হইলেন (উক্ষিতাসঃ মহিমানম্ আশত)।

তাঁহারা অন্তরীক্ষে নিজেদের বাসস্থান বিস্তীর্ণ

করিলেন (সদ্যঃ উরু চক্রিরে)। "মরুৎগণের অন্তরীক্ষে অবস্থিত আয়ত ও বিস্তীর্ণ বসতি তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে (চক্রমে মহতো নিঃ উরুক্রমঃ সমানস্মাৎ সদস)।

তাঁহারা অলংকার প্রিয়। কোথাও গমনকালে বিশেষভাবে অঙ্গসজ্জা করেন এবং বিবিধ অলংকার ধারণ করেন (যামন্ প্রশুম্ভন্তে, ১৮৫।১); রূপাভিব্যঞ্জক আভরণে অঙ্গ শোভিত করেন (অঞ্জিভিঃ শুভয়ন্তে); স্বকীয় দেহে সুরুচিপূর্ণ আভরণ ধারণ করেন (তনূষু বিরুক্মতঃ দধিরে ১৮৫।৩। তাঁহারা উৎসবদর্শী মনুষ্যের ন্যায় অলংকারধারী (৭।৫৬।১); শোভার জন্য বক্ষে মনোহর হার ধারণ করেন (১।৬৪।৪; ৫।৫।১; ৫।৫৭।৫)।

তাঁহারা সঙ্গীতপ্রিয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ। সোমপানে হর্ষান্বিত হইয়া 'বাণ' নামক শততন্ত্রীযুক্ত বীণাবাদন করেন (ধমন্তঃ বাণং মদে সোমস্য, ১।৮৫।১০)।

তাঁহারা স্তুতিপ্রিয় ১।৩৮।১; ৫।৬১।১৫) ৫।৮৭।১)। প্রিয়নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেই তাঁহারা প্রীত হন (৭।৫৬।১০) এবং যজ্ঞে সোমপানাদি করিয়া প্রসন্ন হন (মদন্তি বিদথেষু)।

তাঁহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। তাঁহারা বীর এবং শত্রুধর্ষণকারী (বীরাঃ ধৃষ্টয়ঃ); সর্বশত্রুবিনাশক (বিশ্বং অতিমাতিনম্ অপবাধন্তে); জয়ঘোষযুক্ত (১।৮৭।১) যুবা ও জরারহিত (১।৬৪।৩); নিত্য তরুণ (৫।৬০।৫; ৫।৬১।১৩; ৬।৪৯।১১); সর্বদর্শী (১।৬৪।১২); সর্বজ্ঞ (১।৬৪।৮; ১।৮৬।৬; ৩।২৬।৪; ৫।৬০।৭); স্বর্গরক্ষক (১।৫২।৯); যজ্ঞরক্ষক (১।৮৭।৪); কনক কবচধারী (৫।৫।৬); সুবর্ণময় উষ্ণীষধারী (৫।৫৭।৬); মরণ রহিত (১।২৬৮।৪); ক্ষিপ্রগামী (৭।৫৬।১০); মেঘ-ভেদক (৭।৫৬।১৭), অগ্নিজিহ্ব (১।৪৪।১৪); মনের ন্যায় গতিসম্পন্ন (মনঃ জুবঃ, ১।৮৫।৪); দীপ্তায়ুধ (১।৮৭।৩)। তাঁহাদের রথে পৃশতী নামক শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগগণ বাহনরূপে যোজিত হয় এবং তাঁহারা যুদ্ধ-সমুৎসুক বীরের ন্যায় সংগ্রামে গমন করেন (শূরাঃ ইব ইৎ যুযুধয়ঃ)। তাঁহারা শক্তিবলে অচল পর্বতকেও বিচলিত করিতে পারেন (অচ্যুতা চিৎ ও জসাপ্রচ্যাবয়ন্তঃ)। তাঁহারা গর্জন শব্দেই শত্রুদিগকে অভিভূত করেন (৫।৮৭।৫)। দীপ্তদর্শন নৃপতিগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে সকল প্রাণীই ভয় করে (ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা রাজানঃ ইব সংদৃশঃ)।

তাঁহাদের অবদান বহু ও বিচিত্র। তাঁহারা শোভনকর্মা (সুদংসসঃ) বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা রোদসীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন (রোদসী বৃধে চক্রিরে)।• তাঁহারা বৃষব্রাতাসঃ' —মেঘে অবরুদ্ধ জলকে মোচন করিতে সমর্থ – এবং অন্ন উৎপাদনের জন্য মেঘকে প্রেরণা দান করেন (বাজে অদ্রিস্ রংহয়ন্তঃ)। মরুৎগণের গমনপথে ক্ষরণশীল জলধারা তাঁহাদের অনুগমন করে এবাং বর্ত্মানি ঘৃতং অনুরীয়তে)। তাঁহাদের বৃষ্টিপ্রদ সেনা অনুর্বর প্রদেশকে উৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট করে (১।২৮৬।৯)। যেরূপ ঋত্বিকগণ যজ্ঞে ঘৃত সিঞ্চন করেন, সেইরূপ দানশীল মরুৎগণ সারবান জল সিঞ্চন করেন এবং গর্জনকারী অক্ষয়মেঘকে দোহন করেন (১।৬৪।৬)। তাঁহারা অক্ষয় ধনসম্পন্ন (৩।২৬।৬; ৫।৫৭)। তাঁহারা যত দান করেন এত আর কেহই করেন না (৬।৫৬।৩)। তাঁহারা 'সুদানবঃ' (শোভন দানকর্মা, ১।৮৫।১০)।

৭ম মণ্ডলের ৫৮ সূক্তের পরপর তিনটি মন্ত্রে তাঁহাদিগকে কামবর্ষী (কাম্যফল বর্ষণকারী) বলা হইয়াছে। তাঁহারা বৃষ্টি-জল-সেচন ব্রতে নিযুক্ত (১।৮৫।৪)। তাঁহাদের দান ব্রত অদিতির ব্রতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন (১।৬৬।১২)।

তাঁহাদের দানকর্মের একটি উদাহরণে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা তৃষ্ণার্ত্ত গৌতম ঋষির জন্য একটি কূপকে স্বস্থান হইতে উত্তোলন করিয়া গৌতমের আশ্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে বাধাদানকারী অচল পর্বতসমূহ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। (১।৮৫।১০)।

ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। "হে মরুৎগণ! ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য (১।২৩।৮); তোমরা সম্পূর্ণরূপেই যজ্ঞার্হ (১।৬৪।৮) সোম পানার্থ

মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে আহ্বান করি ; তিনি মরুৎগণের সহিত তৃপ্ত হউন (১২৩।৭)। বৃত্রহননের গৌরব পৌরাণিকদেরমতে ইন্দ্রের একা। কিন্তু বেদে বহুমন্ত্রেই মরুৎগণকে বৃত্রবধে ইন্দ্রের সহায়তাকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১৷৫২৷৪ ; ১৷৫৩৷৬ ; ১৷৮০৷১১ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। একবার পণি নামক অসুর অঙ্গিরা কুলের গোধন হরণ করিয়া অন্ধকার গুহামধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আর একবার বল নামক অসুর অথর্ব্ব-কুলের গাভীসকল অপহরণ করিয়াছিল। উভয়ক্ষেত্রেই ইন্দ্র মরুৎগণের সহায়তায় গুহাদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ঋষিকুলের গোধন উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। বহুমন্ত্রেই ইহার উল্লেখ আছে। (১।১১৫ ; ১৷৬২৷২ ; ১৮৩৷৫ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। বীর মরুৎগণ ইন্দ্রের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধে গমন করেন (৩৷৫৫৷২১)। তাঁহারা মহান ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞাদিতে আবির্ভূত হন (৫৷৮৭৷২)। প্রথম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে ইন্দ্রকে 'হে মরুৎযুক্ত ইন্দ্র' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং একাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "যাঁহার স্তোত্র মরুৎগণের সহিত একীভূত, সেই ইন্দ্র ইত্যাদি"। "হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া এই যজ্ঞে বিস্তৃত কুশের উপর উপবেশন করিয়া হৃষ্ট হও" (১৷১০১৷৯)। 'হে ইন্দ্র! মরুৎগণ তোমার পরিজন' (১৷১৭৷৩)। 'হে ইন্দ্র। মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা ; তাঁহাদের সহিত সুখে যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর' (১৷১৭০৷২)। 'হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত আগমন করিয়া এই বিশেষরূপে প্রস্তুত সোম গ্রহণ কর' (৩৷৫১৮)। 'হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া এই পুরোডাশ (পিষ্টক) ভোজন কর' (৩৷৫৫৷৭)। এইভাবে বহু মন্ত্রে ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম মণ্ডলের ১৯ সূক্তে অগ্নি ও মরুৎগণ যুক্তভাবে স্তুত হয়েছেন। এই সূক্তে নয়টি মন্ত্র আছে। প্রতিটি মন্ত্রের শেষ চরণে বলা হইয়াছে 'হে অগ্নি! এই যজ্ঞে মরুৎগণের সহিত আগমন কর (মরুদ্ভিরগ্ন আগহি)। এই সকল মন্ত্রে মরুৎগণের সম্পর্কে বহু প্রশংসা-ব্যঞ্জক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম মণ্ডলের শততম সূক্তে ১৯টি মন্ত্র আছে ; তাহার মধ্যে ১৫টি মন্ত্রেই ইন্দ্রকে "মরুৎগণের সহিত আমাদের রক্ষার্থে তৎপর হইতে" আহ্বান করা হইয়াছে। ১০১ সূক্তে ১১টি মন্ত্র আছে ; তাহার মধ্যে ৯টি মন্ত্রেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আহ্বান করা হইয়াছে।

৬৷৪৮২ মন্ত্রে অগ্নিকে মরুৎগণের সুখসাধনে তৎপর বলা হইয়াছে। মরুৎগণ বিষ্ণুর সহিত একত্র যজ্ঞ-ভোজী (বিষ্ণোঃ মহঃ সমন্যবঃ, ৫৷৮৭৷৮)। সরস্বতী ও মরুৎগণ হৃষ্ট হউন (৭৷৩৯৷৫)।

মরুৎগণের পত্নী দেবী রোদসী। তিনি তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী। "মরুৎগণের পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্ত মনে মরুৎগণের সেবা করেন। সূর্য্যা (অর্থাৎ উষা) যেমন অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, রোদসী, সেইরূপ মরুৎগণের রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন (১৷১৬৭৷৫)। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বৃষ্টিপ্রদানার্থ তরুণ মরুৎগণ তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপন করেন। শক্তিমতী রোদসী নিয়মক্রমে মরুৎগণের সহিত মিলিত হন (১৷১৬৭৷৬)। আমরা মরুৎগণের সেই অন্নপূর্ণ রথকে আহ্বান করিতেছি, যে রথের বেদীর উপর রোদসী সুস্বাদু সলিল লইয়া রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন (৫৷৫৬৷৮)।

মরুৎগণ সম্পর্কে তিনটি স্তুতির উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "যাঁহারা সুখদাতা, যাঁহাদের মহিমার সীমা নাই, সেই অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী মরুৎগণের বন্দনা কর" (৫৷৫৮৷২)। "হে মরুৎগণ তোমরা পূজার্হ। কে তোমাদের যথার্থ পূজা করিতে পারে? কে তোমাদের যোগ্য স্তুতি করিতে পারে? কে তোমাদের বীরত্ব যথার্থ ঘোষণা করিতে পারে?" (৫৷৫৯৷৪)।

অথর্ববেদের প্রথমকাণ্ডের বিংশসূক্তে সোম ও মরুৎগণ যুক্তভাবে স্তুত হয়েছেন। সেখানে প্রথম মন্ত্রে প্রার্থনা নিবেদন করা হইতেছে "হে মরুৎগণ! এই যজ্ঞে আমাদের উপর অনুগ্রহ কর (অস্মিন্ যজ্ঞে মরুতঃ মৃড়তঃ নঃ) সম্মুখস্থ বিপদ আমাদের উপর পতিত না হউক (মা নঃ বিদৎ অভিভাঃ); অযশস্কর ও বিদ্বেষবুদ্ধিযুক্ত পাপ আমাদের মধ্যে না আসুক (মা উ অশস্তিঃ মা নঃ বিদৎ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা)।

ঋগ্বেদ ১।৩৮।৭; ১।৩৯।৪, ৭; ১।৬৪।১২; ২।২৬।৫; ২।৩৪।১০; ২।৩৪।৩; ৫।৫৭।১; ৫।৫৮।৭; ৫।৫৯।৮; ৫।৮৭।৭; ৬।৬০।৪; ৮।৭।১২; ৮।৭।১৭ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

বস্তুতঃ বহু ঋক্ মন্ত্রেই তাঁহাদিগকে "পৃশ্নিমাতরঃ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১।২৩।১০; ১।৩৮।৪; ১।৩৯।৪; ১।৩৯।৭; ১।৬৪।২; ৫।৬০।২; ৭।৫৭।২; ৫।৫৭।৩; ৫।৫৮।৫; ৫।৫৯।৬; ৭।৫৬।৪; ৮।৭।৩ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

সন্ত্রাসবাদী

কালীচরণ ঘোষ

কংগ্রেসের জন্মের আগে থেকেই বাঙালীর দাবীদাওয়া নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বাক্ ও লেখনী সাহায্যে তর্জ্জমা সুরু হ'য়েছিল একশ্রেণীর লোকের, বিশেষ করে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিতের সঙ্গে। সেটা ছিল শান্তির পথ। কংগ্রেস সে ধারা বজায় রেখে চলেছে; তবে ১৯০৭ সালে সুরাটে প্রকাশ্যভাবে দুই মতের সঙ্ঘর্ষ ঘটে। সে কেবল ধূমায়িত বহ্নির বহিঃপ্রকাশ।

এ সকলের মধ্যে মহারাষ্ট্রে একটা ভিন্ন কর্ম্মপন্থা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আক্রমণাত্মক কর্ম্মপদ্ধতি রূপগ্রহণ করে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যায় সফলতা প্রমাণ করেছিল। আবেদন নিবেদন সম্পূর্ণ বিফল বলে মনে হয়েছে। তাই নিপীড়িত জাতি-সত্ত্বা আপন সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে উৎপীড়ক বিদেশী শক্তিকে আঘাত করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

বাঙলায় এ ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ বিলম্ব হয় নি। বরং বলা চলে 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় (১৮৯৩) অরবিন্দর প্রবন্ধাবলী "New Lamps for Old"এর সূচনা জাগিয়েছিল; প্রেরণা যোগাচ্ছিল।

স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন বড় করে মনে ওঠে। এই বিপদের মধ্যে কারা এসেছিল, আর কেন এসেছিল? প্রথম যুগের যাঁরা যাত্রী মোটামুটি পরিচয় দেবার মত বংশ-গৌরব তাঁদের ছিল। ঘরে তাঁদের অন্নাভাব ছিল না; সংসারে শিক্ষার চর্চ্চা ছিল এবং তাঁরা মোটামুটি "শিক্ষিত" আর ছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি। পরিবারে ছিলেন স্নেহময়ী মাতা এবং মমতায় পরিপূর্ণ অপরাপর আত্মীয় ও আত্মীয়া। এদের অনেকেই বংশের দুলাল, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা স্থল; মাতাপিতার নয়নের মণি। প্রায় সকলেই সুস্থ, সবল, চরিত্রবান। পরদুঃখকাতর, আত্মসুখে অনবহিত, কৃচ্ছ্রসাধনে অপরাঙ্মুখ, নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে অকুতোভয়। মোটামুটি "বেপরোয়া" ভাব প্রভৃতি গুণ বা দোষ তাদের নিজস্ব পরিচয়।

সকলেই যে সমস্ত দিক বিচার করে এসেছিলেন তা নয়। এ বন্ধুর পথে আসতে অনেকেই ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। দেশসেবায় সকল নির্য্যাতন সহ্য করতে, জীবন আহুতি দিতে সকলেই সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন, এ কথা সত্য নয়। কিন্তু তাঁদের অন্তরে যে গভীর দেশপ্রেম ছিল, পরাধীনতার ব্যথা যে তাঁদের চিত্ত উদ্বেল করে তুলেছিল সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তাঁদের মূলপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ কয়েকজন যুগন্ধর মহামানব। দেশের দুর্দ্দশায় যাঁদের মন কাঁদতো, তাঁদের ঘর থেকে, মায়ের আঁচল ছাড়িয়ে এঁরাই বার করে এনেছিলেন আদর্শ দিয়ে। সন্দেহগ্রস্তর মনে সাহস দান করে এই মহাপুরুষরাই অনুগামীদের নিজের পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখার চেষ্টাকে প্রতিনিবৃত্ত করে রেখেছিলেন।

সাধারণ জাগতিক বুদ্ধিতে এই ঘরছাড়ার দলের কার্য্যবিধি বোঝা বড়ই কঠিন। সকল তর্কবুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয় ব্যথা বেদনার অনুভূতি তাঁদের কাজের মূল উৎস। ভাবা সে-ভাব প্রকাশে সম্পূর্ণ অক্ষম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিঃশেষে রুদ্ধ। অন্ধ আবেগ কেবল বিপদসঙ্কুল, অজানা, অচেনা পথে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মৃন্ময়ী দেশ চিন্ময়ীরূপে ফুটে উঠে মনের অতল গভীরে অমিত বল সঞ্চয় করতে সহায়তা করেছে, উন্মাদনায় অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় পর্য্যন্ত দেয় নি। সে শক্তি একবার

জাগ্রত হয়ে আর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। অবিরাম গতিতে চলেছে, স্নেহ মমতার বন্ধন, মঙ্গলামঙ্গল সকল চিন্তার বাঁধ ভেঙ্গে দুকূল প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

এর জন্য তাঁদের নূতন করে কোনো চেষ্টা করতে হয় নি। বেঁচে থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত স্বভাবসিদ্ধ রীতি হিসাবে এ প্রেরণা জেগে উঠেছে।

"সন্ধ্যা মালতী সাজে যে ছন্দে,
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে"—

সেই প্রকৃতির নিয়ম এঁদের অভিভূত করেছিল। কস্তুরী মৃগ আপনার নাভির গন্ধে আত্মহারা হয়ে ছুটে বেড়ায়, পতঙ্গ অগ্নিতে আত্মনাশে পরাশান্তি লাভ করে। এই ধারা থেকে বিপ্লবী জীবনের গতির একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। পুঞ্জীভূত আবেগ বহিঃপ্রকাশ চাইছে। তাই,—

"জাগিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ভয় ?"

বিপদের সম্ভাবনা নির্দেশ করে বহু সাবধানতা বাণী উৎসারিত হয়েছে। "ও পথে যেও না ফিরে এস বলে কানে কানে" কত শুভানুধ্যায়ী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। তাঁকে "করিয়াছে অবিশ্বাস মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস অতি পরিচিত অবজ্ঞায়।" তাঁদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে গন্তব্য পথের শেষ মৃত্যুর আলিঙ্গনে ; প্রত্যাবর্তনের পথ ধ্বংসের প্রতীক নরকঙ্কালসমাকীর্ণ।

কালে কালে দেশে দেশে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে। "আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান" তাঁদের মাতিয়ে তুলেছিল। মাতৃনামের মন্ত্রগ্রহণে স্বাধীনতার রশ্মিরেখা লক্ষ্য করে তাঁরা চলেছিলেন। দুর্দ্দশার ভয় দেখিয়ে তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা চিরতরে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। সত্য সত্যই এঁরা জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের দেশ "স্বর্গ হতে (ও) মহা মহীয়ান্।" তাঁদের কাছে, "স্বর্গ স্বর্গ করে লোক, সার তার নাম, প্রকৃত সুখের স্বর্গ জননীর ধাম।"

বাঙ্গলার এই দধীচির দলের নিকট মায়ের সেবায় জীবনপাত "স্বর্গসুখ" হতেও লোভনীয়। এঁরা বলছেন,

"মিশেছ মোর দেহের সনে
মিশেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি মর্ম্মে গাঁথা।"

অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্ক এক জনমের নয়,

"আমি জানি ভাগ্য মোর
তব সনে গাঁথা,
জন্ম-জন্মান্তর হতে
অয়ি ! চির মাতা।"

সহস্র বৎসরের পরাধীনতার অন্ধকারে আপনজন চিনে নেবার পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়েছে সেই অবলম্বনের কথা যাঁকে পেলে নিজেকে সংযত, সংহত, শক্তিমান বলে মনে করতে পারা যাবে।

"আপন মায়েরে চিনেছি এবার,
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার
'মা' বলে ডাকিতে হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়াছে খুলিয়া।
দূরে গেছে ভয় ভাবনা দীনতা,
ঘুচে গেছে লাজ দারুণ হীনতা,
প্রাণের আবেগে দেহের ক্ষীণতা
গিয়াছি সকলে ভুলিয়া।"

তার ফলস্বরূপ

"শত বলে মোরা আজ বলীয়ান্
হৃদয়ের তেজে স্ফুরিত নয়ান
'মা' নামে গভীর ভকতি।"

এই মাতৃনাম কষ্ট করে গ্রহণ করতে হয় নি। "শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে" সেই ভাবে এই অভয়-মন্ত্র অন্তর থেকে অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এসেছে। মাও তাঁর "ভৈরব দুর্জ্জয় আহ্বান" প্রেরণ করেছেন। আর

"………যে শুনেছে কানে,
তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষঃ পাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।

* * * *

হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্ম শোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

সবই বিস্মৃতির তলে চলে গেছে।

"কবে আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি,
কেন আসিয়াছি? গেছি পাশরিয়া,
তোমারই পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে এ বাণী তাঁরা মোটেই বিস্মৃত হন নি

"তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

তাঁরা এ প্রচণ্ড প্রাণান্তকারী কর্ম্মভার হাসিমুখে কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁরা শুষ্ক বারুদের স্তূপের ওপর বহ্নিশিখা স্পর্শ করিয়েছিলেন, দেশ বিপম্পিত করে দারুণ বিস্ফোরণের শব্দ সমস্ত জাতির মোহনিদ্রা নিষ্ক্রিয়তা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলেছিল।

অবিসম্বাদিতরূপে বাঙ্গলায় বিপ্লব-যজ্ঞের যিনি হোতা, সেই ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, "যদি দেশকে শুধু একটা ভৌগোলিক অবস্থিতি, কতগুলো মাঠ বন পর্ব্বত নদীর সমষ্টি এবং কয়েক লক্ষ ভালমন্দ মানুষের বসবাস (ভূমি) বলে মনে করতাম তা হ'লে নিজের ও দশজনের জীবনকে বিপন্ন করতাম না মোটেই। আমি ত জড়বাদী নই। দেশকে আমি 'মা' বলে অনুভব করেছি, পূজা করেছি, তোমরা যেমন মাকে পূজা কর। তোমাদের রক্ত মাংসের দেহের মত দেশও জীবন্ত, প্রাণবন্ত; তা না হ'লে দেশপ্রেম হয় না।" (পুরোধা, "স্বপ্ন," জানুয়ারী ১৮৬৮)

দার্শনিক, তত্ত্বজিজ্ঞাসু দেশপ্রেমিক পরম পূজ্যপাদ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়) এই নব জাগরণকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এটা আকস্মিক বা কোনো এক বিশেষ আঞ্চলিক ব্যাপার নয়। তিনি শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা (বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৪) পত্রিকায় লিখেছেন:

"বিংশ শতকের প্রারম্ভ এক মহা যুগসন্ধিক্ষণ। সে সন্ধিক্ষণ মহান এই জন্যে যে কালশক্তি অথবা যুগদেবতা কোনো এক সীমিত দেশে, স্তরে, পর্ব্বে, বা ভূমিকায় তার আরব্ধ বিপ্লব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই।

"ভারতের ইতিহাসে মুখ্যতঃ মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশে বিপ্লব-শক্তি-জাগৃতির সূচনা হইয়া থাকিলেও, তার ব্যাপ্তি কোনো প্রাদেশিক গণ্ডী মানিয়া লয় নাই।

"কেবল তাহাই নয়, সে শক্তি-জাগৃতি নানারূপে, নানাছন্দে, সারা ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

"মানবগোষ্ঠীর বা সমাজের স্তর-বিশেষেই উহা সীমাবদ্ধ হয় নাই। সাধারণতঃ গণজাগরণই এর রূপ এবং বিপ্লবই (সহিংস-অহিংস) এর ছন্দ। আবার রাষ্ট্রিক, অর্থ নৈতিক সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক কোনো পর্ববিশেষেই ইহা নিঃশেষিত হয় নাই। মানুষের পূর্ণ অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বাঙ্গীন সার্ব্বজনীন মুক্তিই এর প্রেরণা মূল ছিল।

"কাজেই সে লক্ষ্যের অনুরোধে এর ভূমিকা বদলও হইয়াছে।

"প্রতি ভূমিকায় যে কর্ম্ম, সেটিকে যদি বলা যায় "সাধন" বা "সেবা," তবে সে মূলতঃ চতুর্ব্বিধ:

(১) বিশেষতঃ কায়িকশ্রমের স্বাচ্ছন্দ্য-সহকৃত নিষ্ঠার দ্বারা সেবা;

(২) ভোগ্য-উৎপাদন-কুশলতা এবং বণ্টনভূয়িষ্ঠতা দ্বারা সেবা;

(৩) তেজঃ বা ওজঃ শক্তির দ্বারা যোগক্ষেমার সেবা;

(৪) তপঃ ত্যাগ ও বোধশক্তির দ্বারা সেবা।

"গীতায় ভগবান এই চতুর্ব্বিধ সেবাকে 'চাতুর্ব্বর্ণ্যম্' আখ্যা দিয়াছেন।

"এ চারিটি সেবায় অন্যোন্যাশ্রিতভাব, সুতরাং সুসঙ্গতি আবশ্যক এবং সামগ্রিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশেই এ সেবা-চতুষ্টয়ের চরিতার্থতা।

"বিংশ শতকের প্রারম্ভে যে শক্তিসম্বিৎজাগৃতি, সেটি চাহিয়াছিল এই চতুরঙ্গা চরিতার্থকেই; তার চাইতে অধম বা ন্যূন কিছু সিদ্ধি নয়।

"ঋষির ধ্যানে এই চরিতার্থতা হইল পূর্ণ যোগসমন্বয়। কবির মানসে ইহা মহামাহিমান্বিত মানবতা। সাধকের ইহা উপনিষদ স্বারাজ্যসিদ্ধি। যে বা যাহারা পরাধীন, পরবশ, শৃঙ্খলিত, তাদের আকূতিতে ইহা পূর্ণস্বরাজ।

"যুগ প্রবর্ত্তনের আগেই ঋষি বঙ্কিম ইহা ধ্যানে পাইয়াছিলেন তাঁর আনন্দমঠে; আর এর অমোঘ মন্ত্রও পাইয়াছিলেন—'বন্দে মাতরম্'।

"এই পূর্ণস্বরাজের উপনিষৎ-শ্রীমদ্ভাগবত্ গীতা। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আর শ্রীঅরবিন্দ এই বরেণ্যত্রয়ী, বিশেষভাবে দেশমায়ের সেবায় আপনাদের উৎসর্গীকৃত করিয়া এই গীতোপদিষ্ট পূর্ণস্বরাজকেই লক্ষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সে অঙ্গীকার 'কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাব' হইতে যেন নাই কোনোক্রমে।" গুরুদেবের বিশেষ অনুমতিক্রমে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

বিরাট শক্তিশালী ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে বহুলোক পাবার কথা নয়। যাঁরা গোড়ায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নকে রূপায়িত করতে সকলপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে, তাঁরা অগ্রণী হয়ে এসেছিলেন; কোনো বিপদের সম্মুখীন হ'তে তাঁদের চরণ টলে নি, নয়ন গলে নি'। অবিচলিত চিত্তে, দৃঢ়পদক্ষেপে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। জাতির অপেক্ষাকৃত সাহসী যুবকরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে।

তিলক, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব তাঁদের ন্যায্য স্থান আজও পাননি কিন্তু যখন আদর্শচ্যুত, মদগর্বী, লোভী অবিমৃশ্যকারী অপরিণামদর্শী বিলাসপ্রিয় দেশীয় নেতৃবৃন্দের নাম লোকের স্মৃতিথেকে মুছে যাবে, বা নাসিকাকুঞ্চনের সঙ্গে উচ্চারিত হবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামীজির নাম জাতির কাছে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। সঙ্গে থাকবেন তিলক, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ, ভগৎ সিং, সূর্য্যকুমার, সুভাষচন্দ্র, রাসবিহারী প্রমুখ মহাবিপ্লবীদের নামাবলী। তাঁদের ভাস্বর দীপ্তিতে ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। প্রারম্ভে 'বন্দে মাতরম্' আর শেষের 'জয়হিন্দ' মন্ত্র ইংরেজকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করেছে। অহিংস-পথে মহাত্মা গান্ধীর অবদান স্মরণ করতেই হয় কিন্তু তাঁর কতগুলি অযোগ্য চেলার কথা মনে হ'লেই খণ্ডিত ভারতের চিত্র ফুটে উঠে বেদনায় মন ভরে যায়।

যখন বৈপ্লবিক কাজ বাঙ্গলায় সুরু হয়ে যায় তখন যারা এসে পড়েছিল এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েছিল তাদের একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। বলে রাখা ভাল ধর্ম্মগত বা জাতিগত বিশ্লেষণ থেকে প্রকৃত চিত্র পাওয়া কঠিন;—বিপ্লবের গতিপথে কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে থাকবে। ইংরেজ সরকার যে হিসাব রাখতে চেষ্টা করেছিল, তার আভাস দেওয়া যাচ্ছে। বিদেশী শাসকের পক্ষে হয়ত অশান্তি নিরোধকল্পে এটা প্রয়োজন ছিল—যে শ্রেণীর ভেতর থেকে বেশী সংখ্যক যুবক বেরিয়ে আসে, সেই দিকটায় তারা লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছে বেশী করে।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১৮৬ জন বিপ্লবসংক্রান্ত ব্যাপারে দণ্ডিত হয়েছিল। সন্দেহে ধৃত বা বিচারান্তে মুক্তিপ্রাপ্ত শত শত কর্ম্মীর হিসাব ইহার মধ্যে নাই। পরের ঘটনা-বিচারে মনে হয় এই অনুপাত মোটামুটি বজায় থেকে গেছে।

জাতি হিসাবে প্রধানতঃ কায়স্থকে দেখা যায় প্রতিশতে ৪৬·৩ জন, ব্রাহ্মণ ৩৪·৯, আর বৈদ্য ৭। সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজে এই তিন শ্রেণী যে স্থান অধিকার করে আছে, সেটা কেবল শিক্ষাদীক্ষা আর ধনের প্রভাবের বলে নয়, বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম, জনসেবা-প্রবৃত্তি, কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের দাবীতে হয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

অন্যান্য জাতি বা শ্রেণীর অংশ—মাহিষ্য ও কৈবর্ত্ত, প্রত্যেকেই ১·৬ শতাংশ গ্রহণ করেছে। তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক, 'বৈশ্য', কর্ম্মকার, বারুজীবি, মুদি (মোদক) প্রভৃতি সকলেই সেই তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ

বৈপ্লবিক চিন্তা সকল স্তরেই গিয়ে পৌঁচেছিল। সঙ্গ-দোষে পড়ে রাজপুত ও ওড়িয়া এক এক জন হিসাবে আর অস্ত্রবিক্রয় ব্যাপারে চারজন শ্বেতাঙ্গ দণ্ডিত হয়েছিল।

কর্ম্মবিভাগ অনুযায়ী বিচার করলে দেখা যায় ছাত্ররা ছিল দলে ভারি। তারাই শতকরা ৩১'২ জন। বেকার (অন্ততঃ সরকারী খাতায়) ছিল ১২'৯ আর প্রায় সমান অনুপাত রক্ষা করেছেন শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত লোক ও জমির উপস্বত্বভোগী (landlord). সাধারণ কেরানী ও সরকারী চাকুরে শতকরা ১০ জন। নিজেদের ধারণামত শিক্ষকদের একটা খুব বড় স্থান দেওয়া ছিল, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে তাঁরা পাঁচ দলের পর ষষ্ঠ স্থান করেছেন অর্থাৎ ৮'৩ শতাংশ। চিকিৎসাব্যবসায়ী ডাক্তার কম্পাউণ্ডার (৪.০%), সংবাদপত্রসেবী (৩.০%) প্রভৃতি এসে দল পুষ্ট করেছিলেন।

এইবার বয়সের হিসাব নেওয়া যাক্। সকলের চেয়ে দুরন্তকাল ২১-২৫ বৎসর—শতকরা ৪০'৮ হলো তাঁদের অংশ; ১৬-২০ হচ্ছে ২৫'৩%; তৃতীয় স্থান হচ্ছে ২৬ ৩০; এঁরা হলেন শতের মধ্যে ১৫, আর ৩১-৩৫ বছরের যৌবন পারের লোক হলেন মাত্র ৬'০%। এর পর আসেন ৩৬ ৪৫ বছরের দল। ১০-১৫ বছরের কিশোর থেকে ৪৫ উর্দ্ধের লোকও ছিলেন এ দলে। দেখা যাচ্ছে সকল স্তরের লোকের মধ্যে এই বিপদসঙ্কুল চিন্তা প্রবেশ করেছিল আর যত লোক দণ্ডিত হয়েছিলেন, তার সহস্রগুণ লোক এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্যদান করেছেন।

মহা প্রস্থান

গল্প

সুধীরচন্দ্র রাহা

ছোট গ্রাম। নাম কেশবপুর। অতীতকালে কেশব বলিয়া হয়তো কেহ ছিলেন, এবং তিনিই তাঁহার নামকে চিরস্থায়ী করিবার মানসে, এইস্থানে নিজ নাম দিয়া কেশবপুর গ্রাম বসাইয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীংকালে, সেই কেশব সম্বন্ধে কেহ কিছুই জানে না। এখন তিনি অতীত ইতিহাসের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছেন। ঐ গ্রামে একটি বিরাট দীঘিও আছে। সেই দীঘির কিছু-অংশ মাটি পড়িয়া বুঁজিয়া গিয়াছে—কিছুটার সামান্য জল থাকে। দীঘির অন্যান্য অংশ, বন-জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের গরু বাছুর সেখানে চরিতে আসে। সেই দীঘির নাম কেশব দীঘি। ইহাতে মনে হয়, দূর অতীতে কেশব বলিয়া কেহ ছিলেন। যাহা হউক, এই কেশবপুর গ্রাম অতীতে যাহাই থাকুক, এখন দেখিতেছি গ্রামের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। গ্রামের লোকজন খুবই কম—মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর এখন এই কেশবপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। গ্রামের চারিদিকে মাঠ আর জঙ্গল। বহুদূরের অন্যান্য গ্রামের সহিত ইহার ভাল যোগাযোগ নাই। বলিতে গেলে এই গ্রামটী নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। ইহার নিকটে কোন হাট বাজার ডাক্তারখানা, স্কুল কিছুই নাই। তবুও অজস্র অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, এই গ্রামের বাসিন্দারা, এই কেশবপুরের মাটি কামড়াইয়া বাস করিতেছে। বোধ করি উহারা আনন্দেই আছে। বাহিরের কোন আঘাত বা সংঘাত, কোন বিপর্য্যয়, এই গ্রামখানিকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেশবপুর যেন একটি ছিপ্‌ছিপে নদী। ইহার গতি নাই—প্রমত্ততা নাই বা বেগ নাই। ইহা আপনমনে সংসার-বিরাগী কোনও উদাসীর মত, জগৎ সংসার ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষেতের তরকারী, মাঠের ধান, গরু লাঙল, চাষ-আবাদ এইসব লইয়াই ইহারা থাকে। সন্ধ্যার সময় গ্রামের মধ্যখানে অশ্বত্থগাছের তলায় গোল হইয়া বসিয়া, দা-কাটা কড়া তামাক টানিতে টানিতে গল্পগুজব করিয়া, রাত্রি হইলে, যে যার কুটীরে যাইয়া দরজা বন্ধ করে। মাঠ হইতে কুটীর, আর চাষ-আবাদ, গরু-লাঙল, এই সব লইয়াই উহাদের জীবন। কখনও কখনও গঞ্জের হাটে যাইয়া ইহারা বেড়াইয়া আসে, অথবা হাটে কালেভদ্রে যাত্রাগান শুনিয়া চমৎকৃত হয়। ইহাই উহাদের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

কালক্রমে দেশ স্বাধীন হইল, বিদেশী শাসকগণ প্রস্থান করিল। কিন্তু ইহারা তাহা জানিতেও পারিল না। কেহ কেহ শুনিল, দেশ নাকি স্বাধীন হইয়াছে। ইংরাজরা জাহাজে করিয়া চলিয়া গিয়াছে। খুদু মোড়ল সদ্য সহরে গিয়াছিল। মোড়লই খবরটা সান্ধ্য-আসরে প্রকাশ করিল। মোড়ল বলিল, সহরে শুনে এলাম। ওনারা সব বলাবলি করছিলেন, ইংরেজরা এখন এদেশ থেকে চলে গিয়েছে, এখন স্বদেশীবাবুরাই দেশের রাজা হয়েছেন। সকলে অবাক হইয়া গেল। একজন বলিল, সেই লাল-মুখো সাহেবরা হঠাৎ চলে গেল কেন গো! এমন সাজান সোনার রাজ্যি-পাট কাকে দিয়ে গেল মোড়ল? তামাক টানা বন্ধ করিয়া মোড়ল বলিল, আরে এ ছোঁড়াটা দেখছি কিছু জানে না। বলি, গান্ধী মহারাজের নাম শুনিস্‌নি? এখন সেই গান্ধী মহারাজ হলেন দেশের রাজা। সায়েবরা বউ ছেলে নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে, কলের জাহাজ চেপে দেশে ফিরে গেল। মোড়লের কথার উপর আর কেহ প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কি জানি, ততগুলি লোকের মাঝে, আবার বে-ফাঁস প্রশ্ন করিয়া অর্বাচীন বোকা বনিয়া যাইবে? তাই সকলে

চুপ করিয়া, মোড়লের কথাই শুনিতে লাগিল। সকলের একপাশে বসিয়া ছিল ভুপতি। ভুপতির এখন একমাত্র প্রশ্ন—ইংরাজ তো চলিয়া গেল, এখন তাদের অবস্থা ফিরিবে কি? অতীতে দিনের কথা ভুপতি ভোলে নাই। জমিদার, তাহার নায়েব, পাইক-বরকন্দাজ ইহারা তাহাকে একেবারে শেষ করিয়া দিয়াছে। খাজনার দায়ে জমি গিয়াছে—গরুবাছুর নিলামে উঠিয়াছে। মহাজনও তাহাকে কম জ্বালায় নাই। মহাজনের দেনার দায়ে, তাহার আর কিছু নাই। পায়ে ধরিয়া, হাতজোড় করিয়াও রেহাই পায় নাই। সেইসব কথা ভাবিতে ভাবিতে, ভুপতির শীর্ণ চোখে জল নামিয়া আসে। এখন কি তাহাদের অবস্থা ফিরিবে? তাহার তো মাত্র দুই বিঘা জমি। উহাতে অভাব ঘোচেনা। পরের জমিতে খাটিয়াও পেটের ভাত হয় না। দেবতা যদি দয়া করেন তবেই সুবৃষ্টি হয়, নতুবা মাঠ খাঁ খাঁ করে। কি জানি এখন ঈশ্বর কি করিবেন। সন্ধ্যার পর ভুপতি বাড়ী ফিরিয়া আসে। কিন্তু ঘর-দুয়ার অন্ধকার কেন? বাদলের মা কোথায় গেল?

ভুপতি ডাকে, বাদল—বাদল—। অন্ধকার ঘর হইতে সাড়া আসে—এই এখানে—। আলো থাকবে কি করে। ঘরে কেরোসিন নেই। রেশন-কার্ডে তেল দেবে। তা দোকানী বলল, তেল আসেনি—

ভুপতি চুপ করিয়া যায়। ভুপতি হঠাৎ রাগিয়া বলে আসেনি আবার। সব বেলাকে সেরে দিয়েছে। বুড়োর সব—

রেশন-কার্ডে চাল, গম, চিনি দেয়, কিন্তু সব সময় কি ভুপতি কিনিতে পারে? চিনি তাহারা খায় না—। চালের পয়সাই জুটাইতে জীবন বাহির হইয়া যায়—তা চিনি। দোকানের বাবুরা কি যে লেখেন, তা তাঁরাই জানেন। সে বড়লোক নয় যে চিনি খাইবে। চলতি কথায় আছে—যে খায় চিনি—তাকে জোগান চিন্তামণি। কিন্তু গরীবের বেলায় চিন্তামণির সেরূপ ইচ্ছা দেখা যায় না। যদি একটু নেক্‌নজর রাখিতেন, তবে এই অভাব অনটনের বাজারে কি সুখই না হইত। কিন্তু গরীবের কপালে বিধি-বাম। শুধু বিধি কেন? সকলেই বাম্‌। ভগবান-মানুষ-সরকার আজ সবাই বিরূপ। গরীবের নামে সরকার হইতে খয়রাতি দান করিবার জন্ত যাহা কিছু আসে, তাহাই কি গরীবদের কপালে জোটে? না, তাও জোটে না। ভুপতির মনে পড়িয়া যায়, একটি ঘটনার কথা। গত কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন আশ্বিনমাসের মাঝামাঝি। হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি নামিল। একনাগাড়ে পাঁচদিন ধরিয়া কী তুমুল বৃষ্টি। মানুষজনের ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। আর সেকি ঝড়! সেই সাংঘাতিক ঝড়ে কারুর গোয়াল পড়িল, ঢেঁকিঘরের চালা উড়িয়া গেল—কত লোকের ঘর, বাগান সব তছনছ হইয়া গেল। তারপর আসিল বান। গঙ্গার জল কুল ছাপাইয়া, মাঠ, ঘাট, ও গ্রাম ভাসাইল। ক্ষেতের ধান ডুবিল—সেই সঙ্গে ডুবিল অজস্র মানুষজন। চাল অমিল হইল। মুড়ির দর হইল চার টাকা সের। চালের দরও উঠিল তিন টাকা সের আর আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিষের মূল্য হইল অসম্ভব। এখন সেইসব অন্ধকার দিনগুলির কথা ভুপতির মনে পড়িয়া যায়। ক্ষেতে ফসল নাই—আর মাথার উপর আশ্রয়ের চালাটুকু পর্য্যন্ত নাই। মানুষজনের ঘরে সামান্ত খুদমুঠো পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়াছে। শোনা যাইল, সরকার সকলকে বিনা পয়সায় চাল দিতেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী তারিণীদাসের বাড়ী দিন রাতে পঞ্চাশবার হাঁটিয়া, তবে মিলিল একখানা কাপড়ের অর্দ্ধেক। কিন্তু চাল আর কপালে জুটিল না। কিন্তু আধখানা কাপড় লইয়া, আর চাল না পাইয়াও ভুপতিকে তাহার নামের পাশে তিনখানা কাগজে বুড়ো আঙ্গুলের তিনটি ছাপ দিতে হইল। ভুপতি দেখিল, লেখাপড়া না জানার এই ফল। কিন্তু সেক্রেটারীবাবুর কীর্ত্তিটা ভুপতি বুঝিয়া ফেলিল। তাহার পাওনা কাপড়, কম্বল আর চাল যে কোথায় গিয়াছে তাহা ভুপতি বেশ বুঝিল। এমনি করিয়া, গরীবকে মারিয়া উঁরা বড়লোক হইতেছেন। তাহার মত পচা গরীবদের রেশন-কার্ডের চাল, চিনি আটা এইসব কোথায় যায় তাহা কি তাহারা জানে না।

জানে, সব জানে। কিন্তু জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত কে শত্রুতা করিবে? তাহারা পচা গরীব। তাহাদের ব্যথা, তাহাদের দুঃখ কে শুনিবে, কে বুঝিবে? গাঁয়ের মোড়ল আর মাথা যারা তাঁহাদের হাতেই সব। সরকারের প্যান্ট-কোট পরা বাবুরা টেবিলে পা তুলিয়া চা খান—সিগারেট ফোঁকেন—কাঁচের ডিসে ডিসে সন্দেশ রসগোল্লা খান—। মাংস ও মুরগীর ভেট্ চলিয়া যায়—তা এইগুলি কি অমনি আসিতেছে। ভূপতি মনে মনে হাসিতে থাকে। আর ঐ অমরবাবু ভোটের সময় কত গলাবাজীই না করিয়াছেন। গরীবের দুঃখে ওঁর দুই চোখে জল নামিয়া আসিত। খালি বলিতেন, ওইসব চোরেরা শোষণ করিতেছে। কিন্তু দেখা গেল—ভোটের পর সব যেন বদলাইয়া গিয়াছে। যাহাদের চোর বলিতেন, এখন উহাদের সঙ্গেই খাতির বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। ভূপতি হাসিয়া হাসিয়া, আপন মনেই বলে—হায় ঈশ্বর, এ জগতে আর কত কি না দেখাবে—

চৈত্র গেল, বৈশাখ গেল। না—আকাশে মেঘ নাই। লোকে হাঁ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। মাঠগুলি শুকনো, পাথরের মত শক্ত-রিক্ত উদাসনয়নে তাকাইয়া আছে আকাশের পানে। আশা, যদি আসে বৃষ্টি। কিন্তু বৈশাখ নির্মম নিষ্ঠুর। এখন চারিদিকে হাহাকার—ধরা ভাণ্ডার আজ রিক্ত। পৃথিবী যেন অগ্নি-স্নানে মত্ত। শুধু দিকে দিকে—শূন্যে শূন্যে বৈশাখীর সন্তপ্ত নিঃশ্বাস। দূরের সমস্ত মাঠ আজ জলহীন—কোথাও বিন্দুতম জল নাই। বিন্দুতম কচিঘাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। লতা-পাতা বৃক্ষ সমস্তই আজ বৈশাখীর অগ্নিস্নানে জ্বলিয়া পুড়িয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। মধ্যদিনের দীপ্ত গগনের তলায়, সূর্য্যের তপ্ত বিষ নিঃশ্বাস শুধু দিকে দিকে আগুনই ছড়াইতেছে। অসহায় চাষীর-দল—শুধু নিষ্পলনয়নে তাকাইয়া থাকে। এদিকে চালের দর হু হু করিয়া উঠিতেছে। দুই টাকা ছাড়াইয়া এখন এক কেজী চাল বিক্রয় হইতেছে তিনটাকা করিয়া। ভূপতি মাথায় হাত দিয়া বলে—এখন উপায়? ঘরে এক ছটাক ধান নাই—শুধুমাত্র আছে আউশধানের বীজগুলি। কিন্তু বীজধান খাইয়া ফেলিলে, শেষে কোথায় বীজ ধান পাইবে?

ভূপতির বউ কাতু বলিল, বাঃ এখনো বসে আছ। ঘরে যে একটা দানা নেই। ছেলেমেয়ে কটা যে খিদের সারা হয়ে গেল। কাল রাতে সেই ছাতু খেয়ে আছে—এমনি করে কতদিন উপোস করবে সব। নিজেদেরও খিদে তেষ্টা আছে। খালি পেটে কতদিন মানুষ থাকতে পারে। ভূপতি বলিল—নাঃ এই বসে বসে তাই ভাবছিলাম। কিন্তু কোথায় চাল পাব। হাতে তো একটা পয়সা নেই। কোথাও কোন কাজও পেলাম না—

কিন্তু বসে থাকলেই কি চলবে। পোড়া পেট যে কিছুই শোনে না। উঃ ভগবান, আর কত কষ্ট সইব। এককোঁটা জল দিলে না—এখন মাঠ ফেটে চৌচির। আর কবে বিষ্টি হ'বে—

ভূপতি আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে—আর বৃষ্টি হলেই বা এখন কি হ'বে। এখন জষ্টি মাস—এখন বিষ্টি হলে কি আউশ হয়? এখন একবার যাই সিকরিটারীবাবুর কাছে। শুনছি রাস্তার কাজ হ'বে। ছেলে বুড়ো নাকি কাজ পাবে। নগদ একটাকা আর এককেজি করে গম। আমি নাম লিখিয়ে দিয়ে আসি। ছেলেটা, মেয়েটা আর আমি—এই তিনজনই মাটি কাটব—

কাতু বলিল—আর আমিই বা বাদ যাব কেন গো। একটা টাকা এক কেজি গম, এ আজকের দিনে কম নাকি? চারজনে চার কেজি গম পাব।

—না ওদের দুজনকে দেবে পাঁচশো করে। বা দিক, তাই কম নাকি? দুবেলা রুটী খেয়ে থাকব। ভূপতি গামছা হাতে করিয়া বাহির হইয়া যায়।

অন্যদিনের মত বাদল আর পারুল, তাহাদের বই খাতা লইয়া পড়িতে বসিয়াছিল। কিন্তু শূন্য উদরে কে পড়া করিতে পারে? দুইজনেই মুখ কালি করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। বইয়ের পাতা আর খোলা হয় না। অন্য সময় হইলে, এতক্ষণে দুইজনে চীৎকার করিয়া পড়া মুখস্থ করিত। মুড়ি, গুড় ও পান্তাভাত

খাইয়া উঁহারা ঘণ্টাখানেক পড়িত। কিন্তু এখন ঐ দুই বস্তুই অমিল। মুড়ি চিনির দর এক হইয়া গিয়াছে। কোথাওবা মিশ্রীর চেয়ে মুড়ির দর বেশী। দেশে খাদ্য নাই—ক্ষেতে ফসল নাই। কিন্তু খাদ্য নাই, এই কথা সত্য নয়। টাকা ফেলিলে, অ-ঢেল খাদ্যই পাওয়া যায়। দর বেশী দিলে, সবই মিলিবে। মজুতদারের ঘরে চিনি, চাল, গম কত পরিমাণে জমিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দর সেই আকাশচুম্বী। সামান্য আয়ের পক্ষে ঐ চড়াদরে খাদ্য কেনা সাধ্যাতীত।

এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশী আঘাত পড়িয়াছে, মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর স্কন্ধে। মধ্যবিত্তদের ঘরে পয়সা নাই, আর শারীরিক পরিশ্রমের কোন ক্ষমতা নাই। এটা সেটা বিক্রয় করিয়া দিন কাটিতেছে—কিন্তু বুঝি আর তাহাও কাটিতে চায় না। ইহাদের দেখিবার কেহ নাই—ইহাদের কষ্ট দুঃখ বুঝিবারও কেহ নাই। দিনের পর দিন, শুষ্ক মুখে, শূন্য উদরে ইহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর বৌ-মেয়েরা, বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারে না – অনাহারে, অখাদ্য, কুখাদ্য খাইয়া, সমস্ত জাতি এক মহাসর্বনাশের পথে, ধ্বংসের পথে চলিতেছে। ইহা কে দেখিবে? চোরা-কারবারীর দল, এই সুযোগে মজা লুটিতেছে, আর ব্যবসায়ীরা অবাধে দর বাড়াইতেছে। অসংখ্য অভাবী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা পর্য্যন্ত চোরা-কারবারের পথে নামিয়াছে। সমস্ত মানুষের ভাগ্য লইয়া, একশ্রেণী বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়ী আর চোরাকারবারী ছিনিমিনি খেলিতে সুরু করিয়াছে। ইহাদের মূল শিকড়, ডালপালা মেলিয়া, বহুদূর পর্য্যন্ত শক্তভাবে ছড়াইয়া দিয়া, নির্বিচারে কারবার চালাইতেছে। মানুষের স্বাস্থ্য, অর্থ, পরমায়ু, নৈতিক চরিত্র পর্য্যন্ত আজ পঙ্কিল ও কলুষিত। মনে হয়, মানবসমাজ—অধঃপতনের শেষ সীমায় নামিয়া আসিয়াছে।

কেশবপুরের অবস্থা একই। গ্রামকে গ্রাম—গ্রামের সমস্ত অধিবাসী আজ আর মাঠে যায় না। মাঠে ফসল নাই—সামান্য ঘাসটুকু পর্য্যন্ত নাই। অকৃপণ অকরুণ শ্রাবণ, দুই হাত ভরিয়া জলধারা দান করে নাই—শ্রাবণের সেই প্রাণমাতানো বর্ষণ আজ আর নাই। দিগন্ত জুড়িয়া কাল কাল মেঘের সমারোহ—বিদ্যুতের চকিৎছটা বা মেঘের গুরু-গুরু গম্ভীর ডাক কিছু শোনা যায় না। মাঠ আজ রিক্ত-শুষ্ক, নদী ক্ষীণা—। রিক্তবৃষ্টি আকাশে অগ্নিবাণ যেন চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ভবিষ্য ভাবিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিতেছে।

কেশবপুরের পাশের গাঁ হইল মাঝের পাড়া। এই মাঝের পাড়া এখন কালোবাজারীদের প্রধান আড্ডা। মুরারী কায়ফরমা ঐ আড্ডার একজন প্রধান। তাহার যেমন টাকা তেমনি হাতে আছে দু-চারশো গুণ্ডাশ্রেণীর লোক। মুরারী এখন গাঁয়ের প্রধান। উহাকে বাদ দিয়া, গাঁয়ের কোন কিছু চলে না। বরং রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ লেখা চলিতে পারে, কিন্তু মুরারী কায়ফরমাকে বাদ দিবার উপায় কাহারও নাই। গ্রামাঞ্চলে আজ এক নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজের উদয় হইয়াছে, এই সম্প্রদায়কে বাদ কে দিবে? ইহারাই সমাজ-শাসন করিতেছে। সমস্ত সমাজজীবনে ইহাদের প্রকাশ্য অ-প্রকাশ্য শক্তি ক্রিয়া করিতেছে।

রাত পোহাইবার তর সয় না। গাঁয়ের ছেলে বুড়ো কোদাল লইয়া রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। টেষ্ট-রিলিফের কাজ সুরু হইয়াছে। কিন্তু মাটি কাটা সহজ নয়। মাটি যেন পাথর। কায়ফরমার লোক ভূপতিকে বুঝাইল, মাটি কেটে কী লাভ। তার চেয়ে ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে চালের কারবারে নেমে পড়। কুড়ি কেজি করে তোমরা আনতে পারলে মোটা পয়সা। মুরারীবাবুই টাকা দেবেন—চালও নেবেন তিনি—। নগদ টাকা মিলে যাবে—। কড়কড়ে নগদ টাকার কথা শুনিয়া, ভূপতির মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহার টাকা চাই অনেক টাকা চাই। এক আধ টাকায় কিছুই হইবে না। ঘরে একটি দানা নাই। মা লক্ষ্মী এবারও কৃপা করিলেন না। ভাতের স্বাদ তো ভুলিয়া গিয়াছে। ভূপতি যেন নূতন চালের সুগন্ধ নাকে পায়। একটু ডাল—যৎসামান্য তরকারী আর পুরো একথালা ভাত সে যেন পাইয়াছে। আহাঃ—এ যে স্বপ্ন—। আজ

চালের বেলাকে যদি অদৃষ্টে এক্‌থালা ভাত পায়, তবে কেন মিথ্যা মাটি কোপাইয়া মরিবে। ভূপতি প্রথমেই চালের কারবারে নিজে গেল না। বাদল, কমলা, আর কাতু দূরের গঞ্জে চাল আনিতে যায়। টাকার ভাবনা নাই—টাকা যোগায় মুরারী কারকরমা। কাতু তার ছেলেমেয়েকে সঙ্গে লইয়া, ট্রেণে চলিয়া যায়, কাটোয়া, সালার, কখনও বা বীরভূমে। ওখানে চালের দর খুব কম। ঘুষ দিয়া একবার আনিতে পারিলেই মোটা পয়সা।

মাসখানেক চলিয়া যায়। ভূপতি দেখে, কাতু আর দুই ছেলেমেয়ে গোছা গোছা নোট লইয়া ফিরিতেছে। কাতু এখন ভয় পায়না—আর এই কাজে ছেলে-মেয়েও বেশ চালাক হইয়া গিয়াছে। রাতের ট্রেণে ওরা ছোট ছোট থলি লইয়া ট্রেণে ওঠে। উহারা রাতে কোথায় থাকে—কি খায়—কোথায় বা ঘুমায়, এ সব প্রশ্ন ভূপতির কাছে অবান্তর। যে অভাব-রাক্ষসী তাহাদের পিষিয়া মারিতেছিল, এখন সেই অভাব আর নাই। ইতিমধ্যেই সংসারে অনেক কিছু অদলবদল হইয়া গিয়াছে—। কাতু এখন পুলিসের ভয় পায় না। কিভাবে বিনা টিকিটে যাইতে হয়, পুলিসকে কিভাবে ফাঁকি দেওয়া যায়,—এইসব কথা হাসিয়া হাসিয়া গল্প করে। কিন্তু ভূপতি দেখিতেছে বাদল বিড়ি সিগারেট ধরিয়াছে—আর মেয়ের হাল-চালও ভাল নয়। কয়দিন চুপ করিয়া থাকিয়া, একদিন ভূপতি কাতুকে বলিল, মেয়েটা বড় হয়েছে, এমন রাত-বিরেতে একা একা ছেড়ে দেওয়া কি ভাল। কোথায় যায়—কার সঙ্গে থাকে, এসব ভাল কথা নয়। পাঁচজনে যে পাঁচকথা বলছে—

কাতু মুখ ঝামটা দিয়া বলে, ওঃ বড় সব ভাল লোকরে। এখন ওদের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে যে। দুটো পয়সা করছি কিনা তাই সব জ্বলেপুড়ে মরছে—।

সেদিন মোড়লই বলিল, হা হে ভূপতি। তোমার পরিবারের দিকে নজর দাও একটু। বলি ও লোকটা কে? সেদিন ট্রেণে দেখলাম। দেখি কাতু একটা গাঁট্টা গোট্টা জোয়ান লোকের সঙ্গে হাসছে—গল্প করছে। বলি কে লোকটা? মেয়ে বউ ছেলের খোঁজ রাখনা—।

ভূপতি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এখন আর উপায় কি? পেটের দায়ে যে-পথে নামিয়াছে,—এখন ফেরানর কোন রাস্তাই নাই। কিন্তু শুধু কি তারই ছেলে মেয়ে এই কাজ করিতেছে? আজ হাজার হাজার মেয়ে-মদ্দ তো এই পথ ধরিয়াছে। দোষটা কি আর শুধু উহাদের? কে উহাদের পথে নামাইয়াছে? আকাশে বৃষ্টি নাই—ক্ষেত শস্যহীন—বাজারে চালের দাম আজ সোনার মত। সমস্ত জিনিষের দাম—আগুনের মত। এখন জীবন রাখিতেই মানুষ ব্যস্ত। পেটের ক্ষুধা যে কি জিনিষ, তা অন্যে কি করিয়া বুঝিবে? ভূপতি মনে মনে হাসে—আর বলে, তুমি গাঁয়ের মোড়ল—। তোমার বাড়ীতে এখনও দু-গোলা ধান। গরুর দুধ হচ্ছে—। নিজেরা খাও আর বাকীটা বিক্রী করছ। তোমার টাকা আছে—তাই তোমার সুখ আছে। আর যারা খেটে খায়, যাদের জমি-জায়গা নাই—পরের জমিতে যাহারা মজুর খাটে, তাহাদের উপায় কি? ভূপতি আর কথা বলেনা।

সেদিন ভূপতি এক কাণ্ড করিয়া বসিল। যে ভূপতি একমাত্র তামাক ছাড়া আর কোনও নেশা করিত না, আজ হঠাৎ কোনও বন্ধুর আগ্রহেই তাড়ি খাইল। ইহার পর যাহা হয় তাহাই ঘটিল। হঠাৎ নেশা করিয়া সামান্য কথা লইয়া বচসা সুরু হইতে হইতে, শেষে মারামারি সুরু হইয়া যায়। অপর পক্ষ ছাড়িয়া দেয় নাই। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটাইয়া দেয়। অনেক রাত্রে ভূপতি রক্ত-মাখা অবস্থায় বাড়ী ফিরিল। সঙ্গে দু' একজন আসিয়াছিল। কে বা কাহারা, তাহার মাথায় লতাপাতা কি যেন ছেঁচিয়া, ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিল। ভূপতির নেশার ঝোঁক তখনও কাটে নাই। অন্ধকার ঘরে শুইয়া শুইয়া, অধিক রাত পর্য্যন্ত শুধু বৃথা আস্ফালনই করিতে থাকে।

অন্যদিনের চেয়ে, আজ অনেক বেলায় ভূপতির ঘুম ভাঙিল, তখনও তাহার মাথায় রক্ত বন্ধ হয় নাই।

সমস্ত-শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট—মাথা মুখ সব ফুলিয়া গিয়াছে। আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া রহিল ভূপতি। বাহিরে কড়া রোদ আর গরু বাছুরগুলি গোয়ালে চীৎকার করিতেছে। রান্নাঘরে বোধ করি কুকুর বিড়াল ঢুকিয়াছিল রান্নাকরা ভাত তরকারী ফেলিয়া ছড়াইয়া মহানন্দে ভোজ লাগাইয়া দিয়াছে। সমস্ত গৃহস্থালীতে একটা অগোছাল ভাব। জিনিষপত্র এখানে-ওখানে পড়িয়া রহিয়াছে। বাসি উঠানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। ঘরদুয়ারে বোধ করি বহুদিন ঝাঁটা পড়ে নাই। সমস্ত রাত জাগিয়া কাতু যখন বাড়ী ফেরে, তখন কোনমতে নাকে মুখে গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে। তারপর ঘুম ভাঙিলে চালের বস্তা লইয়া উহারা কারফরমায় আড্ডায় যাইয়া হাজির হয়। সেখানেই অনেক সময় কাটিয়া যায়। আবার বাড়ী ফিরিয়া কোনমতে দুটি খাইয়া রাত্রের ট্রেন ধরে। এই যাহাদের জীবন, তাহাদের ঘর-সংসারের উপর দৃষ্টি দিবার সময় কোথায়?

বাহিরের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন উহাদের গিলিয়া খাইয়াছে। পল্লীবধূর সেই মাধুর্য্য—সংসার স্বামী ও পুত্র-কন্যার উপর ভালবাসা বা টান ও গৃহসংসারের মঙ্গল-ভাবনা আজ আর নাই। এক সর্ব্বনাশা নেশায়, উহারা জুয়াড়ীর মতন, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এক মরণ-খেলায় মাতিয়াছে।

ভূপতি অবাক হইয়া দেখিল, এতখানি বেলা হইয়াছে, কিন্তু বউ ছেলেমেয়ে আজ আর ফেরে নাই। এই রকম তো আজ পর্য্যন্ত কোনদিনই হয় নাই।

ভূপতি নিজের অসহ্য ব্যথা উপেক্ষা করিয়া, কোনমতে গরু-বাছুর বাহির করিল। কিন্তু উহাদের খড় জল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে আর তাহার ইচ্ছা হইল না। শরীর বহিতেছেনা—যন্ত্রণায় সমস্ত মাথা যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। গরুবাছুরের সম্মুখে দুই এক আঁটি খড় দিয়া, ভূপতি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মারামারিতে, মাথায় লাঠির আঘাত লাগিবার পর, মনে হয়, তাহার যেন কিছুটা সম্বিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। বাড়ী, ঘর সংসার—চাষবাস, নিজের গরুবাছুর প্রভৃতির কথা মনে হয়। পূর্ব্বে সংসারে অভাব ছিল বটে কিন্তু শান্তি ছিল। ছিল সুনাম, ছিল ভগবানের উপর প্রগাঢ় ভক্তি। কিন্তু আজ আর সেই শান্তি সুখ কিছুই নাই। কিন্তু বসিয়া থাকিলে তো চলিবে না। গরুবাছুর যে না খাইয়া মরিবে। সমস্ত দিন চলিয়া গেল কিন্তু কেহই ফিরিল না। ভূপতি মনে করিল, একটা কিছু কাণ্ড নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু আগে, নিজের জমিতে আসিয়া দাঁড়ায়। শূন্যজমি, কোথাও কোন ফসল নাই—সব শূন্য। কোথাও একটি ঘাস পর্য্যন্ত নাই। ক্ষুধার জ্বালায় গরুবাছুরগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া ঘাসের সন্ধান করিতেছে। দূরে বাবলা বন। ঐ বাবলা বনের ছায়ায়, কবরের তলায়, তাহার সহকর্ম্মী সামাদ, মালেক, গফুর আরও অনেকে চিরবিশ্রাম করিতেছে। উহারা এই মাঠে চাষ করিত। কতদিন কত সুখ দুঃখের গল্প করিয়াছে,—কিন্তু আজ উহারা কোথায়? কবরের মাটির তলায় উহাদের সাদা হাড়গুলি শুধু পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতিমার সে সাজ নাই—সব রূপ-রস-সৌন্দর্য্য কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। উহাদের জীবনে কোন সাধ-আহ্লাদ মেটে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ কষ্ট লইয়া ক্ষুধাতুর জীবন লইয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

লাঙলের ক্ষুধিত দুটি জানোয়ারের পিছনে পিছনে চিরকাল তাহারা মাটি চষিয়াছে—কিন্তু ক্ষুধার অন্ন পায় নাই। ভূপতি বিষণ্ন হইয়া ওঠে।

ঠিক সাতদিন পর কাতু ফিরিল। কিন্তু একা। চুলে তেল নাই—পরণের কাপড় অতি ময়লা আর ছিন্নভিন্ন। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। এই সাতদিনেই, কাতু যেন একেবারে বুড়ী হইয়া গিয়াছে। যে দুই ঠোঁট, একদা সব সময় পানের রসে লাল হইয়া থাকিত—চোখ দুটি সদাই চঞ্চল হইয়া, এদিক-ওদিকে কি যেন খুঁজিয়া ফিরিত—আজ সব স্তব্ধ। কাতু যেন একটা প্রেতছায়া—।

কাতু ধীরে ধীরে আসিয়া, দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে, ক্লান্তভরে ঠেস্ দিয়া বসিল। শূন্য চোখ শুধু শূন্যেই তাকাইয়া রহিল। ভূপতির মাথায় ঘা বিন্দুমাত্র ভাল হয় নাই—। মুখ, চোখ, মাথা আরও যেন বেশী ফুলিয়াছে। একবার মাত্র সেই দিকে তাকাইয়া, কাতু কোন প্রশ্ন

করিল না। শুধু নিষ্পলক নয়নে তাকাইয়া রহিল। ভূপতি বলিল—ওরা কোথায়? কমলা—বাদল, কোথায়? এইবার কাতু হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—নেই-নেই—কেউ নেই। আমি রাক্ষুসী, আমিই বাছাদের মেরেছি—। সেই বাঁশের খুঁটিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া, কাতু মাথা ঠুকিতে লাগিল। তাহার কান্নায় লোকজন ছুটিয়া আসিয়াছিল—তাহারাই কাতুকে জোড় করিয়া আটকাইল। ইহার পর সব ব্যাপার জানা গেল। পুলিশের ভয়ে, চলন্ত ট্রেন হইতে উহারা হঠাৎ লাফ্ দিয়াছিল। কমলা সঙ্গে সঙ্গে কাটা পড়িয়া যায়। আর বাদলের দুই পা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—। সে এখন হাসপাতালে--কিন্তু সেও বোধ হয় এতক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে। আর উহার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি লাভ? কাতু শুধু ধরা পড়িয়াছিল। সাতদিন হাজত-বাস করিবার পর ছাড়া পাইয়াছে। ভূপতি শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

—কমলা নেই। মা আমার নেই। আর বাদল—বাদলও নেই। আমার সব গেল—সব—সব গেল। একটা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া ভূপতি মাটিতে পড়িয়া গেল। নিশ্চয়ই, ভূপতির মনে অনেক কথাই জাগিয়াছিল। ছেলেমেয়েকে, সে ক্ষুধায় অন্ন জোটাইতে পারে নাই। কাপড় জামা ঔষধপত্র শিক্ষা কিছুই দিতে পারে নাই। কতদিন কমলা বায়না ধরিয়াছে, একটি জামা, একজোড়া জুতার জন্য। ছেলেটা একটা কলমের জন্য কতদিন বলিয়াছিল, স্কুল যাইবার জন্য একটা ভাল প্যাণ্ট চাহিয়াছিল। কিন্তু অক্ষম পিতা, ক্ষুদ্র বালক-বালিকার সেই তুচ্ছ আকাঙ্খাও পূর্ণ করিতে পারে নাই। শুধু তাহার জীবন উদয়াস্ত পরিশ্রমের ভারে নানা হতাশা ব্যর্থতা আঘাত, ঋণের বোঝা অভাব অনটন, সমস্ত মিলিয়া সমস্ত জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে। আজ সব শেষ—সকল ভাবনা চিন্তার পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

ভূপতিও নাই। দূরে বাবলাবনের তলায় তাহার পুরাতন বন্ধুরা চির-বিশ্রাম করিতেছে—আর আজ ভূপতি চলিয়াছে, সেই বাবলাবনের পাশ দিয়া, সহ-কর্ম্মীদের কাঁধে চড়িয়া, চিতানলে নিজেকে অর্ঘ্য দিবার জন্য। শুধু পিছনে পড়িয়া রহিল, তাহার ভাঙ্গা সংসার, আর শস্যহীন রিক্ত দুই বিঘা জমি।

বহুবিবাহরোধে বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

"তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন"—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর তাঁর "বহুবিবাহ" শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, ও সামাজিক নিয়মদোষে, পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্ব্বলতা ও অধীনতানিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট, অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই, স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে, অশেষপ্রকারে, যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা, একণে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই।" [বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী : বহুবিবাহ, পৃঃ ৩৪৮]

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নারীর লাঞ্ছনা সবদিক থেকে চরমে পৌঁছেছিল এর কারণ পুরুষের নির্দ্দয়তা ও সংস্কারজনিত আচারপরায়ণতা। নারীর এই লাঞ্ছনার মূলে যে সংস্কার সেদিনের সমাজকে একপেশে করে রেখেছিল তা' হচ্ছে—প্রথম বাল্যবিবাহ, দ্বিতীয় বিধবার নির্য্যাতন, তৃতীয় বহুবিবাহ। বাল্যবিবাহ অর্থাৎ নারী ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে তার বিয়ে দিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ কুলীন ব্যবস্থা থাকায় কুলরক্ষার তাগিদে সেই বালিকাকে হয়ত বিয়ে করতে হ'তো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে। বিধবা নারীর (বালিকার) আজীবন কঠোর কৃচ্ছ্রতা, এবং কুলরক্ষার তাগিদেই একবরে বহুকন্যাকে সম্প্রদানের ঘটনা সেদিন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের তাগিদ অনুভব করেছিলেন তাঁর সমবেদনাশীল, করুণার্দ্র হৃদয় থেকে। তাই সমাজের এই তিনটি দুর্নীতির বিরুদ্ধেই তাঁর যুগপৎ সংগ্রাম। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে সংগ্রাম থেকে তিনি বিরত হন নি।

রাজা বল্লাল সেন হিন্দু ব্রাহ্মণের কুলবন্ধন করেছিলেন গুণবিচার ক'রে। কালক্রমে কুলীনদের মধ্যে যখন অজস্র দোষ দেখা দিল, তখন দেবীবর ঘটক কুলীনদের মেলবন্ধন করেন দোষবিচার ক'রে। দেবীবরের নিয়মে উচ্চমেলের কন্যার বিবাহ উচ্চমেলের (বা সম্প্রদায়ের) পাত্রেই দিতে হ'বে। কিন্তু এমন পাত্র দুর্লভ হওয়ায় কুলরক্ষার জন্য বহুপত্নীক কুলীনকেই কন্যাদান করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এটা কুলীনদের ব্যবসা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে কুলীন ব্রাহ্মণরা হ'য়ে উঠলো কশাইয়ের মত নৃশংস, আর কুলের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ বালিকাদের ভাগ্য অসহায় ও করুণ হয়ে পড়লো।

বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ গ্রন্থের 'তৃতীয় আপত্তি' পরিচ্ছেদে এই ধরণের কয়েকটি কুলীন স্বামীর পরিচয় দিয়েছেন :

"কোন প্রধান ভঙ্গ কুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়, আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি? তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট (visit) পাই সেইখানে যাই।"

"গত দুর্ভিক্ষের সময় একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কতলোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে; কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।" বিদ্যাসাগর আরও উদাহরণ দেন, যে কন্যা বিবাহের পর আর স্বামীর মুখ দেখেনি, সে গর্ভবতী হ'লে, কন্যার পিতা বহু টাকার বিনিময়ে সেই কন্যার স্বামীকে একরাত্রির জন্যে নিয়ে আসতেন। যাতে কন্যার পুত্র বৈধ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। এর ফল হ'ত এই যে ছেলে বা মেয়ে তার বাপকে চিন্‌তো না। ভাগ্নে ও ভাগ্নীকে পালন করার দায়িত্ব নিতে হ'ত মামাদের। এবং সেই অবাঞ্ছিতদের দুর্গতির আর সীমা থাকতো না। বিদ্যাসাগরের মানবমুখী মন নারীর এই অমের নির্য্যাতন বিগলিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। তাঁর 'বহুবিবাহ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বলেছেন—"তাহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

বিদ্যাসাগরের দেহে হৃদয় নামে একটি বস্তু ছিল। সেদিনের সমাজে এই 'হৃদয়' থাকাটা একান্ত অপরাধ ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু যিনি সমাজকে ক্লেদমুক্ত করতে এসেছেন, সমাজের সকল প্রথাকে তিনি ঘৃণা করবেন এবং ওই প্রথাগুলির উচ্ছেদের জন্য জীবনপণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিধবাবিবাহ সমাজস্বীকৃত করানোর জন্য সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে যখন পাহাড়ের মত দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর, তখনই তাঁর সংকল্প গ্রহণ করা হ'য়ে গেছে যে 'বহুবিবাহ'র মত নিষ্ঠুর প্রথারও উচ্ছেদ করতে হ'বে।

১৮৫৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম আবেদনপত্র পেশ করেন তিনি। কিন্তু জনবিক্ষোভের ভয়ে এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সে আবেদন সরকারী নথিপত্রের তলায় চাপা পড়ে রইলো। চাপা পড়ে রইলো আরও, কারণ বিদ্যাসাগর তখন 'বিধবা-বিবাহ' শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষার প্রসার ও অন্য নানা কাজে ব্যাপৃত। কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নতুন করে এ' ব্যাপারে অগ্রণী হ'লেন। ১৮৬৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিদ্যাসাগর নতুন যে আবেদনপত্রটি রচনা করলেন, তাতে তাঁর নামের তলায় অন্য যাঁরা স্বাক্ষর দিলেন তাঁদের মধ্যে নদীয়ার সতীশচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের সত্যশরণ ঘোষাল, ও কাঁদির প্রতাপচন্দ্র সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। এই নতুন আবেদনপত্রটি লেফ্‌টনেণ্ট গভর্ণর সেসিল বিডনের কাছে দাখিল করা হ'ল। উপসংহারে লেখা হ'ল—

"It is the fervent hope and prayer of your petitioners that before your Honour laid down the responsibilities of your office, your Honour might signelise the close of your long and successful carrear by emancipating the females of Bengal from the pains, cruelties and attendant crimes of the debasing custom of polygamy."

১৯শে মার্চ্চ তারিখে বিদ্যাসাগর সদলে দেখা করলেন গভর্ণর সাহেবের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিলেন রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাপচাঁদও চিঠি দিলেন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে। ২৩শে মার্চ্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রস্তাবের অনুকূলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হ'লো। গভর্ণর জেনারেলের নির্দ্দেশে তখন একটি অনুসন্ধান-কমিটি বসানো হয়। কিন্তু সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ইতিমধ্যেই তাঁর রিপোর্টে জানান্ যে বর্ত্তমানে এ ধরণের কোন আইন (অর্থাৎ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ) বিধিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত হ'বে না।

বিদ্যাসাগর যে অমের চরিত্রের অধিকারী ছিলেন

সে চরিত্রের বৈশিষ্ট ছিল এই, যে, 'পরাজয়', 'হতাশা', প্রভৃতি বস্তুগুলি তার পরিধির মধ্যে স্থান পায়নি। যিনি সংগ্রামী, সংগ্রামে তাঁর জয় সবসময়েই হ'বে এমন আশা করা দুরাশামাত্র। বিফলতা বিদ্যাসাগরের জীবনেও এসেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর সে বিফলতাকে মেনে নেন নি। পরাজয়কে মেনে নিয়ে তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় হননি। যখন স্বজন বান্ধব সকলে তাঁকে পরিত্যাগ করেছে তখন তিনি একক সৈনিকের মতই অগ্রসর হ'য়েছেন।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ক'রে আইন পাশ করানো গেলনা। তখন বিদ্যাসাগর তাঁর লড়াইয়ের কৌশল বদলালেন। তিনি বুঝলেন যে এই কুৎসিৎ প্রথার বিরুদ্ধে জনমানসকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হ'বে। যে সমাজে শাস্ত্রের অনুশাসন একমাত্র কার্যকরী সে সমাজে বিপ্লব ঘটাতে গেলে শাস্ত্রকেই শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হ'বে। তাই আবার শাস্ত্রমন্থন করলেন তিনি। উদ্ধার করে আনলেন সেই সব শ্লোক যা তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহায়ক।

অর্থাৎ বহুবিবাহের সমর্থন আছে কোন্ কোন্ অবস্থায়?

মনু বলেছেন—

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা ॥৯.৮০(৫)

অর্থাৎ যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিনী, অতিক্রুরস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয় তাহা হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবে।

এবং

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯।৮১।(৫)

অর্থাৎ যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হয় তা'হলে অষ্টমবর্ষে, মৃতপুত্রা হ'লে দশমবর্ষে, কেবল কন্যাসন্তানের জননী হ'লে একাদশ বর্ষে এবং অপ্রিয়বাদিনী হ'লে অবিলম্বে পুনরায় দারপরিগ্রহ ক'রিবে।

অতঃপর

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ৩.১২

অর্থাৎ

দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) পক্ষে প্রথম অর্থাৎ ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ স্বজাতীয়া কন্যা বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করে তাহারা বর্ণ স্তরে বিবাহ করিবে।

কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবহার রহিত হইয়াছে; সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহ অশাস্ত্রীয়।

বিদ্যাসাগর আরও বললেন যে, কোন কোন লোক পৌরাণিক রাজাদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষীয় রাজারা স্ব স্ব অধিকারে একপ্রকার সর্বশক্তিমান ছিলেন। রাজারা উন্মার্গগামী হ'লে তাঁদের ন্যায়পথে চালিত করবার মত লোক ছিলনা। যদি কোন রাজা উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহলে সেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসম্মত বলা চলে না। তাই "এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধর্মানুগত ব্যবহার নহে।"

বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। "The whole of Bengal was in a purturbed state at that time." (Subal Chanda Mitra.

যাঁরা অগ্রণী হ'য়ে প্রতিবাদ পুস্তিকা রচনা করলেন তাঁরা হ'লেন—

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি

" কাব্য " " দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

মুর্শিদাবাদ নিবাসী কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন

বরিশাল নিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন

এবং ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন

এঁদের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুহৃদ ও বিশেষ অন্তরঙ্গদের অন্যতম। তিনি

ইতিপূর্ব্বে বহুবিবাহ নিরোধ বিষয়ক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ 'বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত' এই বিরুদ্ধমত প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর বিস্মিত ও ব্যথিত হন। তারানাথ সংস্কৃতভাষায় রচিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। ফলে বিদ্যাসাগর দু'মাসের মধ্যেই (১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর) তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করলেন। এই পুস্তকে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটি যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতি তিনি এতই বিক্ষুব্ধ হন যে তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্কের ছেদ ঘটে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও অন্যান্য প্রতিবাদীরা প্রত্যেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক জিনিষ আর হৃদয়বানতা অন্য জিনিষ। যে পাণ্ডিত্য 'মানুষের ধর্ম্ম' কি তা বুঝতে শেখেনি সে পাণ্ডিত্য নিষ্ফল। বিদ্যাসাগর বিদ্যার সাগর ছিলেন কিনা সে কথা তত বড় নয়; কিন্তু তাঁর সমস্ত হৃদয় যে মানুষের বেদনাকে অনুভব ক'রে মানবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিল সে কথা মানবসমাজ আজও বিস্মৃত হয়নি। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান উদারচিত্ততার স্নিগ্ধধারায় সঞ্জীবিত হয়েছিল বলেই সমাজের উষর মরুচিত্তে তিনি এতবড় পরিবর্ত্তনের প্লাবন আনতে পেরেছিলেন।

'বহুবিবাহ' নিষিদ্ধ করে কোন আইন প্রণয়ন করা সেদিনই সম্ভব হয় নি। তার কারণ ১৮৫৬ সালে বিধিবদ্ধ বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণগুলির মধ্যে একটি—একথা অনেকেই বলেছিলেন। বিদেশী শাসকের কাছে সাম্রাজ্যরক্ষার প্রশ্নই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বহুবিবাহ যে নৃশংস প্রথা এ'কথা সেসিল বিডন থেকে সুরু ক'রে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। তবুও বর্ণহিন্দুর সমাজে সকলে এই প্রথা অশাস্ত্রীয় এ'কথা মানতে রাজী ছিলেন না। সমাজে যারা আপন প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থবুদ্ধিকে কায়েম ক'রে রাখতে চায় তাদের একটি দলই সেদিন বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মানবিকতার অধিকার রক্ষার জন্য যাঁদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও তাগিদ ছিল, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন নি। বলাবাহুল্য বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম সফল হ'য়েছিল। কারণ 'বহুবিবাহ' অতঃপর শিক্ষিত সমাজে ধিকৃত হ'য়েছিল এবং বাল্যবিবাহরূপ কৌতুকজনক রীতিরও আস্তে আস্তে বিলোপ ঘটেছিল। সমাজমানসে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্ব সেদিন যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, তারই আলোড়নে পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও দূষিত জল আপনা-থেকেই সরে গিয়েছিল।
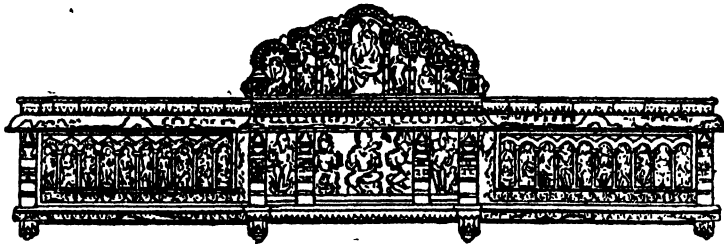
তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

১

"বুঝলে কিনা যোগুদিদি, আমাদের গ্রামে বলেনা, 'বাঘের আগে বার্ত্তা ছোটে,' এ হয়েছে তাই"। ভগীরথ দ্রুতহাতে খুন্তি চালাতে চালাতে বলল। ঝি যোগমায়া বাটনা বাটা এক মুহূর্ত্তের জন্যে থামিয়ে বলল, "সত্যি বাপু, আমরা ঘরে বসে কিছু শুনলামনি, আর সারা পাড়া জুড়ে হৈ হৈ। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই ঐ এক কথা,—তোমাদের দাদাবাবুর বিয়ে নাকি গো? কনে ঠিক হয়েছে? কেমন মেয়ে? কি দিচ্ছে? আরে বাপু অত সাত সতেরো আমরা জানি নাকি? বউ যখন আসবে তখন দেখব।"

ভগীরথ বলল, "আর জানলেই অমনি বলে বেড়াব নাকি? এ বাড়ীর বউ কি যেমন তেমন একটা আসলেই হল? বুড়ো গিন্নিমা যখন মারা গেলেন তখনও তাঁর বয়স ঢের হয়েছিল। এই দাদাবাবুই তখন বারো চোদ্দ বছরের। তা কি চেহারা ছিল। যেন ভগবতী দুর্গা। আর আমাদের মা ঠাকরুণের কথা যদি বল ত তেমন রূপ এ দেশেই দেখবে না। যেন সোনা দিয়ে গড়া প্রতিমা। সেই বাড়ীর বউ আসবে, সে কি হেঁজি পেঁজি হতে পারে।"

ঝি যোগমায়া এ বাড়ীতে পাঁচ ছ' বছর মাত্র কাজ করছে। এঁদের পূর্ব্ব ইতিহাস ভগীরথ যেমন জানে, এর তত জানা নেই। আর ঠিকা ঝি সে, পাঁচ বাড়ী ঘুরে কাজ করে কোনো একটা বিশেষ বাড়ীর প্রতি অতিরিক্ত রকম আনুগত্য তার নেই। তবু বিয়ের নামে স্ত্রীজাতির যে স্বাভাবিক কৌতূহল তা যাবে কোথায়? ভগীরথের কথায় সে বলল, "তা হ্যাগা, মেয়েটেয়ে দেখা কোথাও হয়েছে নাকি?"

ভগীরথ বলল, "তুমিও যেমন। লাখ কথা ছাড়া কখনও বিয়ে হয়? তা কথা এখানে কইছে কে? বাবু ত দিনে যে ক'টা কথা বলেন তা একহাতে গোনা যায়, আর ছোট পিসীমার নিজের সংসার আছে ত? তিনি আর ভাইপোর জন্যে কত কথা বলে বেড়াবেন? তবু করছেন সাধ্য মত। শুনছি যে এখানে বাবুর এক বন্ধুর মেয়ে দেখবার কথা হচ্ছে। সামনের রবিবারে ছোট পিসীমা গিয়ে মেয়ে দেখে আসবেন। তাঁর পছন্দ হলে তবে বাবু দেখতে যাবেন। দাদাবাবু যদি যেতে রাজী হন, তাহলে তাঁকেও নিয়ে যাবেন। আর এক শুনলাম যে দেশে বড় পিসীমার এক দেবরঝি আছে, তারা নাকি এখানে তার বিয়ে দেবার জন্যে খুব ঝুলাঝুলি করছে। বড় পিসীমা বলেছেন মেয়ে নাকি সোন্দর। এখনও কেউ তাকে ভাল করে দেখেনি অবশ্য। পুজোর সময় সে মেয়ে জেঠাইমার বাড়ী আসবে বেড়াতে, তখন এনারা সব গিয়ে দেখবেন। তা তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদি, এ বছরে বিয়ে হবে না, সামনের বোশেখ মাসে যদি হয়।"

যোগমায়ার নিশ্চিন্ততার অভাব কিছু ছিল না সে এখানের কাজ সেরে আর এক বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। বলল, "আমাদের চিন্তাই বা কি অ-চিন্তাই বা কি? দুবেলা একটু পেট ভরে ভালমন্দ খাব, আর একখানা নূতন শাড়ী পাব, তা সে যখন হয় হবে।"

ভগীরথের চিন্তাধারা অত সরল ছিল না। খাওয়া ও কাপড় পাওয়া ত অত্যন্তই সামান্য ব্যাপার. সে ভাবছিল এরপর চাকরিটি বজায় থাকলে হয়। অন্নপূর্ণার পরলোক-গমনের পর থেকে কার্য্যত ভগীরথই এ বাড়ীর কর্ত্তা ও গিন্নী। এখন নূতন গিন্নী এলে তাকে পদচ্যুত হতে হবে না ত? এঁরা যেন সেই রকম মেয়েই চাইছেন, যে ঘরে ঢুকেই সংসার বুঝে নিতে পারে। তা কতবড় মেয়েই বা হিন্দুসমাজে পাওয়া যায়? দাদাবাবুরই ত বয়েস বড় জোর বাইশ হবে, তার বউ আর কত বড় হবে? বড় জোর চোদ্দ পনেরো। আচ্ছা দেখাই যাক, গণপতির ছেলে ভগীরথকে সহজে হটাতে পারবে এমন মেয়ে বাংলা দেশে বেশী জন্মায়নি।

সন্ধ্যার সময় হেমলতা এসে বললেন, "দাদা কোথায় রে ভগীরথ, উপরে, নাকি বেরিয়ে গেছে?"

ভগীরথ বলল, "নীচে নামতে ত দেখিনি পিসীমা, ওপরেই আছেন বোধহয়।"

হেমলতা বললেন, "দেখে আয় বাপু চট্‌করে একবার। না যদি থাকে ত শুধু শুধু আর সিঁড়ি ভাঙবনা।" হেমলতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভারি হয়ে পড়েছেন, সহজে সিঁড়ি ওঠানামা করতে চাননা।

ভগীরথ উপরে উঠে সিঁড়ির মুখের কাছ থেকে হাঁক দিল, "উঠে আসুন পিসীমা, বাবু ঘরেই আছেন।"

হেমলতা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে না উঠতেই রামপদ বারান্দায় বেরিয়ে খাটিয়ায় বসলেন। বললেন "তুই একটু diet করে রোগা হয়ে নে, তা নইলে চল্লিশ পার হতে না হতে অচল হয়ে যাবি যে।"

হেমলতা বললেন, "ও বাবের যেমন ধাত, বুঝলে দাদা? আমাদের বাপের বাড়ীর বেশীর ভাগ লোকই ত মোটা। আমাদের যে একমাত্র পিসী ছিলেন জাহ্নবী, মনে আছে তাঁকে? কি ভীষণ মোটা হয়েছিলেন তিনি। মারাই গেলেন তিরিশ বছর বয়সে। কবিরাজমশায় নাকি বলেছিলেন মেদ বাহুল্যে হৃৎপিণ্ড বিকল হয়েছে।"

রামপদ বললেন, "তোর আর পিসীমার ধাত পেয়ে কাজ নেই। খাওয়াটা কমা, তাহলেই ঝরে যাবি এখন।"

হেমলতা বললেন, "ও সব পারবনা বাপু। সারাদিন খাটিখুটি দুপুরে পেটভরে ভাতটা না খেলে পারি কখনও? তা দুবেলা দুবার ত খাই, জলখাবার খাওয়া টাওয়া আমার অভ্যেস নেই। যাক সে কথা। এখন পরশু রসিক-বাবুদের বাড়ী মেয়ে দেখতে যাবার কি করছ? ওরা ত ঝুলোঝুলি লাগিয়েছে। ভদ্রলোক আবার কর্ত্তার দূর সম্পর্কের কুটুম হন, কাজেই তিনিও বারবার বলছেন। মেয়ের ঠাকুরমা নাকি গোঁড়ামানুষ তিনি মেয়েদের ইস্কুলে পড়া পছন্দ করেন না তাই নাতনীরা কেউ ইস্কুলে যায় নি। বাড়ীতে গুরুমারা এসে পড়িয়েছে আর সেলাই শিখিয়েছে।"

রামপদ বললেন, "বয়স কত মেয়ের?"

হেমলতা বললেন, "উনি ত বললেন বারো তেরো, কিন্তু আমাদের ঝিয়ের বোন কাজ করে সেবাড়ী, সে বলল, 'কিসের বারো তেরোগা, এই ঢ্যাঙলঢ্যা মেয়ে বাপের কাঁধ ছাড়িয়ে উঠেছে। গায়েগতরে বেশ ভারি, ষোলো সতেরো না হয়ে যায় না'।"

ক্ষীণকায় অভয়পদর পাশে একটি ঢ্যাঙলঢ্যা ও গায়ে-গতরে ভারি বউ মানানসই মনে হল না রামপদর কাছে। তিনি বলিলেন, "একেবারে উল্টোরকম বর্ণনা দুজনের। নিজে না দেখলে বোঝা যাবে না। রসিকবাবু খুবই ভদ্র-লোক, তাঁর মেয়ে নিতে আর কোনো আপত্তি নেই যদি ছেলের পছন্দ হয় এবং মেয়ে অসুস্থ না হয়। পরশু যেতে আমি পারি, তুই চল্ আমার সঙ্গে। খোকাকেও সঙ্গে নিলে কেমন হয়। বারেবারে না গিয়ে সকলে একসঙ্গেই দেখে আসা যায়।"

হেমলতা বললেন, "না, না, ছেলেকে আগেই নিয়ে যেয়ো না। আগে আমরা দেখিশুনি, যদি আমাদের পছন্দ হয়, তাহলে খোকাকে নিয়ে যাব। তাহলে ওদের বলে পাঠাই পরশু বিকেলেই আমরা যাব।"

রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন, "রসিকবাবুর অবস্থাটা কেমন? খুব বেশী গরীব হলে অভয়ের পছন্দ হবে না বোধহয়। সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে টাকাকড়ি দরকার বটে।"

হেমলতা বললেন, "অবস্থা ভালই যতদূর জানি। দেশে বাড়ী ঘর আছে জমিজমা আছে কলকাতায় বাড়ী নেই অবশ্য। ছেলে নেই ভদ্রলোকের, ঐ দুই মেয়েই সব পাবে। শুনছি মেয়েটার রং তেমন ফরশা নয়। খোরকাল না হলে মেজে ঘসে নেওয়া যায়। আর খোকার তেমন ফরশা বাতিকও নেই।"

রামপদ বললেন, "মুখে ত অনেক ছেলেই অনেক কথা বলে, কাজে সেটা করতে পারে তবে না? সুন্দরী মেয়ে দেখলে স্বভাবতঃই মন আকৃষ্ট হয় আবার অসুন্দর দেখলে তেমনই স্বাভাবিক ভাবেই মন বিমুখ হতে পারে। যারা শুধু বাইরের খোলসটুকু দেখে, তারা রং দিয়েই বিচার করে।"

হেমলতা বললেন, "ও পরের মুখের পাঁচ কথা শুনে কিছু বোঝা যাবে না বাপু। নিজেরা গিয়ে দেখেই আসি। খুব কালো কি খুব মোটা হলে আমি পছন্দ করব না, তা বলেই দিলাম। শুধু ছেলের মনের দিকে চাইলেই হবে না, ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে ত? ঐ রকম বউ নিয়ে আসি, তারপর বাড়ীতে কালজিরের ক্ষেত বসে যাক্।"

রামপদ হেসে বললেন "সে একটা কথা বটে। অভয়ের মা ঠাকুরমার সংসারে ওরকম নাতি নাতনী মানাবে না।"

হেমলতা বললেন "যাক্‌গে, এদের ত জানিয়ে দিই যে আমরা পরশু বিকেলে যাচ্ছি। দিদির দেওরঝিটা শুনছি নাকি বেশ ফরশা। দিদি অবশ্য ইদানীং তাকে দেখেনি সেই কচি বয়সে দেখা। বয়স তা বছর বারো তেরো হবে বৈকি? তার মানেই ধরে নাও, চোদ্দ পনেরো। গ্রামের লোকের বয়স ভাঁড়ান রোগ ত আছেই?"

রামপদ উঠে পড়লেন, "আচ্ছা আমি এখন তবে চলিয়ে। উকীলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব। এই-উইল্-ট্রাইজের ব্যাপার আর কি?"

হেমলতা বললেন, "হ্যাঁ দাদা, দেশের জমিজমা সব যে দুই বোনকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিচ্ছ এতে খোকা রাগ করবে না? হাজার হোক ওরই ত পাওনা, পৈত্রিক সম্পত্তি যখন।"

রামপদ বললেন, "ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে, ও খুশী হয়ে মেনে নিয়েছে। কলকাতায় বড় বাড়ী করে দেব ওকে। গ্রামেও জ্যাঠামশাইয়ের ভাগের জমিটা ওর নামে কিনে দেব। তারপর বেঁচে থাকি যদি আরো কিছুকাল, তাহলে সেখানেও একটা ছোট বাড়ী করে দিয়ে যাব।"

"ভাল ব্যবস্থাই করেছ" বলে হেমলতা সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলেন। রামপদও তাঁর পিছন পিছন নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ভগীরথ রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে দেখে বলল, "নাও, এবার সত্যিই সুরু হল। যদি মেয়ে পছন্দ করে আসে তাহলে মেয়ের বাপের নামে বেনামা চিঠি ছাড়তে হবে একখানা, দাদাবাবুর কুচ্ছো করে।"

কনে দেখবার দিন ত এসেই পড়ল। হেমলতা ভাল শাড়ী ও মোটা মোটা কয়েকখানা সোনার গহনা পরে এবাড়ী এসে হাজির হলেন, তিনি রামপদর সঙ্গেই যাবেন। অভয়পদ ঘরে বসে একটু শঙ্কিত চিত্তে ভাবতে লাগল "মেয়ে একটু দেখতে ভাল হয় যেন হে মা দুর্গা। সুন্দরী চাইনা কথাটা অত বড় গলায় না বললেই পারতাম।"

মেয়ের বাপের বাড়ী এ পাড়ার কাছেই। নিতান্তই মধ্যবিত্ত সংসার, তা বাড়ীতে ঢুকেই বোঝা গেল। দোতলায় থাকেন তাঁরা। খান তিন-চার ঘর, লোকজন অনেকগুলি। একটি ঘর বাদে আর সব জায়গায় কপাট ভেজান। অতিথিদের সামনে আব্রু রক্ষার আর কোন ব্যবস্থা নেই। রান্নাঘর থেকে ফোড়নের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে। গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করলেন। একটি ছোট মেয়ে এসে হেমলতাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল।

রামপদ যে ঘরে বসলেন, সেটা শোবার ঘরই, কোনোমতে গোটা চার পাঁচ নানান ধাঁচের চেয়ার ও মোড়া এনে সেটাকে বসবার ঘরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে। বড় তক্তপোশের বিছানার উপর একখানা খুব বাহারের বেডকভার ঢাকা দেওয়া হয়েছে, গোটা দুই মোটা তাকিয়াও এনে সাজান হয়েছে। ছেলেদের পড়বার টেবিলটা সরানোর আর বোধহয় জায়গা নেই,

সেটা ঘরেই বিরাজ করছে। বই, খাতাপত্র তার উপর গোছান রয়েছে।

রামপদ গিয়ে বসলেন। আশে পাশের দরজা জানালার পথে নানারকম মনুষ্যমূর্ত্তি উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হেমলতা পাশের একটা ঘরে নূতন শতরঞ্জির উপর বসে আছেন আধখোলা দরজার ফাঁকে দেখা গেল।

প্রথমেই জলযোগপর্ব্ব। তার আয়োজন মন্দ হয়নি, তবে অঢেল কিছু নয়। রামপদ অল্প কিছু খেলেন। মনটা তাঁর চলে গেল বহুকাল আগের একটা গ্রীষ্মের সকালে। গ্রামের বাড়ী, চারিদিক কাঁচাসোনার রঙের রোদে ঝলমল করছে। ফুলের গন্ধে ঘর ও ঘরের বাহির একেবারে সৌরভভারাক্রান্ত। হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক অলৌকিক দেবীমূর্ত্তি। মানুষে এত সুন্দর হয় তা রামপদ আগে কখনও দেখেননি।

মেয়ের বাপের কণ্ঠস্বরে তাঁর দিবাস্বপ্ন হঠাৎ ছুটে গেল। "কিছুই খেলেননা যে রামপদবাবু?"

রামপদ বললেন, "বিকেলে ভুরিভোজন অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছি ত। দু-একখানা বিস্কুট বা একমুঠো মুড়ি এই খাই।"

"ও আচ্ছা, তা হলে পান নিয়ে আয়রে", বলে গৃহকর্ত্তা একটা রুদ্ধ কপাট দরজার দিকে তাকালেন। দরজাটা হড়াৎ করে খুলে গেল, বেরিয়ে এল একজন আধাফর্সা শাড়ীপড়া ঝি আর একটি মেয়ে, হাতে তার একটা রূপোর পানের ডিবে।

হ্যাঁ, "ঢ্যাঙলড়ঙ্গা" মেয়ে বটে। লম্বায় বাপের কাছাকাছি যায়। তবে মোটাসোটা নয় তেমন বরং যত লম্বা তার তুলনায় কৃশই বলা যায়। হাতের ডিবে রামপদর সামনে নামিয়ে রেখে সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ল।

মেয়ের পরণে ঘোর সবুজ রংএর মখমলের জামা এবং সেই রংএরই একখানি ফুলতোলা ঢাকাইশাড়ী। চুল খুব শক্ত করে বাঁধা, খোঁপাটি প্রায় ছোটখাট সুদর্শনচক্র বিশেষ, অনেকগুলি রূপোর কাঁটা, ফুল আর প্রজাপতি দিয়ে সুশোভিত। গলায় ভারি পান্নার কণ্ঠী, হাতে চুড়ি বালা, কানে ভারি জড়োয়া ইয়ারিং। পা খালি, বেশ চওড়া করে আলতা পরা। মুখে পাউডার বা আর কোনো প্রসাধনের চিহ্ন নেই। মেয়ের রং যে একেবারেই ফরশা নয়, তা গোপন করার কোনো চেষ্টা হয়নি। দেখলে মনে হয় বয়স পনেরো ষোলো হবে। মেয়ে দেখে মন খুশী হয়না।

রামপদ নিয়মমত জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, তোমার নামটি কি?"

উত্তর এল, "সরযূবালা দেবী।"

"কতদূর পড়েছ?"

মেয়ে কিছু বলবার আগেই তার বাবা বললেন, "ইস্কুলে ত দিই নি, মা ও-সব পছন্দ করেননা। বাড়ীতে একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে বাংলা, ইংরিজি, সংস্কৃত পড়েছে। সেলাই গান এ সবও শিখেছে। ইস্কুলের এনট্রান্স্ ক্লাশের মত পড়েছে।"

হেমলতা অনুরোধ করে পাঠালেন ঝিয়ের মারফত, মেয়ের গান একখানা তিনি শুনবেন। অতএব একটা বক্স হারমোনিয়ম এল। সরযূ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বসল, তক্তপোশের উপর, হারমোনিয়মের সামনে। গলা ছেড়ে একখানা কীর্ত্তন ধরে দিল। যাঁর কাছে গান শিখেছে তাঁর নির্দ্দেশমত হাত মুখ নাড়াগুলিও বাদ দিলনা।

রামপদ আধখোলা জানলার পথে দেখতে পেলেন, হেমলতা বেশ ভ্রুকুটি করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। এরপর আর দু-একটা অবান্তর কথা বলে তাঁরা উঠে পড়লেন। কালপরশুর মধ্যে মতামতটা জানিয়ে দেবেন এই আশ্বাস দিয়ে এলেন রসিকবাবুকে।

গাড়ীতে উঠেই হেমলতা বললেন, "বাবাঃ, কি তাল ঢিড়িঙে চেহারা। যেন গিরীশ ঘোষের 'পাহারাওয়ালা-মাসী!' ঐ মেয়ে আমাদের পাশে? মনে হবে ছেলেকে যেন পেত্নীতে পেয়েছে।"

রামপদ বললেন, "তাই বলে অতটাই খারাপ নয়। ভাল দেখতে নয় তা ঠিক। কি বলব ওদের ভাবছি।"

হেমলতা বললেন, "সোজা জবাব দিয়ে দেওয়াই ভাল। খোকা না হয় বলেছে পরমাসুন্দরী চাইনা, তাই বলে কুৎসিত চাই একথাও ত বলেনি ?"

রামপদ বললেন, "তা বলেনি অবশ্য। এখন তাহলে বাকি রইল কনকের দেবরঝিকে দেখা। চেহারা কেমন জানিনা, সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল হবার কথা নয়। নামটা খুব সরেশ, এইমাত্র বোঝা গেল।" "কি নাম ?"

রামপদ বললেন "অপরূপা। ও রকম নাম রাখতে নেই। ওসব নামের মর্য্যাদা রক্ষা করতে কটা মানুষই বা পারে, মাঝ থেকে কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়ে যায়।"

হেমলতা বললেন, "তা কি করবে মানুষ ? ছেলে মেয়ে সুন্দর হবে, এইত সব বাপ মায়ের সাধ। কিন্তু ভগবান্ কি আর সকলের সাধ পূর্ণ করেন ? কাজেই ভাল ভাল নাম রেখেই ওরা মনের ক্ষেদ মেটায়। না হলে আমার নাম কেউ হেমলতা রাখে ? লোহালতা রাখলে বরং ঠিক হত।"

রামপদ বললেন, "যত সব বাড়াবাড়ি। কেন, হেমলতা আর লোহালতার মাঝামাঝি কিছু নেই নাকি ?"

গাড়ী এসে রামপদর বাড়ীর দরজায় দাঁড়াল। অভয়পদ বেরিয়ে এল বারান্দায়। হেমলতা নেমে পড়ে বললেন, "যাই, বেচারার সংশয় মিটিয়ে আসি।"

অভয়পদ নেমে আসছে দেখে রামপদ উপরে উঠে গেলেন। হেমলতা ভাইপোকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "এখানে সুবিধা হল নারে, বড় কুচ্ছিত মেয়ে। এইবার দিদির দেওরঝিটাকে দেখতে হয়। বলেছিল বটে যে পুজোর সময় দেখাবে, তা অত দেরি করা চলবেনা। আজ চিঠি লিখে দিচ্ছি, দশ বারদিনের মধ্যে মেয়ে দেখানর ব্যবস্থা করতে। দশ ক্রোশ দূরে ত মেয়ের বাপের বাড়ী, তা আর আসতে পারবেনা ? নাকাতে নাকাতে আসবে। তোর উপরে কি কম লোভ ওদের ?"

(৮)

আবার সেই গ্রাম। এ গ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা প্রায় পঁচিশ বছর আগে। হঠাৎ যদি কেউ এরোপ্লেন থেকে দেখে তাহলে মনে হবে, যেমন তখন দেখেছিলাম তেমনই আছে শুধু যেন একটু ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামে ঢুকে হেঁটে বেড়াও পথে পথে, অনেক তফাৎ চোখে পড়বে। গ্রামের লোকজন কিছু কমে গেছে মনে হয়, বাড়ী ধ্বসে পড়েছে দু-দশ-খানা। আধভাঙা বাড়ীর সংখ্যা, চালের খড় উড়ে-যাওয়া কুঁড়েঘরের সংখ্যা বেড়েছে। বারেবারে দুর্ভিক্ষ অজন্মার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে, ফলে অনেক লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। যারা টিকে আছে তাদেরও আগের মত হাসিমুখ নয়।

তবে উন্নতির লক্ষণও দেখা যায় দুচারটে। এখন রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে এখানে, অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়ী চড়ে আসতে হয়না। আর কোথাও থাক বা নাই থাক, স্টেশনে খান দুই ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায়। গোটা দুই পাকা রাস্তা হয়েছে, বর্ষা নামলেই পথঘাট একহাঁটু কাদায় ডুবে যায়না। ট্রেণ যাতায়াতের দরুণ দুচারটে মণিহারী দোকান হয়েছে আশেপাশে, হাটেও ঢের বেশী জিনিষপত্র আসে এধার ওধারের গ্রামগুলি থেকে।

রামপদদের সাবেকী বাড়ী এখনও আগের মতই অনেকখানি জমি জুড়ে আছে। তবে নানাভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় আগের সে শ্রী আর নেই। বিন্ধ্যবাসিনীর সেই সুন্দর ফুলের বাগানটি আর নেই। জমিটা এখন হেমলতার। তিনি সেটাকে নীচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে রেখে দিয়েছেন, আগাছায় ও ঝোপে-ঝাড়ে ভরে উঠেছে। বাড়ী এখন অনেক নির্জ্জন হয়ে পড়েছে, ছেলে ছোকরারা বেশীর ভাগ এখন এখানে থাকেনা, হয় কাছের শহরে চাকরি করে নয় কলকাতায় পড়াশুনা

করে। বুড়ো বুড়ী, বিধবা এরাই এখন বেশীর ভাগ এখানে বাস করে, কচি ছেলে মেয়েও আছে অবশ্য অনেকগুলো।

রামপদর দুই কাকা এখনও বেঁচে। তাঁরা বুড়ো এবং অপটু হয়ে পড়েছেন। তবু তাঁদেরই বিষয়সম্পত্তি দেখা-শোনা করতে হয় কোনোমতে, কারণ ছেলেরা পারতপক্ষে গ্রামে থাকতে চায়না, তাতে যা লোকসান হয় হোক। গৃহিণীরা কর্তাদের চেয়ে বয়সে খানিকটা করে ছোট হওয়ায় এখনও খানিকটা শক্ত সমর্থ আছেন। কাজেই ঘর-সংসার চলছে একরকম। তবে রামপদর বাল্য ও প্রথম যৌবনের সেই নির্মল পরিপাট্য আর নেই বাড়ীর। মেজগিন্নী আর ছোটগিন্নী এখন বিনাবাধায় ঘরদোর অগোছাল করেন, এবং তেলচিটে ময়লাশাড়ী পরে থাকেন। উঠানের এদিকে ওদিকে ছোটখাট আঁস্তাকুড়ও গজিয়ে উঠেছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর ঘরগুলিতে এখন কনকলতা বাস করেন তাঁর রুগ্ন স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। হাজার হোক, বিন্ধ্যবাসিনীর মেয়ে, কাকীমাদের চেয়ে তিনি অনেকটাই গোছাল ও পরিষ্কার। তবে ছেলেমেয়ে অনেক, কাজে সাহায্য করবার বিশেষ কেউ নেই এবং সবার উপরে অর্থাভাব তাঁকে অনেকখানিই অক্ষম করেছে। তবুও তাঁর উঠোন তকতক করছে নিকোনো, কোথাও আবর্জনা নেই। কাচা কাপড় যেগুলি উঠোনে শুকোচ্ছে, সেগুলিও বেশ ধবধবে করে কাচা। ঘরগুলি জিনিষপত্রে ঠাসা, তবে ধুলিধূসরিত নয়। শ্রী নেই, পরিপাট্য নেই, কিন্তু নোংরামিও নেই।

এই সংসারের মধ্যে কনকলতার জা তাঁর এক ছেলে এবং বিবাহযোগ্যা মেয়েটিকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাসাঠাসির মধ্যেই কোনোমতে তাঁদের জায়গা হল। দুতিনটে দিন কেটে যাবে কোনোমতে। খুব দরকার পড়লে গরমের দিন, রাত্রে উঠোনেও ছেলেরা শুতে পারে। এদের জায়গা হল বটে, কিন্তু পরদিন ত আবার রামপদ, অভয়পদ আর হেমলতা আসবেন, তাঁদের কোথায় জায়গা দেওয়া হবে?

রক্ষা করলেন মেজকাকীমা। সময়মত পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন বলে এঁদের মধ্যে কোনো বৈরিতা বা বিদ্বেষ ছিলনা, মোটামুটি মিলেমিশেই ছিলেন। তিনি সমস্যার কথা শুনে বললেন, "কেন ওরা শিবুর ঘরে থাকুকনা? ঘর ত খালিই রয়েছে, ওর আসতে দের দেরি। নূতন করে নিকিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।" তাই করা হল।

পরদিন সকালের ট্রেণে পিতাপুত্র আর পিসীমা এসে উপস্থিত হলেন। এরই মধ্যে গরমে সকলের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। হেমলতা বললেন, "চল্‌তরে আমার সঙ্গে কেউ। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে আসি। গরমে যেন গা গুলিয়ে উঠেছে।"

কনকলতা ধমক দিয়ে উঠলেন, "কচি খুকী না কিরে তুই? গরমে পুড়তে পুড়তে এসেই পুকুরে ডুব দিবি কি? সর্দিগর্মি হয়ে মরবিনা? বোস্ দুদণ্ড, জিরিয়ে নে, সরবৎ করে রেখেছি ঘোলের, খানিকটা খেয়ে নে তারপর না চানের কথা।"

দিদির ধমক খেয়ে হেমলতা সেখানেই মাদুরের উপর শুয়ে পড়লেন। সামনেই একটি দশবারো বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে ডেকে বললেন, "ওরে এই খুকি, কি নাম তোর, একখানা তালপাখা নিয়ে আয় ত।"

মেয়েটি মেজকাকীমার নাতনী, সে ছুটে গিয়ে একখানা তালপাখা নিয়ে এল, তার মায়ের ঘর থেকে। হেমলতার পাশে বসে পড়ে সে তাঁকে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল। কনকলতাও আর একখানা পাখা নিয়ে রামপদ আর অভয়পদকে হাওয়া করতে লাগলেন।

অভয়পদ লজ্জিত হয়ে পাখার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "ওকি পিসীমা, তুমি আবার আমাকে হাওয়া করবে কি? দাও, আমাকে দাও।"

কনকলতা এক ঝট্‌কায় পাখাখানা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে বললেন, "যা যা, ওসব সাহেবী তোর কলকাতায় বসে করিস্। আমরা গেঁয়ো মানুষ, তাই ভাইপোকে বাতাস করলে আমাদের জাত যায়না।"

রামপদ হেসে বললেন, "কলকাতায় থাকলেই কি

সাহেব হয়ে গেল? তা হলে ত হেমও সাহেব, ও ত নিশ্চিন্ত মনে খুকির হাতের বাতাস নিচ্ছে।"

যাক আর এক খুকি এসে জোটাতে তর্কাতর্কি থেমে গেল। কনকলতা হাতের পাখা তাহার হাতে সমর্পণ করে এবার ঘোলের সরবৎ আনতে চললেন। রামপদ, অভয়পদ, হেমলতা সকলে বড় বড় পাথরের গেলাশে করে সরবৎ খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সত ছেলেপিলে ছিল সবাই পাথরবাটি নিয়ে বসে গেল। কনকলতার হাতের তৈরি সরবৎ এ বাড়ীর খুব প্রসিদ্ধ জিনিষ।

এরপর সবাই কাপড়-চোপড় নিয়ে স্নানের উদ্দেশ্যে পুকুর ঘাটের দিকে চললেন। এইটি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড়পুকুর, এর উল্লেখও সবাই করে 'বড়পুকুর' বলে। জল বেশ পরিষ্কার, ঘাটগুলিও ভাঙাচোরা নয়। মেয়েদের ঘাট এখনও কলরবমুখরিত, ছেলেদের ঘাটের ভীড় অনেকটাই কমে গেছে। রোদ তখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। একটু তাড়াতাড়ি করেই তাঁরা স্নান সেরে বাড়ী ফিরে এলেন।

এবেলা খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন মেজকাকীমা। গৃহিণীদের মধ্যে এখন তিনিই বয়স এবং সম্পর্কে সব চেয়ে বড়, কাজেই কনকলতা তাঁর অনুরোধ ঠেলতে পারেননি। তিনি না-হয় রাত্রেই খাওয়াবেন। কালকের দিনটাও ত এরা আছে।

স্নান সেরে সবাই ফিরে আসতেই কনকলতা বললেন, "কোথায় জায়গা করব মেজকাকীমা? আর দেরিতে কাজ নেই, তোমার রান্না ত হয়েই গেছে। ছেলেদের জায়গা করি তোমার ওদিকের বারান্দায়?"

মেজকাকীমা বললেন, "তাই কর্ বাছা, খালি তোর মেজকাকার খাবারটা আমার শোবার ঘরে জলচৌকির উপর দে। বাতের ব্যথায় ত আসনে বসতেই পারেনা। একখানা চৌকিতে বসে আর একখানার উপর থালা রেখে খায়।"

অভয়পদ হেসে বললে, "তোমরাও ত দেখি সাহেবী শিখেছ মেজদিদি। টেবিলে খাওয়ার দিকে এগোচ্ছ?"

মেজগিন্নী হেসে বললেন, "হ্যাঁ ভাই, তুমি যেন সাহেব ঘরে এলে এখন মেম না হয়ে করি কি? একটি গাউন যদি সঙ্গে আনতে ত পরে পাশে বসতাম।"

রামপদ উপস্থিত থাকাতে অভয়পদ উপযুক্ত জবাব কিছু দিতে পারলনা। কনকলতা জায়গা করে এসে বললেন, "ওঠ সব, পাতা করে এসেছি।"

রামপদ উঠে এসে বললেন, "এইতেই হয়ে যাবে, এতগুলি বউঝির, ছেলেমেয়ের?"

মেজকাকীমা বললেন, "তুই যেন কি বাছা? বউঝিরা এর মধ্যে বসবে কি? শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে তারা বসে খেতে পারে? ওরা পরে খাবে এখন, আগে তোদের হয়ে যাক।"

রামপদ বিরক্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, "আমিও তা হলে মেয়েদের সঙ্গে খাব। কচিকচি মেয়েগুলো সব মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফেলে রেখে আমরা বুড়ো ঢেঁকিরা গিলতে বসব কি?"

অভয়পদ মনে মনে ভাবল, "বাবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। সবাইকে খাইয়ে মেয়েরা পরে খাবে, কি সুন্দর আদর্শ! না, সাহেবীয়ানা করে সবাইকে একসঙ্গে খেতে হবে।"

হেমলতা তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "না, না, অত দেরি করলে দাদার মাথা ধরবে, ওর মোটে অনিয়ম সহ্য হয়না, আর তাহলেই তোমাদের গোধূলি লগ্নে মেয়ে দেখান শিকেয় উঠবে। চল দিদি, তার চেয়ে তোমার ছোট শোবার ঘরে মেয়েদের জায়গা করি। আমি আর তুমি পরিবেশন করব এখন। বাড়ীতেও আমার বেলা দুটো আড়াইটের আগে কোনোদিন খাওয়া হয়না, দেরি হলে আমার কিছু অসুবিধা হবেনা। বেলা না হলে আমার ক্ষিদেই হয়না।"

হেমলতার কথামত কাজ করে দুপুরের খাওয়াটা ভালয় ভালয় সম্পন্ন হয়ে গেল। তারপর সবাই চলল নিজের নিজের স্থানে একটু গড়িয়ে নিতে। হেমলতা আর দাদার ঘরে শুলেননা। কনকলতার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে এসে বললেন, "আমি এইখানেই শুই একটু দিদি, তোর সঙ্গে গল্প করি। কতকাল পরে দেখা।"

কনকলতা বললেন, "এখানে ত এখন শোওয়া চলবে না ভাই। এ ঘরটাই পরিষ্কার করে মাদুর শতরঞ্জি পেতে

কনে দেখানর জায়গা করতে হবে। এটা ছাড়া আর বড় ঘর ত এদিকে নেই। মেজকাকীমা, ছোটকাকীমার খানদুই বড় ঘর আছে বটে, তবে তাঁরা এমন ছিরি করেছেন সে সব ঘরের যে দশদিনেও পরিষ্কার করা যাবে না।"

দুই বোনে মিলে জিনিষপত্র ঠেলে-ঠুলে কিছু বা অন্য ঘরে চালান করে দিয়ে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা করলেন। রাজ্যের শতরঞ্জি, মাদুর, পাটি সব এনে পাতা হল। কনের জন্যে একটা কার্পেটের আসন দেওয়া হল। হেমলতা বললেন, "মা থাকতে কি সুন্দর করে ঘর সাজাতেন ভাই। মনে হত যেন দেব-মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি।

কনকলতা বললেন, "সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। ইচ্ছে ত করে আমারও, কিন্তু সে সামর্থ কোথায়? নেহাৎ দাদার দয়ায় খেয়ে-পরে বেঁচে আছি, না হলে কোন গোভাগাড়ে গিয়ে মরতাম কে জানে? বাবা শুধু কুল দেখলেন, স্বাস্থ্য ত দেখলেন না, নইলে অমন রোগা মানুষের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয়?"

হেমলতা বললেন, "তোমার অদৃষ্টের দোষ, বাবা কি করবেন বল? বাবা যখন ছেলে দেখতে গেলেন তখন কি সুন্দর চেহারা ছিল জামাইবাবুর। যেমন রং, তেমন মুখশ্রী! একটু রোগাটে গড়নের, আমাদের ঐ অভয়ের মত, তা অমন ত কতই থাকে। তা সেই যে পুরো হাঁপ-কাশের রুগী হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত?"

কনকলতা বলিলেন "অদৃষ্ট না অদৃষ্ট। ছেলে-পিলে-গুলোকেও বা কোথায় মানুষ করতে পারলাম? যাকগে, ওসব ভেবে লাভ নেই। আমার এ জীবনটা এই ভাবেই যাবে।"

হেমলতা কথা ঘুরোবার জন্যে বললেন, "দিদি, তোর জা কোথায় রে? একবারও ত তাকে বা তার মেয়েকে দেখলাম না?

"তারা সব ঠাকুর-ঘরে লুকিয়ে বসে আছে। তোরা আসার আগে গিয়ে পুকুরে চান করে এসেছে, তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে এসেছে। যখন তারা দেখাবে, তার আগে কেউ যেন মেয়েকে না দেখে এই তাদের ইচ্ছে। যাক্ ঘর ত একরকম ঠিক হল, এখন ছোটগিন্নী মেয়ের কি ব্যবস্থা করছেন চল দেখি গিয়ে। সে আবার সাত বোকার এক বোকা। মেয়ের কাপড়-চোপড় কি এনেছে কে জানে? কনে দেখাতে হলে একটু পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতে হয় সে জ্ঞানটুকুও তার আছে কিনা সন্দেহ। ও ছোটবৌ, একবার এদিকে আয়না, আমার বোন হেম তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছে।"

পাশের পুজোর ঘর থেকে একটি নারীমূর্ত্তি বেরিয়ে এলেন। চেহারা রোগজীর্ণ, বেশবাসও জীর্ণ। এসেই ঢিপ করে হেমলতাকে প্রণাম করলেন।

হেমলতা হাতধরে তাঁকে তুলে বললেন, "আমাকে আবার প্রণাম কেন ভাই। আমি তোমার চেয়ে বড় হব না।"

কনকলতা বললেন, "সেই সকাল থেকে ঐ গরম ঘরটায় জুজুবুড়ী হয়ে বসে আছিস্ কেন? মেয়েটা ত শুকিয়ে উঠল। কি শাড়ীটাড়ী এনেছিস ওর? শহুরে মানুষরা সব দেখবে, ভাল করে সাজিয়ে দিতে হবে ত?"

ছোটবৌ বললেন, "ওর কি কিছু আছে দিদি, যে, নিয়ে আসব? পুজোর সময় পর্য্যন্ত একটা তাঁতের শাড়ী পায় না। যা ঘরে পরে তাই পরেই এসেছে।"

কনকলতা বললেন, "হয়েছে। আগে বলনি না কেন? চেয়েচিন্তে আনতাম। আমার ত ও সব ভাবোম কোন্‌কালে উঠে গেছে। মেয়েগুলোর জন্যেও কখনও কিছু করাইনা, ভাবি বিয়ের সময় ত এককাঁড়ি দিতেই হবে। যাই, দেখি, ছোটকাকীমার বউটার কাছে যদি কিছু থাকে। তাও আবার তার মা যা দজ্জাল, ভাল শাড়ী গহনা কিছু সে আনতে দেবে না এখানে। মাটির দেওয়াল খড়ের চাল, ডাকাতে সব লুটে নেবে একদিনেই, এই তার ধারণা।"

ছোটকাকীমার বউয়ের কাছে মানানসই শাড়ী জামা জুটে গেল, তবে গহনা প্রায় কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। পাড়াগাঁয়ে অত সোনার গহনা পরে কে বা বেড়াচ্ছে। একজোড়া বালা অনেক কষ্টে জোগাড় হল, আর কনক-লতা নিজের একমাত্র গহনা, একটা খোটা বিছে হার কনের গলায় পরিয়ে দিলেন। ছোটকাকীমার বউ এসে

একটু ভাল করে চুল বেঁধে আর মুখে পাউডার মাখিয়ে নব্যভাবে শাড়ী পরিয়ে সাজিয়ে দিয়ে গেল!

একজন দুজন করে বাড়ীর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষগুলি কনকলতার ঘরে এসে বসলেন। ছোটরা চারিদিকে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে বেড়াতে লাগল, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসা তাদের কুষ্ঠিতে লেখে না।

রামপদ আর অভয়পদও এসে বসলেন। অভয়পদ অবশ্য অনেকটা পিছনে। ওরই মধ্যে সে একটু সেজে-গুজে নিয়েছে। সে ত কনেকে দেখবে, কনেও কি আর লুকিয়ে চুরিয়ে একবার তাকে দেখে নেবে না?

ঘড়ি দেখে সময় নির্ণয় করে কনকলতা বললেন, "এই-বার ঠিক সময় হয়েছে। অপুকে বার করে নিয়ে আয় ওঘর থেকে।"

অপু? অপরূপা! অভয়পদর মনে যেন বীণা বেজে উঠল। দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটা খুলে গেল, কনকলতার দুই মেয়ে হাত ধরে আর একটি জড়সড় মেয়েকে নিয়ে এসে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়ে দিল।

সকলে দেখল, একটি ছোট-খাট মেয়ে, গড়ন একটু রোগাই বলা চলে। গায়ের রং ফরশাই বোধহয়, গ্রামের জল হাওয়ার গুণে রোদপোড়া দেখাচ্ছে। চুলগুলি কোঁকড়া। চোখ এমনভাবে মাটিতে নিবদ্ধ যে সেগুলির আকার বা রং কিছু বোঝা যায় না।

কনকলতা তাড়া দিয়ে বললেন, "ওরকম পুঁটলি পাকিয়ে বসেছিস্ কেন? সোজা হয়ে বোস্। তোকে দেখবে কি করে লোকে, মুখ ত প্রায় হাঁটুর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ঘাড় সোজা কর্ দেখি।"

জ্যাঠাইমার তাড়ায় অপরূপা সোজা হয়ে বসল। এই ফাঁকে অনেক জোড়া চোখ তাকে ভাল করে দেখে নিল। রামপদ বললেন, "একেবারে নিতান্তই গ্রামের মেয়ে। অনেক শেখাতে হবে একে।"

হেমলতা ভাবলেন, "দেখতে এমন কিছু নয়, তবে অযত্নে মানুষ, ভাল করে খেলে মাখলে চেহারা ফিরে যেতে পারে। বয়েস চোদ্দ পনেরোর বেশী নয়। তবে বাপু গো-মুখ্যু। মানুষের দিকে কেমন করে যে তাকাতে হয় তাও জানে না।"

অভয়পদ ভাবল, "আহা, কি করুণ মুখখানি। দেখলেই ইচ্ছে করে একে আশ্রয় দিই। এই রকম বনের পাখীর মত মানুষই ত আমি চেয়েছিলাম। একে যা শেখাব ও তাই শিখবে। একেবারে Shakespeare-এর মিরান্দা। আর কি সুন্দর নাম অপরূপা!"

রামপদ বললেন, "এখানে বেশী formality-র ত কোনো দরকার দেখিনা। নিজের ঘরে বসে ঘরের মেয়েই দেখছি যেন। নামও ত শুনলাম। তা পড়াশুনো কি রকম করেছে? আমরা ইস্কুল মাষ্টার মানুষ, ঐ খবরটাই আগে নিই।"

কনে উত্তর দিলনা, তার মাও কথা বললেননা। খালি তার ভাই বলল, "ইস্কুলে ত পড়েনি, গ্রামে মেয়েদের পড়াবার কোনো ব্যবস্থা নেই। বাবার কাছে কিছু কিছু বাংলা আর ইংরিজি পড়েছে।"

কনকলতা বললেন, "ঘরকরণার কাজ সব ভালই জানে। সেলাইও ভাল জানে। কাঁথা সেলাই করে একবার এক একজিবিশনে প্রাইজ্ পেয়েছিল।"

হেমলতা ভাবলেন, "আহা, কি সুশিক্ষিত মেয়েই আসছেন আমার পণ্ডিতদাদার ঘরে। অভয়টা যেমন হাঁদা, তার উপযুক্ত বউই হবে।"

সামনাসামনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার না থাকাতে রামপদ এবার উঠে পড়াতে সভাভঙ্গ হয়ে গেল। পুরুষরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, মেয়েরা নানাভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগল। অপরূপা আর তার মা আবার গিয়ে পূজার ঘরে আশ্রয় নিলেন।

কনকলতা রামপদর পিছন পিছন কিছুদূর এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ দাদা, কি বলব তবে ছোট বৌকে?"

রামপদ বললেন, "শুধু চেহারা দেখে ত চট্ করে কিছু বলা শক্ত। দেখতে ত বিশেষ ভাল নয়। তবে অভাবের মধ্যে মানুষ, যত্নে আদরে থাকলে খানিকটা উন্নতি সেদিকে হতে পারে। ঘরটা ভাল, জানা ঘর। মেয়েকে লেখাপড়াও এঁরা বিশেষ কিছু শেখাননি।

সাংসারিক অবস্থা ত একেবারে ভাল নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে।”

কনকলতা বললেন, “সে কথা সত্যি, তবে আমি বলেছিলাম ওদের, যে, ছেলের বিয়েতে তুমি টাকা নেবেনা।”

রামপদ বললেন, “টাকা আমাকে দিতে হবেনা, তবে মেয়ের বিয়েতে নানারকম খরচা আছে ত? সেসব ওঁরা ঠিকমত করতে পারবেন কি? আমার ত বাড়ীতে এইটিই প্রথম কাজ এবং শেষ কাজও। কাজেই কোথাও ত্রুটি থাকে এটা আমি চাইনা।”

কনকলতা চিন্তিত মুখে বলিলেন, “ওদের কিছুই নেই দাদা বসতবাড়ীটা আর কয়েক বিঘা ধান জমি ছাড়া। কিছু থাকলে কি আর আমি এমনভাবে তোমাদের ঘাড়ে পড়তাম? তোমার একমাত্র ছেলের বিয়ে যেভাবে হওয়া উচিত সে রকম আয়োজন ওরা কিছুই করতে পারবেনা। কিন্তু মায়ের একমাত্র নাতি, বৌদির একমাত্র ছেলে, তার বিয়ে ওরকম হা-ঘরের মত হতে পারেনা ত? স্বর্গ থেকে দেখে তাঁদের আত্মা কষ্ট পাবে যে? ওদের তাহলে না বলেই দিই?”

রামপদ বললেন, “অত সাত তাড়াতাড়ি না বলতে হবেনা তোমাকে। অভয়ের বউ সম্বন্ধে পছন্দটা একটু অভিনব। আধুনিকতা সে একেবারেই পছন্দ করেনা। হয়ত ওর অপুকে পছন্দ হয়েও যেতে পারে। হেমকে ডাক দেখি, খোকা তার ছোট পিসীর কাছে অনেক মনের কথা বলে।”

হেম বারান্দায় দাঁড়িয়ে অভয়পদর সঙ্গেই কথা বলছিলেন। দিদির ডাকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, “যাই গো।” ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ঐ কথাই বলি গে তবে দাদাকে?”

অভয়পদ বলল, “হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কি বলবে? আমার যা সত্যিমত তাইত বলব? না অন্য সকলের মুখ চেয়ে তাদের পছন্দমত কথা আমার বলতে হবে? তা হলে আমাকে না নিয়ে এলেই হত।”

হেমলতা বললেন, “তাই বলছি গিয়ে বাপু, আগেই চটিস কেন? ফিরে এসে বলব এখন দাদার কি মত। বাড়ীতেই থাকিস, কোথাও বেরিয়ে যাসনে যেন।”

হেমলতা কাছে আসতেই রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন, “খোকা কি বললে? মেয়ে পছন্দ হয়েছে?”

হেমলতা গালে হাত দিয়ে বললেন, “অবাক্ কাণ্ড দাদা! ঐ মেয়েকেই তোমার ছেলের ভয়ানক ভাল লেগে গেছে। ওকেই ও বিয়ে করতে চায়।”

রামপদ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “বেশ, এর উপরে আর কথা নেই। সবার উপরে ওর মতটাই থাকা উচিত, তাই থাকবে। মাঝ থেকে আমাকে বর-কর্ত্তা আর কন্যাকর্ত্তা দুইই হতে হবে, এই যা মুস্কিল।”

কনকলতা বললেন, “বিয়েটা না-হয় ওরা যেমন তেমন করে দিক, বউভাতটা তুমি কলকাতায় গিয়ে খুব ঘটা করে কোরো।”

রামপদ বললেন, “সে হয় না রে। একমাত্র ছেলে, তার বিয়েতে যদি কোনো ত্রুটি হয় সেটা আর সংশোধন করবার সুযোগ পাওয়া যাবেনা। আমার মায়ের বড় সাধ ছিল এই ভিটেয় তার নাতির বিয়ে হয়, তাই হবে। আমি কলকাতায় ফিরেই সব জোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ করব। তুমি তোমার জাকে কথা দিয়ে দাও। এটাও বলে দিও, যে, তাঁদের কিছুই করতে হবেনা, শাঁখা শাড়ী পরিয়ে কন্যাদান করবেন। আর সব ভার আমার। আমাদের এদিকে চলন নেই, তবে বাংলা দেশের অন্য অঞ্চলে নিয়ম আছে, বরের বাড়ী মেয়ে এনে বিয়ে দেওয়া। অশাস্ত্রীয় কিছু নয়। ওঁদের এটাতে রাজী হতে হবে।”

কনকলতা বললেন, “তা যেমন অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা। বললেই হবে যে জ্যাঠাইমার বাড়ীর থেকে বিয়ে হচ্ছে।”

হেমলতা বললেন, “আমার জমিটা আর জ্যাঠা-মশাইয়ের জমিটা পরিষ্কার করতে লোক লাগাও দিদি। তাঁবু খাটিয়ে হোক কি ছিটেবেড়ায় ঘর তুলে হোক, বরযাত্রী রাখতে হবে ত?

ক্রমশঃ

শিল্পতীর্থ-খাজুরাহো

রামপদ মুখোপাধ্যায়

জায়গাটা দূর না হলেও কিছুটা দুর্গম। রেল-ষ্টেশন থেকে ষাট সত্তর মাইল বাস বা মোটরে যেতে হয়। একটা পথ সাতনা থেকে সত্তর মাইলের মত—ছ'ঘণ্টা যানের মেয়াদ, অন্যটা মাওরা থেকে প্রায় ষাট মাইল। মাহোরা আবার মধ্য রেলপথের একটা শাখা লাইনের (মানিকপুর-ঝাঁসি) মাঝখানে পড়ে—; ওটা আগ্রা (দিল্লী যাত্রীদের পক্ষে সোজা পথ। বাংলা থেকে যাঁরা আসবেন—তাঁদের পক্ষে সাতনাই ভাল। জব্বলপুর থেকে এলেও ওই সাতনা। আমরা জব্বলপুর থেকে আসছিলাম, সাতনায় পৌঁছালাম সন্ধ্যাবেলা। ভোর ছ'টায় বাস ছাড়বে ষ্টেশনের গা থেকে—সুতরাং রাতটা প্রতীক্ষালয়েই রয়ে গেলাম। ষ্টেশনের প্রতীক্ষালয় মানেই হট্টমন্দির। মাঝরাত পর্য্যন্ত গাড়ী আসা-যাওয়ার হৈ হৈ হট্টগোল চলল—জোরালো আলোটাও জ্বলতে লাগল। তারই মাঝে এক সময়ে তন্দ্রাও নামল চোখে। সেই ঘোর কাটতে না কাটতে রাতের আকাশ ফিকে হয়ে এলো—আমরাও হাত মুখ ধুয়ে বাসে এসে বসলাম।

বাসের ড্রাইভার, ক্লীনার, কণ্ডাক্টার বাসের মধ্যে সীটগুলি জুড়ে তখনও ঘুমুচ্ছিল। যাহোক—আমরা আসতেই ওরা উঠে বসল এবং পরিধেয়, পাগড়ী ও দাড়ি গুছিয়ে নিতে লাগল। তা সে করতেও সময় লাগল আধ ঘণ্টার মত। তারপর গাড়ী ধোয়া মোছাতে গেল কিছু সময়। তারপরও কিন্তু গাড়ী ছাড়ল না—ড্রাইভার একখানা টেলিগ্রামের ফরম হাতে প্লাটফরমে পায়চারি করতে লাগল। কি ব্যাপার? ট্রেণে চল্লিশ জনের মত একটা পার্টি আসছে—তারা তারযোগে বাসটা রিজার্ভ করিয়ে রেখেছে। তাহলে আমাদের উপায়? কণ্ডাক্টার অভয় দিলেন, ঘাবড়াইয়ে মাৎ। পঁয়তাল্লিশ আসনের যান—চল্লিশ বাদ দিলেও তোমাদের তিনজনকে নেওয়া চলবে। তবু ভাল—না হলে আমাদের তো অকূল পাথার। সবে ধন নীলমণি এই বাসখানা সরাসরি যায় খাজুরাহো। আর আর বাসে পান্নায় 'গাড়ী বদল' করতে হয়। মোট-ঘাটারি নিয়ে সে বড় হাঙ্গামার কাজ। কুলিদের কবলে পড়লে সুখ শান্তির দফা গয়া!

প্রত্যাশিত যাত্রীরা এলো না—মুখভার করে ড্রাইভার সাহেব ফিরে এলেন। হাতঘড়ি দেখে ভ্রু কোঁচকালেন—একঘণ্টা হল গাড়ী ছাড়ার সময় উতরে গেছে। লাফিয়ে উঠলেন গাড়ীতে। তারপর চাবি টিপে চাকা ঘুরিয়ে ষ্টেশন ইয়ার্ড থেকে বার করে আনলেন সেটাকে। তার পর একসিলেটারে চাপ দিতেই গর্জন করে উঠলো ইঞ্জিন, কাঁপতে লাগল থর থর করে। প্রশস্ত পীচ-বাঁধানো পথে ছুটে চলল দুরন্ত বেগে।

কণ্ডাক্টার বলল, সিংজী—জেরা ধীরেসে।

আর ধীরে! যাত্রীরা না আসতে এবং ঘণ্টাখানিক পিছিয়ে পড়াতে সিংজীর মেজাজ গেছে বিগড়ে। মনের ক্ষোভ এই দুর্দম গতির মাধ্যমেই বার করে দিতে লাগল। ঘড় ঘড় ঝন্ ঝন্ শব্দ করে কাঁপতে লাগল গাড়ীর জানলাগুলো। আমরাও গতির মুখে টাল খেতে লাগলাম। ঝড়ের ঝাপ্টা এসে লাগছে মুখে চোখে সর্বাঙ্গে—গতির নেশায় আমরা শুদ্ধ মাতাল হয়ে উঠলাম! হারানো সময়কে এমনি করেই কি কুড়িয়ে নিতে পারবে সিংজী! পথের ধারে কয়েকটি জায়গায় যাত্রীরা হাত উঠিয়ে গাড়ী থামাতে ইসারা করল। সিংজী হাত নেড়ে বলল, হবে না।

কণ্ডাক্টার বললে, লোকসান তো পুরোপুরিই হল—নাও না দু'চারজনকে তুলে।

সিংজী মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করল।

এমনি করে ত্রিশ মাইল ঝড়ের বেগে ছুটে এসে আধ ঘণ্টা সময় বাঁচল। কিন্তু সেদিন সিংজীর কপালের লেখাটায় ছিল দুর্ভোগ—একটি জনপদের প্রবেশমুখে ছোট একটা বাচ্চা ছেলে পড়ল সামনে—সিংজী প্রাণপণে ব্রেক কষল। ছেলেটা পাশ কাটাতে পারল—তবু দুর্ঘটনা রোখা গেল না। ক্যাঁচ করে গাড়ী থামতে না থামতে ইঞ্জিন দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বা'র হতে লাগল আর বিশ্রী ডিজেল তেল পোড়ার গন্ধ। অস্বাভাবিক গতির ফলে ইঞ্জিন তেতে উঠেছে—টগবগ করে ফুটছে তেল—এখন তেল ঠাণ্ডা না করলে এক ইঞ্চিও নড়বে না।

সিংজী আর সেদিকে তাকাল না—একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। ক্লীনার বেচারা বালতি বালতি জল বয়ে এনে ঢালতে লাগল ইঞ্জিনের গর্তে। সে তখন অগ্নিগর্ভ—। ঢালতে না ঢালতে ফুটন্ত জল উগড়ে উগড়ে দিতে লাগল। এতক্ষণ বে-দরদ দৌড় কষাঘাতে তার মনহীন শরীরেও সঞ্চিত হয়েছিল বিতৃষ্ণা—উত্তপ্ত উদ্বমন তারই প্রতিক্রিয়া। তাকে শান্ত করতে সময় লাগল। চালকের হিসাব-নিকাশকে নস্যাৎ করে দিয়ে তবে সে গতির মেজাজ ফিরে এলো। আমরা পান্নায় পৌঁছালাম এক ঘণ্টা লেট-এ।

ততক্ষণে সিংজীর মেজাজও ঠাণ্ডা হয়েছে। পান্না থেকে কিছু যাত্রী সে উঠিয়ে নিতে বলল।

সত্তর মাইলের পাল্লায় যে ক'টি জনপদ দেখলাম পান্নাই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে ইস্কুল, কলেজ, কোর্ট-কাছারি, হাসপাতাল আর একটা রাজবাড়ী পর্য্যন্ত আছে। বাস থামেও আধ ঘণ্টার উপরে, খানাপিনা চা জলখাবার যার যেমন রুচি সেরে নেয় যাত্রীরা।

পান্নার পর প্রকৃতির চেহারা বদলাতে সুরু করল। ঢেউ-খেলানো অসমতল জমি—বনের ঘনতা, অবশেষে একটা পাহাড়ের উপরেই ঠেলে উঠল বাস। ওপাশে আর একটা পাহাড়—মাঝখানে গভীর খাদ। একটা পাহাড় শেষ হতে না হতে আর একটা। সেটাও এঁকে-বেঁকে উপর নীচের পাক খাইয়ে বাসকে নাগরদোলার আস্বাদ দিলে। তারপর বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর—একটা নদী, তার উপর সদ্য নির্মিত এক সেতু। সেতুর পরপারে আবার সমতল অরণ্যভূমি। ক্রমে খাজুরাহোর সীমানায় পৌঁছাল বাস।

খাজুরাহো নামটি নাকি খেজুর গাছের থেকেই এসেছে। বাংলায় যেমন পালে পার্বণে মাঙ্গল্য-কর্মে কলা গাছ শুভ সঙ্কেত; এখানে খেজুর গাছেরও অবিকল সেই ভূমিকা। জায়গাটার গায়ে পুরণো পুরণো ভাব মাখানো ছিল। এখানে একসময় প্রভাবশালী চান্দেল্ল রাজবংশ রাজত্ব করত। এই বংশের যশোবর্মণ, সঙ্গ, বিদ্যাধর প্রভৃতি নৃপতিদের শিল্পানুরাগের ফলে খাজুরাহো দেবভূমিতে পরিণত হয়। ক্রমে এই রাজ্যের যশ-গৌরব ও ঐশ্বর্য্য খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তরে। সেই খ্যাতিই অবশেষে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলল। সুলতান মাহমুদের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল রাজ্যটির উপরে। মাহমুদের আক্রমণ ঠেকাতে চন্দেল্লরা মাহোবা, কালিঞ্জর আর অজয়গড়ের দুর্গগুলি দৃঢ় করে তুললেন। কিন্তু তুর্কী আক্রমণের মুখে সুদৃঢ় প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। রাজা রাজ্যপাট ধূলায় মেলিয়ে গেল—শুধু গভীর জঙ্গলের আশ্রয়ে বেঁচে রইল কিছু কালজয়ী শিল্প-কীর্তি। বিশ্বের শিল্প-রসিকরা এই কীর্তি-দর্শনের নেশায় ছুটে আসেন এখানে।

প্রকাণ্ড এক সরোবরের সামনে আমাদের যাত্রা শেষ হল। সরোবরের নাম শিবসাগর। পাশেই ছত্তরপুরের রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে পাহারারত শান্ত্রী আর দুটো বড় আকারের কামান দেখলাম। এর গা থেকেই মন্দির সীমানা। মন্দিরগুলির চারধার কঠিন বেড়া দিয়ে ঘেরা। ছোটমত একটা সরকারী দপ্তর—দুয়োরে পাহারাদার। প্রবেশমূল্য না দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করবার উপায় নাই।

বেড়ার মধ্যে অনেকখানি জায়গা—কয়েকটি মন্দির, আর ফুলবাগান। স্থানটি মনোরম।

জায়গাটাও ছোট। পাশেই বসতিগ্রাম একটি জমকালো রাজবাড়ী—রাজাদেরই প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয়, কিছু খাবার ও চায়ের দোকান, কাঁচা আনাজপাতির

একটা স্টল, মুদি-মশলা কাপড় জামা ইত্যাদির দোকানও আছে অনেকগুলি। একটিমাত্র বাঙালী হোটেল আছে। অবাঙালী হোটেলও আছে। আর আছে ফার্লং খানিক দূরে প্রাসাদোপম সরকারী অতিথিশালা—একেবারে রাজার হালে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। সেখানে ধনপতি সদাগরের মেলা।

আমরা সে মেলায় বেমানান। মন্দিরসংলগ্ন কয়েক-খানি বাসযোগ্য ঘর ভাড়াতে পাওয়া যায়—মতান্তরে দেশী স্থইট। তা হোক, দেশী মানুষ তাতে খুব অসুবিধা ভোগ করে না। আমরা হোটেলের মাধ্যমে এসেছিলাম ফলে পাঁচগুণ বেশি ভাড়া দিতে হল—সরাসরি রাজষ্টেটের হাত থেকে নিলে সুবিধা হত। তবে বেশির ভাগ মানুষই দেখলাম—রাত্রিবাস করেন না। বারটায় পৌঁছে চারটের বাসে ফিরে যান। আধ মাইলের দুই প্রান্তে প্রায় সবগুলি মন্দির; দুরন্ত বেগে ঘোরাঘুরি করতে পারলে না-দেখার কথা নয়। আর সাধারণ মানুষরা তেমন খুঁটিয়ে দেখেন না। শিল্পকলার ঠিকুজী কোষ্ঠী দিনক্ষণ মিলিয়ে রাশিচক্র বিচার করার ধৈর্য্য বা জ্ঞান তাঁদের থাকে না—দৃষ্টির কৌতূহল মিটলেই মন তাঁদের পরিতৃপ্ত। এ ছাড়া একনাগাড়ে ঘোরাফেরায় দেহে ও মনে ক্লান্তি। মন্দিরচত্বরে খানিকটা জিরিয়ে—ফিরে আসেন চায়ের দোকানে। ক্লান্তি ঘুচলে মন বলে—চমৎকার মন্দির।

* * *

তখন মধ্যাহ্ন কাল—বাসভ্রমণ এবং ক্ষুধা দুটিই দেহকে ক্লান্ত অবসন্ন করেছিল। স্থির করলাম আহারাদি সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আমরা আধ মাইল দূরের জৈন মন্দির দেখে আসব। আগামী কাল দেখব—হাতের নাগালে এই মন্দিরগুলি। এই মন্দিরের সংখ্যা ও কারুকার্য্য অনেক—দেখতেও সময় লাগে। একটু ভাল করেই দেখব।

তবু এইধারের একটা মন্দির এক ফাঁকে দেখে নিলাম। মতঙ্গেশ্বর মন্দির। মন্দিরটি রাজবাড়ীর চত্বর-সংলগ্ন—সরকারী বেড়ার বাইরে। সুতরাং নিঃশুল্ক দর্শন। মন্দিরে শিল্প-কর্ম তেমন নাই কিন্তু শিবলিঙ্গটি বিরাট। এতবড় শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষে দুই একটাই আছে। দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বর শিবের কথা মনে পড়ল। উচ্চতা বাদ দিলে ভুবনেশ্বরও তো লিঙ্গরাজ। এই শিবের মাথায় ফুল জল ঢালতে হলে সিঁড়ি বেয়ে আধতলা সমান উঁচুতে উঠতে হবে। উঠেছেনও অনেকে। মহিলার সংখ্যাও কম নয়। আমরা নীচে প্রণাম জানিয়ে—মন্দির থেকে নেমে এলাম।

এই মন্দিরের পাশেই বাঁ ধারে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালা। মুক্তাঙ্গন সংগ্রহশালা। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সাজানো রয়েছে হাজার বছর আগেকার অটুট ও আধ-ভাঙা নানা মূর্ত্তি, শিলালেখা, স্তম্ভাংশ, রেলিঙের টুকরা ইত্যাদি। কতকগুলি মূর্তির গায়ে পরিচয়লিপি উৎকীর্ণ। এ সমস্তই প্রাচীনকালের খাজুরাহোর শিল্প-নমুনা।

এইসব দেখব স্থির করে মন্দির প্রবেশদ্বারের বিজ্ঞপ্তি-গুলিতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। সাধারণত বেলা ৯টা থেকে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়—তবে দিনের আলো আরও তাড়াতাড়ি নিভে এলে আরও শীঘ্র মন্দিরঅঙ্গনের ফটক:বন্ধ হয়। এখন বেলা সাড়ে তিনটে—মাত্র দেড় ঘণ্টায় কতটুকুই বা ঘুরতে পারব ভেবে পূর্ব অংশের জৈন মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম। ফার্লং ৪।৫ দূরে ওধারেও বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। প্রবেশ-মূল্যহীন ওই মন্দির-প্রাঙ্গণে যতক্ষণ খুশী ঘোরাফেরা করা যায়।

খাজুরাহো—ধর্ম ও মন্দিরগোত্র ধরলে দুটি অংশে ভাগ করা। পূব দিকের অংশটায় জৈন ধর্মের প্রসার—পশ্চিমের এগুলি শৈবতীর্থ। ওদিকে যেমন জৈন দিগম্বর শ্রেণীর আধিপত্য—এধারে তেমনি শিবপার্বতীর রাজ্য। যাইহোক, পূবদিকে চলতে চলতে একটি অজ পাড়াগাঁয়ের মাঝখানেই এসে পড়লাম। মাঝখানে পথ—দুপাশে ক্ষেতি-জমি আল আর বেড়া দিয়ে ঘেরা। ধুলো-ওঠা মাঠে দিগম্বর শিশুর মেলা—চাষা হালে বলদ জুড়ে লাঙল টেনে চলেছে, মাঠের মাঝে মাঝে চূড়াকৃতি পোয়াল সাজানো—চাষাণী এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে স্বামীর কাজে সাহায্য

করছে। এখানে চড়ছে গরু ছাগলের পাল। শীতের খাটো বেলার রোদটি ভারি মিষ্টি হয়েই মাঠের মাঝখান দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। সাঁজাল দেয়ার উদ্যোগ ওরই মধ্যে সুরু হয়েছে। মাঠের ধারে কুলগাছে কাঁচা ডাঁসা অজস্র ফল। অনেক আছে বলে ছেলেদের লোভ কম— ওরা ধুলো উড়িয়ে খেলাতেই মত্ত। খানিকটা উড়ন্ত ধুলো জামা কাপড়ে নিয়ে আমরা জৈনমন্দির দুয়ারে এলাম।

একটা অভাব চোখে পড়ল, জলের অভাব। নদীর অস্তিত্ব কাছে-পিঠে নাই—কয়েক মাইল দূরে বাসে আসতে আসতে যা দেখেছিলাম। সবচেয়ে বড় তালাও হল শিবসাগর—যার ধারে বাস থেমেছিল। আর কোথাও তো ছোটখাটো জলাধার দেখছি না। ভরসা ইঁদারা; মানুষের স্নানে পানে, আর গৃহস্থালীর নানান কাজে এবং সেচে একমাত্র নির্ভর। বলদের সাহায্যে দ্রোণী ভর্তি করে তুলে, মাঠের আলে আলে ঢেলে দেওয়া; সেই পুরাকালের ধারা।

মন্দিরের বয়সও প্রায় হাজার বছর। এখনও পূজা-উপাসনার ধারাটা বলবৎ। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে যাত্রী অতিথিদের জন্য বিশ্রামশালা। এই বিশ্রামঘর কোন ধর্মীয় চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত কিনা জানিনা—তবে এঁদের সৎ আচরণের ধারা দেখে মনে হল, যে কোন ধর্মের মানুষ অর্থাৎ হিন্দু মাত্রেরই এখানে বিশ্রামাধিকার আছে।

মন্দির মধ্যে বিরাট তীর্থঙ্কর মূর্তি। নগ্ন মূর্তি। সামনে বসে একদল ভক্ত উচ্চকণ্ঠে নাম-কীর্তন করছে। এই মন্দিরে কারুকার্য তেমন চোখে পড়ল না।

এর উত্তরধারে আরও দুটি মন্দির, যার বহিরঙ্গের শিল্পকর্ম অপূর্ব। আদিনাথের মন্দির একেবারে ভূমি থেকে চূড়া পর্যন্ত এক ধরণের নক্সার অলঙ্করণে রমণীয়। মাঝখানের মন্দিরের গায়ে অনেক জৈন-পুরাণ কাহিনী। সিংহ, হস্তী, নর্তকী দ্বারপাল, দেবকন্যার দল। এরমধ্যে প্রসাধনরত একটি মেয়েকে বড় ভাল লাগল। সুন্দরী প্রসাধনান্তে তুলি দিয়ে অলক্তক-রেখা অঙ্কিত করছে। একটি পা হাঁটুর উপর তুলে ধরেছে, একটি হাত দিয়ে ঈষৎ অবনত-ভঙ্গিতে অন্য হাতে তুলিটি ঠেকিয়েছে গোড়ালীর কাছে। পা-টি টেনে রাখার ভারসাম্য পাঁচটি আঙুলে ফুটেছে অপরূপ হয়ে—আর ঈষৎ আনমিত শরীরের কয়েকটি শ্লথ তরঙ্গিত রেখায় শারীরসংস্থানের তত্ত্বটি ধরা পড়েছে। প্রসাধনতৃপ্ত মেয়ের অন্তরটি মুখের সূক্ষ্ম হাসির রেখায় অভিব্যক্ত।

একদল দর্শনার্থী ছবিটির পানে চেয়ে চেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—ধন্য শিল্পী!

ধন্যই বটে। রংতুলি দিয়ে আঁকা নয় ছবি। তুলির পোঁচ টেনে রঙের সমতা এনে হাসিকে যে কোন ডিগ্রীতে কমানো বাড়ানো সহজ কিন্তু ছেনির মুখে পাথর কেটে পরিমাণমত এমন সূক্ষ্ম হাসি ফুটিয়ে তোলা, যে হাসির সঙ্গে গভীর তৃপ্তিস্বাদ মিশেছে—সে তো সহজ কাজ নয়! আর অবনত দেহের পেশী-সঙ্কোচনে আঙুলের ডগায় ঈষৎ শ্রমচিহ্ন?

অনেকক্ষণ ধরে ছবিটি দেখলাম। আর অদ্ভুত ভাল লাগল—আদিনাথ মন্দিরের গায়ে সুষম রেখায় অদ্ভুত সামঞ্জস্যে ভরা নক্সাগুলো। দূর থেকে মনে হয় শাখা-পত্র সজ্জিত—কারুকার্য্যমণ্ডিত ক্রম-সূক্ষ্মাগ্র শির একটি দেবদারু গাছই বুঝি!

এখানেও একটি মুক্তাঙ্গনে সংগ্রহশালা আছে। অযত্ন-বর্দ্ধিত লতাগুল্মে প্রাঙ্গণটা এবং কিছু সংগৃহীত মূর্তিও ঢেকে গেছে—কোনটিরই পরিচয়লিপি নাই। পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ে যাঁদের দৃষ্টি অভ্রান্ত—তাঁরাই অবয়ব, চিহ্ন ও বাহন দেখে যক্ষ সূর্য্য বিষ্ণু অথবা আদিনাথ পার্শ্বনাথ মহাবীর প্রভৃতিকে সনাক্ত করতে পারেন। অভয়মুদ্রা অথবা জ্ঞান বিতরণের ভঙ্গির পার্থক্যটা তাঁরা ধরতে পারেন। এক টুকরো ভাঙ্গা পাথরে তাঁরা এক একটা যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি-চিহ্নকে আবিষ্কার করে উল্লসিত হতে পারেন—অপরের পক্ষে এ সমস্তেরই এক অর্থ—ভাঙ্গা মূর্তি!

ফিরে আসছি—বাইরের দুয়োরে পানীয় জলভর্তি গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একজন লোক। সবিনয়ে গ্লাসটা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলল, পীজিয়ে শেঠজী।

জৈন মন্দির দর্শন-পর্ব শেষ হল।

* * *

সার্কিট-হাউসে বা সরকারী বিশ্রামালয়ে বিজলী-আলোর ব্যবস্থা আছে—তা ছাড়া সর্বত্র কেরোসিন বাতি। হোটেলওয়ালা একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছিল—সেই আলোয় রাতের খাবার তৈরী হল। আহারান্তে আমরা শুয়ে পড়লাম।

তিথিটা ছিল কৃষ্ণা প্রতিপদ। আগের দিনকার পূর্ণিমার চাঁদ অচিরেই মাঠ ঘাট মন্দিরসীমানা আলোকিত করে তুলল। খাজুরাহো দেবভূমিতে পরিণত হল। এখনও যাত্রীর আনাগোনা ভালমত জমেনি, রাতের প্রথম প্রহরেই চারিদিক সুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন হতে লাগল। এবার নরলোকের বি াম, দেবলোক উঠবে জেগে। কিন্তু শত কণ্ঠোৎসারিত স্তবস্তুতি শঙ্খঘণ্টা-ঝঙ্কৃত সন্ধ্যারতি বন্দনা—'জয় জয়' রবে প্রতিধ্বনিত—দিক্‌মণ্ডল মুখরিত ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মায়ালোক—সে তো অতীত শতাব্দীর চিত্রকল্পনা! একমাত্র মতঙ্গেশ্বর মহাদেব ছাড়া আর কোন দেউলে পূজা অর্চনা আরতি ভোগের ব্যবস্থা নাই। খাজুরাহো যেন মৃত-দেবপুরী।

দশটায় সেই রিজার্ভ-করা বাসখানা চল্লিশজন যাত্রী বয়ে বকুলতলায় এসে দাঁড়াল। মৃত শহরে নতুন জীবনের ঢেউ উঠলো। ওঁরা কলকাতার একটি নামী কলেজ থেকে আসছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি জায়গা ঘুরে এখানে এসেছেন—অপরাহ্নেই ফিরে যাবেন। এখানে কোথায় যেন স্নান আহারের বন্দোবস্ত ছিল। বাস থেকে নেমে দ্রুত সেই দিকে অদৃশ্য হলেন।

আমরা এখন মন্দির প্রাঙ্গণে—ওঁদের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। একই সঙ্গে সুরু হল পরিক্রমা।

ডান দিক থেকে সুরু করলাম পরিক্রমা। এলাম বিশ্বনাথ মন্দিরে। এই মন্দিরটি একেবারে পথের ধারে—কাল সার্কিট-হাউসে যাবার পথে দেখেছিলাম। গঠন-শৈলীতে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের ছাপ। এটি দশ-এগারো শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। লিঙ্গরাজ মন্দিরও ওই সময়ের, একটু পরেরই হবে।

অর্দ্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, জগমোহন ও অন্তরাল এই চারটি স্তরে ভাগ করা মন্দির। শিল্পকর্মেও সাযুজ্য লক্ষণীয়। এটা সময়েরই প্রভাব, মধ্যপ্রদেশ থেকে ওড়িষা, বিন্ধ্যশৈলের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সমুদ্রের তটভূমি পর্য্যন্ত একই শিল্প-তরঙ্গ আবর্ত্তিত হয়েছিল হয়তো। মন্দিরগাত্রে মিথুন মূর্তিগুলির সমাবেশ এর একটি প্রমাণ। এই দৃষ্টান্ত কি ইলোরার গুহামন্দির থেকে নেওয়া? খাজুরাহোতে এর প্রকাশ আরও ব্যাপক। পুরীর মন্দিরেও ছিল—এখন চুণবালির পলস্তরায় ঢাকা পড়েছে। কোণারক ভুবনেশ্বরেও রয়েছে। তবে পুরীর মন্দিরে স্থূলতার প্রকাশ। খাজুরাহোর সূক্ষ্ম শিল্প-সৌন্দর্য্য কামকামনার প্রকাশ দেহকে আশ্রয় করেও যেন দেহাতীত ইঙ্গিতে পর্য্যবসিত। স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ব্যাখ্যা যেমন করেই দেওয়া হোক—শিল্পঐশ্বর্য্যের সামনে দাঁড়িয়ে শিল্প-সৌন্দর্য্যকে সাধুবাদ না দিয়ে উপায় নাই। ছবিগুলি দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্বে মনের বিকারবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার কষ্টিপাথর কিনা সে তর্ক থাকুক তথা-কথিত ধার্মিক মনে। এখন তো মন্দিরে দেবতা নাই,—থাকলেও পূজাঅর্চনায় তাঁর পদবন্দনার কথা কেউ তুলবে না—যেহেতু অশুচিস্পর্শে দেবতা অন্তর্হিত। সুতরাং বিকারগ্রস্ত মনকে নিয়ে বিক্ষুব্ধও হবেনা কেউ। তবু শিল্পের উপর শ্রদ্ধা নিয়ে যিনি মন্দির দেখতে আসবেন—তিনি কি ছবির পানে চেয়ে সেই প্রাচীন-যুগের রুচি সংস্কৃতিবোধের প্রতি কটাক্ষ হানবেন? হিন্দুশাস্ত্রে চতুর্বর্গের মধ্যে সব কটিরই স্থান তুল্যমূল্য, বাস্তবক্ষেত্রে কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। ধর্ম আর তিনটি কর্মকে ধারণ করে আছে। অর্থ, কাম বা কামনা, মোক্ষ তিনটিই মানুষের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত—নিঃশ্বাস-বায়ুর মত।

ধর্ম অর্থাৎ স্বভাবধর্ম ওই তিন বস্তুরই যোগফল—এ ছাড়া জীবন অর্থহীন। শিল্পবোধ-উদ্দীপ্ত জীবনশিল্পী স্বভাবতই প্রাণধর্মকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবতা যদি প্রাণস্বরূপ হয়—দেহবিলাসের এই চিত্রগুলি কি সেই প্রাণবহ্নির পূজা-উপচার নয়? এক অর্থে হোমানল। ছবিতে চৌষট্টি কলার প্রকাশ। পুরাণের গল্প, মানুষের কল্পনা, বাস্তবান্বিত জীবনবোধ শিল্প-সুষমায় মিশিয়ে মন্দির-গাত্রে নানা প্যানেলে ছড়িয়ে দিয়েছেন শিল্পীদল। মানুষের কামনার বস্তু—গল্প শোনা, ছবি আঁকা, জীবন-তৃষ্ণা, জীবনাতীত সুখ-কল্পনা। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা। তাই কি কামনার সংসার থেকে কল্পনার ধ্যানলোকে সুদূর-বিস্তৃত ছায়া-ছায়া পথকে খুঁজে নেওয়ার অর্থাৎ ইঙ্গিত রেখেছেন শিল্পী-দল? তবে একথা ঠিক খাজুরাহোর মন্দির দেখে মন বিকারগ্রস্ত হয়েছে এমন উদ্ভট ঘটনার কথা শোনা যায় না—যদিচ বিকারগ্রস্ত মন ওই ছবি থেকে বিকার-বহ্নির আরও সমিধ সংগ্রহ করে নিতে পারবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। আসলে মনই তো চালায় মানুষকে। সুন্দর-অসুন্দর শুচি-ক্লেদ স্থূল-সূক্ষ্ম বিচার-বোধ প্রতিনিয়ত ছায়া ফেলছে মনেরই আয়নায়। ছায়া অবশ্য বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না—নূতন নূতন কামনার বাতাসে সরে যায়। কিন্তু আকাশে মেঘ জমলে বাতাস বয় না—তখন অস্বচ্ছ অভদ্র কামনার কুয়াশায় দর্পণখানি মলিন হয়ে ওঠে—আর ছায়া হয় গাঢ়তর। সেই অন্ধকার মনেরই আর এক রূপ।

এমন পঙ্কিল মন নিয়ে ঘুরতে দেখলাম কয়েক-জনকে। ওদের স্থূল মন্তব্য কানে গেল—বেছে বেছে ওই প্যানেলগুলিরই ছবি তুলল। হায়, এত অর্থব্যয়, দেহ-ক্লেশ ও কৌতূহলস্পৃহা বহন করে, দূরদূরান্তরে এসেছে কি ওইটুকু স্থূল আনন্দের রসদ সংগ্রহ করতে!

* * *

কাল পথ থেকে বিশ্বনাথ মন্দির দেখে মনে হয়েছিল—এ-কি এমন অসাধারণ! সূক্ষ্ম অলঙ্করণের নমুনাগুলি দূর থেকে ছিল অস্পষ্ট-লেপাপোঁছা,—এখন সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বাক্যহারা! এ কী সৃষ্টি! পাথরে এমন সূক্ষ্ম নরম লেস-বোনা—এমন ঝালরের কারিগরি! কার্ণিসে থামের মাথায় ছাদে—যেন সাদা পিটুলি গোলার নিপুণ আল্পনা দিয়ে রেখেছে কোন কলাবতী কন্যা। লতাপাতা, পদ্মফুল, নানা রেখা ও বৃত্তের সমাবেশ। আল্পনার গুণে কঠিন পাথর এমনই নরম মনে হচ্ছে—বুঝি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গলে গলে পড়বে মেঝেতে!

অর্দ্ধমণ্ডপ-মণ্ডপ-জগমোহন চারিদিকের থাম দেওয়াল ছাদ খিলান ফাঁক নাই কোনখানে—ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ! এরই মধ্যে দিব্যাঙ্গনাদের দেহভঙ্গি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীবা কণ্ঠ পৃষ্ঠ কটি নিতম্ব হস্ত পদ বক্ষ প্রভৃতি আট অঙ্গের লীলামাধুর্য্যে ছন্দময় বরতনু। কবরী রচনায়, অলঙ্কার সন্নিবেশে—লাস্য ভঙ্গিমায়... কিন্তু এত সব বর্ণনা নিরর্থক। বাছা বাছা শব্দ সাজিয়ে, উত্তম বিশেষণ প্রয়োগ করে এই শিল্প-চাতুর্য্যকে নিশ্চয় কলমের ডগায় আনা যাবে না। কল্পনা-সুন্দর মন না থাকলে শিল্পীর সৃষ্টি যেমন সার্থক হয় না—তেমনি সৌন্দর্য্যরসকে আস্বাদন করার জন্যও প্রয়োজন অনুভূতিপ্রবণ মন। তেমন মন সাথে না মিলায় এক।

শিল্প-চাতুর্য্য না বুঝেও—শিল্প-সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলাম গর্ভমন্দিরে। কত যাত্রীর আসা-যাওয়া—দেবতার সামনে মাথা নামানো দেখলাম; কেউ বা প্রণাম করল না—চারদিকটা চকিতে ঘুরে নিয়ে বা'র—হয়ে গেল, কারও মুখে পিঠ-চাপড়ানোর মন্তব্য—সাবাস! কারও মুখে শুনলাম—মন্দিরে দেবতা নেই যদি—দেয়ালে-দেয়ালে এত ছবির বাহার কেন! কেউ বা ছবি দেখেই মহাখুসী—ধন্য শিল্পী, ধন্য রাজন্। অর্থাৎ যে রাজা এমন দেউল তৈরী করিয়েছেন। আর যে শিল্পী শিল্পকর্ম দিয়ে ভরিয়েছেন দেউল, দু-পক্ষকেই সাধুবাদ।

বিশ্বনাথের সামনের মণ্ডপে নন্দীকেশ্বর বৃষ। আকারে এবং গঠন-সৌন্দর্য্যে উল্লেখযোগ্য। মন্দির-চত্বর

আধভলা সমান উঁচু—মন্দির ছাড়াও চওড়া রোয়াক—আর সেটা এতটাই ঢালু যে একফোঁটা জলও জমতে পায় না। এই কারণেই দীর্ঘ কয়েকটি শতাব্দী পার হয়ে গেলেও এটা ফাটেনি—শ্যাওলা জমেনি—তৃণ আগাছা বাসা বাঁধেনি। শুনলাম, মন্দির মশলা দিয়ে গাঁথা নয়। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে তৈরী। হবেও বা। এমন নিখুঁতভাবে টালিগুলি সাজানো—যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলেও জোড়ের মুখে ফাটল কিংবা সূক্ষ্ম-রেখা আবিষ্কার করা গেল না। যেন এগুলি পর পর সাজানো নয়, অখণ্ড একটি পাথরেরই দেউল।

নেমে এসে পার্বতী-মন্দির দেখলাম। বিশ্বনাথ মন্দিরের চেয়ে ছোট—শিল্পকর্মেও প্রায় নিরাভরণ।

ফুলবাগিচার মাঝখান দিয়ে পথ। মালিরা গাছের পরিচর্য্যা করছে। কুন্দ ফুলের ঝাড়গুলিতে হাজার বাতির রোশনাই—মালতীর নরম শরীরের মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা উতল—গোলাপের ডালে ডালে রূপ-সজ্জার ঝলকানি। শীত আসছে—ঘাসে পাতায় ফুলে শিশিরের ঘর্মবিন্দু—সোহাগী ফুলের রাজ্যে প্রসাধনের ত্বরা পড়ে গেছে।

এবার উদ্যানের পশ্চিম কোণে এসেছি। মাঝারি মত একটি মন্দিরের চত্বরে উঠছি। চিত্রগুপ্তের মন্দির। এরও আগাগোড়া শিল্প-ঐশ্বর্য্যে ঝলমল। সেই মণ্ডপ জগমোহন—গর্ভগৃহ—ভিতরে পূজা-আরতিহীন বিগ্রহ। পুরোহিত নিত্য নিয়মিত পূজা করেন না—তবু কয়েকটি ফুল কে যেন বিগ্রহের পায়ে রেখে গেছে। বৈধী পূজার পরিবর্ত্তে মন্ত্রহীন ভক্তি-অর্ঘ্য। ভিতরে বাইরে মূর্ত্তির মিছিল—নক্সার বৈচিত্র্য। নতুন নতুন প্যানেলে নতুন নতুন ছবি।

এরপর জগদম্বি আদ্যাশক্তি পার্বতী-দেউল—একই চত্বরে কাণ্ডারীর (মণ্ডপ) মহাদেবও রয়েছেন।

খাজুরাহোর মধ্যে সবচেয়ে বিশাল মন্দির—সবচেয়ে সুন্দরও। এই মন্দিরের অন্তর্দেশের প্রসার বেশী—মণ্ডপের সংখ্যা পাঁচ—বাইরে থেকে পঞ্চচূড়ার রথ বলে মনে হয়। প্রশস্ত চত্বরে দাঁড়িয়ে চূড়ার পানে চাইলে অবাক হতে হয়। অপেক্ষাকৃত বড় বড় প্যানেলে বিচিত্র সব ছবি। মনে হয় অসংখ্য দিব্যমূর্ত্তি অলকা-পুরীর সৌধঅলিন্দ বেয়ে মিছিল সাজিয়ে নেমে আসছে মর্ত্ত্যভূমিতে। কন্দর্প মহাদেবকে ঘিরে তাদের আনন্দোৎসব। এখানে নরলোকের লোকযাত্রার স্রোতটি দেব-লোকের বেগধারায় মিশেছে। চতুর্ব্বর্গের অদ্ভুত সমাবেশ। দেহবিলাস—দেহাতীত সত্তা—রূপসজ্জা—রূপাতীত কল্পনা, ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসপুরী, শস্ত্রপাণি দেবদল—হস্তীযুথ, বরনারী, ইন্দ্রসভা, আদিকামনার নর্মলীলা—বৃহৎ দেউলের আদ্যন্ত অত্যন্ত সজীব সাবলীল রূপতরঙ্গ প্রবাহ। একবার চোখ বুলিয়ে সরে যাব—সে উপায় নাই।

ধন্য শিল্পী—ধন্য রাজন্। যাত্রীকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠছেই।

খাজুরাহোর সবগুলি মন্দিরের শিল্প-মহিমাকে আত্মসাৎ করেছে কন্দর্প-মহাদেব-দেউল—এখানে শিল্প-মেলায় পূর্ণপরিণতি। ইলোরায় যেমন কৈলাসমন্দির—এখানে তেমনি কন্দর্প-দেউল। মন্দির-রাজ্যে এরা রাজচক্রবর্ত্তী।

মন্দির দেখতে দেখতে একটি প্রশ্ন মনে জেগেছিল। এইগুলিতে এখনও কালের করস্পর্শ ঘটেনি—এ কি গঠনরীতির দক্ষতায়? কিন্তু খল মানুষের ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করল না কেন? অথচ ভারতবর্ষের যত্রতত্র দেখা যায় দেবমন্দিরগুলি ধর্মদ্বেষীদের নখরাঘাত-চিহ্নে জর্জ্জরিত—খণ্ডবিখণ্ডিত। এখানে এই ক'টি দেবদেউলের কোনটিই তো লাঞ্ছিত নয়, বিগ্রহ-মণ্ডপ-অলিন্দ-চত্বর সমস্তই অভগ্ন অটুট। রাজ্য জয় করে বিদেশীরা কি তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়েছিল? অথবা গভীর অরণ্য-অন্তরালে এই রূপময় দেবরাজ্যের সন্ধান ওরা পায়নি! অনুসন্ধানী ঐতিহাসিকদের সামনে প্রশ্নটা রইল।

আর বেশিক্ষণ বসে থাকা চলল না…ক্রমেই দর্শনার্থীর ভিড় বাড়ছে। উঠি উঠি করছি—এমনসময় মেয়েপুরুষের মাঝারি একটা দল উঠে এলো চাতালে।

উঠে এসেই একসঙ্গে কলরব করে উঠলো: আরে—রাম-রাম-রাম। চল ভাইয়া—জলদি চল—, মেয়েপুরুষে একসঙ্গে দেয়ালের পানে চাওয়া যায় না। রাম-রাম!

হুড়হুড় করে নেমে গেল দলটি।

* * *

কন্দর্প-মন্দিরের পর উল্লেখযোগ্য হল লক্ষ্মণ-মন্দির। এটির সংস্কার হচ্ছে—আষ্টেপৃষ্ঠে ভাড়ার বাঁধন। ভিতরটা দেখার সুবিধা হল না—তবে মন্দির-চাতালের চারপাশে তিনটি থাকে অনেকগুলি ছবির পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্যানেলগুলিতে রাজকীয় মহিমা ও সমরযাত্রার প্রাধান্য। গজবাহিনী, শস্ত্রপাণি যোদ্ধৃদল। ধ্বজপতাকা, ছত্রদণ্ডতলে রাজাকে ঘিরে আশাশোটা-ধারী অনুচরবৃন্দ, আবার কোথাও বা সংঘর্ষরত সৈন্য-দল। সুদীর্ঘ একটি শোভাযাত্রা চলেছে চত্বরের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়ালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত।

লক্ষ্মণ-মন্দিরের আগে আরও দু'টি ছোট মন্দির দেখে নিচ্ছেন যাত্রীরা। লক্ষ্মী ও বরাহ-মন্দির। লক্ষ্মী-মন্দিরটি সবচেয়ে ছোট। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠলে মজুরি পোষালো না বলে মনে হবে। (কন্দর্প-মহাদেব-মন্দির দেখার পর—এই চিন্তাটা যে-কোন মন্দির দেখার সময় মনে উঠবেই।) অথচ না উঠেও উপায় নাই। একটি স্থূলাঙ্গী মহিলা নীচের দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে ছিলেন—সঙ্গীরা উপরে উঠে গেছেন। যেন তাঁকে বঞ্চিত করা হচ্ছে—এমনি ক্ষোভ বিরক্তিতে ভ্রুকুটি হানছেন। ক্রমশঃই মেঘ জমছে।

পাশের মন্দিরটিও তেমনি উঁচু চত্বরে। বিরাটকায় বজ্রবরাহ মূর্ত্তিটি—নীচে থেকে মনে হচ্ছে গণ্ডার। তার দেহের খাঁজে খাঁজে চামড়ার ভাঁজ—যেমন গণ্ডারের দেহে থাকে। দূর থেকে গণ্ডার বলেই ভুল হয়। নিকটে এসে অবাক হতে হয়—চামড়ার এক একটি ভাঁজে কি নিপুণ শিল্পনমুনা। অসংখ্য, ছবির সমাবেশ। দেবসভাতলে গায়ক বাদক নর্ত্তকের সম্মিলন। তিনটি ভাঁজে অসংখ্য মূর্ত্তি—একটি পুরাণ-কাহিনীই বুঝি আদ্যন্ত উৎকীর্ণ।

একজন নতুন মানুষ তাঁর বিপুল কলেবরে অর্থ-ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন বহন করে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই উঁচু চত্বরে এলেন—দুপাশে তাঁর ক্ষীণকায় অনুচর-পরিচরবৃন্দ। অতিকায় বরাহের হাঁটুর সামনে এলে তাঁদের মনে হ'ল ক্ষুদ্র একদল শিশু কৌতুকরঙ্গ দেখতে এসেছে।

অনুচরদের পানে চেয়ে কলেবর' প্রশ্ন করলেন, এ কৌন্ হ্যায়?

মূর্ত্তির পরিচয় ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা ছিল। কিন্তু লিপি পরিচয় হয়তো এঁদের কারও জানা ছিল না।

ওরা মাথা নাড়ল, মালুম নহী শেঠজী।

আমার পানে চেয়ে প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলেন শেঠজী।

বললাম, ইনি বরাহ অবতার। ভগবান বিষ্ণু—

ব্যস্-ব্যস্ মালুম হুয়া। বাঃ—বাঃ—সাবাস! ধন্য-শিল্পী—ধন্য রাজন্!

সারা দলটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বরাহের পেট টিপে—গোড় দাবিয়ে—লেজের মাপ নিয়ে পায়ে মুখে হাত বুলিয়ে ওরা প্রদক্ষিণ সুরু করল।

সেই স্থূলাঙ্গী মহিলাটি নীচে থেকে সরোষ-দৃষ্টি মেলে, হেনে এতক্ষণ ওদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। ওদিকে ফুটফুটে ছোট মেয়েটি নাচতে নাচতে এগিয়ে গেছে গোলাপ সারের দিকে। হাত বাড়িয়ে ফুল তুলবার চেষ্টা করছে মেয়েটি। তীব্র কণ্ঠে সুর তুললেন স্থূলাঙ্গী, এ সরস্বতিয়া—

শব্দটা সাইরেনের মত বিপদ-সঙ্কেত জ্ঞাপন করল। সরস্বতিয়া ছুটে এলো কিনা দেখলাম না, কিন্তু দলটি সিঁড়ি ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

দেউল-সীমানা থেকে বা'র হবার সময়ে খানিকটা

অপেক্ষা করতে হল। কলকাতার সেই বড় দলটি দেউল-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে।

ওরা একত্রিত হলে একজনের ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল: তাড়াতাড়ি দেখে নেবেন মন্দিরগুলো। বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে গোছগাছ করে বাসে উঠতে হবে মনে রাখবেন।

একটি কণ্ঠ শোনা গেল—জৈন মন্দির দেখা হবে না?

সে আবার পাঁচ ফার্লং দূরে পুবধারে। সময় হবে কি?

দলটি ছড়িয়ে পড়ল বিস্তৃত অঙ্গনে।

এই ভ্রমণ-পর্বের শেষে আরও দুই একটি লাইন যোগ করতে না পারলে বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে—একটি অবিস্মরণীয় চিত্রের কথা। ছবিটা দেখেছিলাম সকালে মতঙ্গেশ্বর মন্দিরের পাশে মুক্তাঙ্গন সংগ্রহশালায়। বহুতর মূর্তির মাঝখানে অনন্য ও উজ্জ্বল।

নৃত্য-বস্তুটি সর্বকালে সর্বলোকে সমাদৃত। নাচের বয়স নাই, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া অধিকারও নাই। বালক বৃদ্ধ যুবা মেয়ে পুরুষ আনন্দের আতিশয্যে কোন-না-কোন সময়ে নাচেই। সেই নৃত্য পায়ের ছন্দ মিলিয়ে হাতের মুদ্রা সৃষ্টি করে অথবা সর্বশরীরে হিল্লোল তুলে কিংবা শিল্প-নির্দেশ অমান্য করে সাংসারিক ঘটনার তালে তালে সুরে বেসুরে পা ফেলে যেমন করে হোক, কোন-না-কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তুন্দিল তনু গজমুণ্ডধারী খর্বকায় গণেশের নৃত্য কল্পনা করতে পারবেন কি! এমন একটি ছবি মনে এঁকে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই কৌতুক-রঙ্গে শিউরে উঠবে দেহ? আদৌ তা নয়। এখানে সংগ্রহশালায় বিনায়ক-মূর্তিটি দেখলে তা মনেই হবে না। এঁর সর্বরেখাবলয়িত সুছন্দ তনুদেহটি যেন ধীর প্রবাহিত তরঙ্গদোলায় ভাসমান। ঈষৎ উত্তোলিত দক্ষিণ পদ ঈষৎ নমনীয় বঙ্কিম কটিদেশ-উর্দ্ধোত্থিত গজতুণ্ড ও গ্রীবাভঙ্গি আর সুস্থূল অলঙ্কারভূষিত চারটি হাতে মুদ্রাসৃষ্টির চাতুর্য—চক্ষুতে আনন্দ স্ফূর্তির আবেশ—সারা মুখ তারই ছটায় অতিশয় মেদুর—অপূর্ব অনবদ্য এই বিনায়ক-নৃত্য। ধীর স্থির মিতবাক সর্বকার্যে সিদ্ধিদাতা স্বভাব-গম্ভীর গণপতি নৃত্যের মাধ্যমে নিজ-স্বভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিল্পীর রসবোধ, পরিমিত জ্ঞান ও নৃত্য-ছন্দে পারঙ্গমতা—এই চমৎকার মূর্তির সর্বাঙ্গে জলজল করছে। ইচ্ছা ছিল একটা ফটো নেব। ভাবের সঙ্গে রসের, তার সঙ্গে রূপের এবং ছন্দসূত্রের এমন নিবিড় মিলন-রীতির নমুনা বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ছবির রীলটা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল—চেষ্টা করেও অল্প সময়ের মধ্যে আর একটা যোগাড় করা গেল না!
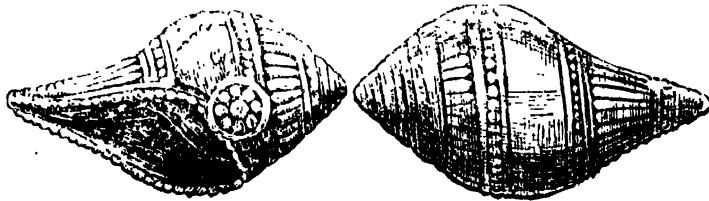
রামচৌতরার কথা

বিভা সরকার

পশ্চিম বা পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে বাইরে শোয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। গ্রীষ্ম সমাগত তার লু ঝড় ঝঞ্ঝা সঙ্গে নিয়ে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিশ্বচরাচর যেন স্বপ্নলোকে হারিয়ে যেতে চায়। দমকা হাওয়ায় মশারি উড়িয়ে নিতে চায়, সে যেন সাদা বকের মত ডানা মেলে গগন-বিহারী নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে যেতে চায়। চৌধুরীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো। শুদ্ধ হয়ে শুয়ে শুয়ে তিনি নীলাকাশের বুকে আকাশভরা তারার উৎসব দেখছিলেন। এক আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতা নিয়ে জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।

মশারিটার বন্ধন মুক্ত করে খুলে ফেলে দিলেন তিনি। তিনি যেন আজকের এই অপূর্ব্ব রাতটিতে তাঁর নিজের মনটাকেও বন্ধন মুক্ত করে ঐ নক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশের বুকে নিরুদ্দেশের যাত্রী-করে দিতে চান। জ্যোৎস্নার নিপীড়নে তিনি যেন আড়ষ্ট অভিভূত হয়ে গেছেন। চৌধুরীর হঠাৎ বহুদিন আগের এক এমনি তীব্র জ্যোৎস্নাময় ফাল্গুনীরাতের কথা মনে পড়ে গেল। তখন তাঁর প্রথম যৌবন। ভয়ডরহীন জীবন বেহিসাবী। জীবন-মৃত্যুকে তখন তুচ্ছ করে চলে যেতে পারতেম অসংশয়ে। সেদিনও এমনি উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে তিনি আর চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। জ্বলজ্বলে তারায় চুমকিখচিত গাঢ় নীলাম্বরীর চন্দ্রাতপের নীচে শুয়ে তিনি সেদিন মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে-ছিলেন। সে নীলাম্বরী কি তাঁর যৌবন-মনে অনাগত এক নীলবসনা সুন্দরীর মৃদু পদসঞ্চালনে আগমনের রোমাঞ্চকর আভাস কল্পমায়ায় জাগায় নি? সেদিন কি তিনি মনে মনে মানসসুন্দরীর কামনায় বেপথু-ব্যাকুল হয়ে ওঠেন নি?

এক চিন্তার মধ্যে আর এক ভাবনা এসে পড়ে, মন যেন আজ স্মৃতির ভারে উথলে উঠছে। সেদিন সেই Bahawalpur এর রাতটি আবার তাঁর মনের মুকুরে ফিরে এলো। গাঢ়নীল আকাশ বড় পরিষ্কার বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল পরিষ্কার ছায়াপথটি ঠিক আজকেরই মত। কাছেই পাতকুয়া থাকায়, তাঁর শোবার জায়গাটি লোকজনেরা সাধ্যমত জল ঢেলে ঢেলে শীতল করতে চেষ্টা করেছিলো। কিছু পরে মৃদু বাতাসও বইতে আরম্ভ হয়েছিল। সারাদিনের পরিশ্রম-শ্রান্ত তিনি বড় তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ কখন মাঝরাতে কাদের যেন কান্নার কলরোলে ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন তিনি। সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই কান্নার আওয়াজ ধরে ছুটে চলেছিলেন। ভালকরে যখন সম্বিত ফিরে পেলেন দেখলেন তিনি এসে পড়েছেন এক শূন্য গোরস্থানের মাঝখানে। তাঁর চতুর্দ্দিকে কবর আর কবর, ভাঙাচোরা সাপ শেয়ালের বাসা। সরগাছের ঝোপ আর ফণী-মনসার গাছ ছড়ানো।

কয়েকটা শুকনো মরা গাছে শকুনের বাস। তাদেরই বাচ্চাদের এ বিকট চিৎকার শিশুকান্নার মত দূর থেকে তাঁর ঘুমন্ত-শ্রবণে মনে হয়েছিল। বিকট চেহারা নিয়ে গোদা শকুনটা ক্ষুধার তাড়নায় বুঝিবা তাঁকেই জীবন্ত ছিঁড়ে খেতে আসে। চারিদিকের এই বীভৎসতার মধ্যে মরা পশুর হাড়গোড়ের রাজত্বে মৃত্যুর তমিস্রায় যেন তাকিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সারা অঙ্গে শিহরণ তুলে নেমে যাচ্ছিল একটা কি যেন অজানা অনুভূতি। দূরে কাছে শুধু যেন ছায়ার রাজত্ব। সে ছায়াদের নির্ব্বাক মুখে যেন একটাই জিজ্ঞাসা—এ মৃত্যুর রাজত্বে মৃত্যুপুরীর মাঝখানে তুমি জীবন্ত কেন? কোন

প্রত্যাশায়? প্রকৃতির কি রিক্তা বন্ধ্যারূপ! এমন বুঝি এর আগে আর কখনও দেখেন নি। শকুনদের ডানাঝাড়া আর কর্কশ কোলাহলে যেন পিশাচীদের খলখল হাসি! এমনি এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তে স্বর্গের দেব-দূতের মতই লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়ালো তাঁর ক্যাম্প-এর হেডম্যান বা প্রধান। প্রবীণ বয়-বিজ্ঞ মানুষটি।

দৈববাণীর মতই প্রাণধারা বইয়ে দিলে তাঁর শিরায় শিরায় সেই জীবন্তের কণ্ঠস্বর। ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরী হয়নি। ঘুমের ঘোরে ছুটে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিলেন তিনি, আর তারই শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। এমনিতেই সে প্রহরে প্রহরে ঘুরে ফিরে দেখে নিত সব ঠিকঠাক আছে কিনা—রাতের চৌকিদারীও যে তার কাজ। সাহেবের খাটের কাছে এসে খাট শূন্য দেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দূরে আবছায়ার মত মূর্তি দেখে অনুসরণ করে এখানে এসে সে পৌছেছে।

সেই তমিস্রার জগৎ থেকে ফিরে আসতে তাঁর বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিলো। নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতই তিনি চৌকিদারকে অনুসরণ করে ফিরে এসেছিলেন ক্যাম্পে!

আজ এই প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় বসে সেসব ছেলে-মানুষি মনে পড়লে হাসি পায়। আর একবারও তিনি এমনি শিশুকান্নার আওয়াজে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন জীবন্ত মৃত্যুর আস্তানায়।

তখন তিনি হরিদ্বারের দিকে কাজ করছেন। বড় জঙ্গল ছিল তখন কনখলের ওধার। উজাড় বিজবন ছিলো লছমন ঝোলার আশপাশ। দড়ির সেতুতে পারাপার হতে হত পাহাড়িয়া গঙ্গা। বড় মনোরম সে দৃশ্য। খরধারায় উপল চপল পায় পাহাড়িয়া নদী যেন বিশ্বরূপ-দর্শনে উন্মাদিনী হয়ে ছুটে আসছে। সাধু-সন্তদের ছায়া আশ্রয়। ছোট ছোট পর্ণকুটির জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতো—আর কচিৎ দর্শন হয়ে যেত কোনও ধ্যানরত সাধনমগ্ন সন্ন্যাসীর।

কালিকম্বলিওয়ালার চটিগলি তখনও সব সমাপ্ত হয়নি। মহাপ্রস্থানের যাওয়ার পথের এ প্রারম্ভ তখন এত সুশৃঙ্খল ছিল না। তখনও সে পথ দুরারোহ দুর্গম। সত্যই পদে পদে মৃত্যুকে উপহাস করে চলতে হত সে পথে। তবুও দেবাদিদেব-দর্শনাকাঙ্ক্ষী মানুষ ছুটে যেত সেই পথে সবভুলে মানসসরোবরের পানে—শ্রীকৈলাসের দর্শনে; বিশ্বের পরম রূপকারের রূপময় বৈচিত্র্যময় লীলা-নিকেতনে। আকাঙ্ক্ষা তাদের অনমনীয়, ইচ্ছা তাদের অদম্য, উৎসাহ তাদের অনির্বাণ।

সেই সব দিনে একদিন অপরাহ্ণে ফিরে আসছিলেন সারাদিনের পরিশ্রান্ত তিনি পাহাড়িয়া পাকদণ্ডি (পায়ে-চলা সরু পাহাড়ের পথ) ধরে, হঠাৎ কানে এল শিশুকান্নার অসহায় আর্তরব। মনে হল কয়েকটা ছোটছেলে যেন আকুল হয়ে কাঁদছে। মন তাঁর ছটফটিয়ে উঠেছিলো। আগত গোধূলিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর ফেরার উল্টোপথে ছুটেছিলেন বিভ্রান্ত ব্যাকুল হয়ে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে আরও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ধুলোয় বড় বড় পায়ের দাগের সঙ্গে ছোট ছোট পায়ের দাগ দেখে। সেই জন-মানব বর্জিত গহন অরণ্যে ছুটতে ছুটতে মন তাঁর নানা কথা ভেবে চলেছিলো। ছাত্রজীবন তখনও বেশীদিন ত্যাগ করেননি তাই সারলক্ হোমসের ডিটেকটিভ মনের আগোচরে তখনও বুঝিবা কাজ করত। অজানা রহস্যের আভাসে মন তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে যেন যেতে উঠেছিলো। না জানি কি মহা অন্যায় অত্যাচার, শিশুপীড়নের গোপনগুহা এই পাহাড়ের কোথাও লুকিয়ে আছে। লোকালয় থেকে দূরে এই অজগর বিজবনে, হয়ত নিরীহশিশুদের ধরে এনে তাদের ওপর দুষ্টেরা কতই না অত্যাচার করছে। হনহনিয়ে হেঁটে চলেছিলেন তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। একদল পাহাড়িয়া যেন কার তাড়া খেয়ে ছুটে আসতে তাঁর মুখোমুখি এসে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো, তারপর তাঁর সাজপোষাকে বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি তাদের, তিনি বিদেশী। সভয়ে বলেছিলো—তাড়াতাড়ি ফিরে চলুন! আপনি পরদেশী তাই বুঝতে পারেন নি ও ভাল্লুকবাচ্চাদের কান্না। এই সন্ধ্যার সময়ে তাদের সামনে পড়ে গেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ফেরাবার জন্য টানাটানি করে

তারা তাঁকে ফেলেই প্রায় ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলো। সেই ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে চৌধুরী সাহেবের মনও কেমন যেন থমথম করে উঠেছিলো এক অজানা আতঙ্কে। ইতিমধ্যে কুলির সর্দার তাঁর ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছিলো দুই চক্ষে আতঙ্কের ছায়া নিয়ে, "চলে আসুন! চলে আসুন সাহেব"। পরিত্রাহি চিৎকারে টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলো। তবু তাঁর মন মানে নি। পরের দিন কুলিসর্দারকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে গিয়েছিলেন সেই পথে মধ্যাহ্নের দিকে। সেই সময়টাই নাকি সবচেয়ে নিরাপদ ওদের মতে। বড় ভালুকরা সাধারণত এ সময় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। দূর থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখেছিলেন তিনি—সত্যই কয়েকটা কালো কালো বাচ্চা নিজেদের মধ্যে খেলছে বা মারামারি করছে পশুসুলভ সহজাত ভঙ্গিমায়। আর দাঁড়াননি তাঁরা। ফিরে চলে এসেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য মানুষের পায়ের সঙ্গে, বিশেষ করে বাচ্চা পশুর ছাপতো অবিকল মানবশিশুর ছোট ছোট কচি পায়ের ছাপ। জংলি ভালুক বড় সাংঘাতিক জীব। এরা গাছে চড়ে, তাড়া করে, জলে তাড়া করে, ডাঙায় তো বটেই। এদের হাতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। এদেশী মানুষ তাই বড়ই ভয় পায় এই জীবটিকে।

ঘুম ভেঙ্গে বসে বসে স্মৃতির রোমন্থন করছিলেন তিনি। এমন সময় দূরে কাছে শেয়ালেরা ডেকে উঠলো রাতের শেষ প্রহর জানিয়ে। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল গারদখানার পেটা-ঘড়িতে। সেই পাখী-না-জাগা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন বাগানে এসে দাঁড়ালেন। সামনের নদী-কিনারের নিঃসঙ্গ পথটা তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তারপর বনে বনে মুখর হয়ে উঠলো ভোরের কাকলি। মুঠো মুঠো সোনারোদ ছড়িয়ে পূর্ব্ব-দিগন্ত উদ্ভাসিত করে অপূর্ব্ব সূর্যোদয় দেখলেন তিনি রাবি নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে। শুনলেন ভোরের মাঙ্গলীক। নদীর জল বাড়তে আরম্ভ হয়েছে। আর কয়দিনের মধ্যেই বালির চড়া ঢেকে যাবে। ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলেন, রমজান আলী নমাজে আত্মস্থ। তার মত ডুবুরী এ তল্লাটে কমই আছে। পাকা অভিজ্ঞ মানুষ। সে যেন জলের পোকা—কত অঘটন, কত মানুষের কত সর্ব্বনাশ সে ঠেকিয়েছে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে। এ ব্রীজের সে অতন্দ্র প্রহরী। মানুষটাকে আজ যেন নতুন সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখলেন চৌধুরী। আপন নমাজে সে আত্মমগ্ন ধ্যানস্থ। ওধারে দৃষ্টি যেতে দেখলেন মন্দির। রহিম আর রাম আজ তাঁর চোখে এক হয়ে গেলেন।

আপন মনেই ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চললেন তিনি মন্দিরের দিকে। নাগরা জুতো শিশিরে ভিজে বালি জড়িয়ে ভারী হয়ে উঠেছে।

মন্দির-সংলগ্ন রামচৌতরার ঘাটে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। শ্বেতশ্মশ্রু পলিত কেশ এক বৃদ্ধকে দেখে মন তাঁর যেন আপনি সম্ভ্রমে নত হল। মুখর হয়ে চাপল্য দেখাতে পারলেন না। নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। প্রভাবশান্ত মানুষটি সেদিন সকালে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন ঘাটে এসে, প্রভাত সূর্য্যের পানে চেয়ে তদ্‌গত হয়ে। হয়ত তিনি রোজই এমনি করে বসে থাকেন সেই অনন্ত কাণ্ডারী নবীন নৈয়ার পথ চেয়ে। ধন্য হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি সূর্য্যদেবের দর্শনে, না সূর্য্যদেব তাঁর দর্শনে সে কথা কে বলবে!

চৌধুরী সাহেবের মনে হল ধন্য হয়ে গেলেন তিনি আজ অনাড়ম্বর এ মহাতপস্বীকে দেখে, যাঁদের দর্শন একমাত্র সেই বৈদিক যুগেই পাওয়া সম্ভব ছিল।

কৌতুক দমন করতে না পেরে বাবাজীর কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে উদ্‌ঘাটন করলেন এই রামচৌতরার বা পঞ্জাবের জনজীবনের আর এক অভিসম্পাতময় ইতিহাস।

. এই সব দেশের এই এক উৎপাত, বলে চলেন বাবাজী। শীতের দিনে গাঁয়ের আশেপাশে এসে তাঁবু ফেলে 'ওড' বা যাযাবরেরা। চাষীর ক্ষেতে যখন কাপাস তুলোর ফল ফেটে একাকার হয়ে থাকে প্রায় তখনই

হয় এদের আগমন। মাস কয়েক থাকে তারপর কোথায় যে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে উধাও হয়ে যায় বোঝা যায় না। অপূর্ব্ব রূপবান আর বলিষ্ঠ এ জাত। তেমনি অদ্ভুত এদের সাজসজ্জা। কাবুলিদের সঙ্গে পোষাকে রূপে চালচলনে এদের খুবই সাদৃশ্য। অল্পবয়সী মেয়েগুলো তো সত্যই অপ্সরী। আর তেমনি অপরিচ্ছন্ন। একেবারে ম্লেচ্ছ বলতে যা বোঝায়। সমস্ত জীবনে বোধহয় কখনও স্নান করে না। দিনান্তের শেষে নদীর মাঝখানে বসে এদের আসর—বিশেষ করে চাঁদনী রাতে সে-আসর একেবারে জমজমাট। নৃত্যগীতে বাঁশীর মনভোলানো সুরে ভরে তোলে মাঠের উদাসী প্রান্তর। কাঠকুটো জেলে আগুন করে। সেই আগুন ঘিরেই জমে ওঠে উৎসবের সমারোহ। ঝলসানো মাংস আর গৃহপালিত পশুর দুধ দিয়ে তৈরী করে একরকম মদ, তাই পান করে এরা উন্মত্ত হয়। সম্বল তাদের কিছু ছাগল ভেড়া, কয়েকটা বা ঘোড়া কখনও বা দুই চারটি উট আর ভাল্লুকের মত একরকম বিরাট বিরাট কুকুর। উটের দুধ এদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য, আর তাই দিয়ে প্রস্তুত কারণ তো একেবারেই অমৃত।

সামাল সামাল পড়ে যায় গৃহস্থের ঘরে ঘরে এদের আগমনে। হাঁস মুরগি চুরি থেকে মানুষের মন পর্য্যন্ত চুরি করে এই গুড্‌দের মেয়েরা। কোনও কল্যাণ-অকল্যাণ বোধের ধার ধারে না এ যাযাবর জাতি। ঘরে ঘরে কতই না অঘটন ঘটে যায়। কত ঘর ভেঙে যায়, কত সংসার নষ্ট হয়ে যায়।

এ কয়মাসের জীবিকা এদের, প্রধানত মেয়েদের ক্ষেতের তুলো তোলা। পুরুষরা মাটি কাটে, মাটির ঘর তোলে নিপুণ হাতে। নানা পুরুষালী শক্তির কাজ করে আর যখন সেসব কিছুই না জোটে পুরুষরাও তুলো তোলার কাজে মাঠে নেমে যায়। ছোট ছোট শিশুগুলোকে পিচমোড়া করে কাপড়ে জড়িয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নেয় মায়েরা। এদের বাচ্চারাও তেমনই কষ্টসহিষ্ণু। রোদে ধুলোয় দিব্যি থাকে ঐ ভাবে—কিছু হয় না। আমরা দেখে অবাক হই, ভেবে মরি। যুবতি মেয়েগুলো গৃহস্থের আনাচে-কানাচে উঁকি দেয়। এটা ওটা হাতসাফাই করে। পুরুষদের বিভ্রান্ত করে পয়সা আদায় করে। নীতির কোনও ধার ধারে না মেয়েপুরুষে এই জিপসিরা। গৃহিণীরা তাই ঘরের আসেপাশে দেখলেই দূর দূর করে, গাল পাড়ে। এরা কিন্তু হেসে কুটোকুটি হয় লুটোপুটি খায়। লাজলজ্জার বালাই রাখলে কি এ সব চলে!

এমনি এক ঝড়ের ধাক্কায় এঁরও ঘর ভেঙে গেছে। বড় নির্ব্বিবাদী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ উনি। একমাত্র সন্তান বুড়ো মা বাপকে ফেলে সেই যে চলে গেল কোন্ কুহকিনীর মোহে আর তার সন্ধান কেউ পায়নি। সে দলটাও এধারে আর কখনও ফিরে আসেনি। বুড়ীটা সহ্য করতে না পেরে এই রামজীর দোরে এসেই ঐ কুঁড়েতে মরেছে। আর ওঁকে তো দেখতেই পাচ্ছেন। সেই পরম নৈয়ার পথ চেয়ে যেন শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছেন। সুরদাসের মতই ওঁর সাধনা। মীরার মতই আত্মনিবেদিত ভাব। নিজেকে রামজীর দাস রামভক্তের সেবক করে দিয়েছেন।

আসবেন আর একদিন আলাপ করিয়ে দেব। বলতে বলতে চলে গেলেন তিনি মন্দিরে। বালভোগের ঘণ্টা বেজে উঠেছে, স্তব্ধ হয়ে ঘরের পথে ফিরলেন চৌধুরী।

নানা বৈচিত্রের দল মেলে এ রামচৌতরা যেন দিনে দিনে শতদলে বিকশিত হয়ে উঠছে তাঁর কাছে।

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

সুভাষের নিরুদ্দেশের সামান্য দিন পরেই Script Commission এল এবং সেটা গ্রহণ না করে মহাত্মাজী quit India প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সুভাষও কি দুই বৎসর পূর্ব্বে এই কথাই বলে নি? তাই বলেছিল বলেই কি তাকে ইস্তফা দিতে হয় নি? দেশবাসী যদি চিন্তাশীল হয় তবে এটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখবে। quit India আন্দোলন কি অহিংস ছিল? আমাদের বাংলায় যেখানে সেটা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল সেই মেদিনীপুর যে অহিংস ছিল না তার আমিই প্রধান সাক্ষী। কত লোক কলিকাতায় ও সুন্দরবনে আমার আশ্রয়ে এসেছে তাও আমি জানি এবং তারা সহিংস কাজের জন্যই দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আমি নিজে মেদিনীপুরে গিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি নি, কারণ তখন আমার ৬২ বৎসর বয়স এবং আমি খানিকটা বার্দ্ধক্যগ্রস্ত। কিন্তু প্রতি কার্য্য নিরীক্ষণ করেছি এবং দেশবাসীর সে কার্য্যের জন্য হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি। মহাত্মাজী কি জেলে থেকে এর বিবরণ জানতে পারেন নি? পেরেছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জেলে থাকায় বা যে কোনও কারণেই হ'ক, চৌরীচৌরার মত এ আন্দোলন বন্ধ করতে পারেন নি বা করেন নি। শেষ আমেরিকা জাপানের উপর অ্যাটম বোমা ফেল্লে এবং জাপান যখন বুঝল এ বোমার সঙ্গে যুদ্ধ অসম্ভব তখন আত্মসমর্পণ করলে। ওদিকে রাশিয়া ও আমেরিকা ও ইংরেজ জার্ম্মানির হিটলারকে কোণ-ঠাসা করলেন এবং জার্ম্মানিও আত্মসমর্পণ করলে।

যুদ্ধ থামল, কিন্তু যে সকল ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়ে পরে সুভাষ কর্ত্তৃক নূতন আজাদহিন্দ দলে যোগ দিয়া ইংরাজের হাতে বন্দী হয়, দিল্লীর লাল-কেল্লায় তাদের বিচার সুরু হল। বম্বের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ভুলা ভাই দেশাই তাদের defend করেছিলেন তাইতেই সুভাষের অদ্ভুত কীর্ত্তি সারাভারতে প্রচারিত হল। কেমন করে সুভাষের সৈন্যদল ইম্ফলে এসে ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন করেছিল, কেমন করে আন্দামান দ্বীপেও ঐ পতাকা উড়িয়েছিল, এইসব বিষয়ই জানতে পেরে বাংলা তোলপাড় হল। শুধু বাংলা নয় সমস্ত ভারতবর্ষে। অবশ্য আসামীরা দোষী সাব্যস্ত হল, তারা ইংরাজের সৈন্য হয়ে তারই বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল। কিন্তু তাদের শাস্তি দিতে আর সাহস হ'ল না। ইতিমধ্যে নেভিতে (নৌযানে) বিদ্রোহ হল। অবশেষে প্যাটেল সাহেবের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হয়। তারপর আকাশযানে (air Service) বিদ্রোহ হয়।

ইংলণ্ডে যুদ্ধাবসানে যে নির্ব্বাচন হল তাতে লেবার-পার্টি মন্ত্রীত্ব পায় এবং অ্যাটেলি সাহেব প্রধান মন্ত্রী হন। অ্যাটেলি দেখলেন তাঁর দেশকে যুদ্ধধ্বংস থেকে গড়ে তুলতে হিমসিম হতে হবে। ভারতবর্ষকে আর জোর করে দখলে রাখা সম্ভব নয়। তিনি ক্যাবিনেট-মিশন পাঠালেন। ক্যাবিনেট-মিশনের যে বক্তব্য ছিল সেটাও আমাদের পক্ষে খারাপ হত না। বরং ভালই হত। কংগ্রেস সেটা গ্রহণও করেছিল। মোস্লিম লীগও গ্রহণ করেছিল, প্রত্যেক প্রদেশ autonomous হবে। federated centre হবে। তার হাতে foreign relation, defence আর communicatior থাকবে যদি কোনও প্রদেশ ভবিষ্যতে আলাদা হতে চায় আলাদা হতে পারবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতি কর্ত্তৃক বম্বেতে ওই প্রস্তাব গৃহীত হল। মৌলানা

আজাদ লিখছেন, পরদিন প্রাতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জহরলাল press conferenceএ একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এইভাবেই আমরা ইংরাজের সঙ্গে রফা করে নিচ্ছি। তবে constitution assembly ত constitution প্রস্তুত করবে তখন যা হয় হবে। তার পরদিন জিন্না সাহেব মুস্লিম লীগের পক্ষে বললেন, জহরলালের মনে যখন এই দুরভিসন্ধি আছে যে constitution assemblyতে হিন্দু মেজরিটি দিয়ে সব বদলে দেবে তখন আমরা বিভাগ ছাড়া আর কিছুতেই মত দিতে পারি না। সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কেবিনেট-মিশন ফিরে গেল। অ্যাটলি সাহেব যেমন করে হ'ক ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচেন। ওয়াভেল সাহেব ভাইসরয় জিন্না সাহেবের বিভাগ আদৌ গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। তাকে সরিয়ে অ্যাটলি পাঠান লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। জানি না তাঁর নিজের influence বা তাঁর পত্নীর influence যার দ্বারাই হক, জহরলালজী ও প্যাটেল সাহেব দেশভাগে রাজী হয়ে গেলেন। আর মহাত্মাজী? যিনি বলেছিলেন দেশ বিভাগ হতে হলে তাঁর মৃতদেহের উপর হতে হবে। তাঁকে তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা যে কি করে বশ করেছিলেন সেটা এখনও রহস্যাবৃত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, আগের দিনও মহাত্মা দৃঢ় ছিলেন। কিন্তু পরদিন এসে দেখলাম প্যাটেল সাহেব ও নেহেরুজী তাঁকে রাজী করিয়েছেন। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। অ্যাটলি সাহেব যখন মাউন্টব্যাটেনকে বহাল করেন ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারীতে, তিনি তাঁকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুলাই মধ্যে যেমন করে হ'ক ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে। মাত্র তিনমাসে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের মে মাসেই তিনি কংগ্রেসকে ভাগে রাজী করে ফেললেন এবং তাঁর despatch চলে গেল dominion Status এর বিল প্রস্তুত করে ভারতবর্ষকে দুভাগ করে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান গঠন করে আইন পার্লিয়ামেণ্টে পাশ করে দিতে। অ্যাটলি সাহেব হাত ধুয়ে বসে-ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি জুন মাসেই বিল এনে উভয় হাউসে পাশ করে ফেললেন। তারপর এল ভারতবর্ষের সেই মহাদিন যাকে লোকে বলে—ভারতের লোকে বলে ভারতের স্বাধীনতাসূর্য্য উদয়ের দিন আর আমার মত দুর্ভাগারা বলে ভারতের চির অন্ধকারের দিন, সেই ১৫ই আগষ্ট উপস্থিত হল। ১৪ই আগষ্টের রাত্রি ১২টার পর ঐ দ্বিধাবিভক্তিকরণ আইন ভারতে বলবৎ হল। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশে, North West Frontier Province ও বেলুচিস্তানে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। হিন্দু শিখ মরল, মুসলমান মরল। শতশত স্ত্রীলোক ধর্ষিত হল। শতশত বালক খুন হল। আর যুবাবৃদ্ধের ত কথাই নাই। ফলে ৪৫ মাস মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব সিন্ধুদেশ, North West Frontier Province ও বেলুচিস্তান হিন্দু ও শিখ শূন্য হল, আর পূর্ব্বপাঞ্জাব মুসলমান শূন্য হল।

তদানীন্তন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও মুস্লিম লীগ কর্তৃপক্ষ এই যে ভারতের উপর পরম অন্যায় আঘাত দিলেন এবং দেশ স্বাধীন করেছি বলে বাহাদুরী নিলেন তার বিষময় ফল আমরা এই ১৮ বৎসর ধরে ভোগ করছি। আর এই সর্ব্ব অনিষ্টকর বিভাগ যতদিন বর্ত্তমান থাকবে ততদিন ভোগ করবো।

সেইদিন ভারতের এক যোগীপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, এ বিভাগ যদি থাকে গৃহবিবাদ কোনও দিন বন্ধ হবে না, কোনও উন্নতি হবে না; চাই কি বাহির হতে ভারত আক্রান্ত হবে, চাই কি আবার পরাধীন হয়ে পড়তে পারে। এই ১৮ বৎসরে সেই যোগীপুরুষের কথা যেন ভবিষ্যৎবাণীর মত ফলে যাচ্ছে। হায় দুর্ভাগা দেশ, হায় দুর্ভাগা ভারত-অধিবাসী, কার পাপের ফলে আজ এই ভোগ! ভগবান কি ভারতের দিকে চাইবেন না? এই বিভাগ কি রদ হবে না? ভারত কি আবার পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হবে? এই কি বিধাতার ইচ্ছা? কি জানি বৃদ্ধ আমি, যেদিন থেকে বিভাগ হয়েছে সেইদিন থেকে যে মর্ম্ম-যাতনায় জলে মরছি, সেই যাতনাই বুকে নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে!

আর সেই ১৫ই আগষ্ট বাংলার কর্মীবৃন্দের মাতৃস্বরূপা বাসন্তী দেবী চোখের জলের সঙ্গে বলেছিলেন, একি হল সাতকড়িবাবু, বাংলা দুভাগ করে, পাঞ্জাব দুভাগ করে, ভারত দুভাগ করে শেষ সেই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস? যেদিন লর্ড বার্কেনহেড ১৯২৯ সালে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দিতে চেয়েছিলেন, সেদিন মহাত্মাজী নিতে চান নি, আর আজ এই বিভাগ করে বাংলাকে পাঞ্জাবকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে সেই মহাত্মাই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নিলেন? তাঁর ত কাঁদবারই কথা। তাঁর স্বামী সর্বস্ব পণ করে যে যুদ্ধে নেমেছিলেন, রাজার অবস্থা থেকে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁর পিতৃভূমি আজ মুস্লিম. ষ্টেট! এর চেয়ে বেশী দুঃখ বুড়ো বয়সে আর তাঁর কি হতে পারে?

(৩০)

পূর্ব্বে বলেছি ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে মা জ্যাঠাইমা প্রভৃতির সঙ্গে উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্রে যেসকল তীর্থস্থান ছিল তা দেখে এসেছিলাম। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, মথুরা, বিন্ধ্যাচল, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র ও হরিদ্বার। কেন জানি না, আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল বৃন্দাবন ও হরিদ্বার। তারপর ২০।২২ বৎসর চলে গেছে কোন সালে ঠিক মনে নাই ১৯২৪ কি ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে যাই। মিটিং শেষ হলে বড় ইচ্ছে হল একবার হরিদ্বার ঘুরে যেতে। গেছলাম সেখানে। ১৯০২ সালের হরিদ্বার থেকে অনেক বদলে গেছল। ক্রমশঃ শহর হয়ে উঠছিল। সেখানে একদিন থেকে পরের দিন Bus-এ করে হৃষিকেশ গেলাম। সেখানে কালী কমলিওয়ালার ধর্ম্মশালায় উঠলাম। ব্যবস্থা অতি সুন্দর। একখানি ঘর খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে নিজে রেঁধে খাব কি না। অবশ্য আমি রাঁধবার ব্যবস্থা করি নি। জানলাম নিজে রেঁধে খেলে রাঁধবার বাসন ইত্যাদি এবং চাল ডাল ইত্যাদি ধর্ম্মশালার অধিকর্ত্তা বিনা পয়সায় দিবেন। ঐ ধর্ম্মশালার চাকরগণ Bus Stand-তে যায় এবং যাত্রীর দ্রব্যাদি নিয়ে আসে। আমারও এনেছিল। তাদের পয়সা দিতে গেলে নিল না। আমি বাজার থেকে দুধ ও ফল এনে খেয়ে রাত্রে থাকলাম। পরদিন প্রাতে হেঁটে লছমনঝোলায় গেলাম। সেই বৎসর বর্ষাকালের যে বন্যায় দড়ির উপর দিয়ে গঙ্গা পার হতে হত, সেটা ছিঁড়ে গেছল এবং একধারের থাম ভেঙে গেছল। হৃষিকেশ থেকে [illegible] যেতে দুই পাশের জঙ্গলের মধ্যে গাছের [illegible] কোটরে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। আমি দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি। শরীরে স্পন্দন নাই। অবশ্য খুব বেশী সময় দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। লছমনঝোলায় দড়ি ছিঁড়ে গেছে। ওপারে যাবার বড়ই ইচ্ছা। নৌকা আছে তবে জলের যে তরঙ্গ তাতে পার হতে সাহস করে না। শীতকাল বলে জলের তরঙ্গ তবু কম। শেষে পাঁচ টাকা দিতে সাহস করে পার করে দিল। ওপারে গিয়ে একটি কাঠের ঘর খোঁটার উপর প্রস্তুত, তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের এক বাঙালী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হল। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তিনি গার্হস্থ্য জীবনে ডাক্তার ছিলেন। আমি বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শুনে বড় খুশী হলেন। বললেন, বাংলার ত ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের আড্ডা। একটা পাঁচনের দ্রব্যের তালিকা দিচ্ছি। এটা প্রস্তুত করে যদি কংগ্রেস থেকে বিলোতে পারেন তবে বহু লোকের উপকার হবে।

তাঁর কাছ থেকে ঋষিকুল বিদ্যালয়ে গেলাম। সেটি পাহাড়ের উপর। সেখানে ছোট ছোট বালকগণ পড়ে। বেদ পড়ান হয়। শিক্ষক ও ছাত্র সবাই উত্তর প্রদেশের। হিন্দীতে কথা বললাম। শিক্ষক ভদ্রলোক আমি বাংলা কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ জেনে বড় আনন্দিত হয়ে ছাত্রদের দ্বারা সামবেদ গান করিয়ে

আমাকে শোনালেন। শিশুকণ্ঠে এ গান এত মধুর হয়েছিল যে আমি কিছুক্ষণ বাকশূন্য হয়ে ছিলাম। শিক্ষক ভদ্রলোক আমায় ছাড়লেন না। খিচুড়ী খাওয়ালেন। আমি ৫৲ দিলাম। শুনলাম সরকার থেকে তাঁরা সাহায্য পান। ইংরাজ সরকারের এ গুণ আমি দেখেছি। মুসলমান আক্রমণকারীগণ হিন্দু বিশ্ববিত্তালয়, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করেছে; হিন্দুর বহু মূল্যবান পুস্তক পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ কখনও তা করে নি। সংস্কৃত বিদ্যার বিষয় যখনই পণ্ডিত ইংরাজ আয়ত্ত করেছিলেন তখনই তাঁরা আশ্চর্য্য হয়েছিলেন এবং [illegible] শিক্ষার জন্য কখনও অবহেলা করেন নি। [illegible] ১৮ বৎসর চলে গেছেন। এই ১৮ বৎসর যাঁরা ভারতবর্ষের কর্ণধার তাঁরা যদি সংস্কৃত শিক্ষার দিকে জোর দিতেন, তাহলে মুসলমান-ধ্বংসকারীদের হাত থেকে যে সকল পুস্তক রক্ষা পেয়েছে তার আলোচনা হলে কি গণিতে, কি পদার্থ বিজ্ঞানে, কি রসায়ণ বিজ্ঞানে, কি আয়ুর্বিজ্ঞানে এমন কি পূর্ত্তবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বহু বিদ্যার আশ্চর্য্য আবিষ্কার হতে পারত। দুঃখের কথা তাঁদের পরানুকরণ মনোবৃত্তি তাহা করিতে দেয় নাই।

এই উপলক্ষে এখানে একটা কথা না লিখে পারলাম না। পুরী গোবর্দ্ধন মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে যিনি শঙ্করাচার্য্য ছিলেন তাঁর কথা লিখিতেছি। তিনি ১৯৬১ কি ১৯৬২ সালে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তার পুরা নাম মনে নাই, তীর্থ ভারতী কি এইরূপ ছিল। তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং কংগ্রেসের মুক্তি-আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ইংরাজের জেলেও নাকি গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে তিনি আমায় স্নেহ করতেন। শুক্ল পূর্ণিমায় আশীর্ব্বাদী পত্র পাঠাতেন। আমার সোদর-প্রতিম ডাক্তার যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্তের বালিগঞ্জ প্লেসের রামকুঁড়ে নামক বাড়ীতে এসে থাকতেন। তিনি মাদ্রাজী ছিলেন এবং philosophy-তে M. A ছিলেন। পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করে পুরীর শঙ্করাচার্য্য হয়েছিলেন। ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলছি। তিনি একবার এসে আমাকে বল্লেন "সাতকড়ি তুমি ত গণিতের ছাত্র আর আমি দর্শনের ছাত্র। তুমি গণিতের যে কোনও অঙ্ক আমাকে দাও আমি কষে দিব।" আমি বোর্ডে Intrigal calculas-এর একটি অঙ্ক লিখলাম। তিনি যখন সেটা কষতে লাগলেন, আমি দেখলাম ক্যালকুলাসের প্রসেস নয়, যখন উত্তর মিলে গেল তখন জিজ্ঞাসা করলাম, যে প্রসেস লিখলেন ওটা ত ক্যালকুলাসের প্রসেস নয়। তিনি বললেন "আমি ত ক্যালকুলাস পড়ি নাই। আমি বললাম তবে এ প্রসেস আপনি কোথায় পেলেন? তিনি তখন বললেন, অথর্ব্ব বেদের একজায়গায় ১৬টি শ্লোক আছে যার পাঠ উদ্ধার করলে জগতে যতপ্রকার গণিতের সমস্ত অঙ্ক কষা যেতে পারে। আমি সেই থেকেই এই প্রসেসে ঐ অঙ্ক কষে দিলাম। তিনি যে শুধু আমাদের উহা দেখিয়েছিলেন তাহা নহে, নাগপুরের হাইকোর্টের এক জজ সাহেবের গৃহে তিনি অতিথি হয়েছিলেন এবং সেখানে দিনের পর দিন তিনি ঐরূপ অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন এবং তখনকার Statesman পত্রিকায় সেটা দিনের পর দিন উল্লেখ করেছিল। আমাদের দেশের সরকার এদিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। কেবল ইউরোপের অনুকরণ করে এলেন এই সতের বৎসর। দুর্ভাগ্য ভারতের ছাড়া আর কি বলবে?

ঋষিকুল বিত্তালয় থেকে গেলাম স্বর্গদ্বারে। সেটিও একটি মনোরম স্থান। পাহাড়ের সানুদেশে মনোরম বিস্তৃত উত্তান। সেই উত্তানে খুব ছোট ছোট পাকা কুটির। ঐরূপ কুটিরে প্রায় ১০০ শত সন্ন্যাসী বাস করেন। এক বিশালকায় সন্ন্যাসী তখন মঠাধিকারী। তাঁর বেশ একটি সুন্দর বাটিকা, তার মধ্যে অজিন-আসনে তিনি বসে আছেন। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দীতে কোথা থেকে আসছি। আমি বললাম, আমি তীর্থযাত্রী নই, বিচিত্র তীর্থ ঘুরে বেড়াচ্ছি। বললেন, এই মঠে কিছু দাও, এখানে ১০০ সন্ন্যাসীর খাবার থাকবার ব্যবস্থা। আমি বললাম, ঐরূপ দিবার শক্তি আমার নাই। মধ্যাহ্নের সময় সন্ন্যাসীদের আবার

দেখলাম। ঘণ্টা পড়তেই প্রত্যেকে একটি করে পাত্র ও একটি ছোট বস্ত্রখণ্ড হাতে আসতে লাগলেন, রুটি আর ডাল, কেউ কেউ চিনি। ঐ একবার আহার। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত তাঁরা খাদ্য নিয়ে চলে গেলেন।

আমি সেখানে নৌকায় পার হয়ে পুনর্ব্বার ঋষিকেশে এসে আমার পোটলা নিয়ে হরিদ্বার এবং সেখান থেকে সোজা কলকাতা চলে এলাম।

পূর্ব্বে লিখেছি যে, ১৯২৫ সালের কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির পর বৃন্দাবন গিয়াছিলাম। যেদিন বৃন্দাবন পৌঁছুলাম সেদিন পূর্ণিমা। ধর্ম্মশালায় উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে রাত্রি ১০টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। জ্যোৎস্নায় ফিন ফুটেছে। যমুনার তীরে বালিতে নামলাম এবং প্রায় ৭।৮ মাইল কুলেকুলে চলে গেলাম এবং ভোরে ফিরে এলাম। কেন জানি না, বৃন্দাবনে গেলেই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার কথা। জানি সে বৃন্দাবন জঙ্গলে পূর্ণ হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব রূপ সনাতনকে উপদেশ দিয়ে, বৃন্দাবন গড়ে তুলতে বলেন। বর্ত্তমান বৃন্দাবন সেই জঙ্গল কেটে প্রস্তুত। কিন্তু গৌরাঙ্গদেব এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলে স্থির করেছিলেন। পরের দিন ভাতে-ভাত করে খেয়ে সান্তবাবার মঠ পূর্ব্বে যাহা কাঠিয়া বাবার মঠ ছিল তাহা দেখিবার জন্য বাসে (Bus) উঠিয়া বসিলাম। ঐ মঠ বৃন্দাবন ও মথুরার রাস্তার মাঝামাঝি। তারাকিশোর রায়চৌধুরী হাইকোর্টের খুব বড় উকিল ছিলেন। তিনি লাইব্রেরীর যে ঘরে বসতেন আমি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে সেই ঘরেই বসতাম। তিনিই বৈরাগ্য হলে সন্ন্যাস নিয়ে কাঠিয়া বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে কাঠিয়াবাবা দেহরক্ষা করলে সেই মঠের অধিকারী হন। এইখানে তারাকিশোর বাবুর নিজমুখে যা শুনেছি সেই গল্পটা করি, মন্দ হবে না। তারাকিশোর বাবু, বিপিন পাল মহাশয় ও ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় তিন জনেই শ্রীহট্টের অধিবাসী। তিনজনেই বন্ধুত্বে আবদ্ধ এবং একত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তারাকিশোরবাবু আইন-পরীক্ষা পাশ করার পর কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বিপিনবাবু ও ডাক্তার সুন্দরীমোহনের কথা পূর্ব্বে লিখেছি। তারাকিশোরবাবু শিক্ষকতা ত্যাগ করে ওকালতি করেন। তাঁর যখন খুব ভাল প্র্যাকটিস্, এক পক্ষে ডাঃ রাসবিহারী আর অপরপক্ষে তারাকিশোর সেই সময়েই তাঁর জীবনে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আসে। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান। সংস্কৃতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি যুবক বয়সে ব্রহ্ম হন, তারপর নাস্তিক হয়ে যান। তাঁর বিবাহিত জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। সন্তানাদি না হওয়া অবস্থায় স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এ অবস্থায় যা হয়ে থাকে, তিনি নেশারও বশবর্ত্তী হন। বৃদ্ধ পিতা মনের দুঃখে কাশীবাসী হন। একদা পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি পিতাকে লেখেন—"কাশীতে ত' বহু পণ্ডিত আছেন তাঁরা যদি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে ঈশ্বর আছেন তাহা হইলে আমি আস্তিক হইয়া সংসারধর্ম্ম করিব।" পিতা খুব আনন্দিত হইয়া কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া তারাকিশোর বাবুকে কাশী যাইবার জন্য লিখিলে, তিনি কাশী গিয়া তিনচারদিন ধরিয়া সেই সব পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্র বিষয়ে বিচার করেন। পরে পিতাকে জানিয়ে দেন যে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁর পিতা অতিশয় মর্ম্মপীড়ায় ব্যথিত হন। ইহার কিছুদিন পরে শীতকাল, তিনি শয়নকক্ষে রাত্রে দরজায় খিল দিয়া মশারি ফেলিয়া শয্যার বাহিরে মাথার কাছে একটি বিজলী বাতি জ্বালিয়া আইনের রিপোর্ট-বহি পড়িতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন সামনে খাটের পাশে জটাজুটধারী, কৌপীনধারী নগ্ন-দেহ এক সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া তাঁর দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন। দেখিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিয়া মশারির বাহিরে আসিলেন।

এসবই তাঁর নিজ মুখ হইতে শোনা। সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি ভিতরে এলেন কি করে? দরজা ত' বন্ধ।" তিনি মৃদু মৃদু হাসতে হাসতেই বললেন—"ওরকম আসা খুব সহজ। তুমি

যে তর্ক করবে ভগবান আছেন কিনা,—তাই আমি এসেছি” তারাকিশোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—“ঘর বন্ধ আছে অথচ সহজে আসা যায় বলছেন, এ কি ভেল্কী বাজী?” তিনি বললেন,—ভেল্কী বাজী নয়। যোগের খুব প্রথমেই এসব শক্তি অর্জ্জন করা যায়। এখন তুমি বস’, আমি তোমায় ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোঝাব’।—তারাকিশোরবাবু আমাদের বলেন—“আমি জিজ্ঞাসা করলুম, যে যোগের প্রথম অবস্থায় এরূপ শক্তি অর্জ্জন করা যায় সেই যোগে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়?” তিনি সহাস্যে বললেন,—নিশ্চয়ই হয়। তুমি বস’ আমি তোমায় ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারাকিশোরবাবুর আর তর্ক করা হ’ল না। একেবারে সেই কৌপীনধারী যোগীর পায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কে, আমায় উদ্ধার করতে এসেছেন? তিনি তারাকিশোরবাবুকে তুলে বললেন,—তিনি কাঠিয়াবাবা নামে পরিচিত। বৃন্দাবনের সন্নিকটে তাঁর মঠ আছে। তোমার বাবা যেরূপ মর্ম্মাহত হয়েছেন তাই জানতে পেরে আমি এসেছি। তোমার কি এখন ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস হ’য়েছে? তারাকিশোরবাবু আবার তাঁর পায়ে পড়ে বললেন,—আপনি যখন দয়া করে এসেছেন তখন আমায় শিষ্যত্বে গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন। তিনি বললেন,—সে এখন অনেক বিলম্ব আছে। তোমার প্রথম কর্ত্তব্য পিতার নিকট গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং পুনরায় কাশীধামে উপবীত হওয়া। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, নাস্তিক হ’য়ে নিজেকে অনেক নীচুতে এনে ফেলেছ। এখন আবার আমার উপদেশমত কাশীতে উপবীত হ’য়ে, ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করে পুনরায় শাস্ত্র-আলোচনা করবে। মন্ত্র এখন দোব না, উপবীত হয়ে পবিত্র হ’য়ে আমাকে স্মরণ করলেই আমি এসে তোমায় মন্ত্র দোব। উপযুক্ত সময় হ’লে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। তারাকিশোর-বাবু সেই উপদেশ অনুসারে চলেছেন। তাঁর ভ্রম ঘুচে গেছে। এখন অপেক্ষা করছেন কবে গুরুর ডাক পড়বে। এ সংবাদ তাঁর নিজের মুখে শোনা। তারপর একদিন সত্যসত্যই সকল উকীলের নিকট সহাস্যমুখে বিদায় নিয়ে মঠে চলে যান। আমি যখন ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দেখা করতে যাই তখন গিয়ে দেখি—মাথায় প্রকাণ্ড জটা, এক খাটিয়ার উপর বসে আছেন কৌপীন পরে, নগ্ন গায়ে। আমি প্রণাম করতে চিনতে পারলেন না। পরিচয় দিলাম। শুনে বললেন,—তোমার এ বেশ কেন? ছোট খদ্দর পরিধানে, গায়ে একটা মেরজাই ও একটা খদ্দরের চাদর। খালি পা। আমি বললাম,—ওকালতি ছেড়ে দিয়েছি, কংগ্রেসে সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত আছি। শুনে বললেন—, বস, এখানে খাও। আমি খেয়ে এসে’ছি বলায় দুঃখিত হলেন! বললেন,—মঠে এলে তাও খেয়ে?—আমি বললাম, পরে প্রসাদ খেয়ে যাব’। তখন কংগ্রেসের গল্প শুনবার জন্যে ব্যস্ত হলেন। প্রায় দু-ঘণ্টা গল্প করবার পর আমায় ঠাকুরের প্রসাদ,—ফল ইত্যাদি দিলেন। তাই খেয়ে পরের বাসে মথুরা এসে ট্রেণ ধরে একেবারে কলকাতা। গল্পের সময় ব’লেছিলেন,—জান সাতকড়ি, তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে মঠে এলে গুরু আমাকে বললেন—তোমার বড় অহঙ্কার ছিল। তুমি দুটী বছর মঠে যারা খাবে তাদের এঁঠো পরিষ্কার করবে। তাই করেছিলাম।

পরে আমি আরও ক-একবার তীর্থস্থানে গেছি। অবশ্য দাক্ষিণাত্যে যাওয়া হয়নি। পুরী, ভুবনেশ্বর গেছি। কিন্তু, বৃন্দাবনে গিয়ে মনের যে একটা অপূর্ব্ব-ভাব হয় এমন আর কোথাও হয়নি।

(৩১)

জীবনে হিন্দু-মুসলমানের খেলা ভাল করে দেখলাম। তাই সে সম্বন্ধে দু-চারটে কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। মেদিনীপুর সহরে আমার জন্ম এবং বাল্য ও কৈশোর সেখানেই কেটেছে। মেদিনীপুর সহরে বহু মুসলমানের বাস। এমনকি আদিম পাঠান মুসলমানবংশ মেদিনীপুর

সহরে দেখেছি। সকলেই জানেন মোগল সেনাপতিগণ পাঠানদের সঙ্গে বহু যুদ্ধ এই মেদিনীপুরের উপর করেছেন। বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঠানগণ উড়িষ্যায় আশ্রয় লয় এবং শেষ যুদ্ধ সবই মেদিনীপুরের কাছাকাছিই হয়। মেদিনীপুরে ধর্মান্তরিত মুসলমানও অনেক। এটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে, বাংলায় হিন্দুর নিম্ন শ্রেণীরাই ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলমান হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বা সদ্‌গোপ, মাহিষ্য ইত্যাদি শ্রেণী হইতে ধর্মান্তরিত মুসলমান নাই বল্লে খুব অত্যুক্তি হবেনা। দু-চারজন হয়ত' পাওয়া যেতে পারে। তাই বাংলায় মুসলমানগণ সাধারণতঃ দরিদ্র। ১৮৫৭ সালে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠে যাকে তাঁরা সিপাহি-বিদ্রোহ বলেন তাতে হিন্দু-মুসলমান একযোগে কাজ করে। তাই সে আন্দোলন স্তব্ধ করিয়ে ইংরাজসৈন্য যে অকথ্য অত্যাচার করে, সেটা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের উপরেই। বরং হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের উপর বেশী করে। ভারতের শেষ বাদশাহ দিল্লী থেকে বর্মায় নির্ব্বাসিত হইলে, ভারতে দাক্ষিণাত্যে নিজাম ছাড়া এবং মধ্যপ্রদেশে ভূপাল রাজ্য ছাড়া আর কোনও মুসলমান রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল না। যখন ইংরাজ সরকার তাদের রাজকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীর জন্য শিক্ষাপ্রণালী ভারতে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হিন্দুরাই প্রধানতঃ যোগ দেয়। মুসলমানের সংখ্যা গোড়ায় গোড়ায় অতি নগণ্য। তাই প্রায় সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং সেই কারণে হিন্দুর পদানত। দুইচারজন শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন এবং ব্যবসা করিয়া কিছু মুসলমান ধনী হইয়াছিলেন। আলিগড়ে মুস্লিম ইউনি-ভারসিটি স্থাপনের পর মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার কদর বাড়ে। তাই যখন ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস স্থাপিত হয় তখন তাতে মুসলমানের স্থান অতি নগণ্য। ইংরাজও মুসলমানদের কোনও পাত্তা দেয় নাই। লর্ড-কার্জ্জনই ভাইসুরয় হয়ে এসে প্রথম উপলব্ধি করেন যে হিন্দুরা ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠছে এবং মুসলমানগণ তাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য বিশেষ করে পরিস্ফুট হয়েছিল বাংলাদেশে, যেখানে বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীন, রবীন্দ্রনাথের দল রাশি রাশি জাতীয়তার গান গেয়েছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কার্জ্জন সাহেব তাই বাংলার মধ্যেই প্রথম হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বাধাবার জন্যে বাংলা ভাগ করেন, ঢাকার নবাব খাজা শলিমুল্যা সাহেবের সাহায্যে। সেইজন্যে বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে মুসলমানদের কোনও অবদান নেই। পশ্চিমবাংলায় মাত্র দু-তিনজন মুসলমানের নাম করা যেতে পারে। যেমন বর্দ্ধমানের লিয়াকত হোসেন, এবং ব্যারিষ্টার রসুল সাহেব যিনি বরিশাল কন্‌ফারেন্সে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ঢাকার নবাবের সহযোগিতা করে সমস্ত মুসলমানরা ঐ বিভাগ করার অনুকূলে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বিশেষ করে মেদিনীপুরে মৌলবী পাঠিয়ে তাদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তারা রাজী হয়নি। আর এই সময়েই সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানদের ধর্মগুরু আগা খাঁ দ্বারা প্রথম মুস্লীম লীগের সৃষ্টি।

এটা খুবই সত্য যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কাছে যেমন অস্পৃশ্য ছিল, তারা ধর্মান্তরিত হ'য়ে মুসলমান হয়েও সেইরূপ অস্পৃশ্যের মতই থেকে গেছল। আমিত' ছোটবেলায় দেখেছি উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরমণী বিধবা অবস্থায় আচারশীলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় এলে আমার মা তাঁদের সঙ্গে এক আসনে বসেছেন, তাঁদের ছুঁয়েছেন, গল্প করেছেন। আবার তাঁরা চলে গেলে সে আসন কেচে, নিজে স্নান করে তবে সংসারের কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু, সাধারণ-ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুব মেলা-মেশা ছিল। হিন্দুর দোল-দুর্গোৎসবে মুসলমানগণ খুবই সহযোগিতা করত'। আবার মুসলমানদের পর্ব্ব ঈদ, মহরম প্রভৃতিতে হিন্দুগণ বিনা দ্বিধায় যোগ দিত'। মুসলমান-সানাই ছাড়া হিন্দুর কোনও কুল-কার্য্যই হ'ত না। কিন্তু ঐ বাংলা-বিভাগ থেকে মুস্লীমলীগ স্থাপিত হলে সেই প্রথম মুসলমানগণ হিন্দু-বিদ্বেষী হতে আরম্ভ করল। যদিও

প্রথমে তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ঐ লর্ড কার্জ্জনই ইংরেজদের হুঁশিয়ার করে দিলে যাতে এই বিদ্বেষ-বহ্নিতে তাঁরা ক্রমশঃ ইন্ধন দেন। এই ইন্ধনের জোরে এবং কংগ্রেসের মধ্যে নরম ও গরমপন্থীর মধ্যে বিবাদের দৌলতে মুস্লীমলীগ ক্রমশঃ তিলে তিলে বেড়ে উঠ্‌ল। তবুও কংগ্রেসের তদানীন্তন নেতৃবর্গের কৌশলে ১৯১৬ সালে লীগপন্থীদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা হয় এবং জিন্না সাহেবের মত মুসলমানগণও কংগ্রেসে যোগ দেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস অসহযোগ আদর্শ গ্রহণ করে কংগ্রেসের সৃষ্টি হ'ল তাতে জিন্না-সাহেবের লীগপন্থী মুসলমানগণ যোগদান না করলেও মহাত্মাজীর প্রোগ্রামের মধ্যে খিলাফৎ থাকায় মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ইত্যাদির মত Rank মুসলমান-গণও কংগ্রেসে এসেছিলেন। আমার মনে হয় এই সময় ভারতবর্ষের তথা বাংলায় যত মুসলমান স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এত মুসলমান আর কখনও যোগ দেয়নি। তার ফলে হল এই যে, মুসলমানগণের আত্ম-চেতনা খুব বেশী করে জাগ্রত হ'ল। আর তারা বুঝল যে তাদের সংখ্যা ত' কম নয়। সুতরাং সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের সেই অনুপাতে স্থান পাওয়া চাই। কিন্তু বিভেদ-বুদ্ধি তখন আর ছিল না বললেই চলে। তাই লর্ড রি'ডং যখন ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আপোস করতে চাইলেন তখন মৌলানা আক্রামখাঁর মুখে জেলের ভিতর মজলিসে শুনেছিলাম,—"যদি এই আপোষে ভারতের স্বাধীনতার পথ এগিয়ে আসে তবে আপোষ করুন। আমাদের যদি জীবনভোর জেলে থাকতে হয়, আমরা রাজী।"—এই একতা দেখে ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ১৯১৯ সালের কন্‌ষ্টিটিউশনে পৃথক ভোটে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস ত' সে নির্ব্বাচনে যোগ দেয় নি। আবার যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল নির্ব্বাচনে যোগ দিলেন তখন স্বরাজ্যদলের মুসলমান প্রতিনিধিগণ পৃথক ভোটে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেই দেশ-বন্ধুকে চেপে ধরলেন একটা চুক্তি করবার জন্যে। আর সেই চুক্তির ফল যে কি হয়েছিল তা পূর্ব্বে বলেছি। তাতেও কিছু হ'ত না যদি না হিন্দু মহাসভার এবং কংগ্রেসেরই কয়েকটি উৎকট হিন্দু-ধর্ম্মধ্বজী দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কলকাতায় ১৯২৬ সালে তীব্র সংঘর্ষ বাধাতেন। সেই গল্পটাই বলি।

একদিন হিন্দু মহাসভা এক হিন্দু-প্রশেসন বের করে। বাদ্যভাণ্ডসহ হ্যারিসন রোড দিয়ে চলেছেন। তখন বেলা আন্দাজ তিনটা হবে। কলেজ ষ্ট্রীট আর চিৎপুর রোডের মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে রাস্তার দক্ষিণদিকে একটা হাসপাতাল আছে এবং রাস্তার উত্তরদিকে একটা ছোট মসজীদ আছে, প্রসেসন সেখানে উপস্থিত হতেই, সেই মসজীদ থেকে একটি ঢিল তাদের উপর পড়্‌ল। তখন উপাসনার সময় নয়। এটি কোনও দুষ্টবুদ্ধি মুসলমানের কাজ। হিন্দুরা প্রস্তুতই ছিল। মসজীদ চড়াও হ'য়ে সেটা একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে তারা চলে গেল। সহীদ সরওয়ার্দ্দি তখন কংগ্রেসের তরফে ডেপুটি মেয়র এবং যতীন সেনগুপ্ত মেয়র। সরওয়ার্দ্দি এই ব্যাপার শুনে নাখোদা মসজীদে এসে গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিলে। ব্যস্, রাস্তায় রাস্তায় হিন্দু-পথচারী খুন হ'তে লাগল'। আমি ও প্রতাপ গুহরায় দুজনে কংগ্রেস-অফিস থেকে বৈকাল পাঁচটার সময় অকুস্থলে গেলাম। কংগ্রেসের লোক দেখে মসজীদের ইমাম ছুটে এসে আমাদের মসজীদে নিয়ে গেল। দেখলাম সব আসবাব-পত্র ধ্বংস হ'য়েছে। ক্রমশঃ এই নিধনযজ্ঞ সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়্‌ল। আমি সমস্ত রাত্রি কংগ্রেস-অফিসে ব'সে সংবাদ পেলেই স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে মানুষকে উদ্ধার করছি। কংগ্রেসের পতাকা দেখলে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সম্মান দেখাচ্ছে। রাত একটার সময় কলা-বাগান থেকে টেলিফোন করছে এক হিন্দু-পরিবার, তাদের রক্ষা করার জন্যে। আর কেউ তখন নেই। আমি একাই একটা ট্যাক্সী নিয়ে গেলাম সেখানে। ট্যাক্সী সেখানে ঢুকবে না। ট্যাক্সী ছেড়ে, হাতে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কয়েকজন মুসলমান যুবক এসে পড়্‌ল। স-সম্মানে বললে, কেন

এসেছেন। বললাম একটি হিন্দু-পরিবার বিপন্ন বলে ফোন্ ক'রেছেন। তারা বললে আমরা পাহারা দিচ্ছি কোনও বিপদ হবে না। আমার সঙ্গে তাঁরা সেই বাড়ীতে গেলেন। হিন্দু-পরিবারকে সাহস দিলেন কিন্তু তাঁরা থাকতে রাজী হলেন না। তখন তাদের সকলকে ঘিরে আমার সঙ্গে এসে ঐ মুসলমানযুবকগণ ট্যাক্সীতে তুলে দিলে। তখনও মুসলমানের উপর কংগ্রেসের অতিশয় প্রভাব। কয়েকদিন ধরে সহীদ সরওয়ার্দি গুণ্ডাদের নিয়ে হাঙ্গামা জিইয়ে রেখেছিল। গুণ্ডার সর্দারের নামটা ভুলে গেছি (বোধহয় মিনা পেশওয়ারী)। তাকে আমি দেখেছিলাম। বড়বাজারের হিন্দু গুণ্ডারা মুসলমানদের মারতে লাগল'। যতীন সেনগুপ্ত নিজে গাড়ী নিয়ে সেইসব হিন্দুপ্রধান স্থান থেকে মুসলমান পরিবারদের উদ্ধার করেন। একদিন সকালে আমি ও ডাক্তার কুমুদ-শঙ্কর রায় হ্যারিসন রোড দিয়ে চিৎপুরের মোড় বরাবর গেছি, দেখি একটি পথচারী মাড়ওয়াড়ী হিন্দুকে একটা লোক তার মাথায় লাঠি মেরে পালাল। সে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে তাঁকে তুললাম। মাথা দিয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ করে রক্ত পড়ছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। পুলিশ কোনই সাহায্য করেনি বরং যাতে এই বিবাদ খুব বাড়ে তার চেষ্টা করেছে। একদিন মেছুয়াবাজার থেকে একদল মুসলমান গুণ্ডা ঠনঠনের কালীবাড়ী আক্রমণ করবার জন্যে ছুটেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু বলেনি তাদের। দুটি হিন্দু যুবক লাঠি হাতে তাদের আটকে ছিল। কালীবাড়ীতে পৌঁছুতে দেয়নি। পুলিশ গুলি করে একজন যুবককে ধরাশায়ী করলে। তখন অনেক হিন্দু এসে গেছে। মুসলমানরা পালিয়ে গেল। পুলিশও সরে গেল। এক-জন যুবকের প্রাণ গেল (চন্দ্রকান্ত)। যাঁরা পড়ছেন, তাঁরা অবাক্ হবেন,—ভাববেন যারা দেবমন্দির রক্ষা করছে পুলিশ তাদের মারলে? এত' আশ্চর্য্য কথা? হ্যাঁ, আশ্চর্য্য কথাই। তখন ইংরেজ কংগ্রেসকে কাবু করবার জন্যে এমন হীন কাজ নেই যা করেনি।

ক্রমশঃ

কুমারহট্ট ও ঈশ্বরপুরী

মাধব পাল

'প্রভু বোলেন কুমারহট্টেরে নমস্কার
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার।'

(চৈতন্য ভাগবত)

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে প্রসিদ্ধ পল্লী 'কুমারহট্ট হালিসহর' গ্রাম। বর্তমানে কুমারহট্ট নাম অনেকেই বিস্মৃত। সমগ্র গ্রামটি হালিসহর নামেই খ্যাত। ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী থানার অন্তর্গত বর্তমান হালিশহর।

কেউ যদি বলেন, হালিশহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট বা কুমার-হাটি একটি পাড়া। কিন্তু আসলে হালিসহর ও কুমারহট্ট একই গ্রাম। প্রাচীনকালে পণ্ডিত-সমাজে হালিসহর কুমারহট্ট বলেই পরিচিত ছিল। কুমারহট্ট নামটি এত প্রাচীন যে কিভাবে এই পল্লীর নাম কুমারহট্ট হয়েছিল কোথাও তার সঠিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। তবে এই সম্বন্ধে কয়েকটি জনশ্রুতি আছে। যদিও তার কোনটিও সত্যি বলে মনে করার কারণ নেই।

যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধরগণ বিশেষ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য এখানে আসতেন। সেজন্য যশোহর হতে গঙ্গাতীরে এই স্থান পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত জাঙ্গাল বা রাজপথ ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য প্রতিবৎসর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহু লোক সঙ্গে নিয়ে এই গ্রামে আসতেন। তার আগমন সময়ে গঙ্গাতীরে মেলা বা হাট বসতো। ক্রমে সেই হাট জনপদে পরিণত হয়ে কুমার উদয়াদিত্যের নামে কুমারহট্ট বলে খ্যাত হয়। কিন্তু কুমারহট্ট পল্লীর নাম এতই প্রাচীন যে যশোহরের রাজবংশের অনেক পূর্ব্ব হতেই ঐ নামে উক্ত গ্রাম অবস্থিত ছিল।

আবার কারও মতে এই গ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস বলে উহা কুমারহট্ট নামে পরিচিত। এখনও অনেক কুম্ভকার এই গ্রামে বাস করেন। তার মধ্যে অনেকেরই টালী তৈরী করা প্রধান কাজ। কিন্তু এই গ্রামে প্রাচীন-কাল থেকেই ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকের বাস ছিল। তারা যে কুম্ভকারদের নামে গ্রামের নাম মেনে নেবে তা মনে হয়না।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই গ্রামকে কুমারহট্ট বলে উল্লেখ করতেন। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে এই গ্রামকে কুমারহট্ট বলে উল্লেখ করেছেন তা তাঁর জীবনীকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করেছেন। দু'শ বছর আগে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত চারি পণ্ডিত-সমাজের অন্যতম ছিল এই কুমারহট্ট গ্রাম। একসময় ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণ কুমারহট্টের পণ্ডিত-সমাজের অন্তর্গত বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন।

বাংলার মুসলমান নবাবদের রাজত্বকালে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার উত্তর সীমা বাঘের খাল হতে শ্যাম-নগর ষ্টেশনের দক্ষিণে নবাবগঞ্জের খাল পর্য্যন্ত সমগ্র গঙ্গাতীর বহু অট্টালিকায় পূর্ণ ছিল। মুসলমান রাজ-পুরুষগণ অট্টালিকাপূর্ণ গঙ্গাতীরবর্তী ঐ অঞ্চলকে 'হাবেলী সহর' বলতো। উর্দ্দু ভাষায় 'হাবেলী' মানে অট্টালিকা। সরকারী দলিলপত্রেও কুমারহট্ট হাবেলী সহর বলে

উল্লেখ আছে। এই হাবেলী সহরই বর্তমানের হালিসহর।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪পরগণা জেলা গেজিটিয়ারে উল্লিখিত আছে—

Halisahar town in the Barakpur Subdivision in the District of 24 Pargannas, Bengal, situated in 22°56 North and 88°29 East on the Bank of the Hooghly river. . . . . .It was formerly called Kamerhatta and is a noted home of Pandits. Among other Devotees Gouranga, Ramprasad lived here.

উপরিউক্ত গেজেট মতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এখানে বাস না করলেও তাঁর চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছিল এই কুমারহট্ট গ্রাম। শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন এই গ্রামের অধিবাসী। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে কুমারহট্টে এসেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করেন। তারপর তিনি বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড় দেশাভিমুখে রওনা হন।

আনন্দে বর্ষা কৈল সমাধান
বিজয়া দশমী দিনে করিল প্রয়াণ।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

শারদীয়া বিজয়া দশমী দিনে রওনা হয়ে তিনি কার্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে পাণিহাটীতে এসে পৌঁছান। তারপর দিন শান্তিপুর অভিমুখে গঙ্গাতীর ধরে এসে কুমারহট্টে পদার্পণ করেন।

আপনি ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলেন কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থান।
আর কিছু শব্দ নাই ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধে এক ঝুলি॥
প্রভু বলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোর জীবন ধন প্রাণ॥

(চৈতন্য ভাগবত)

মহাপ্রভুকে প্রেমানন্দবশে এক ঝুলি মাটী তুলে নিতে দেখে অনুগামী বহু ভক্তবৃন্দ ঐ স্থান হতে পবিত্র মাটী তুলে নেয়। ফলে ঐ স্থানে একটি ক্ষুদ্র ডোবার সৃষ্টি হয়। ঐ ডোবা এই সুদীর্ঘকালের বিপুল পরিবর্তনের মধ্যেও অদ্যাবধি 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ডোবা' নামে খ্যাত হয়ে আছে।

অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর ও রামকেলি গ্রাম হইতে বৃন্দাবন যাত্রা বন্ধ করে পুনরায় কুমারহট্টে আগমন করেন।

কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্টে শ্রীবাস মন্দিরে॥

(চৈতন্য ভাগবত)

নবদ্বীপের ভক্তচূড়ামণি শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর সন্ন্যাসযাত্রার পর থেকে কুমারহট্টে এসে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানের পাশে বাস করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কয়েকদিন থেকে নীলাচলের পথে রওনা হন। এইভাবে কুমারহট্ট শ্রীচৈতন্য চরণস্পর্শে ধন্য হয়।

কুমারহট্ট তার পূর্ব হতেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং তাঁর গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তদের সাধনার স্থল ছিল। মাধবেন্দ্রপুরীর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার পূর্ণিপাট গ্রামে। তিনি ছিলেন দক্ষিণী বৈদিক ব্রাহ্মণ। সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া ও কুমারহট্টের মধ্যবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রামে এসে বাস করেন। তিনি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের খাতিরে কুমারহট্ট কাঞ্চনপুর শান্তিপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত হন।

এই সময় কুমারহট্টের শ্যামসুন্দর আচার্য্যের তরুণ ও মেধাবী পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র এসে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও সন্ন্যাস দীক্ষান্তে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শান্তিপুরের কমলাক্ষ পরে শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য ও কাটোয়ার শ্রীপাদ কেশব ভারতী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরী গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকেন। তারপর তিনি সর্বতীর্থ ভ্রমণে বের হন।

এক সময়ে গয়াধামে শ্রীগৌরাঙ্গ পিতার পিণ্ডদান করতে গেলে অকস্মাৎ ঈশ্বরপুরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তিনি সেই সময় গৌরাঙ্গদেবকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম উজ্জীবিত করেন।

আজকাল আর কেউ ঐ গ্রামকে কুমারহট্ট বলে না। সমগ্র পল্লীই হালিশহর নামে খ্যাত। সাধক কবি রামপ্রসাদ এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজ গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখে গেছেন।

ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্রমধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥

অধুনা শ্রীচৈতন্যের গুরুপাট শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ও তৎসংলগ্ন 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ। নিত্য ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল হয়ে দুইজন বৈষ্ণব সাধক অতিকষ্টে প্রায় অজ্ঞাত পীঠস্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য-সেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। বৈষ্ণব সাধকদের তীর্থস্থান এই শ্রীপাট ও শ্রীচৈতন্য ডোবার একান্ত সংস্কার প্রয়োজন।
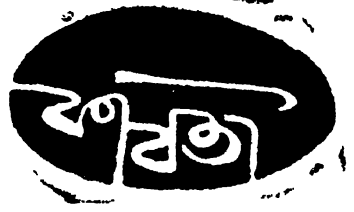
রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

"আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে"
হে কবি দেখিয়াছিলে এই পৃথিবীরে
প্রতি দিবসের তার সুখ দুঃখ মাখা
আনন্দের সোনা রূপা তবকেতে ঢাকা
রঙীন খেলনা-ভরা। তারে বুকে তুলি
সবিস্ময়ে আপনার দুঃখ সুখ ভুলি
হেরিলে, বলিলে গানে সুরে ও সঙ্গীতে,
"যদি ডাক পুনরায় ধরায় ফিরিতে।"
হায় মোরা ভ্রমমূঢ় অবসন্ন জীব
দুহাতে আবরি আঁখি পলাতক ক্লীব
মনেরে বলেছি ওরে ওরা মরীচিকা
যাদুকরী পৃথিবীর মায়া বিভীষিকা।
হেরিব না। ফিরিব না। শুনিব না গান।
আনন্দ নহেক ওরা আনন্দের ভান।

* * * *

যাদুকরী পৃথিবীর কবি যাদুকর
আনন্দের রসায়নে করি রূপান্তর
হেরিলে ভুবন বিশ্ব, গেয়ে গেলে গান
'ফিরে আসি যদি করো আবার আহ্বান'।

ঘরোয়া

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১

মেঝেতে মাদুরটাই আমাদের পার্ক
সন্ধ্যায় সেখানে এসো বসি।
কাজ ও কাজের কথা এ-সময় থাক
এখন ছুটির গড়িমসি।
হরগৌরীর পট ছেলে মেয়ে দেখে ;
আমাদেরে দেখুক, দেখুক।
জানালা খোলাই থাক, দূর থেকে চোখ
যত খুশি এখানে আসুক।

২

সময় চলে, বয়েস বাড়ে, চেহারা ভাঁজ পড়ে
একটি চেনা আদল তবু থাকে।
আমার চোখে সেই নিটোল আভাস ভেসে ওঠে
আমার প্রেম সেখানে চুমু রাখে।
রূপের রেখা বদল হয়, আদল তবু ধ্রুব
সেই আদল তোমার তুমিটাই।
দিনের আলো যদিও তাকে লুকিয়ে রাখে, তবু
তারার আলো সাজিয়ে ধরে তাই।

৩

তুমিও আমার যেন প্রিয় উপনিষদের বই,
মলিন মলাট জীর্ণ, তবু শান্তি সেখানে অথৈ।
দাগ দিয়ে পড়া বই, বার-বার বহুবার পড়া—
আমারই চিহ্নিত কথা তথাপি তোমাতে আনকোরা।
আমারই নিজের কথা তোমাতে প্রকীর্ণ দেখি সই—
তুমিও আমার যেন প্রিয় উপনিষদের বই।
পড়ি আর নাই পড়ি, তবু রাখি হাতের নাগালে,
বালিশের পাশে থেকে সান্ত্বনার গন্ধদীপ জ্বালে।

তবে বন্দর ছাড়াই ভালো

—মনোরমা সিংহরায়

তবে বন্দর ছাড়াই ভালো। ঘুরে ঘুরে ফিরে আসি
বার বার ঢেউয়ের দোলায় টলমল এই তরী
একেবারে ছেড়ে দেওয়া ভালো।
তোমরা কোরো না মানা তোমরা দিয়ো না ডাক
বন্ধন ছিঁড়েছি আমি ঢেউয়ের দোলায়
ঐ দ্যাখো তীর ছেড়ে এ তরণী দূরে ভেসে যায়।।

* * * * *

নীল জল থৈ থৈ একূল ওকূল দেখা যায় না তো আর
মাঝে মাঝে হাঙরের তিমিরের উল্লম্ফন তাতে কিসে ভয়!
বন্দর ছেড়েছি তবু ফিরবার নয়।
এসো তুমি অকূলের-হাওয়া এসো জল সাগরের
অঢেল অঢেল ঢেউ তোলা।
ডোবে যদি ডুবুক না, এ তরণী ভাঙুক না
দেখা যদি নাই যায় এপার ওপার
তবুও তো ছাড়লাম তীর ছেড়ে চললাম
ঢেউয়ের দোলায়
এ তরণী আরো দূরে যায় ভেসে যায়।।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতার ভবিষ্যৎ কি

কিছুদিন পূর্ব্বে ইউ-এন-আই কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ: গত কিছুকাল ধরিয়া বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে কলিকাতা নগরীর অবস্থা পরম সঙ্কটময় হইয়া উঠিয়াছে—এবং এই সঙ্কট প্রত্যহ বৃদ্ধিমুখেই চলিয়াছে। ফলে নগরবাসীদের জীবন হইয়াছে অসহনীয়। সমীক্ষায় আরো বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার প্রকল্পিত প্রায় সর্ব্বপ্রকার উন্নয়নকার্য্য অর্থাভাব এবং সেই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তাদের উদ্যোগহীনতা, অকর্ম্মণ্যতা এবং দূরদৃষ্টির অভাবের জন্যই ব্যাহত হইয়াছে। এ-বিষয়ে রাজ্যসরকারের দায়িত্ব—যে কারণেই হউক, যথাযথ যে পালিত হয় নাই তাহাও প্রকাশ।

কলিকাতার (বৃহত্তর কলিকাতা সমেত)—বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৭৫ লক্ষেরও বেশী এবং এই নগরীর পরিধি (বৃহত্তর বৃত্ত সমেত) প্রায় ৪৫০ বর্গমাইল। পৃথিবীতে লণ্ডন, টোকিও এবং নিউইয়র্ক, মাত্র এই তিনটি শহরের লোকসংখ্যা, কলিকাতা অপেক্ষা বেশী। হিসাব করিয়া দেখা যায়,. ১৯৮৮ সাল নাগাদ বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ অতিক্রম করিবে। ১৯৭৬ সালের মধ্যে আরো প্রায় ৩৬ লক্ষ লোকের জন্য নূতন বাস এবং কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্ত্তমানকালে কলিকাতার বিষম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান দুইটি কারণ (১) বহিরাগত কর্ম্ম সন্ধানকারীদের ক্রমবর্দ্ধমান অভিযান এবং (২) পূর্ব্ব-বঙ্গ আগত উদ্বাস্তু। এই ভীষণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কলিকাতার বাসগৃহ সমস্যা হইয়াছে অতি প্রকট। কলিকাকাতার এক 'অতি বৃহৎ সংখ্যক লোক যে-ভাবে থাকে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই নগরের বস্তিগুলিকে নরকসমান বলিলেও বোধহয় ঠিক বলা হয় না, বোধহয় তথাকথিত নরকের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল এবং সেই নরকবাসীরাও কলিকাতার মানুষ অপেক্ষা অধিকতর সুখ সুবিধা ভোগ করে। নরকে কলিকাতা করপোরেশনের মত কোনপ্রকার পৌরপ্রতিষ্ঠান নাই বলিয়াই বোধহয় ইহা সম্ভব!

হিসাবে দেখা গিয়াছে, কলিকাতার শতকরা ৪৫ জন অধিবাসী মাসিক ২৮৲ টাকার বেশী বাড়ী ভাড়া দিতে অক্ষম, শতকরা ৪০ জন ৭৮ টাকার বেশী দিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে একটি ছোট খুপরীর ভাড়াই ৩০।৩৫ টাকার কম নহে। পানীয় জলের কথা না বলাই ভাল। কলিকাতায় ৬০ শতাংশ লোক প্রত্যহ নির্দ্ধারিত ৫০ গ্যালনের স্থলে ১০ গ্যালনেরও কম জল পায়। নগরে জলসরবরাহ করিবার পূর্ণ দায়িত্ব কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কিন্তু এই পৌরপ্রতিষ্ঠানের মালিক—পৌরপিতারা তাঁহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতখানি বা কতটুকু সজাগসচেতন, তাহা গবেষণার বিষয়। হুগলী নদী কলিকাতার জলের একমাত্র উৎস। কিন্তু এই হুগলী নদীর জল যে-ভাবে লবণাক্ত হইতেছে এবং ক্রমশ এই নদীর জলে লবণের পরিমাণ যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যভাবেও জল

যে প্রকার নিয়ন্ত্রণা হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবিলম্বে ইহার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার ব্যবস্থা না হইলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অস্তিত্বও হয়ত লোপ পাইবে! বাস্তবে ইহা যদি ঘটে, তাহা হইলে পৌরপিতার দল কি করিবেন? ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, আফ্রিকার সমস্যা, মার্কিণ দেশে সাদা-কালোর লড়াই, ইংলণ্ডের শ্রমিক-মন্ত্রীমণ্ডলীর সমস্যা প্রভৃতি, কলিকাতার-পক্ষে-অতি-প্রয়োজনীয়-এবং নিকট-সম্বন্ধীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁহাদের অতি মূল্যবান মতামত বিশ্ববাসীকে শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করিবেন কি ভাবে?

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক বিপর্যয়—

কলিকাতার পথে-ঘাটে যে-পাহাড় প্রমাণ আবর্জ্জনার স্তূপ জমিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া নগরের সমাজ-জীবনেও দেখা যাইতেছে। আজ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শহরের অধিকাংশ পরিবার গড়-পড়তা ৬।৭ জন লোক লইয়া গঠিত এবং শতকরা অন্তত ৬০।৬৫টি পরিবার বাস করে এক বা দুই কামরার বাসা-বাড়ীতে। বহু পরিবার (৫।৬ জন) একটি মাত্র কামরাতেই সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হয়। রান্নাঘর বলিতে এক ফালি বারান্দা, স্নানের ঘর বারোয়ারী কলতলা। পানের জল রাস্তার কল হইতে লাইন দিয়া সংগ্রহ করিতে হয় এবং কলে যতক্ষণ জল থাকে, জলের-লড়াই এবং কর্ণ-ভেদী কোলাহল অবিরাম চলিতে থাকে। ঘরে স্থানা-ভাবের জন্য অধিকাংশ বাড়ীর লোককে, বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘরের বাহিরে ফুটপাত বা সরকারী রাস্তায় আবর্জ্জনার মধ্যেই কাটাইতে হয় বাধ্য হইয়া। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙ্গালী পরিবারে সামাজিক জীবন নাই বলিলেই চলে এবং এই সঙ্গে পারিবারিক জীবন এবং বন্ধনও লুপ্তপ্রায়। বয়স্ক ছেলেমেয়েরা কে কখন কোথায় কিভাবে কাটাইতেছে তাহা পিতামাতারাও বলিতে পারেন না। এইভাবে চলিতে থাকিলে ১৫।২০ বৎসর পরে কলিকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-জীবনে কি কি রূপ দেখা দিবে, তাহা সহজে অনুমেয়।

কলিকাতার ছেলেরা রাস্তায় ফুটবল, হকি, ক্রিকেট খেলে এবং ইহাতে পথিকসাধারণ এবং সেই সঙ্গে পাড়া-বাসীদেরও যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। অনেকে বিরক্ত বোধ করেন, অনেকে অল্পবিস্তর আপত্তিও করেন, কিন্তু সবই বৃথা। ছেলেদের দোষ দিবার কথা আমাদেরও মনে হয় কিন্তু তাহাদের দোষ দিব কোন মুখে? বিশেষ একটা বয়সে ছেলেরা খেলা করিবেই এবং তাহাদের এ-অধিকার চিরন্তন। রাস্তায় খেলা এবং ছেলেদের হৈ হল্লা বন্ধ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহাদের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা। এ-কর্ত্তব্য প্রধানত কলিকাতা পৌরসভার এবং তাহার পর রাজ্যসরকারের। কিন্তু বর্ত্তমান পৌরপিতাদের, পৌরপুত্রদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ইহাও অতি সত্য যে, কলিকাতা পৌরসভার নিকট হইতে করদাতারা—হিতকর কিছুই আর আশা করেন না। এই পৌরসভার একমাত্র কর্ত্তব্য তথা কর্ম্ম—নগরবাসীর সকলভাবে এবং সকলদিকে অসুবিধা, অকল্যাণ সৃজন এবং বৃদ্ধি করা। সামান্য কর্ত্তব্যবোধও যদি থাকিত, পৌরপিতারা একদা-প্রাসাদনগরী কলিকাতাকে এমন করিয়া আজ বিশ্বের বৃহত্তর এবং 'শ্রেষ্ঠ' জঞ্জাল-নগরীতে পরিণত করিতে পারিতেন না। কিন্তু কাজের কাজ কিছু না করিলেও প্রতি পাঁচ-ছয়বৎসর অন্তর কলিকাতায় বাড়ীঘরের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি তাঁহারা অতি নিখুঁত ভাবে করিয়া যাইতেছেন। বর্ত্তমানে কর্পোরেশন ট্যাক্সের মাত্রা এমনই হইয়াছে যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত অবস্থার এমন কি বহু ধনী ও বাড়ীর মালিক একে একে তাঁহাদের পৈতৃক ভিটা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন। গত ১০।১২ বছরে এইভাবে কলিকাতার শতকরা প্রায় ৪০।৫০ ভাগ বাড়ী হস্তান্তরিত হইয়া অবাঙ্গালীর—বিশেষ করিয়া মাড়ো-য়াড়ী এবং কালোয়ার-কবলিত হইয়াছে। যে-হারে বাড়ীর মালিকানা অবাঙ্গালী ধনীদের হাতে যাইতেছে তাহাতে ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, এমন দিন ২৫।৩০ বছরের মধ্যে শীঘ্রই আসিবে যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের করদাতা সংখ্যা হইবে শতকরা অন্তত ৬০।৭০ জন অবাঙ্গালী। ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ক্ষমতাও যাইবে

কলিকাতার অবাঙালী করদাতাদের হাতে! পৌরপিতা-দের মধ্যে অবাঙালীর হারও হইবে শতকরা অন্তত ৭০ জন। ভাবিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি, আর কাহারো জন্য নয়, কেবলমাত্র বর্ত্তমান পৌরপিতাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া! পৌরপ্রতিষ্ঠানে মোড়লী করা এবং পরের পয়সায় নবাবী-মেজাজ দেখানো ছাড়া যাঁহাদের আর অন্য কোন কাজ বা বৃত্তি নাই, সামান্য চাকুরী করিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধিও যে সব পৌরপিতাদের নাই, তাঁহাদের কি দশা হইবে! তাঁহারা কলিকাতার করদাতাদের সর্ব্বাত্মক কল্যাণ-প্রয়াস-প্রচেষ্টার অবকাশ হইতে কি বঞ্চিত হইবেন চির-কালের মত?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের কলিকাতা পৌরসভার প্রতি মায়ামমতার অতি আধিক্য দেখিয়া বঙ্গবাসী সাধারণজন বিস্মিত না হইয়া পারে না। পৌরকর্ত্তারা নিজেরা ত কোন কাজই করিবেন না অন্যকেও দিবেন না। তাহাদের আত-উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় সর্ব্বপ্রকার অ কর্পোরেশনীয় কার্য্য-কলাপ এবং পৌরসভার অনাবশ্যক (শহর এবং শহরবাসী-দের পক্ষে) বিষয় লইয়া বাজে তর্কের ঝড় তোলা এবং সভাকক্ষে, অবিশ্বাস্য (এবং অভদ্রজনেও যাহা করিতে লজ্জা বোধ করে) ইতরামোর প্রকাশ্য প্রদর্শন করিয়া গৌরব বোধ করা! করদাতাদের কষ্টের দেওয়া মূল্যবান অর্থের শ্রাদ্ধ করা পৌরপিতাদের দ্বিতীয় প্রধান কার্য্য।

রাজ্যপাল কলিকাতা শহরের রাজপথ হইতে জঞ্জাল সাফ করিতে বদ্ধপরিকর। এই সঙ্গে কর্পোরেশনের সর্ব্বা-পেক্ষা এবং সর্ব্বভাবে দুষ্ট ও মারাত্মক জঞ্জাল এই কাউন-সিলারদেরও যদি ময়লাবাহী লরিতে বোঝাই করিয়া ধাপার মাঠে বা অন্য কোন সুদূর এক নির্জ্জন প্রান্তরে, কাঁটাতার বেড়া দেওয়া বিশেষ সুরক্ষিত স্থানে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করেন, কলিকাতাবাসীরা কিছুকাল অন্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির পৌর-পিতারা যাহাতে আর কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, বিশেষ আইন করিয়া তাহাও করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে এবারের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল—

১৯৬৮ সালের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার পাশের হার অতি শোচনীয়। পরীক্ষা দেয় ৯৩,৩৮২ জন ছাত্রছাত্রী। পাশের সংখ্যা ২০,৮০০ জন অর্থাৎ শতকরা ২২.২৮ জন। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ৬০,৭৫৭, পাশ করিয়াছে ৫,৭৫৩ জন মাত্র অর্থাৎ শতকরা ৯·৪৬ জন। রেগুলার পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৩২,৬২৫, পাশের সংখ্যা ১৫,৩৪৭ অর্থাৎ শতকরা ৪৬.১ জন।

এবারের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফলের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে—প্রথম তিনজনের মধ্যে কলিকাতার কোন ছাত্রই নাই, আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রথম দশজনের মধ্যে একটিও ছাত্রীর নাম দেখা যাইতেছে না! প্রথম দশজনের মধ্যে কলিকাতার পরীক্ষার্থী মাত্র তিন—ইহাদের মধ্যে কেহই (কলিকাতার) কোন নাম করা বিদ্যালয়ের ছাত্র নহে। এবারের ফলাফলে দেখা যায়, প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে মাত্র ৩০৪, দ্বিতীয় বিভাগে ৫০১৪ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৪,৪৫৫ জন। ৬০,৭৫৭ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজারের কিছু বেশী কিন্তু ছ হাজারের কম পাশ করিয়াছে।

এবারের পরীক্ষায় অন্যায় উপায় অবলম্বনের জন্য ৪৩০৪ ছাত্র অভিযুক্ত হইয়াছে। এই সংখ্যাও আগের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। বিষদভাবে পরিসংখ্যক দিয়া লাভ নাই—যতটুকু দেওয়া হইল, তাহাতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, যে-ছাত্রদের প্রধানতম কর্ত্তব্য অধ্যয়ন কিন্তু দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলগুলির কার্য্যকলাপ এবং ছাত্রদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে টানিয়া আনার কি বিষময় ফল দেখা দিতেছে। শুনিয়া থাকি এবং আমাদের পণ্ডিত এবং দেশভক্ত নেতারাও অহরহ প্রচার করেন যে বর্ত্তমানের ছাত্রসমাজই দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসা। বিবিধ পরীক্ষার শোচনীয় ফল দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার পরিবর্ত্তে নিরাশারই সঞ্চার করিবে—একান্ত আশাবাদীর মনেও।

কলিকাতার স্কুলকলেজগুলিতে ১৯৬৭ সালে কয়দিন নিয়মিত ক্লাস বসিয়াছে বলা শক্ত। তবে আমরা যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয়, গড়ে তিন চারদিনের বেশী স্কুল বসে নাই। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে কোন স্কুল হয়ত বসিয়াছে, এমন সময় অন্য কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদল হৈ-চৈ করিয়া ইট-পাটকেল ছুড়িয়া সেই স্কুলের দিনের কাজ বন্ধ করিয়া দিল! ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারীদের হুকুমে স্কুল কলেজের ছাত্রদের প্রচণ্ড হিংসাত্মক বিক্ষোভেও—পুলিশের হস্তক্ষেপ করা চলিবে না! এই 'পূজারীর' দল যখন সরকার গঠন করেন, সেই সময় ত দেখা যায় হাঙ্গামা-কারীদের পূর্ণ (অ) রাজত্ব!! কোন আইনসঙ্গতভাবে গঠিত সরকার, বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্রে, জনতার অযথা বিক্ষোভে এবং বেআইনী রাষ্ট্র এবং সমাজবিরোধী ক্রিয়া-কর্ম্মে সহায়তা করে বলিয়া শুনা যায় না। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে ইউ-এফ সরকারের আমলে খোদ 'উফী' সরকারই রাজ্যব্যাপী হরতালের ডাক দিতেও লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করে নাই! সরকারই যেক্ষেত্রে মানুষের অসামাজিক কার্য্য এবং অযথা আন্দোলন, গণ-বিক্ষোভ প্রভৃতি দেশ-ক্ষতিকর কার্য্যের প্ররোচকরূপে রণক্ষেত্রে অবতরণ করে, সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের হৈ-হল্লাকে নিন্দা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

ছাত্রদের পড়াশুনার কার্য্যে সর্ব্ববিধ বাধার সৃষ্টি করিয়া আগামীকালের দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি কিংবা কোন প্রকার ইচ্ছাও বোধকরি তথা-কথিত বামপন্থীদল এবং দলনেতাদের নাই। কিন্তু এ-কথা সকলেরই মনে রাখা দরকার যে আজ যাহাদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করা হইতেছে পার্টি স্বার্থের কারণে, সেই তাহারাই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইবে, পালের গোদাদের পৃষ্ঠে যথা সময়ে পদাঘাত করিয়া!

গদিতে বসিলে—

ইউ-এফ সরকার কি করিবেন, সেই বিষয়ে মোটামুটি কিছু তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে, প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার 'উফী' কর্ত্তারা—যাহা করিবেন স্থির করেন, নূতন প্রস্তাবে তাহা বহুলাংশে 'নরম' করা হইয়াছে—বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয়। নূতন প্রস্তাব-গুলিতে ভালমন্দ দুই-ই আছে। প্রস্তাবগুলির বিশদ এবং বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান নিবন্ধে শ্রম এবং শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কে সংযুক্তদলীয় সরকার কি করিবেন, সেই বিষয়েই কিছু আলোচনা করিব।

'উফী' দল বলিতেছেন, (ক্ষমতা হাতে পাইলে) তাঁহারা শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষা করিতে সব কিছুই করিবেন এবং ইহার জন্য প্রয়োজনবোধে শ্রম আইন ও সংশোধন (এবং বিশেষ অবস্থায় নাকচ) করিতেও দ্বিধা করিবেন না। মালিক-পক্ষ যাহাতে কোন ভাবে এবং কোন অবস্থাতেই শ্রমিক-দের উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিতে না পারে সে বিষয়েও উফী সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখার সঙ্গে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবের ধরণ এবং ভাষা দেখিয়া সহজেই মনে হইবে যে, 'উফী' দলের কাছে কলকারখানা এবং ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষ দেশের পক্ষে অতি ক্ষতিকর একটা শ্রেণী মাত্র যাহাদের প্রধান কর্ত্তব্যই হইল শ্রমিক নির্য্যাতন!

এই মালিকপক্ষকে সায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা নিশ্চয় সংযুক্ত দলীয় সরকার করিবেন। কিন্তু মালিকপক্ষও ত ভারতীয় নাগরিক এবং তাঁহাদেরও সংবিধানসম্মত কিছু অধিকার অবশ্যই আছে; সেইসঙ্গে তাঁহাদের ন্যায্য স্বার্থ বলিয়াও কিছু নিশ্চয়ই থাকিতে পারে। সেই স্বার্থরক্ষার ভার কে লইবে বা কাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে? আমরা এমন কথা কখনই বলি না যে সকল মালিকই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী—যাহা মালিক নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া মিটাইতে পারেন, তাহা মিটাইতে হইবে এবং দেশের সরকারকে সেই দিকে দৃষ্টিও রাখিতে হইবে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের আইন অনুমোদিত পথে চলিতে হইবে।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এমনিতেই প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রমিকদের সবরকম অস্বাভাবিক, এমন কি অন্যায় দাবী-

দাওয়াও সমর্থন করিয়া অহরহ ধর্ম্মঘটের হুমকি দেন, ইহার উপর বামপন্থী সরকারের বেপরোয়া সমর্থন পাইলে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কি হাল হইবে সহজেই বুঝা যায়। ইউ এফ সরকারে শ্রমিকবিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে মালিকপক্ষকে রক্ষা করিবার কোন কথা নাই—মনে হয় মালিকপক্ষ অন্ধ হইলেই শ্রমিকমহল স্বর্গ হাতে পাইবে,—নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বর্গ হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বর্গপ্রাপ্তিও ঘটিবে এ কথাটাও বলা যায়। দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মঘটের হুমকি দিয়া মালিকপক্ষকে দাবী স্বীকার করানো সর্ব্বক্ষেত্রে কার্য্যকর হয় না। তেমন অবস্থায় মালিকপক্ষ কলকারখানা বন্ধ করিয়া অন্য রাজ্যে চলিয়া যাইবেন—ইহার সূচনাও দেখা দিয়াছে। কোন শিল্পসংস্থা জোর করিয়া চালু রাখিতে সরকারও পারিবেন না। সরকার নিজ দখলে কোন কোন শিল্প অবশ্যই লইতে পারেন, কিন্তু ব্যবসা, কলকারখানা চালাইতে যে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি এবং দক্ষতার প্রয়োজন সরকার কোন ক্ষেত্রেই তাহা এখনো দেখাইতে পারেন নাই। ইহার প্রমাণ—সরকার পরিচালিত এবং স্থাপিত পাবলিক সেক্টারের প্রায় সব কয়টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানই লোকসানের কারবার। অতি নিম্নস্তরের অযোগ্য লোকের হাতে কর্ম্ম-পরিচালনার দায়িত্ব থাকায় পরিণাম এই।

(ভগবান না করুন) পশ্চিমবঙ্গে আবার যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় (কোন সার্থক কর্ম্ম না করিয়াও) কর্ম্মবীর অস্থির-আদর্শবান শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্য-মন্ত্রিত্বে, এ-পোড়া দেশের যতটুকু এখনো অ-পোড়া আছে, তাহাও এবার অগ্নিগর্ভে যাইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবস্থা ১৯৬৭ সালে 'উফ্রীর' আমলে যাহা হয়, হয়ত এবার তাহার শতগুণ মন্দ হইবে। বাঙ্গলা দেশের লোক যদি সচেতন থাকে এবং ভাঁওতা-মুগ্ধ না হয় তাহা হইলে—'যুক্তফ্রন্টের কোন প্রার্থীকেই একটি ভোটও দিব না।' এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গকে যাহারা মহাশ্মশানে পরিণত করিতে চায়, সেই জনমারী দেশ-দ্রোহীদের ক্ষমতালোলুপ হিংসাত্মক আক্রমণ হইতে আমাদের বাঁচিবার অন্য কোন পথ নাই।

গদিতে বসিবার ক্ষীণ আশাতেই যাহারা দেশবাসী এবং দেশের উপর অকল্যাণকর সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য পাঁয়তাড়া করিতেছে—পূর্ব্বেই তাহাদের পৃষ্ঠে একমাত্র জনগণই গদাঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

———

সংহতির দিকে—

তথাকথিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিশবৎসর পরে আমাদের কর্ত্তাদের 'বিশেষ' নজর পড়িল দেশের সংহতির প্রতি—এবং এই দৃষ্টি পড়িবার বিশেষ কারণ গত কিছুকাল মধ্যে কয়েকটি 'সাম্প্রদায়িক' দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং যাহার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক নিরীহ লোকের প্রাণদান। 'সাম্প্রদায়িক' হাঙ্গামা না বলিয়া সোজা কথায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বলিলে কি দোষ হয় তাহা আমরা জানি না, খুব সম্ভবত সাধারণ মানুষের মনে যাহাতে কোন প্রকার 'সাম্প্রদায়িক' বিদ্বেষ উত্তেজনা আর বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্যই আমাদের কর্ত্তাদের এই বৃথা প্রয়াস! এ-দেশে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা সংবাদ-পত্রে এবং বেতারে প্রচারিত হওয়ামাত্র পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকই বুঝিতে পারে যে হাঙ্গামাটা ঘটিয়াছে—হিন্দু এবং মুসলমান এই দুইটি ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে। কারণ যাহাই হউক।

একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দায়ী করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানকে। কিন্তু কথাটা ঠিক কি না, কেহ তাহার বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন মনে করে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু কিছু ব্যক্তি অবশ্যই আছে যাহারা সামান্য একটা ব্যক্তিগতকলহকে—(একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমানের মধ্যে)—একটা অতি বিকৃত এবং বহুগুণ স্ফীত করিয়া নিজ নিজ মহলে ব্যাপক প্রচার দিয়া একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং দুঃখের বিষয়

বহু ক্ষেত্রেই তাহারা তাহাদের এই হীন অপপ্রয়াসে অতি সাফল্যও অর্জ্জন করে।

এমন ঘটনার কথাও জানি, একটি হিন্দু বালক এবং একটি মুসলমান বালকের খেলার সময় কলহ এবং মারামারিকে কেন্দ্র করিয়া—ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগিয়া গেল। এই সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে নিন্দা করিবার এবং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিবার কোন হেতু না থাকিলেও আমরা বহু সময় তাহাই করিয়া থাকি এবং সব দোষটা যে অন্য পক্ষের তাহাই প্রচার এবং প্রমাণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়া থাকি। এ-কথা অতি সত্য যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ও এ-বিষয়ে অতি তৎপর। এই ক্ষেত্রে "এক হাতে তালি বাজে না" একথাটা আমরা সকলেই ভুলিয়া যাই এবং হাঙ্গামার মূল কারণ এবং অপরাধী নির্দ্দেশের বেলায় অঙ্গুলী প্রসারিত করি 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'—মুসলমান সম্প্রদায়ের দিকে! জানি আমাদের এই কথা আমাদের অনেকের নিকট প্রীতিকর মনে হইবে না এবং অনেকে হয়ত আমাদের জাতি এবং ধর্মদ্রোহীও বলিবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা নিজেদের মনে আমাদের উক্তির সত্য মিথ্যা যাচাই করিলে অবশ্যই ঠিক জবাব পাইবেন। সকল বিষয় সকল সময় কেবল সেন্টিমেন্ট্ কিংবা ভাবাবেগ দিয়া যথাযথ বিচার তথা সত্য নিরূপণ করা যায় না, এমন কি ইহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনাই বেশী। যাক এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

শ্রীনগরের শীতল, সুরভি, পুষ্পিত পরিবেশে 'জাতীয় সংহতি সম্মেলনের' অধিবেশন কয়েকদিন পূর্ব্বে হইয়া গেল—সম্মেলনে মঞ্চের মধ্যখানে —"ত্রিমূর্ত্তি ; প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। চারিদিক ঘিরিয়া দর্শনীয় সাধুসমাবেশ। মেলাটিকে অবশ্য 'পূর্ণকুম্ভ' বলা যাইতেছে না। কারণ গুটিকয় রাজনৈতিক দল এবং এক-আধজন বিশিষ্ট যাজক আমন্ত্রণপত্রে সাড়া দেন নাই। কাশ্মীরের স্থানীয় পীরেরাও সকলে নাকি এই গাজনে সন্ন্যাসী সাজিতে গররাজী।" কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে খানাপিনার ঢালাও ব্যবস্থার কারণে, প্রীতি সম্মেলন জমিয়াছিল ভাল। নানা মতের, নানা দলের, বিবিধ বর্ণের এবং বর্ণচোরার, বহু সুধী-সজ্জন ভাবুক, পণ্ডিত এবং মূর্খের সমাবেশে সভা সরগরম হয়। শ্রীনগরের উর্ব্বর জমিতে সভা বসার ফলে সম্মেলনে (অসার) কথার ফলনও হইয়াছে সুপ্রচুর! এবারের পাঞ্জাব-হরিয়ানার গমের ফলনের প্রায় শতগুণ! সবই ভাল।

প্রধানমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া অন্যান্য প্রায় সকল বক্তাই একসুরে কথা বলিয়াছেন। সকলেরই একই বক্তব্য—একটা কিছু করা প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে একজাতি, একপ্রাণ, দেশের ঐক্য—গেল বলিয়া!! কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে একটি হোয়াইট-পেপার প্রচারিত হয়। সংহতি-সম্মেলনে বক্তৃতাগুলির বয়ানে মনে হইল ঐ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শ্বেতপত্রের কথাই প্রতিফলিত হইল!

১৯৬১ সালে জাতীয় সংহতি পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে জবাহরলাল যে মহৎ ঘোষণা দেশবাসীকে শ্রবণ করান, তাহাতে মোট কথা বা শব্দসম্ভার ছিল সাড়ে তিন হাজারের মত। নেহরুজীর ঘোষণা শুনিয়া তখন আমাদের যাহাকে মনে হইয়াছিল 'এটম বোমা,' আসলে দেখা গেল তাহা ছিল একটি বৃহদাকার পটকামাত্র! ইহার শব্দ শুনিয়া কিছু কাক, কিছু শালিক এবং কিছু চড়ুই পাখী উড়িয়া গিয়াছিল ঠিকই, কিন্তু যে সকল "বাঘ, সিংহ এবং অন্যান্য হিংস্র সাম্প্রদায়িক জন্তুদের" বিতাড়ন-মানসে ঐ বহুত-বহুত-কাজ-সংঘটিত বাক্য-এটম-বোমাটিকে ফাটানো হইল, দেখা গেল তাহারা যথাস্থানে পরম সুখে এবং নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতেছে। ঘোষণার একটিও প্রস্তাব তথা সংকল্পের আজ পর্য্যন্ত কাজে রূপদান হয় নাই।

সেইসময় রচিত হইয়াছিল রাজনৈতিক দলগুলির জন্য আচরণ বিধি, সরকারের আচরণ-আচার সম্পর্কেও বিধি রচনার একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু ঐ চেষ্টা বা ইচ্ছাতেই সকল সাধুসংকল্পের পরিসমাপ্তি।

চীনা আক্রমণের সময় দেশ যে ঐক্য দেখায়, তাহার পর নূতন করিয়া কেন আবার সংহতি-চিন্তা বা সংহতির চেষ্টা?—এই অজুহাত বা কৈফিয়ৎ দিয়া সংহতি পরিষদ অবসর গ্রহণ করিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার কণ্ঠে এখন শুনা গেল যে, "আমরা আত্মতুষ্টি দেখাইয়া ভুল করিয়াছিলাম! আমরা বাস্তবে না থাকিয়া ছিলাম মায়ালোকে!"

ভুল স্বীকার করা মহতের লক্ষণ—কিন্তু বর্ত্তমানেও প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, এখনো কি তাঁহারা প্রকৃত বাস্তব উপলব্ধি করিয়াছেন, না, এক মায়ালোক হইতে অন্য মায়ালোকে গিয়াছেন? চীন এবং পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতে যে-ঐক্য, যে-সংহতি দেখা যায়, তাহা কি ঝুটা, মায়ারখেলা? আর সত্য হইল তাহাই যাহার কুৎসিৎ রূপ সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক এবং মানুষে মানুষে বিদ্বেষ প্রভৃতি সাময়িক 'রোগ' হিসাবে এখানে ওখানে প্রকট হয়? মানুষের দেহে যেমন নানা রোগ নানা ভাবে, নানা সময়ে প্রকাশ পায়, এবং যাহার চিকিৎসা মানুষেই করিয়া দেহকে সুস্থ সবল করে। রোগ-ব্যাধি সাময়িক, স্বাস্থ্যই সত্য। একটা দেশ এবং জাতি সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে সাধারণভাবে। সাময়িক রোগ-ব্যাধিকেই সত্য বলিয়া কখনও কোন জাতি চিরন্তন সত্য বলিয়া মনে করে না।

কথায় বলে—'বনের বাঘ খায় না, খায় মনের বাঘ।' ক্রমাগত সংহতির গুণকীর্ত্তন করিয়া আমরা আমাদের মনের বাঘকেই সযত্নে লালন করিতেছি। সত্য কথা—আসল ব্যাধি আমাদের সরকার এবং দলীয়-স্বার্থ-সর্ব্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির মনে এবং ইহাই প্রকৃত 'বাঘ' হইয়া আত্মপ্রকাশ করে মধ্যে মধ্যে।

তাবার আঞ্চলিকতার দাঙ্গা প্রভৃতিতে কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির অবদান কি কম? শ্রীজয়প্রকাশ সত্যই বলিয়াছেন—'যে-সব ভেদবুদ্ধি আজ দেশের সংহতিকে বিপন্ন করিয়াছে, তাহার অনেকখানিই কেন্দ্র এবং রাজ্য-সরকারগুলির কৃতিত্বে।'

পরম ঘটার সহিত সভা ডাকিয়া 'সংহতি, সংহতি' বলিয়া শোক প্রকাশ করিয়া, মায়াকান্না কাঁদিয়া সংহতি উদ্ধার বা রক্ষা করা যাইবে না—। দেশের এবং জাতির মূল ব্যাধি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বৈষম্য এবং সমাজজীবনের বিবিধ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস। যে-দেশ বিপদকালে এক হইতে পারে, বিপদ যখন নাই, সেই সময়েও কেন তাহা পারিবে না? গোটা পাঁচেক কমিটি, গোটা ছয়েক সাব্-কমিটি, কর্ত্তাদের অসার কথাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য কয়েকটা উপ-সমিতি, আর কাজকর্ম্মের তদ্বির করিবার জন্য একটি হাই-পাওয়ার কমিটি, এইভাবে কেবলমাত্র কমিটি বাহিনী গঠন করিয়া গেলে শেষপর্য্যন্ত দেখা যাইবে ফললাভ হইয়াছে হাজার হাজার ফাইল, যাহা খুলিয়া দেখিবার প্রয়োজনও হয়ত কেহ কোন দিন 'কানশ' ভাবে অনুভব করিবেন না। বলা বাহুল্য—এইভাবে গরীব দেশের দরিদ্র করদাতাদের টাকার অপচয়ের আর একটা নূতন নালারও সৃষ্টি হইবে।

সংহতি সাধনে সরকারী দায়িত্ব—

কেবলমাত্র সংহতি সংহতি বলিয়া চিৎকার করিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা অর্জ্জন করা যাইবে কি না, কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলিকে সবিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সরকারী কর্ত্তারা যদি সততার সহিত 'আত্মজিজ্ঞাসার' সহিত তাঁহাদের রীতি এবং নীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন—সরকারী বিকৃত চিন্তা এবং অদূরদর্শীতাই দেশে অসংহতির একটা প্রধানতম কারণ তথা উৎস। সাধারণ মানুষকে ঐক্য স্থাপনের উপদেশ দিবার পূর্ব্বে, কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলি নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি স্থাপন করিলে ভাল হয় না কি? হাজার হাজার বৃথা উপদেশ অপেক্ষা একটা উজ্জ্বল বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখানোতে অধিকতর ফললাভ হইবে। দেশের মানুষকে কলহবিবাদ বর্জ্জন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার বাণীবর্ষণ উপর মহল হইতে অহরহ হইতেছে—অথচ নীচু মহলের মানুষ বাস্তবে চোখের সামনে কি দেখিতেছে? এক রাজ্যসরকার অন্য রাজ্যের সহিত সীমানা, নদীর জল প্রভৃতি লইয়া অহরহ

কলহমগ্ন। ইহা দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, স্বাধীন ভারতের এক একটি রাজ্য যেন 'অধিকতর স্বাধীন' এবং সমগ্র ভারতের স্বার্থ রাজ্য-স্বার্থের নিম্নে! সর্ব্বপ্রথম চাই রাজ্যের সকল স্বার্থ রক্ষা করা, তাহাতে যদি অন্য রাজ্যের তথা ভারতের কল্যাণ-স্বার্থ ব্যাহত হয়, ক্ষতি নাই! রাজ্যগুলির (কয়েকটি) ক্রমাগত গোপন প্রচেষ্টা করিতেছে—কি ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের অংশবিশেষ বেদখল করিয়া নিজ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা যায়। বিগত রাজ্যসীমানা নির্দ্ধারণের সময় ওড়িষ্যা বঞ্চিত হইল ওড়িয়াভাষী খরসোয়ান এবং সেরাইকেলা হইতে, খণ্ডিত খর্ব্বাকৃতি পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করা হইল—মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি বাঙ্গালী-প্রধান এবং বাঙ্গলাভাষী অঞ্চলগুলি হইতে। এ-ক্ষেত্রে বিহারকে 'অতুষ্ট' করিয়া ওড়িষ্যা এবং বাঙ্গলার প্রতি ন্যায় বিচার করিবার মত মনোবল ইস্পাত-কঠোর কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের ছিল না। ইংরেজী বিতাড়নে যাহাদের এত বিষম উৎসাহ, সেই হিন্দীভাষী কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু ইংরেজ-আমলের ইংরেজ প্রশাসকদের, অবিচারগুলিকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই চিরস্থায়ী করিতে অধিকতর উৎসাহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ: মহীশূর-বোম্বাই কেরল, আসাম কর্ত্তৃক পার্ব্বত্য উপজাতিদের স্বয়ংশাসিত ন্যায্য অঞ্চল দাবী অস্বীকার, পশ্চিমবাঙ্গলা এবং ওড়িষ্যা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বিহারের অহিন্দীভাষী অঞ্চলগুলি ফেরত পাইবার দাবী অস্বীকার ইত্যাদি। দেশের সংহতির নামে কেন্দ্র কর্ত্তৃক সর্ব্বভারতে গায়ের জোরে হিন্দী চাপান অহিন্দীভাষীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও—যাহার ফলে দক্ষিণ ভারতে ভীষণ জনবিক্ষোভ দেখা দেয়—এবং অচিরে পূর্ব্বভারতেও ইহা ঘটিবে। কেন্দ্র সরকার এখন সিক্ত মেকুরের রূপ ধরিয়া, সংহতি-সংহারে অবদান যোগাইয়া আজ সংহতির জন্য মড়াকান্না কাঁদিতেছেন। এমন আরো বহু অনাবশ্যক ক্রিয়াকর্ম কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলি প্রায়ই করেন, যাহার ফলে দেশে বহুবিধ দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা জনগণের মধ্যে ঘটিতে থাকে।

কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলি অবিলম্বে নিজেদের আচরণে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা এবং বৈষম্যমূলক নীতি ত্যাগ করুন, তাহার পর জনগণকে উপদেশ দিলে হয়ত কিছু কাজ, কিছু ফললাভ হইতে পারে।

এবার নাকি সরকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং সেই সঙ্গে দেশের ঐক্যবিনাশী সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প। সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন করিতে হইলে, কেবলমাত্র নিরক্ষর অজ্ঞান এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মানুষকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলেই আসল কাজ কিছুই হইবে না। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে প্ররোচক, যাহারা অন্ধকারে থাকিয়া তাহাদের কাজ করে, সেই উপর-তলার শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সর্ব্বাগ্রে ধরা দরকার এবং এই কার্য্যে, পদমর্য্যাদা, রাজনৈতিক দল বিবেচনা করিয়া সরকারী, বেসরকারী কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া চলিবে না। রুই কাতলাগুলি সর্ব্বাগ্রে মারা প্রয়োজন।

ফ্যারাডে

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

চুম্বকের শক্তিদ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন ক'রে মাইকেল ফ্যারাডে বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন যুগ আনয়ন করেছেন। এই পদ্ধতিতেই বর্তমানে যত বিদ্যুতের কার্যকলাপ হয়ে থাকে এবং তার জন্যে জগত ফ্যারাডের কাছে কৃতজ্ঞ।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের এক শহরতলিতে মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দরিদ্র পিতা কামারের কাজ করতেন। সুতরাং মাইকেল ছেলেবেলায় ভাল ক'রে লেখাপড়ার সুযোগ পায় নাই। দারিদ্র্যের জন্যে তেরো বছর বয়সেই তাঁকে স্কুল ছেড়ে অর্থ রোজগার করতে বেরোতে হয়। একটা খবরের কাগজ বিক্রী করার কাজে লাগেন। ঐ কাগজ-মালিকের পুস্তকপ্রকাশের ব্যবসাও ছিল। বালকের কাগজবিক্রীর পটুতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে এক বছর পরে তিনি তাঁর পুস্তক-বাঁধানোর অর্থাৎ দপ্তরীর কাজে ফ্যারাডেকে লাগিয়ে দেন এবং নিজের বাড়ীতে রেখে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন। এই ব্যবস্থা বালকের জীবনে এক নতুন অধ্যায় আনয়ন করলো। ব্যাপারটা হলো এই যে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং কাজ শেষ করবার পর বালক পরম উৎসাহে নানা বই পড়বার সুযোগ পেলো। পুস্তক-প্রকাশের বিস্তর পুস্তক থাকাতে তার জ্ঞানপিপাসু চিত্ত বিবিধ পুস্তকের মধ্যে ডুবে গেল। আর তার দয়ালু মনিব তার এই পড়ার ঝোঁক দেখে পরম প্রীত হয়ে তাকে এ বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য করে যেতে লাগলেন।

এই সময়ের কথা ফ্যারাডে পরবর্তিকালে লিখেছিলেন—দুটো বই আমাকে খুবই সাহায্য করেছিল, একটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা যা থেকে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার সর্ব্বপ্রথম হয়, আর দ্বিতীয় বইখানি হলো, মিসেস্ জেন্ মার্গেটের কনভার্সেসন্ অন্ কেমিস্ট্রি, যে বই আমার মনে বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন ক'রে দেয়।

সত্যিই কিশোর বয়সের এই অনুপ্রেরণার পর ফ্যারাডে রসায়ণ ও বিজলীর গবেষণায় সারা জীবনটা ডুবিয়ে দেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা বক্তৃতা শুনবার সুযোগ হয় তাঁর। এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভী। এই বক্তৃতা শুনবার সময় এবং শুনবার পর তার সারমর্ম ফ্যারাডে একটা খাতায় লিখে রাখেন। বই বাঁধাই-কাজে দক্ষ বালক সেই খাতাটা সুন্দর বাঁধাই ক'রে রাখেন।

এইভাবে বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে তার যখন বই বাঁধানোর মতো তুচ্ছ কাজ আর ভাল লাগছে না, মন যখন ছুটেছে বিজ্ঞানজগতের রহস্যসন্ধানে তখন এক চিঠি লিখে বসলেন রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর সেই স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভীর কাছেই। চিঠিতে লিখলেন, বই বাঁধানোর মতো তুচ্ছ কাজ তাঁর মনকে আর বেঁধে রাখতে পারছে না—তিনি চান স্যার ডেভীর ল্যাবরেটরির কোনো একটা কাজ। এবং সেই চিঠির সঙ্গেই পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সেই সুন্দর বাঁধানো খাতাখানি যাতে স্যার ডেভীরই বক্তৃতার সারমর্ম লিখেছিলেন।

এই খাতাখানি ও এই চিঠি তাঁর জীবনের আর এক অধ্যায় উন্মুক্ত করে দিল। স্যার ডেভী খাতাখানিতে নিজের বক্তৃতার আশ্চর্য্য অনুলেখন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং ফ্যারাডেকে ডেকে পাঠালেন। ফ্যারাডে গিয়ে স্যার ডেভীকে আরও মুগ্ধ করে দিলেন। যুবক বলতে লাগলেন যে তিনি স্যার ডেভীর বক্তৃতার সুত্রধ'রে

এবং নির্দ্দেশে নিজে নিজেই কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেই পরীক্ষাদির ফলাফল নিজের খাতায় লিখে রেখেছেন, সেই সব দেখাতে লাগলেন। স্যার ডেভী একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন এবং তাঁর রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের একজন সহকারী কর্মীরূপে যুবককে নিযুক্ত করেন। স্যার ডেভী নিজের জীবনে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে গেছেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি বলেছিলেন—আমি জীবনে যতকিছু আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এই ফ্যারাডেকে বেছে পাওয়া, যাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হলো বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য বহু তথ্য। শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উক্তি অভিনব ও উচ্চাঙ্গের বলতে হবে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্যার ডেভীর কাছে কাজ করতে লাগেন ফ্যারাডে। আর সাত মাস পরেই অর্থাৎ অক্টোবর মাসেই স্যার ডেভীর বিবাহ হয় এবং তারপরই তিনি তাঁর নবপরিণীতা পত্নীকে নিয়ে মধু-চন্দ্রমায় যে যাত্রা করেন সেই সময় ফ্যারাডেকেও সঙ্গে নিয়ে যান যাতে করে স্যার ডেভী তখনো বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। বিজ্ঞানীর মধুচন্দ্রমাও বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া হতে পারে না। ফ্যারাডেকে তিনি তাঁর সেক্রেটারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় যত বড় বড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সময় ফ্যারাডে তাঁর পাশে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাস্থানে বক্তৃতায় ও প্রদর্শনীতে আছেন ফ্যারাডে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। এইভাবে স্যার ডেভীর দৌলতে কামারের পুত্র ফ্যারাডে এক বছরের মধ্যেই হয়ে উঠলেন একজন উচ্চস্তরের বিজ্ঞানসাধক।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্যার ডেভী মধু-চন্দ্রমা নামে তাঁর এই বিজ্ঞান-সফর শেষ করে লণ্ডনে ফিরে যান। তখন ফ্যারাডে আবার রয়্যাল ইনষ্টি-টিউশনে তাঁর পূর্ব্বের কাজেই লাগলেন। এই কাজে থেকেই বরাবর তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা চলতে থাকে। এই রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর স্যার ডেভী অবসর গ্রহণ করবার পর ফ্যারাডেই ডিরেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ ক'রে তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলোকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলতে থাকেন। তিনি বিশেষভাবে কাজ করতে থাকেন সাধারণ রসায়ণ, বিদ্যুৎসংক্রান্ত রসায়ণ এবং ধাতুবিদ্যা নিয়ে। আর স্যার ডেভীর আবিষ্কৃত বিখ্যাত এবং তাঁরই নামাঙ্কিত 'ডেভী ল্যাম্প'কে আরও উন্নতির অবস্থায় নিয়ে যান ফ্যারাডে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের সমবেত চেষ্টায় অনেক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

বিদ্যুৎ-রসায়ণ সম্বন্ধে ফ্যারাডের মনোনিবেশের ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিশেষ বিশেষ তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে-গেলে সেই তরল পদার্থের বিশ্লেষণ ঘটে। এই বিশ্লেষণের নাম দিলেন ইলেকট্রোলিসিস। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর পরীক্ষাদির দ্বারা দেখা গেল যে জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে গেলে জল বিশ্লেষিত হয়ে হাই-ড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। আর তরল কষ্টিক পটাশের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ গেলে পোটাশিয়াম পাওয়া যায়।

ফ্যারাডে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বিদ্যুৎ নির্দিষ্ট মাত্রার তরল পদার্থকে বিশ্লেষণ করে। এই নির্দ্ধারণের ফলেই বিদ্যুৎ-মিটার আবিষ্কৃত হয়। বিশ্লেষিত তরল পদার্থের মাপ দেখেই বোঝা যায় কত বিদ্যুৎ খরচ হয়। এই মিটার দ্বারা জানতে পারা যায় যে ঘরে ঘরে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে এবং সেই অনুসারে ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রাপ্য টাকার বিল তৈরী করে।

এরপর ফ্যারাডে আবিষ্কার করলেন ইলেকট্রিক মোটর। এ হচ্ছে চুম্বক থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতেই আজকাল চলে ইলেকট্রিক ট্রাম, ট্রেন আর যত কলকারখানার যন্ত্রপাতি। এই-ভাবে ফ্যারাডে জগত-বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। তিনি রয়্যাল সোসাইটির একজন সভ্য হলেন যা চূড়ান্ত সম্মানজনক।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তিনি অমরলোকে চ'লে যান।

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

কিন্তু তারো চেয়ে বিপদ তখনও বাকি ছিল প্রভার কপালে। কবিতায় রূপক হিসাবে বরকে রাজার কুমার বলায় চিন্তিত হলেন অনুপমার শ্বশুর। বারে বারে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন একথা কেন লেখা হয়েছে? এখনকার অভিজ্ঞতা থাকলে প্রভা বুঝতো ওঁকেই স্তুতিচ্ছলে রাজা বলা হয়েছে এইটেই কবুল করিয়ে নিতে চান প্রসন্নবাবু। হবি কি? তার পরেই অনুর ভাসুরঝির বিয়ে। কেন জানিনা, অনুর শ্বশুর বললেন, প্রভা যেন বেয়ানের নাম করে একটি কবিতা লিখে দেয়। এবার আর রাজা উজীরের দিক মাড়ালো না প্রভা—সন্তর্পণে একটু প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করে বিয়ের কবিতা সেরে দিলো। না বলার মত মনের শক্তি নেই—। আপ্রাণ চেষ্টা করেও যাদের বিন্দুমাত্র মনোরঞ্জনে সমর্থ হন নি প্রভা, এত সহজে তাঁকে খুশী করার আশায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি কবিতাটি লিখে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু অনু এসে বললো, তুমি কি মা আর কথা খুঁজে পেলেনা, হঠাৎ লিখে বসলে বলাকা। বলাকা কথাটায় যে দোষ হবে তা প্রভা বুঝতে পারেনি। ঠোঁট ফুলিয়ে অনু বললো, আমার শ্বশুরঠাকুর বল্লেন, বলাকা কথাটার মানে কী? আমি বাবা উত্তর দিইনি বাড়ীশুদ্ধ লোক হিমসিম, শেষে আমি থাকতে না পেরে বললুম বলাকা মানে বক্ সেকথা কেউ বিশ্বাসই করলোনা। আমার ভাগ্নে চ্যাপ্টোল বললো, বা: বা, দাদুকে বক দেখিয়েছে তোমার মা? তোমার মার সাহস ত কম নয়? এমনি ধারা নিত্যি নতুন সমস্যা।

প্রথম হল খবরের কাগজ নিয়ে বাড়ীতে ঢেউ উঠলো। কনে বৌ নাকি খবরের কাগজ পড়ছিল স্বচক্ষে দেখেছে নখার মা। ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল সবাই একী দুর্লক্ষণ বলো দেখি? এই যে গদীর তলায় ঠাসা নোট আর জলের পাইপের মধ্যে সোনার বার সবই হয়ত উবে যাবে। কে না জানে বলো, লক্ষ্মী সরস্বতী একসঙ্গে থাকতে পারেনা কখনো। একী বখাত সলিল? বাড়ীশুদ্ধ লোক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। একেবারে সবাই একবাক্যে রায় দিলো যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে বৌয়ের মা। মেয়ে মানুষ পদ্য লেখে এমন সর্ব্বনেশে কথা কেউ শুনেছে নাকি কক্ষনো? অমন মায়ের পেটে এমন ছাড়া আর কী জন্মাবে বলো? দেখিসনা মস্ত মস্ত খামে চিঠি আসে বৌয়ের নামে। সব নাকি বৌয়ের মা লেখে, সেদিন কর্ত্তা বলছিলেন একী চিঠি বাবা? এ যেন রবি ঠাকুরের মত যাচ্ছেতাই চিঠি। আর ঐ চিঠি এলেই নতুনবৌ আর কাজে হাত দেবেনা, কখনো কাঁদছে, কখনো হাসছে ঠিক যেন পাগলের মত। বিপদতারিণী ফোড়ন কাটলো হবে না? ওদের ঘরে যে ঐ রবি ঠাকুরের ছবি টাঙানো আছে। পাশে আমাদের এই খিজি বৌ আর খিজির মা। ওরা কাগজের মর্ম কী বুঝবে? জানে খবরের কাগজের এঁটো? জানেনা—ওসব বিলিতি জিনিষ বৈঠকখানাতেই মানায় ভালো। সেখানে মদ আনাও, বাঈজী আনাও সবই চলে যাবে। তাবলে খবরের কাগজ শোবার ঘরে আসবে? আসবে সতী লক্ষ্মী বৌদের হাতে? তাহলে আর জাত-ধর্ম্ম রইল কোথায়? বৌয়ের মা বলে, বৌ নাকি কোনদিন ইস্কুলে পড়েনি। পড়েনি যদি তবে এত কিরিস্তানি

শিখলো কোথায়? সব মিথ্যে কথা ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছে এ নির্ঘাত কিরিশ্চানি বিবি ইস্কুলে পড়ামেয়ে। বিপদ আরো ঘনালো—ফুলঝুরি নামে একটি ছোটদের বই আসতো অনুর নামে—সেই অনুরাণী শ্বশুর বাড়ীতে, সদাশিববাবু অতশত না ভেবেই বইটি রিডায়রেকট করে দিয়েছেন মেয়ের নামে। পড়বি কি পড় বইটি একেবারে অনুর ভাসুরের হাতেই পড়লো। নাম পটল হলে কি হবে, পটল বানান করতে তিনি হিমসিম খান। তোমরা বলবে পটল বানান আবার শক্ত কী? না আছে হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈকারের হাঙ্গাম, না আছে তিন রকমের স ষ শ, না আছে অন্তস্থ য বর্গীয় জয়ের বিড়ম্বনা কিন্তু পটলবাবুর পক্ষে ঐ পটল বানান করাই পটল তোলার মত সাংঘাতিক ব্যাপার। সেই পটলবাবু ক্ষেপে গেলেন একেবারে।

একী নাহক মানুষকে বিব্রত করা, বিব্রত করা নয়, অপমান করা। আজকে বাড়ীর বৌ-এর নামে বই আসবে। কালকে পার্টির কার্ড আসবে। পরশু নথি-পত্তর আসবে। তারপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আসতেই বা কতক্ষণ। ঝামেলা বলে ঝামেলা। যত সহ্য কচ্ছি ততই বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। প্রথম তো আরম্ভ হল নিত্যি বাপের আনাগোনা। তিনি নাকি মেয়েকে না দেখে থাকতে পারেন না। এমন কথা বাপের জন্মে কেউ কক্ষনো শুনেছে? আমাদের ক্যান্ত তো মুখের ওপরই বলে দিলো—মেয়ে হল গলার কাঁটা গলা থেকে নামিয়ে দিলে ব্যস, তা মা আবার রোজ মান খুইয়ে কুটুম-বাড়ীতে খেতে আসে কেউ—? ওমা বৌয়ের মায়ের আবার কথার বাহার কতো? বলে কিনা "ছিঃ দিদি ওরা আমার গলার কাঁটা হতে যাবে কেন? ওরা আমার ঘরের আলো—আমার ঘর অন্ধকার করে তোমাদের ঘরে এসেছে আলো করতে"। কথা শেষ হতে দেয়নি ক্ষেন্তি, নিজের পিসীর দিকে চেয়ে বলেছে, শোন তোমরা একটু শোন, ওরা মেয়েদের গলার কাঁটা বলেনা। যাই হোক, সে পড়ার ব্যাপার অত সহজে চুকলো না ঘটনাটা গড়ালো অনেকদূর—।

বই পড়ার ভারি সখ ছিল অনুর। সে বই পড়ার মধ্যে জাতবিচার ছিল না। গল্পের বই হোক, জীবনী হোক, প্রবন্ধ হোক, ধর্মগ্রন্থ হোক সবেই তার সমান আগ্রহ ছিল। প্রথমে নতুনবই হাতে পেলে তাকে চট করে পড়তো না অনু, পড়তে পারতো না। প্রথমে অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে তার স্পর্শসুখ অনুভব করতো তার পরে দুচোখ মেলে তাকিয়ে তার মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ পেতো। মনে হত আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ এসে গেছে তার হাতে। এখন প্রতি পাতায় আনবে কত না নতুন রাজ্য, কতনা না-দেখা জিনিষ। তারপর বারে বারে আঘ্রাণ করতো তাকে, তখনো বইএর পাতা খোলা হয়নি। তারপর সারাবিশ্ব ভুলে তন্ময় হয়ে পড়া। তখন মেয়েদের শিক্ষার এত প্রচলন হয়নি। তবুও অনুমণির জন্যে সদাশিববাবু যেখানে যা ভালো বই পেতেন আনিয়ে দিতেন। তাঁর এই বই-পাগল মেয়ের জন্য। তখন সংসারে আর্থিক অনটন প্রচুর। ছেঁড়া গরদের শাড়ীর পাড় দিয়ে চুল বেঁধে দিন কাটিয়েছে নিরুপমা অনুপমা, তাদের তাতে কোন বিকার ছিলো না। বিলাস তাদের ধাতে ছিলো না। ছোট-বয়েসেই প্রভা মেয়েদের বলেছিল, তোমাদের বাবার-শরীর খারাপ, রোগা মানুষের খেটে আনা টাকা, তাতে আমরা খাচ্ছি—না খেলে উপায় নেই, কিন্তু ও পয়সায় বিলাসিতা করতে নেই। মেয়েরা বাপকে সত্যিসত্যিই ভালোবাসত, শুধু বাপকেই নয়, ভালোবাসা জিনিষটা তাদের রক্তে মজ্জায় গাঁথা ছিল—তাই কারুর ভালো-বাসাতেই তাদের ফাঁকি ছিল না—সেই ভালোবাসার মাশুল তারা দিয়েছে আজীবন। তবে সবচেয়ে বেশী যেন দিতে হল অনুপমাকে। এমন মাশুল আর কেউ দেয়নি পৃথিবীতে

অধ্যাপকের বাড়ী। বাড়ীতে মাসিক পত্রিকা আসতো প্রচুর, আর আসতো নানা ধর্মপুস্তক প্রভার জন্ত। শিশু বয়েসেই শিশির ঘোষের অমিয় নিমাই চরিত থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীদত্ত মশায়ের জ্ঞান-যোগ কর্মযোগ ভক্তিযোগ সব পড়ে শেষ করেছে অনু।

হয়ত সব বোঝেনি তবে কণ্ঠস্থ থাকার পরে মনেমনে বারবার আবৃত্তি করে আস্বাদন ক'রে তৃপ্তি পেয়েছে। এই পড়া নিয়ে গোল বাধলো শ্বশুরবাড়ীতে। যে কোন একটি বই হাতে পেলেই স্বর্গ হাতে পেতো অনু। হয়ত ভাগ্নেদের কোন একটি পড়ার বই, তাও অনুর কাছে খেলনা নয়। বাইরের জগৎ ও সাহিত্য-জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত অনু বইটি পরম আগ্রহে জড়িয়ে ধরতো, কিন্তু ছি ছিক্কারে বাড়ী ভরে গেল।

ওমা বাড়ীর বউ আবার বই পড়বে কী গো? এবার দেখবো সাইকেলে চেপে বউ থানায় যাবে। পাশের বাড়ীর সোহাগী বললো, এই যে আমাদের বাড়ীতে কাগজ আসে কেউ দেখেছে কখন আমাদের ছুঁতে। নেহাৎ উনুন ধরাতে বা আগুন না থাকলে ছেলের দুধটা-আসটা গরম করতে না কাগজ ছুঁই। আমরা মেয়েমানুষ আমাদের আবার কাগজের সঙ্গে সম্পর্কটা কি বলো? বিধবা মাসশাশুড়ী বললেন, বললে তো বিশ্বাস করবে না, আমি সেদিন স্বচক্ষে দেখেছি ভাঁড়ার তুলতে বসে ডালের ঠোঙাটা নিয়ে পড়ছে সেজবৌ। সামনে কুলো ঢালা সব ছড়ানো তন্ময় হয়ে পড়ছে। এই যে প্রবাসী আসে মাসে মাসে আমার বাড়ীতে, কখন খুলে দেখেছি একটা পাতা? কই, কেউ বলুক দেখি? গুছিয়ে গাছিয়ে তুলে রাখি, ছমাসের হলে সোনার জলে নাম লিখিয়ে তুলে রাখি বাঁধিয়ে। এক-খানি ছেঁড়েনি একখানি হারায়নি। পাছে কেউ চেয়ে পড়ে বলে কাঁচের আলমারীর সামনে ছাপা কাপড়ের পর্দা টাঙিয়ে রেখেছি কেউ যে চেয়েচিন্তে পড়বে তারও উপায় নেই। গোড়ায় গোড়ায় বৌ যখন ঠোঙাগুলো তুলে রাখতো, গোছানি বৌ ভেবে বড় আনন্দ হয়েছিল, বলে যাকে রাখো সেই রাখে। কাজে অকাজে ঠোঙাগুলো লাগবেই। ওমা তা নয় দেখি সেগুলো বসে বসে পড়ে।

মুখের কথা কেড়ে নেয় সখীর মা, বল্লে বিশ্বাস করবে না মাসীমা পরশুদিন মা বললে গদায়ের বিছানাটা রোদে দিস, ওমা বিছানাটা তুলতে গিয়ে দেখি তার তলায় কতযে কাগজ তার ঠিকঠিকানা নেই। ঠোঙাতো আছেই, আবার মশলা বাঁধা কাগজ অবধি রেখে দিয়েছে। আমিত মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে সব ঝেঁটিয়ে ফেলে দিচ্ছিলুম, ওমা সেজোবৌদির সে কি হাঁউ মাঁউ করে কান্না। আঁচল দিয়ে মুছে মুছে সব ধুলো থেকে তুলে রাখলো। বললে না পেত্যয় যাবে বাবুর তামাক বেঁধে আনা কাগজটুকুও কুড়িয়ে রেখেছে। রাস্তায় যারা কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় না? তারা বোধহয় সেজবৌদিরই বাপের বাড়ীর লোক। জানো মাসীমা, আবার নেকেও লুকিয়ে লুকিয়ে। পরশু ছাদে বসে আছে, আমি ভাবলুম বুঝি চুল শুকুতে গেছে। ওমা তা নয় বসে বসে নিকছে—দেখেত আমি তাজ্জব, লজ্জায় মরি। বললুম, অ সেজোবৌদি বসি করছো কি? পিসীমা শুনলে অনর্থ করবে: মেয়েমানুষ লেখাপড়া করলে বিধবা হয়, এতো শাস্ত্রেই লেখা আছে। এ কি বালিগঞ্জের বিবি-গো এরা শাস্ত্র মানে না?

এরো আগে ফুলশয্যার রাতে গদাই বৌএর হাতে একটি মীনা করা আংটি পরিয়ে দিয়েছিল জি লেখা। অনু সকালবেলা আংটিটা খুলে ফেরৎ দিয়ে বলেছিল এ আংটি আমি পরতে পারব না ভারি লজ্জা করে আমার, কেউ যদি জিগেস করে কে দিয়েছে তায় তোমার নাম লেখা, তার চেয়ে তুমি আমায় রবি ঠাকুরের চয়নিকা একখানা এনে দিও। চমৎকার কী সুন্দর কবিতা আছে তোমায় পড়ে শোনাবো। "আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর"—থাক্ বলে স্ত্রীর কাব্য-সাধনায় বাধা দেয় গদাই। মনে মনে স্বর্ণালঙ্কারে স্ত্রীর অনুরাগহীনতায় কষ্ট পায়। আরো বিরক্ত হয়, তার নাম লেখা আংটি পরায় অনুর অনিচ্ছা দেখে। কেন মেজদার বৌ তো মেজদার মানিক নামের আদ্যাক্ষর দুকানে বড় বড় এম ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে। গলায় হারেও এম লেখা। মাথার দুপাশে দুটো পাশ চিরুণীতে 'পতি পরম গুরু' লেখা। খোঁপার ফুলগুলোতেও তো মানিক চাঁদ পাঁচটা ফুলে পাঁচটা অক্ষর লেখা। যদিও চুলবাঁধতে বসে মাসশাশুড়ী অক্ষর-পরিচয়হীন বলে অনেকসময়

নিটা আগে কাঁটা তারপরে হয়ে খোঁপায় একটা ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে। করুকগে তা বলে স্বামীর নাম পরবে না একী একটা কথা হল? প্রথম দিনেই মনটা খিঁচড়ে গেল গদায়ের। মুখে বলে সারাদিনতো পড়ার ঠ্যালায় অন্ধকার, আবার বাড়ীতেও যদি ঐ ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হয় তাহলে ত অস্থির। মাসী ঠিকই বলে শেষে কি গৃহত্যাগী হবে? অনুর আনন্দ-দীপ্ত মুখ শুকিয়ে যায়। গদাই বলে, এই জন্তেই ত মা বলে বৌ ত নয় যেন মাষ্টারণী।

অনুরই অদৃষ্ট খারাপ। তারই কপালে একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির, বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেউ নেই। গিন্নি পিয়নকে বলেন, অসময়ে এলে বাছা, কে যে সই করবে কে যে পড়বে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ভরা পোয়াতি মেয়ে বিদেশে আমার, কী খবর এলো কে জানে? শাশুড়ীর চোখের জলে বিচলিত হয়ে এসে অনু খামটা খোলে—পড়ে বলে, "কাঁদবেন না মা, ঠাকুরঝি ভালোই আছে শুধু ছেলেটি মারা গেছে"। বাড়ীময় কথার ঝড় বয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, রহস্যভেদের নিপুণতায় অনু ত কোন প্রশংসা পায়ই না। বোয়ের বাচালতা ও ধৃষ্টতায় সবাই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কালোমাসী বলে, তোমরা বিশ্বাস করবে না, যখনি বৌমা গিয়ে টেলিগেরাপের কাগজ ছিঁড়ে পড়েছে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। [illegible]য়ার হোক লক্ষণ-অলক্ষণ মানতে হবে তো? না-[illegible]য় আঁটকুড়ীর মেয়ের কোলে আজো কেউ আসেনি [illegible]া বলে হিংসের ননদের এত বড় সব্বোনাশ করতে [illegible]বে। আহা জলজ্যান্ত ছেলেটাকে ধড়ফড়িয়ে মেরে [illegible]ফেললো গো? তুই বৌ মানুষ বৌএর মত থাক, তা [illegible] সবেতে আগবাড়িয়ে যাওয়া। বৌ ত নয় এক ধেই-[illegible]চুনী। জামাইবাবু তাইত বারেবারে বলেছিল [illegible]দিগঞ্জের খিষ্টান বিবি ঘরে এনে কাজ নেই, [illegible]আমরা ত শুনলে না মেয়ে বিনুনির বিষয় [illegible]খেই মজলে। বিপদতারিণী এবার আরো মুখর হয়ে [illegible]ঠে, বলে, ওর আর কি বলো নিজের বিদ্যের বড়াই হল পিয়নের কাছে—অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখছে একেবারে।

সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক কথা বলে গদাই, বলে ছিঃ ছিঃ এততেও শিক্ষা হয় না তোমার? যেই যেই করে পিয়নের কাছে এগিয়ে যাবার কি দরকার ছিল তোমার? ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক সর্ব্বনাশ তো হল বোনটার। কতবার তোমায় বলেছি মেয়েছেলের লেখাপড়া সয় না। এরপর মা তোমায় কি করে সইবে বলোদেখি? অনুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ে।

ক্ষ্যান্তমণির ঐ কুটুমবাড়ীতে খেতে আসা কথা বলার পর থেকে প্রভা সদাশিববাবুর এবাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। যদিও তাতেও কম কথা শুনতে হয়নি অনুকে। তবুও সেই গুণে গুণে কৌচড় থেকে পয়সা গুণে দোয়া আর শিশু দেবতাদের মারামারির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন ভদ্রলোক।—শুধু অনুর স্পষ্টবাদী ঠাকুরঝি একদিন বললো, ভদ্রলোক ভালোমন্দ খাবার আশায় রোজ আসেন কুটুমবাড়ীতে এনিয়ে আবার এত কথা কেন? জানি তো সেজবৌদির বাপেরবাড়ীর খাওয়া। আমরা সেবার কালীবাড়ী ফেরৎ গেলুম না, দেখি সত্যি সত্যি সেজোবৌদির মা শুকনো পাঁউরুটীর পাশ-গুলো চা দিয়ে খাচ্ছে। ঘটনাটা সত্য—অবশ্য মিথ্যে হলেও প্রতিবাদ করার সাহস নেই অনুর।

এরপর চললো সদাশিববাবুর জামা-কাপড়ের সমালোচনা। বেচারা অনু বাধ্য হয়ে মাকে লিখলো, মা আমি জানি তোমার কত টানাটানি তবু লিখছি-বাবাকে একজোড়া জুতো কিনে দিতে পার কি? এই একটি লাইনই যথেষ্ট—বুদ্ধিমতী প্রভার কিছুই বুঝতে বাকি রইল না।

আস্তে আস্তে সদাশিববাবু মেয়ের বাড়ী খাওয়া কমিয়ে দিলেন। যদিও কাজটা তার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। শুধু এই চোখে দেখার আশায় বিদেশের কত ভালোভালো পাত্র হাতছাড়া করেছেন তিনি। সেই মেয়েকে না দেখে থাকা, কিন্তু উপায় কি? শেষে অগতির গতি ফোন। ফোনেও নানা বিপত্তি। প্রথমতঃ ফোন থাকে সদরে, সেখানে বাড়ীর বৌ [illegible]

শেষে প্রসন্নবাবু বললেন, আচ্ছা সন্ধ্যের পর ফোন করতে বোলো কিন্তু বেচারা অনুপমা জানতো না সন্ধ্যে-বেলা সেখানে দাবার আসর বসে। কাজেই ফোন বাজলেই তুলে আঃ জালাতন বলে ফোন রেখে দিতো সবাই। নিরুপায় হয়ে ফোন করাও বন্ধ হল। সব-চেয়ে কষ্ট হত প্রভার, জামাইকে সে একদিনও মনের মত করে যত্ন করতে পারলো না। নেমন্তন্ন করে করে হায়রান হয়ে গেছে প্রভা। মেয়েরও আসার কোন ঠিক নেই, যেদিন বালিগঞ্জের দিকে গাড়ী যাবে সেদিন অনুপমা আসতে পারবে বাপের বাড়ী। কাজেই গেরস্থঘরে মনোমত আয়োজন করা সম্ভব হয় না। একে পাঁচ-জনের বাড়ী তায় জামায়ের বিশের লজ্জা শ্বশুরবাড়ীর নামে। ওইটেই হল গাঙ্গুলিবাড়ীর কেতা। শ্বশুরবাড়ীর নামে মারমুখো হয়ে উঠতে হবে। এমন কি জামায়ের বাড়ী গিয়েও জামাইকে দেখতে পেতোনা প্রভা—হয় শুনতো জামাই বেরিয়ে গেছে, নয় শুনতো নেড়া ছাদে উঠে দাদার জামায়ের সঙ্গে ঘুড়ি উড়ুচ্ছে। একবার দুঃখু করে অনু বলেওছিল আমার মার তো ছেলে নেই, তুমি মাকে মা বলে ডাকনা কেন? গদাই মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল রক্ষে কর, বডি সেমিজ পরা চায়ের বাটি মুখে করে বসা মা ভাবলেই মা বলার প্রবৃত্তি উড়ে যায়। বেচারী অনু আর কোন কথা বলতে পারে নি। একথা মাকে বলবেই বা কি করে? বছরে একবার মানে দুর্গাপূজোর পর বিজয়ায় মাকে প্রণাম করতে আসতো অনুপমা। সে আসার কোন বাঁধাধরা দিন ছিল না। হঠাৎ হরিপদ ড্রাইভার বলতো সেজ-বৌমাকে বলো সখীর মা, আজ বালিগঞ্জের দিকে গাড়ী যাবে, পনের মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নিতে।

অনুর বুকের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে যায়, তবু শান্তভাবে বাদাম এক একটি করে পাথরের থালায় ঘষে চন্দনের মত কাইটুকু পাথরবাটিতে তুলতে থাকে। শত ঝি থাকলেও একাজ ছেড়ে যাবার উপায় নেই। শ্বশুর সকালে ষোলটি বাদাম খান। একমুখ দাঁত থাকলেও চিবিয়ে খাবার উপায় নেই। তাহলে অত টাকা থাকার উপকারিতা কি? কাজেই ঐ বাদাম পাথরে ঘষে ঘষে চন্দনের মত করে দিতে হবে। হয়ত স্বাদ বদলে যাবে, হয়ত বাদাম চিবিয়ে খাবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন, তবুও বৌদের সহবৎ শেখাতে'হবে ত? নইলে হাঘরের মেয়েরা শায়েস্তা হবে কি করে?

অরুচি হলে জিভ বের করে বসে থাকবেন প্রসন্ন-বাবু, বৌদের আদারকুচি নুন দিয়ে জিভে বুলুতে হবে। আপেল খাওয়ার পদ্ধতি আরো বিচিত্র। আপেলকে কুরুনী দিয়ে কুরে নেকড়ায় ছেঁকে রস বার করে দিতে হবে। সেইটুকু চুমুক দিয়ে খাবেন প্রসন্নবাবু। রাত্রে এক একদিন খই খান প্রসন্নবাবু। সে এক মহামারি ব্যাপার। যে বৌ খৈ বাছবে, আইন হচ্ছে তাকে সেদিন প্রসন্নবাবুর খাওয়ার সামনে বসে থাকতে' হবে। যদি একটি ধান বোয়ায় খই থেকে, তাহলে আর রক্ষে নেই। হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। প্রকাণ্ড একটি সারগর্ভ ভাষণ দেবেন প্রসন্নবাবু যে এমন খৈ কি না বাছলেই নয়? বলা বাহুল্য তার আগে সেই ধানটি পুত্রবধূর নাসিকা লক্ষ্য করে ছুঁড়বেন। এই যে লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, এই যে অপগেরাস্থি করা এটা যে বালিগঞ্জ থেকে আমদানি তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এরপর ব্যাখ্যা করবেন ভবতারিণী, অমন শিক্ষা নাহলে অমন কপাল হয়? একটা ছেলে এলোনা পেটে? মেয়ে-বিয়োনীর আর একদফা শ্রাদ্ধ হয় কিন্ত ব্যাখ্যা হলেই তো আর শেষ নেই। বাকি ছিল টিপ্পনী অর্থাৎ টিকা—টিকা প্রসঙ্গে বিপদতারিণী অনেক বিপদ-জনক কথার অবতারণা করে অনুর চোখে জলের ধারা বইয়ে দিলো। বিপদতারিণী আবার সেই কোরাস গেয়ে উপসংহারে বললেন, বাপতো গুনধরীকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বেঁচেছে, আমাদের যে এ সাপে ছুঁচো গেলা। আমরা যে কী করি একে নিয়ে?

অনুর মেজ জা অবিশ্যি বলে, দাঁত জিনিষটি যে খাওয়ার জন্য প্রসন্নবাবু ব্যবহার করেন না তাঁর কারণ নাকি দাঁত খিঁচোন। দাঁতই যদি না থাকে খিঁচোবেন কি? দন্তহীন মেড়ে খিঁচুলে সবাই অত ভয় পাবে কি?

প্রসন্নবাবু যখন পুজোয় বসেন তখন শিশুর দলকে

ছাতে পুরে রাখা হয়। কারণ একবার একটি শিশুর ক্রন্দনে বেয়াক্কেলে বধূর প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি নাকি শালগ্রামকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই ব্যবস্থা। কোনরকম আওয়াজ পেলেই তিনি জোরে জোরে কোশাকুশি আছড়ান। অর্থ এই যে সাবধান হও, আবার যদি আওয়াজ হয় আবার শালগ্রামকেই আছাড় দেবেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা তটস্থ হয়ে থাকেন। জানিনা সিংহাসনে নারায়ণেরই বা কী অবস্থা—পূজার নামে এই নির্য্যাতন তাঁকে নাড়া দেয় কী না কে জানে?

দেখো কী কথা থেকে কী কথায় চলে এসেছি। অনুর বাপের বাড়ী যাবার আদেশ জানিয়ে ড্রাইভার তো বলে গেল আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হতে হবে। সখীর মা তো বলে খালাস, নতুন কোরা তাঁতের শাড়ী পরে ড্রাইভারের নির্দ্দেশমত গাড়ীতে উঠে বসে অনু। অবিশ্যি তার আগে শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি নেয়ার ব্যাপার আছে, সে সব ঘটনাও শ্রুতিসুখকর নয়। ড্রাইভারের পাশে বাইরে গদাই—পথে মার্কেটের সামনে গাড়ী রেখে গদাই প্রসন্নবাবুর জন্যে মাল কিনতে যায় আবার দে কোম্পানী থেকে মেজদার ওষুধ, গাড়ীর ভেতর বসে গলদঘর্ম হয় অনু—কিন্তু তার না আছে নামবার উপায়, না আছে ঘোমটা খুলে বসার শান্তি। সেই বন্ধ গাড়ীতে দম বন্ধ হয়ে বসে থাকতে হবেই। পরবর্ত্তী কালে যখন শিশুদের আবির্ভাব হয়েছে তখনও এ আইনের রদবদল হয়নি। শিশু কেঁদেকেটে বমি করে অনর্থ করেছে কিন্তু পথে পাঁচ জায়গায় অন্ততঃ আধঘণ্টা করে না বসে বাপের বাড়ী যেতে পায়নি অনু। বৌদের বাপের বাড়ী যাবার জন্য বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় করতে নারাজ তারা। না সময়, না পেট্রোল। আটটার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেলা ১টার সময় মার কাছে পৌঁছয় অনু। অনুদের বাড়ীর মোড়ের কাছেই গদাই নেমে যায়। ড্রাইভার করজোড়ে নিবেদন করে, সন্ধ্যেবেলা সেজোবাবু এসে নিয়ে যাবেন সেজোবৌমাকে।

ছোট্ট সংসার। প্রভার তোলা উনুনে রান্না শেষ করে বসেছিল। সদাশিববাবু খেয়েদেয়ে কলেজ গেছেন। তাঁরি পাতে একমুঠো খেয়ে তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দিয়ে অনুর কাছে এসে বসেন। বলেন কখনো কী খবর দিয়ে আসবি না? বছরে একটা দিন আসবি, কি খেতে দিই বলতো? অনু বলে, দাওনা যা হয় ভাতে-ভাত চড়িয়ে। কতদিন তোমায় দেখিনি, একটু বোসোনা মা আমার কাছে? দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে অনু। কেন জানিনা মার মনে হয় অনুর বুকে যেন কিসের শূন্যতা! এতো স্বামী-সোহাগিনী আনন্দময়ীর আগমন নয়! নিরুও তো আসে, কত আনন্দের খবরে মাকে ভরিয়ে দিয়ে সে চলে যায়, সেই আনন্দ মাকে সন্তানের বিরহ ভুলিয়ে দেয়। এ কী—তবে কী অনু সুখী হয়নি? এমন অমূল্যনিধি পূর্ণ মর্য্যাদা পায়নি স্বামীর কাছে? মায়ের মনে নানা প্রশ্নের আনাগোনা।

কিন্তু বসার অবসর কোথায়, তারি মধ্যে পোস্ত বেঁটে বড় করে, ভাতের ভেতর পুঁটুলি করে বাঁধা মুসুর ডাল পেঁয়াজ দিয়ে সাঁতলে বিকেলের ভাজা মাছ দুখানা অম্বল করে মেয়েকে ভাত ধরে দেন প্রভা। আগে জানলে কত কীই করে দেয়া যেত। প্রভা আক্ষেপ করেন, বার বার অনু বলে, খাওয়ার কথা তুমি ভুলে যাও মা। এখন কি আর আগের মত ছোট আছি, বার মাসে তের পার্ব্বণ। আমাদের বাড়ী রোজ উপোস উপোস, আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। এমনিতেই ত জল খেতে আমাদের এগারটা বারটা হয়ে যায়। নটায় বাবা পুজোয় বসবেন তারপর মা পুজো কর্ব্বেন তারপর আমরা পুজো কর্ব্ব। তারপর বাবুদের আফিসের তাড়া, সব সেরে-সুরে বারটার আগে জল খাওয়া আর হয়ে ওঠে কই?

প্রভার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে—এই মেয়ে যে ভোরে উঠে খেতে দিতে দেরী হলে কেঁদে অনর্থ কর্ত্ত। শীতকালে খাটের কাছে ওভারকোট চটি রেখে বাথরুমে গরম জল দিয়ে যার ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন সেই মেয়ে। সংসারে তার দারিদ্র্য ছিল সত্যি কিন্তু অনাদর ছিল না। দুটি মেয়ে দুচোখের তারা ছিল প্রভার। প্রভার ঠাকুমা বলতেন, প্রভার মন আর প্রাণ। আজ

একমাসও হয়নি অন্থর জ্বর শুনে সদাশিব বাবুকে দেখতে পাঠিয়েছিলেন প্রভা। সদাশিববাবু ফিরতেই ছুটে যান মেয়ের খবর আনতে—সদাশিব বাবু বলেন জ্বরটা ছাড়েনি আজো, তবে কমেছে। মায়ের মন হাজার হোক, প্রভা বলে তুমি যখন গেলে অনু কি করছিল? সদাশিব বাবু একটু ম্লান হেসে বললেন, জিগেস না করলেই ভালো করতে। প্রভা ব্যস্ত হয়ে বলেন কেনগো? ভিজে কাপড়ে ঠাকুরদালান মুছছিল বলেন সদাশিববাবু। প্রভা বলেন এই জ্বর গায়ে বর্ষার মধ্যে সে ঠাকুরদালান মুছছে ভিজে কাপড়ে? তুমি বলো কিগো? সদাশিববাবু বলেন তাইতো দেখে এলুম।

হ্যাঁ যেকথা বলছিলুম, অনুর কাছে প্রভা ভাতের থালা এগিয়ে দেয়। অনু মার ম্লান মুখ দেখে বলে, তুমি যা রাঁধবে তাই অমৃত, কতদিন এমন মাছের অম্বল আর পেঁয়াজ দেয়া ডাল খাইনি। তবে আগে জানলে বাবা কখনো কলেজ যেত না, কী মজা হত না মা? কিন্তু মার অবসর কোথা মেয়ের সঙ্গে গল্প বসার। পাশের বাড়ীর চাকরকে ডেকে একটাকা ঘুস দিয়ে মা তাকে জগুবাবুর বাজারে পাঠান।

অঘটনঘটনপটিয়সী প্রভা সারা দুপুর খেটে মাংস থেকে চিংড়ী মাছের কাটলেট, ফুলকপি দিয়ে মাছের কালিয়া মাছের চপ থরে বিথরে জামায়ের জন্য রান্না করলো। আজ বছর ঘুরতে চললো একদিন জামাই এসে খায়নি আজ সেই জামাই নিজে আসবে বলেছে। প্রভার আনন্দ আর ধরে না, চপ কাটলেট ডেভিল ফ্রাই কিছুই আর বাদ রইল না কিন্তু সব আনন্দ নিরানন্দ করে বিকেল পাঁচটায় গাড়ী এসে হাজির। ড্রাইভার বল্লেন সেজোবাবু আজ আসতে পারবেন না। চোরবাগানের মাসীমা এসেছেন, গিন্নিমা এক্ষুণি বৌমাকে পাঠাতে বললেন। তখনও সদাশিববাবু আসেন নি, মেয়ের চোখে জল এসে পড়ে। প্রভাও ভাবেন এত পরিশ্রম সব বরবাদ হল, একদিনও গদাইকে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারলেন না। বড় মন-প্রধান মানুষ প্রভা, ভাবেন এসব ছাইভস্ম কেইবা খাবে, বরং ঐ ড্রাইভারকে দিই। কুটুমবাড়ীর লোক। জামাইকে খাওয়াতে না পারার দুঃখে অনুকেও খাওয়াতে ভুলে যান প্রভা। থালায় করে পোলাও চপ সাজিয়ে হরিপদকে বলেন, তুমিই খেয়ে যাও বাবা। গদায়ের জন্যে রাঁধলুম সারাদিন ধরে। কিন্তু গাঙ্গুলিবাড়ীর ড্রাইভারকে খাওয়ানো অত সহজ নয়। এতো আর নিরুপমার শ্বশুরবাড়ীর লোক নয় যে যত বাহারে উর্দ্দী পোষাক পরাই হোক আর যত নাম লেখা তকমাই থাক্, যা দেবে হাসি মুখে খেয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে যাবে। এ বাবা মদনমোহন তলার গাঙ্গুলিবাড়ীর ড্রাইভার—সেই বাড়ীতে ট্রেনিং পাওয়া। হয়ত পেটে তার ছুঁচোয় ডন মারছে কিন্তু সে কিছুতেই খেতে চাইবে না। এইটেই হচ্ছে ও বাড়ীর বিশেষত্ব অথচ যদি না খাইয়ে ড্রাইভারকে ফেরৎ দাও নিজের কান পাতা যাবে না।

ওপর থেকে প্রভা বারে বারে ড্রাইভারকে ডেকে ডেকে হায়রান হয়ে নিচে এসে দরজায় দাঁড়ালো। তবুও ড্রাইভার অনড় অচল। গাড়ীতে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে বলছে, দোহাই মা খেতে পার্ব্বো না আমি। আজকের মত ক্ষমা করুন মা। সন্তানকে হত্যা কর্ব্বেন না মা, কিন্তু প্রভা নিরুপায়। সেই মানুষকে গাড়ী থেকে নামিয়ে তাকে খাওয়াতেই হবে। জামাই নয় যে হাত ধরে নামাবেন, ছোট বাচ্চা নয় যে ধরে আনবেন। সে এক বিসদৃশ ঘটনা। শুধু এইবার নয় প্রত্যেকবারই হরিপদকে খাওয়াতে গেলে এই একই দৃশ্যের অবতারণা। সদাশিব বাবু থাকলে এর মাঝে বলে ফেলতেন, আহা ও খাবেনা বলছে ওকে টানাটানি কচ্ছ কেন? কিন্তু অনুপমা ফিসফিস করে বলতো, না বাবা বারণ কোরনা ওতে নিন্দে হবে। ঠিক এমনি বিপদ অনুর শ্বশুর বাড়ীতে গেলেও ঘটে।

দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকবেন প্রসন্নবাবু খড়-খড়ির পাখী তুলে তাতে চোখ দিয়ে। এদেখে যদি বেয়াই মশাই বুড়ো মানুষ মনে করে যদি সটান মেয়ের ঘরে চলে যান প্রভা তাহলে আর রক্ষে নেই নিন্দের অন্ত থাকবে না। তারো আগে আরো দুটি

ঘাঁটি আছে বাড়ীতে প্রসন্নবাবুর দিদি আর ভবতারিণীর বোন দুজনে থাকেন। যদি কেউ মনে করে প্রসন্নবাবু আশ্রিতবৎসল তাহলে ভুল কর্বেন। এঁরা আছেন অত্যন্ত অনাদরে অযত্নে মাঝে মাঝে পিসীমা পালিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছেন। তখন মাণিক গদাই পাঁজাকোলা করে এনে তাকে সেই পায়খানার পাশের ঘরে পুরে রেখেছে। বলেছে মাথার দোষ হয়েছে। ঘরটিতে মেজে সেই দেয়ালে কৃমি থুকথুক কর্চ্ছে। কু-লোকে বলে পিসীমার নাকি অনেক টাকাকড়ি আছে। প্রসন্নবাবু বলেন, দিদি আমার মাথার মাণিক আমি বেঁচে থাকতে দিদি আশ্রয়হীন হবেন। মোটামাসীর ব্যাপার আলাদা—মোটা মাসীও মোটা টাকার মালিক কিন্তু সেজন্য এঁকে রাখা হয়নি এঁকে রাখা হয়েছে যেসব কথা বলে নিজেদের মহিমা-কীর্ত্তন করতে চক্ষুলজ্জায় বাধে সেগুলি ইনি করে দেন। তাছাড়া বৌদের বাপের বাড়ী শ্রাদ্ধ পিণ্ডির বিষয় ইনি খুব সিদ্ধহস্ত। যাক প্রভা আর সদাশিববাবু এগুতেই মোটামাসীর সামনে পড়ে গেলেন। জামায়ের পিসীমা আর মাসীমা দুজনেই সমান খাতিরের লোক কিন্তু যাকে আগে প্রণাম কর্ব্বে অপর জনের মুখ হাঁড়ি। প্রভার মনে হয় তাঁর যদি সেকালের তাড়কা-রাক্ষসীর মত দুটো লম্বা লম্বা কাগজের হাত থাকতো একটা দোতলায় একটা তেতলায় দিয়ে একত্র অসুর মাসশাশুড়ী আর পিসশাশুড়ীর পদরজ গ্রহণ কর্ত্তেন। কিন্তু তাতো নেই কাজেই বিপদ। যেইনা সিঁড়ির মুখে মোটামাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তিনি একটু উচ্চ কণ্ঠেই বললেন, ওমা কি ভাগ্যি বেয়ান যে, থাক থাক আর পায়ে হাত দিতে হবেনা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি শোনা যাবে হরি নারায়ণ—তার অর্থ হচ্ছে ভক্তি-মূলক ডাক নয়। নিহিত অর্থ হচ্ছে, এত বড় আস্পর্দ্ধা সোনা বাইরে আঁচলে গেরো? আমি হলুম খোদ কর্ত্তার বোন, আমার বাদ দিয়ে আগে কিনা গিন্নির বোনকে পেন্নাম করা? এরপর প্রসন্নহাস্যে মুখ প্রসন্নতর করে বেরিয়ে আসবেন প্রসন্নবাবু। বলবেন, কে এলোগো বৌমা? ও বেয়াই বেয়ান যান যান আপনারা মেয়ের ঘরে যাচ্ছিলেন, শুধু শুধু আমার ঘরে বসে কেন সময় নষ্ট কর্ব্বেন—খামাখা সময় নষ্ট। অপ্রস্তুত হয়ে প্রভা বলবেন, না, না আমরা ভাবলুম আপনাদের বিশ্রামের সময় নষ্ট কর্ব্ব—হয়ত ঘুমুচ্ছেন তাই ভরসা করে ডাকিনি। কিন্তু ওসব কথা কানে তোলার পাত্র প্রসন্নবাবু নন। তিনি বলবেন, দেখুন আমি হচ্ছি ব্যবসাদার মানুষ, ওসব ছেঁদো কথা জানতে আমার বাকি নেই ওসব আমি খুব বুঝি।

এই অদ্ভুত বোঝার ভঙ্গি ওঁদের অসাধারণ। একদিন গদাই কথাপ্রসঙ্গে সদাশিববাবুকে বললো, "হ্যাঁ হ্যাঁ বিপদের দিনে মজা দেখতে সব ব্যাটা আসবে, কই আনন্দের দিনে আসুক তো? তবে বুঝি কেমন"। কথাটা শুনে অবাক নয় হতবাক হন প্রভা, তাঁরা ত বরাবর এর উল্টোটাই শুনে এসেছেন। সম্পদের দিনে মানুষের বাড়ী যাও বা না যাও, বিপদে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। বিপদের দিনে মানুষ কি মজা দেখতে যায়? একি কথা বলে গদাই? কথাটা এতো বেদনাদায়ক যে কথাটা ভুলতে পারেন না প্রভা। ভাবেন এই কথা শুনলে, নাজানি কতনা আঘাত পাবে—মেয়েটা। শিক্ষায় মানুষ শুধু মার্জ্জিতই হবে না, হবে উদার—সেই উদারতাই যদি স্বামীর মধ্যে না থাকে, দম বন্ধ হয়ে যাবে যে মেয়ের জীবন। মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সদাশিববাবুও যেন ভয় পেয়ে যান। বলেন কি জানি কি করলুম অমন মেয়েটাকে কোথায় দিলুম। জানো মোটে বুঝতে পারিনি আমি। তাছাড়া ভাবলুম হোক মুখুয্যের বাড়ী ছেলেটাত শিক্ষিত। এমন হবে কে জানতো বল? দুজনে ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে নতমুখে বসে থাকেন। সত্যি সত্যিই এঁদের বুঝতে পারেন না প্রভা সদাশিববাবু।

সাধারণ গেরস্থবাড়ীতে কেউ এলে লোকে আড়ালে লোকজনকে খাবার করতে বা আনতে দেয়।

এদের বাড়ীর সবই আশ্চর্য্য—। বেয়াই বেয়ানের সামনেই কোমরের কসির ভিতর থেকে গুণে গুণে পয়সা বের করেন ভবতারিণী। বলেন দেখ বেয়াই বেয়ানের জন্যে দুটো করে শিঙ্গাড়া আনবি আর দুটো করে পানতুয়া আর নিমকীও দুখানা করে আনবি। তাহলে এইনে আরো চারগণ্ডা পয়সা। ঘোমটার মধ্যে থেকে অনুপমার চোখ কী যেন সঙ্কেত জানায় মাকে। প্রভা ব্যস্ত হয়ে বলেন, এই মাত্তর খেয়ে এসেছি বেয়ান, শুধু শুধু অত খাবার আনাবেন না। ভবতারিণী বলেন, সে আমি পার্ব্বনা বেয়ান এহল গাঙ্গুলী বাড়ী, গাঙ্গুলীবাড়ী এসে কেউ শুধু-মুখে ফিরে গেছে একথা কেউ কখনো শোনেনি। আমাদের বাড়ীর একটা মান ইজ্জত আছে ত? সত্যি সত্যি মেয়েকে ত খোলার ঘরে বিয়ে দেননি। হ্যা বিষ্টু শোন, যদি গজা পাস তাও দুখানা নিবি আর আমিত্তির জিলিপী দুখান,—কথার সঙ্গে সঙ্গে কোঁচড় খুলে পয়সা বেরোয়। বারে বারে গোনেন পয়সা। বলেন আমার আবার ভোলা মন ত সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নেন প্রসন্নবাবু, বলেন দেখো আবার পয়সা বলে গিনি দাওনি ত? হ্যাঁ তোমার সেই পান মনে করে একশো টাকার নোট চিবুনোর গল্পটা বলবো নাকি বেয়ানকে? প্রভা হতবাক হয়ে শোনেন এদের কথা ভুলে। এরা কিন্তু দশটাকা বা পাঁচ টাকার নোট চিবুবেনা, চিবুবে একেবারে একশ টাকার নোট! সবই ওঁদের আজব দেশের ব্যাপার।

প্রসন্নবাবু অমায়িক হাস্যে বিগলিত হয়ে বলেন, জানেন আপনাদের বেয়ানের গঙ্গার ঘাটের অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা শুধু আমার গাড়ী চেপেই গঙ্গা স্নান করেন না আবার ঘাড়ও ভাঙেন। আপনার বেয়ানের কাপড় কাচার জন্য তাঁদের মধ্যে মারামারি। আসলে একশো টাকার নোট গিনি ভরা ত— তার তো আর হিসেব নেই। আপনার বেয়ানের কাপড় যে কাচবে তারই লাভ। কাজেই কাপড় কাচা নিয়ে টান পাড়াপাড়ি। চক্ষু বিস্ফারিত করে সদাশিববাবু শোনেন। প্রভা অবাক হয়ে ভাবে, কোন মানুষকেই কি এরা ভালো ভাবতে জানেনা? কোন জিনিষেরই এরা কদর্থ করতে ছাড়ে না। এ কি নরক-বাস হচ্ছে অনুর? আমরা একমিনিট এলে হাঁপিয়ে যাই। এমন সময় শালপাতার চ্যাঙ্গারী নিয়ে ফিরলো। গিন্নি খাবার সাজাতে বসতেই ছোট ছোট অনেক-গুলি শিশুর আদিম বেশে আবির্ভাব। অধিকাংশই বস্ত্র লেশ শূন্য, দু একজন আবার ওপরের অর্দ্ধাঙ্গ মূল্যবান সাটিনের জামা-পরা নিম্নাঙ্গ খালি। কিন্তু শুধু এরাই যে এতক্ষণ দরজায় উঁকি দিচ্ছিল তা নয়, বড়রাও দিচ্ছিল। গদাইকেও যেন এক চটকা দেখেন সদাশিববাবু। খাবার সামনে ধরে দিতেই প্রসন্নবাবু বললেন, কৈ গো ওঁদের সেই নেশার জিনিষ আনিয়ে দিলেনা? কেন যে ওসব ছাইভস্মগুলো খান আপ-নারা—। হঠাৎ প্রভা চমকে ওঠে! সদাশিববাবু দেব-চরিত্রের মানুষ পান সিগারেট অবধি খাননা। ওসব বিষয় খ্যাতি বরং এঁদেরই আছে। প্রসন্নবাবু অহঙ্কার করেই বলেন পাড়ার ভালো ধুতি কেউ কুড়িয়ে পেলে, লোকে বুঝবে এ গাঙ্গুলিবাবুর বাড়ীর কাপড়—। অমন খোলের অমন ধুতি পরার সামর্থ্য আছে কটা লোকের? নেশার ঘোরে রাস্তায় কাপড় ফেলে আসাটা এঁদের পক্ষে লজ্জাজনক নয়, লজ্জাজনক হল যদি সস্তার ধুতি কেউ পরে।

প্রসন্নবাবু নিজেই এবার নিজের কথার ব্যাখ্যা করেন। চা মশাই চা, আপনারা সব বালিগঞ্জের সায়েব তো? টুকুটুকু চাই সকাল বিকেল। দাও না গো চারগণ্ডা পয়সা ফেলে, বিষ্টু মোড়ের দোকান থেকে এনে দিক। আবার প্রভা লজ্জায় মাথা নত করে আপত্তি জানান কিন্তু সদাশিববাবু বলেন, তা বরং আসুক মনটা চা চা কচ্ছে সত্যিই। এদিকে নগ্ন শিশুরা খাবারের রেকাবীর পাশে মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত এগিয়ে এসেছে কিন্তু প্রভা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, পেছন থেকে মাকে ঠেলা দিয়ে অনু বলে, মা,

ওদের হাতে খাবার দাও। চকিত হয়ে প্রভা খাবারের রেকাবির দিকে হাত বাড়াতেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারামারি সুরু হয়ে যায়। "আমি নিমকী খাবো আমায় রসগোল্লা দাও" সঙ্গে সঙ্গে দুথালা খাবার সারা। সস্নেহহাস্যে ভবতারিণী বলেন, ওমা একটাও এঁদের জন্যে রাখলি না? তোরা কিরে? প্রসন্নবাবু বলেন, ওঁরাতো খেতেই চাইছিলেন না। যা খেলে ওঁদের মন ভরে তাতো এসেই গেছে। মরমে মরে গিয়ে দোকান থেকে আনা চায়ের গেলাস মুখে তোলেন প্রভা—। সদাশিববাবুর মুখ কিন্তু প্রসন্ন হাস্যে ভরে যায়, সত্যিই খুসীতে ভরে ওঠেন তিনি। বেচারা ডায়বেটিসের রুগী, ঐ বাজারের রসগোল্লা পানতুয়া তাঁর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অথচ যে বেয়াই বেয়ানকে খুসী করার জন্য এতকাণ্ড—কিকরে না খেয়ে তাঁদের চটাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ একটি শিশু চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা আবার—প্রভা দেখেন তরল পায়খানা শিশুটির পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হাতে তার অর্দ্ধ ভক্ষিত সিঙাড়াটির দিকে নজর পড়ায় প্রভা নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু ভবতারিণী প্রসন্নহাস্যে বলেন, ওর অমনি কাণ্ড খেতে না দিলেই রসাতল।

ক্রমশঃ

যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়—

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

গুহায় নিহিত হিন্দুধর্মের মহিমা কাহার মনীষা বলে
পাশ্চাত্ত্যের ধাঁধিল নয়ন ?
সে যে যুগপ্রবর্তক অমিত বিক্রম রাজা শ্রীরামমোহন।
যেমন বিশাল বৃক্ষতলায় মৃত্তিকারস করি সদা পান
সঙ্গে সঙ্গে শুষে লয় বিশ্বের বায়ুস্রোত হ'তে অফুরন্ত খাদ্য-উপাদান
তাহাতে সমপুষ্ট হ'য়ে ফুলফল করিয়া ধারণ
তোষণ পোষণ করে অগণিত জীবের জীবন—
তেমনি হে ভারতগৌরব বঙ্গসংস্কৃতি হ'তে প্রাচ্যবিদ্যা করিয়া অর্জন
পাশ্চাত্ত্যের বিদ্যারাজিনাতে নিমগ্ন রহিলে অনুক্ষণ।
নিজের জীবনমাঝে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতি সমভাবে করিয়া ধারণ
হে দিশারী, সে আদর্শে শিক্ষিত বাঙালীগণে সাগ্রহে করিলে আবাহন।
হিন্দুর অদ্বৈতবাদ মানবমনের সবচেয়ে বড় অবদান—
সেকথা তোমার কাছে জানি—কৃতার্থ
এমারসন আদি কত বিদগ্ধ খৃষ্টান।
সৌগন্ধ বিজ্ঞানে দেখি গন্ধহীন 'ফিক্‌সেটিভ' দ্রব্যের বিহনে
অতি অল্পক্ষণে।

সুরভি নির্যাসরাশি উবে যায়
তেমনি বিবিধ ধর্ম করিয়া মন্থন
সকলের সার সমন্বয়ে নবধর্ম করিলে সৃজন
সে ধর্মের বিশুদ্ধতা বেশীদিন রক্ষা করা দায়
মহামতি আকবর বাদশার "দীন-এলাহি' ধর্মের ন্যায়।

কতযত্নে শিখেছিলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কত ভাষা
মাতৃভাষা বিকাশের লাগি তবু প্রাণে ছিল তব কী বিরাট আশা—
তাই দৃঢ় ভিত্তির উপরে বাংলাভাষারে তুমি করিলে স্থাপন
আধুনিক বিজ্ঞান চর্চারও তুমিই ত করিয়াছ শুভ উদ্বোধন।

ধর্মের যতেক গ্লানি অন্ধ সংস্কার অনাচার
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল তব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ক্ষুরধার।
অগ্নিগর্ভ পর্বতের প্রায় প্রতিভার প্রদীপ্ত লাভায়
আচ্ছন্ন নিষ্পিষ্ট ক'রে দিলে সমাজের যত আবর্জনা
যাহে পরবর্তী যুগে বাঙালীর মনোলোক হইয়া উর্বর
সমৃদ্ধ সুন্দর হ'ল বিচিত্র শোভায়।
একাধারে জ্ঞানীগুণী কর্মবীর অতি বিচক্ষণ
জাতিধর্ম ভেদাভেদ ভুলি সত্যশিব সুন্দরের করেছ সাধন।
কেবল বাংলায় নয়—সমগ্র ভারতে আনিয়াছ নবজাগরণ
জাগ্রত ভারতবাসী চিরবধি কাল ধরি
করিবে তোমারে দেব, সশ্রদ্ধ স্মরণ।

সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

বঙ্কিমযুগের সাহিত্য-পত্র পত্রিকা এবং বঙ্কিম-মণ্ডলের লেখকগণের বিষয় আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিতপরেই যে ব্যক্তির নাম অনিবার্যভাবে উল্লেখ করিতে হয় তিনি সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তিনি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর আইনের ছাত্র সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তখন বিশেষ সান্নিধ্যের বা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। ইতি-পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র হুগলী মহসীন কলেজ হইতে বি, এ (১৮৬৭) পাশ করিয়াছিলেন এবং 'হুগলী কলেজের লাইব্রেরী পরীক্ষায়' উত্তীর্ণ হইয়া অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কারণ তাঁহার পূর্ব্বে দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত এই পরীক্ষায় পাশ করিবার যোগ্যতা আর কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পাঠাগারের সমুদয় ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থ এই পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল এবং ইহার কঠোরতা বুঝিতে পারিয়া কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেন।

১৮৬৮ সালে অক্ষয়চন্দ্র বহরমপুরে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। এইখানেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। বহরমপুরে ডাঃ রামদাস সেনের বাড়ীতে বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তকের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা ছিল। এই কারণে সে যুগের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি যেমন রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লোহারাম শিরোরত্ন, দীনবন্ধু মিত্র এবং সর্ব্বোপরি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই গৃহে যাতায়াত করিতেন। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় নবীন হইলেও স্বাভাবিক বিদ্যোৎসাহিতার গুণে অক্ষয়চন্দ্র অল্পসময়েই এই গোষ্ঠীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। বহরমপুরে অবস্থানকালেই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশ করেন (১২৭৯-১লা বৈশাখ)। বলাবাহুল্য 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্রের "উদ্দীপনা" নামক প্রবন্ধটি স্থানলাভ করে। পরের বছর অর্থাৎ ১২৮০ সালে অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত "সাধারণী" সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সরলভাষায় রাজনীতি আলোচনা। পত্রিকাটি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতেই মুদ্রিত হইত এবং বঙ্গদর্শনের সহযোগী পত্রিকা হিসাবে পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইত। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহাদের বুঝাই-বার অপেক্ষা রাখেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন হইতেই রীতিসম্মত সমালোচনার জয়যাত্রা সূচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'বঙ্গদর্শনে' সাহিত্যের সুদীর্ঘ আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে প্রতিমাসে নিয়মিত সাহিত্য-সমালোচনার গুরু-দায়িত্ব অক্ষয়চন্দ্রের উপর ন্যস্ত করেন। ইহা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নিবিড় সাহিত্যিকবন্ধন ও নির্ভরযোগ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া অক্ষয়চন্দ্র কৃতিত্বের সহিত "সাধারণী" পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার প্রভাব সেযুগের মনীষী ও মনস্বীগণের মধ্যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, রাজনীতি বিশেষজ্ঞ বিপিনচন্দ্র পালের একটি উক্তি স্মরণ করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন —"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্যগুরু নহেন— তাঁহার 'সাধারণী' পড়িয়াই আমি রাজনীতির ক খ হইতে

উল্লেখযোগ্য এই যে "সাধারণী" পত্রিকায় রাজনীতি ব্যতীত সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক অনেক চিন্তাপুর্ণ আলোচনা ও সমালোচনা প্রকাশিত হইত। এবং সেকালের সকল লেখকই এই পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করিয়া ইহাকে উৎসাহিত করিতেন।

১২৯১ সালে 'সাধারণী' অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নববিভাকর' (ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত) পত্রিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' তখন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই পত্রিকায় রচনা প্রদান করিতে থাকেন। প্রথম সংখ্যায় 'জাতিবৈর' রচনাটি প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ বসু (বঙ্গবাণী সম্পাদক) এই পত্রিকায় লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। একই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র স্বগ্রাম চুঁচুড়া হইতে 'নবজীবন' মাসিক সম্পাদনা আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণবিহারী সেন, নীলকণ্ঠ মজুমদার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ আলোচনা সমালোচনার বৈঠক ও আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র সেই আসরে কেবলমাত্র উপস্থিত থাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই সকল লেখকগণের রচনা সংগ্রহ করিয়া নিয়মিত "নবজীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "মহাশক্তি" নামক প্রথম রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজপথ' ও ভানুসিংহের জীবনী 'নবজীবন' পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করে। 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশের পনর দিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'প্রচার' প্রকাশিত হয় এবং অক্ষয়চন্দ্র এই পত্রিকাতেও রচনা প্রদানের আহ্বান লাভ করেন।

সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলিবার পূর্ব্বে সেই যুগের পরিবেশ সম্বন্ধে একটি ধারণা হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধের ভূমিকায় অক্ষয়চন্দ্রের মনীষা, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য বন্ধন এবং সেকালের সকল উল্লেখযোগ্য পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপরে সন্নিবিষ্ট হইল। অক্ষয়চন্দ্র পূর্ব্বে বর্ণিত পত্র-পত্রিকাগুলি ছাড়াও পূর্ণিমা, সাহিত্য, ভারতবর্ষ, নবপর্য্যায়ের বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার সমালোচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যিক কৃতি কেবলমাত্র সমালোচনা সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, তাহা কাব্য, রসরচনা, লঘুপ্রবন্ধ, গুরুগম্ভীর আলোচনা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, অনুবাদকর্ম সব কিছুর মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রসরচনার সমাদর করিয়া 'চন্দ্রলোকে' নামক রচনাটি 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনা যেমন যুক্তিনিষ্ঠ তেমনি স্পষ্টবাক্। তিনি অসঙ্কোচে সাহিত্যের বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনায় যোগদান করিতেন। তাঁহার লিখনভঙ্গী, রচনারীতি, ভাষার অনন্যসাধারণ শক্তি ও সরলতা লক্ষ্য করিয়া বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন—"কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শব্দসম্পদের পরিচয় দান করিয়াছেন, গদ্য লেখাতে অক্ষয়চন্দ্র সে শব্দসম্পদের প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সুললিত, সহজবোধ্য, বিবিধ রসোদ্দীপক শব্দধারার সৃষ্টি-কুশলতায় বাংলা লেখকদিগের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও হয়েন নাই।" "সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী লেখক হইলেও তাঁহার স্বকীয়তা প্রদর্শন করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচকমূলক প্রবন্ধগুলি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার উপর তাঁর টীকা-টিপ্পনীযুক্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি হইতে অক্ষয়চন্দ্রের বিচারশক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়। আমরা এইক্ষণে সেই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিব।

বাংলার আদি কবিগণের মধ্যে জয়দেব একটি অবিস্মরণীয় নাম। বৈষ্ণবযুগের সাহিত্য রচনায় কাব্যকলার যে বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল তাহার মূলে জয়দেবের প্রয়াস সর্ব্বাগ্রগণ্য। জয়দেবের গীতিকাব্য

সম্বন্ধে বাংলাসাহিত্যের এমন কোন আলোচনা নাই যিনি ইহার রস-বিশ্লেষণ করেন নাই। কেহ ইহার মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব বা অমর্ত্ত্য প্রেম উপলব্ধি করিয়াছেন, আবার কেহবা ইহাকে স্থূল দৈহিক লালসার চিত্রাঙ্কন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এই পরস্পর-বিরোধী মত-বাদ সত্ত্বেও গীতিগোবিন্দের কবি যুগযুগ ধরিয়া আমাদের হৃদয়াসনে অচলপ্রতিষ্ঠ আছেন। অক্ষয়চন্দ্র কোন্ দৃষ্টিকোন্ হইতে এই কাব্যকে বিচার করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"জাহ্নবী সর্ব্বত্রই পূতসলিলা তথাপি হরিদ্বার সেই পূতবারির পূততম পুণ্যতমতীর্থ। গীতগোবিন্দ সেইরূপ বাঙালীর গীতিকাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ। বাঙ্গালায় যেখানে যে প্রবর, শাখা, সম্প্রদায় থাকুক সকলেরই এক গোত্রে উৎপত্তি। বাঙলার গীতিকাব্য একমাত্র জয়দেব গোত্রজ।" তাহার মতে "জয়দেব গোস্বামী হইতে বাঙালীর বৈষ্ণবধর্মের রাগমার্গের পরম ও চরম স্ফূর্ত্তি হয় এবং সেই রাগমার্গ হইতেই মহাপ্রভুর প্রণোদিত ভক্তিমার্গের উৎপত্তি।...জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাস পদ্ধতি এবং সঙ্গীতরীতি আর আর পাঁচটা জিনিষের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দবন্ধময়ী পদলালিতাসমন্বিত সঙ্গীত-জীবন সৃষ্টি করিয়াছে।" অক্ষয়চন্দ্র ইহাও দেখাইয়াছেন যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙলার আদি পাঁচালি এবং ইহাতে ছড়া গান, ধুয়া, অস্থয়া ঠিক পাঁচালির মতনই আছে।...মধুর কোমলকান্ত রসের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে কঠোর বা উৎকট রসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুরু। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরগুপ্তের রচনা তাঁহাকে কেবল অনুপ্রাণিত করে নাই তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন আজও তাহা পাঠকগণ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। বঙ্কিমশিষ্য অক্ষয়কুমার ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার "কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার কাব্য" শীর্ষক আলোচনাটি এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি। অর্থাৎ বাঙালীর ঐতিহ্য সংস্কারকে লইয়াই তাঁহার কবিতার প্রকাশ, বাঙালীর সমাজ ও রীতিনীতিই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য।

তিনি প্রতিভাশালী কবি না হইলেও জনসাধারণের প্রিয়কবি ছিলেন। এই কথা স্মরণ করিয়াই অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন: ঈশ্বরগুপ্ত বড় কবি নহেন। ক্ষুদ্র বাঙালী জাতির মধ্যেও উচ্চতর কবিও নহেন, কিন্তু হয়ত তিনি শেষ কবি।...গুপ্ত কবির রচনাতে খুব গূঢ়ভাব বা কল্পনার বিশেষ লাবণ্যময়ী লীলাখেলা না থাকিলেও, ভাবকে কখন ভাষার বিরাগ জন্য ম্রিয়মান হইতে হয় নাই।...ঈশ্বরগুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনা। ভাষা কোথাও তুবড়ির মতো ফুটিতেছে—আর চারিদিকে কেবল ফুল কাটিতেছে। ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ ইয়ারের রঙ্গ তাহাতে দ্বেষের লেশ নাই। ঈশ্বরগুপ্তের দুঃখ, বিশ্বেশ্বর সমীপে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, তাহাতে দুরাকাঙ্খার নিরাশা নাই। আর ঈশ্বরগুপ্তের আনন্দলহরী বাঁধাসুরের সাধারাগিণী—তাহাতে অহংকারের গীট্‌কারি বা ঘৃণার টিটকারী নাই"। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে ব্যঙ্গের পরিমাণ অধিক থাকিলেও কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায় "হিন্দু মুসলমান, একেলে সেকেলে, ব্রাহ্ম খৃষ্টান মেয়ে পুরুষ, মেড়ো বাঙ্গাল শহুরে পাড়াগেঁয়ে সকলেরই উপর গুপ্ত কবির সমান দৃষ্টি আছে।"

ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যের আর একটি প্রধান দিক তাঁহার স্বদেশপ্রীতি। তিনিই বাংলা দেশের এমন কবি যিনি বাঙালীকে দেশাত্মবোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উত্তর কালে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত রচনার পথপ্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। এই বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রও বলিয়াছিলেন: ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রীতি এবং মাতৃভাষায় ভক্তি তাঁহার

সহজধর্ম ছিল। টেনে বুনে বা পেটের দায়ে পেট্রিয়টি তাঁহাকে করিতে হয় নাই।"

অক্ষয়চন্দ্রের "কাব্যি সমালোচনা" একটি সরস আলোচনা। ইংরাজী কাব্যের অনুরাগী বাঙালী পাঠকগণ একসময় শেলী বায়রন প্রমুখ কবিগণের কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়া বাঙ্গালা কাব্যের প্রতি ঔদাসীন্য বা অবহেলা প্রদর্শনে অভ্যস্ত হন। এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়াই অক্ষয়চন্দ্র উপরোক্ত রচনাটি প্রকাশ করেন। রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে একসময় শেলী ও বায়রণের নাম এ দেশের পাঠকসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু এই কবিদ্বয়ের কাব্যে জগৎ ও জীবনের রহস্য যে অস্পষ্ট ও খণ্ডাকারে প্রতিফলিত হয়েছিল তাহাই বুঝাইতে অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন :—শেলির অন্তরজগৎ সত্যসত্যই কুজ্ঝটিকাময় ছিল। সেই অন্তরের কুয়াশায় তিনি তাঁহার বহির্জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বায়রনের ধূপছায়ায় ধূপ ফুটাইতে না পারিয়া কেবল ছায়ার মায়ায় মজিয়াছিলেন। বায়রণ নিঃশ্বাস ফেলিতেন, ধূমের সহিত তাহাতে অগ্নি নিষ্কাশিত হইত, শেলি নিঃশ্বাস ফেলিতেন—ধূঁয়া ধূঁয়া—কেবল ধূঁয়া। শেলী—খুঁজিতেন কেবল ছায়া, নিভৃতি, নিরালয়, বাসিফুলের ম্লানভাব, কুঞ্জ্যার অস্ফুট কুলুকুলুরব; বাতাসের হুতাশ, আকাশের উদাস, চাতকের পিপাসা আর পাতকীর নিরাশা"। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া অক্ষয়চন্দ্র স্মরণ করাইয়াছেন :—"বাঙ্গালা সাহিত্য সূতিকাগার হইতেই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণের নন্দযশোদা, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী বৃন্দাচন্দ্রা, শ্রীদাম সুবল, মান মাথুর, রাসপ্রভাস, সকলই বর্ণনার গুণে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ।...কেবল বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পুরাতন সকল কবিই সুস্পষ্ট চিত্রণে সুদক্ষ।" পরিশেষে তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছেন—"কেবল শেলীর দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কন কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিত্যক্ত অপূর্ব্ব সাহিত্য সম্পত্তি নষ্ট করিবে?" অক্ষয়চন্দ্রের 'নাটক' প্রবন্ধটি সেকালের বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ আলোচনা। রামনারায়ণের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় চুঁচুড়ায় ১৮৫৭ সালে। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও সধবার একাদশী, ও লীলাবতী, হেমন্তকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপয়া', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুষবিক্রম' ইত্যাদি কয়েকটি নাটককে অবলম্বন করিয়া তিনি একটি সারগর্ভ রচনা প্রকাশ করেন। বাংলার নাটক সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন "আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের দেহ আছে, প্রায়ই প্রাণ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন আছে, আবেগ-তরঙ্গের চলাচল নাই।" তিনি উপরোক্ত নাটকগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—দেশহিতৈষিতা, প্রাসঙ্গিক, অনুবাদমূলক ও প্রণয়জীবন নাটক। তাঁহার মধ্যে দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটককার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাহার কাব্যরস তরল হইতে থাকে। অন্যত্র তিনি ইহাও বলিয়াছেন: "এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব আর যেরূপ এলায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু ইঁহারা সকলেই প্রহসন-লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অদ্বিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা নাটক—কেবল দুই একখানি ব্যতীত সকলগুলিই অসার। যেখানে দেশহিতৈষিতা উদ্দীপনের চেষ্টা সেখানে গ্রন্থকার প্রায়ই অকৃতকার্য।"

অক্ষয়চন্দ্র স্বসম্পাদিত পত্রিকা "সাধারণী" ও "নবজীবন" ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এ নিয়মিত ভাবে যেসব গ্রন্থ সমালোচনা করিতেন তাহা ভিন্ন তিনি 'নবপর্য্যায়ে বঙ্গদর্শন', 'জাহ্নবী', আর্য্যাবর্ত্ত, ভারতবর্ষ, মাসিক পত্রিকা সাহিত্য, পূর্ণিমা, প্রভৃতি পত্রিকা সেকালের বহুবিধ গ্রন্থের আলোচনা করেন। যেমন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "গীতায় ভক্তিবাদ", নবীনচন্দ্র সেনের আমার জীবন, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'ফোয়ারা', দীনেশচন্দ্র সেনের 'গৃহশ্রী' রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ', যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'রামায়ণের ছবি ও গান', অক্ষয়কুমার বড়ালের "শঙ্খ" ও 'এষা', সরলাবালা দাসীর 'প্রবাহ', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ফোকলা দিগম্বর', শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর 'দেবীযুদ্ধ' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "ষোড়শী", রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা', যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু', রামকমল তর্কালঙ্কারের 'বাঙ্গালা অভিধান', সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, বাঙালীর বল", ডাক্তার লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ইউ; এন, মুখার্জির —"A Dying Race" (মরণোন্মুখ জাতি) ও স্বর্ণকুমারী দেবীর "দীপনির্ব্বাণ"।

যে গভীর অধ্যবসায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি এই সকল গ্রন্থগুলির বিচার করেন তাহা পাঠ না করিলে সম্যক অবগত হওয়া যাইবে না। ঐ সকল প্রবন্ধগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আলোচ্য বিষয়ের কলেবরকে ভারাক্রান্ত করিবে। অতএব আমরা তাঁহার সমালোচনার কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীকে উপলব্ধি করিবার জন্য কয়েকটি নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব। নবীনচন্দ্র সেনের আত্মচরিত 'আমার জীবন' একটি বিপুলায়তন গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত সমগোত্রীয় গ্রন্থ হইলেও, আমার জীবনের সহিত তুলনীয় নয়। কারণ কবি ইহাতে আপনার শিক্ষা, দীক্ষা ও পরীক্ষার বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র বলিয়াছেন—"নবীনের কাব্যে যে জিনিষটার ছায়া দেখিয়াছিলাম এই আত্মচরিতে তাহা জীবন্ত দেখিতে পাইলাম।"

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল যুগসন্ধিক্ষণের কবি। অর্থাৎ প্রবীণ ও নবীনের সমন্বয়সাধনই তাঁহার কাব্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দুইটি কাব্যে "শঙ্খ" ও "এষা" অক্ষয়চন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রথম কাব্যগ্রন্থে অক্ষয় কুমার বড়াল রথী মহারথীকে সম্বোধন করিয়া যোগী ঋষি, পুজককে আহ্বান করিয়া শঙ্খে ফুৎকার দিতে বলিয়াছেন "এবং এষাগ্রন্থে বনিতাবিয়োগবিধুর বড়াল কবি শান্তি অন্বেষণ করিয়াছেন। এই অন্বেষণের অপর নামই 'এষা'। স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থা হইতে সান্ত্বনার শেষঅবস্থা পর্য্যন্ত যে সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা পাঠকের হৃদয়কেও রসে বিগলিত করে। এমন অসীম ধৈর্য্য ও অচল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত খুব কম বাংলা কাব্যে দেখা গিয়াছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী' গ্রন্থটি ষোলটি গল্পের সংগ্রহ। এই কাহিনীগুলির মধ্যে একটি ঐক্য বর্ত্তমান। সব গল্পগুলির অধিকাংশই ষোড়শীরূপসীকে লইয়া রচিত। তাই অক্ষয়চন্দ্র এই বিষয়টিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন: 'ষোড়শী'র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে তাহাকে চিনিল না) বেশ ভাবুক, সামাজিক, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখনপটু, তাঁহার লেখায় সুন্দর ভঙ্গী আছে, ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রূপের গতি আছে। তাঁহার যখন এতগুণ তখন তিনি কেন কেবল ষোড়শী আর ষোড়শী করিবেন, কেন বর্ষিয়সী বাঙালীমার চিত্র অঙ্কন করিবেন না? ভালবাসা ও দাম্পত্য প্রণয়ে বা যৌব-যোজনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে।"

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্রের যেসব সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল ঐ গুলির মধ্যে "হেমলতা" নাটক, 'তীর্থমহিমা' নাটক, 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' প্রহসন, রস কাদম্বিনী বা সংস্কৃত অমরু শতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক মাসিকপত্র বা পত্রিকা যেমন উৎসাহ, উদ্বোধন, উপাসনা, এডুকেশন গেজেট, কৃষক, ধর্মপ্রচারক, নব্যভারত, পন্থা, পল্লীচিত্র, প্রবাসী, ভারতী, মহাজন বন্ধু, মুকুল, সাহিত্য, সাহিত্যসেবক, স্বদেশী, হিন্দুপত্রিকা, প্রভৃতির রচনাগুলিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া রসিক-সমাজের সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে সাহিত্যের মূল্যবোধ বা মূল্যায়ন বিগত যুগ হইতে অনেক উচ্চতর পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে সত্য তথাপি সমালোচনা সাহিত্যের উদয়লগ্নে যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ হইয়া সাহিত্যের বিশ্লেষণী ধারার গতি-প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, অক্ষয়চন্দ্র যে নিঃসন্দেহে সেই পূর্ব্ব সূরীর একজন এই কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে। অক্ষয়চন্দ্র সমসাময়িক সাহিত্যের বিচারে যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বহুবিধ

পরিচয় দিয়াছেন উপসংহারে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালীন 'গোরা' সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। 'গোরা' গল্পে মানবচিন্তার যেরূপ বিশ্লেষণ হইতেছে, সেরূপ বিশ্লেষণ, বাঙ্গালা ভাষায় ত নাই-ই, ইংরাজীতে অল্প দেখা যায়। ভিক্টর হুগোতে আছে। এইরূপ বিশ্লেষণে রবিবাবু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানব-চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করা অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শীর কাব্য, কিন্তু এরূপ ব্যবচ্ছেদ দর্শনের অঙ্গ, বোধ করি কাব্যের অঙ্গ নহে।... দার্শনিক-পাঠক সকল দেশে কম, আমাদের দেশে আবার নিতান্ত কম। কাজেই গোরা গল্পের অদ্ভুত বিশ্লেষণ তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না। এই বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া যদি দুই চারিটি প্রতিমা ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে গোরার গল্প সমধিক আদরের সামগ্রী হইবে।"
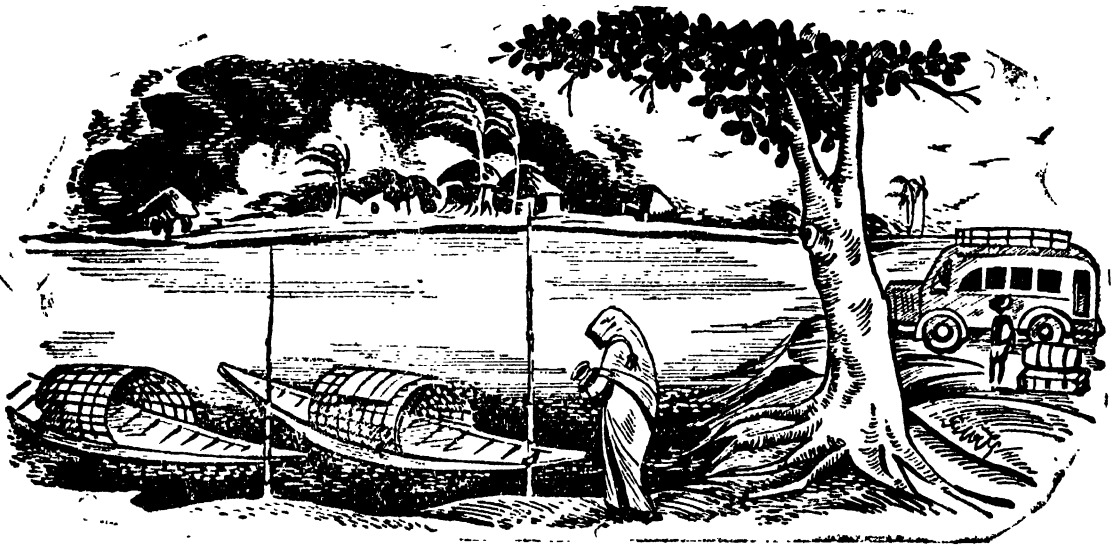
নাট্যকার বনাম নাট্যসমালোচক

অশোক সেন

"লেখকদের মত সমালোচকরাও তাঁদের লেখার সমালোচনা খুব পছন্দ করেন না। তাঁরা চান তাঁরাই সাহিত্যিকদের কাজের গুণাগুণ বিচার করবেন—তাঁদের নিজস্ব কাজ নিয়ে কেউ বিচার করে এ তাঁদের ঠিক মনঃপূত নয়। নাট্যকারদের মতই সমালোচকরাও দাম্ভিক উদ্ধত এবং অসার প্রকৃতির—এবং তাদের মতই এদের ভেতরেও একটা মহৎ ঔদার্য আছে। নাটক লিখবে রোবোটস্ এবং তার সমালোচনা হবে কম্পিউটারের দ্বারা, এমন দিন যেন কোনদিন না আসে"—উপরের কথাগুলো বলেছেন লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকা টাইমসের বিখ্যাত নাট্যসমালোচক হ্যারল্ড হবসন। বর্তমান সময়ের দু একজন প্রথিতযশা নাট্যকারদের সমালোচকদের সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা শুনেই হ্যারল্ড হবসন এই ধরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন: "আমরা বিনাদ্বিধায় স্বীকার করছি মিষ্টার অসবর্ণ এবং মিষ্টার ওয়েস্কার আমাদের হতচকিত করে দিয়েছেন ঠিক যেমনটা হয়তো আমরাও তাঁদের করেছি। মিষ্টার অসবর্ণ ইংরাজী দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সমালোচকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার আগে এবং মিষ্টার ওয়েস্কার (যাকে সবাই খুব সহৃদয় ব্যক্তি বলে জানে) সমালোচকদের ধ্বংস করবার প্রস্তাব পেশ করবার পূর্বে, আমাদের অর্থাৎ সমালোচকদের ব্লাডপ্রেসার যে-স্তরে ছিলো, সে স্তরে ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘদিন সময় লাগবে একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। মিষ্টার অসবর্ণ এক সময় নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছিলেন যে ইংলণ্ডে এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁদের বিচারবুদ্ধির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁদের মতামত তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই উক্তির কথা ভেবে সমালোচকরা যদি সান্ত্বনা পেতে চান তাও বৃথা হবে বলেই আমার মনে হয়। যখন ঐ ধরণের উক্তি মিষ্টার অসবর্ণ করেছিলেন তারপর বহু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং মনে হয় তিনিও তাঁর মত পাল্টে ফেলেছেন।

তবে আজকের দিনের প্রচলিত নাট্য-সমালোচনাকে বিধ্বস্ত করবার জন্য মিষ্টার ওয়েস্কারই এগিয়ে এসেছেন কিছু বাস্তব প্রস্তাবনা নিয়ে—তিনি চান সমালোচনাকে জ্ঞানগর্ভ, সুন্দর এবং মঙ্গলময় করতে। তাঁর মতে প্রথমে সমালোচকদের নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়া দরকার এবং রিহার্সালে উপস্থিত থেকে, পরে নাটকের জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনীর সময় সেখানে যাওয়া উচিত। খুবই খাঁটি কথা! এখন আমাকে যদি প্রশ্ন করেন, কেন আমি মিষ্টার ওয়েস্কারের স্ক্রিপ্ট পড়িনা বা কেন তাঁর রিহার্সালে যাই না—আমার জবাব হোল, তিনি ওইসবের জন্য কখনও আমাকে আমন্ত্রণ জানান নি। তাছাড়া তাঁর এই প্রস্তাব বিষয়ে নটনটিদের কি প্রতিক্রিয়া হবে সে কথা ভেবে দেখেছেন? আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় একজন যুবতী অভিনেত্রীকে মিষ্টার ওয়েস্কারের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলাতে, তিনি আতঙ্কজড়িত স্বরে খুবই সরলভাবে আমাকে বলেছিলেন—গুড্ হেভনস্, আপনাকে রিহার্সালের সময় প্রেক্ষাগৃহে থাকতে দেওয়া হবে? বরং কোন চারওম্যানকে ওই জায়গায় সহ্য করা যেতে পারে।'

এমনও যদি হোত যে সমালোচকেরা চারওম্যানদের থেকে জনপ্রিয়—আসলে অবশ্য তাঁরা তা নন্—তাহলেও বিপদের আশংকা থাকতো। এই বিপদ এসে আঘাত হানতো লেখকদেরই উপর। সিসিরো—আমার মনে হয় একথা সিসিরো সম্বন্ধেই প্রচলিত—একবার তাঁর এক বন্ধুকে তাঁর এক বক্তৃতা রিহার্স করবার সময় এসে শুনতে বলেছিলেন—এই বক্তৃতা তিনি তৈরী করছিলেন তাঁর এক মক্কেলের সমর্থনে। প্রথমবার বক্তৃতাটি শুনে বন্ধু বললেন, চমৎকার করেছেন। দ্বিতীয়বার [illegible]

মনে হোল বক্তৃতাটি একঘেয়ে লাগছে। তৃতীয়বার শোনবার পর তাঁর মনে হোল, এই বক্তৃতার ফলে সিসিরোর মক্কেলের সম্ভবতঃ কনভিকশন্ হয়ে যাবে। সিসিরো এবার বন্ধুকে উত্তর দিলেন—কিন্তু বন্ধুবর, সেনেট এই বক্তৃতা একবার মাত্রই শুনবে। সুতরাং নাট্যকারদের প্রতি আমার উপদেশ হোল—সমালোচকেরা যদি আপনাদের নাটক একবারের জন্যই মাত্র দেখেন। আপনাদের দিক থেকে সেটাই হবে সবদিক থেকে ভাল।

ওয়েস্কারের দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে—সমালোচকদের জন্য প্রথম রজনীতে অভিনয় দেখবার কোনো ব্যবস্থা রাখা হবে না। সমলোচনাকে পেছিয়ে দিতে হবে কয়েক সপ্তাহের জন্য। এবং সবাইকে একসময়ে ডাকা হবে না। উত্তর—সমালোচনাকে ওইভাবে পেছিয়ে দিলে জনসাধারণের মনে তার কোথাও প্রভাব পড়বে না। এবং তারপর কোন্ সমালোচকদের আগে ডাকা হবে এবং কাদের পরে আসতে দেবেন? ধরুন, যে সমালোচক নাটকটি পছন্দ করলেন তিনি নাটক শুরু হবার একমাস পরে এলেন—আর যিনি নাটকটিকে মনে করলেন নীচস্তরের তাঁকেই ডাকা হোল প্রথমদিকে। এতে নাট্যকারের সত্যিকার কিছু সুবিধা হবে কি? অসবর্ণকে আর একটা কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করবো। আজকের বৃটিশ থিয়েটার-জগতে তাঁর মত শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব খুব কমই আছেন। কিন্তু তাঁর প্রথম নাটক 'লুক্ ব্যাক ইন এ্যাঙ্গারকে' মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার জন্ত ক্রিটিকদের কাছে কি তিনি বিশেষভাবে ঋণী নন? তারপর ধরুন ব্রেশটের কথা—এদেশে ব্রেশটের যশ এবং খ্যাতির প্রতিষ্ঠার জন্য একজন বিশেষ সমালোচকই যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী একথা বললে কি সত্যের অপলাপ হবে?"

এই বিশেষ সমালোচকটি বোধহয় অবজার্ভারের কেনেথ টাইনান। কিন্তু হবসনের শেষ মন্তব্যটি অত্যন্ত হাস্যকর। সারা পৃথিবীতে আজ বেরটল্ট ব্রেশটকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে সম্মান দেওয়া হচ্ছে—সেটা সমালোচকদের মতামতের জন্য নয়, ব্রেশটের নাটকের নানাবিধ নাট্যিক গুণের জন্য। কৃষ্টির ক্ষেত্রে নবাগত আমেরিকানরা পর্যন্ত—যাঁদের সেরা দুই নাট্যকার টেনেসী উইলিয়ামস এবং আর্থার মিলার অর্থাৎ যাঁরা সেক্সের এবং পারভারটেড্ সেক্সের গরম মশলা ছাড়া নাটক জমাতে পারেন না…আজ কাল ব্রেশট বলতে পাগল। এর কারণ বোধহয় ব্রেশট তাঁর নাটকে অত্যন্ত জটিল রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোকেও অতি সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারেন বলেই আমেরিকানরাও তাঁকে গ্রহণ করেছে অন্তর থেকে। অথচ তাদের নিজেদের দেশের মহৎ নাট্যকার ইউজিন ওনীলকে তারা যথাযথভাবে এ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে না।

সে যাই হোক, পৃথিবীর সব দেশেই যখন ব্রেশটের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে, সেক্ষেত্রে মারলো সেকস-পীয়ারের জন্মভূমি ইংলণ্ডে বেরটল্টে ব্রেশটের প্রতিষ্ঠা হয়েছে একজন সমালোচকের কৃতীত্বে, এ ধরণের উক্তি অত্যন্ত শিশুজনোচিত বলেই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

মধ্যযুগে বাঙ্গালীর খাদ্য

মাধব পাল

মানুষ আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আসছে। বাংলার সজল প্রকৃতির দান—ভাত, ডাল ও মাছ, তাই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। ধান উৎপাদনে যেমন জলের প্রয়োজন তেমনি তাপেরও। জল আর তাপের প্রাচুর্য্যের জন্যই ধান আর শাক-সবজী বাংলা দেশে প্রকৃতির অকৃপণ দান। বাংলা দেশ—বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গ ধানচাষের প্রকৃষ্ট স্থান।

এছাড়া আছে, বাংলার জলে—খালে বিলে পুকুরে নদীতে প্রচুর মাছ। বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকায় তাই ভাত, ডাল, মাছ ও শাকসব্জী প্রাধান্য লাভ করেছে। এইসব খাদ্য বাঙ্গালী জাতির প্রথম অবস্থা থেকেই প্রচলিত। কালক্রমে কিছুটা ভিন্নতর খাদ্যের তালিকা বাঙ্গালীর পাতে পড়লেও মোটামুটি প্রায় একই রকম আছে।

এই সাধারণ খাদ্য নিয়ে বাঙ্গালীর সমস্যাও প্রাচীন কাল থেকেই। তবে মধ্যযুগের যেসব চিত্র পাওয়া যায় তাতে সচ্ছল বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকায় কিছু সুখাদ্য স্থান পেলেও, সাধারণলোকের খাদ্যও যে সাধারণ তা আজকের মত হাজার বছর আগেও ছিল। একটাকায় একসের যব আর কিছু সৈন্ধব লবণ পেলে দরিদ্রও সেদিন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো। বাংলা ভাষার প্রথম অবস্থার একটি চর্য্যাতে এর নিদর্শন পাওয়া যায়।—

সের এক জই পাঅই মিত্তা
মণ্ডা বীস্ পকাইল নিত্তা
টঙ্ক এক জই সিন্ধব পাআ
জো হউ রক সো হউ রাজা।

তার পরবর্তী কালেও সাধারণলোকের খাদ্য তালিকায় দেখা যায় শাকসব্জী ও ছোট মাছ। অবশ্য তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘি দুধ থাকতো কোন কোন ভাগ্যবানের পাতে। এরকম একটি খাদ্য তালিকা আছে একটি কবিতায়—

ওগরা ভত্তা, রম্ভা পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সযুক্তা
মইলি মচ্ছা নালিচা গুচ্ছা
রান্ধই কান্তা খায় পুনবন্তা।

একটি উদ্ভট শ্লোকে মল্লভূমির সাধারণ লোকের যে সহজ সরল জীবন যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাদের খাদ্যও যে অতি সাধারণ ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়।—

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানং শাল পাত্রে চ ভোজনং
শয়নং তালপত্রে চ মল্লভূমেরিয়ং গতি।

বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যগুলিতে যেসব খাদ্যের বর্ণনা আছে তাতেও ভাতই প্রধান। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে মধ্যযুগের সমাজচিত্রই অঙ্কিত। সেকালেও নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রের খাদ্যসমস্যা করুণ ছিল। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত ফুল্লরার বারমাস্যায়—

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।

কিন্তু চৈত্র মাসেই দিন-মজুরের খাদ্যের অভাব ঘটতো, একথাও বারমাস্যা থেকেই জানা যায়। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসেও ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী অন্নদার কাছে সন্তানদের দুধেভাতে রাখার প্রার্থনা জানিয়েছিল। খাদ্য সমস্যা মধ্যযুগেও যে কত প্রকট ছিল তা মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত আছে।

পাল ও সেন রাজাদের আমলেও বাঙ্গালীর খাদ্য মোটামুটি বর্তমানকালের মতই ছিল।—ভাত ডাল মাছ শাকসব্জী দৈ দুধ ঘি এবং পেটাচিনি ও আখের গুড়

সেকালেও ছিল। তবে সাধারণলোকের পক্ষে ঐসব সুখাদ্যও সহজলভ্য ছিল না।

মধ্যযুগে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর ঘরে খাদ্য-তালিকায় নানা-রকম তরকারী ছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে শ্রীচৈতন্যের ভোজনের যে চিত্র আছে তাতে দেখা যায়—

বাস্তশাক প্যাক করি বিবিধ প্রকার
পটল, কুষ্মাণ্ড, বড়ি, মানকচু আর।
নারিকেল শস্য, ছানা, শর্করা মধুর
মোচাঘন্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।

সে সময় সাধারণ গৃহস্থের খাদ্য আরও সাধারণ ছিল। শ্রীচৈতন্য পুরীর পথে কাশীমিত্রের বাড়ীতে ভোজন করেন। চৈতন্য-সেবক গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে—

ভোগ দিয়া—প্রসাদ বণ্টন করি দিলা
সুক্তার ঝোলে প্রাণ প্রসন্ন হইলা।
আষ্টখানা কড়লার ভাজা খাইনু সুখে
বড় বড় গেরাস তুলিয়া দেই মুখে।
চুক্রায় গুড় দিয়া অমৃত সমান
কত খাব আনন্দেতে প্রসন্ন বয়ান।

সুলতানী আমলে সাধারণলোকের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ঘন ঘন রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের জন্য চাষীদের খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও কমে যায়। তার উপর সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ভোগ-বিলাস ও অত্যাচারের ফলে সাধারণলোকের খুবই দুরবস্থা ঘটে। বিদেশী পর্যটক বারবোসা ও ইবন বতুতার ভ্রমণ-কাহিনী মতে তখন বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্য বিশেষ দুর্মূল্য ছিল না। তবু সমাজের নিম্নস্তরের লোকের খাদ্য জোগাড় করা সহজ ছিল না। খাওয়া-পরার একেবারে অভাব ছিল না বটে তবে অভিজাত সম্প্রদায়ের তুলনায় তা খুবই নিম্নস্তরের ছিল।

মোগল আমলেও সাধারণলোকের খাদ্য ছিল অতি সাধারণ। অভিজাতদের সহজপ্রাপ্য ছিল মোগলাই-খানা। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, সাধারণলোককে এখনকার মতই অখাদ্য খেয়ে কাটাতে হতো। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আটমণ চাল পাওয়া যেতো। তার মানে এই নয় যে, লোকে সচ্ছল ভাবে খেতে পেতো। তখন অত সস্তাদরে চাল কেনার পয়সাও লোকের হাতে ছিল না। কারণ বাংলার অর্থ তখন চরমভাবে শোষিত হতো দিল্লীর মসনদী শোষক কর্তৃক। শায়েস্তা খাঁর নিজস্ব দৈনিক ব্যয়ই ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

অনেক লোকসাহিত্য মধ্যযুগের রচনা। এই সব লোকসাহিত্যে সেসময়ের কিছু সামাজিক ও খাদ্যচিত্র পাওয়া যায়। সাধারণলোকের খাদ্য ভাত মাছ সংগ্রহ করাও সেসময় যে কষ্ট হতো তা পাওয়া যায় উত্তর বঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে—

মোর কালা খাইবে ভাত
কোটটে পাইম্ মুঞ এ কলার পাত
কোট্টে পাইম্ মুঞ জীয়ামাগুর মাছরে।

চট্টগ্রামের একটি লোকসঙ্গীতে আছে—

বাড়ীতে যাই ভাত কিদি খাইম্?
বেয়ানে খাই মরিচ ভত্তা
বিয়ালে কি খাইম্?

ময়মনসিংহ গীতিকায় মহুয়া কাহিনীতে ফলারের আমন্ত্রণে পাওয়া যায়—

শালি ধানের চিড়া দিয়াম আরও শবরী কলা
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু, খাইবা তিন বেলা।

সাধারণ চাষী-গৃহস্থের প্রিয়জনের ফলারের পক্ষে এই খাদ্যই যথেষ্ট ছিল তখন। অবশ্য খাওয়ার শেষে পান সুপারী চর্ব্বণ বাঙালীর খাদ্য-তালিকায় প্রাচীন কাল থেকেই আছে।

ধ্রুবতারা

ভাগবতদাস বরাট

সর্ব্ব দেশে প্রায় সকল জনের কাছেই ধ্রুবতারা পরিচিত। যুগ যুগ ধরে এই তারাটির অবস্থিতি লক্ষ্য করছে প্রত্যেকেই। তাই একে কেন্দ্র করে জনমানসে নানা কিংবদন্তী ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এককালে এর অবদান মানবসমাজে অপরিমিত ছিল।

আগে যখন বিজ্ঞানের প্রসারতা ছিল না, বিজ্ঞান যখন কম্পাসের সৃষ্টি করে নি, সেই সময় মানুষ এই ধ্রুবতারাকেই কম্পাসের কাজে লাগাত। তার কারণ, এই তারাটির সব সময়েই উত্তর দিকে অবস্থান। সুতরাং সমুদ্রপথে নাবিকরা যখন কোন দিকেই কূলের সন্ধান পেত না, তখন তাদের গমন-পথ ঠিক রাখার মানসে এই ক্ষুদ্র তারাকে লক্ষ্যে রেখে এগিয়ে যেত। আর একে জেনেই বাকী দিকগুলো চিনে ফেলত। শোনা যায় ফিনিশীয় নাবিকরা এই তারাকে সর্ব্ব প্রথম দিক-নির্ণয়ের কাজে লাগায়।

পূর্ব্বে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে গ্রীকের নাবিকরা দিক-নির্ণয় করত। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে তারা বলত cynosure, অর্থাৎ কুকুরের লেজ। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৬০৫ বছর আগে এই গ্রীসের নাবিকরা দিকনির্ণয়ের ব্যাপারে ধ্রুবতারার সাহায্য নেয়। তারা ধ্রুবতারার নাম দেয় মুকুটমণি। মোঙ্গলেরা একে বলে সোনার পেরেক। এদের ধারণা রাতের কালো আকাশটা ঘুম-পরীদের আস্তানা। সন্ধ্যা হতেই সারা আকাশে ঘুম-পরীদের দেওয়ালী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধ্রুবতারা ওদের মতে সোনার পেরেক। সারা আকাশটা ঐ পেরেকের উপর আঁটা আছে।

দিক-নির্ণয়ে কম্পাসের সামিল এই তারাকে নিয়ে হিন্দুদের পুরাণে একটি কাহিনী শোনা যায়। পুরাণে বর্ণিত উত্তানপাদ রাজার দুই রাণী ছিল। একজনের নাম সুরুচি এবং অপর জনের নাম সুমতী। সুমতীর গর্ভজাত সন্তানের নাম ধ্রুব।

রাজা ছিলেন সুরুচির অনুরক্ত। তাই অপর রাণী সুমতীর উপর তাঁর তেমন দরদ ছিল না। এমন কি পুত্র ধ্রুবর উপরও তাঁর টান ছিল না।

একদিন রাজা উত্তানপদ রাজমহিষী সুরুচিকে নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময় বালক ধ্রুব পিতার কোলে চাপার অভিপ্রায়ে হাত বাড়ান। কিন্তু বিমাতা সুরুচির কটুক্তিতে নিরস্ত হলেন। এবং পরে ক্ষুণ্ণমনে মাতা সুমতীকে সব কথা জানালেন।

মাতার উপদেশে বাল্যকালেই ধ্রুবর মনে বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয়। তিনি পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য্যের চেয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তিকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে ধরে নিলেন এবং গৃহ ছেড়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে ঈশ্বরারাধনায় রত হলেন।

শ্রীভগবানের দর্শনলাভের পর তাঁর আদেশে তিনি সংসারধর্ম্ম পালন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। বৃদ্ধকালে মৃত্যুর পর তাঁর স্বর্গবাস হয়।

আমাদের পুরাণে এও লেখা আছে যে, ঐ ধ্রুবতারাটি আর কেউ নয়, ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত রাজা ধ্রুব।

চীনবাসীদের প্রবাদে ধ্রুবতারা স্বর্গের রাজা। আকাশবক্ষের ঐ দেশটা থেকে সন্ধ্যা হলেই হাজার হাজার তারা পৃথিবীর দিকে মিটি মিটি চোখে চেয়ে থাকে,—সেই দেশ ছিল তারার দেশ। ঐ দেশ পৃথিবীর চেয়েও মনোরম। সেখানে নেই কোন শোক, নেই

তাপ, দুঃখ, কষ্ট। আর নেই পীত নদীর প্লাবনের ভয়। তাদের ধারণা ওখানের বাসিন্দারা অমর।

চীন দেশের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, চীন দেশে মাউতাউ নামে এক দেবী ছিলেন। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান, অটুট ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি অবিচল আস্থা এবং অনুপম রূপরাশিতে উত্তর চীনের রাজা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজা এই দেবীকে বিয়ে করেন। কালে ঐ রাজারাণী এক সঙ্গে মারা যান। তখন আকাশ-দেবতা তাঁদের দু'জনকে স্বর্গে নিয়ে যান। এখন তাঁদের দু'জনের আত্মা এক হয়ে সেখানে ধ্রুবতারা রূপে শোভা পাচ্ছে। আর ঐ রাজারাণী ধ্রুবতারা হয়ে আকাশবক্ষে রাজত্ব চালাচ্ছেন। আকাশের আর সব তারারা ওঁদের আজ্ঞানুবর্ত্তী প্রজা এবং পরম ভক্ত। চীনাদের ধারণা যে, পৃথিবীর লোকজন যখন গভীর রাত্রে নিদ্রা যায়, তখন ঐ অসংখ্য তারার দল জয়গান গেয়ে ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করে।

আরবদেশের লোকদের ধারণা আবার অন্য রকম। তাদের মতে ধ্রুবতারা পাপী ও দুষ্ট তারা। কে একজন বীর পুরুষকে হত্যা করেছে। বৃহৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল হল সেই বীরপুরুষের শবাধার। মৃত বীরপুরুষটি ঐ শবাধারের উপর শায়িত। আর ঐ পাপিষ্ঠ ধ্রুবতারাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাকে উত্তর দিকে হিমের ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে। উত্তর মেরুর শীতল-হিমের হাওয়ায় ঐ দুষ্ট তারার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। তাই মিটি মিটি চোখে আর সব তারার দল ঐ দুষ্টতারার কষ্ট দেখে হাসছে।

প্রবন্ধটি লিখতে লিখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আকাশ বুকে ফুটে উঠল কোটি কোটি তারা। অসংখ্য তারা হতে হাজার রকম আলোর ইসারা নেমে আসে। উত্তর দিকে চেয়ে দেখি ধ্রুবতারা ধ্রুব ও অচঞ্চল। কি গভীর একাগ্রতা নিয়েই না চেয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। আমার মাথাটা নুয়ে পড়ল। মুখ থেকে তারই উদ্দেশ্যে আপনাআপনি বেরিয়ে পড়ল কয়েকটি কথা।—হে যুগান্তকারী পথের দিশারী, আলোর উৎস, আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত একাগ্রতা নিয়ে আদর্শের সেবা করতে পারি। আমার সাধনা যেন জয়যুক্ত হয়।

বন্যেরা বনেই সুন্দর

বিভা সরকার

পাঞ্জাব Irrigation Department এর ইঞ্জিনীয়ার চৌধুরী সাহেব অলস আলস্যে আরাম-কেদারাটায় শুয়ে শুয়ে আজ স্মৃতির রোমন্থন করছিলেন। এ বাংলো ছেড়ে ও বাংলো এই তো করে বেড়াতে হয় তাঁদের। কয়দিন তো নয়—কত অভিজ্ঞতার আয়াস অধ্যবসায়ের ইতিহাসে ভরা তাঁর এই দীর্ঘ পথটি। সেসব দিনগুলি আজ তাঁর কাছে স্বপ্নের মতই মনে হয়, যখন তাঁবুতে তাঁবুতে মাঠে ঘাটে জরিপ করে করে ঘুরে বেড়াতেন। দারুণ গ্রীষ্মে এক-একদিন প্রাণ তাঁর ছটফটিয়ে উঠতো একটু ঠাণ্ডা জলের জন্য একটি ছায়া শীতল গাছের জন্য। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে কখন তা জুটতো, কখন তাও জুটতো না। তখন তিনি Bhawalpur ষ্টেটে জরিপে ব্যস্ত, নতুন নহর (canal) বার করা হবে। সেইখানেই তো তাঁর হাতেখড়ি জরিপের কাজের। মুসলমান-প্রধান দেশ। মুসলমান নবাব সেখানের শাসক। সামান্য কিছু হিন্দু যারা আছে তারা বেশির ভাগই দোকানদার ব্যবসাদার। হিন্দুরা তাই "ফেরাড়" নামে খ্যাত। "ফেরাড়" শব্দটির পেছনে দস্তুরমত অবহেলা ও অবজ্ঞা আছে ঠিক যেমনটি আছে জর্ম্মনদের মনে Jew শব্দটির উচ্চারণে। পাঞ্জাবের বৃহত্তম রাজষ্টেট এটি। উত্তরে ফিরোজপুর থেকে আরম্ভ করে সিন্ধের প্রান্ত পর্য্যন্ত এর বিস্তার। শতদ্রু, পঞ্চনদ ও সিন্ধুনদ তিনটি মিলিয়ে তিন শো মাইল এর নদী-বিস্তার বা River frontage। বালুময়, প্রায় মরুভূমি এ দেশ। সারা বছরে বৃষ্টিপাত ইঞ্চি পাঁচের বেশী হয় না। নদীগুলির দক্ষিণ পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা দক্ষিণের দিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে। সামান্যই এখানের চাষ আবাদ। কিছু অংশ বন্যাপ্লাবিত পলি-মাটিতে কিছু বা পাতকুয়ার জল তুলে পারসীয়ান হুইল বা চরখি চালিয়ে বলদ বা উটের সহায়তায়। কষ্টের চাষ আবাদ এ দেশের। এ অহল্যাভূমি বেশীর ভাগই বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে মরুর রুক্ষতা নিয়ে। এর ওপাশে বিস্তৃত স্থান জুড়ে কঠিন কাঁকর ও বালুময় ভূমি যাকে 'পাট' বলা হয়। এ জায়গাটি "হাকরা" নামে পরিচিত। সম্ভবত এক সময় এটি শতদ্রু নদীর গর্ভ ছিল। "হাকরার" দক্ষিণে চোখ ফেরালে শুধু বালু আর বালুর পাহাড়, উত্তপ্ত লু চালিয়ে বালুর ঝড় তুলে সর্বনাশা রূপ নিয়ে রাক্ষসীর মতই খাঁ খাঁ করে। দৈবাৎ পথভ্রান্ত পথিক যদি বিপথে যায় তার আর রক্ষে নেই। রাজস্থানের বিরাট মরুভূমির এইখানেই সূচনা। Minchanabad, Khanpur আর Bhawalpur এই তিনটি প্রধান সহর নিয়ে এই রাজ্য। এই শতদ্রু পোলের ওপর দিয়ে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গতায়াত। এর কাছেই বাহাওয়ালপুর রাজধানী। নবাবের বাসস্থান। খানদানী বংশ নবাবের। আব্বাসী দৌউদ পোত্রা তাঁদের গোত্র। কুলমর্যাদায় নবাবকুলে পরম কুলীন। সিন্ধুই তাঁদের আদি নিবাসভূমি। এ রাজ্যের প্রথম নবাব ছিলেন শাদিক মোহম্মদ। নাদীর শাহ যখন ১৭৩৯-এ ডেরাজাট আক্রমণ করেন তখনই তাঁকে সন্তুষ্ট করে নবাব উপাধি অর্জন করেন তিনি, তুষ্ট নাদির শাহের কাছে আর এই রাজ্য বা ষ্টেট। নবাব তৃতীয় মহম্মদ বাহাওয়াল খাঁন পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রঞ্জিত সিংহের আক্রমণভয়ে ভীত হয়ে ১৮৩৩ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় ইংরেজকে তিনি নানাভাবে উপকৃত করেন। এ ছাড়া ১৮৪৮ সালে মুলতানের দেওয়ান বিদ্রোহী মুলরাজের বিরুদ্ধাচরণের সময়েও অত্যন্ত মূল্যবান

সাহায্য দেন ইংরেজ বাহাদুরকে। ইংরাজরাজের তাই প্রিয়পাত্র এঁরা। খানদানী বংশ এঁদের, তাই আপন গৌরব রক্ষায় সদা সচেতন। সমকক্ষ ঘর তাঁদের সব সময় না পাওয়ায় তাঁদের ঘরের বেশীর ভাগ কুমারী মেয়েকেও মোগলদের অনুকরণে চিরকুমারী থাকতে হয়। এই রাজ্যেরই এক রিক্তা ভূমিতে গেরুয়া বালিয়াড়ীর প্রান্তে এক সুরক্ষিত দুর্গে আছে রাজ-অন্তপুরিকাদের নন্দনকানন। সম্পূর্ণ প্রমীলার রাজত্ব নাকি সেটি। রাজবংশের অনূঢ়া কন্যারাই শুধু নহেন উপরন্তু গত নবাবের বেগমরাও স্থান পান এইখানে। নবাব গত হলে তাঁর বহুবেগমরাও নতুন নবাবের কাছে সমস্যা বিশেষ। হারেম যদি পূর্ণ থাকে মৃত নবাবের বেগম দিয়েই, নবীন তাঁর নবীনাদের স্থান দেবেন কোথায়? পুরাতনীদের তাই সে দুর্গ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আজন্ম অসূর্য্যম্পশ্যা হয়েই তাঁদের বাকি জীবন সেখানে শেষ হয়। সেই দুর্গেই আছে তাঁদের নিজস্ব মসজিদ, সমাধিভূমি। সবই আছে সে রাজত্বে। পার্সীয়ান হুইল চালিয়ে চালিয়ে জল তুলে তুলে হয়ত সবুজের সমারোহ করে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়—অন্তঃপুরিকাদের ভ্রমণ-উদ্যান, বিলাসকুঞ্জগুলি, কিন্তু এ সবই অনুমান। কেমন করে যে কাটে সে চরম উপেক্ষিতাদের জীবনগুলি সে শুধু জানা আছে মহাকালের যাঁর রোজ-নামচায় সকলের সত্যকার সুখ-দুঃখের ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে। যাঁর কাছে কোনও আবরণই কিছু নয়। হয়ত কত মানব-মুকুলিকা অকারণে ব্যর্থ হয়ে ঝরে যায় মানুষের মিথ্যা অহমিকা মিথ্যা খেয়ালের নিরপরাধ বলি হয়ে। তবে যাই হ'ক না কেন, সুপক খেজুরের অভাব হয় না নিশ্চয়ই তাদের সে মরুদ্যানে। বসন্তও আসে তার নব পত্রপল্লবের সমারোহ নিয়ে। কোকিলও হয়ত ডাকে। বেপথু দক্ষিণে-বাতাস বাধা বন্ধহীন সে, সে কোনও রাজশাসন মানে না। দুরন্ত দুষ্টছেলের মতই সে রাজনন্দিনীদের আলিঙ্গনে বেঁধে হয়ত তাদের উতলা উন্মনা করে পালিয়ে যায়। অকারণে হয়ত বা কোনও উদ্ভিন্নযৌবনা মদির বিহ্বলতায় উন্মনা হয়ে আকাশ পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে বিরহী প্রহর কাটাতে বাধ্য হয়। অজানা ইচ্ছায় ব্যাকুল আনমনা মুহূর্ত্তগুলি একলা যাপে। আর কোনও পথ না পেয়ে নর্সীসসের মতই হয়ত বা কেউ নিজেই নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে পাগল হয়। সেসব শুদ্ধান্তচারিণী বন্দিনী রাজনন্দিনী রাজগেহিনীদের খবর বাইরের জগৎ কিছুই জানে না। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের চারপাশে কড়া পাহারা। বাইরে থেকে বাতাসও বুঝি ঢোকার আগে থমকে থামে—মত্ত মধুপও ঢুকতে ভয় পায় সে ফুলকাননে। কড়া রাজশাসন সদাই উদ্যত হয়ে আছে সজাগ জাগরণে।

জরিপ করতে করতে একবার এই দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী। দূর থেকে একটি অস্পষ্ট বিন্দু, মহাসমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র জাহাজের মতই এ মরুসাগরে দুর্গটিকে মনে হয়েছিল তাঁর। সকৌতুকে সেই দিকে দুরবীন তুলেছিলেন। চকিতে যেন যাদুর খেল ঘটে গিয়েছিল। আকাশে বালুর ঝড় উড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মতই ছুটে এসেছিলো কে জানে কোন দিক থেকে এক সশস্ত্র ঘোড়-সওয়ার। কি হিংস্র তীক্ষ্ণ তার চেহারা। তার দিকে চেয়ে নির্ভয় চৌধুরী সাহেবেরও কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা শিহরণ নেমেছিলে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে। কষ্টে দৃঢ়তা বজায় রেখে তার পানে নির্ভয় দৃষ্টি মেলে জানতে চেয়েছিলেন তার বক্তব্য। ঘোড়া থেকে নেমে সেলাম জানিয়ে সে সসম্ভ্রমেই জানিয়েছিলো আপনি সরকার বাহাদুরের লোক এ আমরা জানি, কিন্তু গোস্তাকি মাফ করবেন, ভুলেও ওদিকে তাকাবেন না। এখান থেকে সরে যান। আপনি আপনার "হদ্দার" অর্থাৎ সীমানার বাইরে এসে পড়েছেন। আজ যদি আপনাকে ইংরাজ বাহাদুরের লোক বলে না জানতুম, এতক্ষণে আপনার দেহ এইখানে লুটিয়ে পড়ত এই রুক্ষ মরুকে রক্তে রাঙা করে। সাহব বহুৎ হুঁসিয়ারী সে চলনা চাহিয়ে। ইহ হমলোগ পর হুকুম হ্যায়। হুকুম হাসিল না কর-না তো বেইমানী—বিলকুল হরামী। নবাব সাহেবকি রোটি খা রহে হৈঁ নিমকহরামী নহি করেঙ্গে। আদাকর জনাব। আপ যাইয়ে। বলে তেমনি বালুর তুফান

তুলেই সে দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল। স্তব্ধ নির্বাক হয়ে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী সাহেব, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটে উঠেছিল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে চলে গিয়েছিলেন। পথ-প্রদর্শক না নিয়ে আর কখনও সে পথে আসেন নি। এ প্রখর গ্রীষ্মের তাঁবুর বাইরেই শুতে হত তখন। এ সব দেশে তপ্ত গ্রীষ্মের দিনে ভয়-ডর মনে রাখলে কি আর চলে। সারা পঞ্জাবেই তো এই নিয়ম। গ্রীষ্মে হয় ছাদে, না হয় খোলা মাঠে বা অঙ্গনে একেবারে আকাশ চন্দ্রাতপের নীচে শোয়া ছাড়া উপায় নেই। রাজ্যের শেয়াল কুকুরগুলোও কি তেমনি ক্ষেপে ওঠে এই সময়টায়। সেবার সেই গুজরানওয়ালার শেনা বাংলোয় তাঁদের কি সর্ব্বনাশটাই না হয়ে গেল। তিনিই তো তখন S.D.O সেখানের। Exiculive এসেছিলেন তদারকের জন্য, সঙ্গে তাঁর ছিলেন আর একজন S.D.O খোসলা সাহেব। একটা নহরকে বাড়ানো হচ্ছিল তখন। পুরাণো ব্রীজটি ফেলে নতুন ব্রীজ তৈরী হবে। শেনায় তাঁর নিজস্ব বাংলো আর গেষ্ট-হাউস ছিলো গায়ে গায়ে। খেয়ে দেয়ে খোস গল্প করতে করতে শুয়েছিলেন তাঁরা তিন জনে। শ্রীমতী আর ছেলে মেয়েরা ছিল না তখন কাছে। আজও সে দুর্ঘটনা এক বিভীষিকা হয়ে আছে তাঁদের মনে। এই রাম চৌতরায় কিন্তু বাড়ীর ভেতর বিরাট অঙ্গন উঁচু পাঁচিলে দিব্য ঘেরা। শুধু কি তাই, আবার সেই উঠোনের মধ্যেও দেওয়ালের ধারে ধারে চামেলি মতিয়ার সমারোহ। পশ্চিমের চামেলি আর বাংলার কামিনী আহা হা! সুগন্ধে ভরে তোলে মধুযামিনী। এ গন্ধ উগ্র নয় এর সুবাস সত্যই মন-বিমোহন। আছি অথচ নেই! ধরা দিয়েও যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকার ইচ্ছা! বাসন্তি চামেলিতে তো এরই মধ্যে কিছু কিছু ফুল এসে গেছে। উঠোনের দরজা দুটো বন্ধ করে দাও, বাস একেবারে সুরক্ষিত দুর্গ। চাকরদের কোয়ার্টারও অঙ্গনের বাইরে দেওয়ালের গায়ে। ডাকলেই যাতে উত্তর মেলে। যিনি দেওয়াল তুলিয়েছিলেন সবদিকে লক্ষ্য ছিল তাঁর। এক কোণায় একটি হ্যাণ্ডপাম্পও বসানো। জল তোল আর ঢেলে ঢেলে কর উঠোন ঠাণ্ডা। তবে যতই গাগরী বারি ঢাল না কেন, এ মাটি পিছল করা বড়ই কঠিন! শুষ্ক তৃষিত মাটি সব জল শুষে নেবে মরুর তৃষ্ণা নিয়ে। পশ্চিম কোণায় চমৎকার একটি ঝাঁকড়া আমগাছ ছায়া-শীতল করে রেখেছে অঙ্গনকে। অথচ যথেষ্ট খোলা জায়গাও রয়েছে রাতের শোয়া-বসার জন্য। আমগাছের তলাটি সুন্দর বাঁধানো বেদীতে ঘেরা। খুবই পছন্দ হবে শ্রীমতীর এ জায়গাটি সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। মনে মনে গৃহিণীর উৎফুল্লতায় কল্পনায় তিনিও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। বড় নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন যাপন করতে হয় তাঁদের। এক এক সময় নিজেকে অসামাজিক হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। একেবারেই গ্রাম্য পরিবেশ। হক না বাগানবাড়ী, সে কি রোজ ভাল লাগে। গৃহিণী তায় খাস কলকাতার মেয়ে। কলের জল আর ইলেকট্রিক বাতির শোক তাঁর আজও যায়নি। আর সত্যি উৎপাত কি কম। এক একটা বাংলোতে সাপ-বিছের রাজত্বি। বাংলোয় ঢুকে স্কাই-লাইটটা খুলেছেন হয়ত ঝপাৎ করে মাথায় এসে পড়ল একটা সাপ। ভাগ্যে মাথায় তখনো ছিলো সোলার হ্যাট, ছিটকে দূরে পড়ে গেল। তিনিও সভয়ে সরে এলেন। এমনতো হামেশাই ঘটছে। বাংলোগুলো তো বন্ধই থাকে। কেউ এলে গেলেই না ঝকঝকে তকতকে করে খুলে দেয়—পরিষ্কার করে রাখলে হবে কি, সর্প-মহারাজেরা যে—কখন কোনখানে সে কে বলতে পারে। বিশেষ করে ম্যাট্রেস আর সতরঞ্চর তলা বা কোণা বড়ই খারাপ জায়গা। যখন বাংলোয় তিনি যান ম্যাট্রেস আদপেই বিছতে দেন না। বাংলোয় রাখা বিরাট বিরাট ছবির পেছনগুলোও বড় সর্বনেশে জায়গা। কে আর নাড়চে ঝাড়ছে—বড় জোর কেউ এলে গেলে ঝাড়নে সামনের ধুলোটুকু মুছে দেওয়া। কোনও বাংলোয় আবার বইয়ের বোঝা থাকে দেওয়াল আল-মারীতে। মানুষের সভাবতঃই ইচ্ছা হয় টেনে নিয়ে একটু নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাটা কাটাতে কিন্তু বড় খারাপ জায়গা ওসব। পদে পদে এমনি শত বিপদ নিয়ে বড় সাবধানে চলতে হয় তাঁদের। মৃত্যুর অবারিত দ্বার যেন চতুর্দিকে

খোলা। সেবার সেই গ্যাস্হেল বাংলোয় কি বাঁচান বেঁচে গিয়েছিলো ছেলেটা। বাংলোয় পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। দেরী করে বেরিয়েছিলেন। রাস্তাও মাঝখানে খারাপ ছিল। তখন তো তাঁর মোটর হয়নি। তখন ঐ টমটমখানাই ভরসা। দশ মাইল পথ ঘণ্টা তিনেক লেগেছিল পৌঁছাতে। টমটমখানা কি কম দিনের সঙ্গী! ও আর শ্রীমতী বলতে গেলে দুয়েরই আগমন একই সঙ্গে তাঁর জীবনে। কত সখ করে মখ-মলের গদীতে ভাল কাঠে অনেক যত্নে অনেক খরচ করে করিয়ে ছিলেন ঐ টমটমখানা। বড় মায়া ওটায় তাঁর, তাই প্রয়োজন শেষ হলেও ওটাকে আজও পরম যত্নে টেনে বেড়ান তিনি। ছেলেমেয়েরা গৃহিণী কেউই এটা ঠিক বোঝে না, হাসেন—উপহাস করেন তাঁকে এ নিয়ে। রামরতন আর টীপুসুলতান কুকুরটা তো তারও আগের। টীপু আর বাঁচবে না বেশী দিন বয়স তো আর কম দিন হল না। বাংলোয় পৌঁছে ছেলেটা আধো-আঁধারে বাথ-রুমে ঢুকেই সাপ সাপ চিৎকারে পালিয়ে এসেছিলো। গৃহিণী বিব্রত ছিলেন তাঁর আচার-বিচার রক্ষায় অর্থাৎ ওদিকের বারান্দা ধুইয়ে ছোট প্যানট্রি পরিষ্কার করিয়ে রান্নার ব্যবস্থায়। ছত্রিশ জাতের ব্যবহৃত অপবিত্র বাবুর্চি-খানায় রান্নার আহারে তিনি নারাজ। গৃহিণী গৃহম্ উচ্চতে মেনে নিতে হয়েছে তাই হোমরুল। ছেলেটার চিৎকারে ছুটে গিয়েছিলেন লণ্ঠন আর টর্চ হাতে। হ্যাসাগগুলো জ্বালান হয়ে ওঠেনি তখনও। চিলমচি জগ বাথটব স্নানের পিঁড়ি সব সরিয়ে দেখা হল—কোথায় কি! একটা ঝরা পাতাও পড়ে নেই। নিশ্চয়ই নর্দমা দিয়ে পালিয়েছে রায় দিল কেউ বা একবার দেখা জিনিষ বারবার দেখছি। এ কোণা ও কোণা টর্চ ফেলছি হঠাৎ শ্রীমতী বললেন—দেখতো কমোডের পেছনের পায়ে কে পাড়ের ফালি বেঁধেছে?

পাড়ের ফালি?—এ বাংলোয় বহুদিন মনুষ্য পদচিহ্ন পড়েনি, সেখানে আবার পাড়ের ফালি? ভাল করে টর্চ ফেলে দেখে আর বুঝতে বাকি রইল না। কি সহজাত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এই সাপেদের। আত্মরক্ষার চেষ্টায় এরা কি দুর্বার; সাধ্য কার ধরে ওকে ওখানে!

একবার তো নয় এ তিনি বারবার দেখেছেন। সেবার শ্রীমতীর সঙ্গেই কি কম কৌতুক করেছিল একটা সাপ। দিব্য চিক ফেলে রাঁধাবাড়া সমাপন করে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় গরম বারান্দাটিতে তিনি খেতে বসে-ছিলেন। হঠাৎ কানে চিৎকার এল—রামরতন সাপ।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম মনে করে আপন মনে পায়ে কম্বলখানা চাপা দিয়ে নভেলখানায় ডুব দিলুম। আবার ডাক পড়ল—না আর শুয়ে থাকা চলে না। পায়ে পায়ে দোর-গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াই। চতুর্দিকে আলো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! উপহাস করে বলি—রামরতনের চেলা হলে নাকি?—বেটা রামরতন আফিংখোর। দারুণ রোষে ফেটে পড়লেন শ্রীমতী! অর্দ্ধভুক্ত আহার ছেড়ে উঠে পড়লেন। হাত তাঁর আগেই থেমে গিয়েছিল। তুষ্ট করতে তোষামোদের ভঙ্গিতে বলি, নাও খেয়ে নাও! রাগ কেন? আমি তো দাঁড়িয়ে আছি।

জবাব দিলেন—দাঁড়াও না খানিক চুপ করে ঐ মাংসের বাটির পানে চেয়ে, আপনিই সন্দেহভঞ্জন হবে। একবার নয় বারবার দুবার দেখেছি, আধহাত গলা বাড়িয়ে পেছন থেকে এগিয়ে আসছিলো—টিকটিকি গিরগিটি হলে কি পা দেখা যেত না। সত্যই তো অকাট্য যুক্তি। নীরবে দাঁড়িয়ে আছি, পাঁচ মিনিট যেন পাঁচ ঘণ্টা মনে হচ্ছে। বড় জমেছিল নভেলটা, শ্রীমতী সব দিলেন মাটি করে। সামনে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওমা! তাই তো দিব্য সর্পরাজ ধীরে ধীরে মাংসের বাটির দিকে গলা বাড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি চাকরদের ডাকি। কিন্তু আবার সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কণ্ঠস্বর শুনেই বেমালুম আত্মগোপন। লোকজনেরা এমন পরিষ্কার বারান্দায় এত আলোয় কর্ত্তা-গৃহিণীর সর্প-ভীতিতে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করেছিলো। যখন দেখল, কোথায় কি! সকৌতুকে বারবার তাকাচ্ছিল। ওদের কাছে মান রাখা দায় হল। এদিক ওদিক চারিদিক তোলপাড়—সাপ না থাক তার চলে যাওয়ার দাগটুকু অন্তত থাকবে। নিশ্চয়ই সে টিকটিকির মত দেওয়াল-বিহারী জীব নয়। কিন্তু কোথায় কি? এ যে ভৌতিক ব্যাপার!

গৃহিণীর মুখে সকৌতুক হাসি—কেমন জব্দ! বারবার চিকটার আলো ফেলি, ঝাড়াই কোথায় কি? সব পরিষ্কার। কিন্তু ওটা কি?--চিকের তলার দিকে কয়েকটা সরকাটি নেই আর সেই ফাঁকটুকুর মধ্যে লম্বা দড়ির মত ওটা কি? সবিস্ময়ে টর্চ ফেললুম—চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো পলাতকের। আপন জন্যই করল বিশ্বাসঘাতকতা। আত্মগোপনের অভাবনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেছি, কিন্তু না; তাই বলে সসর্পে চ গৃহে বাস চলে না।

বীর হনুমানের আস্ফালনে ক্ষুধার্ত্ত জীবটাকে শেষ করে দিলে চোখের সামনে। মনে জাগল কেমন এক অপরাধবোধ। চেয়ে দেখি গিন্নীর চোখে জল; বলেন আহা! অভুক্ত ক্ষিদের জ্বালায় খেতে এসেছিলো! ওতো কারও ক্ষতি করেনি; কিন্তু একি অন্যায়।" এ যে আমারই মনের প্রতিধ্বনি! মুখে বলি, তাই বলে কি পুষবে নাকি? তুমি না মার, ও যে তোমায় মারবে। শুধু মনে হতে লাগলো মানুষও কি এদের চেয়ে কম হিংস্র, কম নিষ্ঠুর!

আজও তাঁরা ভাল করে জানেন না সেদিন সেই সেনা বাংলোর জীবন্ত অভিসম্পাতের মত বিভীষিকাময় জীবটা শেয়াল ছিলো কি কুকুর। দু দুটো মানুষকে শেষ করে চলে গিয়েছিলো শয়তানের পার্শ্বচরের মতই। আহা, তরুণ খোসলা সবে বিয়ে করেছিলেন। বুড়ো মা বাপের একমাত্র সন্তান বহু দুঃখকষ্টে একমাত্র পুত্রের পেছনে সর্বস্ব খরচ করে অনেক আশায় ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন। বুড়ো বাপের মাথা চাপড়ে কান্না যে আজও তিনি ভুলতে পারেন নি। বউটা যেন স্তব্ধ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো আকস্মিক আঘাতের চাপে খোসলার বাপ তাঁর দুহাত জড়িয়ে ডুকরে উঠেছিলেন, "চৌধুরী, এ আমারই অহংকারের সাজা দিলেন প্রভু; মধ্যবিত্ত জমিদার আমরা। খেতের মাটি রুটি যোগাতো, কোনও কষ্ট তো ছিল না। মনে লোভ হল চৌধুরী; নিজে পারিনি। সেই চাষ আবাদ নিয়ে চাষা হয়েই রইলাম কিন্তু ছেলে তো আছে। তাকে দিয়েই মেটাবো সব আকাঙ্খা! আত্মীয়স্বজন পর হয়ে গেল, জমি-জায়গা সব বিকিয়ে গেল—আমি যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে জীবনের সর্বস্ব পণ রাখলুম। আমার সে স্বপ্নসাধ ফলে-ফুলে ভরে উঠেছিলো চৌধুরী! ছেলে আমার কুলকে উজ্জ্বল করে আমার বুক গর্বে তৃপ্তিতে যে ভরিয়ে দিয়েছিলো। মনে হত পৃথিবীতে এত সুখও আছে! আমার এতই সৌভাগ্য! চৌধুরী! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলুম, একেবারে ফুরিয়ে গেলুম—এখন আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো বলে দাও! কি সান্ত্বনা দেব ঐ মেয়েটাকে? নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি চৌধুরী—বুকের ভেতর যেন মোচড় দিয়ে উঠেছে—কষ্টে আত্মসংবরণ করে নির্মম কর্ত্তব্য তাঁরা সমাধান করেছিলেন। চেষ্টার কি ত্রুটি হয়েছিলো—মাঝরাতে যখন হঠাৎ চেঁচামেচিতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল, আচমকা খাট থেকে নেমেই দেখলাম একটা কি জন্তু চকিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন অপর দুজনার কাতর আর্ত্তনাদ "চৌধুরী; চেয়ে দেখ পাগলা শেয়াল না কুকুর কিসে আমাদের সর্বনাশ করে দিয়ে গেল!"

পলক না ফেলতে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল জন্তুটা, আজও যেন বিস্ময় মনে হয়। এ যেন তাঁদের মৃত্যু তাঁদের নিয়তি এমনি করে পাগলা জন্তুর রূপ ধরে ছুটে এসেছিলো। হাঁকডাকে উঠে পড়েছিল হাতা (compound). হাজাগ লণ্ঠনগুলো জ্বালা হয়ে গিয়ে-ছিলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। হাতার মধ্যেই ছিলো সরকারি ছোট হাসপাতাল আর তার ডাক্তার সরণসিং। ছুটে এসেছিলেন তিনি কম্পাউণ্ডার আর ঔষধপত্র নিয়ে। ধুয়ে মুছে কষ্টিক দিয়ে পুড়িয়ে ক্ষতস্থানগুলি যথাসাধ্য antiseptic করতে চেষ্টা করেছিলেন। ঘুমের ওষুধ দিতেও ভোলেন নি কিন্তু তাঁদের জগতে সুখনিদ্রা চিরদিনের মতই অন্তর্হিত হয়েছিলো সেইক্ষণ থেকে। কত কত বিনিদ্র চিন্তাগ্রস্ত রাত এর পর তাঁরা কাটিয়ে-

ছিলেন সে তাঁরাই জানেন। মহাকাল যাঁর খাতায় দিন-রাত্রির সমস্ত ইতিহাসই লেখা হয়ে চলেছে! সকাল-বেলায় অভিজ্ঞজনেরা পায়ের দাগ দেখে পাগলা শেয়াল বলেই রায় দিয়েছিলো জন্তটাকে। দুজনেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন কসৌলি। কসৌলি চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হয়ে গেছে। সেখানের চিকিৎসা অর্থ বা চেষ্টা কোনটারই কার্পণ্য হয়নি তাঁদের বেলায়। চিকিৎসা শেষে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন যে যার কর্মস্থলে। কিছু-দিন পর থেকেই খোসলা সাহেবের শরীর খারাপ হতে আরম্ভ হয়। অল্প অল্প জ্বর হতে থাকে। তাঁরই কামড় বেশী হয়েছিলো। প্রথম আক্রমণটা যে তাঁর ওপরেই ঘটেছিলো। তাঁর পাশে ছিলেন ক্রোড্ সাহেব খোসলার চেঁচামিচিতে প্রথম ঘুম তাঁরই ভাঙে। সাহায্যের জন্য ছুটে যেতেই তিনিও কামড় খান। কে জানে কোন পুণ্যে তিনি আশ্চর্য্যরকম বেঁচে গিয়েছিলেন। আতঙ্কিত চিৎকারে হতচকিত হয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো জানোয়ারটা। শুধু তিনিই ন'ন, সবাই একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলো বৈ কি ব্যাপারটায়। একেই বোধহয় বলে রাখে কেষ্ট মারে কে!

সেই থেকেই তো গৃহিণী প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন আর খোলামেলায় অমন করে শোয়া চলবে না। শুধুই কি গৃহিণী—মনের সঙ্গোপনে তাঁরও কি আতঙ্ক বাসা বাঁধেনি অমন জলজ্যান্ত নওজওয়ান দু দুটো মানুষকে শেষ হয়ে যেতে দেখে। কসৌলি থেকে ফিরে অবধি কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন খোসলা সাহেব। কিসের চিন্তায় অহরহ যেন ম্রিয়মান হয়ে থাকতেন। মেঘলা দিনের মত থমথমে হয়েছিলেন—সেই সদা-হাস্যময় বলিষ্ঠ মানুষটার কি চেহারা! কি স্বাস্থ্য, যেন কন্দর্পকান্তি। এই ঘটনার কিছুদিনের পর একদিন স্নানের ঘর থেকে চিৎকার করতে করতে খোসলা বেরিয়ে এসেছিলেন। স্ত্রীর অসহায় ডাকাডাকিতে লোকজনেরা এসে পড়ে তাঁকে ধরে বসিয়ে দিয়েছিলো ইজিচেয়ারে। তাদের অভিজ্ঞ দৃষ্টি বুঝতে ভুল করেনি, পাগলা জন্তু কামড়ের শেষ সর্বনাশা লক্ষণ জলাতঙ্ক আরম্ভ হয়ে গেছে তাঁর। অসুরের শক্তি পেয়েছিলেন যেন, জওয়ান জওয়ান কয়জনে ধরে রাখতে না পেরে শেষে বেঁধে রাখতে বাধ্য হয়েছিলো। এরপর আর চ'ব্বিশ ঘণ্টা মাত্র ছিলেন।

খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা। নিরুপায় অসহায়তার মধ্যে সবশেষ করে বেদনামূর্চ্ছিত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। সব ফেলে ছড়িয়ে সদ্য বিধবা পুত্রবধূকে বুকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিলেন বুড়ো বাপ সর্বহারার হাহাকার বুকে চেপে। কয়দিন ভাল করে অন্নজল রোচেনি কার মুখে! বিশ্বের সমস্ত শূন্যতা সমস্ত বৈরাগ্য যেন তাঁদের ঘিরে ধরতে চেয়েছিলো। এক অব্যক্ত বেদনায় থমথম করে উঠেছিল চারিধার! হাওয়ায় ভেসে মন্দখবর যায়। গোপন করার চেষ্টা সত্বেও এ সংবাদ ক্রোড্ সাহেবের কানে পৌঁছেছিল। নির্বান্ধব পুরীতে তিনি তাঁর খান-সামাটাকেই শোনাতে বাধ্য হতেন সুখ-দুঃখের কথা মনের বোঝা লাঘবের জন্য। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবলই বলতেন—"খোসলা সাহব চলা গিয়া। মৈ ভি নহী বচুঙ্গা' একা একা চাপতে পারতেন না মনের দুর্ভাবনা। কেবল মদ খেয়ে যেতেন সারারাত ধরে। মায়ের মমতা নিয়েই খানসামা বুড়ো এসে বোঝাতো, সকাতরে বলত-আওর মত পিও সাহেব, অব শো যাও। আর খেও না সাহেব এবার ঘুমাও। ইসতরে সে আপ বচো গে কয়দিন। (এমন করলে বাঁচবে কয়দিন)।" শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, দুহাতে তাঁর হাত জড়িয়ে বলেছিলেন "বিদায় চৌধুরী! তোমার সঙ্গে অনেক আনন্দময় দিন কাটিয়ে গেছি; এই পৃথিবীকে আমি ভালবেসেছি। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র আমায় মুগ্ধ করেছিলো—নানা সম্পদের অধিকারি তোমার এ দেশ; তেমনি বিচিত্র এ দেশের মানুষরা। বিজাতির সকৌতুক সদম্ভ মন নিয়ে এখানে আমি এসেছিলুম। যাবার সময় একে আমি শ্রদ্ধায় প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের আমি ভালবেসে ফেলেছি চৌধুরী! ভগবান

তোমাদের মঙ্গল করুন!" চোখে জল চকচক করে উঠেছিলো। অমন দুর্দান্ত ডানপিঠে নির্ভীক মানুষটা অনাগত মৃত্যুর ভাবনায় যেন স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিলো। উৎসাহ দিয়ে সাহস দিয়ে তাঁকে উৎফুল্ল করতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি,কিন্তু ফল বড় কিছু হয়নি। খোসলার মৃত্যুসংবাদ কেমন যেন মন ভেঙে দিয়েছিলো তাঁর। আমিও বাঁচব না! এই হয়েছিলো তাঁর অহর্নিশির চিন্তা।

সন্ধ্যার দিকে জ্বর আরম্ভ হওয়ায় শিশুর মতই অসহায় হয়ে তিনি তাঁর আদরের খানসামাকে সেই বান্ধববর্জিত নিঃসঙ্গঘরে ডেকে বলেছিলেন" দেখো মহম্মদ জান! ম্যায় নহীঁ বচুঙ্গা। অব মৈ ঘর যানা চাহতা হুঁ!

"তাই যাও সাহেব! তোমার মন ভাল নেই। মুল্লুকে তোমার কত বড় বড় ডাক্তার কত নতুন চিকিৎসা। তুমি আবার ভাল হয়ে ফিরে এস সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে—খোদাতালার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই! তোমার সেবায় আমি বড় সুখে ছিলুম সাহেব, আবার তোমাদের খিদমত করব! খোদা আপকা ভলা করে!

বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন সাহেব সেই বিদেশী খানসামার স্নেহ শ্রদ্ধায়, সহানুভূতিতে। এ পরবাসে তাঁর স্পর্শকাতর মন বুঝিবা একান্ত স্নেহবুভুক্ষ হয়ে পড়েছিলো। তাই সেদিন সে নিঃসঙ্গ রাতে পাণ্ডববর্জিত এই দেশে, দেশ কাল পাত্র ভুলে—ভুলে পদমর্য্যাদার বালাই, এক স্নেহকাতর মন আর এক স্নেহময় প্রাণের দরদভরা স্পর্শে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। ঘুচে গিয়েছিলো সাদা কালোর ব্যবধান, দুরত্ব প্রভুভৃত্যের। এ অবশ্য সবই শোনা কথা খানসামাটার মুখে। সাহেবের মৃত্যু সংবাদে সত্যই সে কটা দিন অনাথের মতই কেঁদে বেড়িয়েছিলো। গেষ্টহাউসের চৌকিদারের খালি পদটায় তিনিই বিলেত যাবার আগে বহাল করে দিয়ে গিয়েছিলেন ওকে।

যতই দুর্ঘটনার ঝড়ঝাপটা এসে থাক বড় সুন্দর জায়গা ছিলো কিন্তু এই গুজরাণওয়ালার শেনা জায়গাটি। স্টেশন থেকে যাতায়াতে বড় অসুবিধে ছিল কিন্তু। জনমানবহীন পাণ্ডববর্জিত 'টপা' ষ্টেশনে নেমে বেশ কয়েক মাইল বালীয়াড়ী ভেঙে তবে শস্যশ্যামলা প্রান্তর পড়ত। হয় ঘোড়ায় চড়ে, নয় রথে চড়ে পার হতে হত এই বালুময় প্রান্তরটুকু। তার পরই দিগন্তবিস্তারী হরিৎ-শস্যক্ষেত। নির্ভয়ে হয়ত হরিণীরা চরে বেড়াচ্ছে—গাড়ীর শব্দে চোখ তুলে মানুষের গন্ধ পেয়ে খাওয়া ভুলে ছুট দেয়—অপূর্ব সে ছবি! সকালের সোনা রোদ তাদের দেহে লুটিয়ে পড়ে রচনা করে এক রূপমায়া! মানুষ সত্যিই নিষ্ঠুর, সত্যই বেদরদী নইলে এমন ভুবনমোহন রূপ দেখেও তার হিংসাপ্রবৃত্তি জাগে। এদের মারতে ইচ্ছে হয়। কি জানি কেন, নিরীহ জীব বা পাখি-শিকারে চৌধুরী সাহেবের হাত উঠতে চায় না। কেমন যেন কাপুরুষতা বলেই তাঁর মনে হয়। পাঞ্জাবের রথ বড় সুন্দর। কড়ির মালায় রঙিন পুঁতিতে রঙিন কাপড়ে ঢাকা যেন চলন্ত ছবিখানি। তেমনি সতেজ সুন্দর বলদ জোড়া। তারাও সাজানো ঘণ্টায় কড়ির মালায়। শুধুই কি শিশুদের—সে যে বড়দেরও নয়নলোভন, মন কেড়ে নেয়।

বড় কষ্ট হয়েছিলো সেবার গ্রীষ্মের সময় কলকাতা থেকে ফেরার পথে ছেলেমেয়েদের। রায়পিণ্ডে গাড়ী বদল করে আসতে হত। ট্রেন পৌঁছাতও বড় অসময়ে। ষ্টেশনই বা কি। শূন্য ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝখানে কয়েকটি ঘর আর একটা নিরালা প্ল্যাটফর্ম। তেমন গাছপালাও নেই, কাজেই সকাল ১০টায় পৌঁছে সেখানের বিশ্রাম-ঘরে সারাদিন কাটানো সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কয়দিনের ট্রেনযাত্রার পর ভাবতেই পারা যায় না। বেরিয়ে পড়েও বড় ভুল করেছিলেন। বড় কষ্ট হয়েছিলো—ছেলেমেয়েগুলো আধমরা হয়ে গিয়েছিলো। কয়দিন লেগেছিল সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। কিন্তু বাংলোটির মনোরম পরিবেশ যত্রতত্র ময়ূরের নাচানাচি আর বাঁদরের লাফালাফি তাদের পথকষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিলো যেন যাদুর স্পর্শে।

বড় শিকারপ্রিয় ছিলেন এই ক্রোড্ সাহেব। সময়ে

অসময়ে ছুটে আসতেন শিকারের লোভে। হরিণের পালের লুকোচুরি সবুজ ক্ষেতের বুকে সে এক বিচিত্র শোভা। নিরীহ নীল গাইয়ের পাল। তারা কিন্তু হরিণের পালের মত এমন নয়ন-মনোহর নয় বরং ঠিক তার বিপরীত। এদের মত চাষীর শত্রু বুঝি আর নেই! কচি কচি গমের হরিৎ-শোভায় চোখ জুড়িয়ে যায়। আকাশে বাতাসে কেমন এক নতুন কচি গমের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। সেদিকে তাকালে মন শান্ত হয়। আকাশ দিগন্তের এ অপূর্ব মিলনমহিমা মনকে টেনে নিয়ে যায় মাটি ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে। মুগ্ধ মন ঘর ভোলে! ক্ষণিকের জন্ম মাটির বন্ধন ভোলে! ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না এমন নবদূর্বাদলশ্যাম শস্যভূমি ছেড়ে। তবুও এমন মোহন দিনেও কি চাষীর নিস্তার আছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয় হরিণের পালের হাত থেকে নীল গাইয়ের হাত থেকে তাদের এই বহু যত্ন-সালিত শিশু-চারাগুলিকে বাঁচাতে। নীলগাই অর্থাৎ গরু-যাতা যে—তাই হিন্দুর অবধ্য—অবধ্য মুসলমানেরও হিন্দু ভাইদের ইচ্ছায়। শিকারীর খোঁজ পেলে কিন্তু, হরিণ-শিকারে চাষীরাই সমাদর করে ডেকে নিয়ে যায়, সন্ধান বলে দেয় ওদের বাসস্থানের। বড় জমিদারদের তো নিজেদেরই বন্দুক রাইফেল আছে। রাইফেল ছাড়া অসুবিধা হয় মারতে। সব সময়েই যে এক গুলিতে মরে তাও নয়। আহত অবস্থাতেও বেশ কিছু দূর ছুটে যায়। এদিকের হরিণগুলো Black Buck বা কৃষ্ণসার মৃগ। পুরুষ হরিণটির মাথায় দুটি সূচালো মুখ পেঁচানো পেঁচানো লম্বা সিং থাকে। সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ হয় এর অগ্রভাগটি। মাথাটি ২৩ থেকে ২৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হতে দেখা যায়। প্রতিটি পালে একটি করেই কুরঙ্গ থাকে। সে যখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় সত্যই সে মৃগরাজ। গৃহপতির মর্য্যাদা তার সর্ব অঙ্গে। এক একটি পালে হরিণী ও বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে সংখ্যায় বড় কম থাকে না এরা। পুরুষ হরিণটির পিঠের রং কালচে, বুক পেটের দিক সাদা। হরিণীদের রং কিন্তু বাদামী আর তাদেরর বুক ও পেট সাদা। শৈশবে হরিণ-হরিণীর রঙে কোনও তফাৎ নেই। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ হরিণের রং বদলায়, শিং গজায়। হরিণটি কিন্তু সাধারণত তত সজাগ নয় যেমন সজাগ হরিণীরা। সামান্য মাত্র শত্রুর আভাসেই পালকে পাল সচকিত হয়ে তারা বেগে ছুট দেয়। পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু হরিণীরাই। দলপতি থাকে সবার পেছনেই। সে যেন তার বলিষ্ঠ পুরুষকার দিয়ে সকলকে আড়ালে রাখতে চায় সব ঝড়-ঝাপটায় বুক পেতে দিয়ে। সূর্য্যোদয়ের আগেই হানা দিলে ভাল হয় এদের আস্তানায়—তখন মারবার সুযোগ অনেক বেশী পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এরা আস্তানা ছেড়ে ক্ষেতের পথে পা বাড়ায়। হরিৎ-শস্যসমুদ্রে হারিয়ে যায়। নীলাকাশের বুকে দিগন্তবিস্তারী হরিৎসমুদ্রে বাতাসের লহরী কাঁপে—যেন কোন বনলক্ষ্মী চঞ্চল অঞ্চল বেপথু হাওয়ায় উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে!

ক্ষিপ্রগতি কুরঙ্গিনীদের পেছু নেওয়া সহজসাধ্য নয়। সামান্যতম শব্দেও তারা সন্দেহে সচকিত হয়ে সহজাত সাবধানতায় চোখের পলকে দূরে মিলিয়ে যায়। অভিজ্ঞ-জনেরা তাই এদের আস্তানা ছাড়ার আগেই অতি প্রত্যুষে অপ্রত্যাশিতে শিকারীর নিঃশব্দ পায়ে এসে চরম আঘাত হানেন।

সেবার সেই শেনাতেই তো নহরের স্রোতে ভাস-পালায় জড়িয়ে ভেসে এল একটা হরিণের বাচ্চা। চরখিতে (Persian wheel) আটকে অসহায়ভাবে পড়েছিলো। মালী গিয়েছিলো ভোরবেলা চরখি ঠিক চলছে না কেন দেখতে। পার্সীয়ান হুইল জলের স্রোতে সুন্দর চলে আর এই চরখি চলেই তো নহরের জলে সরস করে রাখে হাতার চারিধার। মালী সে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এসে হাজির। ছেলেরা সেটাকে ছাড়লো না—হৈ হৈ হল্লোড় আরম্ভ করলে। শ্রীমতী তাকে অপত্যস্নেহে বুকে তুলে নিলেন। ছোট্টশিশু জলে ভিজে ভয় পেয়ে প্রায় আধমরা অবস্থা। আদর করে তার নাম দেওয়া হল 'মোতি'। মুক্তার মতই টলটলে তার দুই চোখে বনের মায়া। শিশু মোতি দেখতে দেখতে কৈশোর পেরিয়ে যুবক হল—হয়ে উঠলো পাকা শয়তান। জাত-

ধর্ম যাবে কোথায়! দড়িতে আর বশ মানলো না, সরু লোহার চেনে বাঁধতে হল তাকে। ভাল মন্দ খেয়ে খেয়ে সে আর তখন মৃগরাজ না গুণ্ডারাজ। সরু ছুঁচলো দুই শিং গজালো। শ্যামকান্তি রূপবান যুবক হয়ে উঠলো সে। অসম্ভব হয়ে উঠলো তাকে সামলানো। শেকল ছিঁড়ে একে ওকে গুঁতিয়ে, খুনখারাপী করে আসে। বড় সাহেবের গৃহিণী পুত্রের পেয়ারের হরিণ খাতিরে কেউ কিছু বলে না। মাথার শিংএ লাট্টু পরাণ হল।

যদি বা শেকল ছিঁড়ে গুঁতোয় আঘাত মারাত্মক হবে না। মোতিকে ত্যাগ করা তখন কষ্টকর, বড় মায়া পড়ে গেছে যে!

এততেও নিস্তার নেই। এর মধ্যে একদিন ভোরবেলা শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে। কখন শিং এর একটা লাট্টু খুলে চৌকিদারের ছেলেটার উরু এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। রক্তাক্ত ছেলেকে নিয়ে সকালবেলা চৌকিদার এসে হাজির। মহামুস্কিল ব্যাপার। তক্ষুণি ডাক্তার দিয়ে যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিন্ত। নিত্য নতুন তার উৎপাত আর সহ্য হল না। বিব্রত হয়ে দিলুম সেটাকে পাঠিয়ে লাহোরের চিড়িয়াখানায়। মুখ ভার করে ফিরল কদিন ছেলে-মেয়েরা। আমাদেরও মন কেমন করত বৈকি। কিন্তু উপায় কি!

মাথার শিংয়ে লাট্টু পরা যুবক মোতি নতুন সঙ্গিনীদের নিয়ে দলপতি সেজে মনের আনন্দেই থাকে। যখনই লাহোরে আমরা যাই তাকে দেখে আসি। গোড়ার দিকে বেটা মোতি ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে আসতো, চিনতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে হাত চাটতো। আশপাশের দর্শকরা দেখে আনন্দ পেতেন, প্রশ্ন করতেন। নতুন করে মায়া জাগতো, মন কেমন করত ফেলে আসতে। বছরখানেক পরে আর মোতিকে চিনতে পারা যায় না—আলাদা করা যায় না। মোতি ডাকে আর কেউ ছুটেও আসে না। সব বন্ধন, সব স্মৃতি ধুয়ে মুছে সে শেষ করে ফেললে। মৃগ-মৃগীর ঝাঁকে মোতি আমাদের চিরদিনের মত মনের সুখেই হারিয়ে গেল!

রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী

দেবনাথ দাঁ

কবিগুরুর সৃষ্টিকল্পনার অসামান্য দীপ্তি সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যের অন্তর্লীন ভাববস্তুর ক্ষেত্রে যেমন, তার বহিরঙ্গ বাণীমূর্তির ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি লোকোত্তর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শিল্পবস্তুর নামকরণগুলিই বা কী সুন্দর—কী অভাবনীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত। তিনটি গল্প একত্রে স্থানলাভ করেছে বলেই তিনি তিনসঙ্গীর নাম তিনসঙ্গী রাখেন নি, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি আরও গভীর। কী অন্তরঙ্গ ভাববস্তু, কী বক্তব্যের উপস্থাপনা, কী বহিরঙ্গ ভাষানির্মিতিতে আলোচ্য গল্প তিনটির মধ্যে অখণ্ড ঐক্য বর্তমান।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে ছিল পল্লীবাংলার সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন সুখদুঃখের কথা। কিন্তু তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা সহরে লালিত, শিক্ষার আলোকে পুষ্ট, সর্বোপরি মনে-প্রাণে আধুনিক। আধুনিক নগরজীবনের ডাইনামিক রূপ তিনটি গল্পেই উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিফলিত—যে সমাজে নারীপুরুষের মেলামেশা অবাধ, সতীত্বের প্রাচীন প্রচলিত ধারণা যেখানে অচল, যেখানের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধি। শুধু কর্মে-কথায়-আচরণেই নয়, এই আধুনিকতার মহিমা স্পর্শ করেছে অভীকের শিল্পিসত্তাকে। শেষ কথা গল্পের পটভূমিকা যদিও গড়ে উঠেছে অরণ্য-প্রকৃতির নিবিড় ছায়াতলে, তবু এ গল্পের সকল পাত্র-পাত্রীই লালিত হয়েছে সহরের শিক্ষাসভ্যতা ও চিন্তাচেতনায়। আধুনিক জীবনের উগ্র লালসার দিকটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ল্যাবরেটরীতে।

কিন্তু তিনসঙ্গী গল্পের যথার্থ মূল্য একালের জীবন-চিত্রের রূপায়ণরূপে নয়। আধুনিকতার আলেখ্য এসব গল্পের বাইরের দিক। তাদের অন্তরলোকে স্পন্দিত হয়েছে কবিগুরুর চিরন্তন ভারতীয় চিন্তা—যে চিন্তাকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর আবাল্যের শিল্পসাধনায়—কবিতায়, গানে, নাটকে ও কথাসাহিত্যে। মহর্ষির-গড়া ঠাকুর পরিবারের অভ্যন্তরে ভারতীয় ভাবনার যে শুচি-শুভ্র ভাব দিবানিশি বিরাজ করত, নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছিলেন সেই পরিবারের সকলে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের প্রেমভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা, ভারতবর্ষের সাধনার প্রতি নিষ্ঠা আলোচ্য গল্পতিনটির প্রাণবস্তু। অভীক অনেক ফুলের অনেক মধু পান করে পরিশেষে যেখানে ফিরে এসেছে, সেখানে আধুনিকতার সুতীব্র আগুন নাই, আছে চিরকালের সেই স্নিগ্ধ আলোক। বিভার সমস্ত অন্তরখানি যে স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য ও শুচিতায় পরিপূর্ণ। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূতের ভিতর দিয়ে কালিদাস কী সেই প্রেম-সৌন্দর্যের আরতি করেননি, যেখানে কামনার দাহ ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা শাসিত। নারীর এই কল্যাণী সৌন্দর্যেই তো রবীন্দ্রনাথ চিরদিন ভুলেছেন।

২

রমণীর প্রেম ও সৌন্দর্য পুরুষের সাধনাকে বিচিত্র-রূপে সার্থকতর করে তোলে—একথা স্বীকার করেছেন পশ্চিমের কবি ও দার্শনিক। কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে ভারত-বর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দেবযানীর অশ্রুপূর্ণ অনুরোধ-উপরোধকে উপেক্ষা করে কচ তাই বের হয়ে গিয়েছিল নিঃসঙ্গ সাধনার দুরূহ পথে। অচিরা যখন বুঝতে পেরেছে, তার সান্নিধ্য নবীনকে একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধনার পথ থেকে বিচলিত করছে, তখন সে ভয় করেছে নিজেকে : "ছি ছি কি পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে।" আপনাকে

যেদিন সে বুঝেছে সেদিনই সে ঐকান্তিক সাধনায় নিঃসঙ্গ পথে সাধককে মুক্তি দিয়ে দূরে সরে 'গেছে। অচিরার নিজেরও একটা সাধনা ছিল। সে সাধনা জীবনের প্রথম ভালোবাসাকে সকল আঘাত থেকে রক্ষা করে অর্চনা করার। এখানেও সে একাকিনী।

মন প্রাণ অর্পণ করে কর্ম করাকে যদি বলা হয় তপস্যা, তবে নন্দকিশোর ছিলেন একজন খাঁটি তপস্বী। নন্দকিশোরের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত বিজ্ঞানসাধনাকে পূর্ণতার আলোকতীর্থে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে মোহিনী। মোহিনী যে স্বামীর সহধর্মিনী! কিন্তু মোহিনীর সেই সতীত্বের সাধনা সার্থকতার বিচিত্র পথে রূপায়িত হতে পারেনি। যে তরুণ সাধকটিকে তিনি নন্দকিশোরের বিজ্ঞানসাধনার বেদীমূলে পূজার জন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন, সৌন্দর্যময়ী নারীর ছলনায় তার ধ্যান হয়েছে বিচলিত। ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে নারী এসেছে এইভাবে ধ্যান ভেঙে দিতে। মহাযোগী গিরিশের শুভ্র তুষারক্ষেত্রে তাই সৌন্দর্যময়ী প্রেমময়ী উমার প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

এই গল্পগুলিতে একদিকে যেমন ভারতবর্ষের প্রেম ও সাধনাকে উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে, য়ুরোপের আধুনিক বিজ্ঞানকেও তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। পশ্চিমের বিজ্ঞানসাধনা এবং কর্মশক্তির প্রতি কবিগুরুর আজীবন একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। আলোচ্য গল্পের প্রধান পাত্রমাত্রেই বিজ্ঞানী—কর্মের ক্ষেত্রে নিরলস সৈনিক। বিভাকে অভীক লাভ করতে চেয়েছে আপনার বীর্যবত্তার দ্বারা। এইজন্য সুদূর পশ্চিমে যাবার পথে সে গ্রহণ করেনি বিভার দেওয়া অনায়াসলভ্য কোনো পাথেয়। যে চায় শিল্পীর রাজকর, দরিদ্রের ভিক্ষায় তার কী হবে? য়ুরোপীয় রূপতন্ত্র এবং ভারতীয় ভাবতন্ত্রের রাখীবন্ধন করতে চেয়েছেন কবি এইসব গল্পে। প্রাচ্যের সাধনা ও পাশ্চাত্ত্যের কর্মশক্তি নিয়ে তাই তিনসঙ্গীর নায়কেরা সৃষ্ট।

বার্ধক্যের হেমন্তগোধূলিতে কবি যখন idea-এর জ্যোতির্লোকে বিচরণ করছেন, তখন তিনসঙ্গী লেখা। তার ফলে, ফুল যেমন আপনার প্রাণশক্তিতে বিকশিত হয়ে উঠে, তিনসঙ্গীর চরিত্রগুলো তেমনি আপনাদের ভিতর থেকে ফুটে ওঠেনি। রক্ত-মাংসের সজীব চরিত্রের উত্তপ্ত স্পর্শ যদি তাদের কারোর মধ্যে পাওয়া যায়, তবে সে মোহিনী। Idea-কে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেবার ফলে গল্পগুলির শৈল্পিক রসসৌন্দর্য অনেকস্থলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন, একই আরণ্যক প্রকৃতি একবার অচিরার নীরব সতীত্ব-সাধনার অনুকূল হয়েছে, আবার তাই পরে তার হৃদয়ে কামনার রক্তশিখা জ্বেলে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আসলে, গল্প ও চরিত্রগুলি এখানে কবির মনে এসেছে ideaকে প্রকাশ করবার উপায়রূপে।

শিল্পরীতির দিক দিয়েও গল্পতিনটির মধ্যে বিস্ময়কর ঐক্য বর্তমান। তিনসঙ্গীর ভাষা পুষ্পভারানত লতিকার মতো। তা যেমন রমনীয়, তেমনি সহজ, তেমনি সৌন্দর্যে লাবণ্যে পরিপূর্ণ। অলঙ্করণের দীপ্তি রবীন্দ্রনাথের সর্বত্র, এখানেও। এখানের অনেকগুলি অলঙ্কার বিজ্ঞান-প্রসঙ্গমূলক। যেমন, "সূর্যের কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধূমকেতুর যেমন লেজটা যায় উড়ে, মুণ্ডটা থাকে বাকী" (শেষ কথা)। এইভাবে বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের অদ্বৈত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনসঙ্গীতে। পাত্র-পাত্রীরা এইসব গল্পে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছে যথেচ্ছ। এপিগ্রামের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাদের কথায় কথায়; "ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশী দরকার আর থাকবে না, তখনই তোমার হাত থেকে নেব" (রবিবার)। উদ্ধৃতিযোগ্য সুন্দর বাক্য ছোটগল্পের একটি প্রধান সম্পদ। এই সম্পদেও তিনসঙ্গী ঐশ্বর্যবান। যেমন, "মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে" (শেষকথা) কিংবা, মোহিনীর কথা; "পুজোর সাজির বাহিরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়" (ল্যাবরেটরী)।

রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী গল্পগ্রন্থের রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরী যথার্থ ই তিনসঙ্গী॥

স্বাধীনতার মূলতত্ত্ব

অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী

প্রথমেই বলা উচিত যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা ব্যতীত ইহজীবনে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ও আনন্দ-লাভ করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব স্বাধীনতা লাভ করা সকলেরই কাম্য এবং কর্ত্তব্য বটে।

এস্থলে সমষ্টিগত স্বাধীনতাই আলোচ্য বিষয়। জাতিগত বা দেশগতভাবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহাই বিচার্য্য।

ইংরাজি ভাষায় স্বাধীনতা পদটির তিন প্রকার অনুবাদ করা হয়—যথা Freedom, Independence এবং Liberty 'Freedom' এর অর্থ হইল—যে কোনও বন্ধন হইতে মুক্তি। Independence কথাটির অর্থ হইল অপরের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি এবং Liberty শব্দটির অর্থ ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার শক্তি বা অধিকার।

সুতরাং ইংরাজী মতে অর্থাৎ পাশ্চাত্য আদর্শে যখন কোন জাতি বা দেশ অর্থাৎ কোন মানবগোষ্ঠী তাহাদের স্বদেশের শাসন ও পরিচালনা নিজেরাই স্বমতানুযায়ী করিতে পারে তখনই তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায়। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ কিঞ্চিৎ বিচিত্র। ভারতীয় আদর্শের স্বরূপ সংস্কৃত ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই সংস্কৃতভাষাতেই ইহাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই সংস্কৃতভাষায় স্বাধীনতা শব্দটি দুইটি পদের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে—যথা 'স্ব' এবং অধীনতা। ইহার মর্ম্মার্থ হইল "স্ব" বা নিজের অধীন হওয়াকেই স্বাধীনতা বলা যায়। এস্থলে প্রতিবাদ করা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য আদর্শে Freedom, Liberty বা Independence পাইলেও ত 'স্ব' অর্থাৎ নিজের অধীন থাকা সম্ভবপর হয় —সুতরাং ভারতীয় মতের বৈশিষ্ট্য কোথায়? তদুত্তরে বলা যায় যে সকলক্ষেত্রেই এরূপ সম্ভবপর না হইতেও পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আফ্রিকার কথা ধরা যাক। সেখানে অধুনা অনেক প্রদেশের আদিম অধিবাসীগণ কিছুদিন পূর্ব্বেও যে পূর্ব্বপুরুষাগত স্বকীয় বিশিষ্ট জীবনাদর্শ ধর্ম্মাদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিত তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তৎস্থলে খৃষ্টীয় বা ঐস্লামিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে এবং তৎ তৎ স্থলে নিজেরাই গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া তাহারা নিজেরাই স্বদেশকে শাসন এবং পরিচালনা করিতেছে। সেই সকল দেশকে পাশ্চাত্য-মতে নিশ্চয়ই Independent বা Free বলা যায়—কিন্তু ভারতীয় আদর্শে কখনই প্রকৃত স্বাধীন অর্থাৎ "স্ব"এর অধীন বলা যায় না।

সুতরাং ভারতীয় আদর্শে "স্ব" কাহাকে বলে তাহা জানিয়া বুঝিয়া তাহার অধীনতাটা শুধু রাষ্ট্রশাসনেই নহে, সামাজিক পারিবারিক এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করিলে তখনই পূর্ণ ও প্রকৃত স্বাধীন হওয়া যাইতে পারে। ভারতে পাঠান ও মোগল যুগে সুদীর্ঘকাল ভারতবাসীর কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল দিকে অনেকটাই স্ব+অধীন—অর্থাৎ স্বাধীন ছিল বলিয়াই তাহাদের অস্তিত্ব অদ্যাপি ধরাধাম হইতে লুপ্ত হয় নাই—নতুবা মধ্যযুগে তাহাদিগকে যে প্রকার রাষ্ট্রীয় নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল—তাহাতে আজও তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবার কথা নহে।

আমাদের কেবলমাত্র স্থূল ও জড় দেহটিকেই "স্ব" বলা যায় না। তাহার সহিত মন ও আত্মা সংযুক্ত হইলেই তখনই উহাকে "স্ব" বলা যায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সংযোগই হইল "স্ব" এর অর্থাৎ সত্তার (Entity) মূল-ভিত্তি। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এই সত্যকে বাচনিক না হইলেও কার্য্যতঃ স্বকীয় করা হয়। তাই দেখা

"...বিজ্ঞজনেরা কোনক্রমেই চতুর্থ প্রসব অনুমোদন করেননা..." —বলেছেন কুন্তী

(মহাভারত সম্ভব পর্ব্ব)

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের জন্মের পর পাণ্ডু যখন আরও সন্তান কামনা করেন তখন কুন্তী, রাজাকে বলেন যে ঋষিগণ চতুর্থ প্রসব অনুমোদন করেন না। এখন অবশ্য সময় এবং সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ অনেক বদলে গেছে, তবে সেই প্রাচীন যুগের সেই মহিমান্বিতা রাণীর—এই কথাগুলির তাৎপর্য্য এখনও নষ্ট হয়নি! প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় এই কথাগুলির মূল্য আরও বেড়েছে। বর্ত্তমানে যাঁরা বুদ্ধিমান তারা শুধু সেই ক'টি সন্তান চান, যে ক'টিকে তারা খাইয়ে পরিয়ে ভালোভাবে মানুষ ক'রে তুলতে পারবেন। ছেলেমেয়ে কম হ'লে প্রত্যেকটি সন্তান বেশী আদর যত্ন পায় এবং ভবিষ্যতে ওরা যাতে সুখে থাকতে পারে সেই রকম সুযোগ সুবিধে পায়। বেশী **সন্তান** হ'লে মা'র স্বাস্থ্যও খারাপ হতে পারে।

আপনি সন্তানজন্ম প্রতিরোধ করতে **পারেন**. অথবা আপনার ইচ্ছানুযায়ী যতো বছর **প্রয়োজন** ততো বছর পর্য্যন্ত সন্তান জন্ম বিলম্বিত করতে পারেন। অনুগ্রহ ক'রে আপনার বাড়ীর কাছাকাছি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যান, সেখানে বিনামূল্যে সেবা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।
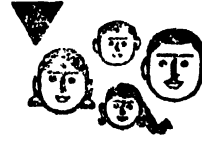
ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

যায় যে তাহারা স্বকীয় বা স্বজাতীয় আদর্শও ভাবধারাকে সম্পূর্ণ বজায় ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আত্মশাসন বা স্বরাজ্যশাসন করিয়া চলিয়াছে এবং কখনই অপর জাতি বা দেশের আদর্শ ও আচরণকে, তাহা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে তাহারা কার্য্যতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শকে অনুসরণ করিয়া শুধু Independent ই নয়, প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে শুধু ব্যতিক্রম দেখা যায় আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষে। যে ভারত অতীতে স্বাধীনতার অনন্ত-তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া বিশিষ্ট হইয়াছিল—সেই আজ "স্ব" কে ভুলিয়া গেল। তাই এক্ষণে দেখা যায় যে ভারতের অধিবাসীগণ ক্রমশঃ বিজাতীয় ও বৈদেশিক রীতি নীতি খাদ্য বেশভুষা আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতি এমন ব্যাপকভাবে নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে যে ভারতের "স্ব" অর্থাৎ আত্মসংস্কৃতিটা যে কি তাহা আঙ্গুলে গোণা যায় এমন কতকগুলি ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই বলিতে পারিবে না। আবার যাঁহারা তাহা বলিতে সক্ষম তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিতেও ভীত এবং সঙ্কুচিত এবং যাহারা এই তত্ত্ব জানেনা, তাহারা তাহা শুনিতেও ইচ্ছুক নহে, মানিতেও প্রস্তুত নহে। সুতরাং এক্ষণে ভারতে 'স্বাধীনতা' কথাটা খুব সঙ্কীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থাৎ ভারতরাজ্য ভারতবাসী কর্ত্তৃক শাসিত হওয়াকেই স্বাধীনতা বলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন Expansion is life Contraction is death. জীবনের পথে যতই সঙ্কীর্ণতা লইয়া সঙ্কুচিত হইয়া চলা যাইবে ততই মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিতে হইবে। এই অভ্রান্ত সত্যটিকে উপেক্ষা করিবার ফলেই আজ শুধু রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রেই নহে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সকল ক্ষেত্রেই সকল দিকেই অনন্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়াছে।

সকলেরই পছন্দসই বিস্কুট
লিলির
থিন
এরারুট
LILY THIN ARROWROOT BISCUITS
LILY'S THIN ARROWROOT BISCUITS
রোগী ও রুগ্ন ব্যক্তিদের
পক্ষে বিশেষ উপযোগী
সকলেই স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন
সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ
লিলি বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪
লিলি বিস্কুটই কিনবেন
LB-32/63

তাহার ফলে দেশব্যাপী নিরন্তর সঙ্ঘর্ষ বিরোধ শত্রুতা প্রবঞ্চনা হত্যা প্রভৃতি অশান্তিজনিত ঘোর দুর্দশায় জনগণ দলিত মথিত হইতেছে।

অতএব এক্ষণে প্রশ্ন ইহাই যে, কেন এইরূপ ঘটিল? পাশ্চাত্য মতানুযায়ী স্বরাজ্য শাসনের অধিকার আমরা স্বয়ং লাভ করিয়াছি ইহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু স্বাধীনতার যে পুরস্কার—যে সুফল তাহা কেন পাইলাম না? বর্ত্তমানে আমাদের স্বরাজ্যশাসনের চিত্র দেখিলে হৃৎকম্প হয়, নৈরাশ্যে নিরাপত্তার অভাবে অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায় সদা সশঙ্ক থাকিতে হয়। আমাদের জন্মভূমি—একটি মাত্র দেশ—ভারতবর্ষ। কিন্তু তাহা পরিচালনা ও শাসন করিতে ১৫।২০টি দল লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি দলই বলিতেছে যে কেবলমাত্র আমার পরিচালনা দ্বারাই ভারত স্বর্গে পরিণত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য ইহাই যে কোনও দলই একথা ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহে যে, ভারতই আমার জননী জন্মভূমি ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসী প্রত্যেকটি তৃণলতা প্রত্যেকটি ধূলিকণাও আমার নিকট অতি পবিত্র অতি আপনার অতি প্রিয়—অর্থাৎ স্বাধীনতার যে মূল মন্ত্র হইল—"স্ব" বা স্বজাতীয়তার বোধ সেইটাই এখানে কাহারও নাই। পাশ্চাত্যদেশগুলি একদিকে স্বদেশকে নিজেরাই যেমন পরিচালনা করে সেইরূপ স্ব-দেশেকে "স্ব" বলিয়া জানে, মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া স্ব স্ব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া চলে। পক্ষান্তরে আমাদের শাসকদলগুলি স্বাধীনতার প্রসাদটা লইবার জন্যই শুধু পরস্পর কাড়াকাড়ি করে অর্থাৎ স্বাধীনতার মজাটা প্রত্যেকেই কেবলমাত্র নিজেই লুটিতে চায় কিন্তু তাহার জন্য তপস্যা করিতে আত্মত্যাগ করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে। সংসারে সুখভোগ করিতে গেলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য—অধিকার পাইতে হইলে কর্তব্যপালন অপরিহার্য্য অর্থাৎ স্বার্থলোভকে সংযত করিতেই হইবে। কিন্তু আমাদের শাসকদলগুলি এই সত্যটিকে মানিতে প্রস্তুত নহে। বস্তুতঃ আমাদের সকল দুর্দ্দশার মূল এই স্থলেই নিবদ্ধ। রাজ্য পরিচালনা কে করিতেছে—তাহাই বড় কথা নহে। কংগ্রেস প্রভৃতি যে কোনও দলই যদি ভারতের "স্ব" কাহাকে বলে তাহা জানিয়া বুঝিয়া মানিয়া লইয়া তদনুসারে রাজ্য পরিচালনা করে তাহা হইলেই ভারতকে প্রকৃত স্বাধীন দেশ বলা যাইতে পারে, অন্যথায় দেশ শাসনটা স্বার্থসিদ্ধির সহজ কৌশলে রূপান্তরিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং যে স্থলেই স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা হইবে সেই স্থলেই স্বার্থসংঘাত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং পরিণামে দুঃখ এবং অশান্তি ভোগটাও অনিবার্য্য। তাই আজ দেখা যাইতেছে যে, ভারতের জনগণ এক্ষণে সর্ব্বদাই অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে শিক্ষার অভাবে রোগচিকিৎসার অভাবে চতুর্দ্দিকেই বিধ্বস্ত হইতেছে—অনন্ত বিপদসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কিন্তু ইহা একটি পরম বিস্ময় যে, তথাপি কাহারও চৈতন্যোদয় ঘটিতেছে না—আজ ভারতবাসী যেন জড়প্রস্তরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহা কি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ এবং শোচনীয় দুর্গতি নহে? ইহার আশু প্রতিকার কি কাম্য নহে? ভারতে যাঁহারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং কর্ম্মে শীর্ষস্থানীয় ও বরেণ্য তাঁহাদের দৃষ্টি কি এখনও এই মহান কর্ত্তব্যের প্রতি আবদ্ধ হইবে না? যদি তাহা না ঘটে তবে বুঝিতে হইবে যে আজ সত্যই ভারতের ভাগ্যাকাশে মহাদুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। বিধাতার করুণা ব্যতীত সেই দুর্ভাগ্য হইতে পরিত্রাণের আর কোন পথ দেখা যায় না।

'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'

'প্রবাসী' চিরকালই দেশের কথা ও পল্লীর কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সকল সমস্যা-সমাধানের নির্দেশক এই প্রবাসী। নিরপেক্ষ সমালোচনা সেদিন একমাত্র 'প্রবাসী'ই করিয়াছে। সত্যরক্ষার্থে কঠিন মন্তব্য করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীকেও কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবাসী চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে।

রাজনৈতিক ফাঁদে বাঙালীর দুর্গতি আজ নূতন নয়। সেই কতবছর আগে 'প্রবাসী'ই বলিয়াছে:

"বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মানীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাঙলাদেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলাদেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে, যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহারপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, 'ওহে, দেশের জন্য কিছু কর,' তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?" সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী-হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর," তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ।" প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭।"

এই দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই 'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'। বিদগ্ধ-সমাজে আজও প্রবাসী আদরণীয়। যদিও কালের প্রভাবে আজ মানুষের রুচি নিম্নগামী। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-অধোগতি লজ্জার কথা!

অমরু শতক : শ্রীবামাপদ বসু অনূদিত, ৪৪ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ছয় টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'অমরু শতক' উচ্চ প্রশংসিত। এতৎ সত্ত্বেও ইহার আশানুরূপ প্রচার নাই। কালপ্রবাহে এই কাব্যের কথা চাপাই পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন মনে হয় তাহাই সত্য। তিনি বলিয়াছেন, "মেঘদূত" আর "গীত গোবিন্দ" এই দুই সুন্দর রচনার আওতায় "অমরু শতক" পড়ে গিয়েছে।

অমরু একটি নাম। তাঁহারই রচিত শত শ্লোকে এই গ্রন্থখানি গ্রথিত। ইহার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেসব কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। শুধু বলিব "মেঘদূত" "ঋতু-সংহার", "গীত গোবিন্দ"এর মতোই ইহা উপভোগ্য। অমরুর কবিতা অনেকের কাছে অশ্লীল বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু বলার মাধুর্য্যে ও কাব্যরসের কাছে তাহা গৌণ।

অমরুর কবিতার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার নহে, ইহা অনুভূতির বিষয়। কাব্য হিসাবে ইহার তুলনা বিরল।

দেখিতে পাই, এই কাব্যে কোনো ধারাবাহিক-ক্রম নাই। এক একটি শ্লোক স্বয়ংসম্পূর্ণ। কবি শুধু ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন—রসশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার রসের ছবি। ইহার উত্তরও সুনীতিবাবু দিয়াছেন……"জীবন-নীতির অন্যতম পরিপূরক 'কাম'কে বর্জন ক'রে কেবল আধ্যাত্মিকতার সাধন কোনোকালেই ভারত-ধর্ম ছিল না।"

যাই হোক, বামাপদবাবু এই অপূর্ব কাব্যখানি অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার সহিত এই কাব্যের পরিচয় করাইয়া দিয়া বহু উপকার সাধন করিলেন। আর অনুবাদও হইয়াছে তেমনি সুন্দর, সহজ, সরল। পড়িতে পড়িতে কোথাও অনুবাদ বলিয়া ঠেকে নাই। যেমন :

"তুমিই উহারে দিয়াছিলে প্রেম
তুমিই বাড়ালে প্রীতির ভার।
শুনিনু আজিকে দেছো মনে ব্যথা—
নিঠুর খেলা এ-যে বিধাতার!
অকরুণ! তব সান্ত্বন-বাণী
নাহি বরষিবে শান্তিধারা
সখীর কণ্ঠে উঠিবে রোদন
অসহ ব্যথায়—বাঁধনহারা।"

অনুবাদ যে কত সুন্দর হ'তে পারে তার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

"ভ্রূকুটির অভিনয়ে
অধিক উতলা আঁখি…
আরো হলো দরশ-পিয়াসী।
কথা বন্ধ করিলাম—
কিন্তু এ-যে পোড়ামুখে
উজলিল মৃদুমন্দ হাসি।"

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, "অমরু শতক" সাধারণ পাঠককে তৃপ্ত করিবে।

প্রশ্নোত্তরে মনোরোগ প্রসঙ্গ : ডাঃ অজিতকুমার দেব, দি বুক হাউস, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য দু টাকা।

গ্রন্থকার স্বয়ং ডাক্তার এবং মনোরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে গ্রন্থকার অনেক জটীল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। কি ভাবে শিশুদের প্রতি লক্ষ্য

রাখিলে এই মনোরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহারই বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মনস্তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক নির্দেশ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ফ্রয়েডের মতকেই তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন।

এ রোগের প্রধান লক্ষণই হইল আত্মচিন্তা। সেইজন্যই গ্রন্থকার একস্থানে বলিয়াছেন, "নূতন কিছু শিখিতে পারিলে রোগী আত্মচিন্তা হইতে বিরত হয়।" এই নূতন কিছু শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদিগকে কর্মে ব্যাপৃত রাখাই সমীচীন।

এইরূপ একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়া গ্রন্থকার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পূর্ব হইতে সাবধান হইলে এই রোগাক্রমণের আর ভয় থাকিবে না। ইহা সকলেরই ঘরে রাখা উচিত।

স্বপ্নদীপ ঃ নীরদবরণ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী—২। মূল্য চার টাকা।

কয়েকটি কবিতা লইয়া এই কাব্যগ্রন্থ। ইহা পড়িতে যেমন ভাল লাগে, বুঝিবার পক্ষে তেমন নয়, বরং সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। কবিতার অর্থ বিশ্লেষণের মধ্যে নাই, দেহ-বিজ্ঞানী শব-ব্যবচ্ছেদ করে, কিন্তু রসোপলব্ধি অনুভূতিসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছিলেন, "কবির কাছে অর্থ জানিতে চাহিও না। আমি নিজেই জানি না, কি লিখিয়াছি।" কবির সৃষ্টি তাঁর অবচেতন-মনের ক্রিয়া। তাই তিনি নিজেও জানেন না, কখন কি লিখিয়াছেন। কবি জয়দেব সম্বন্ধেও এইরূপ একটি কিংবদন্তী আছে—একটি পংক্তি নাকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়া গিয়াছেন। ভক্ত হিসাবে তিনি যাহাই বলুন, এই পংক্তিটি তিনিই লিখিয়াছেন তাঁর অবচেতনমনে। নীরদবরণও বলিয়াছেন, "... শক্তি হ'লো গুরুর।" সৃষ্টির সকল কার্যই স্রষ্টার অবচেতন মনে সম্পাদিত হয়। তাই তাঁহার অগোচরেই কখন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় তিনি জানিতেও পারেন না। এ ধ্যান। সাধারণ লোক তাঁহাকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে গিয়া ভুল করিয়া বসে।

শ্রীঅরবিন্দ এই কবিতাগুলিকে 'সুররিয়ালিষ্ট' কবিতা বলিয়াছেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "স্বপ্নচেতনা হল একটা বিশাল জগত, তার অসংখ্য দেশ প্রদেশ ও বিস্তৃত বহুস্তর। সাধারণ স্বপ্নগুলি প্রায়ই অবচেতন দেহ এবং অবচেতন প্রাণের স্তরে আবদ্ধ থাকে। এগুলো আমাদের জাগ্রত চেতনার অত্যন্ত কাছে এবং অবচেতনমণ্ডলের (Subconscious belt) অন্তর্ভুত বলা যেতে পারে। এসব স্তরের স্বপ্ন বা কবিতাগুলি এলোমেলো, অর্থহীন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আরও গাঢ় সুপ্তিলোকে ডুব দিয়ে যদি তাদের স্বপ্নস্মৃতি জাগ্রত চেতনায় তুলে আনা যায়, তাহলে সেসব স্বপ্ন বা কবিতা কখনো কখনো পরিষ্কার অর্থ বহন করে, কখনো সেগুলো হয়ে দাঁড়ায় সাঙ্কেতিক লিপি (hieroglyph) অবশ্য এর জন্যে জোরালো স্বপ্নক্ষমতা থাকা চাই।"

প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে তিনি স্বপ্নলোকের কবিতাই বলেছেন। একটা উদাহরণ দি :

"উষার পান্থ, নবজীবনের উদয়তিলক,এসো হেথা এসো যবে
কাল শর্ব্বরী হেথা অবসান, নাই কোন কালো ছায়া,
হেথায় মূর্ত মর্ত্য মাটিতে, বিদীর্ণ করি সুদূর চন্দ্রাতপে,
যুগল অমর-বহ্নি, ধরিয়া মানব-মানবী কায়া।
আসিল ভূতলে দোঁহে,ধরণীর যুগকল্পিত আহ্বানে দিয়া সাড়া;
মর জনমের সুধা হলাহল নিঃশেষে পান করি',
মৃত্যুরে দিল অপূর্বরূপ, জীবন জলধি মরণ তিমিরহারা :
আসিছে যাত্রী, তাদের কিরণ সাগরে বাহিতে তরী।"

বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা ইহার চলে না, উপলব্ধির বিষয়। ঠিক একই কারণে বইখানির নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

—গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

"হেড স্টাডি"
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কালকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ প্রথম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৭৫	৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার ২১ বৎসর পূর্ণ

২১ বৎসর পূর্ব্বে বিভক্ত ভারত ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং এখন সেই খণ্ডিত অঙ্গ ভারতের স্বাধীনতা পূর্ণ বয়স্ক হইল। পূর্ণ বয়স্ক হইলে একটা সকল বিষয়ের দায়িত্ব উপরে আসিয়া পড়ে এবং সেই সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে বহন করিতে হইলে শিশু ও কিশোরের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন যথেচ্ছাচার আর চলে না। অর্থাৎ পরিণত বয়সে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র উভয়কেই নীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান ও মানবতার আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিতে হয়। আমাদের রাষ্ট্রে যে সকল যথেচ্ছাচার, অনাচার, লঘুগুরু বিভেদজ্ঞানশূন্যতা ও অবিবেচনার বাহুল্য ছিল ও রহিয়াছে, এখন হইতে সেইগুলির অথবা সেই জাতীয় কার্য্যের নিবৃত্তি আবশ্যক। তাহা হইবে কি না সে কথার উত্তর আসিবে আমাদিগের রাষ্ট্রের কর্ণধারদিগের কর্তব্যজ্ঞানের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া।

ভারতে বিদেশীয় প্রভুত্ব বহুবার স্থাপিত হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিদদিগের মতে ভারতে দ্রাবিড় ও আর্য্যজাতিগুলিও বিদেশ হইতে আসিয়াছিল এবং পরেও কুশান, হুন, শক, সিথিয়ান, ব্যাকট্রিয়ান, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতে আসিয়া এই দেশেরই অন্যান্য সকল জাতির মহা জনস্রোতের মধ্যে অবগাহিতভাবে এই দেশবাসীই হইয়া গিয়াছিল। শুধু ইয়োরোপীয় জাতিগুলিই জাহাজে চড়িয়া এই দেশ ও নিজ দেশের মধ্যে যাতায়াত করিয়া সাম্রাজ্য চালনার চেষ্টা করিয়াছিল। ইংরেজ বাণিজ্য করিয়া নিজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই এদেশে আসিয়া পরে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া লুণ্ঠন ও শোষণকার্য্য আরও বিস্তৃতভাবে করিতে আরম্ভ করে এবং সেই লুণ্ঠন ও শোষণ বর্ণ ও জাতিগত ঔদ্ধত্যের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবাসীকে কোন সময়েই ইংরেজ প্রভুত্ব ভুলিয়া থাকিতে দেয় নাই। ইংরেজ কখনও ভারতবাসী হয় নাই, হইবার কোন চেষ্টাও করে নাই, এবং নিজের পার্থক্য প্রকট হইতে প্রকটতর করিয়া তুলিয়া সে সর্ব্বদাই এদেশের মানুষকে নিজ

পদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টাই করিয়া গিয়াছে। এই কারণে ভারতীয়গণ প্রথম হইতেই ইংরেজকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টা বহুধারায় নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের সিপাহী যুদ্ধ সেই চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। এই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্তগণ প্রভু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুঝিয়াছিল এবং নেতৃত্বের ভুলের জন্ম ইংরেজের হস্তে পুনরায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরাজ এই যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে নির্মম-ভাবে হত্যা করিয়াছিল। ভারতের বহু শহরেই ফাঁসির রাস্তা বলিয়া প্রধান প্রধান রাজপথগুলির নামকরণ হইয়াছিল; কারণ সেই সকল বড় রাস্তার দুই পার্শ্বের বৃক্ষের ডালেডালে ভারতবাসাদিগকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হইত। সিপাহীযুদ্ধের অবসানে যে অত্যাচার আরম্ভ হইল তাহা পূর্ব্বের তুলনায় বহুগুণ। ইংরেজের দফতরে ঢুকিতে হইলে সকলকে নানাভাবে আত্মমর্য্যাদা বলিদান করিয়া যাইতে হইত। ইংরেজী বস্ত্র পরিলে রেলগাড়ীতে তাহার জন্ম পৃথক কামরার ব্যবস্থা হইল। সাধারণের ব্যবহারের উদ্যানগুলিতে ব্যাণ্ড বাজাইবার সময় ভারতীয়-বস্ত্র পরিহিত লোকেদের সেখানে থাকিতে দেওয়া হইত না। বহুস্থলেই ভারতীয়দিগের উপরে প্রবেশ নিষেধ-আজ্ঞা জারি করা হইত। বিদ্যায়, জ্ঞানে ও কর্মক্ষমতায় ইংরেজ অপেক্ষা অধিক গুণবান ভারতীয়দিগকে চাকুরীতে সর্ব্বত্রই ইংরেজের নিচে কাজ করিতে হইত। ব্যবসায়ে ইংরেজকে অধিকমাত্রায় লাভ না খাওয়াইয়া কোন কাজই হইত না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে প্রথমে কেহ সাহস না পাইলেও, সিপাহীযুদ্ধের অনেক বৎসর পরে আন্দোলন ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হইল। এইসকল আন্দোলনে কার্য্যে প্রথমতঃ ইংরেজ বিরুদ্ধতা অপেক্ষা ভারতীয়দিগের সাম্য অধিকার এবং সমান শিক্ষা ও জ্ঞানের দাবিই উত্তমরূপে ব্যক্ত হইত। এই কার্য্যে কোন কোন ইংরেজও সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের যে কৃষ্টি জাগরণ এবং আত্মমর্য্যাদা-বোধ কার্য্যে বিকাশ করার চেষ্টা দেখা যায় তাহার আরম্ভ হইয়াছিল রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায়। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বোস প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের নাম বাংলা দেশে সর্ব্বজনবিদিত হইয়া উঠিল। ভারতবাসীকে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধ শিখাইবার জন্ম বাংলায় বাহিরেও বহু স্বার্থত্যাগী নেতার আবির্ভাব হইল এবং ইহার পরের যে স্বদেশী আন্দোলন সর্ব্বত্রই তাহার জন্ম ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। বহু লেখক, বহু চিন্তাশীলব্যক্তি, বহু বিদ্বান ও বহু রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্ম্মী এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতেই লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিভাগ কার্য্যের প্রতিবাদপ্রসূত বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হইতেই দেশের সর্ব্বত্র আগুনের মত ছড়াইয়া গিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিপ্লব ও বিদ্রোহ চেষ্টার মধ্যে বাংলার যাঁহারা মহাত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের সংখ্যা ছিল অনেক। লড়িয়া ইংরেজকে তাড়াইবার জন্ম সম্মুখে আসিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার দলের বহু লোক। বিদেশী বর্জ্জনের প্রচেষ্টা ও স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠায় জন্তও বহু জননেতা নানাভাবে স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছিলেন ও ই রেজের অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিপ্লবীদিগের মধ্যে উৎপীড়ক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ও ইংরেজ সহায়ক ভারতীয়দিগকে হত্যা করিয়া অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ইংরেজ বিরুদ্ধতা একটা এমন রূপ ধারণ করিল যে কয়েকবৎসর ঐ অবস্থা থাকিলে পরে ইংরেজ বঙ্গবিভাগ রদ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা আরও অনেকভাবে বাংলা ও বাঙ্গালীর ক্ষতিকর বিলি-ব্যবস্থা করিল। যথা বাংলার কোন কোন জেলা কাটিয়া বিহার অথবা উড়িষ্যার সংযোগ করা। অনেক জেলা বা জেলার অংশ স্বাধীনতা হইলে পরেও বাংলায় ফিরিয়া আসে নাই। বঙ্গবিভাগ রদ হইয়া এবং ভারতের রাজধানী

বাংলা হইতে সরাইয়া দিল্লীতে লওয়া সত্ত্বেও বিপ্লব ও বিদ্রোহ চেষ্টা সমানে চলিতে থাকে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীগণ অপর বিদেশী জাতির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ইংরেজ বিতাড়ন ব্যবস্থা করিতে তৎপর হয়েন। এই সকল চেষ্টাতে অনেকের প্রাণ যায়; কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। কিন্তু ইংরেজ একথাও বুঝিতে পারে যে বিদেশীর নিকট অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রবলভাবে বিপ্লব চালান সফল না হইলেও সফলতার কাছ ঘেঁসিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-আন্দোলন আসিয়া পড়ায় ইংরেজ কিছুটা অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে থাকে। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে তাহাদের নিশ্চিন্তভাব রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অহিংসনীতি বহু স্থলেই রক্ষিত হয় নাই, এবং হিংসাত্মক কার্য্য প্রকট হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজের দিক হইতেই জালিওয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভারতবাসীকে ইংরেজ বিদ্বেষের চরমে পৌঁছাইয়া দেয়। অসহযোগ আন্দোলনের বেশীরভাগই শান্তিপূর্ণভাবে চলিতে থাকে এবং কোথাও কোথাও কখন অস্ত্র ব্যবহারে বিপ্লব চেষ্টাও উৎকটরূপ ধারণ করে। চট্টগ্রামের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহীগণ কর্তৃক চট্টগ্রাম দখল ইত্যাদি ঘটনা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে ভারতীয় জনগণ প্রয়োজন বোধ করিলে অহিংসার পথ ছাড়িয়া রক্ত বহাইতে অপারগ থাকিবে না। ইংরেজ সন্দেহে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নানাস্থানে আটক করিয়া রাখে এবং হিংসা ও অহিংসার সহযোগও বহুক্ষেত্রে লক্ষিত হয়।

১৯২৬ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরেজ ব্যাপকভাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ঘটাইবার ব্যবস্থা করে ও বহুস্থলে মারাত্মক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিতে থাকে। এই সময়েই লণ্ডনের ফ্লিট ষ্ট্রীটস্থ কোন সংবাদপত্রের এক উর্দ্দু শিক্ষিত ইংরেজ সাংবাদিক পাকিস্থান নামটির সৃষ্টি করে। এই দেশ বিভাগের মনোভাব তখন হইতেই ইংরেজের দ্বারা সমর্থিত হয় ও হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা দেখিয়া ভারতের কোন কোন অংশকে মুসলমান এলাকা বলিয়া প্রচার করা আরম্ভ হয়। কোন কোন প্রদেশ মুসলমান প্রধান বলিয়া সেখানে মুসলিম লীগ গভর্ণমেন্টও স্থাপন করা হয়। পাকিস্থান হইবে কি না ইহার আলোচনা চলিত কিন্তু ভারত বিভাগ হইবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র বোস আটক অবস্থায় হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করেন। পুলিশ বেষ্টিত বন্ধ গৃহের ভিতর হইতে তিনি কেমন করিয়া চলিয়া গেলেন তাহা আজ অবধি কেহ ঠিক বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া আফঘানিস্থানের ভিতর দিয়া প্রথমতঃ রুশ দেশে গমন করেন। রুশের তৎকালীন ইংরেজপ্রীতি ও সখ্য হেতু তাঁহাকে রুশ ছাড়িয়া জার্ম্মাণ দেশে গমন করিতে হয়। জার্ম্মাণ সাবমেরিন চড়িয়া তিনি জাপান গমন করেন ও সেই সময় যে বহু সহস্র ভারতীয় সৈন্য মলয় ও ব্রহ্মদেশে বন্দি ছিলেন তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া জাপানের সহায়তায় ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সেনাবাহিনী ভারত হইতে ইংরেজকে বহিস্কৃত করিবার জন্য ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়া ভারত আক্রমণ করে এবং অনেকটা ভারতের ভিতরে প্রবেশ করে। এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভারতের সকল সামরিক জাতির লোক ছিল এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী সৈন্যও ছিল। ইংরেজ ইহা এখন বুঝিতে পারিল যে তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র গুর্খা, পাঠান, বেলুচি প্রভৃতি সামরিক জাতির লোকেরা জাতীয়তার আহ্বানে ইংরেজকে আর প্রভু বলিয়া মানিবে না। নেতাজী সুভাষের আক্রমণে ইংরেজের সামরিক পরাজয় না হইলেও ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের মূল মন্ত্র যে আত্মমহিমায় বিশ্বাস তাহা চিরতরে চূর্ণ হইয়া গেল। ইংরেজ বুঝিল যে শুধু বাঙ্গালী নয় এখন ভারতের সর্ব্বজাতিই তাহাদের বিতাড়িত করিতে পরম উৎসাহে অগ্রসর হইতেছে।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের নেতাগণ যদি ভারত বিভাগে রাজী না হইতেন ও আন্দোলন চালাইয়া চলিতেন তাহা হইলে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে না হউক তাহার কোন অতি নিকট সময়েই ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত। কিন্তু

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বাধীনতার ফল উপভোগের আগ্রহাধিক্য থাকায় ইংরেজ সুবিধা বুঝিয়া ভারত বিভাগে সক্ষম হইল এবং পাকিস্থান বলিয়া একটা এমন দেশের সৃষ্টি করিল যাহার সাহায্যে তাহাদিগের বহু মতলব সিদ্ধির পথ খোলা রহিয়া গেল। ভারতেরও অঙ্গে এমন একটা এমন কণ্টক বিঁধিয়া রহিল যাহাতে সকল বিষয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতের গঠন ও উন্নতির কোন আর সহজ গতি সম্ভব রহিল না।

এখন আমাদিগের স্বাধীনতার পূর্ণ বয়স্ক হইবার বৎসরে আমাদের সেই সকল অতীতের মহাপুরুষদিগকে মনে রাখিতে হইবে যাঁহারা ভারতে না জন্মলাভ করিলে আমাদের কোন উন্নতিই কদাপি সম্ভব হইত না। এই সকল মহাপুরুষের প্রতিভা, জ্ঞান ও আদর্শের দ্বারাই আমরা অনুপ্রেরণা পাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি এবং ইঁহাদিগের প্রেরণাতেই শত সহস্র ত্যাগী ও কর্ম্মী ভারতকে কৃষ্টি সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদে পূর্ণতার পথে লইয়া গিয়াছেন। আমাদিগের যে সকল ভুল ও দোষে আমরা জাতীয়ভাবে, আহত হইয়াছি ও হইতেছি তাহাও মনে রাখিয়া আমরা যাহাতে ভবিষ্যতে আরও আঘাত না পাই তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

জাতীয় প্রতিভার অপচয়

প্রায়ই শুনা যায় যে ভারত অতঃপর আর বিদেশী যন্ত্রবিদ ভাড়া করিয়া কারখানা চালাইবে না। অতঃপর ভারতীয় যন্ত্র ও শিল্প-কৌশল দিয়াই ভারতের সকল কার্য্য চালান হইবে। ভারতকে যে বিদেশ হইতে যন্ত্র কৌশল আমদানি করিতে হয় তাহার নানান কারণ। প্রথমটি হইল কাল্পনিক কারণ। বিদেশী বিশেষজ্ঞ উচ্চ বেতনে না আনাইলে অনেক ভারতীয় মনে শান্তিলাভ করেন না। ইহার মধ্যে ভারত সরকারের কেহ কেহ আছেন এবং অধিক আছেন ব্যক্তিগত সম্পদশালী কারখানার মালিকদিগের মধ্যে। শ্বেতকায় হইলেই সে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইবে বলিয়া অনেক ভারতীয় ধনিকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের পিছনে অন্য কথাও থাকিতে পারে, যথা শ্বেতকায় যন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করা, যাহা করিলে ভারতীয় ধনিকদিগের নানা প্রকার বৈধ ও অবৈধ লাভের উপায় হয়। দ্বিতীয় কারণ ভারতীয় যন্ত্রবিদদিগকে বেতন দিবার বেলায় কার্পণ্য। ভারত সরকার এবং ভারতীয় ধনিকমহলে বেতন দিতে হইলে গাত্র চর্ম্মের বর্ণ দেখিয়া তাহাতে পার্থক্য সৃজন করা হয়। এই কারণে এ দেশের যন্ত্রবিদ্গণ অন্য দেশে কাজ লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, যেখানে তাঁহারা আরও অনেক অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। তৃতীয় কারণ ভারতীয়দিগের কর্ম্মক্ষেত্রে ইজ্জত রক্ষা করিয়া ন্যায্য পাওনা পাওয়া কঠিন। যাহাদিগের পিছনে সুপারিশ আছে তাহাদিগের এদেশে উন্নতি হয়। কখন কখন উৎকোচের কথাও উঠে। এই সকল কারণে কর্ম্ম-কৌশলের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিভা আর ভারতে থাকিতে চাহিতেছে না। ভারতের বাহিরেই তাহার অধিক আদর। ভারত সরকার এবং ভারতীয় ধনিকদিগের এই সকল কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া আবশ্যক।

কলিকাতাকে খর্ব্ব করার চেষ্টা

কলিকাতায় বসিয়া ভারতের বহু অবাঙ্গালী জাতির লোক অর্থ উপার্জ্জন করে। তাহারা এই কারণে বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা, এমনকি বন্ধুতার ভাবও পোষণ করে না। তাহাদের ব্যবহারে মনে হয় যেন তাহারা কলিকাতায় বাস করিয়াও ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি এক মহা অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছে এবং সেইজন্য বাংলা দেশ বাহাদের তাহাদেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে বহুলোকই বাংলা ও বাঙ্গালীর যথাসাধ্য ক্ষতি ও দুর্নাম রটনা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুর্নাম রটনার কার্য্যে তাহাদিগকে কোন মৌলিকত্বের প্রতিভা দেখাইতে হয় না। ইংরেজ পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীর নামে যাহা যাহা সত্যমিথ্যা দোষ দেখাইয়া জগতের নিকট ঐ জাতিকে হেয় প্রমাণ করিত, বর্ত্তমানে ভারতের বাঙ্গালী-বিদ্বেষী জাতির লোকেরা সেই কথাই আওড়াইয়া চলে। কলিকাতার বিরুদ্ধে যে কুপ্রচার তাহার মধ্যে একটা

হইল কলিকাতার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব। যদিও কলিকাতার অবাঙ্গালী অঞ্চলগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন এবং যদিও কলিকাতার রাজপথে ও অলিতে গলিতে অবাঙ্গালী মানবই সহরটিকে অপরিষ্কার করিয়া থাকে তাহা হইলেও কলিকাতার এই দোষ বাংলাবাসীরই দোষ বলিয়া প্রচার করা হয়। এখন শুনা যাইতেছে যে কলিকাতায় সর্ব্বদাই মহা গোলযোগ চলে, ঘেরাও হয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় এবং কলিকাতার কর্ম্মী লোকেরা কাজ করিতে পারেনা, ছাত্রগণ পাঠ করিতে পারেনা, ব্যবসায়ীগণ সুখে সচ্ছন্দে ব্যবসা করিতে পারেনা, ভ্রমণকারীগণ উপযুক্ত হোটেল পায় না, দেখিবার কোন কিছুই পায় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কলিকাতার গোলযোগ ও অপরাপর হাল্লা হাঙ্গামার মধ্যে যাহারা জড়িত থাকে, যথা মালিক ও শ্রমিক, তাহাদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। অন্যান্য অভিযোগ যাহা ও যে জন্য আন্দোলন ঘটে, তাহারও মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে কেন্দ্রীয় সরকার, নয়ত ভারতীয় পার্টিগুলির আদর্শবাদের জন্যই যত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই সকল বিষয়ে যাহারা মাতব্বর তাহারা অধিক ক্ষেত্রেই অবাঙ্গালী। সর্ব্বভারতীয় যে সকল কলহের বিষয় তাহা যদি কলিকাতায় প্রবলভাবে ব্যক্ত হয় তাহার কারণ কলিকাতার আকার ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সংখ্যা। একটা ৭০।৮০ লক্ষ অধিবাসীর বাসস্থান; যেখানে দশ বিশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী কুলি মজুর ও বেতনভোগী মানুষ থাকে, সেখানে অন্যান্য সহরের তুলনায় বেশী গোলমাল হইবেই। নিউইয়র্ক কিম্বা টোকিওতে, ব্র্যাডফোর্ড, ফিলাডেলফিয়া অথবা ইয়োকোহামা অপেক্ষা অধিক হাঙ্গামা হইয়া থাকে এবং হইবেই।

কলিকাতাকে খর্ব্ব না করিলে আবার ভারতের ও বিশ্বের কোন কোন জাতির মতলব সিদ্ধি হইতে পারে না। ঢাকা অথবা খাটমাণ্ডু কলিকাতা অপেক্ষা অধিক আকর্ষণের কেন্দ্র একথা শুধু কোন মতলব সিদ্ধির জন্যই কেহ বলিতে পারে। কলিকাতা হইতে মোটরগাড়ী চড়িয়া বিষ্ণুপুর, দামোদর উপত্যকার বড় বড় বাঁধ, দুর্গাপুর আসানসোলের বিরাট বিরাট কারখানা, বড় বড় কয়লার খনি, রাজগৃহ, নালন্দা, পাওয়াপুরী ও বুদ্ধগয়ার ঐতিহাসিক ও অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া আসা যায়। কলিকাতার যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা ভারতে অতুলনীয়। কলিকাতার অপরাপর বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকলা কেন্দ্রগুলি ও গহনা বস্ত্র উপহারের দ্রব্যাদির দোকানগুলিও ঢাকা অথবা খাটমাণ্ডুতে পাওয়া যায় না। কলিকাতার বন্দর ভারতের শ্রেষ্ঠ রপ্তানী দ্রব্য নিচয় বিদেশে চালানি করিবার কেন্দ্র। চা, পাট, লৌহ ও ধাতুপূর্ণ খনিজ, কয়লা, বাইসিক্‌ল্‌, সেলাইয়ের কল, বিজলিচালিত পাখা ও অপরাপর যন্ত্র, রেলের মালগাড়ী, রেলের ইঞ্জিন, রেশমের কাপড় ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য রপ্তানি ও বিক্রয়ের কেন্দ্র হইল কলিকাতা। লক্ষ লক্ষ কারিগর ও কর্ম্মী কলিকাতার আশেপাশে থাকে ও সেইজন্য কারখানা চালাইবার সুবিধা এই সহর ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আমেরিকান, বৃটিশ ও কিছু কিছু অন্য প্রদেশের লোক কলিকাতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিতে ইচ্ছুক। এই কারণে কলিকাতার বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারের বন্যা বহিতেছে। শুধু এক সুন্দরবন অঞ্চল ঘুরিয়া আসিবার জন্যই অনেক শিকারী কলিকাতায় আসেন। এই অঞ্চলে যেরূপ ব্যাঘ্র, কুম্ভীর ও অন্যান্য জীবজন্তু আছে তাহা পৃথিবীর অপর স্থলে বড় একটা দেখা যায় না। ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায় যাহাতে ভ্রমণকারীগণ এই সব সহজেই দেখিতে পারেন এবং শিকারের সখ থাকিলে শিকারও করিতে পারেন। কলিকাতা হইতে বিহার ও উড়িষ্যার জঙ্গলে যাওয়া কঠিন নহে। বিদেশী শিকারীগণ কলিকাতা হইতে শিকারের ব্যবস্থা করিয়া নানা স্থলেই যাইতে পারেন। কলিকাতার হাওয়াই বন্দরে নামিয়া যত জায়গায় যাওয়া যায়, অপর কোথাও নামিলে তাহা যাওয়া সম্ভব হয় না। ঢাকা হইতে ভারতের দর্শনীয় অল্পস্থানেই যাওয়া যায়। খাটমাণ্ডু হইতেও ভারতের সহিত পরিচয় বিশেষ হয় না। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানান দিক দিয়া ভারতের সহিত পরিচয় এক কলিকাতা হইতেই উত্তমরূপে হইতে পারে। ভারতীয়

সভ্যতার প্রসার হয়. বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার ও কৃষ্টির ক্ষেত্রের মহাপুরুষদিগের দ্বারা। হিন্দু বা বৌদ্ধ দর্শনের বড় বড় পণ্ডিতগণ কলিকাতা বা কলিকাতার নিকটবর্ত্তি নানা স্থানেই বাস করেন। শান্তি-নিকেতন, দক্ষিণেশ্বর, বসু বিজ্ঞান মন্দির, প্রভৃতিতে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতেই তাহা হইতে পারে। সুতরাং কলিকাতা না দেখিলে ভারতের সহিত পরিচয় কখনও পূর্ণভাবে হইতে পারে না। এখনও বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা মনে করে যে কলিকাতা না দেখিলে মানবজীবন কখন ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। আধুনিক কালের যে প্রগতি তাহার সকল নিদর্শনই কলিকাতা হইতে দুইশত মাইলের মধ্যে বড় বড় রাজ-পথের উপরে সন্নিবিষ্ট। প্রকৃতির গৌরবময় শোভার সাক্ষাৎও কলিকাতা নিকটস্থ বহুস্থানে পাওয়া যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ও কারুশিল্পের, অথবা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা ঐ কলিকাতাতেই হইতে পারে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাওলপিণ্ডি কিম্বা খাটমাণ্ডু, শ্রীনগর ও আমেদাবাদে তাহা হইতে পারে না। তারপর হইল ভারতীয় মানুষের কথা। ভারতের সকল জাতির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে বাংলাই সর্ব্বাধিক শিক্ষা, জ্ঞান, আত্মত্যাগ ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃষ্টিক্ষমতা দেখাইয়াছে। ভারতীয় মানবের মনের গতি কোন পথে যাইতেছে তাহা খাটমাণ্ডু অথবা ঢাকা হইতে বোধগম্য হইবে না। বাঙ্গালী ছেলে মেয়েরাই তাহা বিদেশী আগন্তুকদিগকে বুঝাইতে পারে। দিল্লীর সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা তাহা বোঝান সম্ভব নহে। কলিকাতায় ঐ সকল ভ্রমণকারীগণ না আসিলে তাহাদেরই ভারতভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, বাংলা ও বাঙ্গালীর ততটা ক্ষতি হইবে না। কারণ বাংলায় ব্যবসা ও হোটেল ট্যাক্সী কম লাভজনক হইলে তাহাতেও বাঙ্গালীর অংশ কমই থাকিবে। বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে অপর প্রদেশ ও অন্যদেশকে বাদ দিয়া চলিলে তাহা ততটা অসম্ভব অথবা ক্ষতিকর হইবে না, যতটা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ক্ষতি হইবে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য হস্তচ্যুত হইলে। বাঙ্গালী বিরুদ্ধতা অতিমাত্রায় চালাইলে এইরূপ পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশ অধিক মাত্রাতেই বাড়িয়া চলিবে এবং কোন না কোন সময় ভারতের অবাঙ্গালী জাতিগুলিকে তাহাদের অবিবেচনার ফল ভোগ করিতেই হইবে।

বাংলার বেকার সমস্যা

বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হয় বাঙ্গালীরা লাভজনক কার্য্যে কেন নিযুক্ত হইতে সক্ষম হন না। বাঙ্গালীরা স্বাধীন প্রচেষ্টায় উপার্জ্জন করা অপেক্ষা চাকুরী করিতে পারিলে তাহাই অধিক সুবিধাজনক মনে করেন। কারণ চাকুরী পাইলে কোন মূলধন লাগে না এবং ব্যবসা বাণিজ্য করিবার মত কোন বিশেষ প্রকারের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা বা যোগাযোগের প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালীর স্বভাব আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। সুতরাং মূলধন বলিয়া অধিকাংশ বাঙ্গালীর কিছু থাকে না। অবাঙ্গালী চাকর দারোয়ান প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ রোজগারের কিছু অংশ সঞ্চয় করিয়া এবং সেই অর্থ উচ্চ সুদে অপরকে ধার দিয়া ক্রমে ক্রমে বেশ কিছুটা মূলধন সংগ্রহ করিয়া ফেলে। পরে তাহারাই অথবা তাহাদিগের পরিবারের অপর ব্যক্তিরা নানা প্রকার ব্যবসা আরম্ভ করে এবং মূলধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সকল ব্যক্তিরা ধনবান বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে। ব্যবসা-গুলির মধ্যে পুরাতন লোহালক্কড় ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ কাল-ওয়ারের ব্যবসাই অবাঙ্গালী অল্পবিত্ত লোকেদের উন্নতির প্রধান সহায়। এই সকল ব্যক্তিরা অনেক সময়ই নানা প্রকার অল্প মাহিনার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কাজ শিখিয়া লয় এবং কিছু অর্থ সংগ্রহ হইবার পর নিজ নিজ স্বাধীন কারবার করিতে আরম্ভ করে। অপর একটি ব্যবসায় হইল পান, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতির দোকান। এই সকল

দোকান হইতে সরবত, সোডা, লেমনেড, ডাব ইত্যাদির সরবরাহও করা হইয়া থাকে। মুদীর দোকান, কয়লা কাঠ কেরাসিন তেলের দোকান, আরও নানা প্রকারের দোকান খুলিয়া অবাঙ্গালীরা বাংলাদেশে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। দোকান না খুলিয়া ফিরিওয়ালার কার্য্যেও অনেকে লাভজনক ভাবে নিযুক্ত থাকে। ফল, বাসন, কাপড়, সান দেওয়া, শিল কাটান, চাবিতালা মেরামত, রাংঝাল ও কলাই এর কাজ, ছুতার, খুনুরী, জলের কলের মেরামতের কাজ, ধোপা, নাপিত, জুতা সেলাই, আরও কত কাজেই না অবাঙ্গালীরা বহু সংখ্যায় বাংলা দেশে দিন গুজরান করিতেছে দেখা যায়। যদি লোক সংখ্যা গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালী বেকারের সংখ্যার তুলনায় অবাঙ্গালী দোকানদার, ফিরিওয়ালা, কারিগর প্রভৃতির সংখ্যা বিশেষ কম নহে। অর্থাৎ বাঙ্গালীরা যদি কাপড় ধোলাই রং, মেরামত, সেলাই, ছোট ছোট দোকান চালান ইত্যাদি নানা কাজে লাগিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে বহু লোকেরই কিছু কিছু রোজগার হইতে বিলম্ব হইবে না। শুধু বড় বড় আফিসে দফতরে বেতনের চাকুরী করিবার সুবিধা অল্প লোকেরই হইতে পারে। পাঞ্জাব হইতে যখন বহু পাঞ্জাবী বিতাড়িত হন তখন তাঁহারা বেতনের চাকরী খুঁজিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। পকৌড়ি ভাজা, কাপড় বিক্রয়, গাড়ী চালান, মাল তোলা ও বোঝাই করা প্রভৃতি যে কোন কাজ তাঁহারা পাইয়াছিলেন তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহারা নিজেদের অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। উদ্বাস্তু বাঙ্গালীরা শুধু চাকুরী খুঁজিয়াই বেড়াইয়াছিলেন ও অনেক পরে কিছু কিছু লোক কারখানায় কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কারখানার কাজ বাঙ্গালীরা অতি উত্তমরূপেই করিতে পারেন; কিন্তু কাজ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদিগের মধ্যে খুব প্রবল নহে। অনেক বাঙ্গালী কারখানায় কাজ করিতে হইলে কত অল্প কাজ করিয়া কত অধিক রোজগার হইতে পারে এই চিন্তাই করিয়া থাকেন। এবং হাল্লা হাঙ্গামা করিয়া টাকা আদায় চেষ্টাতেও তাঁহারা অগ্রগামী। ইহার ফলে আজকাল বাংলা দেশ হইতে বহু কারখানার মালিকগণ কারখানা উঠাইয়া অন্য প্রদেশে গিয়া কারখানা বসাইতেছেন। অফিসে, দফতরেও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী রাখিতে অনেক পরিচালক ঐ একই কারণে বিশেষ নারাজভাব দেখাইয়া থাকেন। এই যে কর্ম্মক্ষেত্রে হাঙ্গামার সৃষ্টি ইহার মূলে আছে রাজনৈতিক দলগুলির কারখানার কর্ম্মীদিগের উপর প্রভাব বিস্তার চেষ্টা। কোন কোন দলের উদ্দেশ্য দেশে বিপ্লব আনয়ন এবং সেই বিপ্লব ঘটাইবার উপযুক্ত অবস্থা সৃজন হেতু সর্ব্বত্র আন্দোলন আলোড়ন তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া চালান। বাংলার ছাত্র ও বাংলার শ্রমিক এই জাতীয় আন্দোলনে সহজেই পূর্ণ আবেগ ও উৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন ও সেই কারণে বাংলার আর্থিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ ঢিলা হইয়া আসিতেছে। বেকার সমস্যা এই বৃহত্তর সমস্যারই একটি অঙ্গ মাত্র।

অনেকে ভাবিতে পারেন যে বাংলা সরকার যে ক্ষেত্রে বহু কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যে হাত লাগাইতেছেন সে ক্ষেত্রে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বহু বাঙ্গালীর অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা হইবে। কিছু কিছু লোকের হয়ত সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু সরকারী চালনায় অধিকাংশ ব্যবসা ও কারখানা প্রায় কোন লাভ করিতে পারে না। বাংলার তথা ভারতের প্রায় সব সমষ্টিগত কারবারই লোকসানে চলিতেছে। কারণ রাষ্ট্রনৈতিক পাণ্ডাদিগের যথেচ্ছাচার, কর্ম্মী, কর্ম্মচারী, পরিচালকবৃন্দ ও সরকারী মন্ত্রীমণ্ডলি, সকলেরই স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ। সরকারী কাজ কারবার উত্তমরূপে না চলাতে নূতন নূতন চাকুরীর সৃষ্টি ত হয়ই নাই, উপরন্তু লোকসানের ধাক্কায় সাধারণ আর্থিক অবনতি ও তাহার ফলে নানা ক্ষেত্রে লাভজনক ও অর্থকরী কার্য্যের অভাব বৃদ্ধি। সরকারী কোন কাজে মন্দা পড়িলে সেই কারবারের সহিত সংযুক্ত বহু বেসরকারী কারবারেও মন্দা পড়িতে সুরু করে। বর্ত্তমানে যে ভারতব্যাপী অর্থ নৈতিক অসচ্ছলতা ও আড়ষ্টভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে সরকারী কারবারের নির্জ্জীব গতিহীনতা। এই নির্জ্জীবভাব এক হইতে আর একে সংক্রামিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই আক্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র লোকসান ও

অভাবের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করিতেছে। সাধারণভাবে ভারতের সর্ব্বত্র যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেজ, উদ্যম, উৎপাদন ও বিনিময়ে নতুন গতিবেগের সঞ্চার হয় তাহা হইলে তাহার ফলে বাংলার বেকার সমস্যারও কিছুটা লাঘব হইবে; কিন্তু যে কারণ বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীকেই অবলম্বন করিয়া প্রকটভাবে বাঙ্গালীকেই বিপন্ন করিতেছে তাহার দূরীকরণ বাঙ্গালীই শুধু নিজ চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কার করিয়া সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন। দলবদ্ধভাবে কোন জাতি যদি নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হয় তাহা হইলে সেই জাতীয় আত্মঘাত চেষ্টার প্রতিকারও শুধু দলবদ্ধ ভাবে জাতিকে বিপরীত পথে চলিতে বাধ্য করিয়া সাধিত হইতে পারে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙ্গালী আত্মোন্নতির চেষ্টায় বিশেষ শক্তি দেখাইয়াছিল। পরে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে বাঙ্গালীর আত্মোৎসর্গ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বাংলার স্বাধীনতার পরের যুগের যে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা; তাহার মধ্যেই আমরা সেই ক্ষুদ্রতা ও অবনতির প্রকাশ দেখিতে পাই যাহার জন্য বাঙ্গালী আজ অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় পরপদানত হইয়া জীবন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার কথা

বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদের অর্থ এবং রীতিনীতি লইয়া নানা প্রকার কলহের আরম্ভ দেখা দিয়াছে। স্টালিন যুগের কঠোর দমন নীতি যখন ক্রমে ক্রমে ঢিলা হইতে লাগিল এবং ক্রুশ্চেভের যুগের শান্তির প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল, তখন পৃথিবীর অপর প্রান্তের এক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কঠিন হস্তে মানব অধিকার খর্ব্ব করিয়া কঠোর নিয়মতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিল। মাওৎসেটুঙের কৃষ্টি বিপ্লবে চীন দেশের জনসাধারণকে জানান হইল যে সভ্যতার উৎস হইল মজদুর, কৃষাণ ও সৈনিকদিগের মনের প্রেরণা ও অনুভূতির মধ্যে। বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, দর্শন, প্রেরণা, কল্পনা ইত্যাদি যতটা ঐ শ্রমিক, কৃষক ও যোদ্ধাদিগের মগজের ও অন্তরের পথ বাহিয়া আসিয়া জাতির জীবনে প্রতিবিম্বিত হইবে তাহাই ধরিয়া জাতির সভ্যতা অগ্রসর হইবে। রুশিয়ানদিগকে মাওৎসেটুঙ আদর্শ বিরোধের দোষে দুষ্ট বিচার করিলেন এবং এই সমালোচনা অন্যান্য দিক হইতেও রুশিয়ার উপর প্রয়োগ করা হইল। ফলে ক্রুশ্চেভের পতন হইল এবং রুশিয়ার কম্যুনিজম্ কোমল হস্তে পুনর্ব্বার ইস্পাতের দস্তানা পরিয়া নিজ দেশবাসী এবং সহযাত্রী অপর দেশের কম্যুনিষ্টদিগকেও আদেশ-নির্দ্দেশ নিষ্পেষিত নিয়মতন্ত্রাধীন জীবন-নির্ব্বাহের গৌরব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। কম্যুনিজম্-এর এই নবলব্ধ কাঠিন্য সর্ব্বত্র আদৃত হইল না। কোন কোন জাতি মানব অধিকার ও কম্যুনিজমের সমন্বয় সৃজন চেষ্টা করিতে থাকিলেন এবং কোথাও কোথাও সে চেষ্টা সবল ভাবে দমন করা হইল।

সম্প্রতি চেকোস্লোভাকিয়াতে প্রায় ২০০০ চিন্তাশীল ব্যক্তি কম্যুনিজমকে সহজ সরল রূপদান করিবার জন্য একটা লিখিত পত্র সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। চেকোস্লোভাকিয়ার পুরাতন নিয়মতন্ত্র বিশারদ নেতাদিগকে সরাইয়া নূতন নেতৃত্ব আনয়ন চেষ্টার ফলে ডুবচেক ঐ দেশের নেতা বলিয়া গৃহীত হইলেন। পূর্ব্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ ঘটাতে একটা মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। পূর্ব্ব জার্ম্মানী ভাবিল যে যদি চেকোস্লোভাকিয়া নরম পথে চলিতে সুরু করে তাহা হইলে পূর্ব্ব জার্ম্মানীকে পশ্চিম জার্ম্মানী যে কোন সময় গিলিয়া ফেলিলে তাহার অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হইবে। হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, বলগেরিয়া পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সহিত এক মত। রুশিয়ার বর্ত্তমান নেতাগণ কঠিন নিয়মতন্ত্রের পূজারী। তাহা না হইলে তাহাদিগকে মাওৎসেটুঙের কৃষ্টি বিপ্লবের নিকট খাট হইয়া থাকিতে হয়। তাহারা পোলাণ্ড হাঙ্গেরী, বলগেরিয়া ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সহিত মিলিত ভাবে সকল কম্যুনিষ্ট জাতিগুলিতে কঠোর ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বদমন পন্থা অবলম্বনে চলিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য একটা ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থার নাম ওয়ারশ প্যাক্ট এবং ইহার অনুসৃত নীতিতে কোন কম্যুনিষ্ট দেশে যদি কম্যুনিজম্ নরম হইয়া যাইতেছে দেখা যায় তাহা হইলে

(৬০০ পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

সাধনা ও রবীন্দ্রনাথ

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'সাধনা'র একটি বিশিষ্ট স্থান চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' দ্বিজেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' পত্রিকার পরেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তা হল 'সাধনা'। রবীন্দ্র-নাথকে কেন্দ্র করেই এই পত্রিকার প্রকাশ। আবার এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঠাকুরপরিবারের তরুণবয়স্ক লেখক-লেখিকাগণের রচনা প্রকাশ করে তাঁদের উৎসাহিত করা। সেই সময়ের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁরা হলেন—হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নামে মাত্রই 'বালক পত্রিকার' সম্পাদিকা ছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রধান কর্ণধার। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে এই পত্রিকার লেখক-লেখিকাগণ আদৌ অগ্রসর হতে পারতেন না। এক বছর পার হতে না হতেই 'বালক' তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে অক্ষম হওয়ার ফলে 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হল। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১২৯৮ সালে বালক পত্রিকার লেখক-গণেরই প্রয়োজনে যেন 'সাধনা' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটল। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা রচনায় সুপটু না হলেও, ছোট গল্প রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শিশু মন ও বাৎসল্যের সরল মধুর চিত্রঅংকনে ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবুও একথা মনে করলে ভুল হবে যে, 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কোন সক্রিয় অংশ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে এই পত্রিকার চার বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে প্রথম তিন বছর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান ধারক ও বাহক এবং নতুন বৎসরে 'সাধনার' সম্পাদনা ভার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করেন।

'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ কোন রূপ নিয়েছিল সে বিষয়ে উল্লেখ করার আগে এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

'সাধনা' পত্রিকা ছিল সেকালের শিক্ষিত ও রুচিবান পাঠকগণের আদরের সামগ্রী। এই পত্রিকার রচনাগুলি লেখকগণের গভীর মননশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। আজ থেকে আশী বছর আগে বাংলা দেশের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এমন একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন পত্রিকার প্রকাশ যে সম্ভব হয়েছিল তা মনে করলে বিস্মিত হতে হয়।

'সাধনা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের যে সব বয়ঃকনিষ্ঠ-গণের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ব্যতীত ঋতেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনার নাম যথাক্রমে সোরাব ও রোস্তম, শকুন্তলা, ঋতু সংহার, প্রাণ ও প্রাণী। এছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠদের রচনা হল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনের সূর্য্যালোক', 'সাধনা-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই সমাজ সংস্কার, জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথের 'সার্গম স্বরলিপির আকারমাত্রিক নূতন পদ্ধতি', স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ ইত্যাদি। ঠাকুর পরিবারের বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় বা আত্মীয়গণের মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর 'জন্মদিন' প্রতাপ মজুমদারের শিকাগো মহামেলা, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'আদরের না অনাদরের' লোকেন্দ্রনাথ পালিতের 'সাহিত্যের সত্য' রমেশচন্দ্র দত্তর 'উন্নতির যুগ' ও 'কবি ভবভূতি', ক্ষীরোদ রায়চৌধুরীর 'কালিদাস ও অশ্বঘোষ', অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীরূপ গোঁস্বামী' এবং 'মহাকবি কৃত্তিবাস' পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'সাধনার' অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর রচনাগুলির বৈচিত্র্য ও মননশীলতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ এই পত্রিকায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা ব্যতীত দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বমূলক রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। যাঁরা এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ রায়ের নাম প্রথমেই মনে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত ক্ষুদ্র আলোচনাগুলিও সুখপাঠ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগে 'গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়', 'ইচ্ছা মৃত্যু' 'মাকড়শার দাম্পত্য', 'ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা', উটপক্ষীর লাথি, মানব শরীর ইত্যাদি উপভোগ্য রচনা প্রণয়ন করেন। 'সাময়িক সার সংগ্রহ' বিভাগ 'সাধনার' অতিরিক্ত আকর্ষণ। এই পর্য্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জাপানের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' 'বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অদ্ভুত কাণ্ড' যুদ্ধের অভিনব অস্ত্র 'ডুবুরীর জীবন' ইত্যাদি যেমন রসগ্রাহ্য তেমনি চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। উমেশ চন্দ্র বটব্যালের 'সাংখ্যদর্শন' রচনা একাধারে ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিকতার মূল্যায়নের নিদর্শন। রামেন্দ্রসুন্দরের আকাশ তরঙ্গ, অতিপ্রাকৃত, 'প্রলয়' ও সৃষ্টি এবং জগদানন্দ রায়ের 'প্রতীচ্য গণিত' জাতীয় সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক আলোচনা এ যুগেও অল্প দেখা যায়। গল্প উপন্যাসের মধ্যে শৈলেন মজুমদার রচিত ছোট গল্প 'উমেদার' শ্রীশ মজুমদারের উপন্যাস 'কৃতজ্ঞতা' ও ছোটগল্প 'পুরুৎঠাকরুণ' এ যুগের পাঠকের নিকট অনুপযোগী মনে হলেও সেকালে চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। কৃষ্ণবিহারী সেনের 'তিনটি অঙ্গুরীয়' ও পরনিন্দার জন্য বিবরণ ছিল সেই রকম রমণীয়। দীনেন্দ্র কুমার রায়ের গল্প, দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতাও এই পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্র এই পত্রিকার শোভাবর্দ্ধন করেছে।

'সাধনা' পত্রিকার সর্বাঙ্গীন রুচিশীলতা ও আভিজাত্য বজায় রাখতে রবীন্দ্রনাথকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার পরিচয় পেতে হলে এই পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। 'সাধনা' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষাকে সুনজরে যে দেখতেন না তা বলাই বাহুল্য। বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধেও ইংরেজী শিক্ষিতদের অনুরাগ তখন একালের মত গাঢ়তর হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ সেযুগের শিক্ষিত বাঙালীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 'বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মান লাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা নহে কেবল মাত্র মাতৃভাষা। যাঁহাদের হৃদয়ে ইহার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে তাঁহাদেরই ভাষা। বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীকে অনুরাগী করার উদ্দেশ্যে এবং এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অটল ভরসায় বিশ্বাসী করে তুলতেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পত্রিকার স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে এই আদর্শই তিনি অটুট রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃজনীধারায় 'সাধনা' পত্রিকা একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি 'সাধনার' যুগ থেকে নিশ্চিত সার্থকতার দিকে মোড় নিয়েছে। তাঁর কবি-কল্পনা এই যুগেই অতীত রোমান্সের মায়া কাটিয়ে শাশ্বত সত্তার সন্ধানে বার হয়েছে। অর্থাৎ 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' 'প্রভাত সঙ্গীত' ছবি ও গান' কড়ি ও কোমল থেকে 'মানসী' পর্য্যন্ত যে আত্মগত সুর রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 'সাধনার' যুগে এসে তা নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। এক অপূর্ব

আনন্দের অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি গেয়ে উঠেছেন :

'হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।

তিনি কায়মনোবাক্যে সেই পৃথিবীকে চাইছেন যা :

'বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

রবীন্দ্র কবিকল্পনায় যে মৌল দৃষ্টিভঙ্গী যা দ্বৈত সত্তার অনুভূতিতে প্রকাশমান এবং কবি যাকে জগৎ মাঝারে কত বিচিত্র তুমি,তুমি বিচিত্ররূপিনী এবং অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তরবাসিনী বলে বর্ণনা করেছেন তা 'সাধনা'তেই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। আবার এই দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বের অবসানে কবি যখন তাঁর অন্তর্যামীর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন তখন কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে—'সাধনা' কবিতায় যার চরম ও সার্থক প্রকাশ তাও 'সাধনা'তে পত্রস্থ হয়েছে :

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি
অকৃতকার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান
বিশাল বাসনারাশি।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও চিত্রা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি 'সাধনা'তেই আত্মপ্রকাশ করে। 'পরশ পাথর' হিংটিং ছট, 'যেতে নাহি দিব', 'সোনারতরী' হৃদয় যমুনা, এবার ফিরাও মোরে, বিদায় অভিশাপ, অন্তর্যামী, মৃত্যুর পরে, 'সাধনা', 'সন্ধ্যা', 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন' প্রভৃতি উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আর একটি উল্লেখযোগ্য দান ছোট গল্প। বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে যে শিল্পরূপ (art form) গ্রহণ করেছিল তার ফলেই একালে তার বহুধা বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সংখ্যা যেমন বহুল তেমনি সেগুলির বিষয়বস্তু রচনাচাতুর্য্য এবং সৌষ্ঠব অনিন্দ্যসুন্দর। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের যে কোনও সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প বাদ দিলে তা যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে একথা গর্ব্বের সঙ্গে উচ্চারণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের গঠনভঙ্গী, আঙ্গিক, ভাষা, কাহিনীবিন্যাস সর্ব্বকালের রসিক-পাঠকের উপযোগী। এই প্রসঙ্গে যা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তা হল রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমেই ছোট গল্প সৃষ্টির নতুন পথ প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে হিতবাদী পত্রিকায় অবশ্যই তাঁর অনেক ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাধীন মন মৌলিক সৃষ্টিকে আশ্রয় করল। কাব্যের ক্ষেত্রে 'সাধনা' যেমন রবীন্দ্রকল্পনাকে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল, ছোট গল্প রচনায়ও তেমনি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভিখারিণী' (ভারতী ১২৯১)-কে ছোট গল্প বলা যায় না। এরপর ঘাটের কথা ও রাজপথের কথাকে বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে ছোট গল্পের সূচনা হয় 'হিতবাদীতে' প্রকাশিত 'দেনা পাওনা'। এরপর যথাক্রমে পোষ্ট মাষ্টার, গিন্নী, রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা, ব্যবধান ও তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি। একই সময়ে 'সাধনায় প্রকাশিত হয় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, ত্যাগ ও সম্পত্তি সমর্পণ, ইত্যাদি ছোট গল্পগুলি। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার একটি সৃজনীধারার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে রাইচরণ চরিত্রের বিশ্লেষণ যেমন মৌলিক তেমনি রসঘন। কঙ্কাল গল্পের পরিকল্পনা ও আঙ্গিক অবিস্মরণীয়। 'সাধনা' পত্রিকা যে কয়দিন প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যেক সংখ্যায়ই রবীন্দ্রনাথের এক একটি ছোট গল্প পত্রিকার শোভা বৃদ্ধি করত। 'সাধনার প্রথম বর্ষের প্রথম ভাগে উপরোক্ত গল্পগুলি পত্রস্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত গল্পের নাম—'একরাত্রি' জয়পরা-

ঘর' 'জীবিত ও মৃত' ও 'ঠাকুর ঘর'। এইগুলির মধ্যে 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাহিনী যেমন অভিনব তেমনি তার বুনান নিশ্ছিদ্র। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলে 'সাধনা' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করল তেমনি তার রচনা পরিপরিবেশন রীতি বিশিষ্ট আকার ধারণ করল। এই বছরে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প কাবুলীওয়ালা, ছুটী, মহামায়া, শাস্তি ও সমাপ্তি আত্ম-প্রকাশ করল। কাবুলীওয়ালার বাৎসল্য রস মহামায়ার প্রেম-কল্পনা, ছুটীর করুণ রস, শাস্তির কঠোর ব্যঙ্গ, সমাপ্তি গল্পের নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সৃজনী প্রাচুর্য্যের অনবদ্য প্রমাণ। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে প্রকাশিত গল্পের মধ্যে সমস্যা পুরণ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি, মানভঞ্জন ইত্যাদি রবীন্দ্র প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। 'সাধনার' শৈশব-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সৃষ্টির একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে।

কবিতা ও ছোট গল্প ছাড়া 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিন্তাপূর্ণ সাহিত্যালোচনা প্রকাশিত হয়। ঐগুলির নাম 'বিদ্যাপতির রাধিকা' বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' বিহারীলাল, সাহিত্যের গৌরব। বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে অগাধ শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ অনুরাগ ছিল তাঁর ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিদ্যাপতির রাধা বর্ণনায় যে মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সরস আলোচনা ভঙ্গীতে তা সাধারণ পাঠককে পরিবেশন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজসিংহ রবীন্দ্রনাথের দুটি আলোচনাই অতুলনীয়। আর তাঁর কাব্যগুরু বিহারীলাল যাকে কবি বাংলার কাব্যকুঞ্জে 'ভোরের পাখী' নাম দিয়েছেন তাঁর কবিতার রস-বিচার বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁর ভিন্ন শ্রেণীর রচনার মধ্যে শিক্ষার হেরফের ও রাজা প্রজা পাঠকগণের অন্যতম প্রিয় আলোচনা। বিবিধ রচনার মধ্যে সাময়িক সার সংগ্রহ বিভাগে—মণিপুরের বর্ণনা আমেরিকার সমাজ চিত্র, পৌরাণিক মহা প্লাবন মুসলমান মহিলা প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার, সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য। ক্যাথলিক সোস্যালিজম রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন। সাময়িক সাহিত্যালোচনা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য ইত্যাদি পত্রিকার রচনাগুলি মুল্যায়ন করেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী 'সাধনা' পত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চ ভূতের মুক্তির পথ—সুবিচারের অধিকার, সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ সম্বন্ধে আলোচনাও প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করতে হয়। 'সাধনা' পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের যে কৃতিত্ব তা সহজে অনুমান করা যায় না। যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের সূচনাকাল থেকে লক্ষিত হয়েছে 'সাধনায়' তার আদৌ ব্যতিক্রম হয় নি। 'সাধনা' পত্রিকায় শিরোনাম পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টি যে কয়েকটি চরণের প্রতি প্রতিফলিত হয় এখানে সেইগুলি উদ্ধার করা হল :

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই
আগে চল, আগে চল ভাই।

গৌরী আমি আর অক্টোপাস

জ্যোতির্ময়ী দেবী

না গৌরী সেন নয়। যার অনেক দানপুণ্য ছিল সেকেলে নির্বোধ মূর্খদের মতন। 'বাণী'ও একটী ছিল না। যার নামে কোনো নগর, রাস্তা, সরু কানা গলি অবধি নেই! 'কর্পোরেশন' তো ছিল না। থাকলেই বা কি? তিনি তো মহামান্য ছিলেন না। সে যাক গে।—আমি সেই গৌরী সেনের কথা বলতে বসিনি।

আমি বলছি গৌরী দাসী নামে যে আমার কাজ করে তার কথা। দিনে কাজ করে আমার কাছে, আর অন্য জায়গায়ও।

আর রাত্রে এসে আমার ঘরে শোয়।

বেশীর ভাগই ভারি রাত করে। সাড়ে দশটা এগারোটা হয়ে যায়। সহর ঘুমোয় কি না জানি নে। আমার ঘুম আসে আর ভাঙে। পাড়ার নিনাদিত রেডিওগুলোও থেমে যায় প্রায়। দরজা খুলতে হবে তো। জেগেই থাকি।

সেদিন এলো তখনো জেগে একটু পড়ছি। মাত্র পৌনে নটা। অবাক! গৌরী! এত শীঘ্র আজ কি করে?

সে বললে 'এই এলাম'। বিছানা পাততে বসল।

বললাম খেয়েছ? জানি, ওর বাড়ীতে অনেক রাত্রে রান্না হয়। ওর বৌও তো কাজ করে লোকের বাড়ি।

সে শুয়ে পড়ল। বল্লে, না। আজ মঙ্গল বার। বললাম, 'ওর মঙ্গলবার ব্রত'? তা ছেলেদের কি? সে বললে, না বড় ভিড় নাকি। রেশন আনতে পারে নি। রান্না হয় নি আজ। বেলাকে কেনার (ব্ল্যাক) পয়সা নেই। গম কেউ ধার দিল না। ওরা চারটী মুড়ি আর কচু-আলু সেদ্ধ সবাই খাবে। তা মুড়িও তো ৪৲ টাকা সের (কেজি)… কার পেট ভরাব ১৲ টাকার মুড়িতে। সারাদিন কেউ কিছু খায় নি। হাঁড়িই চড়ে নি। সাত জনের জন্যে যে চাল গম দেয় তাতে চার দিন আধ-পেটা খেয়ে চলে।

উঠলাম।—বললুম ওঠো, দুখানা রুটী আছে খাও। নইলে বুড়ো মানুষ ঘুমোতে পারবে না। আমারি বয়সি সে।

ভারি লজ্জা তার খাওয়ার কথায়। বললে না দিদিমনি, ও থাক্। সকালে চায়ের সঙ্গে দিও।

বললাম 'না, না, ওঠো।'

প্রতিদিন সকালে 'মা রুটী দেবে' ভিখিরীদের জন্য মুষ্টি-ভিক্ষা রুটীই দেওয়ার আজ-কাল চলন হয়েছে। আমারো মাঝেমাঝে থাকে দুএকটা। রুটী দিতে গিয়ে মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে বিকালে বাসন মাজতে এসে জিজ্ঞাসা করে, দিদিমণি চা খাওয়া হয়েছে?'

আমিও অন্যমনস্ক ভাবে বলি হ্যাঁ। ভাবি চায়ের বাসন বার করে দিতে বলছে মাজবার জন্য।

কেউ আর কিছু বলে না। বাসন নিয়ে মাজতে বসে।

আজ চকিতে মনে হল, ওঃ সারাদিন কিছু খায় নি, ভেবেছিল হয়ত আমার চা খাওয়া না হলে থাকলে একটু চা চেয়ে নেবে।

আমি তো তা বুঝতে পারি নি।

খাবার দিয়ে ঘরে এসে বললাম, চা'ও খেতে পাওনি অন্য বাড়িতে বুঝি?

অপ্রস্তুত মুখে বললে 'না, তারা সব দিন দেয় না বিকেলের দিকে। সকালে দেয়।

ঠিকতো। চিনিও লোকের নিজেদেরই কম পড়ে।

'এসো জন' 'বসো জন' তো আছে গৃহস্থঘরে। মিষ্টি দেওয়া তো সোজা ব্যাপার নয়। এক কৌটা (সন্দেশ) রসগোল্লা পেঁড়া রেকাবীতে দেখাই যায় না ২টা ৪টা না হলে।

মনে পড়ল, ছোট বেলায় কোন্ পত্রিকায়, না কোন্ ছোটদের কাগজে দুটো প্রকাণ্ড ড্যাবডেবে চোখ আর মাকড়্সার মত আটটা সিরসিরে হাত-পা ওয়ালা "অক্টোপাস" নামে একটা জন্তুর ছবি দেখেছিলাম—সেটা একটা ডুবুরীকে ধরেছে তার আটটা বাহুর পাশে।

বেচারী ডুবুরির কোমরের দড়ি তাকে ওপরে টেনে নিয়ে বাঁচিয়ে ছিল কিনা, সেকথা লেখা ছিল না। আমরা ছোটরা শুধু ভয়ে কাঁটা হয়ে ওই অক্টোপাস জীবটা কত বড় আর মানুষ খায় কি না, তাকে খেয়ে ফেলবে কিনা তাই ভাবতাম।

সত্যি কি সেই 'অক্টোপাস' আছে সমুদ্রে? না সবই গল্প কথা।

* * *

অন্ধকারেই একটু হাসি আসে মুখে কি যেন মনে করে।

অক্টোপাস কাকে বলে? কতবড় জন্তু? হাঙ্গর কুমীরের মত বড়? কাল ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করব···।

কিন্তু আমি গুড় খুঁজছিলাম কৌটো ডিবেগুলোতে।

নাঃ গুড়ও নেই। গুড়তো ৩৲ ৩-৫০ হয়ে তখন। চিনিটুকু নিজের আর ওদের এবং অভ্যাগতদের চায়ের মাপেও কমই পড়ে। ওকে কি দিয়ে রুটী দুখানা দিই?

একটা ৮ ঠাকুরের সন্দেশ ছিল। দিলাম। বললাম, খাও। সন্দেশটীও ভেবেচিন্তে ঘরে রাখা হয়। এবং তার আকার? সে তো সবাই জানেন। তবু মনে ভাবি 'পাত্রে' না 'অপাত্রকে' দেওয়া? সে যাক। সে খেয়ে প্রচুর জল খেল। তারপর কাঁথাখানা পেতে শুয়ে পড়ল। ওর জল খাওয়া দেখে মন বললে 'পাত্রে'ই দিয়েছ। আহা সারাদিন খায়নি। কত জল খেল।

গল্প করেছে তার দেশ ছিল ময়মনসিংহে। দেশভাগের পরই আসেনি, এসেছে কয়েক বছর পরে।

দেশে এখনো জমি-জমা আছে। ধান জমি। গেরস্তদের পেট ভরা ধান জন্মাত।

দুটী ছেলে একটী মেয়ে আর দুই বিধবা ননদ নিয়ে সংসার।

মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাবা মরে গেল। বাড়ীতে আর রক্ষণাবেক্ষণের মত শক্ত পুরুষমানুষ কেউ রইল না।

আবার স্বগতই বলে যেন—তারপর? দেশ ভাগ হ'ল দিদিমণি। তা' আশপাশের গাঁয়ে গোলমাল লাগে আর আমরা হিন্দুরা ভয়ে কাঁটা হয়ে যাই। কি করি কোথায় যাব, দেশ জমি মাটী ঘর বাড়ি পড়শী বন্ধু ছেড়ে!

নতুন বিয়ে দেওয়া জোয়ান বউটাকে নিয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি ঘরে। পুকুরে যায় না। ঘরের বার হয় না। কিন্তু গাঁ দেশ তো। সবাই দেখতে পায় কোন্ ঘরে কার জোয়ান মেয়ে বৌ আছে।

মুসলমান পড়শীরা বলে 'ভয় নেই দিদি ঠাকুরুণ, আমরা কিছু হতে দিব না এগাঁয়ে···।

কিন্তু এপাশ ওপাশের গাঁয়ের গোলমাল ভুতের হাতের মত হাত পা বাড়িয়ে দিচ্ছে চার দিকের গাঁয়ে।···আমারও এ সবই জানা আর শোনা কথা। কিন্তু দুঃখের কথা তো পুরোণো হয় না। আবার সে সেই কথাই বলতে থাকে। আমিও শুনি। আর নতুন কথা কি বলবে! নতুন কথা আছেই বা কি জগতে। মানুষের শুধু দুঃখের কথা ছাড়া! রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কোরাণ বাইবেলেও তো এই মানুষদেরই কথা। হয়ত বা রাজা রাণী, ধনীদের কথাই বেশী। কিন্তু তারাও তো সেই মানুষই।

গৌরী কাঁথাটা টেনে গায়ে দিল। তারপর বললে, তারপর আর আর ভরসা করতে পারলাম না দিদিমণি। বড় ছেলে বললে, মা এখানে থাকলে মান-ইজ্জত রাখতে পারব না তোমাদের। বৌকে নিয়ে চল কলকাতায় পালাই। চাকরী না পাই মুটেগিরি করব···।

গৌরী চুপ করে একটু। তারপর বলে 'আর কত ধান আমাদের জমিতে দিদিমণি! বিক্রী করে খেয়েও ফুরোত না···। সেবারেও কি ফলন ফলেছিল। এদেশের সে ধান কোথায় গেল দিদিমণি। জন্মায় না আর?

জিজ্ঞাসা করি কি করলে? কারুকে বেচে দিয়ে এলে জমিজমা?

না দিদিমণি। পাশের পড়শী মুসলমানরা নিল। বল্লে, ঠাকুরুণ কিছু করে দিব। আসবে যখন। জমি তোমারি থাকবে।

গৌরী বিমর্ষভাবে বলল 'আর গিয়েছি কথনো। কি করে কার ভরসায় যাব।

আর কি কথনো পেটভরে ভাত খাব দিদিমণি।

জানলার আলোয় অন্ধকারেই দেখলাম, সে চোখদুটো মুছছে।

কিছু বলতে পারলাম না। কি আর বলব। অন্নের দুঃখ সব চেয়ে বড় দুঃখ। বস্ত্রাভাব নয়। ঘর সংসার নয়... অন্নের অভাব জীব-জন্তুরও যেমন মানুষেরও তেমনি।

° ° •

হ্যাঁ স্বপ্নই দেখলাম।

সেই অক্টোপাসটা আমার ঘরে তার সাপের মত কালো-কালো শেওলাধরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাঁকড়ার মত দাড়াওয়ালা বড় বড় নখ—একটা হাত গৌরীর গলায়। আর একটা হাত আমার দিকে বাড়াচ্ছে। সেই নোংরা পিছলা সেঁতসেঁতে হাত প্রায় আমার গলায় ঠেকল বলে। কি করে ঢুকল ঘরে।...আর তার বড় বড় চোখ দুটো? সেটা যেন কোথায় অনেক দূরে—অনেক অনেক দূরে থেকে তাকিয়ে আছে হাজার মাইল দূরে সেই মস্ত রাজার বাড়ি থেকে এক রাজধানীতে। আর সব দিকেই তার সেই অনেক হাত বাড়ানো। রাজধানী দেশটার নামটা আর মনে করতে পারছি না। স্বপ্নে সব ভুল হয়ে যায়।

কি ওটা সাপ নাকি? ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। ঐ তো গৌরী ঘুমুচ্ছে। ঘরে কি সাপ ঢুকেছে। নাঃ এতো গ্রাম নয়। কলকাতা। বিছানা পরিষ্কার। আঁচলটা গলায় জড়িয়ে গেছে ঘেমে উঠেছি তাই। এবারে সেই দেশের নামটা মনে পড়েছে। উঠে বসলাম। মনে হ'ল গৌরীর কথা 'আর কি কথনো পেট ভরে ভাত খাব।'

মনে এলো রামরাজ্যে শূদ্রক বধ হয়েছিল। শূদ্রক, না শূদ্র বধ? বানানটা ভুল হয়েছিল কি? মনে হচ্ছে শূদ্রই হবে।

ঘুম আর এলো না সে রাত্রে। বৃদ্ধা গৌরীর শীর্ণ ক্লান্ত ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে মনে এলো—নাঃ, আর কোনো দিন তোমরা 'গৌরীরা' পেট ভরে এই রামরাজত্বে ভাত খেতে পাবে না। ঐ অক্টোপাসের কালো নোংরা পিছল হাত তোমাদের পিষে টিপে নখ বিঁধিয়ে মেরে ফেলছে। তোমরা কি ওকে ধরতে পারবে কথনো? তোমরা মরেই যাও। ভাগ্যিস্ মৃত্যু আছে! মরে না গেলে 'মানুষের কি হ'ত! মরেই বাঁচবে ওরা।

ফরাসডাঙ্গার মুক্তিসাধনা

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাসী শাসিত চন্দননগরকেই সে সময়ে দূরে বা কাছের সবাই ফরাসডাঙ্গা বলে জানতেন। সেই সময়ের এখানকার অধিবাসীদের মুক্তির জন্য যেসব চেষ্টা করেছিলেন সেই বিষয়ে কিছু অনুধাবন করা দরকার। একথা বিস্মৃত হলে যে কোন ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে খুবই অমর্য্যাদার বিষয় হয়ে যে এই ফরাসডাঙ্গা একটি ক্ষুদ্র শহর হলেও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে এর একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। সাধারণ-ভারতীয়ের তুলনায় এখানকার স্থানীয় লোকেদের জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবতঃ এই জন্যই বর্তমান কালের প্রবীণতম রাজনীতিবিদ শ্রীরাজাজী ভারতে যোগদানের জন্য গৃহীত গণভোট ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরবাসীকে অভিনন্দিত করেছিলেন এই বলে—"জল যে রক্তের চেয়ে গাঢ় চন্দননগরের বন্ধুরা আজ তাই প্রমাণ করলেন।" এই হচ্ছে স্বাধিকার লাভের একেবারে শেষ পর্য্যায়ের কথা। তাই একেবারে প্রথম থেকে বিচার করা যাক, কিভাবে এই ফরাসডাঙ্গার অধিবাসীরা স্বাধিকার বিষয়ে ধীরে ধীরে চিন্তা করেন আর কিভাবে বিশাল ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ থেকে স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন।

ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডির মধ্যে থেকে ফরাসডাঙ্গার অধিবাসীরা খুব যে ফরাসী-শাসকদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই শহরের প্রজারা সাধারণভাবে কিছু বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিলেন যা যে-কোন ব্রিটিশ-শাসিত শহরের পক্ষে ছিল অভাবনীয়। যেমন প্রত্যক্ষ কর ছিল না, বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল বেশীর ভাগ অপরাধ খুব গুরুতর না হলে সেই অপরাধীর প্রথমবারের জন্য খালাস পেয়ে যাওয়ার সুযোগ। এই সবের জন্য-ব্রিটিশ-ভারতের তুলনায় তাঁরা অনেক সন্তুষ্ট ছিলেন। এমন কি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই শহরকে ব্রিটিশকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব এই শহরবাসীরা প্রতিবাদ জানান যার ফলে শহরটি আগের মতই ফরাসী-শাসনেই রয়ে গেল। কিন্তু এই ঘটনা থেকে একথা মনে রাখার কোন কারণ নেই যে, শহরবাসীরা বোধহয় ফরাসীদের অধীনে থাকতে চান। তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ-শাসিত হওয়ার চেয়ে ফরাসীশাসিত থাকা ভাল এই কথা মনে করেই শহরবাসীরা এই হস্তান্তরে বাধা দেন।

ফরাসীশাসনে যেমন বিশেষ কয়েকরকম সুবিধা ভোগ করা সম্ভব ছিল তেমনি কোনরকম জাতীয় চেতনাবোধকে প্রথম অবস্থায় বাধা দেওয়ার অভ্যাস ফরাসীদের বেলায় ঠিক ইংরাজদের মত অতটা প্রত্যক্ষ ছিল না। কিন্তু এত সুবিধার অধিকারী হয়েও শহরবাসীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং নিজেদের স্বাধিকার লাভের চিন্তা একেবারে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই তাঁদেরকে অস্থির করে তুলেছিল। কি অবস্থায় পড়ে শহরবাসীরা স্বাধীনতার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন তারও অনেক কারণ ছিল।

ফরাসী শহরের তোরণদ্বারে, ভবনে, সর্ব্বত্র—"সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" ঘোষণা করছেন কিন্তু তাঁদের উপনিবেশে শাসক ও শাসিত পৃথক দুই শ্রেণীর নাগরিকভাবে গণ্য হতেন। শহরবাসীরা মনে করতেন যে, ফরাসীরা শুধু বিশ্বের কাছে নিজেদের উদারতা জাহির করার জন্যই এই বাণী ঘোষণা করে থাকেন। শাসকদের সৃষ্ট এই শ্রেণী-বৈষম্য শহরবাসীর মনে স্বাভাবিক-

ভাবেই একটা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্র একটি শাসকগোষ্ঠি এতদূর স্পর্দ্ধা দেখান যে, এখানকার সাহেব বা ইয়োরোপীয় অধ্যুষিত এলাকাকে মানচিত্রে 'সাদা আদমির' মহল্লা বলে দেখাতেও লজ্জা বোধ করেন নি, এবং পাশে অপর একটি এলাকাকে 'কালো আদমির' মহল্লা বলে দেখান হয়েছিল। শিক্ষার সুযোগ ব্রিটিশ-এলাকার চেয়ে অনেক ব্যাপক থাকা সত্বেও শহরে শাসকদের ভাষার মাধ্যমে ছাড়া কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হত না। এরকম কয়েকটি নিদর্শন ছিল যা থেকে বেশ জানা যায় যে ফরাসীরা ব্রিটিশের চেয়েও অনেক কম উদারতা দেখিয়েছেন।

এমনি ধরণের ছোটখাট নিষেধের গণ্ডি বা শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি সাধারণতঃ মানুষকে স্বাধিকারের বিষয় চিন্তা করতে উৎসাহ দেয়। তাই চন্দননগরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ থেকে শহরবাসীরা চেষ্টা করছিলেন যাতে ইংরাজীর মাধ্যমে শহরে বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, কিন্তু সরকারের বাধায় সে-চেষ্টা কিছুতেই সফল হয় না। অথচ ইংরাজী না শিখলে বিশালাকায় ব্রিটিশ-ভারতে জীবিকার অন্বেষণে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তাই শহরের কিছুটা অংশ ব্রিটিশকে দেওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যে সেই হস্তান্তরিত এলাকায় গড়ে উঠল একটি বিদ্যালয় যার উদ্যোক্তারা মূলতঃ ফরাসী এলাকারই অধিবাসী। এ হল শহরের উত্তরাংশের ঘটনা। আবার অনেক দেরিতে হলেও শহরের দক্ষিণাংশের অধিবাসীরা একটি মিশনারীদের পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয় তুলিয়াছেন এবং নিজেরা বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার নেন। দক্ষিণ এলাকায় বিরাট বসতি যা বহুদিন থেকে গোন্দলপাড়া নামে পরিচিত, সেখানে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর শহরের বাহিরে ভদ্রেশ্বর অপর একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ফরাসী ভাষা ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার উদ্দেশ্যেই ফরাসী ভাষার মাধ্যমে যে St-Mary's Institution পরিচালিত হত তাথেকে যাতে বালকেরা পৃথকভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় শুধু সেই জন্যই ভদ্রেশ্বরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। অপর একটি বিদ্যালয় ফরাসী-এলাকার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এর নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গ বিদ্যালয়'। শুধু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়, গোন্দলপাড়ার অধিবাসীরা সাঁতার শেখার ব্যবস্থা, শরীর চর্চা অন্যান্য ক্রীড়া-শিক্ষার ব্যবস্থা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সকলকে সংগঠিত করে আনেন।

ফরাসডাঙ্গার মধ্যে গোন্দলপাড়া যে এতখানি নিজেদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন, এর কারণ শুধু যে তাঁরা ফরাসী-শাসকদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন তা নয়। প্রায় ৩০ বছর ধরে ব্রিটিশ-ভারতের ঘটনাবলী তাঁদের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতিগতভাবে ফরাসডাঙ্গা চিরকালই ছিল বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ ও তার পরবর্তি ঘটনা এবং নীলকরসাহেবদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের বিদ্রোহ এ সবই তাঁদের বিচলিত করেছিল। এছাড়া ছিল এই শহরের শিক্ষা দীক্ষায় একটা শীর্ষস্থান যা তখনকার দিনে ভাগীরথির পশ্চিমতীরে শুধুমাত্র উত্তরপাড়ার সমকক্ষ ছিল। তাই গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে এই দুই শহরের ভদ্রলোকেরা সমগ্র বাঙালী সমাজকে পথনির্দেশ দিতে এগিয়ে আসেন। সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদানপ্রদানও তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার আদানপ্রদানও চলতে লাগল। এক কথায় তখনকার মত ফরাসডাঙ্গা ও বাংলাদেশ যেন অবিভাজ্য ও এককভাবে কাজ করে চলল।

জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সময়ে যেমন "তত্ত্ববোধিনী" ও "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" সমগ্র বাঙালী সমাজকে উৎসাহ দিয়েছিল তেমনি এই সব পত্রপত্রিকার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে গোন্দলপাড়ার অধিবাসীরা তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশকে জাগ্রত করে তুলতে থাকে। এই সময়ে গোন্দলপাড়া থেকে জাতীয়তাবাদী প্রকাশিত মোট পত্রিকার সংখ্যা অপর যে কোন ছোট শহরের পক্ষে কল্পনার অতীত। মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে প্রকাশিত—'প্রজাবন্ধু,' 'উষা,'

'হিতসাধিনী পত্রিকা,' 'চন্দননগর প্রকাশ,' 'সুরভি ও পতাকা,' 'The. Beaver,' 'সমাজ দর্পণ,' 'ধূমকেতু,' 'বঙ্গবন্ধু,' 'মুকুলমালা,' 'বঙ্গপ্রভা,'—এই সমস্ত পত্রিকা শুধু যে এই শহরের সাংস্কৃতিক শীর্ষস্থানের নিদর্শন তা নয়, এর সঙ্গে ছিল জাতীয় চেতনার প্রসারে সমগ্র বাংলাদেশকে উৎসাহিত করা। যখন গোন্দলপাড়ায় এতগুলি পত্রিকার প্রকাশন চলেছে ঠিক সেই সময়ে সমগ্র ভারতে জাতীয়তার ভাবধারাকে কেন্দ্রিভূত করতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র একটা বিরাট জনমণ্ডলিকে সুসংবদ্ধ ও সংহত করার সুযোগ আসে, যার প্রভাবে দেশের বেশীরভাগ জনসাধারণ স্বাধীনতা চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে থাকে। সমগ্র দেশকে যখন নতুন ভাবধারা প্রভাবিত করছে, ফরাসডাঙ্গাতে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা দেয়। ফলে এখানকার অধিবাসীরাও আরও গভীরভাবে বাইরের বাঙ্গালীর বা ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্মবোধে নিজেদের পৃথক শাসনগত স্বত্বাকে অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। স্থানীয় শাসকেরা অনেকটা নির্বিকার থাকায় জাতীয়তাবোধের প্রসারে শহরবাসীরা খুব সহজভাবে ও বিনাবাধায় তাঁদের সংগঠনী কাজ ও পত্রিকা প্রকাশনের কাজ চালাতে থাকেন।

নিয়মতান্ত্রিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে খুশি করতে পারে না। কারণ মোলায়েমভাবে ব্রিটিশের কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করাই একমাত্র পথ বলে তখন কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ তরুণরা এই ধরণের কার্যকলাপের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ফলে নতুন পথ নির্দেশের অপেক্ষায় অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেন।

বাঙালি সম্প্রদায়কে সচেতন করে তুলতে তখনকার দিনে নবীনচন্দ্রের কবিতায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে যা লিখিত হয়েছিল তা হচ্ছে—

"সাধে কি বাঙালি মোরা চির-পরাধীন ?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? করে প্রতিদিন
অপমান শত চক্ষের উপরে ?…

* * *

এছাড়া ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র জাতীয়তাবোধ আরও প্রসারিত করেছিল। তার উপর ছিল কয়েকজন বরেণ্য নেতা—যাঁদের মত ও পথ সমগ্র দেশবাসী খুবই সময়উপযোগী বলে গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে বিশেষভাবে জনমানসে যাঁরা শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—রমেশ দত্ত, মহামতি গোখলে, তিলক, লাজপত রায়, দাদাভাই নৌরজী, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ। এঁরা সকলেই জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই একটা নতুন চেতনা সারা দেশে প্রসারিত করলেন। যার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের আগেকার নিয়মতান্ত্রিক স্বাধিকার আদায়ের পদ্ধতি ধীরে ধীরে নতুন পথ নিল। সমগ্র ভারতের যখন এই অবস্থা তখন ফরাসডাঙ্গার স্বাধীনতাকামী কর্মীরাও নীরবে দিন কাটাতে পারেন নি। তাই দেখতে পাওয়া গেল যে এই সহরের বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠান, সমিতি প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যচর্চা ও প্রসারের নামে জাতীয়তাবোধের প্রসার এসব কাজকর্ম চলতে থাকে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে শহরের গোন্দলপাড়া অঞ্চলের অধিবাসীরা যে সর্বশেষ ভাবধারায় বিশেষভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে "বান্ধব সম্মিলনী" ও "পাঠ সমাজ" প্রতিষ্ঠায়। সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে যুবকদের জনকল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করাও ছিল এইসব সংগঠনের প্রধান কার্য্যপদ্ধতি। তাছাড়া রাজনীতির বিষয়েও বিশেষ নজর রাখা হত এই সব সংগঠনে। কিন্তু এত উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল একেবারে বাংলার বাইরে সুদূর পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে। প্রথমযুগের শাসক-বিরোধী আন্দোলনে ফরাসডাঙ্গা তথা বাংলাদেশ অগ্রণী হতে পারেনি। সেই আন্দোলন উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রসার লাভ করেছিল, তার কারণ তখনও সেখানে পূর্ব্বেকার স্বাধীন নৃপতির বংশধরেরা খুব দ্রুত ইংরাজবিরোধী কার্য্য-

কলাপে এগিয়ে এসেছিলেন। প্রথমে এই আন্দোলন যে বিপ্লবের রূপ নেয় মহারাষ্ট্রে তার একটা বিশেষ কারণ ছিল! সেখানে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়, সেই সুযোগে এই রোগ দমনকল্পে সরকারী নিয়ম ও ব্যবস্থা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এতদূর লাঞ্ছনা, ধর্ম-বিরোধী কাজকর্ম সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় যা মহারাষ্ট্রবাসীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। প্লেগ-কমিটির সদস্য মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দুইজন মহারাষ্ট্র-বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। ইংরাজহত্যার শাস্তি-স্বরূপ দামোদর চাপেকারের প্রাণদণ্ড হয়। সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রথম ইনিই প্রথম আত্মোৎসর্গ করেন। যেসমস্ত বিপ্লবীরা এই ধরণের কাজে নেতৃত্ব করতেন তাঁরা এটা বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, ইতস্তত কয়েকজন ইংরাজকে হত্যা করাতেই যে ইংরাজ-শাসন শেষ হয়ে যাবে তা সম্ভব নয়, তবে এর মাধ্যমে জনসাধারণকে আরও বেশী-সংখ্যায় উৎসাহী করে তোলা সম্ভব হবে। তাই এই ঘটনার পর থেকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে নানা ধরণের গুপ্ত-সমিতি যার উদ্দেশ্যই ছিল যুবসমাজকে বিপ্লব-কাজে উৎসাহিত করা। মহারাষ্ট্রে যে প্রথম বিপ্লবের পদধ্বনি হল, তার প্রভাব ক্ষুদ্র ফরাসডাঙায় পরি-ব্যাপ্ত হল। এখানকার বীর বালক কানাইলাল তার কৈশোরে মহারাষ্ট্রে বাস করার সুযোগ পেয়েছিল। প্লেগের দমন ব্যবস্থা নিয়ে ইয়োরোপীয়দের অত্যাচার ক্ষুদ্র এই বালকের মনে শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা স্থায়ী ঘৃণার ভাব এনে দেয়। যার ফলে বিদেশী বালক তার মনকে বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করতে থাকে, আর তার ফলে স্বাধীনতা-আন্দোলনে শীর্ষ-স্থান অধিকার করে সকলের শ্রদ্ধা নিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাই সুদূর মহারাষ্ট্রের কার্য্য সে এই ফরাসডাঙ্গায় প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গত শতাব্দীর শেষে বিপ্লবান্দোলন বাংলাদেশে যায়নি। স্বাভাবিক কারণেই ফরাসডাঙাতেই এমন কোন কার্য্যকলাপ দেখা যায় না যাকে প্রত্যক্ষআন্দোলন বিপ্লব বা রাজদ্রোহ বলে মনে করা যায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রের আন্দোলনের ফলস্বরূপ সমগ্র দেশে বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতি গড়ে ওঠে। বাংলার বাহিরের কয়েকটি বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে চন্দননগরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার শাখা চন্দননগরেও স্থাপন করা হয়। বাহিরের লোকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাতে গুপ্তভাবে বিপ্লবকার্য্য চলতে পারে, এজন্য অরবিন্দ ঘোষ এই সময় বাংলাদেশে পদার্পণ করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবকে বিস্তার করা এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারও ১৯০৩ সালে একই উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলায় আসেন। ফরাসডাঙায় জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত সকলেই একেবারে প্রথম থেকে এঁদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, প্রবর্ত্তকসংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় নামে একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এরই এক বাৎসরিক অনুষ্ঠানে স্বামী অভেদানন্দ এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় চন্দননগরবাসীদের এক নতুন ভাবধারার সৃষ্টি করেন।

বাংলাদেশের বেলায় যেমন প্রকাশ্যভাবে শত শত লোকের জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেল, শুধু মাত্র 'স্বদেশী আন্দোলন' ও 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' এই দুইটি একই সময়ের আন্দোলন নিয়ে ফরাস-ডাঙাতেও একটা বড় রকমের আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই দুইটি আন্দোলন এত ব্যাপক ছিল যে ইংরাজশক্তি রীতিমত ভীত হয়ে পড়েন। এই সময়ে সমগ্র ভারতে অসন্তোষ তেমন জোরাল না হলেও বাংলাদেশে প্রতিবাদের ঝড় বইতে সুরু করল। বিভিন্ন পত্রিকার লেখক, সম্পাদকদের গেপ্তার, হয়রানি, মামলা রুজু করা, শাস্তি দেওয়া চলতে থাকল। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থিরা প্রথমে এই সব আন্দোলনে সম্মতি দেন নি। কিন্তু চরমপন্থি নেতাদের অসীম জনপ্রিয়তার কাছে তাঁদের [illegible]

সরকারের বাংলা ভাগ করার প্রস্তাবকে শেষপর্য্যন্ত প্রতিবাদ জানানর সম্মতি দেওয়া হয়। এছাড়া এই বছর সর্বপ্রথম কংগ্রেস থেকে ঘোষিত হয়—"স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সর্ব্বত্র যেন আগুন ছড়াতে লাগলেন। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ফরাসডাঙ্গার কর্ম্মীরা সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন উৎসাহে এই উভয় আন্দোলনে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতি যার শাখা ফরাসডাঙ্গাতেও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাদের সভ্য সংগ্রহ কাজে বিশেষ ভাবে জোর দেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিলাতিদ্রব্য বর্জন-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শত শত যুবক যখন মিলিত হল তখন বিপ্লবীদলের কর্ম্মীসংগ্রহ সহজ হল। আর প্রকাশ্য আন্দোলনকে সামনে রেখে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করার সুযোগ আরও বেশী করে পাওয়া গেল এবং বিপ্লবীরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন যায়গায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈরি, এসব বিষয়ে যুবকদের নিয়মিত শিক্ষা দিতে থাকলেন।

স্বাদেশিকতা ও বিপ্লববাদকে সমর্থনকারী "সন্ধ্যা" "বন্দেমাতরম" ও "যুগান্তর" এই সময় সরকারী-নীতির কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। এর মধ্যে চন্দননগরের প্রখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথের লেখাগুলি সত্য সত্যই অপরাপর বিপ্লবী যেমন অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার এঁদের লেখার মতই উৎসাহ উদ্দীপনায় মূল হয়ে দেখা দিল। বিপ্লবকার্য্যের গোড়া থেকেই অসংখ্য বিপ্লবীর ফরাসডাঙ্গায় যাতায়াত ছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল যে, এখানকার ফরাসী, সরকার এসব কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপের উপর ইংরাজের মত কঠোরতা অবলম্বন করেন নি। এই সঙ্গে মতিলাল রায়ের বাসস্থানে যে-কোন গুপ্তভাবে আশ্রয়প্রার্থী বিপ্লবী স্থান পেতেন। যার ফলে বাংলাদেশের সকল বিপ্লবীদের মূল কর্ম্ম-কেন্দ্র হিসাবে ফরাসডাঙ্গা একটি সকলের কাছে মর্য্যাদার স্থান পেয়ে গেল।

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলার সঙ্গে ফরাস-ডাঙ্গার অধিবাসীরাও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। লর্ড কার্জনের Bengal partition a settled fact কে unsettled করার উদ্দেশ্যে যখন সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজ গর্জে উঠেছে তখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এই সহরের কর্ম্মীরা ইংরাজের এই বিভেদ-নীতির প্রতিবাদ না করে পারেন নি। তাই সুরু হল রাখীবন্ধন উৎসব, যার মাধ্যমে বাঙ্গালী সংকল্প গ্রহণ করল, বিভক্ত-বাংলাকে আবার মিলিত করতে হবে। "বন্দেমাতরম" ধ্বনির মাধ্যমে সকল সভা ও শোভাযাত্রা পরিচালিত হত, তাই ভয়ে ইংরাজ এই ধ্বনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। স্থানীয় ফরাসী-সরকারও ইংরাজের নির্দ্দেশমত এই ধ্বনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

ফরাসী-সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে ফরাস-ডাঙ্গায় এই সময় একবার কয়েক শত যুবক লাঠি হাতে জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জনের দিনে এক বিরাট মিছিল বা শোভাযাত্রা বার করার চেষ্টা করে। এই অভিযানে নেতৃত্ব করেন চারুচন্দ্র রায়। এর সঙ্গে বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ বসন্তকুমার ও উপেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ইংরাজের কাছ থেকে ধার করা বিরাট এক সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করলেন ফরাসী-সরকার। এদিকে যুব-বাহিনী খুবই উত্তেজিত। একটা বড় রকমের রক্তক্ষয় অনিবার্য্য দেখে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহ পরিকল্পিত এই মিছিল পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সেদিনের সেই আয়োজন ও উত্তেজনা বিসর্জন অনুষ্ঠান দর্শনার্থী হাজার হাজার দূরাগত লোকের মনে এইসব বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে একটি ঘৃণার ভাব এনে দেয়।

ইতিমধ্যেই ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন মাত্র দুমাস আগের বর্জন বা (বয়কট) আন্দোলনকে ভিত্তি করে চলছিল রাখীবন্ধন উৎসব, যার উদ্দেশ্যে ছিল বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রহিত করা। উভয় আন্দোলন একই সঙ্গে চলায় ক্ষুদ্র ফরাস-ডাঙ্গায় একটা বড় রকমের জাগরণের লক্ষণ দেখা গেল।

স্বদেশী-আন্দোলনকে আরও বেশী জোরাল করার উদ্দেশ্যে এই সময়ে সহরবাসীরা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে

আমন্ত্রণ জানান। তাঁহার আগমনে এক নূতন সাড়া পড়িল। এই সময়ে কয়েকটি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সভার মাধ্যমে প্রচারের ফলে ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় দেশী বস্ত্র সংগ্রহ ও বিক্রয়ের কাজে হাত দেয়। গোন্দল-পাড়ায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে কেনা সমস্ত বিলাতি কাপড় একরাত্রের মধ্যে বদল করে দেশী কাপড় দেওয়া হয়। বিলাতি বস্ত্র পুড়িয়ে না ফেলে দরিদ্রদের বিতরণ করা ভাল, বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথের এই নির্দেশ অনুযায়ী সবাই তাই করেন।

স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে ফরাসডাঙ্গার হাটখোলা নামে এক পল্লীতে একটা বিরাট স্বদেশীসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই সময়ের কয়েক বছর আগে থেকেই সকল রকম জাতীয় আন্দোলনে বাধা দেওয়ার জন্য ইংরাজ-সরকার ফরাসী-শাসকদের প্ররোচনা দিতে থাকেন। যার ফলে হাটখোলার এই সভার স্থান তখনকার মেয়র তার্দিভাল সাহেব মিলিটারী পাহারা মোতায়েন করে সভা অনুষ্ঠিত হতে দিলেন। সাধারণভাবে ফরাসী-প্রজাতন্ত্রে যে সভা অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা আছে সে অধিকার খর্ব করেন। ফরাসডাঙ্গার বিপ্লবীরা এই ঘটনার এক বছরের মধ্যেই মেয়র সাহেবের জীবন নাশের চেষ্টাও করেছিল। সে সময় অবশ্য আরও দুটি নূতন আইন প্রয়োগ করে বিপ্লবী-দের সবরকম কাজে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে এই সময়ে 'বন্দেমাতরম্' 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক লেখক সকলেই কঠোর ভাষায় শাসকদের সমালোচনা করতে থাকে। ফলে তাঁদের অনেককে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এইসব প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথের লেখাগুলি বাংলাদেশের যুবক-দের মনে নূতন প্রাণসঞ্চার করে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অসংখ্য যুবক বিভিন্ন গুপ্ত-সমিতির সভ্য হয়ে গেলেন। কর্ম্মী সংগ্রহ যখন বেশ কিছুটা এগিয়েছে তখন আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ বোমা তৈরী প্রভৃতি কাজ চলতে থাকে। এই সবের প্রধান দুটি ঘাঁটি গড়ে উঠল। একটি ফরাসডাঙ্গার মতিলাল রায়ের বাসস্থানে, অপরটি মুরারীপুকুর বাগানে। দেশের যৌবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইংরাজকে সন্ত্রস্ত করে তোলাই ছিল কর্ম্মীদের কাজ। পরবর্ত্তী স্বাধীনতা-আন্দোলনে ফরাসডাঙ্গার বিপ্লবীরা সমানভাবে বাইরের পরিচালনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

[৯]

অপরূপা তার পরদিনই জ্যাঠাইমার বাড়ী ছেড়ে মা ও ভাইয়ের সঙ্গে নিজের গ্রামে যাত্রা করল। কেমন যেন তার সমস্ত ব্যাপারটাই উপকথার মত লাগছে। এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ের রাজপুত্রের গলায় মালা দেওয়া। জ্যাঠাইমার বাড়ী থেকে বিয়ে হলে খুবই যে ধুমধাম হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপরূপা খুব বুদ্ধিমতী না হলেও এটা বুঝল যে তাতে তার লাভ বই লোকসান নেই।

কিন্তু কনে তুলে নিয়ে বরের বাড়ীতে বিয়ে দেওয়াটায় মেয়ের বাপের সম্মতি হবে কি? এইটাই হল অপুর মায়ের ভাবনা। যাই বল, এটা একটা খাট হওয়াও বর-পক্ষের কাছে? তার স্বামী কি রাজী হবে? যতই বলনা কেন জ্যাঠাইমার বাড়ী থেকে বিয়ে হচ্ছে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবেনা। সবাই বুঝতে পারবে যে বরের বাড়ীতেই বিয়ে হল।

ক্রমাগত এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় কনকলতা শেষে চটে গেলেন। বললেন, "তবে বাপু নিজেদের মান মর্য্যাদা নিয়ে নিজেদের ঘরে বসে থাকগে। এখানে আর কাঁদুনি গাইতে এস না। বি-খরচায় প্রায় রাজার বাড়ীতে বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল, তা সইবে কেন তোমাদের পোড়া-কপালে? ঘটে ভগবান আধ কানাকড়ির বুদ্ধিও ত দেননি? যাও, এখন ভাঙা ঘরে বসে গোবর ঘাঁটগে। মেয়েকেও তেমনি ঘরে দিও। শিক্ষাদীক্ষাও ত তেমনি দিয়েছ।"

অপুর ভাই বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি আগেভাগে ভাবছ কেন জ্যাঠাইমা? বাবা ন্যাকা বলে কি এমনি ন্যাকা যে নিজের ভাল মন্দও বুঝবেনা? আমাদের আবার মান-মর্য্যাদা! খেতে পাইনা ত মাসের মধ্যে দশদিন। একটা মেয়ের যদি না বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, তাতেও বাগড়া দেবে? দের যদি ত শুনবে কিছু আমার কাছে। বাপগিরি কলান বার করে দেব। রেখেছে ত বাঁদর বানিয়ে সবাইকে, একটারও ত গতি হত।"

কনকলতা বললেন, "নে বাপু, আর পাড়া মাথায় করে গাল মন্দ করিসনা। আগে বাড়ী গিয়ে দেখ্ কি বলে। গরুর গাড়ীটা ত ফিরবে রাত্রে, তার হাতে তোর বাপকে বলবি চিঠি দিয়ে দিতে। দাদারও ত আজ রাতে যাবার কথা। বড়জোর আজ রাতটা থেকে কাল সকালে যাবে।"

অপরূপা এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে সকলের কথা শুন-ছিল। হঠাৎ তার স্থূল বুদ্ধিতেও কিসের যেন জোয়ার এল। সে মাকে ঠেলা দিয়ে ফিশফিশ করে বলল," না মা, এ সম্বন্ধ ছেড়োনা, এইখানেই বিয়ে দিও।"

তার মা ধমকার দিয়ে উঠলেন, "এই শোন দাদা মেয়ের কথা। তোকে এর মধ্যে কথা কইতে ডেকেছে কে? হায়া নেই, লজ্জা নেই?"

তাঁর ছেলে বলল, "তোমাদের যদি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত, তা হলে কি আর আমাদের সব কথায় কথা বলার দরকার হত? নাও, চল এখন পুঁটুলি বেঁধে নাও, রোদ বড় খর হয়ে উঠছে।"

ছোট বড় পুত্র কন্যা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বিদায় হলেন। কনকলতা তাঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে ঘরে

ঢুকে বললেন স্বামীকে, "তোমার আপন জন হলে কি হবে বাপু, বড় বোকা। নিজের ভালমন্দটাও বুঝবেনা গা?"

স্বামী একটু আহত হয়ে বললেন, "তা গরীব হলেও মান অপমান জ্ঞান থাকতে পারে ত? এধরণের বিয়ে দেশে কখনও দেখেছ?"

কনকলতা বললেন, "নাই বা দেখলাম? জগতের কত কিছুই ত আমি দেখিনি, তাই বলে সেগুলো কি নেই? এইত পূব বাংলায় কত বিয়ে হচ্ছে এরকম, তারা কি বাঙালী নয়?"

কনকের স্বামী আর কথা বাড়ালেন না। স্ত্রীকে অবলম্বন করেই এখন তিনি সংসারসমুদ্রে ভাসমান, অনর্থক তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে হবেই বা কি? নিজেদের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করার মত যোগ্যতা নিয়ে যখন তাঁরা জন্মগ্রহণ করেননি, তখন অন্যের কাছে মাথা হেঁট করতেই হবে। নিজের মেয়ে দুটোর কি দশা হবে কে জানে? সকলের ত অপুর মত কপাল হয়না?

রামপদ রোদ উত্তাপ অগ্রাহ্য করে খানিক খানিক বাইরে বাইরে ঘুরলেন। দেশের জমি, তাঁর নিজের জ্যাঠামশায়ের জমি সব একটা ফিতে নিয়ে মেপে হিসেব করে ফেললেন। হেমলতা ডেকে বললেন,"ও দাদা,অমন করে রোদ লাগিওনা মাথায়। অসুখে পড়বে। তুমি বরং বিশু খুড়োর ছেলে মৃগাঙ্ককে ডেকে পাঠাও, সে ত ঠিকাদারের কাজই করে, সে সব বলতে পারবে যা তুমি জানতে চাও।"

রামপদ বললেন, "সে এখন গ্রামেই থাকে নাকি?" কনকলতা বেরিয়ে এসে বললেন, "এখানেই থাকে, ওর সারা সংসারই এখানে, তাদের ঘাড়ে নিয়ে ও যাবেই বা কোথায়? এইখানে থাকে, সাইকেল চড়ে আস-পাশের সব গ্রামে ঘোরে। আমি বাগালটাকে বলে দেখছি, পারলে এখনই গিয়ে তাকে ডেকে আনবে। তুমি ঘরে উঠে বস।"

রামপদ ঘরে উঠে এলেন। বোনদের ধরাধরিতে মাদুর পেতে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলেন, কিন্তু মাথার মধ্যে তাঁর তখন এত রকম চিন্তা ভাবনা, যে ঘুম তাঁর ধার কাছ দিয়েও গেলনা। তাঁর থেকে হাত কয়েক দূরে অভয়পদও একটা শীতলপাটি পেতে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। তার মাথাও তখন অত্যন্ত উত্তপ্ত, অবশ্য ভিন্ন কারণে।

গরু গাড়ীটা ফিরতে দেরি খুব বেশী করলনা, কিন্তু তারই মধ্যে বাবা এবং ছেলে দুজনেই অস্থির হয়ে উঠলেন। অভয়পদ বেড়াতে বেরিয়ে গেল, ঘরে টিঁকতেই পারলনা। রামপদ বসে কাকাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। হেমলতা কনকলতার সঙ্গে রাজ্যের শাড়ী জামা আর গহনার গল্প জুড়ে দিলেন।

গাড়ী ফিরে এল অবশেষে। শেষ ট্রেন ছাড়তে মাত্র তখন আধঘণ্টা দেরি, কাজেই রাত্রে যাওয়া সম্ভব হলনা। যাক্ সব ভাল যার শেষ ভাল। কনকলতার দেবর লিখে পাঠিয়েছেন যে ঐভাবে বিয়ে দিতে তাঁর আপত্তি নেই, কারণ এরকম কারণে যদি তিনি এ সম্বন্ধ ফিরিয়ে দেন তাহলে পরিবারের কেউ আর তাঁর মুখ দেখবেনা এবং মেয়ে চিরজীবন তাঁকে অভিশাপ দেবে।

সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কনকলতা হেসে বললেন, "যত ন্যাকা ভেবেছিলাম, তত ন্যাকা নয় বাপু।"

হেমলতা বললেন, "নিজের স্বার্থ সবাই বোঝে যত হাঁদাই হোক্। তার উপর মেয়েও যে নিজে স্বয়ম্বরা হয়ে গেল।"

কনকলতা বললেন, 'হাঃ, স্বয়ম্বরা না হাতী। মেয়েটা বোঝে কিছু? যেমন মায়ের বুদ্ধি, তেমন মেয়ের বুদ্ধি।"

হেমলতা বললেন, "ওগো ওদিকে বুদ্ধি সব মেয়ের থাকে। ও ত আর ঘাস খায়না? নিজের ভাল কিসে তা দিব্যি বোঝে।"

রামপদ বললেন, "মায়ের ঘরের পর আছে রে। এখানে দেখালে কেউ কনে অপছন্দ করেনা।"

কনকলতা বললেন, "তা সত্যি বাপু। চার পাঁচটে বিয়ে হল ত এঘরে কনে দেখে। কেউ এখান থেকে অমত জানিয়ে ফিরে যায়নি।"

হেমলতা বললেন, "যা বলেছ দিদি। আমার মত অদ্বিতীয়া সুন্দরীরও এখানে বর জুটে গেল। এমন কিছু হেলাফেলার বরও নয়।"

কনকলতা বললেন, "তোর ঐ এক কথা। কেন সুন্দরী নয় কেন শুনি? মা ত বলতেন 'হেমের রংটা একটু চাপা বটে, কিন্তু মুখশ্রী ওরই সব চেয়ে ভাল।"

হেমলতা বললেন, "ওরকম সব মা'রাই বলে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেটা সব চেয়ে কুচ্ছিৎ হয়, সেটাই তাদের চোখে সব চেয়ে সুন্দর মনে হয়।"

রামপদ বললেন, "এবারে তাহলে সভাভঙ্গ করে সবাই শুতে যাও। ভোর বেলায় আমাকে চা খাইয়ে বিদায় দিও কিন্তু। আর ঐ যা বললাম, জমিগুলো সব সাফ করিয়ে রেখ। মৃগাঙ্ককে আমি সব লিখে জানাব। তবে গরমকাল, খেয়ে দেয়ে ভুঁড়ির কাপড় আলগা করে খালি না ঘুমোয়, সেটা তুমি দেখ।"

"তা দেখব বই কি? বিয়ের দিন কি কিছু ঠিক করলে? দুটো অত বড় বড় কাজ গুছিয়ে করতে সময় লাগবে ত? কলকাতায় না হয় টাকা ঢাললেই কাজ হয়ে যায়, পাড়া-গাঁয়ে ত তা হবার জো নেই। ঠ্যাঙা নিয়ে সারাক্ষণ সবাইকে তাড়া করে বেড়াতে হবে।"

"দিন এখনও ঠিক করিনি। তবে আমার ইচ্ছে বৈশাখ মাসের মধ্যেই বিয়ে বৌভাত হয়ে যায়। জ্যৈষ্ঠ পড়তে না পড়তে এখানে যা জলের অভাব ঘটে, তখন কোনো কাজ করাই অসম্ভব। কলকাতা থেকে জল ত আর বয়ে আনতে পারব না।"

হেমলতা হাই তুলে বললেন, "ঠিক আছে বাপু, বৈশাখেই হবে। এখনও মাস শেষ হতে পঁচিশ ছাব্বিশ দিন বাকি। আমি গিয়েই হৈ হৈ লাগিয়ে দেব। দরকার পড়লে আমি দশভুজা হয়ে দশ হাতে কাজ করতে পারি, এ আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেও স্বীকার করে।"

অতঃপর সবাই যে যার শয্যায় গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা দেখতে লাগলেন। মনে কারো আর এখন কোনো দুশ্চিন্তা ছিলনা, কাজেই কাউকেই প্রায় জেগে থাকতে হলনা।

ভোরবেলা উঠে কনকলতা ভাই-ভাইপোদের জন্যে যা চায়ের জোগাড় করলেন, তাকে ভুরিভোজন বলা চলে। খৈএর মোওয়া, নারকেল নাড়ু পাটিসাপটা পিঠে কিছু বাকি রাখলেন না। হেমলতা খেতে খেতে বললেন, "দিদি ঠিক মায়ের হাত পেয়েছে। মায়েরও এই রকম ছিল, হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত। আমরা ভেবেই পেতামনা, মা কখন কোথা দিয়ে কি করেন।"

কনকলতা দুঃখিতভাবে বললেন, "আমার কি আর মায়ের মত অর্থ-সামর্থ্য আছে যে তাঁর মত করে কাজ করব? তবু যতটুকু পারি করি।"

রামপদ বললেন, "আমি তোকে কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছিরে কনক, বাড়ীটা ভাল করে সারিয়ে নে। চালের খড় বদলে দিস্। যেখানে যা দরকার মেরামত করিস, ঘরের ভিতর নূতন করে কলি ফিরিয়ে নিস। পুরনো বাড়ী বলে আর যেন চেনা না যায়। একটু বেশী করেই দিয়ে যাচ্ছি, কাকীমাদের ঘরের চালগুলো বদ্‌লে দিস্ বড় জীর্ণ দেখতে হয়ে পড়েছে। কাকারা আর সব দিকে নজর দিতে পারেননা।"

কনকলতা বললেন, "বুড়ো কি আর কম হয়েছেন? ছেলেরা নেহাৎ কিছু দেখবেনা, সব শহুরে বাবু হয়ে গেছে, তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওঁদেরই করতে হয়। যেটুকু না করলে নেহাৎ নয়, সেইটুকুই করে আর কি? আর কাকীমারাও ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘর ছাড়া আর কোনো কিছুর তদারকি করেননি কখনও, তাঁরা ওসব বোঝেনও না, পারেনও না।"

রামপদ বললেন, "আমিই বাইরেটা অন্ততঃ সারিয়ে-সুরিয়ে দিই এবারকার মত। তারপর যদি ভাইরা নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় সারান। কনক, তুই আজ থেকেই লোক লাগাবি কিন্তু, দেরি না হয়। আমিও গিয়েই মৃগাঙ্ককে চিঠি দেব। সেও যেন দেরি না করে।"

কনকলতা বললেন, "বলব ত আমি নিশ্চয়ই, তবে বড় গরীব ত, দুবেলা হাঁড়ি চড়ানই ওদের প্রথম সমস্যা। ওকেও যদি কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও ত নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করবে।"

রামপদ বললেন, "তা দেব। নে এবার তোর গাড়ীতে গরু জুতে বল। আবার দেরি করে ট্রেন না ফেল করি।"

গরুর গাড়ী এল। জিনিসপত্র যা-কিছু সঙ্গে ছিল, হেমলতা সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। বাড়ীর যে-

ক'জন মানুষ এর মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল সবাই বেরিয়ে এল এদের বিদায় দিতে। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে এরা কলকাতায় ফিরে চললেন।

হেমলতা ট্রেনে উঠেই বললেন, "আমার মাথার ভিতরে যেন সার্কাস খেলছে। কবে কি করতে হবে, কোথায় কি করতে হবে, কাকে দিয়ে কি করাব, সব যেন ডিগবাজি খেয়ে চলেছে।

রামপদ বললেন, "সব একখানা খাতায় লিখে রাখ, না হলে গুলিয়ে যাবে।"

"ও সব লেখালিখি আমার আসে না বাপু, আমি মনে মনেই রাখি। আমার ভাসুরঝিটার যেবার বিয়ে হল, তখন কর্ত্তা মস্ত এক খাতা করলেন, আর অন্য সবাইকে উপদেশ দিতে লাগলেন। ওমা, কাজের দু'দিন আগে খাতাখানা গেল হারিয়ে। তখন কি আথান্তর! আমি ত ওসব খাতাখুতি করিনি, আমি দিব্যি নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম, মাথায় সব ছিল, মাথাটা ত আর হারিয়ে যেতে পারেনা?"

উত্তেজনার চোটে গত রাত্রে অভয়পদর ভাল ঘুম হয়নি। সে ট্রেনে উঠেই ঢুলতে আরম্ভ করল, এবং খানিকবাদে ঘুমিয়েই পড়ল।

হেমলতা বললেন, "আছে ভাল ছেলে। আমাদের আহার নিদ্রা টুটে যাচ্ছে ওর বিয়ের ভাবনায়, আর ও কি রকম নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে দেখ না?"

রামপদ হেসে বললেন, "নিক খানিক ঘুমিয়ে। এরপর আরম্ভ হবে অনিদ্রার পর্ব্ব, কখনও সুখের আতিশয্যে, কখনও দুঃখের। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমবার দিন ফুরোল।"

কলকাতায় তাঁরা পৌঁছে গেলেন তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই। তখন রোদ ভীষণ, গরমে লোক আইঢাই করছে। কুলিগুলো যেন নেয়ে উঠেছে এমনি তাদের চেহারা। ওঁদের সঙ্গে বেশী মোটঘাট ছিলনা, সকলে সামান্য জিনিষপত্র নিজেরাই হাতে করে হনহনিয়ে এগিয়ে চললেন। হেমলতা বললেন, "সবাই বলে গ্রামে গরম ঢের বেশী কলকাতার চেয়ে, কিন্তু ওখানে এমন অস্বস্তি লাগেনা বাপু। এ যেন ভাপে সেদ্ধ হচ্ছি।"

হেমলতার বাড়ী আগে পড়ে, তাকে নামিয়ে দিয়ে রামপদ বললেন, "একটু বিশ্রাম করে, খেয়ে দেয়ে চলে আসবি তাড়াতাড়ি। সব পরামর্শ এখন তোর সঙ্গে। গ্রামের ব্যাপার সামলাবে কনক, কলকাতার ব্যাপার সামলাতে হবে আমাকে আর তোকে। মেয়ের দিকের ব্যাপার যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা মেয়েকেই সামলাতে হবে বোধহয়। বাপ ভাইয়ের যা পরিচয় পেলাম, তাতে তাঁদের খুব কর্ম্মক্ষম মানুষ মনে হলনা।"

হেমলতা বললেন, "হুঃ, মেয়ে সামলাবে না আরো কিছু। ওটাও দিদির ঘাড়েই গিয়ে চাপবে। একেবারে বরের বাড়ীর পিসী কনের বাড়ীর মাসী।"

রামপদ নীচু গলায় বললেন, "কুটুম্ব খুব সুবিধার হলনা।"

হেমলতা বললেন, "তা তোমার ছেলের যেমন পছন্দ। কি দেখলেন তিনি ও মেয়ের মধ্যে তা ত জানিনা। চেহারা বিশেষ কিছুই ভাল নয়, শেখেওনি কিছু। তবে ভালর মধ্যে এই যে কোনো কথায় কথা কইবেনা। নিজেদের মুরোদ যে কতখানি, তা তাদের জানা আছে, চুপ করেই থাকবে। দিদি আছে মাঝে, কাজেই নির্গুণে সাপের কুলোপানা চক্র দেখাতে কেউ আসবেনা। আচ্ছা, আসি দাদা, খেয়ে দেয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি আমি আসছি।"

গাড়ি নিজেদের বাড়ির সামনে আসতে না আসতে রামপদ দেখলেন, বাইরে ভগীরথ আর যোগমায়া দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে। রামপদ আগে নেমে উপর তলায় উঠে চললেন, অভয়পদ খানিকটা পিছনে। ভগীরথ দুজনের দুটো ছোট স্যুটকেস একসঙ্গেই বয়ে নিয়ে চলল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে রামপদর কান বাঁচিয়ে ফিশ্‌ফিশ্‌ করে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা তাহলে সন্দেশ টন্দেশ খাচ্ছি ত দাদাবাবু?"

অভয়পদ আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বলল, "তা খাচ্ছ বোধহয়।"

ভগীরথ জিনিষপত্র উপরে উঠিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। যোগমায়াকে বলল, "কনে ঠিক হয়ে গেছে বোধ হচ্ছে। এত পাস টাস করে শেষে ঐ পানাপুকুরের জলেই

ডুব দিলেন। মেয়ে ত শুনি এমন কিছু সোন্দর নয়, দিতে থুতেও কিছু পারবেনা।"

যোগমায়া বলল, "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। আমাদের কি বল? পেট ভরে খেতে পেলেই হল।"

কনকলতা ভাই বোনদের বিদায় দিয়ে খানিকক্ষণ আন্‌মনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উঠোনে। কত রকম চিন্তাই তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। ভাইপোর সঙ্গে এই দেওরঝিকে জুটিয়ে দিয়ে ভাল করলেন, না মন্দ করলেন কে জানে? মেয়েটা হাবাবোকা বটে, তবে দুষ্টু হবেনা খুব। স্বভাবটা শান্ত, বাধ্য হয়েই চলবে। তবে গুষ্টিটি ত ভাল নয়, এখন এই ছুতোয় সবাই মিলে দাদার ঘাড়ে চাপবার চেষ্টা না হয়। দাদা যেরকম ঋষিতুল্য লোক, হয়ত ঘাড় পেতেই দেবেন। বৌদি মারা যাবার পর তাঁর ত সংসারের প্রতি কোনো টান দেখা যায় না। তবে অভয়পদ অন্যরকম, এই বয়সেই বেশ হিসেবী আর আত্মসর্বস্ব। নূতন বউ সেদিকে খুব সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয়না। নিশ্বাস ফেলে তিনি গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। মনে যাই ভাবুন কাজের দিক্ দিয়ে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। লোকজন ডেকে জমি পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। মৃগাঙ্ককেও ক্রমাগত তাড়া দিয়ে ঘর থেকে টেনে বার করলেন, সে রামপদর কাছে যেরকম নির্দেশ পেয়েছিল সেই অনুসারে কাজ কর্মের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করল।

রামপদ ও অভয়পদর সেদিনের দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারতে একটু দেরিই হয়ে গেল। রামপদ নামেমাত্র কলেজে গেলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজের শোবার ঘরে বসে কি সব হিসাবপত্র করতে লাগলেন। অভয়পদ বাড়ির থেকে বারই হলনা। "বড্ড গরম" বলে খাওয়া সেরে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল।

হেমলতার আসতে খানিক দেরি হয়ে গেল। ক'দিন ছিলেন না, ছেলেমেয়েরা যা খুশি করেছে, চাকরবাকরও আশকারা পেয়ে গিয়েছে। খানিকটা গোছ-গাছ ঠিক ঠাক করতে হল। অগোছালপনা তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, বিন্ধ্যবাসিনীর মেয়ে ত?

দাদার ঘরে ঢুকে বললেন, "আজ বুঝি আর কলেজে যাও নি দাদা? অভয় কোথায়?

রামপদ বললেন, "গিয়েছিলাম একবার, বেশী কাজ ছিল না, আগেই চলে এসেছি। খোকা ত বেরোয়নিই মনে হচ্ছে। আচ্ছা তুই বোস্ দেখি এখানে, ঢের কথা তোর সঙ্গে। নানারকম ব্যবস্থা করতে হবে।"

হেমলতা খাটের উপর চড়ে পা ছড়িয়ে বসলেন, বললেন, "যা গরম রে বাবা! আমি দিনের বেলা কমই ঘুমোই, তবে এই গরমে চুপ করে বসলেই ঢুলুনি আসে।"

"ঢুলো এখন পরে। আচ্ছা মায়ের যা জিনিষপত্র আমার কাছে আছে, আমার ইচ্ছে দামী জিনিষগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে এখন পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিই। তাঁর গহনা অনেক ছিল। আমার এবং তোমাদের দুই বোনের বিয়েতে অনেকটাই তিনি নিজেই তিন ভাগ করে দিয়ে দিয়েছিলেন। তবু এখনও খানিক আছে, তাঁর দামী কাপড় চোপড়, তাঁর ও বাবার শালটালও আছে। তৈজসপত্র ঘরের জিনিষ পাথরের আর রূপোর বাসন প্রভৃতিও আছে। এরমধ্যে গহনাগাঁটি আর কাপড়-চোপড়গুলি আমি দু'ভাগ করে দিচ্ছি, একভাগ তুমি নাও, আর একভাগ কনকের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর। অন্য জিনিষপত্রগুলো এখন আমার কাছেই থাক, আমি মারা যাবার পর এগুলি তুমি নিজের কাছে নিয়ে যেও। খোকা যেরকম পাত্রী নির্ব্বাচন করলেন, তাতে এগুলির খুব যত্ন যে এখানে হবে তা মোটেই মনে হচ্ছে না।"

হেমলতা বললেন, "যা বলেছ। কি দেখে যে খোকার ঐ নেকীকে পছন্দ হল, তা বুঝি না বাপু। মেয়েটা দারুণ বোকা, শেখালেও কিছু শিখতে পারবে বলে মনে হয় না। চেহারাটা মাঝারি, ভাল করে খেলে মাখলে, খানিকটা উন্নতি হবে বলেই মনে হয়। তা বলে কি আর বৌদির মত হবে, না, আমাদের মায়ের মত হবে? ভাল কথা, বৌদিরও ত শাড়ী জামা গহনা ঢের ছিল। সেগুলির কি ব্যবস্থা করবে?" "সেগুলি ত অভয়পদরই প্রাপ্য, সেই তার একমাত্র সন্তান। গহনাগুলি বউকেই দিতে হবে, কারণ বাপের বাড়ি থেকে সে কিছু পাবে না। জামা শাড়ি

সে যেগুলি পছন্দ করে নেবে তাও তাকে দেওয়াই ভাল। তুই একটু দেখে শুনে দিস্। আর যা জিনিষপত্র তা এখন এ ঘরেই থাক, যতদিন আমি আছি। পরে কি গতি হবে জানিনা। মায়ের স্মৃতির প্রতি অন্তরের খুব অনুরাগ আছে বলে মনে হয় না।”

“ওর স্বভাবটাই যেন কেমন ধারা। তোমার আমার মত নয়, বউদির মতও নয়। তা বউদির গহনা দু'ভাগ কর তুমি, একভাগ গায়েহলুদের তত্ত্বের সঙ্গে দেব আগে, নইলে ত বিয়ের আসরে নামবেন শুধু শাঁখা হাতে দিয়ে, বাকিগুলি বৌভাতের সময় দেব। শাড়ি জামা সব খুলে দেখছি, একালের মেয়ের কি পছন্দ হবে, না হবে বুঝে দিতে হবে। মেয়েটা এখন ত রোগাই আছে, বিয়ের জল গায়ে পড়লে মুটিয়ে যাবে হয়ত। সেই বুঝে জামাগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। এখন ত খান দুই তিন ভাল জামা হলেই চলবে। একটা বিয়েতে পরবার, আর একটা বৌভাতে পরবার। আর আইবুড়ো ভাতের তত্ত্বেও একটা দিতে হবে, চান করে উঠে পরবার জন্যে। নূতন জামাও কয়েকটা করাতে হবে। সেমিজ সায়াও সব করাতে হবে। তাড়াতাড়িতে চলে এলাম, মেয়ের গায়ের মাপ আনা হ'ল না। আমাকে আবার গ্রামে যেতেই হবে একবার, দু'তিন দিনের জন্যে হলেও।

রামপদ বললেন, “তা কবে যাবি বল্, ব্যবস্থা করে দিই।”

“রোস, জিনিষপত্র দেখে শুনে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিই আগে। তারপর যাব, দিদির ভাগের গহনা কাপড়গুলি নিয়ে যাব। ও বিয়েতে যা পেয়েছিল, তার ত আর কিছুই নেই দেখলাম। একটা বিছে হার আর কয়েক গাছা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া চুড়ি। এগুলি পেলেও নিজে আর মেয়ে দুটো তবু পরতে পারবে। খানতিনেক ভাল শাড়িও ত ওদের দরকার। মায়ের শাড়িগুলি বেছে দেখতে হবে। তাতে না চলে, কিনেই দিতে হবে। আর বউদির গহনা কাপড়ের মধ্যে যেগুলি আইবুড়ো ভাতের তত্ত্বে যাবে, তাও দিদির কাছে দিয়ে আসব। সে একেবারে তত্ত্ব গুছিয়ে রাখবে। আর ছেলের পোশাক করাতে হবে, হীরের আংটি, সোনার বোতাম, হাত-ঘড়ি এসব দিতে হবে।”

অভয়পদর সঙ্গে অপরূপার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর থেকে কনকলতার মনের ভার যেন বেড়ে গিয়েছিল। কোনো দিনই কি তাঁর শান্তি হবে না? যেদিন থেকে মায়ের কোল ছেড়ে গিয়ে নিজে সংসার করতে বসেছেন, সেইদিন থেকেই তাঁর এই অশান্তি। সুস্থ সুন্দর জোয়ান মানুষটা চোখের উপর কি হয়ে গেল! কুশ্রী, কদাকার, চিররুগ্ন। কিন্তু তারই সঙ্গে এ জীবনের মত গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে তাঁর। আর মুক্তির উপায় নেই।

তিনি ভাগ্যের এ অভিশাপ মেনেই নিয়েছিলেন। সম্পন্ন ঘরের মেয়ে তিনি, সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল বইকি? কিন্তু যখন বিধাতা বিরূপ তখন সব আশা তাঁকে ছাড়তে হবে বুঝতেই পেরেছিলেন। কিন্তু বেঁচে থাকতে ত হবে, আত্মসম্মানটাও বজায় রাখতে হবে? কি করবেন তিনি? দাদা রামপদর সাহায্যে এ বিপদ তিনি খানিকটা কাটিয়ে উঠলেন, কিন্তু জীবনটা তাঁর বড় নিরস বর্ণহীন হয়ে গেল। কোনো মতে বেঁচে থাকা, আর রুগ্ন স্বামীকে আর অপোগণ্ড শিশুসন্তানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু শুধু বাঁচিয়ে রাখলেই কি হবে? স্বামীর চিকিৎসা করাতে হবে, ছেলে দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে, মেয়েদেরও কিছু শিক্ষা চাই, নইলে বিয়ের বাজারে কোনো দরই উঠবে না তাদের। দাদা যা দিলেন, তাতে মোটা খাওয়া পরা তাঁদের চলে যেত, মাথার উপর আশ্রয়ও ছিল একটা। কিন্তু আরোও দরকার? কার কাছে আর চাইবেন? শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার কিছু সম্ভাবনা নেই, তারা তাঁকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচে। দাদার উপর আর চাপ দেওয়া অমানুষের কাজ হবে, আর দেব ত একেবারে ছেলেমানুষ, তার কাছে কি হাত পাতা যায়? ছি!

সব রকম বাহুল্য বিলাসিতা ত্যাগ করে, নিজে উদয়াস্ত প্রাণপণে খেটে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন। বিয়ের সময় অনেক পেয়েছিলেন তিনি বাবা মায়ের কাছে। প্রথম মেয়ের বিয়ে, দুর্গাপদ বিন্ধ্যবাসিনীর তখন বাড়বাড়ন্ত

অবস্থা। গহনাগাঁটি, জিনিষপত্র দিয়ে তাঁরা মেয়ের ঘর ভরে দিয়েছিলেন। সে সব ভোগ করতে পারল না মেয়ে, তবে সেগুলির সাহায্যে সে আত্মসম্মান বজায় রেখে সংসারে চলতে পারল।

আর বছর দুই কাটাতে পারলে কনকলতা হয়ত একটু হাঁফ ছাড়তে পারবেন। বড় ছেলেটার পড়া শেষ হলে তাকে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, এ আশ্বাস তিনি পেয়েছেন এক আত্মীয়ের কাছে। ছোটটাও ভালই এগোচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের জন্যে কিছুই করতে পারেননি তিনি। নিজে তাদের ঘরকন্নার কাজ শিখিয়েছেন, বাংলা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, অঙ্কও একটু আধটু শিখিয়েছিলেন, যতটুকু নিজে জানতেন। কিন্তু তাদের বিয়ের জন্যে টাকা রাখতে পারেন নি, গহনা কাপড়, তৈজসপত্র কিছুই গুছিয়ে রাখতে পারেন নি। বড় মেয়ে শান্তিলতা, চোদ্দ বছরের, তার বিয়ে ত এখন দিলেই হয়। মা, দিদিমার মত লম্বা দোহারা গড়নের, তাকে দশ বছরের বলে চালান যায় না আর। ছোট স্বর্ণলতা একটু ছিপ্‌ছিপে, তবে সেও বয়সের পক্ষে বেশ লম্বাই আছে। এদের দিকে তাকান আর কনকলতার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে যায়। কি উপায় হবে এদের? ভাল বিয়ে দিতে না পারলে এরা সংসারে সমাজে কোথায় দাঁড়াবে? মেয়েগুলি দেখতে ভাল, স্বভাব চরিত্রেও ভাল, কিন্তু শুধু তাতে ত চলবে না? ভাল বরে ঘরে দিতে হলে টাকা চাই। তিনি নিজে ত এতকাল নিজের যথাসর্বস্ব ঘুচিয়ে সংসারের প্রতি কর্তব্য করেছেন, তাঁরও ত সামর্থ্য শেষ হয়ে এসেছে।

অপুটার ত খুব ভাল বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু যাঁর কৃপায় হচ্ছে তাঁর নিজের ভাগ্নীগুলো কি জলে ভেসে যাবে? পাত্রী হিসাবে তারা অনেকগুণে ভাল অপুর চেয়ে। কিন্তু কপাল তাদের যে বড়ই মন্দ। এই দেখ না, এত যে ঘটা-পটা হবে মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে বউভাতে, বাছারা কি পরে দাঁড়াবে লোকজনের সামনে? একখানা ভাল শাড়ি আছে, না একটা গহনা আছে? মেজ কাকীমা, ছোট কাকীমার ঘরের বউ-ঝিগুলো, নাতনীগুলো কত সেজে গুজে ঝলমল করে ঘুরবে। এ ওরটা চেয়ে পরবে, ও তারটা চেয়ে পরবে। বাঙালীর সংসারে এই রকমই হয়ে থাকে। তাঁর নিজের কিন্তু এ বিষয়ে ভীষণ একটা শুচি বায়ু ছিল। মায়ের পরা কাপড় ছাড়া আর কারো ব্যবহৃত কাপড় তিনি পরতেই পারতেন না। নিজের জন্যে কখনও কারো কাছে শাড়ি ধার করতে পারেন নি তিনি, এখন মেয়েদের জন্যেও পারেন না। গ্রামদেশে মেয়েদের সাজ পোষাক করবার সুযোগ খুব বেশী হয়না, তবু বিয়ে বৌভাতে যাওয়াটা ত মাঝে মাঝে আছে। কখনও-সখনও সেরকম কিছু হলে কনকলতা সেগুলি এড়াবার চেষ্টা করতেন প্রাণপণে। নিতান্ত না পারলে নামমাত্র গিয়ে হুড়মুড় করে পালিয়ে আসতেন। মেয়েদের পারতপক্ষে কোথাও নিয়ে যেতেন না। যেখানে নিতান্তই সেটা সম্ভব হত না, সেখানে খুব চেষ্টা করতেন শান্তি আর স্বর্ণ যেন কারো চোখে না পড়ে। তারা হয় কোনে বসে পান সাজত, না হয় আত্মীয়াদের খোকা-খুকুদের গল্প বলত। কিন্তু এবারে বাড়ির বিরাট উৎসবে তারা কি করবে? বাপের বাড়ি মামার বাড়ি মিলিয়ে বিয়ে, কোনো দিক্‌টাই ফেলবার নয়। অন্ততঃ একটা সপ্তাহ তাঁদের ছিমছাম, ফিটফাট থাকতেই হবে। নইলেই লোকের চোখে হেয় হতে হবে।

কাজকর্ম করে বেড়াতেন, আর থেকে থেকে বাক্স-প্যাঁটরা হাতড়িয়ে দেখতেন কোথাও কিছু পরিধানযোগ্য জিনিষ চাপা পড়ে আছে কিনা। বিন্ধ্যবাসিনী জামাইকেও বিয়ের সময় হরেকরকমের কাপড় জামা দিয়েছিলেন, তখনকার দিনে যা চলন ছিল। সবগুলি পরা হয়নি, ছিঁড়েখুঁড়েও যায়নি। ঐ রকম একটা ঢাকাই ধুতি বার করে কনকলতা ভাবতে লাগলেন, এটা বাসন্তী রং এ ছুপিয়ে শান্তিকে দিলে কেমন হয়? গত সরস্বতী পূজোর সময় বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর সতী তার দাদার একখানা ধুতি রং করে পরে এসেছিল, বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। শান্তি সতীর চেয়ে অনেক ফর্সা, তাকে ত আরো ভাল দেখাবে।

বড় ছেলে প্রবীর ডেকে বলল, "মা, তোমার একটা চিঠি এসেছে।"

মা বাক্সের ডালাটা নামিয়ে বললেন, "কই, দে। আমাকে আবার কে চিঠি লিখতে গেল! তোমার কাকীমা-দের কেউ বোধ হয়। কি কাঁদুনি গাইছেন আবার কে জানে?"

চিঠির খাম ছিঁড়ে কিন্তু দেখলেন যে ছেলের কাকীমা নয়, নিজের বোন হেমলতাই এ চিঠি লিখেছেন: দিদি, আমি কাল সকালের গাড়ীতে যাচ্ছি। গরুর গাড়ী হোক বা ঘোড়ার গাড়ী হোক, একটা কিছু যেন থাকে ইষ্টিশানে। যা গরম, না হলে ওখানেই ভির্মি যাব। সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র, টাকাকড়িও বেশ কিছু আছে। কাজেই একলা যাচ্ছি না, আমার ছোট দেবর সঙ্গে যাচ্ছেন। তাঁর খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা রেখ, কুটুম মানুষ প্রথম যাচ্ছেন। প্রণাম জেন। ইতি

হেম।

চিঠিখানা মুড়ে রাখতে রাখতে কনকলতা বললেন, "যারে ঘোড়া গাড়ীওয়ালাকেই বলে রাখ, শহুরে বাবু-মানুষ তিনি কি আর গরুর গাড়ীতে চড়তে পারবেন?"

প্রবীর বলল, "সঙ্গে যে আবার অনেক জিনিষপত্র আনছেন, সে ত ঘোড়ার গাড়ীতে ধরবে না, গরুর গাড়ীও একখানা চাই।"

"তবে দুটোই বল গে যাও। থাকবে ত বড়জোর দু-দিন কি তিন দিন, এত কি জিনিষ আনছে," বলে কনকলতা উঠে পড়লেন। "যাই আবার মেজ কাকীমার কাছে শিবুর ঘরের জন্যে ধর্না পাড়িগে। ভাগ্যে কাকীদের দু চারটে খালি ঘর ছিল তা না হলে বিয়ের সময় যেতাম কোথায়? আমার শোবার ঘর দুটো ত তোমার দুই কাকী দখল করবেন, বাকি থাকবে শুধু পুজোর ঘরটা। তা সেখানে ত আর খাওয়া শোওয়া চলবেনা।" বলে কনকলতা অন্য কাজে উঠে গেলেন।

পরদিন সকালেই হেমলতা হাজির হলেন। সত্যিই সঙ্গে অনেক বাক্স-প্যাঁটরা, ধামা-ধুচুনী। প্রবীর বলল, "এখনই এত কি নিয়ে এলে, মাসীমা? বিয়ে হতে ত দেরি আছে?"

মাসীমা বললেন, "বাড়ী গিয়ে দেখিস এখন। বিয়েরই জিনিষ, খাবার জিনিষ ছাড়াও অন্য পাঁচ রকম জিনিষ দরকার হয়ত।"

গাড়ী থেকে নেমেই তিনি নির্দেশ দিলেন, "সব ক'টা বাক্সই রাখ দিদির শোবার ঘরে। ঠাকুরপোর বাক্সটা তার যেখানে জায়গা হয়েছে, সেখানে রাখ। বাকি সব এখন ভাঁড়ার ঘরে থাক।"

এরপর আলাপ পরিচয়, সরবৎ খাওয়া, পাখার হাওয়া খাওয়ায় খানিক সময় গেল। হেমলতা বললেন, "দিদি' তোর সঙ্গে ভাই অনেক কথা অনেক পরামর্শ আছে। একটু নিরিবিলি চাই। কখন অবসর হবি তুই?"

কনকলতা বললেন, "তা ভাই রান্না খাওয়াটা হয়ে যাক। দুপুরে সবাই ত ঘরে দোর দিয়ে ঘুমোয়, তখনই ভাল সময়। রোদ না পড়লে কেউ ওঠেনা।"

হেমলতা অতঃপর কাকীমাদের ঘরে বেড়াতে গেলেন, কনকলতা তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে রান্নাবান্না শেষ করতে লাগলেন। খানিকবাদে শান্তি আর স্বর্ণ মাসীমাকে নিয়ে স্নান করাতে চলল পুকুরঘাটে। প্রবীরের উপড় পড়ল নূতন কুটুম্বের তদারকি করার ভার।

দারুন চড়া রোদে হেমলতা বেশীক্ষণ পুকুরঘাটে থাকতে পারলেন না। ভিজে গামছা মাথার চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। কনকলতার তখনও রান্না শেষ হয় নি, বাইরের অতিথি একজন এসেছে, দুচারখানা ভালমন্দ রাঁধতে হয়ত? হেমলতা বললেন, "আমি একটু গড়িয়ে নিই ভাই, ভোররাতে উঠেছি জিনিষপত্র গোছাতে, ভাল করে ঘুম হয়নি। তোর রান্না হয়ে গেলে আমাকে ডেকে তুলিস।" তিনি গিয়ে কনকলতার তক্তাপোষে শুয়ে পড়লেন।

রান্না শেষ হল। খাওয়াদাওয়া, পান খাওয়াও চুকে গেল ক্রমে। এরপর ঘরে দরজা বন্ধ করে দিবানিদ্রার পালা। প্রবীর সুধীর বাবার শোবার ঘরে আশ্রয় নিল।

কনকলতা বললেন, "মেয়ে দুটো থাকবে, না কাকীমাদের ঘরে পাঠিয়ে দেব ?"

হেমলতা বললেন, "ওরা থাক না। ঘরের কথা ওরা ত আর বাইরে বলে বেড়াবেনা ?"

এঁদের ঘরের দরজায়ও খিল পড়ল। বড় ট্রাঙ্কটা খুলে হেমলতা বললেন, "আগে টাকার ব্যাপারটা মিটিয়ে নিই, তারপর অন্য কাজ। এই নাও ভাই মৃগাঙ্কের টাকা। দাদা বলছেন ওর কাছে সব টাকার রসিদ নেবে। কিসে কত খরচ হল, তা লিখে দ্যায়। কাজকর্ম করছে কেমন ?"

কনকলতা বললেন "তা করছে মন্দ নয়, আমি ত তাকে বসতে শুতে দিইনা সারাক্ষণ তাড়া লাগাচ্ছি। আমার ঘরগুলোর কাজ প্রায় শেষ, বেশ নূতনের মত দেখাচ্ছে না ?"

"হ্যাঁ ভাই, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, ঠিক মা-বাবার ঘর যেমন ছিল, আমাদের ছোট বয়সে।"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন, সেই রকম করেই করাচ্ছি। আজ কালের মধ্যে কাকীমাদের ঘরেরও চাল বদলান হয়ে যাবে। তারপর বাকী থাকবে বরযাত্রীদের ঘর, তাদের চানের জায়গা, আর সব। একেবারে রাজা-রাজড়ার কাণ্ড করছে দাদা, নইলে দুদিনের জন্যে এত খরচ কেউ করে ? আসবে ত বড়জোর তিরিশ চল্লিশ-জন লোক, তার জন্যে একটা পাড়া গড়ে তুলছে।"

হেম বললেন, "দাদার সবই ঐ রকম। বলেনা যে মারি ত গণ্ডার, লুঠি ত ভাণ্ডার'। ছোটখোট কাজের মধ্যে ও নেই। আমি একদিন বলেও ছিলাম গ্রামে যেমন করে তেমনি করেই করনা, অত টাকা খরচ করবার কি দরকার ? তা বললে, "বন্ধুদের কি আমি শাস্তি দিতে নিয়ে যাব ? ভাল করে থাকতে না পারলে, অসুবিধে ভোগ করলে ওরা আমার ছেলে বউকে মনে-মনে গাল দেবে।"

কনকলতা বললেন, "করুক ভাই, যা মন চায় করুক। নিজের উপার্জ্জন করা টাকা, ধার করে ত করছেনা ? আর খরচ করবার সুবিধাও কোনোদিন এরপর পাবেনা। মায়ের মন পেয়েছে দাদা, তাঁর মত সব জিনিষ নিখুঁৎ করে করতে চায়। সময়মত সবই হয়ে যাবে, তাকে বলিস্।"

"তা বলব। জ্যাঠামশায়ের ভিটেতেও দাদা বাড়ী তুলছে শুনেছিস্ ? বলে কাজ থেকে যখন অবসর নেবে, তখন আর কলকাতায় থাকবে না, গ্রামে এসে থাকবে।"

কনকলতা বললেন "বাঁচি ত তাহলে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই আছি, তারা যে একেবারেই দেখেনা তা নয়, কিন্তু কোনো বিপদে পড়লে আগেই মনে হয় আহা, যদি দাদা থাকত এখানে। নিজের ভাইবোনের মত কি আর জিনিষ আছে ? এক মা, এক বাপের সন্তান, এদের চেয়ে নিকটের সম্বন্ধ আর কার ?"

হেমলতা বললেন, "তা ঠিক ভাই। নিজের ছেলে-মেয়েগুলোকেও এতটা আপনার মনে হয় না। তারাও অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক অন্য জনের। আচ্ছা এইবার এই টাকাগুলো ধর, এগুলো তোর জন্যেই। ঘর সারানর টাকা, কাকাদের চাল বদলানর খরচ, আর বিয়ের সময়ের চাল, ডাল তেল ঘি গুড় চিনি কি সব কিনে রাখবি বলেছিস তার টাকা। তুই বুঝি বলেছিস এদিকে শস্তায় পাওয়া যাবে ?"

কনকলতা বললেন, "তা ত যায়ই, দেখে শুনে ভাল জিনিষ কেনা যায়। তরি-তরকারি মাছমাংস এসবত দাদা আসার পর কেনা হবে, ভাঁড়ারের জিনিষ আমি কিনব। দই ত এখানেই বসাতে হবে, ও জিনিষ ট্রেনের ঝাঁকুনি সইবে না। মিষ্টি কিছু এখানে করাব, কিছু কলকাতা থেকে আসবে, এই ত দাদার সঙ্গে কথা হয়ে আছে।"

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা আর কন্যাযাত্রীর দল কবে আসবে এখানে ?"

কনকলতা বললেন, "আমি বেশী আগে আসতে মানা করে দিয়েছি। খালি জায়গা জুড়ে বসে আমার হাড় জ্বালাবে। কোন্ কর্ম্মটা বা তাঁদের করতে হবে ?

অতিথির মত শুধু খাবে আর শোবে। বিয়ে ত শুক্রবারে হবে, আমি বলে দিয়েছি তার আগের বুধবারে আসতে। পরদিন ত দাদা গায়েহলুদের তত্ত্ব করবেন। সেই সময় উপস্থিত থাকলেই হবে।"

"কে কে আসবে?"

সকলেই ত আসবে শুনছি। এক যদি শেষ অবধি ছোট কর্ত্তা মান বাঁচাবার জন্যে না আসেন। তাও লোভ সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না।"

হেমলতা বললেন, "তাঁদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা কি তোমাকে করতে হবে?"

কনকলতা বললেন, "আমি সাফ বলে দিয়েছি বাপু, আমার দ্বারা হবেনা। ক'দিক্ দেখব আমি? বিয়ের সব ধাক্কা ত আমাকেই সামলাতে হবে? তা ছাড়া কে দেখবে? ওদের ঘর দেব, রান্নাঘর দেব, নিজেরা রেঁধেবেড়ে খাক না? নামে ত বড় জায়ের বাড়ী আসছে, তাতে রাঁধতে দোষ নেই। আমি ত ভাবছি নিজেদের রান্নাটাও ঐ দু তিন বেলা ওদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দেব।"

হেমলতা হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, "বেশ বুদ্ধি বার করেছ দিদি। তোমার একটু পরিশ্রম কমবে। আচ্ছা ভাই, দাদা ত বাকি রাখছে না কিছু, যেখানে যা দরকার সবই করছে। এখন আমরা কোথাও বেফাঁশ কিছু না করি। তোমার জাটির ত বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ কিছু নেই দেখলাম। সেবারে যা ছিরি করে এল। তখন ত তবু আমরা ক'জন মাত্র ছিলাম। এবারে ত বলতে গেলে গাঁ-শুদ্ধর সামনে দাঁড়াতে হবে। কাপড়চোপড় ঠিক মত জোগাড়যন্তর করে আনবে ত।"

কনকলতার মুখ ম্লান হয়ে গেল, বললেন, "কি জানি ভাই, ওদের কি আছে না আছে। সহায়সম্বলও বিশেষ নেই ত ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে। তবে যদি বাপের বাড়ীর থেকে চেয়েচিন্তে আসে। আমারই অবস্থা দেখনা, আমিও ত ভেবে মরছি।"

হেমলতা বাধা দিয়ে বললেন "আহা, ওদের সঙ্গে তোমার তুলনা কিসের? আমরা কি মরেছি নাকি? ওসব কিছু ভাবিনি? দেখেই ত গেলাম, নিজের জন্যে কিছুই রাখনি। তখনই ঠিক করে নিলাম যে মায়ের গহনা কাপড় থেকে কিছু তুলে এনে তোমায় দিয়ে যাব। শুধু শুধু বাক্সবন্দী হয়ে আছে বইত নয়? তা দেখি দাদাও ঠিক ঐ কথা ভেবে রেখেছে। কলকাতায় গিয়েই বলল, মায়ের গহনা কাপড়গুলো ভাগ করে তোরা দু বোন নিয়ে নে, ব্যবহার কর। অন্য জিনিষগুলি এখন আমার কাছে থাক, পরে তোরা নিয়ে যাস। আমি ত তখনই বসে গেলাম বাছাই করতে। এই দেখনা।"

সব চেয়ে বড় ট্রাঙ্কের ডালা তুলে তিনি খোলেন। দুটি মস্ত বড় ভাগ করে বাক্সভর্ত্তি শাড়ী জামা। মাঝে একটি মাঝারি আকারের গহনার বাক্স। বড় ভাগটা টেনে তুলে মাদুরের উপর রাখলেন। উপরে জড়ান একটা পাতলা উড়ুনি, সেটা সরিয়ে বললেন, "এই দেখ, কোন্ কালের জিনিষ কেমন ঝকঝক করছে। মায়ের ছিল আয়ত লক্ষ্মীর হাত, যা ছুঁয়েছেন তাই অক্ষয় হয়ে আছে। আমাদের অঙ্গে এক বছরের বেশী আটপৌরে শাড়ী টেঁকে? দেখ এইগুলি। মা মারাই গেছেন দশ বারো বছর আগে। তা শাড়ীগুলি দেখ, যেন সবে আড়ং ধোলাই করে এনেছে। কতবার করে পরা শাড়ী তাঁর। বারখানা নিয়ে এসেছি, তিন মা মেয়ের তোদের এক বছর চলে যাবে। খানছয় আমি রেখেছি, একলা আর কত শাড়ী পরব? তিন তিনটে ছেলের পর ঐ ত এক পুঁটে মেয়ে, তার শাড়ী পরার বয়স হতে এখনও সাত আট বছর বাকি। জামা সায়াও আছে কিছু কিছু, দরকার হলে ব্যবহার করিস্। দিদি ত প্রায় মায়েরই মত হবে হাতে বহরে, মা আর একটু ভারি হয়ে পড়েছিলেন শেষের দিকে। শান্তি স্বর্ণর বড় ঢিলে হবে। তা তোরা ত তিনজন সেলাইনবিশ আছিস্, কেটেছেঁটে ঠিক করিস্, তার জন্যে আটকাবে না। আর এই দেখ এই তিনটে দামী শাড়ী আলাদা করে রেখেছি, এই হালকা চাঁপাফুলী গরদখানার জরির পাড় এখনও কেমন ঝক্‌ঝক্ করছে, যেন নূতন। এটার বয়স কোন্ না ত্রিশ

পঁয়ত্রিশ হবে। মা প্রতিমা বরণ করবার সময় এটি পরতেন। তুমি এটি পোয়ো বউ বরণ করবার সময়। তুমি সবার বড় এখন, তুমিই বরণ করবে। আর এই বেগুনফুলি রং-এর বালুচরি শাড়ী, এটি মায়ের বৌভাতের কাপড়, তবেই বয়স বুঝে দেখ। এর গায়ে, পাড়ে আঁচলে শাদা রেশমের কাজ, যেন আলপনার ছবি আঁকা। রেশমটাও ঝকঝক করছে বকের পালকের মত। এইটা শান্তিকে বেশ মানাবে। আর এই সবুজ বেনারসীখানা স্বর্ণর জন্যে। এইটারই বয়স সব চেয়ে কম। ঠাকুরমা শেষ যখন কাশী যান, তখন এটা নিয়ে এসেছিলেন মায়ের জন্যে। ব্লাউজ বাপু তিনটে নিজেদের করে নিতে হবে, এই তিনটে ব্লাউসপিস এনেছি। করে নিতে পারবি না ?"

শান্তি আর স্বর্ণ উজ্জ্বল চোখে জিনিসগুলি দেখছিল। মাসীর কথায় শান্তি বলল, "পারবনা কেন ? আমি আর স্বর্ণ কাল ঘণ্টা তিনচার কাজ করলেই তিনটা ব্লাউস হয়ে যাবে।"

হেমলতা বললেন, "তাই করে নে। আমি গিয়ে কলকাতায় বলব যে বোনঝিরা কি রকম কাজের হয়েছে। তোদের কথা কেউ জানেই না, এমন সব কুনো।"

কনকলতা বললেন, "সাধে কি আর কুনো হয়েছে, জান ত আমার দশা ? কি বা ওদের শেখাতে পেরেছি, কখন বা সাজাতে পেরেছি ?"

হেমলতা বললেন, "তুই বড় চাপা দিদি। আমাকে আগে জানালে, আমি ঢের আগে এর ব্যবস্থা করতে পারতাম।"

কনকলতা বললেন, "তা ত হল। কিন্তু সব যে দুহাতে বিলিয়ে দিচ্ছিস, নিজের জন্যে কি রাখলি ?"

হেমলতা বললেন, "ঐ যে বললাম থান ছয় শাড়ী রেখেছি।" ক্রমশঃ

বাল-ভাষিত

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"বাল ভাষিত"—এই কথাটির প্রয়োগ হয় অবজ্ঞা ও করুণার সঙ্গে।

"বালকের কথা! বাল শব্দ সংস্কৃতে যেমন বালকের উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়েছে, তেমনি মূর্খ এবং জনসাধারণের উদ্দেশেও ব্যবহৃত হয়েছে।

জনসাধারণ 'অশিক্ষিত, অপরিণতবুদ্ধি—তাই তারাও "বাল" বা বালক।

আমি কিন্তু আমার এ প্রবন্ধে "বাল ভাষিত" মৌলিক অর্থে ব্যবহার করছি। বাল ভাষিত—অর্থাৎ শিশুর কথা। সরল মানুষের কথা। শিশুর ন্যায় কৌটিল্যবর্জিত জনসাধারণের কথা। যাদের মধ্য দিয়ে সত্য সহজে প্রকাশিত হয়।

"তোর অথিক গুরু পথিক গুরু
গুরু সর্বজন।"

এই মনোভাব নিয়ে যদি সকলের কথা শোনা যায়, শ্রদ্ধাভরে তার অর্থগ্রহণের চেষ্টা করা যায়, তবে আমরা অনেকে সহজেই সত্য দর্শন করি।

একবার এক গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম—কয়েকজন অশিক্ষিত গ্রামবাসী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন:

"আমার মনে হয় হরিনামই সব নামের সেরা।"

"কেন রামনাম কি দোষ করলো?"

"রামনাম, কালীনাম, কৃষ্ণনাম, দুর্গানাম, কিছু দোষ করে নি—তবু আমার বিবেচনায় হরিনামই শ্রেষ্ঠ।"

"কেন, কিছু কারণ তো দেখাও!"

"কারণ, হরির কোনো মূর্তি নাই। হরিনামের সঙ্গে কোনো মূর্তি মনে আসে না। কিন্তু রাম বল, কৃষ্ণ বল, কালী বল, দুর্গা বল, যাই বল, তার সঙ্গে কোনো না কোনো মূর্তি তোমার মনে আসবেই! কাজেই এসব নামের চেয়ে হরিনামই আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ।"

এই কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম! একজন অশিক্ষিত গ্রামবাসীর কাছে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ সুচিন্তিত অভিমত শুনবো—ভাবতে পারি নি। সেই থেকে আমি অশিক্ষিত জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি না। তাদের কথা মন দিয়ে শুনি।

(২)

এবার একটি শিশুর কথা বলি।

মানে ৪।৫ বছরের শিশু। তাকে আমি হঠাৎ বেদান্ত বোঝাতে গেলাম। বল্লাম—"ভগবানের, হাত নাই, পা নাই, চোখ নাই কান নাই"—ইত্যাদি।

শিশু তার মুখ গম্ভীর করে, বড় বড় চোখ তুলে, মন দিয়ে আমার কথা শুনলো। তারপর একটু চুপ করে থেকে মন্তব্য করলো:

"হাত নাই, পা নাই, গাছের গোড়া!"

বেদান্তে ভগবানকে "স্থাণু" বলা হয়েছে। যার এক অর্থ—গাছের গোড়া।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়কে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে এই "নব-নচিকেতার" উপাখ্যান বলি। তিনি শুনে মুগ্ধ হন। তারপর কলকাতায় যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে—তিনি ওই শিশুর কথা বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন। পরে, শান্তিনিকেতনে এসে তিনি সর্বপ্রথম ওই শিশুটিকে দেখতে চান।

(৩)

১৯৩৫ সাল। আমি তখন বঙ্গীয় আর্যসমাজের নেতৃত্বে সমাজসেবার কাজ করি। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের গ্রামে,

অনুন্নত অবজ্ঞাত শ্রেণীর মধ্যে আমার কাজ। মাঝে মাঝে কলকাতা আসি। সেখানেই কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং কর্তৃপক্ষদের বাস। আর্যসমাজের কর্তা ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই অবাঙ্গালী। তাঁদের মধ্যে একজনের ব্যবহারে আমার তরুণ মন আহত হলো। আমি ঠিক করলাম—চাকরিতে ইস্তফা দেব।

মন স্থির করে ফেলেছিলাম, শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন হলো—এক অশিক্ষিতা নারীর কথায়। এই নারীর জন্মস্থান পাঞ্জাব। ইনি বল্লেন—"কার উপর রাগ করে' ভাই, তুমি তোমার দেশের কাজ ছেড়ে দেবে?"

আমি চমৎকৃত, মুগ্ধ! তাঁকে আমার অন্তরের প্রণাম জানিয়ে, কাজ করে যেতে লাগলাম।

(৪)

এক নিরক্ষর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সমাজ তাঁকে 'একঘরে' করেছে। তাঁর অপরাধ—জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি আতুরের সেবা করেন।

আমাকে একজন বড় পণ্ডিত মনে করে' তিনি প্রশ্ন করলেন:

"এ কাজ কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? একাজ কি পাপ?

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম—"আপনি কি একে পাপ মনে করেন?"

"পাপ মনে করলে কি একাজ করতাম?"

সরল মনের সিধে জবাব!

তাঁর কাছে খবর পেলাম—এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর মৃত্যু হয়েছে। তার শবদাহ করবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি একা তো পারবেন না। আরও ২।৪ জন লোকের দরকার।

আমি ২।৪ জন যুবককে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম।

শুনলাম—ঐ ভিখারিণীর ছায়াও কেউ মাড়াতো না। ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই এতদিন তার সেবা করেছেন।

ভিখারিণী নাকি এককালে অপূর্ব সুন্দরী রমণী ছিল। তাকে কোনো পুরুষ প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়। পরে ঐ অসামান্যা রূপসী নারীর জন্য, জমিদারে জমিদারে দাঙ্গা বেধে যায়।

বৃদ্ধ বয়সে সে সর্বজন পরিত্যক্তা। গাছতলায় তার স্থান। ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে তাঁর কুঁড়েঘরে আশ্রয় দেন। এবং প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করেন।

শ্মশানে যখন চিতার উপর ঐ বৃদ্ধার দেহ রাখা হোলো—তখন সেই জরাজীর্ণ নারীর মধ্যে সেই অসামান্যা রূপসীর রূপের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পেলাম না।

ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমস্ত জেনে শুনেই তাকে গৃহে আশ্রয় দেন। এবং যথাশক্তি তার সেবা করেন। যৌবনে তিনি তাকে দেখেন নি। বৃদ্ধা ভিখারিণী-রূপেই তার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা।

ঐ নিরক্ষর সরল বালসদৃশ বৃদ্ধের কাছে, সত্য সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

"পাপ মনে করলে কি একাজ করতাম?"—একে কি "বাল ভাষিত" বলে অবজ্ঞা বা করুণা করতে পারি?

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ

সমর বসু

"বাঙলা সাহিত্যের কোনও বিভাগ যদি বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে তবে তাহা ছোটগল্প' এবং কবিতা।—পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণিধানযোগ্য এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করবার আগে বাঙলা গল্প-সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। গল্প-সাহিত্যের উদ্ভবকাল নির্ধারণ করতে গেলে এই সাহিত্যের পট-ভূমিকাটি অবশ্য বিচার্য্য বিষয় হয়ে ওঠে।

অনেকেই বলে থাকেন যে, বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের ফলেই বাঙলা গল্প-সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এ-মন্তব্য কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। "ভারতবর্ষ বিদেশী সংস্পর্শে আসবার অনেক আগেই এদেশে সংস্কৃত সাহিত্যে অনেকানেক গল্পগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, কথা-সরিৎসাগর এবং দশকুমার চরিত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একহাজার বৎসরের এই সময়টিকে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কালিদাস বানভট্ট থেকে শুরু করে কবি জয়দেব পর্য্যন্ত বহু সাহিত্যরথীর জন্ম হয় এই যুগে। অপরপক্ষে ইউরোপে এই যুগটিকে বলা হয় বিপ্লবের যুগ। সাহিত্যচর্চা, কিংবা সাহিত্যচিন্তা এই যুগে মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।(১)

সুতরাং এ-কথা বললে বোধকরি অসংগত হবে না যে, পাশ্চাত্য-প্রভাব মুক্ত হয়েই ভারতীয় সাহিত্যের প্রসার সম্ভব হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্য যে সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে প্রভূত ঋণী একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাঙলা গল্প-সাহিত্যের গোড়ার দিকে সংস্কৃত উপাখ্যানগুলির অনুবাদ এতবেশী হ'তে সুরু করেছিল যে বাঙালায় গল্প লেখার প্রেরণা লেখকরা যে সংস্কৃত গল্প থেকেই পেয়েছিলেন এ-কথা বললে বোধকরি মিথ্যাভাষণের অপরাধে দণ্ডিত হবার অবকাশ থাকবেনা।

বাঙলার কাহিনীধর্মী কাব্যসাহিত্যের পৌরাণিক কাহিনীগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা চিন্তা-চেতনার সংযোগ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে মঙ্গল-কাব্যেও যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তাও সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যপ্রভাব মুক্ত।

কাহিনী কাব্য থেকেই গদ্য কাহিনীর জন্ম।—নববাবু বিলাস [বাঙলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস] কিংবা 'আলালের ঘরের দুলাল' অথবা হুতোম প্যাঁচার নক্সা কেহই কালাপানির ওপার থেকে এসে হাজির হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রে পাশ্চাত্য-প্রভাব অবশ্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে প্রভাব বাঙলা সাহিত্যে এমন নিপুণভাবে প্রতিফলিত যে বাঙলা-সাহিত্যের বাঙালীয়ানা কোথাও তা'তে ক্ষুণ্ন হয়নি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা না হয় বাদ দিলাম, সেকালের সামাজিক উপন্যাসেও বাঙালী-সমাজ নিজস্ব আকৃতি নিয়েই প্রতিবিম্বিত।

বাঙালীর ভাবপ্রবণতা, কল্পনাপ্রিয়তা, এবং সর্বোপরি নতুনকে জানবার গভীর অনুসন্ধিৎসা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে ক্রমশঃ তার পরিচয়

ঘটিয়েছে। এবং তারই ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের রত্নরাজি আহরণ ক'রে বাঙলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে, তুলতে সমর্থ করেছে। তাই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা-সাহিত্যিকদের পরিচয় যত নিবিড় হ'তে লাগল, বাঙলা গল্পসাহিত্যের শিল্পরূপ ও গঠনরীতি তত বেশী সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও অনবদ্য হ'য়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার অনেক আগে থেকেই বাঙলা কথা সাহিত্য নূতন পথ বেয়ে চলতে সুরু করল। সে পথ, যদিও পুরাতন পথের সমান্তরাল নয়, তবুও পুরাতনের সঙ্গে তার হৃদয়ের সম্বন্ধ ঘুচে গেল না। পুরানো যুগ নতুন যুগে এসে নবজন্ম লাভ করল।

বাঙলা-কথাসাহিত্যে এই যে পরিবর্তন-এ শুধু দৃষ্টির প্রসারতায় এবং ভাবের ব্যাপকতায় নয়, এ পরিবর্তন বাঙলা ভাষাতেও সঞ্চারিত করল চলৎশক্তি। নতুন যুগের এই শুভমুহূর্তটিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—

"মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্ব যুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাঙলা দেশেই বাঙালী মনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হ'ল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলচ্ছক্তিময়ী হ'য়ে উঠল বাঙলা ভাষা। তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবনের সঞ্চারে। সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন ক'রে দ্বীপ উঠেছিল—সমুদ্রের গর্ভ থেকে নব নব প্রাণের আনন্দদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে।"

এর পরের ইতিহাস বাঙলা কথাসাহিতের জয়যাত্রার ইতিহাস। এবং সে জয়যাত্রায় "ছোট গল্প" এসে দাঁড়াল পুরোধায়। এবং আধুনিক কালের বাঙলা সাহিত্যের 'ছোট গল্প' শাখাটাই সাফল্যের ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতার শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হ'য়েছে; এ-সংবাদ সাহিত্যানুরাগী বাঙালী মাত্রেরই আনন্দের এবং গৌরবের। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত মন্তব্য তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এত অল্পকালের মধ্যে এতখানি প্রসার, বিষয় বৈচিত্র্যে এত বিপুল বিস্তৃতি সত্যই বিস্ময়ের। বয়সে প্রায় একশ' বছরের ছোট হয়েও বাঙলা কথা-সাহিত্য বর্তমান ইংরাজী কথা-সাহিত্যের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে—একথা ভাবলে সত্যই আনন্দে অভিভূত হ'তে হয়।

বর্তমান কালের ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে যে, "বাঙালী জীবনের খুঁটি-নাটি সমস্ত দিকই ছোট গল্পে এক আশ্চর্য্য শিল্পরূপ নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে, আধুনিক অতি বৈপ্লবিকতা, লঘু চপল হাস্যপরিহাস থেকে জীবনের অতি গভীরতম সূক্ষ্ম অনুভূতি, কঠিন বস্তুবাদিতা থেকে সুগভীর আধ্যাত্মিকতা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক বিশ্লেষণ একমাত্র 'ছোট গল্পেই বিধৃত হয়েছে। বাঙলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্গিক ও গঠনরীতি সুদক্ষ ভাস্কর শিল্পীর নিপুণ হস্তক্ষোদিত মূর্তির মত পাঠক-মনে পরিপূর্ণ আনন্দের ভাব-ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে।(২)

কথা সাহিত্যে অতি সাম্প্রতিককালে যে জীবন-বিমুখতা, ও অবসাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার মধ্যেও মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গের মত এক একটি ছোট গল্প আগামী কালের জীবন সংসক্তির অগ্রদূত হয়ে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

বাঙালীর কোমল পেলব মাটির সঙ্গে আশ্চর্য্যভাবে সমতা রক্ষা ক'রে বাঙলার কথাসাহিত্যে এমন একটি কোমল এবং মধুর সুর বাজে যা মর্মস্পর্শী, যা মনকে রসসিক্ত করে,—দেহকে উত্তাল না ক'রে। এইখানেই বাঙলা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এবং এ বৈশিষ্ট্য রক্ষা, সম্ভব হওয়ার হেতু নিহিত রয়েছে—বঙ্কিমের মনীষায়, মাইকেলের বৈপ্লবিক চেতনায়, সমসাময়িক লেখকগণের গভীর স্বাজাত্যবোধে, এবং রবীন্দ্রনাথের মননশীলতায়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের সুরুতে যেসব সাহিত্যরথী লেখনী ধরেছিলেন, তাঁরা

তাঁদের মণীষা, রসবোধ, এবং দৃষ্টির সাহায্যে প্রচলিত রীতিনীতির উর্ধে উঠে স্বীয় প্রতিভাকে বহুধা বিভক্ত করে বিশ্বের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, নিজেকে হারিয়ে না ফেলে মুক্তি দিয়েছিলেন,—পরপ্রভাবের অতলে তলিয়ে যেতে দেননি।

এই পর্য্যন্ত হ'ল সাহিত্যের সত্যিকারের গৌরবের দিক। কিন্তু এর একটা বেদনার এবং অনুশোচনার দিকও আছে।

বাঙলা-সাহিত্যের ঐ মহান ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক সাহিত্যিককেই গ্রহণ করতে হয়। এবং সেই দায়িত্ব রক্ষার জন্ম চাই—সেই ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা, অনুরাগ এবং আনুগত্য। সাহিত্য-পাঠকদেরও সে দায়িত্ব রক্ষায় একটি বিশেষ ভূমিকা আছে,—কিন্তু সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

অতি সাম্প্রতিক কালে একটি স্বার্থপর ব্যবসায়িক বুদ্ধি বাঙলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেককেই পেয়ে বসেছে। সাহিত্যিকেরা যেখানে ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন, সেখানে আয়ের মাত্রা বাড়াতে গিয়ে emand এবং supply-এর সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে, যে সাহিত্য তাঁরা পরিবেশন করেন, তা' কতখানি ঐতিহ্যাশ্রয়ী হ'ল, তা তাঁরা চিন্তা ক'রে দেখেন না। সে-সাহিত্যের বিনিময়ে কতগুলি মুদ্রা তাঁরা পেলেন, সেটাই তাঁদের অবশ্য চিন্ত্যনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। এবং সেই লক্ষ্যে সহজে পৌঁছুবার দুটো মাত্র পথ তাঁরা আবিষ্কার ক'রেছেন!—

(১) পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং

(২) বিকৃত যৌনলালসার অতি বাস্তব রূপায়ন।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রভাব বাঙলা-সাহিত্যে অনস্বীকার্য্য একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণের চাপে প'ড়ে সাম্প্রতিককালে—[আধুনিক কালের সংজ্ঞা নির্ণয়ে মতবিরোধের আশঙ্কা থাকায়,—সাম্প্রতিক কাল বললাম] বাঙলা কথাসাহিত্যের একটা বিরাট অংশের যে চেহারা হয়েছে তাকে চেনা বলে মনে হয় না। ইউরোপীয় সমাজ-বিজ্ঞানের কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট 'থিওরী'র দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাঙলার সমাজকে, বাঙালীর মনকে, এমন কি বাঙালীর জীবন-বোধকেও বিচার করতে যাওয়া হচ্ছে বলেই, কথাসাহিত্যের চেহারাটা আর পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না। অবক্ষয়জনিত সমাজের দুঃস্থতাকে যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা হচ্ছে, সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু প্রজ্ঞার গভীরতা তাতে নেই, তাই আপাতঃ অসঙ্গতিটাই সাহিত্যে প্রকট হয়ে উঠেছে আন্তরচেতনার সত্য সেখানে অনুপস্থিত। অসঙ্গতির প্রকাশে কোনও আনন্দ থাকে না, থাকতে পারে না,—আজকের সাহিত্য তাই তার চৌহদ্দী থেকে আনন্দকে নির্বাসিত করে দেহবাদীতার জয়গানে মেতে উঠেছে।

যে কোনও দেশের ভৌগোলিক জলবায়ু, সামাজিক পরিবেশ, প্রচলিত রীতিনীতি, বহুদিনের সংস্কার সেই দেশের মানুষের কাঠামো গ'ড়ে তুলতে যে একটি অতি অর্থপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। সুতরাং বিদেশের কোনও পণ্ডিতের আবিষ্কৃত মনস্তত্ত্ব এবং যৌনবোধের নূতনতম(?) 'থিওরীর' ছুরি দিয়ে এদেশের ছেলে-মেয়েদের মনকে চিরে চিরে যে বক্তব্য কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত করা হচ্ছে,—তা হয়তো অভিনব, কিন্তু সত্য কিনা সেটা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। এ যদি সত্য হত, তাহলে তিরিশের সাহিত্যিকেরা ঐ পথ থেকে সরে আসতেন না।

যুদ্ধোত্তর এবং দেশ-বিভাগের পর বাঙালীর ভেঙে-পড়া সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে অনেকেই এ-কালের সাহিত্যকে প্রচার করার চেষ্টা করছেন, এবং সে চেষ্টার পিছনেও আছে ব্যবসায়িক বুদ্ধি। সে প্রচারও সম্পূর্ণ সত্যনির্ভর নয়। যে-সমাজ-ছবি বাঙলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত, তা ইউরোপীয় জড়বাদীতার, এবং হয়তো বাঙালীর ভেঙে-পড়া সমাজজীবনের খানিকটা।

গভীর চিন্তা এবং মননের অনুশীলনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও টুকরো কার্য্য-কলাপের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরসত্তাকে আবিষ্কার করার যে-প্রয়াস কথাসাহিত্যে

আজ দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং তাকে সকলেই অভিনন্দিত করবে,—কিন্তু আন্তরসত্তা শুধু দেহ-চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেহের কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃপ্তিকে নিয়েই যে গল্প তা যতই বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তি-নির্ভর হোক না কেন, মানুষের-মনোজীবনের চাহিদা তাতে মেটেনা। দেহ-প্রকৃতিই মানুষের সবকিছু প্রবণতার মূলকেন্দ্র নয়,—এ সত্য লেখকেরা যদি উপলব্ধি না করতে পারেন, তাহলে তাঁদের লেখা যতই 'গরম-রুটির' মত বর্তমানে বিক্রী হোক না কেন, ভবিষ্যতে যে সাহিত্যিক-স্বীকৃতি পাবে না, তা যেন তাঁরা স্মরণ রাখেন।

নানা সমস্যায় পর্যুদস্ত বাঙালীর নাগরিক-জীবন, স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষণায় নারীজীবনের নূতন মূল্য-বোধ, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় নীতিবোধের ভেঙে-পড়া ভিত, সাম্প্রতিক কালের 'ছোট গল্পে'র এই সব বিষয়-গুলির সঙ্গে যদিও দেহ এবং জড়ের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, তবুও যেভাবে এইসব গল্পগুলি বাঙলা-সাহিত্যে উপস্থাপিত হচ্ছে—তাতে কেবল যে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তা নয়—ইউরোপীয় রসবোধের মর্য্যাদাও হচ্ছে বিপর্য্যস্ত। এই উপস্থাপনাকে কোনও মতেই বাঙলা-সাহিত্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ী বলা যেতে পারে না। একে ঠিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনও বলা চলে না। সমাজচেতন সাহিত্য হিসাবে প্রচারিত করে একশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে আকৃষ্ট করবার জন্যেই এই সাহিত্য সৃষ্টি।

অবশ্য—"এ কথা সত্য যে, বিদেশী শিল্প-সংস্কার, জীবনবোধ, মানবিকতায় নূতন মূল্যায়ন সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই কর্তব্য।(৩) কেন না উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু বিদেশী ভাবকে, বিদেশী চিন্তাচেতনাকে যদি আত্মীকৃত না করতে পারা যায় তাহলে কেবলমাত্র অনুকরণ কখনই গ্রহণীয় হতে পারে না। চেষ্টাকৃত fantastic লেখাকে Surrealism-এর টিকা পরিয়ে বাজারে চালালেই তারা বরণীয় হয়ে ওঠে না। বিদেশী ভাবধারার মধ্যে শিল্প-প্রেরণার উৎস খুঁজতে গিয়ে ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হলে তার পরিণাম নিশ্চিত অবলুপ্তি।

সাহিত্যের সৃষ্টিমূলে আছে জীবনধর্ম। চিন্তাকে বিশ্ব-জনীন করায় আপত্তি নেই, তাকে রূপময় করতে গেলে নিজের জীবনধর্মের ধাঁচে তাকে ঢালতে হবে। নইলে অনুকরণই হবে, সাহিত্য সৃষ্টি হবেনা।

সাহিত্যের দর্পণে জাতি কিংবা সমাজ যদি নিজের প্রতিচ্ছবি না দেখতে পায়, যে জলমাটি আলোবাতাস নিয়ে সে বেঁচে আছে, ষড়ঋতুর ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী যে-প্রকৃতির বুকে সে লালিত তার ছায়া যদি কোথাও কোনওখানে প্রকাশমান না হ'য়ে ওঠে তাহলে তাকে সাহিত্যসৃষ্টি বলব কোন্ সান্ত্বনায়। অবশ্য সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে Realism এর নামে যদি Pornography-আঁকা হয় তাহলে তাও সাহিত্য হবে না। হবে সাহিত্যের অপসৃষ্টি।

সাহিত্যের একটি কালনিরপেক্ষ নিজস্ব আদর্শ আছে। (৪) সে আদর্শ সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে অনুস্যূত। সৌন্দর্য্যবোধও মানুষের অন্তরের এমন একটি শক্তি যা অন্তবোধনিরপেক্ষ নয়। মনের রাজ্যে একান্ত নিরপেক্ষ কোনও বোধশক্তি নেই। যে-রসবোধের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি হয় তা নীতিবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিবোধ এবং সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করে যে সাহিত্য সৃষ্টি, তা একশ্রেণীর পাঠকদের মনো-হরণ করে বটে, কিন্তু কালের অধীশ্বর কোনও দিনই তাকে অভিনন্দন জানাবেনা। "সাহিত্যের রস-বিচারে কাল একটি অবশ্য গণনীয় বস্তু।" (৫) কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অনেক সাহিত্যিকদের [যাঁদের অবশ্য সাহিত্যিক বলে অভিহিত করা অভিধানসম্মত হবে না]—এই পাঠক-তোষণ নীতি এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করছে যে, কালের দরবারকে উপেক্ষা ক'রে তাঁরা বর্তমানের মুনাফার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন।

যুগধর্মকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে, প্রগতি-শীলতার নামে সংসারের বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যের

বাস্তবকে একাকার করে তাঁরা নতুন সাহিত্য সৃষ্টির উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। ফলে তাঁরা যা সৃষ্টি করছেন প্রকৃত সাহিত্য তার অনেক উর্দ্ধে।

সাহিত্য মনোজীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু। বস্তু জীবনের সবকিছুই সাহিত্যের সবকিছু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পাঠকেরা বল্লেন,—'রোম্যান্টিকতা' চলবে না। তাই তাঁদের লেখকেরা 'Realistic' হয়ে গেলেন।

সুন্দরকে বন্দনা করতে গিয়ে বাস্তবকে অস্বীকার করা যে ভুল এ-কথা তাঁরা মানলেন। কিন্তু বাস্তবকে রূপায়িত করতে গিয়ে সুন্দরকে অগ্রাহ্য করা যে ঠিক তেমনি ভুল এ-কথা তাঁরা ভুলে গেলেন।

একদিক থেকে বিচার করতে গেলে আদর্শনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী প্রতি শিল্পীই একাত্মভাবে রিয়ালিষ্ট জীবনের যে কোনও খণ্ড চিত্রকে নির্বাচন করার অধিকার যেমন শিল্পীর আছে, সেইভাবেই কিন্তু তাকে অসুন্দর করে প্রকাশ করার কোনও অধিকার তার নেই।

তবুও ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায় এই যে পরিবর্তন এর হয়তো ভাল দিকও আছে। নূতনত্বের আকাঙ্খা বিশ্বের চেতন-অচেতন নির্বিশেষে সকলের অস্থি মজ্জায় মিশিয়ে আছে। তাকে অস্বীকার করা যায় না। চলে বলেই পৃথিবীর আর একটা নাম 'জগৎ'। সেই চলার পথ সব সময় যে পরিষ্কার থাকবে এমন ধারণা করা নিশ্চয়ই ভুল। আবর্জনা যদি কোথাও জমে থাকে; Escapist দের মত তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে এগিয়ে চলা সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য নয়।

এ-সমস্ত যুক্তি স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে দুঃস্থতার বীজগুলোকে একস্থান থেকে তুলে নিয়ে ধান্য রোপণের মত অন্যত্র তাকে রোপণ করা অর্থাৎ সমাজের একাংশ থেকে পাঠক-মানসে, নিশ্চয়ই সুফলপ্রসূ নয়।

"কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর; দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্খার যে দুঃখ তাই মানুষের—রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি যদি সত্যি হয় এবং সাহিত্য যদি মানুষের জন্যেই হয় তাহলে এ-কথা নিশ্চয়ই জোর করে বলা যায় যে, সমাজের বিকৃত চেহারাটাই সাহিত্যের সবকিছু নয়, নরনারীর যৌন-বোধই তার মানস-বৃত্তের কেন্দ্র কিছু নয়।

তাই মনে হয় কিছুটা সংযত হওয়ার সময় হয়ত এসেছে। আত্যন্তিকতা কোনও বিষয়েই ভাল নয়। অতিবাস্তবতার প্রতি অতিরিক্ত মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীকে পঙ্গু করে তোলে (৬) ফলে বিচারের সমতা রক্ষা করা লেখনীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

জনপ্রিয়তা অর্জন করাটাই সাহিত্যস্রষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এ-কথা ভাববার সময় বোধ হয় আবার এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি বোধ করি পুনরায় স্মরণযোগ্য হয়ে উঠেছে,—"নবীন লেখকদের আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, অধিকাংশ লোকই জানেনা যে, তার অন্তরে কতটা শক্তি আছে। চলতি বুলির মায়া কাটালেই মানুষ তার নিজের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। আর সেই আত্মাই হচ্ছে সচল সাহিত্যের সনাতন মূল।"—সুতরাং প্রতি নবীন লেখক যদি এই সংকল্প করেন যে,—I am not going to be dominated by other people's opinion, but I am going to dominate the opinion of others"—তাহলে তাঁর লেখার আর মার নেই।"

চৌধুরী মশায়ের এই উক্তিটি তৎকালীন নবীন লেখকদের প্রতি হলেও এ-কালের নবীন লেখকেরা এই উক্তি থেকে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করতে পারেন, এবং তাতে শুধু সাহিত্যেরই উপকার হবে না, তাঁরা নিজেরাও যারপর নাই উপকৃত হবেন।

সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র পাঠকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যকে ভুল অর্থে বাস্তবঘেঁষা না করে লেখকেরা যদি এ-কথা স্মরণ রাখেন যে, বাঙলা-সাহিত্যের যেটা মূল্যবান সম্পদ তা হল এর মহান ঐতিহ্য এবং সে ঐতিহ্য থেকে সাহিত্যিকেরা

যতদূর সরে যাবেন তাঁরা হয়ে যাবেন ততদূর মিথ্যাশ্রয়ী, তাহলেই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করবেন। তাই বলে প্রাচীনতাকে আঁকড়ে ধরে সাহিত্যিকে স্থবির করে রাখতে হবে, এ-কথা আমরা বলছি না, আমরা বলছি—সামনের দিকে এগিয়ে চল। কিন্তু স্মরণ রেখো সামনের পায়ের শক্তি পিছনের পায়েই নিহিত। অতীত এবং ভবিষ্যতের যোগ-সেতু এই বর্তমান।

পরিশেষে আমরা আশা করব যে প্রতিটি সাহিত্যিক নিশ্চয়ই মনে রাখবেন যে তাঁরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের সাধনার উত্তর-পুরুষ, এবং অর্জন করবেন এই মহান উত্তরাধিকার বহন করবার যোগ্যতা। কেন না, আমরা বিশ্বাস করি যে গত শতাব্দীর সারস্বত সাধনা-লব্ধ বিপুল শক্তি এখনও প্রতিটি চৈতন্যময় মানুষের অন্তরে ক্রিয়াশীল।

---

(১) বাংলা ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—শ্রীনরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

(২) বাঙলা ছোটগল্পের ভূমিকা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩), (৪), (৫) সাহিত্যের সমস্যা—নারায়ণ চৌধুরী।

ভারতবর্ষ

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সমস্ত ভারতবর্ষ করেছ ভ্রমণ ?
দেখেছ কি গ্রাম এর, পল্লী অগণন ?
দেখেছ কেবল মাত্র কয়েকটি শহর।
দিল্লী, আগরা, জয়পুর, বোম্বে, শ্রীনগর !
দেখেছ উপরিভাগ, মহাসমুদ্রের,
চঞ্চল চমক দেওয়া বুদ্বুদ ফেনের !
তাই দেখে ভুলিয়াছ, তার বেশি আর
ভাবিয়াছ কিছু হেথা নাহি দেখিবার !
ডুবিলে না তলদেশে, যেথা অগণন
লুক্কায়িত সমুজ্জল অমূল্য রতন।

কতগ্রাম, কতপল্লী! দেখ দেখি আসি,
অবনত, অবজ্ঞাত লক্ষ গ্রামবাসী।
নেতাদের, মন্ত্রীদের, আত্মীয় ইহারা!
কে বুঝিবে বহে দেহে, একই রক্তধারা!
তবু বলি—জেনে রেখো, ইহা মিথ্যা নয়,
এখানেই এদেশের পাবে পরিচয়!
খোঁজ হেথা পেয়ে যাবে অমূল্য রতন,
জ্যোতির রশ্মিতে তার মুগ্ধ হবে মন!
এদেরি চরিতকথা শোন মন দিয়া,
দেখিবে ভারতবর্ষ—তৃপ্ত হবে হিয়া!

আদালতে চলিতেছে খুনের বিচার!
অভিযুক্ত জেলে এক! অপরাধ তার,
প্রমাণিতে সাক্ষী নাহি। জনসমাবেশ
হয়েছে প্রচুর। তারি মাঝে জীর্ণ বেশ—
দুঃখের প্রতিমা যেন—আলুথালু কেশ—
দাঁড়িয়ে রয়েছে নারী, পাণ্ডুরবরণী।
অভাজনা, অবজ্ঞাতা জেলের ঘরণী!
একমাত্র সন্তানের দেখিতে বিচার
আসিয়াছে! সংসারেতে কেহ নাহি আর!

সাক্ষী নাই! আসামী খালাস পাবে আজ!
হেনকালে বিনামেঘে পড়িল কি বাজ?
দেখিয়াছি নিজে আমি। সাক্ষী আমি তারি।"
জননী ফুকারি ওঠে—"পুত্র, হত্যাকারী।
চমকিল আদালত। আসামী কম্পিত!
উকিল, বিচারপতি। বিস্ময়ে স্তম্ভিত!
আসামী উকিল ক্রুদ্ধ। কহে—"সর্বনাশী!
নিজের ছেলেরে তুই দিতে চাস্ ফাঁসি!"

নারী কহে—"শান্ত মনে করিয়া বিচার,
বলিয়াছি, যাহা মোর ছিল বলিবার!
পুত্রেরে বাঁচাবো মোর ধর্মেরে বিনাশি—
ধিক্ হেন কুচিন্তায়! হোক তার ফাঁসি!"

ইহাই ভারতবর্ষ! শ্রেষ্ঠ যাহা তার—
এ নারী প্রতীক তার সর্বতপস্যার!

একটি জীবনের অভিযান

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস।

এই নামের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি আশ্চর্য জীবনের ইতিহাস। সে জীবন আদ্যোপান্ত এ্যাডভেঞ্চারে ভরা। সেকালের নিস্তরঙ্গ বাঙ্গালী জীবনে, ভারতবর্ষীয় চরিত্রে এমন দুঃসাহসী অভিযাত্রীর তুলনা কোথায়? এমন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয়ে গড়া বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যায় না। অপরিচিত বিদেশে, নানা বিরুদ্ধ পরিবেশে এমন সংঘাতমুখর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী! কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনে ইতিহাস যেন একটি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। তার প্রতিটি অধ্যায় বিচিত্র বিষয় বস্তুতে চমকপ্রদ।

কোথায় বাংলাদেশের নিভৃত অভ্যন্তরে এক পরিচয়হীন পল্লীগ্রাম আর কোথায় সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার এক স্বাধীন রাজ্য ব্রেজিল! এই দুস্তর ব্যবধান সুরেশ বিশ্বাসের জীবন-অভিযানে ঘুচে গিয়েছিল। কৃষ্ণনগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে, ইছামতী নদীর ধারে নাথপুর গ্রামের একটি দুরন্ত ছেলে জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে হয়েছিলেন ব্রেজিলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর-নায়ক। সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বছরে তাঁর জন্ম। কিন্তু দুজনের জীবনের মধ্যে কোন যোগাযোগ কিংবা যোগসূত্র কোনদিনই ছিলনা। তবে একথা বলা যায় যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সেকালীন একটি আক্ষেপোক্তিকে সার্থকতায় মণ্ডিত করেছিলেন :

"দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।" এই আবেদনের তিনি ছিলেন মূর্তিমান উত্তরস্বরূপ। সেকালের প্রাণহীন, কূপমণ্ডুক, নির্জীব বাঙ্গালী জীবনযাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ যখন ধিক্কার দেন, সুরেশ বিশ্বাস বৃহত্তর জগতে তখন জীবনের অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেকথা সম্ভবত কবির জানা ছিলনা। কারণ দূর বিদেশে কীর্তি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এবং স্বদেশে সেই খ্যাতির বার্তা পৌঁছতে সুরেশচন্দ্রের তখনো অনেক বিলম্ব।...

নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সুরেশ বিশ্বাসের জন্ম হয়। পিতামহ রামচাঁদ বিশ্বাসের সামান্য কিছু জমিদারি ছিল। তাঁর ৪ পুত্রের মধ্যে গিরীশচন্দ্র তৃতীয়। তিনি কলকাতায় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে (সার্ভেয়ার জেনারেল অফিস) চাকুরি করতেন এবং সেই সূত্রে তাঁদের কলকাতায় বাস আরম্ভ। দেশে যাতায়াত হ'ত ছুটির সময়।

গিরীশচন্দ্রের ২ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে সুরেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। শিশুকাল থেকেই সুরেশ যেমন সাহসী তেমনি চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। ভয় ডর কাকে বলে কোনদিনই তা জানতেন না। উত্তরকালে স্বভাবের যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাঁর নাথপুরের বাল্য-জীবনেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়।

সেখানে নিতান্ত শৈশবেও তিনি আগুন দেখে ভয় পেতেন না, বরং এগিয়ে যেতেন সেদিকে। ঘরে অনেক সময় তাঁকে একলা রেখে দিতে হত। তাই পাছে কখন আগুনের সংস্পর্শে ছেলে এসে পড়ে, এই ভেবে জননী তাঁকে আগুনের দহন-শক্তি দেখিয়ে আগুন সম্পর্কে ভয় জাগাতে চেয়েছিলেন। সেজন্যে একটি দীপের ওপর ছেলের হাত রেখে দেন তার উত্তাপের অভিজ্ঞতার আশায়। কিন্তু শিশু একবারও হাত সরিয়ে নেয়নি কিংবা যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠেনি। জননীকেই হার মেনে তাকে দীপের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

বালকবয়স থেকেই সুরেশচন্দ্র অসমসাহসী এবং দলনেতা। সঙ্গীদের দলকে পরিচালনা করে নিত্য গ্রামের পথে-বিপথে অভিযান করতেন—পরের বাগানে, পুকুরে। এই ভাবে নানারকম খাদ্য সংগৃহীত হ'ত। সেই সঙ্গে গাছে গাছে উঠে পাখীর বাসা থেকে পক্ষীশাবক নিয়ে আসা ছিল আর এক আকর্ষক খেলা। এই আকর্ষণে একদিন প্রাণ বিপন্ন হয়েছিল, বেঁচে যান শুধু দুর্জয় সাহস আর বুদ্ধির জোরে। তখন ১১ বছর বয়স। এক আম গাছে পাখীর বাসা লক্ষ্য করে, একা গাছে উঠে সেই দিকে হাত বাড়িয়েছেন ছানা নেবার জন্যে। ওদিকে কোটর থেকে প্রকাণ্ড সাপ ফুঁসে উঠে দুলে দুলে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। এমন অবস্থা যে, গাছ থেকে নামতে গেলে সাপকে পার হয়ে তবে যেতে হয়। ভয়ে আত্মহারা না হয়ে তিনি আর এক দিকের ডালে গেলেন। শিকার হাত ছাড়া হয় দেখে সাপ ছোবল মারলে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু বাধা পড়ল একটি ছোট ডালে। দ্বিতীয়বার ফণা তুলে ছোবল মারবার আগেই তিনি বাঁ হাতে তাঁর ফণা ধরে ফেললেন। সাপও তাঁর হাত বেষ্টন করলে পাকে পাকে। তাঁর সঙ্গে সর্বদা যে ছুরিখানি থাকত, সেটি দাঁত দিয়ে খুলে সাপের গলায় বসিয়ে দু'টুকরো করে দিলেন। তারপর পক্ষীশাবকটিকে যথারীতি সংগ্রহ করে এবং মুণ্ডহীন সাপটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এলে, মা বাবা সকলেই জানতে পারলেন বৃত্তান্ত।

এই ঘটনার আগে থেকেই সুরেশচন্দ্রের কলকাতায় বাস এবং সেখানে স্কুল-জীবন আরম্ভ হয়েছিল। পিতা তখন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে কড়েয়ায় একটি বাড়ি ক্রয় করে, দেশ থেকে পুত্রকে আনিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু কল্‌কাতাতেও সুরেশচন্দ্রের স্বভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার দিকেই বেশি ঝোঁক। এখানেও একটি দল গঠন করে অভিযানে বেরোনো ইত্যাদি চল্‌তে লাগল।

তারপর একবার ছুটিতে দেশে গেছেন, তখন ১৩ বছর বয়স। নাথপুরে তখন পাগলা কুকুরের উপদ্রবে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। ভীষণ পাগলা কুকুরের আক্রমণে কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে গেছে। কুকুর শিয়ালের ভয়ে গ্রামের অনেকেই তখন বেরুতে পারত না সন্ধ্যার পরে। কিন্তু এত সব শুনেও ঘরে বসে থাকবার পাত্র নন সুরেশচন্দ্র। তাঁর সান্ধ্যভ্রমণ যথারীতি চল্‌ল। একদিন বেরিয়ে ফিরছেন গ্রামের প্রান্তে এক পথ দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হতে আর বিশেষ দেরি নেই, এমন সময় একটা পাগলা কুকুর তাঁকে দেখতে পেয়ে তাড়া করে' এল। হাতে তাঁর কোন লাঠি পর্যন্ত নেই। অগত্যা তিনি পায়ে পায়ে ধূলো উড়িয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলেন কুকুরটার চোখ এড়াবার জন্যে। এক দমে খানিকদূর ছুটে এসে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়াবামাত্র পাগলা কুকুর লোলজিহ্বা মেলে এগিয়ে এল। তখন তিনি একমাত্র উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলেন কলকাতা থেকে শেখা একটি পদ্ধতি—'জোড়া পায়ে লাথি'। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সমস্ত শক্তি দিয়ে জোড়া পায়ে লাথি মারতেই কুকুরটা ছিটকে পাশের নালায় পড়ে গেল। তখন তিনি একটা ইট তুলে এনে তার মাথায় ছুঁড়ে মেরে তাকে শেষ করলেন।

তার কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনা। নাথপুর গ্রামের এক ক্রোশ দূরে সেখানকার নীলকুঠীর একদল সাহেব সেদিন শিকারী কুকুরদের নিয়ে বরাহ মারতে বেরিয়েছেন। তাঁদের কুকুরের তাড়ায় আর বন্দুকের শব্দে বরাহ ছুটে পালাবার সময় সেই দিক থেকে ফিরছিলেন সুরেশ বিশ্বাস, তাঁর অন্য দুই সঙ্গীকে নিয়ে মাছ ধরার শেষে। সাহেবরা তাঁদের দেখে চীৎকার করে পালাতে বলায় তাঁর সঙ্গী দুজন পলায়ন করলেও, সুরেশচন্দ্র সেই প্রাণভয়ে উন্মত্ত বরাহের দিকে এগিয়ে গেলেন। বরাহের পেছনে শিকারী কুকুরের তাড়া, তারও পেছন থেকে সাহেবরা তাঁকে চীৎকার করে পালাতে বলতে লাগলেন বার বার। বরাহটা লালা-নিঃস্রাবী মুখব্যাদান করে তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে হাতের ছিপ দিয়ে বরাহটার মাথায় আঘাত করতেই সে উল্টে পড়ে গেল। তখন শিকারী কুকুরের দল এসে তাকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করতে লাগল। সেই সাহেবরা বন্দুকের কুঁদো আর সুরেশচন্দ্র ছিপের ঘায়ে মারতে মারতে সাবাড় করলেন সেই বুনো বরাহটাকে।

সাহেবরা তাঁর দুঃসাহস দেখে যারপর নেই বিস্মিত হয়ে-

ছিলেন। তাঁকে তাঁরা অজস্র সুখ্যাতি করলেন আর রীতিমত খাতির জানিয়ে একদিন যেতে বললেন তাঁদের নীলকুঠীতে। সুরেশচন্দ্র তারপর একদিন তাঁদের কুঠীতে গিয়ে আলাপ পরিচয় করে' এলেন। নীলকুঠীকে কেন্দ্র করে নাথপুর অঞ্চলে যে ইংরেজ-সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাঁদের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের মেলামেশার সূত্রপাত হল তখন থেকে। মাঝে মাঝেই তিনি কুঠী বাড়িতে যেতেন এবং এই অসমসাহসী ছেলেটিকে সেখানকার সাহেব মেম সকলেই বেশ পছন্দ করতেন। তিনি ক্রমে নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগলেন সেখানে।

সে সময় অনেক নীলকর সাহেবদের মেমরা থাকত না এদেশে। কিন্তু নাথপুরের কুঠিয়াল সাহেবের মেম ছিলেন এবং তিনিও বড় স্নেহ করতেন এই বাঙ্গালী ছেলেটিকে। তাঁর ছেলে সুরেশচন্দ্রের সমবয়সী, সে বিলেতে থেকে লেখাপড়া করত। তাই সুরেশকে সেই মহিলা ছেলের মতন ভালবাসতেন। এদের সকলের সঙ্গে নিত্য মেলামেশার ফলে মুখে মুখে ইংরেজী কথাবার্তা বলতে বেশ দক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি।

মেম সাহেবের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বেড়াতে বেরুতেন টম্ টম্ চ'ড়ে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে অতি পুরনো একটা পুকুরের সামনে তাঁরা এসে পড়লেন। পুকুরটা শেওলা আর আগাছার জঙ্গলে ভরা হলেও বড় বড় পদ্ম ফুল তার মধ্যে ভাসতে দেখলেন তাঁরা। এত বড় আর এমন সুন্দর পদ্ম সচরাচর দেখা যায়না। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিপাতের ফলে অপরূপ সেই পদ্মফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মেম সাহেব। কিন্তু যত আকৃষ্টই হোন, কে এনে দেবে তাঁকে সেই পানা পুকুরের মাঝখান থেকে? তাঁর এত ইচ্ছা দেখে সুরেশচন্দ্র জামা জুতো খুলে জলে নেমে পড়লেন। মেম সাহেব কিন্তু বিপদ বুঝে তাঁকে বারণ করলেন, নিরস্ত করতে চাইলেন বার বার। কিন্তু সে ছেলে ভয়ে পিছিয়ে আসতে কোনদিন শেখেন নি।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁটতে গিয়েই তিনি সাংঘাতিক বিপদ বুঝতে পেরেছিলেন। সেই অগভীর জলে বহুকালের জমা পাঁকে তাঁর পা আটকে যেতে লাগল, কে যেন পা ধরে টেনে টেনে নামিয়ে দিতে চাইলে নীচের দিকে। সেই অবস্থাতেও তিনি এগিয়ে চললেন পদ্মফুলের দিকে হাত বাড়িয়ে। মেম সাহেব চীৎকার করে তাঁকে ফিরে আসতে বলতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কোনরকমে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন গোটাকতক পদ্ম। তারপর ফেরবার সময়ে অসম্ভব হল আসা। প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, ক্রমেই নামতে লাগলেন নীচের দিকে। ডুবে যাবার উপক্রম, কোনরকমে হাত উঁচু করে পদ্মফুল ক'টিকে তুলে ধরেছেন। মেম সাহেব ভয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, তাঁর ক্রন্দন শুনে একজন চাষা ছুটে এসে বুঝতে পেরেই সুরেশের দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিলে। তিনি সেই দড়িতে কোমর বেঁধে ফেললেন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন চাষা এসে পড়ে তাঁকে টানাটানি করে ডাঙ্গায় তুললে। উঠে আসতে দেখা গেল, সর্বাঙ্গে পাঁক, বহুকালের জমানো পাঁক। চাষারা জানাল যে, এই পাঁকে পড়লে কেউ উঠতে পারে না, এমনভাবে বসে যায়। এখানে কোন কোন লোক প্রাণ হারিয়েছে এইভাবে। এই ছেলেটিরও সে অবস্থা হ'ত, বহু ভাগ্যে বেঁচে গেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও তিনি পদ্মফুলগুলি এনে দিলেন মেমসাহেবকে। এই ঘটনার পর মেমসাহেবের স্নেহ তাঁর ওপর আরো বেড়ে গেল। কয়েকদিন পরে তাঁর বিলেত যাবার কথা! তিনি সুরেশচন্দ্রকে বিলেতে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তাতে রাজি হলেন না সুরেশচন্দ্রের পিতা-মাতা। যা'হক, নাথপুরের কুঠী-বাড়িতে দিনকয়েক সানন্দে যাতায়াত করবার পর তাঁকে আবার ছুটির শেষে কলকাতায় চলে যেতে হল।

কলকাতায় স্কুলে পাঠ আরম্ভ হলেও দিন কাটতে লাগল তেমনিভাবে। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ নেই, দুরন্তপনা এবং মারপিট ইত্যাদিই সবচেয়ে ভাল লাগে। সঙ্গীদের নিয়ে ময়দানে বেড়ানো প্রতিদিনের কাজ। একদিন ময়দানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় দুটো ষণ্ডা চেহারার সাহেব তাঁদের শূয়ার, নিগার ইত্যাদি সম্বোধন করায় সুরেশচন্দ্র চোটপাট গালি দিলেন। ইংরেজযুগল তাঁর অল্প বয়স দেখে

তেড়ে এগিয়ে এল হাতের সুখ করবার আশায়। সুরেশচন্দ্র তাদের একজনের নাকে ভারি ওজনের একটি ঘুষি কষিয়ে দিতেই সে ঘুরে পড়ল। তারপর দুজনে মিলে আক্রমণ করলে তাঁকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘুষির বহরে দুজনকেই ধরাশায়ী হতে হল।

এইভাবে এবং ছোটখাটো শিকার যাত্রা, দল বেঁধে মাঠে মাঠে হৈ চৈ করা, দরকার হলে এবং না হলেও মারপিঠ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদিতে দিন কাটতে লাগল তাঁর। পিতা ভবানীপুরের লণ্ডন মিশন স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মাসের মধ্যে ২০ দিনই তিনি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকতেন। তখন দাঙ্গাবাজ ছেলেদের দলপতি হয়ে স্কুলের কাছাকাছি দোকানদারদেরও সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন তিনি। পিতার কানে ক্রমে সব খবরই এসে পৌঁছতে লাগল। তিনি ধমক বকুনি থেকে আরম্ভ করে মারধোর এবং বহু শাসন করেও অপারগ হলেন পুত্রের মতিগতি সংশোধন করতে।

মাতা পিতা দুজনেই অত্যন্ত মনোকষ্ট পেলেন। এমন বুদ্ধিমান ছেলে, অথচ লেখাপড়ায় আদৌ মন নেই, কেবল দাঙ্গার দিকে ঝোঁক। বাড়িতে ক্রমেই তিনি সকলের অপ্রিয় হয়ে পড়লেন। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালও তাঁকে সংশোধনের অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন শেষ পর্যন্ত। চারিদিক থেকে পুত্রের নিন্দা শুনে পিতা ক্রমে অত্যন্ত কঠোর শাসন আরম্ভ করলেন। কিন্তু ফল আরো খারাপ হ'ল তাতে। পিতাকে এড়াবার জন্যে তিনি ৫ দিন ৭ দিনের জন্যে বাড়ি থেকে পলাতক হ'তে লাগলেন। অনেক খৃষ্টান ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, বাড়ি থেকে পালিয়ে খাওয়া, থাকা চলতে লাগল তাদের বাড়িতে। তাদের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা ও আহার বিহার বাড়তে লাগল, স্বভাবচরিত্রেও আরো পরিবর্তন দেখা গেল। হিন্দু ধর্মের আর কিছু ভাল লাগল না। (অবশ্য সে ধর্মের বিশেষ কিছু জানবারও সুযোগ হয়নি এ যাবৎ!) ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন নানা বিষয়ে। সেই অবস্থায় খৃষ্টান মিশনারিদের প্রচারে ও প্ররোচনায় খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

সেই সঙ্গে স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা এত বৃদ্ধি পেলে যে, বাড়ির মধ্যে একমাত্র প্রিয়, কাকা কৈলাসচন্দ্রও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ভর্ৎসনা করতে লাগলেন তাঁকে। পিতাও একদিন সর্বাঙ্গে বেত্রাঘাত করলেন। খৃষ্টান সংসর্গ করবার জন্যে ত্যাজ্যপুত্র করবারও ভয় দেখালেন। বাল্য থেকে স্বাধীনচেতা সুরেশচন্দ্র পিতার তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবার সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের ত্যাগ করে যেতে উদ্‌যোগী হলেন তিনি। শুধু জননীর স্নেহের বন্ধনে এতদিন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন। সে বাঁধনও ছিন্ন করলেন এবার। একদিন পিতার সঙ্গে কলহের পর "আর বাড়ি ফিরব না" বলে গৃহত্যাগ করলেন।

প্রথমে গেলেন খৃষ্টান বন্ধুদের বাড়ি। তারা সব শুনে কিছুদিন তাঁকে বাড়ি না যেতে পরামর্শ দিলে। তারপর তিনি লণ্ডন মিশনের প্রিন্সিপ্যাল এ্যাস্টন সাহেবের কাছে গিয়ে একেবারে আত্মসমর্পণ করলেন, পিতার আশ্রয় ত্যাগের সব বিবরণ জানিয়ে।

সাহেব তাঁকে তখন বুঝিয়ে পড়িয়ে বাইবেল পাঠ করতে দিলেন। সুরেশচন্দ্রের তখন পিতা থেকে আরম্ভ করে সব আত্মজনদের ওপর জাতক্রোধ। বাড়ি ফিরে যেতে একান্ত অনিচ্ছা। আর যাতে কেউ বাড়ি ফিরিয়ে নিতে না পারে এবং পিতার ওপরেও আক্রোশ চরিতার্থ হতে পারে সেজন্যে সেই অপরিণত মন সহজ রাস্তা বেছে নিলে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ! সেই ১৩ বছর মাত্র বয়সে খৃষ্টান হলেন।

খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করলেন। পিতাও যথারীতি ত্যাজ্যপুত্র করে ঘোষণা করলেন যে, এমন পুত্রের আর মুখদর্শন করবেন না।

তখন এ্যাস্টন সাহেব অনেক সাহায্য করলেন তাঁকে। লণ্ডন মিশন স্কুলে তাঁর বিনামূল্যে বাস, আহার ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর কিছুতেই মন বসল না। লেখাপড়ার জন্যে তাঁর জন্ম হয়নি যেন! পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতেও ইচ্ছা হলনা। সুতরাং চাকুরির জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও লেখাপড়া না জানার জন্যেই কাজ পেলেন না।

শেষপর্যন্ত একটি কাজ জুটল স্পেন্সেস হোটেলে—(যেখানে

কয়েক বছর আগে মাইকেল মধুসূদন বিলেত থেকে ফিরে কিছুদিন বাস করেছিলেন)। ইংরেজীতে কথাবার্তা ভাল বলতে পারতেন বলে এই কাজটি পেলেন তিনি। কাজ হ'ল—জাহাজ ঘাটে, রেল স্টেশনে থাকা এবং বিলেত থেকে সাহেব মেম এলে এই হোটেলে নিয়ে আসা। এখানে কিছুদিন এই কাজ করবার পর আর তাঁর ভাল লাগল না। চঞ্চল হয়ে উঠল মন। রোজ গঙ্গার ধারে জাহাজে সাহেবদের আনা নেওয়া করতে করতে তাঁর নিজের মনেও বিলেত যাবার ইচ্ছা ক্রমেই তীব্র হতে লাগল। কিন্তু তা' সফল হবার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মনের মধ্যে কিন্তু দূর দেশে ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছা তাঁকে ব্যাকুল করে তুললে। নানা ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করে আগ্রহ আরো বাড়তে লাগল সুদূর দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবার। তখনো তিনি লণ্ডন মিশনেই বাস করেন। এ্যাস্টনও সেখানে থাকেন সপরিবারে।

মনের আকুলতায় শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন ডেক টিকেট কিনে রেঙ্গুন যাত্রী এক জাহাজে উঠে পড়লেন।

তখন তাঁর ১৪ বছর বয়স। বিলেত যেতে অনেক টাকার দরকার, তা তখন হয়ে উঠবে না—তাই স্থির করে-ছিলেন আপাতত বর্মা যাওয়া যাক। ইংরেজরা তখনো উত্তর ব্রহ্ম অধিকার করতে পারেনি, শুধু দক্ষিণাঞ্চলে ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজী-জানা লোকের সেখানে বিশেষ অভাব জেনে সুরেশচন্দ্র চাকুরির আশায় পাড়ি দিলেন। হাতে তখন অর্থ অতি সামান্যই, তাই জাহাজ থেকে রেঙ্গুন পদার্পণ করেই কাজের চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন।

হঠাৎ সেখানে এক জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে ব্যক্তি তাঁকে নিজের বাসায় নিয়ে গেল। এবং সেখানে তাঁর বাসের ব্যবস্থা হল নিশ্চিন্ত হয়ে কাজের চেষ্টা করবার জন্যে। সেকালের রেঙ্গুন যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি সেখানে গুণ্ডা বদমায়েসদের আড্ডা। খুন জখম ডাকাতি রাহাজানি হামেশাই ঘটে। রীতিমত মগের মুলুক। বন্ধু তাঁকে সাবধানে রাস্তায় চলাফেরা করতে বলে দিয়েছিল। কিন্তু ভয় কাকে বলে তা সুরেশচন্দ্র কোনদিনই শেখেন নি। একলা সেই বিপজ্জনক বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াতেন যথেচ্ছ এবং যত্রতত্র। একদিন নৌকায় বেড়াতে গিয়ে, সন্ধ্যার পর রেঙ্গুনের অন্ধকার রাস্তায় গুণ্ডার দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হলেন। সঙ্গে একটি ছোট রুল যে সর্বদা রাখতেন সেটির সাহায্যে এবং নিজের অমিত শক্তি ও সাহসের জন্যে সেযাত্রা প্রাণ রক্ষা হয় তাঁর।

রেঙ্গুনে থাকবার সময় একদিন এক জলন্ত বাড়ি থেকে একটি নারীকে উদ্ধার করেন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে। পথে আসবার সময় দেখেছিলেন জলন্ত বাড়ির দোতলায় জানালায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে চীৎকার করছে, রাস্তায় বহুলোক জমায়েত থাকলেও কেউ তাকে মুক্ত করতে এগিয়ে যাচ্ছে না। সেই জনতাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে তিনি তখন সেই প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে উঠে যান সেই বাড়ীর ওপরে। এবং মহিলাটির প্রাণ রক্ষা করেন।

কিন্তু রেঙ্গুনে কিছুদিন বাস করেও কোন রকম চাকুরি বা কাজের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে স্থির করলেন ফিরে আসা। কিন্তু কলকাতায় না ফিরে মাদ্রাজ যাওয়া সাব্যস্ত করলেন, কারণ রেঙ্গুনে থাকবার সময় আলাপ হয়েছিল কয়েকজন মাদ্রাজীর সঙ্গে। মাদ্রাজ দেখবারও ইচ্ছা ছিল এবং সেই সঙ্গে চাকুরির আশায় জাহাজের ডেকের যাত্রী হয়ে এবার মাদ্রাজ চলে গেলেন।

মাদ্রাজে গিয়েও কোনরকম কাজের ব্যবস্থা তাঁর হল না। তার ওপর হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে মহা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিছু দিনের মধ্যেই। ভাগ্যক্রমে এক দয়ালু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পাথেয় সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তারপর মাদ্রাজ থেকে শূন্য হাতে বিদায় নিয়ে আবার উপস্থিত হলেন কলকাতায়। বয়স তখন তাঁর ১৬ বছর।

এখানে এ্যাস্টন সাহেব তাঁকে লণ্ডন মিশন বোর্ডিং-এ বাসের অনুমতি দিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কোন ভাল বা স্থায়ী কাজ সংগ্রহ করতে পারলেন না সুরেশ-চন্দ্র। নানা রকমের ঠিকা কাজ করে কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলেন। বাড়ির সঙ্গে এমনিতে কোন সম্পর্ক আর রইল না বটে, তবে মাঝে মাঝে গোপনে দেখা করে আসতেন মায়ের সঙ্গে।

এবার লেখাপড়া শেখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন অনেক ঠেকে অনেক অভিজ্ঞতার পর। তাই ভাল করে পড়াশোনায় মন দিলেন। তবে তা স্কুলের কোন নিয়মিত বিদ্যাচর্চা নয়—নতুন নতুন দেশের কথা, নতুন নতুন জানবার বিষয় নিয়ে বই পড়তে লাগলেন। কারণ মনের মধ্যে তখনো জেগে ছিল বিলাত যাবার স্বপ্ন। সে স্বপ্নকে সফল করবার আশায় এবার আবার নতুন করে উদ্যোগী হলেন।

প্রায়ই গঙ্গার ধারে জেটিতে জেটিতে গিয়ে জানবার চেষ্টা করতেন বিলাত যাবার খবরাখবর। সুযোগ পেলেই নাবিকদের ডেরায় গিয়ে জাহাজী সাহেবদের সঙ্গে ভাব করে জাহাজে জীবনযাত্রা আর সমুদ্রের কথা, তাদের নানা রকম অভিজ্ঞতা আর দেশ বিদেশের কথা অসীম আগ্রহে শুনতেন, জানতেন। যেসব সদাগরী প্রতিষ্ঠানের জাহাজ আছে সেখানে গিয়েও সন্ধান করতেন বিলাত যাবার কোন সুযোগ হতে পারে কিনা। এমনিভাবে কয়েক মাস অবিশ্রান্ত চেষ্টার পরে বি, এস, এন কোম্পানীর এক জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে তিনি বেশ আলাপ পরিচয় করে নিলেন। এই কাপ্তেনের মনটিও ছিল দয়ালু। তার ওপর প্রত্যহ তাঁর কাছে যাতায়াত করে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জাহাজে এ্যাসিস্টাণ্ট স্টুয়ার্ডের কাজে নিযুক্ত হলেন।

কয়েকদিন পরেই সে জাহাজ ছাড়ল বঙ্গোপসাগরে। এতদিনের সাধ পূর্ণ করতে তিনি সত্যই সুদূর বিলাতে পাড়ি দিলেন। স্বদেশ থেকে এ তাঁর চির বিদায়—আর কোনদিন দেশের মাটিতে ফিরে আসতে পারেন নি। নানা বিপর্যয় ও বিচিত্র কীর্তির তরঙ্গে অবশেষে ইউরোপ আমেরিকায় সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিল তাঁর উত্তর জীবন।

লণ্ডনে পৌঁছে সেই জাহাজেই তিনি কাপ্তেনের অনুমতিতে তিন সপ্তাহ বন্দরে রইলেন। তারপর তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাস করতে গেলেন লণ্ডনের কুখ্যাত ইস্ট এণ্ড পল্লীতে। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে খবরের কাগজ বিক্রির কাজ আরম্ভ করলেন।

কিন্তু বেশীদিন সে কাজ ভাল লাগল না, ছেড়ে দিলেন। অথচ কোন স্থায়ী কাজ পাওয়াও অসম্ভব তাঁর পক্ষে। তাই কখনো অর্দ্ধাহার কখনো অনাহার চলল। কারণ কাজ না করতে পারলে লণ্ডনে খাদ্য জোটেনা বিদেশীর পক্ষে। এদেশে ভিক্ষা মেলে না। যে কোন রকম কাজ মাঝে মাঝে করে তিনি কিছু উপার্জন করতেন বটে, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ল। শেষে কুলিগিরি আরম্ভ করলেন লণ্ডনের রাজপথে।

কিছুদিন মুটের কাজ করে দেখলেন, এতে খবরের কাগজ বিক্রির চেয়ে রোজগার বেশি হয়। কয়েক মাস মুটেগিরি করবার পর হাতে কিছু টাকা জমিয়ে এ কাজ ছেড়ে দিলেন। ইস্ট এণ্ড পল্লী থেকে উঠে গেলেন একটু ভদ্রতর পাড়ায়। কিন্তু এখানে এসে এক বিচিত্র বিপাকে পড়লেন। তাঁর এক গুণ ছিল এই যে, লোকের সঙ্গে সহজেই মেলামেশা করে সকলের প্রিয়পাত্র হতে পারতেন। তার ওপর অসাধারণ দৈহিক-শক্তি আর সাহসের জন্যেও এই পল্লীতে এসে অনেককে আকৃষ্ট করে ফেললেন, বিশেষ কয়েকটি নারীকে। তার মধ্যে একটি বিবাহিতা মহিলা তাঁর প্রতি এতদূর অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁকে উদ্দাম প্রেম নিবেদন করতে তাঁর ঘরে পর্যন্ত চড়াও হতে আরম্ভ করলেন। আত্মরক্ষার জন্যে অনন্যোপায় হয়ে তখন সুরেশচন্দ্র শুধু সেই অঞ্চল নয়, লণ্ডন সহরই পরিত্যাগ করে গেলেন।

এ দেশের পল্লীগ্রাম ভাল করে দেখবার ইচ্ছা তাঁর আগে থেকেই ছিল, তার সুযোগ করে নিলেন এবার। উপার্জনের একটি ব্যবস্থা করে চলে এলেন পল্লী অঞ্চলে। এখন এক অভিনব পেশা—ফিরিওয়ালা। একটি পুরণো জিনিষের দোকান থেকে শুধু ভারতীয় কয়েকরকম সামগ্রী বিক্রির জন্যে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ফিরি করতে লাগলেন। একে সুদূর ভারতবর্ষের লোক, তায় অন্যরকমের জিনিষপত্র দেখে কৌতুহলী হয়ে গ্রামের লোকেরা তাঁর কাছে আসতে থাকে, বিক্রিও হয় বেশ। দেশভ্রমণ এবং উপার্জন দু-ই ভালভাবে চলে।

এমনিভাবে ৪।৫ মাস কাটবার পর দেখলেন, হাতে বেশ কিছু টাকা জমে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে কেণ্ট প্রদেশের

একটি সহরে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে তখন খেলা দেখাতে এসেছে এক সার্কাস দল। তার খেলোয়াড়েরা সুরেশচন্দ্র যে হোটেলে রয়েছেন সেখানেই এসে উঠল। তাদের সঙ্গে আলাপ ভাল করে হতেই তিনি সার্কাসদলে ঢোকবার জন্যে মেতে উঠলেন। শরীর চর্চা আর নানা প্রকার ব্যায়াম তিনি ছেলেবেলা থেকেই করতেন, লণ্ডনে এসেও তার অনুশীলন ছাড়েন নি। বরং এখানে এসে নিয়মিত চর্চায় শরীর তাঁর আরো শক্তিশালী হয়েছে। তাই সেই সার্কাসদলের ম্যানেজারকে আবেদন জানালেন তাঁকে দলে নেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর একহারা চেহারা দেখে ম্যানেজার উপযুক্ত বলে মনে করলেন না! সুরেশচন্দ্রের তখন অদম্য আগ্রহ। তিনি পরীক্ষা নেবার জন্যে ম্যানেজারকে অনুরোধ জানালেন। তাঁকে অপ্রতিভ করবার জন্যেই হয়ত ম্যানেজার তাঁকে কুস্তী লড়তে দিলেন দলের সবচেয়ে বড় পালোয়ানের সঙ্গে। কিন্তু সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলে যে, সেই অসুরাকৃতি মল্লকে তিনি ধরাশায়ী করে দিলেন।

ম্যানেজার তাঁকে দলে নিযুক্ত করে নিলেন সেইদিনই। তারপর থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন একজন ভারতীয় যুবক অদ্ভুত সব খেলা দেখাবে।

তিনি তখন একনিষ্ঠ সাধনায় সার্কাস-খেলোয়াড়ের জীবনে আত্মনিয়োগ করলেন। তারপর সত্যিই এই অসাধারণ ভারতীয় তরুণ আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়ে সেই সার্কাসের অনুষ্ঠান জনপ্রিয় করে তুললেন। শুধু জিমন্যাষ্টিকের কৌশল নয়, হিংস্র জন্তুদের বশ করে অসমসাহসে তাদের নিয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। এতদিন পরে তিনি সার্থকতার পথে প্রথম পদক্ষেপ করলেন।

এখানে বলে রাখা যায় যে, দেশের কথা তিনি বিদেশের কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হন নি এবং বরাবর চিঠি লিখে যোগ রাখতেন কাকা কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে। তাঁকে তিনি নিয়মিত নিজের সমস্ত অবস্থা ও অভিজ্ঞতা আনুপূর্বিক জানাতেন এবং সেইসব পত্রাবলী থেকেই তাঁর জীবনীর বিস্তারিত উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। উত্তরকালে চিঠিগুলি থেকে তার স্বদেশে ফেরবার, জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আকুলতাও প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মাঝে।

ওদিকে যে সার্কাসদলে তিনি নতুন জীবন আরম্ভ করলেন, সেখানে কয়েকটি মেয়ের মধ্যে একজন ছিল জার্মান। সে অবাধে ইংরেজীতে কথা বলতে পারত। অল্পভাষিণী এবং কিছু গম্ভীর স্বভাব সেই মেয়েটির চালচলন কথাবার্তায় প্রকাশ পেত বিশিষ্ট রকমের শিক্ষা-দীক্ষা ও আভিজাত্য। অন্য মেয়েদের তুলনায় সুন্দরীও। তার মাথায় ঘন কৃষ্ণ আস্কন্ধ কেশগুচ্ছ সুরেশচন্দ্রের ভারতীয় চোখকে আকর্ষণ করে। দলের প্রায় সব পুরুষই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেও সে একান্ত গাম্ভীর্যে কাউকেই আমল দেয়না। কিন্তু এই অমিত শক্তিমান, সুদক্ষ সার্কাসপটু ভারতীয় যুবকটির প্রতি তার মনোভাব যেন অন্য রকম। অন্য কেউ সামনে না থাকলে তাঁর ওপর তার হাবভাব দৃষ্টিপাতে যে অনুরাগ প্রকাশ পায় তা' সুরেশচন্দ্রও বুঝতে পারেন। তাঁর মনেও আনুরক্তির রঙ লাগে। মনে মনে দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেও কারুর কথা থেকে প্রকাশ পায় না তা। তিনি পুরুষ হয়েও অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় সংযমে নিরুদ্ধ রাখেন।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে মেয়েটি বিজ্ঞাপন দেখে যে, তার মা মৃত্যুশয্যা থেকে তাকে শেষবার দেখবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে। সার্কাসদল ছেড়ে দিয়ে যাত্রা করে মায়ের উদ্দেশে। সুরেশ বিশ্বাস তাকে বিদায় দেবার জন্যে যখন ট্রেণে তুলে দিতে গেলেন, মেয়েটি তখন হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করে নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেললে। তিনি কিন্তু জানালেন যে, দুজনের বিবাহ-মিলনে দুস্তর বাধা।

অসমাপ্ত অনুভবের মধ্যে দুজনের তখন বিচ্ছেদ ঘটল।

তিনি সার্কাসদলে ফিরে এলেন। হিংস্র পশুদের নিয়ে দুর্দান্ত সাহসে খেলা দেখিয়ে দর্শকদের স্তম্ভিত করে সার্কাস করতে লাগলেন। কিন্তু মন থেকে উৎপাটিত করতে পারলেন না সেই তরুণীর সুমধুর স্মৃতি। মাঝে মাঝে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান ও দু পক্ষকে স্মরণের ডোরে যুক্ত রেখে দিলে।

এদিকে সার্কাসে পশুদের নিয়ে দুঃসাহসিক খেলায় প্রখ্যাত হয়ে আর একটি নতুন কাজ পেলেন। প্রফেসর জামবাক, যিনি দুর্ধর্ষ পশু বশের জন্যে সমগ্র ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ এবং ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকা পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশের জঙ্গলে অবস্থান করেছেন হিংস্র জন্তুদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে—সুরেশচন্দ্রের এবিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে নিজের সহকারীরূপে কাজ করবার প্রস্তাব দিলেন তাঁকে। তিনিও সাহেবের কথায় সাগ্রহে রাজি হলেন। তারপর দু'বছর তাঁর তুল্য বিশেষজ্ঞের শিক্ষাধীনে থেকে পশু বশ করবার বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, অর্থোপার্জনও হল ভালই।

এ বিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী হয়ে পরে তিনি একটি বড় এবং নামজাদা সার্কাসদলে যোগ দিলেন। এবার তাঁর গুণপনা দেখাবার সুযোগ পেলেন আরো বৃহত্তর এবং অভিজাত সমাজে। বাঘ সিংহের নানা প্রকার রোমহর্ষক খেলা দেখিয়ে প্রায় সমগ্র ইউরোপে বিখ্যাত হলেন। ১৮৮২ খৃঃ লণ্ডনে যে বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হল, সেখানে হিংস্র জন্তুদের খেলোয়াড় হিসাবে যশের শিখরে আরোহণ করলেন। বহু পদক আর সার্টিফিকেট লাভ করে' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন এবং সেই সঙ্গে বিপুল প্রতিষ্ঠাও। তখন তাঁর ২১ বছর বয়স।

কিছুদিন পরে সেই সার্কাসদলের সঙ্গে সফরে জার্মানীর হামবার্গ সহরে উপস্থিত হলেন। এখানে গাজেনবাক নামে এক বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীর বিরাট পশুশালা ছিল। গাজেন্‌বাক সার্কাসদলের চেয়ে অনেক বেশি বেতনে এখানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন সুরেশচন্দ্রকে। তিনি সার্কাস ত্যাগ করে এই পশুশালার কাজে চলে এলেন। তাঁর এখানে প্রধানকাজ হল, দুর্দান্ত পশুদের 'শিক্ষা' দেওয়া। সেই সব শিক্ষাপ্রাপ্ত জন্তুদের গাজেন্‌বাক বহু মূল্যে নানা সার্কাসদলে বিক্রয় করতেন, সুরেশচন্দ্রেরও উপার্জন হ'তে লাগল প্রচুর পরিমাণে। এবার তিনি সকলের কাছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে গণ্য হতে আরম্ভ করলেন। তা ছাড়া, অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি দলের প্রায় প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র হলেন তাঁর মিশুক স্বভাবের গুণে।

এই দলের কাজেও তাঁকে ইউরোপের নানা জায়গায় যাতায়াত করতে হত। একদিন জার্মানীর এক সহরে বেড়াবার সময় একটি দোকানে হঠাৎ দেখা হল সেই মেয়েটির সঙ্গে।

এতদিন পরে এমন অভাবিত সাক্ষাতে দুজনের মনের অবস্থা কল্পনা করে' নেওয়া যায়। বিস্ময়ানন্দের প্রথম ঘোর কাটিয়ে তখনি সেই দোকান থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটি নির্জন বাগানে তিনি গেলেন তার সঙ্গে। সেখানে একটি বেঞ্চে বহুক্ষণ দুজনে রইলেন। মেয়েটি তার নিজের ইতিহাস সব বলে জানালে যে, মায়ের মৃত্যুর পর পৈত্রিক বহু অর্থ-সম্পদের অধিকারিণী হয়েছে। তখনো সে অবিবাহিতা। সুরেশচন্দ্র বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রতি তার অন্তরের অনুরাগ আগেরই মতন আছে।

তারপর প্রত্যহ তিনি তার সঙ্গে গোপন স্থানে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। দুজনের মনই সম্পূর্ণ অবারিত হল পরস্পরের কাছে। তিনিও এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিবাহের পূর্ণতা লাভে আর বাধা কোথায়?

মেয়েটির কিন্তু অভিজাত আত্মীয়স্বজন অনেক। তা' ছাড়া তার মতন সুন্দরী ও ধনীকন্যাকে বিবাহ করবার আশায় অনেক মান্যগণ্য পরিবারের পাণি-প্রার্থীরা ব্যগ্র হয়ে আছেন। কিন্তু সে দিব্যাঙ্গনার প্রথম-প্রেম তাঁদের সকলের ওপর তার মনকে বিমুখ করেছে। এই ভারতীয় তরুণকে আবার ফিরে পেয়ে সে মন স্থির করে' ফেলেছে এতদিনে। কিন্তু সমাজে প্রকাশ করতে পারে না সেকথা। তাই গোপনে সকলের চোখ এড়িয়ে সে দিনের পর দিন দয়িতের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল।

কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল সুরেশ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর অভিসারের কাহিনী। তার আত্মীয়স্বজন এবং প্রার্থীরাও এই কলঙ্কের কথা জানাজানি হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আত্মীয়দের আক্রোশ এসে পড়ল এই বিদেশীর ওপর। তাঁরা তাঁকে প্রথমে ভয় দেখিয়ে, পরে প্রাণে নাশ করবার চেষ্টা

করতে লাগলেন। যত নির্ভীকই হ'ন, বিদেশে এই অবস্থায় তিনি থাকা ভাল বিবেচনা করলেন না। অন্তরের সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করে, জীবনের পরম লগ্নকে বাধ্য হয়ে অপূর্ণ রেখে ত্যাগ করে' গেলেন জার্মানী।

শুধু জার্মানী ত্যাগ করেও নিস্তার পেলেন না। ইউরোপের যেখানে যান, সেখানেই সেই মেয়েটির আত্মীয়-বান্ধবদের লোক জীবন বিপন্ন করে। অগত্যা তিনি ইউরোপ পরিত্যাগ করাই নিরাপদ মনে করলেন অবশেষে। বহু দিনের বহু কষ্টে ইউরোপে আয়ত্ত করা জীবনের প্রতিষ্ঠা জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রাণের আরাম সেই নারীরত্নের একনিষ্ঠ প্রেম বিসর্জন দিয়ে তাঁকে চিরকালের জন্যে চলে যেতে হল।

অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল আমেরিকা দেখবার। এখন বাধ্য হয়ে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করলেন একটি বড় সার্কাসদলে যোগ দিয়ে। এ কাজ এখন সহজে পেয়ে গেলেন, এত খ্যাতি সার্কাস-জগতে তাঁর হয়েছিল। এবার অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। সেই নিবেদিতা তরুণীর সঙ্গে আর তাঁর উত্তরকালে কখনো দেখা হয়নি। বাস্তব জীবনের ঝঞ্ঝায় তার সেই প্রথম প্রেমের নৈবেদ্যের কি পরিণতি ঘটেছিল তাও কিছু জানতে পারেননি তিনি।

এম্‌নিভাবে তাঁর জীবন-নাট্যের ইউরোপীয় অঙ্কের ওপর যবনিকাপাত হল। বয়স তখন তাঁর ২৪ বছর।

ওয়েল নামে একজন প্রসিদ্ধ সার্কাসওয়ালার দলে যোগ দিয়ে ১৮৮৫ খৃঃ তিনি আমেরিকায় এলেন। এই সার্কাসে হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে খেলাই প্রধান আকর্ষণ। আমেরিকার নানা জায়গায় এই সব পশুদের নিয়ে অমন সাহসী কার্যকলাপ দেখিয়ে সুরেশ বিশ্বাস প্রচুর প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করতে লাগলেন। তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্যের বিবরণ, তাঁর ছবি বেরুতে লাগল এখানকার কাগজে কাগজে। নিউইয়র্কে তিনি এইভাবে সুপরিচিত হয়ে উঠ্‌লেন। তারপর সদলে গেলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। প্রথমে মেক্সিকো, তারপর ব্রেজিলে।

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম রাজ্য ব্রেজিল। কিন্তু সেখানে তাঁর আগে অন্য বাঙালীর আগমন ঘটেনি। আকারে প্রায় ভারতবর্ষের মতন বিশাল রাজ্য এই ব্রেজিলে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে স্পেন। তারপর পোর্টুগাল। ইউরোপীয়রা ব্রেজিলে বসবাস এবং এদেশীয় নারীদের বিবাহাদি করার ফলে যে মিশ্রিত জাতির উদ্‌ভব হয়, তাদের নাম ক্রিয়োল। ব্রেজিলে পরে ক্রিয়োলের সংখ্যাই সমধিক হয়। তাছাড়া, শ্বেতকায় পোর্টুগীসদের সঙ্গে কাফ্রী রমণীদের মিশ্রণে আর একটি বর্ণসঙ্কর জাতি দেখা দেয়—মুলাটো। ক্রিয়োলের পর সংখ্যার হিসেবে মুলাটো ধর্তব্য। স্পেন, পোর্টুগালের উপনিবেশকারীরা ছাড়া, জার্মানীর অনেক লোকও ব্রেজিলে বসবাস করে। পোর্টুগাল এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করবার পর নেপোলিয়ন যখন পোর্টুগাল আক্রমণ করেন, পোর্টুগীস রাজা তখন পলায়ন করে চলে আসেন ব্রেজিলে এবং এখানে সম্রাট-রূপে আত্ম-ঘোষণা করে বসবাস করতে থাকেন। পরে ইউরোপে পোর্টুগালের সঙ্গে নেপোলিয়নের সন্ধি স্থাপিত হলেও সম্রাট আর সেখানে ফিরে গেলেন না, তাঁর এক আত্মীয়কে পাঠিয়ে দিলেন পোর্টুগালের রাজা করে। তখন থেকে পোর্টুগীস সম্রাট ব্রেজিলে রাজত্ব ভোগ করেন সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত।

দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র মধ্যঅঞ্চল জুড়ে বিরাট দেশ হলেও ব্রেজিলের লোকসংখ্যা অতি অল্প। রাজ্যের বেশির ভাগ স্থানই গভীর জঙ্গল। দুতিনটি মাত্র সহর। রেলপথ তৈরি হয়নি। অতলান্তিকের তীরে তার রাজধানী রিও ডি জেনিরো। লোকসংখ্যা তার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। এখানে সার্কাস দেখাতে এলেন সুরেশ বিশ্বাস।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রেজিলে আসবার পর থেকে তাঁর প্রতিভা আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে লাগল। এদেশে বাস করবার সময় থেকেই আরো অপূর্ব সার্থকতার পথে অগ্রসর হয় তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবন। বলা যায়, পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, এই অজানা রহস্য ভরা দেশ ব্রেজিল। নানা বিষয়ে তাঁর অসামান্য প্রতিভা বিকাশের নতুন ক্ষেত্র হল। অবশ্য তাঁর জীবনের এই পরম পরিণতির

প্রস্তুতিপর্ব চলছিল ইউরোপে। সেখানে নানা পরিস্থিতিতে এবং বিচিত্র বিপাকের মধ্যে তাঁর জীবন সম্পূর্ণতার জন্যে গঠিত হচ্ছিল। যদিও বহিরঙ্গ জীবনে তিনি তখন প্রাণান্তকর জীবন-সংগ্রামে কখনো বিপর্যস্ত, কখনো বিজেতা—তাঁর বিচিত্র অন্তর্লোক কিন্তু সেই দুশ্চর পর্বেই সুবর্ণ ভবিষ্যতের বর্ণালীর ঐশ্বর্য সম্ভারে প্রস্ফুটিত হতে থাকে অবশ্য। ব্রেজিলে আসবার পর তিনি পোর্টুগীজ, ইটালীয়, স্প্যানিস ও ডাচ এই কটি ভাষায় অবাধে কথা বলতে শিখেছিলেন। তা ছাড়া, অবসর সময় পাঠেও মনোনিবেশ করতেন এবং এদিকেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হতে আরম্ভ করেছিল বিচিত্র বিষয়ে। সেও তাঁর জীবনের এক আশ্চর্য অধ্যায়। যিনি আবাল্য লেখাপড়ায় অমনোযোগী এবং বিদ্যালাভে অপটু ছিলেন, তিনিই বিদেশে এবং অত্যন্ত বিরূপ পরিবেশে আপন চেষ্টায় কয়েকটি দুরূহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। তাঁর প্রিয় বিষয় হল—অঙ্ক, রসায়ন এবং দর্শনশাস্ত্র। ঘনিষ্ঠ চর্চার ফলে এই তিন বিষয়েই তিনি পারদর্শী হলেন। তারপর ব্রেজিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো ক'টি বিভাগে দক্ষতা লাভ করেছিলেন—সে প্রসঙ্গ পরে উল্লেখ্য।

ব্রেজিলে এসে যে ভাল বক্তা বলে সুপরিচিত হলেন, এখানকার নানাস্থানে বক্তৃতা দেবার ফলে সংবাদপত্রাদিতেও তাঁর সুখ্যাতি হতে লাগল—তার মূলে ছিল ইউরোপে তাঁর বিভিন্ন ভাষার চর্চা। ব্রেজিলের রাষ্ট্রভাষা পোর্টুগীসে তাঁর আগে থেকেই অধিকার থাকায় এখানে পোর্টুগীস ভাষায় বক্তৃতা দেবার জন্যে সহজেই এ দেশীয়দের চিত্ত জয় করলেন। বক্তারূপে তিনি মনস্বীতারও পরিচয় দিলেন দর্শন, রসায়ন ইত্যাদি তাঁর প্রিয় বিষয়ে আলোচনা করে।

ব্রেজিল তাঁর ক্রমে বড় ভাল লাগল। এদেশের অপরূপ নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হলেন তিনি। তাঁর এতদিনের ভ্রাম্যমান স্বভাব যেন বশীভূত হল। অন্তরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশেই বাস করা স্থির করলেন স্থায়ীভাবে। একটি উপযুক্ত সুযোগও পেয়ে গেলেন। তখন এখানকার রাজকীয় পশুশালার পরিদর্শক ও রক্ষকের পদে কেউ নিযুক্ত ছিলেন না। পদটি শূন্য থাকায়, সুরেশ বিশ্বাসের এ বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁকে এই কাজে নিয়োগ করলেন রাজকর্মচারীরা। তিনি সার্কাস দল ছেড়ে ব্রেজিলের সরকারী পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলেন।

এখানে কাজ করবার সময়েই তিনি নিজের একটি নাতিক্ষুদ্র লাইব্রেরি গড়ে তোলেন এবং সেখানে গভীর রাত্রি জাগরণ করে পাঠে নিমগ্ন থাকতেন নানা বিষয়ে। দর্শন প্রভৃতি তাঁর প্রিয় বিষয় ত' ছিল, উপরন্তু চিকিৎসা-বিদ্যাতেও কিছু জ্ঞান লাভ করলেন; এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় ব্যুৎপত্তি। ইন্দ্রজাল সম্পর্কে তিনি বিশেষ কৌতূহলী ও অনুরাগী হয়ে বিশেষ চর্চা করেছিলেন। তাঁর ইন্দ্রজাল ও সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করে এক রোগিণীর মানসিক-ব্যাধি নিরাময় করবারও এক বিবরণ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে তাঁর জীবনের আবার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ব্রেজিলে বসবাস আরম্ভ হলেও তাঁর চিরবিচিত্র জীবনে অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটল পুনরায়। তাঁর জীবনকৃতির এও এক বৈশিষ্ট্য—নিত্য নতুনত্ব। এবং এবারে তাঁর জীবনের এই দিক পরিবর্তন হল সুদূরপ্রসারী। তাঁর আর এক অনাবিষ্কৃত ভবিষ্যৎ তাঁর নাম স্মরণীয় করে রাখবার যোগ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পথে নতুন অভিযানের সূত্রপাত হ'ল। আর সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনে আর একটি রোমান্টিক পর্ব। তাঁর দ্বিতীয় প্রেমের কাহিনী, যা বিয়োগান্তক না হলেও নানা তির্যকরেখায় অগ্রসর হয়। এবং তারই প্রায় সমকালে তার জীবনেরও চরম গৌরব অর্জন করেন চূড়ান্ত সংগ্রামের শেষে।

ব্রেজিলে আসবার বছরখানেক পরে তাঁর সঙ্গে এখানকার এক চিকিৎসকের আলাপ হয়েছিল—কি সূত্রে তা' জানা যায় না, তবে তাঁর নিজের চিকিৎসাবিদ্যায় অনুরাগ ও চর্চার জন্যেও হতে পারে। সেই চিকিৎসকের কন্যাকে তিনি প্রথমদিন দেখেই মুগ্ধ এবং অনুরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সুন্দরী তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করেননি—শুধু সেদিন নয়, তারপর অনেক দিন পর্যন্ত। প্রথম দর্শনের পর বহুদিন বহু স্থানে তাঁদের পরস্পর দেখা হয়েছে। কখনো কখনো কথাবার্তাও। সুরেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ সন্ধান করেছেন, উন্মুখ চিত্তে তাঁর সঙ্গ কামনা

করেছেন। কিন্তু এই বিদেশীর প্রতি কোন আগ্রহ জাগেনি সেই তরুণীর মনে।

এমনি ভাবে দিন যায়, মাস যায়। প্রায়ই তাঁকে তেমনি দেখা শোনা হ'তে থাকে। কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার মধ্যে তিনি কিন্তু তাঁর আকুল হৃদয়াবেগ ব্যক্ত করেন না সেই ব্রেজিল-বরাঙ্গনার কাছে। ক্রমে আরো জানাশোনা হয়। নানাদিকের কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পেতে থাকে সুরেশ-চন্দ্রের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী। তার ফলে অপরপক্ষের অন্তরে অলক্ষ্যে রূপান্তর ঘটে। কোন রহস্যলোকের সোনার মায়া-কাঠির স্পর্শে উদাসীনতা দূর হয়ে দেখা দেয় কৌতূহলী আগ্রহ। দীর্ঘ আঁখিপক্ষের নীচে কালো চোখের ভাষায় অপরূপ কোমলতার বর্ণাভা ফুটে ওঠে। সুরেশচন্দ্রের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী কৈশোর থেকে আরম্ভ করে তাঁর এই পূর্ণ যৌবনকাল পর্যন্ত পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা নাটকীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনতে শুনতে আকৃষ্ট হয় কন্যার চিত্ত। রূপকথার রাজপুত্র অবশেষে এই রোমান্টিক ভারতীয় যুবকের বেশে তাঁর মনোহরণ করে। ক্রমে একান্ত অনুরাগিণী হলেন তিনি।

উত্তর জীবনে যে কীর্তিলাভের জন্য সুরেশ বিশ্বাসের নাম স্মরণযোগ্য হয়ে আছে, তারও উপলক্ষ্য হন এই নারী। তখন তাঁদের ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বের স্তর অতিক্রম করেছে, এমন এক সময় তাঁর মানসী তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমায় সৈনিকের পোষাকে বোধহয় চমৎকার মানাবে।'

সুরেশচন্দ্র এ কথার উত্তর কিছু দিলেন না। কিন্তু তাঁর মর্মস্থলে গাঁথা হয়ে গেল এই অপূর্ব নতুন কথাটি। তাঁর সমস্ত অন্তর আলোড়িত, ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। তিনি এক অভূতপূর্ব প্রেরণা লাভ করলেন এই সাদর উক্তিতে। তাঁর মনের আকাশে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হল।

কথাটিকে তিনি প্রণয়িনীর প্রিয় সাধ হিসাবে মনের মধ্যে গ্রহণ করলেন এবং স্থির করলেন যে এ সাধ পূর্ণ করে তিনি প্রেমের পরিচয় দেবার একটি সুযোগ পাবেন।

এই সংকল্পকে কাজে পরিণত করা কিন্তু তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তবু তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না। বিপুল স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে, জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে এবং অর্থকরী জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন-সংগ্রামের পথে পা বাড়ালেন। সরকারী পশুশালার অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিলেন একজন সাধারণ সৈনিকরূপে।

সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করবার সময় তাঁকে তিন বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে হল। তখন তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় কৃতবিদ্য, স্বনামধন্য সার্কাস খেলোয়াড় হয়েও তিন বছর সৈন্যদলে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য রইলেন একজন সামান্য সেনা হিসেবে। কিন্তু সেখানে মনে কোন গ্লানি না রেখে কঠোর পরিশ্রমে সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি অভ্যাস ও শিক্ষা করতে লাগলেন নতুন উদ্যমে। তখন তাঁর বয়স ২৬ বছর চলছে।

সেনাবাহিনীতে নিম্নতম শ্রেণীর পদাতিক সৈনিক হয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তার ওপর সেকালের ব্রেজিলের তীব্র বর্ণ-বিদ্বেষী আর এক শ্বেতকায় জাতির পদানত ভারতবর্ষের তিনি একজন 'নেটিভ্' প্রজা, এখানকার সমর-বিভাগের পোর্টুগীস ও অন্যান্য শ্বেতকায় কর্তৃপক্ষের মজ্জাগত বিদ্বেষের পাত্র! সুতরাং উন্নতির পদে পদে নিষ্ঠুর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে তিনি সেই বিসদৃশ পরিস্থিতির মধ্যেও অগ্রগতির পথ করে নিলেন। প্রচণ্ড বর্ণ বিদ্বেষীর মনোভাব সত্ত্বেও তাঁর উন্নতি রুদ্ধ করতে পারলেন না সামরিক কর্তৃবর্গ।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই সুরেশ বিশ্বাস সান্টাক্রুজে একটি পদাতিক দলের কর্পোরাল হলেন। কর্পোরালের পদে উন্নীত হবার পর তাঁকে অনেকদিন বাস করতে হয় সান্টাক্রুজে। এখানে তাঁর কাজ ছিল সম্রাটের অশ্বরক্ষকদের তত্ত্বাবধায়ন। এ কাজে তাঁর সময় অল্পই যেত, সেজন্যে দীর্ঘ অবসর পেতেন। সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন নানা বিষয় পাঠে এবং রাসায়নিক পরীক্ষা ইত্যাদিতে।

সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এলেন রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোতে। এখানে তিনি সামরিক-চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। এও তাঁর সৈন্যবিভাগেরই কাজ। কিন্তু হস্‌পিটালে তত্ত্বাবধায়ন করবার সঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যাও হাতে কলমে ভাল করে শিক্ষার সুযোগ পেলেন। আগে

থেকেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পুস্তকাদি পাঠ করে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, এখানে ব্যবহারিক চিকিৎসা-বিদ্যায়, বিশেষ অস্ত্র-চিকিৎসায় রীতিমত শিক্ষার সুবিধা পেয়ে গেলেন তিনি। এবং অদ্ভুত প্রতিভাবলে এমন পারদর্শী হলেন যে, এখানকার রোগীদের অপারেশন পর্যন্ত করতেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ—প্রণয়িনীর আরো প্রিয় হবার চেষ্টা। তাঁর ধারণা ছিল, চিকিৎসক-কন্যা নিশ্চয় এ বিদ্যা বিশেষ ভালবাসেন।

অবশেষে ১৮৮৯-এ সেনাবিভাগে তাঁর তিন বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হ'ল। এখন ইচ্ছা করলে তিনি এ বিভাগের কাজ ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু এই তিন বছরে সমর-বিদ্যাতেও তিনি এমন অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে আর ছেড়ে দেবার ইচ্ছা হলনা। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিণতি যেন এই পথে তাঁকে আকর্ষণ করে রাখে এবং বাঙ্গালী জাতির ভীরুতার অপবাদ ঘুচিয়ে তিনি পরে যে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তারও ভিত্তি রচিত হয় এইভাবে।

তিন বছর পূর্ণ হবার আগেই তিনি অশ্বারোহী থেকে পদাতিক শ্রেণীতে পদ পরিবর্তিত ক'রে নিয়েছিলেন। এবার সেই শ্রেণীর বন্দুক চালনাতেও ভালভাবে শিক্ষা পেলেন। আর কয়েক বছরের মধ্যেই যে সমর-বিভাগে অত্যুচ্চ পদ লাভ করে ও রণক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে নিজের ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করেন—এসব তারই প্রস্তুতিপর্ব।

রিও-ডি জেনিরোর হসপিটালে থাকবার সময়েই প্রস্তুতির প্রথম পর্ব তাঁর আরম্ভ হয়েছিল। তখন যুগপৎ দুটি মহা-বিপদ ঘনিয়ে আসে। মার্কিণ দেশের মারাত্মক ব্যাধি-পীতজ্বর দেখা দেয় মহামারির আকারে। আর সেই সঙ্গে দেখা দেয় দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ। সেই যুদ্ধাদিতে আহত এবং পীতজ্বরে পীড়িত রোগী দলে দলে হসপিটালে আশ্রয় নেয়। তখন যুদ্ধ ও সেবার দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করে তিনি অসাধারণ যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দেন সেই মহাসঙ্কটকালে। এবং এই নতুন ভূমিকায় দেশীয় বহুলোকের শ্রদ্ধার পাত্র হন।

ক্রমে তিনি কর্পোরাল থেকে পদাতিক বাহিনীর প্রথম সার্জেন্ট পদে উন্নীত হলেন এবং সেই পদে নিযুক্ত রইলেন ১৮৯৩ খৃঃ পর্যন্ত। স্বদেশে তিনি যেসব পত্র নিয়মিত লিখতেন তা থেকে জানা যায় যে, সমপদস্থদের চেয়ে তাঁর ওপর অনেক বেশি কাজ ও দায়িত্ব দেওয়া হত। অথচ শুধু ভারতীয় হওয়ার ফলে তীব্র বর্ণ বৈষম্যের জন্যে তাঁর পদোন্নতিতে বাধা পড়ত। বহু বীরত্বের কাজ, রাজ্যের নানা উপকার সাধন করে যশস্বী হলেও, এমনকি রাজ-কর্মচারীদের প্রশংসা লাভ করলেও তাঁর পদোন্নতি হয়নি দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ। সেই সার্জেন্টই থেকে যান।

তারপর ১৮৯২-এ প্রথম লেফটেনান্টের পদ লাভ করলেন তিনি। এই পদের গুরুত্ব কম নয়। রেজিমেন্টের দ্বিতীয় পদ। এই পদাধিকার বলে তিনি একটি সেনা-দলের অধিনায়ক হলেন। লেফটেনাণ্ট পদ তিনি সহজে পাননি, তাঁর অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে আরো একটি গুরুতর কারণে তা সম্ভব হয়েছিল। রাজ্যে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। বিদ্রোহ পরিণত হয়েছে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবে। ব্রেজিলের নৌ-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাজধানী অবরোধ করেছে। অবরুদ্ধ রাজধানী মুক্ত করবার জন্যে চলেছে অগ্নিযুদ্ধ। সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সুরেশ বিশ্বাস লেফটেনাণ্ট হয়েছিলেন।

কাকা কৈলাসচন্দ্রকে তিনি যে চিঠিপত্র লিখতেন, তার মধ্যে একখানিতে লেফটেনাণ্ট হবার সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা করে যে চিঠি লেখেন, তার কিছু অংশ এখানে দেওয়া হল :

'আমি এখন যে পদ পেয়েছি, ভাববেন না সহজে পেয়েছি। আমি যে এদেশের সেনাদের মধ্যে একজন সেনাপতি হব, এ আমি কখনো ভাবিনি। অনেক সময়েই আমার পদোন্নতির কথা উঠেছে আর প্রত্যেকবারই আবার নাম চাপা পড়েছে—আমি বিদেশী বলে আমার পদোন্নতিতে প্রত্যেকবার ব্যাঘাত ঘটেছে। সম্প্রতি দেশে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে—আমি ও সমপদস্থরা একজন প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ হয়েছি। ইনি আমাকে চিনতেন না—কিন্তু ন্যায়বান

ব্যক্তি—লোকের গুণগ্রহণে বিরত নন। আমি কোন দেশ-বাসী, আমি কে, তাহা একবারও দেখেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সাহস ও দক্ষতা দেখে প্রীত হয়ে আমার পদোন্নতির জন্যে রাজপুরুষদের লেখেন—তাতেই আমার এই পদোন্নতি ঘটেছে। তিনি আমার সম্বন্ধে এ দেশের মার্শাল ভাইস প্রেসিডেন্টকে বিশেষ রূপে লিখেছিলেন, তাতেই আমি লেফটেনান্টের পদ লাভ করেছি। আপনি বোধ হয় শুনেছেন যে, আমি লেফটেনান্ট হয়ে নাথেরয় নামক জায়গায় যে ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে বিশেষ দক্ষতা দেখাই। আমাদেরই জয় হয়েছে।'

উক্ত নাথেরয় যুদ্ধের কথা পরে উল্লেখ করা হবে। এই যুদ্ধের আগে তাঁর ব্যক্তি-জীবনে পরম আকাঙ্খিত ঘটনাটি ঘটে যায়। হৃদয়ের যে আকুল আশা নিয়ে তিনি দুশ্চর সামরিক-জীবনের সাধনা করেছিলেন, সকল কাঁটা ধন্য করে তা অনুরাগে রাঙা গোলাপ হয়ে তাঁর জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে অবশেষে। প্রেয়সীকে তিনি পত্নীরূপে লাভ করেন।

তাঁদের বিবাহ উপলক্ষে যে উৎসব হয়, তাও তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির উজ্জল নিদর্শন। মহাসমারোহে সম্পন্ন এই বিবাহ-অনুষ্ঠানে রিও-ডি-জেনিরোর সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ছিলেন। তার আগেই তিনি লেফটেনান্ট হন। এখানকার অভিজাতসমাজে বহু বন্ধু লাভ করে তিনি গণ্য হয়েছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে। স্বদেশ ও সমাজবান্ধব থেকে বহু দূরে অবস্থান করলেও তিনি বন্ধুর অভাব কোনদিন যেমন বোধ করেননি, তেমনি এখানেও। তাঁর সহৃদয় ও মিশুক স্বভাবের গুণে ব্রেজিলেও সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ পরিবৃত হয়ে থাকতেন। রিও-ডি জেনিরোর একজন অতি সম্ভ্রান্তব্যক্তি, মিঃ লাজোস, যিনি ছিলেন প্রধান জমিদার ও ধনী, এদেশে তিনি সুরেশ বিশ্বাসের সব চেয়ে বড় সুহৃদ। এক কথায় বলতে গেলে, সমুদ্রপারের এই ভারত সন্তান ব্রেজিলের সব চেয়ে প্রখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতমরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। এবং তা সম্পূর্ণ নিজের পুরুষকারে।

বিবাহিত জীবনেও তিনি অতিশয় সুখী হন। তাঁর জীবনের সর্বদিক পুষ্পিত হয় অপূর্ব সাফল্যের গৌরবে। নানা শাস্ত্র ও বিদ্যায় তাঁর পাণ্ডিত্যলাভের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন নাথেরয়ের যুদ্ধে। তাঁর সামরিক-জীবনের এই সর্ববিখ্যাত অধ্যায়ে তিনি ব্রেজিলের আধুনিক কালের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে কীর্তিত হয়েছিলেন।

১৮৯৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেজিলে প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয় এবং সমগ্র আলোড়িত হয়ে ওঠে রাজকীয় বনাম সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর সংঘর্ষে। সুরেশ বিশ্বাস সাধারণ তন্ত্রীদের পক্ষে যোগ দিয়ে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এই বৈপ্লবিক যুদ্ধের অত্যন্ত সঙ্কটকালের নাথেরয়ের রণক্ষেত্রে তিনি যে সৈন্য পরিচালনে দক্ষতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন, সে সময়ে তার তুলনা আর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কৃতিত্বের জন্যেই সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর জয়লাভ সম্ভব হয় এই রণাঙ্গনে। সাধারণতন্ত্রীদের প্রায় বিপর্যয়ের মুখে তিনি দুর্জয় সাহস ও নেতৃত্বশক্তি প্রকাশ করে যুদ্ধের গতি আমূল পরিবর্তন করে দেন। মাত্র ৫০ জন সহযোদ্ধাদের মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার পর তাদের নিয়ে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সঙ্কুল ব্যূহে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সেই চূড়ান্ত আক্রমণের ফলেই নাথেরয় যুদ্ধের গতি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে বিজয়ী হয় সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল। সুদূর বিদেশের সমরক্ষেত্রে বাংলার এক সন্তানের পক্ষে এই বীরত্বের পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে যেমন লিখিত হবার যোগ্য তেমনি সে-যুগের নিরিখে ভারতীয় হিসাবেও এক অনন্যকীর্তি।

নাথেরয় যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর তাঁর সামরিক-জীবনও চূড়ান্ত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এই যুদ্ধের সাফল্যের পরেই হন পদাতিক সৈন্যদলের প্রথম লেফটেনান্ট। এবং শেষ পর্যন্ত—কর্নেল। শুধু কোন সুদূরের বিদেশীর পক্ষেই নয়, সেই ঘোর বর্ণ-বৈষম্যের পরিবেশেও সুরেশচন্দ্রের এই সামরিক পদোন্নতি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সেই সঙ্গে বৈষয়িক বিষয়েও তাঁর গৌরবের সময় এল যতদূর সম্ভব। রিয়ো-ডি- জেনিরোর এক অতিশয় সম্মানিত

ও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি রূপে তিনি পরিগণিত হলেন। পারিবারিক জীবনে তিন পুত্র, এক কন্যা ও প্রেমময়ী পত্নী নিয়ে সুখী গৃহপতি। সমাজে বীর, সজ্জন ও সুপণ্ডিত হিসাবেও খ্যাতি প্রতিপত্তি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার। ফলিত চিকিৎসা বিদ্যায় নানা দুরারোগ্য রোগীকে আরোগ্য লাভ করবার ফলেও বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত।

১৪ বছর বয়স থেকে যে বিপদসঙ্কুল জীবন-সংগ্রাম তাঁর জীবনে আরম্ভ হয়েছিল, এমনি ভাবে তার আশ্চর্য সফল পরিণতি দেখা গেল। মাত্র ৪৫ বছরের স্বল্পায়ত জীবনে এ্যাডভেঞ্চারের পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনে এতখানি সার্থকতা সত্ত্বেও তাঁর মনের গহনে গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত ছিল। এমনি বিচিত্র ও রহস্য-অতল মানুষের মন। ১৯০৫ খৃঃ তাঁর বাল্যবন্ধু পি. মুখার্জীকে লেখা একটি চিঠি থেকে তাঁর অন্তর্লোকের সেই অদৃশ্য দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়—'আমি মানসিক অশান্তি দুর করিবার জন্য ম্যাগনেটিসম, জ্যোতিষ গুপ্ততত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করি। কিন্তু ইহাতে আমার অশান্তি দূর হইল না।

কি সেই অব্যক্ত অশান্তি? তাঁর উক্ত সুহৃদকেই লেখা পরের একখানি চিঠিতে তিনি সেই তীব্র মনোকষ্টের স্বরূপ সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। তা হল—পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনদের কথা চিন্তা করে তাঁদের সকলের থেকে চিরকালের মতন বিচ্ছেদের জন্যে তাঁর নিদারুণ অন্তর্বেদনা। ঘটনাচক্রে যে আপনজনদের ত্যাগ করে গেছেন, পরম্পরাগত যে সামাজিক পরিবেশ থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। সুদূর বিদেশের সম্পূর্ণ বিজাতীয় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থান করেও সে-সবের জন্যে মর্মান্তিক আকুলতা বোধ করেছেন। সেখানকার বহির্জীবনে অসাধারণ যশস্বী ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়েও আমৃত্যু যে জর্জরিত হয়েছিলেন স্মৃতির দংশনে এ সত্য সম্ভবত তাঁর অন্তরঙ্গজনের কাছেও অভাবিত ছিল।

ব্রেজিলে তাঁর অনুরাগী কিংবা ঘনিষ্ঠজনেরাও হয়ত ধারণা করতে পারেন নি, কর্ণেল বিশ্বাসের সেখানে সেই গৌরবোজ্জ্বল সময়েও তাঁর মন কতখানি অধিকার করে রেখেছিল তাঁর স্বজন ও স্বদেশ।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে, ১৯০৫ খৃঃ লেখা তাঁর শেষ চিঠিখানিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, আরো অনেক কথা বলবার আছে, পরে লিখবেন।

কিন্তু আর তা লেখবার সময় পাননি।
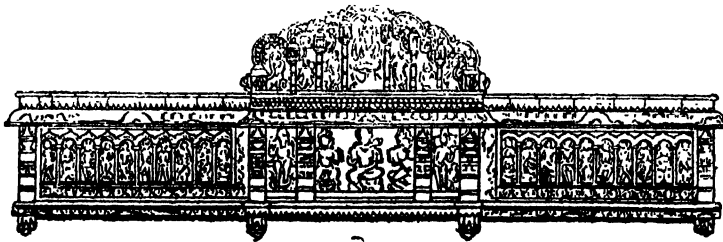
হেয়ার স্কুলের পূর্বকথা

কানাইলাল দত্ত

১.

কলিকাতার অন্যতম প্রাচীন ইংরেজি শিক্ষালয় হেয়ার স্কুল। সম্প্রতি এই স্কুলটি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ১৮১৮ সনটিকে প্রতিষ্ঠা বৎসর ধরিয়া এই বৎসর বিদ্যালয়টির দেড় শত বৎসর জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালনের উদ্যোগ চলিতেছে। এই তারিখের হিসাবেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পঁচাত্তর বৎসর এবং ১৯১৮ সনে শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। বর্তমান হেয়ার স্কুল ভবনশীর্ষে প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৮ সন বলিয়া লেখা হইয়াছে। এ সকল কারণে সাধারণের মনে স্বতঃই এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ১৮১৮ সনটিই হেয়ার স্কুলের জন্ম বৎসর। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালির শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চার একটি নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য বিবরণের পাণ্ডুলিপি এবং সমসময়ে বা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে প্রকাশিত পুস্তক প্রভৃতির নিরিখে এতদিনকার পোষিত বহু ভ্রান্ত ধারণা নিরাকৃত হইয়াছে। কাজেই যদি দেখা যায় তথ্যভিত্তিক আলোচনার আলোকে পুরাতন কোন ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে তখন তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। ভুলের বারংবার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তাহা কখনও সত্যের মর্যাদা লাভ করে না। সাম্প্রতিক কালে ইংরেজি বাঙলা সংবাদপত্রে হেয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠা বৎসর সম্বন্ধে যেরূপ বিতর্ক উঠিয়াছে তাহা হইতেই আমাদের এরূপ ধারণা হইতেছে।

২.

হেয়ার স্কুল নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবশেষে হেয়ার স্কুল নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এ কথা একটু পরে আমরা আলোচনা করিব। আগে জানা দরকার কি করিয়া এই স্কুলের পত্তন হইল।

বস্তুতঃ ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার শিক্ষানুরাগী গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙালিগণ একত্র হইয়া— কলিকাতার দেশীয় পাঠশালার উন্নতি সাধন, আদর্শ ইংরেজি ও বাঙলা স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ভাল ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি স্থাপন করেন। আর এই সোসাইটি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গায় যে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন তাহাই পরে হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়। কথা উঠিয়াছে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে হেয়ার সাহেবের আরপুলি পাঠশালার সঙ্গে একটি ইংরেজি স্কুল বা বিভাগ খোলা হইয়াছিল। এই ইংরেজি বিভাগটি সোসাইটির পটলডাঙ্গার ঐ আদর্শ ইংরেজি স্কুলের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়। এ কারণ আরপুলি পাঠশালার ইংরেজি বিভাগটি উহার পূর্ববর্তী বলিয়া সেই পাঠশালার প্রতিষ্ঠা-কালকেই কেহ কেহ হেয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠা বৎসর ধরিয়া লইতেছেন।

বিষয়টি খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ বর্তমানে এক

শ্রেণীর কৃতবিদ্য ব্যক্তি ১৮১৮ সনটিকে উক্ত আরপুলি পাঠশালার ইংরেজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল স্থির করিয়া ঐ তারিখটিকেই হেয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠা বৎসর গণ্য করিতেছেন। কাজেকাজেই এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্ম দু বৎসর আগে বা পরে হইলে কি আসিয়া যায়? ইহাতে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমে না সত্য, কিন্তু ইতিহাস তথ্য-ভিত্তিক হওয়াই আবশ্যক।

সুখের বিষয় আধুনিককালে বাঙালির ইতিহাস সচেতনতার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মিলিতেছে। গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে হেয়ার স্কুল সম্বন্ধেও প্রচুর তথ্যনির্ভর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য পেশ করিতেছি। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের নিম্নলিখিত বাঙলা ইংরেজি রচনা এই বিষয়ে দিগদর্শনস্বরূপ। তাহার কয়েকটি তাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করি।

১। কলিকাতায় জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠার নূতন ধারা—(১) বাঙলার শিক্ষক—ভাদ্র ১৩৫২।

২। ঐ—(২), বাঙলার শিক্ষক, আশ্বিন, ১৩৫২

৩। ঐ—(৩),—বাঙলার শিক্ষক, কার্তিক, ১৩৫২

৪। Three Pioneer Free Institutions in Calcutta, THE MODERN REVIEW, Sept, 1951.

৫। Primary Education in Calcutta (1818-1833) Mainly based on the manuscript proceedings of the Calcutta School Society) Bengal Past and Present—July-December 1962.

৬। কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র—হেয়ার স্কুল।

৭। বাংলার জনশিক্ষা—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।

২.

আরপুলি পাঠশালা ও ইহার ইংরেজি বিভাগকে হেয়ার স্কুলের আদি বলা হইয়াছে। এই আরপুলি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা হইল কবে? শ্রীযুক্ত বাগল মহাশয় তাহার Primary Education in Calcutta প্রবন্ধে লিখিতেছেন "the second object of the society was the opening of model or regular schools. The society could not turn their attention to this object before 1820.···Four schools were newly started by them in different parts of the city. Among them 'Arpuli Pathsala was given over to David Hare at his own request." (Bengal Past and Present, July-December 1962, p. 86)

যোগেশচন্দ্র স্কুল সোসাইটির প্রতিবেদন পুস্তকের মূল পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া এই তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, আরপুলি পাঠশালা কোনক্রমেই ১৮২০ সনের পূর্বে স্থাপিত হয় নাই।

আর এই পাঠশালার ইংরেজি বিভাগ—সে তো আরো পরের কথা। শ্রীযুক্ত বাগল কলিকাতায় জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠার নূতন ধারা (১) প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—'হেয়ার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে [আরপুলি] পাঠশালার সঙ্গে একটি ইংরেজি বিভাগ খুলেন।' (বাঙলার শিক্ষক, ভাদ্র, ১৩৫২, পৃ, ৬৬)। প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরেজি ডেভিড হেয়ার জীবনী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পাই :

In 1823, the English school was established near the (Arpooly) Patshala, whence the best boys were transfered to that school. Krishna Mohon was transfered to this school thence to Hare's school and in 1824 thence to the Hindu College, (A Biographical Sketch of David Hare,—Peary Chand Mitra. Basumati Press Edition, p. 57).

মিত্র মহাশয় এখানে স্পষ্টই বলেন যে, আরপুলি পাঠশালায় সন্নিহিত ইংরেজি বিদ্যালয়টি যাহাকে ইহার ইংরেজী বিভাগ বলা হইত তাহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

এখানে আমরা নূতন করিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম পাইতেছি। এবং ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, পাঠশালার তথাকথিত ইংরেজি বিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের ঐ স্কুলে অর্থাৎ হেয়ার সাহেবের স্কুলে পাঠান হইত। এই স্কুলটি কোথায় এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হইল? এবং ইহাকে 'হেয়ার সাহেবের স্কুলই' বা বলা হইত কেন?

এ সম্পর্কেও যোগেশচন্দ্রের পূর্বোক্ত কলিকাতায় জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠার নূতন ধারা (১) প্রবন্ধে যে তথ্য পাই তাহা এই: ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গায় স্কুল সোসাইটির অধীনে এবং ইহার ও হেয়ার সাহেবের অর্থানুকূল্যে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হেয়ার আংশিক ব্যয়ভার বহন করিলেও ইহার দেখাশুনার দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। এই স্কুলটি এই জন্যই ন্যায়তই হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হয়। সুতরাং একথা এখন নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আরপুলি পাঠশালার ইংরেজি বিভাগ এবং পটলডাঙ্গায় ইংরেজি মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৩৩ সন নাগাদ কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কাজকর্ম আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময় "হেয়ার নিজের আরপুলি পাঠশালাটিও তুলিয়া দিলেন। ইহার ইংরেজি বিভাগ পটলডাঙ্গা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করা হইল"। (কলিকাতার জনশিক্ষার নূতন ধারা (২)—বাঙলীর শিক্ষক, কার্তিক, ১৩৫২—যোগেশচন্দ্র বাগল)। অতএব দেখা যাইতেছে—আরপুলি পাঠশালা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপিত হয় নাই, ইহার ইংরেজি বিভাগ ও পটলডাঙ্গা স্কুল ও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি পরবর্তীকালে সরকার পটলডাঙ্গা স্কুলের নামকরণ করেন হেয়ার স্কুল। অতএব কোন হিসাবেই কি হেয়ার স্কুল কি আরপুলি পাঠশালার, কি ইংরেজী বিভাগ কোনটিই ১৮১৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং বর্তমান [১৯৬৮] বৎসরের হেয়ার স্কুলের যে দেড়শত জন্ম-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক বিচারে ভ্রান্ত তারিখের ভিত্তিতেই উহা অনুষ্ঠিত হইবে।

বাঙলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে হেয়ার সাহেবের শিক্ষালয়টির কৃতিত্ব কখন ভুলিবার নহে। কলিকাতায়, শুধু কলিকাতায় কেন সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষে এই স্কুলটির মত এমন প্রাচীন ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান এক হিন্দু স্কুল বাদে আর দ্বিতীয়টি নাই। এ দিক হইতে বিদ্যালয়টির জন্মোৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি আবশ্যক নানাদিক হইতে আলোচনা এবং প্রতিষ্ঠাকালের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা।

৪.

পটলডাঙ্গা স্কুলটি কেমন করিয়া হেয়ার স্কুলে রূপান্তরিত হইল তাহা বহুবিদিত নহে। ১৮৩৩ সনে স্কুল সোসাইটি কার্যক্রম যখন অর্থাভাবে সংকুচিত হইতে হইতে একপ্রকার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল তখন হেয়ারের প্রস্তাবানুসারে দেশীয় পাঠশালাগুলির সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সব স্কুলের কোন কোনটির পরিচালনার দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। স্কুল সোসাইটির আর্থিক অনটন আংশিক মিটাইবার জন্য সরকার মাসিক ৫০০৲ টাকা অনুদান ইতিপূর্বে মঞ্জুর করিয়াছিলেন। দেশীয় পাঠশালার উন্নতি বিধানের জন্য এই অর্থ প্রদত্ত হইলেও হেয়ার অতঃপর এই টাকা পটলডাঙ্গার ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালনার্থ ব্যয় করিতেন। ইহার অতিরিক্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হইত তাহা হেয়ার বহন করিতেন।

মৃত্যুর (১ জুন ১৮৪২) পর পটলডাঙ্গা স্কুলের ভার সরকার সম্পূর্ণ গ্রহণ করিলেন। সরকার শিক্ষা সমাজের (Council of Education) হিন্দু কলেজ কমিটির উপর বিদ্যালয়টি পরিচালনার ভার অর্পণ করেন।

পটলডাঙ্গা স্কুলটি একটি ভাড়া বাড়িতে বসিত। হেয়ারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাড়িওয়ালা অবিলম্বে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করিয়া বাড়ি খালি করিয়া দিবার

নির্দেশ দিলেন। তখন কর্তৃপক্ষ অনন্যোপায় হইয়া স্কুলটিকে হিন্দু কলেজ পাঠশালা ভবনে স্থানান্তরিত করেন। ইহা ১৮৪৩ সনের ঘটনা। এই স্থানে জনসাধারণ এবং সরকারের মিলিত অর্থ সাহায্যে স্কুলের জন্ম নূতন বাড়ি নির্মিত হয়। হেয়ারের পরিচালনাধীনে ঐ স্কুলটি অবৈতনিক ছিল। কেবল তাহাই নহে, ছাত্রদের বই খাতা পত্রাদিও হেয়ার প্রয়োজন মত বিনামূল্যে সরবরাহ করিতেন! কিন্তু সরকারী আওতায় আসিবার পর বিদ্যালয়টিকে বৈতনিক করা হয়। হেয়ারের আমলের ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ অবশ্য অব্যাহত রাখা হইয়াছিল।

হেয়ার ভাল হোক মন্দ হোক হিন্দুদের ভাব-প্রবণতাকে (Sentiment) মর্য্যাদা দিতেন। এই জন্যই তিনি তাঁহার স্কুলে কেবল মাত্র হিন্দুদের পড়িবার অধিকার দেন। সেই সময়কার কলিকাতার মানুষ হেয়ারকেও আন্তরিকভাবে ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন।

বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার ন্যায় একজন সমর্পিত প্রাণ মানুষ সচরাচার চোখে পড়ে না। তাঁহার সদাজাগ্রত তৎপরতার সঙ্গে অকাতরে অর্থব্যয় অনেক ক্ষেত্রে কিংবদন্তির মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কতঅর্থ যে তিনি এজন্ম ব্যয় করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে তবে একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি অতি মাত্রায় মুক্তহস্ত না হইলে দেনার দায়ে তাঁহার কলিকাতার ভদ্রাসনটিকে বিক্রয় করিতে হইত না। বিদ্যালয়টির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর ১৮৪২ সাল সরকার ইহা সর্বশ্রেণীর নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেন।

৫.

শিক্ষা-সমাজের হিন্দু কলেজ কমিটি স্কুলটির ভার গ্রহণ করিবার পর ইহা পটলডাঙ্গার পুরাতন বাড়ি হইতে হিন্দু স্কুল পাঠশালা গৃহে আসে। তখন ইহার নামকরণ হইল: হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল। ১৮৫৪ সনের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ—প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু স্কুলে কার্যতঃ বিভক্ত হইয়া যাইবার পর হেয়ার স্কুলের নাম লইয়া গোলমাল দেখা দিল। হিন্দু কলেজ নামটাই যখন লোপ পাইল তখন হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল নামটির সার্থকতা কি? অতএব নূতন নাম হইল: কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। কখন কখন শুধুমাত্র ব্রাঞ্চ স্কুল বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৫৫ সনের ২৭শে জানুয়ারি ডাইরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান বা শিক্ষা অধিকর্তা শিক্ষা-সমাজের স্থলাভিষিক্ত হইলেন; শিক্ষা-সমাজ উঠিয়া গেল। ফলে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলটিও তখন শিক্ষা অধিকর্তার কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িল।

এই শিক্ষা অধিকর্তা সরকারী ভাবে ঐ স্কুলটিকে ১৮৬৭ সনে হেয়ার স্কুল বলিয়া স্বীকৃতি দেন। সরকারী নথীপত্রে স্কুলটি নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। যেমন স্কুল সোসাইটির স্কুল, হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল, ব্রাঞ্চ স্কুল ও কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। কিন্তু সাধারণ মানুষের মুখে মুখে দীর্ঘ দিন এটি হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়াই উল্লিখিত হইত। একটা আকস্মিক যোগাযোগের ফলে ১৮৬৭ সনে সরকার স্কুলটির নাম পরিবর্তন করিয়া হেয়ার স্কুল রাখেন।

হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের সুবিখ্যাত ছাত্র প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের ভূমিকাটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সরকার মহাশয় দীর্ঘ দিন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৬৭ সনেও তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ও এই স্কুলে উভয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ "প্যারীচরণ সরকার" জীবনী গ্রন্থে লিখিতেছেন:

"হেয়ার স্কুল সম্বন্ধে প্যারীবাবুর শেষ কার্য ঐ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন। তৎকালে ঐ স্কুলের নাম ছিল 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল'। কিন্তু লোক মুখে ইহা হেয়ার

সাহেবের স্কুল নামেই আবহমানকাল পরিচিত, কারণ স্কুল সোসাইটির নেতা [প্রথমে সদস্য পরে ইউরোপীয়ান সেক্রেটারি] হেয়ার সাহেব ঐ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যার উইলিয়ম গ্রে সাহেব একদিন ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রাচীরগাত্রে হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ স্থাপিত শিলালিপি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেয়ার সাহেব কে ছিলেন, তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্যারীবাবু তাঁহাকে হেয়ার সাহেবই যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার গুরু ও প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্তক এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন, একথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। এবং অনুকূল সময় বিবেচনা করিয়া তিনি গ্রে সাহেবকে নিবেদন করেন যে, ঐ বিদ্যালয়কে হেয়ার সাহেবের নামে অভিহিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। গ্রে সাহেব ঐ প্রস্তাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলে, প্যারীবাবু অচিরে উদ্যোগী হইয়া বহু লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ আবেদনের ফল স্বরূপ ঐ বিদ্যালয়ের সহিত হেয়ার সাহেবের পবিত্র নাম বিজড়িত হইয়াছে।

দীর্ঘ ৪৫ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের নামটি এই শিক্ষা-মন্দিরের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হইল। বাঙালির হিতসাধনে যে দু চার জন বিদেশী মহাজনেরা প্রাণপাত করিয়াছেন ডেভিড হেয়ার তন্মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। আজকের এই উপলক্ষ্যে সেই মহামনা স্কটল্যাণ্ডবাসী বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

হঠাৎ সংবাদ এল নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার মধ্যে একটি গ্রামে ১০।১১ ঘর গোয়ালা, আর প্রায় ১৫০।২০০ ঘর মুসলমান। সেই মুসলমানরা স্থির করেছে যে ঐ গোয়ালাদের সব মেরে ফেল্‌বে। একজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে আমাকেই ছুটে যেতে হয়েছিল। রেলষ্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। হেঁটে গিয়ে দেখি, গোয়ালারা সব মুখোমুখী হ'য়ে বসে আছে। আমি গেলে তারা একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম,—তোমরা ১৫।২০ জন জোয়ান আছ। তোমরা লাঠি ধরে দাঁড়ালে ওরা তোমাদের কি কর্বে? তারা বল্লে,—আমরা কি কর্বো বাবু, ওরা দুশজন লাঠি নিয়ে এসে আমাদের মেরে সাফ্‌ করে দিয়ে যাবে। আমি বল্লাম, বেশ আমি সবার সামনে থাকব', তোমরা পেছনে দাঁড়াও। তাতেও রাজী হল না। তারপর যেই একটা রব উঠ্‌ল অমনি মেয়েদের ছেলেদের ফেলে সবাই কাশবনে পালিয়ে গেল। আমি ছুটে পল্লী থেকে বেরিয়ে এসে দেখি প্রায় একশ জোয়ান মুসলমান লাঠি, দা, ইত্যাদি নিয়ে ছুটে আসছে। আমার হাতে কংগ্রেস পতাকা দেখে দাঁড়িয়ে গেল। আমি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যে দু তিনজনকে ডাকতে, তারা কাছে এল। আমি বল্লাম, এই গোয়ালারা তোমাদের কি করেছে যে ওদের মারতে এসেছো? তোমরা এদের মারবে জানতে পেয়ে আমি প্রদেশ-কংগ্রেসের সম্পাদক ছুটে এসেছি। একাজ কোরো না। তারা বল্লে, আমরা সংবাদ পেয়েছি কলকাতায় সব মুসলমানদের হিন্দুরা মেরে ফেলেছে। আমি বল্লাম, এটা কি সম্ভব? কলকাতায় পুলিশ রয়েছে, সৈন্য রয়েছে,—সাধ্য কি কেউ কাউকে মারে। আর কংগ্রেস রয়েছে সবাইকে রক্ষা কত্তে। তবুও উত্তেজনা যায় না। তখন বল্লাম, তবে আগে আমাকে মেরে ফেল,—নৈলে একপাও আগাতে পারবে না। এইকথা বলে আমার সঙ্গের স্বেচ্ছাসেবককে পতাকা দিয়ে আমি লাঠি নিয়ে দাঁড়ালাম। তারা ফিরে দলের মধ্যে গেল। নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে ফিরে চলে গেল। গোয়ালাপাড়ায় ঢুকে দেখি, মেয়েরা ছেলে কোলে করে কাঁদছে। তাদের বল্লাম, পুরুষদের খুঁজে আনো। ঘণ্টাখানেক বাদে পুরুষরা ফিরে এলো। তাদের বল্লাম, তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যার চেয়ে নিজেদের প্রাণ বড় হল? এতটা কাপুরুষ হয়ে গেছ? সব চুপ্‌ করে রইল। তারপর গেলাম মুসলমানপাড়ায়। সেখানে একটা টীনের চালের মসজিদে গিয়ে তাদের মুরুব্বিদের জড় করে বুঝালাম যে কলকাতায় কোনও হাঙ্গামা নেই, সব থেমে গেছে। কংগ্রেস সবাইকে রক্ষা করেছে। তোমরা আর নূতন করে হাঙ্গামা আরম্ভ কোরো না। তারা বুঝল। তারপর রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। ১৯২৬ সাল, তখনও বাংলায় কংগ্রেসের মর্য্যাদা বাংলার মুসলমানরা মস্তক নত করে রক্ষা করছে। সরওয়ার্দ্দি সাহেব গুণ্ডা লাগিয়ে কিছু কত্তে পারেনি।

আমার মনে হয় এই মর্য্যাদা সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান বরাবর রক্ষা কর্ত্ত যদি না সহীদ সরওয়ার্দ্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনের মত কয়েকজন স্বার্থান্বেষী নেতা নিজেদের মান, যশ, অর্থের জন্যে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলত। এই সব নেতা নিজেরা কোনও দিন ধর্ম্মের ধার ধারে না। কিন্তু ধর্ম্মের জিগির দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন। আমি ভাবি, এঁরা 'ত

কেউ আরবদেশীয় নয়। ভারতে বড় জোর পাঠান ও মোগল মুসলমান কিছু আছে। বাকী সবইত' ভারতের ধর্মান্তরিত মুসলমান। পাঠান ও মোগলগণও ধর্মান্তরিত মানুষ। মুসলমানধর্ম আরব দেশে প্রচার হল। আর সেই ধর্ম আরব দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহার সমস্ত নিয়ে বিদেশে প্রচারিত হল'। অর্থাৎ যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সে যে জাতিই হোক্ না তাকে আরবদেশের আরবীয় ভাষার নাম, আরব দেশের সামাজিক নিয়ম-কানুন ও আরবদেশের সংস্কৃতি সবই গ্রহণ করতে হ'য়েছে। এই সব ব্যক্তি প্রধানতঃ ধর্মের বিচার কোরে মুসলমান হয়নি। হয় ভয়ে নয়ত' লোভে পড়ে মুসলমান হয়েছে। নিজেদের ধর্ম, নিজেদের সংস্কৃতি, এমন কি নিজেদের নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। মহম্মদীয় ধর্মে ধর্মান্তরের এই ইতিহাস। ভারতবর্ষেও তাই হ'য়েছে। আমি ভাবি যাঁরা লেখাপড়া করেছেন, মুসলমানধর্মে ধর্মান্তরের এই ইতিহাস যাঁরা জেনেছেন তাঁরা কেন চিন্তা করে দেখেন না যে, যে দেশের জলবায়ুতে তার চাপ্পান্ন পুরুষ জন্মেছে ও মরেছে সেই দেশে যে ধর্মের উৎপত্তি কেন তাকে পরিত্যাগ করে, কেন সে দেশের মানুষের নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে যে ধর্মের উৎপত্তি আরব দেশে শুধু সেই ধর্ম তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রহণ করেননি, নিজের নাম বদ্‌লে আরব দেশের আরবীয় নাম গ্রহণ করেছেন, আরব দেশে প্রচলিত সামাজিক বিধান গ্রহণ করেছেন, আরব দেশের সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে জন্মে নকল আরবদেশীয় হয়েছেন। কৈ যাঁরা খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা ত' তা হন্‌নি? শুধু ভারতবর্ষে নয়, কোনও দেশেই হয়নি। নিজের নিজের দেশের সামাজিক নিয়ম বজায় রেখেছেন, নাম বজায় রেখেছেন সংস্কৃতিও বজায় রেখেছেন। যাঁরা মুসলমান হয়েছেন তাঁরা কি চিন্তা করে দেখতে পারেন না যে কেন তাঁরা নকল আরব দেশীয় হয়েছেন? ধর্ম ভগবানকে পাবার জন্য। যদি মহম্মদীয় ধর্ম আর্য্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব'লে তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাহলে না হয় অন্য ধর্ম্মই গ্রহণ করলেন। আরবদেশের সামাজিক নিয়ম, আরব দেশীয় নাম, আরব দেশের সংস্কৃতি গ্রহণ করবেন কেন? ভারতের জল-হাওয়ায় থেকে আরবীয় হবেন কেন? এচিন্তা কই লেখাপড়াজানা মানুষের মনে হয়নি,—এটাই আপত্তির। আমি জানি একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান মহম্মদীয় ধর্মকে হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে তাঁহার পরিণত বয়সে সেই ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি নামও পাল্টাননি, সংস্কৃতিও পাল্টাননি আর আরবদেশের সামাজিক নিয়মও গ্রহণ করেন'নি। ছেলেরা যারা তাঁর ধর্মান্তরের বহু পূর্ব্বে জন্মেছে, তাদের ভারতীয় সামাজিক নিয়মে বিবাহ দিয়েছেন। নিজে দুইবেলা নমাজ পড়িতেন। কিন্তু ছেলেদের ঠাকুর দেবতা পূজায় বাধা দেননি। মুসলমান-খাদ্য গ্রহণ করেননি বা আরবীয় আচারও গ্রহণ করেননি। আমার দৃঢ় ধারণা অন্য ধর্মা-বলম্বীগণ যেভাবে স্বাধীনচিন্তা করেন, মুসলমান-ধর্মা-বলম্বীগণ সেভাবে চিন্তা করেন না। যদি তা করতেন তবে তাঁরা শীঘ্রই প্রথম আরবীয় নাম পরিত্যাগ করতেন, আরবীয় সামাজিক আচার ব্যবহার ত্যাগ করতেন এবং আরবীয় খাদ্যও পরিত্যাগ করতেন। এর কারণ, এই-গুলি প্রকৃতিদেবীর সহিত এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে উহার ব্যতিক্রম জীবন ধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। কিন্তু কি দেখিতে পাই? এইসব আরব নামধারী সরওয়ার্দী, নাজিমুদ্দীন, জিন্না, আয়ুব খাঁর দল কোনও দিন মহম্মদীয় ধর্মের ধারও ধারেন না। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পুরা-দস্তুর anglisized এঁরা। কিন্তু, আরবীয় নাম নিয়ে নিজেদের মুসলমান বলেন এবং যারা ধর্মান্তরিত হ'য়েছে তাদের ধর্মের জিগীর দিয়ে ক্ষেপিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করেন। তিনবার দিনান্তে নমাজ পড়েন না। যাক্ আমার এ দার্শনিক গবেষণার ফল কিছুই নাই।

কলকাতায় দাঙ্গার ফলে ঐ বছরেই ঢাকাতে দাঙ্গা হয়। কিন্তু সেখানেও হিন্দু যুবকগণ খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই যে বিদ্বেষবহ্নি শুরু হ'ল সেটা আর নিবল' না। ঐ সব লেখাপড়া-জানা

শিক্ষিত বলব' না) নেতার দৌলতে কংগ্রেস ক্রমশঃ মুসলমানশূন্য হয়ে গেল। যদি মহম্মদীয় ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ হত' তবে হয়ত' এই বিদ্বেষ হয়ে উঠত না। হিন্দুর সঙ্গে শিখধর্মের, বৌদ্ধধর্মের জৈনধর্মের ত' এরূপ বিদ্বেষভাব নাই। কিন্তু খৃষ্টান-ধর্মের সঙ্গেও কিছু বিদ্বেষভাব আছে যদিও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীর মত এতটা প্রকট নয়।

১৯২৬ সালেও মৌলানা আক্রাম খাঁয়ের দল কংগ্রেসে ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা মুস্লীমলীগে চলে গেলেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস জহরলালজীর সভাপতিত্বে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন কিন্তু তখন তাঁরা বুঝতেও পারেননি যে ভারতের একের চার অংশ অধিবাসী তখন ইংরাজের আওতায় চলে গেছেন। তাঁরা আর কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরাজের উচ্ছেদ চাচ্ছেন না, ভারতের স্বাধীনতা চাহেন না। মহাত্মাজীর প্রত্যেকদিন বৈকালিক সভায় কোরাণ পাঠ, খিলাফতের জন্য ইংরাজের নিন্দা কোনও কিছুই আর মুসলমানধর্মী ভারতীয়কে কংগ্রেসে রাখতে পারেনি। কেবলমাত্র উপরের দিকে মুষ্টিমেয় মুস্লীম কংগ্রেসে থেকে গেলেন।

এর পরের যে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাস সেটা কংগ্রেস আর মুস্লীম লীগের ইতিহাস। ১৯৩৭ সালের নূতন constitution এর নির্ব্বাচনে মুসলমানদের সংখ্যা বাংলার এসেম্ব্লীতে বেশী হ'ল এবং মুস্লীম লীগের নেতা নাজিমুদ্দীন সাহেব মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রীদল প্রস্তুত করলেন। শরৎবাবু মহাশয় প্রজাদলের নেতা ফজলল হক্ সাহেবের সঙ্গে মিলে মন্ত্রীত্ব নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিলল' না। এতে ভাল হল' কি মন্দ হল' ভগবান জানেন। যদি অনুমতি মিলত' বাংলার অবস্থা হয়ত' অন্য রকম হত'। পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্য সব প্রদেশের যেখানে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব করছিল তারা মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ ক'রেছিল। কিন্তু মুস্লীম লীগ ইংরাজের পক্ষে। সুতরাং বাংলা দেশে মন্ত্রীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকল'। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নাজিমুদ্দীন সাহেবের মন্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট মহাত্মাজীর "কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের পর মেদিনীপুরে ঝড় হইতে আরম্ভ হল'। তার উপর ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে সমুদ্রের অভূতপূর্ব্ব জলোচ্ছ্বাসে কাঁথি মহকুমা জলের নীচে চলে গেল। সহস্র সহস্র লোক ও গৃহপালিত জন্তু বিনষ্ট হ'ল। কোথায় তাদের সাহায্য করবে, তা না করে নাজিমুদ্দীন সরকার মেদিনীপুরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে। গ্রামকে গ্রাম ঘরবাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। কাঁথি মহকুমায় যখন নোনাজল সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হল' তখন কেবল নরকঙ্কাল ও জন্তুর কঙ্কালে পূর্ণ দেখা গেল। সে দৃশ্য যিনি দেখেছেন তিনিই কেবল অনুধাবন করতে পারবেন, অপরে পারবে না। এই প্রাকৃতিক দুর্ভোগের উপর পাঠানসৈন্যের অত্যাচার। তথাপি মেদিনীপুর-বাসী অটল ছিল। কারণ সেখানে মুস্লীম লীগের কোনও পাত্তা ছিল না। সমস্ত জেলা কংগ্রেসের হাতে।

আবার যখন ১৯৪৫ সালে নির্ব্বাচন হয় তাতে সহীদ সরওয়ার্দি লীগের কর্তা হ'ল এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী হল'। এল' ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টের "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান" অভিযান। সরওয়ার্দি সাহেবের সে-অভিযান যে দেখেছে সে জীবনে কখনও তা ভুলতে পারবে না। কিভাবে তিনি মুসলমানদের হিন্দুর উপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন এবং কি নৃশংসভাবে মুসলমানগণ অপ্রস্তুত হিন্দুর বাড়ী চড়াও হয়ে অকথ্য অত্যাচার করেছে সে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভুলবেন না। যে মৌলনা আক্রাম খাঁ আজীবন ইংরাজের কারাগারে থাকতে চেয়েছিল, ঠিক্ তাঁর বাড়ীর পাশে একটি অবসরপ্রাপ্ত সবজজের বাড়ীতে যে অকথ্য অত্যাচার হয়ে গেল সেটা তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। কত হিন্দু-পরিবারের বাড়ীতে ঢুকে ছাদের উপর থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, স্ত্রীলোকের স্তন কেটে ধর্ষণ করে ফেলে

দিয়েছে, যুবক,বৃদ্ধদের কেটে দুফাঁক করে দিয়েছে। সরওয়ার্দি সাহেব লালবাজার কণ্ট্রোল-রুমে বসে পুলিশকে নির্দ্দেশ দিয়ে হিন্দুদের কোনও সাহায্যই করতে দেন নি।

আমার দ্বিতীয় কন্যার বাড়ী মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের (যেটা এখন সূর্য্যসেন স্ট্রীট) একেবারে পূর্ব্বপ্রান্তে যেখানে সারকুলার রোডের সঙ্গে মিশেছে সেইখানে ছিল। বাড়ীর ঠিক পিছনেই একটি মসজীদ। বৈবাহিক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল। জামাতা বীরেশ্বরও হাইকোর্টের উকীল। সদর দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে হঠাৎ হৈ-হৈ করে একদল মুসলমান দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল। প্রবোধবাবু তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে আগে মেরে ফেল' তবে ভিতরে যাবে। সেই দলের প্রথমেই যে মুসলমান গুণ্ডা, তাকে প্রমোদবাবুই একবার হাইকোর্টে জেল থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সে প্রমোদ-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়েই ব'লে উঠ্‌ল',-"আরে উকীল সাহেব?" বলেই দলকে বললে,—"এ বাড়ী নেহি, গল্‌তি হুয়া।" বলেই সেলাম করে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। উপরে মেয়েরা তখন চিৎকার করে কাঁদছে। প্রবোধবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি টেলিফোনে সংবাদ পেলাম। পুলিশের সাহায্য চাইলাম,-পেলাম না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র এবং তার দুজন সহকর্মী একখানা private car নিয়ে চলে গেল। প্রবোধবাবুদের একটা গাড়ী ছিল। ঐ দুটো গাড়ী করে সবাইকে নিয়ে, বাড়ীতে চাবিতালা দিয়ে রাত দশটায় চলে এল'। তারা যে অসম সাহসিকতার কাজ করে ওদের বাঁচিয়েছিল আজ মনে হলে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়।

কিন্তু সেই একদিনই। রাত্রেই হিন্দু বাঙ্গালী যুবকের-দল প্রস্তুত হয়ে পড়ল। পরদিন সকাল থেকে মুসলমান-নিধনযজ্ঞ সুরু হ'য়ে গেল। আমার পাড়ায় (হরিশ মুখার্জী রোড ও দেবেন্দ্র ঘোষ রোড) বেলা দশটার মধ্যে আমি প্রায় পঞ্চাশটী মুসলমানের মৃতদেহ দেখেছি। হিন্দু-যুবকরা বালক বা স্ত্রীলোকের গায়ে হাতও দেয়নি। আমি মুসলমান স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের একত্র করে পুলিশ-ভ্যানে তুলে দিয়েছি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্যে। একদিনে সমস্ত কলকাতায় বহু মুসলমান নিহত হ'ল। তখন সরওয়ার্দি সাহেব পুলিশ ও একদল ইংরাজসৈন্য পর্য্যন্ত হিন্দুদের উপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা তখন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে গেছে। কিছু করতে পারে নি। এই সব মৃতদেহ কুকুরে আর শকুনে খেয়েছে। ১৭ই রাত্রে আমি শুয়ে আছি, রাত্রি ১২টার সময় আমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার ঘুম থেকে তুললে। কি ব্যাপার? সংবাদ এসেছে সরওয়ার্দি সাহেব চার-পাঁচ লরী ভর্ত্তি মুসলমানকে পার্ক সারকাসের দিক থেকে আমাদের পাড়ার আক্রমণ করবার জন্যে পাঠাচ্ছে। আমার বাড়ীর পাশেই C. I. D. পুলিশের ব্যারাক। তাঁরা বাঙ্গালী হিন্দু। তাঁরাই সংবাদটা দিয়েছেন এবং তাঁদের রিভলবার, বন্দুক ইঃ থাকা সত্ত্বেও ভয় পেয়েছেন। ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধ আমি, দেখলাম প্রায় ২০০ জন যুবক উপস্থিত, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড ও গিরিশ মুখার্জী রোডের সঙ্গমস্থলে। ছেলেদের বললাম, হরিশ পার্কের লোহার বেড়া ভেঙে প্রত্যেকে একটা করে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এস'। যেই বলা সেই কাজ। দুইশত যুবক লোহার ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের নিয়ে পাঁচ লাইন Deep একটা ব্যূহ করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। পুলিশ অফিসাররা ভয়ে কেউ বাড়ী থেকে বার হননি। রাত তিনটে পর্য্যন্ত থেকে যখন বুঝলাম তাঁদের সংবাদ ঠিক্‌ নয়, অথবা সরওয়ার্দি সাহেব মত পাল্‌টেছেন, তখন ছেলেদের বললাম, সামান্য কয়েকজন রেখে শুতে যাও। আমিও শুতে গেলাম। দু-একদিনে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে এল'। তখন আমার দ্বিতীয় জামাতার মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে দেখা গেল সমস্ত জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে গেছে, এমন কি সমস্ত আসবাবপত্র পর্য্যন্ত। তাঁরা অবশেষে এক মুসলমানকে বাড়ী বিক্রী করে দিতে বাধ্য হলে

কলকাতার হাঙ্গামা থামামাত্র নোয়াখালিতে আগুন জ্বলে উঠল। আমার ধারণা, কলকাতায় নোয়াখালির মুসলমান নিহত হয় এবং তাদেরই আত্মীয়-স্বজন নোয়াখালিতে আগুন জ্বালায়। সেখানে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু তাদের মধ্যেই কেহ কেহ যুদ্ধ করতে করতে সপরিবারে নিহত হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী একজনের কাছে সে-সংবাদ শুনেছি। আর মুসলমানের হিন্দুললনার উপর যেসব পাশবিক অত্যাচারের কথা শুনেছি তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে মুসলমানস্ত্রী একটি হিন্দু মেয়েকে চেপে ধরেছে আর তার স্বামী সেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করছে? এটা করে নাকি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বর্গে যাবে। কোনও ভারতবর্ষীয়ের চিন্তার ধারা এরূপ হতে পারে ইহা আমার কল্পনার অতীত। কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা।

নোয়াখালির খবর যখন সংবাদপত্রে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার কোনও প্রতিকার হল না, তখন বিহারে মুসলমান নিধনসুরু হল। কিন্তু জহরলালজী এরোপ্লেন থেকে বোমা নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে সেটা থামিয়ে দেন। নোয়াখালিতে যে কয়টি হিন্দু পরিবার বেঁচে গেছল তারা কলিকাতায় এসে আশ্রয় নিলে। তারপর মহাত্মাজীর নোয়াখালি পরিক্রমা। তা'ইতে হিন্দু পরিবারের কিছু আবার সেখানে ফিরে যায়।

এই বিবাদের বিষময় ফল ভারত বিভাগ। যার পরিণতি সাধারণ নির্দোষ অধিবাসীগণের মধ্যে হাহাকার যেটা আজও থামল না। কখনও থামবে কি? আজ কোথায় সেই মুস্লীমলীগ আর কোথায় কায়েদে আজম জিন্না সাহেব। তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী তাঁর ভগ্নী নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়ে হাস্যাস্পদভাবে হারিয়া গেলেন। আজ মুসলমান সৈন্যবিভাগ পাকিস্থান শাসন করছে। সরওয়ার্দ্দি সাহেব জেলে পচে শেষ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নাজিমুদ্দিন সাহেবও মৃত্যুর হাত এড়াতে পারলেন না। তাঁকেও জেলের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। যেসব মুসলমান নেতা ভারত ভাগ করায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই নির্য্যাতিত জীবন যাপন করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। অদৃষ্টের কি সুন্দর পরিহাস!

(৩২)

জীবনের আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। বাঙালী স্ত্রীলোকের রুচির পরিবর্ত্তন। বাঙালী মুসলমান স্ত্রীলোকের কথা বলছি না। হিন্দু স্ত্রীলোকের রুচির কথাই বলছি। আমার নিজের যখন এ-বিষয়ে কৌতূহল হয়েছে এবং নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করেছি অর্থাৎ যখন আমার ২০৷২২ বৎসর বয়স ১৯০০৷১৯০২ সাল তখন দেখেছি, রঙ্গীন শাড়ী বা রঙ্গীন সেমিজ ও ব্লাউজ ভদ্রঘরের মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরেছে অর্থাৎ ১১.১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। বিবাহের সময় রঙ্গীন বেনারসী ও দু-চারখানা রঙ্গীন শাড়ী কনের বাক্সে দেওয়া হত। কিন্তু তার ব্যবহার খুব কম হত। রঙ্গীন বস্ত্র যৌবনে এক নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক অর্থাৎ মেথরাণী প্রভৃতিকে এবং রূপোপজীবিনীদের পরতে দেখতাম। ভদ্রপরিবারের মধ্যে সাধারণতঃ গাঢ় কাল পাড় বা লাল পাড় সাদা ধপ্‌ধপে শাড়ী পরাই সৌখিনত্বের লক্ষণ ছিল,—তা কি সূতীর কি সিল্কের। যদি কোনও ১৬৷১৮ বৎসরের যুবতী সিল্কের রঙ্গীন শাড়ী পরতেন সেটা হয় খুব হালকা গিরি রং বা হালকা বাসন্তী রং। এ ছাড়া কেউ রঙ্গীন শাড়ী পরলে তাকে মেথরাণী বলে মেয়েরা ঠাট্টা করত। তখন স্ত্রীলোকদের বিবাহের বয়স বার-তের বৎসরের উর্দ্ধে কখন উঠত না। বিবাহের পূর্ব্বে দশ-বার বৎসর পর্য্যন্ত রঙ্গীন শাড়ী পরার রেওয়াজ ছিল।

তারপর সর্দ্দা-আইন পাশ হোল। চোদ্দ বছরের নিচে বিবাহ দেওয়া বন্ধ করা হোল। ভদ্র-পরিবারের এমনি অর্থের অভাবে বিবাহযোগ্য মেয়ের বয়স বেশী হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সেটা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা হোত। এবার সেটা থেকে গৃহস্থ রেহাই পেল। মেয়ের বিবাহের

বয়স বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গীন কাপড় পরবার বয়সও বাড়তে থাকল। তবুও দেখেছি সন্তানাদি হলেই আর রঙ্গীন কাপড় পরতে স্ত্রীলোকদের সাধারণতঃ লজ্জা বোধ হত।

১৯২১ সালের কংগ্রেসে যখন ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা যোগ দিতে আরম্ভ করল অর্থাৎ যখন থেকে পরদা উঠে যেতে আরম্ভ হল, স্ত্রীলোকরা লেখাপড়ার জন্যে স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হতে লাগল তখনই পরিধেয়ে রং বাহারের ব্যবহারের বৃদ্ধি হল। তারপর ক্রমশঃ এখন যে স্ত্রী-লোকের কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতা হয়েছে, পুত্রের বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূ হয়েছে তিনিও অম্লানবদনে নানা রং-বেরঙের শাড়ীতে ভূষিত হয়ে বেড়াচ্ছেন। এখন সাদা পেড়ে সাড়ী বোধ হয় পয়সাওয়ালা খুব কম গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেন। যাঁরা পরেন তাঁরা পয়সার অভাবের জন্যেই পরেন, রুচির জন্যে নয়।

এই রুচির পরিবর্ত্তন মনের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের জন্যেই হয়েছে। শুভ্রতা পবিত্রতার সূচনা করে। তাই বাল্যজীবনে ও যৌবনে কেবল নীচজাতীয় স্ত্রীলোক ও রূপোপজীবিনীদের রঙ্গীন বস্ত্র পরতে দেখেছি। কিন্তু এই শুচিতা থেকে যতই মন সরে যেতে লাগল যতই মনে রং ধরতে লাগল ততই রঙ্গীন বস্ত্রেরও প্রসার বাড়ল। সকলেই জানেন গাঢ় রং মনে কামনার উদ্রেক করায়। সেইজন্যে ভদ্রপরিবারে রঙ্গীন বস্ত্রের চলন ছিল না। কারণ আর যাই হোক হিন্দু ভদ্রপরিবারে স্ত্রীলোকেরাই হিন্দু-ধর্ম্ম হিন্দু-আচার বারবার রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু এখন অগ্রগতির দিন. সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া অগ্রগতি কিসে সূচিত হবে? তাই রং-বেরঙের এত আদর। এখন আর গরীব বড়লোক নেই। বস্ত্র রংদার চটকদার না হলে তা আর স্ত্রীলোকের পরিধেয় নয়। তাছাড়া এখন ত' বার-তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানান রঙের ফ্রক চলছে।

খাদ্যের বিষয়েও রুচি বদলেছে। মা', খুড়ি, জ্যেঠীদের দেখেছি খাদ্যে কিভাবে শুচিতা রক্ষা করতেন। আমাদের সময়েও দেখেছি খাদ্যে যতটা সম্ভব পবিত্রতা রক্ষা করে সব স্ত্রীলোকই চলেছেন। কিন্তু আমাদের পরের Generation-এ দেখলাম কোনও খাদ্যই আর অখাদ্য নেই। মা, খুড়ী, জ্যেঠাইরা কখন চিন্তাও কত্তে পাত্তেন না যে বাড়ীতে মুরগীর ডিম ও মাংস আসতে পারে। পেঁয়াজ অবশ্য চলত,—ব্রাহ্মণবাড়ী ছাড়া। অনেক সংসারে দেবতার কাছে বলি-দেওয়া পাঁঠার মাংস ছাড়া অন্য মাংসও ব্যবহৃত হত না। আমাদের সময়েও হিন্দু গৃহস্থবাড়ীতে মুরগীর ডিম বা মাংস আসেনি। আর আমাদের পরের বংশে মুরগীর মাংস ও ডিম অখাদ্য নয়, সুখাদ্য হয়েছে। শুধু পুরুষের মধ্যে নয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও।

নিমন্ত্রণবাড়ীতে সহরে এখন টেবিলের উপর একদল খেয়ে যাচ্ছেন আর একদল মেয়ে-পুরুষ এসে জুতা পায়ে সেই এঁটো-টেবিলের কাগজ বদলে দিলেই বসে খাচ্ছেন। কোনও দ্বিধা নেই। অবশ্য বিধবারা এখনও কিছুটা শুচিতা রক্ষা করে চলেছেন।

এই যে সব রুচি পরিবর্ত্তনের কথা বল্লাম তা সহরেই দেখতে পাই। পল্লীগ্রামে অবশ্য রঙ্গীনসাড়ীর প্রবর্ত্তন হ'য়েছে কিন্তু খাদ্যের পরিবর্ত্তন দেখিনি। তার কারণ হয়ত 'অভাব'। পয়সার অভাব ত' বটেই, আবার পাওয়ারও অভাব আছে। হিন্দু-পরিবারে পল্লীগ্রামে মুরগী পোষা সম্ভব হয়নি। সুতরাং যেখানে মুসলমানের বাস নেই, সেখানে মুরগী বা তার ডিম মিলবে কি করে? মাছ, যেটা বাঙ্গালীর নিত্য খাদ্য, তাই এখন পল্লীগ্রামে পাওয়া মুস্কিল।

এই যে রুচির পরিবর্ত্তন বা মনের পরিবর্ত্তন—তা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর? এটাও কি প্রগতির লক্ষণ? মাঝে মাঝে বৃথাই চিন্তা করি। আমি নিজে যখন পয়সা রোজগার ক'রেছি, যখন বেশ ভদ্রভাবে থাকতাম, তখনও এই রং-এর প্রতি আকর্ষণ ছিল না। শুভ্রতাকে বেশী পছন্দ করতাম। কখনও রঙ্গীন জামা পরেছি ব'লে মনে হয় না। অবশ্য শীতকালে গরম কাপড়ের কোটের রং থাকত। কিন্তু তাও বেশীর ভাগ কাল রং। তারপর ১৯২১ সাল থেকে খদ্দর পরণে উঠল,—গায়ে উঠল

খদ্দরের সাদা জামা। আমার মনে হয় রঙীন জামা-কাপড় মনের উপর মন্দ ফলই প্রদান করে। সিনেমার প্রবর্ত্তন আরও এই রং-বাহারের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে। কে সেদিন বলছিল যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মনের পরিবর্তন এসেছে। কিছুদিন গেলে আবার সব শান্ত হয়ে যাবে। তাঁর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক,—যেন সেই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যে পরিণত হয়।

(৩৩)

আমার জীবনে আমাদের জাতীয়তার রূপেরও পরিবর্তন দেখলাম। জাতীয়তার দুই বিভাগ। একটী সামাজিক জাতীয়তা, আর একটী রাজনৈতিক।

রাজনৈতিক জাতীয়তার কথাই বলি। ইংরাজ আসার পূর্ব্বে ভারতে যে রাজনৈতিক চিন্তার ধারা ছিল সেটা অধিকাংশই নিজের নিজের প্রতিষ্ঠা বা বড়জোর প্রাকৃতিক যে বিভাগ বিশাল ভারতবর্ষে চিরকাল বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রাক্‌জ্যোতিষ, মরুভূমি, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর, রাজস্থান, পঞ্চনদ, কোশল, মগধ ইত্যাদি যে সব বিভাগ সুদূর অতীত থেকে বর্তমান আছে—সেই সেই দেশের প্রতিষ্ঠার চিন্তাই প্রবল ছিল। সামগ্রিক ভারতের চিন্তা কেবলমাত্র ধর্ম্মের উপর স্থাপিত ছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ বা আর্য্যজাতির দেশ ব'লেই প্রসিদ্ধি ছিল। সেইজন্ত বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পাঠান আক্রমণের পূর্ব্বে যে যবন, শক, হূণ প্রভৃতি জাতির আক্রমণ হয়েছে তারা ক্রমশঃ হিন্দুত্বে পরিণত হয়েছে এবং ঐ প্রাকৃতিক বিভাগেই তাদের রাজত্ব ব্যবস্থিত হয়েছে। কেবলমাত্র শিবাজীই সমস্ত হিন্দুর স্বাধীনতার জন্ত চিন্তা করেছিলেন। পাঠানরা হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করেনি, বরং হিন্দুকে অথবা বৌদ্ধকে মুসলমান-ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করেছিল। আর তাদের তাড়িয়ে মোগল তাদের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিল। রাজপুতরাও কেবল রাজপুতনায় বা তার মধ্যে নিজ নিজ কুলের অধীনস্থ অধিবাসীদের ছাড়া অন্ত জাতীয়তার কথা ভাবেননি। ইংরাজ বণিক যখন প্রায় বিনা-যুদ্ধে এই বিভক্ত ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত স্থানেই একই রকম রাজনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত ক'রে রাজ্য শাসন করতে লাগল এবং যখন প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিভাগের অধিবাসী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে ঐ কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করল তখনই সমস্ত ভারতবর্ষের সামগ্রিক জাতীয়তার চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত হ'ল।

১৮৫৭ সালে যে অভ্যুদয় হয় সেটাও সমস্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়। ইংরাজকে বিতাড়িত করার যুদ্ধ। কিন্তু তারপরে হিন্দু রাজা হবে কি মুসলমান বাদ্‌শা হবে সে নিয়েও বিবাদ বাধত। কারণ সামগ্রিক রাজনৈতিক জাতীয়তার চিন্তাধারা ছিল না তখনও।

আমার জন্মের পাঁচ বৎসর পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে স্থাপিত হয়,—তাতেই সর্ব্বপ্রথম সামগ্রিক ভারতের জাতীয়তার চিন্তার বিকাশ হয়। আমার যখন সাত-আট বৎসর বয়স তখন আমার বাবাকে কংগ্রেসের ডেলিগেট হ'য়ে যেতে দেখেছি। কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়ে তুলবার চেষ্টা হোয়েছে সেটা একেবারে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে, ইউরোপের অনুকরণে। ইংরাজ ভারতবর্ষকে একটী রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা শাসন করে এসেছে কিন্তু একটী রাজনৈতিক জাতি গঠনের কখনও চেষ্টা করেনি। কংগ্রেসই সে চেষ্টা করেছে গোড়ায় কংগ্রেস কেবল ইংরাজী-নবীশদের হাতে ছিল। তাঁরা যাতে ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্ত শাসিত দেশ হয় তারচেষ্টাই করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এসে এর নূতন রূপ দিলেন। তাতেই সমস্ত জাতির স্থান কংগ্রেসে হ'য়েছিল কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের অধিবাসী এতে যোগ দেয়নি। ভারতবর্ষ তখন কেবল হিন্দুর দেশ ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম আদৌ প্রবল ছিল না। হিন্দুর পরেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তারপর শিখ ও খৃষ্টান। খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যায় অধিক না হলেও শাসনকর্ত্তাদের ধর্ম্ম তাদের ধর্ম্ম ব'লে তাদের প্রভাব মন্দ ছিল না। শিখেরা একটী Compact জাতি

ব'লেই নিজেদের মনে করে। কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের বহু চেষ্টাতেও ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়া সম্ভব হয়নি। দুটী প্রভাবে তা হ'তে দেয়নি। এক ধর্মের প্রভাব। কিন্তু তাহাপেক্ষা প্রাকৃতিক প্রভাবই বিশেষ ব্যাঘাত দিয়েছে এবং বর্তমানেও দিচ্ছে। তাই বলছিলাম, অপর জাতির অনুকরণে জাতীয়তা গড়া যায় না।

ভারতের প্রাকৃতিক প্রভাবেই বিভিন্ন সামাজিক আচার-ব্যবহার এমনকি বিভিন্ন খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ গড়ে উঠেছে। ধর্মের প্রভাবও এদের এক করতে পারেনি। মুসলমান নায়ক যেন ধর্মের জিকির দিয়ে ভারতভাগ করলেন। কিন্তু গত ১৮ বৎসরে পাঞ্জাবী মুসলমান ও বাঙ্গালী মুসলমান একটী রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত করা যায়নি। কখনও করা যাবে কি? না, তা করতে পারা যাবে না। পূর্ব্বে যতটুকু বিভেদ ছিল, এখন তাহাপেক্ষা আরও বেড়েছে,—কারণ রাজনৈতিক বিদ্বেষ তা বাড়িয়েছে।

নেহেরুজী ১৭ বৎসর চেষ্টা ক'রেছেন কিন্তু ভারত ইউনিয়নে যত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আচারী, অধিবাসী আছে সকলকে এক রাজনৈতিক সূত্রে বাঁধতে পারেন নি। সকলেই নিজেকে ভারতীয় জাতি বলতে চায়, কিন্তু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখতে চায় আর তা বজায় থাকবেই।

ইউরোপেও হয়নি। ইউরোপের সকল জাতিই এক ধর্ম্মাবলম্বী। সকলেই খৃষ্টান। এমন কি খাদ্য ও পোষাকও প্রায় একই রকম। কিন্তু প্রাকৃতিক বিভিন্নতা ভাষাকে ভিন্ন করে রেখেছে। তাই অতগুলি রাজনৈতিক দেশে বিভক্ত। আমাদেরও রাজনৈতিক একতা হয়ত' আমরা রাখতে পারব, যেমন আমেরিকা পেরেছে। কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবেই। তা রাখতে না দিলে সমস্ত প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে।

সামাজিক জাতীয়তা ও ধর্ম্ম প্রাকৃতিক বিভিন্নতা দ্বারা গঠিত। সমাজবন্ধন ধর্মের উপর বেশীরভাগ নির্ভরশীল। হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ, খৃষ্টান সমাজ সব এক প্রাকৃতিক বিশিষ্ট হইয়াও বিভিন্ন। যদিও ভাষা এক, পোষাক পরিচ্ছদও এক কিন্তু আচার ব্যবহার ও খাদ্য বিভিন্ন। তাই দেখতে পাই, ধর্ম্ম ও প্রকৃতিই মানুষকে বিভিন্ন সমাজে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য বাঙ্গালী হিন্দু ও মাদ্রাজী হিন্দু এক নয়,—বাঙ্গালী মুসলমান ও পাঞ্জাবী মুসলমানও এক নয়। যেমন নামে একটা রাজনৈতিক একতা বলা যেতে পারে যে আমরা সব ভারতীয়; সেইরূপ বলা যেতে পারে আমাদের সমাজ ভারতীয় সমাজ। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেতেই অল্প আলোচনাতেই পৃথকত্ব পরিস্ফুট হ'য়ে প'ড়বে। আমি মনে করি, এই বিভিন্নতা বজায় রেখেও একত্ব করা যেতে পারে যদি আমরা egoism বা ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করতে পারি। সেটা সম্ভব কতকালে, আদৌ সম্ভব কিনা কে বলিবে? কারণ, ব্যক্তিত্ব পুরাপুরি ত্যাগ তখনি সম্ভব হইবে যখনি আত্মার একত্ব অনুভূতি হইবে। যতদিন না আমরা আধ্যাত্মিকতা অবলম্বন করিতেছি ততদিন এ একত্ব সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে হয় না। সেইজন্যই ভাবি, আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ গড়িতে পারিলে ধর্ম্ম ও প্রকৃতি আমাদের পৃথক করিয়া রাখিতে পারিবে না। তখন-ই ভারতে এক সমাজ ও এক জাতীয়তার সম্ভাবনা হইবে। রাজনীতি দিয়া বা অর্থনীতি দিয়া বা যাকে সোস্যালিজম্ বলে, তা দিয়া কখনও একত্ব আনিতে পারে না এবং পারিবে না।

ক্রমশঃ

আষাঢ়-সন্ধ্যায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়-সন্ধ্যার এই বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকারে তোমাকে মনে পড়ছে বারম্বার !
কুড়ি বছর আগের কথা ! পল্লী-জীবনের আদিপর্বে অপরিচিত
পরিবেশে দুঃখে সুখে খচিত সেই আমাদের দিনগুলি !
সহরের পাষাণ-মরুর পাণ্ডুরতায় জীবন যাচ্ছিল শুকিয়ে !
দুর্ব্বার টানে মনকে টানছিল আকাশের নীল আর ঘাসের
সবুজ, বাতাসের মধু আর বনের তরু-মর্ম্মর, মাটির গন্ধ
আর তারার আলো !
ঐ প্রকৃতির কোলেই তো বইছে প্রাণ-গঙ্গার উচ্ছল জলধারা !
কবে দেহ-মন জুড়িয়ে যাবে ঐ গঙ্গায় অবগাহন-স্নানে ?

জন্মলগ্নে অজানার বাঁশির সুরটী তুমিও বহন করে এনেছিলে
তোমার রক্তের মধ্যে ।
সুন্দরের চরণ-কমলে বন্ধক রেখে এসেছিলে তোমার শিল্পীর মনটাকে !
তাই পল্লীর ডাকে এত সহজে সেদিন তুমি সাড়া দিতে পেরেছিলে !

কুড়ি বছর আগের কথা ! আষাঢ়ের এমনি বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকার !
লণ্ঠনের আলোয় অশথের ভিজে ডাল কাটছি কুড়ুলের ঘায়ে ।
গ্রাম্যজীবনে অনভ্যস্ত আমরা দুজনেই । স্বপ্নে ছিলো পল্লীর
সবুজ, আলামি ময় !
ভিজে কাঠে ফুঁ দিতে দিতে কত দিন তোমার আয়ত চোখ-দুটী
দিয়ে জল পড়েছে গড়িয়ে !
দুঃখের কাছে হার মানোনি তুমি । বিঘ্নের কাছে পরাজয়-
স্বীকার তোমার মধ্যে দেখিনি কোন দিন !

কবিরা ধৈর্য্যের উপমা দেন সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর সঙ্গে। আমি
তোমাতে দেখেছি ধৈর্য্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি।
আমি দেখেছি দুঃসহ দৈন্যের মধ্যে মর্ত্তের মানবী তুমি দাঁড়িয়ে
আছো যেন স্বর্গের মুকুটিতা ইন্দ্রাণী! তোমার পাশে দাঁড়ায়
কে?

বেঁটে ছাতাটী-হাতে তুমি যেতে স্কুলে নদী-পারের পিচ্ছিল
রাস্তা দিয়ে ধীরপাদক্ষেপে! কতদিন, কতমাস!
গ্রামের প্রান্তে একখানি মাত্র ঘরে কাটিয়ে গেছ বেদিনীর জীবন।
জনহীন প্রান্তর। ধর্ম্মের-মুখোস-পরা হিংসার ঝড় বয়ে
চলেছে গ্রামের উপর দিয়ে। সেই ঝড়ের মধ্যে
তুমি দাঁড়িয়ে আছো অবিচলিত পর্ব্বতের মতো।
স্বল্পবাক্ তুমি মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর করতে না। তোমার ঈশ্বর-
বিশ্বাসের স্বাক্ষর বহন করতো তোমার ঋজু-শুভ্র জীবন।
মানুষে দেখতে ঈশ্বরের রূপ—সকল ধর্ম্মের মানুষে।
তোমার মানব প্রেম সীমিত ছিল না বাক্যের বুদ্বুদে। দুর্ব্বলকে
রক্ষা করার কাজে কোন ত্যাগেই তোমার কুণ্ঠা ছিল না।

তুমি ছিলে কলম্বাসের সমগোত্রের। সেই উৎসাহ, সেই উদ্দীপনা,
সেই বজ্রকঠোর সংকল্প।
পথ রেখাহীন সমুদ্রের বুনো চেহারা দেখে কূলে ফেরার
মানুষ তুমি ছিলে না একেবারেই।
ঝড়ের মধ্যে পাখনা মেলে দিয়ে আনন্দে গান গায় যে সামুদ্রিক
বিহঙ্গম তুমি ছিলে সেই ঝড়ের পাখী।

আমার কল্পলোকের বীরাঙ্গনাকে আমি খুঁজতে যাবো কেন
দূরবর্ত্তীকালের কাহিনীতে? দূরের এ মোহ আমার জন্য নয়।
আমারই ঘরের নারীতে দেখেছি সেই সুদুর্লভ মানবীকে যাঁর জীবন
ছিলো বসন্তের বাতাসের মতোই কোমল, দুঃখকে বীর্য্যের সঙ্গে
বহন করবার শক্তি ছিল যাঁর অপরাজেয়, বাক্যে বা আচরণে
কারও মনে যিনি কখনও উদ্বেগের সঞ্চার করতেন না, প্রজ্ঞার
জ্যোতিতে যিনি ছিলেন উষার মতোই দীপ্তিময়ী।

ক্রান্তিক্ষণ

শ্রীবাণীকুমার দেব

ক্রন্দসী রজনীর রক্তাক্ত আকুলতা আমায় ডাকে—
ডাকে তার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, ক্ষয়ে যাওয়া বিবশা শর্ব্বরী
এক মৌন জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার দিকে।
জীবনের প্রান্তসীমায় স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আমিও
ক্রান্তিক্ষণের এক অসীম তিতিক্ষায়,
আকাশের প্রান্তে প্রান্তে দিগন্তের কিনারায়
খুঁজেছি উত্তর তার।
উদ্দাম চাপল্যেভরা যৌবনের পেয়ালা হায়—নিঃশেষিত
বার্দ্ধক্যের লোলচর্মে ঢাকা অস্থির মজ্জায় মজ্জায়—
মহাকালের অঙ্কুশ না মেনে বার্দ্ধক্য খুঁজে তার যুবালি পরশ
লঙ্ঘিয়া স্থষ্টির আদিম বিস্ময়।
অবশেষে পেয়েছি উত্তর : বোবা—ঘোলা—স্থবির এক রাত্রির
সে যে হতাশার ম্রিয়মান ছবি,
রজনীর ক্রন্দন আর বার্দ্ধক্যের হতাশা
একসূত্রে বেঁধেছে—'রাখী'।

জ্বলন্ত জ্বালা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

তিন-চতুর্থাংশ জল শুনি পৃথিবীর;
আমি তবু পিপাসার্ত—জলেরই কাঙাল;
সর্ব দিশি বন্ধ্যা বালি; বালির জাঙাল
ভাঙিবার সাধ্য নাই; বঞ্চনা গভীর;—
দাউ-দাউ জ্বালা জ্বলে চির-অশান্তির।
শুষ্ক—রুক্ষ—রিক্ত বালি হোলো হায়, কাল!
বালি-ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণা-চক্রে কে দিবে সামাল!—
এত জল—নির্মমতা তবু কী বিধির!
সমুদ্র চাহে না জল, জলের জ্বালায়
সে-ও নাকি জ্বলে নিত্য? এত হেরফের
অসহ লাগে না কা'র? দীর্ণ দুনিয়ায়
নিরসন কে করিবে এত অসাম্যের?
বালি হ'তে মরু কভু নিস্তার কি পায়?
জল হ'তে নিস্তার কি আছে সমুদ্রের?

বয়কট বা বর্জ্জন আন্দোলন

কালীচরণ ঘোষ

"বয়কট" বা "এক ঘরে" করার কথা আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে (প্রবাসী ১৩৭৫) বলা হয়েছে। বহু বিভাগের সংবাদ পাকাপাকিভাবে প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই যে তীব্র আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্যে বিদেশী (পণ্য) বর্জ্জননীতি অন্যতম। আপামর সাধারণ বাঙ্গালী তাকে "বয়কট" নামে চালিয়েছে।

'স্বদেশী যুগ' অর্থাৎ ১৯০৫ ও পরের কয় বৎসরের কার্য্যক্রমে বয়কট-নীতি গৃহীত হয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের এক হাতিয়ার রূপে। শোনা যায় (অমৃত বাজার পত্রিকা, ১০-ই নভেম্বর ১৯০৫ ধর্ম্মানন্দ ভারতী লিখিত পত্র) ১৭৩০ সাল অর্থাৎ দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাওর শাসনকালে সপ্তশৃঙ্গ পর্ব্বতে গুরুপদ স্বামী বাস করতেন। তাঁহার অগাধ দেশপ্রেম ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি সে-যুগে বুঝেছিলেন বিদেশী পণ্যর চাপে দেশের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটবে এবং তার প্রতিকারকল্পে বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপের নানা জাতির পণ্য বর্জ্জনের সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তখন নিতান্তই একা, অনেকে এটা তাঁর একটা খেয়াল বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল। সুতরাং ১৯০৫ সালে বাঙ্গলার বয়কট-আন্দোলন একেবারে নূতন সৃষ্টি বলে মনে করলে ভুল হবে।

বিরোধের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে। বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল; আর 'বয়কট' এক বিরাট শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলো। ১৯০৫ জুলাই ১৭ "Ce" স্বাক্ষরে অমৃত বাজার পত্রিকা বয়কট সম্পর্কে এক পত্র প্রকাশ করে। তাছাড়া নিতান্ত অবান্তর হবে না বলে একটা নূতন বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে।

সমকালীন পুলিশ রিপোর্টে বয়কট-আন্দোলনের সঙ্গে টহলরাম গঙ্গারাম নামক এক অ-বাঙ্গালীর নাম দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মিত্র আত্ম-জীবন চরিত (পৃঃ ২৪৪)-এ বলেছেন "বঙ্গভঙ্গের বিরাট আন্দোলনের পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জনের উগ্র শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন হইয়াছিল।...টহলরাম ডেরা ইসমাইল খাঁর একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তিনি লর্ড কার্জ্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন।" তিনি বক্তৃতার মধ্যে ইংরেজের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বর্জ্জনের পক্ষে কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেন। তখনও অন্য নেতৃবর্গ একথা বলা আরম্ভ করেন নি। এ কথার ইঙ্গিত অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে।

বাঙ্গলার দুরবস্থায় ব্যথিত হয়ে সুদূর ডেরা ইসমাইল খাঁ থেকে যিনি এসেছিলেন তাঁর নির্য্যাতনের কাহিনী সামান্য উল্লেখ করা ন্যায্য বলেই মনে হলো। টহলরাম কলেজ স্কোয়ারে প্রকাশ্য বক্তৃতা দিতেন এবং তাতে প্রচুর লোকসমাগম হতো। তাঁকে পঙ্গু করে ফেলার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি এই গুণ্ডাদের দ্বারা নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন। নর্দ্দমা থেকে ময়লা উঠিয়ে তাঁর দেহে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একদিন তাঁর আঘাত এত গুরুতর হয় যে তাঁকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত সঞ্জীবনী পত্রিকা অফিসে নিয়ে প্রচুর শুশ্রূষা করে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর একদিন ঐ স্থানেই তাঁর দেহে নিক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় কর্দ্দম

পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। এত অত্যাচারেও পুলিশ তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি।

এই গুণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল তখনকার পত্রিকায়। ১৫-ই এপ্রিল (১৯০৫) নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকা লিখেছেন, যে-সকল মুসলমান বা ফিরিঙ্গি গুণ্ডারা টহলরামকে মেরেছিল তাদের ধরবার কোনো রকম চেষ্টা না করে টহলরামের বক্তৃতা বন্ধ করবার জন্য চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আবেদন করা হয়েছে। নিরীহ লোকের ওপর বে-পরোয়া আক্রমণ রোধ করতে না-পারায় পুলিশের অকর্মণ্যতা ঢাকা দেবার জন্য চেষ্টা অতি বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে করা যেতে পারে। সন্ধ্যা (৯ই এপ্রিল ১৯০৫) পত্রিকা থেকে জানা যায়, পাছে টহলরামের বক্তৃতা শোনবার জন্য দারুণ ভিড়ের চাপে অকস্মাৎ কেউ (পার্শ্বস্থিত) পুকুরের জলে ডুবে মারা যায় সেই কারণেই তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যার শেষ মন্তব্য, "এর চেয়ে হাস্যাস্পদ কাহিনী আর কিছু হতে পারে না।" মহাভারতকার বলেছেন, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

টহলরাম যাই-ই বলে থাকুন বাঙ্গলার চারিদিকে বয়কট আন্দোলন স্বতঃই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ১৩-ই জুলাই (১৯০৫) সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখেছিল, গভর্ণমেণ্টের মতিগতি যে রূপগ্রহণ করেছে, তাতে বাঙ্গালীর পক্ষে ইংলণ্ডের পণ্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করাই যোগ্য প্রত্যুত্তর। তাছাড়া সরকারী বড় কর্ম্মচারী ও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করতে হবে।' পরেই ২১-এ জুলাই লালমোহন ঘোষ দিনাজপুরে এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সরকারী বা সরকার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত এবং 'অনারারী' (অবৈতনিক) হাকিমের পদ বর্জ্জনের কথা অতি জোরের সহিত বলেন। ২৪-এ জুলাই সন্ধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ঐ নির্দ্দেশকে "ঠিক পথ" বলে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

এখানে প্রত্যক্ষ বিদেশী বর্জ্জনের কথা বলা হলো না বটে কিন্তু লোকের মনোভাব যে কি দাঁড়াচ্ছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের নির্দ্দেশ এসেছিল প্রথম দিকটায় ১৮৯৪ সালে যখন আমদানী শুল্ক' পুনঃসন্নিবিষ্ট হয় এবং ভারতীয় যে শ্রেণীর বস্ত্র ল্যাঙ্কাসায়ারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। তার ওপর 'উৎপাদন শুল্ক' বসানো হয়। ১৮৯৬-তে ভারতে উৎপাদিত তুলাজাত সকল প্রকার দ্রব্যের বস্ত্রই উৎপাদন শুল্ক—এর আওতায় ফেলা হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে যে মোটাবৃত্তির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, তাকেও রেহাই দেওয়া হয় নি। রমেশচন্দ্র দত্ত৹ (তাঁর Economic History of India in the Victorian Age, fifth edition p. 513) এই ব্যবস্থার উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য তাঁর কথার মধ্য দিয়ে সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছিল।

১৮৯৪ সালের আমদানী শুল্কনীতি গৃহীত হলেই জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। কলিকাতা টাউন হলে রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে ৮-ই মার্চ্চ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নূতন ট্যারিফ বিলের প্রচণ্ড প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় The Chronicle of the British Indian Association, p. 90). বিলাতী বস্ত্রের উপর আমদানী ও দেশী বস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ককে উপলক্ষ করে যে আন্দোলন হয়, তাতে বিদেশী বস্ত্র বয়কট করার চিন্তা খুব জোর করে দেখা দেয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হয় নি। মানুষের মন তখনও ভাল করে গড়ে ওঠে নি।

পুরাতন সূত্র ধরে ১৯০৫ বয়কট বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করে, সে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কে বা কারা এ প্রস্তাব সর্ব্ব প্রথম উত্থাপন করেছিল সে কথা নিশ্চিৎভাবে বলা কঠিন। যখন মানুষের মন ইংরেজের সুবিচারের ওপর সকল আস্থা হারিয়ে বসেছে তখন "the idea of a boycott of British goods was started by--whom I cannot say--by several I think at one and the same time. (Surendranath Banerjee, A nation in Making, 1963

p. 176)। তখন হয় ত একই সময়ে বহুজনে একই পথের কথা বলেছে। সুরেন্দ্রনাথের মতে পাবনায় এক প্রকাশ্য সভায় প্রথম বয়কট সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সেই চিন্তাধারা দাবাগ্নির মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যখন বয়কট-আন্দোলন বাংলায় সবে মাত্র ভাল করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখন বৃহত্তর জগতে এ নীতির সম্যক প্রয়োগে বিদ্রোহীমন অধিকতর শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করে—চীন ও আমেরিকার বিরোধে। ১৯০৫ মে মাসে আমেরিকা এক চীন বিতাড়ন (Exclusive Treaty) নীতি গ্রহণ করে, যার ফলে আমেরিকার ভ্রমণকারী বা ব্যবসায়ী চীনাদের ওপর নবাগত বা আগন্তুক পরীক্ষা বিভাগ (Emigration Department) প্রবর্তিত অসম্মানকর বিধিব্যবস্থার প্রতিবাদে চীনারা আমেরিকার পণ্য বয়কট করে। দৈনিক হিতবাদী ৩০-এ জুন (১৯০৫) লিখেছিল যে এই একটা "দাওয়াই" আমেরিকাকে (exclusive treaty) এক্সক্লুশিভ ট্রিটিকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে।

এ সংবাদ বাঙালীর নিকট এসে পৌঁছুলে বয়কটের ফলাফল সম্বন্ধে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। (তখনকার) চীনারা যা পারে বাঙালীর পক্ষে সে পদ্ধতি অনুসরণ করা মোটেই কষ্টকর নয় বলে মনে হয়েছিল এবং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আপনাদের কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছিল।

সংবাদপত্র-পত্রিকা ক্রমেই বর্জ্জনের নীতি প্রচার করতে থাকে। খুব গোড়ার দিকে ১-লা আগষ্ট (১৯০৫) ময়মনসিংহের চারু মিহির পত্রিকা লেখে যে বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবে প্রতি বাঙালী মনে ইংলণ্ডের পণ্য ব্যবহারে স্বতঃই পরাঙ্মুখ করে তুলবে। ২রা আগষ্ট সংখ্যায় বরিশাল হিতৈষী বলে যে এই আন্দোলন স্বায়ত্ব শাসনের আভাষ দিচ্ছে। বাঙালী এখন বাঙলার বাজারে বিদেশী মাল আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে। পরে ৪ঠা আগষ্ট মিহির ও সুধাকর (কলিকাতা) দেশবাসীকে বিলাতী পণ্য বর্জ্জন দ্বারা সাচ্চা কাজের পরিচয় দিতে আহ্বান জানায়।

টাউন হলে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫) সভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতায় সভা হয়ে যাবার পর মফঃস্বলে বহু স্থানে বিরাট সভা হয়েছে। মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করলে বাঙালীর মনের অবস্থার একটা ধারণা করা যাবে। ময়মনসিংহ সেরপুর সহরে রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুরের সভাপতিত্বে ২৭-এ আগষ্ট "বিলাতী" পণ্য বর্জ্জনের নীতি গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে রাণাঘাট সহরে (২৭-এ) জমিদার যোগেশ চন্দ্র পাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে, ২৮-এ কুমিল্লা সহরে মহম্মদ কাজি রিয়াজুদ্দিনের সভাপতিত্বে, ২৯এ ময়মনসিংহে যাগেশ্বর পাত্রনবিশের সভাপতিত্বে, ৩০এ ঢাকায় অন্নদাচরণ রায়ের সভাপতিত্বে, এবং বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় সভা আয়োজিত হয়েছিল। কোনো সভায় দশ সহস্রাধিক শ্রোতা সমবেত হয়েছিল। এরই সঙ্গে বঙ্গবিভাগ নিয়ে বাঙলা দেশ তোলপাড় হয়ে উঠেছিল সে কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র আত্মচরিতে লিখেছেন (পৃঃ ২৩৮) "এই সঙ্গে (বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে) প্রতিবাদ কার্য্যকরী করিবার জন্ম "সঞ্জীবনী" এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সঞ্জীবনী ইংলণ্ড হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং তন্মধ্যে যাহা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।" গোপালকৃষ্ণ গোখেল-এর সভাপতিত্বে ১৯০৫ বারাণসীতে যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতে বয়কটের স্বপক্ষে (বিপক্ষতাচরণের লোকের অভাব ছিল না) বলা হয় যে "বিভক্ত বাঙলার বিশেষ অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন।"

সর্ব্বশেষ "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় বয়কট বার্ষিকী উপলক্ষ করে ৬ই আগষ্ট (১৯০৭) যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে বয়কটের নিগূঢ় তত্ত্ব অদ্ভুতভাবে আলোচিত হয়েছিল। পত্রিকার মতে ৭ই আগষ্ট ভারতের জাতীয়তার শুভ জন্মদিবস। জাতীয়তার অর্থে দুটি জিনিস মনে করতে হবে,—প্রথম স্বাধীনতার সঙ্কল্প নিয়ে আত্মোৎ-

র্গ, আর দ্বিতীয়—স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়া। এই হিসাবে যখন আমরা ৭ই আগষ্ট বয়কট নীতি প্রচার করেছিলাম, তখন এটা কেবল অর্থনৈতিক বিদ্রোহ ঘোষণা করি নি। প্রকৃতই এটা স্বাধীনতা লাভের কর্মকাণ্ড বলে মনে করেছিলাম। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টা অঙ্গাঙ্গিভাবে অপর জাতীয় স্বতন্ত্রতা, লাভ প্রচেষ্টার সহিত জড়িত। সহজেই অনুমান করা যায় এ দুটি পরস্পরের ওপর নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। এই কারণেই বলতে হয় ৭ই আগষ্টই আমাদের স্বাধীনতা জন্মলাভ করেছে।" বয়কট যে স্বাধীনতার নামান্তর এ কথা এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।

বয়কট সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা মনে পড়ে। এই আন্দোলন উপলক্ষ্য করে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধের ক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। সুতরাং রাজদ্বারে ও, পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বয়কট আমাদের রণদামামা, ধর্মযুদ্ধের শঙ্খনিনাদ, শত্রুর প্রতি শর-নিক্ষেপের তূর্য্যধ্বনি।

বিদেশী পণ্য বর্জ্জনকে ঘিরে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর একটা বড় সাহিত্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। প্রথম পর্য্যায়ে- দেশী পণ্যের লোপ ও আর্থিক দুর্দ্দশার বেদনা প্রকাশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্জ্জনের জন্য মন গড়ে তোলা এবং শেষ পর্য্যায়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার নির্দ্দেশ।

বর্জ্জন-আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে থেকেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। কবি কালীপ্রসন্ন গান ধরলেন,—

"(ভাই সব) দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে,
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা,
অভাব মোচন পরের হাতে।
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতাম কলার পাতে,
এখন এনামেলে মাথা খেলে,
কলাই করার ব্যবসাতে।"

মনোমোহন বসু প্রাঞ্জল ভাষায় দেশের শিল্পপণ্যে দুর্লক্ষণের কথা প্রকাশ করলেন।—

"অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল।
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল।
কেমনে হরিল কেহ না জানিল।
এম্‌নি কৈল দৃষ্টিহীন।

* * *

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার,
সুতা যাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!

* * *

ছুঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশালাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

ক্রমশঃ মন গড়ে উঠেছে; বিদেশীর প্রতি বিতৃষ্ণার ভাবের সঙ্গে দেশীয় পণ্যের উপর প্রীতি ও আকর্ষণ ফুটিয়ে তোলার লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। কাব্যবিশারদ ভিক্ষা চাইছেন।

"এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার,
স্বদেশের বস্তু কর ব্যবহার,
বিদেশীর কিছু করো না গ্রহণ,
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায়।"

এখন শপথ গ্রহণের কাল সমুপস্থিত। জড়তা দূর করে মনকে শক্ত করে তুলতে হবে, যাতে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পরের ভূষণ পরের বসন, পরের অশন" ত্যাগ করবো এবং এইটাই

"নব বৎসরে করিলাম পণ,
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা।"

কবি জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রতিজ্ঞা করলেন।

"আজি ভারতের প্রতি জনে জনে বিদেশের কিছু কিনিব না কেহ, এ দেশের জিনিষ যদি পাই।"

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ঐ সুরে মন বাঁধতে বলেছেন।

"যাব না, আর যাব না ভিক্ষে নিতে
পরের দোরে।
যা আছে অশন বসন তাই খাব
তাই থাকবো প'রে।"

সকল হৃদয় স্পর্শ করে, সাধারণের মনে দেশীয় পণ্যের ওপর প্রেম সঞ্জাত হয় "দীন দুখিনী মা যা দিতে পারেন" তাই নিয়ে পরম আনন্দে থেকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলে বিশ্বাস রেখে চলতে পরামর্শে। এ সম্পর্কে যত গান রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কান্ত কবির "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" কবিতার তুলনা নেই। আমাদের মা পরম দুখিনী ভাল করে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আজ তাঁর অন্তর্হিত কিন্তু—

"সেই মোটা সুতোর সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই"

তাতে আমাদের আপন হৃদয়ে কোনো ছাপ পড়ে না; আমরা মায়ের স্নেহজড়িত অমূল্য রত্ন ফেলে "ওই পরের দোরে ভিক্ষা চাই।" আমাদের সকলের মুখে দেবার মত প্রচুর অন্ন নেই, আর আমরা এমনিই হতভাগা বুদ্ধিহীন, "তবু তাই বেচে সাবান মোজা কিনে করছি ঘর বোঝাই।" এই দুর্ব্বলতার প্রতিকারকল্পে আমরা "মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই, পরের জিনিষ কিনবো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

এরই জুড়ি গানটি হয়ত আরও সুন্দর, আরও হৃদয়স্পর্শী। সেখানে বলা হচ্ছে।

"তাই ভাল মোদের মায়ের
ঘরের শুধু ভাত"

কারণ

"ভিক্ষার চেলে কাজ নেই
সে বড় অপমান।"

নিজের ঘরের দিকে তাকাতে হবে, তাতে আমাদের সামান্ত ব্যাঘাত হতে পারে, তৎসত্ত্বেও

"ছিছি কাপড় পরবো না আর
যেচে পরের কাছে,
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"

পরে আমি আত্মসম্মানগর্ব্বে সুন্দর হবো, তার কাছে যতই মনোমুগ্ধকর নয়নানন্দদায়ক বিদেশী পোষাক পরি, অপর সকলপণ্য ব্যবহার করি। আমি আত্মসম্মানে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে নিজের কাছেই "ছোট" বলে প্রতিপন্ন হব।

মনের বাসনা কার্য্যে পরিণত করার কথা ভাবতে হবে। কবি মুকুন্দ দাস ও মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর আহ্বান "ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরো না" নির্দ্দেশ বাঙ্গলার মা বোনের হাত থেকে বেলোয়ারী চুড়ির নির্ব্বাসন ঘটিয়েছিল। অমৃতলাল বসু বলছেন

"তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী
শাঁখের আবার রাখবো মান।"

শাশ্বতীর বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী সুপণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মশাই "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা"য় বলাচ্ছেন "শাঁখা থাকতে (কাচের) চুড়ি পরবো না" আর—বঙ্গনারীদের দেবীর নামে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন, বিদেশী চুড়ি আর ব্যবহার করা চলবে না।

বাঙ্গলার মাতা ভগ্নী জায়া কন্যা বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের শপথ গ্রহণ না করলে কোনো স্থায়ী ফল হবে না। অপরিজ্ঞাত নারী কবি বলছেন,

"মোটা দেশী বস্ত্রে আজ আচ্ছাদিয়া,
বাঙ্গালিনী বেশে করিব পণ।
লুপ্ত কীর্ত্তি যার করিতে উদ্ধার—
সঁপিব সকলে পরাণ মন।"

কবি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন

"নব অনুরাগে এস তবে বোন
প্রতিজ্ঞা করিব সকলে আজ,
ছুঁইব না আর বিলাতী বিলাস
পরিব না আর বিদেশী সাজ।"

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সকলকে সতর্ক করে বলছেন, "বাজিছে বিষাণ উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই।" কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে অতি কঠোর ব্যবস্থা ও, তা না হলে এ দুরবস্থা ঘুচবে না। তাই—

"নগরে নগরে জ্বালারে আগুন,,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ।
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত,
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।"

মায়ের দৈন্য দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর সেই দৈন্য ঘুচাতে "সন্তান আজ জেগেছে।" পরীক্ষা কঠোর, কিন্তু হৃদয়ে দুর্ব্বলতাকে স্থান দিলে চলবে না। মায়ের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে আমরা দৃঢ়পদে অগ্রসর হব। বিজয়চন্দ্র মায়ের চরণে প্রার্থনা করছেন।

"প্রেম ডোরে তব দৃঢ় করি আজি
রাখ বাঙ্গালীরে বাঁধি মা!
পদতলে দলি বিলাতী বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা!"

নিতান্ত ভোগবিলাসী, দেশের স্বার্থরক্ষায় পরাঙ্মুখ, সরকারী কৃপাপুষ্ট স্বার্থান্বেষী বাঙ্গালী ছাড়া আর সকলে এই বয়কট আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিল। মারামারি নয়, খুন খারাপি নয়, বিদেশীপণ্য পরিহার করার প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা ইংরেজ বণিক তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছিল" "হাতে মারবার আগে ইংরেজ জাতকে যে "ভাতে মারবার" কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তাতে যতটা সুফল লাভ করা সম্ভব সেটা হয়েছিল, তারপর যখন ইংরেজশাসনের প্রকৃত রূপ ফুটে বেরুলো তখন "ভীরু, দুর্ব্বল" বাঙ্গালী ইংরেজকে "হাতে মারবার" হাতিয়ার সংগ্রহ করেছে দশ প্রহরণ ধারিণী "মা" একটি একটি করে আয়ুধ সন্তানের হাতে তুলে দিয়েছেন। "বজ্রসমুৎকীর্ণ" ছিদ্রপথে সূত্রের যেমন মণির মধ্যে প্রবেশ সম্ভব হয়, সেইভাবে বয়কট সাহায্যে বাঙ্গালী বিদেশী চক্রব্যূহের রন্ধ্র আবিষ্কার করে অভিমন্যুর মত সংগ্রাম করেছে, আর বিদেশী কৌরবকুল ভিতর থেকে শক্তিহীন হয়ে যুদ্ধান্তে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

নূতন কিছু নহে—

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজ্যপাল শ্রীধর্ম্মবীর হঠাৎ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়া কলিকাতার রাজাবাজারের কাছে রাস্তায় আলো জ্বলিতে দেখেন—বলাবাহুল্য তখন বেলা দ্বিপ্রহর! এ-বিষয় তিনি কর্পোরেশনের কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দিনের বেলায় রাস্তার আলো জ্বলিতে দেখিয়া রাজ্যপাল হয়ত বিস্মিত হয়েন, কিন্তু কলিকাতাবাসীর নিকট দিনে রাস্তার আলো জ্বলা এবং রাত্রে না জ্বলা এমন কিছু অবাক কাণ্ড নহে; আমরা অহরহ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা কর্পোরেশনের একটা কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা বহুবার এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। কেবল দিনের বেলায় রাস্তার আলো জ্বলাই নহে, রাস্তার জলের কলের, শতকরা অন্তত ৭৫টিতে অহরহ জল পড়া সম্পর্কেও পৌর-পিতাদের এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি [illegible] বহুবার কিন্তু সবই বৃথা!

পৌর-পিতারা এবং অন্যান্য কর্পোকর্তাদের দিনে আলো-জ্বলা, অহরহ কলের জল পড়া প্রভৃতি বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় কোথায়? তাঁহারা এমন সকল বিষয়, সমস্যা লইয়া সদা ব্যস্ত থাকেন যাহার সমাধান (যাহা পৌরপিতাদের হাতে) না হইলে, কেবল বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষই নহে, সমস্ত বিশ্ব চরম বিপদের সম্মুখীন হইবে। কর্পোরেশনের গুণবর্ণনা এখন আর বিশদভাবে করার কোন প্রয়োজন নাই। পৌরপিতাদের হাজারো প্রকার কঠোর সমালোচনা এবং তাঁহাদের অ-কর্পোরেশীয় কার্যকলাপের হেন নিন্দা নাই যে সংবাদপত্রে করা হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা নিজেদের সকল মান অপমানের উর্দ্ধে (বা নীচে?) বলিয়া মনে করেন, কোন প্রকার নিন্দা বা (সহজ ভাষায় কাঁচা গালি) যাঁহাদের 'হাইডে' স্পর্শ করে না, তাঁহাদের লজ্জা দিতে পারে কে? স্বয়ং লজ্জাদেবী পৌরপিতাদের দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ৫৫৩০ কিলো মিটার দূরত্ব রাখিয়া চলেন!

এইবার কিন্তু রাজ্যপাল বিপদে পড়িবেন। শীঘ্রই কর্পোরেশনের সভাতে আবার তাঁহার অপসারণ দাবী কোন বামচারী কাউন্সিলার উত্থাপন করিবেন। কারণ রাজ্যপাল পৌরপিতাদের 'অটোনমিতে' হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পৌর-পিতাদের চরকায় তেল দিবার কোন অধিকার রাজ্যপালের নাই, কারণ পৌরপিতারা সম্পূর্ণ স্বাধীন একতন্ত্রের মালিক—তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার আছে স্বেচ্ছাচারী হইবার!

কর্পোরেশনের ব্যাপারে অবশ্যই কাহারো কিছু বলিবার থাকিতে পারে না, কিন্তু কর্পোরেশন তথা পৌরপিতারা ত্রিভুবনের সকল ব্যাপারেই নাক প্রবেশ করাইবার অধিকারী। ইহাদের নাক কর্ত্তিত হইবার ভয় নাই (কান ত বহুকাল পূর্ব্বেই গিয়াছে)!

(৭-৭-৬৮)

কলিকাতার মেয়রের সময়োচিত বিদেশ ভ্রমণ!—

রাস্তায় ঘাটে জঞ্জালের পাহাড়ে এবং তাহার বিষম দুর্গন্ধে কলিকাতাবাসীদের প্রাণ যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে

দিবারাত্র, ঠিক সেই সময় কলিকাতার অতি মাননীয় মেয়র মহাশয় কলিকাতা নামক নরক ত্যাগ করিয়া বিদেশ প্রয়াণ করিলেন! এই বিদেশ ভ্রমণ অতি সময়োচিত হইয়াছে, অবশ্যই স্বীকার করিব। ইহাতে একদিকে তিনি নগরবাসী-দের নিত্য অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা অঞ্জলি হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। অপরদিকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মেয়র মহাশয় বিদেশ ভ্রমণের ফলে পৌর-প্রশাসন সম্পর্কে যে বিষম জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আসিবেন, তাহাতে কলিকাতার করদাতারাই বিষম লাভবান হইবেন। কারণ মেয়র মহাশয়ের বহু ব্যয়ে নব লব্ধ বহু জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ফলে পৌরপ্রতিষ্ঠান একটি পরম পবিত্র সর্ব্ব-বিষয়ে সুনীতিপূর্ণ সংস্থায় অবশ্যই পরিণত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্যকার অর্ব্বাচীন পৌরপিতারাও সৎপৌরপিতাতে রূপান্তরিত হইয়া দিবারাত্র পরম নিষ্ঠার সহিত চিন্তা করিতে থাকিবেন কেমন করিয়া পৌরপুত্রদের বর্ত্তমান নরক সমান নাগরিক জীবন হইতে স্বর্গসুখ প্রদান করা যায়। আশা করা যায় মেয়র মহাশয়ের বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর কলিকাতা, দুই চারি মাসের মধ্যেই প্রায় নন্দন কাননে পরিণত হইবে। (আমেন!) (২০-৭-৬৮)

অটোনমীতে আঘাত?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি আদেশে কর্পোরেশনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কিছু কিছু ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সঙ্কুচিত করিয়া, তাহা কমিশনারের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। রাজ্য সরকার তাঁহাদের প্রেরিত দুইজন ডেপুটি কমিশনারের হাতে নূতন ক্ষমতা তথা কর্ত্তব্যপালনে স্বাধীনতা দিয়া, তাঁহাদের সামান্য কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। গত কিছুকাল মধ্যে দেখা গেল, রাস্তার জঞ্জাল সাফ করিতে কর্পোরেশন চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়া অবশেষে মেয়র রাজ্যপালের দ্বারস্থ হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যপাল মেয়রের একান্ত অনুরোধেই—দুইজন সরকারী অফিসারকে বিশেষ ডেপুটি কমিশনারের পদে কর্পোরেশনে বহাল করিলেন। এই দুইজন ডেপুটেড্ অফিসার, (স্পেশাল ডেপুটি কমিশনার) যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঠিকমত এবং বিনা বাধায় করিতে পারেন, তাহা দেখা রাজ্য সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তহীন দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতার বিষয় নূতন কথা আর কিছুই বলিবার নাই। নগরবাসী আর কাহারো কাছে কর্পোরেশণীয় ক্রিয়াকর্ম্ম অজানা নহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে দুইজন ডেপুটি কমিশনারের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা দূরের কথা, পৌরসভার বাস্তু ঘুঘুরা পৌরপিতারা এবং কিছু সংখ্যক কর্পোরেশনের অফিসার নব নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনারদের সহিত সহযোগিতা না করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টির কাজে অধিকতর মনযোগী হইলেন। এরূপ ব্যবহারের প্রধান কারণ পৌরসভার দুর্নীতির ডিপোগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে বিশেষ কয়েকজন পৌরপিতা এবং তাঁহাদের তাঁবের অফিসারদের স্বার্থে বিশেষ ও গভীর আঘাত পড়িবে। এবং যাহার ফলে তাঁহাদের একটা পরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও পড়িতে হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা দুর্নীতিকেই জীবনের পরম নীতিরূপে বরণ করিয়া করদাতাদের প্রদত্ত-অর্থ কেবল অপচয় নহে, ফাঁকতালে নিজেদের ধনভাণ্ডার স্ফীত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, কর্পোরেশনকে কলঙ্কমুক্ত করার প্রচেষ্টা অবশ্যই অন্যায় অথবা এবং পৌরসভার অটোনমির উপর অসংবিধানসম্মত আঘাত বলিয়া মনে করিবে।

আমরা বলিতে পারি না রাজ্য সরকার কোন্ গোপন কারণে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত একটা অচল সংস্থাকে সচল রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ-রাজ্যের ছোট ছোট অনেক মিউনিসিপ্যালিটিকে অযোগ্যতার কারণে প্রায়ই বাতিল করা হয়—এই সব বাতিল করা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার দুর্নীতি, বিশেষ করিয়া আর্থিক বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ প্রায়ই থাকে না। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশন সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির আকর হওয়া সত্বেও—রাজ্য সরকার এই সংস্থাকে যেন একটু অতিরিক্ত—কেবল স্নেহই নহে, প্রশ্রয়ও দিয়া আসিতেছেন।

"মোর বুদ্ধি তোর কড়ি ফুর্ত্তি করা যাক—!"

কলিকাতার পৌরপিতারা ইহাকেই পরম এবং চরম ব্যবস্থা বলিয়া ঠিক করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাজ্য সরকারের কাছে যখন দরকার, তখনই কর্পোরেশন নানা ছলে অর্থ ভিক্ষা করিবেন, কিন্তু সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ কি ভাবে এবং কেন খরচ করিবেন তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তিতকর্ণ কাউনসিলার মহাশয়দের। খরচের বিষয় রাজ্য সরকার কিছু বলিলে, এখন কি হিসাবের ব্যাপারে কড়াকড়ি করিলেও, পৌরপিতারা বলিলেন—কর্পোরেশনের স্বায়ত্বশাসনে, (সহজ কথায়ঃ কাউনসিলারদের স্বেচ্ছাচারিতায় এবং বেলেল্লাগিরিতে) সরকার অফিসার বে-আইনী অনুপ্রবেশ করিতেছেন।

মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে পৌরসভার ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স্ কমিটি কর্পোরেশনের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার কথা বলিয়া প্রকাশ করেন যে, এবার কলিকাতা পৌরসভার আয়-ব্যয়ে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে মাত্র চারি কোটি সাত লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা। বলাবাহুল্য পৌরকর্তারা যথাবিহিত এবং যথারীতি রাজ্য সরকারের দরজায় ভিক্ষার পাত্র লইয়া দাঁড়াইবেন ঘাটতি পূরণের আবদার আবেদন লইয়া।

আরো আছে—কর্পোরেশনের চীফ্ অ্যাকাউনটেণ্ট্ মিঃ কে সি দাসের রিপোর্টে প্রকাশ যে, চলতি কোয়ার্টারে কর্পোরেশনের আয় ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৪ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কর্পোরেশনে ২২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেয় বিল পাশ হইয়া পড়িয়া আছে কিন্তু অর্থাভাবে পাওনাদারদের ঐ সকল বিলের টাকা মিটান সম্ভব হইতেছে না!

———

গোদের উপর বিষ-কোড়াও আছে—

ক্যালকাটা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাষ্টকে ৮৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কর্পোরেশনকে দিতে হইবে—এই টাকা বকেয়া খাতে পড়িয়া আছে। আগামী ১লা অক্টোবর ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন পাওনা হইবে আরো ১৫ লক্ষ টাকা! কর্পোরেশনের চীফ্ অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট্ অ্যাণ্ড্ ফিনান্স্ অফিসারের মতে পৌরসভার আর্থিকসঙ্কট (ক্রনিক?) এবার চরমে চড়িয়াছে। পূজার ছুটির পূর্ব্বে কর্পোরেশনের কর্ম্মীদের দু'মাসের বেতন এবং তাহার সহিত এক মাসের অগ্রিমও দিতে হইবে! পৌরসভা এই দায় এবং দেয় কোথা হইতে মিটাইবে জানি না। একমাত্র ভরসা রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার টাকাও দিবেন দাবী মত এবং প্রাপ্য হিসাবে পাইবেন পৌর অপপিতাদের নিকট হইতে কেবল প্রায়-কাঁচা-গালাগালি।

অনেকে বলিয়া থাকেন, কর্পোরেশনের হিসাব বাহিরের পাকা 'হিসাবীদের' দ্বারা চেক্ করাইলে বহু বিচিত্র এবং লোমহর্ষক তথ্য প্রকাশ পাইবে। বিশেষ করিয়া ময়লা ফেলিবার লরি ভাড়ার এবং বিশিষ্ট কয়েকজন কর্পোরেশন-কন্ট্রাক্টারের বিলগুলি। হিসাবের কারচুপীতে করদাতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা কিভাবে পৌর অপপিতারা অপ-ব্যয়িত করিতেছে, তাহার সামান্ত কিছু হয়ত লোকের পক্ষে জানা সম্ভব হইবে।

কর্পোরেশনের মুস্কিলআসান যখন সর্ব্বক্ষেত্রেই: যেমন রাস্তার জঞ্জাল অপসারণ, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, পাম্পিং ষ্টেশনগুলির যথাযথ রক্ষণ ব্যবস্থা, কলিকাতার রাজপথ মেরামতের তদারক প্রভৃতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিষম ব্যাপার প্রয়োজন হইলেই (যাহা অহরহ ঘটিতেছে) কর্পোরেশনের আর্থিক ঘাটতি পূরণ, সেই অবস্থায় কর্পোরেশনের মত একটা ঘাটের মড়াকে গরীবদের অর্থের অপব্যয় করিয়া বৃথা বাঁচাইয়া রাখিবার বৃথা এবং অশুভ-প্রচেষ্টা কেন এবং কাহাদের হিতার্থে বা স্বার্থে? কলিকাতার করদাতাদের একটা গণভোটের ব্যবস্থা করিলে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে—শতকরা শতজন করদাতাই (কেবলমাত্র কাউন্সিলারগণ বাদে) অদ্যকার এই পৌরসভাকে কালবিলম্ব না করিয়া বাতিল করিবার পক্ষে ভোট দিবে। আমরা মনে করি কলিকাতা পৌরসভা পৌরবাসীদের কল্যাণসাধনেই তাহার সকল প্রয়াস প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করিবে, কিন্তু কার্য্যত দেখা যাইতেছে

কলিকাতা পৌরসভা কেবলমাত্র কাউন্সিলারদের মজলিসের আড্ডাখানায় পরিণত হইয়াছে—যাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য করদাতাদের পয়সায় নবাবী করার সঙ্গে সঙ্গে সকল সময় দলীয় তথা নিজ নিজ স্বার্থসাধনে ব্যাপৃত থাকা মাত্র। পয়সা পাওয়া এবং পাওয়ান এই হইল কাজ।

কেন্দ্রীয় দুষ্ট চক্রের চাকা আবার সক্রিয় হইল?

হলদিয়ার অন্যান্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আর প্রকল্পটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার শুভ প্রয়াস কেন্দ্রীয় দপ্তরের একটি প্রভাবশালী দুষ্টচক্র প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতেছে এবং যাহাতে এই প্রকল্পটি এ-রাজ্যে না হয় তাহার জন্য প্রায় জান কবুল করিয়াছে। এই দুষ্টচক্রের চেষ্টার ফলেই হলদিয়ার বহু প্রকল্প, বিশেষ করিয়া সার প্রকল্পটি ক্রমগত মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর, পিছাইয়া যাইতেছে। এমনিতেই এ বিষয় পাকা সিদ্ধান্ত লইতে দেরী হইয়াছে তিন বছরের বেশী, এখন আবার নূতন করিয়া যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দু-চার জন মন্ত্রীর স্নেহে লালিত সেই দুষ্টচক্র আবার তাহার পাপচক্র ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, চতুর্থ পরিকল্পনার আওতা হইতে হলদিয়া হয়ত একেবারেই বাদ যাইবে। তাহার পর পঞ্চম পরিকল্পনায়, কেবল হলদিয়াই নহে, হয়ত পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি তথা পঞ্চত্ব পাইতে বিশেষ কোন অসুবিধা থাকিবে না।

সবই বুঝা যায়, কিন্তু লোক এবং রাজ্যসভার পশ্চিম বঙ্গের সদস্য মহাশয়গণ এ-ব্যাপারে একেবারে নীরব কেন? পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া, দিল্লীতে গিয়াই কি তাঁহারা অন্যরূপ ধারণ করিলেন? রাজ্যের প্রতি, বাঙ্গালীর অতি ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ এবং দাবীর সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক বা স্বার্থ কি আর নাই? দিল্লীতে সরকারী খরচায় বাড়ী, গাড়ী, টেলিভিশন সেট, প্রত্যহ অর্দ্ধশত মুদ্রা ভাতা প্রাপ্তিই কি তাঁহাদের চরম কাম্য—এবং এই রাজকীয় ঠাট কি তাঁহাদের কপালে মরণকাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে? নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ভোট-ভিক্ষার সময় প্রত্যেক প্রার্থীই, জনগণের কাছে বড় বড় আদর্শমূলক কথার সঙ্গে দেশ এবং দশের জন্যই তাঁহাদের প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন এমন কথাই বলেন এবং কোনক্রমে একবার নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেই তাঁহারা কি করিয়া চরম দেশ সেবা করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিবেন। সেইজন্য প্রার্থী কাতরভাবে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া একবার সুযোগ দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেও কসুর করেন না। এ-বিষয়ে কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী, বাম, ডাইন প্রভৃতি সকল দলের সকল প্রার্থীই সমানভাবে নিজের এবং নিজ নিজ দলের মহান গরিমা ঢাক ঢোল বাজাইয়া গাজনের উৎসব সুরু করিয়া দেন। কিন্তু কার্য সমাধা হইবার পর মুহূর্ত্তেই দেশ, দশ, জাতি—সব কিছুই শিকায় তুলিয়া রাখিয়া—সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে কায়মন অর্পণ করেন!

রাজ্য স্বার্থ রক্ষায় সকলেই সজাগ—কিন্তু আমরা?

আমরা বিশেষ করিয়া আজ বাঙ্গালী এম-পি-দের বিষয় বলিতেছি। অন্যরাজ্যের এম-পি-রা আর কিছু করুন আর নাই করুন, নিজ নিজ রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় তাঁহারা অতীব প্রখর এবং তৎপর। ইতিপূর্ব্বে বহুব্যাপারে ইহা দেখা গিয়াছে—এবং বর্ত্তমানেও যাইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে স্থাপিত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে সেই রাজ্যের লোকরা যাহাতে সর্ব্বাধিক কাজ পায়, সে-ব্যবস্থাও অনেকে করিয়া লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া বিহার, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্থানীয় লোক, যাহাকে বলে Sons of the soil, কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজন এবং দাবীর অতিরিক্ত সার্থকতা অর্জ্জন করিয়াছে—অর্জ্জন বলা ভুল হইবে, গা এবং গলার জোরে আদায় করিয়াছে! কিন্তু এ-দিক দিয়া আমাদের এই ভাগ্যহত রাজ্যে কি দেখিতেছি? এখানে কেবল কেন্দ্রীয় নহে, অবাঙালী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিতেও 'বাহিরের' লোক শতকরা প্রায় ৭০।৭৫ ভাগ পদ দখল করিয়া আছে। বিগত কংগ্রেস রাজত্ব কালেও

অবস্থা এই ছিল, আমাদের কাতর ক্রন্দনেও কোন ফল হয় নাই! 'উকী' সরকারের আমলের কথা না বলাই ভাল। আত্ম এবং দলীয় স্বার্থ রক্ষায় বিধান সভার উকী মাতব্বর এবং সামান্য পদাতিক সদস্যরাও তাঁহাদের সর্ব্ব প্রচেষ্টা এবং প্রয়াস নিয়োগ করেন। বাঙ্গলা ধ্বংস হউক, বাঙালী চুলায় যাউক, তাহাতে তাঁহাদের কোন উদ্বেগ বা চিন্তা দেখা যায় নাই।

কেবল লোকসভার সদস্যেরাই নহেন, রাজ্য বিধান সভায় যুক্তফ্রন্ট এবং কংগ্রেসী সদস্যদের কার্য্যকলাপে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের আশা কিংবা ভরসা করিবার কিছুই ছিল না, ভবিষ্যতেও নাই। সকল সদস্যই পার্টি-স্বার্থ, দলীয়গৌরব বৃদ্ধি এবং বিরুদ্ধ দলীয় সদস্যদের শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান কার্য্যেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। যুক্ত-ফ্রণ্টের মহামান্য নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণাই করিয়াছেন; কংগ্রেসকে ভিটাছাড়া করাই তাহাদের প্রধানতম পবিত্র কর্ত্তব্য। অন্যপক্ষে কংগ্রেসী নেতারাও পিছাইয়া নাই, তাঁহারাও তারস্বরে জনগণ অর্থাৎ ভোটদাতাদের আহ্বান জানাইয়াছেন, যুক্তফ্রণ্ট দলীয় প্রার্থীদের কেহ যেন ভোটদান করিয়া দেশের এবং বাঙ্গালীর সর্বনাশ না করে।

কংগ্রেসী প্রচারকবৃন্দ এমন কথাও বারবার বলিতেছেন এবং আবার বলিবেন যে—দেশ এবং জাতিকে বাঁচাইতে, সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র কংগ্রেস। কিন্তু বিগত বিশ বছরে কংগ্রেস দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দেশকে আজ কোথায়, কোন অতলে নামাইয়াছে, সে-বিষয় কংগ্রেসী নেতারা কিছু বলিতেছেন না কেন?

অনেকেই আজ বলিতেছেন, দেশ যে স্বাধীনতা (তথা-কথিত) ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভিক্ষার দান হিসাবে লাভ করে, সে-স্বাধীনতা দেশের মানুষের নহে, সেই দানস্বরূপ পাওয়া স্বাধীনতা কংগ্রেস ভিক্ষা করিয়া অর্জ্জন করে এবং ইহার সকল সুখ-সুবিধা কংগ্রেসী নেতা এবং ভক্তের দলই সর্ব্ব-ভাবে উপভোগ করেন। দেশের সাধারণ মানুষ অহরহ পাইতে থাকে গান্ধীটুপী পরিহিত নেতাদের শ্রীমুখ হইতে নির্গত মহা-বাণী এবং যে বাণী সাধারণ মানুষকে সংসারে সম্ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া, দেশের জন্য—আরো কষ্ট, আরো কৃচ্ছ্রসাধন, আরো ত্যাগের পথ অনুসরণ করিতে উদ্বোধিত করে। অর্থাৎ সহজ কথায় তাঁহারা বলেন "হে দেশবাসী! তোমরা দেশের জন্য দুঃখকষ্ট সবই প্রাণ ভরিয়া ভোগ কর, আর আমরা সেই অবসরে স্বাধীনতা (ভিক্ষা) প্রাপ্তির জন্য যে যতটুকু ত্যাগ বা ক্ষতি স্বীকার করি (বা করিব বলিয়া মনে করিয়া ছিলাম)—তাহার সুদ সমেত অণ্ডল করিয়া লই," দীর্ঘ বিশ বৎসরের কংগ্রেস শাসনের ইতিহাস এই,—একদিকে শতকরা ৯০।৯৫ সাধারণ মানুষের উত্তরোত্তর দুঃখ কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি, আর অন্যদিকে কংগ্রেসী নেতা মহারাজ এবং তাঁহাদের ভক্ত আশ্রিত স্বজনদের ক্রমাগত দৌলত বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সকল প্রকার আরাম বিলাসের প্রভূত আয়োজন আড়ম্বর। এই শ্রেণীর ভাগ্যবানদের সংখ্যা ভার-তের জনসংখ্যার শতকরা ২।৩ এর বেশী হইবে না। আর সংযুক্ত দলীয় সরকার—মাত্র ন মাসেই বাংলা দেশকে প্রায় নিষ্ফলতার ঘাটে পৌছাইয়া দেন! ইহারাই আবার নির্ব্বাচন আসর মাত করিতেছেন"—

দুই দশকের 'পরিকল্পনায়' ভারতের সাফল্য?

কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে 'কাইেশিয়া' সম্মেলনে এক ভাষণ প্রসঙ্গে নূতন পরিকল্পনা ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ গ্যাড. গিল বলেন যে—একটা জাতির জীবনে ২০ বৎসর খুবই কম সময় কিন্তু এই কম সময়টার মধ্যে পরিকল্পনা প্রভৃতির দৌলতে ভারতের যে অগ্রগতি হইয়াছে—তাহা সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়!

ভারতে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্ত্তক স্বর্গত জবাহর-লাল নেহেরুর মানসপুত্র, দলত্যাগী কিন্তু কর্ম্মবীর, শ্রীঅশোক মেহতা প্রথম বিশ বৎসর ভারতীয় পরিকল্পনা মহাযজ্ঞের পুরোহিত-প্রধান ছিলেন।

এখানে একটা কথা, আবার বলা প্রয়োজন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার কংগ্রেস সভাপতির পদে থাকাকালে ১৯৩৮ সালে একটী পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করিয়া শ্রীজবাহরলালকে ঐ পরিকল্পনার কার্যক্রম স্থির করিবার সকল ভার অর্পণ

করেন। ভারতে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার জন্মকথা এই। কিন্তু দিল্লীর মহাশয় কংগ্রেসী কর্তাগণ—১৯৪৮।৪৯ সালেই পরিকল্পনার ইতিহাস হইতে সুভাষচন্দ্রের নাম সযত্নে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া, শ্রীজবাহরলালকেই ভারতের পরিকল্পনার একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পিতৃত্ব দানে কোন দ্বিধা বা লজ্জা-বোধ করিলেন না। অবশ্য একথা আমরা জানি যে দেশের কাজে, মানুষের সেবায় লজ্জা সঙ্কোচ এবং কোন বিষয়ে কোন দ্বিধা রাখা চলে না। যাক—

শ্রীঅশোক মেহতা কিভাবে, এবং কি দরাজ হস্তে পরিকল্পনার কার্য্য পরিচালনা করেন, তাহার কথা আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। একথা বলিব না যে আমাদের পরিকল্পনা সবই ব্যর্থ হইয়াছে, কিছু কিছু সার্থকতা অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু ব্যর্থতার তুলনায় তাহা অতি সামান্যই। বিদেশের কৃপা-সাহায্যের উপর একান্ত ভরসা করিয়াই আমাদের পরিকল্পনা প্রাসাদের ভিত রচিত হয়। এই বিদেশী কৃপা-সাহায্য দয়ার দান নহে, ইহা যথা কালে সুদসমেত পরিশোধ করিতে হইবে, ইতিমধ্যেই এই পরিশোধ-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশের নিকট ভারতের ঋণের পরিমাণফল দাঁড়াইয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে আমাদের নাতি-প্রনাতিদেরও বেগ পাইতে হইবে—এক কথায় আমরা ভারতের আগামী ২০০ বৎসরের ভবিষ্যতকে বিক্রয় কিংবা বাঁধা দিয়াছি—কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট। পাওনাদারদের মধ্যে ভারত-সুহৃদ সোভিয়েট রাশিয়াও আছেন। বলাবাহুল্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রই ভারতকে নিছক এবং নির্ভেজাল প্রেমের কারণে পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি টাকা অর্থ-ভিক্ষা দেয় নাই, ইহা কৃপাপ্রার্থীকে দান-ভিখারীর প্রতি করুণার দানও নহে। অর্থদাতা সকল রাষ্ট্রই নিজের স্বার্থ সেন্ট পার-সেন্ট বজায় রাখিয়া দাসখৎ লইয়া আমাদের টাকা দিয়াছে এডের নামে স-সুদ ঋণ।

ভারতীয় ৩টি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের কি লাভ, কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বহুজন বহু পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন, আবার নূতন করিয়া বলিবার তাহার প্রয়োজন নাই। আমাদের আপত্তি মিঃ গাডগিলের একটি কথায়, তিনি জাতীয় জীবনে দীর্ঘ বিশ বৎসরকে অল্প সময় বলিলেন কোন যুক্তিতে এবং কিসের বিচারে।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যে না পৌছানর অজুহাত অর্থাৎ প্রায় ব্যর্থতার কারণস্বরূপ সময়ের অল্পতা—মাত্র বিশ বৎসর জাতীয় জীবনে কিছুই নহে, এই কথা যদি মিঃ গাডগিলের মত মানুষের মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে আমাদের অবাক হইতে হয়। কুড়ি বৎসর সময় একটা জীবন্ত জাতি এবং প্রকৃত নেতৃত্বের নিকট বড় নহে। ইতিহাস ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কি নজীর দিবে দেখা যাক।

ইজরাইলের জন্ম মাত্র ১৯৪৮ সালে কিন্তু তাহা সত্বেও মাত্র ২০ বৎসরে আত্ম প্রচেষ্টা এবং জাতীয় সাধনার বলে ইজরাইল দেশকে আজ সর্বদিক হইতে উন্নতির চরম শিখরে লইয়া গিয়াছে! বিগত জুন মাসে আরব লীগের সহিত ৬দিনের যুদ্ধে ইজরাইল দেখাইয়া দেয় দৃঢ় নেতৃত্ব এবং ঐক্যবদ্ধ জাতি কি করিতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত এবং একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপান ও পশ্চিম জার্মানীও কুড়ি বছরেরও কম সময়ে আজ শিল্প বাণিজ্য শিক্ষায় বিজ্ঞান সাধনা প্রভৃতিতে বিশ্বকে তাক্ লাগাইয়া দিতেছে। ১৯৫০ হইতে চীন কম্যুনিষ্ট শাসনে, কিন্তু শত দুঃখ কষ্ট এবং অভাব থাকা সত্বেও মাত্র ১৮ বৎসরের মধ্যে চীন সম্পূর্ণ ভাবে পরনির্ভরতা পরিত্যাগ করিয়া আজ হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী হইয়া মার্কিন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সকল বিষয়ে সমানে পাল্লা দিতে সক্ষম হইয়াছে—কিসের কারণে, কোন শক্তি জোরে? আত্মনির্ভরতা।

আসলকথা আমাদের পরিকল্পনাগুলির চরম ব্যর্থতার প্রধান কারণ আমাদের পরনির্ভরতা এবং ভিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া জাতীয় নেতৃত্বের বড় বড় অবাস্তব আদর্শ বুলীর অবতারণা আমাদের জাতীয় সরকার যে নেতৃত্বে এতদিন চলিয়াছে তাহা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত। এখন অবিলম্বে অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করিয়া নূতন নেতৃত্ব চাই। পুরাণ নেতৃত্বকে নোংরা বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করিয়া দেশ এবং জাতিকে বাঁচাইবার নূতন পথ খুঁজিতে হইবে। পরিকল্পনার ব্যাপারে অশোক মেহতার মত লোকের প্রবেশ

চিরতরে বন্ধ করা দরকার। সর্ব্বশ্রী মোরারজী দেশাই, দীনেশ সিং, পুনাচ্চা, জগজীবন রাম প্রভৃতি লোকেদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত না করিতে পারিলে, দেশের অবস্থা এবার ২৫ ফুট কাদার তলায় যাইবে। কিন্তু আমাদের কথায় কোন কাজই হইবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না সাধারণ মানুষ লগুড়াঘাতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য রাসভালয়গুলিকে জীবশূন্য করিয়া, নূতন মানুষকে প্রবেশাধিকার দিবে। বর্তমান নেতৃত্ব অবিলম্বে বাতিল হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের পরিকল্পনার ভিত্তি কিসের উপর ?

বলিতে দ্বিধা নাই ভিক্ষা-ভিত্তিক পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আদি-পিতা জবাহরলাল। কোটি কোটি টাকা 'এডে'র উপর নির্ভর করিয়া রাজকীয় পরিকল্পনা-খসড়া প্রস্তুত হয়। চাহিলেই তখন মার্কিন, ব্রিটেন, রাশিয়া, পশ্চিম জার্ম্মানি, জাপান এমন কি ক্ষুদে রাষ্ট্র যুগোস্লোভিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া—এমন কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্র দেশ কোয়েত পর্য্যন্ত, ভারতকে হাজার হাজার কোটি টাকা পরিশোধের সময় সীমা বাঁধিয়া দিয়া সুদসহ এড্‌রূপী ঋণ দিয়াছে। কিন্তু দুবছর পূর্ব্বে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পরেই ভারতের ভিক্ষার ঝুলি প্রায় খালি হইল। মার্কিন তাহার প্রতিশ্রুত 'এড' দেয় নাই, অন্যান্য দেশও প্রায় তাহাই। এখনও কোন বড় রকমের যুদ্ধ বাধে নাই, কিন্তু সে-সম্ভাবনার কালো মেঘ দেখা দিয়াছে, হঠাৎ যদি ভারত আবার তাহার অনিচ্ছাসত্বেও যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে - আমাদের ভিক্ষা-ভিত্তিক পরিকল্পনার কি হইবে? তেমন অবস্থায় ভারতকে সকল পরিকল্পনা শিকায় তুলিতে হইবে না কি? পর-নির্ভরতার বিপদ এইখানে। নিজের পায়ে দাঁড়াইবার জোর না থাকিলে পরের কাঁধে ভর করিয়া মানুষ কতদিন চলিতে পারিবে? এখনও হয়ত সময় আছে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় সম্বল করিয়া এখনও যদি আমরা আত্মনির্ভর না হই, দেশ, জাতি এবং সাধারণ মানুষ অতলে যাইবে। অনর্থমন্ত্রী মোরারজী, অব্যাপারী দীনেশ সিং, অচাষী জগজীবন রাম, পরের পকেটে অর্থ সন্ধানকারী অশোক মহারাজ এবং এই প্রকার অন্যান্য কেন্দ্রীয় অকর্ম্মবীরদের দাপট হইতে বিধাতা ভারতকে রক্ষা করিবেন কি না জানি না, যদি না করেন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য লইয়া জবাহরলাল এবং অন্যান্য দু-চারজন মহানেতা যে পরিহাস কৌতুক করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও অনেকে করিতেছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সারা দেশকে জীবন দিয়া করিতে হইবে।

মালয়ের সেমাং

তুষারকান্তি নিয়োগী

গত প্রায় দুবছর ধরে 'প্রবাসী'র পাতায় আমরা ভারতবর্ষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আদিবাসীদের জীবনবৃত্তের আলোচনা করেছি। এবার আমরা ভারত ছেড়ে একবার বাইরের দিকে চোখ মেলে চাইব, দেখতে চেষ্টা করব পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের কি অবস্থা, সভ্যতার প্রাঙ্গন থেকে সরে আছে ওরা কতদূরে, কতদূরইবা সত্য করে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছে নিজেদের, কতদূরইবা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতিকে খুইয়ে বসেছে ইতিমধ্যে। আমার পাঠকপাঠিকাদের এবার তাই একটি স্বতন্ত্র আদিবাসীর জীবনবৃত্তান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী। ভারতবর্ষের পর সাধারণত সব ব্যাপারেই আমরা পাশ্চাত্যের দিকে নজর ফেলি, জানতে চাই সবকিছুকে একটা তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, পাশ্চাত্যের মাধ্যমকে এর বিচারের কষ্টিপাথর হিসেবে। পূর্বের দেশগুলিতেও যে অনেক কিছু জানবার আছে তা আমাদের মনেই থাকে না। আমরা কিন্তু আমাদের পরিক্রমায়, যদি কোনদিন শেষ করতে পারি, পূর্বের দিকেই বলব, মুখ তুলে চাইতেও অনুরোধ করব আমাদের পাঠকবর্গ সেইদিকে। মালয় উপদ্বীপ নামটি সামান্য ভূগোল জানা যে কোন লোকেরই অজানা নেই। সেই মালয়ের বুকেই গিয়ে আজ আমরা দাঁড়াব। এখন নাম হয়েছে মালয়েশিয়া স্বাধীন দেশ, বৃটিশের কবল থেকে এরা মুক্ত হয়েছে আমাদেরই মত। সভ্যতার চেহারাটা মালয়েশিয়ার হাটেমাঠে ছড়ান, যারাও মুচকি হেসে এইসব সভ্যমানুষদের কাজকর্ম করে যাচ্ছে; কিন্তু শহর থেকে বেশকিছু দূরে, কোলাহল কল্লোল থেকে একটু সরে গিয়ে বনের ভিতর অন্য দৃশ্য। সেখানে ইতিহাস আর সময় চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে থেকে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে এগিয়ে যাবার পথ, বনের মানুষগুলিও চলতে পারেনি বাইরের মানুষগুলির সঙ্গে তালে তাল রেখে, তারা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের মত এখনও চোখে বিস্ময়, শরীরে শ্রম আর শক্তি রেখে একই স্থানকে কেন্দ্র করে ঘুরে ফিরে চলেছে বংশপরম্পরায় যুগ যুগ ধরে। বাইরের উল্লাস ওদের জীবনযাত্রায় কোন ছেদ বা দ্রুততা আনতে পারেনি, বাইরের বিজ্ঞানবোধকে হেলায় সরিয়ে রেখে সরল শৈশবীয়বোধ নিয়ে ওরা টিকে আছে। এভাবে কতদিন টিকে থাকবে তা জানেনা তারা, এবং জানতেও চায়না। হয়ত বাইরের চাপকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা তারা, হয়ত বন কেটে বসত বানাবার তাগিদে মেতে ওঠা সভ্যমানুষদের যন্ত্রের চিৎকারে ওরা মুহ্যমান হয়ে পড়বে। সে যা হোক, সে সব ভবিষ্যতের চিন্তা ওদের কিছুমাত্র নেই, আছে শুধু বর্তমান জীবনটুকু আরও একদিন যাপন করে নেওয়ার ভাবনা—যতক্ষণ সময় আছে ততক্ষণ ব্লোগান দিয়ে পাখী বিদ্ধ করা যাক, হার্পুন ছুড়ে মাছ ধরা যাক, বিষাক্ত শলাকা দিয়ে হাতিকে ধরাশায়ী করা যাক, বানর শিকার করার সময় ওর রকমসকম দেখে একটু কৌতুক অনুভব করা যাক—সবমিলে শান্তিতে যে কয়দিন টিকে থাকা যায় যাক, যে কয়দিন কাটান যায় যাক। জীবনাসক্ত এই মানুষগুলির নাম হ'ল সেমাং—মালয়ের সেমাং।

সেমাংদের বাস দক্ষিণমালয়ের জঙ্গলাভূমিতে। সেমাংরাই এই অঞ্চলের ভূমিজ (autochthon), কিন্তু আজ সংখ্যায় ওরা অত্যন্ত ন্যূন। আজকের মালয়ীরা সেই দ্বাদশ শতক থেকে দলে দলে আসতে শুরু করে সুমাত্রা অঞ্চল থেকে এবং ধীরে ধীরে অধিকার করতে থাকে মালয়ের অঞ্চলগুলি এবং আজ তারাই হল মালয়ের প্রধান অধিবাসী। এ ছাড়া মধ্যযুগে আরবী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য থেকে মালয় উপকূলের বন্দরগুলি রেহাই পায়নি, রেহাই পায় নি তাদের সর্বগ্রাসী ধর্মপ্রচারের প্রকোপ থেকে—আজও মালয় উপকূলের বন্দরগুলির জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মুসলমান। এরপর গতায়ত হতে শুরু হয় পাশ্চাত্য বণিকবেশী সাম্রাজ্যবাদীদের—ক্রমে ক্রমে পোর্তুগীজ ডাচ ও ইংরেজরা আসতে যেতে থাকে। লোকসংখ্যার একটা সাধারণ হিসেবে দেখা যায় যে মালয়ে বসবাসকারীদের ৩৫০০,০০ মালয়ী, ৪৫০০০ ইউরোপীয় ১২০০০ ইউরেশীয় টিনের খনিতে এবং রবার সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত দক্ষিণভারতীয়দের সংখ্যাও অপ্রচুর নয়, এছাড়া আছে চীনা ব্যবসায়ী ও মজুর, আর আছে সীয়ামীরা।

এত' গেল উপদ্বীপের বাইরের দিককার বিবরণ। বাইরের কোলাহল আর নাগরিকতার আলোর দেশ ছেড়ে বনের ভিতর একবার দৃষ্টি দিলে চোখে পড়বে সংখ্যান্যূন সংঘবদ্ধ জনশ্রেণীকে যারা এ ভূভাগের প্রাচীনতম অধিবাসী যদিও আজ তারা সমগ্র জনসংখ্যার ১ ভাগের বেশী নয়। এই আদিমমানুষদের ৩টি ভাগে ভাগ করা চলে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য জাকুনরা যাদের জাতিগত ও ভাষাগত মিল আছে মালয়ীদের সঙ্গে, আছে সেকাই যাদের খর্ব আকৃতি দেখে সহজেই চিনে নিতে পারা যায় ;—এবং সবশেষে উল্লেখ করা যায় সেমাংদের। সেকাই এবং জাকুন, উভয় দল থেকেই প্রাচীনতর, প্রাচীনতর জীবনমান ও জীবনায়নের দিক দিয়ে, হল সেমাংরা। নিগ্রোজাতীয় আকৃতিরূপের যে পরিচয় পিগমীদের মধ্যে পাওয়া যায় তার পূর্ণমাত্রার বিকাশ ঘটেছে সেমাংদের মধ্যে। প্রাচীন নিগ্রোজাতীয় শাখাগোষ্ঠীর সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে আজও টিকে থাকা এই হাজার দুএক সেমাংকে নির্দেশ করা চলে।

শরীর আকৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক পুরুষ ৫ ফিটের বেশী লম্বা হয়না—মেয়েরা আরও তিন চার ইঞ্চি মাথায় খাটো। তবে শরীর গঠনে বেশ সংহতি আছে—শরীর কাঠামোর ঋজুতা এবং সংবদ্ধতা সহজলক্ষ্য। গায়ের রঙ তাদের ঘনশ্যামাভ, মাথার চুল ছোট ছোট, পশমের মত মাথার সঙ্গে লেপ্টান, দাড়ি আর শরীরে চুল বলতে প্রায় কিছুই নেই, কপাল ওদের গোল নীচু, চোখ গাঢ় পিঙ্গল আর নাসিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, চ্যাপ্টা ও চওড়া, মুখাকৃতি গোলাকার এবং চোয়াল সামনের দিকে ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত, মাথা মাঝারি আকারের। কেউ কেউ মনে করেন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের পলায়নকারী নিগ্রোক্রীতদাসরাই হ'ল মালয়ের সেমাংরা। সে যাহাই হোক আজ এ মত প্রায় গ্রাহ্য হয়েছে যে ওরা ফিলিপাইন এবং আন্দামানে বসবাসকারী নিগ্রোজাতীয় মানুষদের সমজাতীয়—শুধু দৈহিক আকারমানই নয়, জীবনায়নের দিক থেকেও এদের পরস্পরের সাদৃশ্য ও সাধর্ম বর্তমান। তবে দেহকাঠামো ও জীবনায়নের দিক থেকে নিগ্রোজাতীয়দের সঙ্গে সাম্য দৃষ্ট হলেও সেমাংদের কথ্যভাষার সঙ্গে নিগ্রোজাতীয় ভাষার কোন মিল নেই। ইন্দোচীন এবং ব্রহ্মের মোংখেমর ভাষার সঙ্গে ওদের ভাষার অনেক মিল পাওয়া যায়—শব্দভাণ্ডারে আছে এই সাম্য, একাক্ষরতা ও প্রত্যয় প্রয়োগে আছে ঐক্য। সেমাংদের কোন লিখন, লিপি নেই এবং ৩এর বেশী সংখ্যা গণনায় ওরা অপারগ।

উপদ্বীপের অভ্যন্তরে উঁচুনীচু পার্বত্যপাদপে বনজঙ্গলে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা কমবেশী ৭০০০ ফিট। সেমাংরা ছোট ছোট দলে কেদহ, কেলানটন এবং পেরাক ইত্যাদি অঞ্চলে বসবাস করে—

স্থানটির ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া যায় ১০১°-১০২° পূর্বদ্রাঘিমা এবং ৫°-৬° উত্তর অক্ষাংস। বিষুব অঞ্চলের জলবায়ু এখানে—ঝড় বিদ্যুতের লীলাচাপল্যে ১০০° ইঞ্চির বাৎসরিক বৃষ্টিধোয়া অরণ্যভূমি সবসময় চরম উচ্চতা ও আর্দ্রতার প্রলেপ গায়ে মেখে থাকে। জঙ্গলের ঘনভাব অত্যন্ত বেশী আর সারা সকাল থাকে কুয়াশাভরা। কুয়াশাভরা আলোকদীপ্ত সকালের স্বচ্ছ-প্রকাশ বেলা ১১টার আগে হতে পারেনা। প্রচুর জলকণা ভূমিকে ধৌত করে নানা পথে, তরঙ্গিত জল-প্রবাহ ঝর্ণা সৃষ্টি করে এগিয়ে চলে—তীর ঘিরে বেড়ে ওঠে নানানজাতের অসংখ্য গাছগাছড়া বনস্পতি লতা-পাতার সার। বড় বনস্পতি, মাঝারি কাঁটাগাছ, লতা বাঁশঝাড়, বিষাক্ত লতাশ্রেণী, আগাছা, পরগাছা ফার্ণ শেওলা ইত্যাদি ঘন, অতিঘন হয়ে বনের পৃষ্ঠদেশ শক্ত করে ঘিরে রেখেছে—এত পুরু আস্তরণ রচনা করেছে উদ্ভিদপ্রাণ যাতে করে অনেকসময় ছুরি সাবল দিয়ে পুরু উদ্ভিদত্বক ছেদন করে ভিতরে ঢুকতে হয়। বনের ভিতর যেমন উদ্ভিদশ্রেণীর সাবলীল প্রাণপ্রকাশ তেমনি পোকামাকড়ের প্রাণোন্মাদক সঞ্চরণক্ষেত্র—অসংখ্য অগণিত পোকা, বিভিন্নশ্রেণীর মশা আর জোঁক ইত্যাদির সাবলীল বিচরণক্ষেত্র এই বনাভ্যন্তর। নদী খালে প্রাণচঞ্চল কুমীরের একচ্ছত্র আধিপত্য, এছাড়া ব্যাঙ, সাপ, নানাজাতের সরীসৃপ গিরগিটি, কচ্ছপ ইত্যাদির স্বাধীন জীবিকাক্ষেত্র হল এই বনস্থল—আর আছে সংখ্যাতীত স্তন্যপায়ী জীব—হাতি, জলহস্তী, বন্যষাঁড়, বাঘ, নেকড়ে, চিতা, ভল্লুক, বনহরিণ, বনশূকর, গিবন ও নানাজাতীয় বানর, লেমুর আর কাঠবিড়ালী……। অগণ্য মীনপ্রাণের মধ্যে আছে একটি আশ্চর্য জাতের মাছ যারা ভূমিতেও বিচরণ করতে পারে, অন্য এক রকমের মাছ আছে যারা পিচকিরির মত জলনিক্ষেপ করে কীটপতঙ্গ শীকার করে।

স্বভাব-যাযাবর সেমাংরা কোন একটি স্থানে এক-ক্রমে তিনদিনের বেশী থাকেনা—শিকারের অন্বেষণে, বন্যমূল অথবা ফল আহরণের জন্য তাদের বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। কৃষিকাজ ওরা জানে না, তবে মালয়ীদের প্রভাবে আজকাল ছত্রকজায়গায় চাষবাসের একটু আধটু প্রচলন হয়েছে। পশুপালন বৃত্তিটাও ওদের মধ্যে তেমন দেখা যায়না তবে লাল-রঙের একজাতীয় কুকুর ওরা পালন করে, আর পালন করে অল্পবয়সী বানর। বানর ওদের অত্যন্ত প্রিয়—সেমাং নারীকে একই সঙ্গে তার নিজের গর্ভজাত শিশু ও পালিত বানর সন্তানকে স্তন্যপান করাতে দেখা গেছে। তাই যে প্রাণীকে এভাবে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়, পালন করা হয় তা তাদের কাছে অবধ্য যদিও তাকে বিক্রয় করা যায় অথবা অপরকে দান করা যায়। মাছ ধরাও ওদের জীবিকার একটি প্রধান উপায়। তবে ওরা কখনও জালের সাহায্যে মাছ ধরেনা। ছোট মাছ ছিপ বঁড়শিতেই ধরা পড়ে—বড়মাছ বা কচ্ছপ শিকারের জন্য বর্শা বা হার্পুণের প্রয়োজন। শিকারের সঙ্গে চলে রাঙ্গাআলু, ডুরিয়ান (বড়আকারের রসাল মালয়ী ফল) ও নানাজাতীয় বন্য ফলমূল সংগ্রহের কাজ। শিকারের যন্ত্রহিসাবে বাঁশের বর্শা (প্রায় ৪।৫ ফিট লম্বা) ও তীর ধনুকের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ব্লোগানের প্রচলন আছে সেমাংদের মধ্যে—এই ব্লোগান সেমাংদের নিজস্ব কীর্তি, নয় প্রতিবেশি সেকাইদের কাছ থেকে ওরা ব্লোগান নির্মাণ ও ব্যবহার শিখেছে। ব্লোগান তৈরী করতে লাগে ৭ ফুট লম্বা চোঙ্গল, চারপাশ থাকে ঘেরা, মুখের দিকটা আটকানো থাকে গাটাপার্চা দিয়ে। বাঁশের সঙ্গে লৌহশলাকা আটকান থাকে—এই শলাকাটি ফুটখানেক লম্বা। বিষজাতীয় বস্তু, বিশেষতঃ ইউপাস গাছের বিষাক্তরস লাগান থাকে ছুঁচাকার শলাকার মুখে। এই বিষের ক্রিয়ায় মানুষ, পশু এবং যে কোন জীবেরই মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া সেমাংদের প্রধান অস্ত্র হল তীর ধনুক। ধনুকের উপাদান কাঠ, দৈর্ঘ্য ৬।৭ ফিট, ছুকোনা উদ্ভিজ্জাত সুতোর বাঁধা; তীরও বাঁশের তৈরী, মুখে থাকে ইউপাস গাছের বিষাক্ত রস। সেমাংরা ছোটখাট পশুপাখী

রোগান এবং বড়বড় জীবজন্তু তাঁর ধনুক দিয়ে শীকার করে। ওদের হাতি শিকারের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে—হাতির পেছন থেকে আঘাত করা হয় একটি বিষাক্ত শলাকা দিয়ে, সেই আঘাতে এবং বিষের ক্রিয়ায় হাতিটা নির্জীব হয়ে পড়ে ও ধীরে চলতে থাকে, আর সেই সুযোগে বর্শাবিদ্ধ করে হাতিটাকে ধরাশায়ী করা হয়। জলহস্তীরা অনেক সময় নদীর কিনারে বালিয়াড়িতে বিশ্রামসুখ ভোগ করে, যখন সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জলাভূমি শুষ্ক হয়ে যায় তখন জলহস্তীর পক্ষে সেই মাটির ওপর চলাফেরা করা অথবা আক্রান্ত হলে পালান অসম্ভব হয়ে পড়ে—ওই অবকাশে সেমাংরা জমির চারপাশ থেকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং জলহস্তী অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে।

নেগ্রিটো সেমাংরা শুকনো ছাল অথবা বাঁশের ডাল ঘসে আগুন জ্বালিয়ে থাকে। আগুন জ্বালানর প্রয়োজন হয় উষ্ণতা সৃষ্টির জন্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যাপারে এবং মাংস ইত্যাদি সেঁকে নেওয়ার কাজেও আগুনের দরকার হয়ে থাকে। অবশ্য সেমাংরা মাংস প্রধানত কাঁচাই খেতে পছন্দ করে। বাঁশের দণ্ডে ফুঁড়ে পাখী, মাছ এবং ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার আগুনের উপর রেখে সেঁকে নেওয়া হয়। বিষাক্ত ফলমূল এবং রাঙ্গাআলু ইত্যাদির উপর চুন মাখিয়ে গাছের পাতায় মুড়ে আগুনে সেঁকে নেওয়া হয়। রান্নার কাজ মুখ্যত মেয়েদের। খাবার সময় পুরুষ ও বাচ্চাদের আগে পরিবেশন করা হয়। বাঁশের পাত্রে এবং নারকোলের খোলা দিয়ে কাপ তৈরী করে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা হয়।

কাপড়চোপড়ের বিশেষ ধার ধারে না সেমাংরা। পুরুষদের পরিধেয় হল সামান্য একখানি কটিবস্ত্র—কিন্তু বালক-বালিকারা প্রায় উলঙ্গই থাকে। মেয়েদের লজ্জা-বস্ত্র তৈরী হয় বিশেষ একজাতীয় ছত্রাকের ছাল দিয়ে। নানা জাতীয় পাতা ও পাতার আঁশ দিয়ে হাত ও গলা ইত্যাদির অলংকার প্রস্তুত হয়, অলংকারের ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আসক্তি রয়েছে। শরীরে রঙ্গন দ্রব্যের প্রলেপ লাগান হয়—তবে এর পশ্চাতে অলংকারের চেয়ে যাদুর প্রভাবই বেশী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়, অবশ্য মেয়েদের মাথার পিছনে এক গুচ্ছ চুল থাকে, এই চুলে বাঁশের চিরুনী গেঁথে রাখা হয়। চিরুনী নির্মাণে সেমাংদের বিশেষ শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেমাংদের বাসস্থানের কাজ করে এক জাতীয় ভগ্ন-প্রায় কুঁড়ে ঘর—কোন স্থায়ী নিবাস গঠনে ওরা বিশেষ আগ্রহী নয় কারণ ওরা কখনও কোথাও একযোগে দীর্ঘ দিন বসবাস করতে পারে না। অস্থায়ী বসতি গড়ে তোলবার জন্য চারটে শক্ত বাঁশের খুঁটিকে শক্ত করে মাটিতে চার কোণে পুঁতে দেওয়া হয়, চারপাশে থাকে বাঁশের কঞ্চির বেড়া, চাল ছাওয়া হয় নানা জাতীয় পাম-গাছের পাতায়। ঘর তৈরী করবার আগে ওরা উদ্দিষ্ট স্থানটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে নেয়। নির্দিষ্ট স্থানটিতে ওরা আগুন জ্বালে, যদি দেখে যে ধোঁয়া সরাসরি আকাশমার্গে ঋজুরেখ তবেই সে স্থানটিকে বাসযোগ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়। যদি তা না হয়ে সমস্ত ধোঁয়া বনের দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে যেতে থাকে তবে নিকটবর্তী বনে বাঘ আছে চিন্তা করে সত্বর সে স্থানটি পরিত্যাগ করে চলে যায়। কেবল মাত্র বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সেমাংরা গুহাকে বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করে না, যারা মালয়ীদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত এবং বশীভূত তারা উন্নত শ্রেণীর আবাসে বাস করে। এছাড়া মূলত: ওরা নিজেদের ওই বিশেষ শ্রেণীর কুঁড়েতে বাস করাই পছন্দ করে। বর্ণিত আকারের পাঁচ ছটি কুঁড়ে গোল হয়ে স্থানটিকে ঘিরে রাখে—এখানে পাঁচ ছটি পরিবার একত্রে একটি গোষ্ঠীবদ্ধ এলাকা করে বাস করে। কোনরকম মৃৎশিল্প অথবা ধাতুদ্রব্য নির্মাণ ও ব্যবহারের কাজ সেমাংরা জানে না, তবে আজকাল মালয়ীদের প্রভাবে সেমাংরা কোথাও কোথাও ধাতুর ব্যবহার শিখছে। পাথরের কোনরকম যন্ত্রপাতি তৈরীর প্রক্রিয়া

সেমাংদের জানা নয়। তবে ওরা পাথরের হাতুড়ি, ছুরি এবং যন্ত্রে সান দেবার পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সেমাংদের জীবনমান তথা বাস্তব্য সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ হল বাঁশ। কোন একজন বিশেষজ্ঞ এ সম্বন্ধে বলেছেন যে ওরা বাস করে এমন একটি আদিম অবস্থায়, একটি আদিম যুগের আবহাওয়া অথবা পরিমণ্ডলে যাতে বলা চলে যে ওরা বংশযুগীয় অধিবাসী (a primitive age, a bambooage)। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে ওরা বাঁশের ব্যবহার করে। বাঁশ দিয়ে নির্মিত বস্তুনিচয়ের মধ্যে নাম করা যেতে পারে— ব্লোগান, তীর, তূণ, ছোট আকারের বর্শা, বর্শা, বর্শার ফলা, চিরুণী ও পানপাত্র ইত্যাদি। বাঁশ থেকে এক জাতীয় বাক্সও প্রস্তুত করে ওরা। এছাড়া শোবার খাট, ভাসানর ভেলা ইত্যাদির মূলেও আছে ওই বাঁশের ব্যবহার। প্রমোদদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত বাঁশী, ঢোল, বাজানর কাঠি ইত্যাদি সব কিছুই বংশজাত। বাঁশের তৈরী ব্লোগান, তূণ এবং চিরুণী ইত্যাদির উপর বিচিত্র রকমের শিল্পকর্ম করা হয়। এই শিল্পকর্মের মধ্যে একদিকে সেমাংদের বাস্তব জীবনবোধ ও অপরদিকে প্রতীক ব্যবহার এবং রূপকল্প রূপায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়।

খাদ্যসংগ্রহ ও বিতরণের ব্যাপারে যৌথ অধিকার গ্রাহ্য—এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার কোন স্থান নেই। অবশ্য অন্যান্য ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজন ও রক্ষার আইন স্বীকৃত। কয়েকটি পরিবার একত্র হয়ে কয়েকটি বসতি-কেন্দ্রে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করে। খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা সহজ লক্ষ্য, সংগ্রহের পর আহরিত দ্রব্য সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। কাপড়, তূণ, তীর, বর্শা, ছুরি ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এসব জিনিসের ব্যবহারে কোনরকম যৌথ অধিকার স্বীকৃত হয় না। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোক কয়েকটি "উপস" এবং "ডুরিয়ান" গাছের মালিক—এর ওপর অন্য কোন লোকের কোন দাবী থাকতে পারেনা। মেয়েদের সম্পত্তি বলতে কয়েকটি ছোটখাট জিনিসপত্রের উল্লেখ করা যায় এগুলি মেয়েরা নিজেরাই তৈরী করে নেয়—এছাড়া ঘর তৈরীর ব্যাপারে মেয়েদের বিশেষ দক্ষতা রয়েছে বলে বাসস্থানের উপর মেয়েদের বিশেষ অধিকার বর্তায়। ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সরাসরি পুত্রের উপরই আসে স্ত্রীর ভাগে কিছুই পড়ে না—পুত্র না থাকলে সম্পত্তির মালিকানা হয় আত্মীয়স্বজনদের। অনুরূপ ভাবে স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকারও পায় ছেলেমেয়েরা অন্যথায় অর্থাৎ ছেলেমেয়ে না থাকলে তার ভাইবোন সেই সম্পত্তির মালিক হয়। আহরিত বনজ সম্পদ ওরা মালয়ীদের সঙ্গে বিনিময় করে সভ্যজগতের নানারকম জিনিসপত্র পেয়ে থাকে। নেগ্রিটোদের সঙ্গে মালয়ীদের আদানপ্রদানটা পূর্বে একটি বিচিত্র উপায়ে সম্পন্ন হত। উভয়ে উভয়ের ভাষা না বোঝার ফলে বিনিময়টা সাধারণ ভাবে হত না। আহরতি বনজ দ্রব্য এনে সেমাংরা বনের কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে চলে যেত—পরে সময়মত এসে বিনিময়ে মালয়ীদের রেখে যাওয়া জিনিস পেত। এই জাতীয় বিনিময় ব্যবসাকে dumb barter বলা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে এই ব্যবসায় চতুর সভ্য মালয়ীরা নিঃসন্দেহে লাভবান হত এবং আজ সেমাংরা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অমূল্য সম্পদ হারাত।

সেমাংরা সাধারণত ৬,৭টি পরিবার মিলে একস্থানে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করে, এই পরিবারগুলির সভ্যেরা পরস্পর আত্মীয়বন্ধনে সম্পৃক্ত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর শিকার সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা থাকে। পিতাই পরিবার-প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়—পিতৃপ্রাধান্য স্ত্রী ও পুত্রের দ্বারা স্বীকৃত। এছাড়া ৬।৭টি পরিবার-কেন্দ্রিক প্রত্যেক বসতিকেন্দ্রে বৈদ্যের (medicine man shaman) বিশেষ স্থান আছে। সাধারণ ব্যাপারে বৈদ্যের তেমনি কোন ক্ষমতা বা অধিকার না থাকলেও যাদু বিদ্যা ও কয়েকটি আচার-পালনের ব্যাপারে বৈদ্যের ক্ষমতা গ্রাহ্য ও স্বীকৃত হয়। চুরি ডাকাতি ইত্যাদি ব্যাপার সেমাংদের মধ্যে বিশেষ নেই তবু চুরি করলে এবং চোর ধৃত হলে চোরকে হৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বলা হয়,—না দিলে তাকে

উত্তমমধ্যম প্রহার দেওয়া হয়। খুন অথবা ব্যভিচার ইত্যাদির একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।

সেমাংরা সাধারণত শান্তিপূর্ণভাবেই বসবাস করে— অশান্তি অপ্রিয় কলহের পথে বিশেষ পা বাড়ায় না। আর এই শান্তিকে ওরা কেবল নিজেদের মধ্যেই রাখতে পছন্দ করে তা নয়, প্রতিবেশী সেকাই এবং সভ্য মালয়ীদের সঙ্গেও ওরা সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। অবশ্য ওদের এই শান্তিপ্রিয় স্বভাবের সুযোগ নেয় সভ্য ধূর্ত মালয়ীরা সুযোগ পেলেই ওরা ঠকিয়ে নেয় সভ্য ধূর্ত মালয়ীরা, সুযোগ পেলেই ওরা ঠকিয়ে নেয় সরল প্রাণ সেমাংদের। সেমাংরা স্বভাব নম্র এবং লাজুক প্রকৃতির লোক—অতিরিক্ত লাজুক হওয়ার ফলে বিদেশী বা ভ্রমণকারিরা ওদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে না। তবে একবার ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারলে, সহজ হতে পারলে দেখা যাবে যে ওরা স্বতোচ্ছল প্রাণচঞ্চল আবেগপ্রবণ কোমল মধুর স্নিগ্ধ স্বভাবের মানুষ।

সেমাংরা কখনও একে অপরকে নাম ধরে ডাকে না— ডাকে আত্মীয় সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করে। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় দিক থেকেই আত্মীয়সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয়। সন্তান জন্মে পিতার দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্বীকৃত—এবং স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনে এই সন্তান জন্মে এ তথ্য ওরা জ্ঞাত হলেও সন্তান জন্মে ও নামকরণে ওরা একটি বিশেষ পোষিত ধারণানুসারে কাজ করে। ভ্রূণের দেহবিকাশে যৌনসম্বন্ধের অবদান স্বীকৃত, কিন্তু ভ্রূণের আত্মার বিকাশে এই সংগমের তেমন কোন মূল্য নেই। ওদের বিশ্বাস প্রত্যেক ভ্রূণের আত্মা তার জন্মের পূর্বে কোন এক পাখীর মধ্যে অবস্থান করে। স্ত্রীপুরুষের নামকরণ হয় গাছের নামানুসারে। কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হলে সে বাসস্থানের নিকটে কোন গাছের কাছে গিয়ে, যে গাছের নাম অনুসারে তার নিজের নাম হয়েছে, সেই গাছের পাতা ও ফুল ইত্যাদি দিয়ে তার অঙ্গসজ্জা করে। সেই গাছের উপর সেই আত্মাপক্ষী (soul bird) নেমে আসে, এবং তখন তাকে অর্থাৎ সেই আত্মাপক্ষীকে তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়। তারপর গর্ভিণী নারী সেই পাখীকে খেয়ে ফেলে—ওদের বিশ্বাস আত্মাপক্ষী ভোজনে গর্ভস্থ সন্তানের ভ্রূণ-শরীরে আত্মার প্রবেশ ঘটে। এই সময় অর্থাৎ সন্তান জন্মের পূর্ব পর্য্যন্ত গর্ভিণী নারীকে সবরকম কাজকর্মের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক ও ধর্মীয় নিষেধাচার পালন করতে হয়। সন্তানসম্ভবা নারী বন্যবরাহ, মাওয়া বানর, কাঠবিড়ালী, গিরগিটি, টিকটিকি অথবা তীরবদ্ধ কোন প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে না। ঠিক একইভাবে স্ত্রীলোকটির স্বামীকেও এই রকম নিষেধাচার পালন করতে দেখা যায়। সন্তানজন্মনিরোধক নানা প্রক্রিয়া ওদের জানা থাকলেও ওরা কোন সময়ই শিশু হত্যা অথবা গর্ভপাতের চেষ্টা করে না। প্রসব কাজ ব্যাপারটি কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ এক প্রকারের বাঁশের উঁচুবেদীর উপরেই সম্পন্ন হয়। প্রসূতির কাছে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারে না, অন্যদের মধ্যে থাকে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়েরা এবং ধাই। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে ধাই বাঁশের ছুরি দিয়ে জন্মনাড়ী ছেদন করে দেয়, এরপর নবজাতককে স্নান করান হয় গরমজলে, পরে কান বিঁধিয়ে দেওয়া হয় কাঁটা দিয়ে—আর সন্তানের নাম রাখা হয় নিকটস্থ গাছের নামানুসারে। সন্তান জন্মের পর বেশ কিছুদিন "মা" যাবতীয় কাজকর্ম থেকে ছুটি পায়—এ হল তার পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময়। শারীরিক দুর্বলতা দূর করার জন্য "মাকে" উষ্ণ তরল পানীয় দেওয়া হয়। এইভাবে বেশ কিছুদিন বিশ্রামের পর স্ত্রীলোকটি সুস্থবোধ করলে সে আবার কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করে। সন্তানের প্রতি মায়ের অসীম মায়া মমতা, পৃথিবীর প্রায় সব আদিবাসীদের মধ্যে সন্তান প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—সেমাংরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

মা ছেলেকে পিঠে করে কাজকর্ম করে, কখনও বা শুইয়ে রাখে গাছের ডালে বাঁধা দোলনায়—অজস্র চুম্বন আর আদরে মা ভরিয়ে রাখে ছেলেকে। সেমাংরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে, পছন্দ করে ছেলেমেয়েদেরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও দেখতে। পাঁচ

বছর পর্যন্ত শিশু মা বাবার বিছানাতেই শুতে পায়, তারপর থেকে স্বতন্ত্র বিছানায় তার শোবার ব্যবস্থা হয়। একদিকে জীবনযাত্রার দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি, অপরদিকে সংক্রামক যক্ষ্মরোগের প্রকোপ, এই দুইয়ের ফলেই অনেক শিশুকে তার মায়ের কোলে থাকা অবস্থাতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়; এইসব কাটিয়ে যে অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ে বেঁচে ওঠে তাদের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও আত্যন্তিক মায়ামমতা যে থাকবে সে ত জানা কথা। তথাকথিত সভ্যজগতের শিক্ষার মান বা নিরিখে অশিক্ষিত মনে হলেও সেমাং ছেলেমেয়েরা নিজেদের জীবনচর্যা ও প্রয়োগধর্মী কাজকর্মের ব্যাপারে মোটেই কুশিক্ষিত থাকে না। ছোটরা বিশেষ কৌতূহল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ওদের মা-বাবার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের হাবভাব রপ্ত করবার বিশেষ চেষ্টা পায়—মেয়েরা বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে ছোটখাট যন্ত্রপাতি, বাঁশের বাক্স, ফোঁদল, শয়নবেদী ইত্যাদি তৈরী করতে শেখে এবং সমস্ত কাজকর্মে মা ও স্ত্রীলোকদের অনুবর্তিনী হয়। বয়ঃসন্ধি লগ্নে কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান পালনের প্রথা নেই। যৌনাচার সম্পর্কিত, বিশেষজ্ঞ প্রাগ-বিবাহকালীন যৌন সম্বন্ধ সম্পর্কে, তেমন কোন বিধি-নিষেধ সেমাং লোকসমাজে প্রচলিত নেই। তবে বিবাহিত নরনারীর যৌন স্বভাব অত্যন্ত সংযত এবং মার্জিত,—বিবাহোত্তরকালে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হলে তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, পাপের গুরুলঘু বিচারে শাস্তির মাত্রা স্থির হয়, কখনও কখনও এর জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যৌনাচার সম্পর্কিত সংযত আচরণও সেমাং সমাজের লক্ষ্যণীয় বিষয়। দিবামৈথুনের কোন রকম সুযোগ সুবিধা সেমাং জীবনবৃত্তে মেলে না। বিবাহিত পুরুষ সব সময়ই তার শাশুড়ীর সম্পর্ক পরিহার করে চলে—কোন অবস্থাতেই এদের দুজনের কথাবার্তা বলা অথবা পাশাপাশি বসবাস করা চলে না। ঠিক একই পরিহার স্বভাব শ্বশুর এবং পুত্রবধূর মধ্যেও দেখা যায়। এমন কি স্বামী স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক বিচ্ছেদের পরও এই পরিহার, ভাবটা বজায় থাকে। বাবা মেয়ে, মা ও ছেলের মধ্যে এই পরিহার সম্পর্ক রয়েছে—অবশ্য এটা করা হয় সন্তানদের বয়ঃপ্রাপ্তির পর। মনোবিজ্ঞানহীন, বিজ্ঞানঅজ্ঞ সেমাংরা মনে মনে কি ইডিপাস এবং ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স স্বভাবকে লালন করে আসছে।

মেয়েদের বিয়ের বয়স সাধারণত ১৫ থেকে ১৬, ছেলেদের ভাগ্যে বিয়ের সিকে ছেঁড়ে আরও দু'তিন বছর পর। সেমাং-সমাজে বিবাহ ব্যাপার নিতান্ত অনাড়ম্বর, সরল এবং সহজসিদ্ধ, বিবাহে অনীহা ওদের তেমন একটা দেখা যায় না—দু একটা অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ যে নেই তা নয়, তবে "বিয়ে না হওয়া" অথবা "বিয়ে না করা" ওরা মনে প্রাণে অপছন্দ করে। সমাজ সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়বদ্ধ সংস্থা "পরিবার" রচনায় ওরা বিশেষ আগ্রহী। বিয়ের বর কনে সাধারণতঃ নিজেদের দল থেকেই বাছা হয়, তবে প্রয়োজনে প্রতিবেশী দল থেকেও মেয়ে আনা হয়। বিয়েটা সম্পূর্ণ ভাবে বরকণের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে। ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করার পর পাত্র-পাত্রীর বাবার কাছে গিয়ে তার মেয়ের জন্য আবেদন জানায় এবং এ সময় সে কন্যাপণ হিসেবে সঙ্গে কিছু উপহার-সামগ্রীও নিয়ে যায়, এইসঙ্গে মেয়ের কটিবন্ধটিও সঙ্গে নিতে ভোলে না। তারপর একটি নির্দিষ্ট দিন স্থির করে সমবেত অতিথিদের ভোজ-উৎসবে আপ্যায়িত করে বর কনেকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রস্থান করে। তাদের মধুযামিনী যাপন হয় এই বনাভ্যন্তরে। এখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত আপন হয়ে নিভৃতে দুটি কপোত-কপোতীর মত দিন যাপন করে তারা। ঘর বাঁধে তারা চার হাতের চমৎকারিত্বে, জল আনে তারা বনের নদীতে ছলছল কলকল ধ্বনি তুলতে তুলতে, খাবার দাবার জোগাড় করে দু'জনে হেসে খেলে খায়, উপভোগ করে একটুকু বাসার একটুকু সুখ। এইভাবে ঐ সুখের নীড়ে নবাবিবাহিত দম্পতি প্রেমের আনুসঙ্গিক

সমস্ত কর্মাচারই সম্পন্ন করবার পর বনের বাইরে আসে, যোগ 'দের গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার তালে। এরপর বেশ কিছুদিন, সাধারণতঃ এক বা দুই বৎসর পাত্রকে স্ত্রীর গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করতে হয়, করতে হয় শ্বশুরমশাইয়ের কাজ, অথবা নানা কাজে নানা সাহায্য। তারপর যথানিয়মে স্ত্রী তার স্বামীর ঘর করতে আসে। আইনত একবিবাহপন্থী সেমাং দুই বা বহু বিবাহের নিন্দা করে না, এটাকে শুধু অপরাধের কাজ বলে। তবে একাধিক বিবাহের ব্যাপারে পাত্রী সংগ্রহে অন্য দলের কাছে যেতে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদটাও একটা সাধারণ ব্যাপার, বিশেষত পুত্রকন্যাহীন দম্পতির ক্ষেত্রে যে কোন পক্ষ থেকেই বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক কাজ হয় স্বামীর গৃহত্যাগের মাধ্যমে, গৃহের মালিকানা স্ত্রীর। যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে তবে তার পিতাকে বিবাহকালীন উপহার বা সেই মূল্যের কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে। সন্তান সন্ততিরা সাধারণত মায়ের কাছেই থাকে।

সেমাংসমাজে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট মর্যাদা আছে। বাপের বাড়ী অথবা স্বামীর ঘর—কোথাও তাদের ওপর কোন অত্যাচার করা হয়না। নানা রকম কাজে অংশ-গ্রহণ করলেও স্ত্রীসুলভ কমনীয় কাজের ভারই তাদের উপর দেওয়া হয় এবং সেই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু বিশেষ অধিকারও তারা ভোগ করে থাকে। ঘর বাঁধবার দায়িত্ব যেমন মেয়েদের, মালিকানাও তেমনি তাদের থাকে। বিভিন্নকাজে পুরুষকে সাহায্য করা ছাড়া বীজ বপন, মূলকর্তন, রন্ধন, সন্তান-পালন এবং অন্যান্য কাজ যেমন মাদুর ও বাক্স তৈরী করা, বাসস্থান নির্মাণ করা ইত্যাদি সব কাজ মেয়েরা করে থাকে। পুরুষদের প্রধান কাজ হল শিকার, জাল তৈরী করা মাছধরা, ফল এবং অগ্নিকাষ্ঠ সংগ্রহ করা; অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও সজ্জা করা ইত্যাদি কাজও পুরুষের। সেমাং জনগোষ্ঠীতে স্ত্রীলোক যথেষ্ট স্নেহ ও সম্মানে লালিত হয়।

বয়স্কদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। বয়সের ভারে ন্যুব্জ বা ক্লান্ত বর্ষীয়ান মানুষকে কখনই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয় না। স্বভাবের কমনীয়তা এবং মাতাপিতা তথা গুরুজনদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাভাবের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে সেমাং যুবক যুবতীদের বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা বাবা মা অথবা আত্মীয়দের ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়িয়ে কাজকর্ম করতে দেখলে। দুর্বল, অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তিকে অত্যাচার করা দূরে থাক কটুকথাও কখনও ওরা বলেনা।

সেমাংদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, কোন অসুখ অথবা মৃত্যু, সবকিছুরই পশ্চাতে আছে কোন এক অজ্ঞাত যাদুশক্তি অথবা অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। কেবলমাত্র যাদুশক্তির প্রভাবে কোন লোক তার শত্রুর বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে পারে, প্রেতাত্মার শক্তিসঞ্চয় করে অলৌকিক ব্যাপার ঘটান যায়। এইসব কাজের আরও সুবিধা হয় যদি সে তার শত্রুর কোন ব্যক্তিগত জিনিস, যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে কটিবন্ধ সংগ্রহ করতে পারে। সংগৃহীত বস্তু ও মন্ত্রবলের সাহায্যে এই যাদুকর্ম সমাধা হয়।

শরীরের নানাস্থানে রঞ্জনদ্রব্য ব্যবহারের দ্বারা অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাবার একটা চেষ্টা দেখা যায়; ফুল পাতা দিয়ে মাথা সাজিয়ে ঘোরাফেরা করলে বৃক্ষপতনের অপঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্তঃসত্তা নারী "তাহোং" ২ অর্থাৎ বাঁশের ছোট্ট নল তার কটিবস্ত্রের অভ্যন্তর অংশে লুকিয়ে রাখে এতে করে বমি ও গা-ঘোলোনো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নলের গায়ে থাকে দাগকাটা শ্রেণীবিভাগ: এই দাগগুলির মাধ্যমে পেটে সন্তান আসার পর থেকে জন্মপর্যন্ত পরিবর্দ্ধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একরকম ম্যাজিক চিরুণী পরার প্রথাও মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত আছে। চিরুনীর সংখ্যা একযোগে একাধিক হয়। আটটা চিরুনী ব্যবহার করার সময় দুটোর মুখ উঁচু করা এবং দুটোর নীচু করা, এই অবস্থায় সাজান থাকে। চিরুনী রংত্রে ব্যবহার করা হয়না। মৃত্যুর পর চিরুনীগুলিকে স্ত্রীলোকটির সঙ্গেই কবর দেওয়া হয়—ওদের ধারণা, জীবিত অবস্থায় চিরুনী-

গুলি স্ত্রীলোকটিকে নানা রোগ শোক দুঃখযন্ত্রণা থেকে রক্ষা ও সান্ত্বনা দিয়েছে, মৃত্যুর পরও এগুলি অনুরূপ সহায়কেরই কাজ করে যাবে।

সেমাংজনগোষ্ঠীতে বিশেষ মর্যাদার পাত্র হল সামান অর্থাৎ ওঝা। তার পোশাকে অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে পার্থক্য দেখা যায়—তাকে পালন করতে হয় কয়েকটি বিশেষ নিষেধাচার, তার হাতে থাকে যাদুদণ্ড এবং তার কবরের বেলাতেও একটি বিশেষ আচার পালিত হয়। ওঝার কাজ বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। একখণ্ড ম্যাজিক পাথর, স্ফটিক ও যাদুদণ্ড নিয়ে ওঝা সবসময় নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, ওঝা বহুব্যাপারে লোকজনকে আসন্ন বিপদ থেকে সচেতন করে দেয়—সে বুঝতে পারে নিকটে কোথায় বাঘ রয়েছে, প্রয়োজনে গোষ্ঠীর লোককে সে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করে। নানারকম যাদুবিদ্যায় তার সবিশেষ অধিকার—সে জানে বাঁশের কাজ, সে পারে অটুট প্রেমসম্পর্ক গড়ে তুলতে কেবলমাত্র জঙ্গলীফুলের যাদুতে। সে অশরীরি আত্মার সঙ্গে অলৌকিক কথাবার্তা বলতে পারে। সেমাংদের ধারণা যে কোন রোগের পশ্চাতে আছে প্রেতশক্তির প্রভাব—এই প্রেতশক্তি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে রোগহিসেবে প্রকাশ লাভ করে। সামানের পক্ষেই প্রেতশক্তির প্রবেশকারণ-তথ্য জানা সম্ভব। এই কাজ করবার জন্য তার নির্জনতা ও স্বতন্ত্র পুরের প্রয়োজন হয়। সেখানে তার কাজের উপাদান হল স্ফটিকমনি, ম্যাসাজ ও নানাপ্রকারের ঔষুধপত্তর। সামানরা সামাজিক সম্মানও যথেষ্ট পায়। পৃথিবীর বহু অধিবাসীর মধ্যেই ওঝার এই স্বতন্ত্র সম্মান ও স্থান পরিলক্ষিত হয়।

সেমাংদের বিশ্বাস মানুষের মত পশুদেরও আত্মা আছে—পশু, পাখী, মাছ, সবকিছুরই শরীরাভ্যন্তরে এই আত্মার অবস্থান। মানুষের আত্মা হল মানুষের ক্ষুদ্র একটি রূপায়তন—কেবল এটি অত্যন্ত বেশী রকমের লাল হয়। ঘুমের সময় এই আত্মা দেহত্যাগ করে ভ্রমণে বের হয়—তারপর সর্বত্র ঘুরেফিরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং এই সব অভিজ্ঞতাই মানুষ স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পায়। সেমাংদের জীবনে স্বপ্ন তাই কেবল অলীক বস্তু নয়, এর একটা বাস্তবভিত্তিও আছে, জীবনের অনেককিছু নির্ভর করে এই স্বপ্নদর্শন ব্যাপারের উপর। নেগ্রিটোরা বলে যে: যদি স্বপ্নে দেখি যে একটা শূকর আমি বধ করেছি তবে সেই স্বপ্নকে সত্য পরিণত করার জন্য পরদিন সকালে সেই শূকরকে খুঁজে বার করে তাকে হত্যা করব। "আত্মা" দেহের খাঁচায় বদ্ধ এমন চেতনা সভ্যজগতের জ্ঞানের খাতায় (৩) লেখা আছে। পূর্বে সেমাংরা মৃতদেহ খেয়ে ফেলত (৩) কেবল মাথাটা মাটিতে পুঁতে দিত। তবে বর্ত্তমানে ওরা গোটা শরীরটাকেই কবর দেয়। প্রতিবেশী সেকাই অথবা জাকুনদের মত ওদের মৃতের আত্মা বা ভূতের সম্পর্কে বিশেষ ভয় নেই। মৃত্যুর পর আনুসঙ্গিক কাজের সময় যথাবিহিত মৌনতা পালন করা হয়। মাদুরে মুড়ে মৃতের মাথা অস্তমান সূর্যমুখী করে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। কবরের পাশে জ্বালা হয় আগুন। মৃতের পাশে রাখা পাত্র থেকে মৃতের মুখে এবং কবরে জল নিক্ষেপ করা হয়—যাতে আত্মা মৃত্যুর পরও পিপাসায় কাতর না হয় ঠিক একই কারণে খাদ্যও মৃতের মুখে এবং কবরের অভ্যন্তরে অর্পণ করা হয়। এরপর মৃতের পরিবারের সকলে সে স্থান ত্যাগ করে নদী বা ঝর্ণার অপর পারে গিয়ে নোতুন নিবাস নির্মাণ করে। ওদের বিশ্বাস প্রেত কখনও জলবিভাজিকা অতিক্রম করতে পারেনা। সভ্যজাতিদের প্রেতবিশ্বাসের মধ্যেও অনুরূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনরা কান্নাকাটি করে নিজেদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করে। এসময় নৃত্য গীত এবং সর্বপ্রকার অলংকরণ নিষিদ্ধ। যে পক্ষে মৃত্যু হয় তার শেষ দিনে শবাচার পর্ব শেষ হয় এবং সকলে একটা ভোজ ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ জীবনযাত্রায় ফিরে আসে।

নেগ্রিটোদের বিশ্বাস যে মৃতের আত্মা রাতের আঁধারে আবার তার পূর্ববাসস্থানে ফিরে আসে পাখীর রূপ নিয়ে। বিশেষত: অবিবাহিতদের অতৃপ্ত আত্মা মারমুখী স্বভাব নিয়েই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়—তাদের সেই অবস্থানের প্রকাশ ঘটে নিশান্ধকারের উদ্বেলিত চিৎকারের মধ্যে,

নিঃসীম আর্তধ্বনি আর হাহাকারের মধ্যে। তখন নেগ্রিটোরা আলো নিভিয়ে পরস্পর পরস্পরের বড় কাছাকাছি হয়ে শুয়ে থাকে। নানারকম ভূতপ্রেতে বিশ্বাস থাকা ছাড়াও সেমাংদের নানারকম দেবতার ওপর বিশ্বাস আছে। ওদের সবচেয়ে শ্রদ্ধাশীল দেবতা হল "করেই" (Karei) করেই হল বজ্র-দেবতা। করেই হল অকায় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান দেবতা—এ দেবতার মধ্যে ঘটেছে ভীমকান্ত রূপের প্রকাশ। একই দেবতা তাদের সুখ এবং দুঃখের কারণ হতে পারেন। করেইয়ের রোষবহ্নির প্রকাশ ঘটে ঝড় বিদ্যুতের লীলাচাপল্যে, পাপ করলে শাস্তি নেমে আসবে করেইয়ের কাছ থেকে। পাপ হল নিষেধাচার লংঘন। সেই পাপ চুরিতে নয় অথবা হত্যায় নয়, তা হয় শাশুড়ীতে আসক্ত হলে অথবা কয়েকটা বিশেষ পাখী হত্যা করলে, পালিত পশুর প্রতি অত্যাচার করলে, দিবা-মৈথুনে ব্যাপ্ত হলে, আগুনে পোড়া কালিমাখা পাত্রে জল আনলে, পাখীর ডিম নিয়ে খেলায় মত্ত হলে, অথবা বজ্রপাত বা শবাচারের সময় মাথায় চিরুনীর সাজ করলে, অথবা ভরসকালে বর্শা ছুঁড়লে, যা কেবল বিকেলেই ছোঁড়া যায়। এসব পাপের প্রকাশ ঘটে আকাশে ধ্বনিত বজ্র নির্ঘোষের মধ্যে—করেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে "তোমরা পাপ করেছ—সাবধান হও"। তখন ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে রক্তোৎসর্গের মধ্য দিয়ে করেইকে নিবৃত্ত করতে হয়। বাঁশের নলে তাজারক্ত ও জল মিশিয়ে মিশ্রিত বস্তু রোষকম্পিত বজ্রদেবের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে "রক্ষ! রক্ষ!"—কাতর প্রার্থনা জানায় পাপমুক্তির। সেমাং ধর্মীয় চেতনার একটি মূল আকার এটি। সংক্ষেপে এই হল সেমাংদের দিন গুজরাণের কাহিনী, ওদের অস্তিত্বের বিবরণ।

কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ? ওদের আগামী সম্ভাবনা? ভবিষ্যৎ কে বলতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎ ছাড়া, শুধু এইটুকু বলা যায়:

ধীরে ধীরে সভ্যতার নগ্ন হাত হয়ত ওদের পুরোপুরি মগ্ন করে ফেলবে, সময়ের কামড় তার বিষকে শিরায় শিরায় পৌঁছে দেবে ওদের, তারপর একদিন হয়ত পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকেই লুপ্ত হয়ে যাবে ওরা যেমন গেছে জাভামানুষ, সিনানথ্রোপাস, পিথাকানথ্রোপাস, নিয়ানডারথাল ইত্যাদি প্রাচীন মানুষের দল। আজকের পৃথিবীতে বাস করলেও সেমাংরা অতীতের জীবনধারা নিয়ে চলেছে, এতদিন চলে এসেছে, কিন্তু বিবর্তনের ধারাকে রুখে আর কতদিন ওরা এমনভাবে প্রাচীন জীবন ধারণা নিয়ে চলবে বলা শক্ত, ওদিকে সভ্যতাও তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দুবাহু বাড়িয়ে ছুটে আসছে, সভ্যতার সর্বগ্রাসী ক্ষমতার চাপে ওরা ওদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ভুলে হয়ত পুরো মিশে যাবে, সমীকৃত হবে আধুনিকতার সঙ্গে—ওদের ভাষা, ওদের আচার ব্যবহার, ওদের শিরায় তাজা রক্ত আর ওদের স্বভাব, সরলতা ও সততা, প্রাচীন ইতিহাসের চিহ্ন হয়ে বর্ণের হরিৎপাতায় মিলিয়ে যাবে। সভ্যতা হামগুড়ি দিয়ে ওদের জঙ্গলাভূমিতে প্রবেশ করেছে—তারপর ধীরে মজিয়েছে ওদের নেশায়, জুগিয়েছে তার আফিম; চাকচিক্যে ভুলে হয়ত ওরা স্বর্ণলতার মত বিদেশীদের নেকনজরের ওপর জীবন দেবে সঁপে—ধীরে ধীরে ভুলে যাবে ওদের সংস্কৃতি, ওদের বেদনার ভাষাকে। শেষ সেমাংয়ের গানে স্যার হিউ ক্লিফোর্ড ওদেরই হয়ে এই কথাটি ঘোষণা করেছেন:—

ব্যথা পাই সেও ভালো
যদি শুধু রেখে দাও কিছু বনভূমি
মাত্র কিছুদিন, ঝরিবার আগে
অবশিষ্ট ভগ্নস্মৃতি প্রাচীন জাতির
আজ যারা পথহারা পৃথিবীর পথে!

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

একটি স্মরণীয় দিনে আমরা বৈতানিকের আসরে সমবেত হয়েছি। অমর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আজকের তারিখে ৯৮ বৎসর আগে জোড়াসাঁকোর বিশ্ববিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেদিন কৃষ্টির সম্পদ সমৃদ্ধ করার জন্য রসরাজের আবির্ভাব হয়েছিল সেই দিনটি মনে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য, তাই আজকের অনুষ্ঠানে উৎসবের আয়োজন।

এই প্রসঙ্গে কিছু বলার এবং জিজ্ঞাস্য আছে। যে শিল্পীর অবদান প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, রসিককে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে, সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের স্বীকৃতি, কি কেবল বৎসরে একটি দিন আলাদা করে রাখলে শেষ হয়ে যায়? উৎসবের প্রয়োজনে কতকগুলি বাছাই করা স্তুতি-বাক্য শিল্পীর উপর প্রয়োগ করলেই তাঁহার রূপ-পরিকল্পনা ও প্রকাশভঙ্গীতে সুন্দরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব? ছবির সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলেই কথাটা উঠল। তবে টিকা আমদানী আধুনিকতার আদর্শ যদি সুন্দরের বিচারে দত্ত প্রত্যাশার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তাহলে বিচারের মানদণ্ড সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উপস্থিত বাকযুদ্ধে যুক্তিকাটাকাটির অবসর নেই। সুতরাং আমার বলার কথা বলে নি।

মনে রাখার সঙ্গে শ্রদ্ধার যোগ থাকায় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যের তুলনায় দেখি, দেবতার পূজাতেও বহুক্ষেত্রে এইরূপ নির্লিপ্ততার চলন আছে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেমন পূজাতেও উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে, সেখানেও ফুল চন্দন ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর সংগ্রহ করা হয় অর্ঘ্যকে নিখুঁৎ করার জন্য। কিন্তু আড়ম্বর যেভাবেই যোগাড় হোক, পূজার সঙ্গে ভক্তের আন্তরিক যোগ না থাকলে, আঁটসাঁট পোষাকি ভাষায় মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র, এই সময় ভক্ত থাকে আত্মপ্রতারণায় ব্যস্ত। অপর দিকে গতানুগতিক প্রথায় মন্ত্রকে ভুলে ভঙ্গিয়ে পুরোহিত পান দক্ষিণা।

পূজার দৃষ্টান্ত সামনে থাকায় প্রতিষ্ঠাকামী শিল্প-সমালোচক যদি পুরোহিতের মত আপন স্বার্থকে লাভজনক ব্যবসায় দাঁড় করাতে চায়, পুঁথিগত বিদ্যার দম্ভে রস-বিশ্লেষণে যথেচ্ছ কাটাই-ছাঁটাই চলে, অথবা পক্ষপাতিত্বের টানে বাছাই করা বিশেষণ অপাত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে ছবি বোঝানর সাহায্য অপেক্ষা বিঘ্নই সৃষ্টি করে বেশী। ততোধিক অবাঞ্ছনীয় জিনিষ ঘটে অপ্রাসঙ্গিক তথ্যকথা অবোধ্য হওয়ার জন্য। ফলে দম্ভের দাপট নিরীহকে বিভ্রান্ত করে ছাড়ে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার বদহজম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কেমন করে? অনুসন্ধিৎসু রসগ্রাহীর অবচেতন মনকে কি ভাবে ছবির গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতন করা যায়, কি ভাবে স্বাধীন চিন্তার দ্বারা ব্যক্তিগত রুচি গড়ে তোলা সম্ভব। ব্যক্তিগত রুচির উল্লেখে আমি সেই বিচারশক্তির কথা বলতে চেয়েছি যা বিভিন্ন ছবির তুলনামূলক গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচারককে চিন্তাশীল করে তোলে, ছবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় বিচারক কেবল প্রকাশভঙ্গীর বিশ্লেষণ করে না সুন্দরের সন্ধান পেলে আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে।

ছবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে হলে, সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসা দরকার, কেবল সমালোচনা পড়ে বা বক্তৃতা শুনে ছবির অন্তর্নিহিত গুণকে উপলব্ধি করার উপায় নেই। যদি থাকত তাহলে পাকপ্রণালীর বর্ণনা পড়লেই ভোজনবিলাসীর রসনা তৃপ্ত হোতো।

ছবির বক্তব্য বিষয় যাই হোক তার প্রকাশভঙ্গীতে

তারতম্য আছে। এইখানে নক্সার রূপ ও রং-এর বিন্যাস যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তা নানা প্রভাবে অনুপ্রেরিত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা এখন সম্ভব নয়।

অবনীন্দ্রনাথের অবদানে বৈশিষ্ট্য আছে যা সাধারণের তুলনায় পৃথক। সুতরাং বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে তাঁহার আঁকা ছবির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের দরকার। এই সুবিধা আমরা পাই কেমন করে? তর্কের প্রয়োজনে অনেকে প্রশ্ন করেন, রূপসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি আনন্দ পাওয়া ও দেওয়া তাহলে আনন্দের সূত্র ও প্রকাশভঙ্গীর স্তরভেদ নিয়ে মাথা ঘামানর প্রয়োজনীয়তা আসে কেন? এ বিষয় আমাদেরও চিন্তার অন্ত নেই। বড় রাস্তায় বা অলিগলির ফুটপাথে যখন চলন্ত তারকার রঙীন ফোটোয় হৃদয় কাটান কটাক্ষ, পথিককে ডাক দিতে থাকে তখন সাড়া দেবার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসে সস্তায় রূপসীর সান্নিধ্য লাভের জন্য, উদ্দেশ্য থাকে ছাপান ছবির অসাড় দৃষ্টিতে সিনেমায়-দেখা সচল নারীকে নিকটে পাওয়া। যারা এই জাতীয় আনন্দে সন্তুষ্ট তারা সাধারণ, মনের প্রসার নেই, দৈন্যের পূজায় তারা আত্মহারা। দীনকে কৃপা করা চলে কিন্তু দৈন্যের পূজায় অভাব বাড়তেই থাক। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে থাকে শিল্পীর পরিকল্পনার রূপায়িত উচ্ছ্বাস—কারণ ফোটোর স্রষ্টা যন্ত্র-মন্ত্রের কোন অনুভূতি নেই, শিল্পীর স্থান এখানে কোথায়। তুলনার কথা টেনে আরো বলি অবনীন্দ্রনাথের আঁকাছবিতে সাধারণ বা সস্তার কোন অভাব নেই। পুরাতন ঘরোয়ানা আদর্শকেই নতুনের রূপ দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুন্দরের সন্ধানে ঘুরেছিলেন। রস বিতরণের প্রথা কোন ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাৎসরিক প্রদর্শনী-গৃহে দেখেছি, চিত্র-প্রদর্শনী কক্ষে তাঁহার ছবির সংস্পর্শে এসে নতুনকে জানার কৌতূহল জনসাধারণ দমন করতে পারে নি। অনেককে ভালমন্দের বিচারের প্রশ্ন করতে শুনেছি। যার সঙ্গে আড়াল দেওয়া শ্লেষের কোন যোগ ছিল না। এ থেকে প্রমাণ হয়, উপযুক্ত সুবিধা দিলে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে অনেকের মনের মিল ঘটত, চিন্তাজড়িত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শিল্পীর কলানিপুণতার বৈশিষ্ট্য বোঝাও সহজ হয়ে আসত। কিন্তু বৎসরান্তে মাত্র কয়েকটি দিন উৎসবের ভীড়ে ছবি দেখার অজুহাতে মেলামেশার তাগিদ থাকে বেশি। তার সঙ্গে শাড়ী ও রুজের তারিফ চলে কম নয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, প্রদর্শনী-কক্ষ fashion parade এর একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমার শেষ বক্তব্য, অবনীন্দ্রনাথের যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি সংগ্রহ করে একটি বিশিষ্ট চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা হোক্, যেমন ফরাসীরা রোদাঁ Museum এর প্রতিষ্ঠা করেছে। দেবতার মন্দিরে স্থান দিয়েছে রোদাঁর বহুমূর্তি শিল্পীকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেবার জন্যই। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বাসনা জনসাধারণ নিজের করে নেবেন এবং যিনি দেশের কৃষ্টির সম্পদ বাড়িয়ে গেছেন তাঁর কাজের সংস্পর্শে এসে জনসাধারণ লাভবান হবে।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ভাষণ।

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী
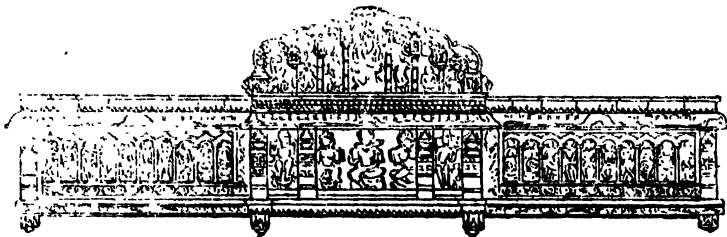
অবার সামনে এসে দাড়ান গদায়ের দাদা চন্দ্রমোহনবাবু। ভদ্রলোকের পানাসক্তির কথা সর্ব্বজনবিদিত হলেও ব্যবহার যেন এঁদের মধ্যে সহজ। তিনি মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি সামনে বসলে গদায়ের শাশুড়ীর গলায় খাবার আটকে যাবে মা—যা গলায় পা দিয়ে পঁচিশ ভরির চন্দ্রহার আদায় করেছ তুমি। ভবতারিণী বলেন, শুনছো বেয়ান চাঁদুর কথা? প্রভা বিব্রত হয়ে আঁচলে মুখ মোছেন নিজেদের অন্যায়জনক ঘটনা এঁরা নিজেরাই সগৌরবে বলে বেড়ান। সত্যিই মানবমন বিচিত্র। কতকষ্টে যে এই চন্দ্রহার দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশী জানে অনুরাণী। তাই শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরে প্রভাকে বলেছিল "জানো মা বৌভাতের দিনে সকলকে সব গয়না দেখিয়ে আমার ননদ তো হীরেকে জিরে বলে বলে বর্ণনা করলেন। সবচেয়ে দামী গয়নাটিতো পরে চেপে বসে আছি—। উঠেতো আর সকলকে চন্দ্রহার দেখাতে পারি না। তোমার জামাই আবার ঐ চন্দ্রহার দেখে বলে "কী বিচ্ছিরি সেকেলে গয়না, ও আবার মানুষে পরে?" আমি বল্লুম তুমি অন্ততঃ ও কথাটা বোলোনা; ওটা হচ্ছে আমার গেট-পাশ তোমাদের বাড়ী ঢোকার। আবার আমার জা বলে জানো "ওটা আমিই বুদ্ধি করে আদায় করে দিয়েছি"—কি আশ্চর্য্য মানুষ মা ওরা? ভাবছে আমার বাপমার ওপর চাপ দিয়ে আদায় করে দিয়ে আমাকেই খুসী কর্ব্বে। ওরা শুধু সোনা রূপোই চেনে মা সোনা রূপোকেই ভালোবাসে মানুষকে ভালবাসতে ওরা জানে না। এই ঘটনায় আরও একটি বেদনাদায়ক কথা অনুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। শান্ত চাপা ধরণের গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে সব আঘাত সব বেদনা সে মায়ের কাছে আড়াল করে রাখতো। তবু তা সেদিন সে পারেনি, বলে জানো মা তোমার জামাই ত সকালে ঘুম ভাঙ্গলে একবারে ঠাকুরদালানে গিয়ে ঠাকুরের মুখদেখে তাহলে নাকি সারা দিনটা ভালো যায়। আমি ত তা জানিনা—ও ঘুমুচ্ছিল, ঘরে চাবী আনতে গিয়ে মজা করে ওকে ডেকেছি, জানো মা। ও কী রাগ কর্চ্ছিল, বল্লে দিলে ত সকালে মুখটি দেখিয়ে, সারা দিনটা আমার নষ্ট করে?" বলতে বলতে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুর সে কী কান্না। ঘটনাটা প্রভার মনে গভীর নাড়া দিলো, মনে পড়লো কত কথা—এই উদাসীন অধ্যাপকমশাই কবে তাকে বলেছিলেন "প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু দিন যাবে মোর ভালো।" আজ যেন প্রভা ভালো করে বুঝলো সাধারণ ভেবে সে যা গ্রহণ করেছে তা সাধারণ নয় কত অসাধারণ।" ততক্ষণে অনু চোখ মুছে উঠেছে, বলছে জানো মা সে কী রাগ? সেদিন রাতে ঘরে শুতে অবধি এলোনা। পরে বর্ম্মে দালদার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সত্যিই নাকি সেদিনটা ওর ভালো যায় নি। বলেছে আর কক্ষনো না যেন ও রকম সকালে মুখ দেখিও না।" মেয়ের সেই কান্নাভরা মুখ কখনো ভুলতে পারেনি প্রভা। ঐ মুখে হাসি দেখার আশায় এই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বিয়ে দেওয়া। আর যে যেমন দেখতেই হোক পরস্পর পরস্পরের ঐ দুটি মুখের তুলনা জগতে খুঁজে পায়না। যা নিয়ে বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্যই রচনা হয়ে গেছে।

সেই প্রিয়তমের কাছে মুখের এ অনাদর সহনীয় নয়। একবারও গদাই ভাবেনা তার জন্যে অনু কত ছেড়েছে। ঐ অনু যে সুরতে ফিরতে গানেরকলি গাইত। যার গান শুনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাকে ঝরণা বলে ডাকতেন। বলতেন "ওর গান স্বতস্ফূর্ত্ত—তাই অত সুন্দর"। শান্তি-নিকেতনে থাকাকালীন এক-একটা উৎসবে অনু সাত খানা গান গেয়েছে। কোন গান একবার শুনলেই হত। টেপ-রেকর্ডের মত তা গেঁথে যেত অনুর মনে। অনুর দাদু শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাঁর কাছে কিছুদিন থাকার সৌভাগ্য অনুর হয়েছিল। ঐ সামান্য কদিন সেখানে থেকেই সঙ্গীতে ও চিত্রাঙ্কনে অনু বিশেষ পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিল। অনুর ক্লান্তিভরা মুখখানার দিকে চেয়ে প্রভার বারে বারে সেই প্রাণোচ্ছলা শিশু অনুর জন্য মনকেমন করে। সেই অনু যার চলার মধ্যে নাচার ভঙ্গী, কথায় ছিল গানের সুর, এসব যেন তার সহজাত ছিল। যেমনি তীক্ষ্ণ মেধা ছিল অনুর তেমনি ছিল আনন্দ প্রতিমা মূর্ত্তি। চিরকাল সকলের কাছে যে আদর পেয়ে এসেছে সে যদি আজ স্বামীর কাছেও অনা-দর পায় বাঁচবে কী করে? মায়ের মনে নানা আকাঙ্ক্ষা নানা ভয়। একই বাপ মার চেষ্টায় একই রকম অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে দুবোনের কিন্তু ভাগ্য-দোষে একি বিপর্য্যয় ঘটলো?

একই দিনে দুখানা চিঠি পেলো প্রভা। একটা অনু-পমার একটা নিরুপমার। দুটি চিঠিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুর। নিরুপমার চিঠিতে আনন্দ যেন ধরেনা—লিখেছে জানোমা আমরা সবাই পিকনিক করতে গেছলুম হংসেশ্-রীর মন্দিরে—নতুন জামাই নিয়ে যাওয়া তো খুব সমা-রোহ—কী আনন্দে যে কাটছে না মা কি লিখবো তোমায়! আমাদের গোঁড়া বাড়ীতে বৌদের পিকনিকে যাওয়ার নাকি আইন ছিলনা—যেইনা শ্যাম শুনেছে আমি যাবোনা, বলেছে আমিও তাহলে যাবোনা বৌদি। বেচারা ছেলেমানুষ ও বাড়ীতে পড়ে থাকবে আমরা আনন্দ করতে যাবো সে কী করে হয়? তখুনি মা বললেন, না বৌমা তুমি যাও। যে কালের য সেকালের তা, আমাদের যুগ কেটে গেছে কাজেই মহানন্দে আমরা পিকনিক করতে গেলুম সঙ্গে আমাদের হারুদাও ছিলেন। সারা রাস্তা শুধু গান গাওয়া আর খাওয়া। আমার অনুটার জন্যে মন কেমন কচ্ছিল। ওমা গান গাইতে পারে একাই জমিয়ে রাখতো? হ্যাঁ মা অনুর শ্বশুরবাড়ীতে নাকি গান গাওয়া বারণ? ওর অর্গান নাকি ওরা তোমায় ফেরৎ দিয়েছে? সত্যি শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। গানই অনুর জীবন গান শুনলে ক্ষিদে তেষ্টা মনে থাকে না ওর তাইত দিদি ওকে বুলবুলি পাখী বলে ডাকতেন। জানো মা বিনুর সঙ্গে আমারও একটা নতুন জর্জেট ভেলভেটের সাড়ী হয়েছে—একসঙ্গে মিলিয়ে পরব বলে। অনেক গল্প জমেছে তোমার জন্যে। যেদিন যাবো বলবো।" আজ এখানেই শেষ করি নিচে কে ম্যাজিক দেখাতে এসেছে, ননদ দেওর ডাকাডাকি জুড়ে দিয়েছে। প্রণাম নিও। তোমাদের নিরু।

এরই সঙ্গে অনুর চিঠি এসেছে। মা! তুমি অত চিঠি লিখো না, এখানে চিঠি এলে সবাই রাগ করে। জানি আসা বন্ধ, ফোন করা বন্ধ, আবার চিঠি লেখাও বন্ধ হলে তোমার মনে কত কষ্ট হবে। কিন্তু সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। তোমার সেই এক চিঠিই সাত জনে সাতরকম মানে কর্ব্বে। আমার ভালো লাগেনা। তোমাদের নিয়ে কেউ কিছু বললে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি অমন দুঃখ করে কেন চিঠি লিখেছ মা, কেন আমার সব দুঃখের জন্য তুমি নিজেকে দায়ী করো? সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে নইলে দিদিও তো শ্বশুরবাড়ীতে আছে, তাকে ত কেউ এরকম কথা শোনায় না। লক্ষ্মীটি মা, তুমি মন খারাপ কোর না। তুমি মন খারাপ করে আছ ভাবলে আমি যে এসব সইবার শক্তিও পাইনা মা। তুমি ত জানো যত দুঃখই এরা আমায় দিক তা শান্ত হয়ে মেনে নিতে আমি পারি। শুধু পারিনা তুমি আর বাপী কষ্ট পাচ্ছ ভাবলে। কথা শোনানো এদের স্বভাব। কাজেই সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি বলো? এইত বটঠাকুর বল্লেন আমরা কাপড়চোপড় বুঝিনা, পুজোর

সময় একটা গয়না আদায় কর্বে বাপমার কাছ থেকে। তুমি হয়তো থালা বাটি বেচে পয়সা গড়াতে ছুটবে কিন্তু তা কোরোনা। যা দিদিকে দেবে তাই আমায় দেবে— ওরা দুটো কথা বলবে এই ত নয়। লক্ষ্মীটি মা, তুমি নিজেকে দায়ী মনে করে কষ্ট পেওনা। আমার কপালে যা আছে আমায় মেনে নিতেই হবে। আজ এখানেই শেষ করি। আজ আমাদের বিশ্বকর্মা পুজো অনেক কাজ— এখন আর লেখার সময় নেই তোমরা কেমন আছ?

তোমার অনুমা

চিঠি দুখানা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে প্রভা। এর মধ্যে খবর এসেছে অনু নাকি সন্তানসম্ভবা। ঐ ত বাড়ী নিত্যি উপোস এ পোয়াতি মেয়ে নিয়ে কী যে কপালে আছে কে জানে? ওর শাশুড়ীর নাকি চোদ্দটি সন্তান তার চারটি মাত্র জীবিত আছে। ওভাবে সন্তান ধারণের মূল্য কি? সে তো কুকুর বেড়ালেরও ছানা-পোনা হয়। নানা ভাবনায় মন তোলপাড় করে প্রভার। এ কি নিরুপমার শ্বশুরবাড়ী, অসুখ হলে সেবা যত্ন যথেষ্টই হবে। আবার চাও তো নিয়ে যাও মেয়েকে। এদের বাড়ীর ফ্যাসান আলাদা! এরা মেয়েকে পাঠাবেও না, আবার নিজেরাও দেখবে না। প্রতিটি মানুষ যেন অহঙ্কারে চুর চুর। মাঝে মাঝে সদাশিববাবুর ওপর রাগ হয় প্রভার। এমন কথা কেউ শুনেছে কখনো, যে চোখে একবার না দেখে মানুষ জামাই ঠিক করে? ঐ অগ্নিশর্মা মানুষ দেখলে কে আর বিয়ে দিতো বলো। বার বছরের মেয়ে এমন কিছু গলার কাঁটা হয়নি। আবার নিজের ওপর রাগ হয়, বিয়ের আগে নিরুপমার শ্বশুরবাড়ী নিজে গেছলেন, অনুর বেলা গেলেন না কেন? অনুরাণী ঠিকই বলে, সবই অনুর ভাগ্য নইলে এত কষ্ট মেয়েটা পায়?

যা ভয় করেছিলেন তাই হল। হঠাৎ শোনা গেল অনু শ্বশুরশাশুড়ীর সঙ্গে কাশী যাচ্ছে। গাঙ্গুলি বাড়ীর কেতাই আলাদা। যে ছেলে যাবে সে বৌ যাবে না। তাই যাচ্ছে মেজ ছেলে আর মেজো বৌ। উপোস করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেল অনু। না ডাক্তার না বদ্যি। সেই অবস্থায় দশ বারো দিন কাটিয়ে অনু যখন কলকাতায় ফিরলো বেদনাটি কায়েমী হয়ে বসেছে। সারা দশমাস ধরে কষ্ট পেলো অনু। প্রায়ই ব্যাথা ওঠে। মনে হয় ছেলে বুঝি পেটে আর থাকেনা। সাধের সময়ও নানা হাঙ্গাম। মেয়ে-জামায়ের আর্থিক অনটনের কথা ভেবে প্রভার বাবা তাঁর কাছে অনুর সাধ দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু বিপদতারিণী মাকে নিয়ে এসে নাকের ভুঁড়ি ফুলিয়ে অনেক কথা বলে ভাজকে নিয়ে চলে গেল। অনুর সাধে প্রভা নিমন্ত্রিত হলেন না। চোখের জল মুছে প্রভার মেয়ের বাক্সে একটি বেনারসী আর নিজের শেষ জড়োয়া বালাজোড়া দিয়ে বললেন, পারলে পরিস। তার পরের ঘটনা আর বলার মত নয়। কি করুণা ওদের হল জানিনা, সদাশিববাবু আর প্রভার কাতর প্রার্থনায় প্রসবের সময় অনুকে ওরা পাঠিয়ে দিলো। সে ত যমে মানুষে টানাটানি ব্যাপার। প্রসবের পর একশো পাঁচ ছয় করে জ্বর হল। অনুর সবই সেই পড়ে যাওয়ার উপসংহার। মেয়েদের সেরা ডাক্তার কেদার দাসকে নিয়ে এলেন সদাশিববাবু। তাতে শান্তি হলনা গদায়ের। গদাই তার দিদি বিপদতারিণীকে দিয়ে বলে পাঠালো তাদের পাড়ার নারান মিত্তিরকে ডাকতে হবে। পয়সা যদি না জোটে গদাই নাকি টাকা দেবে। এ রকম ঘটনা ঘটে কোন ঘরে? কিন্তু জামাই নিজেই ডাক্তার আনে। শ্বশুরকে বলে, কিন্তু গদায়ের স্বভাব আলাদা, টাকাটাও বের করলো না। অথচ অপমানটাও করা হল। এধারে গদায়ের টিকি নেই। শোনা গেল গদাই নাকি বাপকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বাপ নাকি স্ত্রীর ওপর রাগ করে কাশী গেছেন। বাপের পিছু পিছু গদাই কাশী চলে গেল। এধারে অনুকে নিয়ে তখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। কর্তা গিন্নি কাশীতে। কিন্তু বাড়ীর আর যারা এলেন সবাই ম্লান। বিশেষ করে বিপদতারিণী। অপরাধ মেয়ে বিয়োণীর মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়েছে।

এতবড় অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। কাজেই নেহাৎ গাঙ্গুলি বাড়ীতে বিয়ে হয়েছে বলেই যে ছেলে হয়েছে একথা বারে বারে বলে তাঁরা বাড়ী ফিরে গেলেন।

এরপর ছেলে নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট। ছেলের অসুখ হলে মা ছেলে নিয়ে থাকতে পাবে না, তাহলে তক্ষুণি শাশুড়ী বলবেন—সকাল থেকে সর্ব্বস্ব কোলে করে বসে আছ। আমার সংসার চুলোয় দিয়ে। মহা বিপদ হল প্রভার। ওদের বাড়ীর সবই অদ্ভুত। ছেলে মেয়েরা ওদের বাড়ীতে কুকুর বেড়ালের সামিল। অনু বলে, জানো মা আমার জা আর ভাসুর দুদিক থেকে ছেলে মেয়েকে লাথি মারে ঠিক যেন বল খেলছে সে তুমি ভাবতে পারবে না মা। এরপর নাতিকে সেখানে রাখা কঠিন হল। অথচ অনুই বা ছেলে ছেড়ে থাকে কি করে? তবে সুবিধে এই যে নাতি পাঠাতে ওদের কোন আপত্তি নেই। আপদ বিদেয় গোছের অবস্থা। নাতিও এখানে এলে যেতে চায় না। গদাই শ্বশুর বাড়ীতে ছেলের আদর দেখে বিরক্ত হয়, নাক কুঁচকে বলে যাচ্ছেতাই। প্রভা শত চেষ্টা করেও গদায়ের মাতৃ মহিমায় বিরাজিত হতে পারেন না। গদাই চোদ্দ সন্তানের শেষ সন্তান। পঞ্চান্ন বছরের মার গর্ভের সন্তান সে। জ্ঞান হতে অন্তত: পাঁচ বছর, এদিকে ভদ্রমহিলার যখন ষাট বছর বয়েস তখন দশটি সন্তানের জননী বিপদতারিণী বিধবা হল। তিরিশ বছরের বিধবা মেয়ের সামনে মা আর কত সাজবে? কিন্তু গদায়ের আইনে ওর মার সাজসজ্জা হল আদর্শ-স্থানীয়া। তিনি সায়া সেমিজ ছেড়ে অনেক সময় সাড়ীও ঠিক সামলে রাখতে পারতেন না। এধারে আচার-বিকারের জন্য গামছার ব্যবহারই বেশী ছিল। ঠিক সে ধরণের সাজ প্রভার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তারপর তাঁর মাতৃত্বর প্রাবল্যে, সন্তানরা ঝিয়ের কাছেই মানুষ হয়েছিল এ কথাটাও প্রভা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর মতে ঝি চাকর যতই থাকুক, মা দেখবে না সন্তানকে? গদাই যখন বলতো যে আমাদের খাওয়ার কাছে আমাদের মা কখনো বসেনি—ঝা দেখার পাতাই দেখতো। গদাই যত গর্ব্ব করেই সেকথা বলুক না কেন, প্রভার চোখ ছল ছলিয়ে উঠতো, বলতো আহা বাছারে।

আবার হয়ত কথাপ্রসঙ্গে গদাই বলতো, রাতে শীতের চোটে আমি পর্দাটাই তুলে গায়ে দিয়েছি—প্রভা সবিস্ময়ে ভাবতো—শীত পড়েছে অথচ শীতের চাপা বের করে দেয়নি এ কেমন মাগো? গদাইদের বাড়ীতে আহার্য্য ছিল তিন প্রকার। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজকীয় আহার্য্য ত্রিতল বাসী চন্দ্রমোহনবাবু সস্ত্রীক ও সজননী খেতেন। মদ্যপ মানুষ যা ইচ্ছে বলার ও করার এক্তিয়ার তাঁর আছে। মাকে বলতেন মাছের মুড়োটি বড় বৌকে দাও মা, তুমি যদি না মরো ও কী মাছের মুড়ো কোনদিন পাবে না? রূঢ়কথা বললেও মাকে ভালোমন্দ খাইয়ে হাতে রেখে-ছিলেন চন্দ্রমোহন। ফলে ঐ মদ্যপ ছেলেই ছিল বিষয়-আশয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা। নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য খেতেন কর্ত্তা আর বাকি তিন ছেলে। তৃতীয় শ্রেণীর খাবার ছিল অনুগৃহীত, তিন বধূ ও ভৃত্য-দাসীদের জন্য।

তখনও ইন্ডারকুয়েসান চলছে—খাদ্যের কিছুটা অনাটন। তবুও যেদিন প্রভা শুনলেন, অনু বজরার রুটি আর বেগুনের তরকারি খায়—তাঁর গলায় কথা ফুটলো না। অনুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি মায়ের অন্তর তার কাছে অজানা ছিলো না। তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিয়ে অনু বললো, বজরার রুটি কিন্তু খেতে খারাপ নয় মা, তাছাড়া ঝাল ঝাল তরকারি তো? বজরা কি আটা বুঝতেই দেয় না। এদিকে গদাই মানিক চাঁদরা মাংস লুচি খাচ্ছে—তারা খোঁজও রাখে না বৌরা কি খাচ্ছে। মেয়ে-মানুষের খাবারের খোঁজই যদি তারা রাখবে তারা কেমন মরদের বাচ্ছা।

গাঙ্গুলিবাড়ীর সবই অনাসৃষ্টি কাণ্ড— শোনা যেত গদায়ের পাঁউরুটির টুকরো ছিঁড়ে উড়ে পড়ায় প্রায়ই নাকি বিপদতারিণীর রাতের খাওয়া নষ্ট হয়ে যেত। প্রভা ভাবতো বিধবা মেয়ের পাশে বসে পাঁউরুটি কি না খেলেই নয়। রাত্রে চন্দ্রমোহনবাবুর বে-এক্তিয়ার অবস্থা। কাজেই সকালেই মা ছেলের সঙ্গে খেতেন। রাতে সেখানে খাওয়া সম্ভব ছিল না।

অনাসৃষ্টি কাণ্ড সেখানে আরো ঘটতো। গদাই শ্বশুরবাড়ীতে যখন আস্ফালন করে বলতো, আমার বাবা ভক্ত মানুষ বাড়ীতে দুর্গা পূজা হচ্ছে আমার এক ভাই মারা গেল। অশৌচ হলে পূজো বন্ধ হয়ে যাবে

ত? তাই ছাদ দিয়ে দিয়ে তাকে সরিয়ে ফেলা হল কেউ জানতেও পারলেন না। কিন্তু প্রভা অবাক হয়ে ভাবে, মা দুর্গাও কি জানতে পারলেন না? এদের ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা কি রকম? গীতায় বলেছে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বত্র মুখ সর্ব্বত্র পাণি পাদ—কিন্তু গদায়ের বাড়ীতে মা দুর্গাকেও বোকা হাবা সেজে থাকতে হল—বাড়ীর মহিমা আছে বাবা। যতই হোক মা দুর্গাও তো মেয়ে মানুষ, বেশী কিছু বলতে গেলে বলবে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে এসো না।

আবার আরো রোমহর্ষক গল্পও করে গদাই। বলে, আমার ঠাকুমা যখন মারা গেলেন দানসাগর শ্রাদ্ধ হচ্ছে, পুরোহিত খানিকবাদে বললো. সেই বুড়ীটা কোথায় গেল যে জোগাড় দিতো? যখন শুনলো সেই বুড়ীটারই শ্রাদ্ধ তখন ত সে অবাক। যত অবাকই পুরুত হোক আর যত সাদাসিধে গিন্নিই হোক, বাড়ীর পুরুত চেনে না এর চেয়ে অসম্ভব কথা আর কি আছে? প্রভার বলতে ইচ্ছে হত, ছেলেদের পৈত্তের কি মা ছেলে কোলে করে বসতেন না? তাঁর শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধের বা নারায়ণের ভোগ রাঁধতেন না তিনি। কিন্তু গল্পের গরু গাছেও চড়ে—গদায়ের গল্পের স্রোত এসব ছোট খাট বাধা মানতো না। আর একটা কথা গদায়ের কথার মাত্রা ছিল সে ছিল প্রসন্নবাবুর চাঁদির জুতো যে না খেয়েছে—কিন্তু প্রভার ঠোঁটের কাছে আসতো চাঁদির টাকার তো অনেক সদ্‌ব্যবহার হতে পারে শুধু চাঁদির জুতোরইবা এত প্রয়োজন হল কেন? শুনতেন আর ভাবতেন আহা অনুটার কত কষ্টই না হয় এই নোংরা গজালি শুনতে শুনতে জীবন কাটাচ্ছে। সদাশিববাবুও মাঝে মাঝে বলতেন, দেখো পারিপার্শ্বিকের কি প্রভাব গদাই লেখাপড়া শিখেও এগুলো বুঝতে পারে না।

গদাই-ই গল্প করে বলেছিল আমার ছোট বোন মোক্ষদার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে খুব অসুখ হল। কেবল খবর পাঠাচ্ছে—একবার তোমরা এসো আমি আর বাঁচবো না আর দেখতে পাবো না তোমাদের। কিন্তু হুট বলতে তো আর কুটুম বাড়ী যাওয়া যায় না। শেষে পাঁজি দেখে যদি বা বাবা বেরুবে, প্রথম দিন হাঁচি পড়লো। পরদিন চেয়ারের হ্যাণ্ডেলে বাবার কাছা আটকে গেলো! কাজেই যাওয়া আর হল না। বাধা পড়লো তো? তারপর দিন খবর এলো মোক্ষদা মরে গেছে। অবিশ্যি তারপরে বাবা সেখানে গেছেন। ঐ জামাইবাবুর বিয়েতেই। বাবাই দাঁড়িয়ে বিয়ে দেয়ালেন। প্রভার ঠোঁটের কাছে এলো যে বহু জন্মের পাপ না থাকলে কেউ তোমাদের বাড়ীর মেয়ে হয়ে জন্মায় না।

চন্দ্রমোহনবাবুর ইতিহাস আবার আরেক রকম। প্রথম বৌ অত্যাচারের চোটে আত্মহত্যা করলো। দেয়ালে সে নাকি রক্ত দিয়ে লিখে গিছলো "মুখে রক্ত উঠে মরবে তুমি" দ্বিতীয় পক্ষের বৌও বিষ খেয়েছিল একবার। এখন নাচার হয়ে দুজনেই এক গোয়ালের গরু হয়েছে। মদে সর্ব্বক্ষণ চুর হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়ীতে নিত্য নতুন হাঙ্গাম সৃষ্টি হয়। সেদিন অনুর ঘুম ভাঙলো কালো মাসীর তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে একরাশ কোঁকড়া চুলের ঢালকে হাতে জড়াতে জড়াতে ভয়চকিত মুখে উঠে বসে সে। বেরুতেই তাকে দেখে ভবতারিণী বলেন কিগো রাজ-কন্যে ঘুম ভাঙলো? তা বাসি মুখে বাসি কাপড়ে আর কী রাজকার্য্য করবে বলো? অপ্রস্তুত হয়ে অনু চানের ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বাড়ীতে মেম্বার তেত্রিশ জন অথচ বাথরুম একটি। এখন রাঙাদির পালা, নিঃসন্তান শুচিবায়ুগ্রস্ত মহিলা। কাজেই বাথরুম পাবার আশা দুরাশা। তবুও একবার দ্বিধাভরে কড়া নাড়ে। তীব্র কণ্ঠে উত্তর আসে বাপরে বাপ সন্দেশ নয় রসগোল্লা নয় কলের জল তাও কি ছাই পাবার জো আছে? নুড়ো জ্বেলে দাও এ সংসারের মুখে, নুড়ো জেলে দাও, এ সংসার উচ্ছন্নে যাক। অবিশ্রান্ত শাপ-শাপান্ত চলতে থাকে। শঙ্কিত অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে অনু বাপরে বাপ রাঙাদির কি গলা, জলের তোড়কেও হার মানিয়েছে। মেজ জার ছেলে নন্তু চোখ রগড়াতে রগড়াতে কাছে আসে, অনুকে দেখে মুখ

ফুলিয়ে বলে মনে আছে কাকীমা আজ কিন্তু মাছের ডিম আমার। তুমি কেবল দাদাকেই ভালোবাস, কাল বলেছিলে কালকে দোব। আজ মাছে ডিম না থাকলে অনর্থ ঘটার আভাস পেয়েও অনু আদর করে নন্তকে কোলে টেনে নেয়। তার কোকড়া চুলে ঘেরা পদ্ম ফুলের মত মুখখানায় চুমো খেয়ে বলে কিন্তু নন্তবাবু আজ যে বেস্পতিবার আজতো মাছের ডিম খেতে নেই। নন্ত সহস্র বিধি-নিষেধের মধ্যে মানুষ তাই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী নন্ত পরাজয় মেনে নিয়ে বলে শুক্কুর বারে তো খেতে আছে কাকী মা? নিরাপদ উত্তর ভাবার আগেই নীচ থেকে প্রসন্নবাবুর ডাক আসে সেজোবৌমা! নন্তর হাত থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপদে অনু নিচে নেমে যায়।

হরিধ্বনি কর্চ্ছেন প্রসন্নবাবু খড়মের দ্রুত ধাবনের আওয়াজ মনের বিরক্তির প্রকাশ। হরি বলো মন হরি বলো, বলেন কালকে কে তরকারি কুটেছে? ত্রয়োদশীতে বেগুন খেয়ে কি এমন স্বর্গ লাভ হবে যে হিন্দুর ঘরে এটা না করলেই চলছিল না? এইজন্তে বারে বারে গিন্নিকে বারণ করেছিলুম। তখন ত বুড়োর কথা কানে তুললে না এখন মরো ত্রয়োদশীতে বেগুন খেয়ে। সামনে নাপিতকে উদ্দেশ্য করে বলেন,এখন সাহেবরা পর্য্যন্ত মানছে যে ত্রয়োদশীতে বেগুনে পোক হয়। কই এবার কার সাধ্য বলুক না? নাপিত পরম সম্ভ্রমে ঘাড় নাড়ে "তাতো নিশ্চয়ই বাবু ওসব সাহেব-সুবোর কথা ছেড়েই দ্যান্ ওঁরা হলেন গিয়ে সাক্ষাৎ দ্যাবতা"। এবার হরপ্রসাদবাবু চটে ওঠেন বলেন দূর ব্যাটা মুখ্যু, ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে এলো। চাকরকে বলেন কি হে নবাব আজ বাজারটাজার যেতে হবে না? অনু এই সুযোগে আবার ওপরে চলে যায়। ওপরে গিয়ে দেখে কলতলা এর মধ্যে বেদখল হয়েছে। মেজ জা তেলের বাটি সাবান গামছা রেখে নিজের দখলি সত্ত্ব সাব্যস্ত করে গেছে। কোন রকমে মেজদিকে হাতে পায়ে ধরে বারান্দায় তেল মাখতে বলে অনু বাথরুমে ঢুকে পড়ে। কলতলায় মাথা পেতে বসে অনুর মনে পড়ে এখনও চুল খোলা হয় নি চোখ দুটি অকারণে জলে ভরে আসে মার কথা মনে পড়ে।

হঠাৎ চমক ভাঙে পিস শাশুড়ী মাস শাশুড়ীর গলার আওয়াজে। দুজনেই বিধবা দুজনেই নিরাশ্রয়া, কাজেই দুজনেই তাঁদের আগের ঐশ্বর্য্যময় দিনের গল্পের অবতারণা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর্ত্তে চান। প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পিসীমার ভাসুরপোর বিয়ের হাতীতে রূপোর হাওদা পরানো হয়েছিল। সঙ্গে গিছলো সোনার তকমা, আঁটা পাইক-বরকন্দাজের প্রশেসান। শুনে দোক্তার পিক ফেলার সঙ্গে মুচকে হেসে মাসীমা বল্লেন, তা যদি বল্লে ভাই তবে শোনো আমার দেওরের বিয়েয় তো সব সোনার সামাজিক হয়েছিল। তখন এধারে ধারে-দেনায় বিষয়সম্পত্তি সব দেনায় ডুবু ডুবু। রোজ একটা করে সম্পত্তি নীলামে উঠছে। কানাঘুসোয় সেই কথা হয়ত শুনে থাকবে পাড়ার লোকে। একজন নতুন কুটুম্ব অত ভারি বাসন দেখে মনে করেছিল বুঝি কাঁসার। শুনে হেসে আর বাঁচি না। মুখ ভার করে পিসীমা বলেন, কে জানে বাবা দেনা করে সোনার সামাজিক করা আবার কি ঢং।

এমন সময় হারানী ঝি ভিজে কাপড়ে খাবার জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। গল্প থামিয়ে তার কোথাও শুকনো আছে কিনা নিরীক্ষণ করবার জন্ত পিসীমা উঠে পড়লেন। 'হরি নারায়ণ হরি নারায়ণ' ধ্বনি করে বনের অকুস্থলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাসীমা রান্নাঘরের দিকে যাত্রা করলেন। ওদিকে সেখানে তুমুল কোলাহল উঠেছে মতির মা নাকি কোঁচড়ে করে হলুদ জিরে মরিচ চুরি করে নিয়ে যায়। বামুন ঝি সব কাজ ফেলে ভীড় করে দাঁড়ায় শিলের কাছে। মাছ কোটা ফেলে সখী ঝিও মজা দেখার আসায় আসে। কাকে একটা কৈ মাছ নিয়ে যায়। পিসীমা মতির মাকে আর মাসিমা সখীর মাকে বকতে সুরু করেন। ভবতারিণী মালা হাতে করে এসে দাঁড়ান, বলেন কী হল এখানে? চারদিকে চেয়ে গিন্নী বলেন

ও তাই বলো ? তা চোর নয় কে ? বামুন ঠাকুর রোজ ঘি-এর বাটি সরায় না, না সখীর মা ঠাকুর-ঘরের ফল নেয় না। কারুর গুণের কথা জানতে তো আর বাকি নেই। তারপর মন্তির মাকে বলেন মরণ আর কি ? স্বভাব মলেও যাবে না।

অনু শঙ্কিতভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এসবের সঙ্গে সে যেন খাপ খাওয়াতে পারে না। কাজ করতে করতে মন তার চলে যায় মার কাছে— হাতের কাজ শ্লথ হয়ে আসে, পাশে, রাঙাদি বলে কিগো ভাবুনি তোমার নাহয় মাকে ভাবলেই পেট ভরবে আমাদের যে নিত্যি ভাত-তরকারির হাঙ্গাম। অপ্রস্তুত হয়ে অনু আরো তাড়াতাড়ি হাত চালায়। দু ঝুড়ি পালং শাক ভাজার জন্যে কোটা হয়েছে। বাঁধাকপি ছটা। এখনও পাঁচটা মোচা কুটতে বাকি। কান্নার আওয়াজ আসছে খোকনের কিন্তু যাবার উপায় নেই। আজ কদিন ধরে জ্বর চলছে—ছেলেটার। তিনদিন ত এরা বালসানো বলে ছেড়ে দিলো। এখন ভাসুরঝির দেওর কি একটা হোমিওপাথির ওষুধ দিচ্ছে—। মাকে জানালে এখুনি ব্যবস্থা হয় কিন্তু এরা তক্ষুণি চটে যাবে, বলবে সবকথা মার কানে তোলা কেন ? একটানা সুরে খোকন কেঁদে যাচ্ছে—। কদিনেই ছেলেটা কি রোগা হয়ে গেছে। মার কাছে সবই আলদা—। সংসারে যত টানাটানিই থাক অসুখ হলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে—। বার্লি খেতে চায় না খোকন, মার কাছে হলে ঐ বার্লিই কখনো লেবুর রসে কখনো গোলাপ জলে কখনো দুধে মিশিয়ে ভেনিলা দিয়ে অপূর্ব্ব মনোরম হয়ে উঠতো। কত-দিনের কত কথাই মনে পড়ে, মাগো মা। সেবার খোকনের বোতল ভাঙলো রাত তখন নটা, বাবা বিদেশে, কাছে-পিঠে কোথাও বোতল পাওয়া যায়না। মা সেই রাতে দাদুকে মোড়ের দোকানে গিয়ে কোন করলো। দাদু হেঁটে বাগবেটে গিয়ে বোতল কিনে নিয়ে এলো। হোক দারিদ্র্যের সংসার সেই সংসারে মা যেন সম্রাজ্ঞী আর এখানে বাবাঃ মেয়েদের কী হেনস্থা—।

এই ছেলের জন্যে এখানে নারায়ণের তুলসী দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কাঁদলে তার কাছে যাবার উপায় নেই। এদের পুজোর শুধু আড়ম্বর শুধু অত্যাচার বিচারের চোটে মানুষকে পাগল করার ব্যবস্থা।

সেবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে এমন সময় এলেন প্রভার বাবা, খাকি হাপপ্যাণ্ট পরা, ছড়ি হাতে মূর্ত্তিমান সাহেব মানুষটির যে চণ্ডী পুঁথিটি কণ্ঠস্থ এমন আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে বলো—। পুজো পাঠের সর্ব্বাগ্রে যে আচমন হচ্ছে গামছা পরিধান তা হয়ত এ মানুষটি জীবনেই পরেননি। পায়ে জুতো ভদ্রলোক উচ্চারণ ভুল শুনে থমকে দাঁড়ালেন তারপর উদ্দাত্ত কণ্ঠে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতে করতে ওপরে উঠে গেলেন। সারা বাড়ী গম গম করে উঠলো সেই গলার আওয়াজে। অনুর আজও মনে আছে দাদু বলেছিলেন হ্যাঁরে এমন গো-মুখ্যু ভটচায্যি তোরা পেলি কোথায় যে সংস্কৃতও জানে না কিছু। উচ্চারণ-টুকু তো বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

খোকনের অন্নপ্রাশন আসন্ন। ছুটোটিউশানি নিলেন সদাশিববাবু। প্রভা তত্ত্বের আয়োজনে ব্যস্ত। কাঁথার কারুশিল্পে ছুটি ট্রে বোঝাই হল নানা কবিতা লেখা কাঁথা। নিজের নমস্কারিতে পাওয়া গরদটি কেটে নাতির পাঞ্জাবী সেলাই হল কটা। উলের বোনা জামা। এবারে হাত দিতে হল বাবার ঢাকা থেকে আনা রূপোর টিসেটটিতে। সেকালের ভারি জিনিষ। ওটা ভেঙে একসেট রূপোর বাসন গড়াতে হবে খোকনের। সংসারে দারিদ্র্য তো চিরকাল আছে। খোকনের অন্নপ্রাশন তো আর দুবার হবেনা। নিজের ছেলে নেই, আত্মজার কাছ থেকে সেই জিনিষ পেয়ে মন ভরে আছে প্রভার—সদাশিববাবু সেটা বোঝেন বলেই বাধা দেননা। তবে আশঙ্কিত হন, এই প্রাণ-পাত করা তত্ত্বর যখন নানা অপরাধ ধরা পড়বে তখন কত আঘাত পাবে প্রভা।

প্রভার ভাবনা আবার অন্য খাতে বইছে। কত আদরের অনুরাণী কি সহিষ্ণু কি চাপা মেয়ে। জীবনে কখনো কিছু চাইত না সে, এ নিয়ে প্রভা যদি মেয়েকে বলতো নিরু কত কি চায় তুই কিছু চাস না কেনরে? অনু শান্তভাবে বলতো চাইবার আগেই তুমি দাও যে। অনেককাল আগের কথা মনে পড়ে প্রভার—। তখন ছোট্ট দুটি পিঠোপিঠি বোন। সেকরাকে ডেকে নিরুপমার চুড়ি গড়াতে দিচ্ছেন প্রভা—। নিজের ক্ষয়া জুবিলী চুড়ী দিয়ে—। সদাশিববাবু একবার শুধু বললেন, তুমি চুড়ি পরবেনা বুঝি আর। প্রভা বলেন পরবনা কেন কাজের হাত তো সোনা ক্ষয়ে যায়। ঐ একজোড়া চুড়ই আমার যথেষ্ট। মেয়ে বড় হচ্ছে নেমন্তন্নটা—আসটা আছে, তাই ওর হাতের একজোড়া চুড়িই গড়িয়ে নিচ্ছি—। সদাশিববাবু জানতেন মেয়েদের সাজিয়ে আশ মিটতো না প্রভার। অর্থের প্রাচুর্য্য নেই ওমার খৈয়ামের বই রেখে ছেঁড়া শিল্কের কাপড় ছাপা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মনোরম পোষাক তৈরী হত। তার সঙ্গে শাঁখের মালা গালার কানবালা। কাঁচের চুড়ি—। স্বভাবসুন্দর মেয়ে দুটি তাতেই উজ্জল হয়ে উঠতো—। প্রভার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল কোন জিনিষ সবাই পরছে দেখে কোন জিনিষ তিনি করাতেন না। বলতেন যা সবাই পরছে অমনি করাতে হবে তা কেন? প্রভার এই স্বভাব পেয়েছিল অনুরাণী। সেকরা যখন অনুকে বললো তা ছোট খুকী মাকে বলোনা তোমার চুড়ি গড়তে দেবে। অনু এক কথায় উত্তর দিলো, দিদির ছোট হলে আমি পরবো। স্বল্পবাক সংযত স্বভাবা এই প্রাণোচ্ছলা মেয়েটি বাপ মা দিদির একান্ত গর্ব্বের ধন ছিলো।

ঠিক খোকনের অন্নপ্রাশনের আগের দিন সেই অত সাধের তত্ত্ব পাঠিয়ে প্রভা বসে ছিল। কি রায় আসে কুটুমবাড়ী থেকে। রূপোর থালা বাটি গেলাস দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি প্রভা। নিজের দোলের তত্ত্বর রূপোর পিচকিরি বালতি ভেঙে পিকদান জগও গড়িয়ে দিয়েছে খোকনের জন্যে—। পিচকিরি বালতিটিতে কতস্মৃতি জড়ানো—। মা সাধ করে মেয়ে-জামায়ের নাম মনোগ্রাম করিয়ে দিয়েছিলেন ঐ পিচকিরি নিয়ে দোল খেলেছিলেন সদাশিববাবু—। কত কথাই না বায়স্কোপের ছবির মত মনে আসছে—। সদাশিববাবুর হাত থেকে ঐ পিচকিরি কেড়ে নিয়ে নিমু তাঁকেই রংএ চুবিয়ে দিয়েছিল। মনে হয় যেন কালকের কথা।

হঠাৎ কড়ানাড়ার আওয়াজে দোর খুলে দেখেন গদাই এসেছে। বেশ একটু মনোক্ষুণ্ণ হলেন প্রভা। ওমা, অমন সাজানো তত্ত্বটা গদাই একবার দেখলো না। লরি ভরে তত্ত্ব পাঠিয়েছেন প্রভা। আবার তার সামনেতে লাল শালুতে তুলো দিয়ে খোকনের নামও লিখে দিয়েছেন। সঙ্গের লোকের হাতে শাঁখ দিয়েছেন শাঁখ বাজাতে বাজাতে গলিতে ঢুকবে লরী। তাহলে শাঁখের আওয়াজে পাড়ার লোক তত্ত্বটা দেখবে। এসব জিনিষ নিয়ে কেউ বড়লোক হয়না। শুধু সাজানো দেখানোরই আনন্দ। ওদের বাড়ীর আবার যা কাণ্ড? তত্ত্ব দেখতে তো কারুকে ডাকবেই না, আবার সাজিয়েও রাখবেনা। সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড ঐ তত্ত্বই অন্য কুটুমবাড়ী পাঠিয়ে নিজেদের তত্ত্বর পয়সা বাঁচাবে। প্রভাও তেমনি তত্ত্বের সন্দেশে অন্নপ্রাশন ছাপ করিয়ে দিয়েছেন তাই। অনু ত এসে হেসেই গড়াগড়ি। বলে বাবা এতো মনেও আসে তোমার। প্রভা বলে কেনই বা আসবেনা। দিনে কত টাকা ড্রিংকে খরচা করেন তোমার ভাসুর অথচ মেয়ের বাড়ী তত্ত্বর সময় এই লোকটার মুখে-রক্তওঠা টাকায় তত্ত্ব দিয়ে তত্ত্ব সারা। বিবর্ণ হয়ে যায় অনুর মুখ, বলে ভালোই হয় মা ও মিষ্টি খেতে হয়না। ওদের খুসী করতে দেওয়া ত ওরা খুসী হলেই হল। সেদিন আমার এক ভাসুরঝি আমার সেই তোমার দেওয়া তারের সাড়ীটা পছন্দ বলে নিয়ে নিলো—আমার ননদ বললো তুমি ত আচ্ছা বোকা চাইতেই দিয়ে দিলে—। সত্যি বলছি মা আমার কাপড় গয়নার যে কী ঘেন্না কি বলবো তোমায়।

ওরা যদি ঐ কাপড় পেয়ে খুশী হয় হোক। ওদের খুশীর জন্যেই ত এত কষ্ট বাপীর তোমার—। ও কাপড় গয়নায় আমার কী আনন্দ হতে পারে মা?

যাক যা বলছিলুম গদাই এসে টেবিল থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বসলো—এটাই হচ্ছে গাঙ্গুলিবাড়ীর বৈশিষ্ট্য—। প্রভার মনে কত প্রশ্নের বান ডেকে যায় কিন্তু গদায়ের আচার-আচরণে মনে হয় সে যেন এখানেই ছিল। চা খেয়ে ড্রয়িংরুমে এসে বসেছে মাত্র—।

শেষে থাকতে না পেরে প্রভা বলে "হঠাৎ তুমি এসময় এলে যে,বাড়ীর সব ভালো ত?" গদাই বলে এদিকে এসেছিলুম তাই একবার ঘুরে যাচ্ছি—। তবুও প্রভার মন শান্ত হয়না। বলে খোকন কেমন আছে তুমি গাড়ী করে এলে তাকে সঙ্গে আনলে না কেন? গদাই হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে ওকে নিয়ে ঘুরবো কোথায়? দিনরাত কান্না যাচ্ছে তাই হয়েছে একটা। আবার প্রভা বলে ভালো আছে ত? গদাই হুঁ বলে কাগজের মধ্যে ডুবে যায়। ঘণ্টাখানেক বাদে গদাই চলে যায়। ফিরে এলো তত্ত্বের লোকেরা। এসেই বাসনাঝি বলে জানো মা খোকাবাবুর খুব অসুখ। আজ ষোলদিন এক জ্বরী। মাথা চালতেছে—। আর দিদিমণির ননদের ছেলেটা বলছিল কি জানো? "মামাদের ছেলেগুলো ত বাঁচেনা, ভাতের সময় পট্‌পট্ করে মরে যায়। সেজোমামার ছেলেটাও বাঁচবেনা, ও বিষয় আমরাই ভোগ করব।" অত খেলনা পুতুল দিলে মা, আহা বাছা আমার চোখ চেয়েও দেখলো না। জানো মা দিদিমণি কাঁদতেছিল। প্রভা তো হতবাক্! ঐ যায় যায় ছেলে ফেলে গদাই নির্বিকার এখানে এসে রইল! কী কাণ্ড বলোত? প্রভার সংসার মাথায় উঠলো—। দরজায় তালা ঝুলিয়ে কোলের ন বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গেলো বাপের বাড়ী, সেখানে থেকে ফোন করে সদাশিববাবুকে সব বলে তাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলো অনুর বাবার বাড়ী।

সকালে অত বড় তত্ত্ব পেয়ে কর্তা-গিন্নির মেজাজ বোধ হয় ভালো ছিল। প্রসন্নবাবু সৌজন্যের বন্যা বইয়ে দিলেন একেবারে, এ কি ব্যাপার হঠাৎ বেয়ান যে, মেঘ না চাইতেই জল—। কী কাণ্ড আপনার, নাহক সামান্য কারণে এতটাকা খরচ করলেন। কি দরকার ছিলো অত রূপোর বাসনকোসন দেবার? আমার রূপোর বাসনেই আটটা আলমারি ঠাসা, আরো দেওয়া মানে আমায় বিপন্ন করা—। কথার মাঝে বাধা দিয়ে প্রভা বলে, খোকনের নাকি অসুখ। কর্তা বলেন ঐ ছেলেপুলের যেমন হয় আর দিনরাত নাকে কান্না তো ওর স্বভাব। আজকে প্রভা আর ভদ্রতা রক্ষা করতে পারলেন না দ্রুতচরণে মেয়ের ঘরে গেলেন। দেখেন ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে গায়ে ধান দিলে খই হয় এমন তাত। তারি মধ্যে দিদি-মাকে দেখে কচি মুখে খুসীর হাসি ফুটলো, অনু এসে দাঁড়ালো। মাকে দেখে বললো সত্যি মা তুমি এসে বাঁচালে, প্রভা ধমকে ওঠেন মেয়েকে। রেখে দে তোর লৌকিকতা, খোকনের এত অসুখ আমায় খবর দিসনি? অনু অবাক! বলে আমার চিঠি পাওনি তুমি? কেন ও যায়নি তোমার কাছে? প্রভা বলে গিছলো ত? কই অসুখের কথা ত কিছু বললো না। অনু একটু থেমে বলে বোধহয় তোমার অসুবিধে হবে ভেবে বলেনি। ও যেতেই চাইছিল না, আমিই জোর করে পাঠালুম। জানি ত তোমায় সারা পৃথিবী একদিকে আর খোকন একদিকে—। এদের বাড়ীতে তো অসুখ-বিসুখ নিয়ে মাতামাতি করা খুব দোষের। আর যার ছেলের অসুখ সেতো ঘরেই ঢুকতে পারবেনা। এদের আইনকানুন বুঝিনা আমি। প্রভা তাঁর চির-কালের ভঙ্গি নিয়ে খোকনের খাটে ঝেঁকে বসলেন। হাতের কাছে জিনিষ জোগাতে লাগলো ন বছরের মেয়ে বেণু। প্রভারই মেয়েত? বাড়ীতে মাতৃত্ব জিনিষটার প্রাবল্য চিরদিনই বেশী। তার ওপর ঠিক পুতুলখেলার বয়েসে ছোটদি তাকে এই জ্যান্ত

পুতুলটা দিয়েছিল। কাজেই খোকনের ওপর তার আদর ও শাসন সমানভাবেই চলতো। এই স্বভাব প্রভার চিরকালের। সংসারের পোড়া কয়লাগুলি বেছে রাখা থেকে সাবান ভিজুনো সব নিজের হাতে না করলে তাঁর শান্তি নেই। কিন্তু যখনই কারুর অসুখ হত তখন যাক সংসার জাহান্নামে। তিনি বিশ্ব-জগৎ ভুলে শুধু সেই রুগীকে নিয়েই থাকতেন। ফলে অধিকাংশ দিনই বেণুর হাতে সংসার। কিন্তু আজ ত আর বেণুকে একা বাড়ীতে রেখে আসতে পারেন না। কাজেই সদাশিববাবুর যে কী কষ্ট হবে তা বুঝতেই পারছেন। তবু নিরুপায় হয়েই তাঁকে থাকতে হল ষোল দিন গাঙ্গুলিবাড়ীতে—।

ঐ রকম বেটক্কর বাড়ীতে ষোল দিন কাটানো সুখের কথা নয়। তার ওপর সবচেয়ে বিপদ হত যখন মদে চুর হয়ে টলতে টলতে চন্দ্রমোহনবাবু এসে সামনের ড্রেসিং-টেবিলের ওপর চেপে বসতেন। মাতালকে ভয় প্রভার চিরকাল। তার ওপর নিশুতিরাত। তবুও যেন মনে হত এ মদের মাতাল সংস্কারের মাতাল গদায়ের, চেয়ে অনেক ভালো। যে পিতা লোকলজ্জার ভয়ে তার পিতৃত্বের প্রকাশের কুণ্ঠায় অসুস্থ ছেলের কাছে ঘেঁষেনা তার চেয়ে এ মাতালের মধ্যেও যেন মনুষ্যত্ব আছে। আর একদিনের কথা প্রভার চিরকাল মনে থাকবে—সেদিন ছেলের একশো ছয় জ্বর। জ্বর আর নামছে না তখন বরফ পাওয়া যাচ্ছেনা। মেজ ভাই মাণিকচাঁদ সেই কথা বলতে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন চন্দ্র-মোহনবাবু। বললেন যেখান থেকে হোক যতটাকা লাগুক বরফ আমার চাইই। এলো বরফ, জ্বর নামলো। এর অনেক পরে যেদিন সত্যিই চন্দ্রমোহনবাবু মারা গেলেন, মুখে রক্ত উঠে, গদাই সেদিন তাঁর বারে বারে ডাকাতেও তাঁর কথা রেখে তাঁকে দেখতে যায়নি। সেদিন অনেকবার প্রভার এই দিনের কথা মনে পড়েছে! সেদিন সেইভাবে বরফ আনিয়ে না দিলে আজ এই ছেলে বাঁচতো কী? প্রভা বারে বারে ভগবানের কাছে বলেছে ঠাকুর গদাইকে তুমি ক্ষমা কোরো। এ কী অন্যায় করলো সে?

অহঙ্কার আর অহঙ্কার এই দিয়ে যেন সব বুদ্ধি, সব বিদ্যা, সব জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে গেছে গদায়ের। মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেনা সে। চন্দ্রমোহনবাবুর স্বপক্ষে কিছু বলার নেই সত্যি। তবু দুটি কথা স্বীকার করতেই হবে। চন্দ্রমোহনবাবুর ছেলে ছিলো না। মেয়েদের সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক আসলে চন্দ্রমোহনবাবু তাদের বলতেন "আমার সোনার চাঁদ ভাইরা আছে। তারা যেন বিষয়ের লোভে মেয়ে না দিতে চায়।" যদিও অনু চন্দ্রমোহন-বাবুর ঘনিষ্ঠ হতে কখনো পারেনি। তবুও তাঁর কাছে মেয়েদের মত অনেক স্নেহের পরিচয় সে পেয়েছে! সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। শ্বশুরবাড়ীর নিষ্ঠাবান ভক্ত চূড়ামনিদের কাছে যা দুষ্প্রাপ্য ছিল।

একদিন গদাই আস্ফালন করে বললো "আমাদের বাড়ীর কাছেই ত মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম, বাবা একবার কুড়িটা টাকা দিয়ে আমাদের বললেন যাও টাকাটা দিয়ে এসো।" ভঙ্গীটা যেন ভিক্ষা দেবার ভঙ্গী। প্রভা ভাবলো হায়রে? কাশীতে থেকেও গদায়ের বাবা যে বিশ্বনাথ দর্শনে যান না এটাও তাঁর একটা গর্ব্বের কথা। বিশ্বের যিনি নাথ তাঁর কাছে যাবার প্রয়োজন নেই প্রসন্নবাবুর, তিনি ঘরে বসেই বিশ্বনাথকে পাবেন এই তাঁর আশা। ঠাকুর সম্বন্ধে অদ্ভুত তাদের মনের ভঙ্গী। তাদের ঠাকুর কাশ্বরা দর্শনও করতে পারবে না। আবার পুজোর সময় নতুন কাপড় পরা নাকি মহা দোষের। প্রভার বাবা বলতেন, আমাদের দরিদ্র দেশ; সকলকে নতুন কাপড় না পরিয়ে ছেলে পুলেদের নতুন কাপড় দিতে কষ্ট হয়। আর প্রসন্নবাবু বলেন নতুন কাপড় পরে সোনারবেনেরা—যারা শুধু টাকাই চেনে কিন্তু তাঁর চেয়ে বেশী টাকা কে চেনে?

(ক্রমশঃ)

নিষ্পাপ ও পাপিষ্ঠা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তখন প্রত্যূষ কাল।
আকাশের দিকে দিকে বুক ভরে জেগে ওঠে নানা রং লাল।
রংয়ের অক্ষরে যেন লেখে তারা ঈশ্বরের নাম।
শ্যাম ধরণীর ঘুম ভাঙে কি না ভাঙে
বিধাতারে সে তখনো জানায় নি তার আহ্নিক প্রণাম।
পাখীর ভেঙেছে ঘুম। নদী জল তখনও স্থির কেহ ছোঁয় নাই।
কোনো ফুল ফুটিয়াছে। প্রভাতের পূজা শেষ করে
কেহ কেহ পড়িয়াছে ঝরে।

* * * * *

কে ডাকিল উন্মত্ত চিৎকারে "মারো ওরে। মারো মারো ওরে।"
নিস্তব্ধ সুষুপ্ত গ্রামে দিকে দিকে প্রান্তরে প্রান্তরে
প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে। জাগিল মানুষ আবৃদ্ধ-আবাল।
কে করিছে চিৎকার করাল।
'মারো ওকে পাপীয়সী পাপ করিয়াছে।
কেড়ে লও বসন উহার। টানো ছিঁড়ে ফেল কেশ
ছিন্ন ভিন্ন করে দাও বস্ত্র যাহা অঙ্গে আছে।
লজ্জাহীনা পাপিষ্ঠা নারীর বসনের কিবা প্রয়োজন
গণিকার বসনে কি কাজ।
অট্টহাসে পুরুষ সমাজ।
'টেনে ফেল সর্ব আবরণ'।

কেহ টানে বেশ বাস কেহ কেশ পাশ
এক সাথে টানে ছেঁড়ে কুন্তল বসন
বিবসনা বিহ্বল নয়ন—
নত মুখে জানু পাতি বসে পড়ে নারী ভূমিতলে
বাহু দিয়ে বক্ষপুট করে আবরণ
ঘন কেশ টানে বুকে গায়ে গায়ে।
ক্রুর কণ্ঠে হাসে নারীদল বলে দেখ গণিকার লাজ
পাপিনীর বসনে কি কাজ
ক্ষুদ্র শিশু জননীরে বলে 'পাপ নাম কার?
দেখিব পাপেরে ডাকনা তাহারে একবার,
ওরে কেন মারে লোকে।
হাসে নারী বলে শোন্ শিশুর বচন
পাপ কভু কে দেখেছে চোখে'।
আবার চিৎকারে সবে শিলা আনো আনো
সূর্য্য উদয়ের আগে মারো ওরে পাথরে পাথরে
এক সাথে পাপিনীরে হানো।

দূর হতে ভেসে আসে কার এক শান্ত কণ্ঠস্বর
'থামো থামো ওরে
কে করেছে কি বা পাপ মারিছ কাহারে।'
ক্ষণেক থামিল সবে। পিছাইল মুখরা রমনী।
পুরুষ কহিল 'এই নারী লিপ্ত ব্যভিচারে।'
অশ্রুহীন নতনেত্র। যৌবন আনত তনু অবনত সরমে ও ভ...
বিবসন নগ্ন দেহে পড়িয়াছে ঊষার আলোক
ছিন্নবাস দূরে আছে পড়ে
কহিল পুরুষ দল 'ওঠ্ ওঠ্ পাপীয়সী ওরে'
প্রভু এসেছেন তোর পাপে দিতে সাজা
বন্ধু দল এক সাথে হানো শিলা। বাজা বাদ্য বাজা।

হোক প্রভুর সমুখে ওর রক্তাক্ত মরণ। হবে পাপ বিমোচন।"
চারিদিকে বাজে বাদ্য, জাগে উন্মত্ত নর্তন।
রমণীর লাজনত শির আরো নেমে আসে বুকের উপরে।
সেই বুকে কাঁপিতেছে আশাহীন ভাষাহীন মানবীর ভয়ত্রস্তমন
যে ভুলেছে মৃত্যুভয়! একসাথে জীবন মরণ।

* * * * *

শান্ত মুখে কহিলেন প্রভু, কে তোমরা পৃথিবীতে কভু কর নাই পাপ
প্রথম আঘাত কর ওরে।
হে নিষ্পাপ বন্ধুগণ মোর, করিব আঘাত আমি তোমাদের সাথে
তারপরে।
শুনে থামে বাদ্যভাণ্ড। নারীর মুখর শ্লেষ থামিল জিহ্বায়।
নীরব পুরুষদল। হাত হতে খসিল পাথর।
মৃদু বাক্যে কানাকানি চোখে চোখে প্রশ্ন জাগে—পাপহীন কে আছ
হেথায়।
জনতা নীরব নিরুত্তর। শূন্য হয়ে আসিল প্রান্তর।

* * * * *

স্কন্ধ হতে নামাইয়া উত্তরীয়খানি প্রভু রাখিলেন নারীদেহ 'পর।

(বাইবেল অনুসরণে *)

সোনার তরী

অশোক সেন

প্রথম কবিতার নাম অনুসারেই কাব্যের নাম দেওয়া হইয়াছে। 'সোনার তরী' কবিতাটি লইয়া একসময় বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা দিবার জন্য কবিকে কলম ধরিতে হয়। কবি লেখেন: "সোনার তরী' বলে একটি কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষ্যে তার একটি মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করেছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো চারদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হ'য়ে আছে—সেইজন্য গীতা বলেছেন—

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
> অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠ্‌ছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হলো-তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য—ফল তা সে এ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবেনা—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সংগে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ; তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে। সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছেনা, কিন্তু মানুষ যখন সেই সংগে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনো-মতেই জমাবার জিনিস নয়।"

প্রেম এবং সৌন্দর্যের অনুভূতি দেহকে অতিক্রম করিয়া দেহাতীতের পানে মনকে আকর্ষণ করে—এমন একটা উন্নত স্তরে উঠিতে চায় যাহার প্রভাবে মানুষের পক্ষে নিজের অন্তরের মাহাত্ম্যকে খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয়না। প্রেম ও সৌন্দর্যের সার্থক রূপায়ণ 'মানসী' ও 'চিত্রাঙ্গদায়' এবং পূর্ণ প্রস্ফুটন "সোনার তরীতে।"

তাছাড়া ক্রমশঃ মানুষ এবং প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের দিকটাও এখন হইতে রবীন্দ্ররচনায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিতেছে। বৈচিত্র্যকে ঐক্যের বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত করা, খণ্ডকে অখণ্ডের অংশবিশেষ হিসাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস যেন 'সোনার তরীতে' আসিয়া দানা বাঁধিয়াছে।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলি ভাবগম্ভীর এবং শব্দ-চয়নের দিক দিয়াও অতুলনীয়। ধ্বনির গাম্ভীর্য এবং ছন্দের লালিত্যে 'সোনার তরীর' কবিতাগুলি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

'সোনার তরীতে" জীবনদেবতা সম্বন্ধেও কিছু আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'সোনার তরীর' সূচনায় কবি লিখিয়াছেন: "মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে

জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করিনি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে। তারই এসেছিল ডাক। মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়েছিল। আলোতে তাই ফুটে উঠ্‌তে লাগলো। কিন্তু 'সোনার তরীর' লেখা আর এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনা বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি। বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যাম-শ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সৃজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছেছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি। সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হ'তে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনারতরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি ?"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমান্টিসিজমের প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। সুতরাং এইখানে প্রথম ইংরাজ রোমান্টিক-কবিদের কাব্যপ্রেরণা, কাব্যরচনায় কল্পনার স্থান, কাব্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিলে তা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একথা বলাই বাহুল্য যে, সমস্ত রোমান্টিক কবিদের দ্বারা স্বীকৃত কোন বিশেষ রোমান্টিকথিওরী কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোনো বিশেষ একজন সমালোচকও সুসংবদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে রোমান্টিক পদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। কোল্‌রিজের লেখাতেই তবু অনেকটা বস্তু পাওয়া যায়—যদিও তাঁর বক্তব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং টুকরাটুকরাভাবে বিবৃত হইয়াছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ খানিকটা কোলরিজেরই পথে গিয়াছেন—অবশ্য তিনি একথাও বলিয়াছেন যে তাঁহাকে সমালোচক হিসাবে ধরিলে ভুল করা হইবে। কারণ চাপে পড়িয়াই তাঁহাকে সমালোচক সাজিতে হইয়াছিল। কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমালোচনায় অনেক ছোটখাট আত্মবিরোধী উক্তি এবং বৈষম্যের সমাবেশ দেখা যায়।

শব্দের স্পষ্ট সংগা দিবার ব্যাপারে বা শব্দের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার বিষয়েও রোমান্টিক ক্রিটিকদিগের উপর কোনও আস্থা রাখা যায়না। যে আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা কাব্যসমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে বিশ্লেষণপ্রসূত স্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়না—পাওয়া যায় উৎসাহ-আবেগপূর্ণ-উচ্ছ্বাসেভরা

বিবৃতি। এইসব বিবৃতির ভিতর হইতে তাঁহাদের স্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধে ধারণা করাও বেশ কঠিন হইয়া পড়ে।

তাহাছাড়া প্রত্যেক সমালোচক তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন ধরুন শেলী ছিলেন প্লেটোনিক মতবাদে বিশ্বাসী, হ্যাজলিটের ধারণা ছিল তিনি এমপিরিসিষ্ট, কোলরিজ ছিলেন কান্টিয়েন—ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন তিনি কখনও কান্টের বই পড়েন নাই, এমনকি কোন প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক পদ্ধতি হইতে বরাবরই দূরে থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন—স্বাধীন চিন্তাধারা এবং কল্পনাশক্তির অনুপ্রেরণার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া তিনি কাব্যরচনা করিতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ এত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সাহিত্যিকদের ভিতর মতের ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা অসম্ভব মনে হয়। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও কয়েকটি ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি একটি রোমান্টিক থিওরীর প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই সময়ের সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া প্রায় একই ধরণের উপসংহারে আসিয়াছেন।

রোমান্টিসিজমের প্রথম ব্যাখ্যাকারী বলিতে কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হ্যাজলিট এবং শেলীকেই বোঝায়—কীট্‌সও তাঁহার পত্রাবলীতে এবিষয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দু'চারটি মন্তব্য করিয়াছেন। কোলরিজের মতামতই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিফেস পড়িয়া বুঝা যায় যে কাব্যের উপযোগী অনুভূতি বলিতে তিনি বোঝেন—সেই ধরণের অনুভূতি যাহা চিন্তার সংগে গভীরভাবে যুক্ত, অন্তরের গভীর হইতে যে অনুভূতির উৎপত্তি, যাহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন "Emotion recollected in tranquility." রোমান্টিক কবিদের মতে অনুভূতিই কাব্যরচনার প্রধান উপাদান। এই অনুভূতিই কবিকে প্রেরণা দেয় এবং ভাবের আবেগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হন।

এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন :

Those primary sensations of the human heart, which are the vital springs of sublime and pathetic composition……and as from these primary sensations such composition speaks, so, unless correspondent ones listen promptly and submissively in the inner cells of the mind to whom it is addressed the voice cannot be heard…… [upon Epitaphs] [Wordsworths' [Literary Criticism ed. Nowell Smith, London 1905-P108.]

আবার শেলীর মতে :

The pleasure and the enthusiasm arising out of those images and feelings in the vivid presence of which within his own mind consists at once the poets inspiration and his reward. [Preface to the Revolt of Islam, in the complete poetical Works. Thomas Hulchinson (Oxford Standard Authors 1943) P-33.]

কোলরিজ তাহার ভাষায় দার্শনিকতার প্রলেপ মাখাইয়া বলিয়াছেন যে :

Man……must always be a poor and unsuccessful cultivator of the Arts if he is not impelled first by a mighty, inward power, a feeling quod regneo: monstrare, et sentio tantum; nor can he make great advances in his art, if, in the course of his progress, the obscure impulse does not gradually become a bright and clear and living idea. [Treatise on Method, ed Alice D. Snyder (London, 1934), p 64.] ওয়ার্ডসওয়ার্থের primary sensations', যা প্রতিধ্বনিত হইতেছে "inner

cell of the mind"-এ শেলীর ',enthusiasm and pleasure".

কোলরিজের intimations of an idea, বহির্মুখী চিন্তাপ্রসূত নয়, কবির অন্তর্মুখী চিন্তার কথাই তাঁহারা বলিতেছেন। কোলরিজ একজায়গায় লিখিয়াছেন যে কবির আবেগ বস্তুটিও আপাতদৃষ্টিতে কিছু দেখিয়া উৎপন্ন হয়না—গভীরভাবে কোন বিষয়ে চিন্তার ফলেই আবেগের সৃষ্টি হয়।

সমালোচক P.W.K. Stone তাঁহার The art of Poetry বইতে লিখিয়াছেন :

It is in fact characteristic of the Romantics to talk of feeling as associated with contemplation : Wordsworths' conception of emotion recollected, described in the Preface, is reflected in Coleridge's praise of his meditative pathos, a union of deep and subtle thought with sensibility. Hazlitt elaborates on precisely the same idea of feeling involved with meditation as the source of poetry. Coleridge indeed, in a mood of speculative curiousity rare with romantics when they are writing on this topic, contrasts the emotion arising from the life within' with the feeling that displays itself externally, the "passion" of the rhetoricians.

কবিগুরু তাঁহার 'আত্মপরিচয়' বইতে লিখিয়াছেন : "বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া, মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই'। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎপরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি!

* * * *

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়-দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে,—যাহা চোখের সামনে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাছে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাক্ত করিয়া থাকে—যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফেরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেইসকলকাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে ইংরাজ রোমান্টিক কবিদিগের সহিত কাব্যরচনার প্রেরণা বা কাব্যসৃষ্টির আসল পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মতৈক্য আছে—

এবার 'সোনারতরী'র কয়েকটি কবিতার আলোচনা করা যাক্—

পরশ পাথর

খ্যাপা সাধারণ জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পরশপাথরের সন্ধানে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে মোটেই আত্মসচেতন নহে—আসলে সে বৈরাগ্য-বিলাসী। এদিকে কখন তাহার অগোচরে তাহার কাঁকালের লোহার শিকল পরশ পাথরের স্পর্শে সোনায় রূপান্তরিত হইয়াছে—যখন জানিতে পারিল তখন হাহাকার করিয়া আবার পূর্বপথে ধাবিত হইল হারানো রতনের সন্ধানে।

যাঁহারা মনে করেন কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা জীবনে অনির্বচনীয়কে লাভ করিবেন, তাঁহাদের অবস্থা এই খ্যাপারই মতন হয়। পৃথিবীর শব্দ, গন্ধ, বর্ণ, গীত, সৌন্দর্য সব কিছুরই ভিতর সেই অলৌকিক শক্তির স্পর্শ যাহাকে

অবজ্ঞা দেখাইলে ঈশ্বরের প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। রূপের ভিতর হইতেই অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। রূপের জগৎকে অগ্রাহ্য করিয়া অরূপের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইলে খ্যাপার মতই বিপথগামী হইতে হয়।

বৈষ্ণব কবিতা

পঞ্চভূতে কবি লিখিয়াছেন :

"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায়না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারেনা। তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, 'তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

বৈষ্ণব কবিতা শুধু স্বর্গের দেবতার প্রণয়, বিরহ, প্রেমলীলা বিষয়ক কাব্য এ কথা ঠিক নহে—এ সংগীত-ধারা মর্তের মানুষের প্রেমতৃষ্ণাও সমভাবেই মিটাইবার জন্য রচিত। বৈষ্ণব কবিতায় স্বর্গ ও দেবতাকে পৃথিবী ও মানব হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিযুক্তভাবে দেখা হয় নাই এই কথাই কবি বলিয়াছেন।

দুই পাখি

প্রত্যেক মানুষের ভিতর দ্বৈত সত্বা বিরাজ করে।—একজন চায় সীমার জগতে আবদ্ধ থাকিতে, অপরজন অসীমের পানে ধাবমান হইয়া মুক্তির স্বাদ উপভোগ করে। এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়েই মানুষের জীবনে চরিতার্থতা আনিতে পারে। কবিতাটিতে সীমা এবং অসীমের মিলনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আকাশের চাঁদ

জাগতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া যে ব্যক্তি স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে পাইতে চায়, জীবনের অপরাহ্নে তাহার উপলব্ধি হয়, যে সে সম্পূর্ণ ভুল পথে চলিয়াছিল—মন নৈরাশ্য এবং অনুশোচনায় ভরিয়া ওঠে। তখন সে ভাবে আর একবার অতীত জীবনকে ফিরিয়া পাইলে কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আকাশের চাঁদকে পাইবার ব্যর্থ সাধনায় সে সোনার জীবনকে উপেক্ষা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিত না।

যেতে নাহি দিব

সাংসারিক ব্যাপারেও যেমন স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, প্রেম, বিচ্ছেদকে রোধ করিতে পারে না, তেমনি পার্থিব ব্যাপারেও অনাদি অনন্তকাল হইতে এই যাওয়া-আসার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কবির চারি বৎসরের শিশু কন্যাটি যেমন নিস্ফল দাবী জানায় যেতে নাহি দিব, পৃথিবীর বেলাতেও ঠিক তাই ঘটে।

"চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
যেতে নাহি দিব। ম্লান মুখে, অশ্রু আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
যেতে নাহি দিব। যতবার পরাজয়
ততবার কহে, আমি ভালোবাসি যারে
সেকি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।"

প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা

প্রকৃতির সঙ্গে মানবের গভীর একাত্মতার অনুভূতি অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে 'মানস—সুন্দরী', বসুন্ধরা, সমুদ্র প্রভৃতি কবিতায়। কবি আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন :

এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চির পুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে.আকর্ষণ করিয়াছে।

সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি, কাহাকে বলে। পৃথিবীকে যাহারা 'জলরেখাবলয়িত মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়। প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব—

এমন সুন্দর দিন রাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতি-দিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে? কতবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা। এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না। মনটা যেন আরও শতলক্ষ যোজন দূরে। রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষ-গুলি সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে—পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এইজন্যে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখেনি। চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি। সেই আশ্চর্য! এই স্বেচ্ছা অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে।

এক সময় আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত সূর্য কিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম। তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস। যে একটি জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্য ক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।

এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে ওঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না।

'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'

'প্রবাসী' চিরকালই দেশের কথা ও পল্লীর কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সকল সমস্যা-সমাধানের নির্দেশক এই প্রবাসী। নিরপেক্ষ সমালোচনা সেদিন একমাত্র 'প্রবাসী'ই করিয়াছে। সত্যরক্ষার্থে কঠিন মন্তব্য করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীকেও কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবাসী চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে।

রাজনৈতিক ফাঁদে বাঙালীর দুর্গতি আজ নূতন নয়। সেই কতবছর আগে 'প্রবাসী'ই বলিয়াছে:

"বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মানীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাঙলাদেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলাদেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে, যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহারপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, 'ওহে, দেশের জন্য কিছু কর,' তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?" সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর," তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ।" প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭।"

এই দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই 'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'। বিদগ্ধ-সমাজে আজও প্রবাসী আদরণীয়। যদিও কালের প্রভাবে আজ মানুষের রুচি নিম্নগামী। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-অধোগতি লজ্জার কথা!

বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার শ্যামচ্ছায়ায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটা পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করতো। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীতহিরণ্য অঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় ঐ আকাশ প্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন—আমার দিকে তেমন লক্ষ করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কবির নিসর্গ-বিষয়ক কবিতাগুলি পড়িলেই বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ইমাজিনেশন কতটা রসঘন এবং ব্যঞ্জনাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—অথচ প্রকৃতি এবং মানবের ভিতরকার যে সম্পর্কের কথা তিনি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত।

ঝুলন

বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়-হীন তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয়না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোন এক কবিতায় লিখেছিলেম, বলেছিলেম আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেগে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

(সাহিত্য তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪১)।

ঝুলন কবিতাটি এই পরিপ্রেক্ষিতে পড়িলে অর্থবোধে কষ্ট হইবে না।

জীবনে যাঁহারা সাধনার পথ বাছিয়া লন—অর্থাৎ শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারনের গ্লানি যাঁহাদের পক্ষে গ্লানিকর, যাঁহারা আদর্শবাদী তাঁহাদের যাত্রাপথ কখনও সুগম হয় না। বহু বাধা, বিঘ্ন, বিপদের ভিতর দিয়া প্রাণের সঙ্গে মরণখেলা খেলিয়া তবে তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি হয়।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

ইহা জীবন দেবতা বিষয়ক কবিতা। সমালোচক এডওয়ার্ড টমসনের মতে—

"Gradually Rabindranath grew to be dominated by the thought of a deeper fuller self seeking expression through the temporary self. He insisted that Jibandevata is not to be dentified with God. He is the Lord of the Poets life, is realizing himself through the poets work, the poet gives expression to him, and in this sense is inspired.

"The idea, the poet told me, has a double strand. There is the Vaishnava dualism—always keeping the separateness of the self and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual, and God is also the ground reality of all, as in vendatist unification. When the the Jibandevata idea came to me, I felt an overwhelmiag joy—it seemed a discovery, new with me—in the deepest self seeking expression. I wished to sink into it, to give myself up wholly to it. Today, I am on the same plane as my readers, and I am trying to find what the Jibandevata was."

নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবি যেন জীবন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন কবে তাহার যাত্রার সমাপ্তি ঘটিবে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে, জীবনের আদর্শের স্পষ্ট রূপায়ণ এবং পরম পরিস্ফুটনে দেহমনে পরম তৃপ্তি এবং শান্তি আসিবে।

(৪৮৮ পৃষ্ঠার পর)

সেই দেশের কঠোর নীতির উপাসকদিগের সাহায্যার্থে প্যাক্ট স্বাক্ষরকারীদের সেই দেশে সৈন্য প্রেরণ করিবার অধিকার গ্রাহ্য হইবে। চেকোস্লোভাকিয়া এই প্যাক্ট নির্দ্ধারিত পন্থায় কোন কম্যুনিজম্ কাঠিন্য নিবারণ চেষ্টা করিলে বন্ধুজাতিদের সৈন্য দিয়া শাসিত হইবে ইহাই ধরা যাইতে পারে। চেকোস্লোভাকিয়া ওয়ারশ প্যাক্টের জাতিগুলির বিরুদ্ধে লড়িয়া জিতিতে পারে না; সুতরাং আক্রান্ত হইলে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। রুশিয়া প্রমুখ কম্যুনিষ্ট দেশগুলি কোন জাতি পরাজয় স্বীকার করিলেই যে তাহাকে শান্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে দিবে এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। নিজ দেশে যাহারা বিরুদ্ধবাদীদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া থাকেন তাঁহারা যে অপর দেশে গিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগকে নির্ব্বিবাদে বাঁচিয়া থাকিতে দিবেন ইহা বিশ্বাস করা যায় না। রুশিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশগুলিতে যখন বিরুদ্ধ মত প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে তখন মস্কো কি ভাবে সেই সকল মতদ্বৈধের সমাধান করিয়াছেন তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে রুশিয়ার দমননীতি কত কঠোর হইতে পারে। সুতরাং চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রচেষ্টার ফলে কখনও ঐ দেশের স্বাধীনতাপ্রয়াসী নেতাদিগের পক্ষে নিরাপদ হইবে না। সাক্ষাৎ ও সর্ব্বজন জ্ঞাতসারে কোন প্রকার গণদমন হইবে কি না বলা যায় না; কিন্তু গোপনে যে বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহার পরে যে চেকোস্লোভাক জনসাধারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন সংগ্রাম চালাইয়া নিজেদের মুক্তির পথ খোলা রাখিয়া চলিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। হাঙ্গেরীতে ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে যখন ঐ দেশের লোকেরা কম্যুনিজম্‌কে সহজ পথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন রুশিয়ার ট্যাঙ্ক সেই চেষ্টা নিষ্ঠুরভাবে দমন করিয়া হাঙ্গেরীর লোকেদের পুনরায় কম্যুনিষ্ট আদর্শবাদের কীলকশয্যায় শায়িত করিয়া দিল। আজ সেই হাঙ্গেরী চেকোস্লোভাকিয়া দমনের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। লাঙ্গুলহীন শৃগালের কাহিনী মনে করাইয়া দেয়।

এখন চেকোস্লোভাকিয়ার ভবিষ্যত কি হইবে তাহা অজানা হইলেও সহজেই অনুমেয়। যে সকল নেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারে বিশ্বাসী এবং নিয়মতন্ত্রকে পরিবর্ত্তিত আকারদানে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের অবস্থা অতঃপর বিশেষ খারাপ হইবে। যাঁহারা বিশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া রুশিয়ার হুকুমে চলিতে প্রতিজ্ঞা করবেন তাঁহারা বাঁচিয়া যাইতে পারেন। লোক দেখান কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; কিন্তু বস্তুত এই যাত্রায় চেকোস্লোভাকিয়ার কোন বিশেষ স্বাধীনতা অর্জ্জন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

"হেড স্টাডি"

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"হেড স্টাডি"

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ প্রথম খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৭৫	৬ষ্ঠ সংখ্যা

নির্ব্বাচনের কথা

নির্ব্বাচনের কথা আলোচনা করিলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে হয় নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য কি। সাধারণতন্ত্রে নির্ব্বাচনের ঊদ্দেশ্য হইল জনমতসম্মতভাবে রাজ্যশাসন কার্য্য চালনা। জনগনের কর্ত্তব্য সমাজের যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নর্ব্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের গুণাগুণ বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া ংকৃষ্টরূপে জাতীয় শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা। অথবা, যদি রাষ্ট্রীয় দলগুলির আশ্রয়ে জাতির াসনকার্য্য রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে হয় তাহা হইলে দলগুলির নেতৃত্ব ও সভ্যদিগের স্বভাব চরিত্র বিচার করিয়া স্থির রা উচিত যে কোন দল জাতীয় ব্যাপারে অধিক বিশ্বাসযোগ্য এবং কোন দল বিশ্বাসের অযোগ্য। বিগত ১ বৎসর ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাঁহারা অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের মধ্যে ধিকাংশ ব্যক্তিই অপরক্ষেত্রে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম না হইয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে সৌভাগ্য অনুসন্ধান রিতে আসিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীদিগের মধ্যে অল্প লোকই দেখা যায় যাঁহারা আইন প্রণয়ন থবা শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ অথবা জাতীয় সমস্যা সমাধানে তৎপর। বর্ত্তমানে যে নির্ব্বাচন বাংলার জনসাধারণের কটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও প্রার্থীর দলের মধ্যে নূতন প্রতিভা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ব্যক্তিগত ক্ষমতা দিয়া নূতন নির্ব্বাচনে রাষ্ট্রীয় অবস্থা কি দাঁড়াইবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে উন্নতির আশা কোথাও জ্বল হইয়া দেখা দিতেছে না। বরং দেখা যাইতেছে যে আরও নব নব কর্ম্মক্ষমতাহীন দুঃসাহসী সৌভাগ্যানুসন্ধানী াকেরাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। এই সকল "অ্যাডভেঞ্চারার"দিগের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যার্থে লক্ষ টাকা অপব্যয় করা কোন জাতির কর্ত্তব্য কি না তাহা স্থির মস্তিষ্কে বিচার করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে যে

প্রেসিডেন্টের রাজ চলিতেছে, তাহাতে যদি ধরা যায় আমাদিগের জাতীয় অবস্থার কোনই উন্নতি হইতেছে না, তাহা হইলেও একথা স্বীকার্য্য যে হাল্লা-হুজুক কম হইতেছে এবং নূতন নূতন পথে জাতির সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিতেও কাহারও সুবিধা হইতেছে না। ইতিপূর্ব্বের বাংলাদেশের শাখা কংগ্রেসের রাজত্ব অথবা সাতদলের মিলিত ফ্রন্টের রাজত্বের তুলনায় প্রেসিডেন্টের রাজত্ব কিছুমাত্রও নিকৃষ্ট নহে একথা সকলেই বলিবে। প্রেসিডেণ্টও স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক, কোন স্বৈরাচারের আদর্শে বলপূর্ব্বক সিংহাসন দখলকারী ব্যক্তি নহেন। তাঁহার রাজত্ব স্বাধীনতার হানিকর বলা যায় না। বিশেষ করিয়া যেখানে প্রদেশের লোকেরা নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে অক্ষম সেখানে সাধারণতন্ত্রের অপর কোন অভিব্যক্তি সম্ভব হইলে, যথা প্রেসিডেন্টের শাসন, তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, একথা বলা যাইতে পারে। যাঁহারা বলেন প্রেসিডেন্টের রাজত্ব স্বায়ত্তশাসন নহে, তাঁহারা ভুল কথা বলেন। উহাও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার আদর্শই ব্যক্ত করে। আরও ঘনিষ্ঠ, নিকটতর ও সাক্ষাৎভাবে নিজ অধিকার নিজে ব্যবহার করিলে হয়ত স্বাধীনতার পিপাসা অধিকতর মাত্রায় মিটান যাইত; কিন্তু যেখানে তাহা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতে বাধার সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে দূরের বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিয়াই নিকটের লোকেদের কাজ করাইয়া লওয়াই উপযুক্ততর পন্থা।

বর্ত্তমানে যদি দেখা যায় যে নানাপ্রকার নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় দল সৃষ্টি হইয়া রাষ্ট্রীয় আদর্শ ক্রমশঃ কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে; এবং কোন দলকেই সমর্থন করা আর নিরাপদ মনে হইতেছে না; তাহা হইলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা অজানা ও অচেনার অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়ার মতই বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িবে এবং সেই অবস্থায় বিপদ ডাকিয়া আনা বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। যেখানে দলগুলির মতবাদ জানা আছে সেখানেও যদি দেখা যায় যে মতবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দলের লোকেরা বিশেষ উৎসুক নহেন; শুধু স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য; সেখানেও দল দেখিয়া নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণরূপে নিরাপদ হয় না। অর্থাৎ অজ্ঞাত রাষ্ট্রীয় আদর্শ অথবা পূর্ব্ব পরিচিত আদর্শ উভয়ই এক পর্য্যায়ে পড়িতেছে। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করিয়া নির্ব্বাচন করার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। দূরের মানুষের স্বার্থপরতা কখনও ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষতির কারণ হইতে সহজে পারে না। নিকটের শত্রু অধিক ভয়াবহ, কারণ সে সকল কথাই পূর্ণরূপে অবগত ও সেই কারণে তাহার শোষণ পদ্ধতিও সকলকে দুর্গতির চরমে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। সকল কথা বিচার করিয়া মনে হয় রাষ্ট্রপতির শাসন অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষতির কারণই হইতে পারে। নূতন নূতন শাসকের সৃজন করিয়া শোষণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক ও গভীর হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

যদি বলা হয় জাতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে যত শীঘ্র সম্ভব নির্ব্বাচন হওয়া প্রয়োজন, তাহার উত্তর এই যে যখন সেই সাধারণতন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াও নিজ ক্ষমতা নিজ দোষেই হারাইয়া ফেলে, তখন পুনঃনির্ব্বাচন অবিলম্বে করিতে হইবে বলিবার অধিকার আর তেমন প্রবল থাকে না। কারণ নির্ব্বাচন করিলেই যে পূর্ব্বের পাপের পুনরাবৃত্তি হইবে না সে কথা কে বলিতে পারে। যে সকল রাষ্ট্রীয় দল নির্ব্বাচন শীঘ্র শীঘ্র করিতে বলিতেছেন সেই সকল দলের লোকেদের অনেকেই আত্মবিক্রয়ে অপারগ নহেন। এই সকল লোক আমেরিকা, চীন বা রুশিয়ার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিতেছেন কি না তাহা আমরা জানিনা। সন্দেহ হয় যে বহুলোকেই বিদেশের অর্থে পুষ্ট। এ কথাও সর্ব্বজন-বিদিত যে ভারতের বহু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বহু লোক অর্থ লইয়া এই দল ছাড়িয়া ঐ দলে গমন করেন এবং পুনরায় সেই দল ছাড়িয়া অপর কোন দলে চলিয়া যান। এই সকল কারণে নির্ব্বাচন আগ্রহ দেশের লোক হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রার্থীদিগের অথবা তাহাদিগের নিয়োগকর্ত্তাদিগের আগ্রহই অধিক প্রকট। যাহারা নির্ব্বাচন করিবেন তাঁহারা বিশেষ ব্যস্ত নহেন কাহাকেও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে। সুতরাং প্রথমতঃ মনে হয় এখন নির্ব্বাচন বন্ধ

রাখিয়া আরও কিছুকাল রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতে দিলে দেশের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইবে।' কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন অনুবর্ত্তন করা হয় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের রাষ্ট্রীয় মতামতের অস্থিরতার জন্য। তাঁহারা যদি ক্রমাগতই দল পরিবর্ত্তন করিয়া গভর্ণমেণ্ট উল্টান একটা নিত্তনৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া তোলেন ও সেই অভ্যাসের দোষেই যদি কন্‌ষ্টিটিশন অচল হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাঁহাদিগের কোন কথারই কোন মূল্য থাকে না, এবং তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য দেশবাসী ক্রমাগত নির্ব্বাচন করিতে দৌড়াইতে থাকিবে, তাহাও তাঁহারা দাবী করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি বা পুনঃনির্ব্বাচন করা আবশ্যক মনে হয় তাহা হইলে তাহা প্রার্থীদিগের সুবিধা দেখিয়া করিবার কোন কারণ নাই। জনসাধারণের সুবিধাই প্রধানতঃ বিচার করিতে হইবে। এই নভেম্বর মাস নিশ্চয়ই সুবিধার সময় নহে; এবং ধান কাটা শেষ হইয়া না যাইলে ও বন্যার আক্রমণ পুরাপুরি কাটাইয়া না উঠিলে এই দেশের লোক পুনঃনির্ব্বাচনে দৌড়াইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে না। হয়ত আগামী বৎসর নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিলে তাহা সকলের পক্ষে সহজ হইতে পারে।

তৃতীয়ত, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাহাতে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরা ক্রমাগত দল পরিবর্ত্তন না করিতে পারেন। যদি গভর্ণমেণ্ট বা কনষ্টিটিউশন দিয়া সে ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে জনসাধারণের উচিত হইবে দল পরিবর্ত্তনকারী প্রার্থীদিগকে ভোট না দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে সকল প্রার্থীর রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়া তাহা ভোটারদিগের নিকট প্রচার করা আবশ্যক। এই সকল প্রচার বা অপর ব্যবস্থা অল্প সময়ে করা সম্ভব না হইতে পারে। সেই কারণে নির্ব্বাচনে তাড়াহুড়া করা বুদ্ধির কার্য্য হইবে না।

শিক্ষার আদর্শ

জাতীয় শিক্ষার আদর্শ যাহাই হউক; অর্থাৎ তাহার মধ্যে বিজ্ঞান কিম্বা দর্শন-কাব্য-ইতিহাস প্রভৃতি কতটা স্থান অধিকার করিবে, এবং শিল্পকলা-কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কি প্রকারের হইবে; সেই সকল কথার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা কোন ভাষার মাধ্যমে হইবে তাহাও একটা বড় কথা। ইয়োরোপে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু ধর্ম্মযাজকদিগের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সেই শিক্ষার জন্য ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা ব্যবহৃত হইত। ভারতে শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং সেই শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত মুসলমান জাতিদিগের মধ্যে কোরাণ পাঠ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আরবি ভাষাতে তাহাদিগের শিক্ষা দেওয়া হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বহু শত বর্ষ ধরিয়াই শিক্ষা ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, সংস্কৃত ও আরবি ভাষাতেই দেওয়া হইয়াছে এই সকল সুগঠিত ও সুমার্জ্জিত ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীদিগকে যে ভাবে ব্যাকরণ ও উচ্চাঙ্গের দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতে হইত তাহাতেই ছাত্রদিগের বুদ্ধি ও চিন্তার প্রসার, গভীরতা ও তীক্ষ্ণতার পূর্ণমাত্রায় সাধিত ও রপ্ত করা হইত এবং তৎপরে অন্য বিষয় শিখিতে তাহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত না। অর্থাৎ ভাষা শিক্ষার যে সংযমন, নিয়মন ও শৃঙ্খলার ধারা তাহার ভিতরেই মানব মস্তিষ্ক বহুল পরিমাণে সবল, সজাগ ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। এই কারণে ভাষা শিক্ষাই বিদ্যা আহরণের একটা মূল অঙ্গ বিবেচিত হয়। সুতরাং মাতৃভাষা ব্যতীত অপর ভাষা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত মাধ্যম নহে বলিয়া যে কথাটা অনেকে মহা সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন সে কথাটার বিশেষ কোন মূল্য নাই। প্রাথমিক শিক্ষা সহজভাবে শিশুর অন্তরে স্থাপনার্থে মাতৃভাষার ব্যবহার বিধেয় হইতে পারে কিন্তু তৎপরে অপর ভাষা শিখিবার আবশ্যকতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপে বিদ্যার পরিণত আকার প্রাপ্ত অনেক-

টাই ল্যাটিন ও গ্রীকের মাধ্যমে ঘটিয়াছে। ভারতের বহুশাস্ত্র রচনার কার্য্য সংস্কৃতের মাধ্যমেই হইয়াছে। বর্ত্তমান-কালে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ভিতর দিয়া যে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যার প্রচার হইয়াছে তাহা সবল ও পরিণতভাবে হয় নাই একথা কেহ বলিতে পারেন না। সুতরাং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষা অথবা হিন্দীর মাধ্যমে সকল শিক্ষার ব্যবস্থার কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন তাঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করিয়াই একথা বলিয়া থাকেন। বয়েল, লাভোয়াসিয়ের, ক্যাভেন্‌ডিশ, ডল্টন, ডারউইন, অ্যাডাম স্মিথ, ক্যারাডে, কেলভিন, লামার্ক, হারভে, টলেমি, পিথাগোরাস প্রভৃতি অসংখ্য লোকের নাম করা যায় যাঁহারা বিদ্যার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহার না করিয়াই জ্ঞানের চরমে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিক কালে, আইনস্টাইন জগদীশচন্দ্র, রামন প্রভৃতি বহু মহাপণ্ডিত ব্যক্তিই ল্যাটিন বা অপর কোন মাতৃভাষা নহে এমন ভাষা ব্যবহার করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শুধুমাত্র মাতৃভাষা অথবা হিন্দীর ন্যায় কোন অপরিণত ভাষা ব্যবহার করিয়া যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার উন্নততম স্তরে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদিগের সংখ্যা অনেক হইবে না। ঐরূপ ব্যক্তি কেহ থাকিলে তাঁহাদিগের নাম এখনও সুপ্রচারিত হয় নাই। সুতরাং বহু মেহনত করিয়া যাঁহারা ইংরেজী হটাইয়া তৎস্থলে হিন্দী বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টায় সবল হইলেও শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। হিন্দী এবং ভারতের অপরাপর ভাষাগুলি উচ্চশিক্ষার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কারণ এই সকল ভাষা অদ্যাবধি ঐ কার্য্যে লাগান হয় নাই ও লাগাইবার মত গঠিত ভাবও ঐগুলির নাই। এই জন্য ইংরেজী ত্যাগ করার কোনও সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। হিন্দী কবে সুগঠিত হইবে তাহারও কোন হিসাব নাই। রাষ্ট্রভাষা হইলেও হিন্দী উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হইতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বেতন ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা

যত ব্যয় বাড়িয়া চলে ; সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অথবা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে ভোগের তালিকা দীর্ঘতর হইতে থাকায় ; ততই আয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। তখন আয় বৃদ্ধির আকাঙ্খা প্রবল হইতে প্রবলতর হয় ; বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিক মহলে চাকুরেরা দাবী পেশ করিতে আরম্ভ করে, দোকানদার জিনিসের দাম বাড়াইয়া নিজের আয় বাড়াইতে চেষ্টা করে। কারখানার মালিকরা মজুরদের মজুরী বাড়াইবার জন্য উৎপাদিত বস্তুর মূল্য বাড়াইয়া দিতে থাকেন। ডাক্তার উকিল শিক্ষক-দিগের "ফিস" ও দক্ষিণা বাড়িতে থাকে। বাড়ীভাড়া, রেলটিকিট, ট্যাক্স প্রভৃতি সকল কিছুই অধিক হইতে অধিকতর হয়। অর্থাৎ বেতন বা মজুরী বাড়াইতে পারিলেই আয়ব্যয়ঘটিত আর্থিক সমস্যার সমাধান হয় না। আয় যত বাড়ে, ব্যয়ও ততই বাড়িয়া চলে এবং ব্যয় যত বাড়ে আয় বাড়াইবার তাগিদ ততই অধিক প্রবল হইতে থাকে। এইভাবে আয় ব্যয় উভয়ই বাড়িয়া বাড়িয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে অর্থের কোন আর মূল্য থাকে না ও সকলে ভাবিতে আরম্ভ করে যে কি করিয়া আয় ও ব্যয় এই দুইএর আর্থিক অভিব্যক্তি দমন করিয়া তাহাদের ক্রমাগত উর্দ্ধগমন নিবারণ করা সম্ভব হইবে। অনেকে মনে করেন যে দেশ-শাসকগণ দ্রব্যমূল্য বাঁধিয়া দিয়া একদর রাখিয়া দিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে বেতন বা মজুরীর হারও নির্দ্দিষ্টভাবে বাঁধিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বস্তুত যদি বাজারে মাল সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অধিক থাকে তাহা হইলে মাল খোলা বাজার হইতে সরিয়া কালো বাজারে গিয়া পড়ে এবং দ্রব্যমূল্য গোপনে বাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করে। তখন বাজারের মূল্য দুই প্রকার দাঁড়ায়। যথা বর্ত্তমানে চাউল বা চিনির

মূল্য খোলা বাজারে যাহা কালো বাজারে তাহার দুই তিন গুণ। এই কারণে খোলা বাজারের মূল্য দেখিয়া বেতন বা মজুরী স্থির করিলে মানুষ সেই বেতন বা মজুরীতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে না। ইহাতেই বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এবং সেই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য বেতন বৃদ্ধি করিলেও তাহার ফল কিছু হয় না। কারণ বেতন বাড়িলেই আবার মূল্য বৃদ্ধি আরম্ভ হয়—খোলা বাজারে না হইলেও কালোবাজারে নিশ্চয়ই হয়। এই বিষয়ের একমাত্র মীমাংসা হইতে পারে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিচয় এত অধিক মাত্রায় উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা যাহাতে সেই সকল বস্তুর কোন কালোবাজার না থাকিতে পারে। দ্রব্যগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে প্রকটভাবে কালোবাজারে বিক্রয় হয় খাদ্যবস্তু। বাড়ীভাড়াও যথেষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ না হওয়ায় অতিরিক্ত হইয়া রহিয়াছে। খাদ্যবস্তু ও বাসস্থান ন্যায্য মূল্যে যথেষ্ট পাওয়ার ব্যবস্থা করিলে মনে হয় উপরোক্ত আয়ব্যয়ের দ্রুত উর্দ্ধগমন থামান সম্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে কোন চেষ্টা অবশ্য সরকারীভাবে করা হইতেছে না। কোথাও কোথাও খাদ্যবস্তু উৎপাদন বাড়িয়াছে কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলিতে হরতাল

ভারত সরকার বর্ত্তমানকালে নানা ব্যবসায়ে হাত লাগাইয়াছেন। পূর্ব্বে কোন কোন জনসাধারণের অতি আবশ্যকীয় কার্য্য সরকারীভাবে করা হইত; যথা ডাক ও তার, রেলওয়ে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দেশরক্ষার ব্যবস্থা, টেলিফোন ইত্যাদি। ব্যবসাদারদিগের হস্তে এই সকল কার্য্যভার থাকিলে না কি তাহারা সাধারণকে ঠকাইয়া লাভ করিত ও সেইজন্য সরকারী ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের স্বার্থ পূর্ণরূপে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন দেশে রেলওয়ে, টেলিফোন প্রভৃতি ব্যবসাদারগণ চালাইয়া থাকেন ও সেই সকল দেশের রেলওয়ে বা টেলিফোন খুব উত্তমরূপেই চালিত থাকিতে দেখা যায়। আমাদিগের দেশের ডাক ও তার বিভাগ কিম্বা টেলিফোন বা রেলওয়ে প্রায় অচল বলিলেই হয় এবং সাধারণের উপর ঐ কার্য্য ভারপ্রাপ্ত বিভাগের লোকেরা যেরূপ উৎপাত করিয়া অবাধে নিজ স্বার্থরক্ষা করিয়া মোতায়েন থাকিয়া যায় তাহার তুলনা অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না। আবার কখন কখন এই সকল বিভাগের লোকেরা উপযুক্ত বেতন পাইতেছে না বলিয়া ধর্ম্মঘটও করিয়া থাকে। ইঁহারা যেরূপ কর্ম্মক্ষম তাহাতে ইঁহাদিগের বেতন যাহাই হউক তাহাই অত্যধিক বলা যাইতে পারে। ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি কোনভাবেই ন্যায্য হইতে পারে না কারণ ঐ সকল বিভাগ সাধারণের নিকট যেরূপ হারে পয়সা আদায় করিয়া পরিবর্ত্তে কোন কিছুই প্রায় না করিয়া নিকর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকে তাহাতে বিভাগীয় লোকেদের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া তাহাদিগকে অধিকসংখ্যায় বরখাস্ত করিলেই ন্যায়ের আদর্শ রক্ষা করা হয়। তার পাঠাইলে প্রায় কোন সময়েই তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে ঠিকমত পৌঁছায় না। চিঠি-পত্র প্রায়ই গন্তব্য স্থানে যায় না। শুনা যায় চিঠি পৌঁছানর পরিশ্রম হইতে বাঁচিবার জন্য চিঠিগুলি অনেক সময় যত্রতত্র নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। টেলিফোন করা একটা পাপের ফলের মতই। টেলিফোন না করিয়া পায়ে হাঁটিয়া যাইলে সময় কম লাগে মনে হয়। রেলওয়ের কথাও ঐ একই প্রকার। কোন ট্রেনই প্রায় কোন সময় নিয়ম অনুযায়ী ভাবে কোথাও পৌঁছায় না। তাহা ছাড়া দুর্ঘটনার শেষ নাই। আগুন লাগা, ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য বিভাগের হাসপাতাল, শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার ব্যবস্থা, নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কোন কিছুই উপযুক্তরূপে চলে বলিয়া দেখা যায় না। সুতরাং যাঁহারা সাধারণের খরচে ঐ সকল বিভাগে বসিয়া বেতন ভোগ করেন তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি থাকার কোন কারণ বস্তুত নাই। এই সকল লোক ও তাঁহাদিগের উপরওয়ালাদিগকে বিতাড়িত করাই উপযুক্ত পন্থা। বস্তুত এই বিতাড়ন

কার্য্য আরম্ভ না করিলে দেশের অবস্থা কখনই ভালর দিকে যাইবে না। সম্প্রতি যে রেডিও বিভাগ খোলা হইয়াছে তাহাও স্বেচ্ছাচারিতার কেন্দ্র। এই অবস্থায় আরও নানা প্রকার ব্যবসা ফাঁদিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না; কিন্তু নানা ব্যবসায়ে হাত দেওয়া হইতেছে। এক সকল প্রচেষ্টার নিবৃত্তি আবশ্যক। যেগুলি আছে কঠিন হস্তে সেইগুলির উপযুক্ত পরিচালনা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জনসাধারণের কোন প্রকার অভিযোগ এমন কি সম্পদ ও শারীরিক হানিকর কিছু ঘটিলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রতিকার চেষ্টা করেন বলিয়া মনে হয় না। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে যেরূপ দায়িত্বহীনভাবে কাজ করা হয় তাহাতে মনে হয় যে ঐ দুই বিভাগের লোকেদের কোন কাজ করিতে হইবে বলিয়া তাহারা মনে করেন না। কাজ না করিয়া শুধু বেতন বৃদ্ধির "মাঙ" পেশ করাই এই সকল লোকের কাজ। জনসাধারণের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনভোগী ব্যক্তিগণের কাহার কি কাজ করিবার কথা তাহা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে সরকারী বিভাগগুলিকে বাধ্য করা। রেলওয়েতে যাইলে দেখা যাইবে যে কর্ম্মে ফাঁকি দিবার ফলে জনসাধারণের প্রাণহানী ঘটিলেও কোন ব্যক্তির কোন সাজা প্রায়ই হয় না। অন্তত অসংখ্য রেল দুর্ঘটনার পরে বহু "অনুসন্ধান" ব্যবস্থা হইলেও কাহারও চাকুরী যাইতেছে অথবা জেল হইতেছে বলিয়া শুনা যায় না। ইহার জন্য রেলমন্ত্রী কিম্বা অপরাপর উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদিগেরও কোন ক্ষতি হয় না। শুধু জনসাধারণের সম্পদ, অঙ্গ অথবা প্রাণহানী ঘটে এবং পরে ক্ষতি পূরণের টাকাও ঐ জনসাধারণই দিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কার্য ব্যবস্থায়ই জনসাধারণের স্বার্থ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। জনসাধারণ যদি ইহা সহ্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সকল খরচের চাহিদা মিটাইতে থাকেন তাহা হইলে যে সকল কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সরকারী বেতনভোগীগণ শুধু "মাঙ" পেশ করিয়া দিন গুজরান করেন তাঁহাদিগের অন্যায়ের কোন প্রতিকার কোন দিন হইবে না। শেষপর্য্যন্ত দেখা যায় জনসাধারণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিত চেষ্টা না থাকিলে কোন কিছুর সুব্যবস্থা কখন সম্ভব হয় না।

কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশ রাজ

একথা সর্ব্বজনবিদিত যে ভারতের কেন্দ্রীয় রাজই আসল রাজ। প্রদেশগুলির যে আত্মশাসন ক্ষমতা তাহা কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা মাত্র। যদিও আমরা বলি যে ভারতের রাজশক্তি সকল প্রদেশের মিলিত রাজশক্তি, তাহা হইলেও সে কথাটা ঐতিহাসিক ভাবে অথবা আইনত সত্য নহে। কারণ বৃটিশ যখন ভারত শাসন শক্তি কংগ্রেসের হস্তে তুলিয়া দেয় তখন তাহা সর্ব্বভারতীয় রাজশক্তি বলিয়াই সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস দলকে অথবা তাহার প্রতিনিধিদিগকেই দিয়াছিল। প্রদেশ বা এলাকা বলিয়া আইনত গ্রাহ্য কোন সংগঠন তখন বৃটিশের নিকট হইতে কোন প্রকার শাসন ক্ষমতা বা রাজশক্তি আহরণ করে নাই। সুতরাং বহু রাজত্বের মিলিত রাজশক্তি ভারতীয় রাজশক্তিরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া চিন্তা করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। প্রদেশগুলির যে অবস্থা তাহা হইতেও বুঝা যায় যে সেই দেশখণ্ডগুলির কোন প্রকার রাজশক্তি নাই। কারণ রাজশক্তি অথবা "সভারেনটি" কথাটা শুধু তাহার সম্বন্ধেই খাটে যে যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধিস্থাপন, আন্তর্জ্জাতিক শুল্ক আদায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ, দেশশাসনের মূল রীতিনীতি নির্দ্ধারণ প্রভৃতি করিতে পারে। আঞ্চলিকভাবে যাহারা আবগারি মাশুল, জমির খাজনা বা আদালতের দেওয়ানী দক্ষিণাদি আদায় করে, তাহাদিগকে রাজা বলা চলে না। মনসবদার অবধি বলা চলিতে পারে। অতএব এই মনসবদারী শক্তিকে কাহারও পক্ষে রাজশক্তি বলিয়া কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। এই কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দেওয়া উচিত।

প্রাদেশিক নির্ব্বাচন তাহা হইলে এমন একটা কোন রাজশক্তির ভাগবাঁটের বিষয় নহে। মনসবদারী প্রাপ্তি ঘটিলে তাহা হইতে লাভ হইতে পারে এই আশায় মানুষ সেই লাভের আশায় প্রদেশের নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাচন প্রার্থনার তাহা হইতে উচ্চতর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বলিবেন, দেশের মঙ্গল সাধন ক্ষমতা এই মনসবদারী হইতেও মানুষের হাতে আসিতে পারে। সেই কথার উত্তরে বলা যায় যে দেশের বিশেষ কোন মঙ্গল যখন বিগত ২১ বৎসরে মনসবদারগণ করেন নাই, তখন সেই আশা পোষণ করিবার কোন কারণ থাকে না। বরং অমঙ্গল সূচক কার্য্যের তালিকাটাই দীর্ঘ এবং মনসবদার গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত লাভের ফিরিস্তিও সবিশেষভাবে বিস্তৃত দেখা যায়। যেখানে অর্থের ক্রয়শক্তি বাড়ান, কমান, আয়করের বৃদ্ধি বা লাঘব ডাকটিকিট অথবা রেলটিকিটের মূল্য নির্দ্দেশ, খনি ও অপরাপর ভৌগোলিক সম্পদের মালিকানা, সৈন্য সামন্তের উপর প্রভুত্ব প্রভৃতি বহু বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদেশবাসীর হস্তে কিছুমাত্রও নাই সেখানে প্রদেশগুলির রাজশক্তি একান্তই কাল্পনিক বলিতে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না।

অতএব প্রদেশিক লোকেদের মনসবদারী অধিকার কাহারও হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য মহাহৈহল্লোড় করিয়া যুদ্ধযাত্রার মত কুচকাওয়াজ করিবার কোন অবশ্যকতা নাই। যাহারা উচ্চ আদর্শ আওড়াইয়া মনসবদারী চাহিবেন তাঁহাদিগকে বলা প্রয়োজন যে উচ্চ আদর্শ সিদ্ধি মনসবদারী শক্তির দ্বারা সম্ভব নহে। কারণ যেখানে যথার্থ রাজশক্তি নাই শুধু কোন দূরের রাজশক্তির নিকট আংশিকভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাই ব্যবহৃত হইতে পারে সেখানে সেই ক্ষমতা যাহারা পায় তাহাদের গৌরব মনসবদার বা গোমস্তার গৌরব মাত্র। রাজার রাজক্ষমতা তাহাদিগের মধ্যে থাকা কখনও সম্ভব নহে। এবং থাকেও না। সেই কারণে যখনই গোমস্তা বা মনসবদারকে নিজ শক্তির অতিরিক্ত কোন বিষয় লইয়া মত প্রকাশ করিতে হয় অথবা জনসাধারণকে বুঝাইতে হয় যে তাহাদের জন্য ঐ মনসবদারগণ অনেক কিছু করিয়া দিবেন, যাহা করিবার ক্ষমতা বস্তুত তাহাদের নাই; তখনই মনসবদারগণ বিক্ষোভ, আন্দোলন ও বিদ্রোহের ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন এবং তাঁহাদিগের আফিস দফতরে তখন মনসবদারী কাজ না হইয়া কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধবাদই অধিক মাত্রায় ব্যক্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে আইন আদালত গোল্লায় যাইতে বসে এবং প্রাদেশিক যে সীমিত রাজশক্তি তাহার অপব্যবহারের চূড়ান্ত হইতে থাকে। অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজপ্রতিনিধিগণ নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া নিজশক্তির বাহিরের কথায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সেইজন্য সর্ব্বদেশের যে রাজশক্তি তাহার সহিত প্রাদেশিক মনসবদারী রাজশক্তির একটা কাল্পনিক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এই যুদ্ধের ফলে রাজশক্তি। বিধিব্যবস্থা ওলটপালট হইয়া শাসনকার্য্য অতলে গড়াইয়া যায় রাজকার্য্যে মনসবদারদিগের আর স্থান থাকে না।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যে পুনঃনির্ব্বাচন ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার ফলে যদি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রাষ্ট্রক্ষেত্রের মহারথীগণ শূন্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা হইলে সেই পুরাতন কাল্পনিক যুদ্ধের পুনরাভিনয় হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় মনসবদারী শাসনকার্য্য অচল হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় নির্ব্বাচনের প্রার্থীদিগকে নিজ অধিকার যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে না শিখাইয়া যদি আবার যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে পূর্ব্বের গোলযোগের পুনরাবৃত্তি ব্যতীত অপর কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রাদেশিক শাসনকার্য্যের যাহা আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রাদেশিক ভাবে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ যদি সেই সকল কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করেন এবং বৃহত্তর আদর্শ ও বিশ্বমানবীয় কর্ম্মের তাগিদে যত্রতত্র দৌড়ধাপ না করেন তাহা হইলে সম্ভবত মনসবদারী রাজশক্তির ন্যায্য ব্যবহারে প্রদেশের কোন লাভ হইতে পারে। নতুবা খরচ করিয়া নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করার কোন সার্থকতা থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

বন্যাবিধ্বস্তদিগের সাহায্য

পূজার সময় বহু অর্থ অপব্যয় করা হইয়া থাকে। কিছু কিছু অর্থ এমনভাবে ব্যয় করা হয় যাহা ঠিক অপব্যয় নহে, কিন্তু সে ব্যয় না করিলে হয়ত চলে। এই সময় যদি যে সকল সার্ব্বজনীন পূজা হয় তাহার তোলা চাঁদার শতকরা ১০ হইতে ২৫ ভাগ বন্যাবিধ্বস্তদিগকে দেওয়া হয় তাহা হইলে বহু টাকা উঠিতে পারে। পূজা বোনাসের শতকরা ৫ টাকা যদি বন্যাবিধ্বস্তদিগকে লোকে দেন তাহাতেও খুব কাজ হইতে পারে। যাঁহারা পরিবারের সকল লোকের জন্য কাপড় ক্রয় করেন তাঁহারা যদি একখানা বস্ত্র অতিরিক্ত ক্রয় করিয়া বন্যাপীড়িতদিগের জন্য দান করেন তাহাও বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে। এক কথায় এই পূজার সময় সেই সকল দেশবাসীদিগকে মনে রাখা কর্ত্তব্য যাহারা আজ অসহায়, গৃহহীন ও নিদারুণ অভাবের তাড়নায় ব্যাকুল। পূজার একটা উদ্দেশ্য আর্ত্তসেবা। সেই কার্য্যের এখন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে এবং আশা করা যায় যে দেশবাসী সেই কথা ভুলিবেন না। বাংলার গভর্ণর শ্রীধর্ম্মবীর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া বন্যাবিধ্বস্তদিগকে সাহায্য দান করিতেছেন। তাঁহাকে বাংলার জনসাধারণ বহু সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আরও সাহায্য প্রয়োজন। সেই জন্য পূজার আনন্দের সময় যাহারা দুঃখের চরমে গিয়া পড়িয়াছে তাহাদিগের কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা কর্ত্তব্য।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণআমেরিকা যাত্রা

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্ত্তমানে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ইহা কি উদ্দেশ্যে তাহা ঠিক পরিস্কার বুঝা যায় না। তবে কৃষ্টি সংযোগ প্রভৃতি কথার অবতারনা হইয়াছে ও তাহাতে মনে হইতেছে যে ভারতীয় কৃষ্টি ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের সহিত ঘনিষ্টতায় উন্নতিলাভ করিবে। আমরা অবশ্য কৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্রেজিল বা আরজেন্টাইনের স্থান কত উচ্চে সে কথা ঠিক জানি না; কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিয়া ঐ দেশে গিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার কৃষ্টি যাহাই থাকুক, টাকা যথেষ্ট আছে। কৃষ্টিলাভ না হইলেও যদি অর্থলাভ ঘটিয়া যায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বিষয়টা যাহাই হউক এখন ভারতব্যাপি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরেরা গোলযোগ করিতেছে এবং সেই সময়ে প্রধান মন্ত্রী দূর দেশে গিয়া কৃষ্টির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ইহাতে মনে হয় যে তিনি নানান সমস্যার মধ্যে কৃষ্টি সমস্যাটাই প্রবলতম বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমরা যদি মনে করি যে দেশে কৃষ্টির অভাব অপেক্ষা অর্থনৈতিক শান্তির অভাবই অধিক তাহা হইলে হয়ত শুনিব যে যাহা অসম্ভব তাহার অনুসরণ করিয়া সময় নষ্ট করা বুদ্ধির কার্য্য নহে।

পূজার ছুটি

আগামী ১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) হইতে ২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর) পর্য্যন্ত শারদীয়া পূজা-উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে।

অধ্যক্ষ, প্রবাসী

গল্প

সৌজন্য

সুবোধ বসু

বেলা চারটের কিছু পরে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেস ধানবাদ ষ্টেশন থেকে ছাড়ে। প্রায় তখন থেকেই সর্দারজীকে লক্ষ্য করেছি। প্রথম শ্রেণীর চেয়ার-কামরায় আমার বাঁ দিকের সারিগুলির মাত্র দু'তিন সারি দূরে একটা চেয়ারের পিঠ শেষ পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তাতে ক্লান্তভাবে চোখ মুদে শুয়ে আছেন। প্রকাণ্ড পাগড়ীর আড়ালে তার মুখ ও দাড়ির একাংশ মাত্র চোখে পড়ে, কিন্তু জানালা দিয়ে আসা বিকালের আলোয় তার মুখের রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। চোখের তলায় কালি, গোঁফের প্রত্যন্তদেশ বেশ একটু ঝুলে পড়েছে। দুই ভুরুই ঈষৎ কুঞ্চিত, কপালের রেখা গভীর। পরণে দামি টেরিলিনের সুাট। শার্টের গলার বোতাম খোলা এবং মূল্যবান নেক্টাইয়ের গিঁঠ আল্গা করে' দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এতসব আমার নজরেই পড়ত না, যদি না তার নিজস্ব চেয়ারের নিয়ন্ত্রণযোগ্য পিঠটি তিনি ট্রেণে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এতটা হেলিয়ে না দিতেন। ট্রেনে চলতে চলতে ক্লান্ত না হয়ে উঠলে এমন কেউ করে না। আমরা শুধু যাত্রা শুরু করেছি।

ইতিমধ্যে খানা-কামরার বেয়ারাদের দু'তিন জন তার কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করে গেছে, 'চা সাহাব?' একবার মাত্র জবাব পেয়েছে হাত নাড়ার ভঙ্গিতে, অর্থাৎ 'চাই না।' গাড়ীতে উঠলেই এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিরাও পয়সা ব্যয় করতে মায়া করে না। প্রথম শ্রেণীর তো কথাই নেই। যে দিকেই তাকাচ্ছি চায়ের সঙ্গে এই সময়ের উপযোগী এবং অনুপযোগী বহু রকম খাদ্য গলাধঃকরণ করছে সবাই। যেন এত সব খাওয়ার সুযোগ পাবে বলেই রেস্তরাঁমণ্ডিত কাম্‌রার জন্য পয়সা ঢেলেছে। এই লোলুপতার মধ্যে সর্দারজী এক পট্ চায়ের জন্যও ফরমাস করবেন না। অথচ ছ ফুট লম্বা ও মানানসই চওড়া প্রকাণ্ড চেহারায় তিনি রেস্তরাঁর অর্দ্ধেক খাওয়ার অর্ডার দিয়ে বসলেও বেমানান হ'তো না।

অক্টোবরের শেষ। ট্রেন আসানসোল ছাড়তে না ছাড়তেই সন্ধ্যা। যখন বর্দ্ধমান পেরলো, তখন তো রাত। ইতিপূর্বেই রেস্তরাঁর বেয়ারা রাতের খাওয়ার অর্ডার নিয়ে গেছে যাত্রিদের কাছ থেকে। সর্দারজী এবারেও পূর্ববৎ নিশ্চুপ থেকেছেন। এবার ডিনার পরিবেশন শুরু হলো। যারা রেস্তরাঁ কারে যাবে না, তাদের জন্য এখানেই ট্রে আসা আরম্ভ করল। প্রত্যেকের সমুখের আসনের গা থেকে ভাঁজ-করা টেবিলগুলি খুলে নিয়ে তাতেই সাজিয়ে দেওয়া হলো প্লেটসমূহ। সর্দারজীর পেছনের আসনের যাত্রীকে খাদ্য পরিবেশন করে যাওয়ার সময় বেয়ারা আবার সর্দারজীকে প্রশ্ন করলে নৈশ-আহারের প্রয়োজন আছে কিনা। সর্দারজী একটু নড়ে উঠে অলসভাবে তাকালেন। তারপর পাৎলুনের বাঁ দিকের পকেটে একবার হাত ঢুকিয়ে হাত বের করে' আনলেন এবং বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে তা নেড়ে দেখালেন। অর্থাৎ পকেট ঠন্‌ঠন্, খাওয়ার দাম দেবার পয়সা নেই।

'মাফ্ করবেন, সর্দারজী। কিছু যদি মনে না করেন, আমার সঙ্গে আজ রাতের খাওয়া খান…'

চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন সর্দারজী। সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে কাছে দাঁড়িয়ে এ রকম অনুরোধ করতে শুনে যেন হকচকিয়ে গেছেন।

আপ্ ফিকির মত করে। আই অ্যাম্ অল্ রাইট।' সর্দারজী এবার আমাকে সম্বোধন করে' বললেন। 'দশটা সওয়া দশটার মধ্যেই তো হাওড়া পৌঁছে যাব। বাড়ী গিয়ে খানা খাব। মেনী থ্যাংক্স ফর ইওর কাইণ্ড···।

'ঠিক আছে। আপনি কোনও সংকোচ করবেন না। আমার আসনের পাশে এসে বসুন। সেখানে খানা দেওয়া হয়েছে। আরও ফরমাস দিয়েছি। বলে তাকে প্রায় জোর করে' টেনে নিয়ে এলাম।

দেখলাম, বেশ খিদে পেয়েছিল। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলেন। গল্প করতে লাগলেন খেতে খেতেই।

'কাল খুব সকালে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধরতে কলকাতা থেকে যখন বের হয়েছিলাম।' সর্দারজী তাঁর গোঁফদাড়ির অরণ্যের মধ্যে কাঁটায় ফোঁড়া বড় এক টুকরো মুর্গার রোষ্ট ঢুকিয়ে বললেন, 'তখন আমার ফোলিও-ব্যাগে সাড়ে সাত হাজারেরও বেশী টাকা ছিল। আজ যখন বিকেলে ধানবাদ ষ্টেশনে ফিরে এলাম তখন কোনও রকমে রেলের টিকিট কেনার পয়সা মাত্র আছে—অথচ দেড় হাজার টাকা টেণ্ডার দাখিলের আর্নেষ্ট মনি হিসেবে আর শ খানিক বা সওয়া শো টাকা ট্যাক্সি ভাড়া ও হোটেলের চার্জ হিসেবে মাত্র নিজে ব্যয় করেছি···'

'বাকি কি হলো? পিক্‌পকেট?' প্রশ্ন করলাম।

'পাঞ্জাবীতে একটা কথা আছে', সর্দারজী খাদ্য চিবুতে চিবুতে বললেন, 'পিণ্ড্ ওসেয়া নেই, উচকে প্যায়লে। মানে, গাঁয়ে বসতি শুরু হয় নি, তার আগেই ঠগ হাজির! আমারও হয়েছে তাই।' বলে তিনি নিজের কাহিনী শোনালেন।

গত কাল বেলা বারোটার কিছু আগে ধানবাদ পৌঁছে ষ্টেশনে তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে তিনি ট্যাক্সিযোগে মারাফারী পৌঁছান। মারাফারীতে বোকারো ষ্টিল প্রজেক্টের প্রকাণ্ড ইস্পাত-কারখানা তৈরি হচ্ছে। এদের স্থানীয় অফিসে টেণ্ডার দাখিলের গত কালই ছিল শেষ তারিখ। ধানবাদ থেকে মোটরে মারাফারী সওয়া ঘণ্টারও পথ নয়। দুটোর আগেই সর্দারজী প্রজেক্টের অফিসে পৌঁছে যান। টেণ্ডার দাখিল সম্পর্কীয় করণীয় বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। ট্যাক্সি খাড়াই ছিল, চেষ্টা করলে হয়তো ধানবাদে ফিরে এসে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ধরা যেত। কিন্তু ব্যাপারটাকে আরও একটু অনুধাবন করা দরকার। তাঁর দাখিল-করা টেণ্ডারটি গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে কোথাও যদি প্রভাব বিস্তার করা যায় সেই জন্যই কলকাতা থেকে এতগুলি ক্যাস্ তিনি বহন করে এনেছেন। পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত এখানে থাকাই তিনি স্থির করলেন।

ধানবাদ থেকে কিরকে, মাহুদা ও চাস হয়ে যে রাস্তা মারাফারীর মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সে রাস্তার দুধারে বহু দোকান, হোটেল, মোটর মেরামতের ওয়ার্কসপ প্রভৃতি গজিয়ে উঠেছে ইস্পাত কারখানা নির্মাণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যারা এখানে এসেছে বা আসে তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য। ডান দিকে দোকান-পসারের নড়বড়ে ঘরগুলির পেছনে ইস্পাত-কারখানার উঁচু পাঁচীল উঠছে। প্রকাণ্ড প্রান্তরের চারদিকে দেওয়াল ওঠাতে যত ইটের দরকার হবে তা দিয়ে দু'চারটে প্রাসাদ তৈরী করা যেত। ইস্পাত-কারখানা তৈরি এলাহি ব্যাপার। কারখানা তৈরি তো শুরুই হয়নি, এ শুধু উদ্যোগপর্ব। দূরে গড়ে উঠছে কর্মচারী-দের থাকবার কলোনী; এরই মধ্যে বহু বাড়ী তৈরি হয়ে গেছে। মেইন রাস্তার ধারে ধারে বিভিন্ন ইয়ার্ডে

নানা সাজসরঞ্জাম, ইলেট্রিক শোভেল, ক্রেন আরও কত কি জমা করা হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে যা জমে উঠেছে তা রাস্তার দুধারের বাজার। মারাফারী ষ্টেশনের কাছাকাছি রাস্তা যেখানে ডাইনে মোড় নিয়েছে ফুস্‌রো, জরাংডি ও বোকারো যাবার জন্য সেই মোড় পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে এই সব দোকান-বাজার। পরে নাকি এসব দোকান অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হবে প্ল্যান-মাফিক। তাই আর কেউ পাকা বাড়ী তৈরি করছে না, যা হোক কোনও রকম একটা আস্তানা খাড়া করে ভবিষ্যতের ব্যবসাপাড়ার জমির ওপর দাবি পাকা করে' নিচ্ছে।

এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হোটেলের সংখ্যা খুব বেশী। খাওয়াটাই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। নানা শ্রেণীর খদ্দেরের উপযোগী নানা স্তরের হোটেল। অনেকগুলি পাঞ্জাবী হোটেলের নাম নজরে পড়ল সর্দারজীর। এর মধ্যে সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত চেহারা গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাব হোটেল। বাড়ীর আকার এমন কিছু গ্র্যাণ্ড নয়, তবু মন্দের ভালো হিসেবে এখানেই ট্যাক্সি দাঁড় করালেন। ভেতরটা নেহাৎ মন্দ নয়। ড্রইং-কাম্‌-ডাইনিং রুমটি বড়ই বলতে হবে। তার আসবাবপত্রও রুচিসম্মত। এর লাগোয়া একটি কাম্‌রা ঠিক করে' ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন সর্দারজী। মালপত্র বহন করে' নেবার জন্য হোটেলের উর্দিপরা এক বেয়ারা বেরিয়ে এসেছিল; হাতের ফোলিওব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নেই দেখে হতাশ হলো।

চায়ের সময় হয়ে গেছে। অতিথিদের অনেকে খাবার ছোট ছোট টেবিলগুলিতে চা নিয়ে বসে গেছেন। কামরার লাগোয়া গোসলখানায় তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে সর্দারজীও খানা-কামরায় চলে এলেন এবং খালি একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়লেন।

'আপনি আজই এসেছেন?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে সর্দারজী পেছন দিকে তাকালেন নিজের মাতৃভাষায় প্রশ্ন শুনে। দেখলেন, ঠিক পাশের টেবিলে তার স্বপ্রদেশবাসী দুজন হিন্দু ভদ্রলোক ও একজন মহিলা চা ও চায়ের নানা উপকরণ নিয়ে বসেছেন। পুরুষেরা দু'জনই তিরিশের কোঠায়, মহিলাটি এখন কুড়ির কোঠা শেষ করেন নি। দামি সাজ-পোশাক পরণে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, সাজের পরিপাট্যও তেমনি। পাঞ্জাবী মেয়েরা একটু বেশী সাজ-পোশাক করেন। ইঁন সেই খ্যাতি যথেষ্টই বজায় রেখেছেন।

'গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাব হোটেলে আমরা গত তিন দিন ধরে আছি, কিন্তু আমরা ক'জন ছাড়া এত'দিনে আর কোনও পাঞ্জাবী অতিথি দেখিনি। আপনাকে দেখে তবু একটু পাঞ্জাব হোটেল বলে মনে হচ্ছে!' সর্দারজীকে ফিরে তাকাতে দেখে যুবকদ্বয়ের একজন সহাস্যে বললেন, 'আসুন না এই টেবিলে...'

এই হৃদ্যতা পাঞ্জাবীদের বৈশিষ্ট্য। আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সর্দারজী নিজের টেবিল থেকে ওদের টেবিলের অবশিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়ে বসলেন। তাঁর চা এখনও আসেনি। অর্ডার দেওয়া হয়েছে মাত্র।

'আমার নাম টি. কে খান্না। মিসেস্ খান্না। ইনি আমার বন্ধু ও পার্টনার মিঃ সচদেব।'

পরিচয় আদান-প্রদান ও নমস্কার বিনিময়ের পর মিসেস খান্না পেয়ালায় চা ঢেলে চিনির পটে চামচ ডুবিয়ে সর্দারজীর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ক' চামচ?'

'তিন।' সর্দারজী জানালেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রতা করে বললেন, 'আপনারা আগে খান। আমার চা তো আসবেই...'

মিসেস খান্না মুখে কিছু না বলে চায়ের পেয়ালা সর্দারজীর কাছে এগিয়ে দিলেন। কেকের একটা মোটা স্লাইস কেটে একটা কোয়ার্টার প্লেটে রেখে আবার চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'একটু মঠ্‌ঠী খাবেন কি?

'মঠ্ঠী!' সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে সর্দারজী বললেন।

মঠ্ঠী খাস্তা নিমকী বা খাস্তা পরোটা জাতীয় জিনিষ। ভারি প্রিয় খাবার এটা পাঞ্জাবীদের। খাস অমৃতসর থেকে খাঁটি মঠ্ঠী আনা ঢাকা থেকে অমৃতি আনার মত একটা বিশেষ ব্যাপার। মিঃ খান্না জানালেন, তাঁর স্ত্রী মাত্র সপ্তাহখানেক হলো অমৃতসরে পিত্রালয় থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে পাঞ্জাবের নানা সুখাদ্য নিয়ে এসেছেন। এমন কি বড়ী পর্য্যন্ত। বিশেষ সব মস্‌লা-সহযোগে তৈরি এই বড়ী বাংলাদেশের ডালের বড়ীর প্রায় দশটার সমান বড়। এই বড়ী মিসেস খান্না সঙ্গে করেও নিয়ে এসেছেন এবং হোটেলের পাচককে বড়ী-আলুর তরকারি রান্না করে দিতে বলেছেন রাতের খাওয়ার সঙ্গে। এতে সর্দারজীরও নিমন্ত্রণ হলো।

'খাওয়া-দাওয়া কি রকম হোটেলের?' সর্দারজী প্রশ্ন করলেন।

'ভালই বলতে হবে। ইংরেজি আর পাঞ্জাবী কোর্স মেশান।' খান্না জানালেন। 'এতটা ভাল জায়গা পাওয়া যাবে, তা আমরা আশা করি নি···'

'হ্যাঁ, ভারি ভাল জায়গা!' মিসেস্ খান্না প্রতিবাদ করলেন। 'কালও তো কোন্ বোর্ডারের কামরার তালা ভেঙে বাক্স থেকে টাকা চুরি গেছে! আমরা যেদিন এলাম, সেদিনও তো একজন অভিযোগ করছিলেন, তার হাত-ঘড়ি চুরি গেছে···'

'না, বহীনজী, ঘরের তালা ভাঙেনি,' খান্নার বন্ধু সচদেব জানালেন, 'বাইরের জানালা ভেঙে এসেছিল পরে শুনলাম।···

'এতে আর কি তফাৎ হলো!' মিসেস্ খান্না তর্ক করলেন।

'তার মানে, চোর হোটেলের চাকর-বাকর নয়, বাইরের কেউ।' যুক্তি দেখিয়ে বোঝালেন সচদেব।

'আর ঘড়ি?'

'সে একটা বাইরের লোক,' সচদেব জানালেন।

'এখানে মাঝে মাঝে খেতে আসত। হোটেলের কার কাছ থেকে একটা পুরানো ঘড়ি কেনে। কিন্তু দাম দিচ্ছিল না। আজ দেব কাল দেব বলে ভাঁড়াচ্ছিল। একদিন খেতে এসে বেসিনে হাত-মুখ ধোবার সময় ঘড়ি খুলে রেখে ভুলে চলে এসেছিল। সেই সুযোগে ঘড়ির প্রকৃত মালিক সেটি তুলে নেয়।···'

'তুমি তো কম গোয়েন্দা নও, সবই জান দেখছি!'

সহাস্যে খান্না বললেন, 'যাই হোক, একটু হুঁশিয়ার থাকাই ভাল। আপনার সঙ্গে কি বেশী মালপত্র আছে, সর্দারজী? ঘরে তালা দিয়ে বের হওয়াই উচিত হবে···'

'এই ফোলিওব্যাগ ছাড়া আমার সঙ্গে আর কিছু নেই।' সর্দারজী জানালেন। 'এটিই আমার দফ্‌তর, ওয়ার্ডরোব, ব্যাঙ্ক-পোষ্টাফিস, সব কিছু!'

মিসেস্ খান্না খুব সন্তুষ্ট বা আশ্বস্ত হলেন না। আগামী কাল দুপুরে নিরাপদে ফিরতে পারলে বাঁচেন জানালেন। খান্না ও তার বন্ধুর কনট্রাক্টরের ফার্ম আছে আসানসোলে। মারাফারীতে একটা মোটর মেরামত ও বাস-এর বডি তৈরির কারখানা খুলতে চান। আজ সকালে জমির বন্দোবস্ত করে বায়না দেওয়া হয়ে গেছে। আশেপাশে তাঁরা কিছু জমি কিনে রাখতে চান ভবিষ্যতে বেশি দামে বিক্রির জন্য। জমির অজ্ঞ মালিকেরাও চালাক হয়ে উঠেছে; ইস্পাত-কারখানার দরুণ জমির চাহিদা ও দাম বেড়ে যাবে, তারা এটা বুঝে গিয়েছে। দাম হাঁকছে বেশী। দুই বন্ধু তাই দ্বিধা করছেন। কাল সকালে এক পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা

হবে। দরে পোষালে বায়না করে ফেলবেন। স্টিল কর্পোরেশনের অফিসে সর্দারজী কাল সকাল দশটার পরে যাবেন শুনে তাঁরও দুই বন্ধুর সঙ্গে জমি দেখতে যাবার আমন্ত্রণ হলো।

'সুবিধে দরে পেলে আপনিও কিছু বায়না দিয়ে রাখুন। ক'দিন পরে আগুনের দামে বেচতে পারা যাবে।' খান্না বন্ধুসুলভ পরামর্শ দিয়ে বললেন।

'দেখা যাক।' বললেন সর্দারজী।

সন্ধ্যাটা কি করে কাটান যায়? এখানে সিনেমা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সর্দারজী। এঁদের আতিথেয়তার একটা বদলা দেওয়া যায় যে কি করে ভাবছিলেন। খান্না প্রস্তাব করলেন, বোকারো বেড়িয়ে আসা যাক। তাদের সঙ্গে নিজস্ব গাড়ী আছে। ফুস্‌রো, জরাংডি, বের্মো হয়ে যে পথ বোকারো গেছে চমৎকার রাস্তা সেটা। এক ঘন্টা সওয়া ঘন্টার পথ। নৈশ-আহারের আগেই মারাফারীর হোটেলে ফিরে আসা যাবে।...'

মন্দ প্রস্তাব নয়। কিন্তু খান্না-পত্নী রাজি হলেন না। কাঁধে একটা অনিচ্ছাসূচক ঝাঁকুনি দিয়ে কানের জড়োয়ার লম্বা দুল দুলিয়ে বললেন, 'না, জী, ওতে আমি রাজি নই। জঙ্গলে জায়গার নির্জন রাস্তা। কোথা থেকে ডাকাত হাজির হয়ে গাড়ী আটক করবে তার ঠিক কি। বিশেষ করে রাতে। তার চেয়ে চলুন ধানবাদ, গিয়ে সিনেমায় বসে যাই। দু'দিকেই প্রায় সমান পথ...'

'ঠিক হায়।' সর্দারজী খান্নার দিকে চেয়ে বললেন। অর্থাৎ রাজি হয়ে যাও।

শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই স্ত্রীলোকের ইচ্ছাই জয়ী হয়। এবারেও তাই হলো। এখনও পাঁচটা বাজেনি। এখনই রওনা হয়ে পড়লে প্রায় সময়মত পৌঁছে যাবে। সবাই তৈরিই ছিল, দু-এক মিনিটের মধ্যেই নিজ নিজ কামরা ঘুরে' এসে গাড়ীতে চড়লে। চালক খান্না নিজে। সচদেব তার পাশে বসেছেন। পেছনের আসনে খান্না-পত্নী ও সর্দারজী। স্টার্টারে টিপুনী খেয়ে গাড়ী গর্জ্জন করে উঠেছে।

'ম্যয় ক্যা জী, সহসা ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বামীকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন মিসেস খান্না। 'এক মিনিট। আমি এক্ষুনি আসছি।' বলে গাড়ী দরজা খুলে কোমরের কাছে শাড়ীর সঙ্গে আঁটা চাবির থোকা খুলে হাতে নিতে নিতে হোটেলের দিকে ছুট লাগালেন।

'ছ্যাখ কাণ্ড!' ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে খান্না বললেন। 'আবার কি হলো। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মিনিট পাঁচসাতের মধ্যেই ফিরে এলেন খান্না-গৃহিণী। হাতে শিল্কের একটা গোলাপী রুমালে বাঁধা পুঁটলি। হাঁফাতে হাঁফাতে গাড়ীতে এসে চাপলেন। বললেন, 'এগুলি হোটেলে রেখে যেতে ভরসা হচ্ছে না। এ আমার সাজ, সম্পত্তি, ব্যাঙ্ক সব কিছু...'

'মাই গুড্‌নেস!' অননুমোদনের কণ্ঠে বললেন খান্না স্টিয়ারিং হাতে। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। গাড়ী ছাড়লেন।

খান্নার স্ত্রী নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে তাতে ভরতে চেষ্টা করলেন পুঁটলিটা। কিন্তু ব্যাগের পক্ষে এটা বড়। তবু চেষ্টা চলতে লাগল।

'এটা ঢুকবে না।' সর্দারজী বললেন।

'তবে আপনার ফোলিওব্যাগেই রেখে দিন।' আবার ব্যর্থচেষ্ট হয়ে অনুরোধ জানালেন মিসেস খান্না। 'ওটা যা বড় তাতে আমার এই সামান্য ক'খানা জেবরের (গহনা) পৌটলা কেন, একটা আস্ত বোরা (বস্তা এঁটে যাবে।' বলে অলঙ্কার-বাঁধা পুঁটলি সর্দারজীর হাতে তুলে দিলেন মিষ্ট হাস্য করে।'

উপায়.কি। খুলতে হলো সর্দারজীকে হাতের প্রকাণ্ড ফোলিওব্যাগ। দুজনেই ঠেলাঠুলি করে' গয়নার পোঁটলা ভেতরে শুইয়ে দিলেন। তালা বন্ধ করার পর মিসেস খান্না নিজেই ব্যাগটাকে আসনের পেছনে ব্যাক্-স্ক্রীণের ধারের সমতল জায়গাটায় স্থাপন করে' সকৌতুকে বললেন, 'আসুন, এবার আমরা দুজনেই এর সামনে বসে কড়া পাহারা দিই। এখন ওটা আমাদের জয়েন্টষ্টক ব্যাঙ্ক…'

মস্ত শহর ধানবাদ। সর্দারজীকে মাঝে মাঝে কার্য্যোপলক্ষ্যে আসতে হয় এই অঞ্চলে; এর মেইন রোডের উপরকার বড় বড় দোকানপসার, কয়লাসম্পর্কীয় সরকারি ও বেসরকারি অফিস প্রভৃতি সম্পর্কে তার মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু সিনেমা-হাউস সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেননা। মিসেস খান্নাই স্বামীকে নির্দেশ দিলেন। কোন্ হাউসে যেতে হবে। সেখানে তার প্রিয় অভিনেতার ছবি হচ্ছে।

সিনেমার বাড়ীর সমুখে গাড়ী যখন পার্ক করল, তখন শো আরম্ভ হবার দু'চার মিনিটই বাকি আছে। গাড়ীর মেসিন বন্ধ করে' দরজা খুলে তড়াক করে' নেমে পড়লেন খান্না টিকিট কেনার জন্য ছুট লাগাতে। পার্স বের করে নিলেন পকেট থেকে। কিন্তু সর্দারজী প্রস্তুতই ছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে খপ্ করে' ধরে ফেললেন খান্নার হাত। বললেন, 'এটি চলবে না। এবার আমার পালা। আমিই প্রথমে প্রস্তাব করেছিলাম…' সর্দারজীও নিজ পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে নিলেন।

খান্নাও ছাড়বার নয়। তকুল্লফের (সৌজন্যের) যুদ্ধে তখন দুজনই দুজনকে বাধা দিতে দিতে অগ্রসর হলেন। একবার দ্বিধাভরে পেছনে তাকিয়েছিলেন। বুঝতে পেরে মিসেস খান্না বললেন, 'ফোলিওব্যাগটা দেব?' বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখ না ফিরিয়েই বাঁ হাত দিয়ে সেটা আকর্ষণ করলেন পেছন থেকে।

'ঠিক হ্যায়।' বলে করতল উঁচু করে' দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করলেন সর্দারজী। ওতে যেমন তাঁর হাজার ছয়েকের মতো টাকা আছে, মিসেস খান্নার গয়নার পরিমাণও কম নয়। তাড়াতাড়ি তিনি সিনেমার টিকিট সংগ্রহের জন্য এগিয়ে গেলেন এবং খান্নাকে ঠেলে দিয়ে টিকিটঘরের সামনের ভিড়ে নিজে আগে গিয়ে দাঁড়ালেন। শো আরম্ভের ঘন্টি বেজেছে। টিকেটের জন্য ভিড় করছে অনেকে। সর্দারজীর সামনে চারপাঁচ জনের ভিড়। তার পেছনে সঙ্গী আছেন খান্না। তার পেছনে আটদশ জনের লাইন দাঁড়িয়ে গেছে।

অবশেষে যখন তিনি টিকেট কিনে বুকিং অফিসের জানালা থেকে সরে এসে খান্নার খোঁজ করলেন, তখন তাকে কাছে দেখতে পেলেন না। নিশ্চয়ই অন্যদের গাড়ী থেকে ডেকে আনতে গিয়েছেন। প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পরও সঙ্গীরা আসছেনা দেখে অধৈর্য্য হয়ে অবশেষে সর্দারজী নিজে এগিয়ে গেলেন গাড়ীর দিকে।

এ কি! গাড়ী কোথায়! অন্যান্য গাড়ীগুলি যথাস্থানে পার্ক করা আছে। খান্নার গাড়ী রাখার জায়গাটা ফাঁকা! ধক্ করে' উঠল সর্দারজীর বুকটা। ব্যস্তসমস্ত হয়ে দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়ীর সারি ঘুরে দেখতে লাগলেন। চিহ্নমাত্র নেই খান্নাদের। কাছেই এক কনেস্টবল দাঁড়িয়েছিল। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। এখানে দাঁড়িয়েছিল যে হারা (সবুজ) রঙের গাড়ীটা? সেটা তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল। সাহেব বলছিলেন, টিকেট পাওয়া গেল না।

'কোন্ দিকে গেছে?' প্রমাদ গণে সর্দারজী প্রশ্ন করলেন।

'সিধা।' মেইন রোড যে দিকে সিধা গিয়ে সাত মাইল দূরে গোবিন্দপুরের কাছে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডে পড়েছে আঙুল দিয়ে সেদিকটা দেখিয়ে দিলে কনেস্টবল।

তারপর কি ধকলই গেছে সর্দারজীর। পথচারীদের পরামর্শে ট্যাক্সি নিয়ে ধাওয়া করলেন গোবিন্দপুরের দিকে। পুলিস-লাইন পার হয়ে ফাঁকা রাস্তা। দু'দিকে নিচু ভিলা-ধরণের বাড়ী, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। ড্রাইভারও ধাওয়ার উদ্দেশ্য জেনে নিয়েছে। হাওয়ার মতই ছুটেছে গাড়ী। বহু গাড়ী পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন ধাবমান গাড়ীগুলির দিকে সর্দারজী। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোড় পর্য্যন্ত পৌঁছেও প্রার্থিত গাড়ী নজরে পড়ল না। ডান দিকে মোড় নিয়ে গোবিন্দপুর বাজার পর্য্যন্ত এগিয়ে যাবার পর বুঝতে পারা গেল, এ পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে পালিয়ে থাকলেও ধরবার উপায় নেই। সিধা চলে গেছে এই রাস্তা হাওড়া পর্য্যন্ত।

'তবে ধানবাদই ফিরে চল, সেখানেই একবার ভাল করে' খুঁজে দেখা যাক।' সর্দারজী বললেন।

'একই রাস্তায় না ফিরে,' ট্যাক্সিচালক প্রস্তাব করলে, 'রাজগঞ্জে মোড় নিয়ে কাত্রাস হয়ে ধানবাদ গেলে ও-দিকটাও দেখা হয়।'

সর্দারজী রাজী হলেন। গাড়ী ঘুরিয়ে রাজগঞ্জের মোড়ের দিকে চালালে ড্রাইভার। অন্ধকার হয়ে এসেছে। গাড়ী সনাক্ত করবার আর উপায় নেই। তবু রাজগঞ্জ থেকে কাত্রাস পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা সজাগ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে এলেন সর্দারজী। কাত্রাসে পৌঁছে ধানবাদের রাস্তায় 'মোড় নিতে উদ্যত হয়েছিল চালক। তাকে নিরস্ত করে' সর্দারজী বললেন, 'চলো মারাফারী।'

গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাব হোটেলের ম্যানেজার জানালেন, খান্নারা আজ সকালে মাত্র এসেছিল। সঙ্গে কোনও মালপত্র ছিলনা। ঘর ভাড়ার টাকা আগাম দিয়েছিল, খাবার বিলও মিটিয়ে গেছে। পতা (ঠিকানা)? দাঁড়ান, দেখছি। দিল্লীর চাউরী বাজারের কি ঠিকানা ছিল।

আবার ধানবাদ। পাগলার মত ইতঃস্তত অনুসন্ধান। নিরুপায় হয়ে অবশেষে থানায় উপস্থিত হলেন সর্দারজী। সমস্ত কাহিনী শুনে ও. সি. বললেন, 'সর্দারজীদের যেসব গল্প শোনা যায়, আপনি দেখি তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছেন! নইলে এত সহজে কেউ সম্পূর্ণ অচেনা লোককে এতটা বিশ্বাস করে। এতটা দেরি করে' এসেছেন, নইলে একবার রাস্তায় আটকাবার চেষ্টা করা যেত। দুটো ঠিকানা কেন, এরা দুশো ঠিকানা দিতে পারে। যাই হোক, প্রথমে আসানসোলের ঠিকানাটাই চেক্ করা যাক···'

কাল বেলা এগারোটার পর আসবেন, তখন যদি কোনও খবর দিতে পারি···'

'কি খবর দিয়েছেন, বুঝতেই পারছেন।' সর্দারজী কাঁটা চামচ প্লেটে নামিয়ে রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন। 'ও ঠিকানায় ওই নামের লোক কোনও কালেই ছিলনা। তবে কয়েকদিন আগে এই নম্বরের একটা গাড়ী চুরি গিয়েছিল আসানসোলের রেল-স্টেশনের সামনে থেকে। এইটে নিশ্চয়ই সেই গ্যাঙ্গেরই কাজ···'

'এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম,' সর্দারজী দু'পাঁচ সেকেণ্ড নীরব থাকবার পর বললেন, 'দারোগা যে ঠাট্টা করেছিলেন, তা পুরোপুরিই আমার প্রাপ্য কিনা। চট করে' ওদের বিশ্বাস করেছিলাম সত্য, কিন্তু সন্দেহ উদ্রেক করবার মত আগাগোড়া কোনও কিছুই করেন নি ওরা। মারাফারীর হোটেলে আমাকে ওদের টেবিলে ডেকে নিয়েছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবীদের মধ্যে এ হৃদ্যতা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। পাঞ্জাবে গিয়ে

বাঙালী দেখলে আপনিও হয়তো আমার মত সহজেই সাড়া দিতেন। ওদের চেহারা, কাপড়-জামা, আচার-ব্যবহার সবই খানদানী (সম্ভ্রান্ত) ছিল। বিশেষ ক'রে ওদের মধ্যে একজন মহিলার উপস্থিতি ভদ্রপরিবার বলেই ওদের চিহ্নিত করেছে। ওদের পারস্পরিক ব্যবহারে কোনও ফচ্‌কেমি দেখিনি। সম্ভ্রান্ত স্বামী যেমন স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি ব্যবহার করেছে। সিনেমা দেখার প্রস্তাব আমিই প্রথম করি। খান্না যেতে চান বোকা-রোতে। বের হবার সময় মিসেস খান্না বেডরুমে ছুটে গিয়ে পোঁটলা নিয়ে এলেন। ওদের ঘরে যে কোনই বাক্স-প্যাঁটারা নেই তা আমার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব ছিলনা। আর যদি কোনও ভদ্রমহিলা তার জেবরের পোঁটলা হাতে ধরে' বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে এবং সাবধানতা হিসেবে সঙ্গীর ব্যাগে রাখবার প্রস্তাব করে তবে কি করে' আপত্তি করা চলে? ওটা মোটে জেবরের পোঁটলা ছিলনা, আমার ব্যাগের ভেতরটা দেখে নেওয়ার ও আমার বিশ্বাস উৎপাদন করার কৌশল ছিল, তা ভাববার কোন কারণই তখন ছিল না। বরঞ্চ চোর-ডাকাতের ভয় তার প্রচুর, তা ইতিপূর্বে অন্য প্রসঙ্গে একাধিকবার জানিয়েছেন। সিনেমার টিকেট কিনতে যাবার আগে হঠাৎ ফ্যোলিওব্যাগটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সসঙ্কোচে যখন একটু দ্বিধা করেছিলাম, তখনই মহিলা ব্যাগটা টেনে এনে আমাকে দিতে উদ্যত হলেন। এগিয়ে গিয়ে সেটা আনতে আমার লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? ওতে যেমন আমার টাকা ছিল, তেমনি তারও তো জেবর বা যা আমি জেবর বলে মনে করেছিলাম, তা ছিল। তার উপর খান্না ছিলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত। টিকেটের 'কিউ'তে আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিজের পয়সায় টিকেট কেনার জেদ করেছেন শেষ অবধি। টিকেট সংগ্রহের উত্তেজনায় শেষের দিকে তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু খান্না যদি আমাকে বলেই যেতেন, "এবার তবে ওদের আমি ডেকে নিয়ে আসি," তবেও কি আমি তা সন্দেহজনক মনে করতে পারতাম?···অথচ দারোগা বললেন, বেকুবি করেছি। আপনি তো পুরো ঘটনাটা শুনলেন। বলুন, আপনি হলে কি করতেন?···

'আপনি যা করেছেন, হয়তো তাই করতাম। তারপর পস্তাতাম।' বলে গরম কফির পেয়ালা সর্দারজীর কাছে এগিয়ে দিলাম।

একটি করুণ কাহিনী

অশোক সেন

ছায়াচিত্রের নামকরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, সার্থক গল্পলেখক এবং যশস্বী পরিচালক সব দেশেই বিশেষ-ভাবে জনপ্রিয়। আমাদের দেশে তো বটেই। হঠাৎ ধরুন, কোন নামকরা অভিনেত্রী কোন জুয়েলারীর দোকানে কিছু কিনতে এলেন—দেখতে দেখতে দোকানটির চারপাশে লোক জমে যাবে। অভিনেত্রীটির তখন সহজভাবে ঐ দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক এমনই হয় দেখবেন ঐরকম পরিস্থিতিতে কোন নামকরা অভিনেতা, লেখক বা পরিচালকের বেলায়। কোন সিনেমার বক্সে, খেলার গ্রাউণ্ডে বা রাস্তায় এঁদের কারোকে দেখলে বেশ বোঝা যায় সেখানে উপস্থিত 'লোকজনের ভেতর একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। আর জনসাধারণের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার ভেতর দোষেরও কিছুই নেই, এটা নিন্দনীয়ও নয়। তার কারণ হচ্ছে এঁরা প্রত্যেকেই শিল্পী, প্রত্যেকেই স্রষ্টা। এঁদের সত্তা জনসাধারণের কাছে রহস্যময়, বৈচিত্রপূর্ণ এবং জটিলতায় ভরা। সুতরাং সাধারণ লোক অর্থাৎ যাঁদের পক্ষে জীবনধারণের অর্থ হচ্ছে এক-ঘেয়ে নিয়মে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া—ছবি দেখতে গিয়ে তাঁরা রূপালীপর্দায় চোখের সামনে দেখতে পান জীবনের নানাস্তরের আলেখ্য। দেখতে পান প্রেম—ভালবাসা—আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী, দেখতে পান মানুষের চরিত্রের নানা ধরণের জটিলতা, জীবনের কতরকমের সমস্যা। কয়েকঘণ্টার জন্য নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমীকে ভুলে গিয়ে এইসব ছবির মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে পড়েন ছবি দেখতে দেখতে প্রেক্ষাগৃহে বসে। তাই এইসব ছবির যাঁরা স্রষ্টা—লেখক, পরিচালক বা নটনটী, যাঁরা জনসাধারণকে একঘেয়ে জীবনের একঘেয়েমী ভুলিয়ে অনাবিল আনন্দরসের আস্বাদনে স্বল্প সময়ের জন্যও আত্মবিস্মৃত করে রাখতে পারেন, তাঁদের এত কদর, এত সম্মান সাধারণ মানুষের কাছে।

আর একশ্রেণীর লোকের কার্য্যকলাপের বিবরণী শুনতে বা তাদের জীবনের কাহিনী জানতে জনসাধারণ সবসময়েই আগ্রহান্বিত হয়—তারা হচ্ছে খুনী বা হত্যাকারীর দল। একজন মানুষ—তা সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক—যখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপর একজন মানুষকে হত্যা করে—তখন আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়, কি প্রবৃত্তির বশে সে ঐ অস্বাভাবিক কাজটা করলো। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক—কিন্তু খুন করাটা সম্পূর্ণ একটা পাশবিক ব্যাপার। মানুষ যখন খুন করে, তখন নিশ্চয়ই তার মনুষ্যত্বের দিকটা বিলুপ্ত হয়ে যায় ভেতরকার পশুটা জেগে ওঠে।

আবার ধরুন, যদি কোন সিনেমা ষ্টার খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হন তাহলে সাধারণ লোকে এব্যাপারে কি প্রচণ্ড রকমের সেনসেশন্ অনুভব করবে তা সহজেই বোঝা যায়। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল বছর পনেরো আগে আমাদের কলকাতা শহরে। আর যাঁকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী গড়ে উঠেছিল তিনি হচ্ছেন বাংলা এবং

হিন্দী ছবির এক সময়ে একচ্ছত্রা অভিনেত্রী শ্রীমতী লতিকা দেবী। আজকের দিনেও সবাই তাঁকে জানেন বৈকি। তবে এখন আর তিনি নিজে বড় অভিনয়ে নামেন না—সুশান্ত ফিল্ম কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক হিসাবেই জনসাধারণের কাছে তাঁর বিশেষ পরিচিতি।

হঠাৎ এ কাহিনীর অবতারণা করছি কেন? তারও একটা বিশেষ কারণ আছে। আমিও লেখক এবং সেই লেখক হিসাবেই বছর কয়েক আগে লতিকা দেবীর সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়। তারপর থেকে আমার কয়েকটি গল্পের চিত্ররূপ লতিকা দেবী দিয়েছেন। মাঝে মাঝে অন্যের লেখা গল্পের স্ক্রিপ্ট তৈরী করবার ভারও আমার উপর পড়েছে। একসঙ্গে কাজ করতে করতে সামান্য আলাপ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে একটা জিনিষ সব সময়েই লক্ষ্য করেছি—লতিকা দেবীকে কখনও হাসতে দেখিনি। মুখে সব সময়েই একটা গাম্ভীর্য—আর একটা বিষাদের ভাব। বেশ বুঝতাম যে অতীতের বিষাদঘন দুর্ঘটনার ব্যাপারটাই তাঁর মনের সুখ এবং আনন্দের ভাবটা চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছে।

লতিকা দেবীর জীবনের সেই অতীত দুর্ঘটনার ব্যাপারটা আমি কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই জানতাম না কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত। কারণ একে এটি ঘটেছিল বছর পনেরো, আগে—তায় আমি আবার কোলকাতায় এসেছি মাত্র পাঁচবছর। আমার বাবা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতেন এবং ওখানেই আমার ছাত্রজীবন কাটে। ওখান থেকে দর্শনে এম, এ পাশ করে কলকাতায় আসি চাকরীর খোঁজে—কিছুদিনের ভেতর একটা পত্রিকার অফিসে কাজও জুটে যায়। সেখানেই প্রথম সাহিত্যের হাতে খড়ি। ছাত্রজীবনেই অবশ্য একটু আধটু গল্প লেখার অভ্যাস ছিল। দু' একসময়ে এলাহাবাদ থেকে নিজের লেখা গল্প পাঠিয়ে দিতাম কলকাতার পত্র-পত্রিকাতে—মাঝে মাঝে সেসব ছাপাও হোত। একদিন আমাদের কাগজের সম্পাদকমশায় আমাকে ডেকে বললেন—'শুনতে পেলাম আপনি ছোট গল্প লেখেন—আমার কোন সহকর্ম্মীই বোধহয় একথা তাঁকে বলেছিল—তা, আমাদের রবিবারের ম্যাগাজিন সেকশনে মাঝে মাঝে লিখলেই তো পারেন।"

সেই থেকে সত্যি স'ত্যিই সময় সময় রবিবারের কাগজে গল্প লিখতাম। এই রকম একটি গল্পই সুশান্ত ফিল্ম কোম্পানীর বিখ্যাত পরিচালক বিক্রম বোসের ভাল লেগে যায় এবং তিনি আমাকে খবর দিয়ে গল্পটি তাঁদের কোম্পানীর হ'য়ে কিনে নেন ছবি করতে। এই ছবিটি হিট্ করেছিল—তারপর থেকেই ঐ কোম্পানীর সঙ্গে আমি যুক্ত হ'য়ে পড়ি।

অতি অদ্ভুত ধরণের লোক এই বিক্রম বোস—সত্যিকার প্রতিভাবান চিত্রপরিচালক। প্রায় বছর ত্রিশেক বয়সের সময় থেকে ছবি তুলছেন, আজ ষাটের কোঠা পেরিয়েছেন তবু মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সতেজ এবং প্রাণবন্ত। ছবির জগতে অনেক বিবর্তন পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু বিক্রম বোস কোন জায়গায় এসে থেমে যান নি। তিনিও সমানতালে পা চালিয়ে এসেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরণের ছবি তোলার কাজে। এঁকে অদ্ভুত ধরণের লোক বলি, এই কারণেই যে কোন কাজ করবার সময় তাঁর স্বভাবটাই যেন বদলে যেতো—অত্যন্ত স্বাভাবিক, অমায়িক ব্যবহারে প্রত্যেক সহকর্ম্মীর থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা আদায় করে নেবার ক্ষমতা যা দেখেছি তার তুলনা হয় না। কিন্তু যেই কাজ শেষ হয়ে গেল আর তাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব—হয় বাড়ী চলে যাবেন, না হয় স্টুডিয়োতে নিজের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে বসবেন। কাজের সময় ছাড়া তাঁকে কখনও কারও সঙ্গে মিশতে দেখিনি। অথচ পুরানো কর্ম্মীদের কাছে শুনেছি এই লোকটিই নাকি অতীতে একেবারে অন্যজাতের মানুষ ছিলেন—সবার সঙ্গেই হাসিঠাট্টায় যোগ দিতেন, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন। যৌবনে নারীঘটিত ব্যাপারেও নাকি বিক্রম বোসের বেশ বদনাম ছিল।

সেদিনটা ছিল রবিবার—সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ষ্টুডিয়োতে একটি উৎসবে যোগ দিতে যেতে হয়েছিল। আমাকেই সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য এই উৎসব। আমার কাহিনীর উপর তোলা একটি ছবি এবছর দিল্লীর সরকারের কাছ থেকে বছরের সেরা ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হওয়াতেই সহকর্মীরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। সভাতে লতিকা দেবী এবং বিক্রম বোসও উপস্থিত ছিলেন—আর ছিলেন ছবির নায়িকা সুমিত্রা ঘোষ। আমার বেশীর ভাগ ছবিতেই সুমিত্রা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে। ছটি ভূমিকায় নামবার পরই সে নিজেকে চিত্রতারকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সুমিত্রা এবং আমি বর্ত্তমানে এনগেজড্—কিছুদিন বাদেই আমাদের বিয়ে হবে এবং তারপর আমরা ইউরোপ ভ্রমণে বের হব ঠিক করেছি।

সভাতে আমাকে, সুিমত্রাকে এবং পরিচালক বিক্রম বোসকে নানারকমের পুরস্কার দেওয়া হল—যথা সোনার ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি, নেকলেশ ইত্যাদি। আমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে দু'একজন বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমাদের পালা—বিক্রম বোস বললেন, ভালছবি করা তখনই সম্ভব হয়, যখন ভাল কাহিনী এবং ভাল সংলাপের স্ক্রিপ্ট আমাদের হাতে আসে। সেইজন্যই এক্ষেত্রে সবথেকে বেশী কৃতিত্ব অতনু চ্যাটার্জির—কারণ তিনিই এই কাহিনীর স্রষ্টা—তারপর আসে অভিনয়ের কথা। সুমিত্রার অভিনয়ের কথা আর নতুন করে কি বলবো। তাঁর বিরাট জনপ্রিয়তাই তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছে। সুমিত্রা আমার এবং পরিচালকের কিছুটা প্রশংসা করেই বসে পড়লো। আমি জানি সে বক্তৃতা দিতে পারে না—নার্ভাস হয়ে পড়ে। এরপর আমি উঠে বললাম। এখানে আমার বক্তৃতার সারমর্মটাই দেব।

বিক্রমবাবু আমার লেখা কাহিনীর উপর সমস্ত কৃতিত্ব আরোপ করেছিলেন। সেটাকে খণ্ডন করে বললাম, আসলে পরিচালকের উপরই ছবির ভালমন্দ নির্ভর করে। অনেক ভাল কাহিনী দেখবেন অযোগ্য পরিচালকের হাতে পড়ে খারাপ ছবিতে পরিণত হয়। আবার অতি সাধারণ কাহিনী সেরা পরিচালকের হাতে পড়ে সত্যিকার পিস অভ আর্ট বলে গৃহীত হয়। যেমন ধরুন, চ্যাপলিনের তৈরী ছবিগুলো। তার কাহিনীও নিশ্চয় অনেকটা সাহায্য করতে পারে। এরপর আমি কাহিনীর ব্যাপারে আরও খানিকটা আলোচনা করলাম—বললাম, আমাদের জীবন নিয়ে ভাল কাহিনী তৈরী করা কঠিন, কারণ এদেশে জীবনে তেমন বৈচিত্র্য কোথায়? আমাদের জীবন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে, অত্যন্ত শ্লথ। এদেশের জীবনে সত্যিকার ট্র্যাজেডীর সন্ধান পাওয়া যায়না। এ নিয়ে কাব্য লেখা চলে, কিন্তু নাটকীয় কাহিনী তৈরী করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সভা শেষ হতে সুমিত্রাকে নিয়ে ব্লু-ফক্সে ডিনার খেয়ে নাইটশোতে চ্যাপলিনের লাইম লাইট দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে তার বাড়ীতে ছেড়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে প্রায় সাড়ে বারোটা হোলো। আমি লেখাপড়াটা বেশীরভাগ রাতের দিকেই করি—সুতরাং ভাবছিলাম একটি ফরমায়েসী অলৌকিক গল্প আজ রাতেই ঘণ্টা দুয়েক খেটে তৈরী করবো। গল্পের কাঠামোটা মোটামুটি মনেমনে তৈরী করে ফেলেছিলাম; একটি হন্টেড হাউস—কেউ এ বাড়ীতে এসে দু-চারদিনের বেশী থাকতে পারেনা। নানারকম ভৌতিক উপদ্রব এখানে হয়—কখনও দেখা যায় কোন টেবিলটা ঘরময় নেচেনেচে বেড়াচ্ছে—আবার কোন সময় চেয়ারে একটি নেপালী যুবতী আয়াকে বসে থাকতে দেখা যায়—সময় সময় শিশুর কান্না শোনা যায় ইত্যাদি ব্যাপার। একটা বুদ্ধিসঙ্গত সমাধানও ভেবেছিলাম। মানুষ বলতে আমরা বুঝি দেহ এবং আত্মার সঙ্গমকে। দেহ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। দেহ বহির্ভূত আত্মা যখন এসে চেয়ার বা টেবিলে প্রবেশ করে তখনই সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে থাকে। আর আত্মাই তো এক্টোপ্ল্যাজম—এই এক্টোপ্ল্যাজমই মানুষ,

পশুপক্ষী সব রকমের আকৃতিই গ্রহণ করতে পারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসে এলোমেলো চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম—সিগারেটটা শেষ করেই লিখ্‌তে বসবো ভাবছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠ্‌লো। চমকিয়ে উঠলাম—এত রাতে কে ফোন করে। রিসিভারটা কানে তুলে নিলাম—মহিলার কণ্ঠস্বর।

হ্যালো, আপনি কি অতনুবাবু?

হ্যাঁ, আপনি?

আমি লতিকা দেবী—

ব্যাপার কি লতিকা দেবী? কোন বিপদ,আপদ···?

না, ওসব কিছু নয়—আপনি এখুনি একবার আমার বাড়ীতে চলে আসতে পারেন?

এত রাত্রে?

হ্যাঁ জরুরী দরকার। আমার গাড়ীটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা, আমি তৈরী হ'য়ে নিচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দিলাম। অবাক কাণ্ড। এত রাতে কি দরকার পড়ল। যাই হোক, যেতেই সখন হবে—উঠে আবার জামা পরে নিলাম। চাকরকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুললাম—বললাম জরুরি কাজে আমায় বাইরে যেতে হবে—দরজা বন্ধ করে দিতে। রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম—অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অল্পপরেই লতিকাদেবীর ষ্টুডিবেকার কমাণ্ডারটা এসে দাঁড়ালো—ড্রাইভার মিশিরলাল বেরিয়ে দরজা খুলে দিল। গাড়ীতে বসে মিশিরলালকে জিজ্ঞেস করলাম কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে কিনা। মিশিরলাল বললে সে কিছু জানেনা। মেমসাহেব তাকে উপর থেকে বেয়ারা মারফৎ খবর দিলেন আমাকে গাড়ীতে নিয়ে আসতে—তাই সে এসেছে। মিশির গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথা বলে কম। আমিই বা আর তাকে কি প্রশ্ন করি—সুতরাং চুপ করেই রইলাম। মিনিট পনেরোর ভেতরই রোলাণ্ড রোডের লতিকাদেবীর বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। বেয়ারা সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যেই মনে হল—বললে উপরে চলুন। তার সঙ্গে উপরে উঠে এলাম—সিটিংরুমের কাছে এসে সে বললে ভেতরে যান—মেমসাহেব আপনার জন্যে বসে আছেন।

ঘরে ঢুকেই দেখ্‌লাম লতিকাদেবী বসে আছেন--পরণে হাউসকোট। সামনে স্কচ্‌ হুইস্কির বোতল, এবং সোডা। একটি গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি রয়েছে—বুঝলাম কিছুক্ষণ আগে থেকেই তিনি মদ্যপান করেছেন।

আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন,—বললেন, আসুন অতনুবাবু—সামনের ঐ চেয়ারটায় বসুন। আমাকে ড্রিঙ্ক করতে থেকে আশ্চর্য হবেন না। দিনে বা অন্য কারোর সামনে আমি কখনও ড্রিঙ্ক করিনা। কিন্তু রাত্রে যখন একলা থাকি তখন স্মৃতির জ্বালা ভোলবার জন্যই এভাবে মদ্যপান করি—তবু কিছুতেই সে ঘটনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনা। আজ দুটি কারণে এভাবে এত রাতে আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। প্রথম কারণ হচ্ছে—আপনি আজ ষ্টুডিয়োতে বলছিলেন আমাদের জীবনে ট্র্যাজিক মেটিরিয়ালের অভাব—তাই নাটকের থিম পাওয়া যায়না। আপনার এ ধারণা ভুল—আমার জীবনের কাহিনী আপনাকে আজ বলবো—তাই থেকেই বুঝতে পারবেন। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আপনি নাট্যকার, আর আপনার নাটকের হিরোইন সুমিত্রাকে আপনি বিয়ে করতে চলেছেন। বছর পনেরো আগে আমিও সব ছবিতে হিরোইনের ভূমিকাতেই অভিনয় করতাম—আর সে সব ছবির কাহিনী লিখতেন আমার স্বামী সুশান্ত

মজুমদার। আমাদের জীবনে ভুল বোঝাবুঝির ফলে যে ট্র্যাজেডী একদিন ঘটেছিল, সেরকম কিছু কখনও আপনাদের জীবনেও না এসে দেখা দেয়, সেজন্যও আপনাকে আমার জীবনের সেই ব্যথাভরা ভয়ানক দিনটার কথা বলতে চাই।

একটা গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন লতিকা দেবী। নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ফাইভ—ফিফ্‌টি-ফাইভের টিনটা এগিয়ে দিলেন আমার সামনে। দু'এক সিপ হুইস্কি পান করে আমিও এবার একটি সিগারেট ধরালাম। লতিকা দেবী বলতে শুরু করলেন। যে কাহিনী সে রাত্রে তিনি আমাকে বলেছিলেন তা যেমন বিষাদপূর্ণ তেমন করুণ। তার উপর ভিত্তি করে আমি আমার বিখ্যাত চলচ্চিত্র কাহিনী নট-গিল্‌টি রচনা করি। এরও পরিচালনা করেছিলেন বিক্রম বোস। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সুমিত্রা। দিনের পর দিন ছবিটি একই সঙ্গে তিনটি হাউসে দেখানো হয়েছিল প্রায় তিনমাস ধরে। লতিকা দেবীর আত্মকাহিনী আমি নাটকের ফর্মেই লিখি সেকথা পরে বলছি। তাঁর বক্তব্য যখন শেষ হলো তখন সকাল প্রায় সাড়ে ছটা।

বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল—একটা কাপে আমার জন্য চা তৈরী করে এগিয়ে দিলেন লতিকাদেবী।

'আপনি খাবেন না?'

"না আমি স্নান না করে চা খাই না।" নিজের আত্মকাহিনীর উপসংহার টেনে তিনি বলতে লাগলেন: শেষ পর্যন্ত বিচারপতি রমাপ্রসাদ মিত্র রায় দিলেন যে আমি নির্দোষ, অর্থাৎ সুশান্তর মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই—এ মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক দুর্ঘটনায়। প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। নিজের কানে রায় শুনলাম, অথচ বিশ্বাস হতে চাইছিলনা। আমি নিজে অবশ্য জানতাম যে সুশান্তর মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী ছিলাম না। তবু ঘটনাগুলো ঘটেছিল এমনভাবে যাতে সবারই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আমিই সুশান্তকে গুলি করে মেরেছিলাম।

কোর্ট থেকে ফিরে এসে প্রথমে নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের মত হয়েছিল; কিন্তু বিক্রমবাবুই দিনের পর দিন নানাভাবে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়ে আবার কর্ম্মক্ষম করে তুললেন। পরপর কয়েকটি ছবি হিট করলো—হাতে এলো প্রচুর টাকা। তারপরই প্রতিষ্ঠা করলাম সুশান্তর নামে আমার ফিল্ম কোম্পানী। ওখান থেকে ওঠবার আগে লতিকাদেবী আলমারি খুলে একটি বিরাট বাধানো খাতা বের করে আমার হাতে দিলেন। বললেন: আমাদের কেসের প্রাত্যহিক রিপোর্টের কাটিংস এই খাতাতে পেইস্ট করে রেখেছিলেন বিক্রমবাবু। খাতাটি এতদিন আমার কাছে ছিল—এটিও নিয়ে যান, আপনার নাটক লেখাতে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন।

কিছুদিন বাদেই নাটকটির একটি কাঠামো রচনা করে লতিকাদেবীর হাতে তুলে দিই। অবশ্য পাত্র-পাত্রীর নাম সব বদলিয়ে দিয়েছিলাম। তবে ছবি তোলবার সময় অবস্থ—কাহিনীর কিছুটা অদলবদল করতে হয়েছিল। দীর্ঘ সংলাপকে ছেঁটেকেটে চিত্রোপযোগী করতে হয়েছিল। মূল কাহিনীর প্রথম যে নাট্যরূপ দিয়েছিলাম তাই এখানে তুলে দিচ্ছি। কারণ ছবির স্ক্রিপ্ট পর্দ্দায় প্রতিফলিত দেখতেই ভাল লাগে। পড়তে গেলে তার থেকে রস পাওয়া যায় না।

নট্ গিল্‌টি—মূল নাট্যরূপ-ঃ

[কলিকাতা হাইকোর্টের একটি বিচার কক্ষ। ব্যারিষ্টার, এ্যাডভোকেট, কাগজের রিপোর্টার ও সাধারণ দর্শকে ঘরটি ভর্ত্তি। একদিকে জুরীরা বসে আছেন। মাননীয় বিচারপতি জাষ্টিস্ রুদ্রপ্রতাপ মিত্র নিবিষ্ট-মনে কেস শুনছেন ও মাঝে মাঝে কিছু নোট করে নিচ্ছেন। প্রসিকিউসান্ কাউন্সেল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সীতাংশুমোহন সান্যাল। ডিফেন্স লিড করছেন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার অমিতাভ দাশগুপ্ত। আসামীর কাঠগড়ায় বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কাননিকা দেবী বসে আছেন। দৃশ্য উঠ্‌লে দেখা যাবে প্রসিকিউসান কাউন্সেল্ শ্রীসান্যাল কেস ওপন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন]

প্র কা :—যাক্ যে কথা বলছিলাম—পুলিশে প্রথম ঘটনাটার খবর দেন ডাঃ প্রণবসেন—কাননিকাদেবীর গৃহ-চিকিৎসক টেলিফোনে জরুরি তলব পেয়ে রাত প্রায় দুটোর সময় তিনি কাননিকা দেবীর ২৩।৩৬নং লর্ডসিন্‌হা রোডের একতলার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হন। ফ্ল্যাটের সামনের দরজা খোলা দেখে তিনি সোজা ঢুকে পড়েন সিটিংরুমে এবং সেখানে একজন বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে লাইব্রেরী-ঘরে যান। সেখানে মেঝেতে শৈবাল মজুমদারের শায়িত দেহের প্রতি তাঁর নজর পড়ে। ওঁর মাথার কাছে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাননিকা দেবী ফুলেফুলে কাঁদছিলেন······এর দ্বারা অবশ্য আপনারা ভুল ধারণা করবেন না—কাননিকা দেবী একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সে যাই হোক, ডাক্তারের উপস্থিতি জান্‌তে পেরেই মিসেস মজুমদার হিস্টিরিয়া রোগীর মত ব্যবহার করতে সুরু করেন—কখনও কান্না··· কখনও পাগলের মত চীৎকার ইত্যাদি। ডাঃ সেনকে রোগীর পালস্ পরীক্ষা করতে দেখে বলেন—"না, না, ও মরেনি···এভাবে ও মরতে পারে না। বলুন ডাঃ সেন, ও মরেনি—নাহলে আমাকেও মরতে হবে···কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না," ইত্যাদি। ডাঃ সেনই পুলিশকে প্রথম খবর দেন। পুলিশ আসবার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস মজুমদার যেন আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেন—বিশ্রীভাবে ইনস্‌পেক্টর দত্তরায় ও তাঁর সহকারীদের অযথা গালাগালি দিতে সুরু করেন ওঁরা টেলিফোন করতে গেলে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং কখনও চীৎকার, কখনও কান্না, কখনও বা পাগলের মত হাসতে সুরু করেন। ডাঃ সেন পরে মতপ্রকাশ করেন যে এই সময়টায় কাননিকা দেবীকে প্রায় উন্মাদ বলে মনে হয়েছিল। যাই হোক ওঁর বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই পুলিশ সেদিন আর ওঁকে গ্রেপ্তার করেনি। তাছাড়া এখন কোন প্রমাণও তখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। যার ফলে ওঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। (একটু থেমে, চশমাটা একবার মুছে, তারপর সমস্ত ঘরটির দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে) কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যেই পুলিশের হাতে এমন কতকগুলো সাক্ষ্যপ্রমাণ এলো যার ফলে বোঝা গেল ব্যাপারটাকে ঠিক অ্যাকসিডেন্ট বলে উপেক্ষা করা চলে না, এবং আরও তদন্তের পর পুলিশ স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছল যে কাননিকা দেবীই স্থিরমস্তিষ্কে শৈবাল মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করেছেন। বলা বাহুল্য যে সঙ্গে সঙ্গেই কাননিকা দেবীকে গ্রেপ্তার করা হলো। সরকারের তরফে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ আছে একে একে এবার সেসব মাননীয় বিচারপতি মহোদয় এবং জুরীদের সামনে পেশ করতে বলব। এর থেকে অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হবে যে মৃত শৈবাল মজুমদারের পক্ষে নিজেকে গুলি করাটা অসম্ভব ছিল। সে ক্ষেত্রে কে গুলিটা ছুঁড়ল? ঐ সময় ওখানে একজন

মাত্র উপস্থিত ছিলেন—কাননিকা দেবী। এই সিদ্ধান্তেই যদি আসতে হয়, তবে বিচার করে দেখতে হবে যে গুলি করাটা কি ইচ্ছাকৃত, না অ্যাকসিডেণ্টাল? আপনাদের আগেই বলা হয়েছে যে এর পূর্ব্বেও দাম্পত্য-কলহের সময় কাননিকা দেবী আর একবার গুলি ছুঁড়েছিলেন। জুরী মহোদয়গণ! যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এ ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণাদি শোনবার পর নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন যে কাননিকা দেবী ডেলিবারেট্‌লি মিষ্টার মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করেছেন—

[সমবেত দর্শকদের মধ্যে প্রথমে গুঞ্জনধ্বনি এবং পরে বেশ গোলমাল সুরু হবে।]

জাষ্টিস্ মিত্র: (টেবিলে হাতুড়ির ঘা দেবেন এবং গোলমাল থেমে যাবে)
If there is anymore of this, the whole court shall be cleared. (ব্যারিষ্টার সান্যালের প্রতি) **continue…**

প্র. কা.: আমার প্রথম সাক্ষী ডাঃ সেনকে আমি অনুরোধ করব Witness Box-এ আসতে।

[ডাঃ সেন Witness Box-এ এসে oath নেবেন।

প্র, কা: আপনার নাম ডাঃ প্রণব সেন?

ডাঃ সেন: আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্র, কা: এই হত্যাকাণ্ড ঘটবার কতক্ষণ পরে আপনি কাননিকা দেবীর বাড়ীতে হাজির হন?

ডিফেন্স কাউন্সেল: [লাফিয়ে উঠে] My Lord, I object—বিচারের সুরুতেই ব্যাপারটাকে হত্যাকাণ্ড সংজ্ঞা দিয়ে জুরীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা আইনসঙ্গত নয়।

জাষ্টিস্ মিত্র: I agree,

প্র, কা:: I withdraw—আচ্ছা ডাঃ সেন, আপনি ঐ বাড়ীতে যাবার কতক্ষণ আগে শৈবাল মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

ডাঃ সেন: আমার মনে হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার ভেতর।

প্র, কা, মৃতদেহ দেখে আপনার কি মনে হয়নি যে মৃত্যুটা অস্বাভাবিকভাবে ঘটেছে?

ডাঃ সেন: অস্বাভাবিক তো বটেই! কাননিকা দেবীর কথা শুনেই তো জানতে পেরেছি যে ব্যাপারটা অ্যাকসিডেণ্টালি ঘটেছে।

প্র, কা,: আপনার কি মনে হয়নি যে শৈবালবাবুকে গুলি করা হয়েছে?

ডাঃ সেন: আমার মনে সে প্রশ্ন আসেনি।

প্র, কা,: কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে ঐ ভাবেই গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—

ডাঃ সেন,: হ্যাঁ, তাও হতে পারে, আবার অন্যভাবেও অর্থাৎ অ্যাকসিডেণ্টালিও ব্যাপারটা ঘটে থাকতে পারে।

প্র, কা,: এ সম্বন্ধে আর যদি কিছু আপনার জানা থাকে আমাদের বললে সুবিচারের সাহায্য করা হবে।

ডাঃ সেন: আমার এই বিষয়ে আর কিছুই বলবার নেই।

প্র, কা,: My Lord, এই সাক্ষীকে আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

[প্রসিকিউসান কাউন্সেল চেয়ারে বসে পড়বেন এবং ডিফেন্স কাউন্সেল উঠে দাঁড়াবেন]

ডি, কা,: আপনি কত বছর ধরে কাননিকা দেবীর পারিবারিক চিকিৎসক?

ডাঃ সেন: (একটু ভেবে) তা বছর পাঁচেক হবে বোধহয়।

ডি, কা, শৈবাল মজুমদারকে আপনি কতদিন থেকে জানেন ?

ডাঃ সেন : আগে কাননিকা দেবীর ওখানেই মৌখিক পরিচয় হয়। ভালভাবে জানি বছরখানেক ধরে—ওঁদের বিয়ের পর থেকে।

ডি, কা, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয়টা বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল কি ?

ডাঃ সেন : কাননিকা দেবীর সঙ্গে আগে থেকেই যথেষ্ট আলাপ ছিল। আর অল্প দিনের আলাপ হলেও মিষ্টার মজুমদার আমাকে বন্ধু বলেই মনে করতেন।

ডি, কা, : আচ্ছা। এঁদের বাড়ীতে এই দম্পতিকে একসঙ্গে তো প্রায়ই দেখেছেন ?

ডাঃ সেন : অনেক সময়েই দেখেছি।

ডি, কা, এঁদের দেখে কি কখনও আপনার মনে হয়নি যে এঁদের মত সুখী দম্পতি সচরাচর চোখে পড়ে না ?

ডাঃ সেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। চিকিৎসার ব্যাপারে বহু বাড়ীতেই আমাকে যেতে হয়—কিন্তু শৈবালবাবু এবং কাননিকা দেবীর মধ্যে বরাবর যেমন একটা মধুর সম্পর্ক দেখেছি এমনটা কোথাও আমার চোখে পড়েনি।

ডি, কা, : গৃহ চিকিৎসক এবং পারিবারিক বন্ধু হিসাবে ওদের সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাতে করে ঐ দম্পতির জীবনে সত্যিকার অসন্তোষ থাক্‌লে সে কথা তো আপনি নিশ্চয় জানতে পারতেন ?

ডাঃ সেন : তা পারতাম বৈকি।

ডি, কা, : ধন্যবাদ, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।]

[ডিফেন্স কাউন্সেল বসে পড়বেন এবং ডাঃ সেনও সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন। প্রসিকিউসান্ কাউন্সেল আবার উঠে দাঁড়াবেন।

প্র, কা, : পুলিশ ইন্সপেক্টার দত্ত রায়—

[মিঃ দত্তরায় সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবেন এবং যথানিয়মে oath নেবেন।]

প্র, কা : শৈবাল মজুমদারের হত্যাকাণ্ড বা অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে কবে কখন এবং কিভাবে আপনি খবর পান ?

দত্তরায় : গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত প্রায় দুটো পনেরো মিনিটের সময় লর্ড সিন্‌হা রোডের ২৩/৩৬নং বাড়ী থেকে টেলিফোন আসে যে রিভলবারের গুলিতে মিষ্টার মজুমদার বলে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন এবং আমরা যেন তক্ষুনি সেখানে হাজির হই।

প্র, কা : কতক্ষণ বাদে আপনারা উপস্থিত হন ?

দত্তরায় : আমি একজন সহকারী এবং দুইজন পুলিশ নিয়ে মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছই।

প্র, কা : গিয়ে কি দেখেন ?

দত্তরায় : সিটিং-রুমের মেঝেতে একটি রিভলভার পড়ে থাকতে দেখি এবং পাশের ঘরে গিয়ে মিঃ মজুমদারের মৃতদেহ দেখতে পাই।

প্র, কা : মিসেস মজুমদার তখন কি করছিলেন ?

দত্তরায় : তিনি খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং ডাঃ সেন তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে ওঠেন—"ডাঃ সেন, ওদের এখান থেকে দূর করে দিন—এখানে ওদের আমি সহ্য করতে পারছি না।" ডাঃ সেন বলেন যে আমাদের investigation-এ কোন রকম বাধা দেওয়া যাবে না—কিন্তু তারপরেই আমি থানায় ফোন করতে গেলে মিসেস মজুমদার এসে আমার হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নেন।

প্র, কা : ব্যাপারটা দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল ? accidental death না murder ?

দত্তরায় : (একটু ভেবে) Murder - কারণ Mrs Majumdar যেভাবে ব্যবহার করছিলেন তাতে তিনি যে নির্দোষ নন এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছিল।

প্র, কা : ধন্যবাদ, আর আমার কিছু জানবার নেই। (বসে পড়লেন)

ডি, কা : (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনাকে যখন ফোনে প্রথম খবর দেওয়া হয়—কে আপনাকে ফোন করেন, কোন পুরুষ না কোন মহিলা ?

দত্তরায় : পুরুষ, ডাঃ সেনই ফোন করেন বলে পরে জানতে পারি।

ডি. কা. : তিনি কি আপনাকে ফোনে জানিয়েছিলেন যে মিঃ মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ?

দত্তরায় : না।

ডি. কা. : তিনি বুঝতে পারলেন না, অথচ ব্যাপারটা দেখে আপনার অনুমান হয়েছিল এটি হত্যাকাণ্ড— কি এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছিলেন ?

দত্তরায় : আমার তাই অনুমান হয়েছিল।

ডি. কা. : (হেসে উঠে) তাই বলুন, আপনার অনুমান হয়েছিল—কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলেননি।

দত্তরায় : তাছাড়া মিসেস মজুমদার আমাদের সঙ্গে যেরকম বিশ্রী ব্যবহার করেছিলেন—অত Slight provocationএ.

ডি. কা. : Slight provocation ! তাই বটে ! (একটু থেমে) আচ্ছা, রিভলবারএ কোন আঙুলের ছাপ পেয়েছিলেন ?

দত্তরায় : না—ছাপ থাকলে তা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

ডি. কা. : Just one would expect following a struggle—আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

[সাক্ষী ধীরে ধীরে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং ডিফেন্স কাউন্সেল বসে পড়বেন]

প্র. কা. : আমার পরের সাক্ষী মিষ্টার ভি. এস. পার্থসারথি।

[মিঃ পার্থসারথির নাম ডাকা হবে এবং তিনি ধীরে ধীরে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে উঠবেন—মধ্যবয়সী মাদ্রাজী—মোটাসোটা চেহারা, oath নেবেন।]

প্র. কা. : আপনার নাম তো মি. ভি. এস. পার্থসারথি ?

পার্থসারথি : আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্র. কা. ২৩।৩৬নং লর্ড সিন্‌হা রোডের বাড়ীর দোতলার একটি ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন ?

পার্থসারথি : হ্যাঁ, প্রায় দু'বছর ধরে ওখানে আমি আছি।

প্র. কা. : শৈবাল মজুমদার এবং কাননিকা দেবীকে আপনি জানতেন ?

পার্থসারথি : তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও পরিচয় ছিল।

প্র. কা. : শৈবাল মজুমদার যেদিন গুলির আঘাতে মারা যান—আপনি কখন সেকথা জানতে পারলেন ?

পার্থসারথি : রাত প্রায় দুটো হবে—আমার স্ত্রী বললেন নীচে যেন কিসের হৈ চৈ হচ্ছে—দেখে এস।

প্র. কা. : আপনি কি নীচে নেমেছিলেন ?

পার্থসারথি : হ্যাঁ, নীচে নেমে দেখতে পাই যে মিঃ মজুমদারের ফ্ল্যাটের সামনের দরজা খোলা এবং বসবার ঘরে পুলিশ ও অন্যান্য লোকে ভর্ত্তি। ভেতরে ঢুকে মিঃ মজুমদারের মৃত্যুর কথা জানতে পারলাম—

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার আমাকে পরদিন থানায় যেতে বলেন এবং সেই অনুসারে পরদিন ওখানে গিয়ে আমার বিবৃতি দিই।

প্র. কা. : মাসখানেক আগেও একবার এঁদের স্বামী-স্ত্রীতে গোলমাল লাগে এবং সেদিনও একটা গুলি ছোঁড়ার ব্যাপার ঘটে। এ বিষয়ে আপনি কি জানেন?

পার্থসারথি : সেদিন ব্যাপারটা ঘটে রাত প্রায় বারোটার সময়। আমরা সিনেমা দেখে একটু আগেই ফিরেছি—হঠাৎ একতলার ফ্ল্যাটে ভয়ানক চেঁচামেচি শুনে নীচে নেমে দেখি ওঁদের স্বামী-স্ত্রীতে খুব গোলমাল হচ্ছে—ও বাড়ীর আরও কয়েকজন লোক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম যে এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে গোলমাল থামানোর চেষ্টা করাটা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। এমন সময় ওঁদের সিটিংরুমের দরজা খুলে গেল, দেখি দরজার কাছে মিষ্টার মজুমদার দাঁড়িয়ে। এই সময় কাননিকা দেবীও ওঘরে ছুটে এলেন এবং চীৎকার করে উঠ্‌লেন—"I will shoot, I will shoot."

তারপরেই একটা গুলির আওয়াজে আমরা চম্‌কে উঠ্‌লাম—কিন্তু রিভলবারটা তাঁর দিকে তাগ্ করা থাকলেও গুলিটা ফস্কে গিয়েছিল—এরপর মজুমদার এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমরা—যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলাম—সবাই হতচকিত হয়ে গেলাম। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখ্‌লাম এসব পারিবারিক কলহের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। পরে অবশ্য একদিন মিষ্টার মজুমদারকে আমি বলেছিলাম যে রিভলবারটিকে সরিয়ে রাখতে। তিনি অবশ্য আমার উপদেশ তেমন গায়ে মাখলেন না। বললেন, মিসেস মজুমদার ভয় দেখাবার জন্যই ওভাবে গুলি করেছিলেন। ওঁকে গুলি করবার কোন অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না। আমি অবশ্য জানিয়েছিলাম যে রিভলবারটা তাঁর দিকেই তাগ্ করতে আমি দেখেছি—সেকথা হেসেই তিনি উড়িয়ে দিলেন। সেদিন যদি আমার কথা শুনে রিভলবারটা সরিয়ে রাখতেন তাহলে এভাবে তাঁকে মরতে হতনা।

প্র. কা. : অনেক ধন্যবাদ—আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

ডি. কা. : (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, মিষ্টার পার্থসারথি, আগেরবার যখন কাননিকা দেবী গুলি ছোঁড়েন তখন তো আপনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে শৈবাল মজুমদারকেই তাগ্ করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

পার্থসারথি : হ্যাঁ, আমি তাই দেখেছিলাম। এমন কি fire করবার সঙ্গে সঙ্গে puff of smoke-ও দেখেছিলাম—

ডি. কা. : তার আকৃতিটা কত বড় হবে?

পার্থসারথি : সেটা হবে……(ভুরু কুঁচকিয়ে)…

ডি. কা. : (দুহাত দিয়ে একটা বিস্তৃতি দেখিয়ে) এত বড় হবে কি?

পার্থসারথি : না, অত বড় নয়।

ডি. কা. : তবে কত বড়?

পার্থসারথি : (হাত বিস্তৃত করে) এই রকম আর কি।

ডি. কা. : এতটা?

পার্থসারথি : হ্যাঁ, অতটাই হবে।

ডি. কা. : আচ্ছা, আপনি কি জানেন যে কাননিকা দেবীর কার্তুজগুলো ছিল corditecartridges?

পার্থসারথি : না, তা জানতাম না।

ডি. কা. : আর এও বোধহয় জানেন না যে cordite cartridge থেকে কোন smoke হয়না ?

[কোর্টের ভেতর একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠ্‌বে]

পার্থসারথি : না, তা কি করে জানবো ?

ডি. কা. : আচ্ছা, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই—আপনি যেতে পারেন—

[ডিফেন্স কাউন্সেল বসে পড়বেন এবং পার্থসারথি witness box থেকে বেরিয়ে আসবেন।]

জাস্টিস মিত্র : আজকের মত কোর্টের কাজ এখানেই শেষ হোলো। কাল আবার কেশের hearing হবে।

[জজ এবং জুরীরা উঠে দাঁড়াবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাইও বেরিয়ে আসতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসবে।]

(২)

[ব্যারিষ্টার মিঃ অমিতাভ দাশগুপ্তের বাড়ীতে তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে বসে মিষ্টার দাশগুপ্ত তাঁর জুনিয়ারদের সঙ্গে এই কেস সম্বন্ধে কনসাল্ট করছেন। ফিল্ম ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ বোস কাননিকা দেবীর বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী প্রিয়জন হিসাবে উপস্থিত আছেন। ঘরের চারপাশে বুকসেলফগুলোতে থাকে থাকে আইনের বই সাজানো রয়েছে।]

অমিতাভ : (অনিরুদ্ধের প্রতি) আপনি চিন্তা করবেন না মিষ্টার বোস। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা আমরা করব। তাছাড়া একটা কথা বোধহয় জানেন না—মার্ডার ট্রায়ালের ডিফেন্সের দায়িত্ব নেবার আগে, একটা কথা আমরা খুব ভালভাবে ভেবে দেখি। নির্দোষ একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারলেই তবে আমরা তার কেস হাতে নেই। এক্ষেত্রে কাননিকা দেবী যে নিরপরাধ সে বিষয়ে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

একজন এ্যাডভোকেট : আচ্ছা, মিষ্টার বোসকে আমাদের তরফ থেকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করানো যায় না ?

অমিতাভ : তাতে বিশেষ কিছুই লাভ হবেনা—বরং complications-এর সৃষ্টি হতে পারে। কেস্‌টা হচ্ছে—রিভলবারের গুলিতে শৈবাল মজুমদার মারা গেছেন। সরকার পক্ষ থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা হবে যে কাননিকা দেবী হত্যা করবার জন্যই শৈবাল মজুমদারকে স্থিরমস্তিষ্কে গুলি করেছেন। আর আমাদের defence তরফের argument হবে দুজনে পিস্তলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার সময় আচমকা গুলি ছুটে গিয়ে মিষ্টার মজুমদারের মৃত্যু হয়। সরকার পক্ষের সাক্ষীরা deliberate shooting এর প্রমাণ হিসাবে যেসব কথা বলবে সেগুলিকে খণ্ডন করে দেওয়াই হল আমাদের একমাত্র কাজ।

অপর একজন এ্যাডভোকেট : পার্থসারথি যে এভাবে নাজেহাল হবে একথা কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি স্যার।

অমিতাভ : এক ধরণের লোক আছে যারা যতটা দেখে তার থেকে ঢের বেশী কল্পনা করে নেয়। প্রথমতঃ কাননিকাদেবী আগের বারে যদি সত্যি সত্যিই শৈবাল মজুমদারের দিকে তাগ্‌ করে গুলিটা ছুঁড়তেন, তবে সেগুলিটা মাথার উপরে অত উঁচুতে সিলিং-এর কোণে গিয়ে লাগতনা। কিন্তু ঐ কথাটা নিয়ে argument

করবার কোন দরকারই হলনা যখন পার্থসারথি ঐ অদ্ভুত উক্তিটা করে বসল যে সে গুলির সঙ্গে সঙ্গে puff of smoke দেখেছে।

প্রথম জুনিয়ার : Finger print এর কথা সরকারের তরফ থেকে প্রথমটায় তুললই না,—আপনি ব্যাপারটা তোলাতে আমি একটু আশ্চর্য্যই হলাম। Finger print থাক্‌লে কিন্তু কেস্‌টা আমাদের পক্ষে একটু গোলমেলেই হ'য়ে উঠতো।

অমিতাভ : তা যদি থাকত তাহলে ওদের দিক থেকেই সেকথা আগে তুলত। আমি জানতাম এক্ষেত্রে Finger print থাকতে পারে না এবং সেটা আমাদের defence-এ যথেষ্ট সাহায্য করবে। আচ্ছা মিঃ বোস, আর আপনার কিছু বলবার আছে ? আমরা এবার নিজেদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব···

অনিরুদ্ধ : (উঠে দাঁড়িয়ে) আর কিছু টাকা কি দিয়ে যাব ?

অমিতাভ : ও বিষয়ে যখন যা দরকার হবে অ্যাটর্ণিই আমাকে সময়মত জানাবেন।

অনিরুদ্ধ : (নমস্কার করে) আচ্ছা, আসি (এঁরা সকলে হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করবেন ও অনিরুদ্ধ বেরিয়ে যাবেন।)

অমিতাভ : আচ্ছা অতীন, এই বইটা থেকে ফ্ল্যাগ-করা পাতাগুলো আমাদের পড়ে শোনাও তো···

২য় জুনিয়ার : [পড়তে থাকবে] There is the safety device on most good hammerless···

[ধীরে ধীরে আলো কমে আসবে এবং যবনিকা]

৩

[পরের দিন কোর্টরুম-কার্টেন উঠলে দেখা যাবে যে প্রসিকিউসান্‌ কাউন্সেল দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন।]

প্র, কা : এবার দুজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য আমরা কোর্টের সামনে উপস্থিত করব। আমার প্রথম সাক্ষী কলকাতার বিখ্যাত প্যাথলজিষ্ট—ডাঃ গোবিন্দলাল ঘোষ।—

[পেয়াদা ডাঃ ঘোষের নাম ধরে ডাকবে এবং তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে oath নেবেন।]

প্র, কা, : ডাঃ ঘোষ, শৈবাল মজুমদারের দেহে গুলির যে আঘাত লাগে, তাইতেই কি তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?

ডাঃ ঘোষ, : এ বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই।

প্র, কা : আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আত্মহত্যা করবার জন্য শৈবাল মজুমদার নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন ?

ডাঃ ঘোষ : আমি একটা Skeletonএর উপর নানাভাবে experiment করে দেখেছি—নিজে গুলি করলে, গুলির গতিপথটা ওভাবে হত না এবং মেরুদণ্ডের যে জায়গায় গুলিটা আঘাত করেছে, সেভাবে আঘাতটা হত না।

প্র, কা : তাহলে ব্যাপারটা সুইসাইড নয়—?

ডাঃ ঘোষ : না—

প্র, কা : আচ্ছা, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

(বসে পড়লেন)

ডি, কা: (উঠে দাঁড়িয়ে) কি ভাবে বুলেটটা ছোঁড়া হয়েছিল তা নির্ধারণ করতে গিয়ে অন্য একটি skeleton এর উপর আপনাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল ?

ডা: ঘোষ: হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিকভাবে বোঝবার জন্য অন্য একটি skeletonএর উপর আমাকে experiment করতে হয়।

ডি, কা: আচ্ছা, ডা: ঘোষ,formations এর দিক থেকে প্রত্যেক মানুষের দেহেই একটা অসাম্য দেখা যায় নয় কি ?

ডা: ঘোষ: তা যায়—

ডি, কা: ধন্যবাদ, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

[বসে পড়লেন এবং সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন]

প্র, কা: এর পরের সাক্ষী অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীমোহিতচন্দ্র ব্যানার্জি।

[পেয়াদা সাক্ষীর নাম হাঁকবে এবং ধীরে ধীরে মোহিতবাবু এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠবেন ও oath নেবেন।]

প্র, কা: মোহিতবাবু, যে রিভলভারের গুলিতে শৈবাল মজুমদার নিহত হন, সেটাকে আপনি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন তো ?

মোহিত: তা দেখেছি বৈকি।

প্র, কা: আচ্ছা অস্ত্রটাকে আপনার বেশ নিরাপদ বলে মনে হয়েছে ?

মোহিত: নিশ্চয়। Its one of the safest revolvers ever made,

প্র, কা: যথেষ্ট শক্তি ব্যবহার করে ট্রিগার টিপ্‌লে, তবেই এটা থেকে ফায়ার করা যায় নয় কি ?

মোহিত: আপনি ঠিকই বলেছেন।

প্র, কা: সে ক্ষেত্রে accidentally ট্রিগারে একটু চাপ পড়ল, আর অমনি গুলি ছুটে গেল—এমনটা হওয়া কি সম্ভব বলে মনে হয় ?

মোহিত: মোটেই না। রিভলভার নিয়ে একটু টানাটানি করলাম আর গুলি ছুটে গেল—একথা আমি অবিশ্বাস্য বলেই মনে করি।

প্র, কা: **Therefore the idea of it going off accidentally when no one wished to fire certainly did not commend itself to you.**

মোহিত: ওভাবে ব্যাপারটা ঘটতেই পারে না।

প্র, কা: ধন্যবাদ, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই।

(বসে পড়বেন)

ডি, কা: (উঠে দাঁড়িয়ে) রিভলভারটা, অর্থাৎ exhibit No 1, ওটা একবার দেখি। (কোর্টের একজন কর্মচারী রিভলবারটা এনে তাঁর হাতে দেবে। রিভলবারটা হাতের তেলোয় রেখে সাক্ষী এবং জুরীদের সামনে তুলে ধরে) মোহিতবাবু—আপনি কি সত্যিই মনে করেন, This is one of the safest weapons made ?

মোহিত: আমি তাই মনে করি।

ডি. কা. : এটাতে কোন safety device নেই, লক্ষ্য করেছেন কি ?

মোহিত : করেছি।

ডি. কা. : ভাল hammerless revolver-এর প্রত্যেকটিতেই safety device থাকে একথা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয় ?

মোহিত : জানি বৈকি। আমি বলতে চাইছিলাম যে hammer যুক্ত রিভলবার বা অটোম্যাটিক পিস্তলের চেয়ে এই revolverটি অনেক safer.

ডি. কা. : বুঝলাম আপনি কি বলতে চাইছেন। (রিভলবারটি নিয়ে ক্রমাগত ট্রিগার টিপতে থাকবেন এবং ক্রমাগত ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্ করে আওয়াজ হতে থাকবে। নিস্তব্ধ কোর্টরুমে বারবার এই আওয়াজটার সঙ্গে একটা অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হবে।)

ডি. কা. : কই মোহিতবাবু, ট্রিগার টিপতে তো এমন কিছু muscular strength-এর দরকার হচ্ছে না—ছেলেদের খেলনা বন্দুকের থেকে একটু বেশী জোর লাগছে মাত্র।

মোহিত : এখন যেভাবে ধরেছেন, কাড়াকাড়ির সময় অস্ত্রটাকে অত শক্তভাবে ধরা সম্ভব ছিলনা—আর সেক্ষেত্রে ট্রিগারও অত সহজে টেপা যেত না। রিভলবারটা একটু আল্গা করে ধরলেই বুঝতে পারবেন…

ডি. কা. : তাই বুঝি ? (রিভলবারটা আলগা করে ধরে আবার ট্রিগার প্রেস করতে থাকবেন এবং চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখাবেন—ক্রমাগত ক্লিক্ ক্লিক্ করে শব্দ হতে থাকবে।) কই মোহিতবাবু, আপনার সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে তো ব্যাপারটা মোটেই মিলছেনা। (বারবার ট্রিগার টিপে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করে যাবেন, যার ফলে জজসাহেব, জুরি থেকে আরম্ভ করে সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে এ রিভলবারের ট্রিগারে একটু চাপ পড়লেই অতি সহজে গুলি বেরিয়ে আসবে। এরপর পিস্তলটা সামনের টেবিলে রেখে আসবেন।)

ডি. কা. : আচ্ছা মোহিতবাবু, শৈবাল মজুমদারের মৃত্যুর পর, এই রিভলবারটার পরপর কিভাবে কার্তুজ সাজানো ছিল মনে আছে কি ?

মোহিত আছে।

ডি. কা. এইরকমভাবে ছিল কি—discharged, live, discharged, live, live,…live…?

মোহিত হ্যাঁ, এইরকমভাবেই ছিল।

ডি. কা. ডিস্‌চার্জড্ কার্তুজ দুটো থেকে বোঝা যায় দুবার গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

মোহিত তা যায়।

ডি. কা এটাও বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে discharged কার্তুজগুলোর মধ্যের চেম্বারে একটা live কার্তুজ ছিল ?

মোহিত তা করেছি।

ডি. কা. এই রিভলবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য নজর করেছেন নিশ্চয়ই—ট্রিগারটার অর্ধেক টান পড়লেই সিলিণ্ডারটা ঘুরে যায় ?

মোহিত : নজর করেছি।

ডি. কা. : করেছেন ? তাহলে এও দেখেছেন বোধহয় সেক্ষেত্রে সিলিণ্ডার ঘুরে গেলেও গুলি ছুটে যায়না ?

মোহিত : তা হতে পারে।

ডি. কা.: তা থেকে এই মনে হয়না যে প্রথম দিনের গুলির পর দ্বিতীয় দিনে প্রথমে ট্রিগারে অর্ধেক টান পড়াতেই সিলিণ্ডার ঘুরে যায় এবং দ্বিতীয় চেম্বারের গুলি সেইজন্যই লাইভ্ থাকে ?

মোহিত: কোন কারণে সিলিণ্ডারটা আগেই ঘুরে গিয়েছিল এবং সেই জন্যই ও চেম্বারের গুলি ফ্যায়ার হয়নি।

ডি. কা.: তা বটে, তা বটে! (এগিয়ে গিয়ে আবার পিস্তলটা তুলে নিয়ে কয়েকবার ট্রিগার টিপে টিপে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ করবেন।) আচ্ছা মোহিতবাবু, ধরুন একজন লোকের হাতে এই রিভলবারটা রয়েছে— একজন এমন সময় এসে সেটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল—এই ধস্তাধস্তির ভেতর লোডেড্ রিভলবারটা থেকে কি গুলি ছুটে যেতে পারে না ?

মোহিত: তা পারে।

ডি. কা.: বিশেষতঃ রিভলভারের নলটি যদি সেই ব্যক্তির দিকে ফেরানো থাকে ?

মোহিত: সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই মারা যাবে।

ডি. কা.: ধন্যবাদ, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই। (বসে পড়বেন এবং সাক্ষী কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসবেন)।

মিঃ মিত্র: আর কোনো সাক্ষী আছে ?

প্র. কা.: (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাদের তরফে এই শেষ সাক্ষী।

(বসে পড়বেন)

ডি. কা: (উঠে দাঁড়িয়ে) My Lord, accused-এর ইচ্ছানুসারে আমি তাঁকেই এবার সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করব। [আসামীর কাঠগড়া থেকে কাননিকাদেবী এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে উঠবেন। ধীরে ধীরে শুরু করবেন—]

কাননিকা: সেদিনটা ছিল গতবছরের ডিসেম্বর মাসের তিরিশ তারিখ—এক বান্ধবীর বাড়ীতে ডিনার খেয়ে প্রায় দশটার সময় আমি বাড়ী ফিরি—তারপর পোষাক বদলিয়ে গায়ে একটা ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে আমি আমার study-তে আসি। শৈবাল যে নতুন নাটকটা লিখছিল সেটাকে নিয়েই আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম—আজও সমস্ত ঘটনাটা আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। ঘটনাটা ঠিক এইভাবেই ঘটেছিল—

[ফ্ল্যাশ ব্যাক—মঞ্চ ঘুরে যাবে এবং দেখা যাবে লর্ড সিন্‌হা রোডের কাননিকাদেবীর নীচের তলার ফ্ল্যাটের পড়বার ঘর। চারিদিকে সোফা, কাউচ, টেবিল ইত্যাদি—দু-একটা বুককেস্ রয়েছে। ঘরের মেঝেতে বড় কার্পেট। কিছুক্ষণ ঘরটা খালি থাকবে। একটু বাদে কাননিকাদেবী রকিং-চেয়ারের কাছে এসে রিডিং-ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেবেন এবং ঘরের সাধারণ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে রকিং চেয়ারটায় এসে বসে স্ক্রীপ্ট পড়তে থাকবেন। পাশের টেবিলটা থেকে ওয়ালেট্‌টা খুলে তার ভেতর থেকে একটা চাবি বের করলেন। এগিয়ে গিয়ে সামনের বড় টেবিলটার ড্রয়ারটার চাবি লাগিয়ে খুলবেন—প্রথমেই চোখে পড়বে রিভলবারটা। সেটা তুলে নিয়ে দেখবেন এবং আবার আগের জায়গায় রেখে দেবেন। ড্রয়ার থেকে একটা লাল-নীল পেনসিল তুলে নিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দেবেন। চাবিটা কিন্তু ড্রয়ারেই লাগানো থাকবে। কাননিকাদেবী আবার ফিরে এসে রকিং-চেয়ারটায় বসে স্ক্রীপটা পড়তে থাকবেন এবং লাল-নীল পেনসিল্‌টা দিয়ে জায়গায় জায়গায় কি সব নোট করবেন। স্ক্রীপটা টেবিলের ওপর রেখে দেবেন এবং নাটকের সংলাপ মন থেকে বলবার চেষ্টা করতে থাকবেন, এই প্রয়াসে তাঁর ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌বে। কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াবেন—নজর পড়বে টেবিলের ওপরে রাখা একটা চিঠিতে—চিঠিটার খামটা খোলা

অর্থাৎ আগেই চিঠিটা পড়া হয়ে গেছে। আবার সেই চিঠিটাকেই বের করে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে থাকবেন।]

কাননিকা : (চিঠি থেকে) নাটকের শেষ অঙ্ক কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। অথচ কথা আছে নাটকটা শেষ করে তবে ফিরবো। মধুপুরের শীতকালটা যে কত সুন্দর তা নিজের চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। কিন্তু এ সৌন্দর্য ঠিক মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে পারছি না। প্রথমত নাটকটা আয়ত্তে আনতে পারছি না। আর বারবার মোনালিসার রহস্য-মাখানো হাসিহাসি মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে—(চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরবেন এবং মুখে 'মোনালিসা স্মাইলটা' ফুটে উঠবে।) মোনালিসা! (বড় আয়নাটার কাছে গিয়ে) সত্যিই কি আমার হাসিতে আর সেই বিশ্বমোহিনী মোনালিসার হাসিতে কোন মিল আছে?

[ধীরে ধীরে সামনের দরজাটা খুলে যাবে এবং ঘরে ঢুকবেন শৈবাল, হাতে পোর্টফোলিও, এদিকে পেছন করে থাকাতে প্রথমটায় কাননিকা শৈবালকে দেখ্‌তে পাবেন না—ঘুরে দাঁড়াবেন এবং দুজনে চোখাচোখি হবে।]

শৈবাল : মোনালিসা!

কাননিকা : (এগিয়ে এসে হাত ধরে) শৈবাল! এত রাত্রে? অথচ লিখেছ নাটক শেষ না করে···

শৈবাল : পরশু যখন চিঠি লিখি তখন ভাবতেও পারিনি এভাবে নাটকটা শেষ করতে পারব। তারপর হঠাৎ লেখাটা অদ্ভুতভাবে সহজ হ'য়ে এল। সেই রাত্রেই লেখাটা শেষ করে ফেললাম। (একটু থেমে) বর্ধমানের কাছে লাইন খারাপ ছিল—নাহলে অনেক আগে এসেই পৌঁছতে পারতাম। নেহাল সিং জেগেই আছে—ওকে ওদিকের ঘরে মালপত্র তুলে রাখতে বলেছি। এখন রাতও তো কম হল না—তুমি বসে বসে কি করছিলে?

কাননিকা : তোমার নাটকের থার্ড এ্যাক্ট অবধি নিজে নিজেই রিহার্স করছিলাম।

শৈবাল : নাটকটার শেষটায় এমন একটা টার্ন দিয়েছি—নায়িকার চরিত্রটি এবার তোমাকে যা suit করবে—

কাননিকা : আজই শেষ অঙ্কটা শুনবো—তার আগে তোমার খাবার বন্দোবস্ত করে আসি—

শৈবাল : আমি station থেকেই খেয়ে এসেছি—

কাননিকা : তাহলে কফি করতে বলি···(কলিং-বেল টিপবেন এবং শৈবাল এগিয়ে এসে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কার্পেটের ওপর ওর পায়ের কাছে বসবেন।)

কাননিকা : শেষ অঙ্কটা খুব জমেছে তো?

শৈবাল : শুনলেই বুঝতে পারবে। The whole play has power and truth. লেখবার সময় নায়িকার প্রতিটি সংলাপের ভেতর দিয়ে তুমিই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিলে। এই নাটকটাই হবে আমাদের সবচেয়ে সেরা কাজ।

কাননিকা : আমাদের নয়—তোমার।

শৈবাল : Nonsense, তোমার শিল্প-মানসের ছোঁয়াচ পেয়েই তো আমি সত্যিকার নাটক লিখতে শিখ্‌লাম। আমার আগেকার নাটকগুলোতে স্ত্রী চরিত্রগুলো হয়ে উঠ্‌তো death masks.

[বেয়ারা ঢুকবে কাননিকা দেবী কফি আনতে বলবেন। বেয়ারা চলে যাবে।]

কাননিকা : এ নাটকটা যাতে হিট করে এজন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এতদিন আমি টাকা পেয়েছি অভিনয় করে। আর তুমি নাটক লিখে। এই আমরা প্রথম অনিরুদ্ধ বোসের সঙ্গে joint producers হিসাবে ছবির কাজে নামছি—আমি আমার প্রাণ দিয়ে অভিনয় করব···তিন মাসে যদি বইটা শেষ করা যায়। তারপরে আমাদের প্ল্যানমত দু'মাসের জন্য Europe এ ছুটি কাটিয়ে আসব। (একটু থেমে) শেষ অঙ্কটা তাহলে পড়তে শুরু কর।

শৈবাল : [হাতে স্ক্রীপ রয়েছে কিন্তু সেদিকে নজর নেই—মুগ্ধের মত এতক্ষণ কাননিকার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে] না, on second thoughts, নাটকটা এখন পড়বোনা।

কাননিকা : কেন বলতো ?

শৈবাল : আজকের এই সময়টার জন্য যেন উৎসুকভাবে প্রতীক্ষা করছিলাম—Lets forget the actress and playwright, Lets just be-us-Lovers.

[বেয়ারা কফির পট ও কাপ নিয়ে আসবে এবং টেবিলের ওপর রেখে চলে যাবে।]

কাননিকা : (কফি ঢালতে ঢালতে হাসির সঙ্গে) এ'ক বছর বিবাহিত জীবনের পরও আমাদের প্রেমে কি কোন ভাটা পড়েছে ? অথচ সাধারণ লোকে ভাবে চিত্র-জগতের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রেম বেশীদিন টেঁকে না।

[দুজনে কফি পান করতে থাকবে।]

শৈবাল : (কাষ্ঠ হাসির সঙ্গে) কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটি তো প্রায়ই হয়—

কাননিকা : হয়—কিন্তু প্রায়ই হয় না।

শৈবাল : (ভ্রূকুটির সঙ্গে) আমার তো মনে হয় আমরা অতিরিক্ত ঝগড়া করি—সেদিন যেভাবে উত্তেজিত হয়ে ঘরের মধ্যে গুলিটা ছুঁড়লে—

কাননিকা : তোমার কি মনে হয় রেগে গেলে আমি তোমাকেও গুলি করতে পারি ?

শৈবাল : আমাকে গুলি করবে না জানি. কিন্তু ও ধরণের রাগকে চণ্ডালের রাগ বলে। রাগের চোটে হয়তো নিজেকেই গুলি করবে। সেদিন চাকর-বাকর এবং অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা কে কতটা দেখতে পেয়েছিল জানি না। সিঁড়ির কাছের দরজাটাও ছিল খোলা—গোলমাল শুনে ওপরের ফ্ল্যাটের পার্থসারথি নাকি নেমে এসেছিল। আরও দু'একজন বোধহয় ছিল। আমাকে পরে পার্থসারথি বল্লে যে দরজার কাছে ও দেখেছিল আমাকে তাগ্ করেই নাকি তুমি গুলি করেছিলে। আমি প্রতিবাদ করাতে বল্লে 'মিষ্টার মজুমদার' আমি আর কারোকে কিছু বললাম না, কিন্তু রিভলভারটা বাড়ীতে রাখবেন না।

কাননিকা : কি সর্বনেশে লোক বলত ?

শৈবাল : তাছাড়া চাকরেরা কি বলে বেড়াচ্ছে জানি না—তাই জন্যেই বলেছি আর আমরা এভাবে ঝগড়া করব না।

কাননিকা : তুমি কি ভাব আমারই এসব ভাল লাগে ! তোমাকে আঘাত দিলে পরে আমার কিরকম অনুশোচনা হয় জান ?

শৈবাল : তাছাড়া, এখন থেকে আমরা বাজে কথা নিয়ে কখনও কথা কাটাকাটি করব না। Its wrong, Monalisa. Its evil ! We love too deeply. (কাননিকা স্বপ্নালুভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন —শৈবাল ওঁর দিকে ফিরে বলবেন) কি ভাবছ ?—

কাননিকা : প্রথম যে দিনটায় তোমার সঙ্গে আলাপ হল, ষ্টুডিয়োতে রিহার্সেল দিচ্ছি—তুমি এলে—অনিরুদ্ধ বোস তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (হেসে উঠে) তোমার সঙ্গে মেয়েদের নিয়ে এর আগে ষ্টুডিও-মহলে কত গল্প শুনতাম—ভেবেছিলাম চেহারাটা হবে···

শৈবাল : (অল্প হাসির সঙ্গে) কন্দর্পের মত—খুব আশাহত হোয়েছিলে তো ?

কাননিকা : ডন্ জুয়ানের সঙ্গে চেহারার তেমন সাদৃশ্য না থাকলেও চোখে ছিল মেফিষ্টোফিলিসের মত আকর্ষণী শক্তি।

শৈবাল: (একটু শ্লেষের সঙ্গে) আমিও কিন্তু বহু গুজব শুনেছিলাম তোমার পূর্বতন প্রেমিকদের সম্বন্ধে—

কাননিকা: যেমন?

শৈবাল: যেমন অনিরুদ্ধ বোস সম্বন্ধে—

কাননিকা: কি সে সম্বন্ধে আমি তো তোমাকে সব কথাই বলেছি।

শৈবাল: অনিরুদ্ধ যে পূত চরিত্রের লোক একথাও কেউ বলবে না। শোনা যায় অনেক চিত্রাভিনেত্রীকেই এগিয়ে আসবার জন্যে অনিরুদ্ধের সাহায্য নিতে হয়েছে,আর বিনা স্বার্থে যে তারা সাহায্য পেয়েছে একথা কেউ বলে না।

কাননিকা: তার জন্যে তারা নিজেরাও কতটা দায়ী এবং অনিরুদ্ধ কতটা দোষী সে কথাও কেউ বলতে পারবে না। আমার নিজের সম্বন্ধে শুধু বলতে পারি যে career build করবার জন্যে এক সময় হয়তো অনেক কিছুই আমি সহ্য করে নিতাম—কিন্তু অনিরুদ্ধ আমাকে সেভাবে কখনও চায়নি। আমার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাবই করেছিল···

শৈবাল: তার প্রস্তাবে রাজী হলেই পারতে।

কাননিকা: কি পারতাম, আর কি পারতাম না, এখন আর সেকথা ওঠে না। তবে আমার অতীত সম্বন্ধে যে তোমার একটা অপরিচ্ছন্ন মেয়েলী কৌতূহল আছে, তা আমি জানি—এটা তোমার একটা অত্যন্ত morbid obsession!

শৈবাল: Obsession? যাকৃগে—আবার কিন্তু যা avoid করব ভাবছিলাম···

কাননিকা: হ্যাঁ, এসব আলোচনা করতে গেলেই যখন গোলমাল হয়···

[দরজায় নকিং-এর শব্দ]

কাম্ ইন্!

অনিরুদ্ধ: (এগিয়ে আসতে আসতে) কয়েকটা music take করতে studioতে দেরী হয়ে গেল। ফেরবার পথে ভাবলাম একটু খবর নিয়ে যাই।

কাননিকা: কফি খাবেন তো?

অনিরুদ্ধ: (বুঝতে পারবেন তাঁর এসময় আসাটা শৈবাল খুব পছন্দ করেনি) না, এখন আর বসবার সময় নেই। (শৈবালের প্রতি) I wanted some news of the big play, ভাবছিলাম কাননিকা দেবী নিশ্চয় আপনার চিঠি পেয়েছেন—well; how's it coming?

শৈবাল: এই কোন রকমে, আর কি···

কাননিকা: একটু বসুন মিষ্টার বোস। (টেবিল থেকে সিগারেটের টিন্ এগিয়ে দেবেন। অনিরুদ্ধ বসবেন এবং একটা সিগারেট ধরাবেন।) তুমি বসবে না শৈবাল?

অনিরুদ্ধ: আপনাকে কিন্তু খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

শৈবাল: আমি সত্যিই ক্লান্ত।

কাননিকা: এ নাটকটা নিয়ে ওকে খুবই খাটতে হয়েছে – লেখা শেষ করে আজ এই একটু আগে এসে পৌঁছেচে।

অনিরুদ্ধ: শেষ অঙ্কটা হয়ে গিয়েছে? অত্যন্ত সুখবর! কবে শোনাবেন?

শৈবাল: ধরুন দিন দুই বাদে।

কাননিকা: দিন দুই বাদে কেন? আপনি বসুন মিষ্টার বোস—এখনই আমাদের শেষ অঙ্কটা শুনিয়ে দাও না শৈবাল!

শৈবাল: (বিরক্তভাবে) না। না। এখন আমি কিছুতেই ও নাটকটা পড়তে পারব না—আর আমার মনে হচ্ছে লেখাটা অত্যন্ত বিশ্রী হয়েছে।

অনিরুদ্ধ: লেখবার অত্যধিক strain-এর জন্যই আপনার এই reactionটা হয়েছে। আমি আপনাকে বলছি—The play's the finest thing yo've done নায়িকার চরিত্রে কাননিকা দেবী একটা sensation create করবেন বলেই আমার ধারণা। It will be a triumph for you both, wait and see. আচ্ছা, Good Night.

[অনিরুদ্ধ চলে যাবেন। কিছুক্ষণ একটা বিশ্রী নীরবতা বিরাজ করবে।]

শৈবাল: এ রকম অদ্ভুতভাবে এত রাত্রে এখানে আসবার কোনো মানে হয়।

কাননিকা: যে কারণে এসেছিলেন তা তো বললেন। তোমার নাটকটা কতদূর এগোল, কোন চিঠি এসেছে কিনা…

শৈবাল: সেই হচ্ছে আসল কথা। এখানে এসে আমাকে দেখতে পাবে ভাবতে পারেনি।

কাননিকা: (ভেতরে ভেতরে রেগে উঠবেন কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে) আমার কাছে আসতে হলে মিষ্টার বোসকে দিনক্ষণ বিচার করে আসতে হবে, এ ধারণা তোমার কোথা থেকে এল? (একটু থেমে) ওঁর মত হিতাকাঙ্খী আমার জীবনে আর আমি পাইনি। তাছাড়া ফিল্ম-লাইনে আমার যা কিছু সাফল্য তা অনিরুদ্ধ বোসের উপদেশ নির্দেশেই সম্ভব হয়েছে।

শৈবাল: (আহতভাবে)—(ব্যঙ্গ ভরে) তাতো নিশ্চয়।

কাননিকা: তোমার ওপর নির্ভর করেই আমার সবকিছু হয়েছে—একথা বললেই বোধহয় খুশী হতে?

শৈবাল: নিজের প্রতিভার জোরেই সাফল্য পেয়েছ—একথাটা বললেই সবচেয়ে আনন্দ পেতাম। সে কথা থাক্ আমি বাইরে থাকার সময়টায় উনি বোধহয় রোজই একবার করে রাত এগারোটা, সাড়ে এগোরটায় তোমার কাছে আসতেন?

কাননিকা: (শ্লেষভরে) সময় পেলে নিশ্চয় তাই আসতেন। একদিন অবশ্য এসেছিলেন, এবং রাত একটা-দেড়টা অবধি বসে আমরা গল্প করেছিলাম।

শৈবাল: আমার নাটকটা কতদূর এগোল, শেষ হল কিনা। এসব বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন নি?

কাননিকা: ছিঃ শৈবাল, যার সাহায্য পেয়ে আজ এতটা উঠ্তে পেরেছে—তোমার এতগুলো নাটক যার direction-এ হিট্ করল…

শৈবাল: ওই নাটকগুলো অনিরুদ্ধের সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগেই লেখা। যে কোনো ভাল ডিরেক্টরের হাতে পড়লেই…

কাননিকা: আগেও তো দু'খানা বই ভাল ডিরেক্টারের পরিচালনাতে flop করেছিল…

শৈবাল: অতএব অনিরুদ্ধ বোসের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাকে সব সহ্য করে যেতে হবে!

কাননিকা: কি করতে চাও বলত?

শৈবাল: ওকে বলে দেবে এভাবে তোমার সঙ্গে মেশামেশিটা বন্ধ করতে হবে।

কাননিকা: তার মানে?

শৈবাল: মানে আবার কি—এ বিষয়ে এই আমার শেষ কথা।

কাননিকা: শেষ কথা! কি বলতে চাও তুমি?

শৈবাল: (উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ…এই আমার শেষ কথা, না বোঝবার মত তো কিছু বলিনি। হয়

সঙ্গে সব সম্বন্ধ এই এইখানেই এই মুহূর্তেই শেষ করে ফেল, না হয় তো অনিরুদ্ধ বোসের সঙ্গে মাখামাখিটা বন্ধ করতে হবে।

কাননিকা : তোমাকে আমি বলছি, অনিরুদ্ধকে বাদ দিয়ে তোমার এবং আমার কারোরই কোন উন্নতি করবার বা এগিয়ে আসবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

শৈবাল : ঐ একই কথা বারবার বলো না—এ লাইনে এখন দুজনেই আমরা well established. আমার তিন-চারখানা বই হিট্ করেছে—আর তুমি তো এখন বাংলার চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম তিনজনের একজন।

কাননিকা : কিন্তু তুমি তো ভালভাবেই জান আমাদের দুজনেরই এই সমস্ত খ্যাতির মূলে রয়েছে অনিরুদ্ধের পরিচালনার কৃতিত্ব।

শৈবাল : ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা—অনিরুদ্ধ...অনিরুদ্ধ...অনিরুদ্ধ! ওর সংস্রব তুমি তাহলে ছাড়বে না?

কাননিকা : না,...না,...না। কোন অপরাধ ও করেনি। নিজের অতীতটা একটু ভেবে দেখো—আমার সঙ্গে মেশবার আগে কি ছিলে? তাছাড়া আজও মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কি কম দুর্ব্বলতা আছে?

শৈবাল : তাই নাকি! তোমার অতীত সম্বন্ধেও আমার কানে কম কথা আসে নি।

কাননিকা : কিন্তু তুমি যে আজও শোধরালে না। ওই যে মারাঠী মেয়েটা, তোমার বইয়ের হিন্দী রাইট কিনে নিয়েছেন। গতমাসে ওঁকে নিয়ে কতবার কত জায়গায় নৈশ-অভিযান করেছ, সে সব আমার কানে আসেনি ভেবেছ?

শৈবাল : তোমার espionage system-এর প্রশংসা না করে পারলাম না—ব্যবসার খাতিরেই শকুন্তলা যোশীর সঙ্গে দেখা করবার দরকার হয়। এ বাড়ীতে আলাপ-আলোচনা হোতে পারত, কিন্তু যেভাবে মাস দুয়েক আগে তাকে অপমান করেছিলে, মনে আছে?

কাননিকা : করব না! যেভাবে বেহায়ার মত গা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে তোমার সঙ্গে তিনি স্ক্রীপ্টের আলোচনা করছিলেন .....

শৈবাল : ওটা তোমার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বিকৃত মনের নোংরা ধারণা!

কাননিকা : ও:, আমার সবই কিছুই বুঝি বিকৃত এবং নোংরা বলে মনে হচ্ছে আজকাল! তাহলে যাওনা ওঁ শকুন্তলার বাড়ীতে—এখানে বসে রয়েছ কি জন্যে?

শৈবাল : আসলে তোমার মনটা অত্যন্ত নীচ...বেশ, আমি উঠ্‌লুম।

কাননিকা : যাও, কিন্তু ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

শৈবাল : কেন অনিরুদ্ধ বোসের বাড়ীতে চলে যাবে নাকি?

কাননিকা : সেদিনকার কথা মনে আছে? রিভলভারটার কিন্তু এখনও অনেকগুলো তাজা কার্তুজ আছে।

[শৈবাল কিছু না বলে সামনের টেবিলটার কাছে এগিয়ে যাবে। বড় ড্রয়ারটার চাবি লাগানো দেখে ড্রয়ারটা খুলে রিভলভারটা বের করে নিয়ে]

শৈবাল : যাক ড্রয়ারটা খোলা থাকাতেই সুবিধা হল। এটা নিয়ে আমি চললাম (দরজার দিকে এগোতে থাকবে)

কাননিকা : (দৌড়ে ওকে ধরতে যাবে) খবরদার, আমার রিভলভার দিয়ে দাও। আমি মরি কি বাঁচি, তাতে তোমার কি?

[শৈবালের হাত ধরে কাননিকা টানতে থাকবে এবং শৈবাল ওকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে পাশের সিটিং-রুমের দিকে নিয়ে যাবে। এবার থেকে ওদের দুজনের কথা কাটাকাটি শোনা যাবে—কিছুক্ষণ

বাদেই গুলির শব্দ হবে এবং দুজনের মিশ্রিত চিৎকার কানে আসবে…অন্যধারে পেটে দুহাত চেপে শৈবাল ঘরে ঢুকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসবে কাননিকা। তার মুখে-চোখে এমন একটা বিহ্বলভাব যেন কি ঘটেছে কিছুই সে বুঝতে পারছে না।]

শৈবাল : (কোনো রকমে থেমে থেমে বহু কষ্টে কথা বলবে) শিগ্‌গির…ডাক্তার সেনকে…টেলিফোন কর। অন্ততঃ তাঁকে ব্যাপারটা বলে যেতে পারব…যাও…দেরী করছ কেন?

কাননিকা : [যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন ডায়াল করবে] কে! আমি ২৩নং সিনহা রোড থেকে কাননিকা দেবী বলছি। ডাক্তার সেনকে বলুন এখানে একটা accident হয়েছে…আমার রিভলভারের গুলিতে শৈবাল মজুমদার সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন…না, না,…তাঁর সঙ্গে আর কথা বলবার দরকার নেই। তাঁকে দয়া করে এখুনি একবার এখানে আসতে বলুন।

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছুটে আসবে। শৈবাল ততক্ষণে মাটিতে বসে পড়েছে। রক্তে জামা একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। তার মুখে-চোখে অত্যন্ত যন্ত্রণার ভাব…কাননিকা দৌড়ে গিয়ে একটা টাওয়েল নিয়ে আসবে এবং সেটা ওর পেটের ওপর চাপা দেবে।]

কাননিকা : খুব কি যন্ত্রণা হচ্ছে?

শৈবাল : ডাক্তার কেন দেরী করছে!

(কাননিকা ওর মাথা ও কাঁধ ধরে আস্তেআস্তে নিজের কোলে শুইয়ে নেবে।)

কাননিকা : এই তো ফোন করলাম। এখুনি এসে পড়বেন। কিন্তু এ কি হয়ে গেল শৈবাল!

[শৈবালের দেহ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠবে—তারপর তার দেহ নিথর হয়ে যাবে। কাননিকা চিৎকার করে উঠবে]

—শৈবাল!

[দপ করে আলো নিভে যাবে এবং মঞ্চ ঘুরে আগের কোর্টরুমের দৃশ্যে ফিরে আসবে—সাক্ষীর কাঠগড়ায় কাননিকা দেবীকে আগের অবস্থায় দেখা যাবে]

কাননিকা : ঠিক এমনিভাবেই সে রাত্রে ব্যাপারটা ঘটে। ডাঃ সেনকে এই কথাটাই জানাবার জন্যে শৈবাল তাই বোধহয়, মৃত্যুর আগে এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমি বুঝিনি, কিন্তু নিজের জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও সে নিশ্চয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল যে আমাকেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হবে। একটু থেমে) আর আমার কিছু বলবার নেই। [সমস্ত কোর্টের ভেতর একটা থমথমে ভাব বিরাজ করবে।]

জাষ্টিস মিত্র : আচ্ছা, আপনি আপনার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান। [কাননিকা আসামীর কাঠগড়ার দিকে ফিরে যাবেন।]

প্র. কৌ. : (উঠে দাঁড়িয়ে) মাননীয় বিচারপতি মহাশয় এবং জুরি মহোদয়গণ! শৈবাল মজুমদারের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে সাক্ষীদের বক্তব্য এবং আসামীর বিবৃতি আপনারা শুনলেন। মিঃ পার্থসারথি, ডাঃ ঘোষ এবং অস্ত্র-বিশেষজ্ঞ মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতির প্রত্যেকেই নিরপেক্ষসাক্ষী। মিঃ পার্থসারথি স্বচক্ষে দেখেছেন যে এই ঘটনার আগে আর একবার কাননিকা দেবী শৈবাল মজুমদারকে তাগ্‌ করে গুলি ছুঁড়েছিলেন। ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে, শৈবাল মজুমদারের মৃত্যুটা যে আত্মহত্যা নয়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। মিঃ ব্যানার্জি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁরও মত এই ধরণের রিভলবার থেকে হঠাৎ accidentally গুলি ছুটে যেতে পারেনা—অতএব বোঝা যাচ্ছে যে কাননিকা দেবী deliberately মিঃ মজুমদারকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। এর আগের বারে যখন তিনি গুলি করেন তখন বাইরে থেকে মিষ্টার পার্থসারথিও

শুনতে পেয়েছিলেন যে কাননিকা দেবী চিৎকার করে বলেছেন—"I will shoot you," আর আসামীর evidence-এ তিনি যা বললেন, আমরা আগে থেকেই জানতাম, ঠিক এই ধরণের একটা আজব কাহিনীই তিনি আমাদের শোনাবেন—করুণরস মিশিয়ে তিনি অতি সুন্দরভাবে তাঁর বিবৃতি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেননি। (একটু থেমে) আসামী যে কত slight provocation-এ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌তে পারেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণও পুলিশ-ইন্সপেক্টরের সাক্ষ্যে আপনারা পেয়েছেন। জুরি মহোদয়গণ! আসামীর এই উদ্ভট অবিশ্বাস্য কাহিনীতে যদি আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন, তাকে নির্দোষ মনে করা সম্ভব।

But if you weigh the evidence carefully and dispassionately, I submit that you will find the accusation proved.

(বসে পড়বেন)

ডি. কা.: (উঠে দাঁড়িয়ে) মাননীয় বিচারপতি মহাশয় এবং জুরি মহোদয়গণ! হত্যার বিচারে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলাটাই যেন প্রথা এবং রীতি দাঁড়িয়ে গেছে।

They may be amusing, but we are not in this court to amuse.

প্রসিকিউসনের তরফ থেকে যেভাবে আগাগোড়া ব্যাপারটাকে বিকৃতভাবে দেখাবার চেষ্টা করে দেখান হোয়েছে...আমি জানি...তার দ্বারা আপনারা এতটুকু প্রভাবিত হননি বা হতে পারেন না। পুলিশের ইন্সপেক্টার এবং প্রসিকিউসন্ কাউন্সেল্ বলেছেন যে slight provocation-এর জন্য কাননিকা দেবী যেমন বিশ্রীভাবে পুলিশদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন এবং তাদের কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন। তাতেই বোঝা যায় কত সহজেই তিনি ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারেন এবং এর থেকেই ইঙ্গিত করেছেন যে ঐ অবস্থায় কাউকে গুলি করে মারাটা কাননিকা দেবীর পক্ষে অসম্ভব নয়। এই slight Provocation-এর ব্যাপারটা একটু পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক—দুর্ঘটনার রাত্রে ওখানকার পরিস্থিতির কথাটা আপনারা একবার ভেবে দেখুন দেখি—মস্ত একটা ভয়ঙ্কর accident হয়ে গেছে, স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে চোখের সামনে। সান্ত্বনা দেবার মত আত্মীয়স্বজন কেউ কাছে নেই—পুলিশের তরফ থেকে ঐ অবস্থায় কাননিকা দেবীকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে থানায় গিয়ে বিবৃতি দেবার জন্যে—এই সমস্ত মিলেও ব্যাপারটাকে যদি slight provocation বলা হয়—(একটু থেমে) I wonder what provocation they would claim as serious. (আবার থেমে) পুলিশের সাক্ষ্যে আপনারা শুনেছেন যে রিভলভারে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। এখানে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি শুধু accused-এর দোষ প্রমাণ করবার বেলাতেই আমরা আঙুলের ছাপের সাক্ষ্য কাজে লাগাব? কাননিকা দেবী যদি সত্যিসত্যিই deliberately হত্যা করবার জন্য শৈবাল মজুমদারকে shoot করে থাকতেন, তবে রিভলবারে আঙুলের ছাপ পেতে পুলিশের কোনই অসুবিধা হতনা। কিন্তু রিভলবারটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে গুলি ছুটে গেছে বলেই কারো আঙুলের ছাপ ওতে স্পষ্টভাবে পড়তে পারেনি। জুরি মহোদয়গণ!

There are cases in which Advocates feel in such despair that they are driven to plead for mercy for their clients and to urge that they are entitled to the benefit of the doubt. (উঁচু গলায়) **I am going to do nothing of the sort. I am not going**

to ask you for the benefit of the doubt. I am going to satisfy you that there is no doubt. I am going to show you that there is no evidence at all.

(একটু থেমে) পুলিশ-ইন্সপেক্টার মৃতদেহ দেখবামাত্রই অনুমান করে নিয়েছেন যে ব্যাপারটা হত্যাকাণ্ড—অথচ এই অনুমান করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি দেখাতে পারেননি। গৃহ-চিকিৎসক ডাঃ সেন কিন্তু একবারও মনে করেননি যে ব্যাপারটা হত্যাকাণ্ড। এরপর মিঃ পার্থসারথির সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তিনি বলেছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে প্রথমবারে যখন গুলি ছোঁড়া হয় তখন শৈবালবাবুর প্রতি রিভলবার তাগ করা ছিল। তাই যদি হোতো তবে গুলিটা মাথার অনেক ওপরে সিলিং-এ গিয়ে লাগতনা—আসলে সেদিন আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে কাননিকা দেবী ইচ্ছে করেই সিলিং-এর দিকে গুলিটা ছুঁড়েছিলেন। আর তাছাড়া সত্যিই যদি তিনি শৈবালবাবুকে লক্ষ্য করে গুলিটা ছুঁড়তেন তাহলে শৈবালবাবু কখনই আর ও বাড়ীতে কাননিকা দেবীর সঙ্গে থাকতে সাহস পেতেন না। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, মিঃ পার্থসারথি প্রভৃতি আরও অনেকে ব্যাপারটা দেখলেন এবং জানলেন অথচ কেউই এটা কর্তব্য মনে করলেন না যে ব্যাপারটা পুলিশে report করা দরকার। তাছাড়া মিঃ পার্থসারথির সাক্ষ্য কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাও আপনারা বেশ ভালভাবেই বুঝেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন firing-এর সঙ্গে সঙ্গে a puff of smoke··· তার সাইজ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। অথচ কাননিকা দেবীর রিভলবারে যে কার্তুজ ব্যবহার করা হোয়েছিল, তা থেকে smoke বের হতে পারেনা—কারণ কার্তুজগুলো ছিল cordite cartridges. পুলিশের কাছে বিবৃতিতে মিঃ পার্থসারথি বলেছিলেন যে প্রথমবারে গুলি ছোঁড়বার আগে কাননিকা দেবী চিৎকার করে উঠেছিলেন—"I will shoot you"—কিন্তু কোর্টে সাক্ষ্য দেবার সময় ঐ বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন—কাননিকা দেবী চিৎকার করেছিলেন—"I will shoot···I will shoot ! I will shoot you এবং I will shoot-এর ভেতর কতটা তফাৎ সে আপনারা সবাই জানেন। (একটু থেমে) Pathologist মিঃ গোবিন্দলাল ঘোষের সাক্ষ্য সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলব—

He gave no shred of evidence to suggest that Saibal Mazumdar's death could not have been caused in the way that Kananika Devi has always said it was. He did not affect my case. I had no questions to ask him.

এর পরের সাক্ষী অস্ত্রবিশেষজ্ঞ শ্রীমোহিতচন্দ্র ব্যানার্জি। মোহিতবাবু তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত রিভলভারটি হচ্ছে—one of the safest revolvers ever made অথচ আপনাদের চোখের সামনে আমি প্রমাণ করে দিয়েছি কত সহজেই এটাকে fire করা যায়। রিভলবারটিতে কোনো safety device ছিলনা তাও আপনারা দেখেছেন। সুতরাং কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে যে হঠাৎ গুলি ছুটে যেতে পারে একথা আমরা বিশ্বাস করব না কেন? রিভলভারের চেম্বারগুলিতে কিভাবে পরম্পর গুলি সাজানো ছিল সে বিষয়েও মোহিতবাবুকে cross examine করবার সময় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কাড়াকাড়ির সময় ট্রিগারে অর্ধেক চাপ পড়তেই একটা discharged কার্তুজের পরের কার্তুজটা ছিল live—কারণ fired হবার আগেই সিলিণ্ডারটা ঘুরে গিয়েছিল। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে রিভলভারটা মিঃ মজুমদারের হাত থেকে কাননিকা দেবী কেড়ে নিতে গিয়েছিলেন।—এর ফলে একটা ধস্তাধস্তি হয় এবং তার থেকেই কোনক্রমে রিভলভারটা ছুটে যায়—নইলে শৈবালবাবুকে গুলি করে মারবার কোনো উদ্দেশ্যই কাননিকা দেবীর ছিল না।

এমন কি এও হতে পারতো যে গুলির আঘাতে সে রাত্রে কাননিকা দেবীই মারা যেতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে হয়তো তাঁর জায়গায় হত্যার অপরাধে শৈবালবাবুরও আজ এখানে বিচার হতে পারতো।

Members of the Jury, I claim that on the evidence that has been put before you Kananika Debi is entitled as a right to a verdect in her favour. I ask you, as a matter of justice, that you should set her free.

(বসে পড়বেন)

জাষ্টিস মিত্র : Members of the Jury, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত কাননিকা দেবীর বিচারে সমস্ত সাক্ষীর বক্তব্য, জেরা, আসামীর evidence, সরকারী এবং আসামী পক্ষের আইনজ্ঞের ভাষণ সমস্তই আপনারা শুনলেন। ডিফেন্স কাউন্সেলের ভাষণ সম্বন্ধে এতটুকু দ্বিধা না করে আমি বলব—

We have listened to a great forensic effort. I am not paying complements when I say it is one of the finest speeches that I have ever heard deliverd at the Bar.

নিজের বক্তব্য তিনি সহজ সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করে আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন—ভাবাবেগের দ্বারা আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবার এতটুকু চেষ্টা করেননি। সাক্ষ্য প্রমাণাদির ওপর নির্ভর করে যদি আপনারা মনে করেন যে এক্ষেত্রে কাননিকা দেবী স্বেচ্ছায় শ্রীশৈবাল মজুমদারকে হত্যা করবার জন্য গুলি করেছিলেন এবং সেই গুলির আঘাতে শৈবাল মজুমদার মারা গেছেন—তবে—বিনা দ্বিধায়, দয়ামায়া প্রভৃতি হৃদয়ের করুণ বৃত্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিজেদের কর্তব্যবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ কথাটাও ভেবে দেখতে হবে—সাক্ষ্য প্রমাণাদির সঙ্গে যদি অসঙ্গতি না পাই তবে কাননিকা দেবী যেভাবে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাই বা আমরা অবিশ্বাস করব কেন? যেহেতু এক্ষেত্রে তিনি নিজেই অভিযুক্ত, সুতরাং তাঁর বিবৃতিকে অসত্য বলে অগ্রাহ্য করব—এ ত' কোন যুক্তি নয়! আর একটি বিষয়ে আপনারা ভেবে দেখবেন—অভিযুক্তের তরফের আইনজ্ঞ বন্ধু manslaughter বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে আইনের যা নির্দেশ আছে তা হচ্ছে এই :

Manslaughter is the unlawful killing of another without any intention of either killing or causing serious injury.

তার মানে হল—আসামী যদি আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে থাকেন। (মনে রাখবেন আত্মহত্যাটা আইনের কাছে একটা অপরাধ) এবং মৃত ব্যক্তি তাতে বাধা দিতে গিয়ে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন এবং সেটা ফিরে পেতে গিয়ে আসামী তাঁর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করবার সময় গুলি ছুটে গিয়ে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে আসামী manslaughter-এর অপরাধে অপরাধী এবং তারজন্য আইন অনুসারে শাস্তি পাবার যোগ্য। এবার আপনারা নিজেদের মন্ত্রণাকক্ষে যেতে পারেন।

[জুরিরা relire করবেন। দেয়ালের ঘড়িতে দেখা যাবে চারটে বাজতে মিনিট সাতেক বাকী। জজসাহেব ও আইনজ্ঞরাও নিজের নিজের ঘরে চলে যাবেন। কোর্টের দুজন অফিসার ডক থেকে কাননিকা দেবীকে নামিয়ে ভেতরের দিকে নিয়ে যাবেন। শুধু দর্শকেরা বসে থাকবেন।

আস্তে আস্তে ষ্টেজের আলো নিবতে নিবতে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে যাবে। আবার যখন আলো জ্বলে উঠবে, দেয়ালে ঘড়িটায় দেখা যাবে পাঁচটা বেজে সতেরো মিনিট হয়েছে। জুরিরা তাঁদের box-এর সামনে

এসে দাঁড়াবেন। কোর্টের অফিসারেরা তাড়াহুড়ো করে এসে বসবেন। আইনজ্ঞেরা নিজেদের জায়গায় আসবেন। জাস্টিস মিত্র এসে বসবেন—কাননিকা দেবীকে আবার ডকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।]

জাস্টিস্ মিত্র : (জুরিদের প্রতি) ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত কাননিকা দেবীকে আপনারা দোষী না নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন ?

জুরিদের প্রধান : নির্দোষ।

[সমস্ত কোর্টের লোকেরা যেন একসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বে।]

জাস্টিস. মিত্র : Manslaughter-এর অপরাধে অভিযুক্তকে আপনারা দোষী না নির্দোষ সাব্যস্ত করেছেন ?

জুরিদের প্রধান : নির্দোষ।

জাস্টিস্ মিত্র : জুরিদের সঙ্গে একমত হ'য়ে শৈবাল মজুমদারের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কাননিকা দেবীর প্রতি আমি মুক্তির আদেশ দিলাম।

[কোর্টের কর্মচারী, জুরীরা এবং জজসাহেব ভেতরে চলে যাবেন। সমবেত লোকেদের মধ্যে উল্লাসের ধ্বনি উঠ্‌বে। ডক থেকে হাত ধরে কাননিকা দেবীকে নামিয়ে দেওয়া হবে। অনিরুদ্ধ ঘোষ এসে তাঁকে নিয়ে ব্যারিষ্টার গুপ্তের দিকে যেতে থাকবেন এবং ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসবে।]

বলা বাহুল্য এই কাহিনীর উপর যে ছবি তোলা হয়েছিল সেটি একটি সুপারহিট্ ছবি হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

(সমাপ্ত)

গান্ধীজী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বঙ্কিমচন্দ্র—এই পর্য্যায়ের মানুষগুলির কথা মনে হলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! কী বিপুল শক্তির মহিমময় প্রকাশ আমরা এঁদের মধ্যে দেখেছি! ইব্‌সেনের নাটকগুলি পড়তে পড়তে রক্তের মধ্যে এই শিহরণ আমি অনুভব করেছি। লেখনীর মুখে স্বর্গের আগুনের ফুল্‌কি। কতকগুলি মানুষের নাম উচ্চারণ করলে উপাসনারই কাজ করা হয়। গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করলে তা উপাসনারই পর্য্যায়ে পড়ে।

বিদ্যাসাগর চরিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "বিশ্বকর্ম্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দু'-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" "এই ক্ষুদ্রকর্ম্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে" গান্ধীজীর মতো নিঃশঙ্ক কর্ম্মবীরের আর্বিভাব রহস্যময় সন্দেহ নেই। এই রহস্যের একটা সন্তোষজনক উত্তর মিলেছে মার্কিণ দার্শনিক উইলিয়াম্ জেম্‌সের একটা প্রবন্ধে। প্রবন্ধটীর নাম Great Men and their Environments. এই রচনায় জেম্‌স্ বলছেন, কালেভদ্রে এক-আধজন বড় লোক সর্বত্রই জন্মান। কিন্তু কোন সমাজ তীব্র কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের উচ্ছল-জীবনের স্পন্দন যদি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করতে চায় তবে দরকার অনেকগুলি বড়োলোকের একসঙ্গে আসা, আর পর পর আসা। তাঁদের আবির্ভাব হওয়া চাই উত্তপ্ত লোহার উপরে কামারের হাতুড়ির উপর্য্যুপরি আঘাতের মতো। লোহাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া চলবে না। ১৮৬১তে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ, ১৮৬৩তে বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ১৮৬৯-এ মহাত্মাগান্ধী। সকলেরই হৃদয়-বীণার তার একই সুরে বাঁধা। সকলেরই কণ্ঠে যুগবাণী। একটা দেশে কত কাছাকাছি জন্মালেন কত বড় বড় মানুষ। এর মধ্যে কি ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার নিশানা নেই?

মানুষের ইতিহাসে যুগের পর যুগ আসে আর প্রত্যেক যুগেরই একটা বিশেষ ব্রত আছে—সে-ব্রত সেই যুগের একেবারে নিজস্ব। আমাদের এই যুগেরও একটী বিশেষ ব্রত আছে যার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোমাঁরলাঁ। বিবেকানন্দের জীবনীতে রলাঁ লিখেছেন:

Our task is, or ought to be, to raise the masses, so long shamefully betrayed, exploited, and degraded by the very men who should have been their guides and sustainers.

আমাদের ব্রত হ'চ্ছে অথবা হওয়া উচিত জনসাধারণকে উন্নত ক'রে তোলা। এতকাল ধরে তাদের

প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে, তাদের শোষণ করেছে, তাদের অধঃপতন ঘটিয়েছে কারা? সেই সমস্ত লোকেরাই যাদের কর্ত্তব্য ছিল তাদের পথ দেখানো, তাদের রক্ষা করা।

যুগের এই মহাব্রত অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে গেছেন গান্ধীজী। যারা সকলের চেয়ে অধম, দীনের থেকেও দীন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুদিনের অবহেলায় যারা নেমে গেছে অযত্নপালিত পশুর পর্য্যায়ে তাদের সেবায় গান্ধীজী ব্রতী হলেন কেন? ঈশ্বরকে দর্শন করবার ব্যাকুলতায়। কে এই ঈশ্বর? গান্ধীজী বললেন, আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসংশয়ে আমি জেনেছি যে সত্য ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। সত্যের সংজ্ঞা কি? সৎ কালতো দেশতো বস্তুতো বা পরিচ্ছিন্নং তদসৎ। আর অসতের বিপরীত যা তাই হচ্ছে সত্য অর্থাৎ আমরা তাঁকেই সত্য বলবো যিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নন, দেশের অথবা বস্তুর দ্বারাও পরিমিত নন। এই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী পরম সত্ত্বা,—যিনি জীব-জগৎ সবই হয়েছেন—এই অবিনাশী সত্ত্বাকেই আমাদের দেশের দার্শনিকেরা সত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন আর নারায়ণকে তাই সত্য-নারায়ণ বলেছেন। কিন্তু সত্যনারায়ণের অন্বেষণে গিরিগুহায় অথবা অরণ্যের ছায়ায় না গিয়ে গান্ধীজী জনসাধারণের সেবায় ব্রতী হলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাব মিলবে গান্ধীজীর আত্মজীবনীর উপসংহারে। সেখানে তিনি লিখেছেন: 'সর্ব্বব্যাপী সার্ব্বভৌম সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দেখতে হ'লে সকলের চেয়ে অধম যে তাকেও আত্মবৎ ভালোবাসতে পারা চাই।' এই আত্মবৎ ভালোবাসার অনুভূতি যেখানে সত্য সেখানে কর্ম্মের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ না হ'য়ে যায় না। গান্ধীজীর মানবপ্রেমই, তাঁকে নবনব কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে এনেছে। আর এই যে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রকেই আত্মবৎ ভালোবাসতে পারার দিব্য-শক্তি অর্জনের জন্য জীবন-ভোর অতন্দ্রসাধনা—এই সাধনার ক্ষুরধার দুর্গমপথে গান্ধীজী শেষপর্য্যন্ত চলতে পেরেছিলেন সত্যনারায়ণের দর্শনলাভের ব্যাকুলতায়। সত্যের জ্যোতিদর্শনের লোভেই কায়-মনোবাক্যে অহিংস হওয়ার কঠিন-সাধনার পথকে গান্ধীজী বেছে নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর আত্মচরিতের শেষ অধ্যায়ে আছে: "তাই সত্যের প্রতি আমার অনুরাগই আমাকে টেনে এনেছে রাজনীতিরক্ষেত্রে। এবং আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না ক'রে অথচ নম্রতার সঙ্গেই বলতে পারি, যাঁরা বলেন ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনই যোগ নেই তাঁরা জানেন না ধর্ম্ম বলতে কি বুঝায়।"

শিবজ্ঞানে জীবসেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয় আর ঈশ্বরের সেবা করতে যে ইচ্ছুক তার পক্ষে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ অপরিহার্য্য—এই যুগবাণী স্বামী বিবেকানন্দ নতুন ভারতবর্ষকে শোনালেন। স্বামীজী শুধু মানবসেবার কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তরুণ ভারতবর্ষকে তিনি বললেন, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব যারা গরীব, যারা নিরক্ষর, যারা মূর্খ, যারা আর্ত্ত তারাই তোমাদের দেবতা হোক।"

"এসো তোমরা সকলে, এসো তোমরা সর্ব্বহারা বঞ্চিতেরা! এসো তোমরা যারা পদতলে নিষ্পেষিত হ'চ্ছ! আমরা সবাই যে এক!"

এই বাণী উৎসারিত হোলো যাঁর করুণকোমল কণ্ঠ থেকে তাঁর হাতের মশাল আর একজন এসে গ্রহণ করলেন। ইনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বিবেকানন্দ যে-পবিত্র সংগ্রাম সুরু করলেন অস্পৃশ্যগণকে অধিকারে এবং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেই সংগ্রাম নতুন করে আরম্ভ করলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী বিবেকানন্দেরই পতাকাবাহী এবং বিবেকানন্দের মতোই ভারতবর্ষের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে আপনাকে সর্ব্বহারাদের সেবায় নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েছিলেন—এই সত্যটিকে অতিসুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজীর জীবন-চরিতে রোমা রলাঁ উদ্ঘাটিত করেছেন। এই হ'চ্ছে তাঁর ভাষা:

Another has received the torch from the hands of him who cried :

"Come, all ye, the poor and the disinherited ! Come, ye who are trampled under foot ! We are One !"

and has taken up the holy struggle to give back to the uutouchables their rights and their dignity—M. K. Gandhi. (The Life of Vivekananda—Romain Rolland)

দলিত, মথিত, শোষিত, বঞ্চিত জনসাধারণের দুঃখ-মোচনের সংকল্প গান্ধীজীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। বিবেকানন্দ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। এই পার্থক্য নিয়ে বাদানুবাদ নিতান্তই অবান্তর, কেননা একটা জীবন-দর্শন হচ্ছে মনেরই ঘর, স্থূল হাত দিয়ে তৈরী নয়, সূক্ষ্ম ভাব দিয়ে তৈরী। আর দুটো জীবন-দর্শন হুবহু এক হ'তে পারে না, কারণ দুটো মনের গড়ন তো এক নয়। আমাদের মুখের চেহারায় যেমন কারও সঙ্গে কারও মিল নেই আমাদের মনের চেহারাতেও তেমনি কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। সুতরাং বিবেকানন্দ বিবেকানন্দই এবং গান্ধী গান্ধী—যদিও বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা গভীর ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্য ভগবদ্বিশ্বাসের গভীরতায়, ঈশ্বরচিন্তায় চিত্তকে নিরত পূর্ণ ক'রে রাখার সাধনায়, ঈশ্বরের করুণার উপরে বালকসুলভ নির্ভরশীলতায়, জাতিধর্মনির্বিশেষে জীবমাত্রকেই আত্মবৎ ভালোবাসার বিশালতায়, দিগ্‌দিগন্তে আত্মার অবারিত, আনন্দিত প্রসারণের ঔদার্য্যে, নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম—গীতার এই কর্মের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তায়, পাশ্চাত্যের দিকে মনের বাতায়নগুলিকে মুক্ত রেখেও প্রাচ্যের আদর্শে নিষ্ঠার অবিচলিত দৃঢ়তায়। বিবেকানন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের দিক থেকে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও 'রাজদ্রোহী ন্যাংটা ফকির'-এর চিন্তাধারায় ও কর্মধারায় বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাব এতই সুস্পষ্ট যে তা লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই। ধর্মজীবনযাপনের জন্ম রাজনীতির ক্ষেত্রকে পরিহার করা নিয়ে নানামুনির নানামত। বিবেকানন্দ রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর শিষ্যা ধর্মপ্রাণা নিবেদিতা কিন্তু রাজনীতির রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। এ দিক থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে গুরুর চেয়ে শিষ্যার মিলই বেশী।

গান্ধীজীর জীবন একটা বিরাট মহাকাব্যের মতোই। সেই দীপ্ত, মুক্ত মহাজীবনের পর্ব্বে-পর্ব্বে সংগ্রামের পর সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। বাধার পর বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম! প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম! মানব-স্বভাবের গভীরে রয়েছে জানোয়ার। সেই জানোয়ারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। গীতাঞ্জলিতে কবির প্রার্থনায় আছে :"জাগ্রত করো, উদ্যত করো।" একটা দিব্য জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখে অনেকেই। তবু পৃথিবীতে মহাপুরুষেরা চিরদিনই সুদুর্লভ কেন? কারণ জীবনকে একটা উচ্চতর নবজীবনে রূপান্তরিত করা মানে সাধনা, ঘুমকে ঘুম পাড়ানোর সাধনা, অচৈতন্যভাবকে কাটিয়ে উঠবার সাধনা, জড়তা-বর্জ্জনের সাধনা। মার্কিণ মনীষী থোরো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত Walden বইতে লিখেছেন :

Moral reform is the effort to throw off sleep.

পৃথিবীতে লাখো লাখো মানুষের হৃদয়ের বিষাদ-সিন্ধু মন্থন ক'রে যে হতাশার করুণসুরটী বেরিয়ে আসছে তা হোলো : 'মিছে মায়ার বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম রৈনু।' বেঁচে আছি কিন্তু বৃক্ষের মতো বেঁচে আছি। মানুষের ঘরে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম তবু 'বৃক্ষসম রৈনু' কেন? দিব্য জীবনযাপন সম্পর্কে আমাদের কোন হুঁস নেই ব'লে। আমরা যাকে আমাদের প্রচলিত ভাষায় জেগে থাকা বলি তাকে তো ঠিক জাগ্রত থাকা বলা চলে না। কোটী কোটী মানুষ উদয়াস্ত জাগ্রত থাকে ঠিকই। শারীরিক শ্রমের জন্ম যে-টুকু জেগে থাকা দরকার

মাত্র ততটুকুই জেগে থাকে তারা। তরুর জীবন, মৃগ-পক্ষীর জীবনযাপন করে তারা। মন দিয়ে বাঁচতে হলে, নিজেকে যতখানি জাগ্রত রাখা দরকার ততখানি জাগ্রত মানুষ কোটিতে যদি একজনও মিলতো? দিব্য-জীবনযাপনের সংকল্পকে চেতনায় অনির্বাণ রাখার মানুষ তো পৃথিবীতে আরও দুর্লভ! থোরো দুঃখ করে লিখেছেন :

I have never yet met a man who was quite awake.

আজ পর্য্যন্ত এমন একজন মানুষও আমার চোখে পড়লো না যাকে বলা যায় পূর্ণ জাগ্রত মানুষ। ঘুমোনো মানুষের মুখের দিকে তাকাবো কেমন ক'রে?

গান্ধীজীর দুইখণ্ড আত্মজীবনীর মুকুরে একটী বিপুল সত্য প্রতিফলিত দেখতে পাই। নিজেকে নিরত জাগ্রত এবং উন্নত রাখবার সাধনায় যত্নশীল তিনি। সমস্ত কামনা, ভয় এবং ক্রোধকে বর্জ্জন ক'রে দিব্য-জীবনযাপনের একটী অবিচলিত সংকল্প নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতোই নিরত তাঁর চেতনায় জ্বলছে। আর মার্কিণ মনীষী উইলিয়াম্ জেম্সের ভাষায় :

Consent to the idea's undivided presence, this is effort's sole achievement.

চেতনায় একটা সংকল্পকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যে সেখানে আর কোন লক্ষ্য জায়গাই পাবে না। মনের সামনে সংকল্পটীকে ধরে রাখতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে। এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যে সেই চিন্তায় সমস্ত মন পূর্ণ হয়ে থাকবে। সমস্ত চিত্তকে যখন একটীমাত্র চিন্তা এইভাবে পূর্ণ ক'রে থাকে তখনই আমাদের সাধনা চরমে গিয়ে পৌঁছায় এবং সিদ্ধি করতলগত হয়। রাজসভায় লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় অর্জ্জুনের চেতনায় ছিল শুধু পাখীর চোখ, আর কিছু ছিল না। মনের এই একাগ্রতাই অর্জ্জুনকে এমন দুর্জ্জয় মহারথীতে পরিণত ক'রেছিল। আমাদের শক্তি, জীবন, সম্পদ এবং এমন কি আমাদের সৌভাগ্য পর্য্যন্ত সবই তো আমাদের উদ্যমের ও সাধনারই ফল। একমাত্র অতন্দ্র চেষ্টার দ্বারাই আমরা গুটিপোকা থেকে প্রজাপতিতে অথবা ডিমের পক্ষী-শিশু থেকে গগনবিহারী বিহঙ্গমে রূপান্তরিত হ'তে পারি। আর স্বভাবের মধ্যে বহু দুর্ব্বলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রেও আমরা চেষ্টার দ্বারা সেই দুর্ব্বলতাগুলিকে জয় করতে পারি, উন্নত-জীবনযাপনে সমর্থ হই—এতে কি কোন সন্দেহ আছে?

গান্ধীজীর দুই খণ্ড আত্মজীবনী প'ড়ে আমার মনে হয়েছে থোরোর এই কথাগুলি :

I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious endeavor.

একটা অতন্দ্র চেষ্টার দ্বারা মানুষ তার জীবনকে উন্নত করবার শক্তি রাখে, এই সত্যের উপলব্ধি থেকে আমি যত প্রেরণা পাই এমন আর কোন কিছু থেকে নয়!

গান্ধীজীর দিব্যজীবনই থোরোর এই অমূল্য বাণীর সত্যকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে। নিজের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

Again I was a coward. I used to be haunted by the fear of thieves, ghosts and serpents. I did not dare to stir out of doors at night. Darkness was a terror to me. I could not, therefore, bear to sleep without a light in the room.

নিজের বাল্যজীবনের এই যে বর্ণনা দিয়েছেন গান্ধীজী—এই বর্ণনার দর্পণে আমরা দেখতে পাই একটা ভীরু স্বভাবের বালককে। ঘরের মধ্যে আলো না জ্বালিয়ে সে ঘুমাতে পারে না। অন্ধকারকে তার বড়ো ভয়। চোর

ভূত-প্রেত, সাপ—অন্ধকারকে পূর্ণ করে আছে। রাত্রে ঘরের বাইরে যেতে তার হৃৎকম্প হয়। এই ভীরু বালকই পৃথিবীর এমন একজন মানুষে রূপান্তরিত হোলো সাহসের দিক থেকে ইতিহাসে যাঁর জুড়ি নেই! অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্যের শক্তির আস্ফালনকে উপেক্ষা করলেন তিনি; সামাজিক বিধি-নিষেধগুলিকে ভাঙলেন অকুতোভয়ে। একই সঙ্গে কত ফ্রণ্টেই না তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন! রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অসিচালনা তিনি বন্ধ রাখেন নি! স্ট্যানলি জোন্স (Stanley Jones) গান্ধীজীর এই অতুলনীয় নির্ভীকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

Never did a man fight so long and continuously on so many issues.

এত দীর্ঘকাল ধরে, এমন নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে এতগুলি সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে আর কোন মানুষ সংগ্রাম করে নি।

রক্তের মধ্যে ক্রোধের বন্যবরাহটাকেও কি তিনি বহন করে আনেন নি? দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী তখন ব্যারিস্টার। বাড়ীতে একটী অন্ত্যজশ্রেণীর যুবক থাকতো। তার ময়লার পাত্র গান্ধীজী স্বহস্তে পরিষ্কার করতেন। কস্তুরবা তাতে রাজী হন নি বলে গান্ধীজী স্ত্রীকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর ভর্ৎসনাবাক্যে অবশেষে ক্রোধান্ধ স্বামীর সম্বিৎ ফিরে এলো। এমন বিষম ক্রোধকেও তো শেষ পর্য্যন্ত বশে আনতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। আর ভার্য্যা হিসাবে কস্তুরবা নিঃসংশয়ে সুন্দরী ভার্য্যা ছিলেন। রূপসী ভার্য্যার সৌন্দর্য্যের আকর্ষণকে জয় করে ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের একটি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতেও গান্ধীজীকে নিজের সঙ্গে নিজের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল!

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনে সংযমের বাঁধ নিমেষের জন্যও ভাঙে নি আসক্তি ভয় বা ক্রোধে কখনো অভিভূত হয়নি—এমন চরিত্র নাটক-নভেলে থাকলেও বাস্তব জগতে কি কোথাও আছে। চারিত্রিক সুষমায় সুন্দর যে-আত্মা, সেই আত্মার গভীরেও জানোয়ারের অনেকখানি অবশিষ্ট থাকে। পশুভাবের আর দিব্য ভাবের অদ্ভুত মিশেল মানুষের স্বভাবে। ধন্য শুধু সেই মানুষ যে নিঃসংশয়ে জানে, তার মধ্যে পশুটা দিনে দিনে যাচ্ছে মরে এবং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেবতা। নিজের মধ্যে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নহে। স্বভাবের মধ্যে যে জানোয়ারটাকে আমরা বহন করে নিয়ে এসেছি তার মৃত্যু ঘটানো নিঃসংশয়ে একটা দুরূহ কাজ। আমরা দিব্যজীবনের উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে পারি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যে আসুরিক দিক আছে তার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ এবং ধ্বংস বিশ্ব-নিয়মেরই অঙ্গীভূত। তাই ইতিহাসের যে চরিত্রগুলিকে আমরা মহৎ বলি, সুন্দর বলি তাঁদের চারিত্রিক মহিমা ও সুষমা একটা সুকঠিন সাধনার ভিতর দিয়েই বিকশিত হয়ে উঠেছে। নিজের সঙ্গে নিজেকে কী কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। তবে মানুষ দিব্যজীবনে অধিকার লাভ করতে পারে। গান্ধীজীর জীবন এই সংগ্রামের একটী উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

দিব্যজীবনের একটা অনির্ব্বচনীয় প্রশান্তি ও মহিমায় পৌঁছানো মানুষ সংসারে এমন সুদুর্লভ কেন? কারণ মহৎ জীবনে অধিকার লাভ করতে হলে দরকার মহাবীর্য্য। দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কতটা উদ্যমের পুঁজি আছে আমাদের মনে, কতটা শক্তি আমরা সে জন্যে প্রয়োগ করতে পারি, সেই উদ্যমের শক্তির effort-এর পরিমাণের উপরে নির্ভর করে আমরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় একটা ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত অথবা বীরের সম্মানে মুকুটিত হবো। স্বভাবের মধ্যে যে দুর্ব্বলতাগুলি রয়েছে সেগুলিকে উন্মূলিত করে একটা দীপ্ত, মুক্ত মহাজীবনের অধিকারী হবার জন্য নিজের বিরুদ্ধে নিজের সংগ্রামের এই যে নাট্য-লীলা, এর সমস্তটাই কিন্তু মনের রঙ্গমঞ্চে। সাধনা, তপস্যা, উদ্যম, প্রযত্ন, effort—যে নামই দিই না কেন, এদের ভূমিকা হোলো চেতনার ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তুকে এমনভাবে ধরে রাখা যে সেখানে আর কোন চিন্তার জন্য তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। এইখানেই হোলো

সব মুস্কিলের গোড়া। মুস্কিল তো আমাদের চেতনায় লক্ষ্য বস্তুকে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতো জ্বালিয়ে রাখা নিয়ে। ঐশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়সুখের লালসা, এক কথায় বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে 'মার' এবং খ্রীষ্টান শাস্ত্রে যাকে 'ম্যামন্' বলা হয়েছে সেই মার বা Mammon আমাদের চেতনার রঙ্গভূমিকে দখলে রাখবার জন্তে কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে। প্রেয় তো আমাদের স্বভাবের একটা বিপুল অংশকে অধিকার করে আছে। শ্রেয়ও রয়েছে সেখানে। আমাদের টান দু'দিকেই। তবুও প্রেয়র দিকেই মানব স্বভাবের ঝোঁকটা যেন একটু বেশী! মনের মধ্যে দেবতাকে যে প্রতিষ্ঠিত করবো—ম্যামন ক্রমাগতই তাতে বাদ সাধছে। ধনের তৃষ্ণা, মানের তৃষ্ণা সুখের তৃষ্ণা, আরামের তৃষ্ণা—তৃষ্ণার পর তৃষ্ণার তরঙ্গমালা এসে দিব্যভাবকে স্থতআসন করবার চেষ্টা করছে। প্রলোভনের পর প্রলোভন এসে মনের শুভ ইচ্ছার দীপশিখাটীকে নিবিয়ে দেবার জন্তে ফুঁয়ের পর ফুঁ দিচ্ছে। তবুও সুখের যে সোনালী স্বপ্ন-বাহিনী মনে বাসা বাঁধবার জন্তে চেতনার দরজায় পাখার ঝাপট মারছে তাদের দূরে ঠেকিয়ে রাখা—এর জন্তে যথেষ্ট মনোবলের প্রয়জন আছে। মুস্কিল কোথায়? মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম জেমস্ বলছেন: The whole difficulty is a mental difficulty, a difficulty with an object of our thought. সমস্ত বাধা হচ্ছে মানসিক বাধা। ধ্যেয়বস্তুকে চেতনার ক্ষেত্রে ধরে রাখাটাই হচ্ছে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। The difficulty lies in the gaining possession of that field, চিত্তভূমিতে ধ্যেয়বস্তুকে, লক্ষ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। আমরা যাকে will বা সংকল্প বলি তার মৌলিক কাজ হোলো মনকে লক্ষ্যে একাগ্র করে রাখবার অভ্যাস না প্রযত্ন। মন স্বভাবতঃই যখন বিপরীত মুখে ধাবমান তখনও সেই মনকে লক্ষ্যবস্তুতে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে যে পর্য্যন্ত না ধ্যানের বস্তুর অঙ্কুরটি পল্লবিত হয়ে ওঠে এবং চেতনার ক্ষেত্র থেকে তার হটে যাওয়ার কোনই আশঙ্কা থাকে না। জেমস বলছেন, This strain of the attention is the act of will, জেমস বলছেন। সমস্ত নৈতিক সাধনার মূল কথা হোলো: to sustain a representation to think, মনের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুকে জাগিয়ে রাখতে পারা। সমস্ত সাধনা—সে নৈতিকই হোক আর আধ্যাত্মিকই হোক—সিদ্ধিতে এসে পৌঁছালো যখনই মনটাকে ধ্যানের বস্তুতে নিশিদিন লাগিয়ে রাখবার মতো একাগ্রতা এসে গেল। গান্ধীজীর মতবাদ নিয়ে যত মতভেদই থাকুক, তার সংকল্পের মধ্যে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা ছিলো—এই সত্য সকল তর্কের অতীত।

গান্ধীজী এই মনোবল সঞ্চয় করেছিলেন দীর্ঘকালের তপস্তার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর তাঁর কাছে ছিলেন সত্যনারায়ণ। God of truth সর্ব্বব্যাপী অনন্ত সত্যনারায়ণের প্রত্যক্ষদর্শন না হলেও চকিতে তাঁকে আভাসে কখনো কখনো তিনি দেখেছিলেন। সেই ক্ষণিকের দিব্য অভিজ্ঞতা থেকে জীবনস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে গান্ধী লিখেছেন সত্যনারায়ণের জ্যোতি অবর্ণনীয়, a million times more intense than that of the sun we daily see with our eyes, চর্মচক্ষুতে যে সূর্য্যকে আমরা রোজই দেখি তার জ্যোতির তুলনায় কোটী কোটী গুণ তীব্র সেই জ্যোতি। এমন সত্যনারায়ণের পূর্ণ রূপ দেখবার জন্তে তিনি যে মরিয়া হবেন, এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। অহিংসার সাধনা—সেও ছিলো বৈজ্ঞানিকের মনোভাব নিয়ে আজীবন একটা বিপুল পরীক্ষা। অহিংসা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করলেন তার আলোয় তিনি দেখতে পেলেন a perfect vision of truth can only follow a complete realisation of Ahimsa. অহিংসায় সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তবেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ মনের প্রত্যক্ষ হতে পারে। গান্ধীজীর রাজনীতিতে যোগদান অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান, কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার বিপুল প্রয়াস, সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ প্রচেষ্টা—সমস্ত শুভ কর্মধারার পিছনে ছিলো সত্যনারায়ণকে মুখোমুখি দর্শন করবার পরম আকুতি।

কেউ যদি তাঁর সমস্ত মনকে নিশিদিন সত্যনারায়ণে লাগিয়ে রাখবার একটা অতন্দ্রসাধনায় ব্রতী থাকে তবে তার দৃষ্টি সহজে অন্যদিকে যাবে না। মনের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তার দীপশিখা যাতে অনির্বাণ থাকে তার জন্যই না প্রার্থনায় তাঁর শৈথিল্য কেউ কখনো দেখেনি। যখন লণ্ডনের গোলটেবিল-বৈঠকে সারাদিন এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁকে সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হোতো, ঘরে ফিরে এসে শোয়া মাত্রই ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন তখনও তিনটার সময় তিনি উঠতেনই এবং শেষ রাত্রে উপাসনা করতেন। মীরা বেন্ The spirits pilgrimage-এ লিখেছেন: আড়াইটার ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখি। ঠিক তিনটায় বাপুকে জাগাই। তিনটা পনেরোর মধ্যে উপাসনার বসি একত্র সমবেত হয়ে। পৌনে চারটা আন্দাজ বাপু শুয়ে পড়েন এবং আর একটু ঘুমিয়ে নেন।" কর্ম্ম যখন প্রবল আকার ধারণ করে জীবনকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তখনও শয়নে স্বপনে অনুক্ষণ ভাবনায় ঈশ্বরচিন্তাকে ধ্রুবতারার মতো জাগিয়ে রাখবার সাধনায় গান্ধীজী স্বতন্ত্র। এ কথা নিয়ত তিনি স্মরণে রেখে দিয়েছেন যে জ্যোতির জ্যোতি সত্যনারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনই তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা প্রবল আগ্রহই তাঁকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে। জীবনস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে গান্ধীজী পরিষ্কার করেই লিখেছেন, "সার্ব্বলৌকিক এবং সর্ব্বব্যাপী সত্যনারায়ণকে সরাসরি দেখতে হলে সৃষ্টিতে যে সকলের চেয়ে অধম তাকেও আত্মবৎ ভালোবাসতে পারা চাই। আর যে মানুষ তাঁর জন্যে ব্যাকুল সে জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকেই তো দূরে থাকতে পারে না। তাই আমার সত্যানুরাগ আমাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে এনেছে।" তা হ'লে জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ গান্ধীজীর অকুণ্ঠ ঘোষণার আলোয় আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তার মানবসেবার সবটার মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে আছে একটা গভীর অধ্যাত্মচেতনা। গান্ধীজীর humanism and লেনিনের humanism ঠিক এক গোত্রের নয় যদিও দুজনেই যুগের দুই ঐতিহাসিক গণবিপ্লবের নাট্যলীলায় প্রধান অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ওলোটপালোট ঘটিয়েছেন। সর্ব্বহারাদের প্রতি নিবিড় সহানুভূতিতে উভয়েরই হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। একজন সত্যনারায়ণকে দর্শন করবার প্রেরণায় কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন এবং অহিংসাকে তার অপরিহার্য্য উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আর একজনের হৃদয় জুড়ে রয়েছে classless Society-র স্বপ্ন এবং সংকল্প এবং হিংসা অহিংসা তাঁর কাছে গৌণ। লেনিনের জীবন-দর্শনের কোথাও ঈশ্বর নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মার্কস বা লেনিন বুদ্ধের মতোই হৃদয়বান এবং বুদ্ধের মতোই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন, irreligious-ও বলা যেতে পারে। পক্ষান্তরে humanism-এর দিক থেকে গান্ধীজী বিবেকানন্দের কাছাকাছি, উভয়েরই মানবসেবা আগাগোড়া একটা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত।

প্রাণীমাত্রকেই আত্মবৎ ভালোবাসবার সাধনা আন্তরিকতার সঙ্গে শুরু করলে কঠিন ত্যাগের, দুরূহ কর্ম্মের মধ্যে সেই প্রেম আত্মপ্রকাশ করবেই। কারণ যাদের দুঃখকে আমি নিজের দুঃখ বলে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করি তাদের শুভ হোক্, মাত্র এই সদিচ্ছা মনের মধ্যে পোষণ করে আমি তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারিনে। With mere good intentions hell is proverbially paved. যেখানে শুধুই সদিচ্ছার বাষ্প, আত্মবলির নাম গন্ধ নেই, কঠিন কর্ম্ম বলতে কিছুই নেই সেই তো আসল নরক। রোমা রলাঁ (Romain Rolland) গান্ধীজী সম্পর্কে যে অদ্ভুত বই লিখেছেন তার উপসংহারে আছে: "বিশ্বাস তো একটা সংগ্রাম। আর আমাদের অহিংসা হচ্ছে কঠিনতম সংগ্রাম।" মনঃপ্রাণ দিয়ে গান্ধীজী ভারতবর্ষের আর্ত্ত জনসাধারণকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত জীবনটাই মানুষের জীবন নিয়ে, মর্য্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যারা, ম্যামনই (Mammon) যাদের উপাস্যদেবতা তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা নিরবচ্ছিন্ন লড়াই। ব্যারিস্টারি ছেড়ে সন্ন্যাসীতে

রূপান্তরিত হলেন, প্রায়োবেশনে বারবার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে গেলেন, আর্তদের হাহাকার কানে নিয়ে সকলকে আশার ও সান্ত্বনার বাণী শোনাতে শোনাতে নোয়াখালিতে ঘুরে বেড়ালেন, শেষে গডসের গুলিতে প্রাণ দিলেন, সমস্তই প্রেমের দায়কে স্বীকার ক'রে। আর এই প্রেমের দায়কে স্বীকার করে সংগ্রামের জীবনকে ত্যাগের জীবনকে বেছে নেওয়া কেন? ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার জন্ত।

ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর রাস্তায় যারা প্রত্যাশা করে সুখ, সান্ত্বনা, আরাম তারা দিব্যানুভূতির মন্দিরে ঢুকবার মুখেই দরজা বন্ধ করে দেয়। ধর্মজীবন বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে পেরেছে যারা তাদের কণ্ঠ থেকে যুগে যুগে উৎসারিত হয়েছে:

"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,
সেতো নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।"

যাকে আমরা আধ্যাত্মিকজীবন বলি সে তো একটা terrific and terryfying adventure. অমৃতের অধিকার চায় যারা দুঃখকে, cross-কে এড়ানোর কোন রাস্তাই খোলা নেই তাদের সামনে। আত্মার একটি চরম প্রশান্তিতে গান্ধীজী পেঁ'ছেছিলেন। শিশুর নির্মল হাসিতে তাঁর মুখখানি সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত থাকতো। তাঁর ত্যাগের শূন্যপাত্র আনন্দরসেই কানায় কানায় ভরা ছিল।

কোথা থেকে এসেছিল নবনব দুঃখকে বরণ করবার এই দুর্জ্জয় শক্তি ও সাহস? আনন্দের প্রাচুর্য্য থেকে। জীবনস্মৃতির শেষ অধ্যায়ে আছে: I must reduce myself to Zero, গান্ধীজীর মধ্যে আমিকে বিলুপ্ত করে দেবার একটা অতন্দ্র সাধনা ছিল। গীতার অমর শ্লোকগুলি তাঁকে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের প্রেরণা দিতো। নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচিন্,—ভগবানের এই বাণী নিত্য তাঁর কানে বাজতো। তাঁকে ঈশ্বরকে সর্ব্বকালে স্মরণে রেখে কর্ম্ম করে যেতে হবে। ফল তাঁর হাতে। সুতরাং কর্ম্মযোগীর কাছে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান সমান। "তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।" চেতনা থেকে উত্তম পুরুষের এক বচন চলে গেলে, তৃষ্ণারাক্ষসী নির্ব্বাসিত হলে দুঃখের মূলেই তো কুঠারাঘাত করা হোলো।

ঈশ্বর যেখানে নিরন্তর চেতনায় রয়েছেন, হৃদয় যেখানে ভগবত-প্রেমে পূর্ণ হয়ে আছে, ঈশ্বরের উপরে যেখানে নির্ভরশীলতা এসেছে সেখানে মানুষ নিজের শক্তিতে কাজ করে না, ঈশ্বরের প্রেরিত শক্তিতে কাজ করে। গান্ধীজীর জীবনে এত নৈরাশ্য, এত দুঃখ, পরাজয়ের এত লজ্জা এসেছে যে ঈশ্বরের কোলে মাথা রেখে প্রার্থনা না করলে কোন্ দিন তিনি ভেঙে পড়তেন।

কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তা অনুসরণ করে গেছেন। জন্মভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, জীবনের স্বপ্নগুলি ধূলিসাৎ হয়েছে, দিকে দিকে ভ্রাতৃবিরোধের দাবানল জ্বলছে, একটা অতলস্পর্শী তমোগহ্বরের মুখে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। আশাভঙ্গের এতবড়ো বেদনার বোঝা যাঁর বুকে তিনি কিন্তু ক্লৈব্যকে হৃদয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিলেন না। হিমালয়ের কোন গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন না। যা তিনি সমস্ত মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে যা ঘটে গেল তার মিল যদি নাই থাকে কুছ্ পরোয়া নেই। নিষ্ঠুর বাস্তবের ভয়াবহ পরিবেশনের মধ্যেই যা কর্ত্তব্য তা শেষ পর্য্যন্ত করে যেতে হবে। সত্য নিয়ে জীবনব্যাপী পরীক্ষা ও নিরীক্ষা থেকে নিঃসংশয়ে যখন তিনি উপলব্ধি করেছেন, প্রাণীমাত্রকেই আত্মবৎ ভালোবাসতে পারলে তবেই ঈশ্বর মিলবে তখন সেই উপলব্ধিকে তিনি কি শুধু বুদ্ধির ক্ষেত্রে রেখে দেবেন, না আচরণে অনুসরণ করবেন? একথা ঠিক যে গান্ধীজী ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বা রবীন্দ্রনাথের মতো অথবা

ডঃ ব্রজেন্দ্রশীলের মতো অত পণ্ডিত লোক ছিলেন না। কিন্তু একটা অদ্ভুত গুণের অধিকারী তিনি ছিলেন। সত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিমেয়। সত্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে মরিয়া হতে পারতেন তিনি। ভারতবর্ষ ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছে। দেশময় রক্তের নদী বইছে। এই তো সময় যখন গৃহ-হারা বিপন্নদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তাদের রক্ষা করতে হবে প্রবলের থেকে, তাদের শোনাতে হবে সান্ত্বনা বাণী, অভয়-মন্ত্র। করুণা, সহানুভূতি—তার পরিচয় কি বাক্যে, না কর্মে? আর প্রেমের পথ ছাড়া তো সত্যনারায়ণের সাক্ষাৎ-দর্শন মিলবার নয়! সত্যকে যে পেতেই হবে, সেই God of Truth-কে। যেখানে কর্তব্যের আহ্বান এসেছে সেখানে ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার কোন প্রশ্নই ওঠে না; জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন তুচ্ছ; মান-অপমান অকিঞ্চিৎকর।

জীবনের সুবৃহৎ স্বপ্নগুলির শ্মশানে দাঁড়িয়ে, বেদনার বিষে নীলকণ্ঠ হ'য়ে যাঁরা প্রসন্নমুখে মানুষকে শোনাতে পারে মাভৈঃ মন্ত্র তাঁদেরই দুঃখ জয়ের তেজোময় দৃষ্টান্ত থেকে আমরা নব জীবন সংগ্রহ করি। ইতিহাসের বীরবন্দের পুরোভাগে থাকবে গান্ধীজীর আসন।

শ্বশুর মন্দিরম্

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বৈকি, তবে সমস্ত মেসের মধ্যে বিবাহিত মাত্র একা গোকুলচন্দ্র। সে-ক্ষেত্রে নূতন শ্বশুরবাড়ি নিয়ে অত বড়াই করতে থাকা তারও যে ভুলই হয়েছিল একথাও না মেনে পারা যায় না। শ্বশুরবাড়ির গল্পে একটা মাদকতা আছে। যার হয়েছে, করে গল্প, তার পক্ষে তো আছেই, যারা শোনে তাদের পক্ষেও, তবে একটা গুণগত প্রভেদ আছে। যারা করে তাদের থাকে শুদ্ধ মাদকতাই, মেতেও যায় তাই, যারা শোনে তাদেরটায় থাকে একটু কৌতুকের ভাব মেশানো, তার সঙ্গে হয়তো একটু ঈর্ষাও। তাই ওদিকে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে এদিকে একটা হুজুগ বা রগড়ের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। বিশেষ করে মেসের মতো যদি পাঁচমেশালী জায়গা হোল, সেখানে বাতাসটাই থাকে হুজুগের।

"ব্যাচিলার্স ডেন" মেসটা আবার ছোট, মাত্র জন সাতেক মেম্বার নিয়ে, কেউ মাষ্টার, কেউ কেরানি, কেউ অন্য কিছু। ছোট মেসে একটা সুবিধা, যদি একটা কিছু প্ল্যান বা মতলব আঁটা হোল তো মতভেদের বালাই থাকেনা, বড় একটা কথা বেরিয়েও পড়তে পারে না।

মেম্বারদের নাম হোল হীরালাল, গোকুল, প্রদীপ, পঙ্কজ, ভাস্কর, গুরুপদ আর ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দার আসল নামটা পুরোপুরি গোকুলেশ্বর গুহঠাকুরতা। দুটো 'গোকুল', ডাকাডাকিতে অসুবিধা আছে, তাছাড়া মেসের ব্যাপার, একটা কিছু নূতনত্ব পেলেই মনে সুড়সুড়ি কাটে, নামটা ঠাকুরতা পদবী থেকে 'ঠাকুর্দা'র কায়েমী হয়ে গেছে।

গল্প জমে রাত্রে খাওয়ার সময়। ঠিকে-পাচকঠাকুর, দূরে বাড়ি, ৯টার সময় সবাইকে খাইয়ে চলে যায়। এই সময়টা সবাইকে একত্রিত হতে হয়। রসনার রসাবেশের সঙ্গে সরস গল্প মজে ভালো, তারপর তেমনি হোল তো প্রশ্নে প্রশ্নে সেটাকে টেনে নিয়ে খাওয়ার সময়েরও অভাব হয় না।

সাতজনের মধ্যে ছ'জন রোজই থাকে একরকম, এক ভাস্কর ছাড়া। সে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ্ একটা বড় অ্যামেরিকান কোম্পানীর। প্রায় বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়।

পাঁচ জনের আসন পাতা হয়েছে সামনা সামনি দুসারি। পাঁচ জন এসে বসেছেও, ঠাকুর থালাও দিয়ে গেছে। বাকি গোকুল আর ভাস্কর আজ নেই।

ঠাকুর্দা প্রশ্ন করল—"কৈ গোকুল এখনও এলনা যে?" প্রশ্নটার আজ একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আজ সোমবার, শনিবার গোকুল শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল।

হীরালাল বলল—"আজ ত'র শালা এসেছিল সঙ্গে, তাকে বাজারে গিয়ে কি সব কিনেটিনে দিয়ে সাড়ে সাতটার গাড়িতে রওয়ানা করে দিয়ে আসবে। সেটা ধরতে না পারলে একেবারে ন'টা, ঠাকুরকে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে বলে গেছে।"

ঠাকুর্দার একটু হুজুগ বেশি। উনকে দিয়ে দিয়ে গল্পের কিকড়ি বের করে। একটু আফশোষের সঙ্গে বলল—"তাহলে বাদ যাবে আজকে হে? টাটকা-টাটকা জমত বেশ।"

প্রদীপ একটা ভাতের গ্রাস মুখের কাছে তুলে থেমে গিয়ে বলল—"মাফ করো ঠাকুর্দা, একেবারে ফেড আপ (fed up), অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আজ স্কুলে গিয়ে একটা সুখবর, সেক্রেটারি দয়ালবাবু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে, স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। এমনিই ভালো ব্যবহার ছিল না কারুর সঙ্গে, তার ওপর আবার ইদানিং আমার প্রতি বেশি সদয় হয়ে উঠেছিল। গেট পর্যন্ত অনেক কষ্টে মুখ চুন করে থেকে বাড়িতে এসে একটু হাত পা ছড়িয়ে দোব বিছানায়; উনি শালা সঙ্গে করে উপস্থিত। সে তো কার সঙ্গে দেখা করতে, না, কি করতে বেরিয়ে গেল, তারপর পড়লেন আমায় নিয়ে। এবারে আবার ছুটো শনিবার বাদ দিয়ে গিয়েছিল, ঝুলি বোঝাই করে এনেছে—পাঁচটা পর্যন্ত বকর বকর, সে যে কী যন্ত্রণা! সত্যি বলছি, এক একবার মনে হচ্ছিল, সেক্রেটারির ভূত এসেই ভর করল নাকি সদ্য সদ্য জ্বালাতে আমায়।"

পঙ্কজ একটু ভাবুক গোছের, প্রশ্ন করল—"তা ওর শালাকে দেখলে কেমন?"

"বছর পঁচিশও বয়েস হবে না, এদিকে একমাথা টাক!"—খানিকটা আক্রোশের সঙ্গে উত্তর করল প্রদীপ।

"দ্যাখোতো! আর এদিকে বলে বৌ-এর চুল হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসে, বিশ্বাস করতে হবে? ভাঁওতারও তো একটা সীমা আছে?"

গুরুপদ বলল—"ও যে অত কাঁচা বয়েসে অত বড় টাক নিয়েই বড়াই করেনি, এটাও তো ভাগ্যি।"

হীরালাল বলল—"তোমরা বলছ বটে, আর ঠিকও, তবে আমার তো মন্দ লাগে না, মেসের একঘেয়ে জীবন..."

গুরুপদ বলল—"তা চলুক না, আপত্তি করছে কে? তবে যতটা রয়-সয় ততটাই ভালো না? শুনলে তো পঙ্কজ কি বলল।"

"আমিও সেই কথা বলি।"—সেইভাবেই বলে উঠল প্রদীপ। মাষ্টার মানুষ, এমনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, তার আজ ছুটিটা—তাও অমন উপলক্ষ্যে পাওয়া ছুটিটা নষ্ট হওয়ায় মনটা বেশিরকম খিচড়ে আছে, বলল—"না একটা বিহিত করতেই হবে, অন্তত একটুখানি চেক (check) যাতে এটা না মনে করে সে, আমরা ও রসে বঞ্চিত বলে ছাই-ভস্ম যা এগিয়ে দিচ্ছে, গো-গ্রাসে গিলে যাচ্ছি। ঠাকুর্দা, তুমিই একটা কিছু উপায় বের করো, তোমার মাথা এসবে খেলে ভালো।"

ওরা নিশ্চয় সাতটার গাড়িটা ফেল করেছে। এদের আহার পর্যন্ত গোকুল এসে পৌঁছাল না। আরও কয়েকরকম গল্প আলোচনা চলল, তার মধ্যে গোকুলের কথাটাই এসে পড়তে লাগল ঘুরে-ফিরে। তবে ঠাকুর্দা বরাবর একটু অন্যমনস্কই থেকে গেল। কলতলায় গিয়ে একে একে মুখ, হাত ধুচ্ছে, ঠাকুর্দা হঠাৎ প্রদীপের দিকে চেয়ে বলল—"তোমার সেক্রেটারির ভূতের কথায় একটা আইডিয়া যেন উকিঝুঁকি মারছে মাথার মধ্যে। গোকুল তো ভয়-কাতুরেও, মনে হয় না?"

গুরুপদ ওর রুম্-মেট, বলল—"বিশেষ করে ভূতের। রাত্রে বেরুতে হলে আমায় না জাগিয়ে তুলে বেরোয় না। বাঁচোয়া যে, প্রাণপণে না বেরুবারই চেষ্টা করে প্রথমটা।"

"ওর শ্বশুরবাড়িও হয়েছে সেই উলো গুপ্তিপাড়ার কাছে না, যেখানে সেই ম্যালেরিয়ায় গাঁ-কে গাঁ উজোড় হয়ে নতুন রকম একটা ভূতের গল্প চালু আছে।"

"বলে তো গুপ্তিপাড়া থেকে মাইল দু'এক পথ।"—হীরালাল বলল।

"বেশ মিলে যাচ্ছে। এক কাজ করতে হবে, আপাতত খাওয়া-দাওয়ার পর ক'দিন খালি ভূতের গল্প, আর অন্য কিছু নয়। জমিটা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এসো সবাই আমার ঘরে, প্ল্যানটা ছকে ফেলা যাক। বর্ষা নেমে গেছে, জমবে ভালো ভূতের গল্প এখন। তোমরাও জোগাড় করতে থাক।

এগারটা বাজে। ওদের প্ল্যান প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, গোকুল সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সবাই জড়াজড়ি করে বলে উঠল—"এতো দেরি যে?…হার ম্যাঞ্চেষ্টির ভাইকে পেয়ে আমাদের ভুলে গিয়েছিলে?…একবার গরীবদের দেখিয়ে দিলে হোত না?…তা বৈকি, শ্রীমুখের একটা আদল পাওয়া যেত…দুধের স্বাদ না হয় ঘোলেই…"

গোকুল ক্লান্তভাবে একটা চৌকিতে বসে পড়ল। বলল—"ইচ্ছে তো ছিল, জানি তোমরা বলবেই না নিয়ে এলে। কিন্তু টাইম পেলাম কোথায়? বাজার করতেই সব বেরিয়ে গেল, রেস্তোরাঁ, ট্রেন ফেল।

হীরালাল বলল—"এতো বাজার!"

পঙ্কজ বলল—"নতুন জামাইয়ের ঘাড়ে।"

গোকুল বলল—"জামাই ষষ্ঠীর বাজার, নতুন জামাইয়ের চার্জে না দিলে তার খুঁৎখুঁতুনি থাকতে পারে—বউ আবার এ বিষয়ে বেশি পার্টিকুলার।…তার ওপর শালী-শালাদের মন্তব্য আছে পছন্দ নিয়ে। অল্পও তো নয়, দু'শো টাকা শুধু জামা কাপড়ের দিকে। হীরেনটাকে বললাম—তোমরা কি নতুন জামাইকে কাপড়-চোপড়ের মধ্যে চাপা দেবে?…

সবার সন্তর্পণে দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল, ঠাকুর্দা বলল—"যাও, খেয়ে নাও গে, খাবার ঢাকা আছে। এরকম খুচরো শুনলে চলবে না, কাল কলাও করে সমস্তটা শোনাতে হবে।"

বেশ প্ল্যান মতো সব হয়ে যাচ্ছে।

এবার বর্ষাটাও যেন একটু এগিয়ে শুরু হয়েছে। ক'টা দিনই কয়েক পশলা করে বৃষ্টি হয়ে গেল। চাইছিলই এই রকম, আর বেরুতে সাহসও হয় না, ঠাকুর্দার ঘরে জটলা করে শুয়ে-বসে ভূতের গল্প করে কাটিয়ে দেয়। অন্য কেউ যদি বেরোয়ও তেমন কিছু কাজ থাকলে, গোকুল কিন্তু একরকম স্থাণু হয়েই পড়েছে। সন্ধ্যার পর একটু গা-ছমছম করে আজকাল, তাছাড়া যাদের ভূতের ভয় আছে, তাদের আবার ভূতের গল্পের ওপর বেশি টান।

জামাইষষ্ঠী এসে পড়ল। পরশুই, বুধবার। বৌ কুন্তলা বাড়িতেই রয়েছে তার বাপের বাড়ি থেকে এসে, গোকুল কাল সকালে বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বিকালের গাড়িতে শ্বশুরবাড়ি যাবে ঠিক হয়েছে।

আজ বিকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ শেষের বৃষ্টি, একেবারে আষাঢ়-শ্রাবণের ধারা বর্ষণ নয়; তবে মেঘের গায়ে মেঘ জমে এসে বেশ এক এক পশলা হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা অনিশ্চিত ভাব, কেউ আর বেরুল না আফিস স্কুল থেকে এসে। রাত্রে খিঁচুড়ির অর্ডার হয়েছে ঠাকুরকে। বাজার থেকে ডালচানা আনানো হয়েছে, ঘনঘন চা, ঠাকুর্দার ঘরে জমাট হয়েছে সবাই। আজ যেন মঞ্চ-পরিবেশে কিছু বাকি নেই;

মাঝে মাঝে বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়াটাও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে একটা চাপা গোঁ-গোঁ শব্দের সঙ্গে দোর-জানালা খটখটিয়ে একটা রহস্যময় আবহ সঙ্গীত-সৃষ্টি করছে, সিলিং থেকে ঝোলানো ল্যাম্প দুলে দুলে সবার ছায়াগুলো হ্রস্ব-দীর্ঘ করে দুলিয়ে দিয়ে কেমন যেন একটা ছায়া-জগতের ভাবই জাগিয়ে তুলছে মনে।

খুব জমে উঠেছে ভূতের গল্প, যার বিশ্বাস নেই, তারও একটা গুটুনো-সুটুনো ছমছমে ভাব যেন আজ। ঠাকুর্দার গল্প চলছিল, গুরুপদ একবার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বাইরের থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে বলল—"ভাস্করটা এই দুর্যোগে যে কোথায় পড়ে আছে।"

একটু ছেদ পড়ে গেল গল্পে। হীরালাল বলল—"তাকে কত বলি, ছাড়ো তোমার এই ভবঘুরের চাকরি, তা···

যেন আঁৎকে উঠে থেমে গেল হঠাৎ। একটা ত্রস্ত ছপছপ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে আগাগোড়া কালো ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা একজন দীর্ঘাকৃতি মানুষ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাস্করই। ছাতাটা বাইরেই মুড়ে রেখে একটা 'ইস-ইস' আওয়াজ করতে করতে ওয়াটারপ্রুফটা খুলে দরজার বাইরে ঝেড়ে নিয়ে আলনায় টাঙিয়ে রাখল। ও ঠাকুর্দারই রুমমেট এই ঘরেই সীট, জুতাটা খুলে চপ্পল জোড়াটা টানতে টানতে একেবারে নিজের চৌকির ওপর পা এলিয়ে দিল, একটু একটু যেন কাঁপছে।

ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল—"খুব ভিজলে নাকি হে?"

"ভিজলুম? না, মোটেই নয়। তবে···আগে একটু চা'র কথা···"

হীরালাল উঠে বসে দেবে, তার আগেই চাকরটা ট্রে করে চায়ের সরঞ্জাম এনে হাজির করল।

নীরবেই চলল একটু চা-পর্ব, তারপর পঙ্কজ প্রশ্ন করল "ভেজনি, তবে এরকম—খানিকটা যেন নার্ভাসও···"

"তবে—বলে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল।"—গুরুপদ বলল।

ভাস্কর উঠে বসে কয়েকটা চুমুক দিয়ে একটু যেন সামলেছে। বলল—"আই হ্যাড দ্য শক অব মাই লাইফ (I had the shock of my life)—এরকম অভিজ্ঞতা কারুর হয় না।"

—তারপর গোকুলের মুখের ওপর যেন আপনিই দৃষ্টিটা ঘুরে গিয়ে পড়তে বলল—"না, থাক্।"

সবাই চেপে ধরল—ব্যাপার কি বলতে হবে। শুধু গোকুলের মুখটা যেন একটু কিরকম হয়ে গেছে। ভাস্কর আপত্তিই করল, বলল—"থাকই, গোকুলবাবু ভয় পেয়ে যাবেন।"

—ও মেসে থাকে কম বলে কথাগুলো সবার সঙ্গে ঠিক 'তুই-তুমি'র স্তরে নয়। সবাই আরও চেপে ধরল, গোকুলও বলল—"বলুনই না। ভয় পাওয়ার কি আছে?"

অবশ্য শুষ্ক কণ্ঠেই।

ভাস্কর চায়ের কাপে ঠোঁট লাগিয়ে তার দিকেই একটু চেয়ে থেকে বলল—"উলো গুপ্তিপাড়া নিয়ে অনেকদিন থেকে কি সব গল্প চালু আছে—প্রায় ষাট সত্তর বছর আগে, হয়তো তারও ওদিকে—একটা মহামারীতে নাকি গ্রামকে গ্রাম উজোড় হয়ে যায়—কারুরই সৎকার হয় না—তারপর থেকে নাকি···"

গুরুপদ বলল—"আছে বইকি গল্প চালু। ছেলেবেলায় কত শুনেছি। তবে এখন আর শোনা যায় না। সেই—জামাই গেছে শ্বশুরবাড়ি—সবই ঠিক আছে, শুধু শব্দ নেই কোনও। শেষে শাশুড়ি না কে, জলন্ত উনুনে পা দুটো সাঁদ করিয়ে রান্না করে ভাত বেড়ে দিলে—নেবু নেই, শালী না কে জানলা দিয়ে লম্বা হাত বের করে পাশের বাগান থেকে নেবু পেড়ে নিয়ে এল। শোনা আছে আপনার? ওদিকেই তো আপনারও শ্বশুর বাড়িটা।

"ব্রেক, গাঁজা, মিন!" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিল ঠাকুর্দা। বলল—"গল্প তো আমাদেরও হচ্ছে, কোনটা পড়া, কোনটা শোনা, তা বলে এরকম…"

আর আমি যে দেখে এলুম মশাই!"—মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অনুযোগ নিয়ে ঘুরে চাইল ভাস্কর, ডান হাতটার আস্তিন টেনে বাড়িয়ে ধরে বলল—"এই দেখুন না বিশ্বাস হয়, এখনও মনে পড়ে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তাই বলছিলাম, না হয় থাক। আপনার শ্বশুরবাড়িটা ঠিক কোথায় বলুন তো!"

গোকুলের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর জায়গাটার নামটা শুনে "তাই নাকি?" বলে সে চুপ করে গেল, আর মুখ খোলে না।

আবার সবাই আরও চাপাচাপি করে ধরতে—"তাহলে বলতেই হবে?" বলে আরম্ভ করল ভাস্কর—

"উনি যে জায়গাটার নাম করলেন আমি প্রায় সেখান থেকেই আসছি। এখন গুপ্তিপাড়া থেকে আলাদা অবশ্য, তবে আগে গুপ্তিপাড়া বলতে তো এখনকার মুানিসিপ্যাল এরিয়াটুকুই বোঝাতো না, এ সবই তার মধ্যে ছিল। সপ্তগ্রাম, মহানাদ, ত্রিবেণী, আর সব নাম করা জায়গা, এদিকে ভাগীরথী আর ওদিকে সরস্বতীর মধ্যে—যেগুলো আজকাল আমরা সপ্তগ্রাম বলেই জানি, আসলে এগুলো ছিল এক একটা সহরই। গুপ্তিপাড়া দাঁইহাট এসবও তাই। ম্যালেরিয়া আর অন্য সব মহামারীতে প্রায় লোপাট হয়ে যায়। এখন দেখবে মাঝখানটা একটু ভদ্রভাবে টেঁকে আছে, একটু বেরিয়ে এসো, ঘন জঙ্গলে ঘেরা দু'তলা তিন তলা বাড়ির ভগ্নাবশেষ, যা হয়তো এক কোণে খানিকটা পরিষ্কার করে নিয়ে দু'একজন বিধবা বুড়ি বা দীনহীন ছোট্ট একটি পরিবার, হয় তো রিফিউজিই। অথচ এসব বাড়ির প্রত্যেকটি ইটে, মন্দিরের টেরাকোটায় ইতিহাসের…

যাক, সে-সব প্রত্নতত্ত্বের কচ্‌কচি তোমাদের ভালো লাগবে না"—খানিকটা আবিষ্টভাবেই বলে যেতে যেতে হঠাৎ সুর বদলে ফেলল ভাস্কর, গল্পের গতিটাও বাড়িয়ে দিয়ে বলে চলল—"তাছাড়া এখন সময়ও নেই তার, যা শক্‌টা পেয়েছি, সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে আসি তাই আগে একটু রেষ্ট নিতে চাই, সবিস্তারে বলবার মতন মনের অবস্থাও নয়। অন্য দিন হবে।

আমি গিয়েছিলাম আমার প্রফেশনাল ভিজিটে। রোগের আড্ডাই তো আমাদের পীঠস্থান। গুপ্তিপাড়া আর এদিকের কাছাকাছি কটা জায়গা সারতে বিকেল গড়িয়ে গেছে, প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি বলা যায়, হঠাৎ খেয়াল হোল এদিকে এলাম—আমার তো নতুন চাকরির পর এই প্রথম—ভাবলাম এলাম যখন একবার মাসিমার বাড়িটা হয়ে গেলে কেমন হয়? আবার কবে আসা হবে না-হবে, এ কোম্পানীতে মনও টেঁকছে না তেমন—একবার ঘুরে আসাই ঠিক করলাম।

এসেছিলাম একবার একেবারে সেই ছেলেবেলায়, গ্রাম আর পাড়ার নামটা ছাড়া কিছু মনে নেই, আর নিতান্ত আবছায়া-আবছায়া একটু জায়গাটা—একটা তেমাথা, তিনটে শরু শরু জঙ্গুলে রাস্তা তিন দিকে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেছে, মাঝখানে খুব পুরনো একটা এখানে-ওখানে ঝুরি নামা বটগাছ!

ডাক্তারকে নামটা বললাম। প্রশ্ন করতে, সম্বন্ধটাও। যাওয়ার কথাটাও বললাম। চেনেন, খুব দূরেও তো নয়, মাইল দুয়েকের মাথায়, তার ভিতরেই। যাওয়ার কথায় কিন্তু মুখটা যেন একটু কুঁচকে গেল, জিজ্ঞেস করলেন—যেতেই হবে? ইচ্ছেটা তাই জেনে বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন—তাহলে বেরিয়ে যান। সঙ্গে টর্চ আছে তো? টর্চ একটা থাকেই ব্যাগে। নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম।

খানিকটা দূরে এসে রিকসার আড্ডা। তাও ঠিক করতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল আরও। কেউ যেতে

চায় না, শেষে একটা পাশ্চিমা রিকশা-ওলা হোল রাজি, প্রায় ডবল ভাড়াতে, ওদিক থেকে লোক পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এখন। তাও ভেতরে যাবে না, ষষ্ঠীতলায় নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

সেই বটতলার তেমাথা আর কি।

যখন পৌঁছুলাম, বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সেখানটায় তো প্রায় মাঝ রাত্রের অন্ধকার, প্রায় বিঘে দুয়েক জমি নিয়ে ঝুরি-নামা বটগাছ, আর চারিদিকে ঘন জঙ্গল তো? নেমে টর্চ জেলে লোকটাকে পয়সা দিয়ে দোসরা সমস্যা—তিনটের মধ্যে কোন্ পথটা ধরতে হবে? বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে টর্চ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক চাইছি, হঠাৎ পেছনে যেন ভিজে মাটির ওপর খড়মের চাপা খটখট শব্দ শুনে ঘুরে, দেখি একটি বৃদ্ধ গোছের লোক, পেছন থেকে প্রায় আমার পাশাপাশি এসে গেছেন। গায়ে একটা চাদর জড়ানো, নামাবলীই মনে হোল মাথায় গেরো বাঁধা একগোছা টিকিও। জিজ্ঞেস করলাম—অমুক ভট্চার্যির বাড়িটা জানেন কি? কোন্ রাস্তায় যেতে হবে?

কথা কয়ে নয় শুধু মাথাটা একটু হেলিয়ে জানালেন—জানেন। আমার থেকে দুপা এগিয়েই গেছেন, হাতটা পেছনে ক'রে সঙ্গ নিতে ইসারা করলেন। অমন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে একটা লোক পেয়েছি, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই আমার পক্ষে যথেষ্ট তখন। কথা কইছেন না, তার কারণ বেশ সহজেই ধরে নিয়েছি. সাত্বিক ব্রাহ্মণ, নিশ্চয় কোন পুকুর থেকে স্নান করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বাড়ি ফিরছেন। এই ধরণের চিন্তার জন্যেই হোক, বা যে জন্যেই হোক, মনে হোল যেন অস্ফুট চাপা সংস্কৃতের গুণ-গুণানিও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। আমিও ছুটলাম না। টর্চটাও জাললাম না, পিঠের ওপর গিয়ে পড়বে, কি ভাববেন? আর, বেশ তো চলেছিও।

অনেকখানিকটা ভেতরে গিয়ে এ রাস্তাটাও দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। উনি দাঁড়িয়ে পড়ে, বেশি না ঘুরে বাঁ দিকেরটার সামনেই একটা বাড়ি দেখিয়ে নিজে ডান দিকেরটা ধরে চলে গেলেন।

আমি মোড় নিয়ে বাড়িটা, রাস্তাটুকু ভালো করে দেখে নেওয়ার জন্যে টর্চ ফেলতে যাব, দেখি কখন ওর মধ্যে নিঃসাড়ে কিউজ হয়ে বসে আছে।

কিন্তু ক্ষতি হোল না, দরজার কাছে গিয়ে 'মাসিমা' বলে ডাক দিতেই একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক কপাট খুলে দাঁড়াল। প্রায় নাক বরাবর ঘোমটা দেখে মনে হোল উমেশ দাদার বউ নিশ্চয়। এগিয়ে প্রণাম করতে যাব, একটু পেছিয়ে গেল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম তো নিতে চায় না অনেকে, আমিও অতটা গ্রাহ্য না করে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম—মাসিমা, মেসোমশায়, উমেশ দাদা—সবাই আছেন বাড়িতে? ঘাড় নেড়েই জানান আছেন। ঘুরে এগুলেম, আমি পেছনেই, দু'তিনটা ঘর পেরিয়ে একটা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে। সামনেই একটা খাটে বিছানা পাতা। তাতে আগা-গোড়া মুড়ি দেওয়া একজন—মাথাটা খোলা দেখে বুঝলাম বেটা ছেলে, ও পাস ফিরে শুয়ে আছে। স্ত্রীলোক-টিকেই জিজ্ঞেস করলাম—মেসোমশাই?

মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস করলাম—অসুখ করেছে?

জানাল—হ্যাঁ।

তারপর ঠোঁটে আঙুল চেপে ডাকতে বারণ করল।

জিজ্ঞেস করলাম—মাসিমা কোথায়?

ঠিক ওপরে আকাশের দিকে আঙুলটা দেখান, কি খানিকটা নামিয়েই, অতটা বুঝতে না পারায়, আমার যেন মনে হোল, বললে কোনও প্রতিবেশীর বাড়ি গেছেন।

আর এক কাপ চা আসুক না।"

হীরালালই দরজার কাছে উঠে গলা বাড়িয়ে ঠাকুরকে বলে দিল। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে।

ভাস্কর আরম্ভ করল—"এটা কি করে এক্সপ্লেন করবেন? বিজ্ঞানে তো আজ সবই নস্যাৎ করে দিতে চাইছে। এতসব যে ব্যাপার হয়ে গেল, আমার কিন্তু এতটুকু কোথাও অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না—একেবারে সেই গোড়া থেকেই। একটা হালকা আলো ঘরে-দোরে-বাইরে, অথচ কোথা থেকে যে আসছে আলো—সোর্সটা প্রদীপ কি লণ্ঠন—শুধু যে দেখতে পাচ্ছি না তাই নয়, কোনও কৌতূহলও নেই। তার ওপর সবাই এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে, অথচ নিঃশব্দ—আমার কিন্তু সবটুকু নিতান্তই সহজ, স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে কোন প্রশ্নই উঠছে না মনে। আবিষ্ট হয়ে পড়েছি বটতলা থেকেই সময় আর পরিবেশের জন্তেই, না, সত্যিই কোন অতীন্দ্রিয় জগতের প্রভাব, না…

—ও হোক না হোক, ঘর-সুদ্ধ সবাই যেন আবিষ্টই হয়ে গেছে, ওর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে। উদ্দেশ্যটা একরকম ভুলে গিয়েই। গোকুলের তো কথাই নেই, যেন ঠাকুর্দাও পর্যন্ত। বলল—"সেকথা বলতে পারিনা. তবে ভগবানের দয়া যে এটা ঠিক, নৈলে আজ এখানে বসে তোমায় এ-গল্প শোনাতে হোত না।"

জল ফুটতেই চাকরটা চায়ের ট্রে এনে তোয়ের করে সবার হাতে হাতে দিয়ে গেল। নিঃশব্দেই পান করল সবাই, শেষ হলে কাপ-ডিস রেখে দিয়ে ভাস্কর বলল—"ঠিক কথাই। আমার হুঁস হোল অনেক পরে। "খেতে দেবে না কিছু?"…

কথাটা মনে হ'তে হাত-ঘড়িটা উল্টে দেখি রাত এগারটা! সঙ্গে সঙ্গেই একটা পৎপৎ শব্দ, একটা উৎকট পোড়া গন্ধ, তারপরেই এদিক ওদিক চাইতে দেখি—সেই ছেলেবেলার শোনা গল্প—ছুটো পা জলন্ত উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাধার আয়োজন হচ্ছে—সামনেই একটা বারান্দা পেরিয়ে ওদিক'কার ঘরটায়!

কি বলো দিকিন? এটমস্‌ফিয়ারে অতি-সূক্ষ্মস্তরে—বহু পূর্বে যা হয়ে গেছে, তার ইম্প্রেশন্, না, কি?

আমার চৈতন্য হোল প্রায় ন'ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ আজ সকাল আটটায়। হোতই না কখনও, উঠোনের মাঝখানে একটা পেয়ারা গাছ, জনতিনেক রাখাল এসে আমায় দেখতে পেয়ে মুখে বুকে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান হোল একটু। মনে আছে, যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছিনা এইভাবে কোন রকমে মুখ দিয়ে বের করেছিলাম—গুপ্তিপাড়া, অমুক ডাক্তার। এই আমার কাহিনী; বিশ্বাস করলে কিনা জানি না।"

চুপ করল ভাস্কর। ঘরের থমথমে ভাবটা যেন জমাট বেঁধে গেছে।

খানিক পরে একটু চকিত হয়ে উঠেই বলল—হ্যাঁ, একটা কথা না বললে ডাক্তারের ওপর রাগটা যাচ্ছে না। খুবই কেয়ার নিয়ে চাঙ্গা করে তুললেন, বিকেলের আগে ছাড়লেনও না, তবে যখন বেশ সামলে উঠেছি, কতকটা যেন হালকা ক'রে হেসেই বললেন—শুনেছি, পথ থেকে ডেকে নিয়ে যায়। অবশ্য, আমার সাহস করবে না, এমন এক এ্যান্টিভূত ইনজেক্‌শন্ আছে!'

—বলে হো হো করে হেসেও উঠলেন। তাহলে কি আমার ওপর দিয়ে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা চালালেন? গোড়ায় আরও একটু স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলে, আমি কি ওমুখো হই?"

খুব লাগসই প্ল্যান। পরদিন সকালে বেরিয়ে যাওয়ার কথা গোকুলের ; বৌকে সঙ্গে ক'রে ওদিক থেকেই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, বিকেল পর্যন্ত গেলনা। তারপরদিন, অর্থাৎ জামাইষষ্ঠীর দিনও নয়। শরীর নাকি বড্ড খারাপ।

একটা বোঁকের ওপর দলগত হুজুকের ফলে অনেকখানিই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, একেবারে জামাই-ষষ্ঠীটা পর্যন্ত বাদ পড়ে যেতে সবাই খুবই অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে। ওকে বোঝালও এত ভয় কি ?…স্টেশনে তো নিতেও আসবে তারা…

ফল হোল না।

বিকেল বেলা গোকুল বাজারে গেছে, আজ বাড়িই যাবে, ওরা সবাই ঠাকুর্দার ঘরে অনুতপ্তভাবেই ভুলটা নিয়ে আলোচনা করছে, এমন সময় ওদের বয়সী একটি যুবা বেশ উদ্বিগ্নভাবেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল। স্খলিত স্বরেই প্রশ্ন করল—"গোকুল আছে ?…কেমন আছে সে ? বাড়িও যায়নি তো !"

মাথায় টাক, হাতে একটা সুটকেশ, বেশ বড়ই। প্রদীপেরই দেখা, সেই অভ্যর্থনা করল "আসুন, আসুন।"

এদের বলল—"আমাদের গোকুলের সম্বন্ধী। হীরেনদা।" ঠাকুর্দা চোখ টিপে দিল, অর্থাৎ ভূতের ভয়ের কথাটা যেন না তোলে।

এসে চেয়ারে বসেছে, সুটকেশটা নামিয়ে, প্রদীপই বলল—"আছে ভালোই, অন্তত আজ তো বটেই। কাল শরীরটা ছিল একটু খারাপ। আমরা অনেক ক'রে তবু বললাম—যাও, জামাইষষ্ঠী। এটা বুঝি মাত্র দ্বিতীয়বারও ? বলল—জামাইষষ্ঠী বলেই যাবে না—একটু অনিয়ম-অত্যাচার হয়ই…"

"অত্যাচার করবে কে ?"—একটু হেসে বলল যুবক,—"আমি, মা, বাবা, ঠাট্টার দিকে একটি ছোট বোন। খাওয়ার দিকে—বাবা ডাক্তার মানুষ, তায় খুঁতখুঁতে—জামাইকে শুধু মুলো শাক—গাজর, তার মানে ভিটামিন খাইয়ে ভালয়-ভালয় ফেরৎ দিলেই বাঁচেন !"

একটা কি হাসি উঠল, ওদেরটা অর্থপূর্ণ ব'লে একটু বেশিই—তারই মাঝে গোকুল এসে উপস্থিত হোল। যুবা বিস্মিতভাবে চেয়ে প্রশ্ন করল—"কি হে, গেলে না যে !"

গোকুলও এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একটু অপ্রতিভভাবেই এসে বসতে বসতে বলল—"শরীরটা একটু…"

"তা বাবাতো রয়েছেন .."

"আর সুস্থ শরীরেই তাঁর যেমন খাওয়ার ব্যবস্থা শুনলাম আমরা…"

—হাসিই চলছিল ব'লে হীরালালের মন্তব্যে সবাই আবার হেসে উঠল, গোকুলের সম্বন্ধী পর্যন্ত। সে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেই বলে চলল—"নাও শীগগির তোয়ের হয়ে নাও।…কাল এলেনা, আজ সকালের গাড়িতেও নয়, সেই দশটা থেকে ছুটাছুটি করছি মশাই। একেবারে ওর বাড়িতে গেলাম মশাই—সেখানে আসেনি !—দুর্ভাবনা—অসুখে পড়ল নাকি !—কুন্তলাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে এলাম—আশা, এসে হয়তো দেখব এসে গেছে গোকুল—কা কস্য পরিবেদনা !—আবার সঙ্গে সঙ্গে ছুট—বাবা বললেন, তাহ'লে ওর জামা-কাপড়গুলো সঙ্গে নিয়ে যা—যদিই কোন কারণে নাই আসতে পারে দিয়ে আসবে।…নাও, আর ওরকম গড়িমসি নয়…"

শেষের কথাটা ওর দিকে চেয়ে বলায় কাঁকতালে এদিকে একটা চোখাচোখ হয়ে গেছে সবার মধ্যে, ঠাকুর্দা বলল—"সেগুলো একবার একটু দেখতে পাই না আমরা? যখন এসেই গেছে হাতের কাছে।"

—দেখল। এমন কিছু নিন্দের নয়,—একটা করেশডাঙার ধুতি, একটা সিল্কের জামা, মুগা-পাড়ের ভালো উড়ানি—সিল্কের গেঞ্জি, এক সেট রুমাল, প্রসাধন দ্রব্য—একজোড়া সৌখীন ষ্ট্র্যাপ শূ—সব মিলিয়ে শ' খানেকের কাছাকাছি তো হবেই।

ওরা চলে গেলে আবার জমে উঠল আড্ডা; এবার শুধু হাসি-হল্লোরই; সব তো জানা গেল একরকম। তায় জামাইষষ্ঠীটা পুরোপুরি নষ্ট না হওয়ায় সবার মনটাও বেশ হালকা হয়ে গেছে, বাঁধ ভেঙেই হাসির স্রোত ছুটেছে, তারই মধ্যে ঠাকুর্দা একবার বলে উঠল—"অত নয় হে, অত নয়! মনে রাখতে হবে ওটা শ্বশুরালয়।. হয়নি, তাই, হ'লে তোমরাও একশ'টাকে দু'শ, চারশ' করবে—কেউ-ই বাদ যাবেনা..."

"এক আমাদের ঠাকুর্দা ছাড়া;—হীরালাল বলে উঠল—"তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তো!..."

হাসির হাওয়াই বইছে, ঐটুকুতেই আর একটা লহর উঠল।

লাভ

কুমারলাল দাশগুপ্ত

ধনী ব্যবসাদার রমেশ রায়ের প্রাসাদের মত মস্ত বাড়ীখানা নতুন করে সাজানো হচ্ছে। বড় হলঘরে ঝাড় ঝোলানো হচ্ছে, মারবেলের মেজেতে পাতবার জন্যে ভাল ভাল গালিচা আসছে। পাশের একটা বসবার ঘর থেকে টেবিল চেয়ার সরিয়ে ফেলে সেখানে নতুন খাট, বিছানা, হালফ্যাশানের ড্রেসিং টেবিল, আলনা ইত্যাদি রাখা হচ্ছে। দরজা জানালায় দামী পর্দা টাঙানো হচ্ছে। কর্তা গিন্নীসহ বার বার প্রত্যেকটি কাজ তদারক করছেন, কোথাও যেন খুঁত না থাকে।

নতুন ঝি বিনোদিনী সারাদিন ছুটোছুটি করে, এটা ধোয়, সেটা মাজে, কাজের যেন শেষ নাই। মাস চারেক হোলো সে এবাড়ীতে কাজে লেগেছে। কি ব্যাপার, কি হবে কিছুই সে বুঝতে পারে না, অথচ কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও সে সাহস পায় না। কর্তা গিন্নী দুজনকেই সে বড় ভয় করে, অন্য ঝি চাকর তাকে আমলই দেয় না। গিন্নীর ছোট মেয়ে কমলার সংগে তার ভাব, তার ফুট ফরমাশই সে বেশী খাটে, সাহস করে তাকেই জিজ্ঞাসা করে "শুনছো দিদিমণি, এত ঝাড়পোঁছ হচ্ছে, জিনিষপত্তর আসছে কেন গো, পূজোটুজো হবে নাকি, না, তোমার বিয়ে?"

কমলা ধমক দিয়ে বলে "থাম বলছি, ইয়ার্কি করবার আর সময় পেলি না। জানিস নে আমাদের গুরুমহারাজ আসবেন সামনের সপ্তাহে!"

বিনোদিনী আঁচ করে নেয় স্বয়ং কর্তা যাঁর জন্যে এত ব্যস্ত তিনি নিশ্চয়ই মস্ত লোক, তাই আবার জিজ্ঞাসা করে "তিনি কোথা থেকে আসছেন দিদিমণি?"

কমলা বলে "তাঁর কাশী, বৃন্দাবন অনেক জায়গায় আশ্রম আছে, তবে তাঁর প্রধান আশ্রম হচ্ছে হরিদ্বারে। সেখান থেকেই তিনি আসছেন।"

কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না বিনোদিনী, প্রশ্ন করে "তিনি কেমন দিদিমণি?"

"তিনি মস্ত সাধু, মহাপুরুষ। যা, যা, আর বকাস নে, এখন আমার অনেক কাজ, এলে দেখবি তিনি কেমন" বলে কমলা চলে যায়।

দেখতে দেখতে শুভদিনটি এসে উপস্থিত হয়। সকাল হতে না হতে রাশী রাশী ফুল আর ঝুড়ি ঝুড়ি ফল আসে। হলঘরটা আর একবার ঝাড়পোঁছ হয়, গালিচার উপর একদিকে পাতা হয় প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল। তার চার পাশে বসান হয় ফুলের ঝাড়। আটটা বাজতেই কর্তা গিন্নী বড় গাড়ীখানা নিয়ে হাওড়া চলে যান। বাড়ীর লোকজন উদ্‌গ্রীব হয়ে পথ চেয়ে থাকে। বিনোদিনী অন্দর-মহল থেকে বারে বারে বাহির-মহলে এসে উঁকিঝুঁকি মারে। মাঝে মাঝে ধমক খায় "তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন বিনোদ, যা, যা, নিজের কাজে যা।" বিনোদিনী নিঃশব্দে সরে যায় কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে আসে। ঘণ্টাখানেক পরে খান ছয় সাত গাড়ী এসে দাঁড়ায় গেটে, বাড়ীর ভিতরে বাইরে হুলুস্থুল পড়ে যায়। বাড়ীর লোকেরা ছোটে গেটের দিকে। তাদের সংগে বাইরে

যেতে সাহস হয় না বিনোদিনীর, সে আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে। বড় গাড়ীখানার দরজা খুলে কর্তা গিন্নী তাড়াতাড়ি নেমে দুপাশে দাঁড়ান একটু পরে নেমে আসেন জটাজুট ধারী গেরুয়াবসন-পরা এক প্রৌঢ় পুরুষ, পিছনে নামে কমলা। অন্যান্য গাড়ী থেকেও নেমে পড়েন ভক্তবৃন্দ। গুরুমহারাজকে নিয়ে কর্তা গিন্নী ফুল পাতা দিয়ে সাজানো গেটের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীতে ঢোকেন, পিছনে সারিবদ্ধভাবে আসেন আর সকলে। অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে দেখছিল বিনোদিনী, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে সে সজাগ হয়ে ওঠে, কে একজন বলে "সরে যা, সরে যা বিনোদ, গুরুমহারাজ আসছেন।" সরে যেতে বিনোদিনীর ইচ্ছে করে না, তবু জোর ক'রে টেনে নিজেকে সে সরিয়ে নেয়।

গুরুমহারাজকে নিয়ে কর্তা গিন্নী চলে যান তাঁর জন্যে বিশেষ করে সাজানো শোবার ঘরে। সেখানে গিন্নী গুরুমহারাজের চরণদুটি ভক্তিভরে ধুইয়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে দেন। তার পরে বিছানায় বসিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছিল তবু নিজের হাতে হাওয়া না করে শান্তি পান না গিন্নী।

ঘন্টাখানেক বিশ্রামের পর গুরুমহারাজ যখন হলঘরে এসে বসেন তখন সেখানে বহুলোকের সমাগম হয়েছে। একে একে তারা এসে গুরুমহারাজকে প্রণাম করে, মহারাজ স্মিতমুখে তাদের আশীর্বাদ করেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন। অন্দরে বিনোদিনীর হাত আর চলেনা, আজ তার কোন কাজেই মন নাই। রান্নাঘর থেকে বামুনঠাকরুণ ডাকে "কোথায় গেলি বিনোদ, মশলা বেঁটে দিয়ে যা" সে কথা কানেই ঢোকে না বিনোদিনীর। বাড়ীর পুরোনো ঝি মতির মা বলে "কলতলায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস বিনোদ, চারখানা প্লেট ধুতে তোর এতক্ষণ লাগে?" চারখানা প্লেটের একখানাও ততক্ষণ ধোয়া হয়নি বিনোদিনীর। কাজ ফেলে বার বার সে ছুটে হলঘরের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, চেয়ে চেয়ে গুরুমহারাজকে দেখে। কি কোমল মুখখানা, কি শান্ত দৃষ্টি আর মিষ্টি হাসি। হাসিটি দেখতে পায় কিন্তু কথা সে শুনতে পায় না, খুব আস্তে আস্তে কথা বলেন গুরুমহারাজ। ইচ্ছে করে সেও গিয়ে প্রণাম করে মহারাজকে, কিন্তু তা কি সম্ভব, সে যে বাড়ীর নতুন ঝি, সামান্য বিনোদিনী। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতেও সে পারে না, ছুটে আবার অন্দরে চলে আসে।

দুপুর পার হয়ে গেছে। বাহিরের সব লোক চলে গেছে, গুরুমহারাজ খেয়ে দেয়ে বিশ্রামের জন্যে শুয়েছেন। কর্তা গিন্নী পদসেবা করছেন, সেদিকে কারু যাবার উপায় নাই। কড়া হুকুম, কোথাও যেন এতটুকু শব্দ না হয়।

বিকেলে গুরুমহারাজ বেরোবেন হাওয়া খেতে, দরজায় মোটর এসে দাঁড়ায়। সংগে যাবেন কর্তা, গিন্নী, আর কমলা। সাজগোজ শেষ করে গিন্নী ডাক দেন "বিনোদ, শুনে যা শীগগির।"

ডাক শুনে বিনোদিনী ছুটে আসে। গিন্নী বলেন "আমরা বাইরে যাচ্ছি, এই ফাঁকে গুরুমহারাজের ঘরখানা তুই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখবি। বুঝলি?"

সাগ্রহে মাথা নেড়ে বিনোদিনী বলে "হ্যাঁ মা, বুঝেছি।"

আনন্দে বিনোদিনীর বুকটা কাঁপতে থাকে, এতবড় সৌভাগ্য তার হবে একথা সে ভাবতেও পারেনি। মহারাজ বেরিয়ে গেলেই সে ছুটে কলতলায় গিয়ে চান করে ধোয়াশাড়ী পরে নেয়। তার পরে দেব-মন্দিরে ঢোকার মতই শ্রদ্ধাভরে মহারাজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কি পরিপাটি করে সাজানো ঘর। নতুন পালঙ্কে ধপধপে বিছানা, জানালায় ঝলমলে পর্দা, ঘরের কোনে ছোট টেবিলের উপর রূপোর ফুলদানি, আয়না বসানো দামী ড্রেসিং টেবিল, দেয়ালে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো গুরুমহারাজের মস্তবড় ছবি। বিনোদিনী জানে এসব কর্তার আয়োজন। কিন্তু গুরুমহারাজের নিজের জিনিষ কোথায়? কি এনেছেন-সংগে তিনি? চারিদিকে তাকিয়ে বিনোদিনী দেখে, চোখে পড়ে আলনায় ঝুলছে একখানা কৌপীন আর গেরুয়া ছোপানো একটুকরো কাপড়। অবাক হয়ে যায় বিনোদিনী। তাঁর কিছু নাই অথচ তাঁকে সবার চেয়ে বড় মনে হয় কেন? সেভাবে হয়তো ওঁর সব সম্পদ ভিতরে

বাইরে কিছু নাই। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ঘরখানি ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে সে। তারপরে মেজের মাঝখানে মাথা ঠেকিয়ে গুরুমহারাজের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করে, আর তার মনে ক্ষোভ থাকে না।

পরদিন বিকেলবেলা গুরুমহারাজের বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে, সবাই প্রস্তুত, এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ালো এক মস্ত গাড়ী। গাড়ী থেকে নামলেন ক্ষীণকায় একটি বাবু, স্থূলকায়া একটি মহিলা। তাঁরা উঠে এলেন হলঘরে। বিনোদিনী যাচ্ছিল সেখান দিয়ে, তাকে ডেকে বাবু বল্লেন "মিষ্টার রায় বাড়ী আছেন?" বিনোদিনী ঘাড় নেড়ে জানালো আছেন।

বাবু বল্লেন "তাঁকে গিয়ে বলো মাধবপুরের কুমার ও তাঁর স্ত্রী এসেছেন, একবার দেখা করতে চান।"

শুনে বিনোদিনী তো তটস্থ, কোন মতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে কর্তাকে খবর দেয়। কর্তা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সমাদর করে বসান দুজনকে। কিছুক্ষণ ধরে কি যেন কথা হয়, তারপরে তিনজন গিয়ে ঢোকেন গুরুমহারাজের ঘরে। হঠাৎ শোনা যায় কান্নার আওয়াজ। একটু পরে কর্তাকে সংগে নিয়ে গুরুমহারাজ গিয়ে ওঠেন কুমার বাহাদুরের গাড়ীতে।

কমলা নিজের ঘরে আয়নার সামনে বসে মুখে ক্রীম ঘষছে এমন সময় কাছে দাঁড়ায় বিনোদিনী বলে "আজ তোমরা বাবার সংগে বেড়াতে গেলেনা দিদিমণি?"

কমলা আয়নার ভিতরে নিজের নাকটা ভাল করে লক্ষ্য করছিল, সেইদিকে তাকিয়েই জবাব দেয় "আমরা কোথায় যাব রে, ওঁরা গেলেন নিউ আলিপুর মাধবপুরের কুমার বাহাদুরের বাড়ী। মস্ত বড় লোক, এক সময়ে রাজা বলতো ওদের। এখন জমিদারী গেছে কিন্তু ওদের ঠাট বজায় আছে।"

বিনোদিনী বলে "বাবাকে দেখবার জন্যে নিয়ে গেল বুঝি? "না রে, না" বলে কমলা "কুমার বাহাদুরের ছেলে মরমর, খুব অসুখ, ডাক্তার জবাব দিয়েছে, তাই ওরা এসে কেঁদে বাবার পা জড়িয়ে ধরলেন। বাবার দয়ার শরীর, না বলেন না, সংগে গেলেন।"

বিনোদিনী আশ্চর্য হয়ে বলে "বাবা গেলে ছেলে ভাল হয়ে উঠবে দিদিমণি?"

"বাবা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে "বলে কমলা, সতীশ মল্লিকের মেয়ের টি, বি হয়েছিল, বাবার আশীর্ব্বাদে ভাল হয়ে গেল। এমন কতজনকে ভাল করেছেন বাবা, বাবা কি যে সে রে।"

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিনোদিনী, তারপরে কমলার কাছে সরে এসে বলে "একটা কথা শুনবে দিদিমণি?"

"বল না, এত ভণিতা কেন" বলে কমলা।

"বলছিলাম কি আমার ছেলেটার মিরগির রোগ, যেখানে সেখানে যখন তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে। বাবা যদি একবার গায় হাত বুলিয়ে দেন তাহলে সে তো ভাল হয়ে যায় বলে বিনোদিনী।"

কমলা দুই হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুলে ক্রীম নিয়ে চিবুকের নীচ থেকে কান পর্যন্ত তির্যকভাবে টেনে নিচ্ছিল, কথা বলবার ফুরসৎ ছিলনা তার। বিনোদিনী অধৈর্য হয়ে বলে "কথাটা শুনেছো দিদিমণি!" প্রসাধনের ব্যাঘাত হচ্ছিল কমলার, বিরক্ত হয়ে বলে "শুনেছি, শুনেছি। যা, মাকে বলগে যা, তিনি বাবাকে বল্লেই হবে।"

বিনোদিনীর আর সবুর সয় না, গিন্নীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিছানায় শুয়ে পড়ে বই পড়ছিলেন গিন্নী, বিনোদিনী ভয়ে ভয়ে ডাকে "মা।" ঘাড় ফিরিয়ে বিনোদিনীকে দেখে গিন্নী বলেন কি বলছিস?"

"দিদিমণি আপনাকে বলতে বল্লেন।"

—কি বলতে বল্লেন ?

—আমার ছেলেটার মিরগির রোগ, বাবা যদি একবার তার গায় হাত বুলিয়ে দেন তাহলে সে ভাল হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন গিন্নী, তারপরে কথাটার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে গর্জে ওঠেন।" যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, বাবা দেবেন তোর ছেলের গায় হাত বুলিয়ে! ছোট লোক আজকাল মাথায় উঠে গেছে! বেরো এখান থেকে।

কাঁপতে কাঁপতে ছুটে পালায় বিনোদিনী।

গুরুমহারাজকে নিয়ে উৎসব চলছিল মহানন্দে এমন সময় একদিন তিনি বলেন "আমি বৃন্দাবন যাব।" কর্তা গিন্নী আতঙ্কিত হয়ে বলেন "কেন বাবা, আমাদের ছেড়ে যাবেন কেন ? আমরা কি কোন অপরাধ করেছি ?" মৃদু হেসে গুরুমহারাজ বলেন "অপরাধ কেন করবে তোমরা, অনেক দিন তো থাকা হোলো, এবার যেতে হবে।" গুরুমহারাজের পা জড়িয়ে ধরে কর্তা গিন্নী বলেন "তা হবে না বাবা, আর কটা দিন থেকে যেতে হবে। সেবা করে আমাদের সাধ মেটেনি। বড়বাজারে একটা নতুন দোকান খুলছি, সেদিন আপনি উপস্থিত না থাকলে তো হবে না বাবা।" গুরুমহারাজ তেমনি মৃদু হেসে বলেন "কাল রাত্তিরে রওনা হব ঠিক করেছি।"

কর্তা গিন্নী মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে ভক্ত মহলে।

পরদিন সকাল থেকেই লোক আসতে শুরু করে। বড় বড় গাড়ীতে আসে বড় বড় লোক। কারু সঙ্গে ফল মিষ্টির ডালি, কারু হাতে ফুল। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ভিড় বেশী। সকালের পূজাপাঠ শেষ করে গুরুমহারাজ এসে বসেন আসনে। ভক্তেরা প্রণাম করে একে একে, কেউ চরণধূলি নিয়ে মাথায় রাখে, কেউ দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে। সবাইকে আশীর্ব্বাদ করেন মহারাজ। বিনোদিনীর ঘাড়ে আজ কাজ পড়েছে অনেক, বাইরে আসবার সুযোগ একবারও পায়নি। সে ভাবে কত ভাল ভাল কথাই যেন হচ্ছে ওখানে। কতজনকে যেন কত উপদেশ দিচ্ছেন গুরুমহারাজ। তাঁর মুখের উপদেশ শোনবার জন্যে বিনোদিনীর মনটা ছটফট্ করে। বেলা বাড়ে, লোক আসার বিরাম নাই। হঠাৎ কমলা এসে ডাকে "ওরে বিনোদ, আয় তো এদিকে। হাতের কাজ ফেলে সে উঠে আসে।

কমলা বলে "হলঘরের ঐ কোনটাতে গালিচাখানা পেতে দিয়ে আয়, আরো লোক আসছে।" হাতে যেন স্বর্গ পায় বিনোদিনী, তাড়াতাড়ি গালিচা নিয়ে সে হলঘরে ঢোকে। কোনমতে গালিচাখানা পেতে দিয়ে সে দরজার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়, দেখে, অতবড় হলঘর প্রায় ভরে গেছে। গুরুমহারাজকে ঘিরে বসেছে মেয়েরা। তারা কথা বলছে, মহারাজ চুপকরে শুনছেন আর হাসছেন। একটি বড়ঘরের বউ, ফুটফুটে রং, গা ভরা গহনা, বলছে "এবার গরমে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম বাবা, আমি কোলকাতার গরম একটুও সইতে পারিনে। গতবছর গিয়েছিলাম নৈনীতাল, এবার কাশ্মীরে একমাস থেকে এলাম। হাজার চারপাঁচ টাকা খরচ হোলো। ওঁর আবার শাল কেনার বাতিক, ভাল জিনিষ দেখলে উনি ছাড়েন না, একজোড়া শাল কিনলেন আড়াই হাজার টাকায়।" বউটির কথা শেষ হতে না হতে আধাবয়েসী একটি মহিলা বল্লেন "আমার ছোট ছেলে দিল্লীতে বদলি হয়েছে বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে সংগে সংগে মাইনেও বেড়ে গেছে। এখানে পেতো দেড়হাজার, ওখানে দুইহাজারের উপরে পাচ্ছে, তাছাড়া বাড়ী।" মহারাজ শুনছেন আর হাসছেন।

বাইরে থেকে ঘনঘন ডাক আসে বিনোদিনীর, সে আর দাঁড়াতে পারেনা, নিঃশব্দে চলে যায়।

গুরু মহারাজ আজ বিকেলে বেড়াতে যাবেন না, রাত আটটায় তাঁর গাড়ী। দুপুর থেকে ছটফট্ করে

বিনোদিনী, একটু ফাঁক যদি সে পায় তাহলে গুরুমহারাজের চরণ দুটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে। সুযোগ আর আসেনা। হাতের কাজ পড়ে থাকে, বকুনি খায় সবার কাছে, তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, বার বার এসে সে হলঘরে উঁকি মারে। একবার এসে দেখে হলঘর খালি, নিঃশব্দে সে এগিয়ে যায়। মহারাজের ঘরেও কেউ নাই, একা বসে আছেন তিনি। সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে সে গুরুমহারাজের পায়ের উপর মাথা রাখে।

মহারাজ বলেন "তুমি কে?

কোনমতে বিনোদিনী বলে "আমি বিনোদিনী, এবাড়ীর ঝি।"

মহারাজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন "তুমি আমার মা।"

সে স্নেহের সম্ভাষণে বিনোদিনী কেঁদে ফেলে, বলে "কি করলে আমার ভাল হবে বাবা?"

তার মাথার উপর হাত রেখে মহারাজ বলেন "সৎ থেকো মা, তাহলেই ভাল হবে।"

যেমন চুপি চুপি বিনোদিনী এসেছিল, তেমনি চুপি চুপি সে চলে যায়। বাবার হাতের স্পর্শ সে মাথায় করে এনেছে, সে যেন নতুন মানুষ। ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে আর বিনোদিনী ভাবে তার মত সৌভাগ্যবতী আর কেউ নাই।

চলে গেছেন গুরুমহারাজ, বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে। কর্তা আর গিন্নীর চোখের জল আর শুকোতে চায় না। সবাই বলে রমেশ রায় আর তাঁর স্ত্রীর মত লোক কলিকালে বিরল। আহা, কি ধর্মপ্রাণ মানুষ দুটি!

কয়েকদিন পরে আজ বিষয়কর্ম দেখতে বেরিয়েছিলেন কর্তা, বিকেলে বাড়ী ফিরে ঘরে ঢুকেই ডাকেন "একবার এদিকে এসো তো।" গিন্নী এসে কাছে দাঁড়াতেই কর্তা বলেন "শুনছো, নরেন মারা গেছে।"

চমকে উঠে গিন্নী বলেন, "কোন নরেন, আমার মাসতুতো ভাই নরেন?"

মাথা নেড়ে কর্তা বলেন "আরে না না, আমার বন্ধু নরেন ঘোষ।"

"তাই বলো না, কি ভয় যে পেয়েছিলাম আমি। তা, কি হয়ে মারা গেল?" বলেন গিন্নী।

কর্তা বলেন "ব্লাডপ্রেশার খুব বেড়েছিল ইদানিং, স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে। আজ আপিসে নরেনের বউ এসেছিল আমার সংগে দেখা করতে।"

গলা খাটো করে গিন্নী বলেন "সেই টাকাটার জন্যে বুঝি?"

মাথা নেড়ে কর্তা বলেন "হ্যাঁ।"

গলা আরো খাটো করে গিন্নী বলেন "কি বলল?"

"বলল আমার স্বামী দেশের বাড়ী বেচে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, সেটা আপনার কাছে জমা রেখেছিলেন, ইচ্ছে ছিল সেই টাকায় কোলকাতায় বাড়ী করবেন। চলে গেলেন, আর বাড়ী দিয়ে আমি কি করবো, টাকাটা দিন, বড় অভাবে পড়েছি।"

আতঙ্কিত কণ্ঠে গিন্নী বললেন "তুমি বুঝি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত টাকাটা দিয়ে দিলে?"

একটু হেসে কর্তা জবাব দিলেন "আমাকে অত বোকা ভেবেছো গিন্নী, অত বোকা হলে আর ধানচালের ব্যবসায় টাকা করতে পারতাম না। আমি বললাম—টাকাটা তো মাসখানেক আগে নরেন আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, টাকা নেই আমার কাছে।"

গিন্নী আশ্বস্ত হতে পারলেন না, বলেন "নরেনের বউ যদি আদালতে যায়?"

বুড়ো আঙ্গুল উঁচু করে কর্তা জবাব দেন "যাক না, লেখাপড়া নাই, সাক্ষী-সাবুদ নাই, ও প্রমাণ করতে পারবে নরেন ঘোষ আমার কাছে টাকা রেখেছিল?"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন গিন্নী, দরজার বাইরে বিনোদিনীকে খাড়া দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলেন "তুই এখানে কি করছিস বিনোদ?"

বিনোদিনী তাঁর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে বলে "আমি যে বড় অপরাধ করেছি মা—"

ভয় পেয়ে গিন্নী বলেন "অ্যাঁ, কি করেছিস?"

গিন্নী পাদুটি জড়িয়ে ধরে বিনোদিনী বলে "আমি চুরি করেছি মা, আমি মহা পাতকী। আমার রোগা ছেলেটা নেবু খেতে চেয়েছিল, আমি আপনার বাড়ী থেকে দুটো নেবু লুকিয়ে নিয়ে তাকে দিয়েছিলাম। সে মাসখানেক আগের কথা মা। কিন্তু চুরি আজই করি আর কালই করি, সে তো চুরিই। কাল থেকে আমার মনে শান্তি নেই মা, তাই আপনার পা ধরে ক্ষমা চাইতে এলাম।"

শুনে দুপা পিছিয়ে গিয়ে কপালে চোখ তুলে গিন্নী বলেন "বিনোদ, তুই চোর! কি সর্ব্বনাশ, ওগো শুনেছো—"

ভিতর থেকে কর্ত্তা সাড়া দিয়ে বলেন "কি হোলো?"

গিন্নী বলেন "বিনোদ চুরি করেছে।"

আঁতকে উঠে কর্ত্তা বলেন "কি চুরি করেছে?"

গিন্নী বলেন নেবু চুরি করেছে। বলছে দুটো, ক'টা করেছে কে জানে।"

কর্ত্তা রুক্ষভাবে নির্দ্দেশ দেন "ওর মাইনে থেকে দাম কেটে নাও।"

বিনোদিনী শান্ত মনে নিজের কাজে ফিরে আসে।

সাহিত্যে মার্কসবাদ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সমালোচকের কাজ আলোচ্য রচনার দোষ-গুণ আলোচনাপ্রসঙ্গে বিষয়ের মর্মরহস্য উদ্ঘাটন তথা বিষয়টির স্বরূপ নির্দেশ। যে-সমালোচক সাহিত্যক্ষেত্রে কাজটি এমন ভাবে করেন যাতে পাঠকের চিত্তে নিরুদ্ধ রসানুভূতির উৎস উন্মুক্ত হয়ে আনন্দবারি-অভিষেক-পবিত্র এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয় যার সাহায্যে পাঠক কিছুক্ষণের জন্যে প্রাত্যহিক গতানুগতিকতার দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তিমানসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে, সে-সমালোচক সার্থক এবং স্রষ্টা; তাঁর লেখা সমালোচনা শুধু মামুলি সমালোচনা নয়, তা হল সমালোচনা-সাহিত্য। তার কারণ, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধ-পত্রসাহিত্যের মতো তাঁর সমালোচনাও পাঠকচিত্তে রসবোধের স্ফুরণ সাধন করে।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে রসজ্ঞ ও রসস্রষ্টা সাহিত্য-সমালোচকের সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি হলেও উল্লেখযোগ্য মাত্র চার-পাঁচ জন। এখন নিঃসন্দেহে সমালোচনার যুগ। মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির যে-প্রাণোচ্ছল বন্যা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যকে প্লাবন-করুণায় উষরতা থেকে উর্বরতায় উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছিল, সেই প্রচণ্ড ভাবশক্তি আজ স্তিমিত, মুমূর্ষু। রাজনৈতিক পরিবেশ ও অরাজকতার সন্ধিপর্ব অবসিত না হওয়া পর্যন্ত সমালোচনাই আমাদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা স্মরণীয়:—

"নূতন সৃষ্টির জোয়ার আসিবার পূর্বে পুরাতনের উপভোগ ও মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করাই নবীনের প্রত্যুদ্গমনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি।"

এ-কথা গোপন ক'রে লাভ নেই যে, কয়েকজন বিভ্রান্তবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতার অপপ্রভাবে এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বাঙালি যে ভয়াবহ আত্মঘাত ও অধোগতির পথে পদার্পণ করেছিল, আজ সে-পথের প্রায় শেষ প্রান্তে সে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। ত্রিপুরী কংগ্রেস, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ও ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রস্তাবিত হক-কারৎ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার সময় থেকে বিগত প্রায় ত্রিশ বছর ধ'রে বাঙালি নিশ্চিত-রূপে অধোগামী (Decadent) জাতি। সমালোচনার প্রয়োজন তাই বর্তমান যুগেই সর্বাধিক।

সমালোচকশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি সাহিত্যের স্বরূপ নির্দেশ করার সময়ে যেমন, কোন শিল্পীর রচনার মূল্য অবধারণের সময়েও তেমনিভাবে আলোচ্য বিষয়টিকে সমগ্রভাবে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা করবেন। অনাসক্ত মনে এ-কাজ করতে হবে। বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে যে-পক্ষে যতটুকু বলার আছে সবটুকু বলতে হবে; কিন্তু বলার পরও দেখাতে হবে যে, সব কথা বলা হয়ে গেলেও এক পক্ষ আপন সামর্থ্যেই জয়লাভ করে, সমালোচক তার প্রতিপক্ষদের দুর্বল ক'রে দিয়েছেন ব'লে নয়। সমালোচককে নাট্যকারোচিত নিরপেক্ষতা এবং ঔপনিষদিক

অনাসক্তি অর্জন করতেই হবে। নিরপেক্ষ সমালোচনার অর্থ এই নয় যে, সব বক্তব্যকে সমান ক'রে ব্যক্ত করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে, সকলেরই ইজ্জত বজায় রেখে গেল। নিরপেক্ষ সমালোচক দেখাবেন যে, সব কথা বলার পরও সে জয়লাভ করুক যে তার নিজ সামর্থ্যেই গরীয়ান্। দুঃখের বিষয়, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এমন সমালোচক খুব কম আছেন।

পরলোকগত আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে :—

"সাহিত্যের শাশ্বত স্বরূপ সম্বন্ধে শেষ কথা বলিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্ফল স্পর্ধা। সাহিত্যের স্বরূপ এখনও বিকাশের পথে। দেশ-কালের একটি বিশেষ কোণে বসিয়া কয়েকটি সনাতন সত্য আবিষ্কার করিবার স্পৃহা এবং স্পর্ধা আমার নাই। এই জাতীয় সাহিত্যই রচিত হওয়া উচিত, এই জাতীয় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত নহে, এই বলিয়া যে-বিতর্কটি সবচেয়ে জমকালো হইয়া উঠে, তাহা আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদের ঝগড়া।"

এই মনোভাব নিরপেক্ষ সমালোচনার খুব নিকটবর্তী হলেও এই সঙ্গে নির্ভীকভাবে বলা উচিত যে, যারা মনে করে কেবল বিশেষ এক জাতীয় সাহিত্যই রচিত হওয়া উচিত, অন্তত তাদের মতবাদ সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে সযত্নে বহিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন। যদি উদার ও সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক চেতনাকে স্বাধিকারপ্রমত্ত অসুর-ভাবাপন্ন মতবাদীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে না দিতে হয়, তা হলে যারা সাহিত্যে কোন একটি বিশিষ্ট মত-বাদের প্রকাশ কতটা হয়েছে মাত্র সেটি দেখে সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে সাহিত্যের আনন্দদানসামর্থ্য উপেক্ষা ক'রে, তারা সংখ্যায় যত প্রবল হোক না কেন, তাদের মতবাদ উপেক্ষা করতে হবে অন্য সকল মতবাদের বিকাশ-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে।

বর্তমানে আমরা এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি যখন আমাদের আর দ্বিধাগ্রস্তভাবে "আমিও ভালো তুমিও ভালো" ধরণের ঔদার্যকে সব ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। প্রত্যেকের নিজের ক্ষেত্রে যা খুশি তাই করার অধিকার আছে, অপরেরও যে সেই অধিকার আছে একথা মেনে নিয়ে; কিন্তু যে বলে, সে-অধিকার আছে কেবল তার, আর কারও নয়, আর সকলকে তার মতানুবর্তী হতে হবে, সেই দুষ্প্রবৃত্তিসম্পন্নকে অন্য সকলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে প্রতিহত করতে হবে। সুতরাং কোন স্বাধিকারপ্রমত্ত লোক যখন বলে :—

No book written at the present time can be good unless it is written from a Marxist or near-Marxist point of view (upward—The Mind in Chains—Theodore Kamisarjevsky.)

মার্কসবাদী বা প্রায়-মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না লিখলে বর্তমানে কোন বই সুলিখিত হতে পারে না। (থিওদর কমিসারিয়েভ্স্কি।)

তখন কেবল মধ্যস্বল্পলভ নিরীহ প্রতিবাদ নয়, সত্যসন্ধ প্রত্যাঘাত নিতান্ত জরুরি দরকার। বর্তমান কালে মার্কসবাদ নিয়ে নানারকম নির্বোধ আলোচনা সর্বদা শোনা যায়। তার মধ্যে সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা মূঢ়োচিত।

সাহিত্য ব্যক্তিচেতনার স্বাধীন বিহারের ক্ষেত্র; ঐ স্বাধীনতাই মনে কাব্যানন্দের স্ফুরণ নিয়ে আসে। ব্যক্তির নিজ মন যখন শ্বাসরোধকারী পারিপার্শ্বিকের বদ্ধ প্রভাবে ক্লিষ্ট হয় তখন তাকে রূপ ও রসসৃষ্টির দ্বারা সর্বভূতান্তরাত্মা যে-চেতনা তার যথাসম্ভব কাছে নিয়ে আসা কাব্যরচনার লক্ষ্য। এর জন্যে ব্যক্তির

মনকে কোন গণ্ডি দিয়ে ঘিরে রাখা চলে না। চিৎস্বরূপের আবরণ ভেঙে ফেলে তার উৎস থেকে বিন্দু বিন্দু মধুর মতো ক্ষরিত রূপাশ্রিত রস আস্বাদনই সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষ্য। পাঠকচিত্তের অনভ্যাসজাত প্রাত্যহিক জড়তার কঠোর আবরণটি ভেঙে ফেলতে প্রকৃত সমালোচক সাহায্য করেন। যে-সমালোচক তা পারেন না, তাঁর সমালোচনা ব্যর্থ। মার্কসবাদী সমালোচক যখনই বলেন: এই পর্যন্ত, এর বেশি নয়, তখনই তিনি ঐ আবরণ দূর করার পরিবর্তে ব্যক্তির রসলিপ্সু চিত্তের চারদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের বেড়া তুলে দেন। অথচ রসসৃষ্টির জন্যে চাই ব্যক্তির স্রষ্টামনের স্বাধীনতা।

কোন মার্কসবাদী বা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেই ব্যক্তিমনের স্বাধীনতা নেই, এই হল নিরপেক্ষ দর্শকের অভিমত। প্রথমেই মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ ক'রে নিলে তার পক্ষে রাষ্ট্রপরিচালকের নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে রসসৃষ্টি করা একান্ত অসম্ভব—কাব্যতত্ত্বের একান্ত বিরোধী এই প্রস্তাব। মানুষের আসল স্বাধীনতাই হচ্ছে মনোভাব প্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, অপরেরও সেই অধিকার ভদ্রভাবে মেনে নিয়ে। কিন্তু এই স্বাধীনতা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। এই স্বাধীনতা স্তালিনের রুশিয়ায় ছিল না, আজকের রুশিয়া বা মাও-সে-তুঙের চীনেও নেই। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে ফ্রান্সে, ডেনমার্কে, সুইডেনে, সুইট্‌সারল্যাণ্ডে, পশ্চিম ইউরোপের আরো নানা দেশে। যে এ-কথা বলে যে, "আমি তোমাদের পোলাও-কালিয়া খাওয়াবো, কেবল মনে রেখো যে, পৃথিবীতে এক আমার গলার আওয়াজ ছাড়া আর কোন গলায় আওয়াজ থাকবে না, সে বিশ্ববাসী মানবসাধারণের পক্ষে কুষ্ঠব্যাধির মতো ভয়াবহ; আর, তার কথায় যারা নব-জাগরণ বা রেণেসাঁস ও রোমান্টিক অভ্যুত্থান বা রোমান্টিক রিভাইভ্যালের গৌরবময় শিল্পনির্দেশ অমান্য ক'রে জৈব চেতনার বাণীকে যুগবাণী (Zeitgeist) মনে করে, তারা মিষ্টান্নলোভী শিশুর দল। একাধিক লোকের চিন্তার মধ্যেই এই মানব সমাজের গতি এবং মনুষ্য জীবনের উন্নতি। এই পরম সত্য উপলব্ধি ক'রে পরলোকগত আচার্য সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেছিলেন :—

"রাষ্ট্রীয় দলপতিদের দণ্ডনীতি আর্টের উপরে উদ্যত হইয়াছে এবং আর্ট বিদ্বজ্জনকথিত রাজেন্দ্রাণীর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাসীবৃত্তি অথবা পণ্যাঙ্গনা বেশযোষার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।"

কমিউনিষ্টরা সাহিত্যকে দাসী এবং মার্কিনরা তাকে গণিকায় কিভাবে পরিণত করতে চায়, আধুনিক মার্কসবাদী ও মার্কিন-সাহিত্যে তার প্রমাণের অভাব নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজব্যবস্থার অনুকূল আশ্রয়ে রসচেতনা বিকশিত হয়। শিল্পী শ্রমিকের হাতুড়ি বা কৃষকের কাস্তে নয়, সে শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের পরম বন্ধু, আত্মার সুহৃদ, আনন্দের সুষ্ঠুতম বণ্টনব্যবস্থার উদারতম পরিচালক ও অন্তরঙ্গতম অংশীদার।

প্রসঙ্গত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক সমালোচকবৃন্দের একটা যুক্তির উত্তর দেওয়া দরকার। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-সত্য আছে তাকে সমর্থন করা হবে না কেন? এর উত্তর এই যে, মার্কসবাদ এমন একটি মতবাদ যা হয় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নয় সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। কোন আপোষ-রফার স্থান মার্কসবাদে নেই। সুতরাং যদি কেউ সাহিত্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ সত্য বলে মনে করেন, তাহলে তিনি এই কথাই বলতে চান যে, আর সব দৃষ্টিভঙ্গি অসত্য। অর্থাৎ মার্কসবাদের প্রধান কথাই হচ্ছে, আর সব মতবাদ অসত্য। কার্ল মার্কস ব্যতীত অন্য সব আলঙ্কারিক ও সাহিত্যরসিকদের যুগ-যুগান্তব্যাপী ধ্যানলব্ধ কাব্যতত্ত্ব যে নিতান্ত আবর্জনা, সে-কথা বলা বর্বরতার পরিচায়ক।

মহামনীষী আচার্য বিনয়কুমার সরকার মার্কসবাদী সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর উদার পরমতসহিষ্ণুতার পরিচয় এইভাবে দিয়ে গেছেন :—

"মার্কস-লেনিনকে কিছু দিন দুধকলা দিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। চলুক না মার্কস-লেনিনের তর্জমা-চুম্বক এক আধ যুগ। ক্ষতি কি? ভরত বিশ্বনাথের রস-বিশ্লেষণে যাদের মগজ বা হৃদয় কুঁপিত হয় না তারা মার্কস-লেনিনের রস-বিশ্লেষণে ব্যতিব্যস্ত হবে কেন? কডওয়েলের ডোজ দেড়েক কডলিভার তেল গিললে তাদের পেট গরম হবার কথা নয়।"

মার্কসবাদীদের মধ্যেও এমন সহিষ্ণু মতোভাব দেখা গেলে আমরা আনন্দের সঙ্গে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারূপে মার্কসকে বরণ ক'রে নিতাম। কিন্তু মার্কসবাদীদের বক্তব্য: একোঽহমেবাস্মি—একা আমিই থাকব।

মার্কসবাদী রাজনীতি তথা সাহিত্যাদর্শের প্রচাপে শিক্ষিতমানস বর্তমানে যে চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে চলেছে তার রহস্য বোঝা দরকার। ইহুদিপ্রভাবিত স্লাভমঙ্গোল গোষ্ঠীর জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জীবনাদর্শের যে মূলগত প্রভেদ আছে, এই প্রসঙ্গে তা একটু আলোচনা করা দরকার।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে-সাহিত্য উৎকৃষ্ট রসপ্রাণ শিল্পসৃষ্টি ব'লে সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করেছে তা হচ্ছে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে লিখিত সাহিত্য। স্লাভ ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা যে-পরিমাণে স্লাভব্যতিরিক্ত ভারত-ইউরোপীয় সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে অবগাহন করেছে, সেই পরিমাণে ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর মানসিক বিশেষত্বগুলি আত্মসাৎ করেছে। স্লাভরা ভাষার দিক থেকে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের রক্তে প্রচুর পরিমাণে তুর্ক-তাতার-মঙ্গোল শোণিত মিশে যাওয়ায় তাদের চিত্তভূমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মঙ্গোলপ্রভাব অভিব্যক্ত করে। চেঙ্গিসখানের সময় থেকে স্লাভরা মঙ্গোলমিশ্র হয়ে পড়ে। উরাল পর্বতের পশ্চিমে অন্তত তিনটি তুর্ক-তাতার-মঙ্গোল শাখার জাতি নিজেদের স্থায়ী বসতি আজ পর্যন্ত স্থাপন করে রেখেছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে তাদের জন্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রও গঠিত আছে: তাতার, চুভাশ ও বাশকির। ফলে, ভাষা ও সাহিত্যে কতক পরিমাণে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোকেদের মতো হলেও স্লাভ নরগোষ্ঠী সংখ্যায় ঢের বেশি মঙ্গোলদের প্রভাবে বহুদিন থেকে জর্জরিত হয়ে বর্তমানে ভারত-ইউরোপীয় সংস্কৃতি পরিহার ক'রে এক নিজস্ব চেতনা গঠন করেছে। স্লাভ জাতিসমূহ যে-পরিমাণে পশ্চিম ইউরোপের দ্বারা প্রভাবিত অর্থাৎ ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সেই পরিমাণে ভারত-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর অনুরূপ হয়েও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় তারা নিতান্ত মঙ্গোলপ্রভাবাধীন।

Scratch a Russian and you will find a Tartar—একজন রুশের মধ্যে একজন তাতার নিহিত আছে—এই প্রবাদটি মাত্র মুখের কথা নয়। মধ্য এশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রভাব সোভিয়েট রুশিয়ার নরগোষ্ঠীর অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট। ঐ প্রভাব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হলেও পুশ্‌কিন, লের্‌মন্তফ, গোগোল, চেকফ, তলস্তয়, তুর্গেনেফ, দস্তইএফ্‌স্কি, বুনিন প্রমুখ রুশ রোমান্টিক সাহিত্যিকদের সাধনায় প্রাক্-সোভিয়েট যুগ পর্যন্ত রুশ ভাষা ও সাহিত্যে ভারত-ইউরোপীয় প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে রুশিয়ার উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অন্তরালে পিটার দি গ্রেট ও দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের পশ্চিম ইউরোপভক্তি বহুদিন ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সক্রিয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্লাভ গোষ্ঠী পশ্চিম ইউরোপ ও আর্য সংস্কৃতির প্রভাব অগ্রাহ্য করে। তুর্ক-তাতার-মঙ্গোল প্রভাবের মারফতে কিছু সেমীয় প্রভাব রুশচিত্তে প্রবেশ করে থাকবে; রুশরা ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে ধর্মক্ষেত্রে গোঁড়া গ্রীক ধর্মযাজকদের প্রবর্তিত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হত, ঐ গ্রীক

অর্থোডক্স্‌ চার্চও সেমীয় প্রভাবের আর এক উৎস, কিন্তু প্লাবনের মতো সেমীয়-মানসিকতা রুশ শিক্ষিত গোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করল যাঁর রচনার দ্বারা তিনি কার্লমার্কস—জার্মানদেশবাসী এক ইহুদি যিনি ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মার্কসপ্রচারিত ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস্‌ ব্যাখ্যাত ইহুদিসুলভ অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদ রুশ জাতিকে একান্তভাবে জড়বাদী, গণতন্ত্রবিরোধী ও ঐন্দ্রিয়িক ভোগলিপ্সু করে তোলে। মার্কসের মহিমা যে রুশিয়ায় সর্বপ্রথমে স্বীকৃত হল তার কারণ কেবল রোমানফ বংশের অত্যাচার বা দারিদ্র্য নয়; তার কারণ, স্লাভ-মঙ্গোল গোষ্ঠীর শোণিত বহুদিন থেকে আপন হৃদয়ে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতের সংস্কৃতি গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। মার্কস তাঁর দর্শনের দ্বারা ঐ জাতির গোপন মর্মবাণী ব্যক্ত করেছিলেন। আর সেই জন্যেই মার্কসের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তে রুশিয়া প্রথম মার্কসবাদ গ্রহণ করে। বিসমার্ক তাঁর অদ্ভুত দূরদর্শিতার সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ বিপ্লব কোন্‌ পথে আসবে। মার্কস-এঙ্গেলসের তুলনায় লেনিন স্লাভ-মঙ্গোলমিশ্র রুশ জাতির মর্মকথা আরো ভালো করে বুঝেছিলেন। রুশিয়ায় প্রযুক্ত মার্কসবাদ তাই লেনিনের দ্বারা সংশোধিত হয়েও রুশদের দ্বারা সানন্দে স্বীকৃত ও গৃহীত। লেনিনের ক্ষেত্রে শোধনবাদের অভিযোগ তোলা হয় না এই জন্যে যে, তাঁকে বাদ দিলে বিশ্বে মার্কসবাদের দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কাব্যতত্ত্ব আলোচনার সময়ে যতই মার্কসবাদ আবৃত্তি করুক, কার্যত সেখানে বুর্জোয়া (Bourgeois) সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং স্তালিন কর্তৃক একাধিকবার স্বীকৃত হয়েছে—১৯৩৩ ও ১৯৪৫ সালে। স্তালিন বোলশেভিক সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে বারবার ভর্ৎসনা করে তাদের গ্যেটে, শেক্স্‌পিঅর প্রভৃতি যুগোত্তীর্ণ লেখকদের লেখা পড়তে বলেন। দু বারই তিনি বোলশেভিক রুশিয়ার মার্কসবাদী সাহিত্যকে "আবর্জনা" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর তিরস্কারের ভাষা পড়লে বোঝা যায়, রুশ-চেতনা এখনও ভারত-ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারে নি। সেই জন্যে আমরা পরবর্তীকালে বরিস পাস্তেরনাক ও শোলোখফ্‌—এই দুজন বিপ্লবোত্তর মার্কসপন্থী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রুশ সাহিত্যিককে পাচ্ছি। বুনিন ও বিপ্লবোত্তর কালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রুশ লেখক—কিন্তু তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না।

অদূর ভবিষ্যতে চূড়ান্তভাবে স্থির হবে, তাতারি মনোভাব ও ইহুদি মতবাদ রুশের সমাজ ও রাষ্ট্রের মতো সাহিত্যকেও গ্রাস করবে অথবা পাশ্চাত্য প্রভাব সাহিত্যের মতো রুশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে। রুশের বর্তমান সমাজবন্ধন ও রাষ্ট্রগঠন ক্রমশ পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উঠছে। আগেও সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রধানত লেনিনের অমানুষিক প্রতিভায় সম্পন্ন হয়েছিল। মার্কসবাদ পুরোপুরি বা মূলত কোন দিনই সোভিয়েট ইউনিয়নে কার্যকর হয় নি।

চৈনিক-জগৎ যে আজ কমিউনিসম্‌ গ্রহণ করেছে তারও কারণ এই যে, চীনা-চেতনায় জড়বাদ প্রবল, সে একান্ত বস্তুবাদী ও ভোগপ্রিয়। এ কথায় তাঁরা চমকে উঠবেন যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই ভুল ধারণা পোষণ করে এসেছিলেন যে, চীন হচ্ছে ভারতের মতো একটি আধ্যাত্মিক দেশ। বস্তুত এ-ধারণাও ভুল যে, ভারত একটি আধ্যাত্মিক দেশ বা জাতি। তবু ভারতে আধ্যাত্মিকতার যে ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে চীনে তাও নেই। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আর্যজাতিগুলির আত্মিক বৈশিষ্ট্য যা সেমীয় বা স্লাভ-মঙ্গোলগোষ্ঠীর চেতনায় অনুপলব্ধ। রসপিপাসু আনন্দপূজারী ভারতীয় আর্য ঔপনিষদ আধ্যাত্মিকতা এবং গ্রীক-রোমক দেবপূজা প্রবণ সৌন্দর্যতৃষ্ণাতুর অ-সেমীয় চেতনা, যাকে pagan ও heathen বলে নিন্দা করা ইহুদিদের স্বভাব, ভারত ও পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করলেও রুশ ও চীনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। কনফিউসিআস, লাওৎসে ও নানাবিধ তন্ত্রাচারপ্রিয় চৈনিক জাতিগুলির আধ্যাত্মিকতা বলতে আমরা যা বুঝি সে-বিষয়ে কোন উপলব্ধি নেই। চীনা

সভ্যতা সুপ্রাচীন বটে, কিন্তু সে আর এক জাতের সভ্যতা যা মূলত বস্তুতান্ত্রিক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "The Chinese built up one of the greatest material civilisations of the world." এই কারণে চীন ভারতের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও তাকে চৈনিক মহাযানী রূপে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল যার সঙ্গে বুদ্ধ-প্রবর্তিত মতবাদের বিশেষ কোন মিল নেই, চীনের সঙ্গে বা মঙ্গোলীয় সভ্যতার সঙ্গে তাই ভারতের হৃদয়ের যোগ নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—"য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো একমহাল নয়। তার একটি অন্তর-মহল আছে। পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অন্তরের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও যদি মিল না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে।"

দুঃখের বিষয়, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে ইউরোপীয় হেলেনিক সভ্যতার সগোত্র আর বর্তমান সভ্যতা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আপন জন, সে-কথা ভুলে গিয়ে আমরা আজ রুশ ও চীনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমাদের তথাকথিত মননশীল বা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সমাজের চিত্তদৌর্বল্যের সুযোগে তরুণ ছাত্রবৃন্দ তোতাপাখির মতো "সাংহাই-এর পথ আমাদের পথ," "মাও-সে-তুং লাল সেলাম" ইত্যাদি বুলি চিন্তাশক্তিবিহীনভাবে আবৃত্তি করে যাচ্ছে। অধ্যয়নতপস্যাবিবর্জিত এই সব ছাত্রের মধ্যে বেশভূষা ও দাড়ি রাখার অনুকরণের দিক থেকে সর্বদাই দু একজন লেনিন, হো-চি-মিন ও ফিদেল কাস্ত্রোর দেখা পাওয়া যাবে। "কডওয়েলের কড্‌লিভার অয়েল" এদের মানসিক কাথার্‌সিস ঘটাতে পারে নি। তার জন্যে সংশয়দোলায় দোদুল্যমান বাঙালি মস্তিষ্কজীবীদের মতিস্থিরতার অভাব অনেকটা দায়ী। শশিভূষণ স্বীকার করেছিলেন, "আমরা নিজেরা হয়তো মার্কসধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, অন্তর্যামীকে এখনও দীক্ষিত করিতে পারি নাই। এতদিন আমরা জানিতাম, মুক্তি—স্বাধীনতাই শিল্পের প্রাণ।" এখন অন্য রকম জানার কারণ কোন মার্কসবাদী সমালোচক আমাদের বোঝাতে পারেন নি।

চৈতন্য-নিরপেক্ষ জড়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও মার্কসবাদিগণের মতবাদ যাঁরা মেনে নেন, তাঁরা শোচনীয় অজ্ঞতার পরিচয় দেন। বটকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছিলেন :—

"সর্বত্র বাহ্য পরিবেশ নিরপেক্ষ অন্তঃপ্রবৃত্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বই চোখে পড়ে।"

মার্কস, প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষীর মতামতের সঙ্গে বিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতামত মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, মার্কসের মতবাদ বৈজ্ঞানিকভিত্তিবিবর্জিত। Aeschylus-এর নাটক প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা হওয়া সত্ত্বেও সেদিনের এথেন্সের সঙ্গে আজকের কলকাতার সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও ঐ নাটক আমাদের ভালো লাগে। ফিউডাল ষোড়শ শতকীয় ইংল্যাণ্ডের শেক্‌স্‌পিয়রীয় নাটক সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিংশ শতকীয় জনগণ কেন পছন্দ করে, তার কোন মার্কসবাদী বিশ্লেষণ হয় না। আসলে অন্নচিন্তাপ্রপীড়িত, দুর্ভাগ্যের তাড়নায় ব্যথাহত ইহুদিজাতীয় মার্কসের ব্যক্তিমনে কোন সূক্ষ্ম চিন্তা বা সৌকুমার্যের উপলব্ধি প্রবেশ করতে পারে নি। সেমীয় না হলে অর্থকষ্টে উন্মত্ত হয়ে এভাবে জড়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ করা সম্ভবপর হত না। একই রকম দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও ভল্‌তের ও শোপেন-হাউআর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জীবনদর্শন প্রচার করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্র থেকে মার্কসবাদ বহিষ্কৃত করা আবশ্যক, এই সত্যটা বুঝতে হবে। পুরাতন অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতবাদের ওপর ভিত্তি স্থাপন করে গঠিত যে-মার্কসবাদ, তা অশ্রদ্ধেয় এই জন্যে যে, তার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ অতি দুর্বল, অর্থনীতিক্ষেত্রে তার মূল্য আছে; কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে তার প্রবেশ অনধিকারচর্চা। এ-ব্যাপারে দুজন বাঙালি আলঙ্কারিকের মত উল্লেখযোগ্য; সুধীরকুমার দাশগুপ্তের মতে, "আর্টকে যদি একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক বা সামাজিক মতবাদের অচ্ছেদ্য লৌহনিগড়ে শৃঙ্খলিত করা হয়, তবে তাহা হইবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভীষণতম দুর্দিন।" নলিনীকান্ত গুপ্তের মতে, "বোলশেভিকির আদর্শ উচ্চতা হিসাবে যে খাটো শুধু তাহা নয়, পরিসর হিসাবেও আবার সংকীর্ণ।" সুতরাং বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিটনিকদের কবল থেকে তেমনি মার্কসবাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্যে কঠোর আত্মসমালোচনা এবং অতীতের দিকে সিংহাবলোকন বাঙালি সাহিত্য সমালোচকের অবশ্য কর্তব্য।

মাশুল

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

এ তুমি কি করলে সুমিতা? একবারও তলিয়ে দেখলে না? বর্ত্তমান ছাড়া আর কোন কিছুরই তুমি মূল্য দিলে না!

তোমার জীবন তোমাকে নিয়ে শেষ হলে সমালোচনার প্রয়োজন হ'ত না। ভুল ভ্রান্তি ভাল মন্দর সেখানেই সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু তোমার ঐ ফুলের মত সুন্দর নিরপরাধ সন্তানকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে কি দিয়ে যাবে?

তুমি ত নির্ব্বোধ নও—তোমার বুদ্ধি বিবেচনারও অভাব ছিল না তবু কেন নিজের জীবন নিয়ে এমন মারাত্মক খেলায় মাতলে। জুয়া খেলার পরিণতির কথাটা কেন ভেবে দেখলে না। কেন চোখ বুজে একটা অবুঝ জেদকে প্রাধান্য দিলে সুমিতা?

তুমি সমাজের জরাজীর্ণ বিধি নিষেধের অনেক উর্দ্ধে বলে যতই চীৎকার কর না কেন তুমি নিজেই একে সকলের চেয়ে বড় মিথ্যা বলে জান। তর্ক ক'রে নিজেকে আর কত ছলনা ক'রবে! তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপই এ কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

নইলে সামাজিক জীবন থেকে সরে গিয়েও আবার ফিরে আসবার আগ্রহ তোমার কেন? কিন্তু, যাদের নিয়মিত মুল্য দিয়ে তুমি জাতে উঠতে চাইছ তাদের দৃষ্টি তোমার টাকার প্রতি। ওদের করুণা কোন দিন পাবে না। তোমার দেবার ক্ষমতা সীমিত তাই বাধ্য হয়েই তুমি হাত গুটিয়েছ। অলক্ষ্য আঘাতটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাড়া ক'রেছে। সেইজন্যই তোমার ছেলের মুখে তার মা বাবা সম্বন্ধে অমন অদ্ভুত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নের একটা জবাব তুমি দিয়েছ। ওটা এড়িয়ে যাবার নামান্তর। অবশ্য এছাড়া তোমার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তোমার ছেলের বয়সটাও একই স্থানে থেমে থাকবে না সুমিতা। সে একদিন বড় হবে। পরিণত বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেটি ঘটনা বিচার ক'রে দেখবে। প্রশ্ন করে কুতুহল মেটাবার প্রয়োজন হবে না। তখনকার কথা একবার কল্পনা ক'রে দেখ দেখি।

তারপর যে লোকটির উপর চোখ বুজে বিশ্বাস ক'রে একদিন তুমি সমাজ সংসার, তোমার হিতৈষী বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয় স্বজনদের অবজ্ঞাভরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে এসেছিলে সেই লোকটির বর্ত্তমান হাল চাল ঠিক আগের মত আছে কি? তোমাদের উভয়ের মনের দৃঢ়তায় ফাটল ধরেছে। দুজনের চিন্তার পথে এক সুউচ্চ প্রাচীর উঠেছে। সুশান্ত তার অতীত জীবনে ফিরে যাবার সুযোগ খুঁজছে। সুযোগ তার হাতের কাছে এসেও গেছে। এ সুযোগের অপব্যবহার ক'রবে না ব'লে সুমিতাকে সে অন্ধকারে রেখেছে। নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই খবরটা জেনে ফেলেছে সুমিতা।

আজ এই মুহূর্তে সুমিতার মনে হচ্ছে যে, সে হেরে গেছে। সব দিক দিয়েই। নিজের কাছে, সুশান্তর কাছে এমন কি তার ছেলের কাছেও।

মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। সমাজ এই মানুষ নিয়ে। তাই তুমি আজ ভয় পেয়েছ সুমিতা। সব চেয়ে বেশী ভয় পেয়েছ তোমার ছেলের অগামী দিনের কথা ভেবে-ভয় পেয়েছ নিজের দিকে চেয়ে। তোমার চোখে যার ঘোর নেই। জীবন সম্বন্ধে তুমি সচেতন হ'য়ে উঠেছ। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের চেহারা দেখতে পেয়েছ।

জীবন নিছক কল্পনা নয়। মাটির জীবন মাটির মানুষ নিয়ে। তাদেরই ভাবনা আর চিন্তায় গড়া পরিবেশ নিয়ে। সেটা বুঝেই তুমি তোমার ছেলের প্রশ্নের কোন সহজ জবাব খুঁজে পেলে না। সুশান্ত আর সুমিতা স্বামী এবং স্ত্রী একথা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারলে না। তোমাদের মধ্যের রক্তের সম্বন্ধটা পথ রোধ করে দাঁড়াল।

ভুল করেছে সুমিতা। অন্তত নিজের কাছে একথা আজ স্বীকার করছে। চতুর্দ্দিক থেকে জড়িয়ে পড়ে এমন অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করা অন্যায় হ'য়েছে। এ জীবন সে চায়নি।

সুশান্ত তার কাছে সমস্যা নয়। সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শানু। তার ছেলে। এ সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র কারুই বুঝি আছে। আকস্মিক একটা দুর্ঘটনায়......

মা—

অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল সুমিতা না না···এ কি সর্ব্বনাশা চিন্তা তোমার সুমিতা? কিসের বিনিম তুমি আবার নতুন ক'রে বাঁচতে চাইছ! যে ছেলে একটু আগে মা বলে ডাকল?

সুমিতার অন্তরাত্মা ককিয়ে উঠল, এর চেয়ে অনেক সহজ নিজে সরে যাওয়া। কিন্তু তাতেই কি শানু মন থেকে প্রশ্নটা চিরদিনের জন্য মুছে যাবে?

কতকটা বিহ্বল চোখে ছেলের মুখের পানে চেয়ে থাকে সুমিতা। সাড়া দেয় না। সাড়া দিতে পারে না তার দৃষ্টির সম্মুখে শানু যেন একটু একটু করে অনেক বড় হ'য়ে উঠেছে। তাকে ধিক্কার দিচ্ছে তাকে···

মা···

তথাপি চুপ করে আছে সুমিতা। কেমন মা সে যে মা তার আপন সন্তানকে সমাজের কাছে চিহ্নিত কে 'য়েছে। কি প্রয়োজন ছি

আবার আহ্বান, মা—

শানু ভয় পেয়ে তার মার একখানি হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, তোমার কি হ'য়েছে? আমা বুঝি খেতে দেবে না? খিদে পায়নি বুঝি আমার—

দোলা লাগে মনে। বুকের ভিতরটা তার অব্যক্ত কান্নায় গুমরে উঠে। মমতা মাখান ডাক। ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধাও যে তার কাম্য।

ওমা—ভয় পেয়ে সে মাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, কথা ব'লছ না কেন তুমি? কি হ'য়েছে তোমার?

এতক্ষণে খানিকটা আত্মস্থ হ'য়েছে সুমিতা। চেষ্টা করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, বড্ড মাথা ধরেছে শানু।

মাথা টিপে দেব মা? ব্যাগ্র হ'য়ে জিজ্ঞেস করে শানু।

আঃ। কত যে ভাল লাগছে শুনতে। কিন্তু···মনটা আমার ভবিষ্যতের মধ্যে তলিয়ে যায়। এ আগের আলোর ঝলক অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সুমিতা স্পষ্ট অনুভব ক'রছে যে, শানুও তাদের সঙ্গে

মিলিয়ে কৈফিয়ৎ তলব ক'রছে। যারা একদিন ব্যাভিচারী বলে তিরস্কার করেছে, তাদেরই পাশে দাড়িয়ে জ্বালা ভরা কণ্ঠে বলছে, তুমি আমার মা এইটেই আমার বড় লজ্জা।

মা......

আবার বর্ত্তমানে ফিরে এসেছে সুমিতা। শানু তাকে ডাকছে। তার সন্তান-সুমিতার অপরিণাম দর্শিতার প্রথম ফসল। শুভানুধ্যায়ীর দল এই কথাই ব'লছে। সুশান্তও মুখ খুলেছে। তার ভালবাসার মুখোস খসে পড়েছে। আশালীন ভাষায় অনুযোগ দিচ্ছে। সুমিতাই নাকি তার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

না সর্ব্বনাশ সে সুশান্তর করেনি—নিজের সর্ব্বনাশই করেছে। কথা কটি সে জ্বলে উঠে বলেছে। এ কথা তোমার মুখেই শোভা পায় সাধু পুরুষ।

জবাবটাও সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে সুমিতা, ভয় দেখিয়ে তুমি গলায় ফাঁস পরিয়েছ। আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েছ তুমি।

তাই বুঝি এমন শক্তি সঞ্চার করে যুদ্ধে নেমেছ? তবে জেনে রেখো আমিও নিরস্ত্র নই।

সেই দিন থেকেই দুজনার মধ্যের ব্যবধানটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

সুশান্ত সযত্নে ঘরকে পরিহার ক'রে চলেছে আর সুমিতা পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা সম্মানজনক সমাধানের পথ। যে পথ ধরে তার শানু সোজা হ'য়ে এগিয়ে যেতে পারবে। এই একটি চিন্তাই তাকে পাকে পাকে বেষ্টন করে ধরেছে।...

নিজেকে আবার ফিরে পেয়েছে সুমিতা। ছেলের মুখের পানে গভীর দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে ক্ষণপূর্ব্বের স্বার্থপর চিন্তার জন্য মনে মনে তাকে ধিক্কার দিল। আশ্চর্য্য কেমন করে কথাটা তার মনে এল।

শানু পুনরায় জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে? অমন করছ কেন তুমি?

চল তোকে খেতে দিই। কিচ্ছু হয়নি তামার।

শানু তার মার কথা বিশ্বাস ক'রতে পারেনি। তাই খেতে বসেও খাওয়ায় মন দিতে পারছে না। বারে বারে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল। অবুঝ ছেলে ও কেমন ক'রে তার মনের খবর পাবে। যদি পেত তবে কি ওর চোখে মুখে অমন সহজ সুন্দর ভাব ফুটে উঠতো?

আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে সুমিতা। এইখানেই তার সবচেয়ে বড় ভয়। আর এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই নানা সম্ভব অসম্ভব চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে।

শানু হঠাৎ খাওয়া ফেলে উঠে এসে মার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, আমার বড্ড ভয় করছে মা—

সুমিতা অন্যমনস্ক ভাবে বলে, আমারও ক'রছে শানু—

কেন মা?

একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে সুমিতা বলে তোর মা যদি মরে যায়—একদম ভুলে যেতে পারবি? একেবারে ভুলে যেতে—

শানু রাগ করে বলে, বারে তুমি মরবে কেন?

তা ত জানি না—

না তুমি মরবে না।

তুই বুঝি তোর মাকে খুব ভালবাসিস শানু?

শানু দুহাতে মাকে বেষ্টন করে ধরে। জবাব দেয় না। অনেকখানি ভালবাসা প্রকাশ ক'রবার এইটিই বুঝি ওর কাছে বড় নিদর্শন। কিন্তু এই বন্ধনটাই সুমিতাকে মুক্তির কথা ভাবতে বাধ্য করেছে। বিভিন্ন ধরণের চিন্তা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

সুশান্তর সঙ্গে তার বর্ত্তমান সম্পর্কটা এমন এক পর্য্যায়ে এসে স্থির হ'য়ে আছে যে সামান্য কারনেও একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠতে পারে। সে ঝড়ে হয়তো অনেক ধুলা উড়বে—ভাঙবেও অনেক। এমন কি সুমিতাকে একেবারে উন্মুত প্রান্তরে এসেও দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এই ঝড়ের হাত থেকে সে নিজেও আত্মরক্ষা ক'রতে চায়—শানুকেও বাঁচাতে চায়।

অনেক ভেবেছে সুমিতা। সবদিক দিয়ে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হলেও পথের সন্ধান সে পেয়েছে। সেই পথেই অগ্রসর হ'তে হবে তাকে।···

সকাল থেকেই আশ্চর্য্য রকম শান্ত হ'য়ে গেছে সুমিতা। বহুদিন পরে সুশান্তর সঙ্গেও ভাল ক'রে দু চারটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। সুশান্তকেও জবাব দিতে হ'য়েছে। ইচ্ছে থাকলেও এড়িয়ে যেতে পারে নি।

কি জবাব দিয়েছে, সুশান্ত তা নিয়েও কোন মাথা ব্যথা নেই সুমিতার। ছেলেকে আজ একটু বেশী ক'রে সাজিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছে। স্কুলে পাঠাবার আগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বার কয়েক চুমু খেয়েছে। শানু মায়ের মুখের পাশে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ একসময় স্কুলে না যাবার বায়না ধরেছিল কিন্তু, এই অসঙ্গত আবদার আমল পায়নি।

সুশান্ত যথাসময় আপিসে গেছে। শানু স্কুলে। ঝি আর চাকরকে ছুটি দিয়েছে সুমিতা। সন্ধ্যার পরে ফিরলেই চলবে। বাড়ীতে সে একলা। একলা থাকতেই চেয়েছিল। তার কাজের কোন সাক্ষী রাখতে চায় না সুমিতা

ঘুরে ঘুরে বাড়ীর প্রত্যেকটি অংশ সে দেখছে। দু চোখ ভরে দেখছে। নিজের সুখ সুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে বাড়ীখানি করিয়েছিল সুমিতা। যেখানে যে বস্তুটি থাকলে ভাল মানায় সেদিকেও তার প্রখর দৃষ্টি ছিল। প্রত্যেকখানি ঘর—তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ, দরজা জানালা, এমন কি দেওয়ালের ডিসটেম্পারের নরম সেডটি পর্য্যন্ত তারই নির্ব্বাচিত।

কিন্তু এই মুহূর্ত্তে সবই সুমিতার কাছে মূল্যহীন—অর্থহীন। ঘর বাড়ী, আসবাব পত্র দেওয়ালে ঝুলান ছবিগুলি—হাঁ। ঐ ছবিগুলিও আর ওখানে থাকবে না। সুমিতার কোন চিহ্নই আর এ বাড়ীতে সে রেখে যাবে না। শানুর মার স্থূল অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুশান্তকে সে সব দিক থেকে মুক্তি দিয়ে যাবে। শানুর জন্যই সুশান্ত মুক্তি পাবে।

ফটোর অ্যালবামটা টেনে বার ক'রতেই সর্ব্বপ্রথমে চোখে পড়ল শানুর দু বছর বয়েসের একখানি ছবি। দ্রুত হাতে ভিতর থেকে নিজের সবগুলি ফটো বার করে নিল সুমিতা। এগুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন শুধু আগুনে ফেলে দেবার অপেক্ষা।

মনে হচ্ছে প্রত্যেকটি কাজই যেমন ভেবেছে সেই ভাবেই সম্পন্ন ক'রতে পেরেছে সে। আর একটি মাত্র কাজই বাকী। সুশান্তকেও তার বলবার কিছু আছে। যে কথাগুলি অনেক চেষ্টা করেও মুখে বলা সম্ভব হয়নি। ভয় পেয়েছে। নিঃশব্দে সুমিতাকে মেনে নেবার দিন সুশান্তর কাছে শেষ হ'য়ে গেছে। ইদানিং সে

প্রতিবাদ মুখর। চিন্তার ধারা পট পরিবর্ত্তন করেছে, ভাষা সংযম হারিয়েছে। সবই হয়ত চলে যাবার প্রস্তুতি।

বিদেশে চলে যাবার সব ব্যবস্থাই পাকা ক'রে ফেলেছে সুশান্ত—একান্ত সংগোপনে। ধরা পড়ে যদিও বলেছে, কর্ম্ম জীবনে উপরে উঠবার জন্যই তাকে যেতে হবে। সময়মত অবশ্যই তাকে জানান হ'তো।

সুমিতা মনে মনে একটু হেসেছে। তবুও সুশান্তর গোপনতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে একটি কথাও সে বলেনি শুধু তার অনুভূতির সূক্ষ্ম কোষগুলি আরও বেশী সজাগ হ'য়ে উঠল। সুশান্তর বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতির মধ্যেই সুমিতা আলোর সন্ধান পেল।

এই মাত্র দুটো বাজল। শানু স্কুল থেকে ফিরে আসবে চারটের পর। আর দু ঘণ্টার মধ্যেই তাকে চলে যেতে হবে। মাত্র দুটি ঘণ্টা।

একখানি প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে বসল সুমিতা। মুখে যে কথা ব'লতে পারেনি, লিখে তা জানাতে হবে সুশান্তকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস সুমিতার অবর্ত্তমানে সে তার অনুরোধকে উপেক্ষা ক'রতে পারবে না।

লিখল,

সুশান্ত ;

তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা অনুরোধ করে যাব। আশা করি অন্তত মানবতার খাতিরেও সে অনুরোধ তুমি রাখবে।

আমাদের মধ্যে কে কতটুকু ভুল অথবা অন্যায় ক'রেছি তার চুল চেরা হিসেব আজ আর করো না। তাই বলে নিজের অপরাধটাকে আমি খাটো ক'রে ভাবতে পারছি না। সত্যিইত একজন পুরুষের শক্তি কতটুকু। তবুও বল"ব আমার উদ্দেশ্যটা আগাগোড়াই খারাপ ছিল না। আমাদের অসামাজিক কাজের কৈফিয়ৎ হিসেবে এ কথা বলছি না। আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রবার চেষ্টাও ক'রছি না। আমার যা কিছু বলা যা কিছু করা তা শানুর জন্য।

ভুল ভ্রান্তি ভাল মন্দ আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে একথা ব'লবার প্রয়োজন হ'ত না। হয়ত জোড়া তালি দিয়ে একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।

তুমি পালাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছ। তোমার গোপনতা একথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই যাও সুশান্ত। আর কোন দিন এ দেশে ফিরে এলো না। কিন্তু তোমার সঙ্গে শানুকে নিয়ে যেও। সে তার বাবার ছেলে হ'য়ে বেঁচে থাকুক। বড় হোক, সুখী হোক।

আজ বেশ কিছুদিন ধরেই আমি নিজেকে নিয়ে সমালোচনা ক'রছি, আমার প্রত্যেকটি কাজকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি। তোমাকে মিথ্যে বলব না সকলকে ক্ষমা ক'রতে পারলেও নিজেকে ক্ষমা ক'রতে পারছি'না। আমার মধ্যের সুপ্ত নীতিবোধ তাই আজ বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ ক'রে তুলেছে। জীবনের উপর এত বড় অশ্রদ্ধা নিয়ে তাই আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই সুশান্ত।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনায় সুমিতার মৃত্যু ঘটবে। অসাবধানে এ, সি, কারেন্ট স্পর্শ করার ফলেই এই মৃত্যু সুশান্ত।...

উঠে দাঁড়াল সুমিতা। দু চোখে তার জল। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে সে। নিশ্চিত মৃত্যুর পথে। তার শানুর জন্য। একটি মহামূল্য জীবনের জন্য। মহামূল্য জীবন......

গল্প

কলঙ্ক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রামগতি আস্তে আস্তে সরে বসল। এক কোণ থেকে আর এক কোণে।

অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে এখন। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হত। বিছানাপত্র নিয়ে সরে সরে বেড়াতে হত।

ঠিক জানলার ওপর ছাদের কোণ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। আগে আগে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ত। অনেক ব্যবধানে টুপ টুপ করে, তারপর ফাটলের পরিমাণ বাড়তেই জলের পরিমাণ বাড়ল।

আজকাল বৃষ্টি হলেই বেশ জল পড়ে। সারা দেয়াল শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গেছে। একেবারে এদিকে এসে বিছানার ওপর রামগতি চুপচাপ বসে থাকে।

নালিশও জানিয়েছে। বাড়ীওয়ালার কাছে নয়। তার সঙ্গে রামগতির কোন সম্পর্ক নেই। ভাড়াটে রামগতির ছেলে। সেই ভাড়ার টাকা দেয়। রসিদও তার নামে।

নালিশ করেছে স্ত্রী কমলার কাছে।

হ্যাঁগো, এভাবে থাকা যায়? একটু বৃষ্টি হলে সারা ঘরে জল দাঁড়ায়। বিছানা টেনে টেনে আমাকে বেড়াতে হয়। ঘুমাতেই পারি না।

কমলা শুনেও না শোনার ভান করেছে।

এ ঘরের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব কম। সকালে বিকালে ঝাঁট দিতে দু'বার আসে। তাও কোনরকমে কাজ শেষ করে বেরিয়ে যায়।

যখন রামগতি একেবারে মুখের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আর উত্তর না দিয়ে উপায় থাকে না।

বলে, এই ভাড়ায় কি আর বাড়ীওয়ালাকে ছাদ মেরামত করার কথা বলা যায়। আজকাল ত্রিশ টাকায় বস্তিই পাওয়া যায় না।

তাহলে—

কিন্তু রামগতি আর কথাটা শেষ করার অবকাশ পায় না।

কমলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে।

না পোষায়, অন্য ব্যবস্থা কর। পাপের ফল তো ভুগতেই হবে। সারাটা জীবন যা করেছ, বার্ধক্যে তার পাওনা গণ্ডা তো বুঝে নিতে হবে।

জোঁকের মুখে লবণের ছিটের সামিল। রামগতি কুঁকড়ে যেন ছোট হয়ে গেল। কথাটি না বলে নিঃশব্দে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সবাই এক কথা বলে। এক অভিযোগ। স্ত্রী, পুত্র, সময়ে সময়ে পড়শীরাও।

রামগতি পরিতাপ করে, এছাড়া তার আর কিই বা করবার আছে। এতো আর পেন্সিলের লেখা নয়। ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেলবে।

ললাটের লিখন। রক্তপাত করে ফেললেও এ লিখন যাবার নয়। বদলাবার নয়।

যৌবনে পাপ একটা সত্যিই করেছিল। মারাত্মক অপরাধ।

ষ্টিফেন কোম্পানীর হেড কেরানী। মাইনে ছাড়াও গুপ্তপথে উপরি রোজগার ছিল।

সতীর্থদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না। রামগতি বে-রসিক লোক। হাস্য পরিহাস কিংবা হৈ চৈ হুটোতে অচল। ছুটি হলেই সোজা বাড়ী চলে আসত। স্ত্রী আর একটি পুত্র নিয়ে সংসার। সুখের সংসার। শান্তিরও।

এই নির্মেঘ আকাশে অশান্তির লক্ষণ দেখা দিল।

পিটার সাহেব জাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পেশায় ইনস্পেক্টর। ঘুরে ঘুরে কোম্পানীর কাজ দেখাই তা কর্তব্য। সে কর্তব্য ভালভাবেই পিটার পালন করত। এই কর্তব্যপালনের ছিদ্র পথে কিছু বাড়তি উপার্জনে সম্ভাবনা ছিল। সে সুযোগ পিটার নষ্ট করেনি।

অফিসের সবাইয়ের কাছে পিটার ইনস্পেক্টর, কিন্তু রামগতির কাছে সে রাহু।

একদিন রামগতির টেবিলের সামনে এসে পিটার তিনখানা দশ টাকার নোট রেখে দিল। টেবিলের ওপর।

কিসের টাকা ?

তোমার টাকা রামগতি।

আমার টাকা ?

রামগতি অবাক।

আলবৎ। ফেয়ার লেডি দিয়েছে।

এবার রামগতি চিন্তিত হল।

রোদে রোদে ঘুরে পিটার সাহেবের মাথার গোলমাল হয়নি তো ? নাহলে ফেয়ার লেডির সঙ্গে রামগতি কি সম্পর্ক যে তাকে থোক ত্রিশ টাকা উপহার দেবে।

অনেক কসরতের পর পিটার কথা বলেছিল।

শনিবারের রেসে একটা ঘোড়ার নাম ফেয়ার লেডি। সে জিতেছে, এ তারই টাকা।

রামগতির বিস্মিতভাব গেল না।

ফেয়ার লেডি জিতেছে তো আমায় টাকা কেন ?

পাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে পিটার বসে পড়ল।

রামগতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, আরে সানিয়াল, এ টাকাটা তোমার পাওনা, কারণ তোমার নামেই আমি বাজী ধরেছিলাম।

আমার নামে ?

হাঁা, অফিসের প্রায় সবাইয়ের নামেই ধরেছিলাম, সুবিধা হয়নি। লোকসান হয়েছে। এবার তোমার নামে

ধরলাম। তুমি ব্রাহ্মিন, সাত্বিক লোক, কোন গোলমালে থাক না। তাই ভাবলাম দেখি তোমার নামে বরাত ঠুকে। ব্যস, প্রথম বারেই বাজী মাত।

আরো দু চারবার বলার পরে নোটগুলো রামগতি পকেটজাত করেছিল। শুধু পিটার নয়, অফিসের কয়েকজনও রামগতিকে আশ্বাস দিয়েছিল।

এ হকের ধন। রামগতি নিলে কোন অন্যায় হবে না।

রামগতি নিয়েছিল।

সেই শুরু। এতদিন পরে আপসোস হয়। সেই যদি শেষ হ'ত।

পরের শনিবার পিটার সাহেব রামগতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কি, আজ হবে নাকি?

কি হবে?

পিটার দুটো আঙুল দিয়ে মুদ্রার ভঙ্গী করেছিল, তারপর রামগতির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আজ খুব ভাল একটা টিপস্ আছে। সিণ্ডারেলা। কিছু লাগাবে নাকি ভেবে দেখ।

সকালের দিকে রামগতির পকেট বাড়তি কিছু টাকা এসেছিল। চোরা পথে। তা থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বের করে সে এগিয়ে দিল।

এই নাও সাহেব। জানি গচ্চা যাবে, তাও দিলাম।

পিটার নোট তিনটে মুঠোর মধ্যে নিয়ে ছুটল।

সোমবার সকালে বিচিত্র কাণ্ড।

তখনও অফিস ঠিকমত বসেনি। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ কেউ গোল হয়ে গল্প করছে, এমন সময়ে পিটারের প্রবেশ। সম্পূর্ণ নাটকীয়ভাবে।

হুররে, থ্রি চিয়ার্স ফর রামগতি।

সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল।

রামগতি সবে অফিসে পৌঁছে জল খাচ্ছিল, ব্যাপার দেখে সে হতবাক।

পিটার পকেট থেকে দশখানা দশ টাকার নোট বের করে রামগতির হাতে দিয়ে বলল, এই দেখ, দিয়েছিলে তিরিশ, ফেরত দিলাম একশো। বাকি সত্তর টাকা সিণ্ডারেলার পায়ের খুরে আমদানী হয়েছে। খাইয়ে দাও ব্রাদার।

সেদিন টিফিনের সময় রামগতি সেকশনের সবাইকে খাইয়ে দিয়েছিল।

সেই সময় পিটার প্রস্তাব করেছিল।

রামগতি ভারি পয়মন্ত। সে যদি নিজেই রেসের মাঠে যায় তাহ'লে অন্য কাউকে আর টাকা ছুঁতে হবে না। প্লেস, উইন, ডবল টোট সব রামগতির।

এই কথাগুলো তখন রামগতির কানে ইষ্টদেবতার মন্ত্রের মতন মনে হয়েছিল।

সে ঠিক করে ফেলেছিল, সামনের শনিবার বরাত ঠুকে একবার মাঠে গিয়ে দাঁড়াবে। অফিসের আর কাউকে কিছু বলবে না। শুধু সে আর পিটার জানবে।

তাই হয়েছিল।

যায় পিটারের হাত ধরে রামগতি ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হ'ল। ঘোড়ার কুলুজি, জকির রহস্য, কত ফন্দীবাজী সব শিখল একটু একটু করে।

ভিতরের রহস্য যত বেশী শিখল, তত হারতে লাগল।

কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। নেশা রক্তে বাসা বেঁধেছে।

রেসের সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক দোষও জুটল।

যেদিন হারত সেদিন দুঃখ ভোলার জন্য 'বার'-এ ঢুকত। যেদিন জিতত সেদিন আনন্দ করার জন্য ওই একই জায়গায় আশ্রয় নিত।

এ বিষয়েও পথিকৃৎ অবশ্য পিটার সাহেব।

ফলে এক বছরের মধ্যে রামগতি নামকরা মাতাল হয়ে গেল। অফিসের সতীর্থরা অতটা জানল না, জানবার অবকাশ পেল না, কিন্তু রামগতির পাড়ার লোকের কাছে সে বিখ্যাত হ'য়ে গেল।

মাঝ রাতে গান গাইতে গাইতে রামগতি ফিরত। কোন রাতে রিক্সায়, কখনও হেঁটে।

কমলা মাথা হেঁট করে বসে দরজা খুলে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম পা জড়িয়ে কেঁদেছে, আত্মহত্যা করার ভয় দেখিয়েছে, পরে খেপে গালাগাল দিয়েছে। শাপমন্যি।

রামগতি নির্বিকার। স্বভাব বদলায় নি।

ইতিমধ্যে পিটার দেহরক্ষা করেছে। সিরোসিস অফ লিবারে।

অনেকেই ভেবেছিল, এবার রামগতি ধাতস্থ হবে। রেস, মদ দুইই ছাড়বে।

কিন্তু তাদের আশাকে অলীক প্রতিপন্ন করে রামগতি ঘোড়া আর বোতল কোনটাই ছাড়ে নি।

একদিন অবস্থা চরমে উঠল।

সম্ভবত কর্তারা কিছুদিন থেকে সন্দেহ করছিল, আচমকা এসে ক্যাশ বাক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে রামগতি সহকারী ক্যাশিয়ার হয়েছিল। ডিপার্টমেন্টের টাকা তার হেফাজতে থাকত।

একেবারে আট হাজার টাকা কম।

বাস, সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল লালবাজার। জন তিনেক লাল পাগড়ী নিয়ে ইনস্পেক্টর এসে হাজির।

রামগতি জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে বলল, কিছুই বোঝা গেল না। ক্যাশ বাক্সের চাবি থাকে তার কাছে। খোলা বন্ধ সেইই করে। আর কারো ওপর যে দোষ চাপাবে তার উপায় নেই।

রামগতির হাতে হাতকড়া পড়ল।

খবর বাড়ী পৌছতে দেরী হল না। কমলা পাগলের মতন থানায় ছুটে এল। কিন্তু নারীর কান্নায় লালবাজারের ইঁট ভেজে না। ভিজলে চলে না।

পুলিশ স্পষ্ট বলল।

আমাদের কাছে কান্নাকাটি করে কোন ফল হবে না। আমাদের হাত বাঁধা। আপনি অফিসের কর্তাদের কাছে যান। তাঁরা যদি কেস উঠিয়ে নেন, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদিও এ ধরণের কেস ওঠানোর পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে।

কমলা তাই করল। রামগতির দু একজন সতীর্থর সঙ্গে বড় সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘোমটা দিয়ে।

ঠিক হল গায়ের অলঙ্কার বেচে যে দু হাজার টাকার যোগাড় করবে সেটা জমা দিতে হবে অফিসে। বাকি চার হাজার টাকা মকুব হবে, শর্ত রামগতিকে চাকরিতে রাখা হবে না।

কমলা রাজী। এর চেয়ে কঠিনতর শর্তেও কমলার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাড়ীর লোক জেলের ঘানি টানবে, এ অপমান রাখার ঠাঁই নেই। মুখ তুলে কোন দিকে কমলা চাইতে পারবে না। আত্মীয় স্বজন, পড়শী সবাইয়ের কাছে ছোট হয়ে থাকবে।

তারপর ছেলেটার কি পরিচয় হবে? চোরের ছেলে। অফিসের ক্যাশ ভেঙে বাপ জেলে গিয়েছে।

রামগতি ছাড়া পেল।

অবশ্য তখনই নয়। সব ব্যাপার চুকতে দশ দিন সময় লেগেছিল। এই দশ দিন তাকে হাজতবাস করতে হয়েছিল।

দশ দিন পরে যখন রামগতি বাড়ী ফিরল, তখন যেন সে একেবারে অন্য মানুষ।

মাথার চুল বয়সের সঙ্গে বেশ কিছু পেকেছিল, কিন্তু এই কদিনেই মাথার অর্ধেকটা সাদা হয়ে গেল। মেরুদণ্ড সবলতা হারাল। কুঁজো, শীর্ণ রামগতি বয়সের ভারে যত না হোক্, পাপের ভারে বেঁকে গেল।

চুপচাপ এক কোণে বসে থাকে। হাজার ডাকলে তবে একটা উত্তর দেয়। কমলা রীতিমত চিন্তিত হল। এতো প্রায় মাথা খারাপের লক্ষণ।

আস্তে আস্তে রামগতি সামলে উঠল।

ভেবেছিল কোন অফিসে চাকরি জুটিয়ে নেবে, কিন্তু ডালহৌসি অঞ্চলে কোথাও সুবিধা করতে পারল না। দরখাস্তর তলায় ওর নামের ওপর চোখ বুলিয়ে সবাই গম্ভীর হয়ে গেল। পাশের সহকর্মীদের সঙ্গে ফিসফাস করে কি বলাবলি করল, তারপর সোজা রামগতিকে প্রশ্ন।

আপনি তো স্টিফেন কোম্পানীতে কাজ করতেন না?

তারপর রামগতি উত্তর দেবার আগেই দুঃখ প্রকাশ করেছে, মাপ করবেন। এখন কিছু নেই।

অনেক চেষ্টার পর এক মারোয়ারীর দোকানে খাতা লেখার কাজ জুটল। উদয়াস্ত পরিশ্রম, সেই তুলনায় দক্ষিণা যৎসামান্য।

কিন্তু রামগতির উপায় ছিল না। নড়বড়ে বাড়ীর মধ্যে বাস করলে সর্বদা যেমন একটা ভয় থাকে, এই বুঝি বাড়ীটা ভেঙে পড়ল মাথায়, অনটনের সংসারের অবস্থাও ঠিক তাই। সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। যে কোন মুহূর্তে অচল হয়ে পড়তে পারে সংসার।

রামগতির আশা ছিল, নিজে তো সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, ছেলেটা যদি কোন রকমে মানুষ হতে পারে। ছেলে শুধু রামগতির ভবিষ্যতই নয়, সংসারেরও ভবিষ্যৎ।

বিধি বাদী। উষা যদি দিনের প্রতীক হয়, তবে ছেলের হালচাল, বিদ্যাশিক্ষার বহর দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, এ ছেলের সম্বন্ধে কিছু আশা করা বৃথা।

স্কুল পালিয়ে সিনেমার দরজায় ধর্ণা দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করা, শিক্ষকদের গালিগালাজ, বিবিধ অভিযোগ রামগতির কাছে এসে জমতে লাগল।

কয়েক দিন অপেক্ষা করে রামগতি একদিন ছেলেকে কড়া ধমক দিল। ফল হল বিপরীত।

ছেলে আরও উচ্ছৃঙ্খল আরো বিপথগামী হয়ে উঠল।

স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছেলেকে তাদের শিক্ষায়তনে রাখতে সাহস করল না। ফলে ছেলের একটা বাঁধন টুটল। স্কুলেব বাঁধন।

কয়েকটা বছর রামগতি আর কোনদিকে চোখ ফেরাতে পারল না। দোকানে ভীষণ কাজ। সাত-সকালে দুটি মুখে দিয়ে বের হতে হয়, ফেরে যখন, তখন পাড়া নিশুতি। কোনরকমে খাওয়া সেরে ক্লান্ত দেহটা বিছানার ওপর আছড়ে ফেলে। কমলার সঙ্গেই অনেকদিন কথা বলবার সুযোগ হয় না।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, ঘরদোরের চেহারা যেন একটু পরিচ্ছন্ন! এ বাড়ীতে কোনদিন আব্রুর বালাই

ছিল না, এখন জানলায় পর্দার বাহার। কমলার রিক্ত হতশ্রী চেহারাতেও যেন একটু লাবণ্য এসেছে। পরিচ্ছদের অবস্থা ও অভিজাত্যসূচক না হোক, পরিপাটি।

কথাটা রামগতি বলেই ফেলল।

কমলা একবার রামগতির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল, বাঃ, মধু যে আজকাল রোজগার করছে।

রোজগার? স্কুল বিতাড়িত, অশিক্ষিত ছেলে রোজগার করছে?

কি করছে সে? চাকরি?

কমলা মুখ বেঁকাল, চাকরি করে ছাই হবে। ব্যবসা করছে।

কি ব্যবসা?

অত শত জানি না। ইচ্ছা হয় ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

রামগতির একবার ইচ্ছা হয়েছিল মধুকে কাছে ডাকবে। জিজ্ঞাসা করবে তার ব্যবসার কথা।

কিন্তু তার আগেই দ্বিতীয়বার বিপর্যয় নামল রামগতির জীবনে।

একদিন সকালে দোকানের কাছ বরাবর গিয়েই থেমে গেল।

দোকানঘর পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। মালিকরা ধারে কাছে কেউ নেই।

আশপাশের লোকদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে দেরী হ'ল না।

গুদামঘরে তামাকের পাতার নীচে থেকে পুলিশ বস্তা বস্তা চালের খোঁজ পেয়েছে। রাত্রেই মালিকরা খোঁজ পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হয়েছে।

বিকাল পর্যন্ত রামগতি অপেক্ষা করল। কারুর দেখা নেই। আর দুদিন পরেই মাইনে পাবার কথা। কোনদিন যে মাইনে পাবে এমন আশা সুদূরপরাহত।

শ্রান্তদেহে রামগতি বাড়ী ফিরে এল।

আবার বেকারজীবনের অন্ধকার নামল তাকে ঘিরে।

কয়েকদিন পরেই কমলা সামনে এসে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার, আজকাল রোজ এত তাড়াতাড়ি যে ফিরে আসছ।

নতমুখে রামগতি শুধু বলল, চাকরি নেই।

এবার কত টাকা?

কমলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে রামগতি চমকে উঠল।

কত টাকা মানে?

আর ন্যাকা সোজো না। ভেবেছিলাম, একবার ঘা খেয়ে স্বভাব শুধরেছে। ছি, ছি, গলায় দড়ি।

তারপর থেকেই রামগতির জন্য এই কোণের আধো-অন্ধকার কামরা বরাদ্দ হয়েছে। রোদের মুখ দেখা যায় না, কিন্তু বৃষ্টির সময় জল পড়ে প্রচুর। সারারাত মাঝে মাঝে বসে কাটাতে হয়।

বড়ঘরটা মধু নিয়েছে। ব্যবসার খাটুনি আছে, মেধার কারসাজি, তাই তার বিশ্রামের জন্য বাড়ীর সেরা ঘরের প্রয়োজন।

বাড়ীর অন্য ঘরগুলোর সঙ্গে যেমন, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গেও যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু খাবার দেবার সময় কমলা এসে দাঁড়াত। ছেলের সঙ্গে রামগতির দেখাই হত না।

ক্রমে ক্রমে কমলাও আসা বন্ধ করল। ঝিয়ের হাতেই দুবেলার খাবার আসত। সংসার সম্বন্ধে কোন খবর কেউ রামগতিকে দিত না, কারণ সংসারে সে যে অপ্রয়োজনীয় এটা বুঝতে কারো বাকি ছিল না।

রামগতি একান্তে নির্বাসিত হলেও এইটুকু বুঝেছিল, যে সংসার চলছে। তার রোজগার ছাড়াও টাকার গতি স্তব্ধ হয় নি। বরং বোধ হয় একটু ভালই চলছে। কারণ কমলার চেহারা, সাজপোশাক অস্বচ্ছলতার প্রতীক নয়। ছেলে মধু ঝকঝকে মোটর সাইকেল কিনেছে।

একবার কমলার সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে রামগতি জিজ্ঞাসাই করে ফেলেছিল, কিসের ব্যবসা গো মধুর? তোমাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন ভালই আছ।

কমলার মুখে কালবোশেখীর মেঘের ছায়া। দুচোখে বিদ্যুতের ঝিলিক।

কেন, সে খোঁজে তোমার দরকার কি? ছেলের ব্যবসার সর্বনাশ করার ইচ্ছা? খবরদার বলছি, ওদিকে একেবারে নজর দিও না। বাছা আমার উদয়াস্ত খেটে ব্যবসাটা একটু দাঁড় করিয়েছে।

কমলা দাঁড়ায় নি। রামগতির সামনে থেকে সরে গেছে। এমনভাবে সরে গেছে, যেন রামগতিকে ঘিরে একটা পাপের বলয়, তার সান্নিধ্যে সর্বনাশের ছায়া।

রামগতি আর কোনদিন কিছু বলে নি।

জানলার গরাদে মাথা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখেছে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে টেম্পো আর রিক্সা এসে বাড়ীর পিছনের দরজায় দাঁড়ায়। মধুর গলা শোনা যায়। সেই সঙ্গে আরো অনেকজনের কণ্ঠ।

একসময়ে রিক্সা আর টেম্পো ফিরে যায়।

কিছু বুঝতে পারে না রামগতি। ছেলে ব্যবসা করছে। ব্যবসায় উন্নতি করছে, এতো খুব আনন্দের কথা, কিন্তু তার জন্য রামগতির সঙ্গে এ লুকোচুরির কি অর্থ।

মার মতন মধুও কি মনে করে বাপ তার ব্যবসার সর্বনাশ করবে। ছেলের অনুপস্থিতির সুযোগে একদিন সব টাকা কুক্ষিগত করবে, যা তার বাপের স্বভাব।

কিংবা এমনও হতে পারে, মধু হয়তো মনে করে রামগতি অপয়া, রামগতির চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ। রামগতি যা কিছু স্পর্শ করবে, তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বেশ তাই হোক। রামগতির কৌতূহল নিরসনের কোন প্রয়োজন নেই। তার অমঙ্গল আওতা থেকে গিয়ে যদি ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ধনে মানে বরণীয়, তাহলে এটুকু ত্যাগস্বীকার রামগতি অনায়াসেই করতে পারবে।

নিজের নির্জীব একটা পায়ের ওপর রামগতি হাত বোলায়। এই অক্ষম পা নিয়ে তার পক্ষে চাকরি খুঁজে বেড়ানো সম্ভব নয়। শরীর যদি অপটু না হ'ত, তাহলে সে এ বাড়ীর চৌহদ্দি ছেড়ে কবে বেরিয়ে যেত। নিজে উপার্জন করে প্রমাণ করত, বাড়ীর সকলে তার সম্বন্ধে যা ভাবে, সেটা সত্য নয়।

কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন এই কুৎসা আর অপবাদ মাথা পেতে নিয়ে সবই তাকে সহ্য করতে হবে। দু-বেলা এই গ্লানির অন্নে উদর পূর্তি করতে হবে, অবহেলায় ছুঁড়ে দেওয়া পরিচ্ছদে নিজের অঙ্গ আবৃত করতেও হবে।

মাঝে মাঝে রামগতি দেয়ালে মাথা ঠোকে, যদি কপালের লিখন পালটাতে পারে, এই আশায়। চীৎকার করে উঠতে চায়, কিন্তু কণ্ঠ থেকে শুধু চাপা একটা আর্তনাদের সুর ধ্বনিত হয়। সে সুর আর কারো কানে যায় না।

হঠাৎ একদিন রামগতি সচকিত হয়ে উঠল।

তখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটে নি। ঘরের কোণে কোণে তরল অন্ধকার রয়েছে। চার-

পাশে ভারি বুটের শব্দ। গম্ভীর গলার আওয়াজ।

রামগতি কিছু বুঝতে পারল না। আস্তে আস্তে উঠে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল।

জানলার বাইরে নজর দিতেই দেখতে পেল কালো রংয়ের লম্বা একটা গাড়ী। পুলিশের গাড়ী। চনতে রামগতির কোন অসুবিধা হ'ল না।

কিন্তু পুলিশ এ বাড়ীতে কেন? পুলিশের পালা তো অনেক আগেই সাঙ্গ হয়ে গেছে। ষ্টিফেন কোম্পানীর সেই অন্ধকার দিন মিলিয়ে গেছে দিগন্তে।

তবে?

একটু পরেই কমলা এসে সামনে দাঁড়াল।

উস্কোখুস্কো চুল, বিস্রস্ত বেশবাস, দুটি চোখ করমচা-রক্তিম।

ওগো, সর্বনাশ হয়েছে?

রামগতির সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল।

কি, কি হ'ল? আবার কি সর্বনাশ হ'ল।

পুলিশ সব খানাতল্লাসী করছে।

কেন?

রামগতি দেয়ালে হেলান দিয়ে টাল সামলাল।

কি জানি, মধুর ব্যবসায় বুঝি কি গোলমাল আছে। জাল ওষুধ নাকি তৈরি করত।

অনেক কষ্টে ঢোঁক গিলে রামগতি শুধু উচ্চারণ করল।

মধু কোথায়?

বোধহয় খবর পেয়েছিল। রাত থাকতে পালিয়েছে। কিন্তু পুলিশ তো ছাড়বে না। সারা দেশ আঁচড়ে ঠিক তাকে বের করবে।

এখন উপায়?

রামগতি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে লাগল। মধু না থাকা মানে, দুবেলা দু মুঠো অন্নেরও ইতি। অক্ষম রামগতিকে একসময় শুকিয়ে মরতে হবে। তিলে তিলে।

তাই সে আবার বলল।

উপায় তো তোমার হাতে।

স্পষ্ট, সতেজ কণ্ঠ। একটু জড়তা নেই কমলার স্বরে।

আমার? আমার হাতে?

রামগতির মনে হ'ল তার অনাবৃত পিঠের ওপর যেন সজোরে চাবুকের আঘাত পড়ল।

সত্যিই তো উপায় রামগতির হাতে।

শ্লথ পায়ে রামগতি এগিয়ে গেল। বাইরের দিকের ছোট কামরার মধ্যে, যেখানে দাঁড়িয়ে জন তিনেক পুলিশ-অফিসর ঝুড়ি কয়েক শিশির লেবেল পর্যবেক্ষণ করছিল।

রামগতি ঢুকতেই সবাই মুখ তুলে দেখল।

দুটো হাত প্রসারিত করে রামগতি বলল।

নিন, হাতকড়া পরিয়ে দিন। যা বলবার থানায় গিয়ে বলব।

একজন-পুলিশ অফিসর ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

আপনি?

উজ্জ্বল দীপ্তিতে রামগতির দুটো চোখ জ্বলে উঠল। ঠোঁটের প্রান্তে হাসির রেখা।

আমি রামগতি সান্যাল। খুব পুরোনো পাপী। ষ্টিফেন কোম্পানীর ক্যাস ভেঙে ছিলাম। আপনাদের খাতায় তার রেকর্ড আছে। কোম্পানী দয়া করে জেলে পাঠায় নি। তারপর লছমীরাম আগরওয়ালার গুদামের হিসাব রাখতাম। সে গুদামে কি ছিল আমার চেয়ে আপনারাই ভাল বলতে পারবেন! দু দুবার বেঁচে সাহস বেড়ে গেল। এবার বাড়ীতে ফলাও করে জাল ওষুধের কারবার ফাঁদলাম।

কথাশেষ করে রামগতি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, অফিসারদের চমকে দিয়ে।

উপন্যাস

মূলে ভুল

পুষ্প দেবী

এরা জুতোও মারে চাঁদির। খায়ও একশো টাকার নোট। এতেও যদি টাকা না চেনা হয় তবে আর টাকা চিনবে কি করে? প্রভার মনে পড়ে একটা ঝি বলেছিল, আমার মাইনের টাকাটা দাও ত মা, ভাসুরপোকে দোব। প্রভা বলেছিল প্রতিমাসেই ত টাকা ভাসুরপোকে দিচ্ছ, তোমার ত স্বামী পুত্র নেই অসময়ে করবে কি? তাতে বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছিল সেই দাসী। বলেছিল টাকা কি কথা বলবে মা? টাকা কি চিবিয়ে খাবো—। প্রভার বড় ভালো লেগেছিল কথাটি—। সাত্বিক বাড়ীতে মানুষ প্রভা। তার বাবা বলতেন, টাকা হল' ভগবানের বিভুতি—। টাকা হল সেই জিনিষ যা দিয়ে মানুষের দুঃখ দূর করা যায়। তাঁর দানে বিরক্ত হয়ে একবার প্রভার দাদা আপত্তি করায় তিনি বলেছিলেন আমার টাকা উপার্জন যে আমার ছেলেদের জন্য একথা ভাবছো কেন? দেশের সবছেলেই আমার ছেলে, টাকা ভগবানের দান এতে সকলের সমান অধিকার—। তাঁরই শিক্ষার তলায় মানুষ প্রভা। কিন্তু গদায়ের বাড়ীর সংস্রবে এসে প্রভা দেখলে টাকাও মানুষ চিবিয়ে খায়। মনে পড়লো ছোটবেলায় পড়া সুখলতা রাও-এর গল্প আরো গল্প বই-এর কথা—। একরাজা টাকা বড় ভালোবাসতো—। তাকে সোনার থালায় হীরের ভাত মুক্তোর ডাল চুনির মিষ্টি দিলে সে খেতে পারেনি। প্রভা ভাবে সুখলতা রাও যদি প্রসন্নবাবু ভবতারিণী বিপদ তারিণীর সংস্পর্শে আসতেন কখনো এমন কথা লিখতেন না।

যাক যেকথা বলছিলুম, খোকনের খুব অসুখ। এতকষ্ট বাছার যে সদাশিববাবুর যে কী দূর্গতি হচ্ছে তা ভাবারও অবসর হলনা প্রভার। ঠিকে ঝি নিশ্চয় এসে ঘুরে যাচ্ছে কারণ তখন তো টিউসানি করতে যান সদাশিববাবু। খোকনের অন্নপ্রাশনের জের মেটেনি। তারপর সুস্থ মানুষতো নন্ যে ভাতে-ভাত রেঁধে খাবেন? বা হোটেলে খাবেন? শরীরটি বহুরোগের আশ্রয়ভূমি। না চিনি না নুন দিয়ে কেইবা রুগীর পথ্য করে দেবে? ছেলে শান্ত হয়ে ঘুমুলেই মনে নানা চিন্তার উদয়। রাত্রে বাড়ীতে একা থাকেন, যদি রাতে শরীর খারাপ হয়? কিন্তু নিরুপায় প্রভা এরকম কঠিন রুগী ফেলে যাবেন কি করে? আশ্চর্য্য এদের বাড়ী, শিশু নারায়ণের প্রতি বিন্দুমাত্র সময় দেবার অবসর প্রসন্নবাবু বা ভবতারিণীর নেই। যাক ভগবান মুখতুলে চাইলেন। খোকন আস্তে আস্তে সেরে উঠলো অনুর হাসিভরা মুখ দেখে খোকনের জীর্ণমুখে দিদিমা ডাক শুনে বাড়ী ফিরে এলো প্রভা ষোলদিন পরে। কিন্তু শান্তি নিয়ে নয় মনে অশান্তির সমুদ্র নিয়ে। এই ষোলদিন কুটুমবাড়ীতে থাকার ফলে বাড়ীর এমন সব দৃশ্য দেখে এসেছে যা প্রভাতো বটেই সদাশিব-বাবুকেও চিন্তিত করে তুললো—। প্রথমতঃ চন্দ্রমোহনবাবু আর তাঁর স্ত্রী রাতে অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় যেসব

ভাষা ব্যবহার করেন, খোকন বড় হলে ত সেসব কথা যত্রতত্র বলে ফেলবে। তারো ওপর আছেন চন্দ্রমোহনবাবুর শ্যালক—। তিনি শুধু মদ্যপই নন, অবিবাহিত। তাঁকে রাতে সামলাবে কে? ভয়ে প্রভাই কাঁপতেন আর অনুর কি অবস্থা হয় ভেবে প্রভার চিন্তার সীমা থাকেনা। যাই হোক অন্নপ্রাশনের পরই বাড়ীতে, পানবসন্তর প্রাদুর্ভাব ঘটলো। অনু গোপনে জানালো, মা যেমন ক'রে হোক খোকনকে নিয়ে যাও। ঐ রোগা ছেলে পানবসন্ত হলে আর বাঁচাতে পারবনা।

কিন্তু এতো আর নিরুপমার শ্বশুরবাড়ী নয়। অসুখ হলেই তারা খবর দেবে প্রভাকে—। তারপর প্রভার যা মনে ভালো হয় তাই করবেন প্রভার অগাধ স্বাধীনতা সেখানে। নিরুপমার বিয়ের পর একবার হাম হয়। এগারো বছরের মেয়ে। একশো তিন জ্বর হতেই পেট্রোল পুড়িয়ে গোঁদলপাড়া থেকে বিরাট গাড়ী এলো প্রভাকে নিতে। প্রভা গিয়ে দেখে শুধু সেমিজ পরে শুয়ে আছে মেয়ে, শাশুড়ীর দুটি হাতের আর বিরাম নেই। তবুও প্রভার শাশুড়ী প্রভাকে ছাড়েননি বলেছিলেন। মায়ের বাছা বায়ে বর্তায়। তোমায় থাকতে হবেই ভাই। জ্বরটা কমের দিকে না গেলে তুমি যেতে পারবেনা। শুধু প্রভা নয়, সদাশিববাবু শিশুবেনু সবাই ছিলেন। নিরুপমার দিদিশাশুড়ী ছোটখাট্ট মানুষটি নিভাঁজ ভালোমানুষ—। প্রথম যখন নিরুপমার বাড়ীতে যান প্রভা তখনও নিরুপমার বিয়ে হয়নি। পাত্র পড়ার ঘরে পড়ছিল। সেই-ই সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। তখন ঐ মানুষটি ভাঁড়ারঘরে বসে কিসমিস বাছছিলেন। বললেন এসো মা এসো, দেখোনা গেরস্থর বাড়ীতে ছেলের বিয়ে আমি ত কোন কাজে লাগবো না তাই চারটি কিসমিস বেছে দিচ্ছি। মানুষটির নাম রাজনন্দিনী ছিল। সত্যিসত্যিই রাজনন্দিনীর মত দিল ছিল তাঁর। দান আর দান। দানেই ডুবেছিলেন সারাজীবন কিন্তু সে দানে অহঙ্কারের স্পর্শ ছিলো না। কখনও শীতকালে গিয়ে দেখেছে, ঘর ভরা থাক থাক কম্বল নিয়ে বসে আছেন, গরীবদের দেবেন। বর্ষাকালে রাজত্বের ছাতা—।

কখনো বা একাদশীর দিনে গিয়ে দেখেছে প্রভা, পরদিন দ্বাদশীর পারন করতে গাঁশুদ্ধ যে বিধবারা আসবেন তাদের জলখাবারের আয়োজন করছেন। কিম্বদন্তী আছে—ভদ্রমহিলা নিজের ভাঁড়ার থেকে কোটা তরকারী চুরি করতেন। তারজন্য রোজ পাঁচটাকা করে তরকারির বাজার করার টাকা বরাদ্দ ছিল দপ্তরে। সেটা চেয়ে নিয়ে রাজনন্দিনী দান করতেন। আর শেষ রাতে উঠে ভাঁড়ারঘরে কোটা বিরাট তরকারির থালা থেকে দুটুকরো আলু, চারটুকরো কাঁচকলা, আর দুটুকরো কাঁচা পেপে, একটুকরো বেগুন চুরি করে নিজের রান্না সারতেন। এর জন্য ঝি থেকে দারোয়ান অবধি হেসে সারা হত। প্রথম যখন নিরুপমার শ্বশুরবাড়ী গেছেন প্রভা, মার্বেল পাথরের ঘরে রূপোর বাসনে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি সাজিয়ে খেতে দিয়ে, অদূরে মলিনবসনা বৃদ্ধা স্নেহবিগলিত মুখ নিয়ে এসে বসতেন। বলতেন "মা আমার একদিনে দুটি সন্তান কলেরায় মারা গেছে। জোর করে খেতে বলার আমার ভরসা নেই। অনেক দূর থেকে তোমরা এসেছ, এও তোমার মার বাড়ী ক্ষিধে নিয়ে যেন ফিরে যেওনা—। এই হল নিরুপমার শ্বশুরের মা—।

আবার নিরুপমার শাশুড়ীর মার ছবিও অনুরূপ। প্রথম যখন এই বিয়ের জন্য তাঁর কাছে প্রভা গিছলো তিনি তখন বাতে শয্যাশায়ী—। বৃদ্ধা প্রকাণ্ড রাজপুরীতে একা—। লোকজন সবি মোতায়েন। নেই শুধু আপন জন। বারে বারে আক্ষেপ করলেন "তোমরা এলে মা কত আদরের সামগ্রী কিন্তু না আছে হাত পা না আছে আপনার কেউ। কি করে তোমাদের যত্ন আত্তি করি? মমতাময়ী প্রভার মন বিচলিত হয়। বলে বলুন কি কোরতে হবে আমিই করছি। একমেয়ে না হয় শ্বশুরবাড়ী আছে আর এক মেয়ে ত এসেছে? তাঁরি আলমারী খুলে রূপোর বাসন বের করে তাঁরি ভাঁড়ারে ঢুকে ভাঁড়ার দিয়ে পোলাও মাংস

চপ কাটলেট রাঁধিয়ে খেয়ে প্রভা বাড়ী ফিরেছিল। শুধু সদাশিববাবু সদরে বসে খেয়েছিলেন। খুশী হয়ে বড় জামায়ের দিদিমা বলেছিলেন এমন না হলে কুটুম? এ আমার প্রতিমার বদল বাঁশী। অর্থাৎ মেয়ের প্রতিনিধি বা প্রতীক। আর একবারের তত্ত্বের কথা মনে পড়ে—। সে তত্ত্বে নাকি মাছ দেওয়া নিয়ম। কিন্তু প্রভা মাছ পাঠাননি। পাড়ার লোক সে কথা বলতেই ধর্মপরায়ণা রাজনন্দিনী বাধ্য হয়ে অসত্য ভাষণ করেছিলেন। বলেছিলেন, মাছের টাকা ত নাতবৌয়ের মা আমায় দিয়ে গেছে। জানে ত আমার শুচীবাই পাছে ছোঁয়া যায় এই ভয়ে মাছ পাঠাতে পারেনি। অহা বেচারি আমার জন্য বাছার অপকলঙ্ক। প্রথম বছর পুজোর তত্ত্বর সময় বড় জামায়ের দিদিমা প্রভাকে একগোছা থান গরদ দিয়ে বলেছিলেন, আমার আলমারীতে পচছে কাপড়গুলো তত্ত্বে সাজিয়ে দিস, আমার জামায়ের টাকা বাঁচবে। এই স্নেহের অগাধ প্রশ্রয়ে কুটুমবাড়ী সম্বন্ধে কোন আতঙ্কই উদয় হয়নি প্রভা আর সদাশিববাবুর মনে—। বড় জামাইও ঠিক তেমনি। যাদের বাড়ীর রান্নামহল আলাদা। বাড়ীতে যাদের বারোমাস মাইনেকরা ভিয়েনের বামুন হালুইকর বামুন। তার মনে কম্‌প্লেকসের বালাই নেই। প্রথম যখন মনোগ্রাম করা তকমা-আঁটা তার সঙ্গে খানসামা এসেছিল বড় বিব্রত বোধ করেছিল প্রভা—। কুটুমবাড়ীর লোকের সামনে চট করে দুগিরে হলুদ বেটে নেওয়া দুটো বাসন ধুয়ে নেওয়া কঠিন ব্যাপার কিন্তু তাদের মত গৃহস্থ-ঘরে এটা নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঠিকে ঝি সম্বল যাদের। তাই সসঙ্কোচে জামাইকে বলেছিল প্রভা তুমিত আমার পেটের ছেলে, এ বাড়ীর ছেলেই তুমি শুধু শুধু ও বেচারাকে আর এনোনা। শ্বাশুড়ীর ইঙ্গিত জামাই বুঝেছিল কিনা জানিনা তবে গুরুজনের নির্দেশ বিনাদ্বিধায় মেনে নেওয়া স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়ে সে আর খানসামা আনতো না।

রান্নাঘরে প্রভা রাঁধতে বসলে সেখানে এসে দাঁড়াতো। বলতো কী কী রান্না হচ্ছে মা? কখন বলতো ডাল দিয়েছেন ভাজা করেন নি খাবো কি দিয়ে? আবার বলতো শুকতো করছেন আবার ঝোল কেন? আর একদিনের কথা মনে পড়ে প্রভার সকালে নিরুপমার বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসেছে রথের—।

খোদ ঝি অর্থাৎ খোদ গিন্নির ঝি একটা গিনি নিরুপমার হাতে দিয়ে বলেছিল, এই নাও বৌরাণী তোমার রথ দেখানি। প্রভা রান্না করছিল জামাই গিয়ে বললো, মা আমার রথ দেখানি কই? আঁচল খুলে প্রভা বাজার ফেরৎ একটা আধুলি জামায়ের হাতে দেন। নিরুপমা বলে তুমি হেরে গেলে আমার গিনি আর তোমার আধুলি—। জামাই বলে যাও যাও, ভারি বুদ্ধি তোমার ঝিয়ের হাতের গিনি নিয়ে আহ্লাদে আটখানা, আমার এটা যার হাতে করে দেওয়া আধুলি জানো?

যাক্ যেকথা হচ্ছিল, কোন রকমে নানা ছুতো করে খোকনকে তো আনলো প্রভা, এধারে হবি ত হ মনুরই হল পানবসন্ত—। অদ্ভুত সেকেলে বাড়ী এই মাইসিন আর পেনিসিলিনের যুগে মেয়েটা শীতলামার রণামৃত খেয়ে পড়ে রইল। চিরদিনের শান্ত স্বভাব সদাশিববাবু বারে বারে বলেন, এযে তোমার কী মায়া াতির ওপর বুঝি না। নিজের পেটের মেয়ে অ-সেবা অ-চিকিৎসায় পড়ে রইল। তুমি সারারাত ঐ নাতি কে করে বসে আছ।

সদাশিববাবু রোজ মেয়েকে দেখতে যেতেন। আর ফিরে নানা স্বগতোক্তি করতেন। বলতেন, কত কথা ভবে যাই গদাইকে বলবো বলে তা একবারও তার দেখা পাই না। অনুকে বললে, অনু বলে জানোত বাবা মার জামায়ের যা অসুখে ভয় তাই এধার-পাশ মাড়ায় না। জ্বরে বেহুস হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। শেষে না কভে পেরে একটা ঝিকে মোটা টাকা কবলে সদাশিববাবু দিয়ে গেলেন। জীবনে এই প্রথম প্রভা সদাশিববাবুর ছ থেকে ভর্ৎসনা পেলেন, সব বাড়াবাড়ি তোমার নিজের মেয়ের চেয়ে নাতি তোমার বড় হল! দেখবো ঐ নাতি

কত করে তোমার। অবুঝ প্রভা তবুও বোঝেন না বলেন, জানো না ত কত কষ্টে সারিয়ে তুলেছি। এখন মা জ্ঞানহারা কত খোয়ার হত বাছার আমার। সদাশিববাবু বলেন সেই ভালো বাছাকে নিয়েই থাকো। যাঁরা সদাশিববাবুকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন তাঁরাই জানেন এই বলাটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। বেয়ানকে অনেক বলে-কয়ে মেয়েকে আনার চেষ্টা করেছিলেন সদাশিববাবু কিন্তু কার্য্যটি ফলকারক হয়নি। অঘোর অচৈতন্য অনুর শিয়রে লুচির গোছা আর সন্দেশ দেখে ফিরে আসতে হত তাঁকে। ফল দেওয়া চলবে না—ঠাণ্ডা লেগে সন্নিপাত হতে কতক্ষণ। তারপর মা শেতলাকে তো আর ভাত দেওয়া যাবে না। ঘরে শুদ্দুর ঝি রয়েছে। পাইখানার চালির ওপর একটা আতুড়ের শতছিন্ন ততোধিক অপরিষ্কার বিছানা তোলা ছিল সেইটে পেতে দেওয়া হয়েছে অনুর জন্যে। দেখে দেখে সদাশিববাবুর চোখ ফেটে জল আসে। প্রসন্নবাবু প্রসন্ন হেসেই বলেছিলেন, অসুখ হলে বাপের বাড়ী পাঠানো আমাদের রেয়াজ নেই মশাই। আমাদের দায় আমরাই বইব। দেখছেন তো লুচি সন্দেশের বহর রোগ হলে অযত্ন হবার যো নেই আমার বাড়ীতে, গাঙ্গুলিবাড়ীর আচার-আচরণ আলাদা। এধারে খোকনকে নিয়ে প্রভা বিব্রত সারাদিন ঘোড়ার গাড়ী করে তাকে পার্কের চার পাশে ঘোরাতে হচ্ছে, নামালেই সে শেন্নাগাগ্নী কই শেন্নাগাগ্নী কই বলে বায়না কচ্ছে। প্রভার মতে মাছাড়া ছেলে এটুকু বায়না তো করবেই। এ মেনে নিতেই হবে। নাতিকে ভোলাতে ট্রাই-সাইকেল কিনে দিলেন প্রভা। যথারীতি সদাশিববাবু তার কলিং-বেল আনতে ভুলে গেলেন। রাস্তায় যে কেউ হর্ণ বাজালেই বলে আমার টিং টিং কই? সদাশিববাবুরও দোষ দেওয়া যায় না, মেয়েটা রইল অসুখে পড়ে আর প্রভার নানা বায়না নাতির জন্যে। এই প্রথম মনে হল সদাশিববাবুর প্রভা যেন নাতিকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করছেন। এবারে গদাইও এসে নানা বিরক্তি জানিয়ে যায় ছেলেকে রাখার জন্য, কৃতজ্ঞ তো নয়ই। উপরন্তু বলে আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটা জঘন্য হচ্ছে যাচ্ছে তাই।

এর মধ্যে সদাশিববাবুকে রোজ প্রসন্নবাবুর কাছে পরীক্ষা দিতে হয়। চিরকালই পরীক্ষায় সদাশিববাবুর রেজাল্ট ভালোই ছিল। কিন্তু এ পরীক্ষা রোজকার বাজারের পরীক্ষা। রোজ অনুকে দেখতে গেলেই প্রসন্নবাবু বলেন, আর মশাই পটলের যা দর পটোল তো আর খাওয়া চলে না। বলতে পারেন না সদাশিববাবু যে আপনার বাড়ী মেয়ে দিয়ে প্রায়তো পটল তোলার সামিলই হয়েছি। আবার খেয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়ানো কেন? বিব্রত হয়ে বলেন ঝিঙ্গে খেলেই হয় বা ঢ্যাঁড়োশ। বিরক্ত হয়ে প্রসন্নবাবু বলেন কিছুরই খোঁজ রাখেন না মশাই, আজকালকার মতো বাবু সব—। বাজার যান না বুঝি? বাজার সত্যিই যান না সদাশিববাবু কিন্তু বাজার দর যে প্রভার কাছ থেকে জেনে নেবেন তারও উপায় নেই। নাতিকে নিয়ে পাগল সে—। ঝিয়ের কাছে বাজারের হিসেব নেবার যে তাঁর সময় আছে তা মনে হয় না। আর যদি বা তাঁর সময় থাকে সদাশিববাবুর সাহস নেই একথা বলে তাঁকে ঘাঁটাবার। এমন সময় ভবতারিণী এক গাল হেসে একটি সুসংবাদ পরিবেশন করেন। অ-বেয়াই কি খাওয়াবেন বলুন আবার আমাদের নাতি আসছে যে? কঙ্কাল-সার মেয়ের দিকে চেয়ে আতঙ্কিত হন সদাশিববাবু। শুনে প্রভা গালে হাত দিয়ে বলেন, বলো কি এখনও যে খোকনের বছর পোরেনি।

অনেক চেষ্টা করেছিলেন প্রভা অনুকে দিনকতক এনে রাখার জন্যে কিন্তু গদাই নিজেও শ্বশুরবাড়ী মাড়াবে না, অনুকেও পাঠাতে দেবে না। একি বড় জামাই? সে এমনি বোকা, হল পরীক্ষা ত সাতদিন শ্বশুরবাড়ী কাটিয়ে গেল। হল কলকাতায় নেমন্তন্ন ত অত রাতে না ফিরে শ্বশুরবাড়ী রাত কাটিয়ে গেলো। গদাইদের বাড়ীতে এ নিয়ে এ কথাও উঠেছিল যে শাশুড়ী মরলে তোর ভায়রা ভাই গলায় কাছা না দেয়। ঐ বড় জামাইকে নিয়ে সেখানে আশঙ্কার শেষ নেই। (৭৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

"হেড স্টাডি"

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"হেড স্টাডি"

শ্রীদেবীপ্রস দ য়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাত

গল্প

সীতা কেন কাঁদে

কালীপদ ঘটক

সে অনেকদিন আগের কথা। শহরের কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে সবে এসে ঢুকেছি। হাতে কোন কাজ নাই। পরীক্ষার ফল বেরুতে অন্তত মাস তিনেক দেরি। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে আপাতত গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটা খসড়া ক'রে ফেললাম। যাত্রাপার্টির আখড়া-ঘরে গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের একটা মিটিং ডেকে কাজকর্ম শুরু ক'রে দিলাম। সর্বপ্রথম নাটক নিয়েই আলোচনা শুরু হলো। এর কিছু সংস্কার ও উন্নতি-বিধান দরকার। সিদ্ধান্ত স্থির হলো সামনের মাসে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে এবার আর গ্রামের দলের যাত্রা নয়। ষ্টেজ বেঁধে থিয়েটারের অভিনয় চালু করতে হবে। যাত্রাপার্টির নাম বদলে নতুন ক'রে নাম দেওয়া হোক 'সপ্তর্ষি ক্লাব'। আর আখড়া ঘরের একটুখানি ভোল পাল্টে নাম দেওয়া হোক সপ্তর্ষি ক্লাব ভবন। গাঁয়ের বামুন পাড়া, কায়েত পাড়া, কামার পাড়া আদি ক'রে সপ্তপল্লীর সমাহার এই সপ্তর্ষি ক্লাব। এর মধ্যে ঐক্য বা সমন্বয়ের গভীর একটা ব্যঞ্জনা আছে। নামের জোরেই ক্লাবটা টিকে যেতে পারে।

প্রগতি ও নব জাগরণের যুগ এটা। অধিক আর ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার দরকার হলো না। আইডিয়াটা লুফে নিলে বেকার এবং অর্দ্ধবেকার নাট্যামোদী গ্রাম-সেবকের দল। তার মধ্যে কয়েকজন স্কুল ও কলেজের ছাত্রও আছে। আমারি সব বশংবদ সাকরেদ ও চেলা-চামুণ্ডা। একে একে পাস হয়ে গেল আরও গোটাকয়েক জরুরী প্রস্তাব। হাডুডুডুর দলটাকে ট্রেনিং দিয়ে তুলতে হবে ফুটবলের পর্য্যায়ে। দুলে পাড়ায় ছোটখাট একটা নাইট স্কুল খুলবার জন্য নতুন একটা লণ্ঠন চাই। বালিকা বিদ্যালয়ের ফুটো চালাটা বর্ষার আগেই খড় দিয়ে ছাইয়ে নিতে হবে। শিক্ষামূলক সৎসাহিত্যের প্রচারকল্পে গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগারের আশু প্রয়োজন।

সমাজ-সেবার আরো বহুবিধ ফ্যাকড়া একে একে জুড়ে দেওয়া হলো গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে। গ্রামের মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার নলিনীবাবুকে সভাপতি ক'রে প্রতিষ্ঠা হলো সপ্তর্ষি ক্লাবের। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার কতকগুলো সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই বর্তালো এসে আমার উপর। পাণ্ডাগিরিটা বরাবরই ধাতস্থ আছে। আর বয়েসটাও এমন কিছু কম হলো না। তার উপর কিনা না উঠতেই এক কান্দি। বি এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। গ্রামসমাজে এর মধ্যেই নাম উঠে গেছে কৃতবিদ্যের কোঠায়। সম্পাদকের দায়িত্বভার না নিয়ে আর উপায় আছে।

অন্যান্য কর্মসূচী আপাতত স্থগিত রেখে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো নাটককে। বৈশাখী পূর্ণিমা আসন্নপ্রায়। এর মধ্যে মঞ্চোপযোগী দু'খানা নাটক তৈরি করে ফেলতে হবে অভিনয়ের জন্য। সীতা আর সাজাহান নাটক দু'খানা পাওয়া গেল হাতের কাছেই। তাই দিয়েই শুরু করে দেওয়া গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই ভরপুর জমে উঠলো নাটকের মহলা। ক্লাবের ঘর সরগরম।

বাড়ীতে আমার জেঠাইমা মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন। আমি নাকি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়া করে বেড়াচ্ছি। হৈ-হুল্লোড়ে এতখানি না মেতে ঘরসংসারের দিকটায় আমার নাকি একটুখানি নজর দেওয়া দরকার। অবশ্য সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে অর্থকরী কোন চিন্তার এতে প্রশ্ন নাই। তার জন্য জেঠামশায় একলাই যথেষ্ট। যা হোক চালিয়ে নেবেন। জেঠাইমা শুধু চান তাঁর কন্যার জন্য অবিলম্বে একটি সোনার চাঁদ পাত্র খুঁজে আনা হোক। সে ভারটুকু আমার উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হতে চান। জেঠামশায়ের গড়িমসির জন্য তাঁর উপর হাড়ে-হাড়ে চটে আছেন তিনি। তাছাড়া আমার রুচি এবং পছন্দের উপর জেঠাইমার আস্থাটা কিছু বেশি। তালেবর শিক্ষিত ছেলে কিনা। যে পাত্র আমি পছন্দ করে আসবো -সে যে একটা কার্ত্তিক গণেশ কন্দর্প একটা কিছু না হয়ে যায় না, সে বিষয়ে জেঠাইমার দারুণ একটা ভরসা আছে। অথচ তাঁর আর তিনটি কন্যার বহু আগেই বিয়ে হয়ে গেছে নির্ভুল মহাজনী পন্থায়। জেঠামশায়ের খোদ প্রচেষ্টায়। জামাইগুলি অবশ্য আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য না হলেও, সাংসারিক অবস্থার দিক থেকে এক একটি প্রায় কুম্ভীরাবতার। যথেষ্ট সুখ সম্পদের অধিকারী তারা। এ জাতীয় শাঁসালো মক্কেলদের স্বল্পায়াসে কব্জা করতে একমাত্র ওই জেঠামশায়ই পারেন। আমি সেখানে নিতান্ত না-বালক।

তাছাড়া কিছু সাম্প্রতিক দায়িত্বের বোঝাও আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আপাতত পাত্র-পাত্রী' খোঁজাখুঁজির অবকাশ কোথায় আমার। সীতা নাটকে রামের পার্টটা রপ্ত করতেই লেগে যাবে আরো কয়েকটা দিন। তারপর কিনা সাজাহানে ঔরংজেব। জব্বর এক ইলাহি পার্ট। হাতে আর সময় কোথায়!

জেঠাইমাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—পটলির বিয়ের জন্যে এত ভাবছো কেন বলত। আসছে বছর প্রাইভেট ম্যাট্রিকটা পাস করুক আগে, তারপর না বিয়ে।

—ছাই হবে পাস করে। বয়েসটা কি দাঁড়ালো তার হিসেব রাখিস।

তা অবশ্য রাখি না। জেঠাইমার কথা শুনে একটুখানি ধাঁধায় পড়লাম। পটলির আবার বয়েস হয় নাকি! এখনো ত মাঝে মাঝে অঙ্ক কষতে বসে দু'একখানা চড়চাঁটি খায় আমার কাছ থেকে। সেই পটলির বিয়ের বয়েস হয়ে গেল নাকি। তাহলে ত এবার আর কিছু হোক কিম্বা নাই হোক চাঁটি চাঁটাগুলো অন্তত বন্ধ করতে হয়।

ভরসা দিয়ে বলে উঠলাম জেঠাইমাকে,—তাহলে ওটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। কলেজ খুললেই আমি ত আবার কলকাতায় এম-এ পড়তে যাচ্ছি। সেখান থেকে একটা পাস করা ছেলে আমি যেমন ক'রে হোক ধরে নিয়ে আসবো। দেখবে তখন পাত্র কাকে বলে। এই ক'টা দিন সবুর কর না।

জেঠাইমা কিন্তু খুশী হলেন না। বললেন,—তাহলেই হয়েছে। কোন্ কালে তুই এম-এ পড়তে যাবি, কোথায় কি তার ঠিক নাই, তার ভরসায় বসে থাকি আমি।

নাঃ—তোকে দিয়ে কিছু হবে না দেখছি।

বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন জেঠাইমা। রান্নাঘরে দাওয়ায় গিয়ে তরকারি কুটতে বসে গেলেন। আপাতত আমি একটু ছুটি পেলাম। বাইরের ঘরে নিশ্চিন্তে বসে সীতা নাটকের পাতা খুলে চোখ বুলাতে লাগলাম।

শেষ অঙ্কে রামের শেষের দিকের ডায়ালগগুলো অতিশয় মর্মস্পর্শী। এ অংশটা খুব ভালভাবে রপ্ত করা দরকার। এইখানেই নাটকের মোক্ষম একটা ক্রাইসিস্। গুন্ গুন্ করে আওড়াতে লাগলাম,—

নির্মম নিয়তি!
জীবনের পরিপূর্ণ সুখ
দেখাইয়া বিজলী ঝলকে—
আবার কাড়িয়া নিবি?
তোর চেষ্টা বিফল করিব।

একটুখানি কারুণ্যের আভাস দিয়েই দার্ঢ্যে তার পরিপূর্ণ রূপান্তর। ব্যর্থ করে দিতে হবে নিয়তির এ অপচেষ্টা। তারপরই বীররস। তারপর আবার লম্বা একটা থ্রিলিং পোজ—

রে লক্ষ্মণ,
আন্, আন্ মোর শর শরাসন,
সপ্ত সিন্ধু মথিত করিয়া,
জানকীরে ফিরায়ে আনিব।
সীতা, সীতা, সীতা, সীতা,—

সীতা বিচ্ছেদে রামচন্দ্রের উন্মত্ত অবস্থা। এইখানেই রামচরিত্রের ভূমিকায় বিশেষ একটি চরম মুহূর্ত। এটা যদি কোন রকমে উৎরে গেল, তাহলে আর দেখতে হবে না। এইখানেই বাজী মাৎ। আর তা না হলেই বিস্তারা গোল। একটুখানি এদিক ওদিক হলেই নাটক যাবে একদম ঝুলে।

—রে লক্ষ্মণ
আন্, আন্ মোর শর শরাসন,—
সপ্তসিন্ধু মথিত করিয়া—

নাঃ, মুড্ ঠিক আসছে না।

এই সময় এক কাপ চা খেয়ে মগজটা একটু সাফ ক'রে নেওয়া দরকার। জোর গলায় একটা ডাক দিলাম,—পটলি!

বাদামী রঙের মলাট দেওয়া একখানা বই হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ালো পটলি। কাঁচু-মাচু করে বললে,—আমি এখন অঙ্ক কষতে পারবো না। ইতিহাস পড়ছি আমি।

বললাম,—কিছু পড়তে হবে না। তাড়াতাড়ি এককাপ চা করে নিয়ে আয় দেখি।

পটলির যেন একটা ফাঁড়া কাটলো। অঙ্ককে ওর বড় ভয়। খুশী হয়ে বলে উঠলো,—ও তাই বলো। চা খাবে? তার চেয়ে এক কাপ দুধ খাও না, কিছুটা ভিটামিন পেটে পড়বে।

সুযোগ পেলেই সব কিছুতে একটু মাতব্বরি ফলাবার চেষ্টা করে পটলি। একটা ধমক দিয়ে বললাম,—ভাগ, তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আয়।

ছুটলো এবার পটলি। এক কাপ চা নিয়ে ফিরে এলো একটুক্ষণ পরেই। বললে,—এই নাও, ধরো।

মেয়েটা খুব চট্‌পটে। আমার খুব অনুগত। মুখে ওকে যতই আমি বকাঝকা করি না কেন, ও নইলে একটি বেলা চলে না আমার। পটলি খুব কাজের মেয়ে।

কাটলো আরো কয়েকটা দিন হৈ হৈ ক'রে। সীতা নাটক প্রস্তুত প্রায়। গ্রামের দলের অনাদি মাষ্টার যাত্রাপার্টির সখীগুলোকে দেখতে দেখতে গাধা-পিটিয়ে প্রায় ঘোড়া বানিয়ে ফেললে। যাত্রাঙ্গী ধারাধরণ পাল্‌টে আমদানি করলে খাঁটি একেবারে থিয়েটারি ঢং। গাঁয়ের পথে-ঘাটে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো বাছাই করা গানের কলি—'আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান।'

এদিকে আবার জেঠাইমা আমার হঠাৎ একদিন হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেলেন। তার জন্য চাঁদের আলো বা সেসব কিছু উপসর্গের দরকারই হলো না। ভাল একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাশের গাঁয়ের দীনু বাড়ুজ্যে মশায়, বাপের বাড়ীর সম্পর্কে জেঠাইমার এক নিঃসম্পর্কীয় দীনু কাকা, নিজে এসে এই শুভ সংবাদটি পৌঁছে দিয়ে গেছেন। সাতগাঁ বীজপুরের ডাকসাইটে চাটুজ্যেদের বাড়ী। বংশ খুব বনেদী, পাত্রও খুব উঁচু দরের।

জেঠাইমা খুশী হয়েই সংবাদটা জানালেন আমাকে। তাঁর দীনুকাকা নাকি ভরসা দিয়েছেন, পটলির বিয়ের ব্যবস্থা সেইখানেই করে দিবেন তিনি। চিন্তার কোন কারণ নাই।

চিন্তার যে কারণ নাই—তারও একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। পাত্রপক্ষের ইষ্টদেব কুলেকুঁড়ি গ্রাম নিবাসী প্রভুপাদ কালাচাঁদ গোস্বামী মহাশয় দীনু বাঁড়ুজ্যের বেয়াই। তাঁর কাছ থেকেই মূল্যবান এই সংবাদটি পাওয়া গেছে। কন্যা যদি পছন্দ হয় তাঁদের, তাহলে আর আটকাবে না কিছুই। পাত্রটি বি-এ ফেল।

মনে মনে একটু খটকা লাগলো। বললাম,—ফেল নিয়ে কি হবে জেঠাইমা। পটলির জন্যে একটা পাস করা—বি-এ কিম্বা এম-এ পাস পাত্র হলেই ভাল হতো না!

জেঠাইমা বললেন,—না হোক গে এম-এ পাস। বিষয় সম্পত্তি ঢের আছে, সাতখানা লাঙলের চাষ। পাকাবাড়ী, দালান-কোঠা। মা বাপের ওই একটি মাত্র ছেলে।

জেঠাইমা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।

চুপচাপ আমি শুনে যেতে লাগলাম। পাত্র হিসেবে ছেলেটি অবশ্য এমন কিছু মন্দ নয়। সেই সঙ্গে বি-এ টা যদি পাস করা থাকতো, তাহলে আর কথাই ছিলো না। জেঠাইমা কিন্তু খুব খুশী। বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন,—আর জানিস, ছেলেটি নাকি বাড়ী বসে ব্যবসা করে। দীনুকাকা তাঁর বেয়াইবাড়ী থেকে সব খবর নিয়ে এসেছেন। মস্ত বড় লটকনের দোকান। কলিয়ারির কোম্পানী সব একচেটে খদ্দের। টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি।

বললাম,—তাই নাকি?

জেঠাইমা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে উঠলেন,—নইলে আর বলছি কি তোকে। ওদের নাকি একটা কলিয়ারি কিনবার ইচ্ছে আছে। দীনুকাকা বলছিলেন।

বললাম,—তাহলেই সেরেছে। ওদের খাঁই খাঁকতি মেটাতে পারবে ত!

জেঠাইমা একটু হেসে বললেন,—তাহলে আর দীনুকাকাকে ধরেছি কি জন্যে। ওর বেয়াই যে ওদের কুলগুরু। ওরা সেসব ঠিক করে দেবেন। আর খুব বেশি খাঁই হলেই বা চলবে কেন বাবা, ছেলেটি ত দোজবরে।

হঠাৎ একটু ধাক্কা খেলাম। বললাম,—দোজবরে, তাহলে!

জেঠাইমা বললেন,—ছেলেমেয়ে হয়নি কিছু। মাস কয়েক হলো বৌ মারা গেছে। সংসারে শুধু মা আর বেটা। আর এই বয়েসে বিয়ে না করলেই বা ও বেচারির চলে কেমন ক'রে। বয়েস বড় জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ। দেখতে শুনতেও ছেলেটি বেশ ভাল। তাই তোর জেঠামশায় বলছিলেন—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি।

জেঠামশায় ঠিকই বলেছেন। পাত্র হিসেবে এমন কিছু মন্দ নয় ছেলেটি। পাকাবাড়ীর বাসিন্দা। তার উপর কিনা সাতলাঙলী মনসবদার। এ পাত্র সহজে কি আর হাতছাড়া করতে চাইবেন জেঠামশায়। মনে ত হয় না।

জেঠাইমা একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন,—তাহলে কি বলছিস বল তোর এতে মত আছে ত।

বললাম,—আমার আবার মতামত কি। তোমরা যেমন ভাল বুঝবে—

জেঠাইমা বললেন,—তা ত হয় না বাবা। পটলির বিয়ে বলে কথা, তুই যদি প্রাণ খুলে মত দিতে না পারিস, তাহলে ত সেখানে বিয়ে হতে পারে না।

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম, জেঠাইমার কথা শুনে। হাসিটা কিন্তু নির্জলা খাঁটি নয়। প্রসঙ্গটাকে

এড়িয়ে যাবার দুর্বল একটা অজুহাত মাত্র। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে পিঠোপিঠি মানুষ হয়েছি,—পটলি আর আমি। জেঠাইমার একই স্নেহের ছায়ায়। পটলি যে আমার কতখানি—জেঠাইমারও তা অজানা নয়। পটলির বিয়েতে আমার একটা মতামতের মূল্য আছে বইকি।

একটু হালকা ক'রে বললাম,—আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। দেখই না আগে কদ্দূর কি দাঁড়ায়। খবর-টবর নিই আগে। এতক্ষণে জেঠাইমা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই হুঁকো হাতে দীনু বাঁড়ুজ্যের পুনরাবির্ভাব। গাঁয়ের সেরা মৌতাতি আড্ডাবাজ মানুষ। তামাকখোর আর গল্পবাগীশ বলে বেশ একটু সুনাম আছে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের। বক্ বক্ ক'রে বকতে পারেন খুব। দাওয়ায় বসে বিকেল বেলা গল্প জুড়লেন জেঠামশায়ের সঙ্গে।

চা মোহনভোগ তৈরি ক'রে নিয়ে এলেন জেঠাইমা। যত্ন ক'রে খাওয়ালেন তাঁর দীনু কাকাকে। ওঁকে একটু হাতে রাখা দরকার। তাই হয়ত ঘটা ক'রে হঠাৎ আজ এই মোহনভোগের ব্যবস্থা।

ইস্তক এই গত হপ্তা পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে ওঁর আপ্যায়নের বরাদ্দ ছিলো দু'এক ছিলিম দা-কাটা তামাকের। সেই সঙ্গে কদাচিৎ এক কাপ চা। খাতিরের বহরটা আজ বেড়ে গেছে কিছু। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে জেঠাইমার দীনু কাকা যে। পুড়ে গেল এর মধ্যেই কয়েক ছিলিম তামাক।

খেলার মাঠে যেতে হবে একটিবার। নতুন একটা ফুটবল কিনে আনা হয়েছে। তালিম দিতে যেতে হবে খেলোয়াড়দের। বাড়ী থেকে বেরোতেই পাড়ার দুটো ছেলে এসে খবর দিলে ফুটবলটা নাকি 'পঙ্কার' হয়ে গেছে। পাম্প ক'রে বেশ কড়ারকমের হাওয়া ঠিকই দেওয়া হয়েছিলো। ব্লাডারের মুখটা কিন্তু ভিতর দিকে ঢুকছিলো না কিছুতেই। চাষাপাড়ার একটা ছেলে কভারের মুখটায় শাবলের ডগা দিয়ে জোর ভরতি একটা চাপ দিতেই বার্স্ট করে গেছে ব্লাডারটা।

এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। ফালতু একটা ব্লাডার ছিলো বাড়ীতে। তাড়াতাড়ি বের ক'রে নিয়ে এলাম। মাঠ থেকে ফিরে এসেই যেতে হবে ক্লাব-ঘরে। সাজাহানের রেহার্সেল চলছে। পেস গেটিং সিন-সিনারি বায়না দেওয়া হয়ে গেছে বিলকুল। ছাপতে গেছে নাটকের প্রোগ্রাম। ধর্মপূজা এসে গেল প্রায়।

সন্ধ্যা বেলা বাড়ী ফিরতেই পটলি এসে চা দিয়ে গেল। এগিয়ে এলেন জেঠাইমা। বললেন,—এদিকের ত আর দেরি করা চলে না, বাবা। দীনুকাকা বলে গেলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই ছেলের ওঁরা বিয়ে দিতে চান।

বললাম,—তাই নাকি, বৈশাখ ত প্রায় শেষ হতে চললো।

জেঠাইমা বললেন,—সেই জন্যই ত বলছি। পাত্রী ওঁরা খুঁজছেন। কালকেই একবার ওখান থেকে ফিরে আয় বাবা। দীনুকাকা সেই কথাই বলে গেলেন।

এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বললাম,—আর ক'টা দিন পরে গেলে হয় না! সামনের এই ধরম পূজোর হিড়িকটা বাদ দিয়ে।

জেঠাইমা বলে উঠলেন,—তা কেমন ক'রে হয় বাবা। দীনু কাকাকে আমি কথা দিয়ে দিলাম যে। একটা দিনের ত মামলা। পরশু দিন ত সন্ধ্যেতক ফিরে আসছিস।

কাগজের একটা টুকরো-ফালি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন জেঠাইমা। বললেন,—নাম ঠিকানা এতেই পাবি। তোর জেঠামশায় লিখে নিয়েছেন দীনুকাকার কাছ থেকে। ওঁদের সঙ্গে কথা বলে কনে দেখার দিন একটা ধার্য্য ক'রে আসবি। গরুরগাড়ীতেই যাবি ত?

—জেঠামশায়কেও রীতিমত জপিয়ে গেছেন দীনুবাঁড়ুজ্যে। এদিকের সব ঠিকঠাক। তাহলে আর না গিয়ে উপায় কি ? বললাম,—থাক, গরুর গাড়ীর দরকার নাই। সাইকেল ক'রে যাব আমি।

নিশ্চিন্ত হলেন এবার জেঠাইমা। বললেন,—পটলির ঠিকুজীর নকলটা যেন নিয়ে যেতে ভুলিস না। যদি ওঁরা দেখতে চান, দেখিয়ে দিবি ওখানেই।

তিনদিন পর নাটকের অভিনয়। হাতে লেখা পোষ্টার পর্য্যন্ত সেঁটে দেওয়া হয়েছে হাটতলার মোড়ে। গ্রামাঞ্চলে নতুন একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে সপ্তর্ষি ক্লাব। ঠিক এই সময়টায় দায়িত্বশীল হিরো বা হিরোইনদের কোন মতেই বাইরে যাওয়া চলে না। তবু কিন্তু যেতে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাল ফিরে এসেই এদিকটা আবার সামাল দিতে হবে।

গ্রাম থেকে প্রায় সাত ক্রোশ পথ। অজয় নদীর শুকনো বালি, বৈশাখের খর-রোদে বেশ খানিকটা তেতে উঠেছে। দু'হাত দিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পার হয়ে গেলাম কোনরকমে। জামুড়িয়ার বাজার পর্য্যন্ত এসে উঠে পড়লাম একটা হোটেলে। মধ্যাহ্নটা এইখানেই সেরে নেওয়া দরকার। এই অসময়ে হঠাৎ গিয়ে ভদ্রলোকদের বিব্রত করার কোন মানে হয় না। আগে থেকে একটা সংবাদ পর্য্যন্ত দিয়ে আসা হয়নি। যেটা নাকি একেবারেই রীতি এবং নীতি বিরুদ্ধ। তবু আমায় আসতে হয়েছে। পটলির যদি একটা ভাল ঘরে, ভাল বরে, বিয়ে হয়ে যায়—তার চেয়ে আর খুশির কথা আর কি হতে পারে।

হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে তৈরি হলাম ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়ার পর। পাত্র-পক্ষের ঠিকানাটা পকেট থেকে বের ক'রে আর এক দফা চোখ বুলিয়ে নিলাম।—শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়। কাশ্যপ গোত্র, দেবারিগণ, খড়দা মেলের কুলীন বংশ।

পটলির নাকি দেবগণ। দেবারিতে যোটক হতে বাধা নাই। ঠিকুজীর নকলটা আমার সঙ্গেই আছে। ইচ্ছে করলে ওঁরা দেখে নিতে পারেন।

বীজপুর আমি যাইনি কখনো। নামটা অবশ্য শোনা আছে। সাতগ্রাম কলিয়ারির কাছাকাছি। হোটেল থেকে বেরিয়ে ধরে নিলাম ডানহাতি রাণীগঞ্জের পাকা সড়কটা।

মাইল চারেক এগিয়ে যাবার পর চোখে পড়লো কলিয়ারির চিমনির ধোঁয়া। সামনে একটা গ্রাম দেখা যায়। রাস্তার ধারে পান-বিড়ির সামনের একটা গুমটির দোকান। জিজ্ঞাসা করলাম,—ওইখানের গাঁটাই কি বীজপুর ?

দোকানদার জবাব দিলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই যে ওই তালগাছের ফাঁকে চাটুজ্যে বাবুদের দো-তলার চিলেকোঠা দেখছেন, ওইটাই বীজপুর।

তাহলে ত এসেই গেলাম। দো-তলার ওই চিলেকোঠা। গাঁ চিনতে আর কোন অসুবিধা নাই। বরাবর পাকা রাস্তা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বীজপুর গ্রামে। গ্রামটা বেশী বড় নয়। ছোটখাটোই বলতে হবে। এদিক-ওদিক লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সেই চিরন্তন পল্লীগ্রামের দৃশ্য। সারবন্দী মেটেঘর, বাঁশঝাড় আর চণ্ডীতলা, পুকুর ঘাট আর বটগাছের নামাল। সর্ব্বত্রই প্রায় একই চেহারা।

সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম, দো-তলা বাড়ীটার সামনে গিয়ে। কলাপ্সিবল গেট। ভিতর দিকে ছোটখাটো একটা বাগানের মত। কয়েক ঝাড় কলাবতী ফুল ফুটে রয়েছে।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলো একটা লোক। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার বাড়ী গো ?

জবাব দিলে লোকটা,—এজ্ঞে বনবিহারী চাটুজ্যে মশায়ের। সাতগেরাম কলিয়ারির ম্যানেজার। থাকেন তিনি কুঠিতে, কোম্পানীর বাংলায়।

তাহলে একটু ভুল হয়ে গেছে। পানওয়ালা অবশ্য ঠিকই বলেছে, চ্যাটুজ্যে বাবুদের বাড়ী এটা। কোন্ চাটুজ্যে—তা অবশ্য জেনে নেওয়া হয়নি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম,—আর বেচারামবাবুর বাড়ীটা কোন্ দিকে বলতে পার?

লোকটা বললে,—বেচারাম চাটুজ্যে? ওই যে মশায়, পেছুদিকে ছেড়ে এলেন। ওই যে দেখছেন লেদাড়ে একটো জামগাছ। ওর ছামনেই বাড়ী।

জামগাছ একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বটে। কিন্তু ওদিকে ত তেমন কোন পাকাবাড়ী বা দালানকোঠা চোখে পড়লো না।

সাইকেল ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ালাম গিয়ে জামগাছটার নীচে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। রাস্তার ঠিক ও পাশে মাটির একখানা ঘর। টালি দিয়ে ছাদন করা। দাওয়ার উপর বিড়ি বাঁধছে জন চার পাঁচ লোক। ছোট্ট একটা তালপাতার চাটাইয়ের উপর খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন আমার দিকে। জোর গলায় সাড়া দিলেন নিজের থেকেই,—মহাশয়ের 'নিবাস?

এগিয়ে গেলাম বারান্দার সামনে। বললাম,—বেচারাম চাটার্জির বাড়ী খুঁজছি।

—এইটাই ত।

ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন। হাঁক দিলেন একটা পিছন দিকে তাকিয়ে,—ওরে বেচা, এই দ্যাখ্, কে খুঁজছেন তোকে।

বারান্দা উঠেই সামনে একটা দরজা। ভিতর দিকে ছোট্ট একটি দোকান। দোকান ঠিক বলা যায়না দোকানের একটা ঠাট মাত্র। সঞ্চিত মাল-মশলা বা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অতি যৎসামান্যই। সামনে একটা খদ্দের দাঁড়িয়ে। কয়লা খাদের কুলি খালাসী টালোয়ান কেউ হবে হয়ত। ছোট্ট একটা শিশির মুখে দশান দিয়ে তেল ঢালছে দোকানী। গাট্টাগোট্টা দোহারা চেহারা। গায়ের রঙ কিছু ফরসা হলেও একটু যেন তামাটে। বয়স প্রায় তেত্রিশের উর্দ্ধে।

খদ্দেরটাকে বিদেয় ক'রেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। তাকালে একবার আমার দিকে। বললে,—কাকে চান?

—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

—আজ্ঞে আমিই ত। কোত্থেকে আসছেন আপনি?

বললাম,—আম্বা সটকি থেকে। ওই যে, কুলেকুঁড়ির গোস্বামীদের কে যেন আপনাদের গুরুঠাকুর মশায়। সেখান থেকে একটা সম্বন্ধের খবর ওঁরা পাঠিয়েছিলেন।

হদিসটা এবার পেয়ে গেল বেচারাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ও হাঁ হাঁ, এইবার বুঝতে পেরেছি। আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

বারান্দা থেকে নেমে এসে তাড়াতাড়ি আমার সাইকেলখানা টেনে হিঁচড়ে তুলে ফেললে উপরে। বললে,—এই যে আসুন, বসুন এসে বৈঠকখানায়।

দোকানের ঠিক পাশেই ডান দিকে একটা কুঠুরি। ছোট্ট একটা চৌকি পাতা আছে। আসবাব বলতে টিনের একটা ফোল্ডিং চেয়ার, টুল একটা, আর খানদুই বাঁশের মোড়া।

সাইকেলটা ঢুকিয়ে দিলে বৈঠকখানার মধ্যে। চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বললে,—বসুন এই চেয়ারটায়, আমি একটা পাখা নিয়ে আসি।

পূব দিকের দরজা খুলে ঢুকে গেল ভিতর দিকে। ওদিকে একটা বারান্দা, মাথার উপর খড়ো চাল। দরজাটা পার হয়ে সেখান থেকেই একটা হাঁক দিলে বেচারাম—ও মা,—তাড়াতাড়ি একটা পাখা দে দেখি, কুটুম এসেছে।

নিয়ে এলো তালপাতার একখানা পাখা। নিজের হাতেই পাখা করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললাম, —থাক্ থাক্, দিন আমাকে পাখাটা।

বেচারাম বললে,—মুখ হাত ধোয়ার জলটা আমি নিয়ে আসি। হাওয়া খান আপনি ততক্ষণ।

একা একা হাওয়া বেশীক্ষণ খেতে হলো না। এক গাড়ু জল আর নতুন একটা আনকোরা গামছা নিয়ে ফিরে এলো বেচারাম। মুখ হাতটা ধুয়ে নিলাম একটুখানি। কাচের গ্লাসে নেবু দেওয়া সরবৎ এলো এক গ্লাস। এক ঘটী জল এনে টুলের উপর নামিয়ে দিলে বেচারাম। চৌকির উপর পেতে দিলে একখানা সতরঞ্জি, আর মোটা হাতের কাজ করা ফুল তোলা একটা বালিস।

পরিচর্য্যায় বেচারামের পটুত্ব ও তৎপরতার কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। অবাক হয়ে চেয়ে দেখবার মত। নারকেলের একটা ঝাঁটা এনে নিজের হাতেই ঘরটা একবার ঝাঁট দিয়ে দিলে। কুটোটি আর চোখে পড়বার উপায় নাই।

বেচারাম একটু সমীহ ও সলজ্জভাবে তাকালো একবার আমার দিকে। বললে,—মশায়কে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

বললাম,—কি কথা, বলুন না।

বেচারাম যেন ভরসা পেলে একটুখানি। বললে,—কন্যেটি কে হয় আপনার ?

বললাম,—আমার ভগ্নী।

বেচারামের মুখে চোখে একটু যেন খুশির আমেজ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বললে,—বেশ বেশ, তাহলে ত আপনি আমার—

—বড় কুটুম ? তা যেমন মনে করেন।

বলতে বলতে ঠেকে গিয়েছিলো বেচারাম। মুস্কিলটা নিজেই আমি আসান ক'রে দিলাম, আলংকারিক বাক্যটি তার সমাপ্ত ক'রে।

খুশী হয়ে উঠলো বেচারাম। বললে,—কাকাকে আমি ডেকে নিয়ে আসি, কথাবার্ত্তা বলুন আপনি তাঁর সঙ্গে।

বেরিয়ে গেল দোকান ঘরের দিকে।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম আমি। হঠাৎ আজ এ কোথায় এসে পড়লাম। এখানে কি সুবিধা হবে! দীনু বাঁড়ুজ্যে বলেছিলেন ছেলেটি নাকি বি-এ ফেল। এঁকে দেখে ত মনে হয়না—এঁর চৌদ্দ পুরুষে কেউ কোনদিন বি-এ ফেল করেছেন। কি যে এঁদের হালচাল, কি বা এঁদের সঙ্গতি, যার জন্যে মরিয়া হয়ে এতখানা ধাওয়া ক'রে এলাম। এইত দেখছি একখানা মাটির ঘর, টালি দিয়ে শুধু চালটুকু ছাদন করা। কে জানে—কেমন যে এর অন্দরমহলের ঠাট, আর কোথায় বা এর পাকাবাড়ী দালানকোঠা। একমাত্র দীনু বাঁড়ুজ্যেই বলতে পারেন সে কথা।

আরও দু'একটা খদ্দের বিদেয় ক'রে দোকানঘরটায় তালা দিয়ে চলে এলো বেচারাম। বিড়িবাঁধা-কারিগরগুলো একে একে উঠে গেল। শুঁটকে মত প্রৌঢ় ওই ভদ্রলোকটি, চাটাইয়ের উপর যিনি এতক্ষণ বসে বসে খবরদারি করছিলেন, তিনিই এসে মোড়ার উপর আসন গ্রহণ করলেন। গলায় একটা ঘাম-শ্যাত-শেতে আধময়লা পৈতে, ডান হাতে একটা তামার তাগা। হাঁপানির রুগী বলে মনে হলো।

বেচারাম বললে,—এই যে, ইনিই আমার কাকা। বাবার ইনি খুড়তুতো ভাই, পাশেই থাকেন। কথাবার্তা ক'ন ততক্ষণ আপনারা, আমি একটু আসছি।

বেরিয়ে গেল অন্দরের দিকে। চুপচাপ আমি বসে রইলাম আড়ষ্ট হয়ে। এঁর সঙ্গে আমি কি কথা বলবো। এঁর কাছে আমি নিতান্ত এক অর্বাচীন অপগণ্ড মাত্র। এখন দয়া ক'রে উনিই যদি শোনান কিছু।

উনিই আগে শোনালেন। বললেন,—মহাশয়ের নাম?

জবাব দিলাম ওঁর প্রশ্নের। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন,—কি করা হয় মহাশয়ের?

বললাম,—পড়াশুনো করি।

—ইস্কুলে?

—আজ্ঞে না, কলেজে।

—বেশ বেশ, খুব খুশী হলাম শুনে। আম্বা সটকি বেশ শিক্ষিত ভদ্রলোকের গ্রাম। নাম শুনেছি বটে। তা আমাদের বেচারামের দুর্ভাগ্য। লেখাপড়া ত বিশেষ কিছু এগুলো না। মাইনরটা পাস করার পর হঠাৎ একদিন বাপ গেল মারা। আর কি ক'রে হয় বলুন!

তা আর কি ক'রে হবে। মহাগুরু নিপাত হয়ে গেল যে।

চাটুজ্যে মশায় নিজেই আবার কথার একটু জের টেনে বললেন,—আবার তাও বলি মশায়, সে জন্যে এমন কিছু এসে যায় না; জমি-জমা ভাল আছে। নুন তেলের দোকানটাও টুকটাক চলে যাচ্ছে মন্দ না। বাড়ীতে আপনার ভগ্নীর যে কোনদিনই অন্নাভাব ঘটবে না, এটুকু আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

বাড়ীর ভিতর থেকে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ ভেসে আসছে। এ বাড়ীতে অন্নাভাবের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সেটা উনি না বললেও আঘ্রাণে টের পাচ্ছি।

চাটুজ্যেমশায় হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। একটু করুণ-সুরে বললেন,—জানেন কি মশায়, সবই নিজের অদৃষ্ট। বেচারামের বেশ ভাল ঘরেই আমরা বিয়ে দিয়েছিলাম। বংশ খুব বনেদী। সচ্ছল সম্ভ্রান্ত ঘর। কিন্তু ওই যে বললাম অদৃষ্ট। সুখ শান্তি ছেলের কপালে থাকলে ত।

বিপত্নীক বেচারামের দুরদৃষ্টের কথাটা শোনা আছে দীনু বাঁড়ুজ্যের কাছ থেকে। ও নিয়ে আর হা-হুতাশ ক'রে লাভ কি।

ছোট দু'খানা কাঁসার থালায় জলখাবার সাজিয়ে টুলের উপর এনে ধরে দিলে বেচারাম। খানকয়েক ঘিয়ে লুচি, আর আলুভাজা। পাথর বাটিতে একটু ক'রে আখের গুড়।

থান-পরা একটি বর্ষিয়সী মহিলা হাতখানেক ঘোমটা দিয়ে ২ গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। ইনিই বুঝি বেচারামের মা।

মাঝে মাঝে বার-ঘর থেকেই বামাকণ্ঠের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। বেশ একটু ঝাঁঝ আছে গলার।

জলখাবারের থালা একটা তুলে নিলাম। শুধু সৌজন্যের খাতিরেই নয়, ক্ষিদেও একটু পেয়েছে।

নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি মেলে নিঝুম মেরে বসে আছেন চাটুজ্যে মশায়। জলখাবারের থালাটার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই।

বেচারাম বলে উঠলো,—কই, খাও কাকা।

চাটুজ্যে মশায় জবাব দিলেন,—আমাকে আবার এসব কেনে বাবা। জানিস ত আমার অম্বলের ধাত।

মুখে শুধু বললেন কথাটা। কিন্তু কার্য্যত ভ্রাতুষ্পুত্রের এ অনুরোধটুকু উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। নিজের হাতেই ছোঁ মেরে তুলে নিলেন থালাটা। বললেন,—চা নিয়ে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল বেচারাম। ভিতর থেকে বামা কণ্ঠে ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁসি বেজে উঠলো যেন,—বলি হাঁ গা, কাপডিসটাও ভাল ক'রে ধুতে জান না। হায়রে আমার কপাল! বাড়ীর অপটু ঝি-চাকরাণী-দের গৃহকর্ম্মে তালিম দিচ্ছেন গৃহকর্ত্রী। কলাই-করা একটা থালার উপর কাপডিসগুলো চাপিয়ে চা দু'কাপ নিয়ে এলো বেচারাম। চায়ের পিয়ালা শেষ হতেই এগিয়ে দিলে সিগারেটের একটা প্যাকেট।

বললাম,—ধন্যবাদ, সিগারেট আমি খাই না।

কাকামশায় বলে উঠলেন,—তামাক, তামাক একটু চলবে নাকি। গড়গড়াও আছে বাড়ীতে।

পান তামাক সিগারেট কোনটাই আমার চলে না, সবিনয়ে নিবেদন করলাম।

কাকামশায় খুশী হলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। বেচারামের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে নিয়ে নিজেই একটি ধরালেন। বললেন,—আমি তাহলে উঠি এখন। গরু বাছুরের খড় কাটার সময় হয়ে এলো। সন্ধ্যের পর আর একটিবার বসা যাবে এক সঙ্গে। পাকাপাকি একটা কথাবার্তা কয়ে নিলেই চলবে। না কিরে বেচা!

বেচারাম জবাব দিলে,—মা ত তাই বললেন। নিজেও তিনি কথাবার্ত্তা কিছু বলতে চান এঁর সঙ্গে।

চাটুজ্যেমশায় বলে উঠলেন,—তা ত বলতেই হবে। দাবীদাওয়া দেনাপাওনার কথাও একটা আছে ত। তা মশাইরা কি জৈষ্ঠ্যমাসেই বিয়ে দিতে চান? তাহলে একটু তাড়াতাড়ি কনে দেখার ব্যবস্থা করতে হয়। না কিরে বেচা?

বেচারাম আর কি বলবে। শুধু মায়ের ইচ্ছাটাই ব্যক্ত ক'রে বললে,—মা ত তাই বলছিলেন। উনি কিন্তু আর দেরি করতে চান না।

চাটুজ্যেমশায় উঠলেন। বললেন,—ঠিক আছে, সন্ধ্যের পর হবে সে সব কথা। তবে এইটুকু ভরসা আপনাকে দিতে পারি, কন্যা যদি পছন্দ হয়—দেনা-পাওনার জন্যে আটকাবে না কিছু। সে সব আমি ঠিক ক'রে দিব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন চাটুজ্যেমশায়। বার দিকের দরজটা হুড়কো দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে বেচারাম। বললে,—আপনি তাহলে আরাম করুন একটুখানি। আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি কেওট ঘর থেকে। আপনার কোন অসুবিধা হবে না ত?

বললাম,—না—অসুবিধা আর কি, বেশ ত আছি আরামে।

অন্দরের দিকে ছোট্ট একটা চক্কর মেরে সদর দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল বেচারাম। সটান আমি শুয়ে পড়লাম চৌকির উপর, ফুলতোলা বালিশটা মাথায় দিয়ে। চোখ বুজে শুধু ভাবতে লাগলাম, এ কোথায় এসে পড়েছি। এর সবটাই যেন মনে হচ্ছে উল্টা-বুঝলি রাম। পাত্রটি ত হোপলেস, এক নম্বর ইডিয়ট। যেমন তার কথাবার্ত্তার ছিরি, তেমনি তার সব কিছু। তাহলে আর সুরাহাটা কোথায়

রাগ হতে লাগলো ভালকানা ওই বাক্যবাগীশ দীনু-বাঁড়ুজ্যের উপর। ওটাও কি একটা কম ইডিয়ট।

অন্দরে সাড়া জাগলো,—বলি শুনছো গা, খাদ যোয়ান থেকে জল এক কলসী নিয়ে আসি আমি। দেখো যেন উনুনছটো নিবে যায় না।

নতুন কুটুমের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে হবে কি না। তাই বুঝি ডবল উনুনের ব্যবস্থা।

জলকে গেলেন গৃহকর্ত্রী। মা বেটা দু'জন গেলেন দুদিকে। ভালই হলো, হাড়ে যেন বাতাস লাগলো আমার।

নিঃশব্দে পড়ে আছি চৌকির উপর। বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চোখ দুটো বুজে গেছে আমার। দু চোখ ভরা তন্দ্রার ঘোর।

চারিদিক নিস্তব্ধ। অপরাহ্নের উদাস একটা ঝিরঝিরে হাওয়া উঠানের দিক থেকে ভেসে এসে মাঝে মাঝে একটু ক'রে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। মৌন সেই নিরঙ্কুশ নৈঃশব্দের মাঝখানে কোথায় যেন মৃদু একটা সাড়া জাগলো। দরজার পাশ থেকে কে যেন একটা ডাক দিলে,—দাদা।

তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে চোখ মেলে একটু তাকালাম। দরজার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবছা এক নারীমূর্ত্তি। ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালো, ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম চৌকির উপর। বললাম,—কে আপনি!

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো মেয়েটি। কোণের দিকে দেওয়াল ঠেস দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালো আমার সামনে। পরণে একটা আধময়লা ডুরে শাড়ী। ঘোমটা একটু সরিয়ে দিলে মুখের উপর থেকে। কাঁদছে মেয়েটি। ঝর ঝর ক'রে জল ঝরছে দু'চোখ বেয়ে।

বিস্ময়ে হতবাক আমি। বুকটা যেন কেঁপে উঠলো। তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—কে আপনি?

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে মেয়েটি,—আমি এই বাড়ীর বৌ। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন এতক্ষণ—তাঁরি আমি স্ত্রী।

চমকে উঠলাম মেয়েটির কথা শুনে। বললাম,—সে কি, বেচারামবাবুর স্ত্রী আপনি! তবে যে শুনেছিলাম —

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে মেয়েটি,—ভুল শুনেছেন, মিথ্যে শুনেছেন। এরা মিথ্যে ক'রে রটিয়ে বেড়ায় আমি কি মরে গেছি। ধাপ্পা দিয়ে আর একটা বিয়ে করবার মতলব।

কি সাংঘাতিক কথা। এ যে আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি না।

ভাল ক'রে তাকালাম একবার মেয়েটির দিকে। ঈষৎ রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশপাশ। সীমন্তে ক্ষীণাঙ্ক এয়োতির চিহ্ন। সহজ সরল নিষ্কলুষ চাহনি। দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়া কুন্দ ফুলের মত ম্লান একখানি কমনীয় মুখ। চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। থর থর ক'রে কাঁপছে যেন মেয়েটি।

হতচকিত স্তম্ভিত আমি। জেগে জেগে—স্বপ্ন দেখছি না ত!

অপরিচয়ের কুণ্ঠাকে জোর ক'রে যেন মন থেকে সরিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো একটু মুছে নিয়ে বললে,—দয়া ক'রে একটুখানি শুনবেন আমার দুঃখের কাহিনী।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মেয়েটি যে একা। এক্ষুণি যদি কোন দিক্ থেকে এসে পড়ে কেউ, ব্যাপারটা যে অতিশয় অশোভন হয়ে উঠবে।

আমার মনের কথা হয়ত টের পেলে মেয়েটি। বললে,—বাড়ীতে আর কেউ নাই, একলা আমি। সদর-দোর আমি বন্ধ ক'রে দিয়ে এসেছি। সে জন্য কোন চিন্তা নাই আপনার।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুধু তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির দিকে। মেয়েটি বললে,—খুলে একটু বলি আপনাকে। তা নইলে আপনিই বা কেমন ক'রে বুঝবেন। আমার বাবার কাছ থেকে হাজার দুয়েক টাকা এঁরা ধার নিয়েছিলেন। কনট্রোলের দোকান খুলবো বলে। সে সব ত হলো না কিছুই। এঁরা সেই টাকা দিয়ে তিন বিঘে জমি কিনলেন। গতবছর আমার ছোট বোনের বিয়ের সময়—শুনছেন আমার কথাগুলো?

—হাঁ—হাঁ, বলুন।

—গতবছর আমার ছোট বোনের বিয়ের সময় বাবা এলেন সেই টাকাটা ফেরৎ নিতে। টাকা ত এঁরা দিলেনই না, উপরন্তু অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন আমার বাবাকে। বাবার সঙ্গে এঁরা আমাকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। আমি কিন্তু জোর ক'রে চলে গেলাম।

—তারপর?

—আমার ছোটবোনের বিয়ের পর আবার আমি ফিরে এলাম নিজের থেকে। সেই তখন থেকেই আমি এঁদের দু'চক্ষের বিষ। আমাকে এঁরা যেমন ক'রে হোক তাড়াতে চান এখান থেকে।

চোখ দুটো আবার ছলছল ক'রে উঠলো মেয়েটির। মুছে নিলে একটুখানি। বললে,—শাশুড়ি আমাকে উঠতে বসতে খোস্তা পেটা করেন। তিনবেলা তাঁর লাথি-ঝাঁটা খেয়েও মুখ বুজে আমি পড়ে আছি এইখানে।

মনে মনে অতিশয় আহত হলাম।

বললাম,—সে কি, বেচারামবাবু কিছু বলেন না আপনার শাশুড়ীকে?

—বললাম তাঁর উপায় আছে। মায়ের ভয়েই তটস্থ। আর উনিও ঠিক সেই রকমই। এখান থেকে আমাকে তাড়াতে পারলে উনি যেন বাঁচেন। নতুন ক'রে আর একটা বিয়ে করবার মতলব।

কি সংঘাতিক কথা।

এরা মানুষ, না আর কিছু।

মেয়েটির বাঁ হাতে ঠিক কব্জির উপর কালচে একটা দাগ। বললাম,—ওটা কি, কি হলো আপনার ওখানে?

তাড়াতাড়ি শাড়ীর আঁচল দিয়ে হাতখানা ঢেকে ফেললে মেয়েটি। বললে,—ও কিছু না, একটুখানি ফোস্কা পড়েছে। আমার কাপড়জিস ধোয়া পছন্দ হয়নি আমার শাশুড়ীর। তাই লুচিভাজা ঝাঝরা দিয়ে একটুখানি ছেঁকা দিয়ে দিয়েছেন।

এমনভাবে কথাগুলো বললে মেয়েটি, যেন এটা একটা এমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ধৈর্য্য এদের সর্বংসহা ধরিত্রীর মত। দুঃখ সইবার এতখানি শক্তি এরা পায় কোত্থেকে!

পুনরায় বললে মেয়েটি,—এঁরা তলে তলে ছেলের আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আমি খবর পেয়েছি। সেই জন্যেই ত এত দুঃখেও এ বাড়ীটা ছেড়ে দূরে কোথাও সরে যেতে পারছি না। কিন্তু আপনি—আপনি কেন এর মধ্যে এলেন দাদা! দয়া ক'রে ফিরে যান আপনি, আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

ফুঁপিয়ে এবার কেঁদে উঠলো মেয়েটি। আছাড় খেয়ে পড়লো আমার পায়ের উপর।

আমার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠলাম। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ

করলাম মেয়েটির হাত দুখানি। টেনে তাকে মাটি থেকে তুলে দিলাম। বললাম,—এ কথা আমি জানতাম না বোন, জানলে আমি কখনই আসতাম না। বিশ্বাস কর আমার কথা। এক্ষুণি আমি চলে যাব এখান থেকে।

ভীরু দুটি চোখ মেলে আর একটিবার তাকালো মেয়েটি। তাকালো আমার মুখের দিকে। বললে,—আপনি আমার দাদা, আপনার এ দয়ার কথা কোনদিন ভুলবো না আমি।

বললাম,—দয়া এটা মোটেই নয়।

আমার বোন পটলির কথা বারে বারে মনে পড়ছে। সেই পটলি আর তুমি আমার চোখে যে এক হয়ে গেলে আজ।

—কি বললেন, পটলি!

ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির মুখে। বললে,—আমারও যে ডাকনাম পটলি, ভাল নাম বীণা।

বললাম,—তাই নাকি!

সঙ্গে সঙ্গে আবার গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটি। বললে,—আচ্ছা দাদা, আমার বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দেবেন আপনি! এখানে আমার চিঠিপত্র পর্য্যন্ত লিখবার হুকুম নাই।

বললাম,—কি লিখতে চাও বলো, কি তাঁর ঠিকানা?

মেয়েটি বললে,—শ্রীবনমালী চক্রবর্তী। পোষ্ট খয়রাসোল, জেলা বীরভূম।

পকেট থেকে নোটবইটা বের ক'রে টুকে নিলাম ঠিকানাটা, বললাম,—কি তাঁকে লিখতে হবে!

মেয়েটির মুখে চোখে হঠাৎ যেন একটু ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললে,—জানেন দাদা, এঁরা সেদিন বলাবলি করছিলেন, এঁরা নাকি কোর্টে দরখাস্ত ক'রে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন আমাকে।

চঞ্চল হয়ে উঠলো মেয়েটি। একটুখানি থেমে পুনরায় বলে উঠলো,—দরখাস্তে কি লিখবে জানেন, আমার নাকি স্বভাব খারাপ। এর চেয়ে যে আমার মরে যাওয়া ঢের ভাল দাদা।

মানসিক একটা উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলো মেয়েটি। আর একটিবার চোখ মুছে বললে,—বাবাকে একবার আসতে লিখে দিবেন। তাঁকে আমি জানাব এ সব কথা।

বললাম,—লিখে দেব, নিশ্চয় লিখে দিব। কিন্তু এর জন্যে তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এত সহজ নয়।

সদর দোরে ঠুক ঠুক ক'রে একটা আওয়াজ হলো। সজাগ হয়ে উঠলো মেয়েটি। করুণ-ভাবে বলে উঠলো,—তা হলে আমি যাই দাদা। আমার যেন কোন অপরাধ নেবেন না।

সামনে থেকে সরে গেল মেয়েটি। মূর্তিমতী একখানি বিষাদের ছায়া।

অন্তর্হিত হয়ে গেল অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে। মনটা আমার মুহূর্তের জন্য টন্ টন্ ক'রে উঠলো। কোথায় যেন একটা টান পড়ছে। হঠাৎ যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেল পথের ধূলোয় কুড়িয়ে পাওয়া আমারি এক-মায়ের পেটের বোন।

উঠে পড়লাম চৌকি ছেড়ে। বার দিকের হুড়কো দেওয়া দরজটা খুলে ফেললাম। শিয়রের দিকে দাঁড়ালাম এসে একটিবার জানলার সামনে। ভিতর দিকে তাকালাম একটুখানি। ইচ্ছে করেই তাকালাম। কাউকেই আর দেখা গেল না। কিড ব্যাগটা তুলে নিলাম চৌকির উপর থেকে। চোখ পড়লো ফুলতোলা বালিসটার উপর। ওয়াড়ের এক কোণের দিকে নীল সুতোয় লেখা রয়েছে 'বীণা'।

এরি নাকি ডাকনাম পটলি।

সাইকেলটা ঘর থেকে বের করলাম টেনে। বেচারামের ভিটে ছেড়ে নেমে পড়লাম সদর রাস্তায়। বেলা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। তা হোক, বাড়ী আজ ফিরতেই হবে, যেমন করেই হোক। এখানে আর থাকা-টাকা নয়।

বেরিয়ে পড়লাম সাইকেল ক'রে। ছেড়ে এলাম বীজপুর গ্রাম। উন্মুক্ত আলো হাওয়ায় এসে মনটা যেন একটুখানি হালকা হলো এতক্ষণে। গ্রাম ছেড়ে একটুখানি এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো ছোট্ট একটা জেলে-পাড়া। খান দুই তিন মাছধরা জাল টাঙানো, ঝাঁকড়া একটা অশথগাছের ডালে।

একটুখানি ফাঁকার দিকে পাকা রাস্তার ধারে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। হাতে তার নারকোলের দড়ি দিয়ে ঝোলানো সের তিনেক একটা রুই মাছ। ইনিই আমার নতুন কুটুম্ব, শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

একটুখানি দো-টানার মধ্যে কখন যেন কমিয়ে ফেলেছি সাইকেলের স্পীডটা। লোকটার দিকে আর মুখোমুখি তাকালাম না। এগিয়ে গেলাম পাশ কাটিয়ে। বেচারাম কিন্তু সাড়া দিলে,—কোথায় যাচ্ছেন?

এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে। ডাক দিলে আবার বেচারাম,—ও কি, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি!

পিছু পিছু হেঁটে আসছে। মরিয়া হয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে বেচারাম। জোর গলায় ডাক দিচ্ছে,—বলি ও আজ্ঞে, ও আম্বাসটকির বাবুমশায়, শুনুন—শুনুন—

সাইকেলের ব্রেকটা একটু কষে দিলাম। নামতে হলো একটুখানি। বেচারাম হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়ালো এসে আমার সামনে। হতভম্বের মত বলে উঠলো,—আপনি কি বাড়ী চলে যাচ্ছেন?

তির্য্যক একটা দৃষ্টি মেলে তাকালাম লোকটার দিকে। বললাম,—ঘরে একটা জলজ্যান্ত বৌ থাকতে বিয়ের আবার শখ কেন?

একেবারে আকাশ থেকে যেন ছিটকে পড়লো বেচারাম। মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখখানা। কোন রকমে একটা দম টেনে বললে,—আজ্ঞে বুঝতে পেরেছি। আমাদের পাড়ার হেবো সরকার, হাড়বজ্জাৎ ওই কুচক্রী বেটা, সাতখান ক'রে লাগিয়েছে বুঝি আপনার কাছে। আমরাই ত সে সব কথা খুলে বলতাম আপনাকে। আপনি হঠাৎ চলে যাচ্ছেন কেন।

মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠলো লোকটার কথা শুনে। বললাম,—লোকটি তুমি সহজ নও বেচু চাটুজ্যে। তোমার একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। সে ব্যবস্থা খুব সম্ভব আমাকেই করতে হবে।

বেচারাম প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলো। বললে,—সে কি মশায়, আপনার জন্যে এতবড় একটা রুই মাছ কিনে আনলাম আমি, আর আপনি কিনা আমায় অপমান করছেন।

পিছন ফিরে আর তাকালাম না। স্পীড দিয়ে দিলাম সাইকেলে।

মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু একটি প্রশ্ন। এ যুগেও কি এমন ধারা অনাচার চলবে! চলবে হয়ত আরো বহু যুগ। যতই আমরা শিক্ষা আর সভ্যতার বড়াই করি না কেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন অমানুষ এই বেচারাম চাটুজ্যে, আর তার বৌ-কাঁটকি মা-বুড়ীর সংখ্যা আজো কিছু কম নয় এদেশে। বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ে। এঁদো পুকুরের পাড় থেকে বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে পরিপাটি গোবর দিয়ে নিকানো তকতকে আঙিনার ও পাশটায় ধৈর্য্য ধরে একটুখানি দৃষ্টিপাত করলেই নজির পেতে দেরি হবে না। সমাজ-দেহে বিষফোঁড়ার মত আজো ওরা টিঁকে আছে মরতে মরতেও।

আপাতত চিঠি একখানা লিখতে হবে বীণার বাবাকে। মেয়েটিকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। ধর্ম্মপুজার

উৎসবটা চুকে গেলেই নিজেও আমি যাব একবার সেখানে। হৃদয়হীন এই বধূ-নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে একটা কড়া রকমের ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না, অবশ্যই তা ভেবে দেখতে হবে।

অজয়নদীর পাড় বেয়ে ঢালুর দিকে গাড়ী নামলো। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে লুটিয়ে পড়ছে যেন। বুঝতে পারিনি এতক্ষণ কোথায় যেন চলেছি। কদ্দুর বা এলাম আমি। শুক্লা তিথির ভরন্ত বৈশাখী চাঁদ ঝলমল করছে রূপালী আকাশের চাঁদোয়ায়। বেশ একটু রাত হয়েছে।

সাইকেল ঠেলে তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেলাম। নদী উঠে মাইল তিনেক যেতেই পড়লাম গিয়ে আঁধার-শোলার শাল বনে। বাড়ী অনেকটা কাছিয়ে এসেছি। এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি যেন আমার গাঁয়ের মিষ্টি মধুর ডাক।

এতক্ষণ হয়ত ক্লাব-ঘরে হুল্লোড় চলছে সপ্তর্ষির। সীতা নাটকের ফুল রিহার্সেল আজ। আমার হয়ে রামের পার্টটা কে প্রকৃসি দিচ্ছে কে জানে। খুব সম্ভব হেডমাষ্টার।

রামায়ণের অশ্রুঝরা করুণ কাহিনী। আদি কবির মানস-কন্যা চিরদুঃখিনী জনকনন্দিনী সীতা। অশোক-বনে নিপীড়িতা, রক্ষচেড়ী-লাঞ্ছিতা, অভাগিনী জনকতনয়া বহু দুঃখের অবসানে লঙ্কা হ'তে ফিরে এলো অযোধ্যায় রাজঅন্তঃপুরে। কিন্তু এই বাঞ্ছিত সৌভাগ্যের দুর্লভ অধিকারটুকু জীবনে তার স্থায়ী হলো না। ঘনিয়ে এলো লোকনিন্দার নিষ্ঠুর করাল ছায়া। লোকপালক রঘুকুলপতি রাজা রামচন্দ্রের অনুজ্ঞায় রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে নির্ব্বাসনে যেতে হলো রাজকুলবধূকে।

দীর্ঘদিনের পর বনবাসিনী চন্দ্রমুখী সীতা আবার এসে উদয় হলো অযোধ্যার রাজসভায়, রামচন্দ্রের আকুল আহ্বানে। আবার সেই অগ্নিশুদ্ধা বৈদেহীর নূতন ক'রে শুদ্ধির প্রশ্ন। প্রকাশ্য রাজসভায় সর্ব্বজনসমক্ষে আর একটিবার জানকীকে দিতে হবে সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা। প্রজাকুল নিশ্চিন্ত হতে চায় অপহৃতা রঘুকুলবধূ অপাপবিদ্ধা।

এ দুঃখ আর সইলো না পতিপ্রাণা রামসোহাগী সীতার। সইলো না তার নারীত্বের দুঃসহ এই অসম্মানের গ্লানি। ধরার মেয়ে মিলিয়ে গেল ধরার বুকে।

সেই কোন্ আদ্যিকালে শেষ হয়ে গেছে রামচন্দ্রের ত্রেতা যুগ। সীতা-বর্জ্জনের অভিশাপটা আজো কিন্তু একেবারে খণ্ডায় নি। চলছে আজো পুরোদমে। তা সে জোর ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়েই হোক, আর আদালতে ডাইভোর্সের মামলা ক'রেই হোক। এর যেন আর শেষ নাই।

বারে বারে শুধু মনে পড়তে লাগলো বীজপুরের ওই অসহায় মেয়েটির কথা। তার এক সম্ভাব্য সতীনের ভাই বলে সে আমাকে ঘৃণা করে নি। দিয়েছে সে অগ্রজের সম্মান। একি ভোলা যায়?

কে জানে, কি যে আছে মেয়েটির ভাগ্যে। দৈনন্দিন জীবনের দুঃসহ জ্বালা, আর মর্ম্মান্তিক অবক্ষয়ের নৈরাজ্য থেকে সহজে তার মুক্তি কোথায়!

রাত্রি প্রায় এগারোটা। গ্রামে এসে পৌঁছে গেলাম এতক্ষণে। চারিদিক প্রায় নিঝুম হয়ে গেছে। চাঁদ হাসছে মাথার উপর। গাঁয়ের সদর কুলি দিয়ে এগিয়ে চললাম বাড়ীর দিকে। দূর থেকে চোখে পড়লো ক্লাব ঘরের প্যাট্রোম্যাক্সের আলোর ছটা। করুণ একটা সুর ভেসে আসছে। টুকরো একটা গানের কলি। থমকে একটু দাঁড়ালাম রাস্তার উপর। সীতা নাটকের মহলা চলছে এখনো। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য এটা। অন্তরীক্ষে অদৃশ্য আহ্বান সঙ্কেত। ভেসে আসছে সঙ্গীতের সুর :—

ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে,
আয়গো ধরার মেয়ে।
শীতল অতল ডাকছে তোমায়,
মুখের পানে চেয়ে।

জননীর অঞ্চলে মুখ ঢাকে ধরিত্রী-কন্যা। তারপর শুধু অন্ধকার। অতলান্ত অন্ধকার।

আমি কিন্তু অতিশয় ক্লান্ত। কিছু আর ভাবতে চাই না। আর কিছু শুনতে চাই না। এবার শুধু বাড়ী গিয়ে সব কিছু ভুলে টেনে একটি ঘুম দিতে চাই।

এগিয়ে গেলাম। রাত হয়েছে অনেক। সদর দোর বন্ধ হয়ে গেছে। টোকা দিলাম গোটাকয়েক। জোরগলায় ডাক দিলাম—পটলি, পটলি।

সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পুনরায় ডাক দিতে লাগলাম, পটলির নাম ধরে।

খুলে গেল সদর দরজা। পটলি নয়, জেঠাইমা এসে দোর খুলে দিলেন।

পটলি হয়ত লজ্জায় আসতে পারেনি। ওর বিয়ের সব ঠিকঠাক ক'রে এলাম কিনা।

উপন্যাস

তিন কন্যে

সীতা দেবী

"ভাল শাড়ী কি রাখলি?"

হেমলতা বললেন, "মায়ের যে দুখানা পুজোর শাড়ী ছিল? একটা দুধেগরদ, টুকটুকে লাল পাড়। আর একখানা তসরের শাড়ী লাল মাছ পাড়। সেই দুটো আমি রেখেছি। আর মায়ের সেই কাল শালটা, কি চমৎকার মানাত মায়ের গায়ে। আমাকে অবিশ্যি তেমন ভাল দেখাবেনা, রং এ মিশে যাবে প্রায়, তবু ওটার উপর আমার বড় লোভ, আমিই রাখলাম। বাবার শালখানাও বেশ ভাল আছে, ওটা ভাবছি প্রবীরকে দেব, দাদামশায়ের জিনিষ তারও কিছু পাওনা আছে? আর সেই মোটা শীল আংটিটা সমীরকে দেব। আমার ছেলেগুলোর জন্যে বাবার জিনিষ কিছু কিছু রেখেছি। আমার পুঁটে গিন্নির জন্যে কিছু রাখিনি এখনও, ভাবছি মায়ের রূপোর গহনা থেকে কিছু বেছে রাখব।"

কনকলতা সজল চোখে বললেন, "সব ভাল জিনিষগুলোই আমাকে দিয়ে দিচ্ছিস্ ভাই?"

হেমলতা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "কোথায় সব ভাল জিনিষ দিয়ে দিচ্ছি? কত রাখলাম নিজের জন্যে। আর যদি দিইই তাতেই বা কি? সব মা বাবার জিনিষ, আমার কাছে থাকাও যা তোমার কাছে থাকাও তা। তুমিই না বললে যে ভাই বোনের চেয়ে নিকট সম্বন্ধ আর কারো সঙ্গে নয়। তবে এত সঙ্কোচ করছ কেন? আরো জিনিষ কত রয়েছে সে এখনও ভাগ হয়নি। এইগুলি দরকার বুঝে আগে ভাগ করলাম। বৌভাতের পর তুমি ক'দিন থাকবে ত কলকাতায়? তখন সব কিছু চুকিয়ে দেব। নাও এখন এই গহনা ক'খানা রাখ।" গহনার বাক্স থেকে রেশমের রুমালে বাঁধা একটা পুঁটলি বার করে নিয়ে তিনি বাক্সটা বন্ধ করলেন। বললেন, "মায়ের গহনার বেশীর ভাগ ত আমাদের তিন ভাই বোনের বিয়েতে তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন। তবু খানিক ছিল, ঠাকুরমার দেওয়া তাঁর কালের গহনা ওসব ভারি জিনিষ এখনকার দিনে কেউ পরেনা, মা কিন্তু ওসব ভাঙেননি, যেমনকে তেমন ছিল। তা এই চন্দ্রহারটা দেখ, কি ভারি! ওসব ত আজ-কাল কেউ পরেনা, আর এই অনন্ত জোড়াও কমে যায়না। দুটোই ঠাকুরমার। এ দুটো শান্তি আর বর্ণকে দিলাম। গাঁয়ের স্যাকরাটা ত ভালই কাজ করে। এ দুটো মিলিয়ে আঠারো উনিশ ভরি সোনা আছে। আটগাছা করে এক একজনের চুড়ি আর এক-একটা করে সোনার নেকলেশ করিয়েদে, কিছু ছিটে ফোঁটা বাকি থাকে ত দু জোড়া দুলও করে দিস্। এইত গেল মেয়েদের পর্ব্ব। নিজের তোর হারটা ভালই আছে, চুড়িগুলো নষ্ট হয়েছে খানিকটা, তা পালিশ করিয়ে নিস আর সঙ্গে এই সরু কঙ্কন জোড়া পরিস, তা হলেই মানান্ত হবে। খুব তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি করাবি। হ্যাঁ ভাই দিদি, নিজের জন্যেও গহনা রেখেছি। মা

শেষ বয়সে যে চওড়া চওড়া চাবাগাছা করে চুড়ি পরতেন সেগুলি আমি দিলাম, আর তাঁর সার মাকড়ি ছ'টা পরবনা গুলি। কিন্তু এত সুন্দর কাজ ওগুলির লোককে দেখিয়ে সুখ! রূপোর গহনা আছে কিছু, বিয়ের পর্ব শেষ হলে তার ব্যবস্থা করা যাবে। নাও এইত গেল আমাদের পর্ব। এখন বউ গিন্নীর জন্যে কি কি এনেছি দেখে নাও। শাড়ীগুলি সব তত্ত্বে যাবে। কয়েকটার সঙ্গে জামা আছে, কয়েকটার সঙ্গে শুধু ব্লাউস-পিস। বিয়ে, বৌভাত আর আইবুড়ো ভাতের জন্যে তিনটে জামা শেলাই করাতে হবে। বৌদির দুটো কিংখাবের জামা আছে, তা কেটে অপুর গায়ের মত করতে হবে। আইবুড়োভাতে নূতন জামাইকে দেব। এখন মাপ ত চাই। ব্লাউসের আর সায়ার, তা ছাড়া চুড়ি বালার। কালকের মধ্যে মাপ আনাতে হবে কাউকে দিয়ে। পারবে?

কনকলতা বললেন, "পারতেই হবে। কাল হাটবার, কত গরুর গাড়ী সাত গাঁয়ে ঘুরবে। তারই এক-টাতে রাধী নাপতিনীকে তুলে দেব, সোজা চলে যাবে। চালাক চতুর আছে, ঠিক জিনিষ আদায় করে আনবে।"

স্বর্ণ বলল, "মা, আমার হাতের যে এই লাল চুড়িটা এটা অপুদির হাতে ঠিক হয়। একদিন পরিয়ে দেখেওছিলাম।"

হেমলতা বললেন. "দে তবে, ওটা খুলে দে। দিদি, এই মাপে বৌদির চুড়িগুলো কেটে ছোট করাবে। নাকি থাকবে? বিয়ের জল গায়ে পড়লেই তোমার দেবরঝি মুটিয়ে যাবে দেখো। তখন কি আর বড় করতে ছুটব? তার চেয়ে যেমন আছে তেমন থাক। এই ত লাল চুড়িটার উপর রাখনা, প্রায় একই মাপ, হাত থেকে কিছু খসে পড়বেনা। এখন জামার মাপ পেলেই হয় সময়ে।" কলকাতা শহরে মানুষে মানুষে আত্মীয়তার যোগ কম। পাশের বাড়ী বিয়ে হচ্ছে, বৌভাত হচ্ছে, তোমরা খোঁজও রাখনা, নেমন্তন্নও হয়না বেশীর ভাগ সময়। নেহাৎ হৈ চৈ করে তত্ত্বতালাশ এলে মেয়েরা উঁকি ঝুঁকি মারে। পুজো পার্ব্বণের বেলাও তাই।

গ্রামের ধাঁচ অন্যরকম। কারো বাড়ীতে কোনো উৎসব হল, ক্রিয়া-কলাপ হল তা সারাগ্রাম ভেঙে পড়বে সেখানে। যেন তাদেরই বাড়ীর কাজ। আসল কাজে সাহায্য সবাই যে করে তা নয়, বেশীর ভাগই করেনা, কিন্তু এসে জুটবে সবাই, আর গলা কাটিয়ে গল্প জুড়বে, উপদেশ দেবে, খুঁৎ ধরবে।

অভয়পদর বিয়ের ব্যাপারেও তাই ঘটল। এতবড় ব্যাপার গ্রামে ইদানীং কবেই বা হয়েছে? এর কাছা-কাছি ঘটা হয়েছিল শেষ রামপদর বৌভাতের সময়। তখন এবাড়ীর প্রতিপত্তি ঢের বেশী ছিল, এঁরাই ছিলেন গ্রামের শীর্ষস্থানীয় পরিবার। সবাই সম্মান করত, অনুগত হয়ে চলত।

তারপর সব ভাগসাগ হয়ে গেছে। সে জমজমাট ভাব আর নেই। পসার-প্রতিপত্তিও অনেক কমে গেছে। বুড়ো মানুষ আর অতি ছেলেমানুষ ছাড়া বিশেষ কেউ আর এখানে থাকেও না। তবুও "মরা হাতী সোওয়া লাখ।" গিয়ে গিয়েও অনেকটা আছে। বিয়ের দিন-দশ বারো আগের থেকে বাড়ীতে ঘন ঘন পাড়া-প্রতিবেশীর ভীড় হতে লাগল। কনকলতা কাজ করবেন না তাদের সঙ্গে গল্প করবেন? সবাই কাজে হাত লাগাতে চায়, অন্ততঃ মুখে তাই বলে। এখনি কি কাজ তাদের দেওয়া যায়? বিয়ের সময় না-হয় তরকারী কুটতে ডাকা যায়, পরিবেশন করতে ডাকা যায়, এখন কি?

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি শেষে হেমলতাকে চিঠি লিখলেন, "তোরা একজন ভাই এখানে চলে আয়, তুইবা দাদা। আমি একলা সব দিক্ সামলাতে পারব না, বুঝতেই পারছি। শুধু সকলের সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই একজন কর্তা ব্যক্তির দরকার। কাজকর্ম সব ঠিক মতই এগোচ্ছে। স্বর্ণ আর শান্তির সব গহনা গড়ে এসেছে।

পুরনো কালের পাকা সোনা, সব আগুনের মত ঝলকাচ্ছে। দাদা বানির জন্যে যে টাকা দিয়েছিলেন, তার অনেকটাই খরচ হয়নি, কুচো কাচা ভাংতি সোনায় পুষিয়ে গেছে। পালিশের কাজও ভালই হয়েছে। টিউব-ওয়েলও বসেছে। পরিষ্কার জল খেয়ে বাঁচছি ক'দিন। বরযাত্রীদের ঘরও হয়ে এল প্রায়। ছিটেবেড়ার ঘর হলে কি হবে? তাতে গোবর মাটি দিয়ে লেপিয়ে, রঙীন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে মৃগাঙ্ক যা ব্যাপার করেছে, এসে দেখিস্।"

হেমলতা ছুটলেন রামপদর কাছে। "দাদা, আমি বরং চলে যাই। দিদি বেচারী না হলে খেটে খেটে মরে যাবে। একলা মানুষ এত কাজ পারে কি? আমি গিয়ে লোকের বকবকানি ঠেকালে সে তবু আসল কাজ করবার সময় পায়।" রামপদ বললেন, "তুই যাবি যে তা এদিক্ সামলাবে কে? তোমাদের কত সব মেয়েলী কাণ্ডকারখানা, ওসব ত আমি বুঝতেও পারিনা। তারপর বর নিয়ে বেরোবার সময়ও ত কত কিছু করতে হয়।"

হেমলতা বললেন, "এদিক্‌কার কাজ ত অনেকটাই হয়ে এসেছে, আর হাতে সময়ও আছে ঢের। মেয়েলী কাজ আমি প্রায় শেষ করে এনেছি। গহনা ছোট করা আর পালিস করা শেষ হয়েছে। শেলাই ছিল একরাশ, তাও কাল হয়ে যাবে। বউয়ের তত্ত্বের জিনিষপত্র কেনাকাটা প্রায় শেষ। শুধু তেল, সাবান, পাউডার স্নোর ট্রেটার জিনিব আজ কিনব, ফর্দ্দ করাই আছে। এসব চুকিয়ে আমি পরশু সকালের গাড়ীতে চলে যাই কেমন? আসল বিয়ের কাজটাই ত সেখানে, তাতে খুঁৎ থাকলে চলবেনা ত?"

"তোকে পৌঁছে দেবে কে? অত জিনিষপত্র নিয়ে তুই ত আর একলা যাবিনা?"

"বড়কাটা পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাকে, আবার রাতের ট্রেণে ফিরে আসবে। আমি রঙন ঠাকরুণকে সঙ্গেই নিয়ে যাব, কাজেই এদিকে ঝামেলা কিছু থাকবেনা। তোমার ভগ্নীপতি আর বড়কা মিলে বরযাত্রী, বর সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে, তোমার কিছু ভাবতে হবেনা। আমার বিধবা বড় ননদ থাকেন বাড়ীতে; কখন কি করতে হয়, না হয়, তা তিনি আমার চেয়েও ভাল বোঝেন, সব ঠিক করে দেবেন। তুমি শুধু গহনাগাঁটি ব্যাঙ্কে রেখে যাবে আর তোমার কলেজের রামনরেশকে বাড়ীতে রেখে যাবে। নইলে ভগীরথের গঙ্গাস্রোতে কখন কি ভেসে যাবে, তার ঠিক কি? আমি বিয়ের পরদিন রাত্রেই আবার ফিরে এসে এদিকে হাল ধরব। বউকে এঘর থেকে ও ঘরে চালান করে দিয়েই আর কি? এইটে এক মজার ব্যাপার।"

রামপদ বললেন, "তা বটে। কিন্তু ও ছাড়া আর উপায় ছিল কি?"

"তাত ছিলই না! আচ্ছা চলি, পরশু ভোরেই রওনা হচ্ছি তাহলে। কেনাকাটা শেষ করতে হবে, দরজীকে তাগাদা দিতে হবে, গোছগাছও করতে হবে," বলে তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন।

নেই, নেই করেও রামপদর অনেক কাজ ছিল। নিজেদের ফ্ল্যাটটা চুনকাম করান এবং দরজা জানলায় রং দেওয়া সবে শেষ হয়েছে। অভয়পদর শোবার ঘরের জন্যে নূতন খাট, আলমারি, আলনা, আয়না বসান দেরাজ সব করান হয়েছে, সে সব আনিয়ে ঘর সাজিয়ে রেখে যেতে হবে। অন্য আসবাব এখন আর কিছু কেনা হয়নি। রামপদ জমি কিনেছেন, বাড়ীও আরম্ভ হবে এই বিয়ের ব্যাপার শেষ হলেই। তখন নূতন বাড়ীতে সব নূতন আসবাব নিয়েই ওঠা যাবে।

গ্রামের বাড়ীতে স্থানাভাব বড় বেশী। কাকীমারা যথাসাধ্য জায়গা দিচ্ছেন নিজেদের অসুবিধা করেও। তাহলেও তাঁরাও একেবারে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন না? বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁদের বিদেশবাসী ছেলে

বউ ও কেউ কেউ বাড়ীতে আসছে ত? রামপদ হেমলতাকে বলে দিলেন "যাঁরা সাহায্য করতে অত ব্যস্ত, তাদের ঘরে দু চারজন করে মানুষ ঢুকিয়ে দিস্ গিয়ে। অন্ততঃ শোবার জায়গাটা দিক্। বরযাত্রী ছাড়াও কাজকর্ম্ম করার জন্যে অনেকগুলো লোক যাবে, এবং বিয়ের পরদিন তল্পি গোটান পর্য্যন্ত থাকবে। খাওয়ানোর ব্যবস্থা অবশ্য আমিই করব।"

হেমলতা বললেন, "দেখি গিয়ে। যত গর্জ্জায় তত ত বর্ষায় না। আসল কাজের নামে সবাই হয়ত পথ দেখবেন। দিদি ত কাউকে উচিত কথা শোনাতে জানে না, সে ভারটা আমাকেই নিতে হবে ওখানে গিয়ে।

"সে ত তুমি আজন্মই নিয়ে আসছ! দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গেই ত তুমি দিদির body-guard."

"তা না হয়ে করি কি বল? সাতচড়ে যে রা নেই ওর মুখে। ছোট বেলায় কেউ মারলেও কিছু বলত না! আমিই মারধোর করে ওকে আগলাতাম।"

হেমলতা খুব তাড়াতাড়ি করে কাজকর্ম্ম শেষ করে নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা ট্রেনে চড়ে বসলেন। জিনিষ-পত্র তাঁর সঙ্গে চলল পর্ব্বতপ্রমাণ। চাকর, ঠাকুর, জোগানদারও চলল অনেকজন। বাকি পরের দিন যাবে। হেমলতার সঙ্গে চলল তার বড় ছেলে সুবোধ আর মেয়ে রঙন। তার বয়স মাত্র আট, এতবড় ঘটার ব্যাপার সে ইতিপূর্ব্বে দেখেনি তার ছোট জীবনে, কাজেই সে দারুণ উত্তেজিত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সে মাকে আর বড়দাদাকে অস্থির করে তুলছে।

প্রবীর সমীর দুজনে গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে হাজির ছিল। লোক আর জিনিষপত্রের বহর দেখে সমীর বলল "মামাবাবু কি কলিকালে রাজসূয় যজ্ঞ করছেন?"

প্রবীর বলল "তাই বোধ হয়। তা এর মধ্যে "বীর বৃকোদরের" পার্টটা আমি ভালই পারব। অন্ততঃ খাওয়ার দিকটায়।"

বাড়ী পৌঁছে সেই রাশীকৃত জিনিষপত্র ভাল করে গুছিয়ে রাখতেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। দুই বোনই অত্যন্ত শঙ্কিত, পাছে এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে অচেনা বাজে লোক বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে এবং চুরি-চামারি করে। রঙনের দিকে ত তার মা ঘণ্টা চার তাকাতেই পারলেন না। তবে সে শান্তিলতার হাত ধরে নির্ভয়ে চারদিকে ঘুরতে লাগল, এবং মায়ের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে সকালের মধ্যেই বারচারেক জলযোগ করে নিল। নিষিদ্ধ জিনিষও অনেক কিছু তার পেটে চলে গেল।

এত কাজের মধ্যেও শান্তিলতা স্বর্ণলতার চেহারা আর ধরণধারণের পরিবর্ত্তনটা হেমলতার চোখে পড়েছিল। এক ফাঁকে কনকলতাকে বললেন "দেখ ভাই কি সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়ে দুটোকে। এবার বৌভাতের পর কিছুদিন ওদের আমি কলকাতায় রেখে দেব। লোকে দেখুক একটু, যে পাড়াগাঁয়েও সুন্দর মেয়ে থাকতে পারে। বৌ দেখে ত তাদের ধারণা ভাল হবে না।"

কনকলতা বললেন "দুটোকে একসঙ্গে নিলে আমি চালাব কি করে ভাই? আমি ত ঝি চাকর রাখি না? ওরাই আমার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে। আর অপুকে যতটা নিরেস তোমাদের লেগেছিল, কনে দেখার সময়, ততটা ও থাকবে না। ভাল কাপড় চোপড় পরলে, ভাল করে খেলে, চাল-চলন কিছুটা শিখে নিলে, একেবারে পাতে দেওয়ার অযোগ্য হবে না। তবে মেয়েটা বোকাই, শিখলেও যে খুব চট করে শিখে নেবে তাও মনে হয় না।

হেমলতা বললেন "ঐ বুদ্ধিমতী মায়ের মেয়ে ত? বড় হাবা বাপু তোমাদের ছোট বউ। কথাটা শুদ্ধ ভাল করে বলতে জানে না। এবারে এসে না জানি কি ভোল দেখাবে। তোমাদের মেজ বউ কেমন? চাল-চলন জানে? বুদ্ধিশুদ্ধি আছে?

কনকলতা বললেন "ছোট বউ বড় গরীব ঘরের মেয়ে। শিক্ষা দীক্ষা কিছুত হয়নি। চাল-চলনই বা শিখবে কার কাছে? জানে শুধু ধান ভানতে আর খেতে। মেজ বউ খানিকটা সম্পন্ন ঘরের, তার বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে কিছু। কোথায় কেমন ব্যবহার করতে হয় তা জানে। একটা মেয়ের বিয়েও দিয়েছে, আন্দাজ খানিকটা আছে সব বিষয়ে।"

খাবার সময় প্রথম হেমলতার খেয়াল হল যে রঙনকে অনেকক্ষণ দেখা যায় নি। বললেন, "আমার পুঁটে গিন্নি কোথায় গেল গো? তোমাদের সব খানা ডোবার দেশ, ও মেয়ে ত কলের জল ছাড়া অন্য জল চোখে দেখে নি।"

কনকলতা বললেন "ও শান্তির জিম্মায় আছে, ঠিক আছে, কোনো ভাবনা নেই। শান্তি বড় সাবধানী মেয়ে, দেখ এখন এরই মধ্যে স্নান করিয়ে চুল আঁচড়ে ফিটফাট করে রেখেছে। দুবছরের ত বড় স্বর্ণর চেয়ে, তাতেই কি গিন্নিপনা করে তাকে আগলাত চুল আঁচড়ে দিত, জামা পরিয়ে দিত। স্বর্ণটি ত এখনও নিজের চুল বাঁধতে জানে না, রোজ দিদি বেঁধে দেয়।"

রঙনকে দেখা গেল দূরে শান্তির হাত ধরে আসছে। এরই মধ্যে তার স্নান হয়ে গেছে, চুল আঁচড়ে পরিষ্কার ফ্রক পরেছে, কপালে একটা টিপও পরেছে।

হেমলতা বললেন "যাঃ, ঠিক জায়গায় জুটে গিয়েছিস্। এরপর দিদির সঙ্গে গিয়ে দুটো খেয়ে নে। তা হলেই এ বেলার মত কাজ হল। মেয়ে আমাদের বাঙালীর ঘরে আদর পায় না, কিন্তু মেয়ে না থাকলে মায়ের ত প্রাণ শেষ। একটা কাজে কেউ হাত লাগাবে না, শুধু খুঁৎ ধরবে আর হুকুম করবে। আমার বড়কাটা যদি মেয়ে হ'ত ত বেঁচে যেতাম। রঙনের সব ভার তার হাতে তুলে দিতাম! শান্তিকে আমি ঠিকই নিয়ে যাব এবার। রঙনের সব ভার ছেড়ে দেব ওর উপর, আমি বৌভাতের ঠেলা সামলাব এখন।"

স্বর্ণ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল "আর আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি, আমাকে রাখবে না কলকাতায়?"

কনকলতা বললেন "ঐ ত বললই। পরের বছর যাবে। একসঙ্গে চলে গেলে আমার চলবে কি করে?"

বিকেলে আবার ঘর বদল করার পর্ব্ব সুরু হল। অপুদের বাড়ী থেকে মানুষ আসছে অনেকগুলি, কনকলতার শোবার ঘর দু খানা তারাই দখল করবে। পুজোর ঘরে তাঁর নিজের দামী জিনিষপত্র সব ঠেসে ঢুকিয়ে কনকলতা ভারি তালা ঝুলিয়ে দিলেন, সেদিকে আর কারো যাওয়া আসার উপায় রইল না। কাকীমাদের কৃপায় তাঁদের দিকে অনেকটাই জায়গা পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে কনক, হেম এবং রামপদ অভয়পদর ব্যবস্থা হল। দাদা এবং তার ছেলের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেদিকে কনকলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন, তাদের কল্যাণেই সব, তাদের যেন কষ্ট না হয় কিছু।

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরা সব ক'খন এসে পৌঁছবে দিদি? কাল সকালেই?"

কনকলতা বললেন "ট্রেনে এলে ত সকালেই পৌঁছবে। তবে বুদ্ধি করে যদি কুলো ডালা নিয়ে গরুর গাড়ীতে আসতে যান, তা হলে বেলা গড়িয়ে যাবে।" রোদে চিংড়ি পোড়া হয়ে যাবে।

হেমলতা বললেন "তবে সকালের জন্যেই ব্যবস্থা কর। ওরা এসে সব রেঁধেবেড়ে খাবে, একথা ভুলে যাও। রসুয়ে বামুনও এসে গেছে, চাকরও এসে গেছে, রান্নার চালাঘরও বাঁধা হয়ে গেছে, কিছু অসুবিধা

হবে না। কাল থেকে সব রান্নাই ওরা করবে, দাদা বলে দিয়েছে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, ও ক'জনে আর কত খাবে ?

কনকলতা বললেন "আমি জানতামই গোড়াগুড়ি যে ঐ ব্যাপারই হবে। তবু বলবার বলে কথাটা বলেছিলাম যাতে বেশী আসকারা না পায়! মেয়ে তুলে আনা না ত মেয়ের সাতগুষ্টি তুলে আনা। তোরা কি সাত এয়োর ডালিও দিচ্ছিস নাকি ?"

"তা ত নিয়ম মত সবই দিচ্ছি। ওদের মধ্যে এরা ক'জন আছে ? সাতজনের বেশী ?"

কনকলতা বললেন "কতজন এসে জুটবে তা ত জানি না। ঘরে ত এক মা এবং দুই জ্যাঠাই মা। মেজ বউয়ের বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে আর একজন সধবা পিসী আছে। এই পাঁচটাত ঠিক, তবে আর কাকে কাকে আনবে তা ঠিক জানি না।"

পরদিন থেকে পুরোদস্তর বিয়ে বাড়ী লেগে গেল। উঠোনে বড় চালা বেঁধে বিরাট রান্নার আয়োজন চলতে লাগল। সবাই আজ থেকে বিয়ের পর দিন বর কনে বিদায় হওয়া পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই খাবে। উনুন রাত্রেই পাতা ছিল, সকাল থেকে গিন্নিরা ব্যস্ত হলেন, বামুন চাকরদের কাজ জুটিয়ে দিতে। চাল ডাল, তেল মশলা মাপা চলতে লাগল হাঁকডাক করে। ঝুড়ি ঝুড়ি আনাজ তরকারিও এসে ঢালা হতে লাগল বাড়ীর তিন চারটা রান্নাঘরে। মাছ কিছু কিছু এল, তবে খুব বেশী নয়, বাংলাদেশের এই প্রান্তটাতে মাছের কিছু অপ্রাচুর্য্য চিরকালই ছিল। বিয়ের দিনের জন্যে বাইরেও মাছ মাংসের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল।

রান্নাবান্না একটু দেরি করেই আরম্ভ হল দেখে কনকলতা বললেন "ভাল করে জল খেয়ে নেয়ে সকালে আজ ভাত খেতে সেই যার নাম বেলা দুটো। স্নান টান সকাল সকাল করে নিও, এরপর পুকুরঘাটে মহা ভীড় হবে। শান্তি রঞ্জনকে একবারও ছেড়োনা, সব সময় হাত ধরে থাকবে। আর হেম ওর হাতের বালা কানের দুল খুলে রাখ, বিয়ের সময় পরিও. কত যে বাইরের মানুষ এসে জুটেছে তার ঠিকানা নেই, এর ভিতর চোর সাধু বাছব কি করে ?"

সকালের জলখাবার খাওয়া মহা হৈ-চৈ-সহকারে চলতে লাগল। বৌ-ঝিরা এবং একটু পরে গৃহিণীরাও গিয়ে গরম পুরোপুরি পড়ার আগে স্নানটা সেরে এলেন। ছেলেদের ও সব ভাবনা নেই, তারা যখন হয়, স্নান করবে।

ইতিমধ্যে সমীর দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিল, "এসে গেছে, এসে গেছে! বউ-যাত্রীর দল এসে গেছে।

কনকলতা তাড়া দিয়ে বললেন "ও আবার কি কথা ? বউ-যাত্রী আবার কি ?"

সমীর বলল "বরযাত্রী যদি হয়, ত বউ যাত্রী কেন হবে না ?"

বলে সে আবার দৌড় দিল।

কয়েক গরুগাড়ী ভর্ত্তি মানুষ হুড়মুড় করে এসে গেল। দুই কাকীমা আর কনকলতা হেমলতা গেলেন তাদের অভ্যর্থনা করতে। চাকরবাকর জুটেছে অনেকগুলো, তারা এসে জিনিষপত্র নামাতে লাগল।

তা মানুষ এসেছে মন্দ নয়। অপরূপার মা, বাবা, ভাই বোন সবাই। ছোট কর্ত্তাও মান করে বাড়ীতে থেকে যেতে পারেন নি। তা ছাড়া অপুর মেজজ্যাঠার বাড়ীরও সবাই, বিবাহিতা মেয়েটি পর্য্যন্ত। সধবা পিসীও এসেছেন, বিধবা পিসী একজন আসতে চেয়েছিলেন, তাঁকে আনা হয়নি, কারণ এত হট্টগোলের মধ্যে আচার-বিচার রক্ষা করে চলা যাবে না।

কনকলতার স্বামী বেরিয়ে এসে তাদের সম্ভাষণ করে গেলেন। তিনি বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, কাশি আসে, কাজেই অল্প পরেই তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। ছেলেমেয়েরা এসে প্রণাম করল, দুচারজন অতি ছোটদের কাছে প্রণামও নিল। ছেলেরা তারপর সরে পড়ল, মেয়েরা দাঁড়িয়ে নবাগতদের নিরীক্ষণ করতে লাগল। কনকলতা সবাইকে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাতে লাগলেন। তালপাখা এনে দিলেন সবাইকে হাওয়া খাওয়ার জন্যে। বড় শোবার ঘরটি মেয়েরাই দখল করল, তারাই সংখ্যায় বেশী, ছোট ঘরখানিতে আশ্রয় নিল পুরুষের দল, তারা সংখ্যায় অনেকটাই কম। গিন্নীদের নির্দেশমত জিনিষপত্র দুভাগ করে রাখা হল।

মেজবউ, ছোটবউ দুজনেই পরিষ্কার শাড়ী পরেছে, ছেঁড়াখোঁড়া নয়। ছোটবউ গহনাগাঁটি কিছু পরেনি, হাতে শাঁখা লোহা যেমন আগেও ছিল, তেমনিই রয়েছে। মেজবউয়ের হাতে দুগাছি করে সোনার চুড়ি আছে। বিবাহিতা মেয়েটি চুড়ি, হার, দুল সবই পরেছে, গরমের অসুবিধা উপেক্ষা করে রঙীন রেশমের শাড়ীও পড়েছে। অপু নিজে বিশেষ সুসজ্জিতা নয়, তবে হাতে একজোড়া বালা উঠেছে। বালাটা আসলে তার জাঠতুতো দিদির, সেটা হাতে পরাবার আগে মেজবউ ছোটবউকে তিন সত্যি করিয়ে নিয়েছেন যে মেয়ে সম্প্রদান করার আগে বালা অপুর হাত থেকে খুলে নেওয়া হবে।

অপু সন্তর্পণে এদিকে ওদিকে চাইছে দেখে স্বর্ণ গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে খুঁজছ ভাই অপুদি?"

অপু ফিশ্ ফিশ্ করে বলল "ওঁরা আসেন নি?"

স্বর্ণ হেসে উঠল, বললে "কার কথা বলছ? বরের কথা?"

অপু লাল হয়ে উঠে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল "যা:"

তার মাও এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "দিদি বেহাইমশায়রা কতক্ষণে আসবেন?"

কনকলতা বললেন, "কাল ভোর ভোর এসে পৌঁছবে। এখন যা গরম, সারাদিনের তাপ কেউ সইতে পারে না। বরযাত্রীটাত্রি মিলে সে এক প্রকাণ্ড দল আসবে।"

ছোটবউ বললেন, "কাল গায়ে হলুদের তত্ত্ব করবেন ত?"

কনকলতা গম্ভীর ভাবে বললেন "হ্যাঁ, তাইত কথা আছে।"

ছোটবউ তাঁর গাম্ভীর্য্যে কিছুমাত্র না দমে বললেন "তা না হলেই ত চিত্তির।"

মেজ বউ ধমক দিয়ে উঠলেন "কি যে বাজে বকিস্ তার ঠিক নেই। চুপ কর্। এটা কুটুমবাড়ী না?"

(১২)

সে রাত্রে বিশেষ ঘুমটুম কারো হল না, অন্ততঃ বড়দের। ছোটরা ঘুমোল অবশ্য। ছেলেরা উঠানে রাস্তায় যেখানে পারল শুল, গরমে কেউ ঘরে শুতে চায়না। মেয়েরা বাধ্য হয়ে ঘরেই শুল, তবে গরমে কেউ ভাল করে ঘুমোল না। সকলের খাওয়াদাওয়া চুকতেই প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেল। ভোররাত্রি থেকেই আবার বরযাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্যে তৈরি হতে হবে, কাজেই যাদের সে ভার নিতে হবে, তারা একরকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোল।

রোদ ভাল করে উঠতে না উঠতে বিরাট দল এসে হাজির হল। বরপক্ষ অতরপক্ষ গোটা ত্রিশ বরযাত্রী,

হেমলতার বাড়ীর সকলে, তা ছাড়া কাজকর্ম করবার লোকজন কিছু। জিনিষ পর্বতপ্রমাণ সঙ্গে। ষ্টেশনের যতগুলি ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী এবং পদাতিক মুটে সব চলল এই সঙ্গে।

বাড়ীর সব লোক, রুগীরা ছাড়া, বেরিয়ে এল এই জনসমাগম দেখতে। প্রতিবেশীরাও জুটল। খানিকক্ষণ কল-কোলাহলে কেউ কারো কথা শুনতেই পেলনা, তারপর আস্তে আস্তে ভীড় ভাগ ভাগ হয়ে যেতে লাগল। বরযাত্রীরা নিজেদের জন্ম নব-নির্মিত বাসভবনে গিয়ে উঠলেন। রামপদ বাড়ীর ছেলেদের ঘিরে তাদের দেখা-শোনা চা বা সরবৎ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে লাগলেন। জিনিষপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে লাগল আর একদল। কলকাতা থেকে একটা রসুনচৌকির পার্টি এসেছিল, তারা সরবৎ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়েই বাজনা সুরু করল। ব্যস, পাড়ার যত বালকবালিকা আর শিশু সেইখানে গিয়ে জমে গেল।

কাজের লোকেরা এর ভেতরেই নিজের নিজের কাজ করে যেতে লাগল। রান্নাবান্না শুরু হল পরিপূর্ণ উৎসাহে, সেই সঙ্গে তরকারি কোটা মাছ কোটা। সবাইকে জলখাবার গুছিয়ে দিতে বাড়ীর মেয়েদের হাঁপ ধরে গেল।

এসব কাজে খানিকপরে যখন একটু মন্দা পড়ল, তখন কনকলতা এবং হেম বাড়ীর অন্যান্য বউঝিদের সাহায্যে গায়েহলুদের তত্ত্ব সাজাতে বসলেন। পাঁড়াগায়ে এরকম তত্ত্ব কেউ দেখেনি। শাড়ী জামার এত রকমারি আর এত বাহার গ্রামে কখন বা আর হয়েছে। এক বিন্ধ্যবাসিনী বেঁচে থাকতে রামপদর বিয়েতে খানিকটা এর কাছাকাছি ঘটা হয়েছিল। তাও তাঁর শহরের সঙ্গে কোনো কারবার না থাকাতে এত রকমারি হয় নি। চোখ বড় বড় করে যারা শাড়ী জামা দেখছিল গহনার বাক্স খুলে যখন সেগুলি চক্চকে ট্রেতে সাজান হতে লাগল তখন বাড়ীর লোক বাদে আর সকলে গালে হাত দিল। একটি মেয়ে কনকলতাকে জিজ্ঞাসা করল "এত গহনা সব দিচ্ছ তোমরা কণেকে?"

কনকলতা বললেন, "তা ছাড়া আবার কাকে দেব? কেনরে?"

মেয়েটি বলল "সার্থক শিবপূজো করেছিল বাপু তোমার দেওরঝি।"

হেমলতা বললেন "যা বল্লি। শিব কিন্তু কিছু তত্ত্ব করেন নি শ্বশুরবাড়ীতে। ভূত প্রেত নিয়ে নাচতে নাচতে চলে এসেছিলেন।"

মেয়েটি বলল "ওসব ঠাকুরদেবতার কথা ছেড়ে দাও। মানুষের মধ্যে যত ঘটা করবে, তত নাম হবে।"

আর একজন বলল "ও ঠাকুরঝি, এত বড় মাছ কোথা থেকে পেলে? এ যে দশ পনেরো সের নিঘ্যস হবে। বাবা, এতল্লাটে এত বড় মাছ কখনও দেখিনি।"

হেমলতা বললেন, "ও কি আর এতল্লাটের যে এখানে দেখবে? ও দাদার সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছে।"

কণকলতা বললেন "থাম ভাই তুমি, অত কথা বলতে গেলে তত্ত্ব পাঠাতে দেরি হবে। তারপর মেয়ের গায়েহলুদ হবে চান হবে, তবে ত লোকে খেতে বসবে। মেজকাকীমার উপর ভার দিয়েছি অভয়ের গায়ে হলুদ দিয়ে চান করাবার। কতদূর করলেন কি, দেখতে হয়। ওকে হলুদ তেল মাখান হলে তবে ত মেয়েকে সেই তেল হলুদ পাঠান হবে? শান্তি যা ত মা, দেখে আয় মেজদিদি ছোড়দিদি কি করছেন?"

শান্তি সে দিকে এগোবার আগেই স্বর্ণ ছুটে এসে বলল "এই, এই, কেউ খবরদার ওদিকে যেয়োনা সবাইকে ভূত সাজিয়ে দিচ্ছে বৌদিরা। দাদাকে চেনাই যাচ্ছেনা। দিদি শীগগির ভাল শাড়ী জামাটা ছেড়ে ফেল, সব নষ্ট করে দেবে।" সবাই বেশভূষা ত্যাগ করবার জন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল। রঞ্জনের যদিও ভাল ছাড়া খারাপ ফ্রক কিছু সঙ্গে আনেনি, তার মায়ের গায়েহলুদের কথা মনে ছিলনা, সে তবু কাপড় বদলাবার

জন্যে জেদ করতে লাগল। কেউ তার কথায় কান দিচ্ছেনা দেখে সে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে চিৎকারি কান্না জুড়ে দিল। অগত্যা হেমলতাকে ছুটতে হল এবং অনেক কষ্টে স্বর্ণলতার একটা পুরনো ছেঁড়া ফ্রক পরিয়ে মেয়ের মান ভাঙাতে হল।

অভয়পদর গায়েহলুদ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে যত মানুষ ছিল, সকলেরই। স্নানের আগে ব্যাপারটা কিছু মন্দ লাগলনা। অভয়পদকে অতঃপর তোলা জলে ঘরেই স্নান করান হল, কারণ এহেন মূর্ত্তিতে সে হেঁটে পুকুরে যেতে অস্বীকার করল।

অতঃপর তেল হলুদ জোগাড় করে নিয়ে কনের বাড়ীতে তত্ত্ব চলল। কনকলতা আবার ছুটলেন নিজের শ্বশুরবাড়ীর দলের দিকে, তাদের সিধা রাখতে, যাতে কোনোরকম বেফাঁশ কাণ্ড তারা না করে। ছোটবউকে বিশ্বাস নেই, অপুও ত হাবার একশেষ। যারা তত্ত্ব নিয়ে যাবে তাদের বখ্‌শিশ্‌ দিতে হবে তা যেন মেজকর্ত্তা, ছোটকর্ত্তা ভুলে না যান। একটা মেয়ের বিয়ে ত মেজকর্ত্তা দিয়েছেন, তাঁর ত জানা উচিত।

তাদের তালিম দিতে দিতেই বাইরে বিপুল শঙ্খধ্বনি আর হুলুধ্বনি শোনা গেল, এবং উঠোন অতিক্রম করে তত্ত্ববাহীরা এসে কনকলতার দাওয়ার সামনে দাঁড়াল। কনকলতা বেরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, হেম অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পাঠিয়েছেন। চাকরঝি কয়েকটা এসেছে, তাদের একএকজন দুখানা করে ট্রে কায়দা করে বহন করছে। প্রবীর, সমীর, শান্তি, স্বর্ণ সবাই তত্ত্ববাহীদের মধ্যে হাসতে হাসতে চলেছে। শান্তির হাতে গহনার ট্রে, প্রবীর বিরাট মাছটাকে ঝুলিয়ে আনছে। রঞ্জন শান্তির সঙ্গ ছাড়েনি, হাত না ধরতে পাক, শাড়ীর একটা অংশ মুঠো করে ধরে আছে। বেনারসী প্রভৃতি বেশী দামী কাপড়ের ট্রে সমীর বহন করছে। স্বর্ণর হাতে তেল সাবান, স্নো, সুগন্ধীর ডালা।

কনকলতা ভাবলেন, "হেম যা হোক বুদ্ধি রাখে। তত্ত্বকে তত্ত্ব নিরাপদে এসে গেল, এদের বখশিশে বেশী টাকাও খরচ করতে হলনা। ছেলেমেয়েগুলো যতখানি বরের বাড়ীর, ততখানি কনের বাড়ীর, কারো কিছু বলবার নেই। এখন মানে মানে সব গুছিয়ে তুলতে পারলে হয়। কিছু চুরি গেলে বড় লজ্জার কথা হবে।

তিনি খানিকক্ষণের জন্যে কন্যাপক্ষীয় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। নিন্দনীয় কিছু ঘটলে তার আঁচ তাঁর নিজের গায়েও লাগবে।

"ও ছোট বউ, গহনার ট্রে ঘরের ভিতরে নাও, বাক্সে চাবি দিয়ে রাখ। অপুর চান হলে তবে বার করে ওকে পরাবে। আর শাড়ী জামার ট্রেগুলি শান্তি আর স্বর্ণ ঘরের ভিতর নিয়ে যাও। মেজবউ তুমি ভাই এই খালি তোরঙ্গটাতে সব গুছিয়ে ঢুকিয়ে দাও। বাইরে শুধু রাখ ঐ লাল পেড়ে শাড়ীখানা, ঐখানা পরে অপু হলুদ মাখবে। আর চান করে উঠে ও পরবে, ঐ গোলাপী বেনারসীখানা। সায়া আর ব্লাউস-শুদ্ধ ওটা ঐ আলনায় ঝুলিয়ে রাখ। তেল সাবানের ট্রেটা আবার কোথায় গেল, ওতে অনেক দামী রূপোর কৌটোটৌটো আছে, তুলে ঐ তাকে রাখ। মেয়ে যখন সাজবে তখন দরকারমত নেবে ওর থেকে। আরে এই প্রবীর, মাছটা সরা দেখি এখান থেকে। ও সকলেরই দেখা হয়ে গেছে। যা, রান্নাঘরে ওটা নামিয়ে দিয়ে আয়। ও দস্যি মাছ কুটতে ভাজতেই বেলা উৎরে যাবে। মরু এত মাছি এসে জুটল কোথা থেকে? যাও দই মিষ্টি রাবড়ীর বারকোসগুলো ভাঁড়ারঘরে ছোট কাকীমার কাছে রাখ। মাছি ত জুটেইছে, এরপর কাকপক্ষী মিলে নষ্ট করবে। ওত সবাইকার দেখা হয়েছে, আবার খাবার সময় পাতে দেখবে।"

মেজবউ, আর ছোটবউ গোঁজ মুখ করে বড়জায়ের আদেশ পালন করতে লাগলেন। ডাল আলা বাপু

তত্ত্ব ত তাদের পাঠিয়েছে, কনকলতাকে ত নয়? তবে সে এত সর্দারি করছে কেন? অথচ তার ঘরে দাঁড়িয়ে ত তার সঙ্গে ঝগড়া করা যায়না? মেজবউয়ের ইচ্ছা ছিল খুব ভাল করে শাড়ী জামা ও গহনাগুলি দেখা এবং কোথাও খুঁৎ বার করতে পারলে সেটা সোল্লাসে প্রচার করা, কিন্তু বড় জা. ঠাকরুণ ত কাউকে কিছু ছুঁতেই দিলেননা। ছোটবউয়ের দৃষ্টি কিন্তু গহনা কাপড়ের দিকে তত ছিলনা, এ ত যেয়েই গেল, আজ হোক, কাল হোক, নেড়ে চেড়ে সবই দেখা যাবে, কিন্তু এত রকম, এত সুন্দর দামী দামী খাবার একটু ভাল করে দেখা গেলনা, অমনি ঝপ্ করে নিয়ে নিজেদের ভাঁড়ারঘরে তোলা হল। কেন গা, তারা কি অমনি লুটে-পুটে খেয়ে নিত সব? অবশ্য ইচ্ছা ত করেই খেতে। নিজের বাড়ীতে হলে তিনি সব জমিয়ে রেখে এক-মাস ধরে খেতেন।

মেজবউয়ের মেয়ে লীলা একেবারে জলে যাচ্ছিল, বোকা মুখ্যু অপুর কপাল দেখে। বলল "বাপ রে বাপ, পাতা চাপা কপাল বটে অপিটার। কত গহনা পেল দেখ, মাথার থেকে পা অবধি। জন্মে ত সোনা অঙ্গে ওঠেনি।"

ছোটবউ চটে বললেন "আর তুমি বুঝি একগা গয়না পরে মায়ের পেট থেকে পড়ে ছিলে? আমি বুঝি বিয়ের আগে তোমায় দেখিনি?"

মেজবউ বললেন "তোমরা থাম দেখি। অত হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হবেনা। যেমন ঘরে তেমনি বাইরে। সহবৎ শিক্ষা তোমাদের ছিটে ফোঁটাও হয়নি।"

দুজন চুপ করতেই কনকলতা মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন বৃদ্ধা গৃহিনীদের ডাকতে। এখন মেয়ের গায়ে-হলুদ না দিয়ে দিলে নাইতে খেতে বেলা গড়িয়ে যাবে। মেয়ের দল ঝাঁক বেঁধে এসে উপস্থিত হল। সবাই হুড়োহুড়ি করার জন্যে, আর হলুদ মেখে ভূত হবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে, ভাল কাপড়জামা যাতে নষ্ট না হয়। অপুকে সাধারণ জামা একটা আর লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়ে দাঁড় করান হল। সধবার দল তাকে তেল হলুদ মাখিয়ে গায়ে জল ঢেলে দিলেন। বাকি স্নানটা তারও তোলা জলে একটা বেড়ার ঘরে হল। এমনি অবস্থায় ত আর মেয়ে নিয়ে পুকুর ঘাটে যাওয়া যায়না। এদিকে বালিকা, যুবতী প্রৌঢ়া সকলে পরস্পরকে হলুদ-মাখানর খেলায় মেতে উঠল। বালকরাও তাতে যোগ দিল। অন্য পুরুষরা সভয়ে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করলেন, তবে সবাই আক্রমণ এড়াতে পারলেন না। অপুর বাবা ও জ্যাঠা মেয়েদের হাতে ধরা পড়ে আপাদমস্তক রঞ্জিত হলেন। ঘণ্টাখানিক ধরে চলল এই আনন্দকৌতুকের তাণ্ডব। তারপর মেয়ের দল স্নানের আশায় পুকুরঘাটের দিকে যাত্রা করল। ক'জন মহিলা মিলে এবার কনেকে ভাল করে ধুইয়ে মুছিয়ে সাজাতে বসলেন। চুল ত ভিজে গেছে কাজেই বাঁধার হাঙাম নেই নূতন বেনারসী শাড়ী আর জামা পরিয়ে দেওয়া হল। গহনাও সবগুলি পরিয়ে দেওয়া হল বাক্স থেকে বার করে। একেবারে অষ্টঅঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার। অপুর মুখটা লাল হয়ে উঠল, গোল চোখ আরো গোল দেখাতে লাগল। অপুর মা বললেন, "আমার মেয়েটাকে ত আর চিনতেই পারছিনা গো!

কনকলতা বললেন "সাজগোজ করলে সব মানুষকেই কিছুটা ভাল দেখায়।"

মেজবউ দেখে শুনে বললেন "জড়োয়া গহনা একখানাও দেয়নি দেখি। শহরে কি ওসবের চল নেই আর?"

হেমলতা বললেন, "চল থাকবেনা কেন? এখানে সবাই সোনার গহনাকেই গহনা বলে জানে, অন্য জিনিষের

কদর বোঝেনা, তাই সোনার গহনাই দেওয়া হল এখানে। কলকাতায় আসুক বউ, তখন 'জড়োয়া' সেট দেওয়া হবে।"

কন্যাপক্ষ আর বরপক্ষ পরস্পরের খুঁৎ ধরতে পেলে খুব খুশী হয়! কিন্তু এখানে এই নির্দোষ আনন্দের ক্ষেত্র বড়ই সঙ্কুচিত ছিল। রামপদর মত বদান্য বরকর্তাকে কিই বা বলা যায়? এমন মানুষ কন্যাপক্ষীয়রা ইতিপূর্ব্বে দেখেইনি।

কনকলতা বললেন "এবার পাতা করগো। বেলা ঢের হয়েছে। সব এক জায়গায় খাওয়ার সুবিধা এখন হবেনা। এই দাওয়ায় একসার পাত দেও, এই আলপনার ধার দিয়ে। জন কুড়ি ধরবে মাঝে কার্পেটের আসন দেও অপুর জন্যে। বোনরা ভাজরা সব ওকে নিয়ে বোসো, যতজনকে ধরে। আমি অপুর জন্যে থালা সাজিয়ে খাবার নিয়ে আসছি, ও আজ পাতায় খাবেনা। ছোট বউ, তুমিও তাই বোস এই সঙ্গে, মেয়ের মুখে প্রথম মাছ ভাতের গ্রাস তুমি তুলে দেবে।"

মেয়েরা জায়গা করতে আরম্ভ করল। পরিবেশনকারীর দল ডেকচি, চ্যাঙারি, পিতলের বালতি প্রভৃতি নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন। হেমলতা, কনকলতা মিলে রূপোর আর শ্বেত পাথরের বাসনে সব খাবার সাজিয়ে নিয়েএলেন অপুর জন্যে। খাদ্যদ্রব্যের ঘটা দেখে অপু আর অপুর মায়ের দুজনেরই জিভে জল এসে গেল। এত সুখাদ্য একসঙ্গে কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টার দিকে চাওয়া যায়?

অপুর মুখে মাছ দেওয়া হতেই শাঁখ বাজল। অভয়পদর খুব ইচ্ছা করল একবার গিয়ে কনেকে দেখে আসে। কিন্তু সে ত বেজায় অশাস্ত্রীয় ব্যাপার হবে। পল্লী বাঙলার আচার অনুসারে বিয়ের সময় শুভদৃষ্টির আগে বরকনের দেখা হওয়া বারণ। কাজেই অভয়পদ অপুর পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার দৃশ্যটা আর দেখতে পেলনা। বাড়ীর ও বাইরের সকলের খাবার জায়গা ভাগে ভাগে নানাস্থানে করা হল। নিমন্ত্রিতরা আজ বেশী ভাগই মেয়ে, কাজেই কলহাস্যে সারা বাড়ী ধ্বনিত হয়ে উঠল। গল্প করে ঠাট্টা তামাসা করে খেতে খেতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। রাত্রে আবার যে পেট ভরে খাওয়া যাবে এ সম্ভাবনা আর বিশেষ রইলনা।

খাওয়া শেষ করেই কনকলতা আবার ছুটলেন মেয়ের সাজ পোশাক গহনাগাঁটি সব খুলে তুলে রাখতে। অপুর বিশেষ ইচ্ছা ছিলনা এখন গহনা কাপড় ছাড়ার কিন্তু বড় জ্যাঠাইমাকে সে অত্যন্তই ভয় করত, কাজেই তাঁর কথা মত শাড়ী গহনা সব ছেড়ে দিল। কনকলতা তার হাতের ক'গাছা করে চুড়ি রেখে দিলেন, আর বললেন, "ভাল কাপড় একখানা পরে থাক্। এই যে এই সবুজ ডুরেটা পর। অন্যরা কিছু খাক না খাক রাত্তিরে তুই ভাল করে দই মিষ্টি খেয়ে নিবি। কাল ত সকাল থেকেই উপোসের পাট সুরু হবে।"

পরদিনটা যে কোথা দিয়ে কেমনভাবে কাটল, কনকলতা যেন টেরই পেলেননা। যন্ত্রচালিতের মত তিনি [illegible]নে কাজ করে চললেন। বাঙালি হিন্দুর বিয়ে তার ক্রিয়াকাণ্ড যে কত তা বলে শেষ করা যায় না, অনেকে [illegible]নেই রাখতে পারেনা। এক্ষেত্রে দুই বৃদ্ধা গৃহিণী, পুরোহিত মশায় এবং নাপিতের কাছে অনেক সাহায্য পাওয়া [illegible]ল। খাওয়া নাওয়া একরকম করে সেরে নেওয়া হল। বর আর কনে অবশ্য ভাত খেলেন না, তবে অন্য জিনিষ [illegible]ছু যে খেলোনা তা নয়। বিরাট ভোজের আয়োজনে লেগে গেল একদল, বাড়ীর মেয়েরা অনেকেই এই দলটির [illegible]হায্য করতে লাগলেন। আর একদল লাগলেন বিয়ের আসর সাজাতে, এবং আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে। [illegible]নকলতা এবং হেমলতা হাজার কাজের মাঝে মাঝে অপুদের বাড়ীর তদারক করে যেতে লাগলেন। অপু বেশী [illegible]গই হাঁড়িমুখ করে বসে আছে। খেতে না পেয়ে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, থেকে থেকে লীলার সঙ্গে [illegible] মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে। মেজবউ ছোটবউ চুপচাপ বসেই আছে বেশীর ভাগ, মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে নিচ্ছে

সন্ধ্যে হতে না হতেই গ্রামের এই পাড়াটার চেহারাই বদলে গেল। এত আলো এদিকে কেউ কখনও দেখেনি, এত বাদ্যভাণ্ডও শোনেনি। নিমন্ত্রিত যারা তারা ত দুপুরের পর থেকেই এসে জুটল, সব কিছুতে যোগ দিতে। যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তারাও দলে দলে আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গণ্ডি ডিঙিয়ে ছেলে মেয়ের দল যত্রতত্র নির্ব্বিচারে পথ করে নিল।

সন্ধ্যে হতে না হতেই এদিক্‌কার ঘরে কনে সাজানও আরম্ভ হল। বেশীর ভাগ বালিকা আর যুবতী এই দিকেই জুটলেন। কনকলতা তাদের জিনিসপত্র জোগান দিতে লাগলেন। মেজবউ, ছোটবউ, লীলা সবাই অপুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। অন্নপূর্ণার বিয়ের লাল বেনারসী শাড়ী আর কিংখাবের জামা পরান হল অপুকে, সবগুলি গহনাও পরান হল। বলা বাহুল্য মেজবউ তাঁর মেয়ের বালা তাড়াতাড়ি অপুর হাত থেকে খুলে নিয়েছিলেন। বাপের বাড়ীর দিক থেকে তাকে এক জোড়া দুল এবং পায়ের রূপোর নূপুর দেওয়া হয়েছিল তাও পরান হল, কারণ গায়ে সোনা আর রূপো না থাকলে কন্যাসম্প্রদান নাকি শুদ্ধই হয়না। একজন কলকাতার বউ এসে পরিপাটী করে কনে-চন্দন পরিয়ে দিলেন। মন্দ দেখালনা কনেকে, তবে তার শাশুড়ী বা দিদিশাশুড়ীকে যারা দেখেছিল তারা মন্তব্য করল যে এই বউ তাঁদের জায়গায় দাঁড়াবার যোগ্য হলনা।

অভয়পদকেও সাজিয়ে গুজিয়ে দেওয়া হল। বৃদ্ধা ঠাকুরমা ও ভাইপোরা এখানে ভার নিলেন। চন্দনও পরান হল, ফুলের মালাও গলায় দুলল। কনে সাজানর দলের বৌঝিরা মাঝে মাঝে এসে এদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে গেলেন।

এরপর প্রবল শঙ্খধ্বনি আর হুলুধ্বনির মধ্যে বর আর বরযাত্রীরদল বিয়ের আসরের দিকে অগ্রসর হলেন। মণ্ডপ খুব বড় করেই বাঁধা হয়েছিল, আর বিভিন্ন কাজের জন্যে আলাদা আলাদা ভাগ সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। স্ত্রী-আচার প্রভৃতিও এইখানে করা হল। সুসজ্জিতা যুবতী, বালিকা প্রৌঢ়ায় জায়গাটি ভরে গেল। বরকে বরণ করলেন কনকলতা। বহুকাল পরে তিনি গহনা পরেছেন, চাঁপাফুলের রঙের জরি-পেড়ে গরদ পরেছেন। কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগল, "দেখেছ এখনও কত রূপ! বুড়ী সেজে থাকে বলে সত্যিই ত আর বুড়ি হয়ে যায়নি? মায়ের চেহারা পেয়েছে।"

কনেকে নিয়ে আসা হল। সাতপাক ঘুরিয়ে, শুভদৃষ্টির জন্যে মাথায় আবরণ দেওয়া হল। অভয়পদ তাকিয়ে দেখল। সুসজ্জিতা অপুকে দেখতে মন্দ লাগছেনা, কিন্তু অমন ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে চেয়ে আছে কেন? মেয়েটির কি লজ্জা কম? না, এখনও মনোবৃত্তি শিশুসুলভ আছে?

অপু ভাবল, বর অমন রাগী চোখে তাকিয়ে আছে কেন? কনেকে দেখে তার ভাল লাগছেনা নাকি? কেন আয়নায় ত ভালই দেখাচ্ছিল? অমন দামী বেনারসী, আর এক গা গহনা পরেছে ত। আর বর নিজেই বা কি এমন অপূর্ব্ব দেখতে? তার চেয়ে শ্বশুরমহাশয়ের ত ঢের ভাল চেহারা।

বিয়ে ত হয়ে গেল। তারপর ভোজের হট্টগোল, কল-কোলাহল। এরমধ্যে একদল যুবতীমেয়ে বর-কনেকে নিয়ে গিয়ে বাসরে বসাল। ঘরটি দেখতে দেখতে নানা বয়সের মেয়েতে ভরে গেল। দিদিমা ঠাকুরমা অনেকগুলি জুটেছিলেন, কাজেই রসিকতা চলতে লাগল নানারকম। গানটানও মধ্যে মধ্যে হল। বেশ খানিকটা রাত হলে বরকনের সারাদিনের উপবাস ভঙ্গ হল। অপুর তখন এত ঘুম পেয়েছে যে ভাল করে খেতেও পারল না। বারবার বালিশের গায়ে ঢুলে পড়তে লাগল। মেয়েকে রসিকতা করে তাকে প্রতিবারই ঠেলে তুলে দিতে লাগল।

অভয়পদর ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। অপু এমন কিছু কচি খুকী নয়। তের চোদ্দ বছর বয়স ত হয়েছে। ও বয়সের বাঙালী মেয়ে বেশ চালাক চতুর হয়ে যায়। বিয়ে মানুষের একবারই হয়, বাসরও একবারই। সে সময়টা খালি ঘুমিয়ে পার করে দেওয়া কিছু বুদ্ধিমতীর কাজ নয়। একটু বিরক্ত দৃষ্টিতেই বর বারবার নিদ্রালু বউয়ের দিকে তাকাতে লাগল। [ক্রমশঃ

চাই

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সভ্যতাতে দাবী যাহার—
নহে অকিঞ্চিৎ,
বেশে বচন ব্যবহারে
নিত্য অকুৎসিত।
আছে বিবেক নিষ্ঠা ভক্তি,
শ্রদ্ধা, বিনয়, অনুরক্তি,
ঔৎসুক্য যার দেশ ও জাতির
করতে সদাই হিত।

২

বক্ষভরে, আছে যাহার
পূজার নীলোৎপল,
চক্ষে যাহার সোনার স্বপন
বিপুল মনের বল।
সবার সঙ্গে থাকে মিশে,
তবু সুদূর পিয়াসী সে।
সেই তো বৃহৎ মহৎ হবে
আন্‌বে সুমঙ্গল।

৩

রুচি তাহার সূক্ষ্ম শুচি
দ্বন্দ্ব দ্বিধা নাই।
সর্ব্বশক্তি মানের সনে
যোগ তাহার সদাই
সত্যাশ্রয়ী, অকুতোভয়,
সবেই তুষ্টি, সব কাজে জয়—
আপ্‌নি উঠে—দেশকে উঠায়
তাকেই মোরা চাই।

বারমাসা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

ত্রেতায় শবরী ছিল আর ছিল অহল্যা পাষাণী
প্রতীক্ষা করিয়াছিল কার তুমি আমি জানি।
দেখেছিল প্রতিদিন কত ঋতু মাস। ফাল্গুনের হাসি মুখে
ফুল ফোটা ঝরা।
শ্রাবণের রাতভরে চুপি চুপি ভিজাপায়ে
বকুলের গন্ধমাখা গায়ে—আশা যাওয়া করা।
দেখিয়াছে আশ্বিনের সোনালী রোদ্দুর,
আঁচল উত্তরী তার বিছায়েছে কত দূর দূর।
শস্য কোলে অঘ্রাণেরে! পৌষের তীক্ষ্ণ কাঁপা শীত,
গাছে গাছে পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে হইয়াছে পীত।
আবার এসেছে চৈত্র বাতাসে বাতাসে অট্টহেসে।
—পায়ে পায়ে এসেছে বৈশাখ।
ত্রেতায় শবরী আর অহল্যা পাষাণী।

* * * * *

দুরু দুরু বুকে শুনিয়াছে তাহাদের পদধ্বনি আর সেই 'বারমাসা'
ডাক্।
প্রত্যহ ভেবেছে তারা প্রতীক্ষার হ'ল বুঝি শেষ!
'কে আসিবে' 'কে আসিবে' বলে পড়ে নাই নয়নে নিমেষ।

* * * * *

কে আসিবে জানিত কি?—জানিত না। আহা! জানিত না।
রাম নয়। কেহ নয়। সে শুধু কল্পনা।
আমিওতো শুনিয়াছি জীবনের ঋতুপথে বিরহের কত বারমাসা।
আমিওতো করিয়াছি কত বর্ষ মাস পথে সেই কার আসিবার
আশা
প্রেম নয় হে শবরী। হে অহল্যা শোনো শোনো
নহে সে শ্রীরাম।
আমি তার নাম জানি।
শুনিয়াছি কণ্ঠে তার আছে ঘুমপাড়ানীয়া বাণী!
দুই হাতে পরম বিরাম।
হয়তো হবে সে প্রেম! হয়তো শ্রীরাম!
কিন্তু মৃত্যু তার নাম।

স্পর্শমণি

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দূরে আছ, তাই তুমি এত লোভনীয়,
স্পর্শমণি সম হায় একান্ত দুর্লভ,
প্রাণে আশা, ওষ্ঠ তবু রয়েছে নীরব,
কত যুগ-সাধনায় হে আমার প্রিয়!
হবে তুমি অসঙ্কোচে মোর বরণীয়?
মালিন্যবিহীন তুমি স্বর্গীয় বিভব,
মোর স্বপ্ন-কাননের কুসুম পেলব,
তোমারে পাবার সাধ স্বপ্ন কমনীয়।
জানি তুমি আসিবে না প্রাণ-কুঞ্জতলে
সান্ধ্য-গৃহ-প্রত্যাগতা কপোতীর মত,
তবু মোর নাহি ক্ষোভ, ভিজি' অশ্রুজলে
কভু কি সফল হয় আশা অবিরত?
নহ পাশে, তাই তুমি ঈপ্সিত আমার,
কাছে এলে ভেঙে যাবে স্বপ্ন চেতনার।

উত্তর মেরু

করুণাময় বসু

কানন শিয়রে রয়েছে আঁকানো রাঙানো বাঁকানো চাঁদ,
যেন বিহঙ্গ অঙ্গ মেলেছে নভে;
সুদূরবিসারী পথের প্রান্ত, আকাশে অনেক রাত,
সঙ্গ তোমার যাত্রা-পাথের হবে।
তুমি আর আমি কালের নদীতে পাশাপাশি দুটি তীর,
কোথায় মিলিব আঁধারে জানে না কেউ?
এই ক্ষণটুকু পান্থ-পাখির ক্লান্ত করুণ নীড়,
কখন ভাঙিবে অদূরে সাগর ঢেউ।
প্রাণের পাত্র ভেবোনা বন্ধু, সফেন তরঙ্গিত,
কোন অলক্ষ্মী ফিরিছে পথের বাঁকে;
নিমিষে ফুরাবে প্রণয়-নাটিকা ভূমিকা সম্বলিত,
লক্ষ্মীছাড়ারে অলক্ষ্য হতে ডাকে।
তুমি যেন কোন মেরুর আকাশে সুদূরের শুকতারা,
নিয়ে সাগর, বাঁধিবে কে বলো সেতু?
পার হয়ে গেল উত্তর মেরু যাযাবর পাখি যারা,—
গৃহ-বন্ধনে বাঁধিবে তারা কী হেতু?

আর ফেরেনি

রেবা ভবানী

আবার যদি ডেকে বল
কান্না-ভেজা সুরে—
'পত্রলেখা' ফিরে এসো
আমাদেরই একান্ত এ
নিবিড় রচা নীড়ে!
ফিরবে না আর পত্রলেখা,
পথ পেরিয়ে সে তো তখন
অনেক অনেক দূরে—
ফুলের গন্ধে মদির বাতাস,
তন্দ্রাহারা রাতে;
চিরকালের আদিম-হবা
হঠাৎ যদি জেগে উঠে
পূজার অর্ঘ্য হাতে!
শাশ্বতী ইভ কোথায় তখন?
ব্যর্থ বাতাস, ফুলের সুবাস,
পাগল-করা স্নিগ্ধ আঁধার
ইভ সে তোমার হারিয়ে গেছে
লক্ষ তারার ভীড়ে।
"পত্রলেখা, লক্ষী, সোনা
আর থেকো না সরে
দুয়ার খোলা, দাঁড়িয়ে আছি
একলা তোমার তরে।"
পত্র লেখা ব্যর্থ হল
লিপিকা ঐ হাওয়ায় উড়ে
ধুলার 'পরে লোটে—।
'পত্রলেখা' ফিরবে না আর
হারিয়ে গেছে পুরাতনী
চিরকালের তরে॥

আবর্তন।

বিভা সরকার

কখন যে চলে গেছে জীবন প্রত্যুষ
উদ্ভাসিয়া চারিধার অরুণ ছটায়
সলাজ রক্তিম পায় উষা মূর্তিময়ী
গিয়েছেরে ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলায়।
নয়ন সম্মুখে নীল আকাশ অসীম
দীর্ঘপথ কত আশা এ শিশু পথিক,
কল্পনার পারাবার হবে বলে পার
ডানামেলি ভীরু পাখী ওড়ে অনিমিখ।
পার হয়ে কত তীর কত বালুচর
আনমনা উড়ে চলে ক্লান্তিহীন পাখা,
কত নব জনপদ হয়ে এল পার
কত যে গোধূলি মেঘে ভীরুপক্ষ ঢাকা।
শুধু চলা দুর্নিবার সম্মুখের পানে
অজানার কোন গান করেছে বিহ্বল
ছুটে চলা শ্রান্তিহীন এ কাহার টানে
ওরে ক্লান্ত আজি কেন আঁখি ছলছল।
সোনার কৈশোর গেল বেপথু চঞ্চল
আলোয় আলোয় ভরি এই ত্রিভুবন
নয়ন সম্মুখে শুধু আশা ভালবাসা
বসন্তের সমারোহে ভরা তনুমন!
আপন অন্তর হতে সঞ্জীবনী সুধা
কৈশোর বিলায়ে গেছে মুঠি মুঠি তুলি
হতাশার দীর্ঘশ্বাস সে কভু ফেলেনি
অক্লান্ত সে অকারণ উঠেছে আকুলি।
ফোটার মাতনে মাতা কলি আধফোটা
আপনার গন্ধভারে করে টলমল
ফুটিব ফুটিব এই দুরন্ত তিয়াষা
বেপথু পবনে মাতি হয়েছে চঞ্চল!
রবিকর পাঠায়েছে অফুরন্ত প্রাণ .
জীবনের জয়গানে বাধা বন্ধ হারা
কোন আশা পারাবার পার হবে বলি
হে উন্মনা ছুটেছিলে পাগলের পারা?

কোন মায়া কুহকিনী ভোলায়েছে পথ
পথভ্রান্ত হয়েছ কি বিহ্বল পথিক ?
প্রাণের পূজারী তুমি যৌবনের দূত
কঙ্কর বিছানো পথে সত্যের ঋত্বিক।
আজি যেন মনে হয় শ্রান্ত তব ডানা
যাত্রা তব লক্ষ্যহীন যেনরে অশেষ
জীবন মধ্যাহ্নে আজি হে ক্লান্ত পথিক
পাওনি কি আপনার পথের নির্দেশ ?
কাকলি মুখর কণ্ঠ কেনরে নীরব
সঙ্গীত মূর্চ্ছনা কেন ভরে না আকাশ ?
নয়নে নাহিরে কেন স্বপ্নালস মায়া
এরই মাঝে সর্ব্ব অঙ্গে শ্রান্তির আভাস ?
মধ্যাহ্ন গগন বুঝি আজি দুর্বিষহ
তাপদগ্ধ ছায়াহীন বেদনা জর্জ্জর—
ওরে শ্রান্ত! আগে চল পথ ধূলা দলি
ভয় কি! আসিছে ধীরে গোধূলি সুন্দর!

আপনার শ্যামশান্তি ছড়ায়ে ভুবনে
বুকে লয়ে মমতার স্নেহময় বাণী,
শ্রান্তি ক্লান্তি মধ্যাহ্নের মোছাতে যতনে
আকাশে বাতাসে তারি ওঠে কানাকানি।

সায়াহ্নের অনাগত দূর পদধ্বনি
কান পেতে শোন ওরে ঐ যায় শোনা
মধুর গোধূলি লগ্নে হবেরে মিলন
বৃথা নয়! ব্যর্থ নয়! এই আনাগোনা।

শামুক

শ্রীসুধীর গুপ্ত

গুটাইয়া আপনারে আপনার মাঝে
কোন্ সাধনায় থাকো সর্ব্বদা উৎসুক ?
শৈবাল-শোভিত শান্ত সরসী-শামুক,
তোমারে ঘিরিয়া এ কী মৌনতা বিরাজে!
আন্দোলিত শর-বনে শত শব্দ বাজে,
মাঝে মাঝে তরঙ্গিত হয় বাপী-বুক,
পতঙ্গেরা রঙ্গ-ভরে জমায় কৌতুক
কলমীর লতা যেথা শোভে শ্যাম-সাজে।

ফড়িংয়ের স্ফূর্তি-ফুল্ল ডানার ঝাপটে
পাশের ফুলন্ত শাখে পাতায়-পাতায়
মৃদু-মন্দ কোন্ ধ্বনি বেজে ওঠে তটে!
পলাতকা ধ্বনি ফিরে নীরে কি মিশায় ?
তুমি থাকো নির্ব্বিকার তা'দেরই নিকটে,—
বাচ্যাতীত কী স্তব্ধতা, ধ্যানে যারে পায়!

নব বসন্ত

শ্রীপ্রতীপ দাশগুপ্ত

হে কন্দর্প, কেন বৃথা তীর হানো
জরা-মন, বসন্ত-অজাগর শরীরে,
এ অনালোকোজ্জ্বল দেহ-মন ক্যাকাসে তা মানো,
কোটী বসন্ত-গীত শুনিবে না এ বধিরে।

* * * *

শান্তির হাওয়া কোথায়? বিশীর্ণ
বৃক্ষের পাতার ঝালর—
যখন যৌবন ছিল যাযাবরী রোদে
মসৃণ খেয়াঘাটে একা
তখন দুঃখের রিক্ত শেওলাপড়া পিচ্ছিল
পথে এসে দাও নি তো দেখা,
তখন করনি তো বসন্ত-পুষ্পিত পথ, দাওনি তো
স্বপ্ন, গান আর স্বর্গ-ঝরণা আলোর।

* * * *

হে কন্দর্প, তবে অসময়ে স্থবির মানসে
বসন্তের ছবি কেন আঁকো?
বিগত-বসন্ত-দেহে তীর হেনো নাকো।
—হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে আঁকো ছবি,
গাও গীত নব বসন্তের,
রিক্ত বঞ্চিত যারা সেনা মরণের—
তাদের শোনাব তোমার গান, তোমারই বাণী,
অন্ধকারে আলোর ব্যাখানী।

অমিত-বিক্রম প্রেম

দিলীপ দাশগুপ্ত

অসহ্য এখুনি হোলো? রূপরসগন্ধবর্ণ শব্দের ভুবনে
এখনো তৃষ্ণার তৃপ্তি হোতে বহু বাকী।
এখনো অস্থির মন বহু লাবণ্যকে
স্থিরলক্ষ্যে ধরে ধরে রাখতে ব্যাকুল!
তবুতো সকলি যায়। ফিরে যায় ছেড়ে তপোবন।
যৌবনের শেষপর্বে একান্ত গভীর দীর্ঘশ্বাস
যন্ত্রণায় ঋজু হয়।
এইই সম্ভবত সত্য।

এই সত্য স্পষ্ট-তীক্ষ্ণ-কঠিন-উজ্জ্বল তলোয়ার
কেটে দেয় আত্মপ্রাণ সকল বন্ধন
ভোলায় সকল শান্তি :
পলাতকা মানসীর স্মৃতি ;
অবিচার-অত্যাচার-কৃতকর্ম যথেষ্ট সকল
করেছি যা আমুক্তে রিপুর ক্রীড়ায়।
দ্যূতক্রীড়াপ্রাপ্ত বিত্ত হয় তাই ক্ষয়।
নিঃশেষিত সুধাপাত্র ; প্রান্তরের বুকে,
উদার আকাশতলে, একাকীত্ব নিয়ে
আত্মদৈন্য-ছলনার প্রয়াস নিষ্ঠুর !
তবু তীব্রদাহ-দীর্ণ, অমিত-বিক্রমে
আমি আজও তেজদীপ্ত রৌদ্র বৈশাখের,
আর আমি ছোট কাঁটা অসহ-অস্থির
পরকণ্ঠলগ্নী প্রেমিকার বুকে-চোখে।

অনাশ্রয়ী বেদনায়

মনোরমা সিংহরায়

অনাশ্রয়ী হৃদয়ের নিঃসঙ্গ বেদনা কখনও
তোমার হৃদয়ে যদি আনে কিছু বিষণ্ণ আঘাত
হয়তো সেদিন তুমি অপরিচয়ের কুয়াশায়—
অজানিত মূঢ়তায় একবার তাকিয়ে তবু
ফিরাবে তোমার মুখ। সেও যাবে অনাদরে হায় !
হয়তো দুহাত মেলে একদিন কখনো আশায়
চাইলেও সে তখন দূরান্তরে মিশে গেছে আর—
প্রতিচ্ছায়া ফুল নয় ধরিয়েছে শুধু ক্যাকটাস।

* * *

তোমার অলিন্দে টবে হয়তো রাখবে তখন
সে হবে গৃহের শোভা। তবু জানি নিশীথ বাতাস
যখন অনিদ্রা এনে চোখে মুখে দু'হাত বুলায়
তখন পড়বে মনে ফুটতোই সুগন্ধ কুসুম
হারিয়েছে একেবারে সে তোমারই কী অবহেলায় ॥
শুধু এক দীর্ঘশ্বাস ! মনে হবে ব্যর্থ এই রাত ‼

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বন্যা-দুর্গতদের জন্য লঙ্গরখানা

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বলেন, বন্যার্ত্তদের লঙ্গরখানায় খাওয়ান অপেক্ষা খয়রাতি সাহায্য-
ন শ্রেয়। তাঁহার মতে লঙ্গরখানায় দুর্গতদের দীর্ঘকাল ধরিয়া খাওয়ানো—তাহাদের সম্মানহানির কারণ
ইতে পারে। রাজ্যপালের এই উক্তির মধ্যে সত্য নিহিত আছে। ভদ্রভাষায় যাহাই বলা হউক না কেন—
রখানা হইতে দুর্গতমানুষকে খাদ্য বিতরণ সহজ কথায় 'কৃপা'-প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য
প্রসঙ্গে এই কথাও বলা প্রয়োজন, অবস্থা বিবেচনায় দু-চার দিন পরম বিপর্য্যের মধ্যে অসহায় মানুষকে
ন্তাত কিংবা খিচুড়ি বিতরণ করতেই হইবে, কিন্তু এই ব্যবস্থা একান্তভাবে এমারজেন্সী ব্যবস্থা বলিয়া
ণ করিতে হইবে। অবস্থার একটু উন্নতি এবং দুর্গত মানুষ বিপদের প্রথম প্রচণ্ড ধাক্কাটা সামলাইয়া লইলেই
হাকে চালডাল এবং অন্যান্য খাদ্য সম্ভার খয়রাতি হিসাবে দিলে তাহার মনের ভিখারীর হীন ভাবটা খানিকটা
টিয়া যাইবে। পেশাদার ভিক্ষুক এবং যাহারা সাধারণভাবে নানা অছিলায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে,
হারা ছাড়া অন্য সকল মানুষই কৃপা বা ভিক্ষার দান হিসাবে লঙ্গরখানায় গিয়া বিতরিত খাদ্য গ্রহণে একটা
সিক পীড়া এবং অপমান বোধ করে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গে যে-বার দামোদরের বিষম বন্যায় দামোদরের
বর্ত্তী-বর্দ্ধমান প্রভৃতি সুবিস্তৃত একটা অঞ্চল, বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান ডিভিশন, ৩.৪ হইতে ৭.৮ ফুট জলের মধ্যে
য়া যায়, সেইসময় (বোধহয় ১৯১৩), আমরা একদল ছাত্র আচার্য্যদের সঙ্গে বন্যাত্রাণ কার্য্যে যাই। সেই
, বলিতে ভাল লাগে, বাঙলার ছাত্রসমাজ দুর্ভিক্ষ এবং বন্যাত্রাণ-কার্য্যে একটা প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ
ত। সেই সময় মাইলের পর মাইল, চিড়া, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসম্ভারের ছোট ছোট বস্তা ঘাড়ে করিয়া
বীর জল বাহিয়া আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাই। গরীব মুটেমজুর এবং ক্ষেতখামারে কাজ করে এমন সব
ক সাগ্রহে সাহায্য গ্রহণ করিত, কিন্তু গ্রামের গৃহস্থ, এমন কি চাষী পরিবারের লোকেরাও, সহজে দান
া চিড়া গুড় গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই! তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত চারপাঁচ দিন প্রায় অনাহারে
হ। এই সব লোকেদের বাড়ীতে জোর করিয়া, এমন কি বহুক্ষেত্রে 'পরে দাম লইব' কথা দিয়া চিঁড়া-গুড়
ও দিতে হয়। কথাটা হয়ত অদ্যকার মানুষ সহজে বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু একটি কথাও, বাড়াইয়া বলা
থাক, কম করিয়াই বলা হইল। ১৯১৬ সালে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষেও। মানুষের এই পরিচয়ই পাই। গ্রামের
গ্রামে গিয়া, বহু অনুসন্ধান করিয়া—দুর্গত গৃহস্থপরিবারের খোঁজ লইতে হয়, সন্ধ্যার পর, অন্ধকারে অজ্ঞে
তে তাঁহাদের বাড়ীতে চাউল, ডাইল, মুড়ি, চিঁড়া গুড় প্রভৃতি পৌঁছাইয়া দিতে হয়। সাঁওতালদের মধ্যেও
ময় এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অশিক্ষিত সাঁওতাল, সহজ সরল মানুষ, ভিক্ষা বা কৃপার দান হিসাবে

সাহায্য লইতে রাজী হইত না, অনাহারে মরিবে, তবু প্রাণ থাকিতে ভিক্ষার হাত পাতিবে না—এই যেন ছিল সেই সব সহজ সরল মানুষদের পণ।

দুর্গতদের ত্রাণে আমরা বহুজন সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করি—'ভিক্ষা দি' বলাই ঠিক হইবে,' কিন্তু কয়জন, মানুষের প্রতি প্রীতি এবং প্রকৃত মমতার সহিত ইহা দি বলা শক্ত। অর্থবান যাঁহারা শত শত হাজার হাজার টাকা-ত্রাণ তহবিলে দান করেন, সংবাদপত্রে যাহাতে তাঁহাদের নাম সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে এই ব্যতিক্রমের সংখ্যা খুবই কম।

প্রায় ৫০ বছর পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গের ভীষণ প্লাবনের সময় আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কিছু কাজ করি। সুভাষচন্দ্র বন্যাস্থলে (আত্রাই অঞ্চলে) রিলিফের কাজে ছিলেন আমরা কয়েকজন সায়ান্স কলেজে অর্থাদি দান গ্রহণ এবং যথারীতি রসিদ দেবার কাজে নিযুক্ত থাকি। আমি সেই সময় প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা দুইখানির একজন সহ সম্পাদক। আচার্য্যদেব শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত পত্র দিয়া আমাকে ছয় মাসের জন্য তাঁহার বন্যাত্রাণ কাজে সহায়তা করিবার জন্য লইয়া যান—। যাক, সেই এমন অনেক দাতা অর্থদান করিতে আসিতেন, যাঁহারা ১০০০।২০০০।৩০০০ টাকা দিয়াই চলিয়া যাইতেন, রসিদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া। সংবাদপত্রে ইঁহাদের দান "অজ্ঞাতনামার দান" বলিয়া স্বীকৃত হইত। এই প্রকার অজ্ঞাতনামা দাতাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই হয় পার্সী, আর না হয় বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান বণিক। অজ্ঞাতনামা বাঙ্গালী দাতার নাম মনে পড়ে না। শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এ বিষয় বহু তথ্যের অধিকারী। এই ভাবে-অজ্ঞাত-নামাদের দান প্রায় ২০ লক্ষ টাকা উঠে। এত কথা বলার একমাত্র কারণ এই যে, বিগত যুগে দুর্গত ত্রাণে মানুষ অর্থ ইত্যাদি দেওয়াকে দান বলিয়া মনে করিত না। মানুষের প্রতি মানুষের মমতা এবং কর্ত্তব্যবোধেই ইহা করিত। আর একটি কথা বলে চলে—দুর্গতত্রাণের কাজে সকল দলীয় এবং সকল মতাবলম্বী মানুষ একযোগে কাজ করিত এবং স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা' বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ থাকিত সর্ব্বাগ্রে। আজ ইহা স্বপ্নের কথা মাত্র। (৭-৯-৬৮)

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈ-এবং হৈ-রাজ্য অবসানের বিনীত নিবেদন

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিগত সমাবর্ত্তনে যে দীক্ষান্ত ভাষণ দিয়াছেন, তাহা গতানুগতিক উপদেশাবলী মাত্র নহে এবং সুষ্ঠু ভাষণের জন্য কেবলমাত্র তাৎপর্য্যপূর্ণ-ই নহে, অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সুনীতিকুমার শিক্ষকতা কার্য্যেই তাঁহার জীবনের মূল্যবান এবং অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। আমরা এবং আমাদের মত সকল অ-পণ্ডিতের দল মনে করে যে শিক্ষা বিষয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতামত এবং নির্দ্দেশ, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান নৈরাজ্য অবসানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় তথা অবশ্য পালনীয়। দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আশু পরিবর্ত্তন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা দেশের সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছেন।

এ-অভিযোগ আজ নূতন নহে যে, দেশ স্বাধীনতা (?) লাভের পর গত ২০।২১ বৎসর ধরিয়া শিক্ষা লইয়া হাজারো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলিতেছে যাহার ফলে শিক্ষার এক পাও অগ্রগতি লাভের পরিবর্ত্তে দেশের শিক্ষার মান দিনের পর দিন ক্রমশ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। নূতন কিছু একটা করা চাই—এই মহত্ত আদর্শে দীপ্ত হইয়া কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য শিক্ষা-মন্ত্রীগণ তাঁহাদের রেডিমেড শিক্ষা-স্কীম কার্য্যকর করিতে অতি তৎপরতা দেখান। এইখানে বলা প্রয়োজন যে, যে-সব মহাপণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাদের বিদ্যা-

বুদ্ধির দৌড় এবং গভীরতা বিষয়ে কোন কথা না বলাই ভাল। সাধারণ জীবনে যাঁহারা শিক্ষাসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন খবর রাখেন নাই, শিক্ষা কি এবং স্কুল-কলেজে কি প্রকার শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষে প্রকৃত হিতকর, সে-বিষয়ে কোন চিন্তা করার মত সামান্য এবং বুদ্ধি, কিছুমাত্র বিদ্যাও যাঁহাদের নাই, সেই সব মস্তিষ্ক ব্যক্তিরাই কপালগুণে এবং 'কর্তার' অনুগ্রহে মন্ত্রীপদ লাভ করিয়াই এক দিনেই সর্ব্ব-বিদ্যাধর হইয়া পড়েন। কেবল শিক্ষা-মন্ত্রী নহে, দেশের অন্যান্য প্রায় সকল মন্ত্রী সম্পর্কেও—প্রায় একই কথা বলা যায়। ব্যতিক্রম চোখে পড়ে খুবই কম।

দেশের শিক্ষাকে বহুমুখী করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের 'প্রবণতা' অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ বিস্তার করার জন্য -তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে সঙ্গে, স্কুলের দশ ক্লাসের কোর্সকে এগার ক্লাসে রূপান্তরিত করা হইল। তাহার পর হঠাৎ কর্তাদের নজরে পড়িল যে টাকার অভাবে সকল বিদ্যালয়কে দশকে এগার ক্লাসে টানিয়া তোলা করা যায় না। অতএব দশ ক্লাস এবং তাহার লেজ স্বরূপ প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সের একটি স্বল্পকালীন পাঠক্রম চালু করা হইল! এই ব্যবস্থায় ছাত্রদের কোন সুবিধা না হইয়া অসুবিধার মাত্রাই বৃদ্ধি পাইল। অন্যদিকে যে সব স্কুল পাঠ্যসূচী এমনই বিচিত্র ও পর্ব্বতপ্রমাণ, যাহা অল্পবয়স্ক কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আহার এবং হজম" করা এক প্রকার অসম্ভব! এই অবস্থার মধ্যে দিয়া যে সকল ছাত্রছাত্রী কোনক্রমে তিন বছরে ডিগ্রী কোর্সের দরজায় পৌঁছায়—'তাদের গা হইতে স্কুলের গন্ধ' তখনও যায় না, তাহার উপর ইহারা কলেজের পূর্ণ সুযোগও পায় না! বর্ত্তমানে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা প্রাণহীন যন্ত্রের মত হইয়াছে। পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে ব্যর্থতা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্য নানা কারণে ছাত্রমহলে অসন্তোষ, বিক্ষোভের মাত্রা প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর হইতেছে। এই সব একজন প্রকৃত দরদী শিক্ষকের মন এবং দৃষ্টিতে দেখিয়া সুনীতিবাবু

পুরানো শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রত্যাবর্ত্তনের সুপারীশ করিয়াছেন

আমরাও ইহার পূর্ণ সমর্থন করি কারণ—শিক্ষার ল্যাবরেটরীতে ছাত্রদের লইয়া আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ দেওয়ার অবসর নাই। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়ত অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার মতামত অপেক্ষা ডঃ চ্যাটার্জ্জীর মতামতের মূল্য হাজারোগুণ বেশী। মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর "শিক্ষাবিদ বলিয়া কোন খ্যাতি ছিল বলিয়া শুনি নাই—শুনিয়াছিলাম তিনি দক্ষ প্রশাসক মাত্র।

বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আর একটি বিষয়ে ডঃ চ্যাটার্জ্জি তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন এবং তাহা হইল—বিদ্যালয়ে তিন-ভাষা চালু করার অছিলায় (প্রচেষ্টাকে ছাত্রদের 'ত্রিশূল' করাও বলা যাইতে পারে!) অহিন্দী ভাষীদের উপর জোর করিয়া অর্দ্ধপক্ক হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দিবার মতলব। এই বিষয়ে আমরা যুগান্তরের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি:—

তিনটি ভাষা হয়তো শিক্ষার্থীদের নিজের প্রয়োজনেই শিক্ষা করতে হবে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগের এবং বিশ্বজ্ঞানের অন্যতম চাবি-কাঠি ইংরেজীকে বরবাদ করার সময় এখনো আসেনি। সুনীতিবাবুর প্রস্তাব হল প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষা ও ইংরেজী এবং একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা (বিকল্পে কোনো আধুনিক ইয়োরোপীয় বা আধুনিক ভারতীয় ভাষা)। অবশ্য এতেও তিন ভাষার বোঝাই চাপল। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, মাতৃভাষা ও ইংরেজীই শিক্ষার্থীরা শিখবে তৃতীয় ভাষা গলাধঃকরণ করা আর সম্ভব হবে না। ভাষা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, বর্ত্তমান স্তরে ইংরেজী বর্জ্জন করলে ক্ষতি হবে আমাদেরই, ইংরেজের এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। দ্বিতীয়ত, হিন্দীকে বাধ্যতা-

মূলক করলে জাতীয় সংহতি তো বাড়বেই না, এর ফলে বরং জাতি-বিদ্বেষ দেখা দেবার আশঙ্কা। মাতৃভাষা ছাড়া অপর একটি ভারতীয় ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করছেন না। কিন্তু কোনো ভাষা চাপিয়ে দিতে গেলেই বিরোধ অনিবার্য। ভারতবর্ষে এরকম ঘটনা ইদানীংকালে বহুবার ঘটেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে শিক্ষানীতি এবং সরকারী ভাষানীতির বিভ্রান্তিকর লক্ষ্য। -সমাজের বাস্তব অবস্থার উপযোগী করে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে কপিবুক শিক্ষানীতি চালু করার দূরদৃষ্টি-হীন পরিকল্পনাই বর্ত্তমান অশান্তির কারণ। ডঃ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষাতেই একথা বলেছেন। ছাত্রদের ওপর দোষারোপ করে আসল সমস্যা এড়িয়ে যাবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত শিক্ষকের মতোই ছাত্রদের উপর দোষ চাপানোর এই চেষ্টার নিন্দা করেছেন। রাজনীতির অনুপ্রবেশ শিক্ষাজগতকে কলুষিত করছে? এর জন্ত রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব কম নয়। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম অরাজকতা চলছে। তরুণসমাজের মধ্যে নৈরাশ্য ও ক্ষোভ বাড়ছে সে কারণেই। অর্থের লোভ, ক্ষমতার লোভ এবং প্রতিষ্ঠার লোভ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রবেশ ঘটিয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এ যুগে প্রায় নেই বললেই চলে। উদ্দেশ্যহীন সমাজে শিক্ষার মূল্যও আজ বিস্মৃত। উপাচার্য আক্ষেপ করে বলেছেন যে, উদ্দেশ্যহীন উচ্চশিক্ষা বেকার সংখ্যা বৃদ্ধিতেই সাহায্য করছে মাত্র। এর একটি কারণ আমাদের দেশে ডিগ্রীর প্রতি মোহ এবং ডিগ্রী না থাকলে জীবিকার সুযোগের অভাব। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন না হলে শিক্ষাজগতে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় যে কয়টি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, শিক্ষার নীতিনিয়ামকরা তার উত্তর দিন। এটা শিক্ষার স্বার্থেই আজ প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা যায় যে, বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীত্ব গ্রহণের সময় দ্বিভাষী সূত্রের প্রস্তাব করেন। (মাতৃভাষা এবং ইংরেজী)। সেই সময় তিনি একথাও প্রকাশ্যে বলেন যে, তাঁহার সহিত শিক্ষানীতি লইয়া সরকারের (সহজ কথায় উপ-প্রধান মন্ত্রী বিদ্যাপতি মোরারজী দেশাই এবং কেন্দ্রীয় কট্টর হিন্দী প্রেমিকের দল) সহিত মতবিরোধ হইলে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে তিনি মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিবেন না। কিন্তু হায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বের গদিতে এক প্রকার ভীষণ এবং বজ্র-আঁঠা আছে যে একবার তাহাতে বসিলে সেই আঠার টান, বিতাড়িত না হওয়া পর্য্যন্ত গদি ছাড়া কাহারো অর্থাৎ কোন মন্ত্রীর পক্ষেই সহজ অবস্থায় সম্ভব হয় না!

বিগত কিছুকাল হইতে দেশের শিক্ষার বাহন এবং পদ্ধতি কি হইবে তাহা লইয়া ছোট বড় মাঝারি এমন কি 'নো-মস্তিষ্ক' মাথা ও বিস্তর কথা এবং ততোধিক বিস্তর শিক্ষার নানা প্রেসক্রিপসন্‌ দিতেছেন যাহার সকল চাপ এবং তাপ ভোগ করিতে হইতেছে নিরীহ ছাত্রসমাজ এবং অসহায় অভিভাবকদের। এই দুই অকূলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

স্কুল-কলেজের নূতন শ্রেণীবিভাগ বেশ কয়েকবছর হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ছাত্রসমাজ কি লাভ করিল, কতখানি উপকার তাহাদের হইল, তাহা কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। কিন্তু এই ভাবে শিক্ষাকে লইয়া ওয়াটার-পোলো খেলার ফলে দেশের শিক্ষা নামক বস্তুটি যে আজ কি ভয়ানক পঙ্কিলতায় ডুবিতে বসিয়াছে, সে-দিকে দৃষ্টি দিবার কেহই নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি (একদা শিক্ষক) মহাশয় "আহ্বান" জানাইয়াছেন যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন

হওয়া দরকার যাহাতে ছাত্রসমাজ তথা দেশও উপকৃত হয়। কিন্তু "এমন হওয়া দরকার" কথাটির অর্থ কি? রাষ্ট্রপতির এই "এমন"টির রূপ বাস্তবে কেমনটি হইবে তাহা জানিতে পারিলে দেশ হয়ত উপকৃত হইত। কেবল ফাঁকা উপদেশ এবং "আহ্বান" জানাইলে কোন ফলের আশা করা বৃথা। (৮-৯-৬৮)

উপদেশামৃত।

উচ্চ আসনে বসিলে কিংবা উচ্চমার্গে ভ্রমণের অধিকারী হইলেই বোধহয় মানুষ নিম্নাবস্থিত জনগণকে উপদেশ বিতরণ করিবার দুর্লভ অধিকার লাভ করে। বলা বাহুল্য—এই সকল উপদেশের প্রকৃত মূল্য কি এবং যাহাদের প্রতি ইহা বর্ষিত হইল, তাহারা কি ভাবে ইহা গ্রহণ করিবে, আদৌ গ্রহণ করিবে কি না, সে-বিচার উপদেষ্টার করার কথা নয়। তিনি তাহা করেনও না। যে-কোন একটা অবকাশ পাইলেই উচ্চমার্গ-বিহারী মহাজন—নিম্নস্থিত মানুষকে তাঁহার অমৃতকণা হইতে কিছু উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন। এবং ইহা করা তাঁহার কেবল কর্ত্তব্যই নহে—বিধাতা প্রদত্ত অধিকার বলিয়াও মনে করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী এবং তৎপর। রাজ্য মন্ত্রী মহাশয়গণও তাঁহাদের সীমিত চারণ-ক্ষেত্রে উপদেশামৃত বিতরণে কোন কার্পণ্য কখনও করেন না।

এ-দেশে মন্ত্রীদের একটা ধারণা এবং বিশ্বাস আছে যে—মন্ত্রীপদলাভ করিবামাত্র তৃতীয়—এমন কি চতুর্থ শ্রেণীর অ-কিংবা-সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তিও হঠাৎ মন্ত্রীত্ব গদির স্পর্শে সর্ব্ববিষয়ে দিব্যজ্ঞান এবং প্রবল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়া উঠেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বেলায় এ-কথা সবিশেষ প্রযোজ্য। তাহা না হইলে নেহাৎ আমা-রামার মত ব্যক্তিও কোন্ যাদু এবং দিব্য শক্তির বলে মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়াই সমাজে বিপ্লব ঘটাইবার মত বড় বড় কথা বলিয়া—স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, নিজসমাজ এবং শ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষকে অযথা ক্ষেপাইবার চেষ্টা করেন কেমন করিয়া?

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি কলেজে ভাষণদানকালে বলেন যে, ছাত্রদের উচিত "to behave in such a way as to evoke love and admiration both from their teachers and pupils···অতি উত্তম উপদেশ এবং পালিত হইলে আমরা আনন্দলাভ করিতাম। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী বহুকাল শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং (শিক্ষক হিসাবে না হইলে)—সুদক্ষ প্রশাসন হিসাবে খ্যাতিও অর্জ্জন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বয়স্ক ব্যক্তিদের কনিষ্ঠদের উপদেশ দিবার অধিকার অবশ্যই আছে—কিন্তু বর্ত্তমানকালে ডঃ ত্রিগুণা সেন ছাত্রসমাজকে যে মহৎ উপদেশ দান করিলেন, ছাত্রসমাজ কি এই ঋষি শিক্ষক এবং দক্ষ প্রশাসককে পাল্টা প্রশ্ন করিতে পারে না যে যুব এবং ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা এবং সমাদর অর্জ্জন করিবার মত ব্যবহার এবং যোগ্যতা বড়দের নিকট হইতে তাহারাও কি আশা করিতে পারে না? আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, শ্রদ্ধার যোগ্য চরিত্র থাকিলে কোন বয়স্ক ব্যক্তিকে, ছোটরা অশ্রদ্ধা কিংবা অগ্রাহ্য করে না। যুব এবং ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা ভালবাসা জোর করিয়া আদায় করা যায় না। ছোটদেরও, অর্থাৎ বয়সে কম হইলেও যুবক এবং ছাত্রদের বড়দের নিকট হইতে মানুষ হিসাবে অবশ্যই কিছু প্রাপ্য আছে, বড়রা যদি, তাহাদের এই প্রাপ্য হইতে তাহাদের বঞ্চিত করেন, তাহারাও তাহাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তি ছোটদের নিকট হইতে পাইবেন না। মানুষ যত ছোট এবং যত কম বয়সেরই মানুষ হোক না কেন, শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জ্জন করিতে হইলে বড়দেরও কিছু মূল্য দিতে হইবে, ফাঁকি দিয়া কিংবা ছোটদের প্রাপ্য না দিয়া আমরা বড়রা (বয়সে) ছোটদের ভাল ভাল উপদেশ মাত্র দিয়াই তাহাদের চিত্ত জয় করিব, এ-বাসনা একমাত্র বাতুলেই করিতে পারে। (৬-৯-৬৮)

উপদেশের সহিত "আহ্বান"।

বিগত কিছুকাল হইতে দেশের এবং জাতির বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রী মহোদয়গণের সহিত একসুরে ছোট বড় নেতারাও জনগণকে ক্রমাগত আহ্বান জানাইতেছেন। এই আহ্বান এমনভাবে জানানো হইতেছে যাহাতে মনে হইবে, যেন ইচ্ছা করিলেই দেশের জাতির প্রায় সর্ব্ববিধ বিকট এবং উৎকট সমস্যা জনগণ অবহিত হইলে অচিরে মিটিয়া যাইবে। সমস্যা সমাধানে সরকারী কর্ত্তা, দেশের বিবিধ দলের নেতাদের এবং আমাদের ভাগ্যবিধাতা হঠাৎ-পণ্ডিত এবং সর্ব্ববিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী মন্ত্রী মহোদয়-দের, আমাদের 'আহ্বান' জানানো ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তব্যই নাই। ভাল কথা, দেশের এবং জাতির সমস্যা সমাধানে আহ্বান-হাম্বা রবে জনগণ সাড়া হয়ত দিবে কিন্তু জনগণের সাধারণ এবং নিত্যকার একান্ত প্রয়োজনীয় ভাতডালের সমস্যা কে বা কাহারা মিটাইবে জানি না। জনগণ প্রতিনিয়ত সরকারের কাছে করজোড়ে 'আহ্বান' নহে, কাতর নিবেদন জানাইতেছে—নিত্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যবিধ অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রীর অতি স্ফীত মূল্য এমন করিতে যাহাতে সাধারণলোকে দিনান্তে অন্তত একবেলা আধপেটাও খাইতে পায় এবং বছরে পরিবারের জনপ্রতি অন্তত একখানা করিয়া মোটা বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে। কিন্তু হায়! জনগণের এ-কাতর 'আহ্বানে' কেহই সাড়া দিতে কোন গরজ দেখাইতেছে না!

গত কিছুকাল যাবত আবার প্রায় সকল পণ্যের মূল্য আকাশগামী এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের আয়ও পাতালমুখী হইয়াছে। চাউল, গম, চিনি, ডাইলের মূল্য ত স্বয়ং সরকার খেয়ালখুশীমত বাড়াইতেছে! কয়লা, সরিষার তৈলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া ব্যবসায়ীদের গরীব মারিবার সর্ব সুযোগ তথা অধিকার করিয়া দিয়াছেন। চিনি সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। ধুতি শাড়ীর মূল্য বিষয়ে কোন কথা না বলাই ভাল। মূল্য স্ফীতি রোধ করিবার মোরারজী-প্রতিশ্রুতি কাগজেই থাকিয়া গেল। বাস্তবে ব্যবসায়ীরা মোরারজীকে কদলী প্রদর্শন করিয়া, জনগণের উপর তাহাদের অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার, কাহারো পরোয়া না করিয়া, চালাইয়া যাইতেছে। ফলে দেশে জনগণের মধ্যে আবার নানা অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হইতেছে, প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে এই প্রত্যহ-বর্দ্ধমান জন-অসন্তোষ কবে ফাটিয়া পড়িবে, কেহই বলিতে পারে না।

বিবিধ রাজনৈতিক দলগুলি আগামী নির্ব্বাচনের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত, নির্ব্বাচনে জয়লাভ করাটাই তাঁহাদের একমাত্র কাজ এবং কর্ত্তব্য। সব দলই চাহিতেছেন: জনগণ যদি মরিতে চায় মরুক, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে তাহাদের দেয়-ভোট যেন বিশেষ বিশেষ দলের প্রার্থীদের অবশ্যই দিয়া যায়। তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলে জনগণের শ্রাদ্ধ তাঁহারা ঘটা করিয়াই করিবেন!

নির্ব্বাচনের দিন যত কাছে আসিবে, দলীয় নেতারা জনগণকে ততই ঘন ঘন 'আহ্বান' জানাইতে থাকিবেন—নিজ নিজ দলের প্রার্থীদের নির্ব্বাচনী বৈতরণী ভোট তরণী সাহায্যে পার করিয়া দিতে। এই সময় দেখা যাইতেছে সাধারণ মানুষের জন্য সকলেরই প্রাণ সদাই ক্রন্দন করিতেছে এবং সকল দলের নেতা এবং দলগুলি আবার নূতন করিয়া সাধারণ মানুষকে সর্ব্ব অভাব দুঃখকষ্ট দূর করিয়া স্বর্গ সুখ দান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; কিন্তু শুভ ইচ্ছা এবং গরীবকে বাঁচাইবার প্রবল বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটিবে নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই—ইহা নূতন নহে বহুবার দেখিয়াছি আবার দেখিব। কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী এ বিষয়ে সকল পার্টি এক 'আদর্শে বলীয়ান্!

(৭।৯.৬৮)

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কবলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ দুর্গতির চরমে, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেসী নেতারা দুর্গত ত্রাণে কতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছেন জানিতে ইচ্ছা হয়—বাক্যে অবশ্য তাঁহারা বহুকিছু করিয়া

ছেন, বাস্তবে নহে। যুক্তফ্রন্টের নেতারা বন্যার দুর্গত ত্রাণে এবং রিলিফের কাজে সরকারী ভুল ত্রুটির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দল হইতে কোন রিলিফ-পার্টি বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় দুর্গত ত্রাণে যাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

কেবল রাজনৈতিক দলগুলিকে নিন্দা করিয়া লাভ নাই—কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের তোড়জোড় এবং সেই সঙ্গে প্রবল দাপটে চাঁদার নামে চৌথ আদায়ের প্রচেষ্টাও সুরু হইয়াছে। দেশের এই বিষম বিপদকালে যখন প্রায় এক কোটি লোকে বন্যার ফলে মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া দিন গুণিতেছে- সেই সময় পূজার ব্যাপার—যতটুকু না, হইলেই নয়,—সেইটুকু মাত্র করিয়া চাঁদার বাকি টাকা দুর্গত ত্রাণে দান করাটা কি অন্যায় হইবে?

পূজার এবার আনন্দ-উৎসব করা সাজে না। লক্ষ লক্ষ পরিবারে যখন অনাহার, কান্নার রোল, সেইসময় দেশের আর এক শ্রেণীর লোক আনন্দ-উৎসবে মাতামাতি করিয়া হাজার হাজার টাকা খরচ করিবে, দৃশ্যটা খুব প্রীতিকর হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক পার্টির নেতারা যাঁহারা চেলাদের প্রায় সর্ব্বপ্রকার অসামাজিক এবং বেআইনী কাজে পশ্চাতে থাকিয়া উৎসাহ দেন, তাঁহারা মানুষের এই বিপদকালে তাঁহাদের চেলাদের একটা হিতকর কাজে প্রকাশ্য উৎসাহ দিতে পারেন না কি? আমাদের সন্দেহ হয়—পার্টির 'হট্টরাড্‌দের' আনন্দ উৎসব এবং হৈ-হল্লাড়ে বাধা দিলে (পূজার সময়) পার্টির "জনপ্রিয়তা" হয়ত কমিয়া যাইবে যাহার ফলে নির্ব্বাচনের ভোটেও হয়ত পার্টিকে চোট খাইতে হইবে। কাজেই 'হট্টরাড্‌দের ঘাঁটাইয়া কাজ নাই—যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক—কোন কারণে যেন "আমাদের ভোট না কমিয়া যায়—তারপর দেখিয়া লইব"—এই হইল নেতা-মনোভাব'—সকল দলের সকল নেতার কথাই বলিতেছি। আমরা সবই দেখিতেছি, কিন্তু ভোট দিবার সময় প্রায় সকল ভোটদাতাই প্রতারকদের প্রতারণা প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইব এবং যে প্রার্থীকে সর্ব্বভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য—তাহাকেই অর্থাৎ সেই শ্রেণীর প্রার্থীকেই আনন্দে ভোট দিব!

(৫।৯।৬৮)

কলিকাতা কর্পোরেশন! সু-প্রস্তাব

কলিকাতা কর্পোরেশনের জনৈক কংগ্রেসী পৌরসভা প্রস্তাব করিয়াছেন, পৌরসভার আগামী নির্ব্বাচনে কুস্তিগীরদের মনোনয়ন দিতে। প্রস্তাব অতি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু মনোনয়ন কেবল কুস্তিগীরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, লাঠিয়াল, বক্সার, পকেটমার, ছিনতাইদেরও মনোনয়ন দিলে ভাল হইবে। একদিকে সভার শোভাবৃদ্ধি অন্যদিকে ব্যক্তির বুদ্ধি, চাতুর্য্য এবং হাত সাফাইএর ক্রীড়ার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা দান হইবে। বর্ত্তমান কর্পোরেশনে হয়ত এই সবই আছে—কিন্তু বর্ণচোরাদের চেনা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাহিরে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়াছি যে আইন করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির কোন প্রার্থী যাহাতে না দাঁড়াইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান কর্পোরেশন বাতিল করার কথাও আমরা বারবার বলিয়াছি, কিন্তু জানি না কোন্ অজানা কারণে—রাজ্যসরকার এ-ব্যবস্থা কিছুতেই করিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারও কি 'কানা'? এবং সেই কানা চোখটি কলিকাতা কর্পোরেশনের দিকে থাকাতে, সরকারের কাছে এই পৌরপ্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার দোষত্রুটি চুরি-চামারি—কিছুই ধরা পড়িতেছে না?

(১০.৯।৬৮)

(মূলে ভুল………………৬৬৮ পৃষ্ঠার পর)

মানুষ ভাবে এক, হয় আর—তা নইলে আর জগতের বৈচিত্র্য হয় কি করে? সেবার কর্মাটারে হঠাৎ প্রভার কাছে অনুর এক ননদাই গিয়ে উদয় হলেন। শশীকান্ত ঠাকুরজামাই অনুর। ভীষণ সাত্বিক মানুষ, দিবারাত্তির পাঁজি নিয়েই থাকেন। দাড়ি কামানো নখ কাটা সব তাঁর পাঁজি দেখে। প্রসন্নবাবুর উপযুক্ত জামাই—। কোথাকার রাণীর নাকি ছেলে হয় না পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে ফিরছেন। গায়ে নামাবলী কপালে মস্ত ত্রিপুণ্ড্র আঁকা। কার্মাটারে প্রভাদের নামমাত্র বাড়ী—। বাড়ীর রক্ষক মুসলমান। আর যে ঝি সে হল সাঁওতাল। দেখেতো শশীকান্ত গর্জাতে লাগলো। আশ্চর্য্য কাণ্ড আপনার, কী করে সাঁওতালদের ছোঁয়া বাসনকোসন নেন আপনারা? ওরা কি জল-চুঁত জাত?

তারি মধ্যে হবি কি হ, সদাশিববাবুর দুই বন্ধু এসে হাজির কলকাতা থেকে। তাঁরা বলেন, শুনেছি তোমাদের মালী ভগলুর রান্না নাকি অপূর্ব! আজ আমরা রোষ্ট খেয়ে যাবো—। অন্য দিন হলে কোন অসুবিধেই হত না কিন্তু বাড়ীতে শশীকান্ত! পেঁয়াজের গন্ধ নাকে গেলে আর রক্ষা নেই। হলু-স্থুলকাণ্ড হবে অনুর শশুর বাড়ীতে, প্রভা বলেন দরকার নেই বাপু ওসব মাংসটাংস করে—। বন্ধুদের কাছে মান বড়, না মেয়েটার খোয়ার বড়? শেষে নিরুপায় হয়ে ঠিক হল নেড়াদের বাড়ী থেকে ভগলু রোষ্ট করে আনবে—আর রাত ন'টার ট্রেনে শশীকান্ত রওনা হলে তবে সেই নিষিদ্ধ-বস্তু বাড়ীতে ঢুকবে। কিন্তু শশীকান্ত? সেও ত জামাই? তাকেও ত ভাতে-ভাত ধরে দেওয়া যাবে না। প্রভাদের বাড়ীটা আবার সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আর তিরিশ বছর আগের কার্মাটার। কাজেই প্রভার খাটুনীর অন্ত রইল না। মোচার চপ, থোড়ের ডালনা, ছানার পায়েস, নিরিমিষ পোলাও যথেষ্ট কষ্টে যোগাড় হলেও খাওয়াটা যে তার মনের মত হল না তা শশীকান্ত ভালো ভাবেই বুঝিয়ে দিলো—। বেচারা সদাশিব যেমন সরল মানুষ তার কপালে কী তেমনি দুর্ভোগ? দুটি বন্ধু তাঁর সামনে বসে পণ্ডিত মানুষ নাম করা প্রফেসার তাঁর কাছে বসে রাজা উজীর মারছে শশীকান্ত—কিভাবে কাকে ভাঁওতা দিয়েছে কিভাবে রাজা রাজড়াকে হাত করেছে—ইত্যাদি নিজের ছাপা কার্ড দেখিয়ে বলছে এই যে রাজ জ্যোতিষী লেখা। এই যে সম্রাটের কুষ্ঠী প্রস্তুতকারক, এটুকু লিখে দিতে হয়। কে গিয়ে সম্রাটকে জিগেস করছে? কার অত পিতৃদায় পড়েছে? যখন যেমন তখন তেমন। এখন নিজেদের ঢাক নিজেই বাজাতে হয়। তাছাড়া যদি আমি একটা কুষ্ঠ রাজার নিজে করেই রাখি আমায় ঠেকাবে কে? এই পূজোর সময় আমি ঘরে বসে হাজার টাকা কামাই মশাই স্রেফ দশটা টাকা খরচ করে একটা বিজ্ঞাপন দিই সকলের কল্যাণার্থে এখানে নিত্য মায়ের পূজা হয়, সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ সুনিশ্চিত যার যা কামনা সহ নামমাত্র দশ টাকা পাঠাইলেই সর্বসিদ্ধি করতলগত। ব্যস ঝপাঝপ মনিঅর্ডার আসে—তবে পূজো যে করিনা তা নয় ঘট পেতে পাড়ার চিন্তাহরণকে বসিয়ে দিই, তাকে রোজ নগদ দু'টাকা করে চারটে দিন দিই। তাছাড়া পাড়ার গিন্নিদের কল্যাণে কলাটা মূলোটাত আছেই।

তাছাড়া মা ষষ্ঠীর কল্যাণে ঘরে কুমারী বা ব্রাহ্মণের অভাব নেই—। কে কত পূজো করবি কর? বেচারা সদাশিববাবু এখন মানে মানে শশীকান্তকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে পারলে বাঁচেন। তিনি ফিরলে ট্রেন ছেড়েছে জানলে তবে নেড়াদের বাড়ী থেকে নিষিদ্ধমাংসর হাঁড়ি বাড়িতে আসবে। যতই হোক, পরের বাড়ী তারাই বা কতরাত অবধি মাংসের হাঁড়ি আগলে বসে থাকবে। কাজেই বাধ্য হয়ে বারবার সদাশিববাবু ঘড়ি দেখেন। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ডাঃ বোস অধ্যাপক হলেও কিছুটা সাংসারিক বুদ্ধি রাখেন। অবস্থা বুঝে বলেন, চলুন শশীকান্তবাবু আমরা ষ্টেশনের দিকে এগুই—দিব্যি চাঁদনী রাত আছে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তিনবন্ধু ত শশীকান্তকে নিয়ে বেরুলেন গেট পেরুতেই—শশীকান্ত বলে আচ্ছা ভালুই মশাই আবুই মা বুঝি বড্ড ছুঁচি বেয়ে

মানুষ—আমাদের মধুপুরের বাড়ী (প্রসন্নবাবুর বাড়ী) ত শুধু মুর্গি খাবার জন্যেই কেনা। একমাস ধরে মাসীর বাড়ী ছানা আর গাওয়া ঘি আর সন্দেশ খেয়ে মুখটা মরে গেছে—ভেবেছিলুম এখানে এসে মুর্গি দিয়ে মুখটা ছাড়িয়ে যাবো—। তা নয় সেই কলা মোচা থোড় আর থোড় মোচা কলা ছুত্তোর। তিনবন্ধু ত হতবাক। আরো ভাবনা প্রভার জন্যে। অকারণ বেচারা কি খাটুনীই খাটলো? শশীকান্তর এই বিদ্রূপের থোড় মোচা কলা নিয়ে। এই বিভ্রাট—অনুর শ্বশুরবাড়ীতে পদে পদে। সামনে যে পরম বৈষ্ণব মনে সে ঘোরতর শাক্ত। কিছুতেই যেন তার হদিশ পাওয়া ভার। যাক রাতে তিনবন্ধুতে খেতে বসে কী হাসির ফোয়ারা। সত্যিই ভগলু অপূর্ব্ব রেঁধেছে। আহা আগে কে জানতো বলো তাহলে ত শশীকান্তকে অনায়াসেই দেওয়া যেত।

সদাশিববাবুর মতে অনুর জন্য ভাবনার অন্ত নেই। তারপর মাঁতীদের বাড়ীর কাণ্ড ত? ঐকদিন নাকি খোকনকে যখন ছাতে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল অর্থাৎ প্রসন্নবাবুর পূজোর সময়। খোকন এক টুকরো কয়লা দিয়ে পাঁচিলে বসা বেরালকে মেরেছিল। এই কথা কানে যাওয়ায় আইনজারী হল যে ঐ জৈষ্ঠ্য মাসের গরমে সেদিন সারাদিন সে ছাতে বন্ধ থাকবে। একদিন এভাবে আটক রাখলে আর কয়লার অপব্যয় করে বেরালের সঙ্গে খেলার খোকাপনা তার সেরে যাবে। গদাই একথা শুনে যথারীতি খেয়ে দেয়ে টানা ঘুম দিলো। কিন্তু কেন জানিনা অনু বিচলিত হয়ে ঘটনাটা প্রভাকে জানিয়ে লিখলো মা যেমন করে পারো খোকনকে এখান থেকে নিয়ে যাও। অত রোদ মাথায় লেগে ওর যদি মেনেনজাইটিস হয়। ওকে আর বাঁচানো যাবে না। প্রভার মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গেই পড়লো। অনুর অসুখের সময় ক'দিন মাকে ছাড়িয়ে রাখতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। মার বাছাকে মার কাছ ছাড়া করে রাখা কি সহজ? কিন্তু নিরুপায়! যেখানে প্রাণ নিয়ে কথা সেখানে জানা ছাড়া উপায় কি? কতবার অনুপমার বাড়ীতে ছাতে গেছে প্রভা। ছাতের অর্দ্ধাংশ কয়লায় আবৃত। ছাতেই কয়লা ঢালা হয় সেখান থেকে খরচ হয়। গুঁড়োই যে কত জমেছে তার ঠিক নেই। প্রাচুর্য্য আছে সত্য তা বলে এত অপব্যয় কেন? ছাত তো নয় যেন আঁস্তাকুড়। ছাতে নেই হেন জিনিষ নেই খালি বোতল শিশি ভাঙা, উনুন, ছেঁড়া তোষক, রাজ্যের মাটির হাড়ি কলসী এ হেন জায়গায় শিশুদের আটক রাখবার জায়গা। প্রভা অবাক হয়ে ভাবতো আচ্ছা ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেও কি এ জায়গাটা পরিষ্কার করে না তারা? কিন্তু মায়েদের অবসর বড়দের সাত ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে তারা বিশ্রাম করার অবসর পায় তখন ছেলেদের কথা ভাবার অবসর আর থাকে না। সমগ্র মন এই রুদ্ররূপী ভয়ঙ্করদের কি কি ত্রুটী ঘটে গেছে ভেবেই আতঙ্কগ্রস্ত। কাজেই ছেলেরাও এই ছাতের বাতিল সামগ্রীর মূল্য নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। কাঁদলে মার খায় নইলে কাঁদতে কাঁদতে খাটের তলায় বা ছাতের ওপর বা সিঁড়ির ধাপে বসে ঘুমিয়ে পড়ে।

সেবার অনু এসে বললো তার মেজজার দুটি ছেলেকে কোন সাহেবদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছে। পয়সার কথা ভেবে তাদের স্কুলের গাড়ীতে আনার ব্যবস্থা হয়নি। বাড়ীতে চারটে গাড়ী তিনটে ড্রাইভার। কিন্তু সময়মত গাড়ী পাঠানো হয়নি। সেখানেও সিঁড়ির ওপর তারা আশ্রয় লাভ করলো। পরণে মূল্যবান সাটিনের জামা তাতে ৩৩্ আর ২১ লেখা টিকিট লাগানো। পায়ে নতুন জুতো দুটি শিশু সেন্ট লরেন্স স্কুলের সিঁড়ির ধাপে বসে ক্রমাগত কেঁদেই যাচ্ছে। সন্ধ্যে হতে স্কুলের দরোয়ান বাধ্য হয়ে জিগেস করলো অ খোঁকা বাবুরা কোথায় বাড়ী তোমাদের? তারা কিছুই বলতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনেক কষ্টে বলে আমরা গাঙ্গুলি কোম্পানী! কিন্তু অত সহজে হদিশ মেলে না।

এধারে বাড়ীতে প্রচণ্ড কলরবে সংসার চলেছে সেখানে ছোট দুটি শিশুর স্থান কোথায়? শুধু ছেলের মা আর কাকীমা মৃদু গুঞ্জরণে বলে ছেলে দুটো এখনও এলো না। সন্ধ্যে হয়ে গেলো তখন অনু আর থাকতে না

পেয়ে, শ্বাশুড়ী মাকে বলে মা যদু মধু এখনও এলো না ত? ভবতারিণী অপ্রসন্ন মুখে বলেন এসেছে বই কি ও আবার কী অলক্ষুণে কথা বাছা—মা মাগী কি মুখে বাশ পরাতে ভুলে গেছে? হয়ত সদরে আছে নয়ত কোথাও খেলা করছে দেখগে। এবার বিপদতারিণী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

পিসীমার স্নেহের মূর্ত্তিমতী করুণারূপে। একেবারে দশবাইচণ্ডী মূর্ত্তি ধরে বলেন। কত আর সইব? বলিহারী বিদ্যেবতী কাকীমার। সেই বিকেল পাঁচটা থেকে রামধুন সঙ্গীত ধরেছেন—ছেলে দুটো এখনও এলো না কেন? ওমা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেও দেখি এই শ্লোগান চলছে তুই মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মত থাক্ তা না তখন থেকে এক সুর ছেলেরা কেন ইস্কুলে থেকে এলো না যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। গাঙ্গুলিবাড়ীর বৌ মুখে তুবড়ি ছুটছে ইস্কুল কলেজ হাইকোর্ট এয়ারোপ্লেন জাহাজ বিদ্যের জাহাজ হয়েছেন কিনা, সর্ব্বদাই বিদ্যের বুড়বুড়ি কাটছেন। এইত আমারই ক্যাবলা সেবার রাতে বাড়ী ফিরলো না। জানি কোথাও আছে ঠিক শুধু শুধু খুঁজে মরবো কেন? দিব্যি খেয়ে দেয়ে শুতে যাচ্ছি এমন সময় বাড়ীতে হৈ হৈ কে নাকি সদরে কি কাজে এসেছিল সেই মিত্তিরদের গাড়ীর ছাতে উঠে বসেছিল ক্যাবলা—তারপর বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা গাড়ী নিয়ে চলে গেছে। রাতে গ্যারেজ থেকে তুমুল আওয়াজ আসতে তারা গ্যারেজ খুলে দেখে ক্যাবলা মারমূর্ত্তি হয়ে দাঁড়িয়ে। ভদ্দরলোকের কী মুখ বাবা বাবাকে বলেন কি ছেলে আপনাদের গাড়ীর কাঁচ ভেঙেছে গদী কেটেছে—(রসভঙ্গ করে রাঙ্গাদি জিগেস করে গদী কাটলো কী করে দাঁত দিয়ে?) বিপদ ভ্রূভঙ্গী করে বলে, দাঁত দিতে যাবে কেনো, ওর কোমরে বেল্টে যে মস্ত ছুরী ঝোলান থাকে সর্ব্বদা তাই দিয়েই কেটে থাকবে। সেবার ত কী যেন দুষ্টুমী করেছিল ওকে মেজদা গুদোমঘরে পুরে তালা দিয়ে দিলো। আমার ভাত খেতে বসে একবার মনেও হল যে ক্যাবলাটা খেতে পায়নি, আবার ভাবলুম, না খেয়ে থাকার মানুষ ও নয়। খাবে ঠিক। ঠিক তাই। তখন পাঁচ বছরের ছেলে। এমন ঠাঙ্গান ঠেঙ্গিয়েছে মেজদা যে প্যান্ট নষ্ট হয়ে গেছে। প্যান্টটা ছেড়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল ক্যাবলা কিন্তু কোমরে ঠিক মস্ত ছুরিটা ঝুলছে। ঐ ছুরি দিয়েই তো মাষ্টারকে কাটতে গিয়েছিল। ক্যাবলার সেই থেকে আর কোন মাষ্টার আসেনি। হঁ্যা যা বলছিলুম। নাইবা পড়লো মাষ্টারের কাছে? বুদ্ধি কি ক্যাবলার কম? ক্যাবলা করেছে কি জানো? সেই দিনই মধুপুর থেকে আমের পার্শ্বেল এসেছিল। সেই ঝুড়ির চট্ কেটে এক ঝুড়ি আম খেয়ে শেষ করেছে। মাথার কাছে আঁটি আর খোলার পাহাড়। ক্যাবলা খেয়ে দেয়ে আরামে ঘুমুচ্ছে। বিপদবালা থমকে থেমে দম নিয়ে আবার বলে, কই বলুক কেউ যে ক্যাবলা বাড়ী ফেরেনি একথা কেউ আমার কাছে শুনেছে। তারপর সেই ভদ্দরলোক কত কথা যে শুনলো বাবাকে গাড়ীর ভেতর নাকি ক্যাবলা কত কি করেছে? যাক গে এই সারগর্ভ বক্তৃতার পর আরো অনেক প্রত্যক্ষদর্শা জননীর বিবরণ বর্ণনা হতে লাগলো—। বেচারা অনু তো স্তব্ধ! রাত দশটায় মেজ ভাসুর ফিরে শুনলেন যদু মধু ফেরেনি। তখন তিনি হরিপদকে পাঠিয়ে আনিয়ে নিলেন তাদের। হারায়নি ছেলে দুটো। দরোয়ানের ঘরে বসে বসে ভুট্টার খই খাচ্ছিল। যাই হোক গদায়ের মত শুনে যে নিশ্চিন্দি হয়ে সে ঘুমোয়নি এইটেই অনুর পক্ষে যথেষ্ট মহত্ত্ব।

গদাই-এর ঘুমের গল্প আরো আছে—। একবার নাকি বাড়ীতে বিপদবালার অসুখ হয়। দশ দিন বারোদিন গেল জ্বর আর ছাড়ে না। প্রসন্নবাবু বিধবা অভিভাবকহীন মেয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে গদাইকে পাঠালেন ব্যবস্থার জন্য—। গদাই যথারীতি খবরের কাগজ নিয়ে বসলো। তারপর কুটুমবাড়ীর গুরুভোজনে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, যখন ঘুম ভাঙ্গলো রাত দশটা। মাঝে মাঝে ভাগে ভাগ্নী ডাকতে এসেছিল তারাও সেই বিখ্যাত ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করো না শুনে ফিরে গেছে। রাত দশটায় যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন আর কোন

ডাক্তারকে পাওয়া যাবে? তাছাড়া মাঝ রাতে ওষুধ আনার ঝঞ্ঝাটও কম নয়। কাজেই পাড়ার জানা কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে এক শিশি ফিবার মিকশ্চার আনিয়ে খাওয়ানর উপদেশ দিয়ে গদাই বাড়ি ফিরে এল। তবে ভালোর মধ্যে এই এটা মদনমোহনতলার গাঙ্গুলিবাড়ীর প্রসন্নবাবু। তিনিও কিছু একটা বিধবা মেয়ের জন্য সময়ের ঘুম ছেড়ে জেগে বসে নেই। সকালে মা ভবতারিণী গদায়ের সঙ্গে দেখা হতে জিগেস করলেন ভয়ে ভয়ে হ্যাঁরে বিপদ কেমন আছে রে? প্রথমে উত্তরই দিলো না গদাই, তারপর বললো তুমি কি বুঝবে? ফ্যাঁচ ফ্যাচ করতে এসো না। ভালোই আছে যে ভার আমার ওপর দিয়েছ সে ভার তার আর ভাবনা কেন? ভয়ে ভবতারিণী আর কথা বলেন না। কিন্তু ঘটনা তারো আগে ঘটে গেছে। সে ঘটনা বিপদতারিণীর স্বামীর মৃত্যুর ঘটনা। চিরকালই ডাক্তারীর দিকে তার ভীষণ ঝোঁক, বিপদতারিণীর স্বামীর অসুখটা যখন ঘোরালো হয়ে উঠলো তখন গদায়ের ঝোঁকেই তাকে অস্ত্রোপচার করা হল।

ডাক্তারদের নিষেধ এমনকি জ্যোতিষীর নিষেধও মানেনি গদাই। আর হবি কি হ ঠিক মৃত্যুর দিনে মনই ঘুমই ঘুমিয়ে পড়েছিল গদাই। কেবিনে সিসটার খেতে গিছলো গদায়ের হাতে রুগী ছেড়ে। এসে দেখে রুগী মরে ভূত আর গদাই মেঝেতে লম্বমান।

যত এসব ঘটনা শোনেন প্রভা ততই ভয় পান। একি দায়িত্বহীন মানুষের হাতে মেয়ে দিলুম। অথচ গদায়ের আস্ফালনের সীমা নেই। সগর্বে এই সব গল্প বলে বেড়ায় সকলকে, যেন ঘুমটা তার অহঙ্কারের বস্তু। সকলকে নিয়ে গজালি করা তার স্বভাব। কোথাও যদি জাঁকিয়ে বসলো আর রক্ষে নেই। নিরুপমা প্রসব হতে বাপের বাড়ী এসেছিল, তখন অনুও ছিল। কাজেই মাঝে মাঝে ভগ্নিপতি গদায়ের আবির্ভাব হত। শালীর ঘরে তখন আদিরসের যে সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য গল্প বইত গদায়ের মুখে তাতে শুধু সঙ্কুচিতই হতনা নিরুপমা আতঙ্কিতও হত। এই গল্পের নায়ক নায়িকা হচ্ছে ডাক্তার আর নার্স। গদাই বলতো এই মজাটা লোটবার জন্যে ডাক্তারী পড়তে ইচ্ছে করে। আমার বন্ধু ফেলারাম বলে, জানিস পকেটের মধ্যে সিরিঞ্জ নিয়ে বেড়ায় ডাক্তারগুলো। খানিক বাদে বাদে নিজের পায়ে ইনজেকশন দেয় যাতে নেশাটা বজায় থাকে। খানিকক্ষণের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যায় ডাক্তারীটা মানুষের রোগমুক্তির জন্য নয়। শুধু নেশা আর ফূর্তির জন্য। অপারেশনগুলো অপারেশনের জন্য নয় রোগীকে ভুলুনোর জন্য দেগে ছেড়ে দেওয়া—। সবি চমকপ্রদ ঘটনা। এধারে পোষড়ার তত্ত্বের আয়োজন হচ্ছে প্রভার ঘরে। দামী দামী শাল কেনা হয়েছে। প্রসন্নবাবুর পাঠানো শালওলার কাছ থেকে। এমন সময় শোনা গেল গদাই গরম-সুট চেয়েছে কারণ সে ডাক্তারি পড়তে বিলেত যাবে। যথারীতি বিপদবালা এসে বললো শাল দিয়েছে বলে যে সুট দিতে নেই তাতো নয়। গদাই আমাদের কত আদরের ধন সাতরাজার মানিক। অন্য কুটুম হলে সোনা দিয়ে মুড়ে তত্ত্ব কর্ত্ত। যাইহোক বাবু, বাবার কানে যেন ওঠেনা আমরা সুট চেয়েছি—। যথা সময়ে শাল মাফলার সোয়েটার সার্ট গরম পাঞ্জাবীর সঙ্গে সুটও হল কিন্তু সুট মনোমত হলনা গদায়ের। পথে দেখা সদাশিববাবুর সঙ্গে গদায়ের। গদাই সদাশিববাবুর সঙ্গে কথা ত বললইনা, পরের স্টপেজে তর-তরিয়ে নেমে গেল। সদাশিববাবুর মত লোকও এবার ব্যথিত হলেন। বাড়ী এসে প্রভাকে বললেন কথাটা—। প্রভা আতঙ্কিত হয়ে অনুকে বলায় অনু বললো "জানোত মা ঐ একধরণের মানুষ শ্বশুরবাড়ীর কিছুই তার অপছন্দ। ও নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। তবু প্রভার মন শান্ত হয়না। কত কষ্টে গরম পোষাক করান হল তবু পছন্দ হলনা! কী করে যে জামায়ের মন পাওয়া যায় ভেবে ব্যাকুল হন প্রভা। অনু বলে জানো মা এধারে আমার কাছে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দেয় বলে "এসব তত্ত্বতল্প পছন্দ করিনা

আমি, করে যে এসব ক্যাডাভারাস জিনিষ দেশ থেকে উঠে যাবে" আমি বললুম তুমি ত এবাড়ীর ছেলে বারণ করলেই পারো—তখন বলে না বাবা আমি ওসবের মধ্যে নেই। আসলে জানো মা ওর পেটে খিদে মুখে লাজ। এধারে বন্ধুবান্ধবের কাছে বলছে দুটটা আমি করিয়েছি। ওকে চেনা ভার।

এরপর সত্যি সত্যিই গদাই বিলেত চলে গেলো বি এস সি পাশতো ছিলোই বিলেত গিয়ে ডাক্তারী পড়বে। বললে কি সুখে ঘরে থাকবো বলো? দু দুটো বাচ্চার জ্বালায় আমার ঘুম পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে—। বোধহয় মনে আশা ফিরতে ফিরতে ছেলেমেয়ে দুটো বড় হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু গেলই না যাবার সময় প্রভার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে গেলো। বলে গেলো আমি গেলেই যেন মেয়েটাকে নিয়ে যাবেন না ও চলে গেলে আমার বাবা মার মন খারাপ হবে—আপনার ইচ্ছে হয় ত নাতি নাতনি নিয়ে যাবেন।

এরমধ্যে বাড়ীতে কটা বিভ্রাট ঘটলো—অনুর বড় ভাসুর নেশার ঝোঁকে বৌকে ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিলো—। তাড়াতাড়ি তাকে ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কোন একটা গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাছে হাসপাতালে দিলে লোক-জানাজানি হয়। বাড়ীর কাণ্ডকারখানা দেখে অনুর তো চোখ ছানাবড়া—। আবার ঝি চাকর মহলে অন্য কথা শোনে অনু। তারা বলে বড় গিন্নিও নেশা করে, নেশার ঝোঁকে পড়ে গেছে। সব-চেয়ে অদ্ভুত চরিত্র প্রসন্নবাবুর। বাড়ীর বৌ নেশা করলে দোষ নেই দোষ সেলাই করা জামা পরলে। এমন অনাসৃষ্টি কথা কেউ কখন শুনেছে?

মদ ও চা তাঁর কাছে এক শ্রেণীর। এযেন গীতার শ্লোকের ব্রাহ্মণ আর গবি হস্তিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অনু কখনো শ্বশুরবাড়ীর কোন কষ্টের প্রতিকারের জন্য মার কাছে কিছু বলেনি। এবার বললো জানো মা তুমি আমার শাশুড়ী মাকে বলে তাঁর ঘরের মেজেয় আমার আর খোকন খুকুর শোবার যদি ব্যবস্থা করে দাও ভালো হয়। রাতে বড় ভয় করে তেতলায় শুতে। ঘরে ঘরে যা হৈ হল্লা হয়, আর ওঁদের ঘরের সামনে দিয়ে আমার কলঘরে যেতে হয় ভাবলে পা আর ওঠেনা। কি করবে প্রভা? কোনরকমে কথাটা ভবতারিণীর কাছে পাড়তেই ভবতারিণী থামিয়ে দেন তাঁকে। বলেন ওকি অলুক্ষুণে কথা বলছো বেয়ান? ওর নিজের ঘর সেই গদায়ের ঘর ছেড়ে আমার ঘরে ও শোবে কেন? বিপদতারিণী ধলে আর সানায়ের পোঁ দুটি—রাতে কান্না জুড়লেই বাবা মার ঘুমের দশাশেষ সাধে কি গদাই দেশান্তরী হয়েছে? প্রভা আর কথা খুঁজে পাননা।

অনুর দুঃখের শেষ থাকেনা। যদিও গদাই থাকতেই বা সে কী সুখেই ছিল—? তবে এখন সে হচ্ছে—গাধা বোট—। যেখানে যা কিছু ঝঞ্ঝাট দাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে। এবাড়ীর সবি অদ্ভুত—। যে গদাই কাণ্ড সে আর বলে শেষ করার নয়। সবই রোমহর্ষক আর অত্যাশ্চর্য্যময় ঘটনা। বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে তার গর্ব্বের অন্ত নেই। একটা কথা আছে না যে ন্যাবা হলে সে সেই চোখে সবই হলদে দেখে। তাই সে সগৌরবে যেসব কথা বলে বেড়ায় তাতে প্রভা আর অনু সঙ্কুচিত হয়, ব্যথিত হন সদাশিববাবু। যাই হোক যথাসময়ে গদাই ত বিলেত চলে গেল। প্রভার চিন্তার অন্ত নেই তবু মনকে স্তোক দেবার যা কথা ছিল মেয়ে জামায়ের কাছে আছে এ তাও নয় এযেন নেটা আছে মটা নেই গোছের ব্যাপার।

গদায়ের বিলেত যাওয়ার প্রভার বা সদাশিববাবুর মত ছিল না কিন্তু গদাইকে সেকথা বলায় গদাই স্পষ্টই বলে দিলো যে আপনাদের মত চেয়েছে কে? আমার মা মত দিলে আমি যাবো, না দিলে যাবো না। হঠাৎ গর্ভধারিণীর এতটা সম্মানে উভয়েই আশ্চর্য্য হন। ক্যাঁচ ক্যাঁচ কোরোনা, দশহাত কাপড়ে কাছা

নেই এবং গামছার ভাত স্ত্রীলোকই ত মা সহসা তাঁর এত সম্মান প্রাপ্য হল কী করে? কিন্তু গদায়ের শাস্ত্রে সবই সম্ভব—। গদাই জানে, তার যে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যে মা আশ্চর্য্যান্বিতা প্রভা, তা নয়—সাধারণ বি এ পি পাশ। সেতো আজকাল পানবিড়ির দোকানদাররাও করছে। তাছাড়া ঘরে ভাত-কাপড়ের অভাব নেই—তারপর ঐ কুসংস্কারপূর্ণ মানুষটির সম্বন্ধে অন্য আশঙ্কাও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু এ যেন হিন্দু মুসলীম সংবাদ। একটা গল্প আছে না, একজন ফকির গাছতলায় ভাত রেঁধেছে এমন সময় গাছের ওপর থেকে একটি কাক বিষ্ঠা ত্যাগ করে দিয়েছে সেই ভাতের মধ্যে—। ফকিরের সাকরেদ বলে, কি হবে• ফকীর সাহেব ও ভাত কি খাবো? ফকির একটু ভেবে চিন্তে বললে ঐ তো একটা হাঁড়ুর বাড়ী, ওদের জিজ্ঞেস করে এসো ভাতে কাকের বিষ্ঠা পড়লে ওরা কি করে? সাকরেদ চললো হাঁড়ুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। দরজায় বসে একবৃদ্ধ তামাক খাচ্ছিলেন, তাঁকে সব বলে কি করা উচিত জিগেস করতেই তিনি বললেন, থাক থুঃ ফেলে দাও ও ভাত। সাকরেদ ফিরে এসে ফকিরকে সেইকথা বলায় ফকির বললো, ঠিক আছে ঘেঁটে ঘুঁটে খেয়ে নাও। এও হচ্ছে তাই। যদিবা গদাই না যেত, প্রভা আর সদাশিববাবুর আপত্তিতে তার জেদ চেপে গেল। তাছাড়া বড় ভায়রাভাইকে ডাউন করাও কম কথা নয়। যদি নামের শেষে গোটাকতক এ বি সি ডি জোড়া যায় সেত কম কথা নয়। প্রভার মমতাময়ী মন অত কথা বুঝতে চায়না। সন্তান দূরে চলে যাবে এই ভেবেই সে দিশাহারা হয়। নাই বা গদাই তাকে মায়ের মত ভালোবাসলো কিন্তু গদাই তো এই পুত্রহীনার সন্তান, মায়ের স্নেহভরা দৃষ্টি নিয়ে বহুবার আঘাত পেলেও প্রভা সবই গদায়ের বিপরীত প্রতিকূল পরিবেশকে দায়ী করে গদাইকে মুক্তি দিতেন। অনুকে বোঝাতেন দেখ শিক্ষায় মনটা মার্জ্জিত হয় মাত্র, চিরদিনের সংস্কার কি যায় রে? কখন বলতেন, জানিস ভালো ছেলেরা একটু বাপ মার অন্ধ ভক্ত তো হবেই। তবুও নিজের মনে যেন জোর পেতেন না। প্রভার বাড়ীর সব ব্যবহারই আলাদা, যা যা সদাশিববাবু খাননা তা বাড়ীতে ঢোকার আইন ছিলনা প্রভার। এখন যদি বা ঢোকে সে একান্তই জামাইরা এলে। দুপুরে ঘুমনোর চিরবিরোধী প্রভা। কেননা স্বামী যাদের দুপুরে খাটে তাদের স্ত্রীরা ঘুমনো প্রভার আইনে অপরাধ। সেই মন নিয়েই প্রভার বাড়ীতে আরো অনেক আইনজারী হল। পুডিং হবেনা কারণ গদাই পুডিং ভালোবাসে টমেটো কাটসুপ করবেন না কারণ মুখ ফুটে কোনদিন না বললেও কবে নাকি কাটসুপ শিশিশুদ্ধ চুমুক দিয়ে গদাই খেয়েছিল। তারি সঙ্গে চললো রাতজেগে গদায়ের ওপর কবিতা লেখা। যদিও সে কবিতা গদীর তলায় চিরবিলুপ্তি পেতো কারণ অনু পড়লে মন খারাপ হবে আর সদাশিববাবু হবেন চিন্তিত। মাঝে মাঝে নিরু শুধু মায়ের এই কবিতাগুলো এখান-ওখান থেকে টেনে বের করে মাকে বলতো ছিঃ মা, এতো মন খারাপ করছ কেন? কতলোকের ছেলে ত দেশবিদেশে যায়। মুখের ওপর কঠিনতার আবরণ টেনে প্রভা সংক্ষেপে উত্তর দিতেন সবাই কি সব পারে? মায়ের এই রূপ নিরু বা অনুর কাছে অজানা নয়, তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। সদাশিববাবু মাঝে মাঝে বলতেন, জানো প্রভা অতবড় শরীরটা তোমার বাইরেই আমি ত দেখতে পাই একটি সম্পূর্ণ মন দিয়ে গড়া মানুষকে—। সংযতবাক্ মানুষটির এই কথায় তার চোখে জল এসে যেত—। মুখে বলতো, যাক কবিগুরুর কথা সার্থক হল। তিনি বলেছেন "জানো না কি এম অন্তর্য্যামী?"

সত্যি সত্যি প্রভাকে নিয়ে বিপদে পড়লেন সদাশিববাবু, রাতে ঘুমোয়না প্রভা। কখনো দেখেন বসে তরকারি কুটছেন, কখন বা গদাইকে চিঠি লিখছেন কখনো বা ঝুল ঝাড়ছেন পাশের ঘরে। এক একদিন এক

একভাবে ধরা পড়েন সদাশিববাবুর কাছে। কখনো বা বেনু উঠে বলে, বাবু মা কোথায় গেল? রামবাবু প্রভাকে বললেন সংসারে কত দুঃখ আছে এত সহজে দুঃখ পেলে শেষে যে কেঁদে কূল পাবিনা।

এতদিন যে কান্না প্রভার বুকের মধ্যে আটকে ছিল, বাপের আদরে তা বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত দুকূল ছাপিয়ে ওঠে। বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে প্রভা—বিচলিত রামবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে একটু বসে উঠে পড়েন। সকলের আশঙ্কাই ঠিক হল—না খাওয়া আর রাত জাগার ফলে প্রভা কঠিন গ্যাসট্রিক আলসারে আক্রান্ত হল।

বিপদ হল অনুর—তার সবচেয়ে বড় আশ্রয় বুঝি যায় অথচ তার করার কিছু নেই। ওদিক থেকে খবর এলো গদাই ফেল করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য গদাই লিখেছে—এই অসাফল্যে সে একটুও দুঃখ পায়নি। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে নেগেটিভ চাইল্ড! প্রভা ভাবে গদাই কি তাই? আবার ভাবে ওদের সংসার অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক বাড়ী—। তাই কি গদায়ের মনে এই প্রভাব! অনুর জন্যে ভাবনার অন্ত রইল না প্রভার। সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে গদায়ের চিঠির উত্তর দেওয়ার। যাই প্রভা লেখে তাতেই দোষ ধরে গদাই। গদায়ের জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ করে চিঠি লিখেছিল প্রভা, তাতে নাকি গদায়ের মেজাজ এমন বিগড়ে গিছলো যে সারাদিন খেতে পারেনি গদাই। প্রভা ভাবে এমন চিঠি প্রভা মরতে কেন লিখলো? যে চিঠি সেই তেপান্তরের পারে ছেলেটাকে আঘাত করলো। গদাই বলতো ওসব কাব্যি করে চিঠি লেখা আমাদের পোষায় না। আমরা দুলাইন কুশল সংবাদ লিখে অধিক আর কি লিখবো বলে চিঠি শেষ করি। সেই রকম চিঠি গদাই ভালোবাসে ভেবে প্রভা চিঠি সংক্ষিপ্ত করে—। তাতে গদায়ের রাগের অন্ত থাকে না। এখানের দুঃখজ্বালা বিদেশে না জানানো উচিত বোধে যদি সবাই ভালো আছে জানান, গদাই লেখে তা আমি জানি। আমি চোখের আড়ালে থাকায় আপনারা সুখের সাগরে ভাসছেন। নিরুপায় প্রভা কি যে লিখবে ভেবে পায়না। আবার চিঠির মধ্যেও যথেষ্ট সতর্ক, গদাই একই সঙ্গে মার চিঠির তলায় স্বাক্ষর সেবক গদাই আর প্রভার চিঠিতে ইতি গদাই। প্রভা গদায়ের মনের কূল পায়না তবু প্রভার উপায় নেই গদায়ের ওপর বিরূপ হবার—তার নিজের মনের গড়া সেই অবুঝ শিশু গদাই এর প্রতি তার বুকের স্নেহের ফল্গুধারা অঝোর ধারা ঝরছেই। মাঝে মাঝে প্রভার নিজেরই হাসি পায় একেই কি বলে অন্ধ মাতৃস্নেহ। আবার ভাবে আমিও নেগেটিভ মাদার তাই নিরুর বরের চেয়ে অনুর বরের ওপর আমার বেশী মায়া।

নিরুর বরকে সবাই ভালোবাসে তার নিরহঙ্কার অমায়িক স্বভাবের জন্য সে সকলের চোখের মনি। উন্নাসিক গদাইকে সবাই এড়িয়ে যেতে চায়। সবাইয়ের মুখে এক কথা, আহা অনুর মত মেয়ের কপালে এই দুর্ব্বাসা মুনি জুটলো—। দুর্ব্বাসা মুনি হলেও রক্ষে ছিল এ যে কী চায় কিছুই বোঝা যায় না। আসলে রাজ্যের বিরক্তি তার শ্বশুরবাড়ীর ওপর। যখন কলকাতায় ছিল গদাই, নিরুর বড় সাধ ছিল একদিন গদাইকে নিয়ে গিয়ে গোঁদলপাড়ায় খাওয়াবে কিন্তু সে সাধ তার পূর্ণ হয়নি। কিছুতেই পারেনি গোঁদলপাড়ায় নিয়ে যেতে। আহা গদাই কি শুধু নিরুর ভগ্নিপতি, ভাইওযে—। কিন্তু গদায়ের মনস্তত্ব আলাদা—। সে বলে বিপদে সবাই মজা দেখতে আসবে সম্পদে আসতে পারে ক'জন? তাই অনুর কাছে বলে একি নেমন্তন্ন খাওয়ানো, শুধু ডাঁট দেখাতে ডেকেছে। ব্যথিত অনু বার বার বলে না গো দাদাদের বাড়ীর লোকেরা সেরকম নয়। গদাই এক ধমকে অনুকে থামিয়ে দেয়। বলে গাধার মত কথা বোল না। অভিমানী অনুর চোখ ছল ছল করে ওঠে। সে থেমে যায় ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপে থর থর করে।

শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে সব ব্যবহারই তার আশ্চর্য্য। ছোটখাট মানুষ তবু এগারো হাত ধুতি নেবে দশ হাত

নেবেনা, অথচ নিজে দশ হাতের বেশী কাপড় পরতে পারে না। কিন্তু পাওনা জিনিষ কম নেবে কেন? এই হল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আর একটা মজা, কোন কিছু রাখতে চাইবে না, সব পাল্টে অন্য রকম ক'রে নেবে। লোককে বলবে আমি কিনেছি।

এধারে বিলেতে গিয়ে গদাই খুব জাঁকিয়ে বসলো, অসুস্থ শরীর বলে দুধের কার্ড করিয়ে দুধ খেলো। এধারে সুস্থ মানুষের যা কিছু আহার কিছুতেই তার অরুচি নেই। তবু প্রভার অদম্য উৎসাহ। সদাশিববাবুর এক বন্ধুর ছেলে বিলেত যাচ্ছিল তাঁর হাত দিয়ে আমসত্ব আচার সরু চিড়ে নলেন গুড়ের পাটালি পাঠালো গদায়ের জন্যে। গদাইকে লিখলো জিনিষগুলো নিয়ে আসতে কিন্তু গদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা—। গদাই দু পা গিয়ে সেগুলো আনার কষ্টও স্বীকার করলো না, বললো আমার সময় কোথা? অসুস্থ প্রভার কাছে সদাশিববাবু কথাটা চাপা দিতে চান বলেন সত্যিই ত পড়াশোনায় ব্যস্ত ত? প্রভা বলেন থামো—সত্যিই ত আমি গদায়ের মা নয় শাশুড়ী। এবারে অনুর শ্বশুরবাড়িতে হৈ হৈ কাণ্ড। বড় ভাসুরের মেয়ের বিয়ে। মোদো মাতাল মানুষ। একবার চটে গিয়ে এক জামাইকে জুতো পেটা করেছিলেন সেকথা মুখে মুখে সর্ব্বত্র রটেছে—পাত্র পাওয়া ভার। অনেক কষ্টে পাত্র জুটেছে সত্যি সত্যিই গঙ্গারামকে পাত্র পেলে? জানতে চাও সে কেমন ছেলে?

সেই আবোল তাবোলের সুকুমার রায়ের সৎপাত্র। কসুর এরা করতে পারে না, মুখে বলে সয় না আসলে শক্তিশুস্তি তো কম নয়। তবুও ভাংচি পড়লো, বিয়ের দিন সন্ধ্যেয় বর এলো না। তখন পুরুত তার শালাকে এনে বসিয়ে দিলো আসরে—। মেয়ে অপাত্রে পড়লে এদের দুঃখু নেই। দুঃখু যদি বশংবদ না হয় তাহলেই। কাণ্ডকারখানা দেখে অনুর তো চোখ ছানাবড়া। কিন্তু বাড়ীর কারুরই আনন্দে কোন বাধা পড়লো না। এমন কি কনেও মনের সুখে বাসরে গান গাইতে বসলো কিন্তু অনুর বুকের কাঁপন আর থামে না। ওই পুরুতের শালাই কতদিন তাদের বাড়ী পুজোর কাজ করে গেছে, আজ নির্ব্বিবাদে তার হাতে মেয়ে সঁপে দিলো এরা। অবোধ অনু তবু জাকে বলে দিদি ওদের পুকুরে চান পুকুর থেকে জল আনা মালু পারবে কি? যা অবজ্ঞাভরে উত্তর দেয় "সেখানে মেয়ে থাকবেই বা কেন? যদি বা দু এক দিনের জন্যে যায় সখীর মা সঙ্গে যাবে। পয়সায় সব হয় মালুর বাপ দরকার হলে টিউবয়েল বসিয়ে দেবে বাড়িতে।" অনু তো থ।

এবারে হঠাৎ প্রভার বাবা মারা গেলেন—। অনু বুঝলো এ আঘাত মার পক্ষে কতখানি কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর লোক তা বুঝবে কেন? হঠাৎ শ্বশুরের হুকুম হল যতদিন গদাই না ফিরবে, অনু বাপের বাড়ী যেতে পাবে না। এর আগে ঠিক প্রকাশ্যভাবে এ আইন জারি হয়নি। অনু মাকে লিখলো, তুমি আমার জন্যে ভেবনা মা, তুমি ত জানো সবরকম দুঃখই সহজভাবে মেনে নেবার শিক্ষা আমরা তোমার কাছে পেয়েছি, ভাবছি শুধু তোমার কথা, দাদু নেই এ সময় আমরাও তোমার কাছে যেতে পারব না, তোমার যে বড় কষ্ট হবে মা। প্রভা চিঠি পড়ে সহিষ্ণু অনুর মুখ মনে করে চোখের জল সামলাতে পারে না।

ক্রমশঃ

হলায়ুধ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

পণ্ডিত অনন্তহরি ভট্টাচার্যের দুই পুত্র। কনিষ্ঠটি যখন সাত বছরের, তখন তাদের মা মারা গেলেন। পুত্র দুটিকে নিয়ে পণ্ডিতমশায় মহা বিপন্ন হয়ে পড়লেন। এ রকম দুষ্টু ছেলে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কে বেশী দুষ্ট বলা কঠিন। আদর করে পণ্ডিতমশাই বড়টির নাম রেখেছিলেন হলায়ুধ। ছেলেটি যত বড় হতে লাগল, তার গুণপনার পরিচয় পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সন্তানে বিতৃষ্ণা এসে গেল। এর কিছুদিন পরে ছোটটির জন্ম হল। প্রথমটির বেলায় পণ্ডিতমশায়ের নামকরণে যে উৎসাহ ছিল, ছোটটির বেলায় তা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। গৃহিণী যখন ছোটটির নামকরণের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, পণ্ডিতমশাই তখন বিরক্তভাবে বললেন, আর নতুন নামে কাজ নেই, গিন্নি। ওই পুরণো নামই দুজনে ভাগাভাগি করে নিক।

—সে আবার কি রকম?

—বড়টির নাম রইল হল, আর ছোটটির নাম আয়ুধ। দুজনে মিলে হল হলায়ুধ।

তাই হল। যখন কিছুতেই পণ্ডিতমশাই দ্বিতীয় নাম রাখতে রাজী হলেন না, তখন দুই ভাই মিলে হলায়ুধ হয়ে রইল। বড়টি কোন রকমে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করলে, ছোটটি ততদূরও গেল না। কোন রকমে প্রথমভাগ শেষ করে বই-খাতাপত্র ছিঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে। এইটুকু দেখে মা পরপারে পাড়ী দিলেন।

দুটি ভাই মাটিতে বড় একটা পা দেয় না। দিনরাত্রি গাছে গাছে ঘোরে। নয়ত নদীতে সাঁতার কাটে। পাড়ার লোক এ বিষয়ে পণ্ডিতমশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, পণ্ডিতমশাই বিরক্তকণ্ঠে উত্তর দিতেন, ওরা যা খুশ তাই করুক গে, আমি আর পারছি না। দুটো ছেলেতে ভগবানের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিলে!

অবশেষে তিনিও একদিন অসুখে পড়লেন। দীর্ঘমেয়াদী অসুখ। তিন বছর শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

আশ্চর্য! হলায়ুধের সমস্ত উৎপাত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের দিন রাত্রির গাছে গাছে ঘোরা, নদীর জলে সাঁতার কাটা, সব বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার লোক অবাক হয়ে দেখল, সেবা কাকে বলে। সব ছেড়ে, দিয়ে দুটি ভাই দিনরাত্রির বাপের সেবায় নিযুক্ত হল। একটি রান্নাঘরে আর অন্যটি বাপের বিছানার কাছে।

ওদের ব্যবহারে বাপ পর্যন্ত অবাক।

এইভাবে চলল, কম দিন নয়, কয়েকটি বছর। গ্রামের সবচেয়ে দুরন্ত দুটি ছেলে সবচেয়ে শান্ত হয়ে গেল।

এ রোগে যা হয়। দীর্ঘ দিন ভুগে ভুগে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এল। ভট্টাচার্য মহাশয়ের যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। সে সময়ে ছেলেদুটিকে প্রায়ই কাছে ডাকতেন আর নানা উপদেশ দিতেন। যাবার সময় বলে গেলেন, ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া করো না। লেখাপড়া ত শিখলে না, তবু আমি যা রেখে গেলাম, ভালভাবে থাকলে তোমাদের দুটি খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না।

হলী এবং আয়ুধ দুটি ভাই অত্যন্ত কলহপরায়ণ। প্রতিবেশীরা ভয়ে তাদের ছায়া মাড়াত না। ঝগড়া করবার জন্যে যখন প্রতিবেশীদের পাওয়া যেত না, তখন নিজেদের মধ্যেই লাগিয়ে দিত। কখনও সশস্ত্র, কখনও বা বাহুমাত্র সম্বল। রাগলে দুই ভাইয়েরই কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। ভট্টাচার্যমশাই এইটিকেই ভয় পেতেন। তাঁর অবর্তমানে দুই ভাইয়ের মধ্যে না খুনোখুনি হয়।

যখন তিনি বিছানায় পড়ে ছিলেন, ওরা একরম কলহ করেনি। বাপের অসুখে বোধহয় কলহ করার কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। অনেকদিন দুই ভাই কলহ করেনি। বাপের মুখে কলহের কথা শুনে দুই ভাই পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল। এবং পরস্পরকে আশ্বাস দিলে, না, আর ঝগড়া করব না।

১

অবশেষে একদিন ভট্টাচার্যমশাই পরলোক যাত্রা করলেন। যতদিন তিনি শয্যাগত ছিলেন, বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাজকর্ম দেখাশুনো করতেন। শিষ্য-যজমান এলে তাদের যথোচিত উপদেশাদি দিতেন, ভাগীদার-চাষী এলে তাদের চাষবাসের কথা জিগ্যেস করতেন। সব কাজ ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা জিগ্যেস করতেন। যাওয়ার সময় তিনি ছেলেদের বলে গেলেন, ভালভাবে থেক।

দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করলে, থাকব।

পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। দুই ভাইয়ের মনের দিক দিয়ে কি যে পরিবর্তন হল, তারা বাড়ি থেকে বেরোয় না, বন্ধু-বান্ধবের সংগে গল্পগুজবও করে না, এমন কি আহারাদি সম্বন্ধেও আগ্রহ কারো রইল না। দুটো খেতে হয়, তাই রান্না করে। অবশিষ্ট সময় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। যাদের চিৎকারে পাড়া সরগরম থাকত, তাদের কথা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এমনি কিছুদিন কাটবার পর একদিন অতিষ্ঠ হয়ে আয়ুধ বললে, এ ত আর ভাললাগে'না, দাদা।

দাদা ঝিমুচ্ছিল। সোজা হয়ে উঠে বসল। বললে, যা বলেছিস ভাই। কি করা যায় বল্ ত?

আয়ুধ বললে, সেই কথাই ত তোকে জিগ্যেস করছি। আমি কি বলব? তুই দাদা। হুকুম করবি, আমি তামিল করব।

এমনভক্তিরসাশ্রিত বাক্য দাদা ছোট ভাইয়ের মুখ থেকে ইতিপূর্বে কখনও শোনেনি। সে মনে মনে খুব খুশী হল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থেকে বলল, বাবা বলতেন, বিষয় না বিষ। বিষয় আমার কাছে বিষের মত বোধ হচ্ছে।

আয়ুধ বললে, আমারও।

হল্ বললে, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, বাবা বৃন্দাবনের পথে পথে কীর্তন গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছেন।

উৎসাহে আয়ুধের চোখ স্থির হয়ে গেল। বললে, স্পষ্ট দেখলি?

—স্পষ্ট দেখলাম। বেঁচে থাকতে বাবা কতদিন বৃন্দাবনে বাস করবার ইচ্ছে জানিয়েছিলেন। আমাদের জন্যেই সম্ভব হয় নি। আমার বিশ্বাস তিনি বৃন্দাবনেই আছেন।

আয়ুধ বললে, আমারও তাই বিশ্বাস।

একটু ভেবে হল্ বললে, এক কাজ করবি?

অসংকোচে আয়ুধ বললে, করব।

হল্ বললে, বিষয়-আশয় সব বিক্রি করে দিয়ে বৃন্দাবন যাবি?

বৃন্দাবনের নামে আয়ুধ লাফিয়ে উঠল। বললে, যাব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা। তুই যা বলবি, আমি তাই করব। বাবা ত বলেই গেছেন, কলহ করিস না।

বলতে বলতে আয়ুধ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠল।

সংগে সংগে গ্রামের মধ্যে রটে গেল, পাগলা ছুটি ভাই বিষয়-আশয় সব বিক্রি করছে। ন'কড়া-ছ'কড়ায় কেনবার লোকের অভাব হল না। জমি-পুকুর-বাগান হু হু করে জলের দামে বিক্রী হয়ে গেল। বাকি রইল ভিটে।

চাটুজ্যে জ্যেঠী বললেন, যা করলি খুব করলি বাবা, বাপ-পিতেমোর বাস্তভিটে বেচিস না।

হা হা করে হেসে হল বললে, কার জন্যে রাখব, জ্যেঠী? ছুঁচো ইঁদুর চামচিকের জন্যে?

—যদি কখনও আবার মতি ঘোরে, যদি কখনও ফিরে আসতে হয়, মাথা গোঁজবার জন্যে একটা আশ্রয় রাখবি না?

হল্ বললে, সেই জন্যেই ত বিষয়টা বিক্রি করছি জ্যেঠী। পাছে ভিটের টানে আবার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয়।

আয়ুধ বললে, আমরা বৃন্দাবন যাচ্ছি, জ্যেঠী। দাদা স্বপ্ন দেখেছে, বাবা সেইখানে আছেন।

জ্যেঠী বললে, তাই বুঝি, তোরা বৃন্দাবন যাচ্ছিস? আমাকে নিয়ে যাবি?

হল্ সোজা জবাব দিলে, না জ্যেঠী, ওটি পারব না। আমরা ঝাড়াঝাপ্টা যেতে চাই।

আয়ুধ বললে, হ্যাঁ, জ্যেঠী, ঝাড়াঝাপ্টা। যাকে বলে, আমরা ছুটি ভাই, শিবের গাজন গাই। আমাদের কোনদিন খাওয়া হবে, কোনদিন হবে না। কোনদিন বা গাছতলায় কাটবে। তার মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাব না।

জ্যেঠী বুঝলে, কথাটা মিথ্যে নয়। বললে, তা বটে।

জ্যেঠীকে ত বোঝানো গেল। কিন্তু তার চেয়ে বড় ঝামেলা সংগে রয়েছে: জমি বিক্রির দরুণ পাঁচ হাজার টাকা। এত টাকা সংগে নিয়ে দেশভ্রমণের ঝুঁকি আছে। সারারাত ছুই ভাই পরামর্শ করলে। টাকাটা এক জায়গায় রাখা ঠিক হবে না। গেলে সব এক সংগেই যাবে। টাকাটা দু'ভাগ করে ছুটি গেঁজলায় পুরে ছুই ভাই নিজের নিজের কোমরে বেঁধে ফেললে। কে সন্দেহ করবে! ছুজনের পরণে ছুখানা মোটা মলিন আটহাতি ধুতি। গায়ে একখানা চাদর। পেট- কোমরে বাঁধা। আর বগলে গামছাটায় বাঁধা ছোট কাপড়ের পুঁটলি। এই বেশে তারা ট্রেনে বৃন্দাবন যাত্রা করলে।

মথুরা।

বৃন্দাবনে ওদের সুবিধা হল না। বাংলাদেশের ছেলে, বিশেষ করে গ্রামের ছেলে, কয়েকদিন নিরামিষ খেয়ে হাঁপিয়ে গেল। বৃন্দাবনে মাছ চলে না। যে তিতিক্ষা নিয়ে ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, কয়েকদিন বৃন্দাবন বাসের পরেই তারও অনেকখানি ক্ষয়ে গেল। ওদের আশা ছিল, বাবার সংগে, অন্ততঃ বাবার ছায়ামূর্তির সংগে একদিন দেখা হয়ে যেতে পারে। তারও কোন আশা দেখা দিচ্ছে না।

আয়ুধ বিরক্তভাবে বললে, চল্ দাদা, এখানে আর নয়।

হলেরও একই অবস্থা। কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললে, কেন বল্ দেখি?

আয়ুধ হেসে বললে, তাও বলতে হবে। এ কদিন মাছ না খেয়ে মুখটা বোদা মেরে গেছে।

হেসে হল্ বললে, যা বলেছিস! তুই কি ভাবছি বলে আমি বলতে সাহস করছিলাম না। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল্ত?

আয়ুধ বললে, দূরে নয়, কাছে কোথাও।

—মথুরা ?

—সেই ভাল। সন্ধ্যেবেলার বৃন্দাবন এসে আরতিও দেখা যাবে, আবার মথুরার বসে মাছও খাওয়া যাবে।

ওরা মথুরায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রইল।

এখানে এসে তারা আগেকার স্বভাব ফিরে পেলে। অর্থাৎ কলহ।

তাদের পাশের বাড়ি থাকত এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। সে একদিন বিরক্ত হয়ে এসে বললে, আপনারা দিন-রাত্তির এমন ঝগড়া করেন কেন ? নাই যদি বনে, তাহলে পৃথক হয়ে গেলেই ত পারেন।

ওরা দুজনেই অবাক ! আরে, এযে বাংলার কথা বলে ! জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বাঙালী ?

সন্ন্যাসী চমকে উঠল : কেন বলুন ত ?

—আপনি বাংলায় কথা বলছেন কিনা, তাই।

এতক্ষণে সন্ন্যাসীর খেয়াল হল, সে ভয়ে এবং উত্তেজনায় অজ্ঞাতসারে বাংলায় কথা বলে ফেলেছে। এসেছিল গরম হয়ে। এখন নরম সুরে বললে, হ্যাঁ, মশাই। কিন্তু কাউকে বলবেন না যেন।

—কেন ? বললে দোষ কি ?

—দোষ আছে মশাই। পরে বলব।

কদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর সংগে যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একসংগে খাওয়া, পাশাপাশি থাকা। বিদেশে-বিভুঁইয়ে এমন কটি বাঙালীর মধ্যে হৃদ্যতা হতে কতক্ষণ লাগে ?

একদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসীঠাকুর মাথা নেড়া করেছে। গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে ধুতী ও নিউকাট জুতো। পূর্বাশ্রমের স্মৃতির মধ্যে শুধু দাড়িটি আছে। হলায়ুধরা হেসে খুন !

—এ কি দেখি, সন্ন্যাসীঠাকুর !

সন্ন্যাসী ধমক দিলে, সন্ন্যাসীঠাকুর নয়, সে কোথায় চলে গেছে। আমি পতিতপাবন মিশ্র।

ওরা করজোড়ে বললে, বিলক্ষণ, মিশ্রমশাই ! কোথা থেকে আপনার আসা হয়েছে ? কখনই বা এলেন ?

মিশ্র বললে, ইয়ার্কি করো না। আমি তোমাদের বাপের বয়সী।

আরো দিন কয়েক পরে হলায়ুধরা নিজেদের সবকথা পতিতপাবনকে বললে। শুনে পতিতপাবনের মনে বড় করুণা হল। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে একজন ব্যাঙ্ক-মারা কেরানী আসামী। ব্যবসায় তার রক্তের মধ্যে মিশে আছে। ভাবলে, যতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে, এদের দুজনকে দিয়ে একটা ব্যবসায় ফেঁদে এদের আড়ালে আত্মগোপন করা যাবে।

ওদের কোন আপত্তি নেই। দুজনে একটা হোটেল করে বসল। পতিতপাবন হল ম্যানেজার।

পতিতপাবনের সুদক্ষ পরিচালনায় হোটেলটি দেখতে দেখতে জমে উঠল। হল, নিজে বাজার করে, আয়ুধ ষ্টেশন থেকে লোক ধরে আনে। ওদের তিনজনের ব্যবহারে আবাসিকেরা সবাই খুশী হয়।

কদিন বেশ চলল। তারপরে আবার আরম্ভ হল সেই কলহ

আয়ুধ ষ্টেশন থেকে একটি ভদ্রলোককে নিয়ে এল।

হল্ তাকে ডেকে বললে, কাকে নিয়ে এসেছিস ?

আয়ুধ বিস্মিতভাবে বললে, কেন ? ওকে কি তুই চিনিস ?

হল্ রেগে বললে, চেনবার দরকার কি! ভুঁড়িতে দেখছিস না, আধসের চালের ভাত ও চৌদ্দৈর নিষেধে উড়িয়ে দেবে। সেই পরিমাণ তরকারীও ও খাবে।

আয়ুধও রেগে উঠল, তুই ত সবই জানিস। আমি এমন ভুঁড়ি দেখেছি যে একছটাক চালের ভাত খেতে পারে না।

লেগে গেল কলহ

হল্ বের করলে লাঠি, আয়ুধ একটা চেলা কাঠ। পতিতপাবন হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। বিপদ হয়েছে তারই। ফেরারী আসামী। এদের কলহে যদি পুলিশ আসে, তাহলে কেঁচো খুঁড়তে কি সাপ যে বেরুবে, কে বলতে পারে। বেচারা কাঁদ কাঁদ হয়ে দুজনের হাতে পায়ে ধরে কোন রকমে নিরস্ত করলে।

কিন্তু দুজনের মুখ আবার খুলে গেল। প্রথম প্রথম নৈমিত্তিক, তারপরে নিত্যে দাঁড়াল। কলহ আরম্ভ হয় ঠিক সকাল ন'টায়। এই সময় আয়ুধ সাড়ে আটটার ট্রেন থেকে যাত্রী নিয়ে আসে আর হল্ বাজার করে নিয়ে আসে।

হল যাত্রীদের খুঁৎ ধরে। তার ইচ্ছা রোগা-পটকা যাত্রী আসবে, খাবে কম।

তেমন যাত্রী যে আসে না, এমন নয়। আয়ুধ বলে, রোজ রোজ রোগা-পটকা যাত্রী আমি পাই কোথা থেকে? কোনদিন রোগা হবে, কোনদিন মোটা হবে, কোনদিন মাঝামাঝি হবে। কেউ বেশী খাবে, কেউ কম খাবে, কেউ বা পরিমাণ মত খাবে। চালিয়ে নিতে হবে। দাদা তা করবে না।

সেও দাদার খুঁৎ ধরে। মাছের খুঁৎ, তরকারীর খুঁৎ।

বলে, বেছে বেছে ওই যে তেবক বেগুনগুলো আনে, ও বেগুন খাবে কে?

হল্ রেগে বলে, কুটলে কি আর তেবক থাকবে?

আয়ুধ বলে, আর তোমার ওই মাথা মোটা পেটরোগা মাছটা। দেখলে ঘেন্না লাগে!

হল্ রেগে ফেটে পড়ে: থাম্ মুখ্যু! যা জানিস না, তা নিয়ে কথা বলিস না। আমাদের পাঁড়ের হাতে পড়লে পিঁয়াজ রসুন দিয়ে ওকেই অমৃত বানিয়ে দেবে। শুধু বাজার করলেই হয় না রে। পড়তার হিসেব করতে হয়। তুই যেরকম রাক্ষুসে মতেল আনছিস, আমি বাজার না করলে হোটেল কোন্‌দিন ভকে উঠে যেত।

ব্যস্, লেগে গেল।

পতিতপাবন ছুটে আসতে আসতে এক প্রস্থ হয়ে গেল। হলের লাঠির ঘায়ে আয়ুধের মাথা কেটে গেল, তা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আর আয়ুধের চেলাকাঠের আঘাতে হলের দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। রক্ত দেখে পতিতপাবন ঠকঠক করে কাঁপছে। বলছে, এ হতভাগারা আমাকে থাকতে দেবে না এখানে। একদিন খুন-খারাপি করে পুলিশ হয়রানিতে করবে। নিজেরাও পড়বে, আমাকেও মারবে।

তখনি সে ডাক্তার ডেকে ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় দুইভাই দুটি খাটে শুয়ে। কেউ কথা বলছে না। বোধহয় বলার শক্তিও নেই। শুধু মাঝে মাঝে চোখ মেলে পরস্পরের দিকে কটমট করে চাইছে। তখন মনে হচ্ছে, এই বুঝি একজন আরেকজনের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পতিতপাবন ওদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, পাছে আবার কোন নতুন বিভ্রাট বাধায়। ঘরের বাইরে থেকে

...টিগোটা সমস্ত সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে সাগালের মধ্যে হাতিয়ার পেয়ে কেউ না অপরকে আক্রমণ ...রে বসে।

দুপুর হল। ওই ঘরেই ওদের দুজনের খাবার দেওয়া হল। পতিতপাবন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুইভাইকে ...রের সংগে খাওয়ালে।

আহারান্তে দুই ভাই নিদ্রায় গেল। বেশ লম্বা নিদ্রা। বোধকরি ক্লান্তি ও অবসাদের জন্তে ঘুম থেকে যখন ...ল, তখন সন্ধ্যার আর বেশী বাকি নেই।

চা-জলখাবার এল।

পতিতপাবন সমস্ত সময় ওদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। তার মনে হল, দুজনেরই চোখ থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ...নেকখানি শান্ত হয়েছে। মনে আশা হল। হয়ত রাত্রে আর নতুন কোন উৎপাত হবে না। তবু বিশ্বাস ত ...ই। দুটিই ত রত্ন। পতিতপাবন মধ্যিখানে একটা চেয়ার টেনে বসল।

আয়ুধকে জিজ্ঞাসা করলে, মাথার আর যন্ত্রণা আছে?

আয়ুধ বললে অল্প।

তারপর হল্‌কে পতিতপাবন জিজ্ঞাসা করলে, তোমার দাঁত?

হল্ বললে, ভাল।

পতিতপাবন আজেবাজে গল্প আরম্ভ করলে। শুনে দুই ভাই হাসতে লাগল।

হঠাৎ আয়ুধ উঠে বসল।

পতিতপাবন চমকে উঠল: বসছ কেন?

আয়ুধ বললে, বলি নি।

বলে খাট থেকে নামল।

পতিতপাবন সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাইরে যাবে! ধরব?

—না।

আয়ুধ হলের দিকে পা বাড়ালে।

ভয় পেয়ে পতিতপাবন ওর কাছে গেল। বোধকরি হল্‌ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সেও সভয়ে উঠে বসল।

ততক্ষণে আয়ুধ হলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। কেউ কিছু বোঝাবার আগেই আয়ুধ করুণকণ্ঠে বলতে আরম্ভ ...: জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। বাবা আমাদের কলহ করতে নিষেধ করে গেছেন। আর ...রা কলহ করব না।

কান্নায় তার গলার স্বর ভেঙে এল। আর কিছু বলতে পারলে না। শুধু হলের পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ...র কাঁদতে লাগল।

হল্ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগল, তুই আমার ভাই, লক্ষ্মণের মত ভাই।

কারও কান্না থামে না। পতিতপাবন অবাক। সেও খুব খুশী হয়ে গেল। যাক্, এদের ঝগড়াটা বন্ধ হল। ...-হামলার হাত থেকে ও অব্যাহতি পাবে।

কিন্তু কোথায় বন্ধ? শুধু একটা ছক বাঁধা হয়ে গেল।

এরপর থেকে আরম্ভ হল, দিনে কালবৈশাখী, রাতে চাঁদের আলো। পতিতপাবনের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে দুজনে ঠিক একজায়গায় হবে এবং সংগে সংগে প্রথমে গালাগালি, তারপরেই হাতাহাতি। পতিতপাবন লাঠি-সোঁটা সরিয়ে রেখেছে। সুতরাং রক্তপাতটা হয় না, কিন্তু দুজনেই জখম হয়ে পড়ে। পতিতপাবন অবাক হয়, তার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে এরা পরস্পর মিলিত হয় কি করে? কিন্তু হয়। পতিতপাবন এসে দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের নিজের খাটে শুইয়ে দেয়। সন্ধ্যেবেলায় সেই মার্জনা ভিক্ষার পালা এবং অশ্রুবর্ষণ। প্রায় প্রতিদিনই এইরকম চলতে লাগল।

পতিতপাবন বলে, ওরা দুইদিকই রেখেছে; দিনের বেলায় ওদের প্রকৃতিগত কলহ, আর সন্ধ্যেবেলায় স্বর্গত বাপের আদেশ পালন।

ঘৃতাহুতি

কালীচরণ ঘোষ

যখন কার্জ্জন এসে ভারত শাসনযন্ত্রের ভার গ্রহণ করলেন, তখন উদারপন্থী দলের প্রভাব ক্ষয়ের দিকে
লেছে, এবং কার্জ্জনী শাসনের ফলস্বরূপ তাঁরা লোপ পাবার পথ ধরতে বাধ্য হ'য়েছেন। অশান্ত মহারাষ্ট্রের কথা
ারে বারে বলা হয়েছে। ১৮৯৩ আগষ্ট থেকে ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় অরবিন্দর "পুরাতনের
াসে নূতন বর্ত্তিকা" প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রমুখ মডারেট
াহারথিবৃন্দের টনক নড়ে উঠেছে। ফলে দেশীয় বরেণ্য-নেতাদের মধ্যে য'দি এই আলোড়ন সুরু হয়ে থাকে,
তর্ক ব্রিটিশ শাসকমহলে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে, তার খানিকটা অনুমান করা যায় মাত্র।
স্রবণের উৎসমুখ যদিই বা রুদ্ধ করা সম্ভব হয়, প্রগতিশীল জাতির কল্যাণকর ভাবধারা একবার রূপ নিতে
চষ্টা করলে তাকে দমন করা সম্ভব নয়। ইতিহাস চিরকাল এ সাক্ষ্য বহন করে আসছে। আরও মনে রাখতে
যে, কার্জ্জন আসবার আগেই অরবিন্দ সশস্ত্র-বিপ্লবের মন্ত্র গ্রহণ করেছেন অন্তরে। তার বহিঃপ্রকাশ কেমনভাবে
বে তখন ঠিক ভেবে উঠতে পারা যায়নি।

১৯০· সালের একেবারে শেষ দিকে অরবিন্দ পাঠালেন বিশ্বস্ত অনুচর যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯০২
াতা বারীন্দ্রকে বাঙলায় বিপ্লব সংঘটনের সুবিধা অসুবিধার তত্ত্ব অনুধাবন করবার জন্যে। ১৯০২ সালের
১, ২২ ও ২৩-শে অক্টোবর সিষ্টার নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং বাঙলার রাজনৈতিক
বস্থার কথা বিশদ আলোচনা করেন। এক গোষ্ঠীর ধারণা এই আলোচনাই অরবিন্দকে বাঙলার ব্যাপারে
ধিকতর মনোযোগী করে তোলে এবং ১৯০৩ সালের ভিতরে তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে
বেই প্রকৃত তথ্য আহরণ করতে থাকেন।

১৯০০-০১ সন্ধিক্ষণে পি (প্রমথ) মিত্র, সরলা দেবী ও ওকাকুরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ভারতীয় রাজ-
তিক আন্দোলনকে আরও শক্তিমান করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পি মিত্র ও সতীশ বসু অনুশীলন
মিতি ও সরলা দেবীর 'আখড়া' স্থাপিত হয়। এই দুই, বিশেষতঃ প্রথমটির অবদান যে কত বিরাট, তার কথা
ংক্ষেপে বলা চলে না।

এই পটভূমিকায় কার্জ্জন লাট মসনদে আরোহণ করলেন। যখন এসকল ঘটছে, তখন তাঁর শাসনকাল
র দুই উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তিনি চোখ খুলে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের সময় করতে পারেন নি বা, সম্পূর্ণ
পেক্ষা করেই চলেছেন। বিপ্লবের আসন্ন ঘনঘটা তাঁর বিচারশক্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলে মনে হয়।

বিপ্লবের পথে দ্রুত ঠেলে নিয়ে যাবার পথে সরকারী ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। মহারাষ্ট্রে প্লেগ বিস্তার রোধ করবার ব্যবস্থা যে প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্ব সে তথ্য আজ বিতর্কের স্তর অতিক্রম করেছে। ভারতবর্ষে কার্জ্জনের আবির্ভাব ও ক্রিয়াকলাপ র‍্যাণ্ডের অত্যাচার কাহিনীকে ম্লান করে ফেলেছিল। জাতীয়তার বিপদসঙ্কুল পন্থা গ্রহণে বাধ্য করার জন্য যদি একক কাকেও প্রধান অংশের গৌরবদান করতে হয় তাহ'লে লাট কার্জ্জনের কথা প্রথমেই মনে আসে।

এই সময়ের ঘটনা পরম্পরায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপ্রগতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ভারতে ইংরেজ-শাসন, চিন্তাশীল শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মন বিষাক্ত করে রেখেছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা দ্রুত বেড়েই যাচ্ছিল। অপরাপর সকল বিষয় এখানে উত্থাপন না করে একজন উদারপন্থী মাননীয় নেতার মতামত উদ্ধৃত করা হ'চ্ছে,—মনে রাখতে হবে, তালিকা বহুলপরিমাণে অসম্পূর্ণ কিছু বাদও দিতে হয়েছে। লর্ড কার্জ্জনের এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে উচ্চারিত বাণীর প্রতিবাদ বেরিয়েছে স্যার ফিরোজশা মেহ্‌তা প্রদত্ত ১৯০৫ সালে কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতার ভিতর দিয়ে।

লাট বাহাদুর বলেছিলেন যে ইংলণ্ড সম্বন্ধে ভারতবাসীর মধ্যে দুটি (বিরুদ্ধ) দল থাকতেই পারেনা।

তদুত্তরে মেহ্‌টা বললেন—

("There might be no two parties about England in India").

(Indian Daily News, January 6, 1905).

এ আশা পোষণ করা নিতান্ত অযৌক্তিক কারণ সেটা কখনই সম্ভব নয়,—

"যখন (while)

(মহারাণীর ঘোষণায়) সমস্ত প্রজার মধ্যে যে সমতার উল্লেখ ছিল সেটা ছাপার অক্ষরে তুলে রেখে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিপালিত হয় না,—পরন্তু উপেক্ষিত হয়।—

যখন মহারাণীর মহান ঘোষণা মতে জাতি ধর্ম দেশ নির্ব্বিশেষে সকল পার্থক্য তিরোহিত হলেও, কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ গুণ বা শক্তির ছলনায় বর্ত্তমান ভারতীয়কে অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করা হয়—এবং শ্বেতাঙ্গ মনোনীত হয়—

("While the distinctions···of race, colour and creed are introduced under the possible guise of distinctions based on distinctive merits and qualifications inherent in race.")

যখন, বিশাল সাম্রাজ্যের অসহনীয় বোঝা সমস্ত উপনিবেশের সঙ্গে ভারতকে সমানভাবে ভাগ করে নেবার কথা, সেখানে অশোভন পক্ষপাতিত্বে একা ভারতের ধনভাণ্ডারের ওপর সেই ভার চাপানো হয়;

যখন, সামরিক প্রয়োজনে ইংরেজের স্বার্থে এবং নিরাপত্তার অজুহাতে সমস্ত ব্যয় ভারতের ক্ষীণ অর্থসঙ্গতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়;

যখন, শ্বেতাঙ্গ জাতির গোপন স্বার্থে ছলনার আশ্রয়ে ভারতীয় নাগরিক তাদের ন্যায্য সঙ্গত দাবী ও প্রাপ্য হ'তে বঞ্চিত হয় এবং যে সকল আচরণকে কোনো কোনো ব্রিটিশ মন্ত্রী বুয়র যুদ্ধের কারণ বলে নির্দ্দেশ করেন, আর সেই সব নীতি ভারতে প্রযুক্ত হয়;

"While the Indian subjects of Her Majesty are allowed to be deprived of their rights of equal citizenship in the undisguised interests of the white races against the dark in a manner which responsible—Ministers of the Crown gravely declared, furnished a just cause of war against the Boers);

যখন, দুই দেশের অর্থবণ্টন নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা গরীয়ান দেশের (ভারতবর্ষ) স্বার্থ উপেক্ষা করে বলবানের—পক্ষে প্রযুক্ত হয় ;

যখন, ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা ব্যাহত করা হয় ;

যখন, শাসনকর্তাদের অন্তরে ভারতের প্রতি "অত্যুগ্র প্রেম" (consuming love) গর্ভজ সন্তানের প্রতি অতি স্বাভাবিক প্রেমের তুলনায় সপত্নী পুত্রের প্রতি প্রেমের মত মনে হয় ;

(While the 'consuming love' for Indian in the breasts of the Rulers has more the colour and charter of affection towards a foster-child or a step-son, than the equal and engrossing love for a natural son) ;

যখন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মত অকপট (bonafide) প্রতিবাদের নির্দেশ, স্বেচ্ছাচারী (autocratic) আবেগে ভণ্ডুল করা হয় ;

যখন, অস্ত্র আইন (Arms Act প্রয়োগে সমস্ত একটা জাতিকে শক্তিহীন করে ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশের স্বার্থহানি করা হয় ;

+ + + + +

যখন,—

থাক্‌গে, ভারতের আপত্তিকর ও তাহার বিরুদ্ধ-স্বার্থে পরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থার তালিকা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই।"

এই যখন মডারেট বা নরমপন্থী একজন সর্বজনমান্য নেতার মনোভাব তখন এ সকল ব্যাপারে উগ্রপন্থীদের কারও মতামতের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কার্জন যেটা করতে চাইলেন সেটা কৃষ্ণবর্ণে হবিঃ সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮৯৮ ডিসেম্বর লর্ড ন্যাথানিয়েল কার্জন বড়লাটরূপে ভারতে পদার্পণ করেন। তাঁর অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয়নি। কারণ তখনও তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায় নি। বিশেষ করে লাট নির্বাচিত হবার পর ইংলণ্ড পরিত্যাগের প্রাক্কালে 'সুদুর্লভ মনোহারী বচন' দিয়ে ভারতীয়ের মন অভিভূত করে ফেলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কার্জনের ভাষায় উল্লেখ করেছেন,

"I love India, its people, its history, its government, the complexities of its civilization and life."

অর্থাৎ আমি ভারতকে ভালবাসি, ভালবাসি তার জনসাধারণকে ; তার ইতিহাস, তার শাসনব্যবস্থা, তার সমস্যাসঙ্কুল সভ্যতা এবং তার জীবনের ধারা।"

এ বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। আরও বলেছিলেন যে ভারতীয় 'ভাইসরয়', অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধির দুটি বিশেষ গুণ, সাহস ও সহানুভূতি ("courage and sympathy") থাকা অপরিহার্য। ফলে যা পরিচয় পাওয়া যায়, সেটাও মিথ্যাভাষণের অপূর্ব দক্ষতা বলে মেনে নিতে হয়।

সংস্কৃত প্রবচনে আছে,

"মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্"

—দুরাত্মাদের মন, বচন ও কর্ম, প্রত্যেকটি অপরটি হইতে ভিন্ন। এদের একের সঙ্গে অপরের কোনো মিল নেই এবং তার জাজ্বল্য প্রমাণ কার্জনের আচরণে পাওয়া যায়।

লাট সাহেবের আসল মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হ'লো যখন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন (ভারত সভা) থেকে তাঁকে লাটপ্রাসাদে অভিনন্দন জানাবার তোড়জোড় করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ এক বিশিষ্ট নাগরিকদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, দুই জনের পায়ে দেশীয় ধরণের জুতা থাকাতে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে তাঁদের বিদায় করে দেন। ক্ষুব্ধ অপমানিত ভদ্রলোকদ্বয় চলে যাবার পর হলে লাটমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।

এর পরই কার্জন ১৯০১ সালে সিমলায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় এক গোপন বৈঠক (Educational Conference) ব্যবস্থা করেন। সেখানে কোনো ভারতীয়ের স্থান ছিল না। সেই সভাতেই তিনি বলেন যে, যেখানে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত, সেখানে তিনি গোপনীয়তা মোটেই সমর্থন করেন না। অথচ এই অনুষ্ঠানেরই আলোচ্য বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ত কোনো সময়েই প্রকাশ করা হয় নি।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালনায় যেটুকু স্বাধীনতা জনপ্রতিনিধিদের ছিল, তা খর্ব করে তিনি এটিকে গভর্ণমেণ্টের তাঁবেদারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বিক্ষোভ হয়েছিল, কোনো ফলই হয় নি। রমেশ দত্ত লিখেছিলেন, "Real popular government was at an end."

ঊনবিংশ শতকের শেষ কটা বছর—ভারতের অতি দুঃসময়। দুর্ভিক্ষ ও দারুণ-অন্নাভাব দেশকে জর্জরিত করে তুলেছিল। সহস্র সহস্র লোক যখন আশ্রয়-শিবির ত্যাগ করতে পারে নি, যখন আর্থিক অবস্থা একেবারে চরমে উঠেছে সেই সময় ১৯০৩ সালে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক সংবাদ সাড়ম্বরে, (রমেশচন্দ্রের ভাষায় "with unseasonable ostentation and expense") সুসম্পন্ন হ'য়েছিল। আর বছরটির পরিসমাপ্তি ঘটে "with a needless, cruel and useless war in Tibet"—অপ্রয়োজনীয়, নির্মম ও অবাস্তব তিব্বত অভিযানে। লোকের মন তিক্ত বিরক্ত অবস্থা থেকে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে তখন। ২৬-এ আগষ্ট (১৯০৪) 'কাল' পত্রিকা লেখে যে নিহিলিষ্টরা যে দাবী করেছে (জনমতের প্রাধান্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি, ইত্যাদি) তার সঙ্গে "ভারতের দাবীর আশ্চর্যাজনক সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এবং সরকারের তিব্বত অভিযান দুটি আলোচনা করে বলতে হয় যে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এখানে নিহিলিষ্ট নেই" (যারা সেরা বাছাই রাজকর্মচারী হত্যা করতে পারে)। ২রা সেপ্টেম্বর পত্রিকা আরও বলে যে নিহত রুশ-রাজকর্মচারী (এম্. প্লেভে)-র অত্যাচারের তালিকা কার্জনের অত্যাচারের কাছে অতি তুচ্ছ বলে পরিগণিত হবে।" এর নির্গলিতার্থ, "অর্থাৎ কার্জনকে কেউ হত্যা করছে না কেন?"

কংগ্রেসের ওপর কার্জন খাপ্পা হয়ে উঠছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের বড়কর্তাদের লিখেছিলেন কংগ্রেসের আয়ুকাল শেষ হয়ে এসেছে; তিনি তার শান্তিপূর্ণ সমাধির জন্ত চেষ্টা করছেন। মানসিক এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট স্যার হেনরী কটনের সঙ্গে সাক্ষাতে অস্বীকার করে তাঁর নিজ বিষাক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। কথায় আছে, আসন্ন বিপত্তিকালে পুরুষের ধীঃ মলিন হয়ে পড়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত বুদ্ধিমান 'অবতার' স্বর্ণমৃগের জন্ম সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বাস করে বসেছিলেন।

১৯০৪ অধিবেশনের শেষে ২৯-শে ডিসেম্বর কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্জনের হাতে দেবার জন্ত কটন এক পত্র দেন। ২-রা জানুয়ারী (১৯০৫) তাঁর সেক্রেটারী জানান, এর পূর্ব্বে কোনো বড়লাট বাহাদুর এরূপ কাকেও সাক্ষাতের সুযোগ দেন নি; তা ছাড়া এরকম একটা (অপ) কর্ম করে অনুগামীদের জন্ত কোনো নজির সৃষ্টি করতে চান না। যুক্তি অকাট্য; তখন যে আগুন জ্বলে উঠছে, সে বিষয়ে কার্জন লাট অন্ধ হয়ে বসেছিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে এইভাবে অপমান গুরুতর হয়ে লোকের প্রাণে বেজেছিল, তার ফল ফলতে বিশেষ দেরী হয় নি।

এই অশালীন আচরণ ইংলণ্ডের কোনো কোনো পত্রিকা-সম্পাদকের দৃষ্টি এড়ায় নি। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ (Indian Daily News) পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা ৬-ই জানুয়ারী (১৯০৫) তার-যোগে জানিয়েছিলেন যে, বিলাতে বহুসংখ্যক (ভদ্র) লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে কার্জনের পক্ষে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করা তখনকার ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করছে। কিন্তু লণ্ডন ডেলি নিউজ (London Daily News) ও মর্ণিং লীডার (Morning Leader) কার্জনের আচরণের তীব্র নিন্দা করে। প্রথমোক্ত পত্রিকা বলে যে কটনের অপমান সারা ভারতের মর্মে আঘাত করেছে; এটা কটনের ব্যক্তিগত অপমান নয়। ব্যবহারটা প্রতি আমলাতন্ত্রী (bureaucratic) লাটের ঘৃণার পরিচায়ক।

("It embodies in a personal affront, the contempt with which the bureaucratic Viceroy regard the popular movement.")

এর সঙ্গে ছিল সতর্কবাণী। নানাভাবে কার্জন এ যাবত ইংলণ্ডের প্রতি ভারতীয় জনগণের বিরাগ সৃষ্টি করে আসছেন, কিন্তু তাঁর এই উদ্ধত ব্যবহার তাঁর ইতিপূর্বেকার সকল যুক্তিহীন আক্রমণাত্মক ও বেদনাদায়ক কাজকে অতিক্রম করেছে।

("Lord Curzon has throughout done his best to lose us the sympathy of the natives, but he has never equalled the tactless offensiveness of his latest affront.")

কার্জনের অহংকার ছিল, সত্যের সর্বোচ্চ আদর্শ প্রধানতঃ প্রতীচ্যে উদ্ভূত ("The highest ideal of truth is to a large extent a Western conception"). এতেই তাঁর বক্তব্য শেষ হয়নি। তিনি বলেছিলেন "প্রাচীতে সম্মান পাবার আগেই প্রতীচ্যের নীতিশাস্ত্রে সত্য অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল, আর সমকালে প্রাচীতে চাতুরী, ও কূটনৈতিক বঞ্চনা অতি গৌরবের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল।" ১১-ই ফেব্রুয়ারী (১৯০৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি স্নাতকোত্তর ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষিত গণ্যমান্য অতিথিদের এই তথ্যদানে ধন্য করেন। তাঁর মতে ভারতীয়ের প্রথম দোষ অতিরঞ্জন (exaggeration)। বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝালেন তথ্যবিবর্জিত আবিষ্কার (invention) ও আরোপ (imputation) ভারতে অস্বাভাবিকরূপে পুষ্ট হয়ে থাকে ("flourish in an unusual degree"). তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হাঁটকে তিনি দেখেছেন এবং তাঁর কাছে বলতে বাধ্য হচ্ছেন "অশ্বডিম্ব" ('ঘোড়া পাখীর বাসা'), যা আজগুবি ভারতে যত চলে অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ("I know no country where mare's nests are more prolific than here."

এতটেও তাঁর গায়ের জ্বালা মেটেনি। আর যে কয়টি দুর্বলতা ভারত থেকে তিনি নির্বাসন দিতে চান, সেগুলি হচ্ছে চাটুবাদ (flattery), কটু নিন্দাবাদ (vituperation), তোষামোদ (sycophancy), পরীবাদ কুৎসা (slander), গালিগালাজ (vilification) ও মিথ্যা আরোপ (imputation)। মহাপুরুষের এই উক্তি শুনে শ্রোতাদের মনের ভাব ব্যক্ত করা কঠিন। সোদরোপম বন্ধু শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ('মুক্তির সন্ধানে ভারত') বলেছেন যে সিষ্টার নিবেদিতা কার্জনের বই—"The Problems of the East" (প্রাচীর সমস্যা) থেকে এক উদ্ধৃতি অমৃতবাজার পত্রিকায় সরবরাহ করেন। বক্তৃতার তিনদিনের মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে এটা প্রকাশিত হয়। এই থেকে জানা যায় কোরিয়া রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সত্যসন্ধ কার্জন তাঁর বয়স সম্বন্ধে সরাসরি মিথ্যা বলেছিলেন, আর তিনি অবিবাহিত এবং রাজপরিবারের কেহ না হ'লেও "রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব" বকাণ্ড প্রত্যাশার ভার তাঁর কপালে ঝুলছে। প্রাচীর অধিবাসী ও কোরিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপে ভরা লেখাটি ছাপা হলে হাস্য

কার্জনের মত লজ্জাহীনের কিছু লজ্জা হ'য়েছিল, কারণ পরের সংস্করণে বই থেকে এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক একমাস বাদে ১০-ই মার্চ (১৯০৫) টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদসভা আহূত হ'য়েছিল। সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ সখেদে বলেছিলেন প্রাচীতে যেসকল মহাপুরুষ জন্মেছিলেন গৌতমবুদ্ধ, যীশু, খৃষ্ট, মহম্মদ, তাঁরা অপরের ওপর কর্তৃত্ব করতে শেখান নি। শিখিয়েছিলেন কেমন করে মরতে হয়, অর্থাৎ পবিত্র মৃত্যুভয়-লেশহীন জীবনযাপন করে গেছেন এবং সেই আদর্শ দেশবাসীর জন্য রেখে গেছেন। এই বক্তৃতায় তিনি সর্বময় কর্তা। তিনি নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মত সামরিক সকল বিভাগের অধ্যক্ষ বলে মনে করেছিলেন। ভারতের সেনাপতি হবেন তাঁর একজন পরামর্শদাতা পার্ষদ মাত্র। তিনি না বুঝে এই শক্তির পরীক্ষায় নেমে পড়েছিলেন। দ্বন্দ্ব বাধলো ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রিয়, প্রভাববান, ভারতের প্রধান সেনানায়ক লর্ড কিচ্‌নারের সঙ্গে। দারুণ বাদানুবাদ বিতণ্ডা চলেছিল ভিতরে ভিতরে। শেষপর্য্যন্ত অসামরিক লাটের পরাজয় ঘটে জঙ্গীলাটের কাছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কার্জ্জনের অনেক আবদার সহ্য করেছিল; এবার কিচ্‌নারকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস হলো না। কার্জ্জনের নানা আচরণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হয় ত আর তত পছন্দ করছিল না। ভারতের নানাস্থানে অশান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিশেষতঃ সামরিক বিভাগে প্রধান সৈন্যসরবরাহকারী পাঞ্জাবীদের মধ্যে ধুমায়মান অসন্তোষ সুষ্ঠুভাবে দূর করতে সমর্থ হওয়ায় কিচ্‌নারের তখন 'একাদশ বৃহস্পতি'র সময় চলেছে। রণে পরাজিত হয়ে ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে কার্জ্জন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ২০-এ আগষ্ট (১৯০৫)।

কার্জ্জন ৯ই নভেম্বর চিরতরে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করলেও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে ভারতবর্ষের অহিত সাধনে অলস ছিলেন না। তিনিই বলেছিলেন পূর্ব্ব বাঙ্গলার ছোটলাট ফুলার (Bampfylde Fuller) এর পদত্যাগপত্র বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালী ছেলেরা কেমন করে স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

কার্জ্জনের অবিবেকিতার শেষ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা, ছাপাখানা, পত্রিকার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ, "দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ" ("poor white" দের জন্য কর্মসংস্থান প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবাসীর প্রতি তাঁর যে দরদের (Sympathy) নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার তুলনা মেলা ভার। একেই অশান্তি ঘনীভূত হয়ে উঠছিল এমন সময় এল বঙ্গবিভাগ, ১৬-ই অক্টোবর ১৯০৫। সমস্ত দেশ রাগে ফেটে পড়লো, সভা, সমিতি, আন্দোলন প্রচণ্ড আকারে দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রচণ্ডতায় আক্রমণ সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। দেশের স্বাধীনতার রুদ্ধদ্বার একটুখানি ফাঁক হয়ে ভিতরের দিব্যজ্যোতি-র এককণা ছটা প্রকাশ করে দিল।

কথায় আছে অতিদর্পে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত লঙ্কেশ্বরের নিধন ঘটেছিল, "অতি"র অত্যাচারে দুর্য্যোধন ও কুরুকুলের পতন ঘটে। ব্যতিক্রম ঘটেনি কার্জ্জনের ক্ষেত্রে। এই প্রভুত্ববিলাসী লোকটি ভারতের বক্ষেই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি হলেন "ভাইসরয়" ইংলণ্ডেশ্বর প্রতিভূ—গ্রহণ অন্যায় হয়েছে মনে করে রাখা তাজ বাঙ্গালীকে উত্ত্যক্ত করে মারতে তিনিও কার্জ্জনের মত এক ধুরন্ধর।

চক্ষুলজ্জা বলে একটা বস্তু কার্জ্জনের সামান্য কিছু যে ছিল, তার প্রমাণ একটা আছে। ১৯০৮ জুনের শেষে পার্লামেণ্টে হাউস্-অফ্-লর্ডস (House of Lords)-এ একসভায় তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে দায়িত্ব পরের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলেন। লণ্ডন টাইম্‌স পত্রিকা আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলে তিনি ১-লা জুলাই তার এক লিখিত উত্তর পাঠিয়ে দেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে পার্টিসনের চরম রূপ সম্বন্ধে তিনি কোনো দায় গ্রহণ করছেন না

'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'

'প্রবাসী' চিরকালই দেশের কথা ও পল্লীর কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সকল সমস্যা-সমাধানের নির্দেশক এই প্রবাসী। নিরপেক্ষ সমালোচনা সেদিন একমাত্র 'প্রবাসী'ই করিয়াছে। সত্যরক্ষার্থে কঠিন মন্তব্য করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীকেও কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবাসী চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে।

রাজনৈতিক ফাঁদে বাঙালীর দুর্গতি আজ নূতন নয়। সেই কতবছর আগে 'প্রবাসী'ই বলিয়াছে:

"বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মানীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাঙলাদেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলাদেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে, যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহারপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, 'ওহে, দেশের জন্য কিছু কর,' তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?" সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর," তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ।" প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭।"

এই দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই 'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'। বিদগ্ধ-সমাজে আজও প্রবাসী আদরণীয়। যদিও কালের প্রভাবে আজ মানুষের রুচি নিম্নগামী। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-অধোগতি লজ্জার কথা!

কারণ ১৯০৪ সালে ছুটি উপলক্ষে তাঁর ইংলণ্ড অবস্থান কালে এটা সংসাধিত হয় এবং ডিসেম্বর মাসে ফিরে গিয়ে তাঁর সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। একটু সংশোধিত আকারে বলেন "পত্রিকা যেমন বলছে, চরম দায়িত্ব আমার এবং আমি তা কখনও মাথাতে চেষ্টা করি নি" ("Of course, as you say, the final responsibility thus became mine, and I have never said one word to repudiate it").

পার্লামেন্টের ঐ অধিবেশনেই ভারতে অশান্তির কারণ হিসাবে কার্জন বলেন যে, ভারতে (কু) শিক্ষা বিস্তার, পার্লামেন্টের নির্দেশানুযায়ী ভারত শাসনব্যবস্থা এবং রুশ-জাপানের যুদ্ধে রুশের পরাজয় এশিয়াবাসীর প্রতি অলি-গলির পথে-প্রান্তরে সাধারণ লোকসমাগমের আড্ডায় আলোচিত হচ্ছে। তাঁর অপকর্ম পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী সহ্য করেন নি, এই হলো পার্লামেন্টীয় শাসনের ওপর কার্জনের আক্রোশের কারণ। যথেচ্ছাচার শাসনই বোধহয় ভারতের পক্ষে উপযোগী বলে তাঁর বিশ্বাস। বড় ব্যথা অপমান নিয়ে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল সেকথা ভুলতে পারেন নি, পারবার কথাও নয়।

কার্জনী শাসন চলেছিল জগদ্দল পাথরের নীচে ফেলে জনমতকে দলিত নিষ্পিষ্ট করে। কোথাও কোনো আন্দোলন যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায় জাগ্রত জাতির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কার্জনের কোনো জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরই সময় বাঙলায় জাগরণ উৎকট রূপ ধারণ করেছিল। লর্ড রোণাল্ডসে (Lord Ronaldshay: Life of Lord Curzon, p, 326) কার্জনের জীবনী লিখেছেন। তিনি বলেছিলেন বাঙলার তৎকালীন বিচার-বিচ্যুত উৎকট ভাবধারা ও তজ্জাত প্রয়াসের ঝড় উঠেছে এবং ভাবাবেগে লোককে জাগতিক প্রাকৃত ঘটনার উর্দ্ধে তুলে ধরছে। (অগ্র-পশ্চাৎ সাধ্যাসাধ্য তারা আর ভাবছে না)। লাট কার্জন ফুৎকারে যে ভাবাবেগ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বিরাট তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার ওঠার মত, সেই উন্মাদনা আজ বাঙালীর স্নায়ু শিরা উপশিরা স্পর্শ করেছে।" এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? লর্ড রোণাল্ডসের ভাষা তুলে দিতে হলো কারণ অনুবাদে কিছু ব্যত্যয় ঘটে থাকবে:

"Bengal, in fact, was passing through one of those storms of unreasoning passion which were ever liable to sweep its emotional people off their feet. Their nerves were thrumming like the strings of a giant harp to the magic touch of the very sentiment which Lord Curzon was inclined too lightly to brush aside."

রোণাল্ডসের উক্তি থেকে বোঝা যায় কার্জন "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌচোভৌ পাণিভ্যাম্" হরণ করতে বিফল চেষ্টা করেছিলেন। অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, কার্জন ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বেই নানাস্থানে বিক্ষোভ বিস্ফোরণের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। কিন্তু কার্জন তখন (বলতে হয় ভারতের মঙ্গলের জন্যে) অগ্রপশ্চাৎজ্ঞানশূন্য হয়ে দমনের বিফল পন্থা গ্রহণ করেছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ও পি, মিত্র ১৯০৫ সালে পূর্ব্ব বাংলায় প্রচার কার্য্যে বেরিয়েছিলেন। ফলে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়, আর বঙ্গবিভাগ রদ করার জন্য দারুণ উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। ৭-আগষ্ট (১৯০৫) যুগান্তকারী বয়কট আন্দোলন সুরু হয়। অস্ত্রশস্ত্রবিহীন জাতির কাছে এটা যে কত শক্তিমান প্রহরণ সেটা বুঝতে বেশী সময় লাগেনি। তার আগে ২১-শে জুলাই লালমোহন ঘোষ দিনাজপুরে বক্তৃতায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে অসহযোগ করার নির্দেশ দিলে লোকে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতি-প্রগতি নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। যুবকদের মারমুখী মনের তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছিল যখন উন্মাদকর হত ১৩ নভেম্বর (১৯০৫) প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যে বিদেশী অধ্যাপক রাসেলকে চটিকাঘাত করে। ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এ একটা অচিন্ত্যনীয় আচরণ; তথাপি এ হলো শাসনযন্ত্রের ওপর অশ্রদ্ধা প্রকাশের রূপ।

নানা স্থানে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেছে। না হবার কারণ নেই। কার্জ্জনের শাসন কালেই ১৯০৪ সালের ২৬ নভেম্বর "সন্ধ্যা", ১৯০৬ ৩-মার্চ্চে 'যুগান্তর' ৬-ই আগষ্ট সালে "বন্দেমাতরম্" অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করেছে। দাবানল জ্বলে উঠেছে দিকে দিকে। কার্জ্জন সাহেবই স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করে গেছেন। "ধর তরবার হাতে বাঙলার বীর সব হও আগুয়ান" বাক্য ২৬-জুলাই (১৯০৫) বাখরগঞ্জ-এ একসভায় উচ্চারিত হয়েছিল। এর পূর্ব্বে আক্রমণাত্মক বাণী আর কোথাও শোনা যায় নি।

কার্জ্জন সম্বন্ধে ১৯০৫ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে গোপালকৃষ্ণ গোখলে যা বলেছিলেন সে কথা এখানে উল্লেখ করা নিতান্ত অবান্তর হবে বলে মনে হয় না। গোপালকৃষ্ণ কার্জ্জনকে মোগল বাদশাহ আওরেঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করেন,। দুজনের মধ্যেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার দৃঢ়চিত্ততা ও একাগ্র প্রচেষ্টা, আত্মভোলা কর্ত্তব্যবোধ, বিস্ময়কর কর্ম্মশক্তি, বহুর মধ্যে সঙ্গী-হীনত্ব একাকিত্বভাব, মানবজাতির ওপর ঘোর অবিশ্বাস ও নির্য্যাতনপ্রবণতা প্রভৃতি দোষগুণ উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান। আর তার ফলে বিরাট চিত্ত-বিক্ষোভ ও বিফলতাজনিত তিক্তচিত্ততা অভিভূত করে রেখেছিল।......

লর্ড কার্জ্জনের অন্ধ ভক্তরাও বলতে পারবে না যে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তির সামান্য পরিমাণে শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।" বাকীটুকু তিনি প্রাণ খুলে বললেই পারতেন যে উভয়েই বিরাট সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ রোপণ করেছিলেন এবং সে বৃক্ষকে ফলে না হলেও ফুলের আবির্ভাব লক্ষ্য করে জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতের পুরাণকার বলেন একদা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য অসময়ে সনকাদি ঋষিগণ গোলকে এসে উপস্থিত হলে এবং জয় ও বিজয় দুই দ্বাররক্ষী প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হতে পারে এই আশঙ্কায় পথ ছেড়ে দিতে আপত্তি জানায় মহর্ষিরা তাদের অভিশাপ দিলেন মর্ত্তে গিয়ে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং চিরতরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হতে বঞ্চিত হ'তে হবে। হতবুদ্ধি হয়ে তারা প্রভুর শরণ নিলেন। ঋষিবাক্য অন্যথা হবার নয়। যেতেই হবে, তবে সাতজন্ম মিত্র ও তিনজন্ম শত্রুভাবে, এই দুয়ের মধ্যে একটা তারা বেছে নিতে পারে। মিত্রভাবে সাতজন্ম বাদে আসতে হলে বহুকাল লেগে যাবে তাই শত্রুভাবে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, কংস ও শিশুপাল রূপ গ্রহণ করে পরম ভক্তরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেইরূপ মনে করা যেতে পারে ভারতেরই এককালীন বন্ধু কার্জ্জন-রূপ ধরে এসেছিলেন। আনন্দমোহন বসু সত্যই বলেছিলেন।

"Lord Curzon has done us indeed signal service which enables us to lay the priceless foundation of a new national life".

সত্যিই কার্জ্জন সাহেব এক স্মরণীয় উপকার করেছেন। আমরা সেই সূত্রে জাতীয় জীবনের অমূল্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে সমর্থ হয়েছি।

বিপ্লবের ইতিহাস যতই আলোচিত হবে, ততই কার্জ্জন ও বঙ্গবিভাগের প্রতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং কার্জ্জনের দানের "কীর্ত্তি" ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। তাঁরা নিঃসংকোচে বলতে পারবে ১৮৯৯-১৯০৫ (আগষ্ট) এই সাড়ে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে একজন ভারতীয় লাট এত রকমে লোককে উত্যক্ত করেছেন যার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম চতুর্গুণ শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩